মানবজীবন

প্রফুল্ল রায়

সপ্তর্ষি, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩।

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক ঃ
ভোলানাথ দাস
সপ্তর্ষি
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ
কনক কুমার বসুঠাকুর
সুমুদ্রণী
৪/৫৬-এ, বিজয়গড়,
কলিকাতা-৭০০০৩২

উপন্যাস

ভাতের গন্ধ

ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা কাঁচা সড়ক চলে গেছে। এদেশে বলে 'কাচ্চী'। গোটা কাচ্চী জুড়ে গভীর আঁচড়ের মতো একটানা এলোপাথাড়ি গর্ত। বার মাস এই রাস্তায় বয়েল আর ভৈসা গাড়ি চলে। এগুলো তারই দাগ।

দু ধারে মাইলের পর মাইল পাথর-মেশানো পড়তি জমি। যতদূর তাকানো যায় কোথাও একটা ধানে শীষ চোখে পড়ে না। তবে শস্যহীন নিষ্ফলা কর্কশ মাটি ফাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে সর্বন ঘাস, সাবুই ঘাস, শরের ঝোপ। সর্বন পাতার সুঘ্রাণ হওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। এখানে ওখানে ফুটে আছে থোকায় থোকায় সফেদিয়া আর মনরঙ্গোলি ফুল। এই সব আগাছা আর ফুলের জীবনীশক্তি বড় প্রবল। নইলে রুক্ষ পাথুরে মাটির রস শুষে টিকে আছে কী করে?

কাঁচা মেঠো রাস্তায় হাঁটুভর লালচে ধুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে ধানোয়ার। বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ। বাজ-পড়া ঢ্যাঙা তালগাছের মতো চেহারা। দুবলা কমজোরি শরীরে মাংস বলতে বিশেষ কিছু নেই, সবই প্রায় হাড়। রোদে জ্বলে জ্বলে গায়েব রং তামাটে। ফাটা পা, মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি। খসখসে চামড়া থেকে খই উড়ছে। পরনে তালিমারা চিটচিটে খাটো ধুতি আর বহুকালের পুরনো জামা। কাঁধে একটা ঝুলি। তার ভেতর রয়েছে ধানোয়ারের যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি—বাঁদরার ছাই (একরকম ক্ষাব) দিয়ে কাচা দুটো কাপড়, দুটো জামা, একটা ধ্সো কম্বল, কিছু বাজরার ছাতু, খানিক মকাই, ক'টা সুথনি (এক ধরনের কন্দ), সিলভারের তোবড়ানো একটা থালা, পেতলের লোটা, ধারাল দা আর একটা টাঙ্গি। বছর দুই আগে এক আদিবাসী মুন্ডার কাছ থেকে আড়াই টাকায় টাঙ্গিটা কিনেছিল ধানোয়ার। সেটার ঝকঝকে ফলা ঝুলির বাইরে বেরিয়ে আছে।

ধানোয়ার জাতে গঞ্জু অর্থাৎ জল-অচল অচ্ছুৎ। তার বাপ, দাদা, দাদার বাপ, দাদার বাপের বাপ—আগের চার পাঁচ পুরুষ ছিল ভূমিদাস। অন্যের জমিতে তাদের আমৃত্যু বেগার দিতে হয়েছে। তবে ধানোয়ার স্বাধীন মানুষ। তাকে কারুর জমিতে কামিয়াগিরি করতে বা বেগার দিতে হয় না।

এই বিশাল পৃথিবীতে কেউ নেই তার। কোন ছেলেবেলায় বাপ-মা মরে গেছে তা ভাল করে মনেও নেই। ধানোয়ার তার মা-বাপের একমাত্র ছৌয়া। না আছে তার একটা ভাই, না একটা বোন। শুধু তাই না, একটা স্থায়ী আস্তানা পর্যন্ত নেই।

মা-বাপের মৃত্যুর পর থেকে কাজ আর খাদ্যের খোঁজে অনবরত ছুটে বেড়াচ্ছে ধানোয়াব। তার নির্দিষ্ট কোনো কাজও নেই। বেঁচে থাকার জন্য তাব হাজার রকমের উঞ্ছবৃত্তি। কখনও আরা জেলায় গিয়ে ঠিকাদারদের কাছে ফুরনের কাজ জুটিয়ে মাটি কেটে সড়ক বানিয়েছে সে। কখনও রাঁচী গিয়ে জঙ্গলকাটাইদের দলে ভিড়ে বিশাল বিশাল গাছের গায়ে কুড়ুল চালিয়েছে। কখনও শিকারিদের সঙ্গে কোশীর ধারের 'ফরিসে' (ফরেস্ট) চলে গেছে। সেখানে সে জঙ্গলহাঁকোয়া। টিন পিটিয়ে হল্লা বাধিযে বনের হিংস্র জানোয়ারদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে শিকারিদের বন্দুকের পাল্লার ভেতর এনে দিয়েছে। কখনও মুসহরদের মতো খেতমজুরের কাজ নিয়ে চলে গেছে মতিহাবিতে। যখন কোনো কাজ মিলত না তখন পূর্ণিয়ার বিলে গিয়ে সিল্লি কি বগেড়ি পাখি মেবে কোনো হাটে গিয়ে বেচেছে। যেখানে কাজ এবং পেটের দানা, সেখানেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেছে সে।

চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে ধানোয়ার যত হাজার মাইল হেঁটেছে পৃথিবীর সেরা ভূ-পর্যটকও বোধহয় তা পারে নি। কিন্তু তিন চার সাল আগে ভারি 'বোখারে' পড়ল সে। ধুম জ্বর, সেই সঙ্গে রক্তবমি। তখন সে যে ঠিকাদারবাবুদের কাছে কাজ করত তারাই তাকে 'অসপাতালে' ভর্তি কবে দিয়েছিল। দু'মাস পর যখন ছাড়া পেল, শরীরে সারবস্তু বলতে আর কিছু নেই, বেজায় কমজোরি হয়ে গেল ধানোয়ার। তারপর থেকে একনাগাড়ে কাজ করতে পারে না। দু রোজ খাটলে দশ রোজ শুয়ে থাকতে হয়।

তার থাকারও ঠিকঠিকানা নেই। আজ কোনো হাটের চালায়, কাল কোনো গাছের নিচে, পবশু

হয়ত কারুর বাড়ির বারান্দায়। তরশু বা নরশু সড়কের ধারের খোলা মাঠে। জীবন এইভাবেই কেটে যাচ্ছে তার।

ধানোয়ার এখন আসছে সুদূর উত্তর থেকে, যাবে দক্ষিণে। যেখান থেকে সে আসছে সেখানে এ বছর আদৌ বৃষ্টি হয়নি। ফলে খেতের পর খেত জ্বলে গেছে। মারাত্মক খরায় এক দানা ধানও সেখানে ফলে নি।

গত একমাসের মধ্যে একদিনও ভাত খায় নি ধানোয়ার। খাওয়া দূরের কথা, চোখে দ্যাখে নি পর্যন্ত। স্রেফ বাজরা, মকাই কি সুথনি খেয়ে আছে। সে শুনেছে দক্ষিণে এ বছর প্রচুর ধান হয়েছে। তার বড় আশা, ওখানে গেলে দু মুঠো ভাত খেতে পাবে।

উত্তর থেকে ধানোয়ার রওনা হয়েছিল দিন চারেক আগে। এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট, গাঁ-গঞ্জ, হাট-বাজার, সব তার মুখস্থ। সে জানে বিকেলের মধ্যে সেই জায়গায় পৌঁছে যাবে যেখানে সোনালি ধানে মাঠের পর মাঠ আলো হয়ে আছে।

দুপুরের আর বেশি দেরি নেই। সূর্য ক্রমশ আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে বেয়ে মাথার ওপর উঠে আসছে।

সবে শীতের শুরু। কিন্তু এর মধ্যেই বিহারের এই প্রান্তে হাওয়ায় মিহি চিনির দানার মতো হিম মিশে গেছে। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস এত বেলাতেও গায়ের চামড়ায় ছুরির মতো কেটে কেটে বসতে থাকে।

জোবে জোরে পা চালায় ধানোয়ার। যত এগোয় ততই যেন চোখের সামনে সফেদিয়া ফুলের মতো রাশি রাশি ভাত ফুটে ওঠে। গরম ভাতের সুগন্ধ নাকের ভেতর দিয়ে শরীরের শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে যেতে থাকে। হো রামজি, কত কাল সে ভাত খায় নি!

ঠিক দুপুরে, সূর্যটা যখন খাড়া মাথাব ওপর উঠে এসেছে সেই সময় মাঠ ফুরিয়ে গেল। ভাঙাচোরা কাঁচা রাস্তা থেকে 'পাক্কী'তে উঠে আসে ধানোয়ার। পাক্কী অর্থাৎ পাকা সড়ক। এটা ধরে আরো কয়েক ঘন্টা হাঁটতে হবে। ধানোয়ার একবার ভাবে—থামবে না, বরাবর হেঁটে যাবে। কিন্তু তখনই খেয়াল হয়, দুব্‌লা অশক্ত শরীর একেবারে ভেঙে আসছে। খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া দরকার। তা ছাড়া পেটের ভুখটাও অনবরত 'সুই' (ছুঁচ) বিঁধিয়ে যাচ্ছে। এখন কিছু না খেলে ধানের জমি পর্যন্ত হেঁটে যাবার মতো তাকত থাকবে না।

এদিক সেদিক তাকাতেই ধানোয়ারের চোখে পড়ে বাঁ ধারের ঝাঁকড়া-মাথা পিপর গাছগুলোর তলায় অনেক লোক বসে আছে। পুরুষ আওরত বাচ্চাকাচ্চা মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ জন। ধানোয়ার আস্তে আস্তে সেখানে চলে যায় এবং ওদের কাছাকাছি ঘাসের জমিতে কাঁধের ঝুলিটা নামিয়ে বসে পড়ে।

মাঠের মাঝখানে সেই কাঁচা রাস্তাটা ছিল নির্জন, ক্বচিৎ কখনও দু-একটা বয়েল কি ভৈসা গাড়ি পাশ দিয়ে ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ তুলে হেলে দুলে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু পাক্কীর ব্যাপারটা একেবারেই উলটো। উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে ট্রাক, দূর পাল্লার বাস, লৌরি, সাইকেল রিকশা, বয়েল বা ভৈসা গাড়ি চলেছে অবিরাম। তা ছাড়া মানুষের চলাচল তো আছেই।

রাস্তার দিকে চোখ নেই ধানোয়ারের। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে পিপর গাছের তলার মানুষগুলোকে সে দেখতে থাকে। এক নজরেই টের পাওয়া যায় ওরাও তারই মতো ভুখা, আধনাঙ্গা হাভাতের দল। এই দুপুরবেলা পুঁটলি-পোঁটলা, ঝোলা-টোলা বা গামছা কি ধুতির খুঁট খুলে বাসি লিট্টি, বাজ়রার রুটি কি ছাতু বার করে সবাই খাচ্ছে।

এত মানুষের ভেতর সব চাইতে বেশি করে যারা চোখে পড়ছে তারা হল দু'জন আওরত। একজনের বয়স কম, তিরিশের নিচেই হবে। হাত-পায়ের মোটা মোটা হাড় এবং শক্ত গড়নের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায় তার গায়ে প্রচুর তাকত। ছমকী লেড়কী না হলেও তার চেহারায় কিছু ছিরিছাঁদ রয়েছে। নাকটা যদিও বেঢপ মোটা, ঠোঁট দুটো পুরু, তবু চোখ বেশ টানা টানা। মাথায় অঢেল চুল, তবে তাতে জন্মের পর থেকে খুব সম্ভব তেল পড়ে নি। লাল ধুলোয় সেগুলো তামাটে, রুক্ষ এবং

জটপাকানো। পরনে খাটো শাড়ি আর জামা। কানে ঝুটো পাথর বসানো চাঁদির করণফুল ছাড়া সারা গায়ে আর কোনো জেবর বা সাজের জিনিস নেই।

অন্য আওরতটার বয়স যে কত, তার হিসেব নেই। সত্তর হতে পারে, আশি হতে পারে, এক শ হলেও কারুর কিছু বলার নেই। লিকলিকে ঘাড়, বুড়ো গিধের মতো চেহারা। মাথার চুলগুলো পাটের ফেঁসো হয়ে উঠেছে। সারা গায়ের চামড়া কুঁচকে ফেটে ফেটে গেছে। ঘোলাটে চোখ। দুই মাড়িতে চার পাঁচটার বেশি দাঁত নেই।

অল্পবয়সী আওরতটা ময়লা গামছার খুঁটে মকাইয়ের ছাতু গুলে ছোট ডেলা পাকিয়ে বুড়ির মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, 'খা লে—'

বুড়ি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে মাথা ঝাঁকায়, 'নায় নায়। নায় খায়েগী। ভাত দে। গরম ভাত্তা না থাকলে পানিভাত্তা দে।'

'কোথায় পাব ভাত? ভাতের জায়গায় কি আমরা এসেছি? সেখানে গেলে খাওয়াব। এখন ছাতু খা।'

'নায়। ভাত খাওয়াবি বলে এক মাহিনা ধরে আমাকে হাঁটাচ্ছিস।'

'এক মাহিনা কঁহা, দশগো রোজ। লে, খা—'

অবুঝ বাচ্চার মতো মাথা ঝাঁকাতে থাকে বুড়ি, 'দেড় দো সাল ভাত খাই না। মকাই আর সুথনি খাইয়ে তুই আমাকে খতম করে দিবি।'

ওদের কথা শুনতে শুনতে ঝুলি থেকে বাসি লিট্টি বার করে চিবোতে থাকে ধানোয়ার।

ওদিকে কমবয়সী আওরতটা বুড়িকে বলে, 'দেড় দো সাল কী বলছিস! এই তো বিশ রোজ আগে এক বাড়ি থেকে পানিভাত্তা চোরি করে তোকে খাওয়ালাম।'

বুড়ি দুর্বোধ্য গলায় চেঁচায়, 'ঝটফুস (বাজে কথা)। বিশ রোজ নেহী, দেড় দো সাল।'

'ঠিক আছে, দেড় দো সাল তুই ভাত খাস নি। আভি ছাতুয়া খা লে। সেই ধানের খেতিগুলোতে আগে যাই, কত ভাত খেতে পারিস দেখব।' বুঝিয়ে সুঝিয়ে বুড়ির মুখে মকাইয়ের ডেলা পুরে দেয় আওরতটা।

আর লিট্টি চিবোতে চিবোতে চমকে ওঠে ধানোয়ার। ওরাও তা হলে তারই মতো ভাতের খোঁজে দক্ষিণে ধানের রাজ্যে চলেছে!

কিছুক্ষণ পর লিট্টি খাওয়া হয়ে গেলে এধারে ওধারে তাকায় ধানোয়ার। খিদের ঝোঁকে খেতে শুরু করেছিল সে, জলের কথা ভাবে নি। এখন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। একটু জল না পাওয়া গেলে লিট্টির ডেলাগুলোকে নিচের দিকে নামানো যাচ্ছে না। কিন্তু আশেপাশে না আছে একটা কুয়ো, না একটা 'টিউকল' (টিউবওয়েল)।

আচমকা ডান দিক থেকে কে যেন বলে ওঠে, 'কা, পানি চাই?'

মুখ ফিরিয়ে ধানোয়ার দেখে একটা আধবুড়ো লোক তারই দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটা খুব সম্ভব তার ওপর আগাগোড়া নজর রেখেছে এবং তার যে জলের দরকার বুঝতে পেরেছে। সে আস্তে ঘাড় কাত করে বলে, 'হাঁ—'

লোকটার কাছে একটা বড় লোটায় জল আছে। সে শুধোয়, 'পানি কিসে নেবে?'

ঝুলি হাতড়ে ব্যস্তভাবে নিজের লোটা বার করে ধানোয়ার। লোকটা জল ঢেলে দেয়। এক নিশ্বাসে লোটা ফাঁকা করে ধানোয়ার বলে, 'বঁচ গিয়া। তুমি পানিয়া না দিলে বিলকুল মরে যেতাম।' কৃতজ্ঞ চোখে সে আধবুড়ো লোকটার দিকে তাকায়।

জবাব না দিয়ে লোকটা শুধোয়, 'কোত্থেকে আসছ?'

সোজা উত্তর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় ধানোয়ার, 'উধারসে। তুমি?'

লোকটা পশ্চিম দিগন্তের দিকে আঙুল দেখায়, 'উঁহাসে।' তারপর জিজ্ঞেস করে, 'যাবে কোথায়?'

এবার দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দেয় ধানোয়ার। লোকটার কপাল কুঁচকে যায়। বলে, 'ওদিকে কেন? কোনো কাজে যাচ্ছ?'

ধানোয়ার তার উদ্দেশ্য জানিয়ে দেয়।

লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'হো রামজি, হো বিষুণজি, আমিও ভাতের তালাশেই ওই দিকে যাচ্ছি। পুরো দো মাহিনা ভাত খাই নি।'

ভেতরে ভেতরে কেমন যেন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে ধানোয়ার। পিপর গাছের তলায় অন্য লোকদের দেখিয়ে বলে, 'আর ওরা?'

লোকটা জানায়, বাকি পঞ্চাশ জন পুরুষ আওরত বাচ্চাকাচ্চাও ভাতের খোঁজেই দক্ষিণে চলেছে।

এত লোক ভাগীদার হলে বড়ই দুশ্চিন্তার ব্যাপার। ধানোয়ার বলে, 'এই আদমীরা কি তোমার গাঁওবালা (গাঁয়ের লোক)?'

'নেহী।' লোকটা জানায় সে ঝাড়া হাত-পা একলা মানুষ। বাকি লোকজনেরা কেউ এসেছে পশ্চিম থেকে, কেউ পুব থেকে, কেউ বা ধানোয়ারের মতোই খাড়া উত্তর থেকে। পথে আসতে আসতে ওদের সঙ্গে জানপয়চান হয়েছে।

কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে ধানোয়ার। তারপর বলে, 'তুমি কি জানো, আরো মানুষ ওদিকে ভাতের তালাশে গেছে কিনা?'

'হো সাকতা। যেখানে পেটের দানা মিলবে সেখানে মানুষ তো যাবেই।'

এত মানুষ যদি একই দিকে ধাওয়া করে যায়, তা হলে ভাগে ক'টা ভাতের দানা আর পড়বে? বড় আশা নিয়ে পুরো চার রোজ হেঁটে ধানোয়ার এই দক্ষিণে এসেছে। ভেবেছিল, ধান ওঠার এই মরসুমে বড় বড জমিওলাদের মেজাজ যখন ভাল থাকে, মন দরাজ হয়ে যায়, তখন ক'টা দিন পেট ভরে খাওয়ার ভরসা থাকে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সব আশাই বিলকুল চৌপট। হঠাৎ ভয়ানক হতাশ হয়ে পড়ে সে।

দুই

দেখতে দেখতে মাথার ওপর থেকে সূর্যটা পশ্চিম আকাশের দিকে নামতে শুরু করে। রোদের তাপ এবং জেল্লা কমতে থাকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই আধবুড়ো লোকটা হঠাৎ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আর বসে থাকা যাবে না। অন্ধেরা নামবার আগে ধানের জমিনগুলোতে পৌঁছতে হবে।' ধানোয়ারকে শুধোয়, 'কা, তুমনি যাওগে?'

ধানোয়ার ওদের অনেক পরে পিপর গাছের তলায় এসেছে। এই মুহূর্তে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। সে ঠিক করে ফেলে আরো কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবে। বলে, 'তোমরা এগোও, আমি পরে আসছি।'

আধবুড়ো লোকটার দেখাদেখি অন্য সবাই ঝোলাটোলা বাঁধাছাঁদা করে উঠে পড়ে। মুহূর্তে পিপর গাছগুলোর তলা ফাঁকা হয়ে যায়।

বেশ খানিকক্ষণ পর কাঁধে ঝুলি ফেলে উঠে দাঁড়ায় ধানোয়ার। পাক্কীর দিকে পা বাড়াতে যাবে, কেউ পেছন থেকে আচমকা ডেকে ওঠে, 'এ আদমী—'

চমকে ঘাড় ফেরায় ধানোয়ার। সেই বুড়ি আর অল্পবয়সী আওরতটা। ধানোয়ার ভেবেছিল, সবাই চলে গেছে। কিন্তু মেয়েমানুষ দুটো যে এখনও বসে আছে, সে খেয়াল করেনি। জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবে?'

'হাঁ।' কমবয়সী আওরতটা ঘাড় হেলিয়ে দেয়।

'কা?'

'ওই বুড়হাটার সাথ যখন কথা বলছিলে তখন শুনলাম তুমিও ভাতের তালাশে চলেছ।'

বুড়িকে খাওয়াতে খাওয়াতে আওরতটা তা হলে তার দিকে কান রেখেছিল। ধানোয়ার বলে, 'হাঁ।'

আওরতটা বলে, 'আমরাও যাচ্ছি।'

না বললেও চলত। ধানোয়ার আগেই লোকটার মুখে শুনেছে। সে বলে, 'তোমরা ওদের সাথ

গেলে না?'

'হামনিলোগ ওই আদমীগুলোর সাথ আসিনি।'

'তব্?'

এবার আওরতটা যা বলে তা এইরকম। আগে থেকেই তারা এসে এই পিপর গাছগুলোর তলায় বসে ছিল। পরে নানা দিক থেকে অন্য লোকেরা আসে। ওদের সঙ্গেই দক্ষিণে ধানের দেশে যাওয়া যেত কিন্তু মকাইয়ের ছাতু খাওয়ার পর তার সঙ্গিনী বুড়িটার বুকে বেজায় টান ওঠে। তাই আর যাওয়া হয় নি। এখন অবশ্য টানটা অনেক কমেছে।

এ সব ধানাইপানাই শোনার আগ্রহ আদৌ নেই ধানোয়ারের। 'বকোয়াস' কোনোকালেই সে পছন্দ করে না। কৌতূহলশূন্য গলায় সে বলে, 'আমাকে রুখে দিলে কেন? কোঈ জরুরত হ্যায়?'

'হাঁ—'

আওরতটা এবার কাজের কথা পাড়ে। প্রাচীন গিধের মতো বুড়িটাকে নিয়ে সে বহোত বিপদে পড়েছে। ভাতের সন্ধানে তারা দিনদশেক ধরে সমানে হাঁটছে। কিন্তু বুড়িটা বড়ই দুব্‌লা, রুগ্‌ণ আর 'বিমারী'। একা একা তাকে নিয়ে সামনের এতটা রাস্তা পাড়ি দিয়ে দক্ষিণের ধানখেতে যেতে সাহস হচ্ছে না। ধানোয়ার যখন ওদিকেই যাচ্ছে—যদি তাদের সঙ্গে থাকে, আওরতটা ভরসা পায়।

একটু ভেবে ধানোয়ার জানায়, তার আপত্তি নেই। তৎক্ষণাৎ কাঁধে ঝোলাঝুলি ফেলে বুড়িটাকে নিয়ে মেয়েমানুষটা উঠে দাঁড়ায়। তারপর একসঙ্গে তিনজন পিপর গাছের তলা থেকে রওনা হয়ে যায়।

মাঝখান দিয়ে বাঁধানো সড়ক। দু'পাশে খানিকটা করে জায়গায় পীচ পড়ে নি, সেখানে ঘাস গজিয়ে আছে। লোকজন ওই ঘাসের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। দু'ধারেই পাক্কীর তলায় নয়ানজুলি বর্ষায় ডুবে গিয়েছিল। এখন এই শীতে জল অনেকটা শুকিয়ে কাদা থকথক করছে।

পাকা সড়কের ধারে ঘাসের রাস্তা দিয়ে ধানোয়াররা এগিয়ে চলেছে। মাঝখানে বুড়ি, এক পাশে অল্পবয়সী আওরতটা, আরেক পাশে ধানোয়ার।

বুড়ির জন্য ধানোয়ার আর যুবতী আওরতটা জোরে পা ফেলতে পারছে না। আস্তে আস্তে হাঁটতে হচ্ছে। গা ঘেঁষে ভারি ভারি ট্রাক এবং সাহারসা বা পাটনাগামী দূর পাল্লার বাস ঝড় বইয়ে ছুটে যাচ্ছে।

চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্য এত যুদ্ধ করতে হয়েছে ধানোয়ারকে যে অন্য কোনো দিকে চোখ ফেরাবার সময় পায় নি। জগতের কোনো ব্যাপারেই তার বিশেষ আগ্রহ নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে আশ্চর্য দুঃসাহসিক এক অভিযানে যেতে যেতে দুই অচেনা সঙ্গিনী সম্পর্কে সামান্য কৌতূহল বোধ করতে থাকে সে।

চোখের তারা দুটোকে কোণের দিকে এনে আড়ে আড়ে সঙ্গিনীদের, বিশেষ করে কমবয়সী আওরতটার দিকে তাকায় ধানোয়ার। তাজ্জবকি বাত, আওরতটাও তাকে একই ভাবে লক্ষ করছে। বোঝা যায়, অচেনা পুরুষ সঙ্গীটি সম্পর্কে তার অনন্ত কৌতূহল।

খানিকক্ষণ চলার পর হঠাৎ ধানোয়ার শুধোয়, 'তুমলোগ কঁহাসে আতী হ্যায়?'

আওরতটা বলে, 'গাঁও জনকপুরা—'

'কঁহা?'

'কোশী নদীকা নাম শুনা কভী?'

'জরুর।'

'তার পাড়ে।'

কী চিন্তা করে ধানোয়ার শুধোয়, 'ভাতের তালাশে বেরিয়ে পড়েছ যে? ওদিকে এবার ধান হয় নি—কা?'

আওরতটা মাথা নাড়ে, 'নেহী। এহী সাল উধরি বহোত ভারি বাড় (বন্যা) হুয়া। জমিন উমিন দশ হাত পানির তলায় ডুবে গিয়েছিল। ধান হবে কী করে?'

ধানোয়ার ভাবে, তাদের ওদিকে 'বারিষ' না হওয়ায় ফসল হয় নি, আর আওরতটার গাঁয়ে কুশীর

বান এক দানা ধানও জন্মাতে দেয় নি। মাথা নেড়ে বিষণ্ন মুখে সে বলে, 'খারাপ খবর।'

একটু চুপ।

তারপর ধানোয়ারই ফের শুরু করে, 'দু'জনে বেরিয়ে পড়েছ। তুমনিলোগনকা আউর আদমী কঁহা?' অর্থাৎ আওরতটির সংসারের অন্য লোকজন সম্পর্কে জানতে চাইছে সে।

মেয়েমানুষটা বলে, 'আউর কোই নেহী হামনিলোগনকা।'

'এ বুড়হী তোমার কে লাগে—মাঈ?'

'নায়, সাস (শাশুড়ি)।'

'তুমনিকো মরদ কঁহা?'

আওরতটা জানায়, তিন সাল আগে দশ দিনের জ্বরে তার মরদ মরে গেছে।

এই সময় বুড়িটা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। ভাঙা জড়ানো গলায় কী বলতে থাকে, পরিষ্কার বোঝা যায় না। কিছুক্ষণ কান খাড়া করে থাকার পর যেটুকু ধরা যায় তা হল, বুড়ির অত বড় জোয়ান বলশালী ছেলেটা মরে যাওয়ায় কষ্টের আর শেষ নেই তাদের। সে বেঁচে থাকতে দিনরাত খেটে খুটে কামাই করে এনে খাওয়াত। কিন্তু এখন দু'টুকরো রুটি বা ক'টা ভাতের দানার জন্য তারা সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির মতো বুড়ির একটানা বিলাপ শুনতে শুনতে একটু দুঃখই হয় ধানোয়ারের। অনেকক্ষণ পর বুড়ির ফোঁপানি থামলে কমবয়সী আওরতটার দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'তুমি তা হলে—'

তার কথা বুঝে নিয়ে আওরতটা বাকিটুকু পূরণ করে দেয়, 'রাঁড় (বিধবা)।'

কথায় কথায় সে আরো জানায়, জাতে তারা দোসাদ—জল-অচল অচ্ছুৎ। তাদের জাতে স্বামী মরবার পর কোনো আওরত পুরনো দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি নিয়ে বসে থাকে না, আবার চুমৌনা (সাঙা) করে নতুন সংসার করতে যায়। মরদের মৃত্যুর পর এই আওরতটা একঘরিয়া হয়েই আছে। এমনটা কখনও আগে আর ধানোয়ারের চোখে পড়ে নি।

একঘরিয়া হল—যে মেয়েমানুষ মাত্র একজন পুরুষের ঘর করেছে। ধানোয়ার জানে গঞ্জু কোয়েরি দোসাদ ধোবি মুসহর—এমনি সব জাতের মেয়েদের অনেকেই দোঘরিয়া চারঘরিয়া ছেঘরিয়া সাতঘরিয়া পর্যন্ত হয়। অর্থাৎ স্বামী মরে গেলে বা অন্য কারণে শাদি টুটে গেলে দু'বার চার বার সাত বার পর্যন্ত কেউ কেউ চুমৌনা করে।

ধানোয়ার শুধোয়, 'তুমি বামহন কায়াথ (ব্রাহ্মণ-কায়স্থ) আওরতদের মতো একঘরিয়া হয়ে রইলে যে? নয়া মরদ জুটল না?'

মেয়েমানুষটার অহংকারে একটু ঘা লাগে যেন। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, 'কেত্তে কেত্তে পুরুখ চুমৌনা করে নয়া সমসার পাতবার জন্যে আমার পা ধরে সেধেছে।'

লিকলিকে সরু গলার ওপর মাথাটা আস্তে আস্তে নাড়তে নাড়তে দু'জনের মাঝখান থেকে বুড়িটা আচমকা বলে ওঠে, 'ঠিক বাত।' সে আরো জানায় তার রাঁড় পুতহুকে (বিধবা ছেলের বউ) চুমৌনা করার জন্য 'বহোতসে আদমী' তাকেও ধরেছিল।

ধানোয়ার বুড়ির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার আওরতটার দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, 'তবে চুমৌনা করলে না কেন?'

আওরতটা বলে, 'আমার সাসকে পুছে দেখ না।'

বুড়িকে জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলে ওঠে, 'চুমৌনা হলে বহু (বউ) তো পরের ঘরে চলে যেত, হামনিকো ওর সাথ নয়া সসুরালে নিত না, কভী নায়।'

সত্যিই তো, নয়া মরদ স্ত্রীর সঙ্গে তার আগের পক্ষের শাশুড়িকে কেন নিয়ে যাবে! ধানোয়ার বলে, 'ঠিক বাত।'

'ও চুমৌনা করে চলে গেলে আমার কী হবে? হামনি বুড়হী, কমজোর, বীমারী। কৌন খিলায়গা হামনিকো, কৌন দেখভাল করেগা? ও চলে গেলে মরে যাব। জরুর ভুখা মর যায়েগী।'

যুবতী মেয়েমানুষটা সম্পর্কে এবার রীতিমত শ্রদ্ধাই হয় ধানোয়ারের। মৃত স্বামীর বুড়ি মায়ের জন্য এতটা কেউ করে না। সে বলে, 'অব সমঝ গিয়া—'

আওরতটা বলে, 'এই বুড়হীকে ছেড়ে আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। যদ্দিন ও বেঁচে আছে চুমৌনা করতে পারব না। চুমৌনাকা বাত সোচনা ভি নায় সাকেগী (সাঙার কথা ভাবতেও পারব না)।'

দ্রুত কথা বলতে বলতে ধানোয়ার আর আওরতটা নিজেদের অজান্তে পা চালিয়ে দিয়েছিল। বুড়ি চেঁচিয়ে ওঠে, 'এ লাখপতিয়া, এত্তে জোর হাঁটছিস কেন? আমার গায়ে কি জওয়ান বয়েসের তাকত আছে? আমি কি তোদের সাথ দৌড়ে পারি? ধীরেসে চল—'

ধানোয়াররা হাঁটার গতি কমিয়ে দেয়। মেয়েমানুষটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'লাখপতিয়া কৌন? তুমনি?'

মেয়েমানুষটা ঘাড় কাত করে বলে, 'হাঁ।'

'বহোত বড়িয়া নাম।' ধানোয়ার বেশ তারিফের গলায় বলে।

মেয়েমানুষটা জানায়, এটা তার বাপের দেওয়া নাম। তারপর মজা করে হাসে। বলে, 'পেটে দানা নেই, তবু আমি লাখপতিয়া! এক সাথ দশগো রুপাইয়া কভী নেহী দেখা, তভ্‌ভি (তবুও) হামনি লাখপতিয়া।'

ধানোয়ারও হাসতে থাকে।

লাখপতিয়া এবার বলে, 'আমাদের কথা তো সবই জেনে নিলে। লেকেন তুমনিকো বাত কুছ নেহী শুনা—'

'হামনিকো কা বাত! দুনিয়ায় হামনি বিলকুল একেলা—' নিজের যাবতীয় তথ্য দিয়ে যায় ধানোয়ার।

পাকা সড়কটা বরাবর সোজা যেতে যেতে একটা বাঁক ঘুরে কোনাকুনি পুব-দক্ষিণে চলে গেছে। ওটা অগ্নিকোণ।

বাঁক পেরুতে পেরুতে শীতের বেলা জুড়িয়ে আসতে থাকে। সূর্য পশ্চিম আকাশের ঢালের দিকে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের রং বাসি হলদির মতো। উলটোপালটা বাতাসে আরো হিম মিশে যাচ্ছে। অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিযে মাঠের ওপর নেমেছে সে জায়গাটা ঝাপসা। ওখানে কুয়াশা জমতে শুরু করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে বুড়ি বলে, 'বহোত জাড় (ঠাণ্ডা)। এ বহু, আমার গায়ে কিছু জড়িয়ে দে না—'

লাখপতিয়া তার ঝোলা খুলে একটা তালিমারা ময়লা ভারি কাঁথা বার করে সযত্নে বুড়ির সারা শরীর ঢেকে দেয়। তারপর সবাই আবার হাঁটতে শুরু করে।

এখনও ধানখেতের দেখা নেই। তবে পাক্কীর দু'ধারে প্রচুর গাছপালা ঝোপঝাড় চোখে পড়ছে। এত সবুজ কতকাল দেখে নি ধানোয়ার। সে যেখান থেকে আসছে সেখানে এবার প্রচণ্ড খরায় ধান তো ফলেই নি, গাছ লতাপাতা আগাছা—সব জ্বলে 'কোশের পর কোশ' হলদে হয়ে গেছে। এখানে মাঠ ভরা সবুজ সতেজ ঘাসবন এবং গাছটাছের দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে যায় ধানোয়ারের।

বুড়ি বলে ওঠে, 'আউর কেত্তে দূর?'

লাখপতিয়া বলে, 'থোড়া।'

'ঝুট।'

'সচ।'

'থোড়া থোড়া করে দশ রোজ হাঁটাচ্ছিস। আউর নেহী সাকেগী। কোমরিয়ার হাড্ডি চুর চুর হয়ে গেল।' বুড়ি প্রায় কাঁদতে শুরু করে।

শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে একই সঙ্গে মায়া আর কষ্ট হতে থাকে লাখপতিয়ার। বলে, 'সচমুচ বলছি, অন্ধেরা নামবার আগেই আমরা পৌঁছে যাব।' ধানোয়ারকে শুধোয়, 'কা, ঠিক বোলা?'

ধানোয়ার এ অঞ্চলে বেশ কয়েক বার এসেছে। সে ঘাড় কাত করে বলে, 'হাঁ—'

লাখপতিয়া বুড়িকে বলে, 'তোকে জোরে হাঁটতে হবে না, আস্তে আস্তে চল—' বলে শাশুড়ির

কোমর সাপটে ধরে তার শরীরের অনেকটা ভার নিজের ওপর নেয়। মা-পাখি যেভাবে তার বাচ্চাকে আগলে আগলে রাখে, অবিকল সেইভাবে বুড়িকে নিয়ে এগিয়ে চলে সে।

সূর্য আরো খানিকটা নেমে পশ্চিম আকাশের নিচের দিকে একটা বিরাট সোনার কটোরা হয়ে যায়। রোদ নিভু নিভু হয়ে আসতে থাকে। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে শীতের হাওয়া শনশন ছুটে যায়।

এক ফাঁকে ধানোয়ার আর লাখপতিয়া ধুসো পোকায়-কাটা কম্বল বার করে গায়ে জড়ায়। এই শেষ বেলাতেই টের পাওয়া যাচ্ছে, রাতে শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়বে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ শুনে মুখ তুলে তাকায় ধানোয়ার। তক্ষুনি খুশিতে আর উত্তেজনায় তার চোখমুখ চকচকিয়ে ওঠে। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক পরদেশি শুগা (টিয়া পাখি) আকাশ পাড়ি দিয়ে দক্ষিণে চলেছে।

ধানোয়ার প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, 'হামনিলোগন আ গিয়া। ধানের জমিন আর বেশি দূরে নেই। হো রামজি, তেরে কিরপা—'

লাখপতিয়া আর তার সাস প্রবল আগ্রহে একই সঙ্গে শুধোয়, 'ক্যায়সে সমঝা?'

'ওই দেখ—' আকাশের দিকে আঙুল বাড়ায় ধানোয়ার।

চোখ তুলে দুই আওরত সরু আর মোটা গলায় বলে, 'পরদেশি শুগা—'

মা-বাপ মরবার পর খাদ্যের খোঁজে এক নাছোড়বান্দা আবিষ্কারকের মতো অবিরাম ছুটে বেড়াচ্ছে ধানোয়ার। গাছপালা লতাপাতা ঝোপঝাড় মাটি পাখি পোকামাকড় ইত্যাদি সম্বন্ধে তার বিপুল জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা। মাটির রং দেখে দশ 'মিল' (মাইল) তফাত থেকে সে বলে দিতে পারে ওখানে কী ফলে আছে। সারিবদ্ধ পিঁপড়ের চলাচল দেখে টের পায় কোথায় রয়েছে বাগনরের (পাকা কাঁচকলা) বন বা মাটির তলায় মিঠা কোনো কন্দ। পোকামাকড় মৌমাছিরা তাকে নানারকম ফলপাকড় বা শস্যের সন্ধান দেয়। চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে খাদ্য ছাড়া অন্য কোনো দিকে তাকায় নি ধানোয়ার, অন্য কিছু ভাবার সময় পায়নি। বহু বার পাখি আর পতঙ্গের পেছন পেছন ছুটে সে ফলমূল কি ফসলের জায়গায় পৌঁছে গেছে।

ধানোয়ার বলে, 'ওই শুগা চলেছে ধানের খেতির দিকে।'

'হাঁ?' লাখপতিয়া অবাক হয়ে বলে।

'হাঁ। কেত্তে শুগা দেখেছ?'

'বহোত।'

'এত্তে শুগা যখন চলেছে তখন মালুম হচ্ছে বহোত ধান ফলেছে ওখানে।'

বুড়ি আচমকা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'এবার সচমুচ তা হলে ভাত খেতে পাব?'

লাখপতিয়া বলে, 'জরুর।'

'বহোত ধান যখন হয়েছে তখন বহোত ভাত খেতে পাব—নায়?'

'হাঁ-হাঁ—'

'তুরন্ত পা চালা—' বুড়ির সারা শরীরে বিজলি চমকের মতো কিছু খেলে যায়। সে প্রায় দৌড়তেই শুরু করে।

বিড়বিড় করে আপন মনে ধানোয়ার বলে, 'হো রামজি, হো বিষুণজি, তেরে কিরপা।'

তিন

সন্ধের কিছু আগে সূর্য যখন দিগন্তের তলায় আধাআধি ডুবে গেছে, চারদিক কুয়াশায় আরো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, সেই সময় একটা পুরুষ আর দুটো মেয়েমানুষ দক্ষিণে ধানের খেতগুলোতে পৌঁছে যায়।

সামনের দিকে এবং ডাইনে-বাঁয়ে—যেদিকে যত দূর তাকানো যাক, শুধু ধান আর ধান। পেছন দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে, কমসে কম এক 'মিল' তো হবেই, পড়তি নিচু জমি। সেখানে ঝোপঝাড়

এবং আগাছার জঙ্গল। তারপর একটা মজা বিল চোখে পড়ে। বিলের ওপারে দিগন্ত জুড়ে বনভূমি।

দিনের শেষ রোদ এসে পড়েছে খেতগুলোর ওপর। অঢেল সোনালি শস্যে গোটা চরাচর যেন ঝলমল করতে থাকে।

পড়তি জমির ঝোপঝাড় থেকে বুনো জুঁই আর আসান গাছের গন্ধ ভেসে আসছে। কিন্তু সে সব গন্ধ ছাপিয়ে নাকে আসছে পাকা ধানের প্রাণমাতানো সুগন্ধ।

কত কাল পরে মাঠ-ভরা এত ধান দেখল ধানোয়ার! গেল বছর এই মরসুমে সে ছিল আরা জেলায়, তার আগের সাল ছাপরায়, তার আগের সাল পালামৌতে, কিন্তু এত অজস্র ধান চোখে পড়ে নি। চারপাশে কোটি কোটি সোনার দানা দেখতে দেখতে সেই আশাটা বুকের ভেতর আবার সতেজ হয়ে ওঠে। উত্তর থেকে চার দিন একটানা হেঁটে আসা ব্যর্থ হয় নি। জরুর পেট ভরে ভাত খেতে পাবে সে। হো রামজি, হো বিষুণজি, অব তেরে কিরপা।

এদিকে সেই বুড়িটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঝড়ের বেগে ছুটে আসার কারণে হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতেই প্রবল উত্তেজনায় সরু গলায় সে চেঁচাতে থাকে, 'কেত্তে ধান, কেত্তে ধান! এ বহু, ভাত খায়েগী—গরম ভাত্তা। দেড় দো সাল তুই আমাকে ভাত খেতে দিস নি।'

লাখপতিয়া শাশুড়িকে ভরসা দেয়, 'খাবি খাবি, ধানের মুলুকে এসে গেছি, সাধ মিটিয়ে ভাত খাস। থোড়া সবুর কর।' বলে ধানোয়ারকে ডাকে, 'এ আদমী—'

ধানোয়ার মুখ ফেরায়, বলে, 'কা?'

'এবার তুমি কী করবে?'

তক্ষুনি উত্তর দেয় না ধানোয়ার। ঘাড় তুলে এধারে ওধারে তাকাতে থাকে। তার চোখে পড়ে, 'পাক্কী' থেকে ডাইনে এবং বাঁয়ে কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে গেছে। ডান দিকে মেটে রাস্তাটা যেখানে একটা নহরের কাছে গিয়ে থেমেছে ঠিক তার কাছাকাছি অনেকগুলো সিমার আর কড়াইয়া গাছ গা-জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। গাছগুলোর তলায় বিশ পঁচিশটা লোক।

ধানোয়ার বলে, 'এখন পেঁড়গুলোর তলায় গিয়ে তো বসি, জিরোই। উসকা বাদ সোচেগা কা করে—'

'হামনিলোগ তুমনিকো সাথ যায়েগী?'

'আও—'

পাকা সড়ক থেকে তিনজন কাঁচা রাস্তায় নামে।

সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় আসতেই ধানোয়ার দেখতে পায় সবই প্রায় চেনা মুখ। দুপুরবেলা পাক্কীর ধারের পিপর গাছগুলোর তলায় এদেরই দেখেছিল সে। সেই আধ-নাঙ্গা ভুখা হাভাতের দল। তাদের মধ্যে আধবুড়ো লোকটাও রয়েছে। গলায় লিট্টির ডেলা আটকে গেলে সে পানি দিয়ে তাকে বাঁচিয়েছিল।

আধবুড়ো লোকটা ধানোয়ারদের দেখে বলে, 'আ গিয়া? আও আও—'

ঝোলা টোলা নামিয়ে তার পাশে বসে পড়ে ধানোয়ার। লাখপতিয়া এবং তার শাশুড়িও কাছাকাছি বসে পড়েছে। বুড়ি হাঁ করে একটানা হাঁপিয়ে চলে। নির্জলা ফাঁকা হুঁকো টানার মতো তার গলার ভেতর থেকে শ্বাসপ্রশ্বাসের সাঁই সাঁই আওয়াজ বেরুতে থাকে। ধানের গন্ধে গন্ধে শেষ দিকটায় দৌড়ে আসার জন্য ক্লান্তিতে এবং কষ্টে তার বুক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে।

ধানোয়ার শুধোয়, 'তোমরা কখন এখানে পৌঁছলে?'

লোকটা আঙুল বাড়িয়ে পশ্চিম আকাশের একটা জায়গা দেখিয়ে বলে, 'সূরযদেও যখন ওখানে ছিল তখন এসেছি।'

সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় নানা বয়সের বাকি লোকগুলোকে ভাল করে দেখতে দেখতে ধানোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'তখন তো বহোত আদমী দেখেছিলাম—পঁচাশ ষাটগো। বাকি সবাই গেল কোথায়?'

লোকটা জানায়, সবাই এক জায়গায় থাকলে হবে কী করে? যদি কিছু মেলে ভাগাভাগি নিয়ে

রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যাবে। কাজেই তারা দু'ভাগ হয়ে এক দল এখানে চলে এসেছে। আরেক দল গেছে পাক্কীর ওধারের ধানখেতগুলোর দিকে।

একটু চুপ করে থেকে ধানোয়ার শুধোয়, 'কিরকম বুঝছ?'

সে কী জানতে চায়, লোকটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে। বলে, 'ধানটান মিলবে কিনা—এই তো?'

'হাঁ—' ধানোয়ার ঘাড় কাত করে।

লোকটা বলে, 'সবে তো এলাম। এত্তে কষ্ট করে, দশ পন্দর রোজ হেঁটে যখন এসেছি, ভাত না খেয়ে লৌটব নাকি ? কভী নায়—'

'কী করে ধান-উন মিলবে, কুছ সোচা?'

'নায়। সোচনা পড়ে (ভাবতে হবে)। এখন কিছু করা যাবে না। ওই দেখ—' বলে লোকটা সামনের জমিগুলোর দিকে আঙুল বাড়ায়।

আগেই ধানোয়ারের চোখে পড়েছিল, বেশির ভাগ জমিতেই ধানকাটা চলছে। প্রতিটি খেতের গা ঘেঁষে গৈয়া কি ভৈসা গাড়ি কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আদিবাসী মুণ্ডা, ওরাওঁ আর মুসহররা ধান কেটে কেটে এনে গাড়িগুলো বোঝাই করছে। সব ধানজমিতেই ঘিউ-মালাই খাওয়া বিরাট চেহারার পহেলবানেরা ঘোরাঘুরি করছে। তাদের হাতে লোহা বা পেতলের গুল বসানো লম্বা লম্বা বাঁশের লাঠি। প্রতিটি জমিরই চার কোণে উঁচু উঁচু খুঁটির মাথায় মাচা বানিয়ে রাতে ফসল পাহারা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। মাচাগুলোর মাথায় চাল আছে কিন্তু বেড়া নেই। চারপাশে ফাঁকা।

ধানোয়ার জানে, ফসলের মরসুমে ফি বছর জমি মালিকেরা আদিবাসী কিষাণ আর মুসহরদের কাজে লাগিয়ে দেয়। মাসখানেক বা মাস দেড়েকের ফুরনের কাজ। ধান উঠে গেলেই তাদের কাজ খতম।

জাতে গঞ্জু হলেও মুসহর বা আদিবাসী খেতমজুরদের সঙ্গে আগে দু'চার বছর চাষের সময় ফুরনের কাজ নিয়ে বড় বড় মালিকদের জমিতে লাঙল দিয়েছে, বীজ রুয়েছে, শীতে ফসল কেটে তাদের খলিহানে (যেখানে শস্য রাখা হয়) তুলে দিয়েছে ধানোয়ার। কিন্তু আজকাল পুরো রোজ কাজ করার শক্তি নেই তার। চেয়েচিন্তে, ভিখ মেঙে বা অন্য দশ রকম ফিকির করে এই সময়টা সে কিছু ধান যোগাড় করে। কিন্তু দক্ষিণের এই খেতগুলোতে যেভাবে পাহারা দেওয়া হচ্ছে তাতে লুকিয়ে চুরিয়ে দু মুঠো ধান নিয়ে আসবে, তার ভরসা খুবই কম। মাঠে নামলে পহেলবানেরা নির্ঘাত লাঠির ঘায়ে মাথা ছেঁচে দেবে।

আধবুড়ো লোকটা তার মতোই হয়ত ভাবছিল। ধানোয়ারের মনের কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ধান আনা যাবে না।'

'তব্?'

'ধানকাটানিদের কাজ যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে কিছু করার নেই।'

'তুমি বলছ ধান কেটে নেবার পর ঝড়তি পড়তি যা পড়ে থাকবে তাই কুড়োতে হবে?'

এ অঞ্চলে, এ অঞ্চলে কেন, গোটা বিহার জুড়ে ফসল উঠবার পর মাঠে যা পড়ে থাকে তা কুড়িয়ে নিলে জমি মালিকরা বা তাদের পাহারাদারেরা কিছু বলে না। আবহমান কাল এখানে এ এক চালু নিয়ম।

দু-এক সাল মাঠকুড়ানিদের সঙ্গে ভিড়ে ধানোয়ার মাটি থেকে ধানের দানা কুড়িয়েছে। খোসা ছাড়িয়ে যে চাল পাওয়া গেছে তাতে একটা করে মাস ভরপেট দু-বেলা ভাত খেতে পেয়েছে। এবারও যদি ধান কুড়োতে হয় তার আপত্তি নেই। যদ্দিন না মাঠ থেকে ধান কেটে নেওয়া হচ্ছে সে অপেক্ষা করবে। মোট কথা, ভাত খেতে পেলেই হল। হো রামজি, হো বিষুণজি, কত কাল সে ভাত খায় নি!

আধবুড়ো লোকটা কী বলতে যাচ্ছিল, বলা হয় না। তার আগেই দেখা যায়, নিচের ধানখেত থেকে তিন চারজন পহেলবান কাচ্চীতে উঠে সোজা ধানোয়ারদের কাছে এসে দাঁড়ায়। তাদের একজন ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা, চুলে কদম ছাঁট, চাঁদির পেছন দিকে সরু টিকি, নাকের তলায় মোটা গোঁফ, এক কানে

মেয়েমানুষদের মতো পেতলের মাকড়ি, প্রকাণ্ড মাংসল মুখে ছোট ছোট হিংস্র চোখ, পায়ে কাঁচা চামড়ার পাক্কা তিন সের ওজনের ঢাউস নাগরা, পরনে ধুতি এবং লাল জামার ওপর মোটা কম্বল—মাটিতে লাঠি ঠুকে বলে, 'কা রে ভূচ্চরের দল, আয়া কঁহাসে?'

কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলায় চব্বিশ পঁচিশটা মানুষের বুকে ভয়ে কাঁপুনি ধরে যায়। কে কোত্থেকে আসছে, জানিয়ে তারা ভীতু নিরীহ পশুর মতো পহেলবানদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'ধান পেকেছে, খবর পেয়েই গিদ্ধড়ের পাল দৌড়ে এসেছিস?'

কেউ উত্তর দেয় না।

অন্য একটা পহেলবান এবার ভারি গলায় গর্জে ওঠে, 'ধান্দাটা কী তোদের—এ হারামজাদকি ছৌয়ারা?'

ভিড়ের ভেতর থেকে কাঁপা গলায় কে বলে ওঠে, 'কোঈ বুরা ধান্দা নেহী পহেলবানজি।'

'ধান চোরির মতলব নেই তো?'

ধানোয়ারের পাশ থেকে আধবুড়ো লোকটা বলে, 'রাম রাম। নেহী পহেলবানজি, চুরানেকা কোঈ ধান্দা নেহী।'

চার পহেলবান এক সঙ্গে সতেজে লাঠি ঠোকে, 'বহোত হোঁশিয়ার। ধান কাটাই খতম হবার আগে জমিনে নামলে খুন করে মাটিতে লাশ পুঁতে ফেলব। সমঝা?'

এমন একটা কাণ্ড যে পহেলবানগুলোর পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়, বুঝতে অসুবিধা হয় না কারুর। হাভাতের দল একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে, 'সমঝ গিয়া—'

পহেলবানেরা যখন খেতের দিকে পা বাড়াতে যাবে, আধবুড়ো লোকটা হঠাৎ বলে, 'একগো বাত—'

একটা পহেলবান কর্কশ গলায় বলে, 'কা রে?'

'আপলোগনকা জমিনে আর ধান কাটানি লাগবে?'

'ধান কাটতে পারিস?'

'জি।'

'মনে হচ্ছে, লাগবে না। মুসহর আর ওরাওঁ মুণ্ডাদের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তব্—'

'কা?'

এবার খানিকটা মহানুভবতাই যেন দেখায় পহেলবানটা। বলে, 'আউর দশগো রোজ আগে এলে ধান কাটাইয়ের কামটা হয়ত পেয়ে যেতিস। কাল সুবে মালিক বড়ে সরকার আয়েগা। তার সাথ বাতচিত করে দ্যাখ। বড়ে সরকারকা কিরপা হো যায় তো কাম মিলেগা—'

'হাঁ—' আধবুড়ো লোকটা মাথা নেড়ে বলে, 'রামজি বিষুণজি ভরোসা—'

পহেলবান তার সঙ্গে আরেকটু জুড়ে দিয়ে বলে, 'রামজি বিষুণজি আউর বড়ে সরকার ভরোসা—'

আধবুড়ো লোকটা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'হাঁ হাঁ, জরুর।'

ধান চুরির ব্যাপারে আরো একবার হুঁশিয়ার করে দিয়ে পহেলবানেরা কাচ্চী থেকে আবার ধানখেতে নেমে যায়।

এদিকে পহেলবানদের সঙ্গে আধবুড়ো লোকটার কথাবার্তা শুনে লাখপতিয়ার বুড়ি শাশুড়িব মনে কেমন একটা সংশয় দেখা দিয়েছে। আচমকা মড়াকান্না জুড়ে দেয় সে; তার হাঁ-করা মুখের ভেতর থেকে বিলাপের মতো একটানা আওয়াজ বেরুতে থাকে।

সবাই চমকে ওঠে। লাখপতিয়া শাশুড়িকে শুধোয়, 'কা রে, হুয়া কা? রোতী (কাঁদছিস) কায়?'

কান্না থামে না বুড়ির, বরং ক্রমশ আরো প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। লাখপতিয়া তার মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে নরম গলায় বলে, 'চুপ হো যা। কী হয়েছে বলবি তো?'

কান্না-মেশানো জড়ানো গলায় বুড়ি এবার বলতে থাকে, 'পহেলবানেরা হোঁশিয়ার করে দিল, জমিনে নামলে খতম করে দেবে। জমিনে না গেলে ধান ক্যায়সে মিলি! ধান না মিললে ভাত খাব কী করে? ভাতের ভরোসা বিলকুল চৌপট।' কান্নাটা আচমকা কয়েক পর্দা চড়িয়ে দেয় সে। 'হো ভগোয়ান,

দেড় দো সাল আমি ভাত খাই নি।'

বুড়িকে কাঁদতে দেখে আশেপাশের কয়েকটা বাচ্চাও কান্না জুড়ে দেয়। বুড়ির দেখাদেখি তাদেরও সন্দেহ হয়েছে—হয়ত ভাত খেতে পাবে না। অথচ মা-বাপের সঙ্গে কেউ সাত রোজ, কেউ দশ রোজ হেঁটে এত দূরে চলে এসেছে।

লাখপতিয়া বুড়ি শাশুড়িকে বোঝায়, যেভাবেই হোক তাকে ভাত খাওয়াবে, জরুর খাওয়াবে। বাচ্চাগুলোকেও তাদের মা-বাপেরা একই সুরে আশ্বাস দেয়। তবু কেউ থামে না। বাতাসে অনেকক্ষণ কান্নার পাঁচমিশালী শব্দ ভেসে বেড়ায়।

চার

একসময় পশ্চিম আকাশের তলায় সূর্য ডুবে যায়। দ্রুত সন্ধ্যা নামতে থাকে।

সেই বিকেল থেকে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। প্রথমে ছিল পাতলা, মিহি—এখন ক্রমশ গাঢ় হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মিশছে অন্ধকার। কুয়াশায় আদিগন্ত ধানের খেত, দূরে দূরে ছোট ছোট দেহাত আর মাথার ওপর অফুরন্ত আকাশ—সব একাকার হয়ে যেতে থাকে।

এদিকে আজকের মতো ধানকাটা শেষ হয়েছে। ফসল বোঝাই করে একের পর এক গৈয়া আর ভৈসা গাড়ি ধানখেত থেকে উঠে এসে কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর পাশ দিয়ে সার বেঁধে পাক্কীর দিকে হেলে দুলে এগিয়ে যায়। গাড়ির চাকা থেকে অনবরত ক্যাঁচ কোঁচ ধাতব আওয়াজ উঠতে থাকে।

এখন বোধহয় পূর্ণিমা। বোঝা যায়, অনেক উঁচুতে আকাশে চাঁদির থালার মতো গোলাকার পুনমের চাঁদ উঠেছে। তবে স্পষ্ট নয়। কুয়াশা এবং হিম চুঁইয়ে যে ঘোলাটে জ্যোৎস্না নেমে এসেছে তাতে চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

ঝাপসা অন্ধকারে ধানের খেতে যতদূর চোখ যায় অগুনতি আলো। রাত্তিরে নজর রাখার জন্য উঁচু উঁচু খুঁটির মাথায় যে মাচাগুলো খাড়া হয়ে আছে সেখানে হ্যাজাক জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মাচায় রয়েছে দু'জন করে পাহারাদার। এক দানা ধানও যাতে খোয়া না যায় তার জন্য যাবতীয় পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছে জমি মালিকেরা।

কাছাকাছি খেতের আলো দেখে তবু হ্যাজাক বলে চেনা যায় কিন্তু দূরেরগুলো অস্পষ্ট। ছোট ছোট আলোর বিন্দু দেখে মনে হয় গোটা চরাচর জুড়ে হাজার হাজার জোনাকি স্থির হয়ে আছে।

দেখতে দেখতে এই সন্ধ্যাবেলাতেই খোলা মাঠ জুড়ে নিশুতি নামতে থাকে। কড়াইয়া গাছের ডালে মাঝে মাঝে রাতজাগা কামার পাখির কর্কশ চিৎকার ছাড়া মাইলের পর মাইল জুড়ে কোথাও কোনো শব্দ নেই। তবে হঠাৎ হঠাৎ মাটির তলায় কোনো অদৃশ্য স্তর থেকে ঝিঁঝিদের বিলাপ উঠে আসছে। আর আলোর ছুঁচের মতো কুয়াশা এবং অন্ধকার ফুঁড়ে ফুঁড়ে হাজার হাজার জোনাকি উড়ছে চারদিকে। নির্জন স্তব্ধ এই প্রান্তরে বিশ পঁচিশটা ভুখা নাঙ্গা হাভাতে মানুষ আর ক'টা পাহারাদার ছাড়া মনুষ্যজাতির আর কোনো প্রতিনিধি নেই।

বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তুরে হাওয়াটা আরো কনকনে হয়ে উঠেছিল। এখন মনে হচ্ছে বরফের সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠে আসছে। ঠাণ্ডায় হিমে পঁচিশটা মানুষের রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে যেন। মায়েরা তাদের বাচ্চাগুলোকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিজেদের শরীর থেকে একটু 'ওম' দিতে চেষ্টা করছে।

ভিড়ের ভেতর থেকে কে এক আওরত বলে ওঠে, 'বহোত জাড়। 'আগ'-এর (আগুনের) ব্যওস্থা না হলে হামনিলোগন নেহী বঁচেগা। ছৌয়াগুলোও শেষ হয়ে যাবে।'

আরেকটা মেয়েমানুষ বলে, 'ঘুর' (আগুনের কুণ্ড। এখানে শীতের রাতে গরিব মানুষেরা হাত-পা সেঁকে) বানাও।'

এটা আগেই বানানো উচিত ছিল। আসলে পাঁচ সাত কি দশ বিশ দিন ধরে ক্রমাগত হেঁটে আসার ধকলে সবাই বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া অঢেল ধান দেখে এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল

যে 'ঘুর'-এর চিন্তাটা মাথায় আসে নি। অথচ এই মারাত্মক শীতের রাতে বিহারের খোলা মাঠে থাকতে হলে 'ঘুর' ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না।

সেই আধবুড়ো লোকটা ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'জরুর বানাতে হবে।' সে অন্য পুরুষগুলোকে ডাকে, 'চল চল—'

পুরুষগুলো বলে, 'কঁহা?'

'শুখা লকড়ির তালাশে। 'ঘুর' বানাতে লাগবে না?'

কারো ওঠার বিশেষ গরজ দেখা যায় না। একজন বলে, 'এখানকার কিছুই আমরা জানি না। অন্ধেরাতে কোথায় লকড়ি পাব? একটা রাত থোড়েসে কষ্টউষ্ট করে গুজরনে দো। কাল সুবে ব্যওস্থা করা যাবে।'

আধবুড়ো লোকটা ধমকে ওঠে, 'নিকম্মার দল। তোমরা না হয় রাতটা কাটিয়ে দেবে। লেকেন ছোট বাচ্চাগুলোর কী হবে? ওঠ, উঠে পড়—'

সবার আগে ধানোয়ারই ওঠে, বলে, 'আর কেউ না যাক, আমি যাব। চল—'

যাদের সংসার, বউ বা বাচ্চা নেই তারা যাচ্ছে। অথচ অন্য সবাই হাঁটুতে থুতনি গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকবে, এটা খুবই খারাপ দেখায়। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরো কয়েকজন উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'চল তবে—'

সিমার এবং কড়াইয়া গাছগুলোর পুব দিকে পাক্কী। পশ্চিমে খানিকটা গেলে যে নহরটা, তার ওপর নড়বড়ে বাঁশের পুল। পুল পেরিয়ে ওরা ওপারে চলে যায়। চাঁদের ঝাপসা আলোয় ডান দিকের পড়তি জমিতে ছোটখাট একটা জঙ্গল চোখে পড়ে। সেখান থেকে সিসম আর আসান গাছের শুকনো ডালপালা ভেঙে ফিরে এসে আগুন জ্বালায় ধানোয়াররা।

একটু পর দেখা যায় 'ঘুর'-এর চারপাশে গোল হয়ে বসে চব্বিশ পঁচিশটা মানুষ আগুন পোহাচ্ছে। তবু বিহারের এই দুর্জয় শীত যেন কাটতে চায় না। মনে হয় শরীরে রক্ত চলাচল থেমে থেমে যাচ্ছে।

এখন কত রাত কে জানে। তবে সবাই টের পায়, খিদেয় পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। রাতের খাওয়া এখনই চুকিয়ে নেওয়া দরকার। গামছার খুঁট বা ঝুলি খুলে কেউ বাসি রোটি, লিট্টি, আধপোড়া মকাই বা চার পাঁচ রোজ আগের সেদ্ধ করা ঘাটো বার করে। সেই সঙ্গে নিমক, শুকিয়ে দড়ি-পাকানো হরা মিরচি, ইত্যাদি ইত্যাদি। পুরুষেরা ওধারের নহর থেকে খাওয়ার জন্য লোটা ভরে জল নিয়ে আসে।

ধানোয়ার লাখপতিয়াদের কাছে বসে ছিল। সে একটা আধপোড়া মকাইতে লবণ আর মরিচ ঘষে চিবোচ্ছে। তার এক পাশে রয়েছে সেই আধবুড়ো লোকটা। সে খাচ্ছে বাজরার রুটি। দুপুরের মতো এবারও ছাতু গুলে নিয়েছে লাখপতিয়া। অবুঝ বুড়ি শাশুড়ি কিছুতেই খাবে না। দুপুরবেলার মতো বুঝিয়ে সুঝিয়ে খাওয়াতে থাকে সে।

খেতে খেতে সবার সঙ্গে ভাল করে জান-পয়চান হয় ধানোয়ারের। আধবুড়ো লোকটার নাম রামনৌসেরা—জাতে তাতমা। ওপাশের কালো লম্বা হাড্ডিসার চেহারার লোকটা হল সখিলাল। সে এসেছে তার বউ সাগিয়া এবং দুটো বাচ্চাকে নিয়ে। মুখে চেচকের (বসন্তের) কালো কালো দাগ যে লোকটার তার নাম ফির্তুরাম। সেও বউ বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে এসেছে। যার মুখের অর্ধেকটা পুড়ে মাংস ঝামার মতো হয়ে আছে সে হল টহলরাম। তার সঙ্গে রয়েছে তার বুড়ি মা। এ ছাড়া রয়েছে সোমবারী, রাতুয়া, মুঙ্গেরিলাল, বিরিজ এবং আরো কয়েকজন।

খেতে খেতে এবং সবার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ক্ষীণ দুর্বল গলায় কারা যেন কেঁদে ওঠে, 'বহোত ভুখ মাঈ—বহোত ভুখ। ভাত দে, রোটি দে। এ মাঈ—'

চমকে ধানোয়ার এবং অন্য সবাই বাঁ দিকে তাকায়। 'ঘুর'-এর এক কোণে একটা মেয়েমানুষ দুটো বাচ্চাকে জড়িয়ে বসে আছে। সবাই কিছু না কিছু খাচ্ছে, কিন্তু ওদেরই খাবার মতো কিছু নেই।

মেয়েমানুষটার বয়স বেশি না, বড় জোর বিশ বাইশ। পরনে ছেঁড়াখোঁড়া পিঁজে-যাওয়া বহুকালের

পুরনো একটা কাপড়। তার ওপর ময়লা কাঁথা জড়িয়ে দিয়েছে। দেখেই টের পাওয়া যায়, অনেক দিনের না-খাওয়া ক্ষুধার্ত চেহারা। চোখের কোলে কালি, চুলে কতকাল যে কাকাই পড়ে নি! রোগা সরু গাঁটপাকানো আঙুল। কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ফুঁড়ে বেরিয়েছে।

চাপা গলায় আওরতটা বাচ্চাদুটোকে বলছে, 'শো যা, শো যা। রাত কাটুক। সুবে তোদের গরম ভাত দেব।'

'ঝুট—'

'নায় নায়। কাল সুবে জরুর খেতে দেব।'

ছেলে দুটো বুঝ মানে না। খিদের কষ্টে সমানে কাঁদতে থাকে, 'কাল না, আজ। আভি—'

তাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ভোলাতে চেষ্টা করে মেয়েমানুষটা। বলে, 'কাঁদে না, কাঁদে না।'

কান্না থামে না, বরং আরো প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। আর মেয়েমানুষটা ধৈর্য হারিয়ে হঠাৎ ছেলেদুটোকে বেদম মারতে শুরু করে। চেঁচিয়ে বলে, 'আমাকে খা। খা লে হামনিকো—' তার চিৎকার এবং বাচ্চাদুটোর কান্নার শব্দ এই নিস্তব্ধ শীতের রাতে কনকনে উত্তুরে হাওয়া চিরে চিরে ফাঁকা মাঠের চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ওদের দেখতে দেখতে ধানোয়ারের গলায় মকাইয়ের দানা আটকে আসে। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রামনৌসেরা ধমকে ওঠে, 'এ আওরত, মারো মাত, মাত মারো—'

এবার বাকি সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে, 'মেরো না, মেরো না। মর যায়েগা—'

'মরুক মরুক। এ দোনো মরনেসে হামনি বঁচ যায়েগী—' বলতে বলতে কেঁদে ফেলে মেয়েমানুষটা। তারপর জড়ানো জড়ানো আধবোজা গলায় যা বলে তা মোটামুটি এইরকম। কী করবে সে? আজ দো রোজ কোনো জায়গা থেকেই একদানা খাদ্য যোগাড় করতে পারে নি। ফলে তারা বিলকুল না খেয়ে আছে। খাওয়ার জন্য দিবারাত্রি অনবরত ঘ্যান ঘ্যান করে চলেছে বাচ্চাদুটো। একে নিজের পেটে ভুখ, তার ওপর ছেলেদুটোর এই ঘ্যানঘ্যানানি—তোমরাই বল, কারুর মাথার ঠিক থাকে?

ধানোয়ার শুনেই যাচ্ছিল। এবার ঝোলা খুলে দেখে আরো গোটা তিনেক আধপোড়া মকাই রয়েছে। একটা মকাই আর সেদ্ধ করা খানিকটা মেটে আলু বার করে মেয়েমানুষটাকে দিতে দিতে বলে, 'খেয়ে নাও। ছৌয়া দুটোকে খিলাও—'

ধানোয়ারের দেখাদেখি নিজের নিজের ঝোলা খুলে আরো অনেকেই তাদের ভাজা রামদানা, আধখানা লিট্টি কি দু-একটা শুকনো চাপাটি মেয়েমানুষটাকে দেয়। সবটাই ওরা খেয়ে ফেলে না। খানিকটা পরের দিনের জন্য রেখে বাকিটা খেতে শুরু করে।

রামনৌসেরা শুধোয়, 'কঁহাসে আতী হ্যায়?'

মেয়েমানুষটা বলে, 'গাঁও মনচনিয়া—'

'কঁহা?'

মেয়েমানুষটা খাড়া পুব দিক দেখিয়ে দেয়।

রামনৌসেরা আবার বলে, 'তুমনিকো সাথ মরদ নেহী। কা—তুমনি রাঁড়?'

মেয়েমানুষটা মাথা নাড়ে। মকাইয়ের শক্ত দানা চিবুতে চিবুতে বলে, 'নেহী—'

'তব্?'

মেয়েমানুষটা জানায়, তার শাদি টুটে গেছে। কাটান ছাড়ানের পর মরদ তাকে এবং বাচ্চাদুটোকে ফেলে ফের সাগাই করে যোগবানি চলে গেছে। নিজের পেট তো আছেই, তার ওপর এই বাচ্চা দুটো। তিনটে পেটের দানা জোটাতে তার শরীরের হাড় আলগা হয়ে যাচ্ছে! কথায় কথায় আরো জানা যায়, তার নাম পরসাদী। জাতে কোয়েরি।

রামনৌসেরা শুধোয়, 'কা, তুমনি একঘরিয়া?'

পরসাদী বলে, 'নেহী, দোঘরিয়া।'

অর্থাৎ দু'জন 'পুরুখ' বা পুরুষের ঘর করেছে সে। পরসাদী জানায় পয়লা মরদ মরবার পর 'দো

লম্বর' মরদ তার 'জীওনে' আসে। কিন্তু সে চুমৌনাও (সাঙা) টিকল না।

'ফির চুমৌনা করলে না কেন?'

'কা করে? ছৌয়াসুদ্ধু কোনো মরদ সাগাই করতে চাইল না।'

কথাটা ঠিক। স্ত্রীর আগের পক্ষের বাচ্চাদের দায় কে আর নিতে চায়? এমন দয়ালু মহানুভব পুরুষ মানুষ কোয়েরিদের মধ্যে একটিও জন্মেছে কিনা কে জানে।

খুব মন দিয়ে ওদের কথা শুনে যাচ্ছিল ধানোয়ার। এই আওরতটার সঙ্গে লাখপতিয়ার অনেকটাই মিল। পরসাদী তার বাচ্চাদের জন্য চুমৌনা করতে পারে নি, লাখপতিয়া পারে নি তার বুড়ি গিধের মতো শাশুড়িটার জন্য।

'ঘুর'-এর আগুন ঝিমিয়ে এসেছিল। আধপোড়া মুখ যার সেই টহলরাম শুকনো লকড়ি-টকড়ি আর পাতা দিয়ে আগুনটা গনগনে করে তোলে। জ্বলন্ত আসান কাঠ থেকে মিঠে সুগন্ধ উঠতে থাকে।

একসময় খাওয়া দাওয়া চুকে যায়। সবাই নিজের নিজের পোঁটলা টোটলা খুলে ছেঁড়া চট, কাঁথাকানি বা পোকায়-কাটা পুরনো ধুসো কম্বল বার করে 'ঘুর'-এর চারপাশে গোল করে বিছানা পাততে শুরু করে। বিহারের এই হিমবর্ষী শীতের রাতে আগুন ছাড়া এই হাভাতে ভুখা আধনাঙ্গা মানুষগুলোকে বাঁচাবার আর কিছু নেই।

বিছানা হয়ে গেলে এক মুহূর্তও কেউ আর বসে থাকে না। হাত-পা বুকের ভেতর ঢুকিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে।

কুয়াশা আরো গাঢ় হচ্ছে। চাঁদের আলো বা ধানখেতের হ্যাজাকগুলো দ্রুত অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাহারাদারদের ঘুমন্ত গলা ভেসে আসে, 'হোঁশিয়ার। কেউ জমিনে নামলে জানে খতম হয়ে যাবি। হোঁশি-য়া-য়া-য়া-র—'

সিমার আর কড়াইয়া গাছের ফোকরে রাতজাগা কামারপাখিরা থেকে থেকে কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে। বাদুড় ডানা ঝাপটায়। নিঝুম প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধানবন চিরে চিরে হাওয়া ছুটতে থাকে অবিরাম। মৃদু বাজনার মতো পাকা ধানের শব্দ ভেসে আসে। ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন।

ধানোয়ারের চোখ বুজে এসেছিল। হঠাৎ খুব কাছ থেকে কেউ যেন মিঠে গলায় গেয়ে ওঠে :

'কৌন রঙ্গে হীরোয়া, কৌন রঙ্গে মোতিয়া
কৌন রঙ্গে মজে মেরে ভৈয়া।
কালে রঙ্গে হীরোয়া, লাল রঙ্গে মোতিয়া
সাঁবরে রঙ্গে নন্দো তেরে ভৈয়া।'

মুখের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে ধানোয়ার এধারে ওধারে তাকায়। একটু পরেই বুঝতে পারে রামনৌসেরা গাইছে।

চারপাশে সবাই মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল। এক এক করে কাঁথা কম্বলের তলা থেকে তারা মুখ বার করে।

টহলরাম বলে, 'বঢ়িয়া গানা---'

মুঙ্গেরি বলে, 'মিঠি গলা, কোয়েল য্যায়সা—'

ধানোয়ার তাজ্জব বনে গিয়েছিল। ওই রকম একটা আধবুড়ো চেহারার লোক, পেটের দানার জন্য যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঊর্ধ্বশ্বাসে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, সে যে এমন গাইতে পারে—শুনেও যেন বিশ্বাস হয় না। ধানোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'মালুম হচ্ছে, গাওয়ার আদত আছে—'

এতজনের তারিফ শুনতে শুনতে গান থেমে গিয়েছিল। রামনৌসেরা বলে, 'আদত থা। এখন আর নেই। ভাতের তালাশে ঘুরতে ঘুরতে সব বিলকুল চৌপট হয়ে গেছে। বহোত রোজ বাদ ইচ্ছা হল, গাইলাম—' একটু থেমে বলে, 'যখন জোয়ান ছিলাম—উমর ছিল বিশ তিশ—তখন নৌটঙ্কীর দলে গাইতাম।'

ধানোয়ার বলে, 'এমন জাদুভরি গলা—নৌটঙ্কী ছাড়লে কেন?'

'বুখারে পড়লাম যে। গলা দিয়ে খুন উঠল। এক মুলুক থেকে আরেক মুলুকে ঘুরে রাতভর গানা গাওয়ার তাকত রইল না। নওটঙ্কী ছেড়ে দিলাম।'

গান থেমে যাওয়ায় লাখপতিয়া বিরক্ত হয়েছিল। বলে, 'বকর বকর থামিয়ে চাচাকে গাইতে দাও না—'

সবাই একসঙ্গে সায় দেয়, 'হাঁ—হাঁ—'

রামনৌসেরা মাথার ওপর কম্বল টেনে দিয়ে আবার গাইতে শুরু করে :

'কঁহা রে শোভে হীরোয়া,
কঁহা রে শোভে মোতিয়া
কঁহা রে শোভে ভৌজি মেরে ভৈয়া,
গলে শোভে হীরোয়া,
গহরে শোভে মোতিয়া,
আঁচরা শোভে নন্দো তেরে ভৈয়া।
টুট যায়েগা হীরোয়া,
বিখর যায়েগা মোতিয়া ....'

কিছুক্ষণের মধ্যে সুরটা ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে এক সময় থেমে যায়।

ধানখেতের পাহারাদার আর মাথার ওপর গাছের ফোকরে ক'টা কামার পাখি ছাড়া চরাচরে এখন আর কেউ জেগে নেই। চারদিকের গাছপালা, ঝোপঝাড়, জন্তুজানোয়ার, কীটপতঙ্গ—সমস্ত কিছুর ওপর গাঢ় গভীর ঘুমঘোর নেমে এসেছে।

শব্দ নেই কিন্তু গন্ধ আছে। জ্বলন্ত 'ঘুর'-এ পোড়া আসান কাঠের গন্ধ, পেছনের ঝোপঝাড়ে বুনো জুঁইয়ের গন্ধ, আর সব গন্ধ ছাপিয়ে রয়েছে হিমে-ভেজা দিগন্ত জোড়া পাকা ধানের অফুরন্ত সুঘ্রাণ।

ভুখা হাভাতে মানুষদের জীবনে একটা রাত এইভাবে কাটতে থাকে।

পাঁচ

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হয়ে যায়। রোদ উঠে গেছে ঠিকই, তবে তার তেজ বা জেল্লা কোনোটাই ফোটে নি। কুয়াশা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। আদিগন্ত ধানের খেত, ওধারের পাক্কী এধারের কাঁচা রাস্তা, নহরের ওপর বাঁশের সাঁকো, তারও পর বাঁ দিকে ছোট ছোট গাঁও, গাঁও পেরিয়ে অনেক দূরে জঙ্গল—সব কিছুকে কুয়াশা মুড়ে রেখেছে।

রাত্তিরে 'ঘুর'-এর আগুন কখন নিভে গিয়েছিল কেউ টের পায়নি। এই সকালেও বাতাস এত কনকনে যে কাঁথা-কম্বলের ভেতর থেকে হাত-পা বার করতে ভরসা হয় না। অবশ্য কম্বল-টম্বলও হিমে জল হয়ে আছে।

রামনৌসেরা বলে, 'রওদ (রোদ) ভাল করে না চড়লে জাড় কাটবে না। 'ঘুর'-এর আগ জ্বালিয়ে নাও—'

কাঠকুটো দিয়ে ফের আগুন জ্বালানো হয়। হাত-পা সেঁকতে সেঁকতে ধানোয়ার এবং আরো কয়েকজন রামনৌসেরাকে শুধোয়, 'সুবা হো গিয়া, অব্ কা করে?' সকাল তো হয়ে গেল, এখন তাদের করণীয় কী, সেটাই জানতে চাইছে।

আসলে রামনৌসেরার ওপর সবাই ভরসা করতে শুরু করেছে। দেখামাত্র টের পাওয়া যায় তার অভিজ্ঞতা বিপুল। লোকটার চলাফেরা, হাবভাব, কথা বলার ভঙ্গি—সবই এই ভরসার কারণ। হাভাতেদের ধাবণা হয়েছে, এই আধবুড়ো আদমীটার কথামতো চললে ধানটান মিলতে পারে।

রামনৌসেরা বলে, 'বেলা বাড়ুক। মালিকরা জমিনে আসুক। ভগোয়ান কিষুণজি আউর রামচন্দজি

কিরপা করলে কুছ না কুছ একটা ব্যওস্থা জরুর হয়ে যাবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রামনৌসেরা কী ভেবে শুরু করে, 'এখানে কত রোজ পড়ে থাকতে হবে, কে জানে। অঘুন (অঘ্রাণ) মাহিনা চলছে; এর মধ্যেই কা জাড়! এর পর তো পুষ (পৌষ) আছে, মাঘ আছে, গাছের তলায় খোলা মাঠে পড়ে থাকতে হলে জাড়ে মরে যেতে হবে।'

'তব্ কা করে?'

'জঙ্গল থেকে লকড়িটকড়ি এনে ঝোপড়ি বানিয়ে নিতে হবে।'

'ঠিক বাত।' সবাই একসঙ্গে সায় দেয়।

কথায় কথায় বেলা চড়ে। কুয়াশা ফেঁড়ে ফেঁড়ে উজ্জ্বল সতেজ রোদে চারদিক ভরে যায়। বাতাস থেকে কনকনে হিমেল ভাবটা আস্তে আস্তে কাটতে থাকে।

এর মধ্যেই বাসিমুখে সবাই ঝোলাটোলা থেকে তিন চার রোজ আগের তৈরি শুকনো চাপাটি, লিট্টি, বা চানাসেদ্ধ বার করে খেতে শুরু করে।

একসময় দেখা যায়, সার বেঁধে গৈয়া আর ভৈসা গাড়ি আসছে। পাক্কীর দিক থেকে কাঁচা সড়কে নেমে এসে সেগুলো ধানখেতে ঢুকে যায়। গাড়িগুলোর পেছন পেছন কাতার দিয়ে নামে মুসহরের দল আর আদিবাসী ধানকাটানিরা।

কিছু পরে দেখা যায়, ধান জমি থেকে কালকের সেই পহেলবানরা এবং তাদের সঙ্গে আরো কিছু লোকজন কাচ্চীতে উঠে আসছে। সারারাত মালিকের ধান পাহারা দিয়ে এখন তারা খুব সম্ভব ঘরে ফিরছে।

কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর কাছাকাছি এসে লোকগুলো একটু দাঁড়ায়। রাতজাগার ফলে তাদের চোখ 'নিদে' ঢুলে আসছে। সেই পহেলবানটা—যে কাল ধানকাটাইয়ের জন্য খেত-মালিকদের ধরতে বলেছিল—ঘুমন্ত গলায় এখন বলে, 'কা রে, আভিতক জিন্দা আছিস?'

রামনৌসেরা বলে, 'হাঁ।'

পহেলবান বলে, 'ভেবেছিলাম জাড়ে খতম হয়ে গেছিস।'

রামনৌসেরা জানায়, জাড়ে বা ঠাণ্ডায় তাদের মৃত্যু নেই। মরলে পেটের ভুখে মরবে।

পহেলবান বলে, 'ভুখে মরিস তো মরবি। কোনো পারোয়া নেই। মগর হোশিয়ার—কেউ জমিনে নামবি না।'

রামনৌসেরা ভীষণ ব্যস্তভাবে বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ, হামনিলোগন বহোত হোঁশিয়ার পহেলবানজি।' একটু থেমে শুধোয়, 'মালিকরা কখন আসবে?'

পহেলবান জানায়, মালিকরা কোনোদিন 'সুবে'তেই চলে আসেন, কোনোদিন দুফারে, কোনোদিন আবার বিকেলও হয়ে যায়। আবার কোনোদিন আসেনও না। সরগনা (গণ্যমান্য) বড়ে আদমীদের মর্জি। যখন ইচ্ছা হবে, আসবেন। দুশ্চিন্তা তো নেই। পাইসা দিয়ে ডর্জন ডর্জন (ডজন ডজন) নৌকর রেখেছেন, তারাই ধান পাহারা দেয়, মুসহরদের কাজকর্ম তদারক করে। মালিকের জমি এবং স্বার্থ রক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব তাদের।

পহেলবানরা আর দাঁড়ায় না, ঢুলতে ঢুলতে পাক্কীর দিকে চলে যায়।

মুখে যার অগুনতি চেচকের দাগ সেই ফির্তুলাল এবার বলে, 'অব্ কা করে? মালিকদের জন্যে কতক্ষণ বসে থাকব?'

রামনৌসেরা বলে, 'দেখি দুফার পর্যন্ত।'

এই সময় লাখপতিয়ার শাশুড়ি তীক্ষ্ণ সরু গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কা রে বহু, আজও ভাত খেতে পাব না?'

বুড়িকে ভরসা দিতে দিতে লাখপতিয়া বলে, 'পাবি পাবি। একটু সবুর কর না।'

বয়স হলেও বুড়ির জ্ঞান এখনও পুরো টনটনে; বিশেষ করে ভাতের ব্যাপারে। তার প্রায় সব ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হয়ে গেছে, অনুভূতিগুলোও তেমন কাজ করে না। শরীর এবং মনের সব কিছুই অসাড়

আর ভোঁতা। অনুভব করার সামান্য যেটুকু শক্তি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে সেখানে ভাত ছাড়া জগতের আর কিছুই ধরা পড়ে না। ভাতের জন্য তার শিরাস্নায়ু হাড়পাঁজরা সর্বক্ষণ অস্থির এবং উত্তেজিত হয়ে থাকে। বুড়ি বলে, 'খেতি-মালিকরা কখন আসবে ঠিক নেই। তারা ধান কাটাইয়ের কাজ দেবে কিনা, ভগোয়ান রামজি জানে। কাম না মিললে পহেলবানেরা জমিনে নামতে দেবে না। তা হলে ধান ক্যায়সে মিলি? ধান নায় মিলল তো গরম ভাত্তা ক্যায়সে খাওগী?'

বুড়ি যা বলল তার মধ্যে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। মনে মনে খানিকটা দমে গেলেও লাখপতিয়া বলে, 'চিল্লাস না। ভাত যখন তোকে খাওয়াব বলেছি, জরুর খাওয়াব। এখন চুপ করে থাক।'

চারপাশে আর সবাই—যেমন ফির্তুলাল, টহলরাম, সখিলাল এবং তার জেনানা সাগিয়া, সোমবারী, রাতুয়া—ধান আর ভাত নিয়ে অনবরত কথা বলে যায়।

আর লাখপতিয়ার বুড়ি শাশুড়ির পাশে বসে আদিগন্ত ধানের দিকে তাকিয়ে থাকে ধানোয়ার। চারপাশের কোনো কথাই সে যেন শুনতে পাচ্ছে না।

কাল বিকেলের মতো আজও শীতের নিরুত্তাপ রোদে লক্ষ কোটি সোনার দানা ঝিকমিক করতে থাকে। হঠাৎ ধানোয়ারের চোখে পড়ে হাজার হাজার পরদেশি শুগা (টিয়া) চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে এসে জমিতে নামছে। শীষ থেকে বাঁকানো ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে তারা অবিরাম ধান খেয়ে যায়।

কিছুক্ষণ আগে যে মুসহর আর মরসুমী আদিবাসী কিষাণরা খেতে নেমেছিল তারা এখন ফসল কেটে আলের ধারে টাল দিয়ে রাখতে শুরু করেছে। পরদেশি শুগারা যে এত ধান খেয়ে যাচ্ছে সেদিকে কারুর হুঁশ নেই। অথচ ধানোয়ারের মতো ভুখা মানুষরা একটা ধানের শীষে হাত দিক, অমনি কুপিয়ে কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে দেবে পহেলবানেরা কিংবা গুল-বসানো লাঠি দিয়ে মাথা দু-ফাঁক করে ফেলবে। বিড়বিড় করে সে বলে 'হো রামজি, হো বিষুণজি এত্তে ধান ফলেছে, হামনিলোগ কি একমুঠো ভাত খেতে পাব না!'

বেলা আরো চড়ে যায়। কাল রাতে গাছের মাথায় রাতজাগা যে কামার পাখিরা কর্কশ গলায় ডেকে যাচ্ছিল, এখন তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। দিনের আলো চোখে লাগলেই ওরা চুপ হয়ে যায়।

কামার পাখিরা নেই, তবে সবুজ রঙের বেলা-বাড়ার পাখিরা কিন্তু মাথার ওপর কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর ডালে অবিরাম ডেকে যাচ্ছে। এগুলো গরম কালের পাখি—সেই চৈত বৈশাখ মাসেই এদের দেখা যায়। তাজ্জবের কথা, এই অঘুন মাহিনায় কেন যে তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে, কে জানে। ওধারে পাক্কীতে স্রোতের মতো বাস, সাইকেল রিক্‌শা, লৌরি (লরী) ছুটে যাচ্ছে। আর যাচ্ছে অজস্র গৈয়া এবং ভৈসা গাড়ি। তা ছাড়া মানুষজন তো আছেই।

সূর্য যখন পুব আকাশের খাড়া গা বেয়ে প্রায় মাথার ওপরে উঠে এসেছে সেই সময় হঠাৎ সখিলালের জেনানা সাগিয়া চাপা উত্তেজিত গলায় বলে, 'হুই —দেখো দেখো—' পাকা সড়কের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় সে।

পুরনো আমলের বড় বড় চাকাওলা বিরাট একটা মোটর পাক্কী থেকে নেমে এদিকেই আসছে। গাড়িটার মাথা খোলা। তাই দেখা যাচ্ছে ভেতরে ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা, বিরাট চেহারার একজন বসে আছেন। গাড়িটার পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছে দশ-বারটা লোক। তাদের মধ্যে সেই চেনা পহেলবানেরা রয়েছে।

সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলা থেকে ধানোয়াররা গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কারুর চোখেই পাতা পড়ছে না, নিশ্বাসও বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে।

আধবুড়ো রামনৌসেরা ফিসফিস করে বলে, 'জরুর জমিনকা মালিক হোগা—'

সখিলালের যেটুকু সংশয় ছিল, কেটে যায়। রামনৌসেরার সঙ্গে একমত হয়ে বলে, 'ঠিক বাত চাচা।'

অন্য সবাই সায় দিয়ে যা বলে তা এইরকম। লোকটি মালিক না হয়েই পারেন না। মালিকদের

ঢংঢাং চালচলন জামাকাপড়, সব কিছু অন্যরকম।

রামনৌসেরা ঠিকই ধরেছে। লোকটি জমি-মালিকই। নাম ত্রিলোকী সিং—জাতে রাজপুত ক্ষত্রিয়।

গাড়িটা এক সময় তাদের কাছাকাছি এসে থেমে যায়। এরপর রাস্তার যা ভাঙাচোরা হাল তাতে অত বড় 'মোটরিয়া'র পক্ষে এগুনো অসম্ভব।

গাড়ি থেকে সেই প্রকাণ্ড চেহারার লোকটি অর্থাৎ ত্রিলোকী সিং নেমে আসেন। এবার তাঁকে ভাল করে দেখতে পায় ধানোয়াররা। প্রকাণ্ড গোল মুখ, ছোট ছোট লালচে চোখ, গলা বলতে প্রায় কিছুই নেই। পাহাড়ের মতো বিশাল শরীরের ওপর মাথাটা বসানো। চুল এমনভাবে ছাঁটা যাতে মাথার চামড়া দেখা যায়, পেছনে সরু একটা টিকি, থুতনির তলায় গোটা তিনেক চর্বির থাক।

ত্রিলোকী সিংয়ের পরনে ধবধবে সাদা চুস্ত আর কলিদার পাঞ্জাবি, তার ওপর দামি কাশ্মীরি শাল। পায়ে পেতলের ফুল-বসানো শৌখিন নাগরা। কানে সোনার মাকড়ি আর মোটা মোটা খাটো আঙুলে কমসে কম আটটা আংটি। কোনোটা হীরের, কোনোটা মোতির, কোনোটা চুনির। ত্রিলোকী সিংয়ের সমস্ত চেহারা জুড়ে রয়েছে এক ধরনের নিষ্ঠুরতা।

কাচ্চী থেকে ত্রিলোকী ধানখেতে নামতে যাবেন, রামনৌসেরা দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। হাত এবং চোখের ইশারায় গাছতলার পুরুষ এবং আওরতদের তার সঙ্গে আসতে বলে।

সবাই প্রায় দৌড়ে ত্রিলোকী সিংয়ের কাছে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ায়। মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'নমস্তে বড়ে সরকার।'

ত্রিলোকীর গোলাকার মাংসল মুখে আর ছোট ছোট লালচে চোখে বিরক্তি ফুটে ওঠে। কপাল কুঁচকে যায়। মোটা কর্কশ গলায় তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কে তোরা?' কথা বলতেই মুখটা ফাঁক হয়, তার ফলে দেখা যায় তাঁর বেশির ভাগ দাঁতই সোনা বাঁধানো।

সবার হয়ে রামনৌসেরা বলে, 'গরিব ভুখে আদমী হুজৌর।'

'কা মাঙতা?'

পাকা সড়কে এবং কাচ্চীতে যারা ত্রিলোকী সিংয়ের মোটরের পেছন পেছন দৌড়চ্ছিল, এখন তারা খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের ভেতর থেকে সেই পহেলবানটা জানায়, রামনৌসেরারা ধানকাটাইয়ের কাজ চায়।

পহেলবানটার নাম গিরধর। ত্রিলোকী সিং তাকে বলেন, 'গিরধর ভূচ্চরগুলোকে বলে দে, কামটাম মিলবে না। ধানকাটানিদের আমরা অনেক আগেই নিয়ে নিয়েছি।' বলে পা বাড়িয়ে দেন। নতুন নাগরার আওয়াজ ওঠে মস মস।

রামনৌসেরারা তবু আশা ছাড়ে না। বলে, 'হুজৌর—'

ত্রিলোকী সিং বলেন, 'আবার কী? যা বলার বলে তো দিলাম—'

দুর্জয় সাহসে রামনৌসেরা এবার বলে, 'দোগা বাত সরকার—'

'কা?'

রামনৌসেরা জানায় হুজৌর যদি কাজের ব্যবস্থা না করে দেন, তারা বিলকুল মরে যাবে। কত কাল তারা ভাতের মুখ দেখে নি। কেউ দশ রোজ, কেউ পন্দর রোজ, কেউ এক মাহিনা, কেউ তারও বেশি। এখন সবই বড়ে সরকারের 'কিরপা'। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের মতো ভুখা আদমীরা বেঁচে যায়।

এত কথা শোনার ধৈর্য নেই ত্রিলোকী সিংয়ের। আধাআধি শুনবার আগেই উঁচু আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেন। রামনৌসেরা ধানখেতে নেমে খানিকটা তফাত দিয়ে যেতে যেতে সমানে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকে। বাকি সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারা কাচ্চীতেই দাঁড়িয়ে আছে।

আচমকা চিৎকার করে ওঠেন ত্রিলোকী সিং, 'গিরিধর, জানবরের ছৌয়াটাকে লাথ মেরে ভাগিয়ে দে তো—'

গিরধর কিছু বলার বা করার আগেই অন্য একটা পহেলবান রামনৌসেরার গলা টিপে ধরে খানিকটা দূরে ছুঁড়ে দেয়।

ত্রিলোকী সিং ফিরেও তাকান না। আলের ওপর নতুন নাগরার আওয়াজ তুলে সোজা ধানের

অরণ্যে ডুবে যান। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গর দল তাঁর পিছু পিছু দৌড়তে থাকে।

রামনৌসেরার খুব চোট লেগেছিল। মাটি থেকে উঠতে গিয়েও সে উঠতে পারে না। কোমরের হাড্ডি চুরমার হয়ে গেল কিনা কে জানে।

কাঁচা সড়কে দাঁড়িয়ে সবাই ভয়ার্ত চোখে এদিকেই তাকিয়ে ছিল। পাছে মালিক এবং তার লোকজন গুস্‌সা হয় সেই ভয়ে কেউ নিচে নামছিল না। ধানোয়ার কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। রামনৌসেরার জন্য তার খুবই কষ্ট হচ্ছে। সে তো শুধু নিজের জন্য জমি-মালিকের কাছে তদ্বির করতে যায় নি, তাদের সবার জন্যই গিয়েছিল। কাজের কাজ কিছু তো হলই না, উলটে মার খেতে হল।

ধানোয়ার ধানখেতে নেমে রামনৌসেরাকে টেনে তুলে বসায়। গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিতে দিতে শুধোয়, 'খুব চোট লেগেছে?'

'হাঁ—' কোমরটা দেখিয়ে রামনৌসেরা বলে, 'এখানটায় দেখ। মালুম হোতা হাড্ডি তোড় গিয়া।' যন্ত্রণায় তার মুখ কুঁকড়ে যেতে থাকে।

'পানি দেব?'

'দাও—'

হাড় সত্যিই ভাঙে নি। খানিকক্ষণ ডলবার পর যন্ত্রণা অনেকটা কমে রামনৌসেরার। ধানোয়ারের কাঁধে ভর দিয়ে সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ফিরে আসে সে। চাপা গলায় বলে, 'চুহাকা ছৌয়া—জানবর।'

গালাগাল দুটো কাদের উদ্দেশে, সেটা বুঝতে কারুর অসুবিধা হয় না।

আরো খানিকটা সময় কাটে। সূরয পছিমা আকাশের দিকে হেলতে শুরু করে।

জমি-মালিকের কাছে দরবার করে কোনো সুরাহা না হওয়াতে সবাই মুষড়ে পড়েছিল। ধানকাটাইয়ের কাজটা পেলেও ভাতের আশা ছিল। এখন সেই ভরসাটুকুও শেষ। কবে তারা ফাঁকা মাঠ থেকে শস্যের কণা খুঁটে খুঁটে তুলতে পারবে তার কি কিছু ঠিকঠিকানা আছে? এত সব কাণ্ডের পরে তবে তো ভাত।

এই বিপুল বিশাল আদিগন্ত শস্যক্ষেত্রের ফসল উঠতে দশ দিন লাগতে পারে, বিশ দিন লাগতে পারে, হয়ত পুরো মাসই কেটে যাবে। এত দিন, এত দীর্ঘ সময় তারা খাবে কী? যে যেটুকু খাদ্য ঝুলিতে বেঁধে নিয়ে এসেছে তাতে বড়জোর আর দু-তিন রোজ চলতে পারে। কারুর পুঁজি তার চাইতেও কম। কিছু একটা ব্যবস্থা না হলে এই কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় তাদের না খেয়ে শুকিয়ে পড়ে থাকতে হবে। কে যেন ভীতু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'অব্ কা করে?'

রামনৌসেরা জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই দেখা যায় ডান পাশের জমি থেকে একটা জোয়ান ধানকাটানি ফসল কাটা বন্ধ রেখে দৌড়তে দৌড়তে উঠে আসছে। ছোকরাটা আদিবাসী মুণ্ডা বা ওরাওঁ না—মুসহর।

সবাই দু চোখে কৌতূহল এবং বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকায়।

মুসহরটা চনমন করে চারদিক দেখতে দেখতে কাছে এসে বলে, 'বড়ে সরকারের সাথ যখন বাতচিত করছিলে, আমি সব শুনেছি। এখানে তোমাদের নজদিগে যত জমিন দেখছ, সেখানে কোনো ভরোসা নেহী। তুমনিলোগ এক কাম কর—'

সবার পক্ষ থেকে ধানোয়ার শুধোয়, 'কা?'

ধানকাটানি ছোকরা যা উত্তর দেয় তা এইরকম। চতুর্দিকে এই যে কোশের পর কোশ (ক্রোশের পর ক্রোশ) ধানজমি, এ সবের মালিক একা রাজপুত ত্রিলোকী সিং নয়। আরো তিনজন মালিক আছে। মৈথিলী বামহন ভানচন্দ ঝা, কায়াথ বজরঙ্গী সহায় আর ঝামরলাল গোয়ার। ঝামরলাল জাতে গোয়ালা, তবে নিজেকে বলে যদুবংশীছত্রি।

মুসহরটা বলে, 'এই তিনগো মালিককে গিয়ে ধর। ভগোয়ান কিরপা করলে একটা ব্যওস্থা হয়ে যাবে।'

মুখপোড়া টহলরাম শুধোয়, 'ওই মালিকরা কোথায় থাকে? কোন গাঁওমে?'

মুসহরটা দ্রুত বলে যায়, 'পিপরিয়া গাঁয়ে থাকে ভানচন্দ ঝা, নওলপুরে থাকে বজরঙ্গী সহায় আউর ঝামরলাল গোয়ার থাকে গাঁও দুধলিগঞ্জে।'

'বহোত দূর?'

'নায়, নজদিগ।'

'কঁহা—থোড়েসে বাতাও না।'

'আর দাঁড়াতে পারব না। সড়ক দিয়ে কেত্তে আদমী চলেছে। তাদের পুছতাছ কর। গাঁওগুলো দেখিয়ে দেবে।' বলে ফের দৌড়ুতে দৌড়ুতে জমিতে গিয়ে নামে।

তার তাড়াহুড়োর কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মালিকের লোকেরা শুধু ধানই পাহারা দেয় না, গিধের মতো হাজার চোখ মেলে ধানকাটানিদের দিকেও নজব রাখে। তাদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে কাজে ঢিলে দেবার উপায় নেই।

সামান্য আশার রোশনি যখন দেখা গেছে, রামনৌসেরা আর সময় নষ্ট করতে চায় না। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে, 'তিনগো মালিকের কোঠিয়ায় এখনই যেতে হবে। লেকেন—'

ধানোয়ার ওধার থেকে শুধোয়, 'লেকেন কা?'

রামনৌসেরা বলে, 'কোমরিয়ার চোট সারে নি। এখনও দুখাচ্ছে (ব্যথা হচ্ছে)। আমি যেতে পারব না।'

'হাঁ হাঁ, তুমি থাকো।'

'ঠিক হ্যায়। বুড়হা-বুড়হি, বীমার আদমী আউর ছোটা ছোটা লেড়কা-লেড়কীরা থাক। আমি তাদের দেখে রাখব। বাকি সবাই যাও—'

ধানোয়ার উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'চল, চল—' শক্তসমর্থ পুরুষ এবং আওরতগুলোকে তাড়া লাগায় সে। খাদ্যের সঞ্চয় ফুরিয়ে আসছে। আজকালের মধ্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফেলতেই হবে।

তাড়া খেয়ে মেয়ে এবং পুরুষগুলো উঠে দাঁড়ায়।

সবার সঙ্গে লাখপতিয়া আর সেই কোয়েরি আওরতটা অর্থাৎ পরসাদীও উঠে পড়েছিল। আচমকা তার বাচ্চা দুটো গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দেয়। মাকে ছেড়ে তারা এই গাছতলায় থাকবে না। দু'জনে মাকে জড়িয়ে ধরে ঝুলতে থাকে। প্রথমে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করে পরসাদী। বলে, 'তোরা রামনৌসেরা চাচার কাছে একটু থাক। আমরা যাব আর আসব।' ছেলে দুটো বুঝতে চায় না। তাদের চিৎকার ক্রমাগত চড়তেই থাকে। এবার পরসাদী ঝাড়া দিয়ে তাদের ছাড়াতে চেষ্টা করে, পারে না। ফলে খেপে গিয়ে চেঁচায়, 'মর, মর ভূচ্চরেরা—'

রামনৌসেরা বলে, 'তোমার ছৌয়া দুটো বহোত বজ্জাত। বোঝালে বোঝে না। তুমি এখানেই থাক। ওদের সাথ তোমাকে যেতে হবে না।'

এদিকে লাখপতিয়াকে উঠতে দেখে তার শাশুড়ি হাউমাউ করে মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছিল। জড়ানো দুর্বোধ্য গলায় সমানে পুতহুকে (ছেলের বউ) বলে যাচ্ছে, 'হামনিকো ছোড়কে মাত যা, মাত যা—'

লাখপতিয়া বলে, 'তোকে ছেড়ে কোথায় যাব? কাঁদিস না। তিনগো গাঁও ঘুরে আমরা এক্ষুনি ফিরে আসছি। ভাত খাবি তো?'

'খাব তো। দিচ্ছিস কই?'

'ভাতের ব্যওস্থা করতে হবে না?' বলে যেই লাখপতিয়া পা বাড়াতে যাবে, বুড়ির চিল্লানি আরো কয়েক পর্দা চড়ে যায়। বিরক্ত গলায় সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'কা হুয়া?'

বুড়ি বলে, 'আমাকে ফেলে তুই ভেগে যাবি। তুই চলে গেলে জরুর হামনি মর যায়েগী।'

এই বিশাল পৃথিবীতে লাখপতিয়া ছাড়া বুড়ির আর কেউ নেই। পুতহুই তার একমাত্র ভরসা, একমাত্র অবলম্বন। সে যদি কখনও তাকে ফেলে চলে যায়, কে তাকে খাওয়াবে? কে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে?

বুড়ির সর্বক্ষণ ভয় এই বুঝি তার যুবতী পুতহু পালিয়ে গেল। এই বুঝি কেউ তাকে ভুজুং ভাজুং

দিয়ে চুমৌনা করে নিয়ে গেল। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য জীর্ণ দেহের সবটুকু আকুলতা দিয়ে তাই সে লাখপতিয়াকে আঁকড়ে আছে।

লাখপতিয়া বলে, 'ভাগার হলে বহোত আগেই ভাগতে পারতাম। রামজি কসম, কিষুণজি কসম, বিষুণজি কসম—তোকে ফেলে হামনি নায় ভাগেগী, নায় ভাগেগী। তোকে ছেড়ে আমার মরারও যো নেই।'

এতগুলো সর্বশক্তিমান দেবতার নামে দিব্যি কাটার ফল কতটা হয় বুড়িকে দেখে ঠিক বোঝা যায় না। তবে তার কান্নার তোড় খানিকটা কমে আসে। সেই ফাঁকে ধানোয়ারদের সঙ্গে পাক্কীর দিকে চলে যায় লাখপতিয়া।

ছয়

পাক্কীতে এসে পথ-চলতি লোকদের জিজ্ঞেস করতেই তিনজন খেতমালিক আর তাঁদের তিনখানা গাঁওয়ের হদিস পাওয়া যায়। পিপরিয়া গাঁও এখান থেকে বেশ কাছেই, পুব দিকে বড় জোর রশিভর হাঁটলেই পৌঁছুনো যাবে। নওলপুর অবশ্য খানিকটা দূরে। ধানখেতের ভেতর দিয়ে পুব-উত্তরে কোনাকুনি কমসে কম আধা 'মিল' (মাইল) হাঁটতে হবে। তবে দুধলিগঞ্জ গাঁও বেশ দূরে। দো-তিন 'মিল' তফাতে—পুব-দক্ষিণ কোণে।

ধানোয়াররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করে, প্রথমে সব চাইতে কাছের গাঁ পিপরিয়ায় যাবে। ওখানে সুবিধা না হলে নওলপুর আর দুধলিগঞ্জে হানা দেবে।

পিপরিয়ায় এসে মৈথিলী বামহন ভানচন্দ্র ঝা'য়ের কোঠি খুঁজে বার করল ধানোয়াররা।

গোটা গাঁয়ের বেশির ভাগ বাড়িই টালি বা টিনের। খড়ের চালের মেটে বাড়িও দু-চারটে চোখে পড়ে। তবে ভানচন্দ ঝা'র কোঠিটা একেবারে আলাদা ধাঁচের।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে পুরনো আমলের দুর্গের মতো ভানচন্দের সুবিশাল তেতলা হাভেলি। পুরু দেওয়াল, মোটা মোটা থাম, লোহার পাত বসানো জানালা। বাড়িটা ঘিরে দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল, যার মাথায় ভাঙা ভাঙা কাচ সিমেন্টের ভেতর গেঁথে দেওয়া হয়েছে। চোর এবং ডাকুদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা। তেতলার ছাদে 'রামসীতা' মন্দির। অনেক দূর থেকে মন্দিরের চোখা চুড়োটা দেখা যায়।

টানা পাঁচিলের এক জায়গায় প্রকাণ্ড ফটক। সেটার বিরাট বিরাট ভারি পাল্লায় পেতলের বড় বড় গুল বসানো রয়েছে। সেখানে ভোজপুরী দারোয়ান পাহারা দিচ্ছে। লোকটা যেমন চওড়া তেমনি খাড়াই। কম করে চার হাত লম্বা তো হবেই। গায়ে প্রচুর লোম তার, মোটা ভুরু, বড় বড় গোল চোখ। নাকের তলায় ঝুপসি চৌগাঁফা গাল পর্যন্ত চলে গেছে।

পরনে খাকি উর্দি তার, কাঁধে দোনলা বন্দুক, বুকের ওপর দিয়ে টোটার মালা ঝুলছে।

ধানোয়াররা দূরে দাঁড়িয়ে ভানচন্দ ঝা'য়ের বড় কোঠিটা দেখল। এগুতে কিছুতেই ভরসা হচ্ছে না।

গালপোড়া টহলরাম বলে, 'দারবানটার কাঁধে কেত্তে বড়া বন্দুক! ওখানে গিয়ে কাজ নেই। চল ফিরে যাই।'

ধানোয়ার বলে, 'এত্তে দূর আয়া হ্যায় লৌটনকে লিয়ে—কা রে?'

'তব্ কা করে?'

অনেকক্ষণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ চলে। তারপর সবাই ধানোয়ারের কথায় সায় দেয়। খুঁজে খুঁজে এত দূর আসা যখন হয়েছে তখন দেখাই যাক না। এমন কিছু কসুর তারা করেনি যাতে ভোজপুরী 'দারবান' বন্দুক হাঁকাবে।

দুরন্ত সাহসে ভর করে শেষ পর্যন্ত ভুখা আধানাঙ্গা মানুষের দলটা ভানচন্দের বাড়ির ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায়।

দারোয়ানের চোখ কুঁচকে যায়। মোটা গলায় সে বলে, 'কা রে, কা মাঙতা?'

হাতজোড় করে ধানোয়াররা জানায় তারা দর্শনমাঙোয়া, মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

হারামজাদার ছৌয়াগুলো বলে কী! শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না দারোয়ানের। পৃথিবীতে এর চাইতে বড় বেয়াদপির দৃষ্টান্ত আর কিছুই হতে পারে না। চৌগাঁফা ফুলিয়ে সে খেঁকিয়ে ওঠে, 'মালিকের সাথ দেখা করবি! বড়া ইজ্জৎদার আদমী আয়া! ভাগ চুহার পাল—'

তবু লোকগুলো নড়ে না। ধানোয়ার সবার প্রতিনিধি হিসেবে বলে, 'থোড়া কিরপা কীজিয়ে দারবানজি—'

হঠাৎ একটা ভারি গমগমে গলা ভেসে আসে, 'দারবান—'

'জি....' বলেই তটস্থ হয়ে ভেতর দিকে মুখ ফেরায় দারোয়ান।

এবার ধানোয়াররা ফটকের মধ্য দিয়ে বাড়ির ভেতরকার খানিকটা অংশ দেখতে পায়। ফটকের পরেই অনেকটা ফাঁকা ঘাসের জমি। তারপর বাড়িটার একতলায় সাদা পাথর বসানো ঢালা বারান্দা। সেখানে গদি-মোড়া ইজিচেয়ারে একটা লোক কাত হয়ে পড়ে আছে। ঘিউ-শক্কর খাওয়া ভারি মাংসল চেহারা। গায়ের রং টকটকে ফর্সা। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে দুধ মাখ্খন খাওয়ার কারণে চামড়া থেকে এই বয়সেও জেল্লা ফুটে বেরুচ্ছে। পরনে ফিনফিনে ধুতি আর হলদে কুর্তা। কপালে আর কানের লতিতে চন্দনের ছাপ। তাতে দেবনাগরীতে লেখা আছে, 'রামসীয়া' এবং 'রাধাকিষুণ'। মাথার পেছন দিকে মোটা টিকিতে তিনটে মনবসোলি ফুল বাঁধা। দেখেই বোঝা যায়, ইনি জমিমালিক ভানচন্দ ঝা না হয়ে যান না।

ভানচন্দও ধানোয়ারদের দেখতে পেয়েছিলেন। কপালে অনেকগুলো ভাঁজ ফেলে বললেন, 'ওই জনবরগুলো কারা? ভিখমাঙোয়া?'

দারোয়ান বলে, 'নায় সরকার। আপনার সাথ দেখা করতে চায়।'

বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন ভানচন্দ ঝা। তারপর হাতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসতে বসতে বলেন, 'কী চাস তোরা?'

ভানচন্দ ঝা যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে ফটকটা বেশ দূরে। ধানোয়ারের ইচ্ছা কাছাকাছি গিয়ে নিজেদের আর্জি জানায়। অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে সে বলে, 'হুজৌরকা হুকুম হো যায় তো হামনিলোগ অন্দর আয়েগা—'

লোকটার অসীম স্পর্ধায় মাথা গরম হয়ে ওঠে ভানচন্দের। দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, 'কী জাত তোদের?'

ধানোয়াররা জানায় তাদের কেউ দোসাদ, কেউ গঞ্জু, কেউ কোয়েরি, কেউ ধাঙড়, ইত্যাদি।

ভানচন্দ শুধোন, 'অচ্ছুতিয়া!'

'হাঁ হুজৌর—' জল-অচল অস্পৃশ্য হবার গ্লানিতে ধানোয়াররা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভানচন্দ ঝা এবার বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েন, 'দারবান জানবরগলোকে লাথ মেরে মেরে এখান থেকে ভাগাও। শুয়ারকা বচ্চে অচ্ছুতিয়ার পাল!'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে শুরু করে ধানোয়াররা।

নওলপুরে গিয়েও কোনোরকম সুরাহা হল না। জাতপাতের ব্যাপারে কায়াথ বজরঙ্গী সহায়ের অত ছুয়াছুত নেই। দামি পাতলুন-কামিজ পরা বজরঙ্গী পোশাকে এবং চলনে বলনে সাহেবী মেজাজের আদমী। ভানচন্দ ঝা'র মতো তিনি তাদের হাঁকিয়ে দিলেন না, বরং ভাল ব্যবহার করলেন। অসীম ধৈর্য নিয়ে তাদের আর্জি শুনলেন। তারপর মিঠা গলায় বললেন, নতুন ধান কাটানির দরকার নেই। মুসহর আর আদিবাসী মরসুমী কিষাণদের আগে থেকেই ঠিক করা আছে। হর সাল এই সময় এসে তারা ফসল কেটে 'খলিহানে' (যেখানে ফসল কেটে জমা করা হয়) তুলে দিয়ে যায়। পুরুষানুক্রমে এই নিয়মেই সব চলছে। কাজেই তাঁর পক্ষে ধানোয়ারদের জন্য কিছু করা সম্ভব নয়।

বজরঙ্গী সহায়ের মিঠে কথায় কাজ না পাওয়ার ক্ষতিপূরণ কিছুই হয় না। তবে অত বড় একটা জমি-মালিকের ভাল ব্যবহারে ধানোয়াররা অভিভূতই হয়।

নওলপুর থেকে কোনাকুনি মাঠ ভেঙে এবার ওরা চলে আসে দুধলিগঞ্জে। কিন্তু যদুবংশীছত্রি ঝামরলাল গোয়ারকে পাওয়া যায় না। চার দিন আগে জরুরি কাজে তিনি পাটনা চলে গেছেন। ফিরতে ফিরতে অঘুন মাস কাবার হয়ে যাবে।

ঝামরলালের খামার কাছেই। সেখানে গিয়ে তাঁর লোকজনের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল, তাদের ধানকাটানি দরকার নেই। ফসলকাটার লোক আগে থেকেই তাদের ঠিক করা থাকে, ফি বছর এই সময় মরসুমী কিষাণরা এসে ধান তুলে দিয়ে যায়। অর্থাৎ বজরঙ্গী সহায়ের মতো ঝামরলাল গোয়ার এই ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। নিশ্চয়ই ত্রিলোকী সিং আর মৈথেলী বামহন ভানচন্দ ঝা'র জমিতেও এই প্রথাতেই ফসল কাটা চলে আসছে আবহমান কাল থেকে।

কাজেই এই অঞ্চলে এসে ধানোয়াররা যে 'গতরচূরণ' খাটুনি খেটে পেটের ভাত জোটাবে তার উপায় নেই।

তিনি জায়গায় ব্যর্থ হয়ে সন্ধের খানিকটা আগে নির্ভূম হাভাতের দল কাঁচা সড়কের ধারে সেই সিমার এবং কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ফিরে আসে।

রামনৌসেরা ধানোয়ারদের জন্য শিরদাঁড়া টান টান করে উদ্‌গ্রীব বসে ছিল। বেলা যত হেলে যাচ্ছিল, পাল্লা দিয়ে তাদের উদ্বেগও বাড়ছিল।

ওদের দেখে রামনৌসেরা শুধোয়, 'কা রে, কুছ হুয়া?'

'সব বলছি। তার আগে পেটে কিছু ঢুকিয়ে নিই।' বলে ধানোয়ার তার পোঁটলা খুলে তিন দিন আগের তৈরি দুর্গন্ধওলা বাসি শুকনো লিট্টি বার করে। তার দেখাদেখি অন্য সকলেও।

সেই দুপুরে ত্রিলোকী সিংয়ের সঙ্গে কথাবার্তার পর না খেয়েই অন্য জমি-মালিকদের কাছে কাজের তালাশে বেরিয়ে পড়েছিল। কোন সকালে কী একটু খেয়েছিল তারা, তারপর থেকে এই বিকেল পর্যন্ত এক বুঁদ পানি পর্যন্ত খায় নি। খিদেয় পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে।

এদিকে লাখপতিয়াকে দেখে মড়াকান্না জুড়ে দেয় তার শাশুড়ি। দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'তুই ফিরে এসেছিস বহু, ফিরে এসেছিস!'

খেতে খেতে লাখপতিয়া বলে, 'এসেছি কিনা তুই বল।'

'হাঁ হাঁ, ফিরেছিস। ও হামনিকো লছমী পুতহু, ও হামনিকো হীরোয়া মোতিয়া বহু—' মৃত ছেলের বউকে সমানে আদর করতে থাকে বুড়ি।

'রামজি কিষুণজির নামে কসম খেয়ে বললাম, জরুর লোটেগী। তুই বিশোয়াসই করলি না তখন।'

'এখন বিশোয়াস করছি।'

'ঠিক আছে, এখন ছাড়। তোর সোহাগে আমার জান গেল।'

বুড়ি দু'হাতের বাঁধন আলগা করে দেয়।

এদিকে গোগ্রাসে খানিকক্ষণ লিট্টি চিবিয়ে ধানোয়ার রামনৌসেরাকে বলে, 'কাম নায় মিলা।' তারপর দূর দূর তিন গাঁয়ে তিন জমি-মালিকের বাড়িতে অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে যায়।

জীবনে অনেক দেখেছে রামনৌসেরা, জগৎ এবং মানুষ সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। সব শুনে খুব একটা হতাশ হয় না সে। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলে, 'মুসিবতকি বাত। ধানকাটাইয়ের কাজটা পেলে ভাল হত।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই লাখপতিয়ার শাশুড়ি আবার কান্না জুড়ে দেয়, 'কা হোগা হামনিলোগকা? কাম না মিললে ভাত খাব কী করে?'

রামনৌসেরা বলে, 'চুপ হো যা লাখপতিয়াকে সাস, চুপ হো যা—'

আদিগন্ত ধানখেতের ধারে কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলায় শীতের বিকেলে যে বিশ পঁচিশটা ভুখা আধানাঙ্গা মানুষ গা জড়াজড়ি করে বসে আছে, দু'দিন আগেও তারা কেউ কাউকে চিনত না, চোখেও দেখেনি। বিহারের জেলায় জেলায় বহু দূরের সব গাঁয়ে তারা ঘুরে বেড়াত। পরস্পরের অচেনা এই সব লোকেরা ভাতের খোঁজে এখানে এসে একই পরিবারের মানুষ হয়ে গেছে, আর রামনৌসেরা যেন তাদের মুরুব্বি। সে জোর করে নিজের থেকে মুরুব্বি হয়ে বসেনি। জীবন সম্পর্কে তার জ্ঞান, বিপুল অভিজ্ঞতা, অসীম ধৈর্য এবং ঠাণ্ডা মাথা—সব মিলিয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই সে এদের অভিভাবক হতে পেরেছে। দু'দিন আগে যাদের এতটুকু 'জান-পয়চান' ছিল না তারাই এখন রামনৌসেরার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে।

ধানোয়ার শুধোয়, 'এখন আমরা কী করব, বল। আমার যা লিট্টি, রামদানা আছে তাতে দো রোজের বেশি চলবে না।'

গালপোড়া টহলরাম বলে, 'আমার আর এক রোজ চলবে।'

সোমবারী রাতুয়া মঙ্গেরি ফির্তুলাল, এমনি আর সবাই জানায়, তাদের কারুর চার রোজের মতো খাদ্য রয়েছে, কারুর তিন রোজের মতো, কারুর বড় জোর দু বেলা চলতে পারে।

কোয়েরি আওরত পরসাদী করুণ মুখে বলে, 'হামনিকো কা হোগা? তোমরা সবাই কাল রাতে যা দিয়েছিলে তাতে আজকের রাতটাই শুধু চলবে। লেকেন কাল? কাল সুবেসে কা হোগা হামনিকো?'

রামনৌসেরা বোঝাতে থাকে, 'ঘাবড়াও মাত। জরুর কিছু একটা হয়ে যাবে।'

পরসাদী বলে, 'কুছ নায় হোগা। এবার ছৌয়া দু'টোকে নিয়ে আমাকে ভুখা মরতে হবে।'

রামনৌসেরা আচমকা জিজ্ঞেস করে, 'তুহারকা উমর (বয়স) কেত্তে?'

থতমত খেয়ে যায় পরসাদী। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'হোগা বিশ তিশ—'

এবার ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একে একে সবার বয়স জেনে নেয় রামনৌসেরা। কারুর বয়স ষাট, কারুর পঞ্চাশ, কারুর চল্লিশ, কারুর সত্তর। তারপর আবার পরসাদীর দিকে ফিরে বলে, 'দ্যাখ এত্তে এত্তে সাল সবাই দুনিয়ায় টিকে আছে। তুইও বিশ তিশ সাল বেঁচে আছিস। এরপরও বেঁচে থাকবি। ডরাস না। নিজের ওপর ভরোসা রাখ আর আমাকে থোড়াবহোত সোচনে (ভাবতে) দে।'

ধানোয়ার বলে ওঠে, 'একগো বাত—'

রামনৌসেরা তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'কা?'

'কাল 'ঘুর' জ্বালাবার লকড়ি আনতে নহরের ওপারে জঙ্গলে গিয়েছিলাম না?'

'হাঁ। তাতে কী হয়েছে?'

'অন্ধেরাতে নাকে একটা খুশবু এল।'

'কিসের খুশবু?'

'বাগনরের (পাকা কাঁচকলা)।'

টহলরাম ফির্তুলালেরা বলল, 'আমরাও একসাথ গিয়েছিলাম। কই, খুশবু টুশবু তো পাইনি।'

কেমন করে ধানোয়ার বোঝাবে সেই কোন ছোটবেলা থেকে খাদ্যের খোঁজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে এবং শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে এই উদ্দেশ্যে প্রখর আর সজাগ করে তুলেছে। খাদ্যের ব্যাপারে তার ঘ্রাণের শক্তি জন্তুর মতো, আর চোখে বাজপাখির নজর। অন্যেরা যে গন্ধ কখনও পায় না, সে একবার হাওয়ায় নাক ডুবিয়েই তা পেয়ে যায়। ধানোয়ার শুধু বলে, 'আমি পেয়েছি। ওখানে বাগনর না পেলে আমার মুখে তিনবার থুক দিও।'

রামনৌসেরা বলে, 'ঠিক হ্যায়। আজ তো 'সাম' হয়ে এল। কাল সুবেই জঙ্গলে গিয়ে দেখব। বাগনর বেশি পেলে দু-একটা রোজ সবার চলে যাবে।'

কালকের মতো সন্ধ্যা নামতে শুরু করে। উত্তুরে হাওয়াটা সারা গায়ে বরফ মেখে সাঁই সাঁই ছুটতে থাকে। কুয়াশা আর হিমে চরাচর ঝাপসা হয়ে যায়। আর এই সময় ধানখেত থেকে ফসল বোঝাই গৈয়া আর ভৈসা গাড়িগুলো কাঁচা সড়কে উঠে এসে ধানোয়ারদের সামনে দিয়ে পাক্কীর দিকে চলে যায়। সারাদিন ঘুমিয়ে থাকার পর কামারপাখিরা অন্ধেরা নামার সঙ্গে সঙ্গে আবার জেগে উঠেছে।

কড়াইয়া এবং সিমার গাছের মাথায় কর্কশ গলায় তারা চেঁচাতে শুরু করে।

এই সময় চোখে পড়ে পাক্কী থেকে পঁচিশ তিরিশ জনের একটা দল কাঁচা সড়কে নেমে এদিকেই আসছে। দেখামাত্রই ধানোয়াররা টের পায়, লোকগুলো তাদের মতোই হাভাতে।

কাছাকাছি এসে দলটা দাঁড়িয়ে যায়।

অন্ধেরা নামতেই 'ঘুর'-এর আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাত-পা সেঁকতে সেঁকতে রামনৌসেরা দলটার উদ্দেশে বলে, 'কঁহাসে আতে হ্যায় তুমনিলোগ?'

একটা বুড়ো ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে আসে। মাথার চুল সাদা ধবধবে। গায়ের কোঁচকানো চামড়া শীতে ফেটে ফেটে গেছে। কোমর থেকে একটা নোংরা চিটচিটে টেনা ঝুলছে। বুকপিঠ বেড় দিয়ে ছেঁড়া কাঁথা জড়ানো। একটা গামছা মাথায় পাগড়ির মতো করে বাঁধা; খুব সম্ভব অঘ্রাণ মাসের দুর্জয় শীত ঠেকাবার জন্য।

বুড়োটা জানায়, তাবা এক জায়গা থেকে আসছে না। রামনৌসেরাদের মতোই কেউ আসছে উত্তর থেকে, কেউ পুব থেকে, কেউ পশ্চিম থেকে। রাস্তায় আসতে আসতে তাদের আলাপ-পরিচয় হয়েছে।

রামনৌসেরা শুধোয়, 'জরুর ভাতের তালাশে এদিকে এসেছ?'

বুড়োটা বলে, 'আমবা কেউ দশ বিশ রোজের ভেতর ভাতের 'মুহ্' দেখিনি।' তারপর বলে, 'ভেইয়া—'

'কা?'

'তিন চার রোজ সমানে হাঁটছি। আউর চলনে নেহী সাকতা। তোমাদের এখানে একটু বসব?'

ওদের বসার কথায় ধানোয়াররা কেউ খুশি হয় না। যদিও এখনও ভাতের ব্যবস্থা কিছু হয়ে ওঠে নি তবু সম্ভাব্য নতুন ভাগীদারদের কে পছন্দ করে? কিন্তু রামনৌসেরা আদমীটা একেবারে অন্য জাতের। সে তক্ষুনি বলে, 'হাঁ হাঁ, বসো না।'

এক মুহূর্তও দেরি না করে ঝোলাঝুলি নামিয়ে দলটা 'ঘুর'-এর আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ে। এই সময় দেখা যায় একটা জোয়ান ছোকরা পিঠ থেকে এক আওরতকে নামিয়ে পুঁটলি খুলে দ্রুত একটা ছেঁড়া চট বার করে পেতে ফেলে। আওরতটাকে খুব যত্ন করে চটের ওপর বসিয়ে নিজে তার পাশে বসে।

আওরতটার বয়স খুব বেশি না, বিশ কি পঁচিশ। শরীরের ওপর দিকটা তার ভালই, পুরোপুরি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো। কিন্তু নিচের অংশটা, বিশেষ করে হাঁটুর তলা থেকে পা দুটো শুকিয়ে গাছের মরা ডালের মতো ঝুলছে। দাঁড়াবার বা হাঁটবার শক্তি নেই তার। সেই কারণে জোয়ান ছোকরাটার পিঠে চড়ে এসেছে। দেখে মনে হয় ওরা স্বামী-স্ত্রী।

ধানোয়ারেরা বিরক্ত, অপ্রসন্ন চোখে নতুন দলটাকে দেখছিল। কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলছিল না। অবশ্য রামনৌসেরা বাদে।

নয়া মানুষগুলোর তরফ থেকে সেই বুড়োটা এবার রামনৌসেরাকে শুধোয়, 'মালুম হচ্ছে তোমবাও ভাতের তালাশে এখানে এসেছ—'

'হাঁ—' রামনৌসেরা মাথা নাড়ে।

'কব্?'

'কাল আয়া।'

'কুছ ব্যওস্থা হুয়া?'

'আভিতক নেহী।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপব রামৌসেরা জমি-মালিকদের কাছে তাদেব ব্যর্থ অভিযানের কথা জানিয়ে বলে, 'একগো বাত—'

বুড়োটা বলে, 'কা?'

'আমরা বিশ তিশ আদমী এখানে আগে থেকে বসে আছি। তোমরা বিশ তিশগো আদমী আজ

এলে। এত্তে আদমী এক জায়গায় থেকে কোঈ ফায়দা নেহী। এক কাম কর না—'

'কা?'

পাকা সড়কের ওধারে আঙুল বাড়িয়ে দেয় রামনৌসেরা। বলে, 'ওখানে বহোত জমিন আছে। ধান ভি হুয়া বহোত। তোমরা ওই দিকে গিয়ে কোসিস কর।'

বুড়োটা বলে, 'ঠিক বাত। কাল সুবে হামনিলোগ চলা যায়েগা।'

এতক্ষণে ধানোয়ারদের বিরক্ত চোখমুখ সহজ, স্বাভাবিক দেখায়।

কিন্তু আচমকা সেই জোয়ান ছোকরাটা, যে মরা ডালের মতো শুকনো পা-ওলা মেয়েটাকে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছিল, বলে 'হামনি নায় যায়েগা। এখানেই থাকব।'

সবাই তার দিকে তাকায়। কেউ মুখ খোলার আগে ছোকরা যুবতীটাকে দেখিয়ে বলে, 'ওকে পিঠে চড়িয়ে মিলের পর মিল হেঁটে আসতে হামনিকো হাড্ডি বিলকুল 'চূরণ' হো গিয়া। আবার যদি ওকে কোথাও নিয়ে যেতে হয়—' একটু থেমে বলতে থাকে, 'হামনি জরুর মর যায়েগা, জরুর মর যায়েগা—'

রামনৌসেরা বলে, 'ঠিক হ্যায়। তোমরা দু'জন এখানে থাক।'

দু'জন বাড়তি মানুষ থাকলে অনিশ্চিত অন্নের ভাগ কতটা কমতে পারে, এ নিয়ে ধানোয়াররা কেউ আর মাথায় ঘামায় না। বরং রুগ্‌ণ পঙ্গু মেয়েটির জন্য ছোকরার ওপর তাদের খানিকটা সহানুভূতিই হয়।

রামনৌসেরাও হয়ত সবার মতো কিছু ভেবে থাকবে। সে ছোকরাকে শুধোয়, 'কা নাম তুমনিকো?'

ছোকরা শুধু নামই না, তাদের জাতপাত এবং গাঁও আর জেলার খবরও দেয়। নাম তার লছমন, জাতে গঞ্জু, গাঁও ঝুমরণ, জেলা ছাপরা। ঝুমরণে সামান্য কিছু জমি তার ছিল। ধান গেঁহু বা আখটাখ ফলিয়ে আর এটা সেটা করে কোনোরকমে চালিয়ে নিত। 'সম্‌সার'ও তার ছোট ছিল—সে আর তার মা। মোট দুটো পেট। সাত সাল আগে অজন্মার সময় ঝুমরণের সব চাইতে বড় জমি-মালিকের কাছ থেকে অঙ্গুঠার (বুড়ো আঙুলের) টিপছাপ মেরে সে কিছু টাকা 'করজ' নেয়। সুদ-আসল মিলিয়ে ঋণটা ফুলেফেঁপে এমন মারাত্মক হয়ে ওঠে যাতে দো সাল আগে তার জমিটা হাতছাড়া হয়ে যায়। বড় জমি-মালিক করজের দায়ে সেটা পুরো হজম করে ফেলে। আর সেই বছরই সাত দিনের জ্বরে মা মরল। গেল বছর সেই বড় জমি-মালিকের কাছে পেটভাতায় লাঙল ঠেলেছে লছমন, নিজের খোয়ানো জমি থেকে ফসল কেটে মালিকের 'খলিহান'-এ তুলে দিয়ে এসেছে।

কিন্তু এ বছর প্রচণ্ড খরায় ঝুমরণ এবং তার চারপাশের বিশ পঞ্চাশটা গাঁওয়ের তাবত মাঠঘাট জ্বলে গেছে। 'বাবিষ' নেই, তাই চাষও বন্ধ। চাষ বন্ধ হলে কে আর তাকে কাজ দেবে! কিন্তু এসব কথা তো পেট মানে না। কাজেই কামাই এবং খাদ্যের খোঁজে সে ঝুমরণ গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারপর সাত দিন হেঁটে সুদূর এই ধানের রাজ্যে চলে এসেছে।

লছমনের কথা শুনে বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে রামনৌসেরা। বলে, 'বহোত দুখকি বাত। লেকেন—'

লছমন তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোয়, 'কা?'

'তুমি নিজের সব কথা বললে। তোমার জেনানার কথা তো কিছু বললে না।' বলে চোখের কোন দিয়ে পঙ্গু যুবতীটিকে দেখিয়ে দেয় রামনৌসেরা।

লছমন প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। তার মুখেচোখে নিদারুণ অস্বস্তি ফুটে ওঠে। দ্রুত বলে ফেলে, 'নায় নায়, ছনেরি হামনিকো জেনানা নেহী। হামনি কুঁয়ার (অবিবাহিত), সাদি নেহী হুয়া—'

বোঝা যায় আওরতটার নাম ছনেরি। সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। রামনৌসেরা বলে, 'তবে ও কে?'

'ও আমার গাঁওয়ের লেড়কী।'

সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। গাঁও-এর মেয়ে কেন লছমনের পিঠে চড়ে এতদূরে এসেছে, ওরা তা জানতে চায়। অন্তত তাদের তাকানো দেখে তাই মনে হয়।

লছমন জানায়, ছনেরিরা জাতে ধোবি। ওর মা বাপ নেই। এক ভাই ছিল, আড়কাঠিরা তাকে লোভ

দেখিয়ে ফুসলে বেত কাটাইয়ের কাজে আসামে পাঠিয়ে দিয়েছে। তিন সাল আগে সেই যে সে গেল, আর ফিরে আসে নি। এই বিশাল দুনিয়ার কোথায় সে হারিয়ে গেছে, কেউ তার হদিস জানে না। বেঁচে আছে কিনা, তা-ই বা কে বলবে।

ভাই যদ্দিন ছিল, ছনেরির দুর্ভাবনা ছিল না। খেতমজুরের কাজ করে বোনকে খাওয়াত। সে চলে যাবার পর কষ্টের শেষ নেই ছনেরির। নিরুপায় হয়ে সে গিয়ে উঠেছিল এক দূর সম্পর্কের চাচেরা ভাইয়ের কাছে।

চাচেরা ভাইয়ের নিজেরই সংসার চলে না। তার ওপর বাড়তি দায় চাপতে মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভাই আর ভাবী দিবারাত্রি তাকে গালাগাল দিত আর মৃত্যুকামনা করত। কোনোদিন খেতে দিত, কোনোদিন দিত না। মুখ বুজে পড়ে থাকা ছাড়া পথ ছিল না ছনেরির। একে সে পঙ্গু, তা ছাড়া ছেলেবেলায় ভারি বুখারে ভুগে ভুগে গলায় স্থায়ী একটা দোষ হয়ে গেল। ভাল করে সে কথা বলতে পারে না। গলার ভেতর থেকে যে জড়ানো বিকৃত স্বর বেরোয় তার প্রায় সবটুকুই দুর্বোধ্য। তাকে একরকম গুংগাই বলা যায়।

ঝুমরণ গাঁয়ের গঞ্জুটোলা আর ধোবিপাড়া পাশাপাশি। গঞ্জুটোলা থেকে বাইরের পাক্কীতে যেতে হলে ধোবিটোলার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। যাতায়াতের পথে ছনেরিকে দেখে খুব মায়া হত লছমনের। আহা, বড় দুখী লেড়কী। কা তখলিফ মেয়েটার! দু'মুঠো খাদ্যের জন্য তার কী অপমান আর লাঞ্ছনা!

এবার খরায় যখন ঝুমরণ জ্বলে গেল, ধোবিটোলা এবং গঞ্জুটোলার বাসিন্দারা প্রায় সবাই গাঁ ফাঁকা করে খাদ্যের খোঁজে নানা দিকে চলে গেছে। ছনেরির চাচেরা ভাই তার জেনানা এবং ছৌয়াদের নিয়ে ভিখমাঙনি হয়ে শহরের দিকে গেল, কিন্তু ছনেরিকে সঙ্গে নেয় নি। নেবেই বা কী করে? সে যদি সুস্থ সবল মানুষ হত, ওদের সঙ্গে হেঁটে যেতে পারত। কিন্তু পরের সাহায্য ছাড়া যে দু হাত তফাতেও যেতে পারে না তাকে কে নিয়ে যাবে? তাকে নিতে হলে পিঠে চাপিয়ে নিতে হয়। চাচেরা ভাইদের কাছে অতখানি মহানুভবতা আশা করা অন্যায়।

ফাঁকা, পরিত্যক্ত ঘরের দাওয়ায় বসে পেটের ভুখে এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় গোঙানির মতো শব্দ করে অবিরাম কাঁদত ছনেরি।

লছমন বলতে থাকে, 'গাঁও ছেড়ে একে একে সবাই চলে যাচ্ছে। কা করে, এই ছোকরিকে ফেলে আমি পালাতে পারলাম না। পিঠে চাপিয়ে পায়দল চলতে শুরু করলাম। চলতে চলতে পথে মানুষজনের কাছে খবর পেলাম, এদিকে ধান ফলেছে।'

সবাই চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। শুনতে শুনতে তারা, বিশেষ করে ধানোয়ার লছমন সম্পর্কে এক ধরনের শ্রদ্ধাই বোধ করতে থাকে। যার সঙ্গে কোনোরকম রিস্তেদারি নেই, এরকম একটা পঙ্গু আওরতকে সাত সাতটা দিন পিঠে চড়িয়ে ধানের দেশে যে নিয়ে আসে তার মহত্ত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

রামনৌসেরা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। বলে, 'বহোত আচ্ছা কাম কিয়া। ভগোয়ান তুমনিকো ভালাই করে।'

লছমন উত্তর দেয় না, সামান্য হাসে।

এদিকে 'ঘুর'-এর আগুন নিভে আসছিল। কাঠকুটো গুঁজে সেটাকে আবার গনগনে করে তোলে গালপোড়া টহলরাম।

কিছুক্ষণ পর দিগন্তের তলা থেকে পুনমের চাঁদ উঠে অসে। গাঢ় হিমের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে-আসা ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় বিহারের এই নিঝুম প্রান্তর ক্রমশ অপার্থিব আর রহস্যময় হয়ে উঠতে থাকে। উত্তুরে বাতাস আজ কালকের চাইতে অনেক বেশি ঠাণ্ডা আর উলটোপালটা।

মাথার ওপর কামারপাখিরা অনবরত চেঁচিয়ে যাচ্ছে। 'ঘুর'-এর আগুন দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে বাড়িয়া পোকা চারদিক থেকে ছুটে এসেছে। মাঝে মাঝে রাতজাগা দু একটা অচেনা পাখি হাওয়ায় ঢেউ তুলে ডেকে উঠছে। তাদের পরিষ্কার দেখা যায় না। শূন্যে অস্পষ্ট দাগ টেনে ধানখেতের ওপর দিয়ে তারা উড়ে চলেছে।

যথারীতি ধানখেতের উঁচু মাচাগুলোতে হ্যাজাক জ্বলছে। আর থেকে থেকে পাহারাদারদের চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। 'হোঁ-শি-য়া-র, কেউ জমিনে নামবি না, জান চলে যাবে।'

রাত আরেকটু গাঢ় হলে নিজের নিজের পোঁটলা পুঁটলি খুলে সবাই মকাই কি রামদানা, সেদ্ধ মেটে আলু বা চানার ছাতু বার করে। খেয়ে দেয়ে, মুড়ি দিয়ে 'ঘুর'-এর আগুন ঘিরে গোল হয়ে শুয়ে পড়ে মানুষগুলো।

কালকের মতোই কম্বলের তলায় মুখ ঢুকিয়ে জাদুভরি মিঠে গলায় গুনগুনিয়ে নওটঙ্কীর গান গাইতে শুরু করে রামনৌসেরা।

মোরি হাটিয়াসে নাথুনিয়া কুলেল করেলা
দেখিকে সবোকে মানোয়া ডোল ডোলেলা
মোরি হাটিয়াসে নাথুনিয়া—
নাথুনি পহান যব চলতি ডডরিয়া
দেখিকে লোকেয়া মারেলা নজরিয়া
হাঁসি হাঁসি ছৈলালোগ মেল তরেলা
মোরি হাটিয়াসে নাথুনিয়া—

গাইতে গাইতে একসময় গলা বুজে আসে রামনৌসেরার। কড়াইয়া এবং সীমার গাছগুলোর তলায় পঞ্চাশ ষাটটা হাভাতে মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া সমস্ত চরাচর স্তব্ধ হয়ে যেতে থাকে।

অন্য সবার মতো ধানোয়ারও ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কাঁধের কাছে খোচা খেয়ে মাথার ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে ধড়মড় করে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, 'কৌন?'

আর তখনই আওরতের চাপা গলা শোনা যায়, 'এ পুরুখ, এত্তে জোরে চিল্লিও না। আস্তে কথা বল।'

এবার চোখে পড়ে। মুখের ওপর থেকে ভারি কাঁথা সরিয়ে লাখপতিয়া তার দিকেই তাকিয়ে আছে। কালকের মতোই সে তার শাশুড়িকে নিয়ে ধানোয়ারের কাছাকাছি শুয়েছে।

ধানোয়ার অবাক হয়ে নিচু গলায় শুধোয়, 'কা হুয়া?' সে বুঝে উঠতে পারে না, এই মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে একঘরিয়া রাঁড় আওরতটা তার কাছে কী চাইছে। খাদ্য ছাড়া আর কোনো জৈবিক ব্যাপারেই এই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত কোনোরকম আকর্ষণ বোধ করে নি সে। তবু গোটা পৃথিবী যখন গাঢ় ঘুমে ডুবে আছে তখন এক শক্ত সমর্থ ডাঁটো চেহারার যুবতী আওরতের দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভেতরটা কেঁপে যায়।

লাখপতিয়া ফিসফিসিয়ে বলে, 'তুমি তখন বাগনরের কথা বলছিলে না?'

'হাঁ।'

'কাল সুবে আন্ধেরা থাকতে থাকতে, কেউ উঠবার আগেই তুমি আর আমি জঙ্গলে গিয়ে বাগনর নিয়ে আসব। এনে লুকিয়ে রাখব।'

'লেকেন—'

'লেকেন উকেন নেহী। বুঝতে পারছ না, সবার সাথ গেলে ভাগে কম পড়ে যাবে।'

খাঁটি কথাই বলেছে লাখপতিয়া। আগে থেকে যতগুলো পারা যায় পাকা কলা এনে রাখতে পারলে পেটের ব্যাপারে কয়েক দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ধানোয়ার উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, 'ঠিক বাত। লেকেন—'

'ফির কা?' 'ঘুর'-এর আগুনের আভায় দেখা যায় লাখপতিয়ার চোখ কুঁচকে গেছে।

ধানোয়ার জানায়, তার নিদটা বড়ই বেয়াড়া, সহজে টুটতে চায় না। যদি আন্ধেরা থাকতে থাকতে না উঠতে পারে?

'বুরবাক নিকম্মা কঁহাকা—' চোখেরকোণ দিয়ে ধারাল একটি নজর ধানোয়ারের বুকের ভেতর বেঁধাতে বেঁধাতে লাখপতিয়া বাতাসে গলার স্বরটা ভাসিয়ে দেয়, 'আমিই তোমার নিদ ছুটিয়ে দেব। লেকেন ধাক্কা দিলে শোর মচিয়ে আর কাউকে জাগিয়ে দিও না। তা হলেই সব চৌপট—'

'সমঝ গিয়া—'

'অব্ শো যাও—' বলেই ধুসো ছেঁড়া কম্বলটা আবার মাথার ওপর টেনে দেয় লাখপতিয়া।

খানিকক্ষণ আওরতটার দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ ঢাকতে শুরু করে ধানোয়ার।

ভুখা হাভাতে লোকগুলোর জীবনে আরো একটা দিন কেটে যায়।

পরের দিন লাখপতিয়ার ধাক্কা খেয়ে ধানোয়ার যখন উঠে বসে তখনও সকাল হয় নি। অন্ধকার এবং কুয়াশা চরাচরকে আচ্ছন্ন আর আড়ষ্ট করে রেখেছে।

হিমের পুরু স্তর ঠেলে আকাশের দিকে তাকালে বোঝা যায়, পুনমের চাঁদ এখনও দিগন্তের তলায় নেমে যায় নি। প্রথম রাতের তুলনায় শেষ রাতে জ্যোৎস্না আরো ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

ধানখেতের হ্যাজাকগুলো এখন ঝিমিয়ে পড়েছে। সমস্ত দিগন্ত জুড়ে জ্যোতিহীন নিস্তেজ চোখের মতো সেগুলো মিটমিট করে। পাহারাদারদেরও কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত ভোরের এই আগে আগে তারাও ঘুমিয়ে পড়েছে।

লাখপতিয়া চাপা গলায় বলে, 'বহোত ভারি নিদ তুমনিকো, বহোত বুরা। বিশ বার ধাক্কা দিতে তবে নিদটা টুটল। আর শুয়ে থেকো না। সবার নিদ ভাঙবার আগেই আমাদের এখানে ফিরে আসতে হবে।'

'হাঁ।'

'আমাদের এই কথাটা কেউ যেন জানতে না পাবে।'

শীতার্ত রাতের শেষ প্রহরে অল্পচেনা এক যুবতী আওরতের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে লুকিয়ে লুকিয়ে খাদ্যের অভিযানে বেরিয়ে পড়ার মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা রয়েছে। বিহারের এই খোলা মাঠে অঘ্রাণ মাসের দুরন্ত হিমেল হাওয়া যখন হাত-পা জমিয়ে দিচ্ছে, রক্তস্রোতে বরফ ছোটাচ্ছে, সেই সময় অদ্ভুত এক উত্তাপ অনুভব করে ধানোয়ার। নিচু গলায় সে বলে, 'নায় নায় কেউ জানতে পারবে না।' বলেই, ঝোলা খুলে ধারাল একটা দা বার করে উঠে দাঁড়ায়, 'চল—'

লাখপতিয়া উঠতে যাবে, সেই সময় রামনৌসেরার গলা শোনা যায়, 'এ ধানোয়ার, এ লাখপতিয়া—'

দু'জনে চমকে 'ঘুর'-এর ডান দিকে ঘাড় ফেরায়। দেখে, কম্বল সরিয়ে মুখ বার করেছে রামৌসেরা।

লাখপতিয়া বলে, 'চাচা তুমনি!'

'হাঁ—' আস্তে মাথা নাড়ে রামনৌসেরা। বলে, 'মাঝ রাত্তিরে তোমরা যা বলছিলে, সব শুনেছি। ইয়ে ঠিক নেহী। বহোত বুরা কাম।'

লাখপতিয়া বা ধানোয়ার কেউ উত্তর দেয় না। লজ্জায় এবং অস্বস্তিতে রামনৌসেরার দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারে না। মুখ নিচু করে থাকে। চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ার মতো অবস্থা তাদের।

রামনৌসেরা বলতে থাকে, 'একসাথ হামনিলোগ ইধর আয়া। কিছু মেলে তো একসাথ ভাগ করে খাব। নায় মিলল তো নায় খায়েগা।' সে আরো যা বলে তা এইরকম। কাউকে না জানিয়ে এরকম চোরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে বাগনর আনতে যাওয়া বড় অন্যায়। বহোত শরমকি বাত।

লাখপতিয়া আর ধানোয়ার এবারও চুপ করে থাকে।

রামনৌসেরা বলে, 'অব্ শো যাও। সুবে হোক, রওদ উঠুক, তখন সবাই একসাথ জঙ্গলে যাব।'

ধানোয়ার বা লাখপতিয়া এবারও কিছু বলে না। ভীষণ ব্যস্তভাবে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

সাত

সকালের রোদ ওঠার পর নতুন হাভাতের যে দলটা এসেছিল, এক মুহূর্তও আর বসে না। কাল রামনৌসেরার সঙ্গে যা কথা হয়েছিল সেই অনুযায়ী পাকা সড়কের ওধারের ধানখেতগুলোর দিকে চলে যায়। তবে ছনেরি আর লছমন এখানেই থাকে।

কালকের মতো আজও গৈয়া আর ভৈস্যা গাড়ি, মরসুমী আদিবাসী কিষান, মুসহর আর পহেলবানদের এধারের জমিনের দিকে আসতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দিগন্ত জোড়া ফসলের খেতে ধানকাটা শুরু হয়ে যাবে।

মুসহরদের দেখেই রাতের পাহারাদাররা ঢুলতে ঢুলতে ঘরে ফিরতে থাকে। তাদের আরক্ত চোখে দুনিয়ার সব ঘুম জমা হয়েছে। ঘরে গিয়েই তারা শুয়ে পড়বে।

পর পর দু'দিন দেখেই বোঝা গেছে, জমি-মালিকের পহেলবানদের একটা দল রাতে ফসল পাহারা দেয়। আরেকটা দল ধানকাটানিদের সঙ্গে দিনের বেলা সন্ধে পর্যন্ত জমিতে কাটিয়ে তাদের কাজের তদারকি করে।

রামনৌসেরা চড়তি সূরযের দিকে এক পলক তাকিয়ে সবাইকে তাড়া লাগায়, 'দের নায় করনা। এবার জঙ্গলে যাওয়া দরকার। বুড্‌হা-বচ্চে, কমজোর আর বীমার আদমীরা ছাড়া সকলকে যেতে হবে।'

'হাঁ হাঁ—' সবাই সায় দেয়।

'কতক্ষণ জঙ্গলে থাকতে হবে, ঠিক নেই। কিছু খেয়ে নাও।'

সবাই ঝোলাঝুলি ঝেড়ে মকাই-টকাই বার করে। পরসাদীর পুঁটলিতে আর কিছুই নেই। ধানোয়াররা নিজেদের লিট্টি টিট্টি থেকে এক-আধ টুকরো করে ছিঁড়ে ওদের দেয়।

খেতে খেতে রামনৌসেরা বলে, জঙ্গলে যাওয়া হচ্ছে। বলা যায় না, খতরনাক জানবর থাকতে পারে। কাজেই নিরস্ত্র ওখানে ঢোকা ঠিক নয়। দা বা টাঙ্গি না থাকলে কমসে কম একটা করে লাঠি হাতে থাকা চাই।

খাওয়া দাওয়ার পর শক্ত সমর্থ পুরুষ এবং মেয়েমানুষগুলো উঠে দাঁড়ায়। এমনকি পরসাদী আর রামনৌসেরা পর্যন্ত আজ চলেছে। তাদের সঙ্গে লছমনও যাচ্ছে।

কাল পরসাদী আর রামনৌসেরা ধানোয়ারদের সঙ্গে জমি মালিকদের বাড়ি যেতে পারে নি। রামনৌসেরা যেতে পারে নি কোমরের যন্ত্রণার জন্য। পরসাদীর ছেলে দুটো এমন কান্না জুড়েছিল যে কার সাধ্য তাদের রেখে যায়।

আজও ছেলে দুটো মাকে জঙ্গলে যেতে দেখে তুমুল চিল্লাতে শুরু করে। কিন্তু পরসাদী তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

টহলরাম রামনৌসেরাকে বলে, 'চাচা, তোমার না কোমরে চোট! তোমাকে জঙ্গলে যেতে হবে না।'

অন্য সবাই একই কথা বলে। কোমরে যন্ত্রণা নিয়ে জঙ্গলে যাওয়া রামনৌসেরার পক্ষে ঠিক হবে না।

রামনৌসেরা বলে, 'কোমরিয়ার দরদ অনেক কমে গেছে। আমি যেতে পারব।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায় মেয়ে এবং পুরুষের দলটা ডান দিকের নহর পেরিয়ে কাচ্চী ধরে পশ্চিম দিকে বরাবর হেঁটে চলেছে। সবার হাতেই দা, টাঙ্গি বা ওই জাতীয় কিছু।

আঁকাবাঁকা মেটে রাস্তার দু'ধারেই ধানখেত, তবে বাঁ পাশে, দূরে দূরে দু-একটা হতচ্ছাড়া চেহারার দেহাত চোখে পড়ছে। ডাইনে গাঁয়ের চিহ্নমাত্র নেই। বহু দূরে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। পরশু রাত্তিরে ঘোলাটে চাঁদের আলোয় আন্দাজে আন্দাজে ওখান থেকে 'ঘুর' জ্বালাবার জন্য আসান আর সিসমের শুকনো ডাল এবং পাতা নিয়ে এসেছিল ধানোয়াররা।

আজ উত্তুরে হাওয়াটা অনেক বেশি জোরাল। ফলে ধানখেত থেকে অনবরত শব্দ উঠতে থাকে—ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন। ধানের বাজনা শুনতে শুনতে ধানোয়াররা এগিয়ে যায়।

সেদিন রাত্তিরে কুয়াশায় আর অন্ধকারে পরিষ্কার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল জঙ্গলের সীমানা পর্যন্ত একটানা শুধুই ধানের জমি। কিন্তু খানিকটা যাবার পর ডান ধারে ফসলের খেত ফুরিয়ে যায়। শুরু হয় মাইল খানেক জুড়ে জলা জায়গা—অনেকটা বিলের মতো। তবে এই অঘ্রাণ মাসে বিলের বেশির ভাগটাই শুকিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। যেখানে যেখানে এখনও জল পুরোটা শুকোয় নি সে জায়গাগুলোতে চাপ চাপ কচুরিপানা। ডাঙা জায়গাগুলো সর্বন ঘাস, দীর্ঘ বুনো ঘাস, নলখাগড়া—এমনি নানা জাতের আগাছা এবং ঝোপঝাড়ে বোঝাই। তা ছাড়া সফেদিয়া, গোলগোলি এবং মনরঙ্গোলি ফুলে গোটা বিল ঝলমল করছে। আর আছে অনেকটা ডাঙা জায়গা জুড়ে কাশের বন। দু তিন মাস আগেও কাশের ফুলগুলো ছিল সজীব, সতেজ এবং দুধের মতো ধবধবে। অঘ্রাণের হিমে সেগুলো সজীবতা হারিয়ে কালচে এবং মলিন হয়ে উঠেছে।

বিলের জলে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়েছে শীতের জলচর পাখিরা। সিল্লি, কাঁক, লাল হাঁস আর মানিক পাখি। এত পাখি যে জল দেখা যায় না। কাঁক আর মানিকপাখির ডাকে নিঝুম বিল চকিত হয়ে উঠেছে।

রাস্তায় একটা লোকও চোখে পড়ে নি। বিলের আধাআধি পেরুবার পর হঠাৎ দেখা যায়, এক বুড়ো ভৈসোয়ার (যে মোষ চরায়) মোষের পিঠে চড়ে উলটো দিক থেকে আসছে। তার পেছন পেছন আরো দশ বারটা মোষ। ওরা আসছে বাঁ দিকের কোনো একটা গাঁ থেকে।

বুড়ো ভৈসোয়ার—গায়ের চামড়া যার কুঁচকে গেছে, দু পাটিতে একটা দাঁতও নেই, গাল তোবড়ানো, ফাটা ফাটা হাত-পা, ছানিপড়া চোখ, কোমরে টেনা আর বুক-পিঠ কাঁথায় জড়ানো, মাথায় গামছা বাঁধা—ধানোয়ারদের কাছাকাছি এসে তার মোষটা থামিয়ে দেয়। ভুরুর ওপর হাত রেখে শুধোয়, 'মালুম হোতা নয়া আদমী। তোমাদের আগে এদিকে দেখি নি তো।'

রামনৌসেরা জানায়, তারা এ অঞ্চলে বিলকুল নতুনই, এই প্রথম আসছে।

ভৈসোয়ার বলে, 'তুমনিলোগনকা সাথ আওরত ভি হ্যায়।'

'হাঁ।'

'ওদিকে যাচ্ছ কোথায়?'

'জঙ্গলে।'

বুড়ো ভৈসোয়ার রীতিমত অবাক হয়ে যায়। বলে, 'কায়? জঙ্গলে যাচ্ছ কেন?'

খাদ্যের খোঁজে যে যাচ্ছে সেটা আর বুড়োকে জানায় না রামনৌসেরা। বলে, 'থোড়া জরুরত হ্যায়।'

'বহোত হোঁশিয়ার রহনা জঙ্গলমে।'

'কায়?'

'উধরি খতরনাক জানবর হ্যায়।'

'কা জানবর?'

'চিতিয়া আউর বরা (চিতা বাঘ এবং শুয়োর)।' বলে আর অপেক্ষা করে না বুড়ো ভৈসোয়ার। গোড়ালি দিয়ে মোষের পাঁজরায় একটা গুঁতো মেরে, আলটাকরায় জিভ ঠেকিয়ে টক টক আওয়াজ করতেই বিশাল জন্তুটা চলতে শুরু করে। ভৈসোয়ারকে থামতে দেখে পেছনের মোষগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এবার তারাও হেলে দুলে চলতে থাকে।

রামনৌসেরারা আর দাঁড়ায় না। কাচ্চী ধরে সোজা এগিয়ে যায়। খানিকটা যাবার পর রাস্তাটা ডাইনে বেঁকে গেছে। বাঁকের মুখে আসতেই চোখে পড়ে, বুড়ো ভৈসোয়ার তার মোষগুলো নিয়ে বিলের ঘাসবনে নেমে পড়েছে।

সূর্য যখন আরো অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে, আকাশে কোথাও এতটুকু কুয়াশা নেই, শীতের সোনালি রোদে সব ঝলমল করছে, সেই সময় দলটা জঙ্গলের কাছে পৌঁছে যায়।

বনভূমির সামনের দিকটা পাতলা। এখানে ওখানে সর্বন আর সাবুই ঘাস গজিয়ে আছে। ফাঁকে

ফাঁকে দু-একটা সাগুয়ান আর সিমার গাছ। তবে ট্যারাবাঁকা চেহারার অগুনতি সিসম এবং আসান চোখে পড়ছে। বেশির ভাগ সিসমই বুড়ো, সেগুলোর ডালপালা শুকিয়ে গেছে। এসব ছাড়া যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, মনরঙ্গোলি আর গোলগোলি ফুলের বাহার।

সবাইকে বার বার সতর্ক করে দিয়ে রামনৌসেরা প্রথমে জঙ্গলে ঢোকে, তার পাশাপাশি ধানোয়ার। বাকি দলটা আসে পেছন পেছন।

জঙ্গলের ভেতর 'রশি'ভর ঘোরাঘুরি করেও পাকা কলার সন্ধান যখন পাওয়া যায় না, রামনৌসেরা তখন বলে ওঠে, 'কঁহা তুমনিকো বাগনর—হো ধানবর?'

ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে শাণিত করে উত্তুরে হাওয়ায় গন্ধ শুঁকতে শুকতে এগিয়ে যাচ্ছিল ধানোয়ার। অন্যমনস্কর মতো সে বলে, 'হ্যায় বহোতসে। আও হামনিকো সাথ।'

হাভাতের দলটা যেখানে এসে পড়েছে সেখান থেকে জঙ্গল ঘন হতে শুরু করেছে। শাল-সাগুয়ান ছাড়াও এখানে অর্জুন কেঁদ আর সিমার গাছের ছড়াছড়ি। সেগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে নানা ধরনের লতা। তবে বুনো জুঁইয়ের লতাই বেশি। সেগুলোর গায়ে অগুনতি সাদা ফুল ফুটে আছে। বন্য জুঁইয়ের উগ্র গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে আছে। ধুঁধুর আর লাল টুকটুকে তেলাকুচ ঝুলছে পিপর গাছের ডালপালা থেকে। বনতুলসীর ঝাড় উদ্দাম হয়ে আছে চারদিকে।

জঙ্গল ঘন বলে তেমন রোদ ঢুকতে পারে নি। পাতার ফাঁক দিয়ে শীতের যে আলোটুকু এসে পড়েছে বনভূমিকে উত্তপ্ত করার পক্ষে তা পর্যাপ্ত নয়। এখানকার মাটি ভীষণ ঠাণ্ডা। রাতের পর রাত কুয়াশায় ভেজার ফলে নরম আর পিছল হয়ে আছে। শীতল মাটি থেকে এত বেলাতেও হিম উঠে আসছে। আর উড়ছে অজস্র বাড়িয়া পোকা। অদৃশ্য পতঙ্গরা চারপাশ থেকে অনবরত অদ্ভুত শব্দ করে চলেছে—কিট কিট কিট।

ধানোয়ারের পিছু পিছু ঘন জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে আরো একবার চেঁচিয়ে ওঠে রামনৌসেরা, 'সব হোঁশিয়ার—'

খুব সম্ভব এই জঙ্গলে মানুষজন বিশেষ আসে না। নিঝুম বনভূমিতে মনুষ্যজাতির একটি দলকে এভাবে ঢুকতে দেখে মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে উড়ে চিৎকার করতে থাকে। কয়েকটা বাঁদর লাফালাফি করে এ-গাছ ও-গাছ হয়ে গভীর বনের দিকে উধাও হয়ে যায়। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সাপেদের বুক টানার শব্দ উঠে আসে।

টহলরাম আর ফির্তুলাল একসঙ্গে বলে ওঠে, 'আউর কেত্তে দুর ধানবার ভেইয়া?'

চোখের তারা স্থির হয়ে গেছে ধানোয়ারের। সবগুলো ইন্দ্রিয়কে নাকের মধ্যে জড়ো করে জোরে জোরে শ্বাস টেনে হাওয়ায় গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করছিল সে। হঠাৎ ধানোয়ার চেঁচিয়ে ওঠে, 'মিলা গিয়া মিলা গিয়া—' বলেই তীরের মতো সামনের দিকে ছুটে যায়।

খানিকটা দূরে অনেকগুলো কড়াইয়া গাছ গা-জড়াজড়ি করে দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলোর পরেই বুনো কলার ঝাড়। কমসে কম আধ 'রশি' জায়গা জুড়ে ঝাড়টা পাকা বাগনরে হলুদ হয়ে আছে। ধানোয়ার এবার প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি, তেরে কিরপা—' সঙ্গে করে একটা ধারাল দা নিয়ে এসেছিল সে। উর্ধ্বশ্বাসে এবং প্রবল উত্তেজনায় দৌড়ে গিয়ে ঝাড়ের একেবারে প্রথমেই যে কলাগাছটা রয়েছে সেটার গায়ে কোপ বসিয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে যায়। একটা বিরাট সাপ—কোথায় ছিল ভগোয়ান জানে, হয়ত কলাগাছটার গোড়ায় বা মাথায়—বিজরি চমকের মতো লেজের ওপর ভর দিয়ে ধানোয়ারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে।

সাপটার গায়ে চাকা চাকা দাগ, ফণাটা প্রকাণ্ড। খাড়াইতে সেটা ধানোয়ারের মাথা ছাপিয়ে আরো বিঘতখানেক উঁচু। চোখ দুটো লাল কাচের দানার মতো জ্বলছে। চেনা যায়, সাপটা গেহুমন। মারাত্মক বিষ তার।

এই শীতের ঋতুতে যখন পৃথিবীর যাবতীয় সাপ মাটির অতল স্তরে ঘুমোতে চলে গেছে তখন কী কারণে গেহুমনটা মাটির ওপর থেকে গেছে, কে জানে।

ধানোয়ার আর সাপটার মাঝখানে স্রেফ চার পাঁচ হাতের ফারাক। কেউ এতটুকু নড়ছে না। স্থির, পলকহীন চোখে তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। ধানোয়ার জানে সে একটু নড়লেই সাপটা ছোবল মারবে এবং তাতে অবধারিত মৃত্যু।

পেছন পেছন দৌড়ে আসতে আসতে বাকি সবাই ধানোয়ার এবং সাপটাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে গিয়েছিল। কে জানত, বাগনরের বন পাহারা দিচ্ছে এমন একটা ভয়াবহ বিষাক্ত সরীসৃপ। এই পৃথিবীতে তাদের মতো হাভাতেদের এত সহজে পেটের দানা জোটে না। দুনিয়ার সব খাদ্য কেউ না কেউ আগলে বসে থাকে। ওখানে পাকা ধানের খেত পাহারা দেয় পহেলবানেরা আর বাগনরের ঝাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে মারাত্মক গেহুমন সাপ।

ভয়ে আতঙ্কে রামনৌসেরাদের শ্বাস আটকে গেছে। কারুর চোখে পাতা পড়ছে না। কেউ হাত-পা নাড়তে পর্যন্ত ভরসা পাচ্ছে না।

রামনৌসেরার ঠিক গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে লাখপতিয়া। ভয়ার্ত চাপা গলায় সে বলে, 'জহরিলা (বিষাক্ত) সাঁপ!'

রামনৌসেরার মাথা নড়ে না। হাওয়ার মতো ফিসফিসে গলায় বলে, 'হাঁ, গেহুমন।'

'আদমীটার কী হবে চাচা?' লাখপতিয়াকে ভয়ানক উদ্বিগ্ন দেখায়।

রামনৌসেরা উত্তর দেয় না।

এদিকে সাপটার চোখের দিকে তাকিয়েই আছে ধানোয়ার। খাদ্যের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে কৈয়া, দাঁতাল শুয়োর, চিতা বাঘ, বুনো মোষ—এমনি কত খতরনাক জানোয়ারের সামনেই না তাকে আজীবন পড়তে হয়েছে। জন্তুজানোয়ার, পাখি-পতঙ্গ, পোকামাকড়, সরীসৃপ—সমস্ত প্রাণিজগৎ সম্পর্কেই তার বিপুল অভিজ্ঞতা। সে জানে গেহুমনটার চোখ থেকে চোখ সরালেই নিশ্চিত মৃত্যু। পরস্পরকে জাদু করে একটি মানুষ আর এক ভয়াবহ সরীসৃপ সম্মোহিতের মতো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

রামনৌসেরারা যখন ভেবে উঠতে পারছে না কিভাবে ধানোয়ারকে রক্ষা করবে ঠিক সেই সময় ছায়াচ্ছন্ন বনভূমিতে হঠাৎ বিজরি চমকে যায়। বিজরি না, ধানোয়ারের দায়ের ঝকঝকে ফলা ওটা। পরক্ষণেই দেখা যায়, সাপটার মাথা বিশ হাত দূরে উড়ে বেরিয়ে গেছে আর ধড়টা আলাদা হয়ে মাটিতে বারকয়েক দাপাদাপি করেই স্থির হয়ে যায়।

এইরকম একটা ভয়াবহ ঘটনার পরও ধানোয়ার একেবারেই অবিচলিত। বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই তার। এক মুহূর্তও আর দাঁড়ায় না সে, খুবই নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সাপটার নিশ্চল মৃতদেহের পাশ দিয়ে কলাগাছের দিকে এগিয়ে যায়।

চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না রামনৌসেরাদের। ভয়ে উত্তেজনায় তাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর তাদের বুকের ভেতর থেকে আবদ্ধ বাতাস বেরিয়ে আসে। জোরে শ্বাস টেনে প্রায় একই সঙ্গে সবাই বলে ওঠে, 'হো ভাগোয়ান, তেরে কিরপা।'

কিন্তু এরকম ঘটনার পরও উত্তেজনাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ভয়, উত্তেজনা বা আনন্দের অনুভূতি—সমস্ত কিছুই তাদের ক্ষণস্থায়ী। এই হাভাতেদের কাছে দুনিয়ার সব চাইতে বড় জিনিস হল পেটের ভুখ। খাদ্য ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে নষ্ট করার মতো পর্যাপ্ত সময় তাদের নেই। একটু পরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে বাগনরের ঝাড়গুলোর ওপর দলটা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাগনরের কাঁদি কাঁধে ফেলে রামনৌসেরারা যখন কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলায় ফিরে এল, সূর্য পশ্চিম দিকে নামতে শুরু করেছে।

প্রচুর বাগনর পাওয়া গেছে। ভুখা আধনাঙ্গা মানুষগুলোর চালচলনে একটা দিগ্বিজয়ের ভাব ফুটে ওঠে। যে অভিযানে তারা বেরিয়েছিল সেটা পুরোপুরি সফল।

রামনৌসেরা কলাগুলো সবাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দেয়। এক একজন যা পায় তাতে কম করে দিন দুয়েকের জন্য সবাই নিশ্চিন্ত। এই অকরুণ পৃথিবীতে পর পর দুটো দিন পেটের জন্য ভাবতে

হবে না, এমন ঘটনা হাভাতেদের জীবনে কদাচিৎ ঘটে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পাকা বাগনর দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নেয় রামনৌসেরারা। তারপর কেউ কেউ ঝুলি থেকে শুকনো তামাক পাতা আর চুন বার করে হাতের চেটোতে ডলে ডলে খৈনি বানাতে থাকে। ভরপেট খাওয়ার তৃপ্তি তাদের চোখেমুখে।

ঠোঁটের ফাঁকে খৈনি গুঁজে মাঝে মাঝে থুতু ফেলতে ফেলতে রামনৌসেরারা ধানখেতগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুসহর এবং আদিবাসী মরসুমী কিষাণেরা অবিরাম ফসল কেটে যাচ্ছে। কাল মাঠে যত ধান ছিল, আজ আর ততটা নেই। প্রতি দিনই ধানখেত অনেকটা করে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে।

যত তাড়াতাড়ি ধান উঠে যায় ততই ভাল। তা না হলে রামনৌসেরারা মাঠে নামতে পারছে না।

খুব সম্ভব এই কথাটাই সবাই ভাবছিল। টহলরাম হঠাৎ ডাকে, 'এ চাচা—'

খয়েরি রঙের খানিকটা থুতু ফেলে রামনৌসেরা সাড়া দেয়, 'কায়?' মুখ অবশ্য ফেরায় না, ধানখেতেই তার চোখ আটকে থাকে।

'পুরা ধান উঠতে ক'গো রোজ লাগবে বলতে পার?'

'হোগা দশ পন্দর রোজ।'

'এত্তে?'

'কত ধান! দশ পন্দর রোজের আগে হয় কখনও।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় টহলরাম, 'ঠিক বাত—'

ওধার থেকে পরসাদী বলে ওঠে, 'লেকেন—'

মাঠের দিকে চোখ রেখেই রামনৌসেরা শুধোয়, 'লেকেন কা রে?'

'জঙ্গল থেকে যে বাগনর নিয়ে এসেছ তাতে দো রোজ চলে যাবে। উসকা বাদ কা হোগা?'

'হো যায়গা কুছ না কুছ। ঘাবড়াও মাত।'

রামনৌসেরা বড়ই আশাবাদী। কখনও কোনো অবস্থাতেই হার মানতে বা ভেঙে পড়তে জানে না সে। অফুরন্ত আশা এতগুলো বছর তাকে এই পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রেখেছে। নিজের মধ্যেকার সেই অদম্য উজ্জ্বল আশাকে রামনৌসেরা তার চারপাশের ভাঙাচোরা ভুখা ক্ষয়াটে মানুষগুলোর বুকে বীজের মতো বুনে দিতে চায়।

দেখতে দেখতে চোখের সামনে দিনটা ফুরিয়ে যায়। লক্ষ কোটি বছরের প্রাচীন আহ্নিক গতির নিয়মে সন্ধ্যা নামে। ফসল বোঝাই করে গৈয়া এবং ভৈসা গাড়িগুলো হেলেদুলে চলে যায়। ধানখেতের উঁচু মাচায় মাচায় হ্যাজাক জ্বলে ওঠে। পাহারাদারদের চিৎকার ভেসে আসতে থাকে, 'হোঁ-শি-য়া-র—'

অঘ্রাণের বাতাস কালকের চেয়েও আজ আরো শীতার্ত হয়ে উঠেছে। রাত ক্রমশ ঘন হতে থাকে। কুয়াশায় ধানখেত, নহর, বাঁশের সাঁকো, দূরের বিল বা জঙ্গল—সব ঝাপসা হয়ে যায়।

সন্ধে নামতে না নামতেই 'ঘুর'-এর আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাত খানিকটা বাড়লে সবাই খেয়েদেয়ে আগুনের চারধারে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে।

অনেক রাতে চারদিক যখন নিশুতি, মাথার ওপর কামারপাখি আর ধানখেতে পাহারাদাররা ছাড়া অন্য কেউ জেগে নেই, সেই সময় কার ধাক্কা খেয়ে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় ধানোয়ারের। জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে সে, 'কৌন রে, কৌন?'

কালকের মতো চাপা গলায় ওধার থেকে লাখপতিয়া বলে, 'চিল্লাও মাত—'

ঘুমটা ভাঙিয়ে দিতে খেপে গিয়েছিল ধানোয়ার। বিরক্ত গলায় সে বলে, 'কা, কা চাহিয়ে?'

'কুছ নায়। একগো বাত সিরিফ—'

মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে ফিসফিস করে চাপা গলায় কী এমন বলতে চায় লাখপতিয়া! অবাক ধানোয়ার শুধোয়, 'কী এমন কথা যা সারদিনে বলতে পার নি? কাঁচা নিদটা ভাঙিয়ে দিলে!'

লাখপতিয়া জানায়, দিনের বেলা সম্ভব হয়নি বলেই রাত্তিরে ঘুম ভাঙাতে হয়েছে। সে কথা সবার সামনে ঢাকঢোল বাজিয়ে বলবার মতো নয়।

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে ধানোয়ার। বলে, 'তবে?'

গলার স্বরটা আরো কয়েক পর্দা নামিয়ে লাখপতিয়া বলে, 'রামনৌসেরা চাচা বলেছিল বাগনর সবাই সমান ভাগ করে নেবে। লেকেন চুপকে চুপকে আমি একটা কাজ করেছি।'

'কা?'

'জঙ্গল থেকে যে বাগনর এনেছি, সব ওদের দেখাই নি। ক'টা আগেই পেটের কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলাম।'

হঠাৎ ধানোয়ারের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'হামনি ভি। চার গো কেলা আমিও কাপড়ার ভেতর লুকিয়ে এনেছি।'

দেখা যাচ্ছে রামনৌসেরা প্রেরণা দেওয়া সত্ত্বেও ধানোয়ার আর লাখপতিয়া পুরোপুরি নিঃস্বার্থ এবং মহানুভব হয়ে উঠতে পারে নি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর লাখপতিয়া বলে, 'জমিনের পুরা ধান উঠতে এখনও অনেক দেরি। আমাদের কয়েক রোজ এখানে থাকতে হবে।'

ধানোয়ার বলে, 'হাঁ।'

'যদ্দিন না জমিন থেকে ধান কুড়োতে পারছি তদ্দিন তো কিছু না কিছু খেতে হবে।'

'হাঁ।'

'মনে হচ্ছে জঙ্গল থেকে সুথনি, কচুয়া, মিট্টি আলু জুটিয়ে এনে পেট ভরাতে হবে।'

'হাঁ।'

'জঙ্গলে যা মিলবে তার পুরাটাই ভাগ করে দিতে পারব না। দু'জনে লুকিয়ে কিছু রেখে দেব।'

এ বিষয়ে পুরোপুরি সায় আছে ধানোয়ারের। সে তৎক্ষণাৎ বলে, 'হাঁ—'

লাখপতিয়া কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, আচমকা তার বুড়ি সাসের গলা শোনা যায়, 'কা রে বহু, ধানবারের সাথ কী অত ফুস ফুস করছিস?'

চমকে ডাইনে তাকায় দু'জনে। লাখপতিয়ার গা ঘেঁষে ঘুমিয়ে ছিল বুড়িটা। কখন যে তার ঘুম ভেঙে গেছে আর কখন যে মুখের ওপর থেকে ধুসো কম্বল সরিয়ে কান খাড়া করে সে পুতহু আর আধচেনা ধানোয়ারের কথা শুনতে শুরু করেছে, কে জানে।

চোখের তারা স্থির করে একবার ধানোয়ার আর একবার পুতহুকে দেখতে থাকে বুড়ি আর ছুঁচের মতো সরু তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচায়, 'কী মতলব তোদের?'

'কোঈ মতলব নেহী। এখন ঘুমো।'

'নায় নায়, তোরা জরুর আমাকে ফেলে ভাগবি।'

'আমাদের সব কথা তো শুনেছিস। ভাগবার কথা বলেছি?'

'সব কথা শুনিনি।'

'যা শুনেছিস তাতে কী মনে হল—ভাগব? কা রে বুড়হি?'

বুড়ি উত্তর না দিয়ে শুধোয়, 'জোয়ানী আওরত হয়ে কেন তাহলে পুরুখটার সাথ মাঝ রাতে ফুস ফুস করছিস? রামচন্দজিকা কহানী শোনাচ্ছিলি একজন অরেকজনকে?' বলেই আচমকা হাউমাউ করে মড়াকান্না জুড়ে দেয়।

লাখপতিয়া এবং ধানোয়ার ভয়ানক চমকে ওঠে। লাখপতিয়া ব্যস্তভাবে বলে, 'রো মাত, রো মাত। সব কোঈকো নিদ টুটেগা—'

বুড়ির কান্না থামে না। অগত্যা তাকে নিজের কম্বলের তলায় ঢুকিয়ে বুকের ভেতর জড়িয়ে লাখপতিয়া গাঢ় গলায় সমানে বলতে থাকে, 'তোকে ফেলে আমি কি ভাগতে পারি? মন হলে কবে ভাগতে পারতাম। কাঁদে না, কাঁদে না—'

বুড়ি হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করতে করতে বলে, 'তুই কোনো পুরুখের সাথ কথা বললে আমার ডর লাগে। কী বলছিলি ধানবারকে?'

'যা বলছিলাম তাতে তোর ডরাবার কিছু নেই। ঘুমো এখন, ঘুমো—'

গোঙানির মতো শব্দ করে কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে বুড়ি। লাখপতিয়ার চোখও ভারি হয়ে আসে।

ওধারে ধানোয়ারও মাথার ওপর কম্বল টেনে দিয়েছিল। এমনিতে কোনোরকমে একটু শুতে পারলেই মোষের মতো ভোঁস ভোঁস করে তার নাক ডাকতে থাকে। কিন্তু এখন কিছুতেই ঘুম আসছে না।

মাথার ওপর কামারপাখিরা মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে। ধানখেত থেকে ঘুমন্ত গলায় পাহারাদাররা এক একবার হুঁশিয়ারি দিচ্ছে।

'ঘুর'-এর আগুন নিভে এসেছিল। উঠে গিয়ে খানকতক শুখা কাঠ তাতে গুঁজে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে ধানোয়ার। কিন্তু এবারও ঘুম আসছে না।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, হঠাৎ পায়ের দিক থেকে ছনেরির ভাঙা ভাঙা জড়ানো গলা কানে আসে 'এ লছমনিয়া—'

লছমন ঘুমজড়ানো গলায় সাড়া দেয়, 'কা রে? হুয়া কুছ?'

'নেহী।'

'তবে ঘুমটা ভাঙালি কেন?'

ছনেরি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'আমি একটা কথা ভেবে দেখলাম—'

'কা?' লছমন আগ্রহ দেখায়।

'তু ভাগ যা—'

'ভাগেগা। কায়?'

'কেত্তে রোজ তুই আমাকে পিঠে চড়িয়ে চড়িয়ে ঘুরে বেড়াবি? হামনিকে লিয়ে তুহারকা বহোত তখলিফ—'

'তখলিফ তো কা?'

'ইয়ে ঠিক নেহী। তু চলা যা—'

'কঁহা যায়েগা?'

'যাঁহা তুহারকা মর্জি।'

লছমন বলে, 'আমি চলে গেলে তোর কী হবে?'

ছনেরি বলে, 'বরাতে যা আছে তাই হবে। আমার জন্যে জীওনটা বরবাদ করবি কেন?'

আরো কী বলতে যাচ্ছিল ছনেরি, তাকে থামিয়ে দিয়ে লছমন বলে, 'চুপ হো, চুপ হো। কী করতে হবে আমি জানি।' বলে মুখের ওপর কম্বল টেনে পাশ ফেরে লছমন।

ছনেরি আর কিছু বলে না। জোরে শ্বাস ফেলে মাথামুখ ঢেকে ঘুমিয়ে পড়ে।

আর পাঁচ হাত তফাতে শুয়ে শুয়ে ধানোয়ার দুই আওরতের কথা ভাবতে থাকে। লাখপতিয়ার শাশুড়ি সর্বক্ষণ ছেলের বউয়ের দিকে গিধের মতো তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। দিবারাত্রি তার ভয়, এই বুঝি পুতহুটা তাকে ফেলে কোনো পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গেল। আর ছনেরি? এই পঙ্গু বে-সাহারা মেয়েটা তার দুর্বহ দায়িত্ব থেকে লছমনকে মুক্তি দিতে চাইছে। তার জন্য জগতের কেউ কষ্ট পাক তা সে চায় না।

অসহায় ছনেরির জন্য অপার সহানুভূতিতে মন ভরে যায় ধানোয়ারের। হো রামজি, হো কিষুণজি।

আট

পরের দিন দুপুরে কালোয়া (দুপুরের খাবার) খেয়ে হাভাতের দল আদিগন্ত ধানখেতের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। রোজই এই সময়টা তারা এইভাবেই ধানকাটা দেখে। আর ভাবে, কবে যে মাঠভরা এত শস্য জমি মালিকের খলিহানে গিয়ে উঠবে!

ধানোয়ার ঝোলা হাতড়ে একটা আধপোড়া বিড়ি বার করে ধরিয়ে নিয়েছে। মাঝে মাঝে অসীম তৃপ্তিতে ফুক ফুক করে সেটা টেনে নাক মুখ দিয়ে নীলচে ধোঁয়া বার করছে। তবে রামনৌসেরা, টহলরাম বা অন্য কারুর বিড়ির শখ নেই, তামাক আর চুন বাঁ হাতের তেলোয় ডলে ডলে খৈনি বানিয়ে ঠোঁট এবং নিচের পাটির দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিচ্ছে। শুধু পুরুষরাই না, মেয়েরাও। খানিকক্ষণ পর পর পিচিক করে কালচে থুতু ছিটিয়ে চারপাশ ভরে ফেলছে।

পরসাদীর কাছে তামাক চুন কিছুই নেই। কিন্তু দশ বছর বয়স থেকেই খৈনি খেয়ে খেয়ে নেশাটা পাকা করে তুলেছে। কেউ খৈনি বানাতে বসলেই সে কাছে গিয়ে হাত পাতে। নেশার জিনিস দিতে কেউ আপত্তি করে না। আজ ফির্তুলাল তাকে খৈনি দিয়েছে।

সূর্য এখন খাড়া মাথার ওপর নেই। পশ্চিম আকাশের দিকে খানিকটা নেমে গেছে। শেষ অঘ্রাণের রোদ দ্রুত ঘন হয়ে যাচ্ছে। উত্তুরে হাওয়া ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। এক ঝাঁক জলচর লাল হাঁস বাতাস চিরে চিরে পেছনের বিলের দিকে উড়ে গেল।

অন্য সব দিনের মতোই সামনের পাক্কী দিয়ে লৌরি, বাস, গৈয়া আর ভৈসা গাড়ি এবং সাইকেল রিক্‌শার স্রোত চলেছে। চারপাশের পৃথিবীতে কিছুই থেমে নেই। মানুষ, পাখি, পোষমানা জানোয়ার থেকে শুরু করে সব কিছুই সরব, সচল। বিপুল বেগে বিশাল পৃথিবী ছুটে চলেছে। শুধু নিশ্চল অনড় কাঁচা সড়কের ধারের ক'টা ভুখা নাঙ্গা নিরন্ন মানুষ। এই বিপুল বিশ্বে শস্যক্ষেত্রের পাশে অন্তহীন আগ্রহ নিয়ে অঢেল পাকা ধানের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ নেই যেন।

আচমকা পরসাদী চিৎকার করে ওঠে, 'হুই দেখো, দেখো—' বলেই পাক্কীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

সবাই চমকে পরসাদীর আঙুল বরাবর তাকায়। পাকা সড়ক থেকে পনের ষোল জনের একটা দল কাচ্চীতে নেমে এদিকে আসছে। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়, ওরা তাদেরই মতো হাভাতে। এ জাতীয় মানুষগুলির গায়ে এমন একটা ছাপ এবং গন্ধ থাকে যে দেখেই চিনে ফেলা যায়।

লাখপতিয়ার শাশুড়ি রোদ ঠেকাবার জন্য ভুরুর ওপর হাত রেখে দেখছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'নয়া হিস্যাদার। জরুর ভাতের তালাশে এখানে এসেছে। কা হোগা হামনিকো? ক'গো ধান মিলেগা এক এক আদমীকো? হো বহু—' ধানের নতুন ভাগীদারদের দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে বুড়ি।

লাখপতিয়া বলে, 'চুপ হো যা। ওরা আসুক না। ডরনেকো কা হ্যায়? বুঝিয়ে সুঝিয়ে অন্য জমিনে পাঠিয়ে দেব।'

'যদি না যায়?'

'যাবে যাবে। জরুর যায়েগা। আগের বার যারা এসেছিল তাদের ভাগিয়ে দেওয়া হল না?'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই দলটা এসে পড়ে। এবং কড়াইয়া গাছগুলোর তলাতেই লাখপতিয়াদের কাছাকাছি ঝোলাঝুলি নামিয়ে বসে যায়।

ধানোয়ার দুই হাঁটুর ভেতর থুতনি গুঁজে লোকগুলোকে লক্ষ করতে থাকে। পনের ষোলজনের এই দলটার মধ্যে রয়েছে এক সাপুড়ে আর তার এক সঙ্গিনী—খুব সম্ভব জেনানাই হবে। সাপুড়েটা বেজায় ঢ্যাঙা, বাজে- পোড়া তালগাছের মতো চেহারা। লালচে জটপাকানো চুল কাঁধ ছাপিয়ে নেমে এসেছে, মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি। পরনে পোকায়-কাটা জামার ওপর ময়লা ধুলোভর্তি কম্বল আর লুঙ্গি। লোকটার বয়স পঞ্চাশের মতো। দুই পায়ের চামড়া ফেটে ফেটে হাঁ হয়ে আছে। পায়ের চেহারা দেখেই বোঝা যায়, পঞ্চাশ বছরের জীবনে কম করে পঞ্চাশ হাজার মাইল সে হেঁটেছে। তার গা থেকে

দুর্গন্ধ উঠে এসে আশেপাশের বাতাসে ছড়িয়ে যেতে থাকে। টের পাওয়া যায়, দু-এক বছরের ভেতর সে স্নানটান করে নি।

তার জেনানা রোগা হাড্ডিসার ক্ষয়াটে চেহারার আওরত। মুখভর্তি কালো কালো চেচকের (বসন্ত) দাগ। তার চুলও স্বামীর মতোই জট পাকিয়ে গেছে। বহুকাল সেগুলোর সঙ্গে তেল জল বা কাকাইয়ের সম্পর্ক নেই। নাকে ছোট চাকার মতো চাঁদির নাথুনি (নথ) ছাড়া সারা গায়ে ধাতুর চিহ্ন নেই। ট্যারাবাঁকা দাঁতে হলুদ রঙের সর পড়ে আছে। তার সঙ্গীর মতো তারও গা থেকে কদর্য গন্ধ বেরিয়ে আসছে।

দু'জনেই সাপের ঝাঁপি বাঁকে বসিয়ে কাঁধে করে নিয়ে এসেছে। এর থেকেই আন্দাজ করা গেছে তারা স্বামী-স্ত্রী।

সাপুড়ে ছাড়া আছে এক বান্দরবালা। খাটো চেহারা তার। মাথার মাঝখানটা স্রেফ ফাঁকা, ধার ঘেঁষে কানের ওপর দিয়ে কাঁচা পাকা চুলের ঘের। লম্বা মুখ তার, ঘোলাটে চোখ। শুয়োরের কুচির মতো খাড়া খাড়া দাড়ি গোঁফ। কালো ডোরা দেওয়া সবুজ জামা আর চাপা পাজামা তার পরনে। মাথায় গামছা জড়ানো। তার বাঁদর দুটোর গায়েও মালিকের মতো একই পোশাক। লোকটা নির্ঘাত মাদারী খেলোয়াড় না হয়ে যায় না। বাঁদর ছাড়া তার সঙ্গে রয়েছে পুরনো রং-চটা ঢাউস টিনের বাক্স। ওটা সে মাথায় করে নিয়ে এসেছে। বাক্সটার মধ্যে নিশ্চয়ই তার যাবতীয় সম্পত্তি রয়েছে। তাদের মতো মানুষেরা নিজস্ব জাগতিক সমস্ত কিছুই এভাবে কাঁধে চাপিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক শস্যক্ষেত্র থেকে আরেক শস্যক্ষেত্রে সুদূর আদিম কোন অতীত থেকে অনবরত ছুটে বেড়াচ্ছে।

ডানদিকের এক জোড়া পুরুষ এবং আওরতও সবার চোখে পড়ছে। বিশেষ করে মেয়েমানুষটার দিকে তাকালে নজর সরানো যায় না। মাজা মাজা গায়ের রং, গোল মুখ। না-খাওয়া চেহারা হলে কী হবে, তার তাকানোতে বিজরির চমক যেন। দুই ভুরুর মাঝখানে সাপের উল্কি। হাতেও নানারকম ছবি আঁকা রয়েছে— যেমন পালকি, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তামাটে রুক্ষ চুল চুড়ো করে বেঁধে একটা ভাঙা কাঠের কাকাই গুঁজে দিয়েছে। খাড়া নাক, পাতলা সরু কোমর। পেটে দু'বেলা ভাত পড়লে আর শরীর ভরে উঠলে তুড়ি মেরে মেরে দুনিয়া জুড়ে লোমহর্ষক নানা কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারত সে।

আওরতটার সঙ্গে যে ভোলাভালা সাদাসিধা চেহারার পুরুষটা রয়েছে, এক নজরেই বোঝা যায় সে একটা আস্ত ভেড়ুয়া। মেয়েমানুষটার হুকুম তামিল করার জন্য সে অকাতরে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

আর রয়েছে রুখা-শুখা চেহারার আধবুড়ো লম্বা একটা লোক। তার মাথার আধাআধি সাদা হয়ে গেছে। কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় বসে কোনোদিকে তাকাচ্ছে না সে, মুগ্ধ চোখে পলকহীন ধান দেখে যাচ্ছে। আদিগন্ত ফসলের জমি তাকে মুহূর্তে জাদু করে ফেলেছে যেন।

এ ক'জন ছাড়াও রয়েছে আরো ক'টা পুরুষ এবং বাচ্চা-কাচ্চা সমেত ছ'সাতটা মেয়েমানুষ।

মাদারী খেলোয়াড় তার ঝোলা হাতড়ে ঘাটো (মকাইসেদ্ধ) বার করে প্রথমে তার বাঁদরদুটোকে খেতে দেয়। তারপর নিজে একমুঠো মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে ধানোয়ারদের উদ্দেশে বলে, 'কেত্তে রোজ তোমরা এখানে এসেছ?'

কেউ উত্তর দেয় না। দু চোখে তীব্র বিদ্বেষ আর সন্দেহ নিয়ে নতুন দলটাকে দেখতে থাকে।

এদিকে মাদারী খেলোয়াড়ের মতো অন্য পুরুষ এবং মেয়েমানুষগুলোও ঝোলাঝুলি খুলে বাসি রুটি, ছাতু ইত্যাদি বার করে খেতে শুরু করেছে। খেতে খেতে আড়ে আড়ে তারা ধানোয়ারদের দেখতে থাকে।

মাদারী খেলোয়াড় ফের জিজ্ঞেস করে, 'কা, জরুর ধানের তালাশে এসেছ?'

কেউ যখন জবাব দিচ্ছে না তখন সবার তরফ থেকে রামনৌসেরাই বলে ওঠে, 'হাঁ।' এতগুলো মানুষের ভেতর একমাত্র তারই নতুন ভাগীদারদের সম্পর্কে বিরূপতা নেই। জগতের সব কিছুই

বিরাগশূন্য শান্ত নিরুত্তেজ মনে সে মেনে নিতে জানে। তার মধ্যেকার উদারতা এবং জীবনের নানা অভিজ্ঞতাই তাকে এসব মানতে শিখিয়েছে।

'মালুম হোতা, আভিতক ধান নায় মিলী।'

'ক্যায়সে মিলেগা! দেখছ না ধানকাটাই চলছে। সব ধান না উঠলে পেহ্‌রাদার পহেলবানেরা কি কাউকে জমিনে নামতে দেয়!'

'ও তো ঠিক বাত।' আস্তে আস্তে মাথা দোলায় মাদারী খেলোয়াড়।

একটু চুপচাপ।

তারপর রামনৌসেরা শুধোয়, 'তুমনিলোগ কঁহাসে আতা হ্যায়?'

মাদারী খেলোয়াড় জানায়, তারা কেউ একদিক থেকে আসছে না। কেউ আসছে উত্তর থেকে, কেউ পুব থেকে, কেউ বা পশ্চিম থেকে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় তাদের জান-পয়চান হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটা অবিকল ধানোয়ারদের মতোই।

রামনৌসেরা এবার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি তো মাদারীকা খেল দেখাও—'

'হাঁ—' মাদারী খেলোয়াড় ঘাড় কাত করে, 'বড় বড় গাঁও আউর বড় বড় হাটিয়ায় দেখিয়ে বেড়াই—'

'তা থেকেই তো কামাই হয়।'

চোখ কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে মাদারী খেলোয়াড়। তারপর সন্দিগ্ধভাবে বলে, 'তা হয়।'

রামনৌসেরা বলে, 'তা হলে ধানের তালাশে এসেছ কেন?'

'দরকার না হলে কি আর এসেছি? সিরিফ পেটকা লিয়ে—'

রামনৌসেরা জোরে জোরে ঘাড় দোলায়, 'সমঝ গিয়া—'

এধার থেকে সপেরা বা সাপুড়ে হঠাৎ বলে ওঠে, 'হামনিকো ভি একহী হাল—'

রামনৌসেরা তার দিকে ঘাড় ফেরায়, 'কা?'

'আমরাও পেটের জন্যেই এসেছি।'

নতুন দলটার বাকি সকলেও এখানে আসার কারণ হিসাবে একই কথা বলে।

গভীর বিতৃষ্ণা নিয়ে ওদের কথা শুনছিল ধানোয়াররা। আচমকা গালপোড়া টহলরাম বলে ওঠে, 'এ সপেরা ভেইয়া—'

সাপুড়ে লোকটা মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কা?'

'একগো বাত—'

'কহো না—'

টহলরাম এবার সেই পুরনো যুক্তিটা খাড়া করে যা বলে তা এই রকম। তারা পঁচিশ ছাব্বিশটা লোক আগে থেকেই এসে বসে আছে। তার ওপর নতুন দলটাও যদি থেকে যায় মাথা পিছু ক'টা করে ধানের দানা আর জুটবে? কাজেই সপেরারা যদি অন্য জমিতে চলে যায় সবার পক্ষেই ভাল। এক জায়গায় পড়ে থেকে কামড়াকামড়ি করে লাভ নেই। এই যুক্তিতেই আগের একটা দলকে পাক্কীর ওধারে পাঠিয়ে দিয়েছিল তারা, ইত্যাদি।

সপেরা পালটা যুক্তি খাড়া করে বলে, 'এত্তে বড়ে জমিন, কেত্তে কেত্তে ধান হুয়া। হামনিলোগ পন্দর বিশ আদমী ইঁহা রহ্ যানেসে তুমনিকো কোই নুকসান নায় হোগা—'

টহলরামের পাশ থেকে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ফির্তুলাল চেঁচিয়ে ওঠে, 'জরুর নুকসান হোগা। তোমরা পাক্কীর ওধারে চলে যাও। ওখানে বহোত ধান হয়েছে—'

'নায় ভেইয়া, আমরা এখানেই থেকে যাই। আমরা এক এক আদমী দশ রোজ বিশ রোজ হেঁটে এখানে এসেছি। শরীর থকে গেছে। আর পা চলছে না।' সপেরা ফির্তুলালকে বোঝাতে থাকে, সুবিশাল এই শস্যক্ষেত্রে ফসল উঠে যাবার পরও যা ঝড়তি পড়তি ধান পড়ে থাকবে ফির্তুলালেরা পুরো সাল চেষ্টা করলেও সব কুড়িয়ে নিতে পারবে না। সপেরারা ক'টা আদমী থাকলে তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি নেই।

টহলরাম কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হাড্ডিসার সখিলালের রোগা দুব্‌লা বউ সাগিয়া ধারাল সরু গলায় চিৎকার করে, 'নেহী, নেহী—'

সবাই চমকে ওঠে। সপেরা শুধোয়, 'কা হুয়া?'

'তোমরা এখানে থাকবে না। জরুর ইধরসে চলা যাওগে। আভ্‌ভি যাওগে—'

শুখা লকড়ির মতো চেহারা সাগিয়ার। সে যে এভাবে চেঁচাতে পারে, আগে টের পাওয়া যায়নি।

নতুন দলটা হকচকিয়ে যায়। কিন্তু সেই আওরতটা যার চোখে বিজরির চমক, ভুরুর মাঝখানে সাপের উল্কি, এক লাফে উঠে দাঁড়ায়। মাটিতে সতেজে লাথি মারতে মারতে দু হাত নেড়ে নেড়ে বলে, 'কায়, কায় যাউঙ্গী হামনিলোগ?'

সাগিয়াও দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। কোমরে হাত রেখে ঘাড় বাঁকিয়ে লড়াইয়ের ভঙ্গিতে বলে, 'জরুর যাবি।'

নতুন দলের মেয়েমানুষটা দৌড়ে এসে সাগিয়ার মুখোমুখি রুখে দাঁড়ায়। তার চোখ দপ দপ করতে থাকে। গলার স্বর দশ পর্দা উঁচুতে তুলে চিল্লায়, 'কেন যাব, কেন? এটা তোর বাপের জায়গা?'

সাগিয়া তার গলার স্বর আরো উঁচুতে তোলে, 'আমরা আগে এসেছি রে ভূচ্চর রেণ্ডী আওরত। আমরা এখানে থাকব। তোরা ভাগ, ভাগ ইধরসে—'

'তু রেণ্ডী, তুলোগনকা মাঈ রেণ্ডী, দাদী রেণ্ডী, নানী রেণ্ডী। আগে এসেছিস বলে এ জমিন কিনে নিয়েছিস? কুত্তীকা বচ্চে, শাঁখরেল কঁহাকা—'

'তুলোগন শাঁখরেল, তকুলোগকান মাঈ, দাদী, নানী—'

যে শস্য এখনও পাওয়া যায়নি তার আগাম ভাগাভাগি নিয়ে এক দুর্ধর্ষ মহাযুদ্ধের ভূমিকা হিসেবে দুই হাভাতের দলের দুই মেয়েমানুষের মধ্যে অনবরত অশ্লীল খিস্তির আদান প্রদান চলতে থাকে. দু'জনেই বনভৈঁসীর মতো ফুঁসছিল। হয়ত পরস্পরের ওপর তারা ঝাঁপিয়েই পড়ত কিন্তু তার আগেই রামনৌসেরা এবং আরো জনকয়েক দৌড়ে এসে তাদের তফাতে সরিয়ে নিয়ে যায়। রামনৌসেরা বলে, 'কা হোতা হ্যায়? কী করছ তোমরা? দিমাগ কি বিলকুল গড়বড় হয়ে গেল? হামনিলোগন ভুখা গরিব আদমী। সবাই এখানে ভাতের জন্যে এসেছি। নয়া আদমীরা যদি এখান থেকে না যেতে চায়, কী করা যাবে? রহনে দো। জবরদস্তি কুছ নায় হোগা।'

রামনৌসেরা যা বলেছে তার ভেতর ফাঁক নেই। সত্যিই তো নতুন দলের মানুষগুলো যদি পাক্কীর ওধারে না যেতে চায় গায়ের জোরে তাদের হটানো যাবে না। সাগিয়ারা কিন্তু খুশি হয় না, সমানে গজর গজর করতে থাকে।

আর নতুন দলের মানুষগুলো নিজেদের মধ্যে ঘাড় গুঁজে কিছুক্ষণ কী পরামর্শ করে। তারপর ঝোলাঝুলি কাঁধে বা মাথায় চাপিয়ে দূরে নহরটার ওপারে চলে যায়। ওখানে কয়েকটা সাগুয়ান এবং পরাস গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। দলটা তার তলায় গিয়ে বসে। একেবারে প্রথম থেকেই যাদের এত আপত্তি এত দুশমনি তাদের কাছাকাছি থাকা ঠিক নয়।

এদিকে কড়াইয়া গাছগুলোর তলা থেকে নিরুপায় সাগিয়ারা হিংস্র চোখে নতুন মানুষগুলোকে দেখে আর কিভাবে তাদের এই রাজত্ব থেকে ভূচ্চবের ছৌয়াগুলোকে উৎখাত করবে তার পরিকল্পনা করতে থাকে।

নয়

দুপুরে নতুন হাভাতের দলটার সঙ্গে ধানোয়ারদের যে তুমুল ঝগড়া হয়েছিল তা ক্ষণস্থায়ী। সন্ধের পরই তা মিটে গিয়ে দু পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়ে যায়। ঘটনাটা এইরকম।

অন্য দিনের মতোই পশ্চিম দিগন্তের তলায় সূর্য ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভৈসা আর গৈয়া ...আজও ধান বোঝাই করে পাক্কীর দিকে চলে গিয়েছিল। আর আকাশ থেকে পৌষ মাসের

তীব্র হিম নামতে শুরু করেছিল।

হিমের দাপট থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য যথারীতি 'ঘুর' জ্বালিয়ে নিয়েছে ধানোয়াররা এবং সেটা ঘিরে সবাই গোল হয়ে বসে হাত পা সেঁকছে।

নহরের ওপাশে সাগুয়ান আর পরাস গাছগুলোর তলায় পৌষের গাঢ় কুয়াশাতেও আবছাভাবে আগুন চোখে পড়ছে। বোঝা যায়, নতুন দলটাও 'ঘুর' জ্বালিয়ে নিয়েছে।

রাত একটু বাড়লে যখন মাটির গভীর তলদেশে ঝিঁঝিদের অশ্রান্ত বিলাপ শুরু হয়, সারাদিন ঝিমোবার পর কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর গোপন গর্তে কামারপাখিরা জেগে উঠে কর্কশ গলায় চেঁচাতে থাকে, ঠিক সেই সময় সাগিয়ার বড় ছেলেটা হঠাৎ পেটে হাত চেপে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়।

সাগিয়া চমকে উঠে ছেলের দিকে ঝুঁকে শুধোয়, 'কা রে, কা হুয়া? হুয়া কা?'

'পেটমে বহোত দর্দ—' বলতে বলতে ছেলেটার ছোট শরীর যন্ত্রণায় বেঁকে যেতে থাকে। মুখচোখ নীল হয়ে যায়।

সাগিয়া এবং সখিলাল ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। তারা কী যে করবে, বুঝে উঠতে পারে না। আচমকা সাগিয়াও ছেলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মড়াকান্না জুড়ে দেয়। আর সখিলাল উদ্‌ভ্রান্তের মতো একবার রামনৌসেরাকে, একবার লাখপতিয়া এবং তার বুড়ি সাসকে শুধোতে থাকে, 'দর্দমে বচ্চে মর যাতা। কা করে হামনি? কা করে?'

রামনৌসেরা কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। তাদের ভেতর কেউ বৈদ টৈদ (কবিরাজ) নেই যে ওষুধের ব্যবস্থা করে ছেলেটার যন্ত্রণা কমিয়ে দেবে। বাচ্চাটার কাছে এগিয়ে এসে তারা অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

এই সময় দেখা যায়, একটা মশাল জ্বালিয়ে নহরের ওধারে থেকে কারা যেন এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতে দেখা যায়, ওরা মোট চারজন। তিনটে পুরুষ, একটা আওরত। ওদের মধ্যে সপেরা আর মাদারী খেলোয়াড় ছাড়া সেই লোকটাও রয়েছে, দুপুরে ঝগড়ার সময় যে একটা কথাও বলে নি, সারাক্ষণ মুগ্ধ পলকহীন চোখে ধানখেতের দিকে তাকিয়ে বসে থেকেছে। মেয়েমানুষটি হল সেই ছমকী আওরত; হাত-পা নেড়ে কুৎসিত অশ্লীল গালিগালাজে সে বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছিল।

ওরা যে দৌড়ে আসবে, কেউ ভাবতে পারে নি। রামনৌসেরা অবাক হয়ে শুধোয়, 'তোমরা!'

সপেরা বলে, 'হাঁ। কা হুয়া? কান্না শুনে বসে থাকতে পারলান না, চলে এলাম।'

রামনৌসেরা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেয় কী হয়েছে।

এবার সাগিয়ার ছেলেটাকে ঘিরে বসে সপেরা এবং তার সঙ্গীরা। সেই লোকটা যে দুপুরে জগৎ-সংসার ভুলে ধান দেখছিল, তীক্ষ্ণ চোখে ছৌয়াটার পেট টিপে টিপে কী লক্ষ করতে থাকে। ছেলেটা যন্ত্রণায় সমানে চিৎকার করে যায়।

রামনৌসেরারা বিপুল আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

লাখপতিয়ার শাশুড়ি জড়ানো গলায় শুধোয়, 'কা, তুমনি বৈদ হো?'

মুখ না ফিরিয়ে গভীর আত্মবিশ্বাসে লোকটা বলে, 'তা বলতে পার। থোড়াকুছ 'দাওয়া-উয়া' আমি দিতে পারি।'

সাগিয়া লোকটার হাত ধরে বলে, 'ভেইয়া, আমার ছেলেটার দর্দ কমিয়ে দাও। বহোত কষ্ট পাচ্ছে।'

'কোসিস জরুর করেগা।' বলে লোকটা চারপাশের জটলার দিকে তাকায়, 'দুফারে ওধারে একটা জঙ্গল দেখেছিলাম। ওখানে যেতে হবে। আমার সাথ দু-একজন চল—'

রামনৌসেরা শুধোয়, 'এত রাতে জঙ্গলে কেন?'

লোকটা জানায়, কিছু পাতা এবং শেকড় নিয়ে আসতে হবে। ওষুধের জন্য দরকার। বলে, 'বসে না থেকে জলদি চল।'

লোকটার সঙ্গে সপেরা, মাদারী খেলোয়াড়, সখিলাল, ধানোয়ার এবং সেই প্রচণ্ড ঝগড়াটি মুখরা ছমকী মেয়েমানুষটা পর্যন্ত মশাল জ্বালিয়ে জঙ্গলে চলে যায়।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাটির তলা থেকে একটা ছোট গাছের শিকড় আর একটা বুনো লতার গা থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে দলটাকে সঙ্গে করে কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ফিরে আসে লোকটা। পাতাগুলোতে উগ্র ঝাঁঝাল গন্ধ। শিকড়টা ছেঁচে কয়েক ফোঁটা রস তক্ষুনি সাগিয়ার ছেলেটাকে খাইয়ে দেয় লোকটা আর এক টুকরো পাথরে পাতাগুলো বেটে থকথকে করে পেটে প্রলেপ লাগিয়ে দেয়।

একটু পরেই ছেলেটা হড়হড় করে বমি করে ফেলে। তীব্র দুর্গন্ধওলা অজীর্ণ কুখাদ্য পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।

বমিটা হয়ে যাবার পর কষ্ট কমে যায় ছেলেটার। সাগিয়া তার মুখ ধুয়ে কম্বল দিয়ে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দেয়। অনুচ্চ অস্পষ্ট শব্দ করে গোঙাতে গোঙাতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে ছেলেটা।

লোকটা নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে এবার বলে, 'অব ঠিক হো যায়েগা।'

রামনৌসেরা জিজ্ঞেস করে, 'কা হুয়া থা বচ্চেকো?'

লোকটা জানায়, নিশ্চয়ই বহুদিন ছেলেটার পেটে ভাত, রুটি বা ভাল সবজি পড়েনি। দিনের পর দিন অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে পাকস্থলীর সর্বনাশ হয়ে গেছে। কাজেই সে যা খেয়েছে তা হজম করতে পারছিল না। পেটে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল। অজীর্ণ খাদ্য বার না করে দিলে ছেলেটা আরো কষ্ট পেত। দাওয়া দিতে 'উলটি' (বমি) হয়েছে। এখন নিদটা ভাল হলে সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে।

লোকটার কাছে সাগিয়া এবং সখিলালের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তার হাত ধরে সখিলাল বলে, 'তুমি না এলে আমার ছৌয়াটা জরুর মরে যেত। তুমি ওকে বাঁচিয়েছ। রামচন্দজি কিষুণজি তোমার ভালাই করবে।'

লোকটা হেসে হেসে এবার যা বলে তা এই রকম। তারা নিরন্ন ভুখা নাঙ্গা মানুষ, সখিলালরাও তা-ই। একজন বিপদে পড়লে আরেক জনের তো দৌড়ে যেতেই হয়। গুছিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে ঠিক এই কথাগুলো সে বলে নি, বা বলতে পারে নি। তার এলোমেলো অবিন্যস্ত কথাগুলো সাজিয়ে নিলে এই রকমই দাঁড়ায়।

এদিকে সাগিয়া সেই মেয়েমানুষটাকে বলতে থাকে, 'তুমি আমার বাচ্চার জন্যে এই জাড়ে কত তখলিফ করলে, অন্ধেরা রাতে 'পুরুখ'গুলোর সাথ জঙ্গলে 'দাওয়া' আনতে গেলে। আর আমরা কিনা দুফারে বুরা গালি দিয়ে ঝগড়া করে তোমাদের ভাগালাম। মনে গুস্‌সা রেখো না—'

ছমকী মেয়েমানুষটা হঠাৎ খুবই মহানুভব আর উদার হয়ে যায়। বলে, 'নেহী নেহী। দুফারকা বাত ছোড় দো। যো হো গিয়া, সো হো গিয়া—'

রামনৌসেরা সপেরাকে বলে, 'তোমরা আর আমরা একই ফিকিরে এখানে এসেছি। সিরেফ ভাতকা লিয়ে। ফারাকে থেকে কা ফায়দা? তুমনিলোগ ইহাঁ চলা আও।'

সপেরা একটু চিন্তা করে বলে, 'ঠিক হ্যায়। লেকেন বহোত রাত হয়ে গেছে। আজ থাক। কাল সুবে সুবে চলে আসব।'

তার দলের বাকি সবাই এতে সায় দেয়। তারপর উঠে নহর পেরিয়ে ওপারে সাগুয়ান আর পরাস গাছগুলোর তলায় চলে যায়।

পরের দিন পৌষের সূর্য উঠতে না উঠতেই নহরের ওধার থেকে অস্থায়ী আস্তানা তুলে নতুন হাভাতের দলটা এপারে এসে রামনৌসেরাদেব সঙ্গে মিশে যায়।

দশ

নতুন মানুষগুলোর সঙ্গে আলাপ জমে উঠতে দেরি হয় না। একে একে সবার পরিচয়ও জানা যায়।

যে লোকটা বৈদের মতো জঙ্গল থেকে পাতা এবং শেকড় খুঁজে এনে সাগিয়ার ছেলেকে বাঁচিয়েছে তার নাম মুনোয়ারপ্রসাদ। জাতে গাঙ্গোতা, তার বাড়ি কুশী নদীর পাড়ের এক গাঁয়ে। ঝাড়া হাত-পা

আদমী, জগৎ-সংসারে তার নিজের বলতে কেউ নেই।

সপেরার নাম জগলাল, তার বউ হল রামিয়া। ছেলেপুলে নেই। বছরের বেশির ভাগ সময় সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখিয়ে এবং পূর্ণিয়ার সরকারি অফিসে সাপের বিষ বেচে কোনোরকমে পেট চালায়। কিন্তু অঘ্রান পুষ বা মাঘ, এই তিনটে মাস তাদের কাছে বড়ই দুঃসময়। পৃথিবীর যাবতীয় সাপ এই সময়টা শীতকালীন ঘুমের জন্য মাটির গভীর তলদেশে চলে যায়। তখন তাদের খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়। এই সময়টা কিছুদিনের জন্য তারা ধানখেতের পাশে এসে বসে। ফসল উঠে যাবার পর যে ঝড়তি পড়তি শস্য পড়ে থাকে, মাঠকুড়ানিদের সঙ্গে ভিড়ে সে সব কুড়িয়ে নিয়ে যায়। পেটের ব্যাপারে কয়েকটা দিন নিশ্চিন্ত হতে পারা তো সহজ কথা নয়।

মাদারী খেলোয়াড় হরসুখ দোসাদ মুক্ত পুরুষ। দুটো বাঁদর ছাড়া তারও কেউ নেই। হরসুখের ঘর সাহারসার কাছে এক গাঁয়ে। তবে বাপ-দাদার ভিটের সঙ্গে তার সম্পর্ক সামান্যই। বাঁদর দুটোকে নিয়ে 'মাদারীকা খেল' দেখাতে দেখাতে এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে, এক টৌন থেকে আরেক টৌনে, এক জেলা থেকে আরেক জেলায় টহল দিয়ে বেড়ায়। যেখানে রুজিরোজগার, যেখানে পেটের দানা, সেখানে না গিয়ে উপায় কী? খেলা দেখিয়ে দিনের শেষে কোনো গাছের নিচে বা হাটের চালায় চলে যায় তিন জনে। ওখানেই ইট বা পাথরের টুকরো দিয়ে চুল্‌হা বানিয়ে লিট্টি কি চাপাটি সেঁকে নেয়। তারপর তিন জনে খেয়ে দেয়ে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে আবার তারা দূর গাঁও কি টৌনে পাড়ি জমায়।

দুই বাঁদর এবং হরসুখের মধ্যে খুবই বনিবনা। তিন জনের সংসারে এক ছিটে অশান্তি নেই। একই খাদ্য তারা ভাগজোখ করে খায়। হরসুখ দু-তিন সাল পর পর লম্বা লম্বা ধারি-দেওয়া মোটা কাপড় কিনে নিজের জন্য পা-চাপা পায়জামা আর ঢোলা কামিজ বানিয়ে নেয়। বাঁদর দুটোকে ওই কাপড়েরই জামা করিয়ে দেয়।

'মাদারীকা খেল' দেখিয়ে সালভর তিন জনের পট চলে না। আট মাস তবু একরকম কেটে যায়। কিন্তু বাকি চারটে মাস হরসুখদের বড় কষ্ট। বিশেষ করে 'বারীষের' আড়াইটা মাস কামাই একেবারে বন্ধ। মাঠঘাট যখন ডুবে যায়, কাচ্চীগুলো গলে থকথক করে, তখন মাইলের পর মাইল দুর্গম পথের কাদা ঠেলে কোথায় যাবে হরসুখ? এই আড়াইটা মাস সাহারসার কাছে বাপ-দাদার ছোট্ট গাঁ দুখানিয়াতে চলে যায় সে। খোরাকির জন্য খরচ-খরচা করার পর সারা বছরের কামাই থেকে যে অংশটুকু হরসুখ বাঁচায় সেই সঞ্চয় ভেঙে বর্ষার আড়াইটা মাস তাদেব চালাতে হয়। বারীষের সময় ছাড়া ধানকাটার আগের একটা দেড়টা মাসও হরসুখদের পক্ষে বড়ই.কষ্টকর। এই সময়টা কিষানদের হাতে এমন রুপাইয়া-পাইসা থাকে না যাতে মাদারী খেল দেখে সৌখিনতা করবে।

জমানো পয়সা বর্ষার সময় শেষ হয়ে যায়। ধান ওঠার আগে কামাই বন্ধ। তাই দুই পশু আর হরসুখ এই মরসুমে ধানখেতের পাশে এসে হাভাতেদের দলে ভিড়ে যায়। জমিমালিকের খলিহানে ফসল উঠে যাবার পর যে ঝড়তি পড়তি শস্যকণা মাঠে পড়ে থাকে, হরসুখ আর তার দুই সঙ্গী সেগুলো কুড়িয়ে নেয়। এইভাবে তারা কুড়ি পঁচিশ দিনের খাদ্য যোগাড় করে।

চোখে যার বিজরি-চমক, ভুরুর মাঝখানে সাপের উল্কি, যে ইচ্ছা করলে তুড়ি মেরে মেরে গোটা দুনিয়াকে নাচিয়ে দিতে পারে সেই ছমকী আওরতটার নাম নাথুনি। জাতে তারাও গাঙ্গোতা। তার ভোলাভালা মরদের নাম গৈয়ারাম।

বৈদ মুনোয়ারপ্রসাদ, সপেরা জগলাল, মাদারী খেলোয়াড় হরসুখ দোসাদ এবং নাথুনিরা ছাড়া আর যারা নতুন দলে এসেছে তারা সবাই ভূমিহীন দিনমজুর বা ভিখমাঙোয়া।

অন্যদিনের মতো আজও সকাল হতেই রামনৌসেরা সবাইকে তাড়া লাগায়, 'ওঠ, ওঠ সবাই। জঙ্গলে চল—' ইদানীং রোজ সকালে জঙ্গলে যাওয়াটা হাভাতেদের কাছে একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

পৌষ মাসের সূর্য আকাশের তলা থেকে সবে উঠে এসেছে। দিগন্তেব মাথায় ঘন কুয়াশা পুরু দেওয়ালের মতো এখনও অনড়। মাটি থেকে অসহ্য হিম উঠে আসছে ধোঁয়ার আকারে। যে নিস্তেজ

ম্যাড়মেড়ে রোদটুকু উঠেছে, পৌষের হিমার্ত শস্যক্ষেত্র, কুয়াশা, ভেজা গাছপালা বা মাঠঘাটকে উষ্ণ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

দা লাঠি বা টাঙ্গি নিয়ে ধানোয়াররা উঠে দাঁড়ায়।

নতুন দলের একটা আধবুড়ো লোক শুধোয়, 'তোমরা জঙ্গলে যাচ্ছ কেন?'

কারণটা জানিয়ে রামনৌসেরা বলে, 'তোমরাও চল। ধানকাটাই শেষ না হওয়া পর্যন্ত জিন্দা তো থাকতে হবে।'

'ঠিক বাত।'

নতুন দলের অনেকেই বিপুল উৎসাহে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু বৈদ মুনোয়ারপ্রসাদ, সপেরা জগলাল আর মাদারী খেলোয়াড় হরসুখের জঙ্গলে যাবাব চাড় দেখা যায় না। তারা বসেই থাকে।

রামনৌসেরা তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কা, তুমনিলোগ নায় যাওগে?'

বৈদ মুনোয়ারপ্রসাদ আদিগন্ত ধানখেতের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বসে ছিল। অন্যমনস্কর মতো সে বলে, 'আমি যাব না ভেইয়া। আমি এখানে বসে বসে ধান দেখব।'

সবাই অবাক হয়ে যায়। ধান কী এমন দেখার বস্তু, তারা ভেবে পায় না। ধানোয়ার শুধোয়, 'ধান দেখবে মতলব—হো বৈদোয়া?' সাগিয়ার ছেলেকে সুস্থ করে তোলার কারণে ধানোয়ারদের কাছে এখন মুনোয়ারপ্রসাদের বিরাট খাতিরদারি। সবাই তাকে বৈদ বলে ডাকতে শুরু করেছে।

চোখ না ফিরিয়েই মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'আরে ভেইয়া, এ তো সিধা বাত। কেত্তে রোজ ধান দেখিনি। দেখো দেখো, কেত্তে কিসিমকা ধান! আঁখ ভরকে দেখো—' তার চোখের তারা দুটো যেন স্বপ্নদর্শী হয়ে উঠতে থাকে। গলার স্বরে গাঢ় মুগ্ধতা ফুটে বেরোয়।

ধানোয়ার বলে, 'ধান তো দেখবে। লেকেন খাবে কী? পেটমে কুছ না কুছ তো দেনাই পড়ে।'

মুনোয়ারপ্রসাদ হাসে। বলে, 'দো রোজকা লিয়ে লিট্টি আউর ঘাটো হামনিকো সাথ হ্যায়। দো রোজ ধান তো দেখি। উসকা বাদ পেটকা চিন্তা করেগা। হো রামজি, কত দিন পর এত ধান দেখলাম!'

ধানোয়ার ভাবে মুনোয়ারপ্রসাদ লোকটা কি পাগল? অফুরন্ত ধান দেখে তার মাথা কি গোলমাল হয়ে গেল? ধানোয়ার অবশ্য এ নিয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না।

ওধার থেকে সপেরা জগলাল বলে ওঠে, 'আমিও জঙ্গলে তোমাদের সাথ যাচ্ছি না ধানবার ভেইয়া।'

ধানোয়ার জবাব দেবার আগেই রামনৌসেরা বলে ওঠে, 'কায়?'

জগলাল বলে, 'আমি একটা খুশবু পাচ্ছি—'

'কিসের খুশবু?'

'সাপের। ইধর উধর চারপাশে বহোত সাঁপ আছে। এ খুশবু তাদের গা থেকে বেরুচ্ছে।'

'লেকেন—'

'লেকেন কা?'

'জাড়ের সময়, মতলব অঘুন পুষ আউর মাঘ, এই তিন মাহিনা সব সাঁপ তো ধরতীকা নিচামে নিদ যাতা হ্যায়।'

'ঠিক বাত।'

'তা হলে সাঁপের গায়ের খুশবু পেলে কী করে?'

জগলাল একটু হাসে। বলে, 'আমি তো সপেরা। মাটির দশ 'মিল' নিচে সাঁপ শুয়ে থাকলেও আমি তার গন্ধ পাই। সমঝা?'

রামনৌসেরা খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, 'লেকেন—'

'লেকেন উকেন কুছ নেহী। তোমরা তো জঙ্গলে যাচ্ছ। ফিরে এসে দেখো দো-চারগো সাঁপ মাটির নিচে থেকে বের করে এনেছি। সাঁপ ছেড়ে এখন আমি জঙ্গলে যেতে পারব না।'

'ঠিক হ্যায়।'

মাদারী খেলোয়াড় হরসুখ জানায়, সেও জঙ্গলে যাবে না। আজ বুধবার। ফি বুধবার এখান থেকে

দু 'কোশ' তফাতে নকীপুরায় একটা হাট বসে। বাঁদর নিয়ে সে সেখানে মাদারী খেলা দেখাতে যাবে। যদি দু-চারটে নগদ পয়সা মিলে যায় এই আশায় সেখানে যাওয়া। কাল থেকে বরং জঙ্গলে হানা দেওয়া যাবে।

রামনৌসেরা বলে, 'তুমনিকো য্যায়সা মর্জি।'

নতুন দলটার আরো কয়েকজন জানায়, তারা ভিখমাঙোয়া, খাদ্যের খোঁজে জঙ্গলে যাবে না, নকীপুরার হাটে ভিখ মাঙতে যাবে।

অগত্যা দুই দলের যারা যারা রাজি হল, তাদের নিয়েই রামনৌসেরা নহর পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

দুপুরে জঙ্গল থেকে ফিরে এসে রামনৌসেরা দেখতে পায়, মুনোয়োরপ্রসাদ সকালবেলার মতোই ধানখেতের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। তবে সপেরা জগলাল আশেপাশে কোথাও নেই। আর নেই হরসুখ এবং তার বাঁদর দুটো। নতুন দলের আরো কয়েকজনকেও দেখা গেল না; তারা নিশ্চয়ই আশেপাশের গ্রাম বা হাটে ভিক্ষে করতে গেছে।

জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গিয়েছিল সবার। ভুখে পেট জ্বলে যাচ্ছে। যে যার ঝুলি ঝোলা হাতড়ে মকাই বা গাছের সেদ্ধ করা মূল-টুল বার করে গোগ্রাসে খেতে শুরু করে।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে আর সব দিনের মতোই তামাকে চুন ডলে খৈনি বানিয়ে ঠোঁটের তলায় গুঁজে সবাই ধানখেতের দিকে মুখ করে বসে।

ধানোয়ার প্রথম দিন থেকেই মুনোয়ারপ্রসাদকে লক্ষ করে আসছে। তাদের মতো হাভাতেদের কাছে জগতের সব চাইতে কাম্য বস্তু হল ধান। তবে এর প্রয়োজন শুধু পেটের জন্য। কিন্তু দিনের পর দিন ধানজমির দিকে পলকহীন তাকিয়ে মুনোয়ারপ্রসাদ কী সুখ পায় কে জানে। ধানোয়ার আস্তে আস্তে উঠে এসে তার গা ঘেঁষে বসে।

ঘাড় ফিরিয়ে মুনোয়ারপ্রসাদ অল্প হাসে। বলে, 'তুম?'

ধানোয়ার বলে, 'হাঁ। একগো বাত পুছনে আয়া—'

'কা বাত ভেইয়া?'

'পয়লা দিন থেকেই দেখছি, ধানের দিকে তাকিয়ে আছ। দিনের পর দিন ধান দেখার কী আছে!'

ধানোয়ারের কথা শুনে অবাক হয়ে যায় মুনোয়ারপ্রসাদ। এরকম আজব প্রশ্ন আগে আর কখনও শোনে নি সে। কিছুক্ষণ পর বলে, 'হো রামজি, তুমি কী বলছ ধানবার ভেইয়া!'

ধানোয়ার শুধোয়, 'খারাপ কিছু বলেছি?'

'আরে ভেইয়া, ইস দুনিয়ামে দেখনেকো তো একহী চীজ হ্যায়। আর তা হল ধান। লছমী মাঈ মানুষকে বাঁচাবার জন্যে এই দুনিয়ার জমিনে জমিনে ধানের জনম দিয়েছেন। ধান পয়দা না হলে কী হত বল তো? তুমি আমি কেউ বেঁচে থাকতাম?'

মুনোয়ারপ্রসাদ এরপর আরো যা বলে যায় তা এইরকম। ধান না ফললে ভগোয়ানের সেরা সৃষ্টি মানুষের বিনাশ ঘটে যেত। চিরকাল জগৎকে যা রক্ষা করে আসছে সেই ধান ছাড়া জীবনে দেখার আর কিছু নেই।

ধানোয়ার কিছু না বলে তাকিয়েই থাকে।

মুনোয়ারপ্রসাদ অনবরত বলে যায়, 'কত কিসিমের ধান আছে জানো?'

'হোগা দো-পাঁচ (দু-পাঁচ) কিসিমকা—'

'নেহী।'

'তব্?'

'কমসে কম দো পানশো (পাঁচ শ) কিসিমকা—'

'হাঁ?'

'হাঁ।'

'তুমি সব ধান চেনো?'

'জরুর।' হাতের একটা মাপ দেখিয়ে মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'যখন আমি এইরকম ছোট ছিলাম তখন থেকে ধান দেখে আসছি। চোখ বুজে ধানের গায়ে হাত দিয়ে বলে দিতে পারি, ওটা কোন জাতের ধান। সমঝা?'

'বল কী!' ধানোয়ার একেবারে হাঁ হয়ে যায়।

'ঠিকই বলছি ভেইয়া।'

একটু চিন্তা করে ধানোয়ার জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের অনেক খেতিউটি ছিল—না?'

প্রশ্নের ধরনটা বুঝতে না পেরে মুনোয়ারপ্রসাদ শুধোয়, 'মতলব?'

'সিধা মতলব। বহোত জমিন ছিল তোমাদের, সেখানে হরেক কিসিমের ধান ফলত। বচপন থেকে দেখে দেখে ওগুলো চিনেছ।'

মুনোয়ারপ্রসাদ হঠাৎ শব্দ করে হেসে ওঠে, 'নেহী নেহী, এক টুকরা জমিনভি হামনিকো নেহী থা। হামনিকো বাপ থা বান্ধুয়া কিষান। পরের জমিনে বেগার দিয়ে দিয়ে জান চৌপট করে ফেলেছে। আমারও বেগার খাটার কথা ছিল। লেকেন ভাগকে আয়া। বেগারি আমি দিতে পারব না।'

'তব্?'

'পরের জমিনে ধান দেখে দেখে আমি চিনে নিয়েছি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মুনোয়ারপ্রসাদ গভীর গলায় বলে ওঠে, 'জানো ভেইয়া, ধান দেখে দেখে আমি সারা জীওন কাটিয়ে দিতে পারি।'

ধানোয়ারের মনে হয়, মুনোয়ারপ্রসাদ মিথ্যে বলেনি। তার কথার প্রতিটি অক্ষরই বিশ্বাসযোগ্য। এমন লোক সে আগে আর কখনও দেখেনি।

কী ভেবে মুনোয়ারপ্রসাদ এবার বলে, 'ভেইয়া, এখানে বসে থেকে কী হবে। চল, জমিনের কাছে গিয়ে ধান দেখি। যাবে?'

রুখা-শুখা চেহারার আধবুড়ো লোকটা ধানোয়ারকে ভেতর থেকে টানছিল যেন। সে বলে, 'যাব। চল, তোমার কাছ থেকে ধান চিনে নিই।'

দু'জন কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলা থেকে উঠে পড়ে।

এগার

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, ধানখেতের ধার ঘেঁষে যে কাঁচা সড়ক জঙ্গলের দিকে চলে গেছে সেটা ধরে মুনোয়ারপ্রসাদ এবং ধানোয়ার অনেকটা এগিয়ে গেছে। নিচের জমিগুলোতে পুরোদমে ধানকাটাই চলছে। রোজকার মতো পহেলবানেরা এ খেত থেকে ও খেতে টহল দিয়ে দিয়ে তদারকি করে বেড়াচ্ছে। গৈয়া আর ভৈসা গাড়িগুলো আলের ধারে অলস ভঙ্গিতে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মুনোয়ারপ্রসাদ সামনের একটা জমির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'এই যে ধান দেখছ, এর নাম হল আদারিয়া মোরি। আদ্রা নচ্ছত্রকা (নক্ষত্র) নাম শুনা হ্যায়?'

ধানোয়ার মাথা নাড়ে, 'শুনা—'

'আদ্রা নচ্ছত্রে এই ধান রোয়া হয়েছিল বলে এর নাম আদারিয়া মোরি। আর ওই যে ধান দেখছ—' এবার ডান পাশের জমিটা দেখিয়ে দেয় মুনোয়ারপ্রসাদ।

'হাঁ, কহো—'

'ওগুলো রোহনয়া মোরি। আদারিয়া মোরির মতো বিলকুল একরকম দেখতে, শুধু থোড়েসে লম্বা। রোহণ (রোহিণী) নচ্ছত্রে এই ধান রোয়া হয়েছিল বলে এমন নাম হয়েছে।'

দুই ধানের মধ্যে তফাৎ সামান্যই। অনেকক্ষণ লক্ষ না করলে বোঝাই যায় না। মুনোয়ারপ্রসাদের

নজরের তীক্ষ্ণতায় রীতিমত অবাক হয়ে যায় ধানোয়ার। সে আস্তে আস্তে মাথা দোলায়, 'সমঝা—'

পাশাপাশি দুই ধানখেত পার হয়ে ওরা আরেকটা জমির কাছে এসে পড়ে। এখানকার ধান দেখিয়ে মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'এ হল সারহাট্টি। গায়ে শুং দেখছ তো, মোমফালির ওপরকার মতো রং?'

'হাঁ—' ধান দেখতে দেখতে জবাব দেয় ধানোয়ার।

'এগুলোর ভেতরে আছে বড় বড় দানা। এই চালের ভাত খেতে ভাল না, রুখা লাগে। তবে এ দিয়ে লোকে মুড়ি বানায় বেশি।'

পর পর অনেকগুলো জমিতে দেখা যায় সারহাট্টি পেকে আছে। সেগুলো পেরিয়ে যেতে যেতে ছড়া কাটে মুনোয়ারপ্রসাদ :

'এক মণ খরিহান (খরচ),
এক মণ বিহান (বিঘা)।'

ধানোয়ার শুধোয়, 'ইসকা মতলব?'

মুনোয়ারপ্রসাদ বুঝিয়ে দেয়, এক বিঘা জমিতে এক মণ সারহাট্টি রুইতে কিষানকে এক মণ নগদ মজুরি দিতে হয়।

এ খবর জানা ছিল না ধানোয়ারের। সে বলে, 'তাই নাকি?'

'হাঁ।'

সারহাট্টির খেতগুলো পেছনে ফেলে একটা জমির মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে মুনোয়ারপ্রসাদ। এখানকার ধান দেখিয়ে সে শুধোয়, 'এগুলো চেনো?'

ধানোয়ার মাথা নেড়ে জানায়—চেনে না।

মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'এ হল সাঠি ধান। দেখো দেখো, পাতার ভেতর শীষগুলো ছুপে আছে। বাইরে থেকে দেখা যায় না—'

আরে তাই তো, এমন ধান আগে আর কখনও দেখেনি ধানোয়ার। একসময় তার গোপন অহঙ্কার ছিল, এই পৃথিবীতে খাওয়ার উপযোগী লতাপাতা, গাছের মূল, কন্দ, পশুপাখি এবং নানা ঋতুর শস্য তার মতো কেউ চেনে না। চল্লিশ বেয়াল্লিশটা বছর অবিরাম খাদ্যের পেছনে ছুটে ছুটে এসব চিনে ফেলেছে সে। মুনোয়ারপ্রসাদের সঙ্গে দেখা না হলে সেই অহঙ্কার তার অটুটই থাকত। কিন্তু এই আধবুড়ো দুব্‌লা কমজোরি লোকটার সঙ্গে ধানখেতের ধার ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হয়, পৃথিবীর অনেক কিছুই তার জানা বা শেখা হয়নি, বিশেষ করে ধানের ব্যাপারটা। মুনোয়ারপ্রসাদকে যত দেখছে ততই বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে ধানোয়ারের। এমন মানুষ আগে আর কখনও তার নজরে পড়েনি।

মুনোয়ারপ্রসাদ বলতে থাকে, 'এই ধান বেশি ফলে না। এর থেকে যে চাল হয় তা কী কাজে লাগে জানো?'

ধানোয়ার বলে, 'নেহী তো—'

'বৈদরা (কবিরাজ) এ দিয়ে দাওয়া বানায়।'

সাঠি ধানের জমিগুলো পার হয়ে দু'জনে যে খেতটার কাছে আসে সেখানকার লম্বাটে ধানগুলো আর চেনাতে হয় না ধানোয়ারকে। এই ধান তার চেনা।

ধানোয়ার বলে, 'এ তো পূর্বী কেলাসর—না?'

মুনোয়ারপ্রসাদ তারিফের ভঙ্গিতে বলে, 'তুমি চেনো দেখছি। এই চালের মাড়ভাত্তা কভি খায়া?'

'খায়া হ্যায়।'

'ক্যায়সা?'

নেহাত পেট ভরাবার জন্যই আজন্ম খেয়ে আসছে ধানোয়ার। কোনো কিছু তারিয়ে তারিয়ে খেয়ে তার আস্বাদ জিভে এবং স্মৃতিতে ধরে রাখার মতো পর্যাপ্ত সময় বা সৌখিনতা, তার নেই। কেননা দুপুরে কিছু জুটলে সেটা খেয়েই রাতের খাদ্যের খোঁজে তাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয়। চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছর ধরে অবিরাম ছোটাছুটির জন্য কোনো খাবার সম্পর্কেই আলাদাভাবে সে নজর দিতে পারে নি।

খাদ্য তার কাছে উপভোগ করার বস্তু নয়, নিতান্তই বেঁচে থাকার জন্য জরুরি।

ধানোয়ার বলে, 'মালুম নেহী—'

চোখ বুজে মুখের ভেতর পূর্বী কেলাসর চালের গরম মাড়ভাত্তার স্বাদ যেন অনুভব করতে থাকে মুনোয়ারপ্রসাদ। বেশ কিছুক্ষণ পর জিভ এবং আলটাকরায় অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে চোখ মেলে তাকায়। বলে, 'বহোত মিঠি ভাত্তা। এ ভাত খেতে পেলে পরমাত্মাকা শান্তি—'

ধানোয়ার অবাক হয়ে শুধোয়, 'হাঁ?'

'হাঁ ভেইয়া।'

এরপর সাদা রঙের সেহ্লা, লাল রঙের মনসরা, মোটা দানার বারাঁঠি, সরু দানার লাল দৈয়া, হালকা সাদা রঙের গজমুক্তা—বিপুল উৎসাহে এবং আবেগের গলায় এমন নানা জাতের, নানা রঙের, নানা আকারের কত যে ধান দেখিয়ে যায় মুনোয়ারপ্রসাদ তার হিসাব নেই। এই সব ধান কখন কোন তিথিতে কিভাবে রোয়া হয়, সমস্ত কিছু তার মুখস্থ। শুধু তাই না, কোন ধানের ভাতে, চিড়েতে বা মুড়িতে কিরকম আস্বাদ, সব তার জিভে লেগে আছে। ধান নামে পৃথিবীর এই প্রাচীন শস্যের দানাগুলি মুনোয়ারপ্রসাদের কাছে প্রিয় সন্তানের মতো। সে তাদের যাবতীয় খবর রাখে।

ধান চেনাতে চেনাতে কখন যে ধানোয়ারকে নিয়ে মুনোয়ারপ্রসাদ খেতের অনেকটা ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল, কারুর খেয়াল নেই।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা জমির পাশে আলের ওপর দাঁড়িয়ে যায় মুনোয়ারপ্রসাদ। ডাকে, 'ধানবার ভেইয়া—'

তক্ষুনি সাড়া দেয় ধানোয়ার, 'কা?'

জমিটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'এই ধান চেনো?'

'নেহী।'

গলার স্বরে বিপুল আবেগ ঢেলে মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'দুনিয়াকা সবসে বঢ়িয়া ধান।'

'হাঁ?'

'হাঁ ভেইয়া। তুলসীমঞ্জরী ধানকা নাম কভী শুনা হ্যায়?' মুনোয়ারপ্রসাদ ঘাড় কাত করে ধানোয়ারের দিকে তাকায়।

ধানোযার মাথা হেলিয়ে দেয়, 'শুনা হ্যায়।'

'আমাদের এই মুলুকে তুলসীমঞ্জরীকে কী বলে জানো?'

'নেহী।'

'নানকী বাসমতী।' বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে মুনোয়ারপ্রসাদ। তারপর উঁচু আল থেকে খেতে নেমে যায়। ধানের একটা মোটা শীষ হাতের ভেতর নিয়ে বলে, 'চিনে রাখো ধানবার ভেইয়া। কালে কালে ছোটা ছোটা দানা—'

গভীর আগ্রহে ঝুঁকে শীষটা দেখতে থাকে ধানোয়ার।

মুনোয়ারপ্রসাদ বলে যায়, 'এই ধানসে যে চাউর মেলে তা ফোটালে এমন খুশবু বেরোয়, কী বলব! এ দিয়ে যদি ক্ষীর (পায়েস) বানিয়ে খাও, মনমে বহোত সুখ হো যায়গা। নানকী বাসমতীর ক্ষীর খায়া কভী?'

'নেহী—' ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকায় ধানোয়ার, 'বছরে সাত মাহিনা ভাত খেতে পাই না, ক্ষীর কিধরসে মিলেগা!'

মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'পন্দর সাল আগে মাধেপুরে এক রাজপুত ছত্রিয় (ক্ষত্রিয়) বড়া আদমীর বাড়ি নানকী বাসমতীর ক্ষীর খেয়েছিলাম। এখনও জিভে লেগে আছে—' বলে আলটাকরায় জিভ ঠেকিয়ে শব্দ করে সে। পনের বছর আগের পায়েস খাওয়ার সেই পরম সুখকর স্মৃতি মুখের ভেতর নতুন করে অনুভব করতে করতে আরামে তার চোখ বুজে আসে।

মুনোয়ারপ্রসাদ চোখ বুজেই আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মাঠের ওধার থেকে হই চই এবং চিৎকার শোনা যায়, 'এ-এ-এ-এ-এ—'

চমকে সামনে তাকায় মুনোয়ারপ্রসাদ আর ধানোয়ার। তিন চারটে পহেলবান লাঠি বাগিয়ে বনভৈসের মতো তাদের দিকে দৌড়ে আসছে।

ধানোয়ার ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। বলে, 'মুনবার ভেইয়া—'

মুনোয়ারপ্রসাদ শুধোয়, 'কা?'

'পহেলবানজিরা হোঁশিয়ার করে দিয়েছিল, সব ধান ওঠার আগে যেন জমিনে না নামি। অব্ কা হোগা?'

মুনোয়ারপ্রসাদ ভেতরে ভেতরে দমে গিয়েছিল। তবে ভয়টা বাইরে ফুটে বেরুতে দেয় না। বলে, 'কুছ নায় হোগা।'

'চল, ভেগে যাই।'

'ভাগনেকো জরুরত নেহী। ভেগে যাবই বা কোথায়? ওরা ঠিক ধরে ফেলবে। ইধরিই খড়া রহো—'

দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকে পহেলবানেরা কাছে এসে পড়েছে। বিশাল চেহারার এক পহেলবান মাটিতে প্রচণ্ড জোরে লাঠি ঠুকে গর্জে ওঠে, 'কা রে ভূচ্চরের ছৌয়ারা, জমিন থেকে সব ধান উঠে গেছে?'

'নেহী পহেলবানজি—' মুনোয়ারপ্রসাদ এবং ধানোয়ার একই সঙ্গে জানায়।

'তবে জমিনে ঢুকেছিস কেন?'

মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'কোনো কসুর করিনি পহেলবানজি। ধানবার ভেইয়া তো সব কিসিমের ধান চেনে না। আমি ওকে চেনাবার জন্যে জমিনে নিয়ে এসেছিলাম।'

দু নম্বর পহেলবান গর্জে ওঠে, 'ঝুট।'

'নায় পহেলবানজি, সচ।'

'জরুর তোদের দুসরা কোঈ ধান্দা হ্যায়।'

ধানোয়ার বলে, 'নেহী, নেহী—'

তিন নম্বর পহেলবান এবার বলে, 'সচমুচ বাতা, কোথায় ধান চুরি করে রেখেছিস?'

ধানোয়ার এবং মুনোয়ারপ্রসাদ সমস্বরে বলে, 'ধান চুরায়া নেহী পহেলবানজি। ভগোয়ান রামজি কিষুণজি কসম—'

'দেখি তোদের কাপড়া-উপড়া—'

'হাঁ হাঁ জরুর। দেখিয়ে না।'

মুনোয়ারপ্রসাদ আর ধানোয়ার পরনের কাপড় ঝেড়ে ঝুড়ে দেখায়। কিন্তু পহেলবানগুলোর পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না। তারা দু'জনের শরীরের নানা খাঁজে হাত ঢুকিয়ে তল্লাশি চালায়। তারপর পেতলের গুল-বসানো লাঠির ডগা ধানোয়ার আর মুনোয়ারপ্রসাদের পেটে গুঁজে ঠেলতে ঠেলতে কাঁচা সড়কের দিকে নিয়ে যায়।

এক পহেলবান বলে, 'জরুর ধান চুরাবার মতলবে এসেছিলি।'

'অ্যায়সা বুরা ধান্দা আমাদের ছিল না।' মুনোয়ারপ্রসাদ বলে।

'শালে, সাধু-মহাত্মার দল। গিদ্ধড়ের ছৌয়ারা, ধান দেখতে এসেছিল! কা, ধান দেখনেকো চীজ!'

মুনোয়ারপ্রসাদ ধানোয়ারকে যা বলেছিল, এবারও তাই বলে। অর্থাৎ এত বড় পৃথিবীতে ধান ছাড়া আর কিছুই দেখবার নেই।

'ধান দেখাচ্ছি তোকে!'

জোরে ঠেলতে ঠেলতে একসময় দু'জনকে কাচ্চীতে এনে তোলে পহেলবানেরা। তারপর প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয় এবং লাঠি দিয়ে হাতে-পায়ে পিঠে-বুকে গোটাকতক বাড়ি বসায়। একটা লাঠি পড়ে মুনোয়ারপ্রসাদের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট আর নাক ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে।

পহেলবানরা শাসায়, আজ বিশেষ কিছুই করা হল না। কিন্তু এরপরও যদি ধানোয়ারদের ধানখেতে

দেখা যায়, তা হলে আর ছাড়া হবে না, একেবারে খতম করে নহরের পাঁকে পুঁতে ফেলা হবে। শাসানির পর আর দাঁড়ায় না পহেলবানেরা, মাঠে নেমে যায়।

হাতের পিঠে রক্ত মুছতে মুছতে উঠে বসে মুনোয়ারপ্রসাদ। বলে, 'একগো ধানও নিই নি, সিরিফ দেখতে গিয়েছিলাম। তবু মার খেতে হল। হো ভগোয়ান—'

ধানোয়ার হঠাৎ খেপে যায়। পহেলবানদের উদ্দেশে বারকয়েক থুতু ফেলে সে—থুঃ থুঃ থুঃ—তারপর বলে, 'কুত্তা, ভূচ্চর, জানবর—'

বার

আজ সকালে খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে নতুন দলের নাথুনির সঙ্গে লাখপতিয়ার তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। ঘটনাটা এইরকম।

ইদানীং ফলপাকড়, লতাপাতা বা খাওয়ার মতো পাখির খোঁজে সবাই একসঙ্গে জঙ্গলে যায় না। দু দলে ভাগ হয়ে একদল যায় জঙ্গলে, আরেক দল নহরের ডান দিকের বিলে।

আজ সকালে রোদ ওঠার পর কিছু খেয়ে রামনৌসেরা পনের কুড়ি জনকে নিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। আর ধানোয়ারের সঙ্গে পনের ষোল জন যায় শীতের মজা বিলে।

মাদারী খেলোয়াড় হরসুখ তার দুই বাঁদর নিয়ে মাধেপুরের হাটে বেরিয়ে পড়ে। সপেরা জগলাল এবং তার জেনানা পাক্কীর কাছাকাছি সাপের গর্ত খুঁজতে থাকে। অনেকেই আশেপাশের গাঁ এবং টৌনগুলোতে ভিখ মাঙতে যায়। ভিখমাঙোয়াদের এই এক স্বভাব, কিছুতেই খেটেখুটে পেটের দানা জোটাতে চায় না। হাত পাতলে যদি পাওয়া যায়, কে আর খাটে!

ধানোয়ারের সঙ্গে রয়েছে টহলরাম আর তার জেনানা, ফির্তুলাল, সোমবারী, এমনি অনেকে। আর আছে লাখপতিয়া। সেই প্রথম দিন থেকেই লাখপতিয়া যেন তার গায়ের সঙ্গে জুড়ে আছে। ধানোয়ার জঙ্গলে গেলে সে জঙ্গলে যাবে, ধানোয়ার বিলে গেলে সে সেখানে গিয়ে হাজির হবে। এমন কি রাতে 'ঘুর'-এর আগুন জ্বালিয়ে যখন তার চারপাশে সবাই গোল হয়ে ঘুমোয়, লাখপতিয়া তার বুড়ি সাসকে নিয়ে ধানোয়ারের কাছাকাছিই শোয়।

লাখপতিয়া ছাড়া সেই ছমকী আওরতটা—যার নাম নাথুনি, যার মাথায় তেলহীন তামাটে চুল, যার ভুরুর মাঝখানে সাপের উল্কি, যার চোখে বাজপাখির নজর, একটু মাংস লাগলে যার জওয়ানি গদরাই হয়ে উঠত—সেও এসেছে। তার ভোলাভালা মরদ অবশ্য আসতে পারে নি। পৌষমাষের হিমবর্ষী আকাশের নিচে পড়ে থেকে তার জ্বর এসে গেছে। দু'রাত সমানে কাশছে সে। শরীর তার এতই দুব্‌লা হয়ে গেছে যে হাঁটতে গেলে পা টলে যায়। তাই দু-তিন দিন ধরে সে খাদ্যের তালাশে বেরুতে পারছে না, কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলাতেই চুপচাপ পড়ে থাকছে।

ধানের আশায় উত্তর বিহারের এ দিকটায় আসার পর থেকে ধানোয়ার বেশির ভাগ দিনই জঙ্গলে গেছে। আজ নিয়ে বিলে নেমেছে মোটে তিন দিন।

সূর্য পুবের আকাশে বেশ খানিকটা উঠে এসেছে, শীতের নিরুত্তাপ রোদ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

এর মধ্যেই সেই বুড়ো ভৈসোয়ারটা তার গণ্ডা তিনেক মোষ নিয়ে বিলে চরাতে চলে এসেছে। রোজ সকাল হতে না হতেই বুড়োটা তার মোষের বাহিনী নিয়ে বিলে নেমে পড়ে। ভোরে সূর্য ওঠার মতো এটা যেন অনিবার্য একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ধানোয়ারদের। এ ক'দিনে সে বুঝে ফেলেছে এরা ধানকুড়ানির দল। প্রথম দিন যখন ধানোয়াররা জঙ্গলে যায়, বুড়ো ভৈসোয়ার তাদের সাবধান করে দিয়েছিল। ওই একটা দিন ছাড়া সে তাদের সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলে নি, নিরাসক্ত উদাসীন চোখে রোজই একবার ধানোয়ারদের দিকে তাকায় শুধু।

কাঁচা সড়কের নিচে যেখান থেকে বিল শুরু সেখানে একটা প্রকাণ্ড মোষের পিঠে চড়ে বুড়ো

ভৈসোয়ার তার জন্তুগুলোকে চরাচ্ছিল। যে মোষটার ওপর বুড়ো বসে আছে তার কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সত্তর আশি কি একশ বছরের একটা মানুষের ভার তার কাছে নেহাতই তুচ্ছ। আপন মনে জন্তুটা শিশিরে ভেজা শীতের ঘাস খেয়ে চলেছে। ভৈসোয়ারের কাঁধের ওপর বসে আছে একটা চোটা পাখি। পাখিটার ভয়ডর নেই বা ভৈসোয়ারকে সেটা গ্রাহ্যই করে না।

আজও ধানোয়াররা কাচ্চী থেকে বিলের শুকনো মাটিতে নেমে বুড়ো ভৈসোয়ারের পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়। বুড়ো উদাসীন ঘোলাটে চোখে একবার তাদের দেখে অন্য দিকে মুখ ফেরায়।

শুকনো কাশের বন আর ছোট ছোট বন-ঝাউয়ের ঝোপগুলোর ভেতর দিয়ে ধানোয়াররা হাঁটতে থাকে। এখানে ওখানে রঙিন ধাতুপ ফুল ফুটে আছে। ফুটে আছে অজস্র মনরঙ্গোলি এবং সফেদিয়া ফুল। দু-একটা গোঁড়া লেবুর গাছও চোখে পড়ে। সেগুলোর ডালে বিরাট আকারের সবুজ লেবু ফলে আছে। আর আছে গুড়মি ফলের গাছ আর কুলের জঙ্গল। এক ধরনের বুনো কাঁটার ঝোপও নানা গাছগাছালির ফাঁকে মাথা তুলেছে। এই শীতকালে কাঁটাগাছগুলোতে বেগুনি রঙের প্রচুর ছোট ছোট ফুল ফোটে। তবে সব কিছু ছাপিয়ে যা বেশি করে চোখে পড়ে তা হল দীর্ঘ বুনো ঘাস।

চলতে চলতে কেউ কেউ পাকা টক কুল পেড়ে নিচ্ছে। কেউ ছিঁড়ে নিচ্ছে দু-একটা গুড়মি ফল। গুড়মি খেতে ভাল লাগে না। কিন্তু হাভাতেদের কাছে জিভের স্বাদ বড় ব্যাপার নয়, পেট ভরানোটাই আসল কথা।

বিলের যে জায়গাগুলোতে অল্প অল্প জল এখনও রয়েছে সেখানে এই সকালবেলাতেই ঝাঁকে ঝাঁকে কুল্লো, কাঁক আর মানিক পাখি এসে পড়তে শুরু করেছে। দু-চারটে লাল হাঁসও চোখে পড়ছে।

ধানোয়াররা একটা জলা জায়গা দেখে তার পারে এসে দাঁড়ায়। এখানে জল প্রায় দেখা যায় না বললেই হয়। কচুরিপানায় সব ঢেকে আছে। নানা জাতের পাখি কচুরিপানার ওপর বসে এই মুহূর্তে পৌষের রোদ পোহাচ্ছে। ধানোয়ারদের লক্ষ্য এই সব পাখির সুস্বাদু মাংস।

ধানোয়াররা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পাখিগুলো অনেকটা দূরে। জল যদিও শুকিয়ে গেছে তবু কমসে কম কোমর সমান তো হবেই, কচুরিপানা ঠেলে পাখিগুলোর কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে ওরা আর থাকবে না, সব ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাবে।

ধানোয়ার জিভ দিয়ে চক চক করে অদ্ভুত একটা শব্দ করে বলে, 'বিলকুল ভুল হো গিয়া—'

লাখপতিয়া এবং আরো দু-চারজন তার পাশ থেকে বলে ওঠে, 'কা হুয়া?'

'খালি হাতে পাখি মারা যাবে না। ওদের কাছে গিয়েও কোঈ ফায়দা নেহী। পোঁছবার আগেই ওরা পালাবে। কাল রাত্তিরে যদি ফান্দা (ফাঁদ) পেতে রেখে যেতাম, ভাল হত।'

নাথুনি শুধোয়, 'তা হলে এখন কী করবে? হামনিলোগ লৌট যায়েগী?'

'নেহী। এতদূর এসে কিছু না নিয়ে ফিরব না। থোড়া সোচনে দো হামনিকো।'

খানিকক্ষণ কী চিন্তা করে ধানোয়ার বলে, 'এক কাম কর—'

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল, শুধোয়, 'কা?'

আগে থেকেই এখানে অগুনতি পাখি রয়েছে। রোদ যত চড়ছে ততই আরো নতুন নতুন পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে কচুরিপানার ওপর বসছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে ধানোয়ার বলে, 'বহোতসে পঞ্ছী হ্যায়। ইটা ফেকো। দু-চারটের গায়ে জরুর লেগে যাবে। জখম হলে ওরা উড়তে পারবে না। তখন ধরে ফেলা যাবে।'

ধানোয়ারের পরিকল্পনা মোটামুটি সবার পছন্দ হয়। এক মুহূর্তও নষ্ট না করে সবাই বিলের পার থেকে মাটির ডেলা বা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু এতদূর থেকে ঢিল ছুঁড়ে পাখিগুলোকে জখম করা সহজ নয়। মাঝখান থেকে পাখিগুলো ভয় পেয়ে বেজায় চেঁচামেচি জুড়ে দেয় এবং ডানা ঝাপটে উড়ে উড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ধানোয়াররা যেদিকে দাঁড়িয়ে আছে, বেশির ভাগ পাখিই তার উলটোদিকে উড়ে উড়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। তবে দু-চারটে সন্ত্রস্ত পাখি এধারেও এসে পড়েছে। তাদের লক্ষ করে ধানোয়াররা অনবরত ঢিল ছুঁড়ে যায়। কিন্তু তাড়াহুড়ো করায় কোনো ঢিলই পাখিদের

বাতাস চিরে দিগন্তের দিকে পালাতে থাকে। গোটা আকাশ জুড়ে নানা রঙের পাখির ডানা ছত্রখান হয়ে যেন রঙের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়।

হাতের সামনে এত অজস্র সুস্বাদু খাদ্য কিন্তু কিছুতেই কিছু করা গেল না।

হাভাতের দল মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে বলে, 'ভূচ্চরগুলো ভেগে গেল। একটাকেও জখম করতে পারলাম না—'

ধানোয়ার বলে, 'এভাবে হবে না। আজ রাত্তিরে ফান্দা পেতে যাব। শালে পঞ্ছীরা কী করে তখন ভাগে দেখব—'

সোমবারী বলে, 'পঞ্ছী যখন মিলল না তখন বাথুয়া শাক, গুড়মি ফল আর লাল্‌সা পিঁপড়ের ডিম নিয়ে যাই। পেটমে কুছ তো দেনাই পড়ে।'

রামিয়া বলে, 'মছলি ভি পাকড়না পড়ে।' অর্থাৎ বিলে নেমে মাছেরও সন্ধান করতে হবে।

অনেকেই সায় দেয়, 'হাঁ হাঁ—'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই একটা দলছুট ভীরু সিল্লি অনেক নিচু দিয়ে প্রায় ধানোয়ারদের মাথা ছুঁয়ে কুঁক কুঁক করতে করতে পুব দিকে উড়ে যেতে থাকে। যে কোনো কারণেই হোক সিল্লিটা এতক্ষণ বিলেই ছিল, তার দলের সঙ্গে যেতে পারে নি।

হাভাতেরা কেউ তৈরি ছিল না। তাদের মনে হয়েছিল, বিলের জল থেকে সব পাখি উড়ে গেছে। কিন্তু লাখপতিয়া এবং নাথুনির হাতে দুটো পাথরের টুকরো থেকে গিয়েছিল। চোখের পাতা পড়বার আগেই তারা পাথর ছোঁড়ে এবং একটা পাথর লক্ষ্যভেদ করে ফেলে। জখমী সিল্লিটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে হাওয়ায় ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ঘাড় গুঁজে দূরে কাশের জঙ্গলে গিয়ে আছড়ে পড়ে।

তক্ষুনি দুই আওরত অর্থাৎ নাথুনি আর লাখপতিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে কাশবনের দিকে ছুটে যায়। ছুটতে ছুটতে নাথুনি বলে, 'ওহী পঞ্ছী হামনিকো।'

লাখপতিয়া বলে, 'নেহী, ওহী পঞ্ছী হামনিকো। হামনিকা ইটাসে জখম হুয়া—'

'নেহী, হামনিকা—'

দু'জনে কাশের জঙ্গলে এসে পড়ে। তাদের পেছন পেছন ধানোয়ার এবং অন্য হাভাতেরাও চলে এসেছে। সামনের দিকে খানিকটা তফাতে রক্তাক্ত সিল্লিটা ডানা ঝটপট করছে। ঘাড়টা তার ভেঙে গেছে. ওটার আয়ু আর বেশিক্ষণ নেই।

লাখপতিয়া এবার কোনোদিকে না তাকিয়ে জখমী পাখিটার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তার আগেই প্রবল শক্তিতে তার কাপড় টেনে ধরে নাথুনি।

লাখপতিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখের কুৎসিত একটা ভঙ্গি করে অশ্লীল খিস্তি দেয়, 'ছোড় দে হামনিকো, রেণ্ডী কাঁহিকা। ছোড় হামনিকা কাপড়া—'

নাথুনি শাড়িটা ছাড়ে না। দাঁত খিঁচিয়ে উত্তেজিত হিংস্র ভঙ্গিতে গলার শির ফুলিয়ে চেঁচাতে থাকে, 'নেহী ছোড়েগী। তু রেণ্ডী, তুহারকা মাঈ রেণ্ডী, তুহারকা দাদী রেণ্ডী—' বলতে বলতে আচমকা শাড়ি ছেড়ে দিয়ে সে সিল্লিটার দিকে দৌড়ে যায়।

হঠাৎ কাপড়টা ছেড়ে দেওয়ায় টাল খেয়ে গিয়েছিল লাখপতিয়া। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে সে বনৈভেসীর মতো নাথুনির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তার চুলের গোছা ধরে টানতে থাকে। ততক্ষণে নাথুনিও লাখপতিয়ার চুল ধরে টানতে শুরু করেছে। চুল টানাটানির সঙ্গে সঙ্গে চলছে অশ্রাব্য খিস্তির আদান প্রদান। দেখতে দেখতে শীতের মজা বিলের মাটি পৃথিবীর আদিম রণভূমি হয়ে ওঠে।

আঁচড়ে কামড়ে দু'জনের হাত-পা এবং মুখ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। পরনের ময়লা চিটচিটে কাপড় ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে যায়।

ধানোয়ার এবং অন্য হাভাতেরা কী করবে, ভেবে উঠতে পারছে না। হঠাৎ ধানোয়ার চেঁচিয়ে ওঠে, 'রুখ যাও, রুখ যাও।'

দুই আওরত তার কথা গ্রাহ্যই করে না, তুমুল লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে।

ধানোয়ার আবার চিৎকার করে, 'কা হোতা হ্যায়? এ জেনানারা, রুখো রুখো—

দুনিয়ার কোনো দিকেই লাখপতিয়া বা নাথুনির নজর নেই এখন। যেভাবেই হোক, পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্য তারা খেপে উঠেছে।

ধানোয়ার আর কিছু বলে না। লাফ দিয়ে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'জনকে তফাতে সরিয়ে দেয়।

দূরে সরানোর ফলে দু'জনে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রবল আক্রোশে এবং উত্তেজনায় লাখপতিয়া এবং নাথুনি সাপের মতো ফুঁসতে থাকে। বুক তোলপাড় করে জোরে জোরে গরম নিশ্বাস পড়ে তাদের।

দাঁতে দাঁত ঘষে নাথুনি চেঁচায়, 'ছোড় দো হামনিকো। ওহী রেণ্ডীর মুহ্‌মে আগ লাগিয়ে দিই।'

গলার স্বর কাঁপিয়ে হাত-পা নেড়ে নেড়ে ভেংচে ওঠে লাখপতিয়া, 'হোয় হোয় হোয়, মুহ্‌মে আগ-লাগানেবালী! আরে কুত্তী, আরে গিধ্‌কা বচ্চী—আ আ আ—তুহারকা কেত্তে তাকত হুয়া, হামনি দেখেগী।' বলে ধানোয়ারের দিকে তাকায়, 'এ পুরুখ, ছোড় দো ওহী রেণ্ডীকো—'

ধানোয়ার এবার প্রচণ্ড জোরে ধমক লাগায়, 'চোপ হো যাও, বিলকুল চোপ—'

লাখপতিয়া বলে, 'ঠিক হ্যায়, এই আমি মুখ বুজলাম। লেকেন তার আগে তোমার মুখ থেকে একটা সচ বাত শুনতে চাই। ভগোয়ানের নামে কসম খেয়ে বলতে হবে।'

'কা বাত ?'

রক্তাক্ত সিল্লিটা এতক্ষণে মরে গেছে। কাশবনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে লাখপতিয়া বলে, 'সচমুচ বল, ওই পাখিটা কার—আমার, না ওই ভূচ্চরকা বাচ্চীর ?'

দশ হাত দূর থেকে নাথুনি সমস্ত শরীর নাচিয়ে ঝাঁকিয়ে চিল্লায়, 'হাঁ হাঁ, বল—'

ধানোয়ার একবার নাথুনিকে দেখে। পরক্ষণে লাখপতিয়ার দিকে তাকায়। বলে, 'আমি দেখেছি, তোমরা দু'জনে দোগো পাথর ছুঁড়লে। তোমার পাথর পাখির গায়ে লাগেনি।'

লাখপতিয়া তীক্ষ্ণ খনখনে গলায় বলে, 'তা হলে কার পাথর লেগেছে ?'

নাথুনিকে দেখিয়ে ধানোয়ার বলে, 'ওহী আওরতকা। তোমরা বিচার চেয়েছিলে। আমার মুহ্ থেকে সচ শুনতে চেয়েছিলে। সচই বাতালাম। হামনিকো মুহ্‌সে ঝুট নেহী নিকলেগা—হাঁ। হামনিকা মরদকা জবান।'

ধানোয়ার যে হঠাৎ সত্য এবং ন্যায়ের জন্য এমন খেপে উঠবে, এতটা ভেবে উঠতে পারেনি লাখপতিয়া। সব শুনেও নিজের কানকে সে যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না। যে আদমীটার পাশাপাশি হেঁটে একই দিনে সে আর তার শাশুড়ি দক্ষিণের এই ধানখেতগুলোতে এসেছে, সর্বক্ষণ সে যার গায়ের সঙ্গে প্রায় লেগেই থাকে, জঙ্গলে বা জমি মালিকদের কোঠিতে সে যার সঙ্গে হানা দেয়, লুকিয়ে বাগনর আনার ব্যাপারে যার সঙ্গে গোপন চুক্তি করে, এমনকি রাত্তিরে 'ঘুর'-এর আগুন জ্বালিয়ে কাছাকাছি ঘুমোয় পর্যন্ত, তার ওপর একটা অধিকার যেন জন্মে গিয়েছিল লাখপতিয়ার। তার বিশ্বাস ছিল তার ক্ষতি হয় বা তার বিরুদ্ধে যায়, ধানোয়ার এমন কিছুই বলবে না বা করবে না। সূক্ষ্ম বা সুগোপন অধিকার বোধ থেকে সে ভেবে নিয়েছিল এই 'পুরুখ'টাকে সে ইচ্ছামতো আঙুলের ডগায় নাচাতে পারবে। সে যেভাবে চাইবে অবিকল সেইভাবে ধানোয়ার চলবে ফিরবে উঠবে বসবে। এই ভরসাতেই সে ধানোয়ারকে সালিশির দায়িত্ব দিয়েছিল। কিন্তু লাখপতিয়ার মতো অটুট দেহের সন্তানহীন একঘরিয়া আওরতের কাছাকাছি এতগুলো দিন থেকেও সে যে এত বড় সত্যনিষ্ঠ হয়ে উঠবে, এটা যেন চিন্তাই করা যায় না। মনে মনে হাজার বার অকথ্য খিস্তি দেয় লাখপতিয়া। 'হারামজাদ, ভূচ্চর, হিজড়াকি ছৌয়া!'

প্রথমটা দমে গিয়েছিল লাখপতিয়া। তারপর রাগে এবং আক্রোশে তার চোখ দপদপ করতে থাকে। ধানোয়ারের কথা মানলে সিল্লিটা সে পাবে না। তার ওপর দেখা গেল, 'পুরুখ'টাকে সে দখল করে নিতে পেরেছে বলে যা ভেবেছিল, সেটাও ঠিক নয়। প্রবল উত্তেজনায় এবং হতাশায় চোখদুটো হঠাৎ দপদপিয়ে ওঠে লাখপতিয়ার। চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। নাকের পাটা থিরথির কাঁপতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, 'তুমনি সচমুচ দেখা, ও রেণ্ডীকা ছৌরী পাত্থরসে পঞ্ছী মারা ?'

মাথা কাত করে ধানোয়ার বলে, 'সচমুচ দেখা। ভগোয়ান রামজি আউর কিষুণজি কসম—'
'ছোড় তুহারকা রামজি কিষুণজি। কুত্তা ভূচ্চর কাহাকা!'
সোমবারী রাতুয়া মঙ্গেরিরা এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার তারাও একসঙ্গে জানায়, নাথুনির পাথরের ঘা খেয়েই সিল্লিটা জখম হয়েছে। লাখপতিয়ার পাথর পাখির গায়ে লাগে নি। কাজেই ওটা পাওয়ার একমাত্র হক নাথুনিরই।
লাখপতিয়ার মনে হয়, সবাই একজোট হয়ে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। যার জন্য এই গভীর চক্রান্ত সে হল ওই ছমকী আওরত। এখানে নতুন এসে সে সবার মুণ্ডু বিলকুল ঘুরিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ধানোয়ারের। আচমকা সমস্ত রক্ত মাথায় চড়ে যায় লাখপতিয়ার, মারাত্মক খেপে ওঠে সে। পরসাদীদের দিকে তেড়ে গিয়ে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করতে থাকে, 'অ-অ-অ, দেখা তুলোগ! দেখা তুলোগ! কুত্তী কৌয়ার পাল।'
পরসাদীরাও মুখ বুজে থাকে না। অশ্রাব্য খিস্তির লেনদেনে পৌষের বাতাস বিষাক্ত হয়ে ওঠে।
মুখের জোর যতই থাক, একার পক্ষে এতগুলো হাভাতে পুরুষ এবং আওরতের প্রতিটি খিস্তির জবাব দিতে দিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই দম ফুরিয়ে যায় লাখপতিয়ার। হঠাৎ মাটিতে বসে পড়ে পা ছড়িয়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে মড়াকান্না জুড়ে দেয় সে।

অনেক রাত্তিরে যখন গোটা চরাচর জুড়ে নিশুতি নেমেছে, গাঢ় কুয়াশায় ঢেকে গেছে আদিগন্ত ধানখেত, মাথার ওপর সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর গোপন গর্তে কামার পাখিদের ডাক পর্যন্ত থেমে গেছে, হাভাতের দলের একজনও যখন আর জেগে নেই, সেই সময় 'ঘুর'-এর আগুনের পাশে শুয়ে শুয়েই মাথার ওপর থেকে ধুসো কম্বল সরিয়ে মুখ বাড়ায় ধানোয়ার। এমনিতে তার বেজায় ঘুম। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনভৈসের মতো নাক ডাকতে থাকে। কিন্তু আজ সন্ধেবেলা খাওয়া দাওয়ার পর আর সবার মতো সেও কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিল কিন্তু ঘুমটাকে কিছুতেই কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। প্রাণপণে চোখের পাতা টান করে রেখেছে। কখন নিশুতি নামবে, কখন গোটা দুনিয়া গাঢ় ঘুমে ডুবে যাবে, সে জন্য অনেক কষ্ট করে তাকে জেগে থাকতে হয়েছে।
দু'হাত তফাতে কাঁথাটাথা মুড়ি দিয়ে বুড়ি শাশুড়িকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে লাখপতিয়া। চাপা নিচু গলায় ধানোয়ার ডাকে, 'এ আওরত, এ আওরত—'
লাখপতিয়ার সাড়া মেলে না।
আরো বারকয়েক ডাকাডাকির পর হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটে যায়। এক টানে মাথার ওপর থেকে ধুসো কম্বল সরিয়ে মুখ বার করে লাখপতিয়া, 'কা, কা হুয়া? এত রাতে শোর মচিয়ে নিদটা ভেঙে দিলে কেন? কা, কা ধান্দা তুমনিকো?'
লাখপতিয়ার চোখমুখ দেখে টের পাওয়া যায়, সেও এতক্ষণ ঘুমোয় নি। হয়ত সে জানত, মাঝরাতে গোটা পৃথিবী জুড়ে নিশুতি নামলে ধানোয়ার তাকে নিশ্চয়ই ডাকবে। তবু ঘুম ভাঙাবার কথা বলে সে যে গুসসা দেখাল, সেটা তার অহঙ্কার। অর্থাৎ ধানোয়ারের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ যেন তার আদৌ নেই। সে তো ঘুমিয়েই ছিল। ধানোয়ারই নিজের গরজে তাকে ডেকে তুলেছে।
ধানোয়ার বলে, 'শোর মচালাম কোথায়? তুমিই তো আমার থেকে বেশি গলা চড়াচ্ছ!'
বিরক্ত চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে লাখপতিয়া। তারপর বলে, 'মাঝরাতে নিদের সময় তোমার সাথ বাত-উত করবার ইচ্ছা আমার নেই। এখন আমি ঘুমবো।' বলেই কম্বলটা আবার মুখের ওপর টানতে থাকে।
কিন্তু তার আগেই হাত বাড়িয়ে কম্বলটা ধরে ফেলে ধানোয়ার। বলে, 'নেহী, নেহী, নেহী—'
'ছোড় দো—'
'নেহী।'
'ছোড় দো—'
'নেহী।'

কালচে ভারি ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে ধানোয়ারকে লক্ষ করতে করতে ধারাল গলায় লাখপতিয়া বলে, 'দুফারে হারামজাদকা বেটিয়া ওই আওরতটাকে সিম্নিটা দিয়ে দিলে। এখন কম্বল টানাটানি করে দিম্নাগি হচ্ছে! কুত্তা কাঁহাকা। ছোড়, ছোড় মেরে কম্বলিয়া—'

ধানোয়ারের ওপর কোত্থেকে যেন অলৌকিক সাহস ভর করে। সে কম্বল ছাড়ে না। বলে, 'সিম্নির কথাটা বলতে চাইছি। গুস্‌সা না করে শোন না—'

'শুনা হ্যায় তুহারকা বাত। নয়া কা বাতাওগে?' লাখপতিয়া ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। উত্তেজিত ভঙ্গিতে সে যা বলতে থাকে তা এইরকম। নতুন আর কিছু বলার নেই ধানোয়ারের। দুপুরে যা বলেছিল সেগুলোই আরেক দফা মুখ দিয়ে হড় হড় করে বার করবে। অর্থাৎ তাকে সালিশ মেনে বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। রামচন্দজি বিষুণজির নামে কসম খেয়ে সে ঝুটা বলে কী করে!

মুখটা বাঁকিয়ে চুরিয়ে দুপুরের মতোই ভেংচে ওঠে লাখপতিয়া, 'আরে বিচার করনেবালা! আরে কসমখানেবালা। হো হো, রামরাজকা মালিক আ গিয়া রে তু! কোনোদিন যেন ওর মুহ্ থেকে ঝুটি জবান বেরোয় নি!' বলে এক হাতে ফের কম্বলটা টানতে থাকে। আরেক হাতের আঙুল দিয়ে 'ঘুর'-এর ওধারে নাথুনির বিছানা দেখাতে দেখাতে গলার স্বর আরেক পর্দা চড়িয়ে দেয়, 'যা যা, ওই ছমকী রেণ্ডীর কম্বলের তলায় ঢুকে তার গায়ের গন্ধ শোঁক গিয়ে।'

ধানোয়ার নিচু গলায় করুণ মুখে বলে, 'এ সাসকা পুতহু, দিমাগ ঠাণ্ডা করে আমার কথাটা শোনই না—'

এবার একটু থমকে যায় লাখপতিয়া। গলার স্বর নামিয়ে শুধোয়, 'কা বাত তুমনিকো?'

'এখন থেকে আর ভুল হবে না। যে-ই পঞ্ছী মারুক, মছলি ধরুক, লালসা পিঁপড়ের ডিম পাড়ুক—বিচারের জন্যে আমাকে ডাকলে সব তোমাকে দিয়ে দেব।'

লাখপতিয়া উত্তর দেয় না, স্থির চোখে তাকিয়েই থাকে।

ধানোয়ার বলে, 'কা, সমঝি?'

'সমঝি—' *ঠোঁট* কামড়ে চোখের তারা ঘোরাতে ঘোরাতে গাঢ় গলায় লাখপতিয়া বলে, 'উল্লু কাহাঁকা—'

শেষ কথাগুলো যে গালাগাল বা খিস্তি নয়, অন্য কিছুর প্রকাশ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না ধানোয়ারের। হট্টাকট্টা চেহারার একটা পুরুষকে পুরোপুরি নিজের দখলে নিয়ে আসার পর আস্তে আস্তে মুখের ওপর কম্বলটা টেনে দেয় লাখপতিয়া।

খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে ধানোয়ার। আবছাভাবে কিছু একটা আন্দাজ করে সামান্য হাসে। তারপর সেও কাঁথা টাথা টেনে মুড়ি দেয়। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পৌষমাসের হিমবর্ষী দীর্ঘ রাত পার করে দিতে পারবে।

তের

আরো ক'টা দিন কেটে গেল।

এর মধ্যে ধানখেতগুলো অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। পাহারাদারি এবং ফসলকাটা সমানে চলছেই। দিন দশেক হল, পৌষ মাস পড়ে গেছে। একেকটা দিন যায়, শীত আরো জাঁকিয়ে পড়তে থাকে। আকাশ থেকে অনবরত গাঢ় তীব্র হিম নামে, মাটির লক্ষ কোটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে দুনিয়ার সব শীতলতা উঠে আসে। মনে হয়, ধানখেতের পাশে খোলা আকাশের নিচে এই অসহ্য শীতে একটা মানুষও বাঁচবে না। তবু যতক্ষণ মরে ফৌত না হয়ে যাচ্ছে, পেটে তো কিছু দিতেই হবে। কাজেই খাদ্যের খোঁজে হাভাতেরা নিয়মিত দূরের জঙ্গলে আর বিলে হানা দিয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য দু'দিন ধরে ধানোয়ার জঙ্গলে যেতে পারছে না। তার ভীষণ বুখার। পরশুর আগের রাত থেকে তার জ্বর চলছে। দুটো দিন প্রায় বেহুঁশের মতো কেটেছে।

এত জ্বর দেখে লাখপতিয়া আর রামনৌসেরা মুনোয়ারপ্রসাদকে টেনে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কী সব লতাপাতা তুলিয়ে আনিয়েছিল। সেগুলো বেটে খাওয়াবার পর আজ সকাল থেকে জ্বরটা ছেড়ে গেছে ধানোয়ারের। তবে শরীরটা এখন বেজায় কাহিল, মাথার ভেতরটা ভীষণ ঘুরছে। উঠে দাঁড়াতে গেলে পা টলে যায়।

অন্যদিনের মতো আজও রোদ উঠতে না উঠতেই হাভাতের দলটা বিলে বা জঙ্গলে চলে গেছে। সপেরা জগলাল এবং তার জেনানা রামিয়া বেরিয়ে পড়েছে সাপের খোঁজে। মাদারী খেলোয়াড় হরসুখ দোসাদ তার দুই বাঁদর নিয়ে গেছে কাছাকাছি কোনো একটা হাটে। ভিখমাঙোয়ারাও ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশের গাঁগুলোতে।

কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলা এখন প্রায় ফাঁকা পড়ে আছে। ধানোয়ার ছাড়া আর যারা গাছতলায় রয়েছে তারা হল ক'টা বাচ্চাকাচ্চা আর বুড়োবুড়ি। যেমন লাখপতিয়ার শাশুড়ি, পরসাদীর ছেলে দুটো, সখিলালের ছৌরাছৌরীরা। অবশ্য ছমকী আওরত নাথুনি এবং তার ভোলাভালা মরদ গৈয়ারামও আছে।

জ্বর হওয়ার আগে থেকেই ধানোয়ারের নজরে পড়েছে, নাথুনি এবং গৈয়ারাম আর জঙ্গলে যাচ্ছে না। কেন যাচ্ছে না তা আর জিজ্ঞেস করেনি। দরকারই বা কী? হয়ত ওদের কাছে যথেষ্ট খাদ্য আছে কিংবা ওরা ভুখাই থাকত চায়। যার যেমন ইচ্ছা।

এই দিনের বেলায় নিভে যাওয়া 'ঘুর'-এর পাশে শুয়ে শুয়ে ধানখেতের দিকে তাকিয়ে ছিল ধানোয়ার। দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠে সেই একই নিয়মে ধানকাটা চলছে। চারদিকে সেই মূসহর, মরসুমী আদিবাসী ধানকাটানি এবং পহেলবানরা ছাড়া আর কেউ নেই। অন্য দিনের মতোই ঝাঁকে ঝাঁকে পরদেশি শুগা আর চোটা ধানের শীষ খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

পৌষ মাসের সূর্য ক্রমশ আকাশের খাড়াই বেয়ে ওপরে উঠেতে থাকে। উত্তুরে হাওয়া উলটো-পালটা বয়ে যায়।

শীতের রোদ বড় নিস্তেজ। তবু তো রোদ। আস্তে আস্তে উঠে বসে হাত বার করে রোদে সেঁকতে থাকে ধানোয়ার। তার নির্জীব চোখের নজর থাকে ধানখেতের দিকেই।

হঠাৎ ধানোয়ার দেখতে পায়, ফসলের জমি থেকে একটা পহেলবান কাচ্চীতে উঠে এসে এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে নাথুনিদের কাছাকাছি গিয়ে বসে পড়ে। চোখ বুজে কিছুক্ষণ কী ভাবে সে। আবছাভাবে তার মনে হয়, কাল পরশু তরশু—এই তিন দিন সকালে জ্বরের ঘোরে যখন সে বেহুঁশ আর কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলা আজকের মতোই ফাঁকা, সেই সময় এই পহেলবানটা নাথুনিদের চারপাশে ঘুরঘুর করছিল। তবে আজকের মতো এরকম সরাসরি এত কাছে এসে বসে নি। ধানোয়ার সোজা তাকিয়ে কান খাড়া করে থাকে।

পহেলবানটার মাথায় গামছা পেঁচিয়ে বাঁধা। সেটার ভাঁজ থেকে তামাকপাতা এবং চুন বার করে হাতের তেলোতে ডলে ডলে খৈনি বানাতে বানাতে সে বলে, 'ক' রোজ ধরেই ভাবছি, তোদের সাথ জান পয়চান করে যাই। লেকেন টৈইন (টাইম) হচ্ছে না। আজ চলেই এলাম।'

নাথুনির মরদ গৈয়ারাম পহেলবানকে দেখে বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। দমবন্ধ গলায় সে বলে, 'কুছ কসুর হুয়া হামনিকা পহেলবানজি? আমরা কিন্তু জমিনে নামি নি।'

গৈয়ারামকে ভরসা দিয়ে পহেলবান বলে, 'আরে নেহী নেহী। আমি জানি তোরা আচ্ছা আদমী—থোড়া গপ-উপ (গল্প-টল্প) করতে এলাম।' বলে বেশ জুত করে মাটিতে বসে পড়ে।

গৈয়ারাম ভয় পেলেও নাথুনি কিন্তু এতটুকু ঘাবড়ায় নি। বাজপাখির মতো ধারাল চোখে পহেলবানকে দেখতে দেখতে চাপা গলায় বলে, 'কা সৌভাগ হামনিলোগকা—' মনুষ্যজাতি, বিশেষ করে পুরুষ সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। তাদের মতো ভুখা আধনাঙ্গা মানুষের কাছে পহেলবানের এভাবে যেচে আসাটা ভেতরে ভেতরে তার সন্দেহকে উসকে দিয়েছে।

কালো কালো ট্যারাবাঁকা অনেকগুলো দাঁত বার করে খানিকটা মজা করার চেষ্টা করে পহেলবান। বলে, 'আ রে, সৌভাগ তো আমার—'

সতর্ক ভঙ্গিতে নাথুনি শুধোয়, 'আপনিকা সৌভাগ!'

'নেহী তো কা? তোর মতো সুনহলা নাজুক আওরতের কাছে বসাটা সৌভাগ না?' বলে গোটা শরীর দুলিয়ে জোরে জোরে হেসে ওঠে পহেলবান।

নাথুনি উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

খৈনি বানানো হয়ে গিয়েছিল। নেশার জিনিসসুদ্ধ হাতের চেটোটা নাথুনির দিকে বাড়িয়ে পহেলবান বলে, 'লে—'

এত খাতিরদারির কারণটা এতক্ষণে পরোপুরি ধরে ফেলেছে নাথুনি। ন্যায্য পাওনা বুঝে নেওয়ার ভঙ্গিতে খানিকটা খৈনি তুলে নিয়ে দাঁত এবং ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দেয় সে।

এবার হাতটা গৈয়ারামের দিকে বাড়ায় পহেলবানটা। বলে, 'তু ভি লে—'

সাদাসিধে ভোলাভালা গৈয়ারাম অতি সন্তর্পণে ছোঁয়া বাঁচিয়ে দুই আঙুল দিয়ে অল্প একটু খৈনি তুলে নেয়। বড় জমি মালিকের পাহারাদারের হাত থেকে খৈনি নিতে পেরে তার চোদ্দ পুরুষ যেন উদ্ধার হয়ে যায়। অন্তত তার মুখচোখ দেখে তাই মনে হয়।

এবার আলাপ জমানো শুরু করে পহেলবানটা, 'হামনিকো নাম হ্যায় মধেলি সিং—রাজপুত ছত্রিয়।' নিজের বংশপরিচয় এভাবে দিতে শুরু করে সে। তার বাপ, দাদা, দাদার বাপ, দাদার বাপের বাপ অর্থাৎ দশ পুরুষ ধরে তারা পহেলবানি বা পালোয়ানি করে আসছে। তাদের কাজ হল পুরুষানুক্রমে বড়ে খেতিমালিক ত্রিলোকী সিংদের জমি পাহারা দেওয়া এবং সব দিক থেকে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা।

বংশ পরিচয় দেবার পর মধেলি সিং শুধোয়, 'তোদের নাম কী?'

গৈয়ারাম এবং নাথুনি তাদের নাম জানিয়ে দেয়।

'কী জাত তোরা?'

'গাঙ্গোতা।'

'অচ্ছুতিয়া?'

গৈয়ারাম ঘাড় কাত করে জানায় তারা পুরোপুরি জল-অচল নয়।

মধেলি সিং দাঁতের নিচে আরেক দফা খৈনি গুঁজে বলে, 'জাতওয়ারি সওয়াল নিয়ে আমি মাথা খারাপ করি না। আমার অত ছুয়াছুত নেই। সমঝা?'

রাজপুত ক্ষত্রিয়ের এতবড় মহানুভবতায় একেবারে গলে যায় গৈয়ারাম। সে যে কী বলবে, কী করবে, ভেবে উঠতে পারে না। তবে তার জেনানা নাথুনির মনের কথা আদৌ বোঝা যায় না। নাথুনির কাছে এটা কোনো 'তাজ্জবকা বাতই' নয় যেন। বাজের মতো তীক্ষ্ণ চোখে মধেলি সিংকে দেখতে দেখতে পিচিক করে খয়েরি রঙের খৈনি মেশানো খানিকটা থুতু ফেলে সে।

মধেলি সিংয়ের ওপর আচমকা দুনিয়ার সব উদারতা যেন ভর করে। প্রচণ্ড উৎসাহে সে বলতে থাকে, 'আমার কাছে সব আদমী সমান। ভগোয়ান রামচন্দজি আউর বিষুণজি কাউকে উঁচা জাত কাউকে নিচা জাত করে পাঠিয়েছে। লেকেন তাতে আমার কিছু আসে যায় না।'

এমন একটা মহত্ত্বের কথা শুনেও নাথুনি চমকায় না। তবে গৈয়ারাম একেবারে অভিভূত হয়ে যায়। সে বলে, 'পহেলবানজি, আপনার কথা বিলকুল সাধু-মহাত্মাদের মতো। উঁচা জাতের আদমীরা আমাদের গায়ে থুক দেয়, আমাদের গায়ে গা লেগে গেলে নাহানা করে শুধ্ হয়। আপনার মতো আদমী আমরা আগে দেখি নি।'

মধেলি সিং কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, আচমকা তার চোখে পড়ে ধানোয়ার তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চোয়াল শক্ত করে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'শালে ভূচ্চর, কা দেখতা ইধরি?'

ধানোয়ার ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। ঢোক গিলে বলে, 'কুছ নায় পহেলবানজি—এমনিই তাকিয়ে আছি।'

'এমনিই তাকিয়ে আছি!' মধেলি সিং খৈনির ছোপ-ধরা কালো কালো দাঁত বার করে ভেংচে ওঠে, 'উধরি দেখ গিধকা ছৌয়া—' বলে উলটো দিকে আঙুল বাড়ায়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসে ধানোয়ার। চোখ তার যেদিকেই থাক, কান দুটো নাথুনিদের দিকেই খাড়া হয়ে থাকে।

মধেলি সিং গোলাকার সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ ধানোয়ারকে লক্ষ করে। তারপর গৈয়ারামের কাছে আরেকটু ঘন হয়ে বসে মোলায়েম গলায় শুরু করে, 'এ নাথুনি—'

নাথুনি বলে, 'কা?'

'টুটাফাটা কাপড়া পরে আছিস কেন? বদবু বেরুচ্ছে। তোর যা চেহারা তাতে জগমগ জগমগ শাড়ি পরলে বিলকুল পরী বনে যাবি —হাঁ।' বলে চোখ কুঁচকে নিঃশব্দে হাসে মধেলি সিং।

নাথুনি উত্তর দেয় না।

মধেলি সিং বিপুল উৎসাহে এবার বলতে থাকে, 'কা রে, চুপ করে থাকলি কেন? হামনি যো বোলা—সচ নায় ঝুট—বাতা, বাতা, জলদি বাতা—'

'কা বাতাউগী?'

'তোর দিল যা চায়—'

মধেলি সিংয়ের চোখে চোখ রেখে নাথুনি চাপা গলায় বলে, 'আমরা ভুখা ভিখমাঙোয়া। কঁহা মিলেগা জগমগ জগমগ কাপড়া?'

'বহোত আপসোস কা বাত—' জিভের ডগায় চুক চুক করে আক্ষেপসূচক একটু আওয়াজ করে মধেলি সিং। তারপর এক নাগাড়ে যা বলে যায় তা এইরকম। রামচন্দজি বিষুণজি কেন যে দুনিয়ার কোনো কোনো আদমীকে পয়সাওলা আর কোনো কোনো আদমীকে নাঙ্গা এবং ভুখা করে পাঠায় কে জানে। সবই ভগোয়ানকা মর্জি।

নাথুনি চুপ করে থাকে।

বিষুণজি এবং রামচন্দজির প্রসঙ্গ পালটে হঠাৎ যেন খেপেই ওঠে মধেলি সিং, 'লেকেন তোর যা চেহারা, যা উমর তাতে জগমগ জগমগ কাপড়া তোর পরতেই হবে—হাঁ।'

নাথুনি বলে, 'পেটের দানা জোটে না তো জগমগ কাপড়া!'

মধেলি সিং কী বলতে যাচ্ছিলি, আচমকা পাক্কীর দিক থেকে হই চই শোনা যায়। সেই সঙ্গে হাওয়া গাড়ির আওয়াজ। দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে সে তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ে। বড় জমিমালিক ত্রিলোকী সিং তাঁর বিশাল মোটরে প্রকাণ্ড শরীর এলিয়ে জমিতে আসছেন। এক মুহূর্তও আর দাঁড়ায় না মধেলি, উর্ধ্বশ্বাসে পাক্কীর দিকে ছুটতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত মধেলি সিং নাথুনিকে আর কী কী বলত, অজানাই থেকে যায়। সে জন্য একটু দুঃখই হয় ধানোয়ারের। তবে অস্পষ্টভাবে টের পায়, এখানেই ব্যাপারটা চুকে বুকে গেল না। পহেলবান মধেলি সিং গাঙ্গোতাদের ছমকী আওরত নাথুনির কাছে আবার আসবে। জরুর আসবে।

সেদিনই রাত্তিরে পৌষ মাষের তীব্র হিমে সমস্ত চরাচর যখন অসাড় তখন 'ঘুর'-এর চারপাশে একজনও জেগে নেই। আজ এমন বেজায় শীত যে সিমার এবং কড়াইয়া গাছগুলোর গর্তে নিশাচর কামার পাখিগুলো পর্যন্ত চুপ করে গেছে।

অন্যদিনের মতো কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল ধানোয়ার। আচমকা একটা চাপা গলার শব্দে তার ঘুম ছুটে যায়। কে যেন কাছাকাছি কোথায় একটানা ডেকে চলেছে, 'এ আওরত, এ গাঙ্গোতিন আওরত—'

প্রথমটা ধানোয়ার ভেবেছিল যে যাকে খুশি ডেকে যাক, সে ঘুমিয়েই থাকবে। কিন্তু হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে এক টানে মাথার ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে এধারে ওধারে তাকাতেই সব চোখে পড়ে যায়।

জ্বলন্ত আসান কাঠের 'ঘুর' পৌষের হিমে নিভে এসেছে। আগুনের জেল্লা না থাকলেও বোঝা যায়, 'ঘুর'-এর ওধারে পহেলবান মধেলি সিং একটা বিছানার ওপর ঝুঁকে অনবরত ডাকাডাকি করে চলেছে। ধানোয়ার ভাল করেই জানে ওখানে কে শুয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পর কাঁথাকানি সরিয়ে মুখ বার করে নাথুনি। ঘুমের ঘোরে জড়ানো গলায় বলে, 'কৌন?'

ইশারায় তাকে চুপ করিয়ে নিচু গলায় ফিসফিসিয়ে কী বলে যায় পহেলবান মধেলি সিং, ধানোয়ার বুঝতে পারে না। তবে নাথুনি আর শুয়ে থাকে না, হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসে এবং ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশের ঘুমন্ত মানুষগুলোকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, কেউ কোথাও জেগে নেই। সে বুঝতে পারে না, নিভন্ত 'ঘুর'-এর ওধারে কুয়াশা এবং অন্ধকারে একটা মানুষ তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

নাথুনি এবার দ্রুত উঠে দাঁড়ায়, তারপর গায়ে কাঁথা জড়িয়ে মধেলি সিংয়ের সঙ্গে কাচ্চী পেরিয়ে ধানখেতে নেমে যায়। গাঢ় হিমে তাদের আর দেখা যায় না।

দেখতে দেখতে এই অসহ্য শীতের রাতেও ধানোয়ারের কপালে ঘাম জমে ওঠে। খাদ্য ছাড়া চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে এতকাল আর কোনোদিকে তাকাবার সময় পায় নি সে। জগৎ এবং মানুষ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা খুবই কম। হঠাৎ তার মনে হয় যে মরদের পাশ থেকে মধ্যরাতে নাথুনি উঠে অন্য 'পুরুখ'-এর সঙ্গে চলে যায় সেই গৈয়ারাম কি এতই ভোলাভালা, এতই সোজা মানুষ? তার ঘুম কি এতই গভীর যে আওরতের এই চলে যাওয়া সে টের পায় নি? হো রামজি, তেরে মর্জি।

বিষণ্ণ, দুঃখিত ধানোয়ার ধীরে ধীরে কম্বলটা আবার মাথার ওপর টেনে দেয়।

পরের দিন ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হয়ে যায় ধানোয়ারের। চোখ মেলে সে দেখে রোদ উঠে গেছে। মুসহর আর আদিবাসী ধান কাটানিরা সামনের খেতগুলোতে ধান কেটে চলেছে।

এদিকে কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলা এখন প্রায় ফাঁকাই বলা যায়। ধানোয়ার ঘুম থেকে উঠবার আগে রামনৌসেরারা নিশ্চয়ই খাদ্যের খোঁজে জঙ্গলে বা বিলে চলে গেছে। লাখপতিয়ার বুড়ি শাশুড়ি, পঙ্গু ছনেরি এবং দু-চারটে বাচ্চাকাচ্চা ছাড়া আর যে দু'জন আছে তারা হল গৈয়ারাম আর নাথুনি। আগের তিন চার দিনের মতো ওরা আজও জঙ্গলে যায় নি।

আজ জ্বর নেই ধানোয়ারেরর। তবে শরীর বেজায় কাহিল লাগছে। কিছুক্ষণ দুর্বল চোখে ধানখেতের দিকে তাকিয়ে থাকে সে। তারপর পাক্কীতে বাস লৌরি বা গৈয়াগাড়ির চলাচল দেখে। একসময় নিজের অজান্তেই কখন যেন তার চোখ কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলায় নাথুনিদের দিকে ফিরে আসে। আগে লক্ষ করে নি, এবার দেখা যায়, ওরা ছেঁড়া চটের ভেতর কাঁথা কম্বল, ভাঙাচোরা বর্তন অর্থাৎ তাদের যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি পুরে বাঁধাছাঁদা করছে।

আচমকা কাল রাত্তিরের সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে যায় ধানোয়ারের। মধ্যরাতে মধেলি সিংয়ের সঙ্গে নাথুনি চলে যাবার পর অনেকটা সময় জেগে ছিল সে। তারপর কখন আওরতটা ফিরে এসেছে টের পায়নি। ভোলাভালা গৈয়ারামও জানতে পেরেছে কিনা, কে জানে। অন্তত তার মুখচোখ দেখে তা বুঝবার উপায় নেই।

পলকহীন তাকিয়েই থাকে ধানোয়ার। কিছুক্ষণ পর নাথুনিরা পোঁটলা-টোটলা ঘাড়ে এবং মাথায় তুলে পাক্কীর দিকে হাঁটতে শুরু করে। ধানোয়ার রীতিমত তাজ্জব বনে যায়। শুধোয়, 'কা, চলে যাচ্ছ যে?'

গৈয়ারাম এবং নাথুনি থমকে দাঁড়ায়। গৈয়ারাম বলে, 'হাঁ ভেইয়া, যাতা হ্যায়।'

'এখনও তো জমিনের পুরা ফসল ওঠেনি। তোমরা ধান কুড়োবে না?'

গৈয়ারাম কী জবাব দেবে, বুঝতে না পেরে তার জেনানার দিকে তাকায়। নাথুনি বলে, 'কী করব, পরে ভেবে দেখব।' গৈয়ারামকে বলে, 'সূরয চড়ে যাচ্ছে। আও আও—' বলে পা বাড়িয়ে দেয়।

গৈয়ারাম আর দাঁড়ায় না, নাথুনির পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করে।

অন্য সব হাভাতের মতোই ফাঁকা শস্যক্ষেত্র থেকে ধান কুড়োতে এসেছিল নাথুনিরা। হঠাৎ কী এমন ঘটল যাতে না কুড়িয়েই তারা চলে যাচ্ছে! ভেবে ভেবে থই পায় না ধানোয়ার। বিড়বিড় করে আপন মনে বলে, 'হো রামজি, তেরে কিরপা।'

চোদ্দ

জ্বরের কারণে শরীর কমজোরি হয়েছে বলে কিছুদিন যে জিরিয়ে নেবে, এমন শৌখিন মানুষ ধানোয়ার নয়। খাদ্যের সন্ধানে আর সব হাভাতের সঙ্গে আবার তাকে জঙ্গলে বা বিলে যেতে হয়।

জঙ্গলের কুল, লাল পিঁপড়ের ডিম, মধু, বাগনর বা অন্য সব ফলমূল এমন অফুরন্ত নয় যে দিনের পর দিন এতগুলো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবে। সেখানকার খাদ্য প্রায় ফুরিয়ে আসে। ডান দিকে বিলের মাছ, কচ্ছপ, গুগলিও শেষ হয়ে এসেছে। আজকাল ফাঁদ, ঢিল বা ইটের টুকরোর ভয়ে সিল্লি, লাল হাঁস, কাঁক বা মানিক পাখিও বেশি আসে না। অথচ খেতে এখনও ধান রয়েছে। সব শস্য মালিকের খলিহানে না ওঠা পর্যন্ত সেখানে নামাও যাচ্ছে না। কাজেই হাভাতেরা খুবই ভাবনায় পড়ে যায়।

একদিন সকালে সখিলাল বলে, 'জঙ্গলের সব কিছুই তো আমরা খতম করে এনেছি। অব কা করে চাচা?'

চাচা অর্থাৎ রামনৌসেরা। ক'দিন ধরে এ সম্পর্কে সে-ও যথেষ্ট ভাবছে। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সে বলে, 'শুনেছি, ওইধারে একটা বড় বিল আছে। ওখানে বহোত মছলি মেলে। তা ছাড়া এহী সাল অনেক মানিক পাখি এসে পড়েছে।' বলে পাক্কীর ওধারে বরাবর দক্ষিণ দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

ফির্তুরাম বলে, 'ওখানে একবার খোঁজ নেওয়া দরকার।'

রামনৌসেরা গলায় জোর ঢেলে বলে, 'হাঁ, জরুর।'

ঠিক হয়, দুপুরের দিকে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে ধানোয়ার এবং লছমন নতুন বিলের সন্ধানে বেরুবে।

সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এলে ধানোয়ার এবং লছমন নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়ে।

লাখপতিয়া তাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তার শাশুড়ি মড়াকান্না জুড়ে দিয়ে তাকে যেতে দেয় নি। এ তো আর খাদ্যটাদ্য নয় যে যেতেই হবে। বিলের খোঁজ আনতে ধানোয়াররাই যাক। তাদের সঙ্গে একটা আওরত না গেলেও চলবে। আদতে সেই ভয়টা বুড়ির ভেতর সর্বক্ষণ অনড় হয়ে আছে। তার যুবতী পুতহু এই বুঝি ধানোয়ারের সঙ্গে পালিয়ে যায়।

কান্নাকাটি করে শেষ পর্যন্ত বুড়ি লাখপতিয়ার যাওয়া আটকে দেয়।

লছমনকে নিয়ে ধানোয়ার প্রথমে পাক্কীতে এসে ওঠে। দক্ষিণ দিকে সোজা খানিকক্ষণ হাঁটার পর রাস্তার লোকজনের কাছে বিলের হদিস জেনে নিয়ে ওধারের কাচ্চীতে নেমে পড়ে। এবার তাদের কোনাকুনি আরো অনেকটা পথ যেতে হবে।

পাকা সড়কের ওপাশের মতোই এধারেও আদিগন্ত ফসলের মাঠ। এখানেও ধানকাটা চলছে এবং মালিকের পাহারাদাররা তদারক করছে। এখানেও মাথার ওপর শীতের মেঘশূন্য নীলাকাশ, সাদা সাদা মেঘ, অফুরন্ত উত্তুরে হাওয়া, পরদেশি শুগা আর চোটার ঝাঁক।

সূর্য পশ্চিম আকাশের দিকে যখন বেশ খানিকটা নেমে গেছে সেই সময় ধানোয়াররা দক্ষিণের বিলে পৌঁছে যায়। কিন্তু এতটা রাস্তা, এত মাঠ পাড়ি দেওয়া কোনো কাজেই লাগে না।

দক্ষিণের এই বিলটা বেশ বড়সড়ই। ধানোয়ারদের কাচ্চীর পেছন দিকের বিলটার মতোই এখানে বেশির ভাগ জায়গাতেই জল শুকিয়ে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। যেখানে যেখানে অল্পস্বল্প জল আছে সেখানে চাপ-বাঁধা অজস্র কচুরিপানা। শুকনো ডাঙাগুলোতে কাশের জঙ্গল, উদ্দাম বুনো ঘাসের বন। এখানেও কাঁক, সিল্লি, মানিক পাখি, লাল হাঁস অর্থাৎ শীতের মরসুমী পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়েছে। সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে প্রচুর লোকজন। কম করে তিরিশ চল্লিশ জন তো হবেই। এক নজরেই টের পাওয়া যায়, ওরা ধানোয়ারদের মতোই ভুখা, হাভাতে, আধনাঙ্গা।

লছমন বলে, 'কুছ ফায়দা নেহী ধানবারচাচা। ইধরি ভি বহোত আদমী।' সে বোঝাতে চায়, যেখানে এত লোক আগেই এসে জড়ো হয়েছে সেখানে বিশেষ সুবিধা হবে না।

ধানোয়ারেরও তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু এতদূর এসে চুপচাপ ফিরে যেতে তার মন সায় দেয় না। দুনিয়ার কোথাও এক দানা খাদ্য অরক্ষিত পড়ে থাকার উপায় নেই, হাভাতের দল অনবরত তা খুঁজে

বেড়াচ্ছে। চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের জীবনে এমন খুব কম জায়গাই ধানোয়ার আবিষ্কার করতে পেরেছে যেখানে বেওয়ারিশ খাদ্য পড়ে আছে অথচ মানুষ সেখানে পৌঁছয় নি। সে বলে, 'দেখা যাক। আয়—'

দু'জনে বিলের ভেতর সেই লোকগুলোর কাছে চলে আসে। তাদের দু-চারজনকে চেনা মনে হয় ধানোয়ারের। ওরাও ধারাল, সন্দিগ্ধ চোখে ধানোয়ারদের দেখতে থাকে।

একটা আধবুড়ো লোক লছমনকে বলে, 'কা রে লছমনিয়া, পাক্কীকা উধারসে ইধরি আয়া! কা হ্যায় তুলোগনকা মনমে? কা ধান্দা?'

এবার মনে পড়ে যায় ধানোয়ারের, যে দলটার সঙ্গে লছমন এবং ছনেরি পাক্কীর ওধারে তাদের সেই সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় গিয়েছিল সে দলে এই আধবুড়ো লোকটাও ছিল। লছমনের বয়স কম, কী বলতে কী বলে বসবে, তাই ধানোয়ারই ব্যস্তভাবে জবাবটা দেয়, 'কুছ নেহী মনমে। ইধরি উধরি ঘুমতা ফিরতা থা। ঘুমতে ঘুমতে চলা আয়া।'

লোকটা বলে, 'ঝুট।'

ধানোয়ার বলে, 'সচ। রামজি কসম।' একান্ত অবলীলায় সে মিথ্যে বলে যায়।

লোকটা সোজা ধানোয়ারের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, 'সমঝ গিয়া তুলোগনকা ধান্দা।' তারপর একনাগাড়ে বলে যায়, তারা যখন পাকা সড়কের ওধারে গিয়েছিল, ধানোয়াররা ভাগিয়ে দিয়েছে। কাজেই তারাও ওদের এখানে ঘেঁষতে দেবে না। ভূচ্চরের দল যেন এখনই ভেগে যায়।

অন্য লোকজনও তার সঙ্গে গলা মেলায়, 'ভাগ যা।'

'যাতা হ্যায়—'

আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। তাদের মতলব শুরুতেই ধরে ফেলেছে এই লোকগুলো। ফলে এত বড় একটা অভিযান পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যায়। ধানোয়ার এবং লছমন বিল থেকে কাচ্চীতে উঠে পাকা সড়কের দিকে হাঁটতে থাকে।

ওভাবে ভাগিয়ে দেবার জন্য ভেতরে ভেতরে ভয়ানক খেপে গিয়েছিল লছমন। সে গজ গজ করতে থাকে, 'শালে গিদ্ধড়েরা—'

ধানোয়ার কিন্তু তেমন উত্তেজিত হয় নি। অনেকটা নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সে জানায়, গুস্‌সা করে লাভ নেই। তারাও ওদের কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল; এখন ওরা শোধ নিল। যে যা করবে, তার ফলটিও হাতে হাতে পাবে, দুনিয়ার এই হল নিয়ম।

এমন ঠাণ্ডা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ব্যাপারটা মেনে নিতে নারাজ লছমন। সে গালাগাল দিতেই থাকে।

ধানোয়ার আর কিছু বলে না।

পাক্কীতে যখন দু'জনে উঠে আসে, সূর্য পশ্চিম দিকে আরো অনেকটা নেমে গেছে। রোদের তাপ দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসে অনবরত পৌষের হিম মিশতে শুরু করছে।

পাক্কীতে রোজকার মতোই বাস, লৌরি, ভৈসা এবং বয়েল গাড়ি স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। সে সবের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ধানোয়ার আর লছমন দু'ধারে তাকায়। ধানখেতের পরিচিত দৃশ্য ছাড়া কোথাও কিছু নেই।

পৌষ মাস পড়তেই বাতাস আরো ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছিল। এই বিকেলবেলাতেই হিম পড়তে শুরু করেছে। আকাশ যেখানে দিগন্তে নেমেছে সেই জায়গাটা এখন ঝাপসা দেখায়।

খানিকটা হাঁটার পর রাস্তার তলায় শুকনো নয়ানজুলিতে সপেরা জগলালকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধানোয়ার। অগত্যা লছমনকেও থামতে হয়। জগলাল উপু হয়ে মাটির ওপর ঝুঁকে একদৃষ্টে কী যেন দেখছে। তার জেনানা শক্ত চেহারার রামিয়া কাছাকাছি বসে পেটফোলা তুমড়ি বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। সুরের উঁচুনিচু ঢেউ শীতের বাতাসে ভাসতে ভাসতে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছাকাছি পড়ে আছে অনেকগুলো সাপের ঝাঁপি আর কিছু পোঁটলাপুঁটলি। রামিয়া এবং জগলাল যেখানেই যাক, নিজের যাবতীয় জাগতিক সম্পত্তি নিয়েই যায়। ও সব কার জিম্মায় রেখে যাবে? বিশ্বাস করার মতো মানুষ এই দুনিয়ায় ক'টাই বা আছে!

লছমনও জগলালদের দেখতে পেয়েছিল। সে বলে ওঠে, 'সপেরা জগলাল—'
ধানোয়ার মাথা নাড়ে, 'হাঁ—'
'সাঁপ পাকড়তা।'
'হোগা অয়সা। চল, দেখে আসি।'
'নেহী ধানবারচাচা, আমি যাব না।'
'কেমন করে সপেরারা সাঁপ পাকড়ায়, দেখতে ইচ্ছা করছে।'
'তবে তুমি যাও। হামনি লৌট যাতা—'
'ঠিক হ্যায়—'

লছমন আর দাঁড়ায় না, পাকা সড়ক ধরে বরাবর হাঁটতে থাকে। আর রাস্তা থেকে নিচে নেমে জগলালদের কাছে চলে আসে ধানোয়ার। আসলে তার হাতে এখন অঢেল সময়। কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলায় ফিরে গিয়েও কিছুই করার নেই। দ্রুত ফাঁকা-হয়ে-আসা ধানখেতগুলোর দিকে হাত-পা গুটিয়ে দিনের পর দিন তাকিয়ে থাকতে কার আর ভাল লাগে! তার চাইতে জগলালের সাপ-ধরা দেখে ওদের সঙ্গেই ফেরা যাবে। ভাতের খোঁজে এসে রোজ রোজ একঘেয়ে সময় কাটিয়ে চলেছে সে। আজ একটু অন্য রকমই হয়ে যাক। তাছাড়া এই অঘ্রন-পূষ মাসে তাবৎ সাপ যখন মাটির ওপর থেকে পৃথিবীর অতল স্তরে ঘুমোতে চলে যায় তখন জগলাল কী করে তাদের ধরে সেটা দেখারও কৌতূহল হচ্ছে।

ধানোয়ারের পায়ের শব্দে বাঁশি থেমে যায় রামিয়ার। একটু চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় জগলাল। হেসে বলে, 'কা ধানবার ভেইয়া, তুম ইঁহা?'

কী উদ্দেশ্যে এদিকে এসেছিল সংক্ষেপে জানিয়ে ধানোয়ার বলে, 'সাঁপ পাকড়ো। হামনি দেখেগা।'

'বহোত আচ্ছা—' বলেই রামিয়ার দিকে তাকায় জগলাল, 'কা রে, তু রুখ গিয়া কায়? বাজা বাঁশুরি।'

ফের তুমড়ি বাঁশি বাজাতে শুরু করে রামিয়া আর জগলাল আবার মাটিতে ঝুঁকে পড়ে জোরে জোরে শ্বাস টানতে থাকে।

ধানোয়ার শুধোয়, 'এত জোরে সাঁস টানছ কেন?'

জগলাল বলে, 'গন্ধ শুঁকছি।'

'কিসের গন্ধ?'

'মিট্টিতে নাক রেখে সাঁস টানো, বুঝতে পারবে।'

কথামতো ধানোয়ার মাটির ওপর অনেকখানি ঝুঁকে শ্বাস টানে। তারপর বিমূঢ়ের মতো জগলালের দিকে তাকায়।

জগলাল জিজ্ঞেস করে, 'কুছ মালুম হুয়া?'

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঝাঁকায় ধানোয়ার। জানায়, পৌষ মাসের ঠাণ্ডা মাটির গন্ধ ছাড়া কিছুই বুঝতে পারছে না।

অবাক হয়ে জগলাল বলে, 'কোঈ গন্ধ নেহী মিলা! বঢ়িয়া খুসবু?

'নেহী তো।' ধানোয়ার আগের মতোই মাথা ঝাঁকায়।

এবার রীতিমত খেপেই যায় জগলাল। ধানোয়ারের ঘ্রাণশক্তি সম্বন্ধে তার প্রবল সন্দেহ দেখা দিয়েছে। বলে, 'কা, তোমার নাক আছে তো?'

জগলালের উত্তেজনা দেখে মজা পায় ধানোয়ার। হাসতে হাসতে বলে, 'হ্যায় তো। এ দেখো—' আঙুল দিয়ে নিজের নাকটা দেখিয়ে দেয় সে।

জগলাল বলে, 'ও জিন্দা আদমীকা নাক নেহী, মুর্দাকা নাক—'

'মানতা হ্যায় হামনিকো নাক মুর্দাকা নাক। লেকেন—'

'কা?'

'মিট্টি ছাড়া এখানে কিসের গন্ধ আছে? বাতাও—বাতাও—'

অসহায়ের মতো ঘাড় নাড়ে ধানোয়ার, 'মালুম নেহী—'
জগলাল বলে, 'সাঁপকো গন্ধ। কোন সাপ জানো?'
'কোন?'
'থুথুরবা (এই সাপকে দোমুহিয়াও বলে। এরা মানুষ বা জন্তু জানোয়ার দেখলে অনবরত থুতু ছিটোয়। এদের থুতুতে বিষ থাকে)।'
ধানোয়ার অবাক হয়ে যায়, 'হাঁ!'
'হাঁ। লেকেন সাঁপটা রয়েছে অনেক নিচে। আপসোসকা বাত, ওটাকে বার করে আনতে পারব কিনা, বুঝতে পারছি না।' জগলালকে বেশ চিন্তাগ্রস্ত দেখায়।
ধানোয়ারের বিস্ময় কাটে না। সে বলে, 'মাটির গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পার, কোথায় কোন সাপ আছে!'
'জরুর।' জগলাল জানায়, এটুকু যদি না-ই পারল তা হলে সারা জীবন সাপের পেছনে ছুটছে কেন? বৃথাই তা হলে তার সপেরা হওয়া।
ধানোয়ার এবার কিছু বলে না।
জগলাল থামে নি। সে সমানে বলে যায়। সাপের চলার দাগ দেখে নাকি সে বলে দিতে পারে কোথা দিয়ে গেছে বিষাক্ত গেহুমন বা ধামন। বলতে পারে কোনটা সাঁকড় অথবা করায়েতের পেট টেনে চলার চিহ্ন। কোনো সাপের গর্তের মুখে বসে সে টের পায় এখানে ছানাপোনাসুদ্ধ রয়েছে হরহরা কিংবা তেলিয়া। তার ঘ্রাণেন্দ্রিয় এতই প্রখর যে, জলে স্থলে বা মাটির অতলে কোনো সাপের লুকিয়ে থাকার উপায় নেই। জগলাল তাদের খুঁজে বার করবেই। কোন সাপের গায়ে কী গন্ধ, ঋতুতে ঋতুতে সেই গন্ধ কিভাবে বদলায়, সব তার জানা। কোন সাপের রং কী, তাদের বিষের ক্রিয়া কেমন, অর্থাৎ দুনিয়ার তাবৎ সাপের কুলশীল, সমস্ত কিছুই তার মুখস্থ।
শুনতে শুনতে মুনোয়ারপ্রসাদের কথা মনে পড়ে যায় ধানোয়ারের। মুনোয়ারপ্রসাদ যেমন ধান চেনে, অবিকল তেমনি জগলাল সপেরা চেনে সাপ। তারিফ করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে ধানোয়ার। বলে, 'হো সাকতা, হো সাকতা। তুমি তো সপেরা। তুমি সাঁপের গন্ধ মালুম করতে না পারলে আর কে পারবে?'
জগলাল খুশিই হয়। বলে, 'থোড়া ঠহ্‌র যাও ধানবার ভেইয়া, গর্ত থেকে থুতুরবাটাকে বার করে আনি।'
রামিয়া এখনও তুমড়ি বাঁশি বাজিয়েই চলেছে। জগলাল এবার একটা ঝোলা থেকে কী সব শেকড়-টেকড় বার করে গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। তারপর চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী বলে যায়। খুব সম্ভব সাপের মন্ত্র।
এইভাবে অনেকটা সময় কাটে কিন্তু জগলালের এত চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যায়। মাটির গভীর তলদেশ থেকে থুথুরবা বেরিয়ে আসে না।
জগলাল বলে, 'শালে হারামী, নেহী নিকলেগা। চল, অন্য কোথাও দেখি।'
অফুরন্ত আশা বা উৎসাহ জগলালের, কোনো কারণেই বুঝি হতাশ হয় না। কাঁধে সাপের ঝাঁপিগুলো তুলে নেয় সে। বাকি পোঁটল-পুঁটলিগুলো হাতে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ায় রামিয়া। দু'জনে নয়ানজুলির শুখা খাত ধরে খাড়া হাঁটতে থাকে। ধানোয়ারও তাদের সঙ্গ নেয়। খানিকটা যাবার পর আরেকটা গর্ত দেখে থেমে যায় জগলালরা। ব্যস্তভাবে ঝাঁপি-টাপি নামিয়ে গর্তটার ওপর ঝুঁকে পড়ে জগলাল। সেটা লক্ষ করতে করতে তার চোখ চকচকিয়ে ওঠে। জোরে জোরে শ্বাস টেনে মাটি শুঁকতে শুঁকতে বলে, 'ধানবার ভেইয়া, এটা কিসের গর্ত জানো?'
'নেহী—' ধানোয়ার মাথা নাড়ে।
'সাঁপের গর্ত।'
এদিকে রামিয়া তার কাঁধের ঝোলাঝুলি নামিয়ে তক্ষুনি গাল ফুলিয়ে তুমড়ি বাঁশিতে ফুঁ লাগায়। আর আগের মতোই পোঁটলা থেকে শেকড়বাকড় বার করে গর্তের মুখে রাখতে রাখতে জগলাল বলে,

'আজ বহোত সৌভাগ ধানবার ভেইয়া। এই যে গর্তটা দেখছ, এটা কোন সাঁপের জানো?'

'কোন?' ধানোয়ার শুধোয়।

খুবই উত্তেজিত স্বরে জগলাল বলে, 'গেহুমন (কেউটে)। মাটির গন্ধ থেকে মালুম হচ্ছে, সাঁপটা বেশি নিচে যায় নি, দো-চার হাতের মধ্যেই আছে। হো রামজি তেরে কিরপা—' বলে বিড়বিড় করে আবার আগের মতো মন্ত্র পড়তে শুরু করে।

বেশ খানিকটা সময় এভাবে কেটে যায়। তারপর অসীম দুঃসাহসে গর্তের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেয় জগলাল এবং চোখের পলকে একটা সাপের লেজ ধরে বার করে আনে।

জগলাল যা বলেছিল ঠিক তাই। সাপটা গেহুমনই। কমসে কম হাত তিনেক তো হবেই, গায়ে কালোর ওপর সাদা সাদা চক্কর। ধানোয়ারের এতক্ষণে পুরা বিশ্বাস হয়, গন্ধ শুঁকে সত্যি সত্যিই সাপ চিনতে পারে জগলাল। সে একেবারে তাজ্জব বনে যায়।

শীতের সাপ নির্জীব হলে কী হবে, জাতে তো গেহুমন। অসময়ে ঘুম ভাঙাবার জন্য সেটা খেপে ওঠে। মাটিতে ছেড়ে দিতেই লেজের ওপর ভর দিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ে। তার বিরাট ফণা অল্প অল্প দুলতে থাকে। লাল কাচের দানার মতো দুই চোখ আক্রোশে জ্বলছে।

জগলাল সাপটার দিকে হাত বাড়িয়ে নাচাতে নাচাতে বলে, 'এ শালে জেনানা সাঁপ। বহোত তেজ—'

সাপটা প্রচণ্ড রাগে জগলালের হাত লক্ষ করে ছোবল মারে কিন্তু অদ্ভুত এক জাদুকরের মতো তার আগেই হাত সরিয়ে নেয় জগলাল এবং সাপের ফণা গিয়ে পড়ে মাটিতে। তক্ষুনি বিদ্যুৎগতিতে এক হাতে সাপটার গলা, অন্য হাতে লেজের কাছটা টিপে ধরে একটা ছোট ঝাঁপিতে পুরে ফেলে জগলাল। বলে, 'গেহুমনের জহরের (বিষ) চড়া দাম। চার পাঁচ রোজের জন্যে আর চিন্তা নেই।' অসীম উত্তেজনায় তার গলা কাঁপতে থাকে। কয়েকটা দিনের জন্য পেটের দুশ্চিন্তা থাকবে না, তাদের মতো হাভাতেদের কাছে এটা মস্ত ব্যাপার।

সাপটাকে ঝাঁপিতে পুরে ফেলার পর আর দাঁড়ায় না জগলাল। পোঁটলা পুঁটলি ফের কাঁধে চাপিয়ে বলে, 'চল ধানবার ভেইয়া। আজকের মতো আমার কাম খতম।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা পাক্কীতে এসে ওঠে। জগলাল বলে, 'তুমনি লৌট যাও ভেইয়া।'

'তোমরা ফিরবে না?'

'নেহী। আমরা এখন সিধা পূর্ণিয়া যাব। সাঁপের জহর বেচে কাল ফিরব।'

জগলাল এবং রামিয়া সোজা হাঁটতে থাকে। ধানোয়ার দাঁড়িয়ে পড়ে। অনেক দূরে পাকা সড়কের বাঁকে যখন এক সপেরা এবং তার আওরত অদৃশ্য হয় সেই সময় ঘুরে দাঁড়ায় ধানোয়ার। জগলালেরা যেদিকে গেছে তার উলটো দিকে সে যাবে। এখন কম করে 'কোশ'ভর হাঁটতে হবে তাকে।

লৌরি, বয়েল এবং ভৈসা গাড়ির পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে সন্ধে নেমে গিয়েছিল, কখন পৌষের হিমবর্ষী আকাশের নিচে কুয়াশা জমতে শুরু করেছিল, পুরোপুরি খেয়াল ছিল না ধানোয়ারের। হঠাৎ মাথার ওপর উড়ন্ত অগুনতি কাঁক পাখির চিৎকারে চমকে ওঠে সে। দেখতে পায়, তাদের সেই কাচ্চীর কাছাকাছি এসে পড়েছে। সড়কের ওপারে গিয়েই তার নজরে পড়ে, নয়ানজুলির ঢালে একটা বড় পিপর গাছের তলায় ডিবিয়া জ্বলছে এবং সেখান থেকে ফুটন্ত ভাতের গন্ধ আসছে। ওখান থেকে আওরতের হাসি এবং একটা পুরুষের গলাও ভেসে আসছে। ধানোয়ার দাঁড়িয়ে পড়ে। কতকাল পর সে ভাতের গন্ধ পেল!

এই সন্ধ্যায় এখানে কে ভাত ফোটাচ্ছে? ডিবিয়ার আলো থাকলেও কুয়াশা এবং অন্ধকার বড় গাঢ়। ভাল করে ঠাওর করতে ধানোয়ার দেখতে পায় পহেলবান মধেলি সিং কী সব মজার মজার কথা বলছে আর ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির পাশে বসে নাথুনি হেসে হেসে ঢলে পড়ছে। তার পরনে একটা নতুন ঝলমলে শাড়ি। একটু দূরে বসে তার ভোলাভালা মরদ গৈয়ারামও হাসছে।

মনুষ্যজগৎ সম্বন্ধে প্রায় অনভিজ্ঞ ধানোয়ার প্রথমটা অবাক হয়ে যায়। পরক্ষণেই কড়াইয়া এবং

সিমার গাছগুলোর তলা থেকে নাথুনিদের চলে আসার কারণটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কতটা দাম দিয়ে নাথুনিরা ভাত খেতে পাচ্ছে, সেটাও তার কাছে আর অস্পষ্ট নয়।

ধানোয়ারের হঠাৎ মনে পড়ে, পনের বিশ দিন সে ভাতের মুখ দেখে নি। কষ্টে তার বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যায় যেন। মনে মনে বলে, 'হো রামজি, হো বিষুণজি, হামনিকা বড়া দুখ—'

পনের

আরো কয়েকটা দিন কেটে যায়।

অঘ্রান মাসের শেষ দিকে ধানোয়াররা ভাতের সন্ধানে দক্ষিণের এই ধানের দেশে চলে এসেছিল। দেখতে দেখতে পৌষ মাসেরও দশ বারটা দিন কেটে গেল।

চারদিকের খেতগুলো থেকে এখনও সব ধান উঠে যায়নি। তবে বেশির ভাগ মাঠই ফাঁকা হয়ে গেছে। জমিতে এখনও যা ফসল আছে তা তুলতে কম করে আরো সাত আট দিন লেগে যাবে।

মুসহর আর আদিবাসী মরসুমী কিষানেরা আগের মতোই রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে খেতে চলে আসে। সারাদিন ধান কেটে সন্ধেবেলা ফসল বোঝাই গৈয়া আর ভৈসা গাড়ির পেছন পেছন মালিকদের খামার বাড়িতে চলে যায়। সব কিছুই আগের নিয়মে চলছে।

পৌষ মাস পড়তেই বাতাস আরো হিমেল হয়ে উঠেছে, কুয়াশা আরো ভারি হয়ে নামে আজকাল। হিমের স্তর ঠেলে তিন হাত দূরেও এখন নজর চলে না।

দক্ষিণের সেই বিলে সেদিন ধানোয়ারদের যাওয়াই সার হয়েছিল। পাক্কীর ওধারের হাভাতেরা তাদের ভাগিয়ে দিয়েছে। কাজেই এদিকের জঙ্গলেই ফের তাদের যেতে হচ্ছে, যেতে হচ্ছে কাচ্চীর পেছন দিকের মজা বিলে। যতদিন না মাঠে নামা যাচ্ছে ওই বিল আর জঙ্গলই আপাতত তাদের ভরসা।

জঙ্গল থেকে ধানোয়ারেরা যোগাড় করে আনে সুথনি, তেলাকুচ, কচু, মেটে আলু এবং বুনো ধুধুর। টক বুনো কুলও এনেছে ক'দিন। বিল ছেঁকে তুলে এনেছে মুংরি মাছ, কচ্ছপ। সর্বন আর সাবুই ঘাসের ঝোপ থেকে ডাহুক আর বগেরিও মেরে এনেছে বারকয়েক। আর মেরে এনেছে খেরোহা (খরগোস)।

জঙ্গলে প্রথম দিন সেই যে মারাত্মক একটা সাপ দেখা গিয়েছিল, তারপর আর কোনো বিপজ্জনক জানোয়ার ধানোয়ারদের চোখে পড়েনি। দু'দিন তারা আট দশটা শিয়ালের দুটো দলকে দৌড়ে পালাতে দেখেছে। আর একদিন জঙ্গলে ঢুকবার মুখেই দেখা গিয়েছিল একটা বুনো দাঁতাল শুয়োর। শুয়োরটা তাদের দেখতে পায়নি, আস্তে আস্তে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গিয়েছিল।

এর মধ্যে দু'দিনে আরো একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। লাখপতিয়া দু'দিনই কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় ছিল না, সামনের নহর থেকে লোটা ভরে 'পীনেকা পানি' অর্থাৎ খাওয়ার জল আনতে গিয়েছিল। সেই সময় আস্তে আস্তে লাখপতিয়ার বুড়ি শাশুড়ি ধানোয়ারের গা ঘেঁষে বসে চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলেছে, 'এ ধানবার—'

এই সিমার আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় প্রায় পনের যোল দিন এই হাভাতের দল একসঙ্গে রয়েছে কিন্তু কখনও যেচে বুড়ি ধানোয়ারের সঙ্গে কথা বলেনি। ফলে রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল সে। বুড়ির দিকে তাকিয়ে শুধিয়েছে, 'কী বলছ?'

'একগো বাত—'

'বল।'

'গুস্‌সা হবি না তো?'

'নায় নায়।'

বারকতক ঢোক গিলে বুড়ি বলেছে, 'ওই যে লাখপতিয়া—মতলব হামনিকো পুতহু--'

ধানোয়ার বলেছে, 'হাঁ--'

'পুতহুটা ছাড়া ইস দুনিয়ামে আমার আর কেউ নেই।'

ধানোয়ারের ভুরু আর কপাল কুঁচকে গেছে। সে বুঝতে পারছিল বুড়ি এই যে ধানাই পানাই শুরু করেছে তার পেছনে একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে। সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে সে বলেছিল, 'হামনি জানতা হ্যায়। আসলে যা বলতে চাও বলে ফেল।'

বুড়ি এবার বলেছে, 'তোরা রোজ জঙ্গলে যাস—'

'জঙ্গলে না গেলে খাব কী?'

'লেকেন আমার বুক কাঁপে। তুলোগন যব তক নায় লৌটতা হামনিকা এত্তে ডর লাগতা কা কহোগী!'

ধানোয়ার জানায় ভয়ের কিছু নেই। তারা এত জন একসঙ্গে জঙ্গলে যায়। সবার হাতেই লাঠি, দা বা টাঙ্গি থাকে। হিংস্র জন্তুরা তাদের কিছুই করতে পারবে না।

গলার স্বর খানিকটা উঁচুতে তুলে লাখপতিয়ার শাশুড়ি বলেছে, 'নায়, খতারনাক জানবরের কথা বলছি না।'

'তব্?'

'তোর আর লাখপতিয়ার কথা বলছি।'

'কী কথা!' রীতিমত তাজ্জবই বনে গেছে ধানোয়ার।

লাখপতিয়ার শাশুড়ি বলেছে, 'জঙ্গল থেকে আমার পুতহুটাকে নিয়ে তুই কোথাও ভেগে যাস না। ওকে ভাগিয়ে নিলে আমি মরে যাব। বিলকুল ভুখা মর যায়েগী।'

বুড়ি যে এরকম একটা কথা বলবে, ভাবতে পারেনি ধানোয়ার। অনেকক্ষণ থ হয়ে চুপচাপ তাকিয়ে থেকেছে সে। তারপর বলেছে, 'নিজের পেটের দানাই জোটাতে পারি না। আওরত ভাগিয়ে নিয়ে কী করব আমি? ভেবো না, তোমার পুতহু তোমারই থাকবে।'

ধানোয়ারের কাঁধে মাংসহীন শীর্ণ হাত রেখে কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে বুড়ি বলেছে, 'সচ বলছিস তো?'

সেদিন রাত্রে লাখপতিয়া ভগোযানের নামে কসম খেয়ে বলার পরও সন্দেহ এবং দুশ্চিন্তা যাচ্ছিল না বুড়ির। ধানোয়ার বলেছে, 'হাঁ হাঁ, সচ।'

ধানোয়ারের কাঁধে বুড়িব শুকনো গাঁটপাকানো সরু সরু আঙুলগুলো কাঁপতে থাকে। বিড় বিড় করে ঝাপসা গলায় সে বলে, 'রামচন্দজি কিষুণজি তোব ভালাই করবে।'

জঙ্গল থেকে হাভাতেরা যে কচুঘেঁচু, মেটে আলু, সুথনি, কচ্ছপ বা পাখি, অর্থাৎ যা যা নিয়ে আসে সে সব খেয়ে সকলের মুখ হেজে গেছে। কিন্তু কিছুই করার নেই। চোখের সামনে মাঠ জুড়ে লক্ষ কোটি সোনার দানা, অথচ তা ছোঁয়ারও উপায় নেই।

কচুঘেঁচু পুড়িয়ে ঝলসে বা সেদ্ধ করে, নুন মিশিয়ে সকলে নীরবে খেয়ে যায়। কিন্তু লাখপতিয়ার শাশুড়ি আর পরসাদীর বাচ্চাদুটো রোজ খাওয়ার সময় ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে দেয়।

'নেহী খায়েগা, নেহী খায়েগা। গরম ভাত্তা দে—'

রোজই তাদের বোঝানো হয়, আর ক'টা দিন, তারপর নিশ্চয়ই দু'বেলা পেট ভরে ভাত খেতে দেওয়া হবে। এই সান্ত্বনার কথা আগেও তারা কয়েক হাজার বার শুনেছে। তাই আর বিশ্বাস করে না। তাদের ধৈর্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অবুঝ বুড়ি এবং বাচ্চা দুটো সমানে মাথা ঝাঁকায় আর বলে, 'নেহী। আভি গরম ভাত্তা দিতে হবে। আভি-আভি-আভি—'

আজ দুপুরে সুথনি সেদ্ধ এবং টক কুল ছাড়া খাওয়ার মতো আর কিছুই নেই। সেগুলো দেখামাত্র বুড়ি আর পরসাদীর ছেলে দুটো সমানে চিৎকার জুড়ে দেয়। হাজার বুঝিয়েও যখন কিছুই হয় না তখন লাখপতিয়া বুড়িকে বলে, 'এখন এগুলো খেয়ে নে। রাতমে জরুব গবমভাত্তা মিলেগা।'

'ঠিক বলছিস?'

'হাঁ হাঁ, ঠিক।'

কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় ভুখা আধনাঙ্গা মানুষগুলো ভাবল অন্য সব দিনের মতো লাখপতিয়া বুড়িকে স্তোক বাক্য দিচ্ছে। তারা কিছু বলে না।

পরসাদীর ছেলে দুটো আচমকা গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বুড়হী গরমভাত্তা খাবে। আমরা খাব না?'

পরসাদী লাখপতিয়ার মতোই বলে ওঠে, 'খাবি খাবি, আগে রাত হোক।'

তারপর সারাটা দিন লাখপতিয়ার শাশুড়ি এবং পরসাদীর ছেলে দুটো 'ভাত ভাত' করে অনবরত ঘ্যান ঘ্যান করে যায়।

লাখপতিয়া দুপুরে তার শাশুড়িকে যা বলেছিল সেগুলো শুধু কথার কথাই নয়। সে আজ ফাঁপা সান্ত্বনা বা স্তোক দেয় নি।

রাত্তিরে 'ঘুর'-এর আগুনের চারপাশে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে আস্তে আস্তে মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে বুড়ির গলা শোনা যায়, 'বহু—'

ঘাড় ফেরাতেই চোখাচোখি হয়। বুড়ি তা হলে জেগেই আছে! লাখপতিয়া বলল, 'কা?'

বুড়ি শুধোয়, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

সতর্কভাবে চারদিক দেখে নিল লাখপতিয়া। তারপর বুড়ির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ধানের জমিনে।'

'ঘুর'-এর আগুনের আভায় বুড়ির মুখটা চক চক করতে থাকে। লুব্ধ গলায় সে বলে, 'কা রে, ধান চুরাতে (চুরি করতে) যাচ্ছিস?'

'হাঁ। ভাতেব জন্যে আমাকে ছিঁড়ে খাচ্ছিস না? না চুরালে তোকে ভাত খাওয়াব কী করে? চুপচাপ শুয়ে থাক। আমি যাব আর আসব।'

'লেকেন—'

'ফির কা?'

লোভের বদলে বুড়ির চোখেমুখে এবার ভয়ের ছায়া পড়ে। সে বলে, 'পেহরাদাররা জমিনে বসে আছে।'

'থাক।' লাখপতিয়া জানায়, পাহারাদারদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে জরুর ধান নিয়ে আসবে। ধানের জন্য আজ সে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

'হোঁশিয়ার—'

'হাঁ হাঁ, বহোত হোঁশিয়ার। তুই এখন ঘুমো—' বলে বুড়ির মুখের ওপর সযত্নে কম্বলটা টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় লাখপতিয়া। সে জানে হাভাতেদের কেউ এখন জেগে নেই। কাঁথা বা ধুসো কম্বল মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে সবাই ঘুমোচ্ছে।

মাথার ওপর কড়াইয়া গাছের ডাল থেকে কর্কশ গলায় কামার পাখিরা ডেকে উঠছে। এ ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দ নেই।

কালো কম্বলে নিজের গোটা শরীর ঢেকে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে কাচ্চী পেরিয়ে ধানখেতের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় লাখপতিয়া। আলের দিকে পা বাড়াতে যাবে, সেই সময় উত্তুরে হাওয়ায় কার ফিসফিস, চাপা গলা কানে ভেসে আসে, 'এ লাখপতিয়া—'

চমকে মুখ ফেরাতে লাখপতিয়া দেখতে পায়, ঠিক পেছনেই পারসাদী দাঁড়িয়ে আছে। পুরো শরীর কাঁথায় জড়ানো। মেয়েমানুষটা কখন 'ঘুর'-এর পাশ থেকে উঠে এসেছে টের পাওয়া যায় নি। লাখপতিয়া শুধোয়, 'তু!'

'হাঁ, হামনি—' আস্তে মাথা নাড়ে পারসাদী। বলে, 'কা করে? ছৌয়া দুটো ভাত ভাত করে রোজ কাঁদে। আজ দুপুরে ঠিকই করে রেখেছিলাম রাত্তিরে সবাই ঘুমোলে ধান চুরাবো। ছৌয়া দুটোর কান্না আর সইতে পারি না।'

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে লাখপতিয়া। বলে, 'আমারও তো একই হাল, বুড়ি সাসটা ভাতের জন্যে মরছে—'

'হাঁ, এখন চল।'

দু'জন কাঁচা সড়ক থেকে ধানখেতের আলে নেমে আসে। ধানের জন্য মাঠের ভেতর অনেকটা যেতে হবে। কমসে কম আধ রশি তো নিশ্চয়ই। কেননা কাচ্চীর ধারে যে খেতগুলো তার সব ফসল উঠে গেছে।

অন্যদিনের মতো চারদিকের জমিতে উঁচু মাচায় হ্যাজাক জ্বলছে। পাহারাদারদের ঘুমজড়ানো গলা মাঝে মাঝে ভেসে আসে, 'হোঁশিয়ার—'

ক'দিন আগে আকাশে পুনমের চাঁদ ছিল। এখন বোধ হয় অমাবস্যা। অন্ধকার আর কুয়াশায় সমস্ত চরাচর ডুবে আছে। তবে ছুঁচের মতো গাঢ় অন্ধকার ফুঁড়ে হাজার হাজার জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে।

লাখপতিয়া বলে, 'খাড়া হয়ে হেঁটে যাওয়া যাবে না। পেহরাদারদের চোখে পড়ে যাব।'

পরসাদী বলে, 'তব্?'

'আমি যেভাবে যাচ্ছি সেইভাবে আয়—' বলে আলের ওপর উবু হয়ে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে এগিয়ে যায়। তার পেছন পেছন পরসাদী একইভাবে চলতে থাকে।

কুয়াশায় আলের ঘাস ভিজে আছে। হিমালয় এখান থেকে খুব দূরে নয়। উত্তুরে হাওয়া সারা গায়ে সেখান থেকে হিম জড়িয়ে ছুটে আসছে।

এতক্ষণ 'ঘুর'-এর পাশে ছিল বলে ঠাণ্ডাটা তত টের পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখন লাখপতিয়াদের মনে হচ্ছে হাত-পায়ের আঙুল, নাক, কান—সব যেন খসে পড়বে; গায়ের চামড়া ফেটে যাবে। হাওয়া থেকে, কুয়াশা থেকে কনকনে হিম চামড়ার লাখ লাখ সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে রক্তের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে যেন।

অনেকটা যাবার পর ফসলভর্তি একটা জমি পাওয়া গেল। জন্তুদের মতো চার হাত-পায়ে সেখানে নেমে যায় লাখপতিয়ারা। কোমরে দু'জনেই ধারাল ছুরি বেঁধে নিয়ে এসেছিল। বাঁ হাতে ধানের গোছা মুঠো করে ধরে যেই কাটতে যাবে, আচমকা কাছের একটা মাচা থেকে এক পাহারাদার চেঁচিয়ে ওঠে, 'কৌন? কৌন রে?'

হারামজাদকা ছৌয়াগুলোর দু চোখে যেন গিধের নজর। ঘন কুয়াশা হোক, গাঢ় অন্ধকার থাক, সব ভেদ করে ওদের নজর চলে। খুব সম্ভব দশ 'মিল' তফাত থেকে ওরা সব কিছু দেখতে পায়। ভয়ে পরসাদী আর লাখপতিয়ার বুকের ভেতরটা জমাট বেঁধে যায়। কিছুক্ষণ অসাড় হয়ে তারা দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে কাচ্চীর দিকে দৌড়ুতে শুরু করে।

এদিকে পাহারাদারটা তুমুল চিৎকার জুড়ে দিয়েছে, 'চোর-চোর-চোর। ভাগতা হ্যায়, পাকড়ো—'

বিশাল মাঠের চারপাশের অগুনতি মাচা থেকে অন্য পাহারাদাররাও চেঁচাতে থাকে, 'চোর-চোর—'

একসময় পরসাদী আর লাখপতিয়া দেখতে পায়, পুব পশ্চিম আর দক্ষিণ দিক থেকে চল্লিশ পঞ্চাশটা পাহারাদার দৌড়ে আসছে। শরীরের সবটুকু শক্তি পায়ে জড়ো করে দু'জনে ছুটতেই থাকে, ছুটতেই থাকে। কিন্তু কাচ্চী পর্যন্ত যাবার আগেই পাহারাদাররা তাদের ঘিরে ফেলে। ভয়ে আতঙ্কে দু'হাতে মুখ ঢেকে এই ভয়ঙ্কর শীতের রাতেও দুটো মেয়েমানুষ গল গল করে ঘামতে থাকে।

পাহারাদাররা চিৎকার করে বলে, 'কৌন তোরা? অ্যাই, মুহ্সে হাত হটা—'

ভয়ে ভয়ে হাত সরায় লাখপতিয়ারা। সঙ্গে সঙ্গে একটা পাহারদার তাদের মুখে টর্চের আলো ফেলে এবং তৎক্ষণাৎ চিনতে পারে। বলে, 'কলিজায় সাহস আছে শালীদের। ভুচ্চরের বাচ্চাগুলো—'

আরেকটা পাহারাদার গর্জে ওঠে, 'তোদের না বলেছি, ধান উঠবার পর জমিনে নামবি।'

লাখপতিয়া বা পরসাদী, কেউ উত্তর দেয় না।

অন্য একটা পাহারাদার লোহার গুলবসানো ভারি লাঠি ঠুকে মারার জন্য তেড়ে আসে। অন্যরা তাকে থামিয়ে দেয়, 'আওরত হ্যায়। গায়ে হাত উঠিও না।'

পাহারাদারটা খেপে যায়, 'হাত ওঠাতে তো বারণ করছ। তবে কি চোরের বাচ্চাদুটোকে এমনি এমনি ছেড়ে দেব?'

'নেহী—' একটা ঠাণ্ডা মাথার পাহারাদার এগিয়ে এসে বলতে থাকে, 'এমনি ছাড়া হবে না। কুছ তো করনাই পড়েগা।' বলেই টান মেরে কাঁথা কম্বল আর পরনের কাপড় খুলে লাখপতিয়া এবং পরসাদীকে পুরো উলঙ্গ করে দেয়। তারপর আবার শুরু করে, 'পয়লা বার বলে শ্রিফ নাঙ্গা করে ছেড়ে দিলাম। ফের ধান চুরাতে এলে কী করব জানিস?' বলে মারাত্মক জঘন্য কতকগুলো ইঙ্গিত দিতে দিতে মেয়েমানুষ দু'টার নোংরা কাপড়চোপড় পাশের জমিতে ছুঁড়ে দেয়।

অন্য পাহারাদাররা খ্যাল খ্যাল করে হাসতে হাসতে পৌষের নির্জন ঘুমন্ত প্রান্তরে হিমার্ত বাতাসকে বিষাক্ত করে তোলে।

এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটে যায় যে প্রথমটা একেবারে থ হয়ে গিয়েছিল লাখপতিয়া। শরীরে তাদের সাড় ছিল না যেন। হঠাৎ হুঁশ হতে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যায়। পরক্ষণে এক হাতে বুক ঢেকে আরেক হাত দিয়ে কাপচোপড় কুড়িয়ে দৌড়ুতে থাকে।

পাহারাদাররা তাদের ছেড়ে দেয় না। পিছু পিছু তাড়া করে আসতে থাকে। ওদের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে, 'জানবরগুলোকে কাচ্চী থেকে হটাতে হবে। নায় তো ফির ধান চুরানে আয়েগী—' কড়াইয়া এবং সিমার গাছগুলোর তলা থেকে হাভাতেদের উৎখাত করে ধানচুরির সম্ভাবনাটা একেবারেই শেষ করে দিতে চাইছে ওরা।

ওদিকে চিৎকার আর হইচই শুনে 'ঘুর'-এর চারপাশে হাভাতেদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ব্যাপারটা যে কী ঘটেছে ঠিক বুঝতে না পেরে তারা আকণ্ঠ উৎকণ্ঠা নিয়ে ধানখেতের দিকে তাকিয়ে থাকে। একসময় অবাক হয়ে দেখতে পায়, লাখপতিয়া আর পরসাদী দৌড়ে আসছে। তাদের গায়ে একটা সুতোও নেই।

ওদের দেখে চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। লাখপতিয়ার শাশুড়ির চোখে তেজ না থাকলেও উলঙ্গ পুতহু আর পরসাদীকে দেখতে পেয়েছিল। আচমকা ডুকরে কেঁদে ওঠে সে। বাতাস, গাঢ় অন্ধেরা আর কুয়াশা ফুঁড়ে ফুঁড়ে তার কান্নার শব্দ বহুদূর ছড়িয়ে যেতে থাকে। বুড়ির দেখাদেখি পরসাদীর বাচ্চাদুটোও তুমুল চিৎকার জুড়ে দেয়।

উদ্বিগ্ন মুখে টহলরাম শুধোয়, 'কা হুয়া? এ পরসাদী, এ লাখপতিয়া—কৌন তুলোগকা অ্যায়সা বুরা হাল কিয়া?'

উত্তর না দিয়ে গাছগুলোর পেছনে চলে যায় দুই মেয়েমানুষ। একটু পরেই কাপড়-টাপড় গায়ে জড়িয়ে 'ঘুর'-এর পাশে এসে বসে। ততক্ষণে পহেলবানেরা জমি থেকে উঠে এসেছে। তারা বলে, 'এত হোঁশিয়ার করে দিলাম, তবু তোরা কানে তুললি না! তোদের দো আওরত ধান চুরাতে জমিনে নেমেছিল। ভূচ্চরের দল, কিরপা করে তোদের এখানে থাকতে দিয়েছি। লেকেন আর না। ভাগ শালে চুহার বাচ্চারা—আভি ইধরসে ভাগ যা—'

রামনৌসেরা এবং ধানোয়ার থেকে শুরু করে সবাই পহেলবানদের হাতে পায়ে ধরতে থাকে। বলে, দিনের পর দিন ভাত না খেতে পেয়ে পরসাদীর বাচ্চাদুটো আর লাখপতিয়ার শাশুড়ি ওদের দু'জনকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। মাথার ঠিক ছিল না ওদের, তাই ধানখেতে নেমেছিল। এবারের মতো মাফ করে দেওয়া হোক। সবাই কথা দিচ্ছে, সমস্ত ফসল ওঠার আগে কেউ আর জমিতে নামবে না। অনেক কাকুতি-মিনতি এবং ধরাধরির পর পহেলবানরা খানিকটা নরম হয়। নতুন করে আরেক বার হুশিয়ারি দিয়ে তারা জমিতে ফিরে যায়।

হাভাতেরা আর বসে থাকে না। রামনৌসেরাই তাড়া দিয়ে দিয়ে সবাইকে শুইয়ে দেয়।

অনেকক্ষণ পর ভাঙা গলায় লাখপতিয়ার শাশুড়ি লাখপতিয়াকে ডাকে, 'বহু—'

লাখপতিয়া ঘুমোয় নি; কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটার কথাই ভাবছিল। চমকে সাড়া দেয়, 'কা?'

'পহেলবানরা তোকে নাঙ্গা করে দিল, তোর বেইজ্জতি করল। আমি আর ভাত চাইব না বহু।' বলে কাঁদতে থাকে বুড়ি। তার স্বর ক্রমশ বুজে যায়।

বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে লাখপতিয়ার। সে কিছু বলে না।

বুড়ি আবার শুরু করে, 'হামনিকো ভাতকা জরুরত নেহী। অমন ভাত খাওয়ার দরকার তিনবার

লাথ, তিনবার থুক।’ বলতে বলতে সমানে ফোঁপাতে থাকে। তারই ভাতের ব্যবস্থা করতে গিয়ে পহেলবানদের হাতে পুতহুর যে জঘন্য অসম্মান হয়েছে তাতে কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে বুড়ির।

গভীর মমতায় শাশুড়িকে বুকের ভেতর টেনে এনে লাখপতিয়া বলতে থাকে, ‘চুপ হো যা, চুপ হো যা—’ তার গলাও ঝাপসা হয়ে আসে। চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরতে থাকে।

ষোল

সব ধান উঠবার পর এ অঞ্চলের জমি মালিকেরা আরা, সাহারসা বা সুদূর মির্জাপুর থেকে নৌটঙ্কীর দল আনিয়ে নাচগনের আসর বসিয়ে দেয়। এই সময়টা খামার-বাড়ির খলিহানগুলো ফসলে বোঝাই থাকে, জমি মালিকদের মেজাজও দরাজ হয়ে যায়। সারা বছর যারা তাদের জমিতে খাটে সেই মুসহর আর শীত মরসুমের ধান কাটানিদের জন্য দুটো পয়সা খরচ করে আমোদের একটু ব্যবস্থা করতে তাদের ভালই লাগে। অবশ্য মুসহর বা খেতমজুররাই শুধু না, নৌটঙ্কীর গন্ধ পেলেই চারপাশের দেহাতীরা ভেঙে পড়ে। এই সামান্য আনন্দটুকুর জন্য সারা বছর ধরে গরিব ‘গাঁও কা আদমী’রা উন্মুখ হয়ে থাকে।

এ বছর সবার আগে মৈথিলী বামহন ভানচন্দ ঝাঁয়ের জমিগুলো থেকে সব ফসল উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভানচন্দ সাহারসা থেকে নৌটঙ্কীর দল আনার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। আজ থেকে পর পর তিন রাত তারা গাইবে।

রাজপুত ত্রিলোকী সিং, কায়াথ বজরঙ্গী সহায় এবং যদুবংশছত্রি ঝামরলাল যাদবের জমি থেকে এখনও সমস্ত ফসল ওঠে নি। উঠলে ওঁরাও দু চার রাতের জন্য নৌটঙ্কীর আসর বসিয়ে দেবেন। পুরো শীতকালটা এখানকার বাতাসে মিঠে দেহাতী সুরে নৌটঙ্কীর মজাদার গানের সুর ভেসে বেড়াতে থাকবে।

পিপবিয়া গাঁয়ে ভানচন্দ ঝায়ের বিশাল কোঠির সামনের ফাঁকা জায়গায় নৌটঙ্কীর জন্য শামিয়ানা খাটানো হয়েছে—এই খবরটা হাওয়ায় হাওয়ায় লাখপতিয়াদের কাছেও পৌঁছে গেছে। ফলে কাচ্চীর ধারে কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় পঁচিশ তিরিশটা ভুখা হাভাতে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারা ঠিক করে ফেলেছে, খোলা আকশের তলায় ‘ঘুর’-এর চারপাশে শুয়ে না থেকে তিনটে রাত নৌটঙ্কীর গান শুনেই কাটিয়ে দেবে।

আজ সন্ধে হতে না হতেই খাওয়া চুকিয়ে গায়ে কাঁথা বা কম্বল জড়িয়ে সবাই পিপরিয়া গাঁয়ের দিকে বেরিয়ে পড়ে। সব চাইতে বেশি উৎসাহ রামনৌসেরার। কেননা একসময় নৌটঙ্কী দলের সঙ্গে সমস্ত বিহার ঘুরে ঘুরে রাতের পর রাত নানা আসরে গেয়ে বেড়িয়েছে সে। এখনও তার গানের গলা আশ্চর্য মিঠে—যাকে বলে যাদুভরি।

পাকা সড়কের ওধারে ধানখেতের ভেতর দিয়ে ‘রশি’ভর হাঁটলে পিপরিয়া গাঁ। পাক্কী পেরিয়ে ওপাশের ধানখেতে গিয়ে ওরা দেখল, আরো অনেক মানুষ চলেছে। খবর নিয়ে জানা গেল, এরাও তাদের মতোই নৌটঙ্কী শুনতে যাচ্ছে।

পিপরিয়া গাঁয়ে ভানচন্দ ঝায়ের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল, এদিকের তাবত গাঁ-গঞ্জ নৌটঙ্কীর শামিয়ানার চারপাশে যেন ভেঙে পড়েছে। পুব-পশ্চিম উত্তব-দক্ষিণ, সব দিক থেকে মাছির ঝাঁকের মতো মানুষ আসছে তো আসছেই।

বিরাট শামিয়ানায় কমসে কম চল্লিশ পঞ্চাশটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাচগানের জন্য সেটার মাঝখানে উঁচু মঞ্চ। মঞ্চটা ঘিরে অগুনতি চেয়ারে ভানচন্দ ঝা এবং তাঁব খাতিরের লোকেরা জাঁকিয়ে বসে আছেন।

শামিয়ানার তলায় ঢোকার উপায় নেই। তাগড়া চোহারার পহেলবানরা মোটা মোটা লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছে। কেউ এগুতে গেলেই লাঠি ঠুকে গর্জে উঠছে, ‘হট, হট ভূচ্চরের দল, ইধর নেহী—

দূরসে দেখ—'

অর্থাৎ শামিয়ানা থেকে অনেকটা তফাতে খোলা আকাশের তলায় বসে নৌটঙ্কী শুনতে হবে।

শামিয়ানার কাছাকাছি বসবার জন্য এ অঞ্চলের দোহাতী মানুষ আর হাভাতেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। চিৎকারে এবং অশ্লীল ভাষার আদান-প্রদানে একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধে। অগত্যা পহেলবানেরা দৌড়ে আসে, চড়-চাপড় মেরে, লাঠি চালিয়ে অবস্থা সামাল দেয়। ভয়ে ভয়ে লোকজন চুপচাপ যে যেখানে পারে বসে পড়ে।

পহেলবানেরা শাসায়, 'আর চেল্লামেল্লি করলে ঘাড়ের ওপর থেকে শির উড়িয়ে দেব, সমঝা?'

লোকগুলো মাথা হেলিয়ে দেয় অর্থাৎ সমঝেছে। রাত একটু বাড়লে গান শুরু হয়ে যায়। সাহারসার নাম-করা দল। দলের সবাই ভাল গাইয়ে তবু তার মধ্যে অল্পবয়সী যুবতী ছোকরিটার তুলনা নেই। কিবা তার চেহারা, বিলকুল পরী য্যায়সা। যেমন তার চোখের ঠমক, তেমনি পতলী 'কোমরিয়া'র লচক। খুবসুরত যুবতীর পা, কোমর এবং চোখের তারা একই তালে নাচতে থাকে। সতেজ সুরেলা গলা থেকে যেন অবিরাম যাদু ঝরে।

মেয়েটা আসরে এলেই চারপাশের হাজার হাজার মানুষ চনমনিয়ে ওঠে। চোখেমুখে অদ্ভুত এক ঘোর নিয়ে তারা সম্মোহিতের মতো ছোকরি কলাকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনুভব করে রক্তের ভেতর দিয়ে অনবরত বিজরি চমকে যাচ্ছে।

নাচের তালে তালে ছোকরি গায় :

মোরি হটিয়াসে নাথুনিয়া কুলেল করেলা
দেখিকে সবোকে মানোয়া ডোল ডোলেলা
মোরি হটিয়াসে ...
নাথুনি পাহান যব চলতি ডডরিয়া (রাস্তা)
দেখিকে লোকেয়া মারেলা নজরিয়া
হাঁসি হাঁসি ছৈলা লোক মেল তরেলা
মোরি হটিয়াসে ...
দেখিকে হামরো চড়ত জওয়ানী
লোকোয়াকে মুহয়ামে ভর যাত পানি
রহিয়ামে হামসে গুলেল করেলা
মোরি হটিয়াসে ...
নজর গহরায় যব দেখায় সুরতিয়া
পাগল নিয়ার হৈল উনকে মাতিয়া
বাঁহিয়া পাকড়কে ঝুলেল তরেলা
মোরি হটিয়াসে ...

ভোর রাতে নৌটঙ্কীর আসর ভাঙলে রামনৌসেরারা কড়াইয়া আর সিমার গাছের তলায় ফিরতে থাকে। রাত জাগার দরুন সবার চোখ ঘুমে জুড়ে আসছে। এখন সোজা গিয়ে তারা শুয়ে পড়বে। দুপুরের আগে কেউ উঠবে বলে মনে হয় না।

ঝিমোতে ঝিমোতেই লাখপতিয়া ধানোয়ারকে বলে, 'ছোকরির গলা বহোত মিঠি।'

'হাঁ।' সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয় ধানোয়ার। ঘাড় কাত করে বলে, 'গানা ভি বহোত বড়িয়া।' বলেই মোটা কর্কশ বেসুরো গলায় গেয়ে ওঠে :

দেখিকে হামরো চড়ত জওয়ানী
লোকোয়াকে মুহয়ামে ভর যাত পানি
রহিয়ামে হামসে গুলেল করেলা
মোরি হটিয়াসে নাথুনিয়া. ...

লাখপতিয়ার শাশুড়ি খানিকটা আগে আগে হাঁটছিল। গানটা শুনে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে,

'আমার পুতহুর চড়ত জওয়ানী (উগ্র যৌবন) দেখ মুহ্‌মে পানি আনিস না। তুই কিন্তু কসম খেয়েছিস ধানবার—'

ধানোয়ার ব্যস্তভাবে বলে, 'ঘাবড়াও মাত বুড়হী। আমার কোনো 'বুরা' ধান্দা নেই। এ তো গানা— সিরিফ গানা হ্যায়।'

বুড়ি উত্তর দেয় না। তার চোখমুখ দেখে মনে হয়, ধানোয়ারের কথায় খুশি হয়েছে।

চুপচাপ খানিকক্ষণ হাঁটার পর ধানোয়ার হঠাৎ ডেকে ওঠে, 'এ বুড়হী—'

লাখপতিয়ার শাশুড়ি তক্ষুনি সাড়া দেয়, 'কা?'

'একগো বাত শুনে রাখ।'

'কা?'

'পেটের দানা ছাড়া দুনিয়ায় আমি আর কিছু ভাবতে পারি না। কুছ নেহী।'

সতের

ধান কাটা এখনও চলছে।

চরাচর জুড়ে জমি মালিকদের এত জমি আর জমিভর্তি এত অফুরন্ত ধান যে একসময় সন্দেহ হয়, কেটে সব শেষ করা যাবে কিনা।

কাজেই রামনৌসেরাদের রোজই জঙ্গলে যেতে হচ্ছে। রাত জেগে নৌটঙ্কী শোনার পর ওরা ভোরে ফিরে এসে কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় পড়ে পড়ে ঘুমোয়। কাজেই তাড়াতাড়ি উঠতে পারে না। ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হয়ে যায়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কারুর পক্ষে জঙ্গলে যাওয়া সম্ভব হয় না।

আজও পঙ্গু, রুগ্‌ণ বুড়োবুড়ি আর বাচ্চাকাচ্চাদের গাছতলায় রেখে জঙ্গলে চলে গিয়েছিল হাভাতেরা।

প্রথম দিন বনভূমি থেকে বুনো কলা নিয়ে গিয়ে রামনৌসেরার কথামতো সবাই ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। এমন কি যারা জঙ্গলে যেতে পারে নি তাদেরও সমান ভাগ দিয়েছিল। কিন্তু এই মহানুভবতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। জঙ্গল থেকে আজকাল তারা যা জুটিয়ে আনে তার অংশ অন্য কাউকে দেয় না। যে যা যোগাড় করে সেটা তার নিজস্ব।

জঙ্গলের ভেতর এক 'রশি' জায়গা জুড়ে যত ফলফলারি, কচু, কন্দ, শাকপাতা, মৌচাকের মধু—এ ক'দিন হাভাতেরা সবই নিয়ে গেছে। আজ খাদ্যের খোঁজে তাদের আরো গভীর জঙ্গলে ঢুকতে হল।

অন্য দিনের মতোই দল বেঁধে তারা এক জায়গায় থাকল না। নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

দক্ষিণের এই ধানের রাজ্যে আসার পর থেকে রোজই জঙ্গলে ঢোকার মুখে রামনৌসিরা যা বলে থাকে আজও তাই বলেছে, 'সবাই চারদিকে নজর রাখবি। জঙ্গলের ভেতরটা বহোত খারাপ জায়গা। কেউ একা একা দূরে যাবি না।'

আজ গভীর জঙ্গলে ঢুকে প্রথমে সকলে একসঙ্গেই ছিল। কিন্তু বনভূমির ফলফলারি বা কচুঘেঁচু তো এক জায়গায় থাকে না। ফলে খাদ্যের খোঁজে সবাই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

তা ছাড়া জঙ্গল যতই বিপজ্জনক হোক না, কেউ চায় না তার সঙ্গে আর কেউ থাকুক। কারণ বাগনর, সুথনি, খোরোহা—যা-ই চোখে পড়ুক, সঙ্গী তার ভাগ নেবে।

যে যেভাবে ইচ্ছা চলুক, জঙ্গলে এলে লাখপতিয়া কিন্তু ধানোয়ারের কাছছাড়া হয় না। সেই যে পাকা সড়কের ধারে পিপর গাছগুলোব তলায় তার সঙ্গে পয়লা দেখা তখন থেকেই লাখপতিয়া যেন তার গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে।

আজ লাখপতিয়া আর ধানোয়ার মৌমাছিদের চলাচল দেখে তাদের পিছু নিয়ে জঙ্গলের উত্তর দিকে এগিয়ে গেল। ধানোয়াবের ধারণা, কোথাও না কোথাও এই পতঙ্গগুলো বাসা বানিয়েছে।

মৌচাকটা খুঁজে বার করতে পারলে মধুর আশা আছে।

রামনৌসেরা বুনো ধুধুরের খোঁজ পেয়ে তা-ই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পরসাদী পুব দিকের জঙ্গলে একটা বড় মেটে আলু দেখতে পেয়েছে। সেটা খুঁড়ে বার করতে হবে। তার থেকে কয়েক হাত দূরে একটা ঘন খেড়ি ঝোপের পেছনে ক'টা কুল গাছ দেখতে পেয়েছে লছমন। এই পৌষ মাসে গাছভর্তি কুল পেকে হলুদ হয়ে আছে। তারা ছাড়া বাকি সবাই বনভূমির ভেতর কিছু না কিছু খাদ্যের খোঁজ পেয়েছে। যেভাবেই হোক জঙ্গলের দান এই খাদ্যগুলো তুলে নিয়ে ধানখেতের পাশে তাদের ফিরতে হবে। এখন আর কোনো দিকে কারুর তাকাবার সময় নেই।

পরসাদীর হাতে একটা বড় দা রয়েছে। মাটিতে কোপ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে সে মেটে আলুটা বার করতে যাবে সেই সময় একটা আওয়াজ কানে আসে, 'গর-র-র-র, গর-র-র—'

চমকে সামনের দিকে তাকাতেই বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায় পরসাদীর। হাত পনের তফাতে একটা মোটা পরাস গাছের গুঁড়ির ওপাশে প্রকাণ্ড একটা চিতা বসে আছে। আর তার দিকে তাকিয়ে গলার ভেতর থেকে জান্তব শব্দ বার করছে, 'গররর—গররররর—' জানোয়ারটার কটা চোখে দুনিয়ার সব হিংস্রতা।

কিছুক্ষণ পরসাদীর দিকে তাকিয়ে সমানে আওয়াজ করে গেল চিতাটা আর মাটিতে লেজ আছড়াতে লাগল। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে যেই ওত পাততে যাবে সেই সময় বুক ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল পরসাদী, 'মর গয়ী, মর গয়ী। বাঁচাও—'

খেড়ি ঝোপের আড়াল থেকে দৌড়ে এল লছমন। বলল, 'কা রে, কা হুয়া তুহারকা—' কথাটা আর শেষ করতে পারল না সে, তার আগেই চিতাটা ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের পলকে এক কামড়ে লছমনের ঘাড়টা ভেঙে আরো ঘন জঙ্গলের দিকে তার শরীরটা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বার করবার সময় পেল না লছমন।

শেষ মুহূর্তে শিকার বদল করে কেন যে চিতাটা লছমনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, পরসাদী জানে না। আচমকা সব ভয় ঘুচে কোত্থেকে দুর্জয় সাহস এসে ভর করল তার ওপর। 'কে কোথায় আছ দৌড়ে এস। শের লছমন ভাইকে খতম করে দিয়েছে। জলদি চলা আও-ও-ও—' চেঁচাতে চেঁচাতে উন্মাদের মতো চিতাটার পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে জন্তুটার পিঠে কোমরে ঘাড়ে অনবরত দায়ের কোপ মেরে চলল।

পরসাদীর চিৎকারে জঙ্গলের চারদিক থেকে রামনৌসেরা, ধানোয়ার, ফির্তুলাল, টহলরাম, লাখপতিয়া—এমনি অনেকে হই হই করতে করতে দৌড়ে এল। এত মানুষের চেঁচামেচিতে চিতাটা লছমনকে ফেলে এক লাফে আরো গভীর জঙ্গলে উধাও হয়ে যায়।

পরসাদী কপাল চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, 'সিরিফ হামনিকো লিখে লছমন ভেইয়া খতম হো গিয়া। আমাকে বাঁচাতে এসে ও মরল — হো রামজি—'

আজ কচু, কন্দ, মেটে আলু ইত্যাদি জোটানো স্থগিত রেখে সবাই লছমনের মৃতদেহ কাঁধে করে বিকেলে কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় ফিরে আসে।

রক্তমাখা নিষ্প্রাণ লছমনকে দেখে এবং সব কথা শুনে অসহায় পঙ্গু ছনেরি মাটিতে কপাল ঠুকে ঠুকে রক্তারক্তি বাধিয়ে দেয়। দুর্বোধ্য জড়ানো গলায় সমানে চেঁচিয়ে যায়, 'অব্ হামনিকো কা হোগা? এখন আমার কী হবে?'

রামনৌসেরা বলে, 'ভগোয়ান ভরোসা। কাঁদিস না, কাঁদিস না। কেঁদে কী করবি?'

অন্য মেয়েমানুষগুলো ছনেরিকে ঘিরে বসে। বলে, 'ভগোয়ানকা মর্জি! হামনিলোগান কা করে। চুপ হো যা ছনেরিয়া, চুপ হো যা—'

সন্ধের পর সামনের নহরটার পাশে চিতা সাজিয়ে লছমনকে পূর্ণ মর্যাদায় পোড়ানো হয়। ছনেরিকে কাঁধে চাপিয়ে দক্ষিণে এই ধানের দেশে ছুটে এসেছিল সে। কিন্তু দু মুঠো ভাত খাবার আগেই তাকে শহিদ হতে হল।

আজ রাত্তিরে লছমনকে পুড়িয়ে আসার পর কেউ আর নৌটঙ্কী শুনতে যায় না। কড়াইয়া এবং সিমার গাছের তলায় পৌষ মাসের কুয়াশার চাইতেও ঘন হয়ে দুঃখ আর বিষাদ নামতে থাকে।

স্তব্ধ চরাচরে কোথাও কোনো শব্দ নেই। কামার পাখিগুলো পর্যন্ত আজ আর চেঁচাচ্ছে না। শুধু গোঙানির মতো ছনেরির একটানা বিলাপ শীতের বাতাসে ছড়িয়ে যেতে থাকে, 'হামনিকো কা হোগা? হামনিকো কা হোগা?'

আঠার

জগতের সব কিছুই অফুরন্ত নয়।

আজ জমি মালিকদের খেতগুলোতে ধান কাটা শেষ হয়। ফসল বোঝাই করে সন্ধের আগে আগে শেষ বয়েল গাড়িটি চলে যেতে থাকে। সেটার পেছন পেছন মরসুমী ধানকাটানি আর পহেলবানেরা হাঁটছিল।

একটা পহেলবান চলতে চলতে ফাঁকা মাঠের দিকে আঙুল বাড়িয়ে হাভাতেদের বলে, 'এখন থেকে জমিনগুলোর মালিক তোরা। পেহরাদারি উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যা, নেমে পড়—' বলতে বলতে সে এগিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে গৈয়া আর ভৈসা গাড়িগুলো নিয়ে পহেলবানেরা পাক্কীর ওধারে উধাও হয়ে যায়।

এদিকে কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় অদ্ভুত এক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বুড়ো অথর্ব বীমারী থেকে শুরু করে বাচ্চা-কাচ্চা পর্যন্ত হাভাতেদের পুরো দলটা চনমনিয়ে ওঠে, তাদের বুকের ভেতর রক্ত ছলকাতে থাকে।

যে কারণে খরা বন্যা আর অজন্মার দেশ থেকে তাবা এই ধানের রাজ্যে চলে এসেছে, এতদিনে তা পাওয়া যাবে। এবার তারা ভাত খেতে পাবে। কতকাল পর এই ভাত খাওয়া! হো রামজি, তেরে কিরপা।

বাঘের হাতে লছমনের মৃত্যু ক'টা দিন হাভাতেদের বিষণ্ণ করে রেখেছিল। কিন্তু প্রতিদিন পেটের দানার জন্য যাদের নিদারুণ যুদ্ধ, শোক দুঃখ পুষে রাখার মতো সৌখিনতা তাদের মানায় না। কাল থেকে খেতে পাবে, এই ভাবনাটাই তাদের হঠাৎ চাঙ্গা করে তোলে, রক্তের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মতো কিছু খেলে যায়।

সবাই একসঙ্গে এবার রামনৌসেরার দিকে তাকায়। আজ সকাল থেকেই ধুম জ্বর রামনৌসেরার। অসহ্য তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। লাল চোখে ঘোর লাগা চাউনি। 'ঘুর'-এর আগুনের পাশে ভাল করে কম্বল জড়িয়ে মাথাটাথা ঢেকে বসে আছে সে।

ধানোয়ার রামনৌসেরাকে শুধোয়, 'অব কা করে?'

রামনৌসেরা বলে, 'আজ থাক। অন্ধেরা আর কোহরাতে (কুয়াশা) ধান দেখতে পাওয়া যাবে না।'

সবাই মিলে পরামর্শ করে ঠিক করা হয়, একেবারে কাল সকাল থেকেই ধানখেতে নামা হবে।

উত্তেজনায় রাত্তিরে ভাল করে কারুর ঘুমই হয় না।

ভোরবেলা, রোদ উঠেছে কি ওঠে নি, কুয়াশা কেটেছে কি কাটে নি—ভুখা আধনাঙ্গা মানুষগুলো কাপড়ের ঝুলি আর সরু সরু কাঠি নিয়ে হুড়মুড় করে ফসল-কাটা ফাঁকা মাঠে নেমে পড়ে। শুধু তিনজন বাদ। লাখপতিয়ার শাশুড়ি, ছনেবি আর রামনৌসেরা। রামনৌসেরার জ্বরটা আজও ছাড়ে নি। হাঁটু থেকে নিচের দিকটায় ছনেরির যা পায়ের হাল তাতে এতটুকু নাড়াচাড়ারও উপায় নেই।

আলের ওপর দিয়ে সবার আগে আগে হাঁটছিল টহলরাম। আজ না আছে মুসহর ধানকাটানিরা, না আছে তাগড়া চেহারার পহেলবানরা, না ভৈসা বা বয়েল গাড়ি।

আদিগন্ত ফাঁকা মাঠের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে আকাশে দু হাত ছড়িয়ে খুশিতে চেঁচিয়ে ওঠে টহলরাম, 'হামনিলোগ জমিনকা রাজা বন গিয়া।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, উঁচু আল দিয়ে ঘেরা চৌকো, তেকোনা, ছ'কোনা একেকটা খেতে ধানোয়াররা এক এক জন নেমে জমি থেকে ঝড়তিপড়তি ধান আঙুল দিয়ে খুঁটে খুঁটে ঝুলিতে তুলছে। মাদারী খেলোয়াড় হরসুখ তার দুই বাঁদর নিয়ে এসেছে। বাঁদরেরা মানুষের সঙ্গেই ধান খুঁটছে।

ধানোয়ারদের বাঁ পাশের জমিতে রয়েছে লাখপতিয়া, ডান দিকের জমিতে ফির্তুলাল, তার জেনানা এবং বাচ্চারা। পেছনের জমিতে টহলরাম। এইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে জমি মালিকদের ফাঁকা ধানখেতগুলোতে এখন ভুখা হাভাতেদের রাজত্ব চলছে।

দেখতে দেখতে দিগন্তের তলা থেকে পৌষ মাসের সূর্য উঠে আসে। শীতের নরম সোনালি রোদে বাকি কুয়াশা কেটে চারদিক ঝলমল করতে থাকে। তবু এখনও বড় ঠাণ্ডা। মাটি থেকে প্রচুর হিম উঠে আসছে।

রোদ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে পরদেশি শুগা আর চোটা পাখি জমিতে নেমে পড়েছে। ধানকাটানিরা যখন ফসল কেটেছে তখনও তারা ধান খেয়েছে। এখনও ঝড়তিপড়তি ধানে ভাগ বসাচ্ছে। আর বেরিয়ে পড়েছে মেঠো ইঁদুর এবং সোনালি গোসাপেরা। ইঁদুরগুলো মাঠময় দৌড়ে বেড়ায় আর গোসাপেরা পেট টেনে টেনে আলের ওপর দিয়ে হাঁটে।

প্রতিটি জমিতেই এখানে ওখানে মেঠো ইঁদুরের গর্ত। ইঁদুরেরা আগে থেকেই তার ভেতর ধান জমা করে রেখেছে।

দুই আঙুল দিয়ে মাটি থেকে শস্যকণা কুড়োতে কুড়োতে যখনই ধানোয়ারেরা একটা গর্ত পায়, সরু কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ধান বার করে। এভাবে আগে থেকে গর্তের ভেতর ধান জমিয়ে রাখার জন্য মাঠকুড়ানিরা চিরকালই ইঁদুরদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ধান কুড়োতে কুড়োতে আচমকা পাশের জমি থেকে ধানোয়ারের উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠে লাখপতিয়া, 'এ আদমী—'

ধানোয়ার মুখ তুলে তার দিকে তাকায়, 'কা?'

'হুই দেখো—' আলের ওপর একটা বড় গোসাপকে দেখিয়ে লাখপতিয়া শুধোয়, 'অব কা করে? গোয়টাকে (গোসাপটাকে) মারবে?'

গোসাপের চামড়া ভাল দামে বিকোয়। ধানোয়ার বলে, 'অভি নায়। বহোত গোয় হ্যায় ইধরি। আগে ক'দিন ভাত খাই। তারপর গোয় মারব।'

আবার তারা ধান কুড়োতে থাকে।

দুপুর পর্যন্ত একটানা খুঁটে খুঁটে ফসল তোলার পর কাচ্চীর ধারের গাছতলায় ফিরে কিছু খেয়েই আবার মাঠে নামে ধানোয়াররা। ফের ধান খোঁটা শুরু হয়।

তবে রোদ থাকতে থাকতেই আজ সবাই মাঠকুড়নো থামিয়ে দেয়। কেননা যা ধান পাওয়া গেছে সেগুলোর খোসা ছাড়িয়ে চাল বার করতে সময় লাগবে। তারপর তো ভাত।

কড়াইয়া আর সিমার গাছগুলোর তলায় ফিরে এসে একটা মুহূর্তও নষ্ট করে না ধানোয়ার। কুড়নো ধান চটের ভাঁজের মধ্যে রেখে গোড়ালি দিয়ে ডলে ডলে খোসা ছাড়াতে থাকে।

আশায় খুশিতে সবার চোখ চকচক করে। এদের মধ্যে লাখপতিয়ার শাশুড়ির আনন্দ এবং উত্তেজনাটাই সব চাইতে বেশি। ভাঙাচোরা কোঁচকানো মুখে হাসি মাখিয়ে জড়ানো গলায় অনবরত বলতে থাকে, 'হো রামজি, কেত্তে রোজ পর গরমভাত্তা খেতে পাব!'

রামনৌসেরার জ্বরটা এ বেলা অনেক কম। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখে সে। মুখটা তার ক্রমশ বিষণ্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এত মানুষ মাঠ কুড়িয়ে ধান এনেছে, সে শুধু বাদ। মনে মনে রামনৌসেরা ভাবে, জ্বরটা বাড়ুক বা কমুক, কোনো পরোয়া নেই, কাল সে মাঠে নামবেই।

শুধু রামনৌসেরা নয়, আরো একজন জমি থেকে ধান আনতে পারে নি। সে পঙ্গু দুর্বল ছনেরি। করুণ মুখে চারদিকে তাকাতে তাকাতে মেয়েটা চাপা শব্দ করে কাঁদতে থাকে আর বলে, 'লছমনটা বেঁচে থাকলে সে-ও ধান নিয়ে আসত।'

লছমন মরার পর হাভাতেরা সবাই নিজের নিজের খাদ্য থেকে একটু আধটু দিয়ে ছনেরিকে বাঁচিয়ে

রেখেছে। কিন্তু কেউ তাকে ভাতের ভাগ দেবে কিনা, ছনেরির সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এদিকে ধান থেকে চাল বার করা চলছেই। কিন্তু গোড়ালি দিয়ে ডলে ডলে এত ধানের খোসা ছাড়ানো অসম্ভব। অগত্যা সবাই নখ দিয়ে খুঁটতে শুরু করল।

চাল বার করতে করতে কখন যে সূর্য পশ্চিম আকাশের তলায় নেমে গেছে, কখন চোখের সামনের দৃশ্যমান জগৎ অন্ধকার আর কুয়াশায় একাকার হয়ে গেছে, কেউ বুঝি টের পায় নি। তবে সন্ধের পর ঠাণ্ডাটা যখন জাঁকিয়ে নামছিল সেই সময় কে যেন 'ঘুর'-এর আগুন জ্বেলে দিয়েছে।

হলুদ খোসার ভেতর থেকে চাল বার করতে করতে বেশ রাত হয়ে যায়। সবাই ঝোলাঝুলি থেকে তোবড়ানো হাঁড়িটাড়ি বার করে পরম যত্নে নহর থেকে চাল ধুয়ে আনে। তারপর শক্ত মাটির ডেলা যোগাড় করে চুলা বানিয়ে কাঠকুটো জ্বেলে ভাত বসিয়ে দেয়।

কতকাল পর হাভাতেদের উনুন ধরে, নিজেরাই তা জানে না। চুলার আঁচে তাদের মুখগুলো বড় উজ্জ্বল দেখায়। হো কিষুণজি, কতদিন পর তারা ভাত খাবে!

কিছুক্ষণ পর টগবগ করে ভাত ফুটতে থাকে। নতুন চালের ভাতের কী প্রাণমাতানো সুগন্ধ ! উত্তুরে হাওয়ায় সেই গন্ধ চরাচর জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

একসময় ভাত হয়ে যায়। কেউ আর ফেন ঝাড়ে না। তোবড়ানো সিলভারের থালায় গরম ভাত ঢেলে পুজোয় বসার মতো পবিত্র মন নিয়ে সবাই খেতে বসে।

ধানোয়ার ভাতের মধ্যে এক টুকরো মেটে আলু ফেলে দিয়েছিল। সেদ্ধ মেটে আলু নুন দিয়ে চটকে ভাতে মাখতে যাবে, সেইসময় হঠাৎ তার চোখে পড়ে ছনেরি লুব্ধ চোখে এদিকেই তাকিয়ে আছে আর সমানে ঢোক গিলছে। কেউ তাকে একদানা ভাত দেয়নি। দেবেই বা কেন? এত কষ্টের ভাত!

শুধু ছনেরিই না, রামনৌসেরাও এদিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতেই সে মাঠের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবনে নিজেকে ছাড়া অন্য কোনো দিকে তাকানোর সময় হয় নি ধানোয়ারের। কিন্তু পঙ্গু কমজোরি মেয়েটার জন্য ভীষণ কষ্ট হতে থাকে তার। নিজের থালাটার দিকে একবার তাকায় সে। যা ভাত আছে তাতে একজনেরই হতে পারে।

ধানোয়ার নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ নয়। তবু এই মুহূর্তে কী যেন হয়ে যায়। থালাটা নিয়ে সোজা ছনেরির কাছে চলে আসে। বলে, 'খা লে—'

প্রথমটা লজ্জায় জড়সড় হয়ে যায় ছনেরি। বলে, 'নায় নায়, এত কষ্টের ভাত তোমার। তুমি খাও—'

ধানোয়ার ধমকে ওঠে, 'খা লে—'

দু-একবার আপত্তির পর খেতে শুরু করে ছনেরি। আর নিজের জায়গায় ফিরে এসে ঝোলা থেকে ক'টা ডাঁসা কুল বার করে চিবোতে থাকে ধানোয়ার। আর তখনই লাখপতিয়ার গলা ভেসে আসে। সে তার শাশুড়িকে বলছে, 'আর দুটো ভাত দেব?'

ধানোয়ার কুল চিবোতে চিবোতে ওদিকে মুখ ফেরায়।

লাখপতিয়ার শাশুড়ি লিকলিকে গলার ওপর মাথাটা নাড়তে নাড়তে বলে, 'দে—'

দেওয়ামাত্র খেয়ে ফেলে বুড়ি। লাখপতিয়া আবার শুধোয়, 'আর দেব?'

'দে—'

চোখের পাতা পড়তে না পড়তে ভাত শেষ হয়ে যায়।

লাখপতিয়া বলে, 'আর দেব?'

'দে—'

এইভাবে লাখপতিয়া যত বার শুধোয়, কোনো বারই 'না' বলে না বুড়ি। পেটের ভেতর দশটা জানোয়ারের খিদে পুষে রেখেছিল যেন সে।

বুড়ির খিদে যখন মেটে লাখপতিয়ার হাঁড়ি ফাঁকা হয়ে গেছে। নিজের জন্য এক দানা ভাতও আর পড়ে নেই। বুড়ি এতক্ষণ খাওয়ার ঝোঁকে ছিল। এবার আপসোসের গলায় বলে, 'এ বহু, আমাকেই তো সব দিয়ে দিলি। তুই খাবি কী?'

উত্তর না দিয়ে লাখপতিয়া জিজ্ঞেস করে, 'তোর পেট ভরেছে?'
'আমার পেট তো ভরেছে। তোর পেটের কী হবে?'
'মকাই ভাজা আছে, খেয়ে নেব। সচমুচ তোর পেট ভরেছে তো?'
'সচমুচ।'
'কতকাল পর তোকে ভাত খাওয়াতে পারলাম। হো ভগোয়ান।'
'লেকেন—'
'লেকেন উকেন না। অব শো যা—'

এখন বেশ রাত হয়ে গেছে। থেকে থেকে রাতজাগা কামার পাখিরা মাথার ওপর চেঁচিয়ে উঠছে। এ ছাড়া পৃথিবীর এই প্রান্তে পৌষের এই হিমার্ত রাতে আর কোনো শব্দ নেই। অন্ধকার ফুঁড়ে ফুঁড়ে জোনাকিরা মাঠময় উড়ে বেড়ায়। ঘন কুয়াশায় চরাচর নিমজ্জিত হতে থাকে।

'ঘুর'-এর চারপাশে হাভাতের দল শুয়ে পড়েছে। তবে অন্য দিনের তুলনায় আজ কিছু তফাত আছে। আজ তাদের মুখেচোখে ভাত খাওয়ার অসীম তৃপ্তি। সবাই বলাবলি করছিল, এমন ভরপেট 'ভাত কা ভোজন' তিন চার মাসের মধ্যে তাদের এই প্রথম হল।

ধানোয়ারের শিয়রের দিকে মাথা দিয়ে আজ লাখপতিয়া শুয়েছে। ধানোয়ার নিজের থেকে লাখপতিয়াকে একবারই ডেকেছিল। আজ আবার ডাকল, 'এ আওরত—'

লাখপতিয়া তক্ষুনি সাড়া দেয়, 'কা?'

'তোমার সব ভাত তো সাসকে খাইয়ে দিলে।'

'হাঁ। তোমার ভাতও তো ছনেরিকে খাইয়ে বসে কুল চিবোলে।'

'কা করে? সবাই ভাত খাবে আর ছনেরিটা খাবে না? ওর জন্যে বড় কষ্ট হচ্ছিল।'

লাখপতিয়া বলে, 'বুড়ি সাসটাকে কত রোজ ভাত দিতে পারি নি। ভাত ভাত করে একেবারে মরে যাচ্ছিল। খাইয়ে দিলাম।' একটু থেমে বলে, 'কাল আমি ভাত খাব।'

ধানোয়ার বলে, 'আমিও কাল খাব। এত দিন ভাত খাই নি। আর একটা দিন না খেলে আমরা মরে যাব না। কী বল?'

'জরুর।'

'তবে কী জানো—'

'কী?'

'নিজে না খেয়ে ছনেরিকে যে খাওয়ালাম সে জন্যে কষ্ট হচ্ছে না। ভালই লাগছে।

'আমারও।'

'কাল সূরয উঠবাব আগেই জমিনে নামব।'

'হাঁ—

ওধারে কম্বলের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে গুনগুনিয়ে নৌটঙ্কীর গান গাইছে রামনৌসেরা :

আগে আগে গোরীয়া চলে পিছেসে মিলনোয়া
মেলোয়া জালি রে ঝরেলিয়া ......
গাগরী লেকে গৈয়া ঘাট, ছৈলা রোসে
দেহেল বাট
সাঁচে সাঁচে কহিও গোরী আপনা বেয়োনয়াঁ
তব্ ওহী হ্যায় রে মিলনোয়া
মেলোয়া জালি রে ঝরেলিয়া ......

গান শুনতে শুনতে ধানোয়ার লাখপতিয়ার দিকে একবার তাকায়। দু'জনে একটু হাসে। তারপর মাথার ওপর কম্বল টেনে দিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকে। তাদের চারপাশে সফেদিয়া ফুলের মতো রাশি রাশি নতুন চালের ভাত টগবগ করে ফুটে চলেছে, আর ফুটন্ত ভাতের সুঘ্রাণে চরাচর ম ম করছে।

ধর্মান্তর

উত্তর থেকে দক্ষিণে সরকারি পাকা সড়ক বা পাক্কী চলে গেছে। রাস্তাটার গা ঘেঁষে দু ধারেই নয়ানজুলি। বর্ষার জল জমে জমে সে দুটো নহর হয়ে গিয়েছিল, এখন জল শুকিয়ে হাঁটুভর থকথকে কাদা। সেখানে আপনা থেকেই গজিয়ে উঠেছে শরের বন, নানা জাতের আগাছা আর সর্বন ঘাস। সর্বনের খুশবুতে আজকাল সারাক্ষণ বাতাস মাত হয়ে থাকে।

দু ধারেই নয়ানজুলির পর থেকে যতদূর চোখ যায়, আদিগন্ত ধানখেত। উত্তর বিহারের এই সব প্রাচীন শস্যক্ষেত্র এখন সোনালি ফসলে ভরে আছে।

পাক্কী থেকে রশিভর পুবে ধানখেত চিরে বরাবর রেল লাইন চলে গেছে। 'কোশ' খানেক তফাতে কাটিহার-যোগবানী ব্রাঞ্চ লাইনের একটা ছোট স্টেশন পড়ে—নাম তেতরিয়া।

অঘুন বা অঘ্রাণ মাস শেষ হয়ে এসেছে। এর মধ্যেই মাঠে মাঠে ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে।

কার্তিকের গোড়া থেকেই এ অঞ্চলে হিম পড়ে। এই 'অঘুন' মাসে রীতিমত জাঁকিয়েই শীত নেমে গেছে। হিমে কুয়াশায় এখন চারদিক ঝাপসা।

হিমালয় বেশি দূরে নয়। উত্তর দিক থেকে যে উলটোপালটা হাওয়া বইছে তা যেন সারা গায়ে বরফ মেখে আসছে। সে হাওয়া হাড়ের ভেতর পর্যন্ত বিঁধে যায়।

এখন সকাল। দিগন্তের তলায় সোনার প্রকাণ্ড কটোরার মতো সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে। যে রোদটুকু উঠেছে উত্তুরে বাতাসকে তাতিয়ে উষ্ণ, আরামদায়ক করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। চারপাশের চাপ চাপ কুয়াশা এখনও ভাল করে কাটতে শুরু করে নি। রাস্তার ধারের গাছের পাতায় বা ধানের শিষে শিশির হীরের দানা হয়ে আছে।

পাক্কী ধরে এই মুহূর্তে দক্ষিণ দিকে হেঁটে চলেছে গৈরুনাথ। তার পাশাপাশি হাঁটছেন মাস্টারজি নটবরলাল দুবে। তাঁরা যাবেন আড়াই 'মিল' দূরের তেতরিয়া রেল স্টেশনে।

গৈরুনাথ জাতে চামার। এ অঞ্চলের উচ্চবর্ণের বামহন-কায়াথ বা রাজপুত ক্ষত্রিয়েরা অবজ্ঞার সুরে বলে গৈরু চামারিযা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। একসময় লম্বা চওড়া হট্টাকট্টা চেহারার প্রকাণ্ড একটা মানুষ ছিল সে। এখন বিরাট কাঠামোটাই শুধু আছে। শরীর ভেঙে ধসে চুরমার। মাথার চুল আধাআধি সাদা হয়ে গেছে। মুখের চামড়া কোঁচকানো। চোখদুটো ঘোলাটে, খুব সম্ভব ছানি পড়তে শুরু করেছে। কিছুদিন ধরে বুকের দোষ হয়েছে তার, অল্পেতেই হাঁপ ধরে যায়।

মোটা নাক, কাঁচাপাকা ঝাঁকড়া গোঁফ, খাপচা খাপচা দাড়ি, বাঁকাচোরা ছ'কোনা চোয়াল। এই মুহূর্তে তার পরনে খাটো ধুতি আর তালিমারা লাল ফতুয়া। অঘ্রাণের হিমবর্ষী বাতাস ঠেকাতে ধুতি-ফতুয়ার ওপর রোঁয়াওলা ধুসো কম্বল। এবড়ো খেবড়ো লোহার পাতের মতো পা দুটো একেবারেই খালি। মাথায় পাগড়ির মতো করে গামছা জড়ানো; এভাবে যতটা হিম ঠেকানো যায়।

গৈরুনাথ গরিবের চাইতেও গরিব, ভীরুর চাইতেও ভীরু। তার তাকানো এবং চলাফেরার মধ্যে সারাক্ষণ একটা তটস্থ ভাব।

গৈরুর সঙ্গী নটবরলাল দুবে বা দুবেজি অথবা মাস্টারজি এ অঞ্চলের এক বুনিয়াদি প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টার। সরকারি সমাজ কল্যাণ দপ্তর বিহারের অজ দেহাতে তিন চারখানা গ্রাম নিয়ে একটা করে যে স্কুল বসিয়েছে তিনি তেমনি এক স্কুলের সর্বেসর্বা।

দুবেজির বয়স ষাটের কাছাকাছি। মাঝারি মাপের চেহারা। এই বয়সেও শরীর অটুটই রয়েছে। মাথার বেশির ভাগ চুল রীতিমত কালো। মুখে তিন চার দিনের দাড়ি। ভারি নাক, বড় বড় চোখ, লম্বা ধাঁচের মুখ। চেহারায় রুক্ষতা বা উগ্রতা নেই। চোখেমুখে এবং তাকানোর ভঙ্গিতে আশ্চর্য স্নিগ্ধতা। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায় মানুষটি স্নেহপ্রবণ, সহিষ্ণু।

দুবেজির পরনে মোটা কাপড়ের পায়জামা, পাঞ্জাবি আর আধ ময়লা চাদর। পায়ে কাঁচা চামড়ার চপ্পল।

উচ্চবর্ণের দুবেজি শীতের এই ভোরে অচ্ছুৎ গৈরু চামারের সঙ্গে যে তেতরিয়া স্টেশনে চলেছেন তার কারণ ফেকুনাথ। গৈরুর ছেলে ফেকুনাথের আরো একটা নাম আছে—দুখন। আজ সকালের ট্রেনে ফেকুনাথ আসছে ভাগলপুর থেকে। ভাগলপুর থেকে সাহেবগঞ্জ সগরিগলি মনিহারি কাটিহার হয়ে তেতরিয়া।

একা একা এতটা পথ এই প্রথম আসছে না ফেকুনাথ। এই লাইনে তার অনেক দিনের যাতায়াত। আগে আর কখনও ভোর হতে না হতেই এভাবে আড়াই 'মিল' হেঁটে তাকে নিয়ে যেতে স্টেশনে ছোটে নি গৈরুনাথ। দুবেজিও আসেন নি। তবে আজ যে দু'জনে চলেছেন তার কারণ দিন চারেক আগে বিহার স্কুল বোর্ডের রেজাল্ট বেরিয়েছে আর তাতে জানা গেছে, ম্যাট্রিক পাশ করেছে ফেকুনাথ। চিঠি লিখে আগেই খবরটা দুবেজিকে জানিয়ে দিয়েছিল সে। আনপড় গৈরুনাথকে চিঠি লেখা না-লেখা সমান। তাই দুবেজি মারফত মা-বাপের সঙ্গে ভাগলপুর থেকে যোগাযোগ রাখতে হত ফেকুনাথকে। সে লিখেছিল আজ সকালে বাড়ি ফিরে আসছে।

ফেকুনাথের ম্যাট্রিক পাশ করাটা গৈরুদের বংশে রীতিমত একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। শুধু তাদের বংশে কেন, চারদিকের বিশ পঁচিশটা গাঁয়ে যে কয়েক হাজার দোসাদ চামার ধাঙড় বা গাঙ্গোতা আছে তাদের কারুর ঘরে কস্মিনকালেও কেউ ম্যাট্রিক পাশ করে নি। কাজেই এত বড় একটা লিখিপড়ি ছেলের বাপ হবার গৌরবে গৈরুনাথের বুক দশ হাত বেড়ে গেছে। গর্বটা দুবেজিরও কম নয়। পনের ষোল বছর তিনি এ অঞ্চলে মাস্টারি করেছেন; এই প্রথম একটা অচ্ছুৎ ছেলেকে ম্যাট্রিক পাশ করাতে পারলেন। যাকে নিয়ে তাঁদের এত গৌরব, সমারোহ করে তাকে নিয়ে যাবার জন্য শীতের এই সকালে দু'জনে বেরিয়ে পড়েছেন।

চলতে চলতে হঠাৎ দুবেজি ব্যস্তভাবে ডাকেন, 'এ গৈরু—'

অন্যমনস্কর মতো ছেলের কথা ভাবছিল গৈরুনাথ। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সে। বলে, 'কা মাস্টারজি?'

'ধান কাটাই শুরু হয়ে গেছে। খেতিতে না গিয়ে দুখনকে আনতে যে চলেছিস, তোর জমিমালিক জানে?' দুবেজিকে বেশ উদ্বিগ্নই দেখায়। তাঁর উৎকণ্ঠার পর্যাপ্ত কারণও আছে।

জাতে চামার হলেও গৈরুনাথ একজন ভূমিহীন কিষান। চিরদিনের নিয়ম বা প্রথা অনুযায়ী তার 'জাতওয়ারি' কাজ অর্থাৎ জুতো সেলাই বা সারাই করার কথা। কিন্তু এসব কিছুই করে না গৈরু। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় জমিমালিক রামধারী মিশ্রের জমিতে বা খামারে বার মাস দিনমজুরিতে ঘাড় গুঁজে খেটে যায় সে। চাষের মরসুমে খেতে লাঙল দেয়, বিছন রোয়, অঘ্রাণ-পৌষে ফসল কেটে মালিকের 'খালিহান' বোঝাই করে। বছরের বাকি সময়টা সে মিশিরজির মোষ চরায় বা আগের সালের তিল তিসি মুগ মুসুর এবং ধান বা গেঁহু বার করে আরো অনেক খেতমজুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রোদে শুকোয়, ঝাড়াই বাছাই করে।

'খরিদী কিষাণ' বা বেগারখাটা ভূমিদাস না হলেও গৈরুনাথ প্রায় তার কাছাকাছিই। রামধারী মিশ্রের কাছে তাব জীবনের প্রায় সর্বস্বত্ব বিকিয়েই দেওয়া আছে। তিনি জমিতে কাজ না দিলে ছেলেপুলে আর জেনানা নিয়ে গৈরুকে ভুখে মরতে হবে।

খেত চষার সময় হোক, ধান কাটার মরসুমে হোক বা বছরের অন্য কোনো সময়েই হোক, রামধারী মিশ্রকে না জানিয়ে কোথাও এক পা নড়ার উপায় নেই গৈরুনাথের। সে মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ মাস্টারজি, হুকুম মিলা বড়ে সরকারকা। চিন্তা নায় করনা—'

উৎকণ্ঠা কাটে দুবেজির। তিনি বলেন, 'তব তো ঠিক হ্যায়।'

পুব আকাশের ঢাল বেয়ে সূর্য উঠে আসতে থাকে। কুয়াশা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। আকাশ, ধানখেত, কাছের এবং দূরের গাছপালা এখন অনেক স্পষ্ট। শীতের নির্জীব রোদ আস্তে আস্তে তেজী হতে থাকে। দু'ধারের অজস্র ধান লক্ষকোটি সোনার দানা হয়ে ঝিকমিক করে। চারপাশের ফসলেব মাঠ চিরে উত্তুরে হাওয়া ছুটে যায়। দিগন্তজোড়া উথলপাথল ধানবনে মৃদু বাজনার মতো শব্দ উঠতে থাকে—ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন।

মাথার ওপর দিয়ে এখন ঝাঁকে ঝাঁকে পরদেশি শুগা উড়ে উড়ে দু'ধারের ধানখেতে গিয়ে পড়ছে। কোন অজানা দূর দেশ থেকে এই শুগারা শীতের মরসুমে এ অঞ্চলে হানা দেয়, কে জানে! যতদিন মাঠে পাকা ধান থাকে, ওরা ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে যায়। ধানকাটা শেষ হলে পাখিগুলো আর একটা দিনও এখানে থাকবে না, দিগন্ত পেরিয়ে উধাও হয়ে যাবে।

দুবেজি বলতে থাকেন, 'ছৌয়াটা (ছেলেটা) এতবড় একটা কাজ করে এসেছে। ওর জন্যে ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিস তো?'

গৈরুনাথ মাথা নেড়ে জানায়, 'দুখনকা মাকে বলে এসেছি সুবে সুবে বাজারে গিয়ে শিকার (মাংস) নিয়ে আসতে। শিকারের সাথ বাথুয়া শাক, ধুধুর ভাজি, চানা দাল, পুদিনকা আচার আউর বাঁরাঠি চালের ভাত। গরিব আদমী, এর বেশি আর কিছু করতে পারিনি মাস্টারজি।'

দুবেজি খুশি হন। তারিফের ভঙ্গিতে বলেন, 'চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে। বহোত আচ্ছা ভাতকা ভোজ হোগা।'

বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যায় দুবেজিব। গৈরুনাথের আরো কাছে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'একটা খবর শুনেছিস গৈরু?'

দুবেজির বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যাতে চমক লাগে গৈরুনাথের। ঘাড় ফিরিয়ে একটু অবাক হয়েই সে দুবেজির দিকে তাকায়। শুধোয়, 'কা খবর মাস্টারজি?'

'দিন তিনেক আগে মৈনুগঞ্জের বড় হাটিয়ায় (হাটে) গিযেছিলাম। সেখানে লোকজন বলাবলি করছিল হাতিয়াড়া গাঁওয়ের দশ ঘর দোসাদ আর তোদের জাতের লোক নাকি খ্রিস্টান হয়ে গেছে।'

হাতিয়াড়া এখান থেকে সাত আট মাইল পুবের একটা গাঁ। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে গৈরুনাথ। বলে, 'শুনা হ্যায়।'

'কেন জানিস?'

'নেহী—' বলে চুপ করে থাকে গৈরুনাথ।

দুবেজি বলেন, 'ওই গাঁওয়ে তোর রিস্তাদারেরা থাকে না?'

'হাঁ। দো চাচেরা ভাই থাকে।'

'তারা খ্রিস্টান হয়েছে?'

'মালুম নেহী। ধান কাটাই শেষ হলে ওখানে গিয়ে খবর নেব।'

দুবেজি বলেন, 'ছে মাহিনা আগেও তো হাতিয়াড়াতে দশ বারটা আদমী ধরম বদল করেছিল?'

'হাঁ।' গৈরুনাথ মাথা নাড়ে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্কর মতো বুক-পকেট থেকে একটা বহুকালের সুতো বাঁধা পুরনো পকেট-ঘড়ি বার করে এক পলক চোখ বুলোতেই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন দুবেজি, 'তুরন্ত পা চালা গৈরু। ট্রেনকা টাইম হো গিয়া।'

দু'জনে জোরে জোরে হাঁটতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তেতরিয়া স্টেশনে পৌঁছে যায়।

.

এ অঞ্চলের দেহাতি স্টেশনগুলোর চেহারা যেমন হয়, তেতরিয়া অবিকল সেইরকম। ধানখেতের মাঝখানে খানিকটা জায়গায় সুরকি ঢেলে নিচু প্ল্যাটফর্ম বানানো হয়েছে। গোটা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে পরাস আর সিমার গাছের ছড়াছড়ি। এর মাঝামাঝি লাল টালির ছাউনির তলায় টিকেট-ঘর, স্টেশন মাস্টারের অফিস। কাছাকাছি বাঁশের ঝুপড়ি বানিয়ে একটা 'চায়কা দুকান'ও বসানো হয়েছে।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না, ট্রেন এসে গেল। এ-কামরা সে-কামরা থেকে বিশ-পঁচিশটা দেহাতি মানুষ নামে। তাদের মধ্যে ফেকুনাথও রয়েছে।

টগবগে জোয়ান ছেলে ফেকুনাথ। বয়স বিশ-বাইশ। মোটা নাক, ভারি ঠোঁট, চওড়া কাঁধ, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হাত। গায়ের রং তামাটে, চুল চামড়া ঘেঁষে ছাঁটা। ছোট ছোট চোখে গভীর চাউনি। দেখেই টের পাওয়া যায় ছেলেটা শান্ত, ধীর, বুদ্ধিমান।

ফেকুনাথের পরনে সস্তা খেলো কাপড়ের ফুলপ্যান্ট আর ফুলশার্ট। তার ওপর মোটা উলের

ঢলঢলে সোয়েটার। অনেক কষ্টে পয়সা বাঁচিয়ে প্যান্ট-জামা কিনে দিয়েছিল গৈরুনাথ। আর সোয়েটারটা কিনে দিয়েছেন দুবেজি। ভুখা আধনাঙ্গা চামাররদের পক্ষে এই পোশাকই রাজার পোশাক।

ফেকুনাথের এক হাতে টিনের রংচটা একটা স্যুটকেশ, আরেক হাতে দড়িবাঁধা শতরঞ্চি-মোড়া বিছানা।

স্টেশনে বাবা আর দুবেজিকে দেখবে, ভাবতে পারেনি ফেকুনাথ। প্রথমটা অবাক হয়ে যায় সে; খুশিতে বিস্ময়ে সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। একরকম দৌড়েই দুবেজির কাছে এসে বলে, 'আপলোগন!'

দুবেজি সস্নেহে হেসে বলেন, 'এত বড় একটা হিস্টোরিক্যাল কাণ্ড করেছিস। তাই তোকে নিয়ে যাবার জন্যে চলে এলাম।' ফেকুনাথের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে মজা করে দু-একটা ইংরেজি শব্দ ঢুকিয়ে দেন দুবেজি।

ফেকুনাথও মজা করার জন্যই বলে, 'আচানক আমার প্রেস্টিজ বেড়ে গেছে, না?' বলেই দুবেজিকে প্রণাম করার জন্য ঝুঁকতে যায়।

তাঁর পা ছোঁওয়ার আগেই প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন দুবেজি, 'হামনিকো নেহী, পয়লা আপনা বাপকো—'

অগত্যা গৈরুর পায়ে হাত ঠেকায় ফেকুনাথ।

অগাধ বিস্ময়ে ফেকুনাথের দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল গৈরুনাথ। এই হট্টাকট্টা চেহারার 'লিখিপড়ি' জোয়ান ছেলেটা যে তারই সন্তান, এটা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না তার। ফেকুনাথ প্রণাম করতেই সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। দুনিয়ার সবাই তাকে ঘৃণা করে, বিদ্রূপ করে, উচ্চবর্ণের লোকেরা পারতপক্ষে তার ছায়া মাড়ায় না। লাঞ্ছনা অপমান যার আজন্মের সঙ্গী, নিজের ম্যাট্রিক-পাশ ছেলের প্রণাম পেয়ে সে যতটা খুশি হয়, ভেতরে ভেতরে তার চেয়ে অনেক বেশি কুঁকড়ে যায়। এত বড় সম্মান যেন তার প্রাপ্য নয়।

ফেকুনাথ এবার দুবেজিকে প্রণাম করতেই দু'হাতে তিনি তাকে জড়িয়ে ধরেন। গম্ভীর গলায় বলেন, 'বহোত খুশি হয়েছি দুখন।'

ফেকুনাথ বলে, 'জানি মাস্টারজি। এই যে পাশ করলাম, সব আপনার জন্যে।'

ওধার থেকে গৈরুনাথও গাঢ় কৃতজ্ঞ সুরে বলে ওঠে, 'আপনি না থাকলে দুখন এত্তে বড়ে লিখিপড়ি আদমী হয়ে উঠতে পারত না। সব কুছ আপহিকা কিরপা।'

দুবেজি বলেন, 'রামজিকা কিরপা। ছেলেটা রাত জেগে এসেছে। এখন ঘরে চল।'

স্টেশন থেকে বেরিয়ে তিনজনে পাক্কীতে এসে পড়ে। এই রাস্তাটা একদিকে পাটনা, আরেক দিকে কাটিহার পর্যন্ত চলে গেছে। যখন দুবেজিরা ভোরে তেতরিয়া স্টেশনে আসছিলেন তখন সড়কটা ছিল একেবারে ফাঁকা। গাড়িটাড়ি বা লোকজন, বিশেষ কিছুই চোখে পড়েনি। বেলা চড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু-দিক থেকে বয়েল আর ভৈসা গাড়ি, দূরপাল্লার বাস, লৌরি এবং সাইকেল রিক্শা স্রোতের মতো ছুটতে শুরু করেছে। লোকজনও এখন প্রচুর। বড় সড়ক রীতিমত সরগরম হয়ে উঠেছে।

প্ল্যাটফর্মেই ছেলের বিছানাটা কাঁধে তুলে নিয়েছিল গৈরু, স্যুটকেশটাও নিতে চেয়েছিল। নিজের লিখিপড়ি ছেলে মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবে, এতে তার মন সায় দেয়নি। ফেকুনাথ অবশ্য বাপকে স্যুটকেশ বা বিছানা কোনোটাই দিতে চায় নি। কিন্তু গৈরুকে ঠেকানো মুশকিল। জোর করে শেষ পর্যন্ত স্যুটকেশটা নিজের হাতে রাখতে পেরেছে ফেকুনাথ।

সড়কের কিনার ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে ফেকুনাথ দুবেজিকে বলে, 'দু'জনে একসাথ যে স্টেশনে এলেন, বাপুর সাথ আপনার দেখা হল কোথায়?' দুবেজি তাদের গাঁয়ে থাকেন না। তাই এত সকালে কিভাবে গৈরুনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল, সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছিল ফেকুনাথের।

দুবেজি বলেন, 'আগেই তোর বাপকে খবর দিয়ে রেখেছিলাম। আজ সুবে সুবে তোদের গাঁওয়ে এসে তাকে তুলে নিয়ে এলাম।'

খানিকটা হাঁটার পর দুবেজি গৈরুনাথের দিকে তাকান। বলেন, 'সারা জীওন অনেক কষ্ট করেছিস।

ছেলে মানুষ হয়েছে। এবার তোর দুখ তখলিফ ঘুচবে।'

যেভাবে মানুষ কোনো মূল্যবান দুর্লভ সম্পত্তি দেখে ঠিক সেইভাবে নিজের ছেলেকে লক্ষ করছিল গৈরুনাথ। সে বলে, 'রামজিকা কিরপা।'

দুবেজি এবার ফেকুনাথের দিকে ফেরেন, 'তোর মা-বাপের কষ্টের কথা তোর চাইতে দুনিয়ায় আর কেউ বেশি জানে না। রামধারী মিশিরের খেতিতে তারা সারা জীওন খতম করে দিয়েছে। এতদিন পড়াশোনা করেছিস, আমি কিছু বলিনি। এবার কিন্তু সম্‌সারের কথা তোকে ভাবতে হবে।'

ফেকুনাথ বলে, 'জরুর মাস্টারজি। আমি ভেবেই রেখেছি, একটা নৌকরি উকরি জুটিয়ে নেব। তখন বাপু আর মাকে খাটতে দেব না।'

'খুব ভাল ভেবেছিস। তোর মা-বাপের বয়েস হয়েছে। খেটে খেটে তবিয়ত কমজোর হয়ে গেছে। এখন আরাম দরকার। সমঝা?'

'সমঝা মাস্টারজি।'

কথায় কথায় আড়াই 'মিল' পেরিয়ে ওরা গৈরুনাথদের গাঁয়ের কাছাকাছি এসে পড়ে। পাকা সড়ক থেকে বাঁ দিকে কাঁচা সরু পথ পাথুরে পড়তি জমির ওপর দিয়ে চলে গেছে। এদেশে বলে কাচ্চী। কাচ্চী ধরে 'রশি'ভর হাঁটলেই গৈরুনাথদের মনচনিয়া গাঁ।

কাচ্চীর মুখে এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায় গৈরুনাথ। চোখ মুখ দেখে টের পাওয়া যায়, আচমকা তার কিছু মনে পড়ে গেছে। তার কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে।

দুবেজি বলেন, 'কী হল রে, রুখে গেলি যে? ঘরে চল।'

গভীরভাবে কিছু ভাবতে ভাবতে গৈরুনাথ বলে, 'আভি নায় মাস্টারজি। দুখনকে নিয়ে আগে মধিপুরায় যেতে হবে।'

দুবেজির ভুরু কুঁচকে যায়। কিসের একটা গন্ধ যেন তিনি পান। বলেন, 'মধিপুরায় কেন?'

'দুখন ভাগলপুর থেকে এলে ওকে নিয়ে যেতে বলেছে বড়ে সরকার।'

বড়ে সরকার অর্থাৎ রামধারী মিশ্র। দুবেজি বলেন, 'বলেছে তো বলেছে। বিকেলে নিয়ে গেলেই হবে। ছেলেটা বিনা নিদে, সারা রাত ট্রেনে কাটিয়ে এসেছে। জরুর ভুখও লেগেছে। এখন ঘরেই চল।'

গৈরুনাথ চমকে ওঠে। বলে, 'নেহী মাস্টারজি, আগে মধিপুরায় যাব। না গেলে সরকার বহোত গুস্‌সা হবে।'

গৈরুনাথ এত গরিব এবং দুর্বল যে কারুর মুখের ওপর 'না' বলতে পারে না। যে যা বলে মুখ বুজে সায় দিয়ে যায়। বিশেষ করে রামধারী মিশ্র কিছু বললে তো কথাই নেই। দুবেজি জানেন, এর একমাত্র কারণ গৈরুনাথের আজন্মের ভীরুতা। এই পৃথিবীতে সবাইকে ভয় পায় সে। তবে সব চাইতে বেশি ভয় তার রামধারীকে। মারাত্মক, সীমাহীন ভয়। রামধারী কিছু বললে তা অমান্য করার মতো দুর্জয় সাহস তার নেই।

ফেকুনাথকে হাজির করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো তারিখ বা সময় ঠিক করে দেন নি রামধারী মিশ্র। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে যখন হুকুম বেরিয়েছে, গৈরুনাথ তটস্থ হয়ে আছে। ফেকুনাথকে তাঁর কাছে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত গৈরুর ভয় এবং উদ্বেগ কিছুতেই কাটবে না।

দুবেজি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই হঠাৎ ফেকুনাথ বলে ওঠে, 'হাঁ, মালিকের দর্শনটা আগে চুকিয়েই যাই মাস্টারজি। সরকার আমাকে দেখতে চেয়েছেন, আচ্ছা বাত। না চাইলেও আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম।'

দুবেজি অবাক হয়ে যান। তলব না করলেও কেন যে ফেকুনাথ রামধারী মিশ্রর সঙ্গে দেখা করার কথা বলল, বোঝা যাচ্ছে না। বিমূঢ়ের মতো তিনি তাকিয়ে থাকেন।

ফেকুনাথ সামান্য হেসে বলে, 'সমঝা নেহী?'

'নেহী।' দুবেজি মাথা নাড়েন।

'বড়ে সরকারের কাছে গিয়ে একটা পুরানা হিসাব বুঝে নিতে হবে।'

দুবেজি চমকে ওঠেন। বলেন, 'কিসের হিসেব রে?'

'পরে বলব।' শান্ত মুখে হেসে হেসে বলতে থাকে ফেকুনাথ, 'আপনাকে না জানিয়ে কিছু করব না মাস্টারজি।'

দুবেজিকে ভীষণ চিন্তিত দেখায়। বলেন, 'ঠিক হ্যায়। মধিপুরাতেই তা হলে চল।'

কাচ্চীতে না নেমে পাকা সড়ক ধরে তিনজনে সোজা হাঁটতে থাকে।

এই মুহূর্তে মধিপুরায় যাবার ইচ্ছা যে দুবেজির ছিল না তা স্পষ্টই বুঝেছে গৈরুনাথ। ফলে দুবেজিকে খুশি করার জন্য তার ভেতরকার আজন্মের সেই ভীরুতা একটা কৈফিয়তও খাড়া করে ফেলেছে। সেটা বলার জন্য সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। যেহেতু তিনি ফেকুনাথের সঙ্গে কথা বলছিলেন, গৈরু সুযোগ পাচ্ছিল না। এবার চারদিক ভাল করে দেখে চাপা নিচু গলায় বলে, 'দুখনকে না নিয়ে গেলে বহোত মুসিবত হত। বড়ে সরকার কেমন টেড়া আদমী জানেন তো।'

রামধারী মিশ্র সম্পর্কে এ জাতীয় মন্তব্য কখনও কারুর কাছে করে না গৈরুনাথ। কেননা কাজটা তার মতো গরিব অচ্ছুৎ দিন-মজুরের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত এবং বিপজ্জনক। কোনোভাবে কথাটা রামধারীর কানে উঠলে তাঁর পোষা পহেলবানেরা তাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবে। তবে দুবেজিকে ভয় নেই, তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে গৈরুনাথ। দুবেজি সে বিশ্বাসের মর্যাদাও রাখেন, তাঁর দিক থেকে সামান্য ক্ষতিরও সম্ভাবনা নেই। তাই কখনও কখনও একমাত্র তাঁরই কাছে দু-একটা মনের কথা বলে থাকে গৈরুনাথ।

দুবেজি বলেন, 'জানি। লোকটা বহোত খতরনাক।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর দুবেজি হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, 'দুখনকে কেন নিয়ে যেতে বলেছে জানিস?'

জোরে জোরে মাথা নাড়ে গৈরুনাথ, 'মালুম নেহী। ডর লাগতা।'

'ডরের কী আছে!' দুবেজি সাহস যোগাতে চেষ্টা করেন।

'কা জানে, বড়ে সরকার য্যায়সা আদমী—' বলতে বলতে থেমে যায় গৈরুনাথ।

একটু ভেবে এবার ফেকুনাথের দিকে তাকান দুবেজি, 'এ বছর তোদের সঙ্গে রামধারী মিশ্রর দুই লেড়কা পরীক্ষায় বসেছিল না?'

ফেকুনাথ বলে, 'শুনেছি।'

'পাশ করেছে?'

'জানি না।'

বড় জমিমালিক রামধারী মিশ্র সম্পর্কে দুবেজির ধারণা ভাল নয়। কী উদ্দেশ্যে তিনি ফেকুনাথকে নিয়ে যেতে বলেছেন, বোঝা যাচ্ছে না। তবে মনে হচ্ছে, উদ্দেশ্যটা আদৌ মহৎ নয়।

মনচনিয়া আর মধিপুরার মাঝামাঝি জায়গায় বইহারি গাঁ। এখানেই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের প্রাইমারি স্কুল। স্কুল বাড়িরই একধারে দুবেজি থাকেন। প্রথমে তিনি ঠিক করেছিলেন, গৈরুনাথদের সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে বইহারিতে চলে যাবেন। হাঁটতে হাঁটতে ভাবলেন, আপাতত মধিপুরাতেই যাওয়া দরকার। ফেরার পথে বইহারিতে গেলেই হবে।

দুবেজি বলেন, 'অনেক দিন রামধারীজির সঙ্গে দেখা হয় নি। চল, তোদের সঙ্গে গিয়ে দর্শনটা সেরে আসি।'

দুই

মধিপুরা বামহন কায়াথ রাজপুত ক্ষত্রিয় ইত্যাদি উচ্চবর্ণের মানুষদের গাঁ। এখানে বেশির ভাগই পাকা মকান। বার আনা রাস্তাই খোয়া দিয়ে বাঁধানো। এ অঞ্চলের লোকজন বলাবলি করে, 'মধিপুরা গাঁও নেহী—ভারি টৌন।' টৌন অর্থাৎ টাউন বা শহর।

মধিপুরার মাঝামাঝি জায়গায় চার একর জায়গা জুড়ে বড় জমিমালিক রামধারী মিশ্রের বিশাল তেতলা হাভেলি। অনেকটা পুরনো আমলের দুর্গের মতো। বাড়িটার মাথায় যে রামসীতা মন্দির রয়েছে

সেটার ছুঁচলো চূড়া দু মাইল দূর থেকে দেখা যায়।

বাড়িটার চারদিক দশ ফুট উঁচু পুরু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের মাথায় ভাঙা রঙিন কাচ বসানো। দক্ষিণমুখো প্রকাণ্ড গেট। সেটার পাল্লা দুটো চার ইঞ্চি পুরু ভারি সাগুয়ান কাঠের, তার ওপর লোহার বড় বড় গজাল আর শুল বসানো। নিচে লোহার চাকা। সেখানে বিরাট চৌগাঁফাওলা দুই ভোজপুরি দারোয়ান কাঁধে বন্দুক, গলায় টোটার মালা ঝুলিয়ে দিনরাত পালা করে পাহারা দেয়। একজনের ডিউটি দিনে, আরেকজনের রাতে।

বাড়িটার বয়স একশ পেরিয়ে গেছে। রামধারী মিশ্রর বাবার ঠাকুরদা এটা বানিয়েছিলেন গত শতাব্দীতে— সিপাহী যুদ্ধের পর। দেওয়ালগুলো আশি ইঞ্চি পুরু। বিরাট বিরাট দরজা-জানালাগুলোকে আরো মজবুত করার জন্য কাঠের পাল্লার ওপর মোটা মোটা লোহার পাত লাগানো হয়েছে।

বাড়িটায় শ'খানেকের মতো ঘর। যদিও রামধারী মিশ্রব তিন জেনানা এবং তিনজনই সুস্থ নীরোগ শরীরে এ বাড়িতে বসবাস করছে, আর আছে তাদের মোট বাইশটি ছেলেমেয়ে—তবু এই বিশাল কোঠির বেশির ভাগ ঘরই ফাঁকা পড়ে থাকে।

রামধারীর বয়স ষাটের কাছে হলেও ঘিউ-মালাই-পেস্তা-বাদাম আর মেওয়ার দৌলতে শরীর এখনও অটুট। দিশি বৈদরা (কবিবাজরা) এবং বিলাইতি ডিগ্রিওলা পাটনার ডাক্তাররা জানিয়ে দিয়েছেন, আরো দশ-বার সাল সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা তাঁর থাকবে। বার বছরে গড়ে প্রতিটি স্ত্রীর কাছ থেকে ছ-সাতটি করে সন্তান উপহার পেলেও এত বড় কোঠি তিনি এ-জীবনে বোঝাই করে যেতে পারবেন বলে মনে হয় না।

স্বাধীনতার কিছুদিন বাদে তিন বছরের মধ্যে শাস্ত্রমতে পর পর দু'বার তিনি বিয়ে করেন। তাঁর প্রথম দুই স্ত্রী স্বজাতের ঘর থেকে এসেছে। কিন্তু তিন নম্বর স্ত্রী সম্বন্ধে নানারকম গুজব কিছুকাল আগেও মধিপুরা এবং চারপাশের দশ বিশটা গাঁয়ে বাতাসে কান পাতলে শোনা যেত। হিন্দু কোড বিল পাশ হবার অনেক পরে এই আওরতটিকে তিনি সাহারসা থেকে সংগ্রহ করে আনেন। এ অঞ্চলের গাঁ-গঞ্জের লোকজন কানাঘুষা করত, তৃতীয় পত্নীটি নাকি আদপে ব্রাহ্মণই না, রাজপুত ক্ষত্রিয়ের ঘরের মেয়ে এবং তাকে শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে নাকি বিয়েও করা হয়নি। এসব গুজবের সবটাই যথাসময়ে রামধারী মিশ্রর কানে উঠেছে। তিনি পৃথিবী কাঁপিয়ে মাটিতে পা ঠুকেছেন এবং সগর্জনে ঘোষণা করেছেন, 'হামনিকা তিসরী জেনানা জরুর বামহন। কারুর সাহস থাকলে আমার সামনে এসে বলুক বামহন না।' তিনি যখন জানিয়েছেন তার ওপর কথা নেই। মধিপুরাকে ঘিরে বিশ পঁচিশটা গ্রামে এমন বুকের পাটা কারুর নেই যে তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে পারে। সুতরাং অনেকের মতে রাজপুত ক্ষত্রিয়ের মেয়ে বামহন হয়ে এখানে বিরাজ করছে।

রামধারী মিশ্রর দাপট এমনই যাতে সংসারে তিলমাত্র অশান্তি নেই। তিন স্ত্রী মুখ বুজে পরম সুখে ঘরকন্না এবং সন্তান উৎপাদন করে চলেছে।

এদিকে এখনও বিজলি আসেনি। বাড়িতে জেনারেটর বসিয়ে রামধারী বাতি জ্বালান এবং পাখা চালান। পাম্প লাগিয়ে দোতলা তেতলায় জল তোলান।

মূল বাড়িটার সামনের দিকে কম্পাউণ্ডের ভেতর অ্যাসবেস্টসের শেডের তলায় পুরনো আমলের দুটো মোটর থাকে। একধারে বাঁধা থাকে একটা হাতি। কখনও কখনও ওটার পিঠে চড়ে খানিকটা ঘুরে আসা ছাড়া হাতিটার আর কোনো উপকারিতা নেই। নিজের বড়মানুষি জাহির করার জন্যই অতবড় জন্তুটাকে পুষে থাকেন রামধারী মিশ্র। বাড়ির পেছনে তাগড়া ওয়েলার ঘোড়ার আস্তাবল। আস্তাবলের পাশে ফিটন রাখার শেড। মোটরের চাইতে ফিটনটাই বেশি পছন্দ করেন রামধারী।

রামধারী মিশ্র শাক্যদ্বীপী ব্রাহ্মণ, গোত্র মিহির। নিজের জাত সম্পর্কে তাঁর ভয়ানক গর্ব। জাতপাত এবং ছুয়াছুত নিয়ে তাঁর গোঁড়ামি মারাত্মক পর্যায়ের। অন্য জাতের, বিশেষ করে জল-অচল অচ্ছুৎদের তিনি পোকামাকড়েরও অধম মনে করেন। তবে তাদের ঘরের সুন্দরী যুবতী হলে আলাদা কথা।

আগেই বলা হয়েছে, রামধারী মিশ্র এ অঞ্চলের সব চাইতে বড় জমিমালিক। যোগবানীর দিকে যেতে তেতরিয়ার পর যে স্টেশনটা পড়ে তার নাম সোনারি। বড় সড়কের ওপারে তেতরিয়া এবং

সোনারির মাঝখানে পাক্কা পৌনে দু 'মিল' জুড়ে যত জমিজমা তার সব কিছুর মালিক রামধারী মিশ্র। ছলেবলে চাতুর্যে এবং স্বনামে বেনামে বিপুল পরিমাণ জায়গা নিজের দখলে রেখেছেন তিনি।

স্বাধীন ভারতবর্ষের যেদিকে ভাবতীয় সংবিধান, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টের কানুন চালু আছে, তার বাইরে বিহারের এই সব অঞ্চল। ফিউডাল সিস্টেমের সঙ্গে তুখোড় শয়তানি আর জাতপাতের গোঁড়ামি মিশিয়ে নিজস্ব স্টাইলে এখানে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন রামধারী মিশ্র।

এই মুহূর্তে 'চড়তি সূরয' যখন পুব দিকের আকাশে অনেকটা উঠে এসেছে, রামধারী মিশ্র তাঁর বিশাল কোঠির একতলায় খোলা বারান্দায় একটা গদি-আঁটা লম্বা ইজি-চেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে শীতের রোদ পোয়াচ্ছেন। চেয়ারটার নিচেই রুপো বাঁধানো মোরাদাবাদী ঢাউস ফরশি; সেটার লম্বা নলের এক প্রান্ত রামধারীর হাতে, অন্যমনস্কর মতো মাঝে মাঝে সেটাতে টান দিচ্ছেন তিনি। উগ্র শাক্যদ্বীপী ব্রাহ্মণ হলেও নেশার ব্যাপারে তাঁর আমিরি চাল।

ফরশি টানতে টানতে বার বার তিনি দূরে বড় গেটটার দিকে তাকাচ্ছেন। আজ সকালে শিউশঙ্কর ঝা'র আসার কথা। শিউশঙ্করজিও তাঁর মতোই একজন জমিমালিক। এখান থেকে সাত 'মিল' তফাতে বিলাখিয়াতে তিনি থাকেন। বিলাখিয়া মধিপুরার মতোই 'টৌন য্যায়সা' জায়গা। ওই অঞ্চলে কয়েক ঘর অচ্ছুৎ নাকি ধর্ম বদল করে খ্রিস্টান হয়ে গেছে। এ নিয়ে ওদিকে খুব উত্তেজনা আর হইচই চলছে। পাটনা কলকাতা দিল্লি বোম্বাই-এর খবরের কাগজগুলো এ নিয়ে রোজই কিছু না কিছু লেখালেখি করছে। সেই ব্যাপারেই পরামর্শ করতে আসছেন শিউশঙ্কর ঝা।

যাই হোক, ভারি মজবুত চেহারা রামধারীর। ষাট বছর বয়সেও গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে যায় নি; টকটকে গায়ের রং। গোল চাকার মতো মুখ, মাংসল গর্দান, বিশাল কাঁধ। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, মাথার পেছনে একগোছা মোটা টিকির ডগায় গিঁট দেওয়া।

মানুষটা বেজায় শৌখিন। তাঁর পরনে ফিনফিনে ধুতি, সার্জের পাঞ্জাবি এবং আরামদায়ক দামি বালাপোষ। ইজি চেয়ারের তলায় শুঁড়তোলা ধবধবে নাগরা। নাগালের মধ্যেই ছোট কাশ্মীরি টেবলে রুপোর রেকাবি ভর্তি পেস্তা বাদাম কিসমিস আখরোট সাজানো রয়েছে। ফরশি টানা স্থগিত রেখে মাঝে মাঝে এক মুঠো করে বাদাম পেস্তা মুখে পুরে আস্তে আস্তে চিবিয়ে যাচ্ছেন।

গেটের কাছে যথারীতি ভোজপুরি দারোয়ান পাহারা দিয়ে চলেছে। একটা নৌকর ওধারে হাতিকে চানা মটর খাওয়াচ্ছে। দুটো নৌকর মোটর ধুয়ে সাফসুতরো করছে। বারান্দার একধারে অনেকগুলো পাখির খাঁচা। খাঁচাগুলোর ভেতর নানা জাতের পাখি—কোয়েল, তোতা, কাকাতুয়া, ময়না ইত্যাদি। ছাদের মাথা থেকে ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। রোজ এই সময় ওখানে 'রামসীতা' মন্দিরে পুজো হয়। এটা তারই শব্দ।

হঠাৎ গেটের কাছ থেকে ভোজপুরী দারোয়ান হাঁকে, 'হুজৌর—'

রামধারী ভুরু তুলে তাকান, 'কা?'

'গৈরু চামারিয়া আয়া, আপকি দর্শন মাংতা হ্যায়।'

যখন রামধারী মিশ্র আরেক জমিমালিক শিউশঙ্কর ঝা'র জন্য বসে আছেন সেই সময় গৈরুর নাম শুনে বেজায় বিরক্ত হন। চোখমুখ কুঁচকে যায় তাঁর। অত্যন্ত বিরক্ত ভঙ্গিতে বলেন, 'সুবে উঠেই চামারের মুখ দেখব? কী চায় গৈরু?'

দারোয়ান জানায়, 'চামারিয়া ওর লেড়কাকে নিয়ে এসেছে। মাস্টারজিও সঙ্গে আছেন।'

এবার নড়েচড়ে উঠে বসেন রামধারী মিশ্র। বলেন, 'আসতে দাও।'

বাইরের রাস্তা থেকে গেট পেরিয়ে চলে আসেন দুবেজি, ফেকুনাথ এবং গৈরুনাথ।

দুবেজিকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন রামধারী মিশ্র, 'কা সৌভাগ হামনিকা! এই পয়লা গরিবের মকানে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল!'

দুবেজিও কম যান না। জিভ কেটে বলেন, 'পায়ের ধুলোটুলো বলে লজ্জা দেবেন না। সৌভাগ

আমারই। সুবে রাজার দর্শন পেলাম।'

রাজা কথাটা কী উদ্দেশ্যে দুবেজি বলেছেন, বোঝা যায় না। এর ভেতরর সূক্ষ্ম কোনো খোঁচা বা বিদ্রূপ আছে কিনা, কে জানে। দুবেজির সরল মুখ দেখে অবশ্য মনে হয়, খারাপ কোনো উদ্দেশ্য না-ও থাকতে পারে।

রামধারী মিশ্র একটা নৌকরকে দিয়ে চেয়ার আনিয়ে ব্যস্তভাবে বলেন, 'এখানে আসুন মাস্টারজি।'

দুবেজি অস্বস্তি বোধ করেন। তবু বারান্দায় উঠে তাঁকে রামধারী মিশ্রের মুখোমুখি চেয়ারে বসতে হয়। আর আবহমান কালের প্রথা অনুযায়ী ফেকুনাথ এবং গৈরুনাথ নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। একসঙ্গে এসে ওদের নিচে দাঁড় করিয়ে নিজে গিয়ে ওপরে বসতে খুবই খারাপ লাগে দুবেজির কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর কিছু করার নেই।

দুবেজি জানেন, রামধারী মিশ্র তাঁকে আদৌ পছন্দ করেন না। তিনি স্কুল বসিয়ে অচ্ছুৎদের পেটে কালির হরফ ঢুকিয়ে তাদের আঁখ খুলে দেবার চেষ্টা করছেন, এ ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট আপত্তি। কেননা লেখাপড়া শিখলে অচ্ছুৎরা আর সাদাসিধা থাকবে না; উদ্ধত প্যাঁচোয়া হয়ে উঠবে। তাতে এ অঞ্চলের শান্তি ও ভারসাম্য নষ্ট হবে। আসলে তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ আরো ব্যাপক এবং গভীর। লেখাপড়ার দৌলতে অচ্ছুৎরা নিজেদের হিসেব বুঝে নিতে শিখবে; তাদের ঠকানো যাবে না। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের স্কুলটা বন্ধ করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন রামধারী; দুবেজির জন্য সেটা সম্ভব হয় নি।

মধিপুরা এবং আশেপাশের গাঁয়ে আরো স্কুল আছে। সেগুলোতে মাইনে দিয়ে পড়তে হয়। অচ্ছুৎ গরিবের ঘরের ছেলেমেয়েদের একমাত্র ভরসা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ওই বিনে মাইনের স্কুল। সেটা বন্ধ হয়ে গেলে এইসব ছেলেমেয়ের পড়াশোনার আর কোনো আশাই নেই।

দুবেজি সম্পর্কে রামধারী মিশ্রর মনোভাব যেমনই হোক, মুখে বা হাবেভাবে কখনও তিনি তা প্রকাশ করেন না। তাঁর ব্যবহারে এতটুকু খুঁত নেই। বাইরে থেকে যতই অমায়িক আর সহৃদয় মনে হোক, দুবেজি জানেন এই লোকটার মধ্যে একটা হিংস্র জানোয়ার খাঁচায় আটকানো রয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে খাঁচা খুলে সেটাকে বার করে আনতে পারেন তিনি। ফলে রামধারী সম্পর্কে সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হয় দুবেজিকে।

নেহাত দোসাদ চামার গাঙ্গোতাদের ঘরে লেখাপড়ার চল হয় নি, তাই রক্ষা। তাদের ছেলেমেয়েরা দু'চার মাস যাতায়াত করতে না করতেই স্কুল ছেড়ে দেয়। যতক্ষণ স্কুলে থাকবে সেই সময়টা মা-বাপের কাজে সাহায্য করলে দু মুঠো গেঁহু বা মকাই বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা। পড়াশোনার পেছনে নষ্ট করার মতো অঢেল সময় তাদের নেই। ফলে চোখ ফোটে নি তাদের, নিজেদের বুঝ বুঝে নিতে শেখে নি, এ অঞ্চলের ভারসাম্য অক্ষুণ্নই আছে। যেদিন অবস্থাটা বদলে যাবে সেদিন রামধারী মিশ্রর স্বরূপ কিভাবে বেরিয়ে পড়বে, সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারেন দুবেজি।

রামধারী বলেন, 'তারপর মাস্টারজি, এই সকালবেলা কী মনে করে?'

দুবেজি বলেন, 'কোনো দরকারে আসিনি। গৈরুরা আসছিল, ওদের সঙ্গে চলে এলাম। শুনলাম, ফেকুনাথকে আপনি দেখা করতে বলেছেন।'

এবার যেন গৈরুনাথদের সম্পর্কে খানিকটা সচেতন হন রামধারী। বলেন, 'হাঁ হাঁ, বলেছিলাম।' বলেই ঘাড় ফিরিয়ে গৈরুনাথ এবং ফেকুনাথের দিকে তাকান। গৈরুকে লক্ষ করে শুধোন, 'কা রে, তোর লেড়কা ম্যাট্রিক পাশ হো গিয়া?'

উচ্চবর্ণের বড়ে সরকারের পা ছোঁওয়ার অধিকার বা সাহস কোনোটাই নেই গৈরুনাথের। চোখের কোণ দিয়ে ফেকুনাথকে প্রণাম করার ইশারা করে রামধারীর উদ্দেশে মাটিতে মাথা ঠেকায় সে। দেখাদেখি নিঃশব্দে তাই করে ফেকুনাথ। কিন্তু তার মুখচোখ কেমন যেন কঠিন দেখায়।

মাটি থেকে মাথা তুলে হাতজোড় করে থাকে গৈরুনাথ। বলে, 'হো গিয়া হুজৌর।'

'লিখিপড়ি লেড়কাকো বাপ বন গিয়া।' বলে চোখ কুঁচকে তাকান রামধারী।

ভয়ে ভয়ে রামধারীর দিকে এক পলক তাকায় গৈরুনাথ। ফেকুনাথ ম্যাট্রিক পাশ করায় তিনি খুশি

হয়েছেন কিনা সে সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারে না সে। কাঁপা গলায় বলে, 'আপহীকা কিরপাসে মালিক।'

রামধারী মিশ্র ফের দুবেজির দিকে তাকান। বলেন, 'পন্দ্র সাল ধরে যে চেষ্টা করছিলেন, এবার তার ফল মিলল—কী বলেন? আমার জীওনে আপনার মতো এত ধৈর্য আর কারুর দেখিনি।'

দুবেজি একটু অবাক হন। বলেন, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না রামধারীজি।'

'বলছিলাম অচ্ছুৎদের ঘরে একটা ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেট ঢোকাতে পন্দ্র সাল খরচা করলেন। ধৈর্য নয়?'

দুবেজির মুখ গম্ভীর দেখায়। তিনি উত্তর দেন না।

'অন্নদান ভূদান বিদ্যাদান—এ সব বহোত পুণকা কাম (পুণ্যের কাজ)।' বলতে বলতে দু হাতে বার কয়েক তালি বাজান রামধারী।

যে নৌকরটা পাখিদের দানা খাওয়াচ্ছিল সে দৌড়ে আসে। রামধারী বলেন, 'লছমন আর সূরযকে ডেকে নিয়ে আয়।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে নৌকর ছুটে যায়। কিছুক্ষণ পর দামড়া মোষের মতো বিশাল চেহারার দুই তাগড়া যুবককে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। এরা রামধারী মিশ্রব প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে। প্রায় সমবয়সী। খুব সম্ভব সূরয লছমনের চাইতে মাসখানেকের ছোট।

রামধারী মিশ্র তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধীরে ধীরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বলেন, 'এবার নিয়ে ক'বার ম্যাট্রিক ফেল করলি?'

মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সূরয আর লছমন।

রামধারী খুব মোলায়েম গলায় বলেন, 'সরমকা কুছ নেহী। বাতা না, বাতা—'

ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে দু'জনে বলে, 'পাঁচ বার।'

'বহোত আচ্ছা—' রামধারী বলতে থাকেন, 'তোদের পেছনে ক'জন মাস্টার লাগানো আছে?'

'পাঁচ জন।'

আস্তে আস্তে তালি বাজাতে থাকেন রামধারী মিশ্র। বলেন, 'বহোত আচ্ছা—' হঠাৎ তালি থামিয়ে আঙুল বাড়িয়ে ফেকুনাথকে দেখাতে দেখাতে বলেন, 'ওকে চিনিস?'

সূরয লছমন একসঙ্গে মাথা নাড়ে, 'চিনি। গৈরু চামারিয়াকা লেড়কা।'

'এহী সাল ও ম্যাট্রিক পাশ করেছে, জানিস? একবার পরীক্ষায় বসেছে, একবারেই পাশ।'

রামধারী মিশ্র উলটোপালটা প্রশ্ন করে যে অত্যন্ত বিপজ্জনক দিকে যাচ্ছেন, এবার তা যেন আন্দাজ করতে পারছে সূরযরা। চোখ নামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তারা।

রামধারী মিশ্র বলেন, 'চুপ করে আছিস কেন? জবাব দে—'

সূরয বা লছমন কেউ মুখ তোলে না, উত্তরও দেয় না।

'চামারের ছোঁয়া ঘরে সার্টিফিকেট নিয়ে এল আর আমার ছেলেরা পাঁচ সাল ফেল!' বলেই চিৎকার করে ওঠেন রামধারী, 'ভৈসকা বাচ্চা, লাথ মার মারকে ঘরসে নিকাল দেগা। নিকাল ইধরিসে, নিকাল যা—' বলেই ইজি চেয়ারের তলা থেকে নাগরা দুটো তুলে ধাঁ করে দুই ছেলের উদ্দেশে ছুঁড়ে মারেন।

অব্যর্থ নিশানা। একটা উড়ন্ত নাগরা গিয়ে লাগে সূরযের ডান গালে, আরেকটা লছমনে ঘাড়ে। দু'জনে জুতোর বাড়ি খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বারান্দা থেকে উধাও হয়ে যায়। আর যে নৌকরটা তাদের ডেকে এনেছিল নাগরা দুটো কুড়িয়ে এনে ইজিচেয়ারের তলায় আগের মতো গুছিয়ে রেখে ফের পাখিদের দানা খাওয়াতে থাকে।

ছেলেরা যেদিকে পালিয়েছে সেদিকে দাঁতে দাঁত চেপে তাকিয়ে থাকেন রামধারী মিশ্র। প্রচণ্ড রাগে তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে; চোখ দুটো টকটকে লাল। প্রবল রক্তচাপে মুখ আরক্ত। একটা হিংস্র জানোয়ারের মতো দেখাচ্ছে তাঁকে।

কিছুক্ষণ পর রামধারী মিশ্র যখন গৈরুদের দিকে মুখ ফেরান তখন সেখানে রাগ বা উত্তেজনার

চিহ্নমাত্র নেই। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেন, 'তোর লেড়কা পাশ করেছে; ওকে মিঠাই খিলাতে হবে।' বলেই তালি বাজিয়ে আবার সেই নৌকরটাকে ডাকেন। বলেন, 'যা, মিঠাইয়া উঠাইয়া লেকে আ। তুরন্ত—'

তৎক্ষণাৎ আদেশ পালিত হয়। নৌকর বাড়িতে তৈরি ঘিয়ে ভাজা উৎকৃষ্ট লাড্ডু, বুন্দিয়া এবং নিমকিন নিয়ে আসে। আর আসে তেজপাতা-লবঙ্গ-এলাচ দিয়ে ফোটানো খুশবুদার চা। উঠোনে দাঁড়িয়ে বাসিমুখে সে সব খেতে হয় গৈরু এবং ফেকুনাথকে। দুবেজি সবিনয়ে মিঠাই ফিরিয়ে দিতে দিতে জানান, সকালে কিছু খাওয়ার অভ্যাস তাঁর নেই। তবে চা অবশ্য নেন।

নৌকর রামধারীর জন্যও চা নিয়ে এসেছিল। চীনা মাটির দামি কাপে চুমুক দিয়ে তিনি শুধোন, 'কা রে গৈরুকা বেটোয়া, পাশ তো করে এলি। এবার কী করবি?'

গৈরুনাথ গোগ্রাসে লাড্ডু চিবোচ্ছিল। এরকম বঢ়িয়া মিঠাই জীবনে ক'বার খেয়েছে সে আঙুলে গুনে বলে দিতে পারে। ফেকুনাথ উত্তর দেবার আগেই রুদ্ধ গলায় বলে ওঠে, 'আপকা যো হুকুম হোগা—' অর্থাৎ রামধারী মিশ্র যেমনটি চাইবেন হুবহু তাই করবে ফেকুনাথ।

অথচ তেতরিয়া স্টেশন থেকে আসার সময় ফেকুনাথ নিজের মুখে জানিয়েছে, একটা সরকারি চাকরি বাকরি জুটিয়ে সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে। সে কথা ভুলে যায়নি গৈরুনাথ। কিন্তু সে গরিবের চাইতেও গরিব। তার মতো ভূমিহীন কিষান যে সালভর রামধারী মিশ্রর জমি বা খামারে উদয়াস্ত খেটে পেটের দানা জোটায় তার বংশের কারুরই স্বাধীন ইচ্ছা বা মতামত থাকতে পারে না। তারা কে কী করবে, না করবে, সব ঠিক করে দেবেন বড়ে সরকার। এ ব্যাপারে তাঁর হুকুমই শেষ কথা। এটা আবহমান কাল ধরে ধর্মীয় কোনো প্রথার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর নড় চড় করার সাহস বা শক্তি গৈরুর মতো ভুখা দিনমজুরের থাকতে পারে না।

আগেই বলা হয়েছে, রামধারী মিশ্রকে মারাত্মক ভয় পায় সে। তার বাপ-দাদা রামধারীর বাপ-দাদাকেও ভয় পেত। পুরুষানুক্রমে রক্তের মধ্যে ধারাবাহিক ভীরুতা নিয়ে উত্তর বিহারের এই প্রান্তে জন্মেছে গৈরু এবং আজন্ম এই ভীরুতাকে ধর্ম পালনের মতো পরম নিষ্ঠায় মুখ বুজে পালন করে চলেছে। কাজেই রামধারী মিশ্রর ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর তার কোনো কথা থাকতে পারে না।

রামধারী মিশ্রর চোখমুখ দেখে মনে হয়, তিনি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন। পরম উদারতায় ফেকুনাথকে বলেন, 'পরে আসিস। আমার খামারে একগো (একজন) লিখিপড়ি আদমীর দরকার। রাজিন্দরটা বিলকুল মূরখ; খামারের ধান গেঁহু তিল তিসির হিসেব রাখতে গোলমাল পাকিয়ে ফেলে। তোকে ওখানে বসিয়ে দেব।'

রাজিন্দর রামধারী মিশ্রর দ্বিতীয় স্ত্রীর দূর সম্পর্কের ভাই। দিনরাত গাঁজা খায় আর লোটা লোটা ভাঙের সরবৎ চড়িয়ে ভোম হয়ে থাকে। লেখাপড়াও বিশেষ কিছু জানে না। ফলে তার হিসেবপত্রে প্রচুর গণ্ডগোল। তার ওপর বেজায় চোর।

মালিকের এ জাতীয় মহানুভবতায় একেবারে অভিভূত হয়ে যায় গৈরুনাথ। সে বলতে যাচ্ছিল 'এ তো দুখনকা বহোত বড় সৌভাগ- -' কিন্তু বলাটা আর হয়ে ওঠে না।

তার আগেই ফেকুনাথ বলে, 'নৌকরি করলে সরকারি নৌকরি করব। আমাদের শিডিউল্ড কাস্ট আর শিডিউল্ড ট্রাইবদের জন্যে গভর্নমেন্ট অনেক চাকরির ব্যবস্থা করেছে। কুছ না কুছ জরুর মিল যায়েগা।' বলেই দুবেজির দিকে তাকায়, 'কা মাস্টারজি, মিলবে না? আমাদের জন্য 'কোটা' নেই?'

গোটা উত্তর বিহার কাঁপিয়ে আচমকা যেন বাজ পড়ে। দুবেজির মতো সাহসী মানুষও রীতিমত থ হয়ে যান। জগতের সব চাইতে ভীরু, সব চাইতে দুর্বল গৈরু চামারের ছেলে রামধারী মিশ্রর মুখের ওপর সরাসরি যা বলে, নিজের কানে শুনেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

এদিকে ভয়ে নিঃশ্বাস আটকে আসে গৈরুনাথের। অদ্ভুত এক কাঁপুনি পেটের ভেতর থেকে অনবরত উঠে আসতে থাকে। দাঁতে দাঁত লেগে যায়। ভীত অস্পষ্ট কাঁপা গলায় সে নাগাড়ে বলতে থাকে, 'দুখনকো মাপ কীজিয়ে সরকার, মাপ কীজিয়ে, মাপ কীজিয়ে—' কিন্তু কিছুতেই গলায় স্বর ফোটে না।

রামধারী মিশ্রও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। একদৃষ্টে তিনি ফেকুনাথের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ফেকুনাথ ফের বলে ওঠে, 'তবে আপনি যখন আসতে বলেছেন, জরুর আসব। না বললেও আসব। আমাদের একটা পুরানা হিসাব আপনার কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে।' অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে যায় ফেকুনাথ। খুব সম্ভব বাকি তিনটি মানুষের মুখচোখের চেহারা এবং প্রতিক্রিয়া সে লক্ষ করেনি।

গৈরুনাথ এবং দুবেজি বুঝতে পারছিলেন, নিদারুণ কিছু একটা ঘটবে। ফেকুনাথের হঠকারিতার বেশ চড়া দামই দিতে হবে। হয়ত পোষা পহেলবানদের ডাকিয়ে এই মুহূর্তে হাতির আস্তাবলের খুঁটিতে বেঁধে বেদম নাগরা চালাবেন রামধারী মিশ্র; মারতে মারতে তার গায়ের চামড়া তুলে ফেলবেন।

কিন্তু আপাতত কিছুই ঘটে না। আস্তে আস্তে তালি বাজিয়ে রামধারী মিশ্র বরং তারিফের গলায় বলতে থাকেন, 'বহোত আচ্ছা, বহোত আচ্ছা—' তারপর দুবেজির দিকে ফিরে বলেন, 'পেটে লেখাপড়া ঢুকিয়ে চামারের ছৌয়ার আঁখ বেশ ভালই ফুটিয়ে দিয়েছেন দুবেজি।' বলতে বলতে তাঁর চোখের সফেদ অংশটা লাল হয়ে উঠতে থাকে। মুখ থমথমে, চোয়াল পাথরের মতো শক্ত। মনে হয়, শরীরের সব রক্ত দ্রুত মুখেচোখে উঠে আসছে।

শেষ পর্যন্ত বিস্ফোরণটা আর ঘটে না। হঠাৎ কোথায় যেন ঘড় ঘড় করে ধাতব শব্দ ওঠে। চমকে সবাই গেটের দিকে তাকাতেই দেখতে পায়, ভোজপুরী দারোয়ান বিরাট ভারি পাল্লা দুটো খুলে দিয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে পুরনো মডেলের প্রকাণ্ড ফোর্ড গাড়ি ভেতরে এসে ঢোকে। গাড়িটার পেছনের সিটে গা এলিয়ে পড়ে আছেন শিউশঙ্কর ঝা। ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা চর্বির পাহাড় একটা। কদমছাঁট চুল। মাথার পেছন দিকে মোটা টিকিতে গাঁদা ফুল বাঁধা। কপালে তিন লাইন চন্দনের ছাপ। গলায় সরু সোনার হার, দু'হাতে আটটা আংটি। পরনে দামি ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর গরম কাপড়ের গলাবন্ধ লং কোট।

শাক্যদ্বীপী ব্রাহ্মণ রামধারী মিশ্র মৈথিলী ব্রাহ্মণ শিউশঙ্কর ঝাকে দেখে দ্রুত উঠে দাঁড়ান। ফেকুনাথের ব্যাপারটা আপাতত মুলতুবি থাকে। পরম সমাদরের ভঙ্গিতে রামধারী বলেন, 'আইয়ে আইয়ে শিউশঙ্করজি—' বলে ব্যস্তভাবে নিচে নেমে গিয়ে ফোর্ড গাড়ির দরজা খুলে দেন এবং শিউশঙ্করজিকে সঙ্গে করে ফের বারান্দায় এসে বলেন, 'চলুন, ঘরে গিয়ে বসি।'

শিউশঙ্কর বলেন, 'কেন, এ জায়গাটা তো চমৎকার। বেশ রওদ আছে।'

সুতরাং তৎক্ষণাৎ গদিআঁটা আরামদায়ক কুরসি আসে। নৌকরকে চা এবং মিঠাই আনার হুকুম দেন রামধারী মিশ্র। তারপর শিউশঙ্করের মুখোমুখি বসে কুশল বিনিময়ের পর শুধোন, 'কহিয়ে, বিলাখিয়াকা কা খবর?'

শিউশঙ্কর বলেন, 'বহোত বুরা। আপনাকে তো জানিয়েছিই, বিশ তিশ ঘর খ্রিস্টান হয়ে গেছে।'

একটু আগে রামধারী মিশ্রর দেখাদেখি দুবেজিও শিউশঙ্কর ঝাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। এ অঞ্চলের তিরিশ চল্লিশটা গাঁয়ের তাবত মানুষ রামধারীর মতো শিউশঙ্করজিকে চেনে। দুবেজিও চেনেন। যাই হোক, সেই যে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, আর বসেন নি। এবার বলেন, 'মাপ কীজিয়ে রামধারীজি শিউশঙ্করজি, আপনারা কথাবার্তা বলুন। আমি আজ চলি, আর হুকুম হলে গৈরুদের নিয়ে যাই।'

শিউশঙ্কর আসায় দুবেজিদের দিকে তেমন লক্ষ্য ছিল না রামধারী মিশ্রর। ঘাড় ফিরিয়ে বলেন, 'ঠিক হ্যায়—'

'পরে আবার দর্শন হবে—' বলে দুবেজি নিচের ফাঁকা জমিতে যেই নেমে এসেছেন, শিউশঙ্কর হঠাৎ ডেকে ওঠেন, 'মাস্টারজি—' তিনিও দুবেজিকে দীর্ঘকাল চেনেন।

দুবেজি দাঁড়িয়ে পড়েন, 'কিছু বলবেন?'

'হাঁ। শুনেছেন নিশ্চয়ই, আমাদের ওদিকে অচ্ছুতিয়ারা অনেকেই ধরম বদল করছে।'

'শুনেছি।'

'আরো অনেকেই নাকি করবে। বহোত চিন্তা কি বাত।'

দুবেজি উত্তর দেন না।

কিছুক্ষণ ভেবে শিউশঙ্কর আবার বলেন, 'আপনি তো অচ্ছুৎ ছৌরা-ছৌরীদের নিয়ে স্কুল খুলে বসেছেন। এখানকার চামার দোসাদ গাঙ্গোতাদের নিয়ে দিনরাত আপনার ওঠাবসা। ধরম ছাড়ার ব্যাপারে তারা কী ভাবছে?'

'তেমন কিছু শুনিনি—' দুবেজি বলেন।

হঠাৎ রামধারী গৈরুনাথদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এই তো গৈরু চামারিয়া রয়েছে। ওর কাছেই সব জানা যাবে। —কী ভাবছিস রে তোরা?'

গৈরুনাথ এতক্ষণ দম বন্ধ করে ছিল যেন। দ্রুত বলে ওঠে, 'কুছ নেহী হুজৌর।'

'তোদের গাঁওয়ের কেউ ধরম বদলের মতলব করেছে? শুনেছিস কিছু?'

'নেহী মালিক।'

'তেমন খবর পেলে আমাকে জানিয়ে যাস।'

'জানাব সরকার।'

'ঠিক হ্যায়, এখন যা।' বলেই ভুরু কুঁচকে ফেকুনাথের দিকে তাকান বামধাবী মিশ্র, 'পুরানা হিসাবটা বুঝতে কবে আসবি রে চামারিয়াকা বেটোয়া?'

রামধারীর বলার ভঙ্গিতে বিপজ্জনক একটা ইঙ্গিত ছিল। তাঁর প্রশ্নটা তলিয়ে না দেখে সরলভাবে ফেকুনাথ জবাব দেয়, 'দশ পন্দ্র রোজের মধ্যে চলে আসব হুজৌর।'

'বহোত আচ্ছা।'

এরপর তিনজন সামনের ফাকা জায়গাটা পেরিয়ে গেটের দিকে যেতে যেতে রামধারী মিশ্র এবং শিউশঙ্কর ঝা'র কিছু কথাবার্তা শুনতে পায়।

রামধারী বলছেন, 'ক'টা অচ্ছুৎ ধরম বদল করেছে তো কী হয়েছে? এই বাজে ব্যাপারটা নিয়ে আপনি বড় বেশি চিন্তা করছেন শিউশঙ্করজি।'

শিউশঙ্কর বলেন, 'আজ দু-চারজন করছে, কাল দু-চার শ করবে, পরশু দু-চার হাজার, তরশু দু-চার লাখ। এভাবে চললে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ভাবতে পারেন রামধারীজি? না না, এটা এখনই রোখা দরকার।'

'ধরম বদলালে ক্ষতিটা কী? জানবরের মতো ওই আদমীগুলো একই থাকবে। আমাদের পহেলবান আছে, লাঠি আছে, বন্দুক আছে। ভয়টা কোথায়?' রামধারীর এই কথাগুলোর ভেতর থেকে আবহমান কালের পরিচিত সব ফিউডাল লর্ড তাদের যাবতীয় চারিত্রিক মহিমা নিয়ে ফুটে ওঠে।

শিউশঙ্কর বলেন, 'ইন্ডিয়া বলতে আমাদের চারপাশে এই ক'টা গাঁও বোঝায় না রামধারীজি। তার বাইরেও বিরাট দেশ পড়ে আছে। সেখানে গরম গরম অনেক কিছু ঘটছে। মালুম পাচ্ছি, বাইরের আগ (আগুন) এখানে এসেও লাগবে।' তারপর একটু ভেবে বলেন, 'দিনকাল বদলে যাচ্ছে। আমাদের এখন থেকেই হোঁশিয়ার হতে হবে।'

রামধারীকে তেমন বিচলিত বা চিন্তাগ্রস্ত দেখায় না। তিনি বলেন, 'আপনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন শিউশঙ্করজি।'

'ভাল করে চিন্তা করলে আপনিও পেতেন। একটা কথা ভেবে দেখুন রামধারীজি, এইসব অচ্ছুতেরা হিন্দু ধরমের বাইরে চলে গেলে ওদের কি নিজেদের 'কানটোলে' (কনট্রোলে) রাখা যাবে?'

দুই জমিমালিকের আলোচনা শুনতে শুনতে দুবেজিরা বিশাল গেট পেরিয়ে বাইরে রাস্তায় চলে যান।

তিন

মধিপুরা থেকে গৈরুনাথরা যখন মনচনিয়ায় ফিরে যায় অঘুন মাসের সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। অবশ্য দুবেজি এতদূর পর্যন্ত আসেন নি। পাক্কী ধরে মাইলখানেক একসঙ্গে হেঁটে দক্ষিণের ধানখেতে নেমে সোজা বইহারিতে চলে গেছেন।

মনচনিয়া অচ্ছুৎদের গাঁ। এর একদিকে থাকে দোসাদরা, একদিকে গাঙ্গোতারা, একদিকে ধাঙড়েরা, আরেক দিকে চামারেরা। বিহারের জল-অচল কিষানদের গাঁ যেমন হয়, মনচনিয়া অবিকল তাই। তেমনই হতচ্ছাড়া চেহারা এখানকার। কোথাও একটা পাকাবাড়ি চোখে পড়ে না। আর নেই পাক্কী বা খোয়া এবং পিচের রাস্তা। সরু সরু ধুলোভরা কাচ্চীর দু'ধারে টুটাফুটা টিন, ভাঙাচোরা টালি, বাঁশ অথবা সাগুয়ান কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি অগুনতি কোমর-বাঁকা ধসে-পড়া নিচু নিচু ঘর এলোমেলো ছড়িয়ে আছে।

এখানে সব চাইতে বেশি করে যা চোখে পড়ে তা হল পরাস সিমার পিপর আর ট্যারাবাঁকা চেহারার সিসম গাছ। এখন এই শীতকালে চারদিকে সফেদিয়া এবং মনরঙ্গোলি ফুল ফুটে আছে। বর্ষায় হাঁটুভর কাদা আর জোঁক. শীতে অসহ্য হিম, গরমের সময় প্রচুর ধুলো, মচ্ছড় এবং বারমাস 'বুখার' আর অভাব নিয়ে বিহারের এই সুদূর প্রান্তে মনচনিয়া গাঁ ঘাড় গুঁজে পড়ে রয়েছে।

বর্ষা বাদে বাকি মাসগুলোতে এখানে 'পীনেকা পানি' অর্থাৎ খাবাব জলের বড়ই কষ্ট। মান্ধাতার বাপের আমলে 'গরমিন অফসরেরা' (গভর্নমেন্ট অফিসারেরা) এখানে একটা টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। কবেই সেটা ভেঙেচুরে গেছে। গাঁয়ের চার মাথায় বিশ বছর আগে যে চারটে কুয়ো কাটানো হয়েছিল, বালি পড়ে পড়ে সেগুলো প্রায় বুজে এসেছে। বালি তুলে ওগুলো নতুন করে না কাটালে বছর দুয়েকের মধ্যেই গোটা মনচনিয়া গাঁ-টাকে তিয়াসে ছাতি ফেটে মরতে হবে। এ ব্যাপারে গাঁয়ের লোকজন বড়ে সরকার রামধারী মিশ্রর কাছে বহুবার দরবার করেছে। তিনি তাদের আর্জি এক কানে শুনে আরেক কান দিয়ে বার করে দিয়েছেন।

পাঁচ সাল পর পর এখানে চুনাও (নির্বাচন) আসে। বড়ে বড়ে আদমীরা ভোটমাঙোয়া হয়ে দর্শন দেন। কুয়োগুলোর দমবন্ধ সঙিন অবস্থা দেখে ভরসা দেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাটাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু চুনাও শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উধাও হয়ে যান। পাঁচ বছর পর আবার তাঁদের দেখা মেলে। চুনাওর পর চুনাও আসে। মৌখিক ভরসাটুকু ছাড়া মনচনিয়া গাঁয়ের কপালে আর কিছুই জোটে না। শুধু প্রতি পাঁচ বছরে কুয়োগুলো আরো পাঁচ হাত করে বালিতে বুজে যায়।

দুপুরবেলায় মনচনিয়া গাঁ প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। দশ বিশটা অকেজো বুড়োবুড়ি এবং কিছু বাচ্চাকাচ্চা ছাড়া এ সময়টা আর কাউকেই এখানে পাওয়া যায় না। তাবত শক্তসমর্থ পুরুষ এবং আওরত কাজ বা খাদ্যের খোঁজে সকাল হতে না হতেই গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে যায়; তাদের ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধে।

এই মুহূর্তে পাক্কী থেকে নিস্তব্ধ ফাঁকা গাঁয়ের ভেতর ঢুকে পড়ল গৈরুনাথরা।

গাঁয়ে ঢোকার মুখে প্রথমেই দোসাদটুলি। ঝমরু দোসাদের বুড়ি মা ঘরের দাওয়ায় বসে ছানিপড়া ঘোলাটে চোখে ভাঙা সিলভারের থালায় পুরনো গেঁহু বাছছিল। আবছাভাবে গৈরুনাথদের দেখে ভুরুর ওপর হাত রেখে শুধোয়, 'কৌন রে?'

গৈরুনাথ বলে, 'আমরা।'

পরিষ্কার দেখতে না পেলেও বুড়ির কানদুটো ভারি সজাগ আর প্রখর। গলা শুনেই মানুষ চিনতে পারে। সে শুধোয়, 'গৈরু?'

'হাঁ মৌসি।'

'দুখন লৌটা ভাগলপুরসে?'

'লৌটা।'

'আচ্ছা হ্যায়?'

'হাঁ।'

'ঠিক হ্যায়। ঘর যা, পরে দুখনকে একবার আমার কাছে নিয়ে আসিস।'

ফেকুনাথের ম্যাট্রিক পাশ করা এবং আজ তার ফিরে আসার খবর দু'দিন আগেই মনচনিয়া গাঁয়ের ঘরে ঘরে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে গৈরুনাথ। তাই বুড়ি ফেকুনাথের কথা জানতে চাইল।

ঝমরু দোসাদের ঘর পেছনে ফেলে ছেলেকে নিয়ে গৈরু এগিয়ে যায়। পথে দোসাদটুলি, ধাঙড়টুলি এবং গাঙ্গোতাটুলির বুড়োবুড়িরাও ফেকুনাথ সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। এর মধ্যে একদল আধনাঙ্গা ছেলেমেয়ে গৈরুদের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করেছে।

একসময় গাঁয়ের শেষ মাথায় চামার পাড়ায় পৌঁছে যায় দু'জনে।

চামারটুলির অনেকখানি ভেতরে গৈরুনাথদের ঘর। বাড়ি ছেড়ে গৈরুর জেনানা লখিয়া এবং তিন ছেলেমেয়ে—বিষুণ, ফুলেরি এবং কৌয়া চামারটুলির মুখে কাচ্চীর ধারে এসে এখন দাঁড়িয়ে আছে। গৈরুর এই ছেলেমেয়ে তিনটে ফেকুনাথের চাইতে বয়সে ছোট।

সকাল সকাল, রোদের তাত বাড়বার আগেই গৈরুদের চলে আসার কথা ছিল। কিন্তু সূরয এখন মাথার ওপর চড়ে গেছে। এত দেরির কারণ বুঝতে না পেরে লখিয়ারা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। তাদের চোখেমুখে এই মুহূর্তে রীতিমতো দুশ্চিন্তার ছাপ।

একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, লখিয়ার চুল রুক্ষ, চোখ লালচে, মুখ টসটস করছে। টের পাওয়া যায়, তার শরীর ভাল নেই। ক'দিন ধরেই জ্বর হচ্ছে।

গৈরুদের দেখে লখিয়ারা দৌড়ে আসে। বলে, 'কা হুয়া, এত্তে দের? টিরেন (ট্রেন) সুবে সুবে নেহী আয়ী?'

গৈরুনাথ বলে, 'আয়ী।'

'তব্?'

দেরি হবার কারণটা সংক্ষেপে জানিয়ে দেয় গৈরুনাথ।

শুনে একেবারে হাঁ হয়ে যায় লখিয়া। বলে, 'বড়ে সরকার দুখনকো লাড্ডু বুন্দিয়া নিমকীন খিলায়া?'

গৈরুনাথ সগর্বে বলে, 'খিলায়া তো। হামনিকো ভি।'

'হাঁ!' লখিয়া অবাক হয়ে যায়।

'হাঁ। হামারা দুখন কেত্তে বড়া লিখিপড়ি সবগনা (মান্যগণ্য) আদমী বন গিয়া।' গৈরুনাথ বলতে থাকে, 'খাতিরদারি না করে যাবে কোথায় মালিক?'

'লড়কার জন্যে তোমার ইজ্জৎ তা হলে অনেক বেড়ে গেছে, না কি বল?'

'জরুর। তোরও বেড়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বকব বকব না করে এবার ঘরে যাবি তো?'

'হাঁ হাঁ—' লখিয়া ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ছেলের একটা হাত ধরে বলে, 'আ দুখনিয়া, আ—'

সবাই চামার পাড়ায় ঢুকে বরাবর উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। ছোট ভাইবোনগুলোর অবাক চোখ ফেকুনাথের ওপর থেকে অন্য দিকে সরে না। ওরা বুঝতে পারছিল, ওদের বড় ভেইয়া ভাগলপুর টৌন থেকে বিরাট কিছু একটা হয়ে এসেছে। বিস্ময়টা সেই কারণে।

হাঁটতে হাঁটতে মা-বাপের সঙ্গে সমানে কথা বলে যায় ফেকুনাথ। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে বার বার ভাইবোনগুলোর দিকে তাকায় সে। বলে, 'কী দেখছিস?'

বিষুণরা লাজুক হাসে। কিছু বলে না।

ফেকুনাথের চোখ হঠাৎ লখিয়ার মুখের ওপর আটকে যায়। সে জিজ্ঞেস করে, 'মা, তোর কি বুখার হয়েছে?'

লখিয়া বলে, 'ও কিছু না।'

গৈরুনাথ বলে, 'ক'দিন ধরে জ্বর তোর মায়ের। লেকেন এখন ধান কাটাই চলছে। তাই—'

ফেকুনাথ জানে, ধানকাটার মরসুমে গৈরুনাথদের এক মুহূর্ত ফুরসৎ থাকে না। বড়ে সরকার রামধারী মিশ্র এ সময়টা তাদের কোথাও যেতে দেবেন না। বাঁচুক মরুক, উদয়াস্ত ফসল কেটে মালিকের খলিহানে তাদের তুলে দিতেই হবে। বুখারের জন্য হাসপাতালে যাবার মতো শৌখিনতা করার সময় এটা নয়। তবে আজ যে কাজ কামাই করে ফেকুনাথকে স্টেশনে আনতে গিয়েছিল গৈরু, সেটা নিতান্তই রামধারী মিশ্রর দুর্লভ মহানুভবতা।

হঠাৎ রেগে যায় ফেকুনাথ। বলে, 'আমাকে আনতে না গিয়ে মাকে নিয়ে হাসপাতালে গেলে তো পারতে।'

আজন্মের ভীরু গৈরুনাথ ছেলের ধমকে ভীষণ ঘাবড়ে যায়। তার মুখে তৎক্ষণাৎ উত্তর যোগায় না।

লখিয়াই শেষ পর্যন্ত স্বামীকে বাঁচিয়ে দেয়। বলে, 'গুস্‌সা করিস না দুখনিয়া। মালিকের ধান উঠে যাক, তখন অসপাতালে গিয়ে 'দাওয়া' নিয়ে আসব।'

বিরক্ত মুখে ফেকুনাথ বলে, 'ততদিন যদি বেঁচে থাকিস!'

লখিয়া এবার আর কিছু বলে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে চামারটুলির প্রায় শেষ মাথায় তাদের ঘরে পৌঁছে যায় ফেকুনাথরা। ঘর আর কী, টিনের টুটোফুটো চাল, হাতখানেক করে পুরু মাটির দেওয়াল, সামনের দিকে বারান্দা, ঘুণে-ধরা নড়বড়ে খুঁটির ওপর বারান্দার ছাউনি। নিচে অনেকটা জায়গা জুড়ে উঠোন। উঠোনের একধারে এই অঘ্রন মাসে থোকা থোকা সফেদিয়া আর মনরঙ্গোলি ফুল ফুটে আছে।

গৈরুনাথ কতবার ভেবেছে, ঘরের চাল পালটে নতুন টিন দিয়ে ছাইবে। কিন্তু মাসের পর মাস যায়, বছরের পর বছর, ইচ্ছাটা তার আর পূরণ হয় না। পয়সা কোথায়?

বছরের অন্য সময় তবু একরকম কেটে যায়। কিন্তু শীতে আর বর্ষায় গৈরুনাথদের বড় কষ্ট। সে কষ্টের আর শেষ নেই। বর্ষায় হুড় হুড় করে ফুটো চাল দিয়ে জল পড়ে, শীতে নামে অসহ্য হিম।

গৈরুনাথদের এই ঘরদুটো মনচনিয়া গাঁয়ের শেষ প্রান্ত। তারপর পাথর মেশানো খানিকটা পড়তি জমি। জমিটার পর থেকে নানারকম ঝোপঝাড়, আগাছার জঙ্গল। একটা মজা নহরও সেখানে দেখা যায়। বর্ষার দুটো মাস সেখানে হাঁটুভর জল থাকে; অন্য সময় জল শুকিয়ে সেটা শুখা মাঠ হয়ে যায়। অনবরত সেখান থেকে ধুলো উড়তে থাকে।

উঠোন পেরিয়ে ফেকুনাথ সটান বারান্দায় উঠে বসে পড়ে। দেখাদেখি গৈরু এবং অন্য ছেলেমেয়ে তিনটে ওপরে এসে তাকে ঘিরে বসে। লখিয়ার অবশ্য বসার সময় নেই। এখন তার অনেক কাজ। এতটা বেলা হয়েছে, কারুর পেটে দানা পড়ে নি; সবার খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। রান্নাটা অবশ্য আগেভাগেই চুকিয়ে রেখেছে। লখিয়া সোজা ডান দিকের ঘরটায় ঢুকে যায়। মনচনিয়া গাঁয়ের যে বাচ্চাগুলো পিছু পিছু আসছিল তারা কিন্তু চলে যায় নি; উঠোনে অনড় দাঁড়িয়ে থাকে।

ছোট ভাইবোন তিনটের মুখচোখ দেখে ফেকুনাথ বুঝতে পারছিল, ভাগলপুর থেকে সে কী এনেছে তা দেখার জন্য ওরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। ফি বারই বাড়ি ফেরার সময় ওদের জন্য কিছু না কিছু সে নিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি টিনের স্যুটকেশটা খুলে রবারের বল, প্ল্যাস্টিকের পুতুল আর খেলনা টেলনা বার করে ফেকুনাথ ভাইবোনগুলোর হাতে দেয়। খুশিতে সবার মুখ আলো হয়ে ওঠে।

এবার স্যুটকেশ থেকে বড় বড় গোটা তিনেক কাগজের বাক্স বার করে ফেকুনাথ ডাকে, ' মা, মা—'

লখিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই তার হাতে বাক্স তিনটে তুলে দেয় ফেকুনাথ। বলে, 'শুখা বুন্দিয়া (শুকনো বোঁদে), পেঁড়া, ডালমুট আর পাঁপর আছে। কৌয়াদের দে—'

ছোট ছেলেমেয়ে তিনটের হাতে শুকনো বোঁদে দু-চার দানা করে দিয়ে যখন কাগজের বাক্সটা লখিয়া বন্ধ করছে সেই সময় গৈরুনাথ ডাকে, 'এ দুখনকা মাঈ—'

'কা?' লখিয়া স্বামীর দিকে তাকায়।

উঠোনে মনচনিয়া গাঁয়ের বাচ্চাগুলোকে দেখিয়ে গৈরুনাথ বলে, 'ওদেরও দে।'

লখিয়া লক্ষ করে বাচ্চাগুলোর চোখ লোভে চকচক করছে। অন্য সময় হলে গৈরুনাথের এ জাতীয় বড়মানুষী প্রস্তাব সে কানেই তুলত না; বরং এ নিয়ে তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিত। মনচনিয়া গাঁয়ের বাচ্চাদের দামি দুর্লভ শুখা বুন্দিয়া বিলোবার মতো মহত্ত্ব তার নেই। কিন্তু ফেকুনাথ এত বড় একটা কাণ্ড করে এসেছে। আজকের দিনটা অন্য দশটা দিন থেকে একেবারেই আলাদা। পরম উদারতায় বাচ্চাগুলোকে কাছে ডেকে হাতে হাতে বুন্দিয়া দেয় সে। বলে, 'লে, মুহ্ মিঠা (মুখ মিষ্টি) কর।'

এ বাড়িতে এসে আজ উৎকৃষ্ট মিঠাইয়ের ভাগ মিলবে, মনচনিয়া গাঁয়ের বাচ্চাগুলো ভাবতেই পারে নি। বুন্দিয়া পাওয়া মাত্র তারা আর দাঁড়ায় না, খুশিতে উত্তেজনায় এবং বিস্ময়ে হই চই করতে করতে চলে যায়।

লখিয়া গৈরুনাথকে বলে, 'তুমি আর বসে থেকো না। দুফারের খাওয়া চুকিয়ে খেতিতে যেতে হবে. মনে আছে তো?'

'হাঁ হাঁ—' ভীষণ ব্যস্তভাবে উঠে পড়ে গৈরুনাথ।

গৈরুনাথদের ঘরের সামনে দিয়ে যে এবড়ো খেবড়ো কাঁচা রাস্তাটা গেছে সেটার ঠিক ওপারেই মনচনিয়া গাঁয়ের চারটে কুয়োর একটা। গৈরুনাথ আর ফেকুনাথ ওখান থেকে নাহানা সেরে এসে খেতে বসে। কৌয়া, বিযুণ এবং ফুলেরিও বসে যায়। লখিয়া সামনে বসে সবার পাতে পাতে মাংস ভাত ডাল সবজি তুলে দিতে থাকে।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো কথা হয়। হঠাৎ লখিয়া ফেকুনাথকে বলে, 'দো-চার রোজের ভেতর ধারাউলিতে খবর পাঠাব কিন্তু।'

মুখ তুলে ফেকুনাথ শুধোয়, 'কিসের খবর?'

লখিয়া হাসে। বলে, 'তোর শাদির খবর। ধারাউলিতে রামিয়ারা থাকে না?'

আগে খেয়াল করে নি ফেকুনাথ। এবার মনে পড়ে যায়, রামিয়ার সঙ্গে তার 'শাদিকা বাত' অনেক দিন ধরে একরকম পাকাই হয়ে আছে। কয়েক সাল আগেই বিয়েটা হয়ে যেত, নেহাত তার ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য ঠেকে ছিল। নইলে তাদের জাতে তার বয়সী কোনো ছেলেই কুঁয়ার (অবিবাহিত) পড়ে থাকে না।

রামিয়ার বাপ বুধিলাল ধারাউলি গাঁয়ের চামারটুলির মুরুব্বি; ওখানকার 'পঞ্চ' বা পঞ্চায়েতের মাথাই বলা যায় তাকে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। নইলে চারপাশের দশ বিশটা গাঁয়ের আর সব চামারের মতোই সে গরিবের চাইতেও গরিব। এক ধুরও (এক কাঠার কুড়ি ভাগের এক ভাগ) চাষের জমি নেই তার। ওই অঞ্চলের সব চাইতে বড় জমিমালিক শিউশঙ্কর ঝা'র চাষের জমিতে 'গতর চূবণ' খাটুনি খেটে পেটের দানা জোটাতে হয় তাকে। একার কামাইতে সংসার চলে না। তাই লখিয়ার মতো তার জেনানাকে চাষের বা ফসল কাটার মরসুমে ধান বা গমের খেতে নামতে হয়।

এই বাপের মেয়ে রামিয়াকে দেখে বোঝাই যাবে না যে সে চামারের ঘরে জন্মেছে। বামহন, কায়াথ বা রাজপুত ক্ষত্রিয়দের ঘরেও এমন মেয়ে লাখে একটা মিলবে না। গোরা রং, পাতলা ঠোঁট, ছোট কপাল, কোমর ছাপানো চুল। তার চালচলন, কথাবার্তা, রাহান সাহান—সব কিছুই বড় ঘরের মেয়েদের মতো। এই মেয়েকে নিয়ে বুধিলালের খুবই গর্ব।

সমাজ কল্যাণ দপ্তরের স্কুলে রামিয়াকে চার ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়েছে বুধিলাল। চামারদের ঘরে এমন 'পড়িলিখি লেড়কী' এ অঞ্চলে আর একটাও নেই। বয়সও তার পনের ষোল। এত বয়স পর্যন্ত অচ্ছুতের ঘরে কোনো মেয়েই কুমারী থাকে না। রামিয়া যে আছে তার একমাত্র কারণ ফেকুনাথ।

আশেপাশের চামাররা তো বটেই, পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরের গাঁ থেকেও অনেকে এসে বুধিলালকে ধবাধরি করেছে—রামিয়াকে তারা পুতহু (পুত্রবধূ) করে নিয়ে যেতে চায়। এ বাবদে পাঁচশ ছশ টাকা পণ দিতেও তারা রাজি। খুব 'সৌভাগ' না হলে রামিয়ার মতো পুতহু পাওয়া যায় না। কিন্তু বুধিলালের উঁচা নজর। তার বিবেচনায় ফেকুনাথের মতো যোগ্য পাত্র চারদিকের বিশ পঞ্চাশটা গাঁয়ের চামারদের ঘরে একটাও নেই। অথচ গৈরুনাথ তিনশর বেশি এক পয়সাও পণ দিতে পারবে না। বুধিলাল তাতেই রাজি। ফেকুনাথের মতো দামাদের জন্য নগদ দুশ টাকা ক্ষতি তার কাছে কিছুই না। দিনের পর দিন ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্টের জন্য সে অপেক্ষা করে আছে।

লখিয়ার কথায় জবাব দেয় না ফেকুনাথ। মুখ নামিয়ে চুপচাপ খেয়ে যেতে থাকে।

লখিয়া হেসে হেসে বলে, 'আর শরমাতে (লজ্জা করতে) হবে না। ঘরে পুতহু আমার চাই-ই।'

'লেকেন—'

'লেকেন উকেন কুছ নেহী। চার সাল ধরে বাত পাক্কী হয়ে আছে। আমি তোর কোনো কথা শুনব

না।'

ফেকুনাথ উত্তর দেয় না। মায়ের বহুকালের ইচ্ছা তার শাদি ঘিরে একটা আনন্দ-উৎসব হোক। লখিয়ার শাদির পর এ বাড়িতে আর কোনো বড় রকমের উৎসব হয় নি। সে শাদিও কি আজ হয়েছে? তেইশ চব্বিশ বছর আগের সেই ঘটনা এখন স্পষ্ট মনেও পড়ে না; সবটাই প্রায় ঝাপসা হয়ে গেছে। মায়ের একান্ত আন্তরিক ইচ্ছাটাব কথা জানে ফেকুনাথ।

লখিয়া সমানে বলে যায়, 'ধানকাটাই হয়ে গেলে এক রোজও আর দেরি করব না; জরুর শাদি দিয়ে দেব।' বলতে বলতে ছেলের দিকে তাকিয়ে কী ভেবে ফের শুরু করে, 'কা রে, মুখ বুজে আছিস যে? আমি যে বকে যাচ্ছি, কিছু বল—'

বিয়েটা অনেকদিন ধরে যে স্থগিত হয়ে আছে এবং এজন্য মায়ের মনে যে শান্তি নেই, এটা ভাল করেই জানে ফেকুনাথ। লখিয়া এতদিন শাদির ব্যাপারে চাপ দেয় নি তাব একমাত্র কারণ তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। তা ছাড়া যেটা সব চাইতে বড় ব্যাপার তা হল, রামিয়াকে ফেকুনাথের খুবই পছন্দ। ছুটিতে ভাগলপুর থেকে এসে লুকিয়ে চুরিয়ে চার বছরে কতবার যে সে ধারাউলিতে গেছে তার হিসেব নেই। তবু সে বলে, 'শাদি তো দিতে চাস—'

লখিয়া উৎসাহিত হয়ে ওঠে। বলে, 'জরুর দিতে চাই।'

'লেকেন তোর পুতহুকে তো খাওয়াতে হবে, না উপোস করিয়ে রাখবি? আগে পয়সা কামাবার একটা ব্যাওস্থা করি।'

'এত্তে বড়ে লিখিপড়ি আদমী হয়ে এলি। কামাই ঠিকই করতে পারবি।'

ফেকুনাথ জানে, তার ওপর মা-বাবার অগাধ ভরসা। তাদের বহুকালের সাধ, রামিয়াকে ঘরে আনে। এখন এ নিয়ে লখিয়ার কথার ওপর আর কিছু বলতে গেলে সে ভীষণ রেগে যাবে। অগত্যা ফেকুনাথকে চুপ করে থাকতে হয়।

লখিয়া এবার গৈরুনাথকে বলে, 'ধারাউলি থেকে আমাদের এখানে ভৈসা গাড়ি আসে না?'

গৈরুনাথ মাথা নাড়ে, 'হাঁ, দো-চারগো করে রোজই আসে।'

'গাড়িওলাদের বলে দিও, ওরা যেন রামিয়ার বাপের সঙ্গে দেখা করে তাকে এখানে আসতে বলে।'

'ঠিক হ্যায়।' বলেই হঠাৎ কী মনে পড়ে যায় গৈরুনাথের। সে ফের বলে, 'লেকেন বুধিলাল আসবে কী করে?'

'না আসার কী হল?'

'ধারাউলিতে এখন ধানকাটাই চলছে না? খেতিমালিক কি তাকে আসতে দেবে?'

'বহোত মুসিবত!' লখিয়ার উৎসাহ নিভে যায়। তাকে খুবই বিষণ্ণ দেখায়। কিন্তু পরক্ষণেই কিছু চিন্তা করে সে যা জানায় তা এইরকম। সারাদিন ধান কেটে সন্ধের পর যেন বুধিলাল আসে। মোটে তো সাত 'মিল' রাস্তা। রাতটা এখানে কাটিয়ে আন্ধেরা থাকতে থাকতে রওনা হলে পরের দিন সকালে ধারাউলি পৌঁছে জমিতে নামতে পারবে। এতে জমি মালিকের কাজের কোনো ক্ষতি হবে না। বুধিলালের সঙ্গে শাদির কথাবার্তা বলে দিনক্ষণ পাকা করেও নেওয়া যাবে।

লখিয়ার মাথাটা সব বিষয়েই সাফ। চিরকালই দেখা গেছে, যে কোনো সমস্যা দেখা দিক, সে একটা রাস্তা বার করে ফেলবেই। মনে মনে লখিয়ার বুদ্ধির তারিফ করে গৈরুনাথ বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

সবার খাওয়া হলে গোগ্রাসে খেয়ে নেয় লখিয়া। উঠোনের কোণে এঁটো বর্তনগুলো ডাঁই করে রেখে ফেকুনাথকে বলে, 'রাত জেগে এসেছিস, এখন ঘুমিয়ে নে। আমরা জমিনের কামটা চুকিয়ে আসি।'

একার কামাইয়ে এতগুলো মানুষেব পেট চলে না। তাই বার মাস গৈরুনাথের সঙ্গে লখিয়াকেও রামধারী মিশ্রর খামারে বা জমিতে খাটতে হয়। শুধু তারাই না, এ অঞ্চলের তাবত মরদ-আওরত এভাবেই পেটের দানা যোগাড় করে থাকে।

ফেকুনাথ রেগে যায়। বলে, 'তোর না বুখাব! তাই নিয়ে কাজে যাবি! যেতে হবে না।'

গৈরুনাথ ভয়ে ভয়ে বলে, 'না গেলে চলবে না। মালিক গুস্‌সা হবে।' জমির কাজ বা রামধারী মিশ্রর কথা উঠলেই সে সিঁটিয়ে যায়। রক্তের স্রোতে প্রবাহিত আজন্মের সেই ভীরুতা থেকে তার মুক্তি নেই।

লখিয়া ছেলেকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। বলে, 'এর চাইতে ভারি বুখার নিয়ে কেত্তে রোজ খেতিতে গেছি। কুছ নায় হোগা। চিন্তা করিস না দুখনিয়া।'

ফেকুনাথ শান্ত হয় না। ভয়ানক খেপে গিয়ে বলে, 'মালিককে পুছিস, তুই মরে গেলে ধান কেটে তার খলিহান বোঝাই করবে কে?'

বিষণ্ণ হেসে গৈরুনাথকে সঙ্গে করে চলে যায় লখিয়া।

পেছন থেকে ফেকুনাথ চেঁচিয়ে বলে, 'কাম হলেই চলে আসিস। দের নায় করনা।'

'হাঁ হাঁ, আন্ধেরা নামার আগেই ফিরে আসব।'

মেটে বারান্দায় বসে ফেকুনাথ দেখতে পায়, চামারটুলি পেরিয়ে দোসাদটুলির উঁচু উঁচু সিমার গাছগুলোর আড়ালে দু'জনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

খাওয়া দাওয়ার পরই কৌয়া এবং ফুলেরি বারান্দাব এক কোণে একটা বিছানা পেতে দিয়ে গিয়েছিল। আরো কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ধুসো কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে ফেকুনাথ।

বাড়ির পেছনে মজা নহরের দিক থেকে শালিক পাখির কিচির মিচির আর সিল্লিদের অবিশ্রান্ত ডানা ঝাপটানোর শব্দ ভেসে আসতে থাকে। সেই সঙ্গে ঝিঁঝিদের একটানা বিলাপ। এইসব শব্দ শুনতে শুনতে একসময় চোখ জুড়ে আসে ফেকুনাথের।

চার

ফেকুনাথের যখন ঘুম ভাঙে, অঘ্রাণ মাসের বেলা মরে এসেছে। রোদের ধার আর নেই। পশ্চিম আকাশের নিচের দিকে নিস্তেজ সূর্যটা কোনো রকমে আটকে আছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটা দিগন্তের তলায় ডুবে যাবে।

বাতাস দ্রুত ঠাণ্ডা হতে থাকে। রোদ থাকতে থাকতেই কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। পঞ্চাশ হাত দূরেব সিমার বা পরাস গাছগুলো ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মাটির লক্ষকোটি ছিদ্র দিয়ে উঠে আসছে অঘ্রাণের দুরন্ত হিম।

বাতাস চিরে চিরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এখন ফিরে চলেছে। নহরের দিকের ঝোপঝাড়ে ঝিঁঝিদের চিৎকার আরো তিনগুণ বেড়ে গেছে। টের পাওয়া যায় একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে, নামবে হিমবর্ষী আকাশের নিচে শীতের গাঢ় অন্ধকার।

কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসে ফেকুনাথ। কৌয়াদের আশেপাশে কোথাও দেখা যায় না। ফেকুনাথের চোখ বুজে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা উধাও হয়ে গিয়েছিল।

গোটা মনচনিয়া গাঁ এখনও আশ্চর্য নিঝুম। বোঝা যায়, দিনেব কাজ চুকিয়ে শক্তসমর্থ পুরুষ এবং আওরতেরা এখনও ফিরে আসেনি।

নিস্তব্ধ গাঁয়ের শেষ মাথায় মাটির দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে হাজার রকমের ভাবনা ফেকুনাথের মাথায় ভিড় করে আসে। লেখাপড়ার পালা শেষ। এখন মা-বাপ-ভাই-বোনদের দায়িত্ব নিতে হবে তাকে। গৈরুনাথ আর দু-চার বছর খেতির কাজ করলেও লখিয়াকে কিছুতেই রোজগারের জন্য বাইরে বেরুতে দেওয়া যায় না। বেজায় কমজোরি হয়ে গেছে মা, এভাবে খাটলে বেশিদিন সে বাঁচবে না। তা ছাড়া বহুকালেব পুরনো এই ঘর দুটোর যা হাল দাঁড়িয়েছে তাতে এর ভেতর বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এখনই এ দুটো ভেঙে নতুন করে ঘর তোলা দরকার।

তাজ্জবের কথা, এত সব জরুরি ভাবনা ছাপিয়ে বার বার ঘুরে ঘুরে রামিয়ার মুখ ফেকুনাথের মাথায় হানা দেয়। সে ভাবে, দু-একদিনের মধ্যে একবার ধারাউলিতে যাবে। সোজাসুজি রামিয়াদের

কোঠিতে তো আর উঠতে পারবে না। যার সঙ্গে শাদির কথা চলছে, আগেভাগে খবর না দিয়ে আচমকা তাদের ঘরে যাওয়া যায় না। বস্তুত শরমকা বাত। তবে ধারাউলিতে জানাশোনা দু-চারজন আছে; তাদের কাউকে দিয়ে রামিয়াকে কোথাও ডাকিয়ে নিয়ে দেখা করবে। আগেও এভাবে বার কয়েক দেখা করেছে ফেকুনাথ।

হঠাৎ দূর থেকে মানুষজনের গলা ভেসে আসতে থাকে। চমকে মুখ তুলে সামনের দিকে তাকায় ফেকুনাথ। তাদের এই বারান্দা থেকে দূরের পাকা সড়ক এবং সড়কের ওধারের দিগন্ত-জোড়া ফসলের মাঠ চোখে পড়ে। ধানখেতে সারাদিন কাজ সেরে মনচনিয়া গাঁয়ের অচ্ছুতেরা এখন পাক্কী ধরে ফিরে আসছে।

জন্মের পর থেকে এই দৃশ্য অজস্র বার দেখেছে ফেকুনাথ। আগে ভাল করে ভেবে দেখে নি, আজই যেন সে প্রথম লক্ষ করল, এ গাঁয়ের চামার দোসাদ ধাঙড়—সব জাতের অচ্ছুতেরা তাদের আবহমান কালের বংশগত কাজকর্ম ছেড়ে রামধারী মিশ্রর জমিতে উদয়াস্ত খেটে যায়। মনচনিয়ার চামারেরা আজকাল জুতো সেলাই করে না, ধাঙড়েরা ময়লা সাফাইতে হাত দেয় না। সবাই কৌলিক জীবিকা বাদ দিয়ে ভূমিহীন কিষান হয়ে গেছে। অবশ্য এদের মধ্যে কেউ কেউ খেতমজুরের কাজ করে না। সরকারি ঠিকাদারদের কাছে নাম লিখিয়ে রাস্তায় মাটি কাটে, ভৈসা কি বয়েল গাড়ি চালায়, হাটে বাজারে মাল বয় বা এ জাতীয় বহু রকম উঞ্ছবৃত্তি করে পেট চালায়।

অথচ এ গাঁয়ের সবারই কিছু না কিছু জমিজমা ছিল। ফেকুনাথ জানে, দু'চারজন বাদে প্রায় সকলের জমিই 'করজে'র দায়ে রামধারী মিশ্রর পেটে ঢুকে গেছে।

একসময় দেখা যায়, গৈরুনাথ এবং লখিয়া বাড়ির উঠোনে এসে ঢুকছে। তারাই শুধু না, তাদের পেছন পেছন গোটা মনচনিয়া গাঁ-টাই যেন এখানে ভেঙে পড়ে। মাঠের কাজ চুকিয়ে সবাই প্রথমে এখানে চলে এসেছে। যে ফেকুনাথ এই গাঁয়ের অচ্ছুৎদের মর্যাদা এবং সম্মান বাড়িয়েছে তাকে একবার না দেখে কেউ নিজের নিজের ঘরে ফিরতে পারছে না।

লখিয়া এবং গৈরুনাথ ছোটাছুটি করে অতিথিদের আপ্যায়ন করে। অবশ্য ভাগলপুর থেকে আনা শুখা বুন্দিয়া এবং প্যাঁড়া, পাঁপড় টাপড় ঘরে লুকনোই থাকে। এত লোককে 'মুহ্ মিঠা' করাতে হলে তাদের ভাগে কিছুই থাকবে না। চুন-তামাক ডলে খৈনি বানিয়ে পরম সমাদরে সবার হাতে হাতে দেয় গৈরুনাথ। এই সামান্য উপকরণেই মনচনিয়া গাঁয়ের বাসিন্দারা আন্তরিক খুশি হয়ে যায়।

'পঞ্চ'-এর যে মাথা, সেই গাঙ্গোতাপাড়ার বুড়ো সুখদেও বলে, 'গৈরু, তোর লেড়কা এত্তে বড়ে একটা কাজ করে এল। আমাদের আত্‌মার (আত্মার) বহোত শান্তি।'

গৈরুনাথ অসীম বিনয়ে জানায়, গাঁয়ের প্রতিটি মানুষের আশীর্বাদে এবং স্বয়ং রামজি বিষ্ণুজির কিরপায় তাদের মতো গরীবের ঘরে এই অসম্ভবটা সম্ভব হয়েছে।

সুখদেও এবার ফেকুনাথের কাছে এসে বলে, 'তোর জন্যে আমাদের 'আত্‌মা' খুশ হয়ে গেছে।' তার প্রায় প্রতি কথায় একবার করে 'আত্‌মা' এসে যায়।

অন্য সবাই জনে জনে কাছে এসে ফেকুনাথকে তাদের আনন্দের কথা জানায়। একজন বলে, তার জন্য মনচনিয়া গাঁয়ের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ফেকুনাথের ভালই লাগে। তারই জন্য এত ভিড়, এতগুলো মানুষের এত গৌরববোধ—এ সবের মধ্যে এক ধরনের তীব্র নেশা আছে।

সবার সঙ্গেই দু-একটা করে কথা বলতে হয় ফেকুনাথকে। কতকাল ধরে এদের দেখে আসছে সে। তবু এই মুহূর্তে মনে হয়, মনচনিয়া গাঁয়ের মানুষগুলো বড় ভাল।

খানিকক্ষণ আগে সন্ধ্যা নেমেছে।

ফেকুনাথকে যারা দেখতে এসেছিল তারা এখন আর কেউ নেই, যে যার ঘরে চলে গেছে।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে আরো ঘন হয়ে হিম পড়ছে। বিহারের এই অঞ্চল এখন অন্ধকার এবং কুয়াশায় ঝাপসা। উত্তুরে হাওয়ার দাপট দশগুণ বেড়ে গেছে। আকাশের দিকে তাকালে চাঁদ বা তারা

চোখে পড়ে না। সেখানে স্তরে স্তরে গাঢ় কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই নেই।

অঘ্রাণ মাসের এই অসহ্য হিমে বাইরে বসে থাকা যায় না। ফেকুনাথরা ঘরে ঢুকে গেছে। কৌয়া, ফুলেরি এবং বিষুণ সারা বিকেল মনচনিয়া গাঁ চষে একটু আগে ফিরে এসেছে।

এখন ঘরের একধারে কালিপড়া লণ্ঠন জ্বলছে। সেটা থেকে যত আলো পাওয়া যায় তার দ্বিগুণ মেলে ধোঁয়া। আরেক কোণে দিনরাত ছেঁড়া চটের ওপর কাঁথাকানি দিয়ে বিছানা পাতা থাকে। গায়ে কম্বল জড়িয়ে সেটার ওপর বসে আছে ফেকুনাথের ভাইবোনেরা। খানিক দূরে একটা ময়লা কাঁথা গায়ে দিয়ে হি হি করে কেঁপে চলেছে গৈরুনাথ। শীতে সে বেজায় কাবু হয়ে পড়ে। আর যেখানে লণ্ঠনটা জ্বলছে তার গা ঘেঁসে গুটিসুটি মেরে বসে আছে লখিয়া।

অঘুন মাসের মারাত্মক হিম থেকে বাঁচবার জন্য টিনের চালের বড় বড় ফুটোগুলোতে কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছোট ছোট ছিদ্রগুলো দিয়ে ধোঁয়ার আকারে অজস্র হিম ঢুকছে। ঠাণ্ডা এবং মশা ঠেকাতে ঘরের চার কোণায় মাটির কটোরায় তুষ জ্বালিয়ে রেখেছে লখিয়া। তাতে কাজ হয়েছে সামান্যই।

রাত এমন কিছু হয় নি। আরো কিছুক্ষণ পর কাচ্চীর ওধারের সিমার গাছগুলোর কোটরে যখন রাতজাগা কামার পাখিরা ঘুম থেকে উঠে কর্কশ গলায় ডাকতে শুরু করবে সেই সময় চূলহা ধরাবে লখিয়া। ও বেলার সবজি ডাল মাংস পুদিনার চাটনি—সবই আছে। শুধু গরম গরম মাড়ভাত্তা করে নিলেই চলবে।

লণ্ঠনের পাশ থেকে প্রচণ্ড উৎসাহের গলায় লখিয়া হঠাৎ বলে ওঠে, 'একটা বঢ়িয়া খবর আছে দুখনিয়া।'

ফেকুনাথ কিছুক্ষণ ধরেই মাকে লক্ষ করছিল। তার মুখ টসটস করছে, চোখ দুটো দুপুরের চাইতেও লাল হয়ে উঠেছে। দেখেই বোঝা যায়, জ্বরটা বেড়ে গেছে। সে শুধোয়, 'কা খবর?'

উত্তর না দিয়ে লখিয়া গৈরুনাথের দিকে তাকায়, 'তুমি বল দুখনিয়াকে।'

একটু কেশে গলা সাফ করে নেয় গৈরুনাথ। তারপর যা বলে তা এইরকম। রামজি এবং কিষুণজির কিরপায় আজই খেতির কাজ সেরে ফেরার সময় ধারাউলি গাঁয়ে চেনাজানা এক ভৈসোয়ারের (মোষের গাড়ির গাড়োয়ান) সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাকে দিয়ে রামিয়ার বাপ বুধিলালের কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে গৈরু। ফেকুনাথ পাশ করে ভাগলপুর থেকে ফিরে এসেছে। বুধিলাল যেন দো-চার রোজের ভেতর একবার মনচনিয়ায় এসে অবশ্যই দেখা করে যায়।

যদিও বিকেলে ফাঁকা বারান্দায় বসে রামিয়ার কথা ভেবেছে ফেকুনাথ, তবু এই মুহূর্তে জ্বরের তাপে ঝলসানো মায়ের চোখমুখ দেখতে দেখতে আচমকা খেপে যায় সে। বলে, 'আমার শাদির জন্যে তোদের মাথা খারাপ করতে হবে না। শাদির আগে অনেক জরুরি কাজ আছে।'

লখিয়া শুধায়, 'কী কাজ?'

'আয়নায় মুখটা একবার দ্যাখ—বুখারে কী হাল করেছিস নিজের! কাল সুবে আমার সঙ্গে হাসপাতাল যাবি।'

'লেকেন—'

ফেকুনাথ ধমক লাগায়, 'লেকেন উকেন শুনতে চাই না। তুই কাল থেকে জমিনে যাবি না। আগে বুখার সারবে, তারপর কামকাজ—'

সংসারের হাল যে খুবই খারাপ এবং সেই কারণে লখিয়ার যে পয়সা কামাই করা দরকার—এ জাতীয় কিছু বলতে যাচ্ছিল গৈরুনাথ। কিন্তু ফেকুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে তার গলায় স্বর ফোটে না। সেই আজন্মের ভীরুতা।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর ফেকুনাথ বলে, 'আমার শাদির জন্যে তো নেচে উঠেছিস।' ঘরের চালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে শুধোয়, 'সব টুটাফুটা। বারিষে আর জাড়ে এ ঘরে থাকা যায়!'

লখিয়ার হয়ে ভয়ে ভয়ে গৈরুনাথ জবাব দেয়, 'কা করে! চালের টিন বদলাব কী করে?'

'কেন, অসুবিধা কী?'

'রুপাইয়া পাইসা কঁহা মিলেগা!'

লখিয়াও স্বামীর কথায় সায় দেয়। ঘরের চাল নতুন করে ছাইতে কম পয়সার তো দরকার নয়। তাদের মতো গরিবেরা অত পয়সা জোটাবে কোত্থেকে? ঘরে তো আর সোনা-চাঁদির পাহাড় নেই। বাপ-নানা তাদের জন্য কিছুই জমিয়ে রেখে যায় নি।

লখিয়ার কথাগুলো ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা সত্যি। পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিক দারিদ্র্যের উত্তরাধিকার নিয়ে এই পৃথিবীতে জন্মেছে তারা। সব জেনেশুনেও রেগে যায় ফেকুনাথ। মাকে বলে, 'আমার শাদির জন্যে পয়সা জমিয়েছিলি না?'

সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে লখিয়া বলে, 'হাঁ, তিনশ রুপাইয়া।'

'সেই রুপাইয়া কোথায়?'

'আছে। কেন?'

'ওখান থেকে আমাকে টাকা দিবি। দু-চারদিনের মধ্যে চাল বদলাব।'

লখিয়া এবং গৈরুনাথ আচমকা চিৎকার জুড়ে দেয়, 'নেহী—নেহী। ওই রুপাইয়া হোনেবালা সমধীকে (ভাবী বেয়াইকে) দিতে হবে। তার মেয়ের পণ।'

ফেকুনাথ বলে, 'সবাই জাড়ে কষ্ট পাবে, বারিষে ভিজবে, আর তিনশ রুপাইয়া পণ দিয়ে তোরা আমার শাদি দিতে চাইছিস। এমন শাদির মাথায় তিনবার লাথ।'

গৈরুনাথরা উত্তর দেয় না। সেই কতকাল ধরে সংসারের খরচ থেকে বড় কষ্টে একটি একটি করে পয়সা বাঁচিয়ে তারা যে তিনশ'টা টাকা জমাতে পেরেছে তার পেছনে রয়েছে তাদের বড় মাপের একটা স্বপ্ন এবং আশা। ফেকুনাথ ম্যাট্রিক পাশ করে এলে তার শাদি দিয়ে সংসারে একটা উৎসব করবে। কিন্তু ছেলের কথার ধরন দেখে তাদের স্বপ্নভঙ্গ ঘটতে থাকে; চোখেমুখে ফুটে বেরোয় হতাশা এবং উদ্বেগের ছাপ।

ফেকুনাথ খানিকক্ষণ ভেবে বাপের মুখের দিকে তাকায়। বলে, 'এবার আসল কাজের কথাটা শোন।'

ছেলে কী বলবে বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে শুধোয়, 'কী কথা?'

'আমাদের কিছু জমিন ছিল না?'

গৈরুনাথ প্রথমটা অবাক হয়ে যায়। ফেকুনাথ যে জমির কথা তুলবে, এটা সে ভাবতে পারে নি। বলে, 'হাঁ, ছিল তো।'

'কত জমিন?'

'হোগা বিশ পন্দ্র বিঘা।'

'পন্দ্র বিশ বিঘায় কত ধান আর গেঁহু হয়?'

'বহোত।' বলে চুপ করে যায় গৈরুনাথ। খানিকক্ষণ চিন্তা করে ফের শুরু করে, 'সালভর আমাদের সবার খোরাকি হয়ে কমসে কম বিশ তিশ মণ ধান-গেঁহু তো বেচতে পারব। বড় ফসল ওঠার পর মুংগ চানা মসুরা সরষো লাগিয়ে দিলে পুরা সাল খেয়ে খতম করতে পারব না। দো-চার মণ তার থেকেও বেচতে পারব।'

অবাক হয়ে ফেকুনাথ বলে, 'হাঁ!'

'হাঁ।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে গৈরুনাথ।

'এই জমিন আমাদের থাকলে তোমাকে আর মাকে পরের খেতে খেটে খেটে গলায় খুন তুলতে হত না।' ফেকুনাথ বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে যায়।

গৈরুনাথ বলে, 'ঠিক বাত। জমিনটা থাকলে আমাদের দুখ-তখলিফ ঘুচে যেত। লেকেন—

'লেকেন কা?'

বিষণ্ণ হাসে গৈরুনাথ, 'যা নেই তা ভেবে কা ফায়দা?'

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে ফেকুনাথ বলে, 'তোমার কাছে অনেক বার শুনেছি, করজের টাকা শোধ

করতে পার নি বলে আমাদের জমিনটা রামধারী মিশিরের পেটে ঢুকে গেছে।'

'হাঁ, সচ—' গৈরুনাথ বলতে থাকে, 'কা করে, ছোটবেলায় তোর ভারি বুখার হল, তাই তো মালিকের কাছ থেকে করজ নিতে হয়েছিল।'

'কত টাকা নিয়েছিলে রামধারীজির কাছ থেকে?

'হোগা শও দো শ রুপাইয়া।'

'একশ দোশ রুপাইয়ার জন্যে আমাদের পন্দ্র বিশ বিঘা জমিন চলে গেল!' রীতিমত অবাকই হয়ে যায় ফেকুনাথ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণ মুখে গৈরুনাথ বলে যায়, 'কা করে, বহোত সুদ চড়ে গেল যে। অত রুপাইয়া শোধ করতে পারলাম না। বাপ-দাদার জমিনটা কেড়ে নিল বড়ে সরকার। তারপর থেকে বড় তখলিফ চলছে। যত রোজ বেঁচে আছি দুখ আর আমাদের ঘুচবে না।'

ফেকুনাথ কী ভেবে শুধোয়, 'আমাদের মতো আরো অনেকের জমিন তো রামধারীজির পেটে ঢুকেছে!'

গৈরুনাথ গলা চড়ায়। হাত নেড়ে নেড়ে বলে, 'বহোত আদমীকা। গাঙ্গোতা, দুসাদ, ধাঙড়—কেউ বাদ নেই। করজের দায়ে অনেকের জমিন কেড়ে নিয়েছে বড়ে সরকার।'

'মনচনিয়া গাঁয়ের সবারই তো আমাদের মতো হাল।'

'হাঁ। দো-চার আদমী বাদ। যারা করজ নেয় নি তারা বেঁচে গেছে। তবে—'

'তবে কী?'

গৈরুনাথ যা উত্তর দেয় তা এইরকম। তাদের মতো এ অঞ্চলের গরিব অচ্ছুতেরা শেষ পর্যন্ত কেউ রেহাই পাবে না। যেভাবেই হোক, কোনো একটা অছিলা খাড়া করে একদিন না একদিন যার যা সামান্য জমিটমি আছে, রামধারী ছিনিয়ে নেবেনই।

এ সব কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় গৈরুনাথ। গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে খানিকক্ষণ পর ফের বলে, 'যা বললাম নিজের মনেই রাখিস, পাঁচ কান করিস না। রামধারীজি জানতে পারলে মুসিবত হয়ে যাবে। জানিস তো ও আদমী আচ্ছা নেহী।'

গৈরুনাথের ভেতর থেকে তার অজান্তে এমন এক অচেনা গৈরুনাথ বেরিয়ে এসেছিল যে সাহসী, অভিজ্ঞ এবং স্পষ্টভাষী। কিন্তু তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই আজন্মের সেই ভীরুতা আবার ফিরে এসেছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

অঘ্রাণ মাসের হিমবর্ষী শীতের রাতে বাইরের খোলা বারান্দায় বসে রান্না করা অসম্ভব। তাই ঘরের এক কোণে একটা মাটির চুল্‌হা বানিয়ে নিয়েছে লখিয়া। এক ফাঁকে শুখা লকড়ি জ্বেলে মাড়ভাত্তা চাপিয়ে দেয় সে। ও বেলার মাংস, ডাল, পুদিনার আচার, সবই অনেকটা করে আছে। শুধু ভাতটা করে নিলেই হল। চুলহার আগুনে ঘরের আবহাওয়া আরামদায়ক হয়ে উঠতে থাকে।

একসময় ফেকুনাথ শুধোয়, 'করজপত্রটা কোথায়?'

ছেলের কথা বুঝতে না পেরে গৈরুনাথ বলে, 'কিসের করজপত্র?'

'যে কাগজটায় অঙ্গুঠার ছাপ (বুড়ো আঙুলের ছাপ) মেরে রামধারীজির কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলে।'

'ওটা বড়ে সরকারের কাছেই আছে।'

'আর আমাদের জমিনের কিওয়ালা (দলিল)?'

'সেটাও বড়ে সরকার নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।' উত্তরটা দিয়ে ভীরু গলায় গৈরুনাথ জিজ্ঞেস করে, 'কিওয়ালা আর করজপত্র দিয়ে কী হবে?'

'হ্যায় কুছ জরুরত।'

ছেলেকে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না গৈরুনাথের। সে চুপ করে থাকে।

কিছুক্ষণ পর ভাত হয়ে গেলে সবাই খেয়ে নেয়। তারপর লখিয়া আরো চারটে বড় হাঁড়িতে গত

বছরের পুরনো তুষ বোঝাই করে আগুন ধরিয়ে ঘরের চার কোণে রাখে। এতে যতটুকু ঠাণ্ডা কমানো যায়। কিন্তু টুটোফুটো টিনের চালের অগুনতি ছিদ্র দিয়ে লক্ষকোটি হিমের গুঁড়ো যেভাবে ঘরে ঢুকছে তাতে ঘরটা গরম রাখার পক্ষে ওই আগুনটুকু যথেষ্ট নয়।

ওরা শুতে না শুতেই কাঁথাকানি আর কম্বলের ভেতরটা ঠাণ্ডায় জল হয়ে যেতে থাকে।

পাঁচ

পরের দিন সকালে জ্বরটা বেশ বেড়েই যায় লখিয়ার। তাই নিয়েই জমিতে যেতে চেয়েছিল সে। ফেকুনাথ একরকম জোর করেই জমানো তিন শ টাকা থেকে দশটা টাকা আদায় করে কৌয়াকে দিয়ে বয়েল গাড়ি ডাকিয়ে আনে। এটায় করে সে মাকে বইহারির হাসপাতালে নিয়ে যাবে। অগত্যা একাই ধানখেতে চলে যায় গৈরুনাথ।

খেতির কাজে যেতে না দেওয়া বা অতি কষ্টের সঞ্চয় থেকে দশটা টাকা একরকম জোর করে কেড়ে নেওয়া, এসব নিয়ে ততটা হইচই করেনি লখিয়া। কিন্তু ভাড়া করা গরুর গাড়িতে চড়ে হাসপাতালে যাওয়ার ব্যাপারে সে তুমুল চিৎকার শুরু করে দেয়। হঠাৎ শুনলে মনে হবে বুঝিবা মড়াকান্নাই জুড়ে দিয়েছে।

কেঁদেকেটে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ভাঙা গলায় একনাগাড়ে লখিয়া বলে যায়, বয়েল গাড়ি চড়ে হাসপাতালে যাওয়া ওদের মতো হাভাতে অচ্ছুৎদের শোভা পায় না। এসব বড়লোকী, শৌখিন চাল। এখান থেকে বইহারির 'অসপাতাল' মোটে 'কোশভর' পথ। যত ধুম জ্বরই হোক, এটুকু সে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে যেতে পারত। এভাবে গাড়িভাড়ায় জমানো পয়সা নয়-ছয় করে উড়িয়ে-ঝুরিয়ে দিলে পুতহু আসবে কী করে?

মায়ের কোনো কথার উত্তর দেয় না ফেকুনাথ। একরকম পাঁজা কোলে করে তাকে বয়েল গাড়িতে তুলে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা হেলেদুলে চলতে শুরু করে।

আগে আর অচ্ছুৎটুলির কেউ কখনও বয়েল গাড়িতে চেপে হাসপাতালে যায়নি। 'বুখার' বেশি হলে বড়জোর বাঁশের চালিতে শুইয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেদিক থেকে লখিয়ার এই হাসপাতালে যাওয়া মনচনিয়া গাঁয়ের এক বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা।

দুপুরের ঢের আগেই ওরা বইহারিতে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের হাসপাতালে পৌঁছে যায়।

আজ বেশি ভিড় নেই। চাষের মরসুম বা ধানকাটার সময় 'বীমারী' লোকজন খুব কমই আসে হাসপাতালে। যত অসুখই হোক, মরুক আর বাঁচুক, এই মরসুমে ধান কাটতে না গেলে দুটো পয়সার মুখ দেখবে কী করে?

খুব তাড়াতাড়িই লখিয়াকে ডাক্তার দেখানো এবং বিনা পয়সার ওষুধ নেওয়া হয়ে যায়।

এখানে এসেই বয়েল গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছিল ফেকুনাথ। সেই গাড়িটা অবশ্য চলে গেছে। তবে হাসপাতালের সামনে পিপর গাছগুলোর তলায় আরো অনেকগুলো বয়েল এবং ভৈসা গাড়ি কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর ভেতর থেকে একটা ভাড়া করে মনচনিয়াতে ফিরে যাবার কথা যখন ফেকুনাথ ভাবছে সেই সময় দুবেজির কথা মনে পড়ে যায় তার। বইহারিতে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে যাওয়াটা ঠিক হবে না। জানতে পারলে তিনি দুঃখ পাবেন।

হাসপাতাল থেকে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের প্রাইমারি স্কুল খুব কাছেই। বড়জোর এক 'রশি' পথ।

ফেকুনাথ বলে, 'মা, এতদূর এলাম। চল মাস্টারজির সঙ্গে দেখা করে যাই।'

লখিয়া বলে, 'হাঁ, জরুর।'

ফেকুনাথ জানে 'রশিভর' রাস্তা যেতে বয়েল গাড়ি ভাড়ার কথা বললে লখিয়া খেপে গিয়ে একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। তবু সে শুধোয়, 'এটুকু পায়দল যেতে পারবি?'

লখিয়া সন্দিগ্ধ চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে জানায়, অবশ্যই পারবে; শরীর তার এখনও ততটা দুবলা হয়ে পড়েনি।

'ঠিক আছে, আমি তোকে ধরে ধরে নিয়ে যাব।'

'ধরতে হবে না, আমি ঠিক চলে যেতে পারব।'

সমাজ কল্যাণ দপ্তর এখানে প্রাইমারি স্কুল এবং গেঁয়ো হাসপাতাল বসালেও বইহারি গাঁয়ের রাস্তাঘাট এখনও সেই মান্ধাতার বাপের আমলের। সেগুলোর হাল ফেরেনি; ধুলোভরা কাঁচা পথ এঁকেবেঁকে চারদিকে চলে গেছে।

হাঁটুভর ধুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে কিছুক্ষণ পর দু'জনে বইহারি গাঁয়ের শেষ মাথায় টিনের চালের প্রাইমারি স্কুলে পৌঁছে যায়। স্কুলবাড়িটার একধারে দুবেজির কোয়ার্টার। কোয়ার্টার আর কী। খান দুই ছোট ঘর, একফালি রান্নার জায়গা আর একটা বাঁধানো কুয়ো।

দুবেজি বিয়ে করেননি। সংসারে তিনি একেবারে একা। ঝাড়া হাত-পা মানুষ বলতে যা বোঝায় তিনি তা-ই।

পিছুটান বলতে কিছু নেই দুবেজির। গান্ধী মহারাজের চেলা তিনি। সেই বেয়াল্লিশের আগস্টে চাম্পারনে আন্দোলন করতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং বেশ কয়েক বছর জেলও খাটেন। এখন সুদূর দেহাতে এসে অচ্ছুৎদের ছেলেমেয়ে পড়াচ্ছেন।

আজও কী একটা পরবের জন্য স্কুল ছুটি। ফাঁকা কোয়ার্টারের বারান্দায় মোটা কাপড়ের চৌপায়ায় শুয়ে সামনের ধু ধু প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছেন দুবেজি। হঠাৎ ফেকুনাথদের দেখে ধড়মড় করে উঠে বসেন। মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যায়, বেজায় খুশি হয়েছেন। ব্যস্তভাবে বলেন, 'আয় আয় দুখনিয়া—'

ফেকুনাথরা এসে বারান্দায় বসে।

দুবেজি বলেন, 'বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ মাকে নিয়ে চলে এলি যে?'

বইহারিতে আসার কারণটা সংক্ষেপে জানিয়ে ফেকুনাথ বলে, 'এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা না করে গেলে গুস্‌সা হতেন। তাই আসতে হল।'

'হতামই তো গুস্‌সা। মাকে নিয়ে যখন এসেই পড়েছিস তখন এ বেলা আর যেতে পারবি না। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে একটু জিরিয়ে ও বেলা মনচনিয়া যাস।' বলে লখিয়ার দিকে ফিরে সামনের ঘরটা দেখিয়ে দুবেজি বলেন, 'দুখনকা মাঈ, তুমি ও ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক। চৌপায়া পাতা আছে।'

শোওয়ার কথায় লজ্জা পেয়ে যায় লখিয়া। মুখ নিচু করে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'না না, এখন শোব না।'

'তোমার না বুখার?'

'তাই বলে দিনের বেলা শুয়ে থাকব! আমি ঠিক আছি মাস্টারজি।'

জোর জবরদস্তি করেও লখিয়াকে ঘরে পাঠানো যায় না। সে বারান্দায় বসেই থাকে।

দুবেজি এবার ফেকুনাথকে বলেন, 'কী খাবি বল। ঘরে মুংগ ডাল আছে। সবজি আছে চার রকম। ঘিউ, দুধ আর কলাও আছে। আর আছে বড়িয়া নানকি বাসমতী চাল। এতে হবে না?'

ফেকুনাথ বলে, 'খুব হবে। এমন আচ্ছা 'ভাতকা ভোজন' ক'দিন কপালে জোটে!'

উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হয়েও দুবেজির কোনোরকম জাতের বিচার নেই। 'জাতওয়ারি সওয়াল'কে তিনি আমলই দেন না। পরিষ্কার করে রেঁধে দিলে সবার হাতেই খান। ছুঁয়াছুতের ধার ধারেন না। দুবেজি ফেকুনাথকে বলেন, 'বেলা অনেক চড়ে গেছে। তুই ভাতটা বসিয়ে দে। আমি সবজি কুটে দিচ্ছি—' বলতে বলতে কী খেয়াল হয় তাঁর, রীতিমত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'না না, ভাত বসাতে হবে না। তোর মায়ের তো জ্বর। রোটিই খানকতক বানানো যাক। ভাত খেলে বুখার চড়ে যাবে।'

শেষ পর্যন্ত কাউকেই রান্নায় হাত লাগাতে দেয় না লখিয়া। একরকম জোর করেই রসুই ঘরে গিয়ে রাঁধতে বসে। আর বারান্দায় নিরুপায় ভঙ্গিতে বসে থাকেন দুবেজি এবং ফেকুনাথ।

দুবেজি অসহায়ভাবে বলেন, 'তোর মাকে নিয়ে আর পারা যায় না রে দুখনিয়া—'

'যা বলেছেন মাস্টারজি। বুখার হলে লোকে শুয়ে থাকে। লেকেন মা কি কারুর কথা শোনে!'

টুকরা টাকরা নানা ধরনের কথা বলতে বলতে একসময় কাল রাতের একটা ব্যাপার মনে পড়ে যায় ফেকুনাথের। সোজা হয়ে বসে সে বলে, 'মাস্টারজি, আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কাজ আছে।'

উৎসুক ভঙ্গিতে তাকান দুবেজি, 'কী কাজ রে?'

'আপনাকে কাল বলেছিলাম না, রামধারীজির মকানে আবার যখন যাব, তার আগে আপনাকে খবর দেব?'

'হাঁ হাঁ, বলেছিলি।'

'আজ বুধবার। ভাবছি সামনের এতোয়ারে যাব।'

কী একটু ভেবে দুবেজি শুধোন, 'কাল রামধারীজিকে বললি কী একটা হিসেব যেন বুঝে নিতে যাবি—'

'হাঁ—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে ফেকুনাথ।

গভীর দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ নিয়ে ফেকুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন দুবেজি। বলেন, 'কিসের হিসেব?'

ফেকুনাথ বলতে থাকে, 'বাপুর কাছে শুনলাম শ'ও রুপাইয়া করজের দায়ে রামধারীজি আমাদের পন্দ্র বিশ বিঘা জমিন কেড়ে নিয়েছে। শ'ও রুপাইয়ায় কত সুদ চড়লে একটা জমিন চলে যায়, সেটা বুঝতে যাব রামধারীজির কাছে।'

দুবেজিকে এবার শঙ্কিত দেখায়। তিনি বলেন, 'লেকেন—'

'লেকেন কা?'

'তুই যখন রামধারীজির কোঠিতে যাবি, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাস। সমঝা?' 'সমঝা' শব্দটার ওপর বেশ জোর দেন দুবেজি।

মাস্টারজির মনোভাবটা বুঝতে পারে ফেকুনাথ। হেসে হেসে বলে, 'চিন্তা নায় করনা। রামধারীজির সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে যাচ্ছি না। এত্তে বড়ে আদমী, কেত্তে খেতি, কেত্তে রুপাইয়া, কেত্তে পহেলবান বড়ে সরকারকো। গরিব চাষার ছৌয়া হয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাওয়া কি আমার সাজে? শ'ও রুপাইয়ায় সুদ কত চড়েছে সিরিফ সেটুকু পুছতাছ করেই আমি চলে আসব।'

'ঠিক আছে। তবু তুই আমাকে সঙ্গে নিবি।'

দেখা যাচ্ছে মাস্টারজি তার ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারছেন না। তাঁর ভয় ফেকুনাথ রামধারীজির কাছে সুদের হিসেব চাইলে তার প্রতিক্রিয়া হবে মারাত্মক। ফেকুনাথকে তিনি সেই ছেলেবেলা থেকে চেনেন। এমনিতে খুবই বিনয়ী এবং নম্র কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভীষণ তেজী আর একরোখা। রামধারীজির আচরণে বা কথায় অপমান বোধ করলে সে চুপ করে থাকবে না। ফলে এমন কিছু ঘটতে পারে যাতে ফেকুনাথের ক্ষতিই হয়ে যাবে। রামধারীজি খুবই বিপজ্জনক মানুষ।

ফেকুনাথ কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাইরে থেকে কারা যেন ডাকাডাকি করতে থাকে, 'দুবেজি হ্যায়, দুবেজি—'

দুবেজি সাড়া দেন, 'কৌন?

'হামলোগ। দরবাজা খুল দিজিয়ে।'

দুবেজির কোয়ার্টারের ডান দিকে দিগন্তজোড়া ধানের খেত। বাঁ দিকে নিচু পাঁচিলের গায়ে দরজা। দরজার ওধারে মূল স্কুল বাড়ি। কোয়ার্টারে ঢুকতে হলে স্কুলবাড়ির ভেতর দিয়ে আসতে হয়।

দুবেজি বারান্দা থেকে নামতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই ফেকুনাথ উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন মধ্যবয়সী সন্ন্যাসী গোছের লোক ভেতরে ঢুকে পড়েন। তাঁদের পরনে গেরুয়া, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, কাঁধ থেকে গেরুয়া কাপড়ের বড় ঝোলা নেমে এসেছে। হাতে একটা করে বাঁশের লাঠি।

দুবেজি একসঙ্গে একজোড়া সাধু দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে যান। এঁদের জন্য মনে মনে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আইয়ে, আইয়ে—'

তক্ষুনি ঘর থেকে একখানা দড়ির চারপায়া বার করে আনা হয়। সন্ন্যাসীরা বসবার পর দুবেজি বসেন। অনাহূত হলেও এঁরা তাঁর অতিথি। অতিথিকে সম্মান দেখাবার শিক্ষা দুবেজির আছে। তিনি বলেন, 'কহিয়ে মহারাজ, আপলোগকা লিয়ে কা কর সাকতা?'

একজন সন্ন্যাসী জানান, তাঁরা রানীখেতের হিন্দু মিশনের ব্রহ্মচারী সাধু। তাঁর আশ্রমিক নাম আত্মানন্দ, তাঁর সঙ্গীটির নাম প্রাণানন্দ। শিউশঙ্কর ঝা এবং রামধারী মিশ্র দুবেজির কাছে তাঁদের পাঠিয়েছেন।

কালই শিউশঙ্করজি এবং রামধারীজির সঙ্গে দেখা হয়েছে দুবেজির, কথাবার্তাও হয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু আজই যে তাঁরা হিন্দু মিশনের এক জোড়া সন্ন্যাসী পাঠিয়ে দেবেন, এমন কথা তো ঘুণাক্ষরেও জানান নি। দুবেজি ভেতরে ভেতরে সতর্ক হয়ে যান। শুধোন, 'আমার কাছে কেন আপনাদের পাঠালেন বলুন তো! আমি সাধু মহাত্মা আদমী নই। স্রেফ একজন স্কুল মাস্টার।'

প্রাণানন্দ গলা খাকরে বলেন, 'হিন্দু ধরম আর হিন্দু সমাজ আজ বড় বিপদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে দুবেজি। আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। এই ব্যাপারেই আপনার কাছে আসা।'

দুবেজি বিমূঢ়ের মতো প্রাণানন্দের দিকে তাকান। বলেন, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

প্রাণানন্দ সামনের দিকে ঝুঁকে গভীর গলায় বলেন, 'আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। নিশ্চয়ই শুনেছেন, আপনাদের এ অঞ্চলের অনেক অচ্ছুৎ ধরম বদল করেছে।'

সন্ন্যাসীদের হঠাৎ এভাবে চলে আসার কারণ এবার খানিকটা যেন আন্দাজ করতে পারেন দুবেজি। বলেন, 'শুনেছি।'

'শুধু তাই না, আরো অনেকেই ধরম বদলের কথা ভাবছে।'

'তাও শুনেছি।'

'এভাবে ধরম বদল হতে থাকলে হিন্দু ধরম বিলকুল বিনাশ হয়ে যাবে মাস্টারজি।'

'লেকেন আমি কী করতে পারি?'

'অনেক কিছু করতে পারেন।' উত্তেজক বক্তৃতার ঢংয়ে এবার আত্মানন্দ বলতে থাকেন, 'প্রতিটি হিন্দুর এ নিয়ে যথেষ্ট করার আছে। আমরা যদি এদিকে নজর না দিয়ে চোখ বুজে থাকি, হিন্দু জাতির মতো এত বড় একটা মহান জাতি পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

প্রাণানন্দও জোরালভাবে তাঁর কথায় সায় দেন।

দুবেজি উত্তর দেন না; চুপচাপ নিবিষ্ট মনে সন্ন্যাসীদের কথা শুনে যান।

দুবেজির অসীম ধৈর্যের পরিচয় পেয়ে আত্মানন্দ এবং প্রাণানন্দ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য এবং তার সমূহ বিপদের সময় প্রতিটি হিন্দুর কর্তব্য সম্বন্ধে একনাগাড়ে অনেক কথা বলে যান।

সব শোনার পর দুবেজি বলেন, 'আপনারা তো রানীখেত মিশনের সন্ন্যাসী! এখানকার ধরম বদলের খবর পেলেন কী করে?'

প্রাণানন্দ বলেন, 'পাটনায় আমাদের মিশনের শাখা আছে। শিউশঙ্করজি লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে আমাদের আনিয়েছেন।'

'আপনারা কি এই ধরম বদল বন্ধ করতে এসেছেন?'

দুই সন্ন্যাসী একসঙ্গে জানান, তাঁদের এই অঞ্চলে আসার সেটাই একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এই কারণেই দুবেজিকে তাঁদের একান্তভাবে দরকার। দুবেজির সাহায্য ছাড়া এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষে এক কদমও এগুনো সম্ভব নয়।

দুবেজি সেই আগের কথাটাই ফের বলেন, তাঁর মতো নগণ্য স্কুলমাস্টার কতটুকু সাহায্যই বা করতে পারেন। এর সঙ্গে আরেকটু জুড়ে বলেন, রামধারীজি আর শিউশঙ্করজি অনেক বড় আদমী। তাঁদের প্রচুর অর্থবল এবং জনবল। তাঁরা পাশে থাকলে আর চিন্তা কী।

আত্মানন্দ বলেন, 'শিউশঙ্করজি রামধারীজি বলেছেন, এ অঞ্চলের সব কিছু আপনার জানা। এদিকের অচ্ছুৎ হরিজনেরা আপনার কথা খুব মানে। বহোত সরগনা আদমী আপনি; হরিজনদের

আপনজন। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে চাই।'

'কেন?'

'সবাইকে বোঝাব, ধরম বদলের কোঈ জরুরত নেহী। আমাদের এই প্রাচীন মহান ধরমই তাদের যথেষ্ট কল্যাণ করতে পারে। এর মধ্যে অনেক শান্তি অনেক শক্তি রয়েছে।'

আত্মানন্দ বলেন, 'বহুকাল আমরা উদাসীন থেকেছি। নিজেদের ধরমের মহিমা প্রচার করা হয়নি, দেশের মানুষকে বোঝানো হয়নি হিন্দু ধরমের মাহাত্ম্য কতখানি। এর কী ফল হয়েছে জানেন মাস্টারজি?'

'কী ফল?'

'মারাত্মক বিষময় ফল।' আত্মানন্দ বলতে থাকেন, 'এই কারণে হিন্দু ধরমের বন্ধন ক্রমশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। হিন্দু হয়েও অনেকে তার ধরমের মহিমা সম্বন্ধে সচেতন নয়। তা ছাড়া—'

দুবেজিকে উৎসুক দেখায়। তিনি বলেন, 'তা ছাড়া কী?'

আত্মানন্দ বলেন, 'আমরা প্রচারের দিকটা উপেক্ষা করলেও অন্য ধরমের প্রচারকরা কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেননি। তাঁরা তাঁদের কর্তব্য ঠিকই করে গেছেন। মাস্টারজি, একবার সারা ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কত হিন্দু ধরম বদল করে মুসলমান হয়েছে, খ্রিস্টান হয়েছে, বৌদ্ধ হয়েছে।'

উত্তর না দিয়ে তাকিয়েই থাকেন দুবেজি।

আত্মানন্দ থামেননি, 'এভাবে চললে হিন্দু ধরমের কী হাল হতে পারে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। যেভাবেই হোক এটা ঠেকানো দরকার।' গলার স্বরে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে শেষ কথা ক'টা উচ্চারণ করেন তিনি।

দুবেজি জিজ্ঞেস করেন, 'কিভাবে?'

এবার উত্তরটা আসে প্রাণানন্দের কাছ থেকে। তাঁর মতে যদিও দীর্ঘকাল কর্তব্যে অবহেলা হয়ে গেছে তবু সব কিছু একেবারে হাতের বাইরে চলে যায়নি। হিন্দুধর্মে যে এখনও যথেষ্ট তেজ এবং মানবকল্যাণের বীজ রয়েছে, প্রাচীন ধর্ম হলেও তাতে যে জরা ধরেনি, এটা মানুষকে নতুন করে বোঝাতেই হবে। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গাঁয়ে ঘুরে এর মহিমা প্রচার করেই ধর্মান্তর ঠেকানো সম্ভব।

দীর্ঘ আবেগময় বক্তৃতার সুরে কথাগুলো বলে প্রাণানন্দ একটু থামেন। পরক্ষণেই আবার শুরু করেন, 'এ অঞ্চলে প্রচারের সময় দয়া করে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন দুবেজি। তাহলে অনেক কাজ হবে।'

দুবেজি বুঝতে পারছিলেন, পাছে নতুন করে আর কেউ হিন্দুধর্ম থেকে বেরিয়ে যায়, সেই ভয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে হিন্দুধর্ম মিশনের এই সন্ন্যাসীদের পাঠানো হয়েছে। সবিনয়ে জানান, তিনি ধর্মপ্রচারক নন, একজন সামান্য গেঁয়ো শিক্ষক মাত্র। ছেলে চরানোই তাঁর একমাত্র কাজ। ধর্মপ্রচারের জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরা তাঁর পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়।

আত্মানন্দ এবং প্রাণানন্দ নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কিছুক্ষণ পরামর্শ করে নেন। তারপর প্রাণানন্দ বলেন, 'আমরা এ অঞ্চলে একেবারে নতুন। আপনি যদি সঙ্গে না থাকেন সেটা হিন্দু ধরমের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। তবে—'

'তবে কী?'

'কোনো গাঁয়ে ঢুকে বলতে পারি তো, আপনার সঙ্গে আমাদের জানাশোনা আছে?'

দুবেজি বুঝতে পারেন, তাঁর পরিচয়টাকে আত্মানন্দ প্রাণানন্দ কাজে লাগাতে চান। বলেন, 'তা পারেন। তবে ধরম প্রচারের সঙ্গে আমার কিন্তু কোনোরকম সম্পর্ক নেই। ওটা আপনাদের নিজস্ব কাজ।'

আত্মানন্দ বলেন, 'ঠিক আছে। প্রথমে কোন গাঁয়ে যেতে বলেন?'

'যেখানে ইচ্ছা। চারপাশে বিশ পঁচিশটা গাঁ রয়েছে।'

কথায় কথায় অঘ্রাণ মাসের সূর্য মাথার ওপর উঠে আসে। দুই সন্ন্যাসী বলেন, 'আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম। এবার উঠি দুবেজি। নমস্তে—'

এই দুপুরবেলা কাউকে না খাইয়ে ছাড়া যায় না। দুবেজি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বলেন, 'এখন আপনাদের যেতে দিতে পারি না। গরিবের ঘরে সামান্য যা আছে তা 'ভোজন' করে গেলে কৃতার্থ হব।'

খাওয়ার কথা শুনে সন্ন্যাসীদের চলে যাওয়ার আগ্রহ হঠাৎ কমে যায়। প্রাণানন্দ বলেন, 'আপনাদের আবার অসুবিধায় ফেললাম।'

দুবেজি বলেন, 'কোনো অসুবিধা হবে না। তবে একটা কথা আছে।'

'কী কথা?'

'আমার ঘরে যা খাবার রয়েছে তা একজন হরিজন মহিলা রসুই করেছে। জাতে চামার, খেতে আপত্তি নেই তো?'

দুই সন্ন্যাসীকে হঠাৎ অত্যন্ত ম্রিয়মাণ দেখায়। খুবই অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন তাঁরা। পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে শুকনো গলায় জানান তাঁদের কাছে যবের ছাতু, পেঁড়া এবং শক্কর আছে। একটু 'পীনে কা পানি' পেলেই আর কিছু দরকার হবে না।

সন্ন্যাসীদের মনোভাব পরিষ্কার আন্দাজ করা যায়। অচ্ছুৎ চামারনীর হাতে খেতে তাঁদের প্রবল আপত্তি। দুবেজি তবু বলেন, 'একটু কিছু মুখে দিয়ে না গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে। হরিজন মহিলার রান্না আপনাদের খেতে হবে না। ঘরে কলা, ক্ষীরা আর চূড়া আছে। তাই খাবেন।'

দুই সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর প্রাণানন্দ বলেন, 'আপনি হরিজনদের হাতে খান?'

'খাব না কেন? পরিষ্কার করে রেঁধে দিলে আমি সবার হাতেই খাই। জাতটাত নিয়ে মাথা ঘামাই না।'

এবার অনিচ্ছাসত্ত্বেই হয়ত দুই সন্ন্যাসী জানান, ক্ষীরা কলা বা চিড়ের দরকার নেই। দ্বিবেদী ব্রাহ্মণ হয়ে যদি দুবেজি শিডিউল্ড কাস্ট মহিলার হাতে খেতে পারেন, তবে তাঁরাও খাবেন।

দুবেজির মুখ খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর লখিয়া যখন কুয়োর পাড়ে সিলভারের বর্তন ধুচ্ছে আর ফেকুনাথ ওধারের ঘরে কী একটা দরকারে গেছে সেই সময় দুবেজি চাপা গলায় সন্ন্যাসীদের শুধোন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না?'

দুই সন্ন্যাসী মাথা ঝাঁকিয়ে জানান, তাঁরা কিছুই মনে করবেন না। একটা কেন, যত ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পারেন দুবেজি।

দুবেজি বলেন, 'আপনারা বুঝি অচ্ছুৎদের হাতে খান না?'

সন্ন্যাসীরা চমকে ওঠেন। 'আগে আর কখনও খাইনি।' একটু থেমে বলেন, 'সমস্কার। বুঝলেন না, বহু যুগের প্রাচীন সমস্কার রক্তের ভেতর শেকড় গেড়ে বসে আছে। কাটিয়ে ওঠা মুশকিল।'

সন্ন্যাসীদের অকপট স্বীকারোক্তিও দুবেজিকে খুশি করে না। বিষণ্ণ মুখে তিনি বলেন, 'বহোত খারাপ সমস্কার প্রাণানন্দজি, আত্মানন্দজি। এভাবে মহান হিন্দু ধরম বাঁচবে না।'

দু'জনেই মাথা নেড়ে জানান, দুবেজির কথা ষোল আনা খাঁটি। আপাতত যেটা প্রধান সমস্যা অর্থাৎ ধর্মান্তরটা প্রথমে ঠেকানো হোক। তারপর হিন্দুধর্মের নতুন সংস্কারে হাত দিতে হবে এবং পুরনো বদ্ধমূল ক্ষতিকর যাবতীয় কুসংস্কার এই ধর্ম থেকে বিদায় করা হবে।

ছয়

দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন কেটে যায়।

এর মধ্যে হাসপাতালের ওষুধ খেয়ে জ্বর সেরে গেছে লখিয়ার। আবার সে রামধারী মিশ্রর জমিতে পুরোদমে ধান কাটা শুরু করে দিয়েছে। আবহমান কালের নিয়মেই তাদের সংসার ঢিমে তালে জোড়াতালি দিয়ে চলেছে।

ফেকুনাথ ম্যাট্রিক পাশ করে আসার পর গোটা মনচনিয়া গাঁয়ে, বিশেষ করে গৈরুনাথদের সংসারে যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল তা অনেকখানি থিতিয়ে গেছে। গৈরু চামারদের জীবনে এ জাতীয় উত্তেজনা বড়ই ক্ষণস্থায়ী। সারাদিন পশুর মতো খেটে যাদের পেটের দানা জোটাতে হয় তাদের পক্ষে এরকম শৌখিন উন্মাদনা নিয়ে কতক্ষণ আর মাতামাতি করা সম্ভব?

ছেলের ম্যাট্রিক পাশের আনন্দে দুটো দিন যে বাড়িতে বসে হই চই করবে, এমন ফুরসত নেই লখিয়া বা গৈরুনাথের। পেট নামে একটা মারাত্মক বস্তু আছে, তার দানা জোটাতে হলে রোজ দু'বেলা তাদের বেরুতেই হয়। চিরকালের রীতি অনুযায়ী সকালে উঠেই খেতিতে চলে যাচ্ছে লখিয়ারা। বাকি ছেলেমেয়ে তিনটেকে বইহারির স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। তারা আদপেই স্কুলে যাচ্ছে কিনা, দেখার কেউ নেই। বাপ-মা যখন রামধারী মিশ্রর খলিহান বোঝাই করার জন্য ধান কাটছে তখন তারা মনচনিয়ার মাঠে ঘাটে খেলে বেড়াত। ফেকুনাথ ভাগলপুর থেকে বাড়ি চলে আসার পর ইদানীং নিয়মিত তাদের বইহারিতে যেতে হচ্ছে।

ফেকুনাথও সারাদিন ঘরে বসে থাকে না। রোজ সকালে বাপ-মা খেতির কাজে বেরিয়ে গেলে ভাইবোনগুলোকে বইহারিতে পাঠিয়ে 'কোশভর' হেঁটে সে চলে যায় তেতরিয়া স্টেশনে। বাঙালি স্টেশন মাস্টার ভাদুড়িজি পাটনার একখানা ইংরেজি কাগজ রাখেন। এক দিনের বাসি ডাকের কাগজটায় চাকরি বাকরির নানারকম বিজ্ঞাপন বেরোয়। শিডিউল্ড কাস্ট এবং শিডিউল্ড ট্রাইবদের জন্য সংরক্ষিত বিজ্ঞাপনগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে সে।

এদিকে গৈরুনাথ এক ভৈসোয়ার মারফত ধারাউলিতে লখিয়ার বাপ বুধিলালকে আসার জন্য যে খবর পাঠিয়েছিল, তারও কোনো সাড়া নেই। বুধিলাল এখনও আসেনি; সেই ভৈসোয়ারটারও পাত্তা নেই। হয়ত গাড়ি নিয়ে সে সাহারসা কি রায়গঞ্জ কালিয়াগঞ্জের দিকে চলে গেছে। যেদিকে ভাড়া মিলবে সেদিকেই তো সে যাবে।

বুধিলাল না আসার ফল হয়েছে এই, রোজই রাত্তিরে খেতে বসে তাকে এবং রামিয়াকে নিয়ে অনেকটা সময় ধরে কথাবার্তা হয়। ফেকুনাথের বিয়েটা এ সংসারে একটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। কেন যে খবর দেওয়া সত্ত্বেও বুধিলাল আসছে না তা নিয়ে লখিয়া এবং গৈরুনাথ খুবই চিন্তিত। ভৈসোয়ারটা তাদের আদৌ খবর দিয়েছে কিনা কে জানে।

আজ সকালে রোদ উঠতে না উঠতেই রোজকার মতো লখিয়ারা রামধারী মিশ্রর জমিতে চলে গেছে। আরো কিছুক্ষণ পর বাসি পানিভাত্তা খেয়ে কৌয়া, ফুলেরি এবং কিষুণ গেছে বইহারিতে। যাওয়ার সময় ফেকুনাথ তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, সিধা যেন তারা স্কুলে যায়। পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে খেলে বেড়ালে তাদের আর আস্ত রাখা হবে না; হাড্ডি বিলকুল 'চূরণ' করে ফেলা হবে।

রোদের তেজ আরো খানিকটা বাড়লে ঘরে শেকল তুলে ফেকুনাথও বেরিয়ে পড়ে। অচ্ছুৎটুলি পেছনে ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যে 'পাক্কি'তে এসে ওঠে সে। বাঁ দিকে রামধারী মিশ্রর আদিগন্ত ধানখেতগুলোতে ফসল কাটা চলছে। ধান বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অগুনতি গৈয়া গাড়ি। মাথার উপর উড়ছে পরদেশি শুগার ঝাঁক। থেকে থেকেই তারা ধানখেতে নেমে যাচ্ছে। পাকা ধানের থোকা থেকে ধারাল ঠোঁটে একেকটি সোনার দানা তুলে নিয়ে আবার উড়ে যাচ্ছে আকাশে। ফি বছরই অঘ্রাণ-পৌষে পাক্কীর নিচে ফসলের মাঠগুলোতে এই ছবি চোখে পড়ে।

পরিচিত দৃশ্য দেখতে দেখতে অন্যমনস্কর মতো হাঁটতে থাকে ফেকুনাথ। পাশ দিয়ে দূর পাল্লার

বাস লৌরি কিংবা সাইকেল রিক্‌শা হুস হুস করে বেরিয়ে যায়। আর যায় হেলেদুলে বয়েল কিংবা ভৈসা গাড়ির ঝাঁক।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় তেতরিয়া স্টেশনে পৌঁছে যায় ফেকুনাথ।

দূর থেকেই ফেকুনাথের চোখে পড়েছিল, স্টেশনের ছোট লাল বাড়িটার সামনে সুরকি-ঢালা খোলা প্ল্যাটফর্মে একটা বহুকালের পুরনো কাপড়ের ইজিচেয়ারে বসে আছেন স্টেশন মাস্টার ভাদুড়িজি। তাঁর হাতে একটা খবরের কাগজ। ফেকুনাথ জানে, ভোরের ট্রেনেই পাটনা থেকে ডাকের কাগজ এসে যায়। সে স্টেশনে পৌঁছুবার আগেই সেটা আগাগোড়া পড়া হয়ে যায় ভাদুড়িজির।

স্টেশনটা এখন একেবারেই নির্জন। শুধু লাল বাড়িটার পাশে ফুটিফাটা অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় রামলগনের চায়ের দোকানে দু-চারটে দেহাতী লোক কম্বল জড়িয়ে বসে আছে। আর একটা লোমওঠা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে একধারে শুয়ে রয়েছে। দশ বার বছর ধরে শীতকালে কুকুরটাকে রামলগনের দোকানে পড়ে থাকতে দেখছে ফেকুনাথ। অনেক বয়স হয়েছে ওটার।

প্ল্যাটফর্মের ধার ঘেঁষে পরাস ও সিমার গাছের ছড়াছড়ি। অঘ্রাণ মাসের হিমে সেগুলো কুঁকড়ে আছে।

স্টেশনের ওধার থেকে আবার ফসলের খেত। থোকা থোকা ধানের ভারে ধানগাছগুলো নুয়ে পড়েছে। তবে এদিকটায় এখনও ফসল কাটা শুরু হয়নি।

পরাস এবং সিমার গাছগুলোর মাথায় কিচিরমিচির করে কারা যেন অবিরাম ডেকে চলেছে। নিশ্চয়ই চোটা বা চড়াইয়ের দল। স্টেশনের ওধারে যে অফুরন্ত ধানখেত, সে সব পেরিয়ে 'রশি' কয়েক হাঁটলে পাওয়া যাবে বিরাট এক বিল। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বগেড়ি বিলের দিকে উড়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে হাওয়ায় ডানা ভাসিয়ে চলেছে অজস্র সিল্লি আর মানিক পাখি। শীতের বাতাস চিরে বগেড়ি আর সিল্লির ডাকও ভেসে আসছে। ভেসে আসছে পাখিদের অবিশ্রান্ত ডানার আওয়াজ।

এই শব্দটুকু ছাড়া তেতরিয়া স্টেশন একেবারেই নিঝুম। সারা দিনে তিনটে আপ আর তিনটে ডাউন, মোট ছ'টা ট্রেন এখান দিয়ে যাওয়া-আসা করে। ট্রেন এলে কিছুক্ষণের জন্য সামান্য চাঞ্চল্য জাগে। নইলে বাকি সময়টা অগাধ স্তব্ধতায় ডুবে থাকে বিহারের সুদূর প্রান্তে এই অতি নগণ্য তেতরিয়া স্টেশন।

এখানে কাজের লোক বলতে মোট তিনজন। স্টেশনমাস্টার ভাদুড়িজি, অ্যাসিস্টান্ট স্টেশনমাস্টার শ্রীবাস্তবজি আর একটা পয়েন্টসম্যান গিরধর। স্টেশনমাস্টার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টারের আলাদা করে নির্দিষ্ট কোনো কাজ নেই। টিকিট বেচা, প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিট নেওয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজই তাঁরা ভাগাভাগি ক'রে করে থাকেন। গিরধরের ডিউটি হল আপ এবং ডাউন গাড়িগুলোকে ফ্ল্যাগ দেখানো। কিন্তু আদতে ভাদুড়িজি আর শ্রীবাস্তবজির কোয়ার্টারেই সে বেশিক্ষণ কাটায়। তার আসল ডিউটিটা সেখানেই। ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ বিহারের এই অখ্যাত তুচ্ছ স্টেশনের জন্য তিনজনের বেশি লোক দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি।

এই মুহূর্তে ভাদুড়িজি ছাড়া বাকি দু'জনকে দেখা যাচ্ছে না। ফেকুনাথ জানে, এখান থেকে বাঁ দিকে কাচ্চী ধরে খানিকটা গেলে প্রথম বাঁকটার ওধারে টালির চালের দু-কামরার দুটো কোয়ার্টার পাওয়া যাবে। ও দুটো ভাদুড়িজি এবং শ্রীবাস্তবজির জন্য বরাদ্দ। শ্রীবাস্তবজি এখন তাঁর কোয়ার্টারেই আছেন। গিরধর হয় তাঁর কোয়ার্টারে কিছু করছে, কিংবা ভাদুড়িজির কোয়ার্টার সাফসুতরো করে, কুয়ো থেকে জল তুলে রাখছে।

গিরধরের জন্য আলাদা কোয়ার্টার নেই। সন্ধেবেলা লাস্ট ডাউন ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর সে কোনো কোন দিন রাত্রিটা স্টেশনের লাল বাড়িতেই কাটায়। তবে বেশির ভাগ দিনই ভাদুড়িজির কোয়ার্টারে গিয়ে শোয়। ভাদুড়িজি একা মানুষ, রাত্তিরে একটা সঙ্গী পেলে তাঁর ভালই লাগে।

ভাদুড়িজি ফেকুনাথকে দেখতে পেয়েছিলেন। বললেন, 'আয় আয়, তোর কথাই ভাবছিলাম।

অফিস থেকে একটা টুল বার করে এনে বোস।'

অফিস অর্থাৎ স্টেশন বিল্ডিং। সেখান থেকে উঁচু টুল এনে বসে ফেকুনাথ। তার চোখ ভাদুড়িজির হাতের খবরের কাগজটার দিকে।

ভাদুড়িজি বলেন, 'বহোত জাড়। আগে একটু চা খেয়ে গা গরম করে নে। তারপর কাগজ দেখিস।'

ফেকুনাথের চা খেতে আপত্তি নেই। বরং উলটোটাই। শীতের সকালে গরম চায়ের মতো জিনিস আর হয় না। স্টেশনে এলে খবরের কাগজ ছাড়া বাড়তি এক কাপ করে চা-ও মেলে। সেটা কম লোভনীয় নয়।

ভাদুড়িজি চায়ের দোকানের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেন, 'এ গণুয়া, দো চায়—'

'লাতে হ্যায় ভাদুড়িজি'—চায়ের দোকানের কাজের ছোকরা গণুয়ার সাড়া পাওয়া যায় তৎক্ষণাৎ।

একটু পর চা এসে যায়।

চা খেতে খেতে ভাদুড়িজি খবরের কাগজটা ফেকুনাথের দিকে বাড়িয়ে দেন, 'দ্যাখ, তোর জন্যে চাকরির জায়গাগুলো দাগিয়ে রেখেছি। শিডিউল্ড কাস্ট আর ট্রাইবদের চাকরির ব্যাপারে আজ অনেকগুলো বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে।'

কাগজটা হাতে নিয়ে ফেকুনাথ দেখে একটা পাতায় অগুনতি লাল কালির দাগ। ভাদুড়িজি সম্পর্কে তার মন গভীর কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়।

এই মানুষটাকে ঘিরে ফেকুনাথের যত শ্রদ্ধা, তার বহুগুণ বিস্ময়। তাঁর পুরো নাম কেউ জানে না। এই অঞ্চলের লোকজন তাঁর পদবির সঙ্গে একটা 'জি' জুড়ে সসম্ভ্রমে ভাদুড়িজি বলেই দীর্ঘকাল ডেকে আসছে।

পনের ষোল বছর ভাদুড়িজিকে দেখছে ফেকুনাথ। সে শুনেছে, তাঁর বাড়ি বাংলাদেশে। কিন্তু তেতরিয়া স্টেশন ছেড়ে কখনও কেউ তাঁকে কোথাও যেতে দেখেনি। বছর ছয়েক আগে একবার এখান থেকে ভাদুড়িজির বদলির হুকুম হয়েছিল। একবার পাটনা, একবার কলকাতায় ছোটাছুটি করে তিনি সেই বদলি আটকেছেন।

তাঁর সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানা যায় না। ভাসা ভাসা যেটুকু ফেকুনাথ শুনেছে তা এইরকম। ভাদুড়িজি বিয়ে করেননি। ভাইদের সঙ্গে কী একটা ব্যাপারে গোলমাল হওয়ায় যৌবনের শুরুতেই বাড়ি ছেড়েছিলেন। তারপর নানারকম উঞ্ছবৃত্তিতে কয়েকটা বছর কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত রেলের চাকরি নিয়ে সুদূর এই দেহাতে চলে এসেছেন।

তেতরিয়ার এই রেল স্টেশন আর কোয়ার্টার—এর বাইরে কোথাও বড় একটা পা বাড়ান না ভাদুড়িজি। কিন্তু এখানে বসেই চার পাশের বিশ পঞ্চাশটা গাঁয়ের খবর রাখেন।

জায়গাটার ওপর তাঁর এতই মায়া পড়ে গেছে যে এখান থেকে আর কোথাও যাওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না।

শ্রীবাস্তবজি তাঁর সহকর্মী হলেও ভাদুড়িজির প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী হল গিরধর। সে-ই তাঁর ঘরদোর সাফ করা থেকে রসুই করা পর্যন্ত সব কিছুই করে দেয়। বেশির ভাগ রাত্তিরেই সে ভাদুড়িজির ঘরেই শুয়ে থাকে।

ফেকুনাথ জানে, ভাদুড়িজি উচ্চবর্ণের বাঙালি ব্রাহ্মণ। কিন্তু কোনোরকম ছুঁয়াছুত মানেন না। জাতপাত নিয়ে মাথা ঘামান না। গিরধর জল-অচল কোয়েরি। অচ্ছুৎ কোয়েরির হাতে খেতে তাঁর ব্রাহ্মণত্বে আটকায় না। এদিক থেকে ভাদুড়িজির সঙ্গে বইহারি স্কুলের দুবেজির যথেষ্ট মিল।

ছেলেবেলার কথা খুব একটা মনে নেই ফেকুনাথের। কিন্তু ভাগলপুরে পড়তে যাওয়ার পর থেকে তেতরিয়া স্টেশন দিয়ে বছরে বারকয়েক করে যাতায়াত করতে হয়েছে তাকে। নিজেই যেচে তার সঙ্গে আলাপ করেছেন ভাদুড়িজি। অচ্ছুতের ঘরের ছেলে ফেকুনাথকে পড়াশোনার জন্য ভাগলপুর যেতে দেখে তিনি যতটা অবাক, তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন। এ অঞ্চলের সব ছেলেমেয়েই যখন এক আধ বছর সরকারি ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে যেতে না যেতেই পড়া ছেড়ে দেয় তখন এই ছেলেটা পটাপট একেকটা ক্লাস পেরিয়ে একেবারে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পাশ করে ফেলেছে। চারদিকের বিশ পঞ্চাশটা

গ্রামে সবার থেকে সে আলাদা। এই একটা কারণে ভাদুড়িজি তাকে যেমন স্নেহ করেন তেমনি খাতিরদারিও করে থাকেন।

ম্যাট্রিক পাশ করে যাবার পর যখন সে ভাদুড়িজির সঙ্গে দেখা করতে আসে তিনি বলেছিলেন, 'আরো পড়বি তো?'

'নেহী—' মাথা নেড়েছে ফেকুনাথ।

'কেন রে?'

'আপনি তো আমাদের সব খবর জানেন। এখন নৌকরি টোকরি পাওয়া দরকার। বাপ-মা আর কতদিন খাটবে?'

'হাঁ। ঠিক কথা—' বাপ-মা এবং সংসার সম্পর্কে যে ফেকুনাথ ভাবে, এতে খুশি হয়েছেন ভাদুড়িজি। বলেছেন, 'তবে পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারলে ভাল হত।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বিষণ্ণ গলায় ফেকুনাথ বলেছে, 'তার আর উপায় নেই ভাদুড়িজি। নৌকরি আমার একটা চাই-ই চাই। লেকেন—'

'লেকেন কী?'

'নৌকরি কোথায় পাব, বুঝে উঠতে পারছি না।'

ভাদুড়িজি জানিয়েছেন, খবরের কাগজে নিয়মিত চাকরি বাকরির বিজ্ঞাপন বেরোয়। সে সব দেখে দরখাস্ত ছাড়তে হবে। তা ছাড়া শিডিউল্ড কাস্ট আর ট্রাইবদের জন্য চাকরির খানিকটা অংশ সংরক্ষিত থাকে। সেটা একটা বড রকমের সুবিধা। ম্যাট্রিক পাশ ফেকুনাথের পক্ষে একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়া অসম্ভব হবে না।

'লেকেন—'

'আবার কী?'

'খবরের কাগজ পাব কোথায়?'

'আমি তো রোজ একটা কাগজ রাখি। এসে দেখে যাস।'

সেই থেকে প্রতিদিন নিয়মিত সকালবেলা তেতরিয়া স্টেশনে খবরের কাগজ দেখতে আসে ফেকুনাথ।

চায়ে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ভাদুড়িজি বলেন, 'দেখলি?'

কাগজের দাগ দেওয়া জায়গাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিল ফেকুনাথ। সে বলে, 'হাঁ।'

'অনেকগুলো নৌকরির বিজ্ঞাপন আছে আজ। সব জায়গায় দরখাস্ত ছেড়ে যা।'

'হাঁ, ছাড়ব। লেকেন—'

'কী?'

'চাকরিগুলো সবই দূরে দূরে। রাঁচি ধানবাদ মুঙ্গের আর পাটনায়।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'ওসব জায়গায় নৌকরি নিয়ে গেলে তলব আর কত পাব! বাপ-মা, ভাই-বোন মিলিয়ে আমাদের বড় সম্‌সার। ওই টাকায় চালাব কী করে? ঘরভাড়া করে থাকতে হবে। ভাড়ার পয়সা দেওয়ার পর খাব কী? ভাবছিলাম—'

'কী?'

'নজদিগ (কাছাকাছি) যদি একটা কাজ-টাজ পেতাম, ঘরভাড়াটা বেঁচে যেত।'

'এখানে কি কলকারখানা, অফিস টফিস বসেছে যে কাজ পাবি। নৌকরি করতে হলে দূরে যেতেই হবে।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই শ্রীবাস্তবজি এবং গিরধর এসে যায়। কিছুক্ষণ পর কাটিহারের দিক থেকে একটা ডাউন ট্রেন আসার কথা। শ্রীবাস্তবজি সোজা স্টেশন বিল্ডিংয়ে ঢুকে টিকেট কাউন্টার খুলে বসেন। গিরধরও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে যায়।

এদিকে প্ল্যাটফর্মে বিশ পঁচিশ জন লোক জমা হয়েছে। তারা ডাউন ট্রেনটা ধরবে। টিকেট কাউন্টার

খুলতেই লোকগুলো সেখানে চলে যায়।

ফেকুনাথ শুধোয়, 'তাহলে আমাকে কী করতে বলেন ভাদুড়িজি?'

বুঝতে না পেরে ভাদুড়িজি জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপারে?'

'এই নৌকরির ব্যাপারে। দরখাস্ত করব?'

'নিশ্চয়ই করবি। চাকরি হলে তখন যদি ইচ্ছা না হয়, নিস না।'

'ঠিক আছে।'

একটু চুপ করে থেকে ফেকুনাথ আবার বলে, 'এসব নৌকরি উকরি কিছুই করতে হত না ভাদুড়িজি, যদি জমিনটা পেয়ে যেতাম।'

সামান্য ঝুঁকে উৎসুক গলায় ভাদুড়িজি বলেন, 'কিসের জমিন?'

'আমাদের জমিন। পন্দ্র বিশ বিঘা—'

'এ তো অনেক জমিন। হর সাল দু ফসল হলে তোদের সংসার হেসে খেলে চলে যাবে।

'চলে তো যাবে, লেকেন জমিনটা আমাদের হাতে নেই।'

'কোথায় গেল?'

'রামধারী মিশ্রের পেটে ঢুকে গেছে।'

বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো ভাদুড়িজি শুধোন, 'কী করে?'

জমি হাতছাড়া হওয়ার কারণটা জানিয়ে দেয় ফেকুনাথ। শুনে অনেকক্ষণ অবাক হয়ে থাকেন ভাদুড়িজি। তারপর বলেন, 'শ'ও রুপেয়া করজের জন্যে এতটা জমিন চলে গেল!'

'হাঁ।' জোরে জোরে মাথা নাড়ে ফেকুনাথ।

'বহুত অন্যায়, বহুত অন্যায়।'

ফেকুনাথ উত্তর দেয় না।

ভাদুড়িজি ফের বলেন, 'টাকাটা শোধ করে জমিনটা ফেরত নিয়ে আয় না। তাহলে সত্যি সত্যি নৌকরি উকরির দরকার হয় না।'

ফেকুনাথ এবার বলে, 'সেই চেষ্টাই করব। তবে—'

'তবে কী?'

'কাজটা খুব সোজা হবে বলে মনে হয় না।'

'কঠিন কী? পাইসা নিয়েছিলি, ফেরত দিয়ে জমিন ফিরিয়ে নিবি। এ তো সিধা হিসাব।'

'আপনার আমার কাছে হিসাব সিধা হতে পারে। তবে রামধারী মিশ্রকে তো জানেন। বহুত টেড়া আদমী। আমাদের এদিকের কত লোকের জমিন যে ছিনিয়ে নিয়েছে তার ঠিক নেই। তবে আমি ছাড়ব না। আমার বাপ-দাদার জমিন। ওটা ফিরিয়ে নিতে যতদূর যাওয়া দরকার, যাব। নেহী ছোড়েগা উসকো।' বলতে বলতে চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে ফেকুনাথের।

শুনতে শুনতে এক ধরনের উত্তেজনা ছড়িয়ে যাচ্ছিল ভাদুড়িজির মধ্যে। দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, 'কক্ষনো ছাড়বি না রামধারীজিকে।'

ফেকুনাথ আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় দিগন্তজোড়া ধানের খেত কাঁপিয়ে কাটিহারের দিক থেকে ডাউন ট্রেন এসে পড়ে। মান্ধাতার আমলের কয়লার ইঞ্জিন থেকে গলগল করে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে গিয়ে অঘ্রাণের উজ্জ্বল নীলাকাশ আর স্নিগ্ধ ঝিরঝিরে বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলতে থাকে।

কাপড়ের চেয়ারটা থেকে উঠে পড়েন ভাদুড়িজি। বলেন, 'যাই, প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে টিকিটগুলো নিয়ে আসি।' তিনি স্টেশন ঘরে ঢুকে একটা পুরনো ফ্যাকাশে রঙের কালো কোট গায়ে চড়িয়ে একটু পরেই বেরিয়ে এসে গেটের কাছে দাঁড়ান।

ফেকুনাথ কাগজ আর ডট পেন নিয়ে এসেছিল। চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো সে টুকে নিতে থাকে।

আপ আর ডাউন যে ট্রেনই এখানে আসুক, মাত্র মিনিট খানেকের জন্য থামে। তার মধ্যেই দশ-বার জন প্যাসেঞ্জার নামল, বিশ-পঁচিশ জন উঠল। তারপর উনিশ শ বার সালের টুটোফাটা ইঞ্জিন বেজায়

শব্দ করে আর কালচে ধোঁয়া ছেড়ে ডাউন ট্রেনের বিশাল শরীরটা টানতে টানতে তেতরিয়া স্টেশন পেছনে ফেলে বেরিয়ে যায়।

বিজ্ঞাপনগুলো টোকা হয়ে গিয়েছিল। ঘাড় ফিরিয়ে অন্যমনস্কর মতো সে স্টেশনের গেটটার দিকে তাকায়। যে সব প্যাসেঞ্জার নেমেছিল, ভাদুড়িজি তাদের কাছ থেকে টিকিট চেয়ে নিয়ে একটু আধটু কথা বলছেন। হঠাৎ ফেকুনাথ যাত্রীদের ভেতর নির্ধারি ঝা'কে দেখতে পায়।

ফি বছরই এই শীতের সময়টা অর্থাৎ ফসল কাটার মরশুমে নির্ধারি এই অঞ্চলে চলে আসে। এবার এই প্রথম তাকে দেখা গেল। এখন এই ঝলমলে অঘ্রাণের সকালে তাকে দেখে মনটা খুবই খুশি হয়ে যায় ফেকুনাথের। লোকটাকে খুব পছন্দ করে সে। ফেকুনাথ আর বসে থাকে না, পায়ে পায়ে গেটের কাছে চলে আসে।

নির্ধারি ঝা'র বয়েস ষাট বাষট্টি। টকটকে গায়ের রং। ধবধবে সাদা চুল চামড়া ঘেঁষে ছাঁটা, মাথার পেছন দিকে মোটা এক গোছা টিকিতে গাঁদা ফুল বাঁধা। গোলগাল চেহারা। কপালে তিন লাইন শ্বেত চন্দন। পরনে মোটা সুতোর খাটো ধুতি আর জামা। তার ওপর রোঁয়াওলা ধুসো কম্বল। পায়ে কাঁচা চামড়ার জুতো। পুরু ঠোঁট আর ছোট ছোট চোখদুটো স্নেহের রসে সব সময় ভাসো ভাসো।

নির্ধারির বাঁ হাতে দড়িতে বাঁধা রংচটা একটা টিনের বাক্স, ডান কাঁধে লাঠির ডগায় নানা রঙের চিত্রবিচিত্র ঝোলা। ওই বাক্স আর ঝোলাটায় রয়েছে নির্ধারির যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি—খানকয়েক ধুতি, জামা, তুলসীদাসী রামায়ণ, একটা তেলচিটে বালিশ, গোটা দুই ধুসো কম্বল, পেতলের লোটা, গেলাস, ছোটখাট শিলভারের বর্তন, হজম এবং জ্বরজারির জন্য সামান্য কিছু কবিরাজি ওষুধ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বাক্স আর ঝোলাটা কাঁধে এবং হাতে ঝুলিয়ে অক্লান্ত ভূপর্যটকের মতো বিহারের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে কতকাল ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্ধারি!

শোনা যায়, তার বাড়ি দ্বারভাঙ্গা জেলায়। তবে ঘরে কেউ আছে বলে কেউ জানে না। তার কাজ হল, সারা বছর এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে শোনানো। তুলসীজি শুনে খুশি হয়ে ভক্তিভরে যে যা দেয় তাতেই একটা পেট বেশ ভালভাবেই চলে যায়।

গোটা বিহার জুড়ে হাজার হাজার গাঁ, লাখ লাখ মানুষ রামজির কথা শুনবার জন্য আবহমান কাল ধরে উন্মুখ হয়ে আছে। তুলসীদাসজির নামে পুরুষানুক্রমে ভক্তি আর আবেগের স্রোত বয়ে. আসছে তাদের প্রাণে। এই যখন অবস্থা তখন পেটের চিন্তা অন্তত নির্ধারি ঝা'র নেই। বিহারের সব গাঁ-ই তার গাঁ, সব ঘর তার ঘর। অনাদি কালের এই ভারতবর্ষে সুবিশাল আকাশের নিচে বছরের পর পছর ধুলোভরা কাচ্চীর ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে গরিব আনপড় মানুষের প্রাণে রামায়ণের বীজ বুনে চলেছে সে। সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-আকাশ এবং বাতাসের মতো এই রামায়ণ। রামজিকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের কথা ভাবা যায় না।

পিছুটান নেই নির্ধারির। তার মুখে কেউ কোনোদিন ঘর সংসার মা-বাপ ভাই-বোন বউ-ছেলেমেয়ের কথা শোনে নি। এ সব সম্পর্কে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে হেসে হেসে সে বলে, 'সব রামচন্দজিকা কিরপা—' এ কথায় নির্ধারি ঠিক কী বোঝাতে চায়, কে জানে।

নির্ধারি মৈথিলী ব্রাহ্মণ কিন্তু তার কোনোরকম গোঁড়ামি নেই। জাতপাতের সওয়াল নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।

অচ্ছুৎদের গাঁয়ে রামায়ণ পড়ে শোনায় বলে অন্য ব্রাহ্মণরা তাকে ভাল চোখে দেখে না। তারা তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে এবং মনে মনে এই কারণে প্রচণ্ড ঘৃণাও করে তাকে। কিন্তু কে তাকে দেখে ভুরু কোঁচকায়, কে তার নামে থুক দেয়, এ সব নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায় না নির্ধারি। সে শুধু বলে, 'রামজি তুলসীজি একা বরাভণের নয়, সব কোঈকা। যে তুলসীজি শুনতে চাইবে তাকেই শোনাব।' দার্শনিক নির্লিপ্ততায় অন্য ব্রাহ্মণদের উপেক্ষা করে তুলসীদাসী রামায়ণ হাতে নিয়ে যৌবনের গোড়া থেকে সে এক গাঁ থেকে আরেক গাঁ, এক জনপদ থেকে আরেক জনপদে হেঁটেই চলেছে।

স্টেশনে ফেকুনাথকে দেখে নির্ধারি ঝাও খুব খুশি। বলে, 'কা রে দুখানিয়া, তু টিশনমে?'

বিহারের কমসে কম দু চার হাজার গাঁয়ের কয়েক হাজার মানুষের নাম-ঠিকানা নির্ধারি ঝায়ের

মুখস্থ। বিশেষ করে ফেকুনাথকে সে খুব ভাল করেই জানে। তার কারণ একটাই। অচ্ছুৎদের মধ্যে ফেকুনাথের মতো লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সে খুব কম ছেলেকেই দেখেছে। ফেকুনাথ সম্পর্কে তার মনে এক ধরনের শ্রদ্ধাই রয়েছে।

ফেকুনাথ মজা করে বলে, 'আপনি আসবেন, তাই স্টেশনে এসে বসে আছি।'

তার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসে নির্ধারি। বলে, 'আমি যে আজ আসব, তুই জানতিস?'

'দো-চার রোজের মধ্যে আসবেন, সেটা তো জানতাম। তাই রোজ স্টেশনে আসি।'

সস্নেহে আলতো করে ফেকুনাথের পিঠে চাপড় মেরে নির্ধারি ঝা বলে, 'খুব ওস্তাদ হয়ে গেছিস। তারপর—'

'কা?'

'ম্যাট্রিক পাশ হো গিয়া?'

'হাঁ। আপহিকা কিরপাসে ঝা'জি।'

পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ দু'জনের কথা শুনছিলেন ভাদুড়িজি। নির্ধারিকে তিনিও চেনেন; পনের ষোল বছর ধরে ফসল কাটার মরশুমে তাকে নিয়মিত এখানে আসতে দেখছেন। এবার তিনি বলেন, 'খুব ভাল পাশ করেছে ফেকু।'

খুশিতে মুখ আলো হয়ে যায় নির্ধারি ঝা'র। বলে, 'শুনে মনমে বহোত সন্তোষ হল। ভগোয়ান রামজি তোর ভালাই করুন।' তার আনন্দটা সত্যিসত্যিই বড় আন্তরিক।

নির্ধারি ঝা'র আন্তরিকতাটুকু বড় ভাল লাগে ফেকুনাথের। এই মানুষটা জগতের সবার হিতাকাঙ্ক্ষী। অন্যের ভাল দেখলে নিঃস্বার্থভাবে সে খুশি হয়।

নির্ধারি এবার বলে, 'যাই রে দুখনিয়া। আবার দেখা হবে। চলি ভাদুড়িজি। রাম রাম—'

ভাদুড়িজি বলেন, 'এবার কদ্দিন এখানে থাকছ নির্ধারি?'

স্টেশনের বাইরে যেতে যেতে নির্ধারি বলে, 'লগভগ দো আড়াই মাহিনা তো হবেই। চারদিকে এত এত গাঁ—সব জায়গায় তো ঘুরতে হবে।'

ফেকুনাথ বলে, 'থোড়া ঠহর যাইয়ে ঝা'জি। অনেকক্ষণ স্টেশনে এসেছি, এবার বাড়ি ফিরব।' ভাদুড়িজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে নির্ধারির সঙ্গে সামনের কাচ্চীতে চলে আসে। নির্ধারির হাত থেকে টিনের বাক্সটা নিতে নিতে বলে, 'এটা আমাকে দিন।'

'আরে নেহী নেহী—' নির্ধারি আপত্তি জানায়। কিন্তু ফেকুনাথ তার কথা কানেই তোলে না।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একটু পরেই দু'জনে গিয়ে পাকা সড়কে ওঠে। পাক্কীতে এখন প্রচুর লোক। লৌরি, দূরপাল্লার বাস, সাইকেল রিক্‌শা আর ভৈসা এবং বয়েল গাড়ি স্রোতের মতো চলেছে।

ফেকুনাথ বলে, 'আগে কোন গাঁওয়ে যাবেন? আমাদের ওখানেই চলুন।'

নির্ধারি ঝা বলে, 'না। আগে যাব নেমিপুরা গাঁওয়ে। দো-চার রোজ সেখানে কাটিয়ে তারপর তোদের ওখানে যাব।'

তেতরিয়া স্টেশন আর ফেকুনাথদের মনচনিয়া গাঁ—এই দুইয়ের মাঝখানে নেমিপুরা।

নির্ধারি ফের বলে, 'তোদের গাঁওয়েই আগে যেতাম। লেকেন ক'রোজ আগে দুধলিপুরার হাটিয়ায় নেমিপুরার চন্দ্রিকার সঙ্গে দেখা। সে অনেক করে বলল, এবার এদিকে এলে আগে যেন তাদের গাঁওয়ে যাই। বচন দে দিয়া তো।'

'ঠিক হ্যায়।'

'গাঁওয়ে গিয়ে সবাইকে জানাস, আমি এসেছি।'

'হাঁ হাঁ, জরুর।'

'আমার জন্যে একটা ঘর সাফাই করে রাখতে বলিস।'

'হাঁ।'

এরপর গাঁয়ের কে কেমন আছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় নির্ধারি। কথায় কথায় বেলা চড়তে থাকে। হঠাৎ কী মনে পড়তে সে ঘাড় ফিরিয়ে ব্যস্তভাবে বলে, 'একগো খবর শুনা—সচ না ঝুট বুঝতে

পারছি না।'

'কা খবর?'

গলা নামিয়ে নির্ধারি ঝা বলে, 'শুনলাম, তোদের এদিকে নাকি অনেকে ধরম বদল করে মুসলমান আর খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে?'

ফেকুনাথ বলে, 'আমিও শুনেছি। তবে নিজের চোখে এখনও দেখিনি।'

'বহোত চিন্তাকা বাত। লোকে ধরম বদল করছে কেন? এতে কী লাভ?'

'কা জানে।'

কিছুক্ষণ দু'জনে নিঃশব্দে হাঁটে। তারপর ফেকুনাথ বলে, 'এদিকে কী হয়েছে জানেন?'

'কা?' উৎসুক চোখে তাকায় নির্ধারি।

'হিন্দু মিশনের দু'জন বড় সন্ন্যাসী এখানে এসেছেন। ধরম বদল ঠেকাবার জন্যে গাঁওয়ে গাঁওয়ে ঘুরে তাঁরা লোকজনকে বোঝাচ্ছেন।'

'হাঁ?'

'হাঁ।'

'তোদের গাঁওয়ে সন্ন্যাসীরা এসেছিল?'

'না। তবে দো-চার রোজের মধ্যে আসবেন।'

কথায় কথায় নেমিপুরার কাছাকাছি এসে পড়ে ফেকুনাথরা। তার হাত থেকে টিনের বাক্সটা নিয়ে নির্ধারি ঝা মনে করিয়ে দেয়, 'আমি যাই। তুই গাঁওবালাদের আমার কথা জানিয়ে দিস—'বলতে বলতে পাকা সড়ক থেকে বাঁ দিকে ধানখেতে নেমে যায় সে। আলের ওপর দিয়ে রাস্তা। এখান থেকে 'রশিভর' হাঁটলে নেমিপুরা গাঁ।

ফেকুনাথও আর দাঁড়ায় না। পাক্কী ধরে বরাবর হাঁটতে থাকে।

এখন বেলা বেশ বেড়েছে। চড়তি সূরয খাড়া মাথার ওপর উঠে আসছে দ্রুত।

সাত

আরো কয়েকটা দিন কেটে যায়।

এদিকে সেই ভৈসোয়ারটার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। রামিয়ার বাপ বুধিলালের দিক থেকেও কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

ক'দিন আশায় আশায় বসে থাকার পর হঠাৎ গৈরুনাথ আর লখিয়া ঠিক করে ফেলে, শীগ্‌গিরই এক সন্ধ্যায় ধান কাটা হয়ে গেলে গৈরুনাথ আর মনচনিয়ায় ফিরবে না, পাক্কী ধরে সিধা ধারাউলিতে চলে যাবে। বুধিলালের সঙ্গে ফেকুনাথের 'সাদিকা বাত' এবং দিনক্ষণ পাকা করে রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দেবে। পরের দিন অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে পড়বে। তাহলে 'সূরয' চড়বার আগেই রামধারী মিশ্রর জমিতে পৌঁছে যেতে পারবে।

এ ক'দিনে চারপাশের গাঁগুলো থেকে রানীখেতের সেই দুই সন্ন্যাসীর খবর আসছে। আত্মানন্দ এবং প্রাণানন্দ গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে হিন্দুধর্মের পক্ষে এবং ধরম বদলের বিপক্ষে মানুষকে বুঝিয়ে চলেছেন। এই সব খবরে মনচনিয়া গাঁয়ে বেশ উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সন্ধের পর গাঁয়ে ফিরে সবাই ধরম বদল এবং সন্ন্যাসীদের ব্যাপার নিয়ে হই চই করে। মনচনিয়া গাঁ আশা করে আছে, যে কোনো মুহূর্তে সন্ন্যাসীরা এখানে এসে পড়বেন।

ফেকুনাথের কিন্তু এসব দিকে নজর নেই। খবরের কাগজে চাকরির যেসব বিজ্ঞাপন বেরোয় সে সব জায়গায় রোজই একটা দুটো করে সে দরখাস্ত পাঠিয়ে যায় ঠিকই কিন্তু তার লক্ষ্য একটাই। সেটা হল বাপ-দাদার পনের বিঘে দো-ফসলি উৎকৃষ্ট জমি। রামধারী মিশ্রর কাছ থেকে ওই জমিটা উদ্ধার

করতেই হবে। বাপ-মা থেকে শুরু করে দুবেজি পর্যন্ত সবাই তাকে এমন মারাত্মক দুঃসাহসের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে বারণ করেছে। একমাত্র ভাদুড়িজিই বাদ। তিনিই শুধু প্রবল উৎসাহ দিয়েছেন।

একটা বজ্জাত টেড়া লোক গায়ের জোরে জুলুমবাজি করে মাত্র একশ টাকা করজের অছিলায় তাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়েছে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ফেকুনাথ। তার রক্তের ভেতর সর্বক্ষণ গনগনে আগুন জ্বলছে। জমিটা যেভাবে হোক ফিরিয়ে আনতেই হবে।

আজ এতোয়ার বা রবিবার।

সকালে লখিয়া এবং গৈরুনাথ যখন জমিতে যাচ্ছে সেই সময় ফেকুনাথও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। বড় সড়কে এসে সে যখন বাঁ দিকে হাঁটতে থাকে লখিয়া অবাক হয়ে শুধোয়, 'কা রে, তুই টিসন (স্টেশন) যাবি না?' বাড়ির সবাই জানে, সকালে বেরুলে রেল স্টেশনেই যায় ফেকুনাথ। কিন্তু তেতরিয়ার রাস্তা হল ডান দিকে। বাঁ ধারে সড়কটা বইহারি মধিপুরা হয়ে মৈনুগঞ্জে চলে গেছে।

ফেকুনাথ বলে, 'নেহী।'

'তব কিধর যাওগে?'

'সে এক জায়গায় যাব।'

'কঁহা? মাস্টারজির কাছে?'

'নেহী।'

'তব্?'

ফেকুনাথ উত্তর দেয় না।

এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি গৈরুনাথ। এবার লখিয়ার ওপাশ থেকে চাপা ভীরু উদ্বিগ্ন গলায় সে বলে ওঠে, 'সমঝ গিয়া। দুখনিয়া জরুর মধিপুরায় বড়ে সরকারের কোঠিতে চলেছে। জরুর—'

ফেকুনাথ অস্বীকার করে না। মাথা হেলিয়ে জানায়, 'হাঁ—'

গৈরুনাথকে এবার ভয়ানক সন্ত্রস্ত দেখায়। তার ধারণা ফেকুনাথ রামধারী মিশ্রর কাছে গেলে নির্ঘাত কিছু একটা গোলমাল হবে। তার যাওয়ার উদ্দেশ্যটা সে জানে। গৈরুনাথ করুণ মুখে মিনতি করতে থাকে, 'মাত্ যা দুখনিয়া, মাত্ যা উঁহা। ও আদমী আচ্ছা নেহী।'

নিজের বাপকে ভাল করেই চেনে ফেকুনাথ। চিরকালের ভীরু এবং দুর্বল। তাকে ভরসা দিয়ে বলে, 'ডরিও না। বড়ে সরকারের কাছ থেকে দু-চারটে কথা জেনে নিয়েই ফিরে আসব।'

ম্যাট্রিক পাশ 'লিখিপড়ি' ছেলেকে আর কিছু বলতে সাহস হয় না গৈরুনাথের। ঢোক গিলে সে শুধু বলে, 'একগো বাত—'

'কী?'

'মাস্টারজিকে নিয়ে তুই বড়ে সরকারের কাছে যা।'

মনে মনে হাসে ফেকুনাথ। বাপ জানে দুবেজি ঠাণ্ডা মাথার মানুষ; তাদের প্রচণ্ড হিতাকাঙ্ক্ষী। সে সঙ্গে থাকলে হঠকারিতার বশে ফেকুনাথ এমন কিছু করতে পারবে না যাতে তার মারাত্মক ক্ষতি হয়। ফেকুনাথকে তিনি ঠিক সামলে রাখতে পারবেন। তাছাড়া দুবেজিকে মোটামুটি সমীহই করে থাকেন রামধারী মিশ্র। অন্তত বাইরে থেকে তা-ই মনে হয়। দুবেজি কাছে থাকলে যতই খেপে যান রামধারী, তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করতে পারবেন।

ফেকুনাথ বলে, 'চিন্তা নায় করনা। মাস্টারজির কথা যেতে যেতে ভেবে দেখব।'

এ সম্বন্ধে আর কিছু বলে না গৈরুনাথ।

লখিয়া বলে, 'বড়ে সরকারের কোঠিতে দের নায় করনা।'

মায়ের মনোভাবটাও বুঝতে পারে গৈরুনাথ। গৈরুর উদ্বেগ তার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। তার হয়ত ধারণা, বেশিক্ষণ রামধারীর কাছে থাকলে কথাবার্তা বেশি হবে। বেশি কথা বললে মুখ থেকে বেফাঁস কিছু কি আর বেরুবে না? তার প্রতিক্রিয়া কী হবে কে জানে। ফেকুনাথ বলে, 'নানা, দেরি করব না। তোমরা ভেবো না।'

গৈরুনাথ এবার বলে, 'মধিপুরা থেকে ফিরে খেতিতে এসে আমাকে সব বলে যাস।'

ফেকুনাথ আশ্বস্ত করা সত্ত্বেও গৈরু খুব যে একটা ভরসা পেয়েছে, এমন মনে হয় না। রামধারী মিশ্রর কোঠি থেকে ছেলে না ফেরা পর্যন্ত সে যে ভয়ে উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে থাকবে, সেটা বোঝা যায়। অগত্যা ফেকুনাথকে বলতে হয়, 'ঠিক হ্যায়। মধিপুরায় কী হল না হল, সব তোমাকে জানিয়ে যাব।'

গৈরুনাথ উত্তর দেয় না।

ফেকুনাথ আবার বলে, 'এত ডরপোক কেন তুমি? সিনায় থোড়েসে সাহস আনো।'

এবারও চুপ করে থাকে গৈরুনাথ।

আরো খানিকটা এগিয়ে পাক্কী থেকে ডান দিকে রামধারী মিশ্রর সুবিশাল শস্যক্ষেত্রে নেমে যায় লখিয়া এবং গৈরুনাথ। আর পাকা সড়ক ধরে বরাবর হাঁটতে থাকে ফেকুনাথ।

বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর বইহারিতে পৌঁছুনো গেল। সেখানে এসে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ে ফেকুনাথ। লখিয়া এবং গৈরু বার বার তাকে দুবেজিকে সঙ্গে করে মধিপুরায় যেতে বলেছে। মাস্টারজিও সেদিন বলেছিলেন, সে যেন একা একা রামধারী মিশ্রর কোঠিতে না যায়।

স্কুলে গিয়ে দুবেজিকে কি ডেকে আনবে? এক মুহূর্ত ভাবে ফেকুনাথ। পরক্ষণেই স্থির করে ফেলে, একাই যাবে। মাস্টারজি সঙ্গে থাকলে অনেক কথাই রামধারীকে বলতে পারবে না। লম্বা লম্বা পা ফেলে আবার সে হাঁটতে থাকে।

মধিপুরায় রামধারী মিশ্রর বিরাট বাড়ির প্রকাণ্ড গেটটার কাছে ফেকুনাথ যখন পৌঁছয়, অঘ্রাণের কুয়াশা কেটে গেছে। চড়তি সূরয পুব আকাশের ঢাল বেয়ে বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। গোটা উত্তর বিহারের ওপর দিয়ে সোনালি রোদের ঢল বয়ে যাচ্ছে। তবে সে রোদে শীতের বাতাসকে তাতিয়ে তোলার মতো তেজ বা উষ্ণতা নেই। এই মুহূর্তে অন্য সব দিনের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে পরদেশি শুগা দূর শস্যক্ষেত্রের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

গলায় টোটার মালা ঝুলিয়ে গেটের কাছে দারোয়ান পাহারা দিচ্ছিল। ফেকুনাথকে দেখেই সে চিনে ফেলে। বলে, 'কী চাই?'

ফেকুনাথ বলে, 'বড়ে সরকারের সঙ্গে দেখা করব।'

মুখটা বাড়ির ভেতর দিকে ফিরিয়ে দারোয়ান চেঁচায়, 'দর্শনমাঙোয়া আয়া হ্যায় হুজৌর।'

গেটের বাইরে থেকে দেখা যায় না, তবু ফেকুনাথ বুঝতে পারে শ্বেত পাথরের সেই বারান্দায় গদি মোড়া চেয়ারে কাত হয়ে পড়ে আছেন রামধারী মিশ্র।

দারোয়ানের চিৎকার শেষ হতে না হতেই রামধারী মিশ্রর গলা ভেসে আসে, 'কৌন?'

দারোয়ান হাঁকে, 'গৈরু চামারিয়াকা ম্যাট্রিক পাশ লেড়কা।'

'আসতে দাও—'

ঘাড় ফিরিয়ে চোখের ইশারায় ফেকুনাথকে বাড়ির ভেতর যেতে বলে দারোয়ানটা।

গেটের ওধারে যেতেই সেদিনের সেই চেনা দৃশ্য চোখে পড়ে। দামি বালাপোষ গায়ে জড়িয়ে আর্মচেয়ারে শুয়ে আয়েশ করে শীতের রোদ পোহাচ্ছেন রামধারী মিশ্র। তাঁর এক হাতের কাছে ফরশির নল, আরেক হাতের সামনে রুপোর রেকাবিতে পেস্তা বাদাম আখরোট এবং কিসমিস।

একটা নৌকর সেদিনের মতোই বারান্দার একধারে পাখিদের দানা খাওয়াচ্ছে, আর এক নৌকর বারান্দার নিচের ফাঁকা জায়গায় মোটর ধুয়ে সাফসুতরো করে রাখছে।

যে দুর্জয় সাহস নিয়ে ফেকুনাথ মনচনিয়া থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, গেট পেরুবার পর তার অর্ধেকটা উবে যায়। দুর্গের মতো এই প্রকাণ্ড বাড়ি, গেটে বন্দুকওলা দারোয়ান, গণ্ডা গণ্ডা নৌকর, মোটর, পাখিদের দানা খাওয়া, শ্বেত পাথরের মস্ত বারান্দা, রামধারী মিশ্রর গম্ভীর নির্দয় মুখ—সব মিলিয়ে আবহাওয়াটা এমন যা ফেকুনাথের মনের জোর অনেকখানি ধসিয়ে দেয়। সেদিন তবু দুবেজি সঙ্গে ছিলেন। ভীরু হলেও গৈরুনাথ তার কাছাকাছি থেকেছে। কিন্তু আজ সে একা, একেবারে একা।

হঠাৎ তার মনে হয়, দুবেজিকে ডেকে নিয়ে এলেই ভাল হত। কিন্তু এখন আর তার উপায় নেই।

ভেতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ফেকুনাথ। দূর থেকে রামধারী ডাকেন, 'কা রে, কা হুয়া? দেখা করতে এসে ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি যে। নজদিগ আ যা—'

গলার স্বর শুনে মনে হয় না, সকাল বেলায় তাকে দেখে অখুশি হয়েছেন রামধারী মিশ্র। ভেতরে ভেতরে একটু ভরসা পায় ফেকুনাথ। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সে। বারান্দার কাছে এসে যান্ত্রিক নিয়মে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রামধারীকে প্রণাম করে যখন সে উঠে দাঁড়ায়, তার বুকের ভেতরটা টিপ টিপ করতে থাকে।

মধিপুরায় আসার সময় রাস্তায় অনেক কথাই ভেবে রেখেছিল ফেকুনাথ। সেদিন বাপের ইঙ্গিতে রামধারীকে প্রণাম করতে হয়েছে। আজ সে কিছুতেই মাথা নোয়াবে না। বড়জোর হাতজোড় করে ভদ্রতার খাতিরে একটা 'নমস্তে' বলবে। প্রথমেই মাথা নুইয়ে দিলে কারুর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস থাকে না। কিন্তু নিজের অজান্তে মুখ থেকে একটাও কথা বেরুবার আগেই সে প্রণাম করে ফেলল। ফেকুনাথ জানে না, পুরুষানুক্রমে তার বাপ, দাদা, দাদার বাপ রামধারীদের কাছে মাথা নুইয়ে আসছে। এটা যেন ধর্মপালনের মতো একটা প্রথা। নিজের রক্তের মধ্যে বংশগত সেই প্রথা নিয়েই আর দশটা ভূমিহীন অচ্ছুতের মতো এই পৃথিবীতে জন্মেছে ফেকুনাথ। রক্তস্রোত থেকে এই রীতিকে মুছে দেওয়া এত সহজ নয়।

রামধারী শুধোন, 'তোদের খবর কী বল—'

ফেকুনাথ বলে, 'ভাল।'

'তোর মায়ের জ্বর হয়েছিল না? এক রোজ খেতিতে আসতে পারে নি। এখন কেমন আছে?'

লখিয়ার বুখারের খবরটা রামধারী মিশ্রর কাছে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে সেটা তাঁর মনে আছে। ফেকুনাথ বলে, 'হাসপাতালের দাওয়াই খেয়ে মা এখন ভাল আছে, রোজ খেতিতে যাচ্ছে।'

রামধারী অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে এবার প্রশ্ন করেন, 'তোরা ক' ভাইবোন?'

'চার।'

'তুই তো বড়?'

'হাঁ।'

'বাকি চারটে কী করে?'

'বাপু মাস্টারজির স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। পড়ে—'

আর্ম চেয়ারের ডান ধারে অনেকটা কাত হয়ে রামধারী ভুরু কুঁচকে এবার শুধোন, 'তোর বাপ গৈরু চামারিয়ার মতলব কী রে?'

প্রশ্নের উদ্দেশ্যটা সঠিক বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে ফেকুনাথ।

রামধারী তার মনোভাবটা বুঝতে পেরেছিলেন। বলেন, 'কা রে, সমঝা নেহী?'

'নেহী।' আস্তে মাথা নাড়ে ফেকুনাথ।

'তোর বাপ বোধ হয় ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেট দিয়ে ঘর ভরে ফেলতে চাইছে। বেটোয়া-বেটিয়াদের (ছেলেমেয়েদের) পণ্ডিত বানিয়ে বামহন-কায়াথের কান কাটবার ধান্দা।' মোটা দাগের রসিকতা করে রামধারী গা দুলিয়ে দুলিয়ে হেসে ওঠেন।

লোকটার হাসির ভঙ্গি এমনই জঘন্য যাতে মাথায় আগুন ধরে যায় ফেকুনাথের। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কিছু করার সাহস নেই তার। মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বার না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সে।

হাসি থামিয়ে রামধারী একসময় শুধোন, 'হিন্দু মিশনের দুই সন্ন্যাসী এদিকের গাঁওগুলোতে ঘুরছেন। তোদের গাঁওয়ে গেছেন?'

ফেকুনাথ আস্তে করে বলে, 'নেহী। তবে আশেপাশের গাঁওগুলোতে যাচ্ছেন।'

'সেখানে গিয়ে কী করছেন, কী বলছেন, খবর রাখিস?'

'হাঁ।'

'কী বলছেন?'

'হিন্দু ধরম সম্বন্ধে অনেক ভাল কথা বলছেন। সবাইকে এই ধরম ছাড়তে না বলছেন।'

'ওঁদের কথা মনে রাখিস। তোদের গাঁওয়ে ওঁরা যখন যাবেন খাতিরদারি করিস। ওঁরা যেভাবে যা করতে বলেন তা-ই করবি।' রামধারী বলতে থাকেন, 'তুই নিজে তো 'লিখিপড়ি' ম্যাট্রিক পাশ। তুইও লোককে বোঝাস, আপনা ধরম ছেড়ে অন্য ধরম নেওয়া ভাল নয়। হিন্দু ধরম বহুত বড়া ধরম। মহান ধরম।'

এখানে ধর্ম নিয়ে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শুনতে আসে নি ফেকুনাথ। সে চুপ করে থাকে।

একমুঠো পেস্তাবাদাম মুখে পুরে রামধারী মিশ্র একটু পর জিজ্ঞেস করেন, 'আমার খামারে কবে থেকে বসছিস?'

খামারের কাজ নিয়েই সেদিন একটা মারাত্মক কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছিল। রামধারী মিশ্র খেপে গিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু ঘটার আগেই শিউশঙ্কর ঝা এসে পড়ায় ব্যাপারটা বেশি দূর গড়াতে পারে নি।

ফেকুনাথ তার অবশিষ্ট সাহসটুকু একসঙ্গে জড়ো করে বলে, 'হুজৌর, সেদিনই তো আপনাকে বলে গিয়েছিলাম, নৌকরি করলে সরকারি নৌকরিই করব। আমি সে জন্যে আসিনি।'

সেদিন এবং আজ, দু দু'দিন এই দুর্বিনীত ঠেটা 'চামারকা ছৌয়া'র দুঃসাহস দেখলেন রামধারী। আস্তে আস্তে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসেন তিনি। চোয়াল ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠতে থাকে। চোখের সাদা রংটা বদলে গিয়ে রক্তবর্ণ হয়ে উঠে। তবু তিনি পুরোপুরি ধৈর্য হারান না। শুধু দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, 'তোদের বাপ-দাদাদের নৌকরির কথা বললে কী করত জানিস?'

'জানি। লেকেন—'

'কা?'

'আপনাকে আগেও যা বলেছি এখনও তাই বলছি। নৌকরি করলে সরকারি নৌকরি ছাড়া আর কিছু করব না।' বলে একটু দম নিয়ে ফেকুনাথ ফের শুরু করে, 'আমি অন্য কাজে আপনার কাছে এসেছিলাম বড়ে সরকার। যদি দয়া করে একটু শোনেন—'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায় রামধারী মিশ্রর। চোখ কুঁচকে কী যেন ভাবেন। তারপর বলেন, 'সেদিন কী একটা হিসেবের কথা বলছিলি। সেই কথাই বলবি তো?'

'হাঁ।'

'বলে ফেল।'

মনে মনে অনেকখানি সাহস এবং জোর সংগ্রহ করে ফেকুনাথ বলে, 'আমার বাপু অঙ্গুঠার ছাপ মেরে আপনার কাছ থেকে শও রুপাইয়া করজ নিয়েছিল।'

ভুরু কুঁচকে যায় রামধারীর। বলেন, 'হাঁ, নিয়েছিল। তাতে কী হয়েছে?'

'আপনার কাছে করজপত্রটা আছে?' ফেকুনাথ শুধোয়।

রামধারী মিশ্র ফরশির নল নামিয়ে রেখে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসেন। কর্কশ গলায় বলেন, 'আছে।'

'আমাদের জমিনের কিওয়ালাটাও তো আপনি রেখে দিয়েছেন।'

'আমি রাখব না তো কে রাখবে? তোরা?'

ফেকুনাথ উত্তর দেয় না।

রামধারী ফের রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করেন, 'কিওয়ালা আর করজপত্র দিয়ে কী হবে? কা জরুরত?'

ফেকুনাথ বলে, 'ও দুটো আমি দেখতে চাই। আর দেখতে চাই সেই হিসেবটা।'

রামধারী বলেন, 'কোন হিসেব?'

প্রচণ্ড সাহসে ফেকুনাথ বলে, 'শও রুপাইয়া করজে কত সুদ চড়লে পন্দ্র বিঘা জমিন আপনি ছিনিয়ে নিতে পারেন সেই হিসেব।'

চামারের ছৌয়ার অসীম স্পর্ধায় একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান রামধারী মিশ্র। প্রায় ষাট বছরের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা তাঁর সম্পূর্ণ নতুন। অনেকক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কথা সরে না। তারপর বলেন,

'তুই দেখতে চাইছিস, জরুর দেখাব। তবে একটা কথা—'

'কী কথা?'

'যদি না দেখাই তুই কী করতে পারিস?'

আচমকা মাথার ভেতর কোথায় যেন একটা শিরা ছিঁড়ে যায় ফেকুনাথের। অন্ধের মতো সে যা বলে যায় তা এইরকম। হুজৌর, শিডিউল্ড কাস্ট আর শিডিউল্ড ট্রাইবদের স্বার্থ দেখার জন্য এম. এল. এ. আছে, এম.পি আছে, মন্ত্রী আছে, অ্যাসেম্বলি আছে। পাঁচ সাল পর পর ভোটের জন্য আমাদের কাছে সবাইকে হাত পাততে হয় তো। এক নিঃশ্বাসে ফেকুনাথ বলে যেতে থাকে, 'সবার ওপর আছে কানুন। হুজৌর, করজপত্র আর কিওয়ালা না দেখিয়ে পারবেন না।' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় ফেকুনাথ। এমন মারাত্মক সাহস তার মধ্যে যে কী করে এল, সে ভেবে পায় না।

রামধারী মিশ্র প্রথমটা থ হয়ে যান। চামারের ছৌয়া যা যা বলল, নিজের কানে সব শুনেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয় কোনো বিশ্রী ঝুটা স্বপ্নের মধ্যে কথাগুলো শুনেছেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন রামধারী। পরক্ষণেই বিস্ফোরণ ঘটে। এম.এল.এ, এম.পি'দের সম্পর্কে অকথ্য দেহাতী খিস্তি দিয়ে রামধারী বলেন, 'আমার মুখ দিয়ে যখন বেরিয়েছে তখন একবারই তোকে কিওয়ালা আর করজপত্র দেখাব। তবে তোদের জমিন যখন আমার পেটে ঢুকেই গেছে তখন ওটা আমার পেটেই থাকবে। তোদের এম.এল.এ, এম.পি বাপদের গিয়ে বলিস, তারা পারলে যেন জমিনটা খালাস করে তোদের ফেরত দেয়। স্বাধীন ভারতের কানুন দেখাতে এসেছে আমাকে!' একটু থেমে বলেন, 'যা, টেড়ারামের সঙ্গে দেখা কর। ওর কাছে সব কাগজপত্র আছে।'

ফেকুনাথ আর দাঁড়ায় না। রামধারীর উদ্দেশে মাটিতে আরেক বার মাথা ঠেকিয়ে কোঠির পেছন দিকে চলে যায়।

আট

টেড়ারাম সহায় রামধারী মিশ্রর মুনশি। তার কাছে খাতকের যাবতীয় ঋণপত্র এবং দলিল দস্তাবেজ থাকে। রামধারীর এসব কাজের পুরো দায়িত্ব দেওয়া আছে টেড়ারামকে।

ফেকুনাথ টেড়ারামকে চেনে। এ বাড়ির পেছন দিকে একটা মাঝারি মাপের মজবুত টিনের ঘরে তার দপ্তর। টেড়ারাম অবশ্য বলে 'হেড আপিস'।

টেড়ারাম মুনশিকে তার দপ্তরে বা 'হেড আপিসে' পাওয়া যায়। সিড়িঙ্গে গাঁটপাকানো চেহারা তার, পিঠ ধনুকের মতো বাঁকানো। লোকটার গায়ে মাংসের চেয়ে হাড় বেশি। নাক শুগার ঠোঁটের মতো বেঁকে ঝুলে আছে। চারকোনা মুখ, ছোট ছোট গোলাকার চোখে ধূর্ত চাউনি। দেখেই মনে হয়, মানুষের চেহারায় একটা ধড়িবাজ শিয়ার।

টেড়ারামের পরনে মোটা হেটো ধুতি আর খেলো খদ্দরের পাঞ্জাবি, তার ওপর তুষের চাদর। পায়ে কাঁচা চামড়ার ভারি নাগরা।

লোকটা জাতে কায়াথ কিন্তু শাক্যদ্বীপী বামহনের কাছে নৌকরি করে করে ব্রাহ্মণত্বের কিছু কিছু অভ্যাস রপ্ত করে ফেলেছে। রামধারী মিশ্রর দেখাদেখি সে টিকি রাখে এবং কপালে সরু করে তিন লাইন চন্দন লাগায়।

যে ঘরটায় সে বসে আছে সেখানে তিনটে দেওয়াল ঘেঁষে কমসে কম সাত-আটটা পুরনো আমলের ভারি ভারি কাঠের সিন্দুক। ফেকুনাথ জানে, এই সিন্দুকগুলো এ অঞ্চলের গরিব অচ্ছুৎদের কিওয়ালা এবং করজপত্রে ঠাসা। টেড়ারাম সহায় যখের মতো এগুলো আগলে বসে আছে কত কাল ধরে।

এ ঘরে চেয়ার টেবল নেই। নিচু তক্তাপোষে ময়লা ফরাসের ওপর কাঠের ডেস্ক পাতা। ডেস্কে ঝুঁকে লম্বা শালুতে মোড়া খাতায় কী যেন লিখে যাচ্ছে টেড়ারাম। গোলাকার নিকেলের চশমা তার

নাকের ডগায় নেমে এসেছে।

ফেকুনাথ ডাকে, 'মুনশিজি—'

চমকে মুখ তোলে টেড়ারাম। বলে, 'কৌন?'

'আমি ফেকুনাথ।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে টেড়ারাম। তারপর যেন চিনতে পেরেছে, এমন ভঙ্গিতে বলে, 'অ, গৈরু চামারিয়াকা ম্যাট্রিক পাশ বেটোয়া!'

চামারের ছেলে হওয়াটা ফেকুনাথের পক্ষে অগৌরবের কিছু নয়। বরং সেটাই তার আসল পরিচয়। কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেরা এমনভাবে 'চামারিয়াকা ছৌয়া' বা 'চামারিয়াকা বেটোয়া' কথাটা উচ্চারণ করে যাতে প্রচণ্ড ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য মেশানো থাকে। শুনতে শুনতে মাথার ভেতর রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে ফেকুনাথের। কিন্তু তারা দুর্বল, তারা গরিব, তারা অসহায়। গলা চড়িয়ে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা বা সাহস কোনোটাই তাদের নেই। ভেতরে ভেতরে খেপে গেলেও তাদের মুখ বুজেই থাকতে হয়। ফুটন্ত রাগটা সামলে ফেকুনাথ নীরস গলায় উত্তর দেয়, 'হাঁ।'

'কা মাঙ্‌তা?'

টেড়াবাম মুনশি শিয়ারের চেয়েও চতুর এবং লাকরার চাইতেও মারাত্মক জীব। রামধারী মিশ্রর স্বার্থরক্ষার জন্য লোকের ঘরে আগুন দেওয়া থেকে শুরু করে খুন পর্যন্ত করাতে পারে। অত্যন্ত সতর্কভাবে ফেকুনাথ বলে, 'বড়ে সরকার আপকো পাস ভেজা হ্যায়।'

'কায় (কেন)?' চশমার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় মুনশি টেড়ারাম।

কী উদ্দেশ্যে টেড়ারামের কাছে এসেছে, সবিনয়ে তা জানিয়ে দেয় ফেকুনাথ।

টেড়ারামের চোখ আরো ধারাল হয়ে ওঠে। সে বলে, 'করজপত্র আর কিওয়ালা দেখবি? কী হবে দেখে?'

'দেখার ইচ্ছে হয়েছে। বাপ-দাদার জমিন তো।' ফেকুনাথ বলে।

কথাটা হয়ত মনে ধরে টেড়ারামের। একটু কী ভাবে সে। তারপর বলে, 'থোড়া ঠহর্ যা—' বলতে বলতে উঠে গিয়ে একটা সিন্দুক খুলে পোকায়-কাটা পুরনো একটা দলিল আর অঙ্গুঠা বা বুড়ো আঙুলের ছাপ-মারা একটা ময়লা জীর্ণ ঋণপত্র বার করে মেঝেতে রাখে টেড়ারাম। কোথায় কোন সিন্দুকে কার দলিল বা ঋণপত্র রয়েছে, চোখ বুজে বলে দিতে পারে সে।

মেঝেতে রাখার কারণ হল, টেড়ারামের ছুঁয়াছুতের বিচারটা একটু বেশিই। চামারেব ছৌয়াকে কোনোমতেই ফরাস ছুঁতে দেওয়া যায় না। ছুঁলে সব ধুয়ে শুধ্ করতে হবে। নিজের হাতে যে দেবে তারও উপায় নেই। ফেকুরামের হাতে হাত ঠেকে গেলে এই শীতের সকালে তাকে নাহানা করে পবিত্র হতে হবে। তবে চামারের ছেলে দলিল বা করজপত্র ছুঁলে দোষ নেই; কাগজে ছুঁয়াছুতের দোষ লাগে না।

সন্তর্পণে কিওয়ালা আর করজপত্র তুলে নেয় ফেকুনাথ। আস্তে আস্তে দলিলের ভঙ্গুর পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে সে দেখে, পনের বিঘা নয়, পুরা বাইশ বিঘা তের কাঠা পনের ধুর (ধুর হল এক কাঠার বিশ ভাগের এক ভাগ) জমি ছিল তাদের।

কিওয়ালা পড়া হয়ে গেলে করজপত্রটা দেখতে থাকে ফেকুনাথ। টাকা প্রতি দৈনিক এক টাকা সুদে রামধারী মিশ্রর কাছ থেকে নগদ একশ টাকা করজ নিয়েছে গৈরুনাথ। এখন থেকে সতের সাল আগের একটা তারিখ দেওয়া আছে। অর্থাৎ ওই তারিখেই ঋণটা দেওয়া হয়েছে। লেখাটার নিচে বাঁ ধারে কয়েকজন সাক্ষীর সই এবং ঠিকানা, ডান দিকে অঙ্গুঠার ছাপ। দীর্ঘ সতের বছরে ছাপটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

করজপত্রটা দেখতে দেখতে মাথায় আগুন ধরে যায় ফেকুনাথের। এই বিপুল পৃথিবীতে বিহারের এক প্রান্তে পূর্বপুরুষের যে জমিটুকু তাদের ছিল, এই পুরনো জীর্ণ একফালি কাগজের জোরে কেড়ে নিয়েছেন রামধারী মিশ্র। ফেকুনাথের ইচ্ছা হয় কাগজটা ছিঁড়ে এখনই টুকরো টুকরো করে ফেলে। কিন্তু অতটা সাহস হয় না।

টেড়ারাম বলে, 'কি রে, দেখা হল?'

শুকনো মুখে ফেকুনাথ জবাব দেয়, 'হাঁ মুনশিজি—'

'অ্যায়সা অ্যায়সা জমিন ছিনকে নেহী লিয়া। দস্তুরমতো কানুন মেনে লেখাপড়া করে তবে তোদের জমিনে হাত দিয়েছি। কেউ বলতে পারবে না তোর বাপকে ঠকিয়েছি। কিওয়ালা আর করজপত্র নিজের আঁখে দেখলি। মনমে সন্তোষ হুয়া তো?' বলে ফেকুনাথের মুখের দিকে তাকায় টেড়ারাম মুনশি।

ফেকুনাথ উত্তর দেয় না।

মেঝের দিকে আঙুল বাড়িয়ে টেড়ারাম এবার বলে, 'কাগজগুলো ওখানে রাখ।'

দলিলগুলো রাখতে রাখতে ফেকুনাথ শুধোয়, 'এক রুপাইয়ায় রোজ এক রুপাইয়া। এত চড়া সুদের কথা আমি জীবনে কখনও শুনিনি মুনশিজি—'

'ম্যাট্রিক পাশ করলেই দুনিয়ার সব কিছু জানা যায়, না শোনা যায়?' টেড়ারামের গলার স্বর বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

ম্যাট্রিক পাশ করে যেন দুর্দান্ত গর্হিত কাজ করে ফেলেছে ফেকুনাথ। অন্তত টেড়ারাম বা রামধারী মিশ্রর কথা শুনলে তাই মনে হয় তার। ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠলেও বিনীত ভঙ্গিতেই সে বলে, 'ঠিকই বলেছেন। ম্যাট্রিকের বইতে এসব লেখা নেই।'

ছোঁ মেরে দলিল এবং ঋণপত্র তুলে নিয়ে কাঠের সিন্দুকে পুরতে পুরতে টেড়ারাম বলে, 'তবেই বোঝ।'

যা দেখতে এসেছিল দেখা হয়ে গেছে। তবু যায় না ফেকুনাথ। বলে, 'একগো বাত মুনশিজি—'

'কা?'

'ম্যাট্রিকের বইতে এসব যে নেই তা আপনি জানলেন কী করে? আপনি কখনও ম্যাট্রিকের বই দেখেছেন?' সবিনয়ে অত্যন্ত ভালমানুষের মতো মুখ করে শুধোয় ফেকুনাথ।

চামারের ছৌয়াটা কি তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে? ফেটে পড়তে গিয়েও কী ভেবে নিজেকে সামলে নেয় টেড়ারাম। তার চোখমুখ অবশ্য কুঁচকে যেতে থাকে। বেজায় বিরক্ত মুখে সে বলে, 'কিওয়ালা দেখলি, করজপত্র দেখলি। আবার দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমার জরুরি কাম আছে। যা, ভাগ—'

ফেকুনাথ বলে, 'আমার আরেকটা কথা আছে।'

'আবার কী কথা?'

মনের সমস্ত জোর একসঙ্গে জড়ো করে ফেকুনাথ বলে, 'আমাদের জমিনটা ফেরত চাই—'

শুনেও যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না টেড়ারাম। বলে, 'কী বললি?'

ফেকুনাথ বলতে থাকে, 'কেত্তে রুপাইয়া দিলে জমিনটা পাওয়া যাবে বলে দিন। একসাথ পুরাটা দিতে পারব না। হর সাল ধান গেঁহু উঠলে কিছু কিছু করে শোধ করব।'

আকাশ থেকে আচমকা সূরয খসে পড়লেও এতটা চমকে উঠত না টেড়ারাম মুনশি। বলে কি চামারের বেটোয়া! আস্তে আস্তে চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে যায় তার। চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'জমিন ফেরত নিতে চাস?'

'আমরা বহোত গরিব। বড়ে সরকারের কত খেতি। তেতরিয়া থেকে সোনারি পর্যন্ত সব জমিনই তো তাঁর। আমাদের এতটুকু মিট্টি কিরপা করে বড়ে সরকার ছেড়ে দিলে বেঁচে যাই।'

টেড়ারাম একটু চিন্তা করে বলে, 'মালিক কিরপা করতে পারে যদি পুরা সুদসুদ্ধ শও রুপাইয়া ওয়াপস করিস।'

বুক শুকিয়ে যায় ফেকুনাথের। ঢোক গিলে বলে, 'কত সুদ হয়েছে?'

তীব্র ব্যঙ্গের সুরে টেড়ারাম মুনশি বলে, 'ম্যাট্রিক পাশ করে এলি। এত্তে 'লিখিপড়ি' পণ্ডিত হয়েছিস! রোজ এক রুপাইয়ায় এক রুপাইয়া সুদ হলে সতের সালে কত দাঁড়িয়েছে, ঘরে গিয়ে হিসেবটা করে দ্যাখ। তারপর পুরা টাকাটা নিয়ে আসবি। এক হাতে রুপাইয়া নিয়ে আরেক হাতে কিওয়ালা আর করজপত্র ফেরত দেব। সমঝা?'

মনে মনে টাকার অঙ্কটা আন্দাজ করে ভীষণ ঘাবড়ে যায় ফেকুনাথ। এই নিরুত্তাপ শীতের সকালেও

গল গল করে ঘামতে থাকে সে। বলে, 'এত্তে রুপাইয়া কোথায় পাব মুনশিজি?'

'সে চিন্তা তোদের। না দিতে পারলে বড়ে সরকারের কিরপাও মিলবে না। যা, ভাগ—

'মুনশিজি—'

'যা, ভাগ।'

'একগো বাত শুনিয়ে না।'

'যা, ভাগ চামারকা ছৌয়া। জমিন ওয়াপস লেনে আয়া!' টেনে টেনে বলে যায় টেড়ারাম।

হঠাৎ ভয় কেটে দুর্জয় সাহস ভর করে ফেকুনাথের ওপর। সে গলা চড়িয়ে বলে, 'দুনিয়ার কোথাও সুদের এত ভাও নেই।'

'ধরে নে এটা দুনিয়ার বাইরের জায়গা।'

ফেকুনাথ বলে, 'আপনারা আমার আনপড় বাপুকে ঠকিয়ে জমিন ছিনিয়ে নিয়েছেন। এ জবরদস্তি আমি মানব না। কিছুতেই না—'

এবার ভয়ানক খেপে যায় টেড়ারাম। গলার নলি ছিঁড়ে চিৎকার করতে করতে বলে, 'চামারকা ছৌয়ার ডানা গজিয়েছে। মরবি তুই, জরুর মরবি। তোর বুকে শুখা চানা দিয়ে আমি ডলব। যা, আভি নিকাল যা—'

রাগে অপমানে চোখমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে ফেকুনাথের। সে বলে, 'ঠিক হ্যায়। এখন আমি যাচ্ছি। লেকেন নায় ছোড়েগা। দো-চার রোজের মধ্যে আবার আমি আসছি।'

টেড়ারামের 'হেড আপিস' থেকে বেরিয়ে বাড়ির সামনের দিকে আসতেই বিরাট তোড়জোড় চোখে পড়ে ফেকুনাথের। দুটো পুরনো মডেলের ফোর্ড গাড়ি বাইরে বেরুবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটাতে রানীখেতের হিন্দু মিশনের দুই সন্ন্যাসী আত্মানন্দ প্রাণানন্দ ছাড়াও আরো জনতিনেক নতুন সন্ন্যাসী বসে আছেন। অন্যটায় তিন চারজন সঙ্গী নিয়ে রামধারী মিশ্র উঠছেন। বোঝা যাচ্ছে, এ অঞ্চলের ধরম বদলের যে ঘটনাগুলো ঘটছে তা নিয়ে তিনি খুবই ব্যস্ত এবং সেই ব্যাপারেই সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। যে ভাবেই হোক, এদিকের গ্রামগুলোতে হিন্দুধর্মের ক্ষয় এঁরা ঠেকাবেনই। ধর্মবদল বন্ধ করার প্রতিজ্ঞা তাঁদের।

ফেকুনাথের ইচ্ছা ছিল, তাদের জমির বিষয়ে রামধারী মিশ্রর সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব না।

রামধারী মিশ্র গাড়িতে উঠে বসতেই ড্রাইভার স্টার্ট দেয়। দুটো গাড়িই পর পর গেট পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামে।

রামধারী ফেকুনাথকে লক্ষ করেননি।

মধিপুরা গাঁ থেকে বেরিয়ে পাক্কীতে এসে অবাক হতে হয় ফেকুনাথকে। গৈরুনাথ উদ্বিগ্ন মুখে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা তার সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার। রামধারী মিশ্রর জমিতে ধান কাটার মতো অত্যন্ত জরুরি এবং মহৎ কাজ ফেলে সে যে এভাবে চলে আসবে তা যেন ভাবা যায় না। এতখানি সাহস তার কিভাবে হল তা-ই বা কে জানে।

ফেকুনাথ অবাক বিস্ময়ে শুধোয়, 'এ কি, তুমি এখানে!'

গৈরুনাথ বলে, 'কা করে! তুই বড়ে সরকারের কোঠিতে গেলি তখন। হামনি বহোত ডর গিয়া থা।'

'ডরনেকো কা হ্যায়?'

উত্তর না দিয়ে গৈরুনাথ ভয়ার্ত মুখে শুধোয়, 'বড়ে সরকার তোকে মারে নি তো?'

হাঁ করে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে ফেকুনাথ। পরক্ষণেই কী চোখে গৈরুনাথ রামধারীকে দেখে সেটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সে বলে, 'মারবে কেন? দেখা করতে গেলে কেউ মারে নাকি?'

ফেকুনাথ বলা সত্ত্বেও খুব সম্ভব পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারে না গৈরুনাথ। তার চোখ দুটো

ক্রমাগত ছেলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আঘাতের চিহ্ন খুঁজতে থাকে।

ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হয় না ফেকুনাথের। সে মজা করে বলে, 'কী খুঁজছ?'

গৈরুনাথ থতমত খেয়ে যায়। বলে, 'কুছ নায়। অ্যায়সাই—'

ফেকুনাথ হেসে ফেলে, 'আরে বাবা, সত্যিই ওরা মারে নি। আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না?'

গৈরুনাথ জবাব দেয় না। একটু চুপ করে থেকে শুধোয়, 'ওখানে কী হল এতক্ষণ?'

ফেকুনাথ লবলে, 'কিছুই হয় নি। আমাদের জমিনের করজপত্র আর কিওয়ালা দেখে এলাম।'

একটু ভীরু আশা দেখা দেয় গৈরুনাথের মনে। সে জিজ্ঞেস করে, 'কি রে, জমিটা ওয়াপস হবে?'

'দেখি কী হয়। তুমি তো চড়া সুদে রুপাইয়া এনে আমাদের সর্বনাশ করে এসেছ।'

মুহূর্তে আশাটুকু বিলীন হয়ে যায় গৈরুনাথের। সে আর কিছু বলে না।

ফেকুনাথ কী একটু ভেবে বলে, 'তোমার সাহস তো কম না বাপু।'

গৈরুনাথ হকচকিয়ে যায়, 'কেন, কী হয়েছে?'

'জমিনের কাজ ছেড়ে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ যে?'

'কা করে! তোর জন্যে ডর খেয়ে গেলাম যে।'

তার জন্য বাপের উদ্বেগটুকু ভালই লাগে ফেকুনাথের। সে বলে, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? চল—'

পাকা সড়ক ধরে দু'জনে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে ফেকুনাথ বলে, 'বড়ে সরকার জমিন ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি সহজে ছাড়ছি না।'

নয়

আজ মনচনিয়া গাঁ জুড়ে প্রবল উত্তেজনা।

কাল রাত্তিরে মধিপুরা থেকে রামধারী মিশ্র লোক পাঠিয়েছেন। খবর দিয়েছেন, আজ সকালের দিকে রানীখেত মিশনের দুই সন্ন্যাসী আত্মানন্দ এবং প্রাণানন্দ আসবেন। তাঁদের খাতিরদারির জন্য তিনি মনচনিয়া গাঁয়ের অচ্ছুৎদের পুরোপুরি ছুটি দিয়েছেন। আজ তাদের আর ধান কাটাইয়ের জন্য মাঠে যেতে হবে না। আচমকা এই ছুটি পাওয়াটা তাদের এত উত্তেজনার হেতু।

রামধারীর লোকটা আরো জানিয়ে গেছে, আজ কেউ যেন রসুই (রান্না) না চাপায়। এর কারণটা অবশ্য বার বার জিজ্ঞেস করেও জানা যায় নি। লোকটা শুধু বলেছে, এ ব্যাপারে যা জানাবার আজ জানানো হবে।

অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তা, বিস্ময় এবং কৌতূহলের মধ্যে কালকের রাতটা কেটেছে মনচনিয়ার বাসিন্দাদের। বলা যায়, কাল ভাল করে কেউ ঘুমোতে পর্যন্ত পারে নি। আজ সকালে সূরয উঠবার আগেই গাঁয়ের প্রতিটি মানুষ দীর্ঘকালের অভ্যাসে উঠে পড়েছিল। তারপর কালকের বাসি পানিপাত্তা বা ঘাটো খেয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে সুদূর পাক্কীর দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

সামনের দিকে এখন যতদূর তাকানো যায়, গাছপালা শস্যক্ষেত্র আকাশ—সব কিছু গাঢ় কুয়াশায় মোড়া। সমস্ত চরাচর নিঝুম এবং আচ্ছন্ন হয়ে আছে। শুধু চারদিকের পরাস সিমার আর গোলগোলি গাছগুলোর মাথা থেকে মাঝে মাঝে ঘুমভাঙা পাখিদের ডাক ভেসে আসছে।

দেখতে দেখতে সূর্য উঠে গেল। ঘন কুয়াশা ছিঁড়ে সোনার সুতোর মতো রোদ এসে পড়তে থাকে। আরো কিছুক্ষণ পর আকাশ বা শস্যক্ষেত্রের গা থেকে সব কুয়াশা মুছে যায়। চোখে পড়ে দিগন্তের তলা থেকে সোনার প্রকাণ্ড কটোরার মতো সূর্যটা আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। শীতের মেঘশূন্য নীলাকাশ এই মুহূর্তে উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। রোদ দেখামাত্র ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি গাছপালার মাথা থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

এতক্ষণ মনচনিয়ার বাসিন্দারা যে যার ঘরের দাওয়ায় বসে ছিল। রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘর

ছেড়ে রাস্তায় নেমে থোকায় থোকায় চারদিকে জড়ো হতে থাকে। ধানকাটাই থেকে একদিনের ছুটি, রামধারী মিশ্রর আজ রসুই চড়াতে না বলা, ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে চাপা গলায় কথাবার্তা হতে থাকে।

বেলা আরো একটু চড়লে সূর্য যখন বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে সেই সময় দেখা গেল, দূরের পাক্কী থেকে চারটে বয়েল গাড়ি কাঁচা মেঠো রাস্তায় নেমে হেলেদুলে মনচনিয়া গাঁয়ের দিকে আসছে।

গাড়িগুলোকে দেখামাত্র অচ্ছুৎটুলিতে চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সবাই পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

গাড়িগুলোতে কারা রয়েছে, দূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল না। কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল, প্রথম গাড়িতে রানীখেতের দুই সন্ন্যাসী আর রামধারী মিশ্রর মুনশি টেড়ারাম সহায় বসে আছে। পেছনের গাড়িগুলোতে আরো কিছু লোকজন রয়েছে। আর আছে অনেকগুলো মুখ-আঁটা বস্তা। বস্তাগুলো নানারকম মালপত্রে বোঝাই। তা ছাড়া স্তূপাকার শুকনো লকড়িও চোখে পড়ছে।

দুই সন্ন্যাসীকে এ গাঁয়ের লোকেরা আগেই দেখেছে। কেননা এখানে না এলেও মনচনিয়ার আশেপাশের গাঁগুলোতে তাঁরা নিয়মিত যাওয়া-আসা করছেন। রামধারী মিশ্রর জমিতে ধান কাটতে কাটতে এই যাতায়াতের সময় তাঁদের লক্ষ করেছে অচ্ছুৎরা। টেড়ারাম সহায়কে এরা আজন্ম চেনে। তাছাড়া অন্য লোকগুলোও অচেনা নয়। তারা রামধারী মিশ্রর নৌকর এবং রসুইকর বামহন। গাড়িগুলো রামধারীজিরই।

টেড়ারাম সহায় বয়েল গাড়ির চালকদের উদ্দেশে বলে, 'ব্যস ব্যস, অব রুখ যা—'

গাড়োয়ানেরা জিভের ডগায় চুক চুক আওয়াজ করে এবং বয়েলগুলোর গায়ে আস্তে আস্তে চাপড় মেরে গাড়ি থামিয়ে দেয়।

এদিকে গোটা মনচনিয়া গাঁ গাড়িগুলোর কাছে ভেঙে পড়েছে। কাল রাত থেকেই সবাই উত্তেজিত ও উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। এই মুহূর্তে তাদের সেই উত্তেজনা এবং বিস্ময় দশগুণ বেড়ে গেছে। সন্ন্যাসীরা আসবেন, এটা তাদের জানাই ছিল। কিন্তু রামধারী মিশ্রর গাড়িতে চড়ে টেড়ারাম সহায়ের সঙ্গে আসবেন, এতটা ভাবা যায় নি।

এধারে টেড়ারাম গাড়িতেই উঠে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে অচ্ছুৎটুলির বাসিন্দাদের উদ্দেশে বলতে শুরু করে, 'তোদের আজ বড় সৌভাগ। দো সাধু মহারাজ এখানে কিরপা করে পায়ের ধুলো দিতে এসেছেন। তোদের আরো সৌভাগ, খুদ বড়ে সরকার রামধারীজি তাঁদের এখানে পাঠিয়েছেন। সরকার চাল দাল ঘিউ তেল সবজি উবজি সব কুছ সঙ্গে দিয়েছেন। এখানে রসুই করে ভগোয়ান রামজির নামে 'উৎসরগ' করা হবে। উসকে বাদ মহারাজেরা হিন্দু ধরমের ওপর যে আপদ আর খত্‌রা ঘনিয়ে এসেছে সে সম্পর্কে বলবেন। পরে একসাথ বসে ভোজন হবে। আজসে সব হিন্দু এক। এক হিন্দু অন্য হিন্দুর সাহারা। সমঝা—'

এত বড় বিস্ময়ের জন্য কেউ তৈরি ছিল না। এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা তাদের জীবনে কখনও ঘটে নি। বুড়হা-বুড়হীদের মুখেও এ জাতীয় ঘটনার কথা কোনোদিনই শোনে নি তারা। রামধারী মিশ্র চাল-ডাল-ঘি-সবজি পাঠিয়ে দেবেন, এ যেন ভাবাই যায় না।

গলা দিয়ে কারুর আওয়াজ বেরোয় না। নিঃশব্দে সবাই শুধু মাথা হেলিয়ে দেয়।

টেড়ারাম আবার চেঁচায়, 'রামধারীজি কাল খবর দিয়েছিলেন—তোরা কেউ রসুই চাপাস নি তো?'

'নেহী—' সমস্বরে অচ্ছুৎরা জানায়, রসুই তো দূরের কথা, চুল্‌হা পর্যন্ত কেউ ধরায় নি।

'বহোত আচ্ছা। আজ হিন্দু ধরমের এই বিপদের দিনে বড়ে সরকার তোদের গাঁওয়ের সবাইকে খিলাবেন।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে একবার দম নেয় টেড়ারাম। তারপর আবার বলে, 'গাড়ি থেকে বস্তাগুলো নামিয়ে নিয়ে কোথাও রাখ।'

টেড়ারামের মুখ থেকে কথা খসার সঙ্গে সঙ্গে ধরাধরি করে সবাই বস্তাগুলো নামিয়ে গাঁয়ের

মাঝখানে যেখানে অনেকগুলো পরাস গাছ গা জড়াজড়ি করে রয়েছে তার তলায় নিয়ে যেতে থাকে।

টেড়ারাম এবার বলে, 'তোদের আরো একটা খবর দিচ্ছি। দুফারে বড়ে সরকার তোদের গাঁওয়ে আসবেন।'

দিনের বেলা আকাশে চাঁদ উঠলে মনচনিয়ার বাসিন্দারা যতটা অবাক হত তার চাইতেও বেশি অবাক হয় টেড়ারামের শেষ কথাটায়। রামধারী মিশ্র কোনোদিন এ গাঁয়ে এসেছেন কিনা, অচ্ছুৎরা কেউ মনে করতে পারে না। মাত্র তিন চার 'মিল' তফাতে মধিপুরায় তিনি থাকেন, পুরুষানুক্রমে মনচনিয়ার লোকজনরা তাঁর খেতিতে 'গতরচূরণ' খেটে আসছে। তা সত্ত্বেও এবং বছরের পর বছর এত কাছাকাছি থেকেও কোনোদিন মনচনিয়ায় আসার কথা ভাবেন নি রামধারী।

ভিড়ের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিল ফেকুনাথ। হঠাৎ টেড়ারাম তাকে দেখতে পায়। হাত নেড়ে নেড়ে ডাকতে থাকে, 'আ যা, নজদিগ আ যা—'

সেদিন হিসেব বুঝতে যাবার পর থেকে টেড়ারাম সম্পর্কে ভেতরে ভেতরে খেপে আছে ফেকুনাথ। ঝানু শিয়ারের মতো এই লোকটা প্রতিটি কথায় একবার করে তাকে 'চামারিয়াকা ছৌয়া' বা 'চামারকা বেটোয়া' বলেছে। সে নিঃসন্দেহে চামারের ছেলে, কিন্তু যেভাবে নাক মুখ কুঁচকে কথাটা টেড়ারাম উচ্চারণ করেছে, তাতে প্রবল ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য ঝরে পড়েছে। প্রচণ্ড রাগে ফেকুনাথের মনে হয়েছে লোকটার মুখে দশ বার থুক দিয়ে বিশটা লাথ কষায়। তা ছাড়া হিসাবের যে নমুনা সে দেখিয়েছে তাতে সেদিন থেকেই ফেকুনাথের মাথায় আগুন ধরে আছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পায়ে পায়ে সে টেড়ারামের বয়েল গাড়িটার কাছে এগিয়ে আসে।

টেড়ারাম কিছু বলার আগেই প্রাণানন্দ এবং আত্মানন্দ ফেকুনাথকে বলেন, 'আরে তুমি! তুমি এখানে!' তাঁরা ফেকুনাথকে চিনতে পেরেছেন।

ফেকুনাথ বলে, 'এখানেই তো আমি থাকি। এটা আমাদের গাঁও।'

'বহোত আচ্ছা। কেউ জান-পয়চান থাকলে কাজের সুবিধা হয়। আশা করি তোমার সাহায্য পাব।'

টেড়ারাম সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে বলে, 'জানেন তো, ও চামারকা বেটোয়া। লেকেন চামারের ছৌয়া হলে কী হবে—ও বহোত লিখিপড়ি আদমী, ম্যাট্রিক পাশ।'

টেড়ারামের বলার ভঙ্গিতে ঘৃণা বা প্রশংসা, কী আছে এই মুহূর্তে বোঝা যায় না। তবে সন্ন্যাসীদের চোখে মুখে সমীহের ভাব ফুটে ওঠে। গরিব অচ্ছুৎদের গাঁয়ে এমন একটি শিক্ষিত যুবকের দেখা পাওয়া যাবে, তাঁরা ভাবেন নি। দু'জনেই জানান, ফেকুনাথ ম্যাট্রিক পাশ—এ খবরে তাঁরা খুবই খুশি হয়েছেন। শুধু তাই না, তাঁদের ধারণা যে কাজে এখানে এসেছেন ফেকুনাথ পাশে থাকলে সহজেই এবং খুব ভালভাবেই তা করতে পারবেন।

ফেকুনাথ সামান্য হাসে, কিছু বলে না। আসলে বিপন্ন হিন্দুধর্মকে রক্ষার ব্যাপারে তার কী ভূমিকা হতে পারে, সেটাই সে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে না।

টেড়ারাম এবার ফেকুনাথ এবং মনচনিয়ার অন্যান্য বাসিন্দাদের উদ্দেশে বলে, 'সন্ন্যাসী মহাত্মারা এসেছেন। এঁদের বয়েল গাড়িতেই বসিয়ে রাখবি নাকি? নামিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখভাল খাতিরদারির ব্যওস্থা কর। বড়ে সরকার মহারাজদের পাঠিয়েছেন। এঁদের কোনোরকম অসুবিধা যেন না হয়। সরকারের সম্মান যেন ঠিক থাকে। সমঝা?'

মুহূর্তে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়।

একটু পর দেখা গেল, সেই পরাস গাছগুলোর তলায় চার পাঁচটা দড়ির খাটিয়া পেতে দিয়েছে অচ্ছুৎরা। তার একটাতে বসে আছেন আত্মানন্দ এবং প্রাণানন্দ। অন্য একটায় বসেছে টেড়ারাম সহায়। গাঁয়ের লোকেরা এবং রামধারীর পাঠানো নৌকর এবং বামহন রসুইকরেরা সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

খাটিয়ায় বসেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে টেড়ারাম প্রথমে নৌকর আর রসুইকরদের ফাঁকা জায়গা দেখে চুল্হা বানিয়ে ফেলতে বলে। তারপর গাঁওবালাদের বলে, 'হিন্দু ধরম বহোত খত্রার মধ্যে পড়েছে। এখন সব হিন্দুর এক হয়ে কাম করতে হবে। ছুঁয়াছুতের বাছবিচার চলবে না। গাঁওয়ের যত জেনানা

আর লেড়কী আছে, সব রসুইয়ের কাজে হাত লাগাও।'

মনচনিয়ার অচ্ছুৎরা একেবারে হাঁ হয়ে যায়। বলে কি লোকটা? সবরকম ছুঁয়াছুত আর জাতওয়ারি সওয়াল ঘুচে গিয়ে দুনিয়ায় কি স্বর্গবাজ্য নেমে এল? মনচনিয়ার অন্য বাসিন্দাদের মতো ফেকুনাথও একেবারে হকচকিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায়, গাঁয়ের শেষ মাথায় রামধারীর নৌকরেরা মাটি খুঁড়ে বড় বড় ক'টা চুল্হা বানিয়ে প্রকাণ্ড হাঁড়িতে ভাত ডাল চাপিয়ে দিয়েছে। গাঁয়ের লোকেরা ছোটাছুটি করে হাতে হাতে তাদের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। আওরতরা ছুরি বঁটি ইত্যাদি দিয়ে পাহাড় প্রমাণ আনাজ কাটতে বসেছে।

এ গাঁয়ের 'পঞ্চ'-এব মুরুব্বি সুখদেও গাঙ্গোতা, গৈরুনাথ, মাল্লাটুলির হীবালাল, জগনাথ, চামারটুলিব ঘনুয়া, শত্রুঘন, এমনি অনেকে তটস্থ ভঙ্গিতে প্রায় জোড়হাতে দুই সন্ন্যাসী এবং টেড়ারাম সহায়ের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকে।

খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ কবতে থাকে ফেকুনাথ। সে জানত, হিন্দু মিশনেব সন্ন্যাসীরা তাদের গাঁযে আসবেন। কিন্তু গাঁয়েব লোকদেব খাওযা দাওযা ইত্যাদিব জন্য বামধারী মিশ্র যে রাজকীয় ব্যবস্থা করবেন, এটা ভাবা যায় নি। বামধারীকে সে যতটা জানে তাতে এ জাতীয় মহানুভবতা তাঁর কাছে কোনোভাবেই আশা করা যায় না। সেদিন শিউশঙ্কর ঝা'র সঙ্গে রামধারীব কথাগুলো শুনেছে ফেকুনাথ। শিউশঙ্কর বলছিলেন, হিন্দুধর্ম থেকে অচ্ছুৎরা বেরিয়ে গেলে তাদের ওপব 'কানট্রোল' রাখা যাবে না। গভীর উদ্দেশ্য নিয়েই যে বামধারী মিশ্র তাদের গাঁয়ে আজ রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেছেন সে সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যায় ফেকুনাথ। সে সতর্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে।

ওদিকে টেড়ারাম গাঁয়ের মুরুব্বি সুখদেওকে বলে, 'মহারাজেরা এসেছেন। তাঁদের জন্যে থোড়েসে চায়-পানির ব্যওস্থা কব। রসুইকরদের গিয়ে বল—ওরা বানিয়ে দেবে।'

সুখদেও উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যায়।

চা খাওয়ার পর টেড়ারাম মনচনিয়ার বয়স্ক লোকদের আরো কিছু কিছু দরকারি নির্দেশ দিয়ে বলে, 'আমি এখন যাই। জরুবি কাম রয়েছে। পরে আবাব আসব। মহারাজদের কাছাকাছি থাকিস, কখন কি জরুরৎ পড়ে—' সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে বলে, 'আপনারা আবাম করুন।'

টেড়ারাম আর বসে না, হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ে। তাবপব একটা বয়েল গাড়িতে চড়ে মধিপুরায় ফিরে যায়।

টেড়ারাম চলে যাওয়ার পর সন্ন্যাসীরা ফেকুনাথকে ডেকে তাদের খাটিয়ায় বসতে বলে। শুধু তাকেই না, সুখদেও গৈরুনাথদেরও বলে। প্রথমে কেউ রাজি হয় না, পরে অবশ্য অনেক বলার পর খুব সন্তর্পণে ছোঁয়া বাঁচিয়ে তারা বসে। আজন্মেব সংস্কাব কাটিয়ে উচ্চবর্ণের মানুষজনের গা ঘেঁষে বসতে তাদের বক্তেব মধ্যেই প্রচণ্ড বাধা রয়েছে।

পাঁচটা খাটিয়ায় এতগুলো মানুষের জায়গা হয় না। বেশির ভাগই দাঁড়িয়ে থাকে।

সন্ন্যাসীরা সহজ এবং আন্তরিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলে সবার অস্বাচ্ছন্দ্য, ভয় এবং আড়ষ্টতা কাটিয়ে দিতে থাকেন। খুটিয়ে খুঁটিয়ে গাঁযের যাবতীয় খবর নেন তাঁরা। এ গাঁয়ে মোট ক'ঘর অচ্ছুতের বাস, তাদের মধ্যে কতজন কোযেবি, কতজন চামাব, কতজন ধাঙড় এবং কতজন মাল্লা, কার জীবিকা কী, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সূরয যখন আরো অনেকটা ওপরে উঠে আসে সেই সময় প্রাণানন্দ ফেকুনাথকে বলেন, 'এবার আসল কাজটা শুরু কবা যাক। তুমি গাঁয়ের সব লোককে এখানে ডেকে নিয়ে এস। বাচ্চা, বুড়হা, আওরত, কেউ যেন বাদ না যায়।'

কিছু বয়স্ক লোক ছাড়া সন্ন্যাসীদের কাছে এখন আব কেউ নেই। আওরতরা রসুইয়ের জায়গায় বসে সবজি কাটছে। বাচ্চা কাচ্চারা একটা উৎকৃষ্ট 'ভাতকা ভোজন'-এর আশায় সেখানে চাক বেঁধে

দাঁড়িয়ে আছে। মনচনিয়া গাঁয়ে এত বড় ভোজের আয়োজন আর কখনও ঘটে নি। সব মিলিয়ে বিরাট এক তৌহার যেন।

ফেকুনাথ একাই নয়, তার সঙ্গে কয়েকজন মুরুব্বিও তাড়িয়ে তাড়িয়ে গাঁয়ের সব মানুষকে পরাস গাছগুলোর তলায় এনে জড়ো করে। বিশাল জনতার সামনে আস্তে আস্তে দুই সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ান। প্রথমে প্রাণানন্দ এভাবে শুরু করেন, 'টেড়ারাম সহায়জির মুখে আপনারা কিছুক্ষণ আগে শুনেছেন, আমরা কী উদ্দেশ্যে এই গাঁওয়ে এসেছি।'

কেউ কিছু না বলে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

প্রাণানন্দ এবার বলেন, 'আপনারা সবাই জানেন, চারদিকের গাঁওগুলোতে অনেকে ধরম বদল করছে। এ পাপ, মহাপাপ। বাপ, দাদা, দাদাকে বাপ, উসকি বাপ—পূর্বপুরুষ যে ধরম পালন করে গেছে তা থেকে বেরিয়ে দুসরা ধরম নিলে অনন্ত্ নরক ভোগ করতে হবে! বাপ-দাদার ধরম পালন করলে অনন্ত পুণ। ভগোয়ানের তাতে সন্তোষ হয়। মানুষের জীওনের সবসে বড়ে পুণ আপনা ধরমে মতি রাখা। সবসে বড়ে পাপ আপনা ধরম তেয়াগ (ত্যাগ)। ভারতীয় মুনি ঋষিরা হাজারো সাল আগে বলে গেছেন শুধ্ (শুদ্ধ) মনে আপনা ধরম পালন করলে মরার পর 'স্বরগ' বাস অবশ্যই ঘটবে। ভারতীয় হিন্দু পরকালের সুখের কথা চিন্তা করেই জীওন কাটিয়ে দেয়। এই সুখের চেয়ে বড় সুখ তার কাছে আর কিছু নেই। বিধর্মী হলে এই সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কোনো হিন্দুর পক্ষেই তা সম্ভব নয়। কাজেই আপনা ধরমের দিকে বেশি করে মন দিন। সনাতন এই ধরম দুনিয়ার সবসে উঁচা ধরম। উসকা আদর্শ উঁচা হয়, উসকা দর্শন ভি উঁচা হ্যায়।' বলতে বলতে প্রাণানন্দের কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপতে থাকে।

ফেকুনাথ ভিড়ের একধারে দাঁড়িয়ে শুনে যাচ্ছিল। প্রাণানন্দের বলার ভঙ্গিটি চমৎকার। কণ্ঠস্বরকে কখনও উঁচুতে তুলে কখনও খাদে নামিয়ে আশ্চর্য এক যাদু তৈরি করতে পারেন।

হঠাৎ ফেকুনাথের নজরে পড়ে মনচনিয়ার বাকি লোকজন বিমূঢ়ের মতো প্রাণানন্দের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের মুখচোখ দেখে মনে হয় না, সাধু মহারাজের সব কথা তাদের মাথায় ঢুকছে।

প্রাণানন্দ থামেন নি, 'লেকেন হাজার হাজার বছরের এই মহান হিন্দু ধরম এখন এক বড় বিপদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্য ধরমের লোকেরা পাইসা রুপাইয়ার লোভ দেখিয়ে হিন্দুদের ধরম তেয়াগ করাচ্ছে। হিন্দু ধরমের বিরুদ্ধে প্রচার চলছে নানা জায়গায়।' এরপর তিনি যা বলেন তা এই রকম। যতদিন আকাশে 'চান্দা সূরয' বিরাজ করছে ততদিন সনাতন হিন্দু ধর্মের বিনাশ নেই। সুপ্রাচীন কালের এই ধর্মের আশ্রয়ে যে আছে বা যে এর শরণ নিয়েছে পৃথিবীর কোনো শক্তিই তার ক্ষতি করতে পারবে না। এই ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য নানাদিক থেকে প্রলোভন আসবে, চাপ আসবে, প্ররোচনা আসবে কিন্তু কেউ যেন কোনোরকম অপপ্রচারের ফাঁদে পা না দেন। কেউ যেন আপনা ধরম ত্যাগ না করেন। নিজের প্রাণের চেয়েও বড় জিনিস হল ধর্ম। ধর্মত্যাগীর মতো পাপী আর কেউ নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাণানন্দের পর আত্মানন্দও একই রকম আবেগময় সুরে হিন্দুধর্মের বিপদ সম্পর্কে জোরাল বক্তৃতা করেন এবং লোভ বা চাপের কারণে ধর্মত্যাগ করতে নিষেধ করেন।

ফেকুনাথ সন্ন্যাসীদের বক্তৃতা শুনতে শুনতে গাঁয়ের মানুষদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। যে ভাষায় হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে তাঁরা কথা বলছেন তা যেন মনচনিয়ার বাসিন্দাদের বোধগম্য হচ্ছে না। কথাগুলো তাদের কানেই ঢুকছে শুধু, মনের ওপর স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারছে বলে মনে হয় না।

যাই হোক, দু'জনের লম্বা বক্তৃতা শেষ হতে হতে সূরয মাথার ওপর উঠে আসে। আরো কিছুক্ষণ পর বেলা যখন হেলতে থাকে, শীতের বাতাসে হিমের গুঁড়ো মিশতে শুরু করে, সেই সময় রসুই হয়ে যায়।

প্রাণানন্দ বলেন, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে, এবার খাওয়াদাওয়ার ব্যাওস্থা করে ফেল।'

সুখদেও এবং অন্য মুরুব্বিরা এরই অপেক্ষায় ছিল। বলামাত্র পরাস গাছগুলোর ওধারে ঘাসের জমিটা সাফসুতরো করতে থাকে। ওখানে সবাই খেতে বসবে।

ফেকুনাথও সুখদেওদের সঙ্গে হাত লাগাতে যাচ্ছিল, সন্ন্যাসীরা তাকে যেতে দেন না। বলেন, 'তুমি বসো। তোমার সঙ্গে দু-একটা কথা আছে।'

ফেকুনাথের দু চোখে কৌতূহল। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

আত্মানন্দ বলেন, 'ধরম তেয়াগের বিষয়ে আমরা যা বললাম তাতে কিরকম কাজ হবে বলে তোমার মনে হয়?'

ফেকুনাথ বুঝতে পারে, তাঁদের ভারি জোরাল বক্তৃতা কতটা কার্যকরী হয়েছে বা মনচনিয়ার অচ্ছুৎদের ওপরে কতটা ছাপ ফেলতে পেরেছে সে সম্পর্কে তাঁরা নিজেরাই হয়ত পুরোপুরি নিশ্চিত নন। সে বিনীতভাবে জানায়, তাদের গাঁওয়ের লোকেরা সবাই আনপড়। সামান্য অক্ষর পরিচয়টুকু পর্যন্ত কারুর নেই। কাজেই 'পাপ-পুণ', 'স্বরগ-নরক', সনাতন ধর্মের মহিমা সম্পর্কে সাধু-মহাত্মারা যে সব বলেছেন তার চোদ্দ আনা অংশই তাদের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। বাকি দু আনা তারা বুঝলেও বুঝতে পারে।

দুই সন্ন্যাসীকে বেশ চিন্তিত দেখায়। আত্মানন্দ বলেন, 'আমাদের কথা গাঁওয়ের লোক পুরোপুরি বুঝতে না পারলে খুবই মুশকিল। তাতে আমাদের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

ফেকুনাথ উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

প্রাণানন্দ বলেন, 'কিভাবে বললে গাঁওয়ের আনপড় আদমীরা ঠিকমত বুঝবে বলে তোমার মনে হয়?' যেভাবে ভারি ভারি কথায় হিন্দুধর্মের বিপদ সম্পর্কে তাঁরা লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেটা যে অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের বোঝাবার সঠিক পদ্ধতি নয় সেটা সন্ন্যাসীরা ধরতে পেরেছেন।

ফেকুনাথ কিছু বলতে যাচ্ছিল, সুখদেওরা সামনে এসে দাঁড়ায়। পাশের জমিটা সাফ হয়ে গেছে। সুখদেও শুধোয়, 'অব্ কা করেগা মহারাজ?'

আত্মানন্দ বলেন, 'রামধারীজির রসুইকররা খাওয়ার জন্যে অনেক শালপত্রি নিয়ে এসেছে। সেগুলো এনে পেতে ফেল। তারপর গাঁওবালাদের খেতে বসিয়ে দাও।'

'আপনাদের জন্যে কী ব্যওস্থা হবে?'

'তোমাদের সঙ্গেই আমরা খাব। আমাদের শালপত্রিও ওখানে দিয়ে দাও।'

সুখদেওরা এতটা ভাবতে পারে নি। টেড়ারাম যখন ঘোষণা করেছিল আজ সবাই একসাথ বসে খাবে তখন তাদের মনে হয়েছিল, মনচনিয়া গাঁওয়ের লোকেরাই শুধু পাশাপাশি খেতে বসবে। এমনিতেই উচ্চবর্ণের বামহন রসুইকরদের কাজে এ গাঁয়ের মেয়েদের সাহায্য করার হুকুম দিয়ে টেড়ারাম সহায় সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। তার ওপর এখন সন্ন্যাসীরা বলছেন, তাদের পাশে বসে 'দুফারকা ভোজন' সারবেন। বিস্ময় এবং চমকের কি শেষ নেই?

ফেকুনাথও কম অবাক হয় নি। ক'দিন আগেই মাস্টারজির কোয়ার্টারে তার মায়ের রসুই-করা ভাত খাওয়ার কথায় বিব্রত বোধ করেছিলেন এই সন্ন্যাসীরাই। পরে অবশ্য খেয়েছিলেন। কিন্তু অচ্ছুৎদের গা ঘেঁষে তাঁদের খেতে বসার কথা চিন্তাও করতে পারে নি ফেকুনাথ।

প্রাণানন্দ খুব আন্তরিক গলায় বলেন, 'হিন্দু ধরমের এই বিপদের সময় জাতওয়ারি সওয়াল ঘুচিয়ে না দিলে এই ধরম ধ্বংস হয়ে যাবে।'

তাঁর কথা শুনে সবাই অভিভূত হয়ে যায়।

আত্মানন্দ তাড়া লাগান, 'যাও যাও, আর দেরি করো না। সাধু মহারাজ হলেও আমাদের মতো ভুখ তিয়াস আছে।' বলে হাসলেন।

সুখদেওরা এবার জানতে চায়, কারা ভাত তরকারি পরিবেশন করবে, অর্থাৎ রামধারীর বামহন রসুইকররা খেতে দেবে, না গাঁয়ের আওরতরা?

প্রাণানন্দ মৃদু ধমক দিয়ে বলেন, 'গাঁয়ের আওরতরা দেবে। বামহনের হাতে খেলে তোমাদের পাশে বসে খেতে চাইছি কেন? তোমাদের মনেও সমস্কার রয়েছে—কুসমস্কার। সেটা কাটাতে চেষ্টা কর।'

সুখদেওরা আর দাঁড়ায় না, ব্যস্তভাবে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে চলে যায়।

ফেকুনাথের কেন জানি মনে হয়, হিন্দুধর্মের স্বার্থে অচ্ছুৎদের পাশে বসে খেতে বসতে চাওয়াটা

নেহাতই সন্ন্যাসীদের লোক দেখানো ব্যাপার নয়। গরিব অচ্ছুৎদের গাঁগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে সত্যি সত্যিই হয়ত নিজেদের রক্তে অর্জিত কিছু কিছু কুসংস্কার তাঁরা কাটাতে পেরেছেন।

কিছুক্ষণ পর প্রাণানন্দ এবং আত্মানন্দকে মাঝখানে বসিয়ে গাঁয়ের লোকেরা খেতে বসে গেল। কয়েকজন বয়স্কা আওরত এবং যুবতী ভাত-ডাল-তরকাবি পাতে পাতে দিয়ে যাচ্ছে।

আধাআধি খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ সবার চোখে পড়ে রামধারী মিশ্রর পুরনো আমলের বিরাট ফোর্ড গাড়িটা দূরের পাকা সড়ক থেকে কাচ্চীতে নেমে এদিকে আসছে।

নতুন করে মনচনিয়া গাঁয়ে আরেক বার চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা শুরু হয়ে যায়। এবারকার উত্তেজনাটা আগের চাইতে কয়েক গুণ বেশি। তার কারণ ষাট বাষট্টি বছরের দীর্ঘ জীবনে এই প্রথম রামধারী মনচনিয়ায় আসছেন। সবাই খাওয়া ছেড়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়।

এদিকে ফোর্ড গাড়িটা একসময় কাছাকাছি এসে থেমে যায়। সেটার ভেতর থেকে নেমে আসেন শিউশঙ্কর ঝা, রামধারী মিশ্র এবং মুনশি টেড়ারাম সহায়। শিউশঙ্কর হয়ত কোনো কারণে মধিপুরায় এসেছিলেন; তাঁকে সঙ্গে করে এনেছেন রামধারী।

রামধারী হাত নেড়ে ব্যস্তভাবে বলেন, 'তোরা খাওয়া ছেড়ে উঠলি কেন? বৈঠ যা, বৈঠ যা—'

তাঁর কথায় সবাই ফের বসে পড়ে।

ওধারে ফোর্ড গাড়ির ড্রাইভারটা ক্যারিয়ারের ভেতর থেকে দুটো ইজি-চেয়ার বার করে রামধারীকে শুধোয়, 'কুরসি কোথায় পাতব হুজৌর?' বোঝা যায় শিউশঙ্কর এবং নিজের জন্য ও দুটো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন রামধারী।

রামধারী এধার ওধার তাকিয়ে অচ্ছুৎরা যেখানে লাইন দিয়ে খেতে বসেছে সেই লাইনের শেষ মাথাটা দেখিয়ে বলেন, 'উঁহা—'

মনচনিয়া বাসিন্দারা ভয়ানক চমকে ওঠে। রামধারী মিশ্র এবং শিউশঙ্কর ঝা তাঁদের পাশে বসে দুপুরের 'ভোজন' সারবেন নাকি? সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে।

লাইনের মাথায় চেয়ার পাতা হয়ে গিয়েছিল। শিউশঙ্কর এবং রামধারী সেখানে গিয়ে বসে পড়েন। তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ায় টেড়ারাম।

অচ্ছুতেরা বুঝে উঠতে পারে না, এই মুহূর্তে তাদের কী করা উচিত। শালপত্রিতে ভাত ডাল সবজি সাজিয়ে রামধারীদের হাতে দেওয়া কতখানি দুঃসাহসের কাজ হবে, কে জানে। প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা বিমূঢ়ের মতো বসে থাকে।

রামধারীই শেষ পর্যন্ত তাদের বাঁচিয়ে দেন, 'শিউশঙ্করজি আর আমি দুফারে খেয়ে এসেছি। লেকেন হিন্দু ধরম আর সাধু মহারাজদের সম্মানে তোদের পাশে এসে বসলাম। হাত গুটিয়ে বসে থাকিস না—খা।'

এই সুযোগটার জন্যই হয়ত ওৎ পেতে ছিল টেড়ারাম। সে দ্রুত বলে ওঠে, 'আমিও দুফারকা ভোজন চুকিয়ে এসেছি। আমার জন্যে তোদের ব্যস্ত হতে হবে না।'

এইভাবে তিনজনই অচ্ছুৎদের পাশে বসে খাওয়ার ব্যাপারটা কৌশলে এড়িয়ে যায়। অচ্ছুৎরাও শিউশঙ্করজি এবং রামধারীজির মতো উচ্চবর্ণের বড়ে আদমীদের সামনে ভাত ডাল সাজিয়ে দেওয়ার বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পায়।

রামধারী আবার বললেন, 'সাধু মহারাজদের কথা তোরা সবই শুনেছিস তো, কি রে?'

'হাঁ সরকার।' সুখদেওরা সমস্বরে বলে।

'মহারাজরা যেমন যেমন বলেছেন ঠিক সেইভাবে চলবি। নইলে আমাদের এত বড় ধরম বাঁচবে না।'

হিন্দুধর্ম নিয়ে আরো অনেক কথা বলে যান রামধারী। শুধু তিনিই না, শিউশঙ্করজিও। নিষ্ঠাভরে অচ্ছুৎদের কী কী পালন করতে হবে, তাঁরা জানিয়ে দেন।

একসময় খাওয়ার পালা শেষ হয়। অচ্ছুৎ আওরতরা এঁটো শালপাতা সাফ করতে থাকে। আর রামধারী মিশ্র, শিউশঙ্কর ঝা, আত্মানন্দ, প্রাণানন্দ, টেড়ারাম পরাস গাছগুলোর তলায় এসে বসে। সেই

ড্রাইভারটা দৌড়ে গিয়ে চেয়ার দুটো নিয়ে এসে পেতে দেয়।

আকাশের ঢালু পাড়ে সূর্যটা পশ্চিম দিকে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের তাপ দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে। উত্তুরে হিমেল হাওয়া উলটোপালটা ছুটে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে।

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে রামধারী দুই সন্ন্যাসীকে বলেন, 'এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে ফিরবেন তো?'

সন্ন্যাসীরা জানান, মনচনিয়া গাঁয়ে তাঁদের কাজ শেষ হয় নি। এখানে দু-চারদিন থাকতে হবে তাঁদের। কেননা, হিন্দুধর্মের সার কথা একদিনে অচ্ছুৎদের ভাল করে বোঝানো যায় নি। রামধারীজি যদি তাঁদের থাকার মতো এগাঁয়ে একটা ব্যবস্থা করে দেন, বড় ভাল হয়।

সুখদেওকে ডেকে রামধারী বলেন, 'তোদের বহোত সৌভাগ, সাধু মহারাজরা তোদের গাঁয়ে দো-চার রোজ থাকবেন। একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিস। আমি বিছানা পাঠিয়ে দেব।'

সুখদেও হাতজোড় করে বলে, 'বহোত কিরপা সাধু মহারাজকা—'

আবো কিছুক্ষণ গাঁয়ের লোকজন এবং সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রামধাবীরা চলে যান।

এ গাঁয়ে রামধারী মিশ্রর আসা থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল ফেকুনাথ। আজ তাঁর সদয় ব্যবহারে এবং মহানুভবতায় একেবারে অভিভূত হয়ে গেছে সে। যদিও তিনি এখানে কিছু খান নি, তবু অচ্ছুৎদের খাওয়ার সময় পাশে বসেছেন, চাল-ডাল-ঘি-সবজি পাঠিয়ে মনচনিয়ার তাবত মানুষকে একটা উৎকৃষ্ট 'ভাতকা ভোজন' করিয়েছেন—এ সবই যেন এক অলৌকিক স্বপ্নের মধ্যে ঘটে গেছে। মনচনিয়া গাঁয়ে এ জাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনা আর কখনও ঘটেছে বলে কারুর জানা নেই।

রামধারী মিশ্রর কথা ভাবতে ভাবতে বুকের ভেতর একটা আশা ক্রমশ সজীব হয়ে উঠতে থাকে ফেকুনাথের। যে রামধারীজি তাদের সঙ্গে আজ এত সহৃদয় ব্যবহার করলেন, তাদের মানুষের মর্যাদা দিলেন, তাঁকে ভালভাবে ধরতে পারলে নিশ্চয়ই নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে না। পূর্বপুরুষেব বাইশ বিঘা তের কাঠা পনের ধুর জমি রামধারীজি অবশ্যই ফিরিয়ে দেবেন।

ফেকুনাথ ঠিক করে ফেলে, দু'একদিনের ভেতর আবার মধিপুরায় যাবে।

দশ

রোদ যখন একেবারে নিভু নিভু, দূরের শস্যক্ষেত্র ঘিরে নামছে শীতের হিম, কুয়াশায় চরাচর ঢেকে যাচ্ছে দ্রুত, সেই সময় ওধারের কাচ্চী থেকে নির্ধারি ঝা'র হাঁক শোনা যায়, 'এ সুখদেও, এ রামবনবাস, এ গৈরু—হামনি আ গিয়া রে।'

তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে ঠিক এইভাবে মনচনিয়া গাঁয়ে ঢুকবার মুখে কাচ্চীতে নেমে হাঁক দিয়ে আসছে নির্ধারি।

অচ্ছুৎটুলিতে সাড়া পড়ে যায়। নির্ধারি ঝা এ অঞ্চলের যত দেহাত আর যত মানুষ আছে তাদের সবার আপনজন—আপনা আদমী।

পরাস গাছগুলোর তলায় যারা আত্মানন্দ ও প্রাণানন্দকে নিয়ে বসে ছিল তারাই প্রথম নির্ধারিকে দেখতে পায়। সেই পরিচিত চেহারা, সেই পরিচিত সাজসজ্জা। মাথায় ধবধবে সাদা চুল, মোটা টিকিতে হলুদ ফুল বাঁধা, বাঁকানো নাক, সারা গা ধুসো কম্বলে মোড়া, পায়ে তালিমারা বেঢপ জুতো, কাঁধে লাঠির ডগায় চিত্রবিচিত্র একটা ঝোলা, হাতে পুরনো রংচটা টিনের বাক্স।

'আইয়ে আইয়ে নির্ধারিজি—' সুখদেও গৈরুনাথ এবং আরো অনেকে দৌড়ে গিয়ে নির্ধারি ঝা'র হাত থেকে মালপত্র নিয়ে নেয়।

পরাস গাছগুলোর দিকে যেতে যেতে নির্ধারি শুধোয়, 'কেমন আছিস তোরা?'

'রামজি কিষুণজির কিরপায় চলে যাচ্ছে।'

'সেবার রামপতিয়ার মায়ের ভারি বুখার দেখে গিয়েছিলাম। বুডঢি বেঁচে আছে?'

'না, এই সাল বারিষের সময় মরে গেছে।'

'ধাঙড়টুলির জগনের পুতহুর ছৌয়া হওয়ার কথা ছিল। কী হয়েছে—লেড়কা না লেড়কী?'

'লেড়কী।'

'রামজিকা কিরপা।'

গাঁয়ের মানুষদের এই জাতীয় নানারকম প্রয়োজনীয় খবর নিতে নিতে নির্ধারি এগিয়ে যায়। একসময় সে শুধোয়, 'আমার জন্যে সেই ঘরটা আছে তো?'

মনচনিয়ার দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায় চার পাঁচটা ঘর ফাঁকা পড়ে আছে। ওগুলোতে যারা থাকত, তাদের তিন ঘর হেজে মজে সাফ হয়ে গেছে। বাকি দু ঘর গাঁ ছেড়ে ঝরিয়ার কয়লা খাদানে কাজ জুটিয়ে চলে গেছে। ফি বছরই রামায়ণ গাইতে এসে ক'টা দিন ওই ফাঁকা ঘরের একটাতে কাটিয়ে যায় নির্ধারি। ধান কাটাইয়ের সময় এ অঞ্চলে তার আসাটা 'সূরয' ওঠার মতোই অবধারিত। তাই ধানের থোকায় হলুদ রং ধরার সঙ্গে সঙ্গে সুখদেওরা একটা ঘর ধুয়ে মুছে তকতকে করে রাখে।

সুখদেও জানাল, সব ঠিক করে রাখা হয়েছে।

কথায় কথায় সবাই পরাস গাছগুলোর তলায় চলে আসে। সুখদেও বলে, 'বৈঠিয়ে নির্ধারিজি—'

একটা দড়ির খাটিয়ায় নির্ধারি ঝা বসলে তার সঙ্গে আত্মানন্দ এবং প্রাণানন্দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং যে উদ্দেশ্যে তাঁরা এখানে এসেছেন তাও জানানো হয়।

শুনে খুশিই হয় নির্ধারি ঝা। বলে, এ অঞ্চলে এসে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে দুই সাধু মহাত্মার কথা সে অনেকের মুখে শুনেছে। আজ তার বড় সৌভাগ্য যে তাঁদের দর্শন পাওয়া গেল। নির্ধারি শুধোয়, 'দো-চার রোজ এখানে আপনারা থাকছেন তো?'

দুই সন্ন্যাসীই জানান, হিন্দুধর্মের কারণে মনচনিয়াতে তাঁদের থাকতেই হবে।

নির্ধারি বলে, 'রামজিকা কিরপাসে আচ্ছাই হুয়া। মহাত্মাদের সাথ এক জায়গায় থাকা যাবে।'

সন্ন্যাসীরা এবার সবিনয়ে নির্ধারির এ গাঁয়ে আসার কারণটা জানতে চান।

নির্ধাবি বলে, 'তুলসীজির রামায়ণ গাইতে আসি।'

'হর সাল?'

'হাঁ।'

দুই সন্ন্যাসীকে এবার খুবই উৎসুক দেখায়। আত্মানন্দ বলেন, 'তবে তো হিন্দু ধরমের বড় একটা কাজ করছেন আপনি। আপনার রামায়ণ গান আমরা শুনব।'

'আপনাদের কিরপা।'

কিছুক্ষণের মধ্যে দিগন্তের তলায় সূর্য ডুবে যায়। হিম এবং কুয়াশা আরো গাঢ় হয়ে নামতে থাকে।

এই সময় রামধারী মিশ্রর একটা নৌকর ঘাড়ে করে সন্ন্যাসীদের জন্য বিছানাপত্র এবং তাঁদের দু-চারদিনের খাওয়ার মতো চাল ডাল আটা সবজি ইত্যাদি দিয়ে যায়। যে রসুইকর এবং কাজের লোকেরা ওবেলা এসেছিল বয়েল গাড়িতে হাঁড়ি-কড়া আর অন্যান্য বাসন-কোসন চাপিয়ে তারা উঠে বসে। ওরা মধিপুরায় ফিরে যাবে।

সুখদেও বলে, 'আন্ধেরা নেমে গেল। চলুন, আপনাদের ঘরে নিয়ে যাই।'

নির্ধারি বলে, 'কা রে, আজ তুলসীজি শুনবি তো?'

'জরুর। আপনি এসেছেন, আজ তুলসীজি শুনব না—এ কখনও হয়! আগে একটু জিরিয়ে নিন। তারপর সব ব্যাওস্থা করে ফেলছি।'

সন্ধে নামার আগেই সুখদেওরা নির্ধারি এবং দুই সন্ন্যাসীকে নিয়ে মনচনিয়ার দক্ষিণ সীমায় সেই ফাঁকা ঘরগুলোতে চলে যায়। তাদের সঙ্গে ফেকুনাথও আসে।

একটা ঘরে দড়ির চৌপায়া পেতে দুই সন্ন্যাসীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। অন্য একটা ঘর নির্ধারিকে দেওয়া হয়। কয়েক বছর ধরে শীতের মরশুমে এই ঘরেই কয়েকটা দিন কাটিয়ে যায় নির্ধারি। দুই ঘরেই মিট্টি তেলের 'লালটিন' এনে জ্বেলে দেয় গাঁয়ের লোকেরা। অতিথিদের হাত-পা ধোওয়া এবং খাওয়ার জন্য কুয়ো থেকে জল তুলে এনে দেয় গাঙ্গোতাটুলির ধনপত।

সন্ন্যাসীদের জন্য রামধারীজি চালডাল পাঠিয়েছেন। নির্ধারির জন্য গাঁয়ের লোকেরা নিজের নিজের ঘর থেকে আটা চাল নুন আলু ইত্যাদি নিয়ে আসে এবং রান্নাবান্নার জন্য ঘরেরই এক কোণে ইটের টুকরো বসিয়ে উনুন সাজিয়ে দেয়। নির্ধারি ছুঁয়াছুত বড় একটা মানে না। অচ্ছুৎবা জল বা চা এনে দিলে তা খেতে তার আপত্তি নেই। তবে নিজের রান্নাটা নিজের হাতেই করে নেয় সে। বরাবর এভাবেই চলে আসছে।

রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে, এ কথায় সন্ন্যাসীরা জানান, আজ অনেক বেলায় খেয়েছেন। পেট বোঝাই হয়ে আছে। রাত্তিরে তাঁরা এক গেলাস করে জল ছাড়া আর কিছুই খাবেন না।

নির্ধারি বলে, রামায়ণ পড়ার পর সে রান্না চড়াবে।

কিছুক্ষণ জিরোবার পর টিনের বাক্স খুলে তুলসীদাসের রামচরিত মানসখানা বার করে নির্ধারি। বইটা বহুকালের প্রাচীন। পাতাগুলো হলুদ হয়ে ছিঁড়ে গেছে। এককালে বইটার সুন্দর শক্ত মলাট ছিল; সেটা আর নেই। একটা ময়লা কাগজ দিয়ে সেটা মুড়ে মোটা কালো সুতো দিয়ে বাঁধা।

নির্ধারি সুতো খুলে বইখানা টিনের বাক্সর ওপর রাখে। তারপর আস্তে আস্তে অত্যন্ত সন্তর্পণে ওলটাতে থাকে। পড়ার সুবিধার জন্য ঘরের চাল থেকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে কেরোসিনের লণ্ঠনটা শক্ত করে বেঁধে দেয় সুখদেও।

এদিকে সারা মনচনিয়া গাঁয়ে নির্ধারির রামায়ণ গানের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। বুড়োবুড়ি থেকে বাচ্চাকাচ্চা পর্যন্ত সবাই ধাঙড়টুলি গাঙ্গোতাটুলি চামারটুলি ফাঁকা করে ছুটে আসতে শুরু করেছে।

নির্ধারির ঘরখানা মোটামুটি বড়সড়ই। এই শীতের রাতে গাদাগাদি করে বসলেও তিরিশ পঁয়ত্রিশ জনের জায়গা হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ জুটেছে কম করে তিন চারশ। এত লোক বসবে কোথায়? তারও ব্যবস্থা হয়ে যায়। নিচু ভিতের ঘরটার সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধুসো কম্বলে ঢেকে জড়াজড়ি করে সবাই বসে পড়ে। শুধু নাকের ডগা এবং চোখ দুটোই যা বাইরে বেবিয়ে থাকে।

রামচরিতের কথা শুনে দুই সন্ন্যাসীও এ ঘরে চলে আসেন। দড়ির চৌপায়ায় নির্ধারির পাশে আত্মানন্দ এবং প্রাণানন্দকে সযত্নে বসানো হয়।

সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় হয়ে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। মাটির লক্ষকোটি ছিদ্র দিয়ে উঠে আসছে পৌষের দুর্জয় হিম।

ঘরের বাইরে যারা বসে আছে তাদের দিকে তাকিয়ে বড় মায়া হয় নির্ধারির। বলে, 'অত জাড়ের মধ্যে তোরা বসে থাকিস না। বুখার হবে। কাল পড়তি বেলায় আকাশে সূরয থাকতে থাকতে রামচন্দ্দজির গান শুরু করব। কাল থেকে শুনিস।'

কিন্তু কারুর নড়ার লক্ষণ দেখা যায় না। অসহ্য হিম মাথায় নিয়ে তারা অনড় বসে থাকে।

অগত্যা হাতজোড় করে মাথা নুইয়ে নির্ধারি প্রথমে রামচন্দ্র, পরে তুলসীদাসের উদ্দেশে প্রণাম জানায়। বিড়বিড় করে বলে, 'জয় রামচন্দজি, জয় তুলসীজি—'

দেখাদেখি মনচনিয়ার অচ্ছুৎরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সমস্বরে বলে, 'রামচন্দজিকা জয়, তুলসীজিকা জয়—'

নির্ধারি অযোধ্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে।

'নীলাম্বুজ শ্যামল কোমলাঙ্গ সীতা সমারোপিত বামভাগম্।
পাণৌ মহাসায়কচাপং নমামি রামং রঘুবংশনাথম্।।

নির্ধারি ঝা'র গলা আশ্চর্য সুরেলা। এত বয়সেও পাখির স্বরের মতোই লঘু, মধুর এবং সতেজ। কণ্ঠস্বরকে অনায়াসে চড়ায় তুলে পরক্ষণেই খাদে নামিয়ে আনতে পারে সে।

গান শেষ করে সরল দেহাতি হিন্দিতে মানে বুঝিয়ে দেয় নির্ধারি। নীলপদ্মের মতো শ্যামল এবং কোমল যাঁর দেহ, সীতাজি যাঁর বাঁয়ে থাকেন, যাঁর হাতে মহাবাণ এবং ধনুক সেই রঘুবংশনাথ

রামচন্দ্রকে প্রণাম করি।

রাম বন্দনার পর গোঁসাইজির দোহা শুরু হয়।

'শ্রীগুরু চরণ সরোজ রজ, নিজ মুকুর সুধারি।
বরনউঁ রঘুবর বিমল জসু জো দায়ক ফল চারি।।'

শ্রীগুরুর পাদপদ্মের ধুলোয় নিজের মনের সীসাকে (আয়নাকে) মেজে শ্রীরামচন্দ্রের যশ গাইছি। এই যশোগান চারটি ফল অর্থাৎ চতুবর্গ দান করে।

'জব তেঁ রামু ব্যাহি ঘর আ এ নিত নব মঙ্গল মোদ বধা-এ।
ভুবন চারিদস ভূধর ভারী সুকৃত মেঘ বরষহি সুখবারী।।'

যেদিন থেকে রামচন্দজি বিবাহ করে ঘরে এলেন সেদিন থেকে হর রোজ নয়া নয়া মঙ্গল ও আনন্দ-উৎসব, মতলব—তৌহার হতে লাগল। চোদ্দ ভুবনের মতো বড় বড় পর্বতের ওপর 'পুণকা' মেঘ সুখের বারিষ ঢালতে লাগল।

এরপর বৃদ্ধ রাজা দশরথ যখন রামচন্দ্রকে অযোধ্যার যুবরাজ রূপে অভিষেক করার উদ্যোগ করছেন সেই সময় আকাশ থেকে হঠাৎ বজ্রপাত ঘটল। কৈকেয়ী মর্মান্তিক এক বর চেয়ে বসলেন। সেই বরে তাঁর পুত্র ভরতকে রাজা করতে হবে এবং রামচন্দ্রকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসে পাঠাতে হবে। শুনে দুঃখে অযোধ্যাবাসীরা হায় হায় করতে লাগল। তাদের চোখের মণি রামকে কিভাবে বনবাসে পাঠাবে! তারা বুড়ো রাজা এবং কৈকেয়ীকে অভিসম্পাত করতে লাগল। অযোধ্যা জুড়ে যে আনন্দ উৎসব শুরু হয়েছিল, মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল।

নির্ধারি ঝা'র গলা এমন 'যাদুভরি' যে মনচনিয়া গাঁয়ের শ্রোতারা অভিভূতের মতো শুনে যায়। অযোধ্যাবাসীদের মতোই রামের বনবাসের দুঃখে তাদের বুকের ভেতর হায় হায় করতে থাকে; কারুর কারুর বা চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তারা ভুলে যায় অসহ্য হিমের রাতে খোলা আকাশের নিচে বসে তারা গোঁসাইজির দোহা শুনছে। যুগযুগান্ত পেরিয়ে তারা যেন সুদূর অযোধ্যা নগরীর বাসিন্দা হয়ে গেছে।

কতকাল ধরে নির্ধারির মুখে গোঁসাইজির রামচরিত শুনে আসছে মনচনিয়ার অচ্ছুৎরা কিন্তু কখনও তা যেন পুরনো হয় না। প্রথম শোনার দিনটির মতো আজও তারা একইভাবে আপ্লুত এবং অভিভূত হয়ে আসছে।

দড়ির খাটিয়ায় নির্ধারির পাশাপাশি বসে দুই সন্ন্যাসীও কম অভিভূত হন নি। কী আশ্চর্য যাদু আছে গোঁসাইজির দোহায় যে হিমবর্ষী আকাশের নিচে এই অসহ্য শীতের রাতে গায়ে মাথায় কম্বল জড়িয়ে বুড়োবুড়ি থেকে বাচ্চাকাচ্চা পর্যন্ত সবাই নিবিষ্ট মনে রামকথা শুনে যাচ্ছে! আজ সারাদিন মনচনিয়া গাঁয়ের ওপর দিয়ে কম ধকল যায় নি। সেই সকাল থেকে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন হয়েছিল। সেই উত্তেজনা এবং খাটুনির পর সবাই খুব ক্লান্ত। তা সত্ত্বেও চোখের ঘুম মুছে, মারাত্মক হিম অগ্রাহ্য করে তারা রামচরিত শুনছে।

অথচ তাঁরা দুই সন্ন্যাসী দিনের পর দিন গাঁয়ের পর গাঁ ঘুরে হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা বেশ ভালই বুঝতে পারেন রামধারী মিশ্র এবং শিউশঙ্কর ঝা'র ভয়ে গাঁয়ের লোকেরা তাঁদের কথা শুনতে আসে ঠিকই, তবে বিশেষ কিছু বোঝে বলে মনে হয় না। প্রাণের টানে তাঁদের কাছে ওরা ছুটে আসে না। এটা তো সত্যিই, তাঁদের দিক থেকে চেষ্টার কোনোরকম ত্রুটি নেই। তবে ফাঁক নিশ্চয়ই কোথাও একটা থেকে যাচ্ছে। ফলে আনপড় সাদাসিধে মানুষগুলোর মনে সঠিকভাবে তাঁরা নাড়া দিতে পারছেন না। ফেকুনাথের সঙ্গে বিকেলে কথা বলেও তাঁদের তা মনে হয়েছে।

সন্ন্যাসীরা শুনেছেন, বছরের পর বছর রামচরিতের গান গেয়ে নির্ধারি ঝা এ অঞ্চলের গাঁয়ের লোকদের মুগ্ধ করে রেখেছে। কী এমন প্রবল অমোঘ সম্মোহন আছে গোঁসাইজির দোহায় যা কখনও পুরনো হয় না, যার যাদুকরী শক্তি অনন্তকাল ধরে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে? হঠাৎ তাঁদের মনে

হয়, রামচরিতে এমন কিছু আছে যার সারল্য, আনপড় মানুষের আত্মাকে ছুঁয়ে যায়। তাঁরা লক্ষ কোটি বছর ধরে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরলেও এই সারল্যের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারবেন না।

আত্মানন্দ নিচু গলায় প্রাণানন্দকে বলেন, 'একটা কাজ করলে কেমন হয়?'

প্রাণানন্দ বলেন, 'কী?'

'এতগুলো গাঁওয়ে ঘুরে হিন্দুধরম সম্বন্ধে অনেক কথাই তো বললাম কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এবার থেকে আমরা যেখানে যাব সেখানে নির্ধারি ঝা'কে সঙ্গে নেব।'

প্রাণানন্দ শুধোন, 'নির্ধারি ঝা'কে নিয়ে যেতে চাইছেন কেন?'

'ও গোঁসাইজির দোহা গেয়ে লোক জমাবে। আমরা তারপর বোঝাব রামচন্দ্রজি যে ধরমের সার সেই পবিত্র মহান ধরম ছেড়ে অন্য ধরমে আশ্রয় নেওয়া ঠিক নয়। আমার মনে হয়, তাতে ভাল কাজ হবে।'

'ঠিক বলেছেন। নির্ধারিকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।'

'কালই ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ব্যওস্থা করে নেব।'

এদিকে রাজা দশরথের বিলাপ পর্যন্ত এসে বই বন্ধ করে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে নির্ধারি ঝা। তারপর জীর্ণ রামচরিতখানা টিনের বাক্সে পুরতে পুরতে বলে, 'আজ এই পর্যন্ত থাক।'

আস্তে অস্তে ভিড় ভেঙে যেতে থাকে। গাঙ্গোতারা ধাঙড়রা চামাররা যে যার টুলিতে ফিরে যায়। শুধু সুখদেওর মতো মুরুব্বিজাতীয় কয়েকজন অপেক্ষা করতে থাকে। দুই সন্ন্যাসী এবং নির্ধারি ঝা'র রাতে আর কিছু দরকার হবে কিনা তা জেনে এবং সেইমত ব্যবস্থা করে তারা যে যার ঘরে ফিরবে।

সব লোকজন চলে যাওয়ার পর সুখদেও শুধোয়, সন্ন্যাসীরা তো কিছু খাবেন না, তবে নির্ধারির রাতের 'ভোজন' পর্যন্ত তারা বসে থাকবে কি না?

দুই সন্ন্যাসী জানান, তাঁদের আর কোনো প্রয়োজন নেই। এখনই তাঁরা শুয়ে পড়বেন।

নির্ধারি বলে, 'রসুই করার চাল দাল লকড়ি চুলহা, সব দিয়েছিস। মিট্টি তেলকা লণ্ঠন ভি। এই শীতের রাতে তোদের আর তকলিফ করতে হবে না। দো চারগো চাপাটি আর ভাজি বানিয়ে খেয়েই শুয়ে পড়ব।'

সন্ন্যাসীরা উঠে বাইরে চলে যান। সুখদেওরাও আর অপেক্ষা কবে না। নির্ধারির ঘর থেকে বেরিয়ে অচ্ছুৎটুলির নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এগার

রানীখেতের দুই সন্ন্যাসী এবং নির্ধারি ঝা আসার পর বিহারের এই অখ্যাত অচ্ছুৎদের গাঁয়ে বহুকালের ঘুমন্ত হিন্দুধর্ম নতুন করে যেন জেগে উঠতে শুরু করেছে। এই সুপ্রাচীন বৃদ্ধ সনাতন ধর্মের শিরায় শিরায় আবার তাজা রক্তের উদ্দাম স্রোত বয়ে যাচ্ছে যেন। এই অচ্ছুৎটুলি থেকে হিন্দুধর্মের নতুন জয়যাত্রা আবার শুরু হতে চলেছে কিনা কে জানে।

ভোরে সূরয উঠতে না উঠতেই মনচনিয়ার অচ্ছুৎরা রামধারী মিশ্রর খেতিতে চলে যায়। সারাদিন ফসল কাটার পর সন্ধের আগে আগে ফিরে আসে। তখনও আকাশের গায়ে রোদের সামান্য একটু আভা লেগে থাকে।

ওদের ফেরার অপেক্ষা শুধু। সঙ্গে সঙ্গে মনচনিয়া গাঁয়ের মাঝখানে যে পরাস এবং সিমার গাছগুলো গা জড়াজড়ি করে রয়েছে সেগুলোর তলায় 'ধর্মসভা' বসে যায়। অচ্ছুৎটুলি রাতারাতি বিশুদ্ধ তপোবন হয়ে উঠেছে যেন।

প্রথমে আত্মানন্দ এবং প্রাণানন্দ হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য সম্পর্কে আবেগ-ভরা গলায় একটানা বক্তৃতা দেন। তার মধ্যে থাকে 'পাপ-পুণ', 'স্বরগ-নরক' ইত্যাদি ব্যাপারে জোরাল সব কথা। এই কথাগুলো

প্রথম দিন থেকে দু'জনে নিয়মিত বলে আসছেন। তাঁরা জানান, যতদিন আকাশে 'চান্দা-সূরয' বিরাজ করবে ততদিন এই ধর্মের বিনাশ নেই। এই সনাতন ধর্মে যে আশ্রয় নিয়েছে তার ক্ষতি পৃথিবীর কেউ করতে পারবে না। নানা প্রলোভন আসবে, চাপ আসবে, কিন্তু কেউ যেন হাজার উস্‌কানিতেও 'আপনা ধরম' ত্যাগ না করে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্ন্যাসীদের বক্তৃতার পর শুরু হয় নির্ধারি ঝা'র রামচরিত পাঠ। গোঁসাইজির দোহা আর রামকথা শুনতে শুনতে রাতের দেড় প্রহর পার হয়ে যায়। শীতের হিমার্ত আকাশে উঠে আসে পুনমের চাঁদ। কুয়াশামাখা ঘোলাটে জ্যোৎস্না নিঝুম চরাচরকে মুড়ে দিতে থাকে।

বিহারের এই প্রান্তে মনচনিয়া গাঁয়ের জীবন বড়ই ম্যাড়মেড়ে। সন্ন্যাসীদের আসা, অচ্ছুৎদের সঙ্গে বসে খাওয়া, ইত্যাদি ঘটনা এখনকার মানুষজনের স্তিমিত ধমনীতে অনেকখানি চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা ঢুকিয়ে দিয়ে যায়।

হিন্দুধর্মের নামে মনচনিয়া গাঁয়ে একাত্মতার উৎসব চললেও প্রথম দিনের মতো বিরাট রাজসূয় যজ্ঞ আর হচ্ছে না। এইধর্মের সুরক্ষার জন্য প্রথম দিনই শুধু রামধারী মিশ্র প্রচুর চাল ডাল ঘি সবজি পাঠিয়েছিলেন। ধর্ম বাবদে একদিনেই তাঁর যথেষ্ট খরচ হয়ে গেছে।

এর মধ্যে দুবেজি দিন দুই এসে ঘুরে গেছেন। অচ্ছুৎদের গাঁয়ে এত বিরাট উত্তেজক ঘটনা দেখে তিনি গাঁয়ের লোকদের বলেছেন, 'হিন্দু ধরমের বড় সৌভাগ, তার ক্ষতি আর কেউ করতে পারবে না। তোদেরও সৌভাগ, একাত্মতাকা তৌহার এখান থেকেই শুরু হল। স্বরগবাস তোদের ঠেকায় কে?' দুবেজির কথায় আন্তরিকতা কতখানি আর কতটা মজা, বোঝা যায় নি।

এদিকে ধারাউলি থেকে বুধিলালের খবর এখনও আসে নি। সেই ভৈসোয়ারটারও কোনো পাত্তা নেই।

ঠিক চার দিন পর নির্ধারি ঝা'কে সঙ্গে নিয়ে রানীখেতের সন্ন্যাসীরা পাশের গাঁয়ে চলে গেলেন। প্রবল উত্তেজনার ঘোর কাটতে মনচনিয়ার বাসিন্দাদের তারপরও দু-একটা দিন লেগে গেল।

অচ্ছুৎটুলির অন্য সবার মতোই এ ক'দিন একটা ঘোরের মধ্যে যেন ছিল ফেকুনাথ। তবে বাপ-দাদার বাইশ বিঘা তের কাঠা পনের ধুর জমির কথা সে ভোলে নি।

আজ সকালে উঠেই আবার সে মধিপুরায় যায়। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলেছে, গৈরুনাথরা তার সাদির জন্য যে টাকাটা জমিয়েছে তার সবটাই আপাতত রামধারী মিশ্রকে দিয়ে পূর্বপুরুষের জমিটা উদ্ধার করবে। রামধারীর হাতে-পায়ে ধরে সুদটা কমিয়ে বছর বছর কিস্তিতে শোধ করবে। কিস্তির কথাটা টেড়ারামকেও বলেছে সেদিন। তার ধারণা তেতরিয়া থেকে সোনারি পর্যন্ত পাক্কা দু মাইল জুড়ে যাঁর অফুরন্ত শস্যক্ষেত্র তিনি কি আর বাইশ বিঘা তের কাঠা পনের ধুর জায়গার জন্য মরে যাবেন? ওই জমিনটুকু হাতছাড়া হলে তিনি টেরও পাবেন না। ফেকুনাথের বিশ্বাস বড়ে সরকারকে ভাল করে বোঝাতে পারলে বাপ-দাদার জমিটা ফেরত পাওয়া গেলেও যেতে পারে। এই আশাটা তার মনে জেগেছে অন্য একটা কারণে। যে রামধারীজি হিন্দুদের একাত্মতার জন্য এত কাণ্ড করলেন, সন্ন্যাসী মহারাজদের মনচনিয়ায় পাঠালেন, নিজে না খেলেও গরিব অচ্ছুৎদের খাবার সময় এক লাইনে বসলেন, এত খরচ খরচা করলেন, তিনি কি তাদের মতো গরিবদের প্রতি সামান্য 'কিরপা' করবেন না? রামধারী মিশ্রর সেদিনের আচার আচরণ এবং সদয় ব্যবহারের কথা মনে করে ফেকুনাথের আশাটা ক্রমশ সজীব হয়ে উঠতে থাকে।

কিন্তু মধিপুরায় এসে বড়ে সরকারের সঙ্গে দেখা হয় না। প্রকাণ্ড মকানের বিশাল গেটটাব কাছে যেতেই বিপুল চেহারার চৌগাঁফাওলা ভোজপুরী দারোয়ান জানায়, রামধারী মিশ্রকে পাওয়া যাবে না। তিনি হিন্দুধরমের সুরক্ষার জন্য দূরের একটা গাঁয়ে গেছেন।

অগত্যা ফিরে আসতে হয় ফেকুনাথকে। কিন্তু পরের দিনই আবার সে মধিপুরায় যায়। তারপরের দিনও। তারপর দিনের পর দিন। কিন্তু রামধারীজির দর্শন আর মেলে না। বেশির ভাগ দিনই ফেকুনাথ

শুনতে পায়, বড়ে সরকার মকানে নেই। যেদিন থাকেন, গেটের দারোয়ান গম্ভীর রূঢ় গলায় নিষ্ঠুর মুখে জানায়, 'দর্শন হবে না, হুকুম নেহী।'

তবু আশা ছাড়ে না ফেকুনাথ। পূর্বপুরুষের যে জমি করজের দায়ে হাত থেকে বেরিয়ে গেছে তা ফেরত পাওয়া সহজ নয়। সে জন্য অসীম ধৈর্যের দরকার। রাগে বা হতাশায় মাথা গরম করে বা হঠকারী হয়ে কোনো লাভ হবে না। সে নিয়মিত মধিপুরায় আসতেই থাকবে। দেখা যাক, কতদিনে রামধারী মিশ্রর দর্শন মেলে।

বার

গৈরুনাথ সেই যে বলেছিল, একদিন সন্ধেবেলা ধারাউলিতে গিয়ে বুধিলালের সঙ্গে দেখা করে আসবে, সেটা আর হয়ে ওঠে নি। আসলে ফেকুনাথই তাকে যেতে দেয় নি। হঠাৎ শীতটা এ অঞ্চলে এত বেশি করে এবং এত জাঁকিয়ে পড়তে শুরু করেছে যে সন্ধের পর মানুষ তো দূরের কথা, জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত বেরুতে পারে না। সকালে রাস্তায় বেরুলে দেখা যায়, রাতে দৈবাৎ যে সব প্রাণী বেরিয়ে পড়েছিল—যেমন কুকুর বেড়াল শুগা বা গোয় (গোসাপ)—অসহ্য হিমে সব মরে পড়ে আছে।

প্রচণ্ড জাড় তো আছেই, তার ওপর ফেকুনাথের ভয়, গৈরুনাথ ধারাউলিতে গেলে নির্ঘাত 'শাদিকা বাত' পাকা করে আসবে। তাতে হাতে জমানো টাকাগুলো খরচ হয়ে যাবে। বাপ-দাদার যে জমিটা রামধারীর হাত থেকে ছাড়িয়ে আনার কথা সে ভাবছে তার আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

ফেকুনাথ যা খুশি ভাবতে পারে, গৈরু আর লখিয়া তাদের নিজেদের নিয়মে ছেলের শাদির কথা ভাবছে। সেই ভৈসোয়ারটা বুধিলালকে আদৌ খবর দিয়েছে কিনা, এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে বুধিলালও নিজের থেকে ফেকুনাথের খোঁজ নিতে পারত। ম্যাট্রিকের ফল যে বেরিয়েছে, সে খবর কি ধারাউলিতে পৌঁছয় নি? বুধিলাল না হয় লিখতে পড়তে জানে না কিন্তু রামিয়া তো আনপড় নয়। ম্যাট্রিকের ফল কবে বেরোয়, নিশ্চয়ই তার জানা উচিত। কিন্তু ব্যাপারটা আদতে কী হয়েছে, ওদের সঙ্গে দেখা না হলে বোঝার উপায় নেই।

ওধারে রানীখেত মিশনের সন্ন্যাসীরা চলে যাওয়ার পর উন্মাদনা খানিকটা থিতিয়ে এলেও আবার নতুন উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ধর্ম বদল নিয়ে রোজ হাওয়ায় হাওয়ায় নানারকম গুজব ছড়াচ্ছে। ফলে মনচনিয়া এবং আশেপাশের দশ পনেরটা গাঁয়ের তাবত মানুষজন এখন প্রবল অস্থিরতা এবং চাঞ্চল্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, এখান থেকে বার চোদ্দ মাইল উত্তরে মৈনুগঞ্জ হাতিয়াড়া ধারাউলি পানপোরিয়া—এমনি সব গাঁকে গাঁ ধরম বদলে খ্রিস্টান কি মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। আবার এ খবরও কানে আসছে—যারা ধরম বদল করেছিল, রানীখেতের সন্ন্যাসীরা যাগযজ্ঞ এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে আবার তাদের বাপ-দাদার ধর্মে ফিরিয়ে আনছেন। শিউশঙ্কর ঝা এবং রামধারী মিশ্রও এই নিয়ে চারদিকে খুবই ছোটাছুটি করছেন। এই ধর্মবদলের ব্যাপারে ইদানীং সারাদিনই মনচনিয়ার গাঙ্গোতা ধাঙড় দোসাদ এবং চামাররা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে আছে।

তবে উত্তেজনাটা সব চাইতে বেশি করে টের পাওয়া যায় গৈরুনাথদের ঘরে গেলে। গৈরুর চাচেরা ভাইরা থাকে হাতিয়াড়ায়। মাস দুই আগে শোনা গিয়েছিল, তারা নাকি খ্রিস্টান হয়ে গেছে। দিন তিনেক আগে খবর এসেছে, পানপোরিয়াতে তার যে ফুফেরি বোনেরা থাকে তারা নাকি মুসলমান হয়েছে। খবরটা 'সচ্ না ঝুট', নিজের চোখে না দেখে অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। তবে এ নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় রয়েছে গৈরুনাথরা।

পৌষ মাস পড়ে গেল।

রামধারী মিশ্রর জমিগুলোতে ধানকাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর দু-চারদিনের মধ্যেই আদিগন্ত

শস্যক্ষেত্র ফাঁকা করে সব ফসল রামধারীর খলিহানে উঠে যাবে।

এর মধ্যে একদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর গৈরুনাথ জানায়, আজ আর সে মাঠে যাবে না। রোদ একটু চড়লে ধারাউলিতে বুধিলালের বাড়িতে রওনা হবে। শুধু তাই নয়, তার আরো কিছু উদ্দেশ্য আছে। এই সঙ্গে পানপোরিয়া এবং হাতিয়াড়ায় গিয়ে ফুফেরি বোন আর চাচেরা ভাইদের দেখে আসবে। নিজের চোখে ওদের না দেখা পর্যন্ত আত্মার শান্তি হচ্ছে না।

কালই রামধারীর ফসল কাটার তদারক করে যে লোকটা সেই লগনচাঁদ ঠাকুরের হাতে পায়ে ধরে একদিনের ছুটি চেয়ে নিয়েছিল গৈরুনাথ। লগনচাঁদ হাতের তেলোয় খৈনি ডলতে ডলতে বলেছে, 'কা রে, দো চার রোজ পর পরই ছুট্টি নিচ্ছিস যে!'

হাতজোড় করে গৈরুনাথ বলেছে, 'একটা জরুরি কাম পড়ে গেল লগনচাঁদজি। এরপর আর ছুট্টি চাইব না।'

লগনচাঁদ বলেছে, 'আমার কী। এক রোজ কেন, তুই দশ বিশ রোজ ছুট্টি নে না। নায় কাম তো নায় মজুরি। আমি তোর পেট জরুর কাটব।'

যাই হোক, গৈরুর ধারাউলি পানপোরিয়া ইত্যাদি গাঁয়ে যাওয়ার কথায় ফেকুনাথ বলে, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।' আসলে আত্মীয় স্বজনেরা ধরম বদল করে কী অবস্থায় আছে, জানার জন্য খুবই কৌতূহল হচ্ছে তার। তা ছাড়া শাদির ব্যাপারে প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও রামিয়াকে দেখার গোপন লোভটুকু যে নেই তা নয়। যৌবনের যা ধর্ম।

গৈরুনাথ এবং লখিয়া পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। ফেকুনাথ যে রামিয়ার জন্যই বিশেষ করে অত দূরে যাচ্ছে, এটুকু বুঝে তারা বেশ খুশি। মুখে যতই 'না না' করুক, পণের টাকাটা শাদির জন্য খরচের ব্যাপারে যতই গুস্সা হোক, রামিয়াকে একবার দেখলে ছেলের মাথা যে বিলকুল ঘুরে যাবে এবং তার সব আপত্তিও যে এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে, এ সম্বন্ধে তারা পুরোপুরি নিশ্চিত।

মা-বাপের হাসির কারণটা বুঝে বেশ লজ্জা পায় ফেকুনাথ। জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলে, 'আমি ধারাউলি যাব না; স্রেফ হাতিয়াড়া আর পানপোরিয়ায় গিয়ে চাচা আর ফুফিদের দেখে আসব।'

গৈরুনাথ কিছু বলে না। ভীরু এবং আনপড় হলেও স্বাভাবিক বুদ্ধি তার কম নয়। ষাট বছরের দীর্ঘ জীবনে অভিজ্ঞতার পুঁজি তার বেশ ভালই। মনে মনে সে শুধু ভাবে, একবার ধারাউলির কাছাকাছি হাতিয়াড়া আর পানপোরিয়ায় ছেলেকে নিয়ে যেতে পারলেই হয়। তারপর ফেকুনাথ কিভাবে রামিয়াদের ঘরে না গিয়ে পারে, সে দেখবে।

গৈরুর ইচ্ছা ছিল, পায়ে হেঁটেই যাবে। মোটে তো দশ বার মাইল রাস্তা। কিন্তু ফেকুনাথের জন্য ইচ্ছাটা আর পূরণ হয় না। দু'জনের ভাড়া বাবদ এক টাকা এক টাকা হিসেবে নগদ দু'টি টাকা খসিয়ে বাসে যেতে হয়।

এদিক থেকে ওই তিনখানা গাঁয়ের প্রথমটা হল হাতিয়াড়া। বাস থেকে নেমে পাকা সড়ক পেছনে ফেলে গৈরুনাথ এবং ফেকুনাথ ডানদিকের কাচ্চী ধরে খানিকটা এগিয়েই গাঁয়ের ভেতর ঢুকে পড়ে।

পাক্কী থেকেই হই চই চিৎকার কানে আসছিল। গাঁয়ের দিকে ওরা যত এগোয় আওয়াজটা ততই বাড়তে থাকে।

হাতিয়াড়ায় ঢুকে বাপ-বেটা দু'জনেই তাজ্জব বনে যায়। এলাহী কাণ্ড চলছে সেখানে। বাঁদিকের ফাঁকা পড়তি জমিতে বিশাল শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। এ গাঁয়ের কেউ আর বাকি নেই। গোটা হাতিয়াড়া এখানে ভেঙে পড়েছে।

শামিয়ানার এক দিকে উঁচু বেদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের বিরাট মূর্তি বসানো। দেবতাদের সামনে দশজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে পুজো করছেন। পাশেই পবিত্র চন্দনকাঠ জ্বেলে চলেছে হোম এবং যজ্ঞ। জ্বলন্ত কাঠ এবং ধূপের ধোঁয়ায় ওদিকটা ঝাপসা হয়ে আছে।

আরেক ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার কড়াইতে খিচুড়ি, আলু কুমড়োর তরকারি, কুলের চাটনি এবং

নানকী বাসমতী চালের ক্ষীর (পায়েস) রান্না হচ্ছে। ক্ষীরের সুঘ্রাণে চারদিক ম ম করতে থাকে। মনচনিয়া গাঁয়ে ক'দিন আগে যে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন হয়েছিল এখানকার ব্যাপারটা তার দশগুণ বড়।

এর মধ্যে শিউশঙ্কর ঝা এবং রামধারী মিশ্রকে দেখা যায়। তাঁরা ভীষণ ব্যস্তভাবে এধারে ওধারে ছোটাছুটি করছেন। আর দেখা যাচ্ছে রানীখেত হিন্দু মিশনের সেই আত্মানন্দ এবং প্রাণানন্দকে। ওঁরা ছাড়াও আরো বিশ পঁচিশজন সন্ন্যাসী চারদিকে ঘুরে ঘুরে সব কিছু তদারক করে বেড়াচ্ছেন।

ভিড়ের ভেতর একজনকে জিজ্ঞেস করে জানা যায়, হাতিয়াড়া গাঁয়ের ত্রিশ চল্লিশ ঘর অচ্ছুৎ খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল। আজ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের পুজো দিয়ে, যাগযজ্ঞ এবং প্রায়শ্চিত্ত করে আবার তাদের পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। লোকটা আঙুল দিয়ে সামিয়ানার মাঝখানটা দেখিয়ে দেয়, 'দেখ, ওই যে—'

আগে লক্ষ করে নি গৈরুনাথরা। এবার চোখে পড়ে শ'খানেক পুরুষ, আওরত এবং বাচ্চাকাচ্চা নাহানা সেরে হলুদ রঙে ছোপানো কাপড় পরে বসে আছে। তাদের ঘিরে অজস্র মানুষ। সবার চোখ তাদের ওপর। চেনাজানা যে লোকগুলো কিছুদিন আগেও হিন্দু ছিল, মাঝখানে হঠাৎ খ্রিস্টান হয়ে ফের বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে আসছে—হাতিয়াড়া গ্রামের মানুষদের কাছে এ এক বিস্ময়কর ঘটনা।

গৈরুনাথ শুধোয়, 'এরা যদি পুরানো ধরমেই ফিরে এল তবে খ্রিস্টান হয়েছিল কেন?'

'কা জানে!' উদাসীন গলায় উত্তর দিয়ে লোকটা এবার বলে, 'এর জন্যে যা খরচ খরচা হচ্ছে সব দিয়েছেন শিউশঙ্করজি আর রামধারীজি—'

'হাঁ!' গৈরুনাথ অবাক হয়ে যায়। তার বিস্ময়ের কারণও আছে। সেদিন রামধারীজিরা তাদের গাঁয়ের সবাইকে খাইয়েছেন, আবার এখানে এত খরচ করছেন। তাঁরা বহোত বড়ে আদমী, প্রচুর পয়সা তাঁদের কিন্তু আগে কখনও কারুর জন্য সিকি পয়সাও খরচ করেছেন বলে শোনা যায়নি।

লোকটা এবার রান্নার জায়গা দেখিয়ে বলে, 'কত রসুই হচ্ছে দেখছ!'

গৈরুনাথ জানায়, সবই সে দেখেছে এবং এই বিপুল পরিমাণ সুখাদ্য কেন তৈরি হচ্ছে, সেটা মোটামুটি আন্দাজও করতে পারছে।

লোকটা আরো বিশদ করে বলে, 'পুরা গাঁয়ের নেমন্তন্ন এখানে। পূজা চড়িয়ে, প্রায়শ্চিৎ করিয়ে ওই আদমীগুলোকে পুরানা ধরমে ফিরিয়ে আনা হয়ে গেলেই সবাই একসাথ খেতে বসে যাবে। সাধু-মহাত্মারা তো খাবেনই; শিউশঙ্করজি আর রামধারীজিও অচ্ছুৎদের পাশে বসে খাবেন।'

গৈরুনাথ অবাক হয় না। সাধু-মহাত্মাদের তাঁদের গাঁয়ে অচ্ছুৎদের পাশে বসে খেতে দেখেছে সে। রামধারীজি এবং শিউশঙ্করজি না খেলেও তাদের পাশে চেয়ারে বসে থেকেছেন। একসঙ্গে বসে খাওয়ার মহিমাটি কী, গৈরুনাথ যে না বোঝে তা নয়। আদতে যারা নতুন করে হিন্দু হল তাদের সামাজিকভাবে মানিয়ে তো নিতে হবে। তাই হাতিয়াড়া গাঁয়ের সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। একসঙ্গে বসে খেলে ষোল আনার মধ্যে পনের আনা কাজই হয়ে যায়। তা ছাড়া রামধারী এবং শিউশঙ্করের মতো উচ্চবর্ণের বড় বড় জমিমালিক আর হিন্দু মিশনের সন্ন্যাসীরা গায়ে গা ঠেকিয়ে পাত পেতে বসবেন, তার পেছনেও একটা গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে। এতে অচ্ছুৎদের বোঝানো যাবে তারা বৃহৎ হিন্দু সমাজের বাইরের কেউ নয়। 'এত্তে বড়ে বড়ে আদমী' যখন পাশে বসে খেয়েছেন তখন পূর্বপুরুষের ধর্মত্যাগ পুরোপুরি নিরর্থক। মনচনিয়াতে যা যা ঘটেছিল, পুরনো ধর্মে ফিরিয়ে আনার দৌলতে সেটাই অনেক বড় আকারে হাতিয়াড়ায় ঘটছে।

গৈরুনাথ এবার বলে, 'ধরম বদল করার পর কাউকে পুরানা ধরমে ফিরে আসতে আগে দেখি নি।'

লোকটা বলে, 'থোড়েসে বৈঠ যাও। নিজের আঁখেই সব দেখতে পাবে।' কী ভেবে আবার বলে, 'এক কাম কর না—'

'কা?'

'দুফারের ভোজনটা এখানেই চুকিয়ে যাও।'

খিচুড়ি তরকারি ভাজি চাটনি এবং নানকী বাসমতী চালের ক্ষীর দিয়ে উৎকৃষ্ট একটি ভোজনের সম্ভাবনায় মনে মনে লুব্ধ হয়ে ওঠে গৈরুনাথ। জিভে জল এসে যায় তার। বহুকাল পর সেদিন রামধারী মিশ্রর কিরপায় একটা ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল তাদের গাঁয়ে। কিন্তু ভোজনের তালিকায় ক্ষীর ছিল না। সেই কবে পনের বিশ সাল আগে নানকী বাসমতী চালের ক্ষীর খেয়েছিল সে। তার স্বাদ মনেও পড়ে না। কিন্তু লোভের পাশাপাশি সংশয়ও দেখা দেয়। ভয়ে ভয়ে গৈরুনাথ শুধোয়, 'লেকেন আমাদের তো কেউ এখানে খেতে বলে নি। খেলে শিউশঙ্করজিরা গুস্‌সা হবেন না তো?'

লোকটা বলে, 'আরে নায় নায়। আমাদের পুরা হাতিয়াড়া গাঁওটাই যেখানে খাবে সেখানে দোগো (দু'জন) আদমী খেলে কী যায় আসে? কেউ টেরও পাবে না।'

কাজেই লোভ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না গৈরুনাথের। ফেকুনাথকে নিয়ে সে লোকটার গা ঘেঁষে বসে পড়ে।

ফেকুনাথ কিন্তু বাপের সঙ্গে হাতিয়াড়া গাঁয়ের লোকটার কথাবার্তা তেমন মন দিয়ে শুনছিল না। একদৃষ্টে প্রায় পলকহীন সে রামধারী মিশ্রকে লক্ষ করছিল। তাঁকে দেখতে দেখতে সেই পুরনো আশাটা নতুন ভাবে সজীব হয়ে উঠতে থাকে। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই রামধারীজি তাদের সামান্য জমিটুকু ফিরিয়ে দেবেন।

এদিকে লোকটার পাশে বসে উৎসুকভাবে শামিয়ানার মাঝখানে তাকায় গৈরুনাথ। সেখানে নতুন করে যারা হিন্দুধর্মে ফিরে আসছে, হাতিয়াড়া গাঁয়ের সেই মানুষগুলো হাতজোড় করে ভক্তিভরে যজ্ঞের আগুনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

হঠাৎ চাচেরা ভাইদের কথা মনে পড়ে যায় গৈরুনাথের। তাদের দেখার জন্য ছেলেকে নিয়ে সে হাতিয়াড়ায় নেমে পড়েছে। এ গাঁয়ে যারা খ্রিস্টান হয়েছিল, এই মুহূর্তে তাদের সঙ্গে হলুদ জামা কাপড় পরে শামিয়ানার তলায় চাচেরা ভাইদেরও তো বসে থাকার কথা। কিন্তু গলা অনেকখানি উঁচুতে তুলেও তাদের দেখা যায় না। রীতিমত চিন্তিত দেখায় তাকে। ঘাড় ফিরিয়ে পাশের লোকটাকে শুধোয়, 'ভেইয়া, একগো বাত—'·

লোকটা বলে, 'কা বাত?'

'তোমাদের গাঁওয়ের ভৈরো আর ধৌলিরামকে চেন?'

লোকটা এবার সোজা গৈরুনাথের চোখের দিকে তাকায়। বলে, 'জরুর। তোমরা চেন নাকি?'

গৈরুনাথ মাথা নাড়ে, 'আমার রিস্তা লাগে—চাচেরা ভাই।'

লোকটার চোখমুখ দেখে মনে হয়, হঠাৎ খুবই অস্বস্তিতে পড়ে গেছে সে। জিজ্ঞেস করে, 'ঘর কোথায় তোমার? কৌন গাঁও?' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গৈরুনাথের যাবতীয় খবর নেয় সে। তারপর জোরে শ্বাস ফেলে বলে, 'ভৈরো আর ধৌলিরামের সঙ্গে কতদিন দেখা হয় না তোমার?'

'হোগা ছে সাত মাহিনা।'

গৈরুকে লক্ষ করতে করতে লোকটা খুব সতর্ক ভঙ্গিতে এবার প্রশ্ন করে, 'ওদের সম্বন্ধে কিছু শুনেছ?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে গৈরুনাথ বলে, 'শুনা হ্যায় ওরা খ্রিস্টান হয়ে গেছে।'

'হাঁ। ঠিকই শুনেছ।'

'লেকেন—'

'কা?'

'ওদের তো ওখানে দেখছি না।' সামিয়ানার মাঝখানে আঙুল বাড়িয়ে দেয় গৈরুনাথ, 'ওরা কি আর পুরানা ধরমে ফিরে আসবে না?'

'নেহী—' লোকটা চারদিক ভাল করে দেখে চাপা গলায় ফিস ফিস করে জানায়, গৈরুর চাচেরা ভাইরা এবং আরো চার ঘর দোসাদ গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ওই দোসাদরাও খ্রিস্টান হয়েছে।

গৈরুনাথ চমকে ওঠে। সে চমক পাশে বসে থাকা ফেকুনাথের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে তীব্র বেগে ছুটে যায়। দু'জনেই একই সঙ্গে বলে ওঠে, 'কায়?'

'ডরে।' একই রকম চাপা স্বরে লোকটা উত্তর দেয়।

'কিসের ডরে?'

'ওরা পুরানা ধরমে ফিরবে না, শিউশঙ্করজিরাও ছাড়বে না। তাই ভেগেছে।'

গৈরুনাথ আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। বিমর্ষ মুখে চুপচাপ বসে থাকে।

দুপুরে পৌষ মাসের নিস্তেজ সূর্য যখন মাথার ওপর উঠে আসে সেই সময় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পূজা, শাস্ত্রপাঠ, যজ্ঞ প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়ায় অচ্ছুৎরা বাপ-দাদার ধর্মে আবার ফিরে আসে। এ যেন ঘরের ছেলের কয়েকটা দিন বিপথে ঘুরে ফের ঘরে ফেরার মতো ঘটনা।

এরপর কাতার দিয়ে সবাই খেতে বসে যায়। পাশের লোকটা যা বলেছিল এবার সেই অলৌকিক ঘটনাটিও ঘটে। শিউশঙ্কর ঝা এবং রামধাবী মিশ্র গৈরুদের গাঁয়ে খান নি। কিন্তু এখানে তাঁরা অচ্ছুৎদের গা ঘেঁষে সত্যিই পাতা পেতে বসে পড়েন।

ভাল ভাল সুখাদ্যে গলা পর্যন্ত বোঝাই করে পানপোরিয়ার দিকে গৈরুনাথরা যখন রওনা হয়, শীতের সূর্য পশ্চিম আকাশে অনেকখানি ঢলে পড়েছে।

মাঠের ওপর দিয়ে গেলে পানপোরিয়া মোটে দু 'রশি' রাস্তা। লম্বা লম্বা পা ফেলে দুই বাপ-বেটা দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায়। এ অঞ্চলে এসে ফুফেরি বোনদের একবার না দেখে গেলেই নয়। তা ছাড়া সন্ধের আগে আগেই তাদের ধারাউলিতে বুধিলালের কাছে পৌঁছুতে হবে।

তের

পানপোরিয়ায় পৌঁছে সিধা ফুফেরি বহিনদের ঘরে এসে ওঠে গৈরুনাথরা। তারা খবর পেয়েছিল, ওই পিসতুতো বোনেরা মুসলমান হয়ে গেছে। এখন দেখা যায়, খবরটা ঠিক নয়। চাচেরা ভাইদের মতো তারাও খ্রিস্টান হয়েছে। তবে এ গাঁয়ের কয়েক ঘর গাঙ্গোতা এবং তাতমা সত্যিসত্যিই মুসলমান হয়ে গেছে।

ধর্ম বদলের কারণে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে ফুফেরি বোনেরা। দায়সারা ভঙ্গিতে ভগ্নিপতি মঙ্গারাম বলে, 'আও আও—'

অথচ মঙ্গারাম লোকটা ছিল বেজায় আমুদে এবং ফুর্তিবাজ। আগে গৈরুদের দেখলে হই হই করে উঠত; এখানে এলে দু-একদিন ধরে রাখত। খাওয়া দাওয়া গল্পগুজবে সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখত। সেই মজাদার দিলখোলা লোকটা একেবারেই বদলে গেছে।

ফুফেরি বোন সোমবারীও ছিল অবিকল মঙ্গারামেরই মতো। কথায় কথায় তার হাসি। দেখা হলেই সে দৌড়ে আসত। কিন্তু এবার কাছেই ঘেঁষছে না। ওধারের একটা ঘরের দরজার আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে নিরুৎসুক গলায় শুধু শুধোয়, 'ক্যায়সা হ্যায় গৈরু ভেইয়া?'

গৈরুনাথ বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

সোমবারী এবার ফেকুনাথের দিকে তাকায়, 'তু দুখনিয়া?'

ফেকুনাথ বলে, 'ভাল আছি।'

'ভাবী আর তোর ভাইবোনেরা?'

'সব ঠিক হ্যায়।'

'তোরা বস।' বলে ঘরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায় সোমবারী।

মঙ্গারাম গৈরুনাথদের ঘরের দাওয়ায় এনে বসায়।

আগে আগে যখনই গৈরুরা এসেছে, ঘরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চায়-পানি বানিয়ে এনেছে সোমবারী। ঘরে যা কিছু থাকত—চিড়ে, চাপাটি বা লাড্ডু—সব বার করে আনত। মঙ্গারাম দৌড়ে যেত বকরির মাংস কিংবা মাছের খোঁজে। তাদের ঘিরে যেন এক তৌহারের মতো ব্যাপার শুরু হয়ে যেত।

গৈরুনাথ বুঝতে পারছে, মঙ্গারামরা তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আগের সেই হুল্লোড়বাজ হাসিখুশি মানুষ তারা আর নেই।

মঙ্গারাম শুধোয়, 'এদিকে কোথায় এসেছিলে?'

গৈরুনাথ বলে, 'একটা বুরা (খারাপ) খবর শুনে দো-তিন মাহিনা ধরে আসব আসব ভাবছিলাম; ধান কাটাই শুরু হয়ে গেল। তাই আসতে পারিনি।'

নিস্পৃহ মুখে মঙ্গারাম জানতে চায়, 'কা বুরা খবর?'

'তোমরা ধরম বদল করেছ—এই খবর।' বলে সোজা মঙ্গারামের চোখের দিকে তাকায় গৈরুনাথ।

আবছা গলায় মঙ্গারাম কী বলে বোঝা যায় না।

এদিকে চুপচাপ বাপের পাশে বসে স্থির চোখে ফেকুনাথ মঙ্গারামকে দেখতে থাকে।

গৈরুনাথ বলে, 'বাপ-দাদার ধরমটা ছেড়ে দিলে?' তার প্রশ্নটার মধ্যে দুঃখ এবং অভিযোগ মেশানো।

'কা করে—' বিষণ্ণ হাসে মঙ্গারাম। বলে, 'উঁচা জাতের আদমীরা আমাদের গায়ে থুক দেয়, গায়ে গা ঠেকলে দশ বার নাহানা করে শুধ্ (শুদ্ধ) হয়—অ্যায়সাই ছুঁয়াছুতের বিচার তাদের। আমাদের মানুষ বলেই ভাবে না তারা। তাদের কাছে আমরা জানবরের চেয়েও খারাপ। এ আর সওয়া যায় না।'

'হাঁ, জরুর।' ফেকুনাথ ঘাড় হেলিয়ে দেয়।

মঙ্গারাম এবার যা উত্তর দেয় তা এই রকম। এ বছর সেই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড গরমে পানপোরিয়ার কুয়োগুলো একেবারে শুকিয়ে যায়। বামহনটুলির দু-চারটে কুয়োতেই শুধু জল ছিল। 'পীনেকা পানি'র জন্য চামাররা দোসাদরা গাঙ্গোতারা সে সব জায়গায় হন্যে হয়ে ঘুরতে থাকে। কিন্তু উচ্চবর্ণের বামহনদের কুয়ো ছোঁয়ার হুকুম বা অধিকার কোনোটাই তাদের নেই। অচ্ছুতেরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকত। বামহনরা মর্জি হলে জলচল নৌকরদের দিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলিয়ে অচ্ছুৎদের লোটায় কি হাঁড়িতে ঢেলে দিত। ইচ্ছে না হলে দিত না। একটু খাবার জলের জন্য কুয়ো থেকে দুশ হাত তফাতে হয়ত একটা পুরা দিনই তাদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

একদিন বামহনদের মেজাজ ভাল ছিল না, কাজেই জল পাওয়া যায় নি। এদিকে তিয়াসে দোসাদটুলি গাঙ্গোতাটুলি চামারটুলির ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। নিরুপায় হয়ে দোসাদটুলির কানহাইয়া রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে বামহনপাড়ার কুয়োর জল আনতে যায়। কিন্তু বরাত খারাপ, ধরা পড়ে গেল সে। কুয়ো অপবিত্র করার কারণে নৌকর দিয়ে বামহনরা এমন মার দেয় যে তিনদিন বাদে ভকিলগঞ্জ টৌনের হাসপাতালে কানহাইয়া মারা যায়। একই ধরমের মধ্যে থেকে কুয়ো ছুঁলে যদি প্রাণ দিতে হয় তা হলে হিন্দু থেকে লাভ কী? পানপোরিয়ার অচ্ছুৎরা 'মিটিন' বসিয়ে ঠিক করে ফেলে সবাই ধরম বদল করবে। উচ্চবর্ণের লোকজনের বিরুদ্ধে এইভাবেই প্রতিবাদ করার কথা ভেবেছিল তারা। অবশ্য ধরম বদলের সময় দেখা যায়, অনেকেই পিছিয়ে গেছে। মাত্র কয়েক ঘরই খ্রিস্টান বা মুসলমান হয়েছে। আসলে এটা বহুকালের অর্জিত সংস্কারের ব্যাপার। শেষ মুহূর্তে বাপ-দাদার ধর্ম ছাড়তে পারে নি অনেকেই।

গৈরুনাথ বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে। বলে, 'হাঁ, উঁচা জাতের লোকেরা আমাদের ঘিন (ঘেন্না) করে, গায়ে থুক দেয়।'

ফেকুনাথ কিছু ভাবছিল। সে মঙ্গারামকে বলে, 'এই যে তোমরা ধরম বদল করলে, তাতে কিছু ফায়দা হয়েছে?'

মঙ্গারাম জিজ্ঞেস করে, 'কিসের ফায়দা?'

'পীনেকা পানির ব্যওস্থা হল?'

'না, এখনও হয় নি। তবে পাদ্রীবাবারা বলেছে, হোলির আগেই নয়া কুয়া কাটাই করে দেবে।'

ফেকুনাথ আর কিছু বলে না।

গৈরুনাথ কী চিন্তা করছিল। এবার বলে, 'তোমাদের এখানে আসার আগে হাতিয়াড়ায় গিয়েছিলাম। ওখানে কি দেখলাম জানো?'

'কী?'

'দেখলাম দেওতাদের পূজা চড়ানো হচ্ছে। যারা ধরম বদল করেছিল 'প্রায়শ্চিৎ' করিয়ে তাদের বাপ-দাদার ধরমে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। শিউশঙ্করজি রামধারীজি সব দেখভাল করছেন।'

মঙ্গারাম বলে, 'শুনা হ্যায়।'

গৈরুনাথ বলে, 'শুনলাম শিউশঙ্করজিরা এখানে এসেও পূজা-উজা চড়িয়ে তোমাদেরও হিন্দু ধরমে ফিরিয়ে নেবেন।'

'ও ভি শুনা হ্যায়।'

'তোমরা কী করবে তখন?

'সোচতা হ্যায় (ভাবছি)। শিউশঙ্করজি রামধারীজির মতো এত্তে বড়ে আদমীরা এলে কিছু একটা করতেই হবে।' রীতিমত চিন্তিত দেখায় মঙ্গারামকে। অর্থাৎ পুরনো ধর্মে ফেরার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে তাদের। বড় বড় জমিমালিকদের মুখের ওপর 'না' বলে দেওয়ার মতো মনের জোর তার নেই।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে গৈরুনাথরা উঠে পড়ে।

চোদ্দ

দু'জনে যখন ধারাউলিতে বুধিলালদের কোঠিতে পৌঁছয় তখনও চারপাশে শীতের নিভু নিভু নিস্তেজ রোদ অল্প স্বল্প লেগে রয়েছে। দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে ফাঁকা ধানখেতের সঙ্গে মিশেছে সেখানে কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। পাখিরা সারাদিন পর মাঠ ঘাট থেকে ফিরে যাচ্ছে, ফিরে যাচ্ছে গাই বকরি চরানিরা।

বুধিলাল এবং তার জেনানা শনিচারী রীতিমত খাতিরদারি করে গৈরুদের দাওয়ায় এনে দড়ির চৌপায়ায় বসাল। তবে রামিয়াকে কাছে পিঠে কোথাও দেখা গেল না।

গৈরুনাথ প্রথমেই বলে, 'তোমার ওপর আমি খুব গুস্‌সা হয়েছি ভেইয়া।'

বুধিলাল মুখ তুলে তাকায়, 'কায়?'

গৈরুনাথ বলে, 'তোমাদের গাঁওবালা এক ভৈসোয়ারকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম—দুখন ভাগলপুর থেকে ম্যাট্রিক পাশ হয়ে ফিরে এসেছে। আদমীটা তোমাকে জানায় নি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে বুধিলাল। তারপর বলে, 'জানিয়েছে। দুখন ম্যাট্রিক পাশ হো গিয়া। হাম সব কোইকো মনকে বহোত শান্তি মিলা।'

অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে গৈরুনাথ। তারপর বলে, 'খবর পেয়েও একবার মনচনিয়া গেলে না: ক'রোজ দেখে আমরা বাপ-বেটায় চলে এলাম।'

বুধিলাল জানায়, তার পক্ষে মনচনিয়াতে যাওয়ার অসুবিধা ছিল।

গৈরুনাথ হালকা গলায় বলে, 'কী অসুবিধে আমি জানি। এখনই বলবে তো, শিউশঙ্করজির খেতিতে ধানকাটাই চালু হয়েছে; সে সব ফেলে যাবে কী করে? ওর মধ্যেই সময় করে যাওয়া যেত।'

বুধিলাল বলে, ধানকাটাই ছাড়াও অন্য অসুবিধা ছিল তার।

একটু মজা করে গৈরুনাথ এবার বলে, 'লেড়কীর শাদি সব কিছুর ওপরে—সমঝা?'

বুধিলাল সামান্য হাসে, উত্তর দেয় না।

গৈরুনাথ বলে, 'তোমার অসুবিধের কথা পরে শুনছি।' বলে শনিচারীর দিকে তাকায়, 'কা সমধীন

(বেয়ান), চায়-পানি খাওয়াবে না? গলার নলিয়া শুকিয়ে গেছে।'

গৈরুনাথ এবং লখিয়া বুধিলাল শনিচারীকে সমধী সমধীন বা বেয়াই-বেয়ান বলে ডাকে। বুধিলালরাও গৈরুদের তাই বলে। ফেকুনাথ আর রামিয়ার বিয়ে হওয়ার আগেই তারা ওই ডাকটা চালু করে ফেলেছে। দু'দিন পরে যখন ডাকতেই হবে তখন আগে ভাগে শুরু করতে দোষ কী।

মুখটা হঠাৎ কালো হয়ে যায় শনিচারীর। সে বুধিলালের দিকে তাকায়।

বুধিলাল একটু চিন্তা করে বিমর্ষ গলায় বলে, 'আমাদের হাতের চায়-পানি কি তোমরা খাবে?'

কথাটা কোনো তামাশার ব্যাপার ভেবে গৈরুনাথ বলে, 'তোমরা কি ভিন জাতের ভিন ধরমের লোক যে তোমাদের হাতে খাব না!'

বুধিলাল মুখ নামিয়ে একটুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। তারপর জানায়, সচমুচ তারা অন্য ধর্মের এবং অন্য জাতের মানুষ।

বুঝিলালের গলার স্বরে চমকে ওঠে গৈরুনাথ। আচমকা তার খেয়াল হয় বুধিলাল বা শনিচারী একবারও কেউ তাকে সমধী ডাকে নি। খাড়া হয়ে বসে সে বলে, 'কা কহা!'

'হামলোগ খ্রিস্টান হো গিয়া।'

'ধরম বদল কিয়া?'

'হাঁ, জরুর।'

আকাশ থেকে হঠাৎ বাজ নেমে এলেও এতটা চমকাত না গৈরুনাথরা। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে তারা। বুধিলালের তিনখানা মেটে ঘরের সীমানা ছাড়ালেই আদিগন্ত ফসলের খেত। সেখানে একদানা ধানও নেই এখন। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে শীতের হাওয়া হা হা করে ছুটতে থাকে।

একসময় গৈরুনাথ বিষণ্ণ মুখে শুধোয়, 'এই জন্যেই তা হলে তুমি মনচনিয়া যাও নি?'

'হাঁ—' ঘাড় হেলিয়ে দেয় বুধিলাল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর গভীর আক্ষেপের গলায় গৈরুনাথ বলে, 'বাপ-দাদার ধরমটা ছেড়ে দিলে ভেইয়া?' জগতে যা কিছু চালু রয়েছে, আবহমান যা যা চলে আসছে, যে যেভাবে যে পরিবেশে আছে, সে সবের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস হয় না গৈরুনাথের। অর্থাৎ যে গরিব আছে সে গরিবই থাকবে, যে হিন্দু আছে সে হিন্দু হয়েই জীবন কাটিয়ে দেবে, যে বড় মানুষ হয়ে জন্মেছে সে বড় মানুষ হিসেবেই মরবে—গৈরুর কাছে নিরবধি কাল ধরে এই রীতিই চলতে থাকবে। আজন্ম ভীরু সে এর বাইরে আর কিছুই ভাবতে পারে না।

মঙ্গারামের মতো দ্বিধা বা অপরাধী ভাব নেই বুধিলালের। গলার স্বরে অনেকখানি জোর দিয়ে সে বলে, 'হাঁ, ছাড়লাম।'

'ছাড়লে কেন? কা হুয়া?'

'চুনাওকে (নির্বাচন) লিয়ে।'

'চুনাও!' বিমূঢ়ের মতো বুধিলালের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে গৈরুনাথ। নির্বাচন যে কারুর ধর্ম বদলের কারণ হতে পারে, এমন কথা আগে আর কখনও শোনে নি সে।

'হাঁ, চুনাও।'

এরপর এক নাগাড়ে অনেক কথা বলে যায় বুধিলাল। ধান কাটাইয়ের আগে এ বছর যে 'এম্লে' নির্বাচন হয়ে গেল তাতে এ অঞ্চল থেকে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষে ছিল ভকিলগঞ্জের যোগিন্দর দোসাদ। অল্পবয়সী ছোকরা যোগিন্দর ভীষণ তেজী। এদিকে নেমেছিলেন শিউশঙ্কর ঝা'র সমধী (বেয়াই) সীয়াশরণজি। চুনাওর আগে সমধীকে সঙ্গে করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন শিউশঙ্করজি, যাতে সীয়াশরণজির পক্ষে সবাই ভোটের কাগজে মোহর মারে। কিন্তু ধারাউলি গাঁয়ের চামারটুলি দোসাদটুলি ধাঙড়টুলির তাবত মানুষ শিউশঙ্করজির কথা রাখে নি; তারা ভোট দিয়েছে তাদেরই মতো একজন অচ্ছুৎ যোগিন্দর দোসাদকে। কিভাবে যেন এ খবরটা টের পেয়ে গিয়েছিলেন শিউশঙ্কর ঝা। তার ফল হয়েছে মারাত্মক। খেপে গিয়ে ধারাউলি গাঁয়ের অচ্ছুৎপাড়ায় তিনি আগুন

লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে মোট এগার জন পুড়ে মরে। তার মধ্যে বাচ্চা চারটে, আওরত দুটো। একটা আওরতের পেটে আবার ছৌয়া ছিল।

সেই কত কাল ধরে উঁচা জাতের লোকেরা তাদের মতো অচ্ছুৎদের গায়ে থুক দিচ্ছে, ঘৃণা করে আসছে, গায়ের জোরে জমিজমা থেকে শুরু করে যুবতী মেয়ে পর্যন্ত ছিনিয়ে নিচ্ছে। একই ধর্মের মানুষ হয়ে বামহন কায়াথদের কাছে তারা ঘেঁষতে পারে না, রামজি কি কিষুণজির মন্দিরে ঢোকা তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। পয়সাওলা উচ্চবর্ণের জমিমালিকদের খেতিতে তারা হাজার বছর ধরে বেগার খেটে কিংবা কামিয়াগিরি করে আসছে। দীর্ঘকালের অভ্যাসে এ সবই তারা মুখ বুজে সয়ে আসছিল। কিন্তু ঘরে আগুন দিয়ে আওরত এবং বাচ্চাদের পুড়িয়ে মারাটা আর সহ্য হয় নি। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো বুকের পাটা তাদের নেই। কিন্তু কিছু একটা করা দরকার। শেষ পর্যন্ত অনেক পরামর্শ করে তারা ঠিক করেছে, শিউশঙ্করজিরা যে ধর্মের মধ্যে আছে, তারা তাতে থাকবে না। হাতিয়াড়া পানপোরিয়ার মতোই এ গাঁয়েও অবশ্য খ্রিস্টান বা মুসলমান হওয়ার মুখে অনেকে মত বদলে পিছিয়ে গেছে।

সব শোনার পর গৈরুনাথ বলে, 'হাতিয়াড়ায় নিজের আঁখে একগো চীজ দেখে এলাম।'

বুধিলাল শুধোয়, 'কা?

'দেখলাম শিউশঙ্করজিরা প্রায়শ্চিৎ করিয়ে সবাইকে পুরানা ধরমে ফিরিয়ে আনছেন। তোমাদের এখানেও ওঁরা আসবেন।'

বুধিলাল উত্তর দেয় না।

গভীর আগ্রহে গৈরুনাথ এবার জিজ্ঞেস করে, 'ওঁরা এলে কী করবে?'

মঙ্গারামের মধ্যে যে দ্বিধা এবং সংশয় দেখা গিয়েছিল সে সবের বিন্দুমাত্রও নেই বুধিলালের। তার মুখ শক্ত দেখায়। বলে, 'যেই আসুক, নয়া ধরম আমি ছাড়ব না। হিন্দু হয়ে হিন্দুর ঘরে আগ লাগিয়ে দিয়েছিল। এখন প্রায়শ্চিৎ করাতে চাইছে। কভী নেহী গৈরু ভেইয়া, পুরানা ধরমে আমি ফিরছি না।'

কিছু একটা মনে পড়তে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় গৈরুনাথের। কাঁপা দুর্বল স্বরে বলে, 'তব্?'

'তব্ কা?'

'তুমলোগ খ্রিস্টান বনা, হামলোগ হিন্দু হ্যায়—'

'হাঁ—'

'তব্ রামিয়া আউর দুখনকা সাদি ক্যায়সে হোগা সমধী?'

এ বিষয়টা এই মুহূর্তে বুধিলালের ভাবনার মধ্যে ছিল না। সে বেশ হকচকিয়ে যায়। বলে, 'হাঁ, বহোত মুসিবতকা বাত। তুমি হিন্দু, আমি খ্রিস্টান। ভিন ধরমের ঘরে লেড়কী পাঠাই কী করে?'

গৈরুনাথ ভীষণ দমে যায়। ঘাড়টা বাঁ দিকে সামান্য হেলিয়ে দেখে ফেকুনাথ দম বন্ধ করে বসে আছে। ছেলের জন্য হঠাৎ ভারি মায়া হয় গৈরুর। আবছা গলায় বুধিলালকে বলে, 'অব কা হোগা ভেইয়া?'

কিছুক্ষণ কী ভাবে বুধিলাল। তারপর আচমকা যেন মুশকিল আসান করে ফেলেছে, এমন ভাব করে বলে, 'এক কাম কর গৈরু ভেইয়া—'

'কা?'

'তোমরাও খ্রিস্টান হয়ে যাও।'

ভয়ানক চমকে ওঠে গৈরুনাথ। বলে, 'বাপ-দাদার ধরম ছাড়তে বলছ! নেহী, নেহী—'

হঠাৎ খেপে যায় বুধিলাল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে চিৎকার করে সে যা বলে সেগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে নিলে এইরকম দাঁড়ায়। কী আছে হিন্দু ধরমে? একদিন হিন্দু ছিলাম। কা মিলা হ্যায় হামনিলোগকা? থুক লাথ আউর আগ (থুতু, লাথি এবং আগুন)। বামহন কায়াথরা আমাদের মানুষ ভাবে না। ভাবে—কুত্তা, চুহা, বান্দর। উঁচা জাতের হাত থেকে বাঁচতে হলে ধরম বদল করে ফেল গৈরু ভেইয়া।

নইলে আমাদের মতো নিচা জাতের আদমীদের আর রক্ষা নেই।

চিরকালের ভীরু গৈরুনাথ দু হাতে মুখ ঢাকে। ঝাপসা দুর্বল গলায় বলে, 'নেহী সাকেগা (পারব না), নেহী সাকেগা।' চালু রীতি বা নিয়ম ভাঙার মতো দুঃসাহস তার নেই।

এতক্ষণ চুপচাপ বসে শুনে যাচ্ছিল ফেকুনাথ। তার শাদির জন্য মা-বাপ বড় কষ্টে যে টাকাটা জমিয়েছিল সেটা দিয়ে রামধারী মিশ্রর কাছ থেকে জমিটা ছাড়িয়ে আনার কথা ভেবে রেখেছে সে। এ নিয়ে মা-বাপের সঙ্গে তার রীতিমত তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাঁটি হয়ে গেছে। জমির ব্যাপারটা খুবই জরুরি। তাই বলে রামিয়াকে সে খারিজ করে দেয় নি। তার বাইশ বছরের সতেজ যৌবনের সঙ্গে রামিয়া স্বপ্নের মতো মিশে আছে। মনে মনে ফেকুনাথ ঠিকই করে রেখেছিল, জমিটা ছাড়াতে পারলে বছর খানেকের ভেতর ফসল থেকে কিছু টাকা হাতে আসবে। তা থেকে বুধিলালকে তিন শ দেওয়া যাবে। অবশ্য শাদিটা বছর খানেকের জন্য পিছিয়ে দিতে হবে—এই আর কি। এসব কথা মনে মনে ভাবলেও এখনও পর্যন্ত মুখ ফুটে কাউকে বলে নি ফেকুনাথ। কিন্তু এখানে, এই ধারাউলিতে এসে বুধিলালের মুখে যা শুনল তাতে সব ওলট পালট হয়ে গেছে। সেই সতের আঠার বছর বয়স থেকে অসীম যত্নে জীবনের একটা বড় স্বপ্নকে সে গড়ে তুলেছিল। সেটা চোখের সামনে যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

হঠাৎ ফেকুনাথ ডাকে, 'বুধি চাচা—' বুধিলালকে সে চাচা বলে।

বুধিলাল ঘাড় ফেরায়, 'কা?'

মঙ্গারামকে গৈরু যা জিজ্ঞেস করেছিল, ফেকুনাথ বুধিলালকে তা-ই শুধোয়। অর্থাৎ ধরম বদলে তাদের কিছু লাভ হয়েছে কিনা। তারা নগদে বা অন্য কোনোভাবে কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়েছে?

বুধিলাল মাথা নাড়ে, 'নায়। ইসমে পাইসাকা মামলা নেহী হ্যায়।'

'খেতিতে যে কাম কর তার মজদুরি বেড়েছে কি?'

'নেহী।'

'তা হলে ধরম বদল করে ফায়দাটা কী হল? হিন্দু হয়ে যে হাল ছিল, খ্রিস্টান হয়ে তো সেই একই হাল রইল। তফাতটা কী?'

বুধিলাল এদিকটা আগে ভেবে দেখে নি। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে, 'ঘরে আগ লাগিয়ে বাচ্চা আর আওরত পোড়াল বলে মাথায় গুস্‌সা চড়ে গেল যে।'

গৈরুনাথ বলে, 'এ সব থাক। আসল কথাটা বল।'

'কী আসল কথা?'

'যে জন্যে এত্তে দূর এলাম। দুখন-রামিয়ার সাদিটা হবে না?'

'কেন হবে না? তোমরা খ্রিস্টান হলে খবর দিও। শাদিকা বাত পাক্কা করে আসব।'

গৈরুনাথ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই ফেকুনাথ বলে ওঠে, 'তোমরা প্রায়শ্চিৎ করে পুরানা ধরমে ফিরে এলে খবর দিও। বাপু এসে কথা বলে যাবে।'

কাজেই এরপর আর বসে থাকা যায় না। গৈরুনাথ এবং ফেকুনাথ বিদায় নিয়ে উঠে পড়ে। বুধিলাল এবং শনিচারী তাদের সঙ্গে সঙ্গে সামনের কাচ্চী পর্যন্ত আসে।

সেখান থেকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে বুধিলালের বাড়ির দিকে তাকায় ফেকুনাথ। একেবারে ডান ধারের ঘরের জানালাটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রামিয়া। তার চোখ জলে ভরে গেছে।

এই মেয়েটার সঙ্গে সেই কবে থেকেই তো বিয়ের কথা ঠিক হয়ে ছিল। কিন্তু ধরম বদলের সঙ্গে সঙ্গে সে কত দূরে চলে গেছে! ভিন ধর্মের এক যুবতীর দিকে তাকিয়ে ফেকুনাথের বুকের ভেতরটা মুচড়ে যেতে থাকে। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে সে গৈরুনাথকে বলে, 'তুরন্ত পা চালাও বাপু, অনেক দূর যেতে হবে।'

এক সময় সূর্য ডুবে যায়। শীতের কুয়াশায় এবং অন্ধকারে দু-পাশের ফাঁকা শস্যক্ষেত্র, গাছপালা, পাকা সড়ক, নয়ানজুলি, মাঠের মাঝখানে মজা নহর—চরাচরের সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসে।

হিমবর্ষী আকাশের তলা দিয়ে গৈরুনাথ এবং ফেকুনাথ পাশাপাশি নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। ফেকুনাথ ভাবে, শিউশঙ্করজি রামধারীজিরা আবহমান কাল ধরে তাদের মতো গরিব অচ্ছুৎদের জমিজমা কেড়ে নিচ্ছে, খেতিতে জানোয়ারের মতো খাটাচ্ছে। গায়ে থুক দিচ্ছে। তাদের জন্যই হাজার হাজার মানুষ ধরম বদল করছে। তাদের জন্যই রামিয়ার সঙ্গে তার সাদি ভেঙে গেল। শিউশঙ্করজি ঝা, রামধারী মিশ্ররা তার ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিয়েছে। তার বাইশ বছরের টাটকা যৌবন এতকাল যে স্বপ্ন দেখে আসছিল সেটা ভেঙে যাওয়ায় মাথায় আগুন ধরে যায় ফেকুনাথের। যারা তার আশা এবং স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছে তাদের কাউকে ছাড়বে না সে।

ফেকুনাথের ভাবনাটা অন্যভাবে কাজ করছিল গৈরুনাথের মধ্যেও। হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে সে।

চমকে বাপের দিকে ফেরে ফেকুনাথ। ব্যস্তভাবে শুধোয়, 'কা হুয়া বাপু?'

উত্তর না দিয়ে চেঁচিয়ে উঠে গৈরুনাথ, 'জানবর, হারামজাদকা ছৌয়া—'

ফেকুনাথ অবাক হয়ে যায়। যে গৈরু জন্মাবধি সন্ত্রস্ত, গলার স্বর চড়িয়ে যে কোনোদিন কথা বলে না, যে কারুর গায়ে আঙুল পর্যন্ত ঠেকাতে শেখে নি, সর্বক্ষণ যে ভয়ে কুঁকড়ে আছে, সেই ভীরুর চাইতেও ভীরু, গরিবের চাইতেও গরিব মানুষটাকে এভাবে কখনও খেপে উঠতে দেখা যায় নি। কার উদ্দেশে সে এই গালাগালগুলো দিল তাও বোঝা যাচ্ছে না।

গৈরুনাথ সমানে ফুঁপিয়ে যায়।

ফেকুনাথ গভীর সহানুভূতিতে বলে, 'রো মাত্ (কেঁদো না) বাপু, রো মাত্—'

গৈরুনাথ উত্তর দেয় না।

মাঝরাতে পৌষের হিমে সমস্ত পৃথিবী যখন আড়ষ্ট এবং নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেই সময় মনচনিয়া গাঁয়ে ফিরে আসে গৈরুনাথেরা।

পনের

ধারাউলি থেকে ফেরার দিনকয়েক পর সকালের দিকে আবার মধিপুরায় চলে যায় ফেকুনাথ। পূর্বপুরুষের জমিনটা যেভাবেই হোক ফেরত চাই-ই। কিন্তু রামধারী মিশ্রর কোঠির বিশাল গেটটার সামনে আসতেই বিপুল চেহারার দারোয়ান তাকে থামিয়ে দেয়। যথারীতি কর্কশ গলায় শুধোয়, 'কা মাঙ্‌তা?'

ফেকুনাথ আগে যেমন জানিয়েছে তেমনি আজও জানায়, বড়ে সরকারের সঙ্গে দেখা করবে। সে টের পায়, বড়ে সরকার আজ বাড়িতেই আছেন। গেটের ওধারে খানিকটা তফাতে সাদা পাথরের ঢালা বারান্দায় আরামদায়ক পুরু গদির ইজি চেয়ারে শরীর এলিয়ে রোদ পোহাচ্ছেন।

ভেতর দিকে মুখ ফিরিয়ে দারোয়ান শুধোয়, 'হুজৌর, গৈরু চামারিয়াকা ম্যাট্রিক পাশ ছৌয়া আয়া। আপহিকা দর্শন মাঙ্‌তা।'

'অন্দর ঘুষনে মাত দো। দর্শন নেহী হোগা।'

বাইরে থেকে দুর্জয় সাহসে ফেকুনাথ চেঁচিয়ে বলে, 'সরকার আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

যে কারণেই হোক, রামধারী মিশ্রর মেজাজ আজ ভাল নেই। বাড়ির ভেতর থেকে তাঁর বিরক্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'দারবান, চামারের ছৌয়াকে ভাগিয়ে দাও।'

দারোয়ান ফেকুনাথকে বলে, 'ভাগ যা। হুজৌরের গুস্‌সা চড়লে মুসিবত হয়ে যাবে।'

ফেকুনাথ মনে মনে ভয়ানক ধাক্কা খায়। যতটা অপমানিত বোধ করে, তার চাইতে অনেক বেশি হয় স্তম্ভিত। এই রামধারী মিশ্রই কি ক'দিন আগে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে অচ্ছুৎদের পাশে বসে 'ভোজন' করেছেন? হিন্দুধর্ম যাতে রসাতলে তলিয়ে না যায় সেজন্য জাতওয়ারি সওয়াল আর ছুঁয়াছুত ভুলে কোয়েরি চামার দোসাদদের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন? কয়েক দিনের জন্য তাঁর ভেতর থেকে এক

উদার হৃদয়বান মানুষ বেরিয়ে এসেছিল। চারদিকের দশ বিশটা গাঁয়ের মানুষের মনে হয়েছিল স্বর্গ থেকে হঠাৎ রামরাজ্য নেমে এসেছে। কিন্তু সেটা যে কতবড় ঝুট, কত বড় ধাপ্পা, এই মুহূর্তে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। নিষ্ঠুর বদমেজাজী নির্মম জমিমালিক রামধারী মিশ্র ফের পুরনো রামধারী মিশ্র হয়ে গেছেন যেন।

ফেকুনাথ আর দাঁড়ায় না। অসহ্য অপমান মাথায় নিয়ে মনচনিয়ায় ফিরে যায়। কিন্তু পরের দিনই আবার মধিপুরায় চলে আসে। তার পরের দিনও। এইভাবে রোজ সকালে উঠে মধিপুরায় আসাটা তার কাছে একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু একদিনও রামধারী মিশ্রর 'দর্শন' মেলে না। গেট থেকেই দারোয়ান তাকে ভাগিয়ে দেয়। কিন্তু রোজকার এই অপমান ফেকুনাথের ভেতরে প্রচণ্ড এক জেদকে একটু একটু করে ক্রমশ উস্‌কে দিতে থাকে।

আজ কিন্তু ফেকুনাথ মনচনিয়ায় ফিরে যায় না। দারোয়ান তাকে চলে যাওয়ার কথা বললেও গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। অদ্ভুত এক রোখ চেপে গেছে তার। মারাত্মক এক দুঃসাহস ফেকুনাথের ওপর ভর করে।

দারোয়ান বলে, 'কা হুয়া? ভাগ যা।'

ফেকুনাথ বলে, 'নেহী।'

'বড়ে সরকার যানে বোলা। কানমে নেহী ঘুষা?'

ফেকুনাথ জানায়, ঘুষেছে কিন্তু আজ রামধারী মিশ্রর সঙ্গে কথা না বলে কোনোক্রমেই মনচনিয়াতে ফিরে যাবে না।

গৈরু চামারের ছেলের সীমাহীন জেদ এবং স্পর্ধায় দারোয়ান হাঁ হয়ে যায়। আরক্ত চোখে সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ফেকুনাথ চেঁচিয়ে ওঠে, 'বড়ে সরকার, আমাদের জমিনের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' বলেই দৌড়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে চলে যায় সে।

রামধারী খেপে যান। বলেন, 'দারবান, শুয়ারের বাচ্চা চামারের ছৌয়াটাকে লাথ মেরে বাহার নিকাল দো—'

মালিকের মুখ থেকে হুকুম খসামাত্র তা পালিত হয়। দারোয়ানের ভারি বুটের লাথি খেয়ে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে ফেকুনাথ। তৎক্ষণাৎ তার রক্তে কিছু একটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উন্মত্তের মতো সে চেঁচাতে থাকে, 'লাথ মেরে ভাগাবে? চোর ডাকু কাঁহাকা? গরিব আনপড় আদমীর জমিন ছিনিয়ে নিয়ে মহাত্মা সেজে বসে আছে! জুয়াচোর! ওয়াপস দিন আমাদের জমিন।'

এই মুহূর্তে আকাশ ভেঙে পড়লেও কেউ এতটা অবাক হত না। যে নৌকরেরা রোজকার মতো ঘোড়াদের ডলাই মলাই করছিল কিংবা মোটরের চাকা ধুচ্ছিল বা পাখিদের দানা খাওয়াচ্ছিল তারা সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। কারুর গলা দিয়ে টুঁ শব্দটি বেরোয় না। নিঃশ্বাস ফেলতেও তারা যেন ভুলে গেছে।

স্তব্ধতা ভাঙে রামধারী মিশ্রর আকাশ-কাঁপানো হুঙ্কারে, 'চামারের বাচ্চাটাকে ধরে এনে বাঁধ, তারপর চামড়া তুলে ফেল—'

সঙ্গে সঙ্গে নৌকররা এবং গেটের দারোয়ান ফেকুনাথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং টেনে হিঁচড়ে তাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে বারান্দায় একটা থামের সঙ্গে বেঁধে ফেলে।

ততক্ষণে রামধারী মিশ্র উত্তেজনায় এবং রাগে উঠে পড়েছেন। তাঁর চোখ রক্তবর্ণ. মাথায় খুন চড়ে গেছে যেন। দৌড়ে ফেকুনাথের কাছে এসে পা থেকে নাগরা খুলে তার নাকে মুখে এলোপাথাড়ি চালাতে থাকেন।

মার খেতে খেতে মাথার ঠিক থাকে না ফেকুনাথের। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো সে চিৎকার করতে থাকে, 'রামধারী মিশ্র, আমি আপনাকে ছাড়ব না। পাটনায় গিয়ে এম.এল.এদের, মন্ত্রীদের,

পুলিশ অফিসারদের আপনার জুয়াচুরি করে গরিবের জমিন ছিনিয়ে নেওয়ার কথা বলব। আপনার জুলুমের কথা দুনিয়াকে জানিয়ে দেব। মনে রাখবেন অচ্ছুৎদেরও মিনিস্টার, এম.এল.এ আছে। আপনি পার পাবেন না।'

উত্তর না দিয়ে সমানে নাগরা চালাতে থাকেন রামধারী। ফেকুনাথের নাকমুখ ফেটে যখন রক্ত ছোটে তখন হাঁপাতে হাঁপাতে আবার শ্বেত পাথরের বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারে বসে পড়েন। নৌকরদের বলেন, 'চুহার বাচ্চাটা বহোত বেড়েছে। আচ্ছা করে 'শিকষা' (শিক্ষা) দিয়ে দে—'

নৌকররা ফেকুনাথের ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রামধারী মিশ্রর কোঠিতে যখন ফেকুনাথের ওপর নাগরা চলছে তখন দু 'রশি' তফাতে রামধারীরই খামারে ধারাল দা দিয়ে বাঁশ চাঁচছিল গৈরুনাথ। ক'দিন আগেই মাঠের সব ধান উঠে গেছে। ফি বছরই ফসল উঠে গেলে গৈরুনাথদের রামধারীর খামারে কাজ করতে হয়।

হঠাৎ ফেকুনাথের মার খাওয়ার খবরটা কিভাবে যেন সেখানে পৌঁছে যায়। কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল থাকে গৈরুনাথ। তারপর 'হা রে দুখনিয়া—'বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে হাতের সেই দা'টা নিয়ে ছুটতে থাকে। তার পেছনে ছোটে লখিয়া। খামারে মনচনিয়া গাঁয়ের যে সব অচ্ছুৎ কাজ করছিল তারাও কিছুই প্রায় না বুঝে ওদের পিছু নেয়।

রামধারী মিশ্রর কোঠিতে এসে গৈরুনাথ দেখে ফেকুনাথের ঘাড় ভেঙে মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে। রক্তে জামা-প্যান্ট ভেসে যাচ্ছে। সে পুরোপুরি বেহুঁশ।

গেটের কাছে দারোয়ান ছিল না। সেও নৌকরদের সঙ্গে ফেকুনাথের ওপর ঘুষি লাথি চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই ভেতরে ঢুকতে অসুবিধা হয় নি গৈরুনাথের। খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে রক্তাক্ত ছেলের হাল দেখতে দেখতে এক অভ্রান্ত নিয়মে তার মধ্যে ভয়াবহ কিছু ঘটে যায়। শরীরে সমস্ত রক্ত লাফ দিয়ে উঠে এসে চোখে জমাট বাঁধতে থাকে, গলার শিরাগুলো প্রবল রক্তচাপে দড়ির মতো পাকিয়ে যায়, ভোঁতা কালচে দাঁতগুলো জান্তব ভঙ্গিতে বেরিয়ে পড়ে, গালের কষ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে আসে। গৈরুনাথের ওপর অপার্থিব কোনো শক্তি যেন ভর করে। আচমকা ধারাল দায়ের ফলা আকাশের দিকে তুলে গোটা পৃথিবী কাঁপিয়ে সে গর্জে ওঠে, 'রুখ যাও, রুখ যাও। দুখনের গায়ে আরেক বার হাত ওঠালে জানে খতম করে দেব। হোঁশিয়ার—হোঁশিয়ার— হোঁ-শি-য়া-র—' বলেই উদ্‌ভ্রান্তের মতো সামনে ছুটে যায়।

ধর্ম পালনের মতো আজন্ম যে ভীরুতাকে পালন করে এসেছে তার ভেতর থেকে হঠাৎ অনিবার্য জাগতিক কোনো পদ্ধতিতে এক পরাক্রান্ত গৈরুনাথ বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বল একটি মানুষের পুরোপুরি ধর্মান্তর ঘটে যায়।

আকাশের নীচে মানুষ

এখন, জষ্ঠি মাসের এই বিকেলে গোটা আকাশ জুড়ে গলা কাঁসার রং ধরে আছে। পশ্চিম দিকের ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে সূর্যটা অনেকখানি নেমে গিয়েছিল। ঘণ্টা দেড়েকের ভেতর সন্ধে হওয়ার কথা। তবু এখনও রোদে ছুরির ধার। গরম বাতাস আগুনের ভাপ ছড়াতে ছড়াতে উলটোপালটা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে।

নিচে ছোটনাগপুরের চাষের খেত। জায়গাটার নাম গারুদিয়া। এখানে যেদিকে যতদূর চোখ যায়, চৌকা তেকোনা ছ'কোনা, নানা মাপের নানা আকারের অগুনতি জমি। বহুকালের প্রাচীন আকাশের তলায় হাজার হাজার বছরের পুরনো সব শস্যক্ষেত্র পৃথিবীর গায়ে নানারকম জ্যামিতিক নকশা এঁকে পড়ে আছে।

চাষের খেতগুলোর একধারে হাইওয়ে। এই সড়ক দিয়ে একদিকে রাঁচী, আরেক দিকে পাটনার বাস যায়। গেল বছর বর্ষায় দক্ষিণ কোয়েলের বন্যায় হাইওয়ে ভেঙেচুরে গিয়েছিল। ঠিকাদাররা ভাঙা সড়কে মাটি ফেলেছে, তবে এখনও পীচ-টীচ পড়ে নি। বাস, ট্রাক, সাইকেল-রিক্শা কিংবা বয়েল গাড়ি অনবরত ছোটাছুটির ফলে বড় সড়কে সব সময় ঘন হয়ে ধুলো উড়ছে। ধুলোর চিকের আড়ালে ওদিকটা ঝাপসা। হাইওয়ের ওধারে দক্ষিণ কোয়েলের একটা রোগা সরু খাত এই জষ্ঠি মাসের রোদে শুকিয়ে ধু ধু মরুভূমির মতো দেখায়।

অনেক দূরে আকাশ যেখানে শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে মাটিতে নেমেছে সেখানে ছোটনাগপুরের একটা ছোটখাট রেঞ্জ। এধারে ওধারে ট্যারাবাঁকা চেহারার কিছু কিছু সিসম গাছ, হঠাৎ হঠাৎ এক-আধটা ঢ্যাঙা তাল, ঝোপঝাড় কি আগাছার জঙ্গল ঝাঁ ঝাঁ রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ছে।

একদিকে হাইওয়ে, আরেক দিকে ছোটনাগপুর রেঞ্জ — মাঝখানে এই গারুদিয়া তালুকের যাবতীয় জমিজমার মালিক মাত্র একজন — রাজপুত ক্ষত্রিয় রঘুনাথ সিং। সড়কের ওধারে দক্ষিণ কোয়েলের পাড় ধরে যত চাষের জমি সে-সব মিশিরলালজির। ওই জায়গাটার নাম বিজুরি— বিজুরি তালুক।

এখন এই গারুদিয়া মৌজার সব জমিতে হাল-লাঙল চলছে। পুরো চৈত্র আর বৈশাখ মাস রোদে পুড়ে পুড়ে মাটি ফুটিফাটা হয়ে আছে। দু-আড়াই মাস এক কণা বৃষ্টি পড়ে নি। বৃষ্টি দূরের কথা, এদিকের আট-দশটা তালুক বা মৌজার তিন-চার লাখ মানুষ ছিটেফোঁটা মেঘও দেখে নি। ফলে মাটি এখন পাথরের চাঙড়া হয়ে আছে।

রাজপুত রঘুনাথ সিং-এর একটা ছ'কোনা খেতে এখন বয়েল-টানা লাঙল চালাচ্ছে ধর্মা বা ধম্মা। তাঁদের গাঁও-মহল্লার মানুষজন অবশ্য ধম্মাই ডাকে। এ ডাকটা খাতির বা স্নেহবশত। সে একাই না, চারদিকের অন্য সব জমিতেও লাঙল ঠেলছে ধাওতাল, রামনগিন, ঢোড়াইলাল, বুধেরি, এমনি আরো অনেকে। তাদের সঙ্গে শক্তসমর্থ মেয়েরাও জমিতে নেমেছে। লাঙলের ফলায় মাটি উপড়ে ফেলার পর তা থেকে কোদা (এক ধরনের আগাছা) কিংবা আগের সালের ফসলের শুকনো শেকড় বাকড় বেছে একধারে ওরা জড়ো করে রাখে।

রাজপুত রঘুনাথ সিং-এর তালুকে ধর্মা একজন বেগার-খাটা ভূমিদাস। সে শুধু একাই না, তার ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে যারা এখন মাটি চষছে তারাও তা-ই। কিন্তু এই ভূমিদাসের জীবন বা সমাজের ইতিহাস এখন না।

ধর্মার বয়স তেইশ-চব্বিশ। গায়ের রং পোড়া তামার মতো। চৌকো মুখ, চওড়া মাংসল কাঁধ, পাথরের পাটার মতো বিশাল বুক, হাত দুটো কাঁধ থেকে জানু পর্যন্ত নেমে এসেছে, আঙুলগুলো মোটা মোটা এবং থ্যাবড়া, হাতের পাঞ্জা প্রকাণ্ড। তার কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল, মুখে খাপচা খাপচা পাতলা দাড়ি-গোঁফ। পরনে হাতকাটা লাল গেঞ্জি আর ডোরা-দেওয়া ইজের। ঘামে ময়লায় সেগুলো চিটচিটে। গলায় কালো কারে রুপো-বাঁধানো বাঘনখ ঝুলছে।

বাঁ হাতের শক্ত মুঠে চেপে লাঙলের ফলা যতটা সম্ভব মাটির গর্ভে ঢুকিয়ে বয়েল দুটোর পিঠে ছপটি হাঁকায় ধর্মা আর থেকে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'উর-র-র, উ-র-র, উর-র-রা-'

জষ্ঠি মাসে রোদের হলকায় তেজী বয়েল দুটোর চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে থাকে। তবু জন্তু দুটো প্রাণপণে লাঙল টানে। এদিকে লাঙলের ফালের ঘা লেগে পাথুরে মাটি থেকে আগুনের ফুলকি ছুটতে থাকে যেন।

যাই হোক না, মানুষ বা জন্তুর এখন রেহাই নেই। রঘুনাথ সিং দিন সাতেক আগে পাটনা গেছেন। তালুকের আর বাজার-গঞ্জের লোকজনরা বলাবলি করছিল, তিনি নাকি এবার এখানকার 'এম্লে'(এম. এল. এ) হবেন। সেই সব ব্যাপারেই দরকারি কাজে তাঁর পাটনা যাওয়া। ধর্মারা শুনেছে তিনি এম্লে বনার 'বাত পাক্কা' করে ফিরে আসার পর চাষের জন্য পালামৌর কিছু ওরাওঁ, সাঁওতাল আর অচ্ছুৎ খেতমজুর আনা হবে। ওরা ফুরনের কিষান। চাষের মরশুমে ফি বছরই ওদের আনা হয়। মরশুম ভর ওরা কাজ করে। আবাদের কাজ শেষ হলেই ওদের বিদায় করা হয়। ফের ওরা আসবে সেই ফসল কাটার সময়। জমি থেকে ধান, গেঁহু, বজরা, মুগ, মসুর, কলাই বা রবিচাষের ফসল কেটে রঘুনাথ সিংয়ের খামারে তুলে দিয়ে, ফিরে যাবে। কিন্তু যতদিন না রঘুনাথ সিং পাটনা থেকে ফিরছেন এবং ওরাওঁ, সাঁওতাল বা ভূমিহীন কিষানরা আসছে ততদিন ধর্মাদের এবং তাদের লাঙল-টানা জন্তুগুলোর জিরেন নেই। রঘুনাথ সিং হুকুম দিয়ে গেছেন, এ ক'দিনে অন্তত আধাআধি জমি চষে ফেলতেই হবে। কেননা আষাঢ়ে 'বারিষ' নামলে একদিনও দেরি করা হবে না, সঙ্গে সঙ্গে বীজ রোয়া শুরু করতে হবে।

লাঙল চালাতে চালাতে কোয়েলের শুকনো খাতের ওপারে তাকাল ধর্মা। শানানো রোদে চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকে যায় তার। তা ছাড়া সারা গা বেয়ে ঢলের মতো ঘাম ঝরছে। কপাল থেকে কয়েক ফোঁটা চোখের ওপর এসে পড়ে। হাতের পিঠে চোখ মুছে আবার তাকাল ধর্মা। মিশিরলালজির তালুকেও লাঙল পড়েছে। তবে বয়েল-টানা লাঙল না, 'মিশিন'-এর লাঙল অর্থাৎ ট্রাক্টর। গনগনে আকাশের তলায় ট্রাক্টরের ভট ভট শব্দ আগুনের মতো লু-বাতাসে ভর করে খা-খা মাঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

রঘুনাথ সিংয়ের জমিনে চাষ-আবাদের হাল মান্ধাতা কি তার বাপ-ঠাকুরদার আমলের মতো। সেই বয়েল, সেই লাঙল। পুরনো জমানা এখানে হাজার বছর ধরে অনড়। আর কোয়েলের ওধারে মিশিরলালজির জমিনে নয়া জমানা এসে গেছে। ওখানে পুরনো যুগের জন্তু অর্থাৎ বয়েল আর কামারের তৈরি লাঙল অচল। ক'বছর হল ওখানে চাষের কাজে 'মিশিন' চলছে।

ধর্মা ভাবল, মিশিরলালজির মতো রঘুনাথ সিং যদি 'মিশিন'-এর লাঙল আনাতেন! কিন্তু কোনোদিন আনাবেন বলে তো মনে হয় না। তাঁর জমিতে কাজ করে মানুষ আর বয়েলের মতো জানোয়ারগুলোর বড় কষ্ট।

পাশের জমি থেকে হট্টাকাট্টা চেহারার আধবুড়ো গণেরি অন্য দিনের মতো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'ন ঘটা (মেঘ), ন বারিষ (বৃষ্টি)! ধুপ আগ য্যায়সা (রোদ আগুনের মতো), মিট্টি পাথর বনী (মাটি পাথর হয়ে গেছে)। বহোত তখলিফ —'

ওধারের আরেকটা খেত থেকে ধাওতাল অভ্যাসবশে বলে উঠল, 'জেঠ মাহিনা (জ্যৈষ্ঠ মাস) কব খতম হোগি মালুম না পড়ি —'

আরেক জন বলল, 'আকাশ থেকে যদি এরকম আগ গিরতে থাকে, আদমী নায় বাঁচেগা, নায় বাঁচেগা। সব মর যায়েগা।'

সবাই চারদিক থেকে সমস্বরে বলতে লাগল, 'হাঁ। অব রামজি ভরোসা। হো রামজি তেরে কিরপা—'

জ্যৈষ্ঠ মাসে আগুন-মাখা আকাশের তলায় যেদিন থেকে হাল-লাঙল পড়েছে সেদিন থেকেই মানুষগুলো রোজ এই কথাই বলে আসছে। জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে কবে আষাঢ় পড়বে, কবে জলকণা-ভরা কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যাবে, জ্বলন্ত মাঠ-ঘাট আর বাতাসের উত্তাপ জুড়িয়ে কবে এই

পৃথিবী স্নিগ্ধ এবং শীতল হবে সেই দিনের আশায় ওরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

ধর্মা আবছাভাবে চারপাশের মানুষগুলোর কথাবার্তা শুনছে। তবে নিজে কিছু বলছে না। কোনোদিনই সে কিছু বলে না। তার বাপ, ঠাকুরদা, ঠাকুরদার বাপ — তিন-চার পুরুষ ধরে ফি বছর তারা রঘুনাথ সিংদের এই জমি লাঙলের ফলায় চৌরস করে আসছে। শুধু কি তারাই, চারপাশের বুধেবি, গণেরি, ধাওতাল — এমনি সবাই পুরুষানুক্রমে রঘুনাথ সিংয়ের জমি চষছে। আকাশ থেকে রোদই ঝরুক কি আগুনই পড়ুক, জমি তাদের চষতে হবেই। পৃথিবীর মাটি ক্ষতবিক্ষত আর উথলপাথল করে বছরের পর বছর রঘুনাথ সিংয়ের জন্য ফসল ফলানো ছাড়া তাদের উপায় নেই। অহেতুক হা-হুতাশ করে কী হবে? তাদের জন্য যুগযুগান্ত ধরেই তো এই কষ্ট জমা হয়ে আছে।

ধর্মার জমিতে সে একলাই নেই। তাদের মহল্লার মেয়ে কুশীও রয়েছে।

ক' বছর ধরে ধর্মা মাঠে নামলেই কুশী তার লাঙলের পেছন পেছন ছুটতে থাকে। শুধু খেত চষার মরশুমেই না, বীজ রোয়া, নিড়ান দেওয়া, ফসল কাটা এবং পরে সেই ফসল রঘুনাথের খামারে তোলা — সব কাজেই সারা বছর কুশী ধর্মার গায়ে ছায়ার মতো লেগে আছে। এখন এই জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মার লাঙলের ফালে মাটির ছিলকা উঠে আসার পর সেগুলো থেকে শুকনো শেকড় বাকড় আর আগাছা বেছে সাফ করে যাচ্ছে সে।

কুশীর বয়েস উনিশ কুড়ি। মাজা কাঁসার মতো গায়ের রং। গোল মুখ, পুরু ঠোঁট, সাদা ঝকঝকে দাঁত, ভাসা ভাসা সরল নিষ্পাপ চোখ, মাথাভর্তি জট পাকানো ঝুপসি চুল। তার শক্ত গড়নের টান টান চেহারা সতেজ কোনো গাছের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

কুশীর পরনে মোটা বনাতের হেটো রঙিন শাড়ি আর হলদে রঙের খাটো জামা। ঘামে শাড়ি ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। হাতে তার কাঁসার কাংনা, নাকে ঝুটো পাথর বসানো চাঁদির নাকফুল।

জষ্ঠি মাসের বেলা যত লম্বাই হোক, অফুরন্ত তো নয়। ধীর চালে হলেও সূর্যটা আকাশের ঢাল বেয়ে একসময় আরো অনেকখানি নেমে যায়। পশ্চিম দিকটা এখন তাজা রক্তের মতো টকটকে লাল। রোদের তাতও বেশ কমে এসেছে। মাথার ওপর দিয়ে সবুজ রঙের এক ঝাঁক বুনো তোতা ডানায় বাতাস চিরে চিরে চেঁচাতে চেঁচাতে কোয়েলের শুকনো খাতটার দিকে উড়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের ট্রিহি ট্রিহি ডাক দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল।

সূর্য ডুববার ঠিক আগে আগে মাঠ থেকে ধর্মারা লাঙল তুলে ফেলে। আজও তুলতে যাবে, আচমকা পেছন থেকে কুশীর তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল, 'হুই — দেখ দেখ —' বলে হাইওয়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

ভুরুর ওপর হাত রেখে শেষ বেলার রোদ ঠেকাতে ঠেকাতে দূরে হাইওয়ের দিকে তাকায় ধর্মা। চারপাশের জমিতে যারা মাটি চষছিল তারাও কুশীর গলা শুনেছে। সেই লোকগুলোও চোখ আড়াল করে কুশীর আঙুল বরাবর হাইওয়ের দিকটা দেখতে লাগল।

বড় সড়কে এখন গাড়িঘোড়ার ভিড় নেই। গোটা কয়েক সাইকেল রিক্‌শা আর বয়েল গাড়ি ঢিমে তালে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। তবে লাল ধুলোর কুয়াশাটা মাথার ওপর অনড় হয়েই আছে।

খুবই মামুলি দৃশ্য, আখছার চোখে পড়ে। এ আর দেখবার কী আছে? বিরক্ত গলায় ধর্মা গজগজিয়ে উঠল, 'সাইকেল রিকশ আউর বয়েলকা গাড়ি কা দেখেগা?'

কুশী সামনে এগিয়ে এল, 'নায় নায়, উ দেখ —'

এবার চোখে পড়ল। হাইওয়েটা মাঠের মাঝখান দিয়ে অনেক দূরে যেখানে ধু ধু হয়ে গেছে সেখানে কালো কালো দুটো ফুটকি দেখা যাচ্ছে। ফুটকি দুটো দ্রুত এদিকে ছুটে আসতে থাকে। নাঃ, কুশীর উনিশ বছরের তেজী চোখের জোর আছে। তিন মাইল তফাত থেকে ও সব দেখতে পায়। একেবারে বাজপাখির নজর।

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার আগে কুশী আবার বলে ওঠে, 'মালুম হোতা, বড়ে সরকারকা মোটরিয়া (মোটর)। সামুন (সামনে) জরুর মুনশিজি হোগা —'

কুশীর কথাই ঠিক। দেখতে দেখতে সেই চলন্ত কালো ফুটকি দুটো খানিকটা এগিয়ে এসে একটা পুরনো আমলের বড় বড় চাকাওলা হুডখোলা মোটর আর একটা হাড় বার-করা লঝ্ঝড় সাইকেল হয়ে যায়। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে — মোটরটার পেছনের সিটে গলায় যুঁই আর গোলাপের মালা ঝুলিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বসে আছেন বিশাল চেহারার মধ্যবয়সী বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং। তাঁর দু'পাশে এবং ফ্রন্ট সিটে ঠাসাঠাসি করে রয়েছেন তাঁরই জনাকয়েক দিলকা দোস্ত — প্রাণের বন্ধু। রঘুনাথ সিংয়ের এইসব পেয়ারের বন্ধুবান্ধবের কথা পরে।

মোটরটার কয়েক গজ আগে আগে একটা সাইকেল চালিয়ে আসছে মুনশি আজীবচাঁদজি। এক হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরেছে সে, আরেক হাত দিয়ে একটা চোঙা মুখের কাছে ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অনবরত কী যেন বলে যাচ্ছে। এতদূর থেকে তার কথা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মুনশিজির বয়স ষাটের কাছাকাছি। রস-বার-করে-নেওয়া আখের ছিবড়ের মতো চেহারা, হাত-পা এবং আঙুল গাঁট পাকানো। ছুঁচলো মুখ, মুড়নো গোঁফ, চোখ দুটো দু আঙুল করে গর্তে ঢোকানো। লম্বা বাঁকানো নাকের ওপর নিকেলের গোল বাই-ফোকাল চশমা ঝুলছে। পরনে ধুতি, ধুতির তলায় শার্ট গুঁজে তার ওপর ধুসো কোট। জামার পকেটে সুতো-বাঁধা পকেট ঘড়ি। মাথায় টুপি। তাকে দেখামাত্র ধূর্ত শেয়ালের কথা মনে পড়ে যায়। গারুদিয়া এবং আশেপাশের আট-দশটা তালুকের লোকজন জানে মুনশি আজীবচাঁদ রঘুনাথ সিংয়ের পা-চাটা কুকুর। সর্বক্ষণ তার একমাত্র কাজ হল মালিক বড়ে সরকারের পায়ের তলায় বসে কুঁই কুঁই করে ল্যাজ নাড়া আর দুনিয়ার তাবৎ আদমীর পেছনে কারণে বা অকারণে লাগা। তার ভয়ে গোরুদিয়া তালুকের সব মানুষ তটস্থ হয়ে থাকে।

আজই যে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং পাটনা থেকে ফিরে আসবেন, ধর্মারা জানত না। তবে মুনশিজি নিশ্চয়ই জানত।

হাইওয়েটা পশ্চিম দিকে আড়াই মাইল গেলে সড়কের ধার ঘেঁষে রেল স্টেশন। এ-জায়গার নামেই স্টেশনটার নাম, অর্থাৎ গারুদিয়া। ধর্মারা যখন রঘুনাথ সিংয়ের জমি চষছে, তখন কোন ফাঁকে মুনশিজি সামনের সড়ক ধরে বড়ে সরকারকে আনতে স্টেশনে গিয়েছিল, কেউ খেয়াল করেনি।

একসময় মোটর আর সাইকেলটা কাছাকাছি এসে পড়ল। এবার মুনশিজির কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। গলার শিরাগুলো নারকেল দড়ির মতো ফুলিয়ে সে চিৎকার করে করে বলছিল, 'হট যা, হট যা—বড়ে সরকার আ রহা হ্যায়। হট যা, হট যা—'

রিক্‌শা, বয়েল কি ভৈসা গাড়িগুলো সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে কিনারে সরে গিয়ে গিয়ে রাস্তা করে দিতে লাগল। রিক্‌শাওলা, বয়েল গাড়িওলা, ভৈসা গাড়িওলা এবং যারা সড়কের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তারা সবাই সসম্ভ্রমে রঘুনাথ সিংয়ের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে জোড়হাতে বলতে লাগল, 'নমস্তে মালিক — ' কিংবা 'নমস্তে বড়ে সরকার —'

মুনশিজির গলার স্বর ক্রমাগত চড়ছিলই, 'আ রে হট যা, হট যা। এস্লে বড়ে সরকার যা রহা হ্যায়। হট যা রিক্‌শাবালা, হট যা বয়েল গাড়িবালা, হট যা পায়দলবালা —' চিৎকারের চোটে তার চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন।

প্রাচীন আকাশের তলায় আধ-চষা মাঠের মাঝখানে আঁকা গুহাযুগের আদিম কোনো চিত্রের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে থাকে ধর্মারা।

কিছুক্ষণ পর পুব দিকের একটা বাঁক ঘুরে ধুলোর ঝড় ওড়াতে ওড়াতে মুনশিজির সাইকেল আর বড়ে সরকারের মোটরখানা অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপরও বেশ খানিকটা সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ধর্মারা। হঠাৎ পাশের খেত থেকে বুধেরি বলে উঠল, 'কা, বড়ে সরকার এস্লে হো গৈল?'

অন্য সবাই চারপাশের খেতগুলোতে বলাবলি করতে লাগল, 'হো গৈল — কা?'

'আ রে, নায় নায় —' আধবুড়ো গণেরি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আভি তক বড়ে সরকার এস্লে নায় বনা—'

সবাই গণেরির দিকে তাকাল, 'কী করে বুঝলে চাচা?'

জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা গণেরির। এই পৃথিবীতে পঞ্চাশ ষাট বছর বেঁচে আছে সে। বহুকালের পুরনো চোখ দিয়ে অনেক কিছু দেখেছে, বহুকালের পুরনো কান দিয়ে অনেক কিছু শুনেছে। এখানকার বেগারখাটা ভূমিদাসেরা তার যে-কোনো মতামতকে খুব মূল্যবান মনে করে।

গণেরি বলল, 'এম্লে অ্যায়সা অ্যায়সা হওয়া যায় না। তার আগে চুনাও (নির্বাচন) হয় না? পাঁচ সাল আগে চুনাও হয়েছিল, মনে নেই? মোহর মেরে মেরে তোরা বাকসমে (বাক্সে) ভোটের কাগজ ফেলে আসিস নি?'

সবার মনে পড়ে গেল। একসঙ্গে তারা বলে উঠল, 'হাঁ হাঁ, আভি ইয়াদ পড়ি —'

বুধেরি বলল, 'তা হলে এম্লে বনবার আগেই মুনশিজি বড়ে সরকারকে এম্লে বলছে কেন?'

গণেরি বলল, 'ও হারামী একটা কুত্তা, দিনরাত জিভ দিয়ে বড়ে সরকারের নাগরা সাফাই করছে। শালে এম্লে বলে বলে মালিককে খুশ করছে। ওর মুখে তিনবার থুক। এক, দো, তিন —' বলে পর পর তিনবার মাটিতে থুতু ফেলল। ঘেন্নায় তার মুখ কুঁচকে যাচ্ছে।

অন্য সকলে কথা বললেও ধর্মা চুপচাপই রয়েছে। ওরা যা বলাবলি করছে সে-সবই তার জানা। ভোট না হলে যে এম্লে বনা যায় না, এ-কথা ছোটবেলা থেকেই সে শুনে আসছে। পাঁচ সাল আগে এখানে শেষ যে ভোট হয়ে গিয়েছিল, তখন তার বয়স ছিল কম। তাই ছাপানো কাগজে মোহর মেরে বাক্সে ফেলা হয়নি। এবার অবশ্য তার ভোটের উমর হয়েছে। কিন্তু যাদের বয়স অনেক, দুনিয়ায় বহুকাল ধরে টিকে আছে তাদের তো জানা উচিত, ভোট না হলে এম্লে বনা যায় না। বার বার ছাপানো কাগজে মোহর মেরে এলেও কেন যে তারা এম্লে বনার নিয়মকানুন ভুলে যায়, কে জানে। সে কিন্তু এই মুহূর্তে ভোট, এম্লে, বড়ে সরকার ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ কিছুই ভাবছিল না। অন্য একটা কারণে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছিল।

বড় সড়কের ওধারে কোয়েলের মরা খাত ধরে খানিকটা গেলে একটা সাবুই ঘাসের জঙ্গল। গরম কালের বিকেলে ওখানে ঝাঁকে ঝাঁকে বগেড়ি পাখি এসে পড়ে। আজকাল কুশী আর সে রোজই ওখানে বগেড়ি ধরার জন্য দশ-বারটা করে ফাঁদ পেতে আসে। সড়ক কি ব্রিজ তৈরির ঠিকাদাররা বগেড়ির মাংস ভীষণ পছন্দ করে। অঢেল কাঁচা পয়সা ওদের হাতে। দামও দেয় ভাল। ডজন তিন সাড়ে তিন রুপাইয়া।

টাকার খুবই দরকার ধর্মার। কাল সন্ধেয় বাঁশের তৈরি যে ফান্দাগুলো তারা পেতে রেখে এসেছিল সেগুলোর ভেতর ক'টা বগেড়ি পড়েছে, জানার জন্য বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সে। আচমকা ধর্মা অন্যদের তাড়া লাগাল, 'সূরয ডুবতে চলল। এবার লৌটবে (ফিরে যাবে) তো, না জমিনে দাঁড়িয়ে থাকবে?'

অন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, 'হাঁ হাঁ, লৌটেগা তো জরুর —'

রোজ সকালে রঘুনাথ সিংয়ের খামার থেকে হাল-বয়েল নিয়ে মাঠে আসে ধর্মারা। সূর্য ডোবার আগে পশু এবং লাঙল সেখানে বুঝিয়ে দেওয়ার পর নিজেদের ঘরে ফিরতে পারে।

একটু পরে দেখা গেল, হাল-বয়েলের মিছিল চলেছে বড় সড়কের দিকে। হাইওয়েতে এসে ধর্মা কুশীকে বলে, 'তুই জঙ্গলে ফান্দাগুলোর কাছে যা। বয়েল আর লাঙল জমা দিয়ে আসছি।'

কুশী বলল, 'তুরন্ত চলে আসিস।'

'হাঁ।'

'দের নায় করনা —'

'নায়।'

কুশী আর দাঁড়াল না। হাইওয়ে থেকে নেমে দক্ষিণ কোয়েলের শুকনো খাতের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। যতদূর চোখ যায়, পড়ন্ত বেলার নির্জীব আলোয় লক্ষ কোটি সোনালি বালির দানা ছড়ানো দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতে একটি তামাটে চেহারার যুবতী ছাড়া আর কোনো মানুষ নেই। এখন কুশী

ছুটছে, ছুটছে আর ছুটছে।

পেছন দিকে দেখা যায়, বিজুরি তালুকের ট্রাক্টরগুলোও ফিরে যাচ্ছে। আজকের মতো ওদেরও কাজ শেষ।

এদিকে সারাদিন পর ক্লান্ত পশু এবং তাদের সঙ্গী মানুষেরা ধুলো ওড়াতে ওড়াতে বড় সড়ক ধরে রঘুনাথ সিংয়ের খামারের দিকে এগিয়ে চলল।

দুই

হাইওয়েটা যেখানে গিয়ে বাঁক নিয়ে ডাইনে ঘুরেছে, সেখান থেকে খানিকটা গেলে একটা ধুলোবোঝাই মেটে রাস্তা পড়ে। এত ধুলো যে পায়ের গোছ অব্দি ডুবে যায়। রাস্তাটা বড় সড়কের গা থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে চলে গেছে। এই রাস্তায় প্রথমে পড়ে রঘুনাথ সিংয়ের খামার বাড়ি। ঢেউ-টিনের চাল আর দশ ইঞ্চি ইটের দেওয়াল দেওয়া পঁচিশ-তিরিশটা বিরাট মাপের লম্বা লম্বা টানা ঘর পর পর দাঁড়িয়ে আছে। এই ঘরগুলো নানারকম শস্যে বা ফসলের বীজে সারা বছর বোঝাই হয়ে থাকে। আগের বছরের ধান, গেঁহু, জনার, মকাই, তিল, মুগ, মসুর, তিসি, সর্ষে, মাড়োয়া ইত্যাদি বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর নতুন বছরের ফসল তুলে গোলাঘরগুলো ভর্তি করে রাখা হয়।

ঘরগুলোর সামনের দিকে পনের-কুড়ি বিঘে জায়গা নিকিয়ে পরিষ্কার তকতকে করে রাখা হয়েছে। ওখানে ফসল শুকিয়ে ঝাড়াই বাছাই করা হয়। তারপর গোলায় তোলার পালা।

তকতকে জায়গাটার একধারে অনেকগুলো টিনের চালা। ওই চালাগুলোর তলায় রঘুনাথ সিংয়ের শ'খানেক লাঙল-টানা বয়েল আর শ'খানেক গাড়ি-টানা মোষ থাকে। এতগুলো পশুর তদারকির জন্য রয়েছে বিশ-পঁচিশটা লোক। পশুগুলোকে দানাপানি দেওয়া, চান করানো, বোখার হলে দশ মাইল দূরের শহর থেকে ভিটিনারি (ভেটারিনারি) ডাগদর ডেকে এনে দাওয়াই কি সুঁই ফোটানো — যাবতীয় কাজই তাদের করতে হয়। এ বাবদে রঘুনাথ সিংয়ের কাছ থেকে পেটের খোরাকি আর সারা বছরের জন্য খানতিনেক করে মোটা সুতোর জামাকাপড় ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পায় না ওরা। ধর্মাদের মতো ওরাও পুরুষানুক্রমে বেগার দিয়ে চলেছে।

গরু-মোষের চালাগুলোর গায়ে হাল-লাঙল আর গাড়ি রাখার জায়গা। ওখানে উঁচু উঁচু চালা বানানো হয়েছে।

খামার বাড়ির গায়ে বেশ ক'টা নিচু নিচু মাটির ঘর। ঘরগুলো এখন খালি পড়ে আছে। চাষের কাজের জন্য বছরে মাস তিনেকের জন্য যে মরশুমী ফুরনের কিষানদের নিয়ে আসা হয়, এ-বছর তারা এখনও আসেনি। ওরা এলে ওই ঘরগুলোতে থাকে।

ধর্মারা খামারবাড়িতে এসে দেখল অন্য দিনের মতো একেবারে সামনের ঘরটার দাওয়ায় পুরু গদির ওপর বসে আছে হিমগিরিনন্দন ঝা। রঘুনাথ সিংয়ের এই খামারটার পুরো দায়িত্ব তার ওপর। আর এই বারান্দাটা হল তার সেরেস্তা। মর্যাদা বাড়াবার জন্য সে নিজে আংরেজি করে বলে কানটোল রুম (কনট্রোল রুম)। সকাল ছ'টা থেকে রাতের সিকি ভাগ পর্যন্ত এখানে বসে বসেই কিষান খাটানো, জমি চষার সময় হাল-বয়েল দেওয়া, সন্ধেয় তাদের খোরাকি মেপে দেওয়া, ফসল রোয়ার দিনে কিষানদের ভাগে ভাগে বীজ বেঁটে দেওয়া থেকে কোন গোলায় কী জাতের ফসল থাকবে তার হেফাজত করা পর্যন্ত সব দিকে হিমগিরিনন্দনের কড়া নজর। এমনিতে আর সব মানুষের মতো তার এক জোড়াই চোখ। কিন্তু আদতে হিমগিরির চোখ হল হাজার খানেক। দুটো ছাড়া বাকি সবই অদৃশ্য। তার চোখে ধুলো ছিটিয়ে কারুর ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই।

এই মুহূর্তে গদিতে বসে ধীর চালে অনবরত পা নাচিয়ে চলেছে হিমগিরি। এই পা নাচানোটা তার অনেক কালের আদত। তার সামনে রয়েছে একটা উঁচু কাঠের ডেস্ক।

লোকটার বয়স বাহান্ন-তিপান্ন। গোলগাল চেহারা। ভারি নাক, মোটা ভুরুর তলায় ঢুলু ঢুলু ঘুমন্ত

চোখ থাকলে কী হবে, এমন সজাগ তীক্ষ্ণ চোখ ভূ-ভারতে অন্য কারুর নেই। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল প্রায় চামড়া ঘেঁষে ছাঁটা, পেছন দিকে এক গোছা লম্বা টিকির মাথায় ফুল বাঁধা। কপালে চন্দনের ছাপে দেবনাগরী হরফে লেখা 'জয় রাম, জয় রাম, জয় কিষুণ, জয় কিষুণ।' পরনে মোটা সুতোর পাড়হীন ধুতি আর কুর্তা।

মৈথিলী ব্রাহ্মণ এই লোকটার চামড়া খুবই মিহি, মসৃণ আর তেলতেলে। গারুদিয়া তালুকের মানুষেরা বলে, 'ওর গা বেয়ে 'মাখ্খন' গড়িয়ে পড়ে।' লোকেরা আরো বলে, 'এই ঝা লোকটা হল লাকড়া (নেকড়ে)। বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের অনেকগুলো পোষা জন্তু রয়েছে। তাদের মধ্যে একটা লাকড়া, একটা সিয়ার (শিয়াল)। একজন হিমগিরিনন্দন ঝা, আরেকজন মুনশি আজীবচাঁদ।'

পা নাচাতে নাচাতে ধর্মাদের দিকে তাকাল হিমগিরি। বলল, 'এখনও তো সূরয পুরা ডোবে নি, এর ভেতরেই কাম হয়ে গেল! হারামজাদগুলো বহোত ফাঁকি দিচ্ছিস।' লোকটার গলার স্বর যেমন সরু তেমনি চড়া, কানের পর্দায় ছুঁচের মতো বিঁধে যায়। ওই রকম মোটা ভারি তেল চুকচুকে শরীরের ভেতর থেকে কী করে যে এমন স্বর বেরোয় সেটাই একটা আশ্চর্যের ব্যাপার।

ধর্মারা কেউ কিছু বলল না। জ্যৈষ্ঠ মাসের জ্বলন্ত আকাশের তলায় সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত জমি চষার পরও বছরের পর বছর, আবহমান কাল ওরা ফাঁকি দেওয়ার কথাই শুনে আসছে। কিন্তু হিমগিরিনন্দনের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস কারুর নেই।

হিমগিরি ফের বলল, 'আজ যা করার করেছিস, কাল সূরয ডোবার আগে জমিন থেকে হাল-বয়েল তুলে ফেললে খোরাকি কাটা যাবে। কানমে বাতঠো ঘুষল হো (কানে কথাটা ঢুকল)?'

সবাই ঘাড় কাত করে জানায় — ঘুষেছে।

'যা, আভি হাল ঔর বয়েলিয়া জমা কর —' বলেই ডেস্কের তলা থেকে পেটমোটা একটা দুধের বোতল বার করে গলায় উপুড় করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বগ বগ করে শব্দ উঠতে লাগল।

ধর্মারা জানে ওই ডেস্কের তলায় দশ বারটা দুধের বোতল সাজানো আছে। খাঁটি মোষের দুধ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খানিকক্ষণ পর পর দুধ খেয়ে যায় হিমগিরি। একেবারে বেড়ালের ধাত। বোতল বোতল স্নেহজাতীয় বস্তু গলা দিয়ে শরীরে ঢোকার ফলেই তার চামড়া এত মিহি, এত মোলায়েম আর জেল্লাদার।

বোতল শেষ করে একটা পেতলের ডিবে বার করে এক খিলি পান মুখে পুরল হিমগিরি। যত বার দুধ তত বার পান।

হিমগিরি যখন পান চিবুচ্ছে তখন ধর্মারা ওধারের বয়েল আর মোষ রাখার চালার নিচে গিয়ে পশুগুলোকে জমা দিয়ে সেটার পাশের চালায় হাল-লাঙল রেখে এল। গরু মোষ এবং লাঙল টাঙল বুঝে নেওয়ার জন্য চালাগুলোতে অন্য লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। একটু এদিক ওদিক হলে তারা চেঁচিয়ে হিমগিরিকে জানিয়ে দেবে।

ধর্মা আর দেরি করল না। কোয়েলের খাতে সেই সাবুই ঘাসের জঙ্গলে কুশী দাঁড়িয়ে আছে। সে তার বয়েল দুটো আর লাঙল নিয়ে ওধারের চালাগুলোর দিকে এগিয়ে যায়।

সামনের চালাটায় বাজে-পোড়া তালগাছের মতো চেহারার আধবুড়ো রামধনিয়া খুদে খুদে গোল চোখে এদিকে তাকিয়ে আছে। লোকটার হাত পায়ের শিরাগুলো দড়ির মতো জট পাকানো। অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা আর আখাম্বা সে। সকালে এর কাছ থেকেই হাল-বয়েল নিয়ে গিয়েছিল ধর্মা। এগিয়ে গিয়ে সে বলে, 'এ লে, তুহারকা বয়েলিয়া আউর —'

রামধনিয়া লাঙলটা নিয়ে চালার একধারে খাড়া করে রাখে। তারপর তীক্ষ্ণ চোখে বয়েল দুটোকে দেখতে থাকে। একটা বয়েলের আগাপাশতলা দেখা হয়ে গেলে একটা ছোকরাকে ডেকে পশুটাকে রাতের খাদ্য কিছু জাবনা দিতে বলে। তারপর দ্বিতীয় পশুটাকে লক্ষ করতে করতে আচমকা সেটার নাকে লম্বা কাটা দাগ দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা-জড়ানো চেরা গলায় চেঁচায়, 'বয়েলিয়াকা নাক পর ক্যায়সা চোট হুয়া রে?'

কেমন করে বয়েলটার নাকে চোট লাগল, ধর্মা জানে না। খুব সম্ভব লাঙল টানার সময় জমির

কাঁটাগাছ খেতে গিয়ে বা শক্ত শেকড় টেকড় লেগে কেটে থাকবে। কিন্তু সকালে সম্পূর্ণ সুস্থ অক্ষত একটি জন্তু দিয়ে সন্ধেয় চোট-লাগা অবস্থায় তাকে সহজে ফেরত নিতে চাইবে না রামধনিয়া। তাদের মতোই অচ্ছুৎ এই লোকটা এবং পেটভাতার ক্রীতদাস। তবু পুরুষানুক্রমে বড়ে সরকারের নৌকরগিরি করে করে তার আদতটাই খারাপ হয়ে গেছে। রঘুনাথ সিংয়ের জমিজমা, অচেতন এবং জীবন্ত তাবৎ সম্পত্তি সে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে। সবই অভ্যাস। রক্তের মধ্যে প্রবাহিত বহু কালের প্রাচীন সংস্কার।

এখনই রামধনিয়া বয়েলের নাকের আঁচড় নিয়ে গলার স্বর সাত পর্দা চড়িয়ে চিৎকার জুড়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে হিমগিরিনন্দন চেঁচামেচির কারণটা জেনে যাবে। তার ফলাফল কী হতে পারে ভাবতেই গল গল করে ঘামতে শুরু করল ধর্মা। কাঁপা, ভীত গলায় সে বলে, 'মালুম নায় রামধনিয়া ভেইয়া—'

রামজিকা অসীম কিরপা, রামধনিয়া আজ কেন যেন চেঁচায় না। শুধু বলে, 'বহোত হোঁশিয়ার রহনা ধম্মা! মনে রাখিস তোর চাইতে এই জানবরের দাম অনেক বেশি। তুই মরলে কুছু হবে না। মগর এই বয়েলটার কুছু হলে বড়ে সরকারের পান শ (পাঁচশ), হাজার রুপাইয়া বরবাদ।'

ধর্মা মাথা নাড়ে, মনে রাখবে। তারপর রামজির পায়ে মনে মনে দশ বার মাথা ঠেকিয়ে ভাবে, একটা ফাঁড়া কাটল। সে আর দাঁড়ায় না, রামধনিয়ার কাছ থেকে সরে আসে। ওদিকে বয়েলটা রামধনিয়ার হাত থেকে সেই ছোকরার জিম্মায় চলে যায় এবং জন্তুটা তার রাতের বরাদ্দ কুচনো খড়, খোল এবং ভেলিগুড়ের মিশ্রিত মণ্ড পেয়ে যায়।

ধর্মার পর অন্য সবাই বয়েল লাঙল জমা দিতে থাকে।

হাল-টানা জন্তুগুলোকে বুঝিয়ে দিয়ে ধর্মারা যখন চলে যাবে সেই সময় হিমগিরি তাদের ডাকল, 'শোন—'

ধর্মারা কাছে এগিয়ে এলে হিমগিরির ঘুমন্ত ঢুলু ঢুলু চোখ একেবারে বদলে গেল। চরকির মতো সে দুটো গণেরি, বুধেরি, ধর্মা থেকে শুরু করে সবগুলো মেয়ের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরতে লাগল। খানিকক্ষণ দেখার পর ভুরু কুঁচকে বলল, 'সবাইকে তো দেখছি, ওহী ছোকরিয়া কঁহা গৈল?'

গণেরি জিঙেস করল, 'কৌন?'

'কুশী।'

গণেরি উত্তর দেওয়ার আগে ধর্মা বলল, 'কুশী আয়ী নেহী। জমিনসে চলি গয়ী।'

তীক্ষ্ণ সরু গলায় হিমগিরি চেঁচিয়ে উঠল, 'ঝুট। ছোকরিয়া কামমে নেহী আয়ী। এক রোজ আদমী নেহী ভেজা তো বাস কাম চৌপট। পেটের দানা অ্যায়সা অ্যায়সা মেলে!'

অন্য দিন সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দশ বার করে জমিতে লোক পাঠায় হিমগিরি। নিজেও কখনও কখনও গিয়ে হানা দেয়। উদ্দেশ্য, কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা, সেটা লক্ষ রাখা। আজ ইচ্ছে করেই লোক পাঠায় নি হিমগিরি। মাঝে মাঝে একটু ঢিলে দিয়ে সে দেখতে চায় কেউ ফাঁকি দিচ্ছে কিনা।

ধর্মা বলল, 'আয়ী সরকার। হামনিকো সাথ থী। পুরা রোজ কাম কিয়া থী।'

'ঝুট, পুরী ঝুট। শুনা হ্যায় উয়ো ছোকরিয়াকো সাথ তুহারকো পেয়ার চালু হো গিয়া। উসকী বাঁচানেকো বাহানা। ছোকরির এক রোজের খোরাকি আমি কাটব।'

'নায় নায় দেওতা, অ্যায়সা নায় করনা। উ আয়ী ইয়া নেহী আয়ী, সব কোইকো পুছো — এ গণেরি চাচা, এ বুধেরি চাচা, এ ঢোড়াইয়া, এ এতোয়ারী, এ শনচারী বোল্ তু লোগ, বোল্ না —' সবার দিকে ঘুরে ঘুরে কাকুতি মিনতি করতে লাগল ধর্মা। সারাদিন ঝলসানো রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করেছে কুশী। তবু একটা ঝুটা অজুহাত তুলে তার খোরাকি কাটতে চাইছে এই মৈথিলী বামহনটা কিন্তু কিছুতেই তা হতে দেবে না ধর্মা।

গণেরিরা এবার বলে উঠল, 'হাঁ দেওতা, কুশী পুরা রোজ জমিনমে থী। আভি গৈল — ভগোয়ান রামজি কসম।'

হিমগিরি বলল, 'ঠিক আছে, আজকের দিনটা ছেড়ে দিলাম। লেকিন এক বাত, কাল থেকে সুবে

সবাইকে এখানে আসতে হবে, আবার সামকো কাম পুরা হওয়ার পরও সবাই আসবি। কানমে ঘুষল?'

অর্থাৎ সত্যি সত্যি ধর্মারা হাজিরা দিচ্ছে কিনা সেটাই এভাবে দেখতে চায় হিমগিরি। সকলে মাথা কাত করে জানায় কাল থেকে তারা দু'বারই এখানে আসবে।

একটু চুপচাপ। সবাইকে দেখতে দেখতে শনিচারীর ওপর নজর আটকে গেল হিমগিরির। জাবর কাটার মতো চাকুম চুকুম করে পান চিবিয়েই যাচ্ছিল সে। শনিচারীকে দেখতে দেখতে তার ভুরু কুঁচকে যেতে লাগল। মেয়েটার পেটে পাঁচ-ছ মাসের বাচ্চা রয়েছে।

শনিচারী লজ্জায় মুখ তুলতে পারছিল না, একেবারে কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে ঘাড় নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

বেশ খানিকটা সময় শনিচারীকে দেখার পর হিমগিরি গলার স্বর ঈষৎ চড়িয়ে বলে ওঠে, 'হারামজাদী কুত্তী —'

শনিচারী তো বটেই, অন্য সকলেও চুপ।

হিমগিরি আবার বলে, 'দো সাল আগে না একটা বাচ্চা হয়েছে তোর?'

শনিচারী উত্তর দেয় না। জগতের সবটুকু সংকোচ সারা গায়ে মেখে নতচোখে দাঁড়িয়েই থাকে।

এদিকে হিমগিরি হঠাৎ খেপে উঠল যেন, 'মুহ্‌সে বাত নিকালতে নেহী! বহোত শরমবালী! হাঁ কি নায় — বোল্, বোল্ —'

শনিচারী সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল, 'জি দেওতা —'

'এখন তো বড়ী শরম। লেকেন মরদের সিনার ওপর সিনা চড়িয়ে না শুলে নিদ আসে না — ক্যা?'

শনিচারী চুপ।

অশ্রাব্য একটা খিস্তি দিয়ে হিমগিরি এবার বলে, 'হর সাল বাচ্চা পয়দা করবি। বাচ্চার বাহানা করে দো মাহিনা করে কামে ফাঁকি মারবি — এ নেহী চলেগি। নায় কাম তো নায় খোরাকি। কানমে ঘুষল?'

'কানমে ঘুষল' শব্দ দুটো হিমগিরির কথার মাত্রা। শনিচারীরা ঘাড় কাত করে জানায় কানে ঢুকেছে।

সোমবারী, গাংনী, কুঁদরী — এমন জনকয়েক শাদি-হওয়া যুবতী গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা চোখ ছোট করে এবার তাদের দিকে তাকায় হিমগিরি। সরু গলায় বলে, 'তোদের মতলব কী রে জোয়ানী মুরগিরা?'

কেউ উত্তর দিল না।

হিমগিরি বলে, 'একটা বাত মনে রাখিস। আপনা আপনা মরদের সাথ জেয়াদা মজা লুটবি না। হর সাল মুরগির মতো যদি আণ্ডা পাড়িস আর খেতির কাম বন্ধ হয়ে যায়, লাথ মার মারকে একেক জনের পাছার হাড্ডি তুড়ে দেব। কানমে ঘুষল?' বলেই বোতল বার করে গলায় বগ বগ শব্দ তুলে আবার খানিকটা ভয়সা দুধ খেয়ে মুখ মোছে। তারপর পান চিবুতে চিবুতে ফের বলে, 'আচ্ছা করকে শুনে রাখ, দশ সাল বাদ বাদ এক এক আণ্ডা। দো বাচ্চার পর ফুল ইস্টপ। গরমিন কানুন বানিয়ে দিয়েছে! কানমে ঘুষল?' মাঝে মাঝে দু-একটা ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে কথা বলে সে।

সবাই নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচকিরির মতো পানের পিচ ফেলে হিমগিরি আবার বলে, 'ভাদই (ভাদ্র) মাসের কুত্তীর দল। মওকা পেলেই পেট ফোলাবার ধান্দা!'

কুঁদরী নামের মেয়েটা—তার রুক্ষ লালচে চুল ঝুঁটিবাঁধা, বুক যেন জোড়া পাহাড়, পতলী কোমর, দেওদার গাছের গুঁড়ির মতো উরু—খুবই হাসিখুশি সে, তবে ডাকাবুকো। ভয়ডরটা তার কম। বামহন, অন্য উঁচা জাত, মুনশি, কাউকেই বিশেষ রেয়াত করে না। তাদের সামনাসামনি মুখের ওপর কিছু বলে না, তবে আড়ালে যা বলে তাতে ভয়ে অন্যদের বুক কাঁপে। তা ছাড়া তার জিভ ভীষণ আলগা, মুখে কোনো কথাই আটকায় না। সোমবারীর কানের ভেতর মুখ গুঁজে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'বুড়হা

লাকড়াটা ক্যা কহ্‌ল রে! ছোকরিদের এহী সিনা, এহী কোমর, এহী জোয়ানি নিয়ে মরদের পাশে শোবে আর মরদ 'মেরে কালাপন দুলহানিয়া' বলে তার সিনার ওপর যখন তার অওরতকে তুলে নেবে তখন এই বামহনটার কথা মনে থাকবে?'

সোমবারী খানিকটা কুঁকড়ে গিয়ে দ্রুত চারপাশ দেখে নেয়। তারপর বলে 'বেশরম—'

কুঁদরী বলতে লাগল, 'মরদ যখন আটার মতো ডলতে থাকে তখন শরম লাগে না? শুনলেই বেশরম — ও হো-হো-হো—'

'চুপ হো যা। কোঈ শুনেগা —'

'শুনুক। দশ সাল বাদ বাদ এক এক আণ্ডা! তার আগে হলে বামহনটা পাছার হাড্ডি তুড়ে দেবে। ওহো-হো-হো, হাড্ডি তোড়নেবালা! বুড়হা লাকড়ার মুখে তিন লাথ, তিন বার থুক —' বলে গুনে গুনে তিনবার থুতু ফেলল কুঁদরী।

সোমবারী ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে সে বলে, 'চুপ হো কুঁদরিয়া — চুপ হো যা —'

ঘুমন্ত হলে কী হবে, হিমগিরির চোখ হল শকুনের চোখ আর কান দুটো কুকুরের কান। সে কুঁদরীদের দিকে তাকাল। কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যা বাত? কী হয়েছে?'

কুঁদরীটা দুম করে কিছু বলে ফেলতে পারে। তার ফলাফল হবে খুবই খারাপ। তাই সোমবারী দম-আটকানো গলায় তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কুছ নায় দেওতা, কুছ নায়।'

ধারাল সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে হিমগিরি। তবে আর কোনো প্রশ্ন করে না। শুধু বলে, 'কুঁদরী বহোত হারামী ঔরত।'

সন্ধে হয়ে আসছিল। সূর্যটা মিনিট কয়েক আগে ডুবে গেছে। হালকা অন্ধকার এই অঞ্চলটার গায়ে উলঙ্গবাহার শাড়ির মতো জড়িয়ে রয়েছে।

ধর্মা ভয়ে ভয়ে একসময় বলে, 'বামহন দেওতা, আপহিকো হুকুম হো তো ঘর লৌট যায় —' কুশী অনেকক্ষণ কোয়েলের খাতে সাবুই ঘাসের জঙ্গলে তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার জন্য ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠেছিল সে।

তা ছাড়া আজ তাদের খোরাকি নেওয়র দিনও না। রঘুনাথ সিংয়ের চাষের জমিতে পেটভাতায় কাজের বদলে তাদের জন্য যে খাদ্য বরাদ্দ তা তারা রোজ পায় না, একদিন পর পর পায়। কাল দু'দিনের খোরাকি হিসেব করে নিয়ে গেছে। আবার আসছে কাল সারাদিন জমিতে কাজের পর দু'দিনের খাদ্য পাবে।

হাল-লাঙল রাখার যে টানা টিনের চালাগুলো রয়েছে তার ওধারে যে তালাবন্ধ লম্বা চালাটা, সেখান থেকে ধর্মাদের ভাগের খাদ্য মেপে দেওয়া হয়।

যা বলার বলা হয়ে গেছে। হিমগিরি বলে, 'যা—' কিন্তু ধর্মারা যখন ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে সেই সময় কী মনে পড়ে যেতে খুব ব্যস্ত ভাবে ডেকে ওঠে, 'আরে শুন শুন—'

সবাই ঘুরে দাঁড়ায়, 'জি—'

'ঘরে লৌটবার আগে একবার বড়ে সরকারের মকান হয়ে যা।'

বড়ে সরকার অর্থাৎ রঘুনাথ সিংয়ের সঙ্গে ধর্মাদের এমনিতে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। অত উঁচুতে যাওয়ার সাহসও তাদের কখনও হয় না। তাদের যাবতীয় কাজ-কারবার হিমগিরিনন্দনের সঙ্গে। হঠাৎ বড়ে সরকারের মকানে কেন তাদের যেতে হবে, সেটা ভেবে পায় না তারা। ধর্মারা মনে করতে পারে না, বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং কোনো দিন ওদের নিজের মকানে ডেকেছেন কিনা। শুধু ওদেরই না, রঘুনাথ সিংয়ের বাপ-ঠাকুরদা ধর্মাদের বাপ-ঠাকুরদাকে কখনও ডেকেছেন বলেও তারা শোনেনি। একই সঙ্গে ভয় এবং কৌতূহল তাদের পেয়ে বসে।

হিমগিরি এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়। বড়ে সরকার এবার 'এম্লে' হতে যাচ্ছেন। তাই নিজের লোকদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলবেন। পাটনা থেকে ফিরেই তিনি খবর পাঠিয়েছেন, বছরের পর বছর যারা তাঁর কাছে কাজ করছে সেই সব আপনা আদমীরা জমিন থেকে ফিরলেই যেন তাঁর মকানে পাঠিয়ে দেয় হিমগিরি।

হিমগিরি আরো জানায়, বড়ে সরকার নিজে ধর্মাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, এটা তোদের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য। খুবই খুশনসিব তারা। তাড়া লাগিয়ে বলে, 'যা যা, চলা যা—'

ধর্মার অস্থিরতা বাড়ছিলই। বড়ে সরকারের বাড়ি যাওয়া মানে আরো খানিকটা সময় বরবাদ। আবার না গেলেও নয়। তার ঘাড়ের ওপর এমন শক্ত মাথা নেই যাতে বলতে পারে — যাবে না, অগত্যা ঘাড় গুঁজে অন্য সবার সঙ্গে সে বড়ে সরকারের হাভেলির দিকে এগিয়ে যায়।

তিন

খামার বাড়ি থেকে দেড়-দুই ফার্লং দূরে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের প্রকাণ্ড কোঠি। পুরনো আমলের মোটা মোটা থামওলা বিশাল দোতলা বাড়িটা বানিয়ে ছিলেন রঘুনাথ সিংয়ের ঠাকুরদা মেঘরাজ সিং। একতলা এবং দোতলা মিলিয়ে মোট শ দেড়েকের মতো বিরাট বিরাট ঘর। এককেটা দরজা আট ফুট উঁচু আর ছ-ফুটের মতো চওড়া। জানালাগুলোতে খাঁজকাটা রঙিন কাচের শার্সি। ঘরের দেওয়াল এবং ছাদে পঙ্খের কাজ আর প্রতিটি ঘরে ঝাড়লণ্ঠন। আগে ঝাড়লণ্ঠনের বাতিদানে মোম জ্বলত। রঘুনাথ সিং দশ মাইল দূরের সাব ডিভিসনাল টাউন থেকে নিজের পয়সায় শালকাঠের খুঁটি বসিয়ে বিজলি আনিয়েছেন। বাতিদানে এখন তাই নানা রঙের বাল্ব জ্বলে। প্রত্যেকটা দরজায় বড় বড় পেতলের গুল বসানো। এগুলো বাহার খোলার জন্য।

দোতলার খানকতক ঘর জুড়ে রয়েছে ছোটখাট একটা মিউজিয়ম। রঘুনাথ সিংয়ের বাবা বনরাজ সিংজি ছিলেন দুর্দান্ত শৌখিন মানুষ। দেশ-বিদেশের নানা দুষ্প্রাপ্য কিউরিও যোগাড় করে তিনি ঘরগুলো সাজিয়েছেন। তাছাড়া শিকারেরও প্রচণ্ড শখ ছিল তাঁর। তিনটে ঘর ভর্তি রয়েছে বাঘ আর হরিণের ছাল, চিতার মুণ্ডু, পাইথনের চামড়া, হাতির দাঁত ইত্যাদি দিয়ে। ঠাকুরদা মেঘরাজজির ছিল গানবাজনার ঝোঁক। ইন্ডিয়ার নানা জায়গা থেকে ধ্রুপদ খেয়াল আর গজল গাইয়েদের এবং সেতার সরোদ আর এস্রাজ বাজিয়েদের আনিয়ে গান-বাজনা শুনতেন, নিজেও চর্চা করতেন। তাঁর বাজনার হাত এবং গানের গলা ছিল বেশ রেওয়াজি। দুটো ঘর বোঝাই হয়ে রাজ্যের সরোদ সেতার হারমোনিয়াম তবলা ডুগি তাঁর গানবাজনার স্মৃতি ধরে রেখেছে। তবে এখন এই কোঠিতে এ সবের সমঝদার কেউ নেই। মাঝে মধ্যে নৌকরদের দিয়ে ওই ঘর দুটো খুলিয়ে বাদ্যযন্ত্রগুলি ঝাড়ামোছা করানো হয়। হাজার হোক পিতৃপুরুষের স্মৃতি তো!

বিরাট বাড়ির সামনের দিকে সুবিশাল কমপাউন্ড। তার একধারে রয়েছে ঘোড়ার আস্তাবল। দামি দামি ডজনখানেক ওয়েলার ঘোড়া আছে রঘুনাথ সিংয়ের, আছে ঝকঝকে ফিটন। আর মোটা মোটা থামে বাঁধা রয়েছে গোটা তিনেক হাতি। কখনও সখনও ইচ্ছে হলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হাতিতে চড়ে ছোটনাগপুরের জঙ্গলে চিতা হরিণ কি পাখি শিকার করতে যান।

তবে মোটরের ব্যাপারে বিশেষ শখ নেই রঘুনাথ সিংয়ের। আজকাল কত রকমের ঝকঝকে নতুন ডিজাইনের মোটর বেরিয়েছে। মাঝে মাঝে যখন তিনি পাটনা বা কলকাতায় যান, সেসব চোখে পড়ে। ইচ্ছা করলে ওই রকম দু'চারটে গাড়ি তিনি যখন তখন কিনে ফেলতে পারেন কিন্তু ইচ্ছা হয় না। পুরনো মডেলের বড় বড় চাকাওলা আর কাপড়ের হুড-লাগানো মোটর নিয়েই তিনি খুশি। মোট কথা, সাবেক আমলের খানদানী চালের দিকেই তাঁর ঝোঁক।

হিন্দু কোড বিল পাশ হওয়ার আগেই দুটো বিয়ে চুকিয়ে ফেলেছিলেন রঘুনাথ সিং। অবশ্য যে ভারতবর্ষে হিন্দু কোড বিল চালু আছে তার সীমানার বাইরে রঘুনাথ সিংয়েব এই গারুদিয়া তালুক। এখানে তাঁর নিজস্ব আরেক ভারতবর্ষ। ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট যত আইনকানুনই পাশ করুক, দিল্লি থেকে দু' আড়াই হাজার কিলোমিটার পার হয়ে তার খুব সামান্যই এখানে এসে পৌঁছুতে পারে। নিজের ইচ্ছামতো কিছু আইনকানুন তৈরি করে পুরনো ফিউডাল সিস্টেমটাকে প্রায় পুরোপুরিই বজায় রেখেছেন রঘুনাথ। ইচ্ছা করলে একটা কেন, কয়েক ডজন বিয়ে করলেই বা তাঁকে ঠেকাচ্ছে কে?

তাঁর এক স্ত্রী স্বজাত রাজপুত ক্ষত্রিয়ের ঘর থেকেই এসেছিল, আরেক জন এসেছে কায়াথদের ঘর থেকে। মহিলাটি ছিল মহকুমা হাসপাতালের নার্স। রাস্তায় তাকে দেখে মজে গিয়েছিলেন রঘুনাথ সিং। রাত্তিরে লোক পাঠিয়ে তার মুখে কাপড় গুঁজে নার্সের কোয়ার্টার্স থেকে তুলে এনেছিলেন। তবে রঘুনাথ সিংয়ের নাম তাঁদের কৌলিক ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে এই জন্য যে, নার্স মেয়েমানুষটির শাঁসটুকু খেয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দেন নি। সেই রাতেই মৈথিলী পুরুত ডেকে রীতিমত বৈদিক মতে হোম-যজ্ঞটজ্ঞ করে বিয়ে করেছিলেন। এই নিয়ে প্রথম স্ত্রী খুব গণ্ডগোল করেছিল। হাজার হোক রাজপুত ক্ষত্রিয়ের ঘরের মেয়ে, কয়েক শ বছর আগের একটা তেজী ঐতিহাসিক ব্যাকগ্রাউন্ড তো রয়েছে।

কিন্তু রঘুনাথ সিং মরদকা বাচ্চা। বলা যায় শেরের বাচ্চাও। গণ্ডগোল দু'দিনেই থামিয়ে দিয়েছিলেন। তবে রাজপুতের মেয়ে আর কায়াথের মেয়েতে বনিবনা হয়নি। পারতপক্ষে কেউ কারুর মুখ দেখতে চায় না। একই কোঠির পিঁজরাতে দুই জেনানাকে দুই মহল্লায় রেখেছেন রঘুনাথ সিং। তিরিশ-বত্রিশ সাল পাশাপাশি থেকেও দুই সতীনের কথাবার্তা নেই। তাদের মধ্যে আমৃত্যু শত্রুতা এবং যুদ্ধ।

সতীনরা এমনটা হয়েই থাকে। কাজেই এ ব্যাপারে মাথা ঢোকান না রঘুনাথ সিং। কে কী করছে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র পরোয়া নেই তাঁর।

দুই স্ত্রীর সাতটি করে মোট চোদ্দটি ছেলেমেয়ে। এ ব্যাপারে রঘুনাথ সিংয়ের এতটুকু পক্ষপাতিত্ব নেই। দু'জনকেই নিরপেক্ষভাবে সমান সমান সন্তান উপহার দিয়েছেন। অন্য দিক থেকেও তিনি খুব বিবেচক। মাসের শুক্লপক্ষ এক স্ত্রীর কাছে কাটান, কৃষ্ণপক্ষ আরেক স্ত্রীর কাছে।

কায়াথনী আর রাজপুতানীর মুখ দেখাদেখি বন্ধ, কথাবার্তা বন্ধ, দুই সতীনের দুই মহলের মাঝখানে অদৃশ্য কাচের বাউন্ডারি ওয়াল। তা হলে কী হবে, চোদ্দটি সওতেলা ভাইবোনের মধ্যে মায়েদের মতো ঝগড়াঝাঁটি নেই। তারা মাঝখানের বাউন্ডারি ভেঙে দু ধারেই যাওয়া-আসা করে।

যাই হোক, পুরনো ফিউডাল জমানা এ বাড়ির আবহাওয়ায় অনড় হয়ে আছে।

ধর্মারা বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের কোঠিতে এসে দেখল, এই জষ্ঠি মাসে দশেরা কি রামনবমীর মতো পরব শুরু হয়ে গেছে। সামনের কমপাউন্ডে অনেকগুলো ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলোর তেজ এত বেশি যে মাটিতে সুঁই পড়লে তুলে নেওয়া যাবে।

কমপাউন্ডের মাঝখানে সিংহাসনের মতো প্রকাণ্ড একটা হাতল-ওলা সোফায় বসে আছেন রঘুনাথ সিং। লোকটার গায়ে প্রচুর চর্বি। গোল চাকার মতো মুখ, প্রকাণ্ড কাঁধ, টেরি-কাটা বাবরি চুল, লম্বা টান টান নাক, ঘন ভুরুর তলায় ছোট ছোট চোখ। গাল নিখুঁত কামানো, তবে একজোড়া মোমে-মাজা ছুঁচলো গোঁফ রয়েছে।

রঘুনাথের পরনে চুস্ত আর ফিনফিনে কলিদার পাঞ্জাবি। গলায় সোনার সরু চেন। পাতলা পাঞ্জাবির তলায় সোনার চওড়া বিছে লাগানো বড় তাবিজ দেখা যাচ্ছে। পায়ে নক্‌শা-করা নাগরা।

এই মুহূর্তে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের গলার সোনার চেনের ওপর গোছা গোছা ফুলের মালা ঝুলছে। কপাল, মাথা এবং গাল আর চুস্ত পাঞ্জাবি গুলালে মাখামাখি।

তাঁকে ঘিরে এখন গারুদিয়া তালুকের প্রচুর মানুষজন। মহকুমা শহরের বড় ভকিল গিরধরলালজি, বঙ্গালী ডাগদর শ্যামদুলাল সেন, হেড মাস্টারজি বদ্রীবিশাল চৌবে — এমনি আরো অনেকে। এঁরা সবাই রঘুনাথ সিংয়ের বন্ধুবান্ধব, দিলের দোস্ত। নামেই দোস্ত। এ অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ, গাঁওবালা খেতমজুর থেকে মহকুমা শহরের সরকারি সেরেস্তার ছোট কেরানিবাবুটি পর্যন্ত সকলেই জানে ওই মাস্টারজি ভকিলজি কি ডাগদরসাবরা রঘুনাথ সিংয়ের পা-চাটা কুত্তা। নানাভাবে বড়ে সরকার নানারকম কুকুর পুষে আসছেন। কেউ এক নম্বর কুত্তা, কেউ দু'নম্বর কুত্তা, কেউ তিন নম্বর কুত্তা। চারদিকের হারামজাদা মানুষজন রঘুনাথ সিংয়ের বন্ধুবান্ধবের গায়ে এইভাবে নম্বর মেরে দিয়েছে। বড়ে সরকারের পা যে বেশি চাটতে পারে তার নম্বর আগের দিকে। যে তুলনায় কম চাটতে পারে

তার নম্বর পেছন দিকে।

রঘুনাথ সিংয়ের চারপাশে তাঁর বন্ধুরা বলাবলি করছিলেন, 'ক্যা খুশ খবর, সিংজি এম.এল.এ বনেগা।'

'বহোত আনন্দকা দিন।'

'পুরা দোনো তালুক বিজুরি ঔর গারুদিয়াকো ছে সাত লাখো আদমীকা ক্যা সৌভাগ—'

'ভাগোয়ান রামজিকো কিরপা, সিংজি ইঁহাকা এম.এল.এ বননে রাজি হুয়া—'

চারদিকে এত কথা হচ্ছে, কিন্তু রঘুনাথ সিং একেবারে চুপচাপ। সারা মুখে তৃপ্তি এবং নকল বিনয়ের একটি হাসি ফুটিয়ে অনুগত কুকুরদের তোষামোদের কথাগুলো উপভোগ করছিলেন।

এদিকে এক নম্বর কুত্তা মুনশি আজীবচাঁদ গোটা মাথায় আর পোশাকটোশাকে গুলাল মেখে কাঁধে একট. পেল্লায় লাড্ডুর ঝোড়া চাপিয়ে ছোটাছুটি করছে আর সবাইকে লাড্ডু বিলোতে বিলোতে গলার শিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিৎকার করে চলেছে, 'মেরে সরকার এম্লে বনে। হো রামজি, তেরে মায়া। লীজিয়ে ডাগদরসাব, লীজিয়ে ভকিল সাব, লীজিয়ে মাস্টার সাব — মুহ্ মিঠা কীজিয়ে। মেরে সরকার এম্লে বনে! ভেইয়া রামনৌসেরা, ভেইয়া ছেদিলালজি, ভেইয়া মধুকরজি মিঠাইয়া নাও—'

আজীবচাঁদ যেন একেবারে খেপে উঠেছে। রঘুনাথ সিং রাজধানী পাটনা থেকে আজ এম. এল.এ হওয়ার টিকেট পেয়েছেন। সেই উপলক্ষে গুলাল মাখামাখি এবং লাড্ডু বিলি হচ্ছে। বড়ে সরকারের এই কোঠিতে কম করে তিরিশ চল্লিশটা নোকর রয়েছে। তাদের কারুর ঘাড়ে লাড্ডুর ঝোড়া চাপিয়ে বিলি করানো যেত। কিন্তু আজীবচাঁদ কাউকে সে দায়িত্ব দিতে নারাজ।

এ সব পরবের মতো ব্যাপার যেখানে চলছে সেখান থেকে একশ গজ দূরে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে ধর্মারা। সাহস করে কেউ আর এগুতে পারছিল না।

ধর্মার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল কুঁদরী। সে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কা, জেঠ মাহিনামে ফাগোয়া আ গৈল? কেত্তে গুলাল —'

ধর্মা জানালো, হোলি না। বড়ে সরকারের ভোটে নামার ব্যবস্থা পাকা হয়েছে; তাই খুশিতে গুলাল মাখা, মিঠাই খাওয়া চলছে।

বুধেরি ওধার থেকে বলে উঠল, 'ইহাঁ হামনিকো কায় বুলায়া?'

'কা জানে।'

রাত হয়ে যাচ্ছে, কুশীটা সাবুই ঘাসের জঙ্গলে নিশ্চয়ই ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তা ছাড়া অন্য একটা কারণে ধর্মার ভয় এবং দুশ্চিন্তা দুই-ই হতে থাকে। সন্ধের পর অন্ধকার নামলে দক্ষিণ কোয়েলের ওদিকটায় কৈয়ারা হানা দেয়। কৈয়া বড়ই খতরনাক জানোয়ার। বাদামি রঙের এই জন্তুগুলো যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি হিংস্র। বেকায়দায় পেলে মানুষ তো কোন ছার, বাঘকেই কাবু করে ফেলে। ধর্মা খুবই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু এ অবস্থায় চলেও যাওয়া যায় না। বড়ে সরকারের কোঠি থেকে কখন যে ছাড়া পাওয়া যাবে তাই বা কে জানে।

আরো খানিকক্ষণ পর হঠাৎ রঘুনাথ সিংয়ের নজর এসে পড়ল ধর্মাদের ওপর। কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর গলায় অজস্র স্নেহ ঢেলে তিনি হাত নেড়ে ডাকতে লাগলেন, 'কি রে, তোরা অত দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

বড়ে সরকার যে এভাবে কোনোদিন কথা বলতে পারেন, ধর্মাদের চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও ভাবতে পারে নি। বিহ্বলের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে তারা শুধু বলতে পারল, 'জি সরকার —'

'কাছে আয়।'

যে মালিক আবহমান কাল নাগরা দিয়ে তাদের পিঠে স্থায়ী নক্শা এঁকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, পোষা পহেলবান লাগিয়ে তাদের ঠেঙিয়েছেন, ঘরের চালে আগুন লাগিয়েছেন, তাঁর এত কোমল কণ্ঠস্বর বড়ই তাজ্জব কা বাত। নিজেদের ইচ্ছায় নয়, একটা ঘোরের মধ্যে তারা সামনে এগিয়ে গেল।

বড়ে সরকার এবার ধর্মাদের দেখতে দেখতে বলতে লাগলেন, 'কেমন আছিস রে বুধেরি? তুই ঢোড়াইলাল? তুই কুঁদরি? তুই রামনেহাল?' জনে জনে সবাইকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন তিনি।

প্রতিটি মানুষের নাম জানেন রঘুনাথ সিং। শুধু নামই না, কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক, কার ক'টা ছেলেমেয়ে এবং তাদের নামধাম — সব তাঁর মুখস্থ।

'জি, আচ্ছা —' উত্তর দিতে গিয়ে বুধেরিদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে।

'বালবাচ্চা কেমন আছে?'

'জি, আপহিকো কিরপা। আচ্ছাই হ্যায়।'

'অ্যাই গণেরি, গেল সাল তোর বউয়ের পেটে না জল জমেছিল?'

'জি সরকার। অসপাতাল (হাসপাতাল) ভেজা থা।'

'এখন কেমন আছে সে?'

'ভালাই হো গৈল। আভিতক আচ্ছাই হ্যায় মালিক।'

'গিধনী তোর খবর কী?'

গিধনী নামের যুবতী বিধবা মেয়েটি চোখ নামিয়ে বলল, 'মালিক দেওতা, আপহিকো জমিনে কাম করে যাচ্ছি।'

রঘুনাথ সিং বললেন, 'জমিনের কাম তো পুবা জীওন আছেই। বাপ-মা নেই, মবদ নেই, জোয়ানী লড়কী। আপনা জাতের মধ্যে একটা ছোকরা দেখে শাদি করে ফেল। আমি তোর শাদির খরচা দিয়ে দেব।'

ওপাশ থেকে মুনশি আজীবচাঁদ লাড্ডু বিলি কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রেখে ডুকরে ওঠার মতো শব্দ করল, 'হোয় হোয়, ক্যা দিল মেরে বড়ে সরকারকো। বেসাহারা বেওয়াকো শাদির পুরা খরচা দিতে চাইছেন। সরকার এয়ে বনে তো জরুর রামরাজ আ যায়েগা —' বলেই আবার লাড্ডু বিতরণ শুরু করে।

এদিকে গিধনী থেকে আরম্ভ করে তাবৎ দলটা একেবারে হকচকিয়ে গেছে। বলছেন কী রঘুনাথ সিং! তারা কি সঠিক শুনছে! দুনিয়া কি হঠাৎ একেবারে ওলট পালট হয়ে গেল!

এই লোকগুলোর মনোভাব যেন খানিকটা আন্দাজ করতে পারলেন রঘুনাথ সিং। গলাটা আরো কোমল করে বললেন, 'আরে বাবা, হামনি তোহারকা আপনা আদমী — তোদের আপনজন। আমার কাছে তোরা থাকিস, আমার খেতে কামকাজ করিস। তোদের ভালাইতে তোদের বুরাইতে আমি পাশে থাকব না তো কে থাকবে?'

আজ কি ধর্মাদের শুধুই অবাক হবার পালা। একের পর এক কী বলে চলেছেন রঘুনাথ সিং! তিনি তাদের খুদ আপনা আদমী—এমন কথা কি তারা কোনোদিন স্বপ্নেও চিন্তা করেছে? মুনশি আজীবচাঁদ যে খানিক আগে রামরাজের কথা বলছিল—সত্যি সত্যিই কি তা এসে গেল! হো রামজি, তেরে কিরপা।

রঘুনাথ সিং ফের বললেন, 'এ গিধনীয়া, একটা ভাল লেড়কা পসন্দ করে ফেল। আগলে মাহিনায় ভোট। ভোটের পর তোর শাদি দিয়ে দেব।'

গিধনী আরক্ত লাজুক মুখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল। বাপ নেই, মা নেই — কেউ নেই তার। এই ভরা যৌবনে একটা সঙ্গীর বড় দরকার। নতুন করে শাদির স্বপ্ন এখন দেখে সে। এই মুহূর্তে রঘুনাথ সিংয়ের কথা শুনতে শুনতে তার বুকের ভেতরটা বর্ষার কোয়েল হয়ে উঠল। নিজের মধ্যে উথলপাথল তুফানের শব্দ শুনতে লাগল সে।

এবার রঘুনাথ সিং ধর্মার দিকে তাকালেন, 'তোর হালচাল কী রে ধর্মা?'

ধর্মা জানালো, বড়ে সরকারের কিরপায় দিন কেটে যাচ্ছে।

'তোর মা-বাপ ভাল আছে?'

'জি সরকার।'

এদিক সেদিক লক্ষ করতে করতে রঘুনাথ সিং বললেন, 'কুশীটাকে দেখতে পাচ্ছি না। ছোকরিটা তো তোর গায়ে সব সময় পরছাঁইয়ের মতো লেগে থাকে।'

ধর্মা বলল, 'খেতির কাম পুরা করে ও চলে গেছে।'

রঘুনাথ সিং ধর্মা আর কুশীর সম্পর্কটা খুব ভাল করেই জানেন। এসব জানাবার লোক আছে তাঁর। বললেন, 'কতদিন আর দু'জন চরকিব মতো ঘুরবি? এবার শাদিটা করে ফেল।'

গিধনীর মতোই লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে রইল ধর্মা।

রঘুনাথ আর কিছু না বলে ঘাড় ফিরিয়ে আজীবচাঁদকে ডাকলেন, 'মুনশি. এদের মিঠাইয়া দাও—'

'জি সরকার। তুরন্ত লাতে হ্যায়।' আজীবচাঁদ ওধার থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

চোখের পলক পড়তে না পড়তেই দেখা গেল মুনশি আজীবচাঁদ প্রকাণ্ড লাড্ডুর একটা ঝোড়া নৌকরের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে আসছে। অন্য সবাইকে নিজের হাতে মিঠাই বিলি করলেও অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের সে নৌকর দিয়েই দেওয়াবে। উঁচু বর্ণের মানুষ আজীবচাঁদ এই সন্ধেবেলায় জল-অচল বেগার-খাটিয়েদের ছুঁয়ে চোদ্দ পুরুষকে নরকে পাঠাতে পারে না।

আজীবচাঁদ যখন কাছাকাছি এসে পড়েছে সেই সময় একটা তাজ্জব কাণ্ড ঘটে গেল। রঘুনাথ সিং বললেন, 'মিঠাইয়ার ঝোড়া আমার কাছে আনো। নিজের হাতে আমি ওদের দেব।'

ধর্মারা আবার কী শুনছে! সরকার মালিক নিজের হাতে তাদের মতো জল-অচল অচ্ছুৎদের মিঠাইয়া বেঁটে দেবেন! হে ভাগোয়ান, হো পবনসুত, দুনিয়ায কি সত্যি স্বরগ নেমে এল! সবাই যে বলাবলি করছে রঘুনাথ সিং এম্লে বনলে রামরাজ নেমে আসবে, সেটা এখন আর মিথ্যে মনে হচ্ছে না। অবশ্য রামরাজ ব্যাপারটা যে কী সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই ধর্মাদের। ভাসাভাসা ভাবে তারা জানে রামরাজ কায়েম হলে তাদের এত দুঃখ এত কষ্ট থাকবে না, মোটামুটি সুখেই তারা থাকতে পারবে।

এদিকে রঘুনাথ সিং নিজের হাতে লাড্ডু বিলি করতে শুরু করেছেন। মাথা পিছু দুটো করে খাঁটি ভয়সা ঘিয়ে ভাজা দামি সুস্বাদু মিঠাই সবার হতে দিতে লাগলেন। যাদের বাড়িতে বুড়োবুড়ি বা কাচ্চাবাচ্চা রয়েছে, হিসেব করে তাদের ভাগেরটাও গুনে গুনে দিলেন।

মুনশি আজীবচাঁদ যে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। দুই হাত কচলাতে কচলাতে শরীরটা নানাভাবে বাঁকিয়ে চুরিয়ে গদগদ ভঙ্গিতে সমানে বলে যাচ্ছিল, 'বড়ে সরকার, মালিক আপনা হাতে অচ্ছুৎদের মিঠাইয়া দিচ্ছেন। রামরাজ আ গিয়া রে, জরুর আ গিয়া।'

সবাইকে মিঠাই দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত ধর্মার পালা এল। রঘুনাথ সিং বললেন, 'এই নে—তোর মা-বাপেব চারগো আর তোর দোগো--ছে'গো।'

ছ'টা লাড্ডু বেঁধে নিয়ে ধর্মা যখন কুশীর কথা ভাবছে সেইসময় রঘুনাথ সিং বললেন, 'তুই কিরকম জোয়ান রে?'

ধর্মা হকচকিয়ে গেল, 'জি–'

'আরে বুদ্ধু, স্রিফ নিজেই মিঠাইয়া খাবি। তোর দুলহানিয়ার জন্যে নিয়ে যাবি না?'

রঘুনাথ সিংয়ের বিবেচনার বহর দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল ধর্মা। কুশীর কথাটা তিনি ভোলেন নি। মনে মনে ধর্মা ঠিক করেই রেখেছিল নিজের ভাগ থেকে একটা লাড্ডু কুশীকে দেবে। বাপ-মায়ের ভাগ থেকে দেওয়া যাবে না। কেননা যখন তারা মহল্লার অন্য সবার মুখে শুনবে বড়ে সরকার মাথাপিছু দুটো করে লাড্ডু দিয়েছেন আর যখন দেখবে তাদের ভাগে দুটোর কম পড়েছে তখন চিল্লিয়ে সাতপাড়া মাথায় তুলে ফেলবে। বড়ে সরকার দেওতা, ভাগোয়ান-- তিনি যে কুশীকে ভোলেন নি সে জন্য মনে মনে ধর্মা আরো চোদ্দ জন্ম তাঁর বাঁধা নৌকর হয়ে রইল।

রঘুনাথ সিং আবার বললেন, 'এই নে কুশীর দোগো, আর তোর মা-বাপের চারগো—পুরা আধা ডর্জন।' বলে একটু মজা করলেন, 'দেখিস, দুলহানিয়ারটা আবার নিজেই খেয়ে ফেলিস না।'

কৃতজ্ঞ ধর্মা বলল, 'নায় সরকার--'

মিঠাই বিতরণ হয়ে গেল রঘুনাথ সিং বললেন, 'যা, এবার ঘরে যা। পুরা রোজ খেতির কামকাজ করেছিস। আর তোদের আটকে রাখব না। ঘরে গিয়ে আরাম কর।'

ধর্মারা মাথা ঝুঁকিয়ে বড়ে সরকারকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করে ফিরে চলল।

রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলি থেকে বেরিয়ে বাস্তায় আসতেই ধর্মারা দেখতে পেল, অনেক লোকজন

এগিয়ে আসছে। সবই চেনা মুখ। গারুদিয়া তালুকের নানা গাঁও-এর মানুষ। বাজার-গঞ্জ আর দশ মাইল দূরের ছোট মহকুমা শহরের কিছু লোকও রয়েছে তাদের মধ্যে।

কাছাকাছি আসতেই লোকগুলো খুব আগ্রহের গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কা, বড়ে সরকার এম্লে বন্ গিয়া?'

গণেরি বলল, 'নেহী। ভোটকা বাদ বনেগা জরুর।'

'শুনা গাঁওবালা সব কোঈকো মিঠাইয়া দেগা বড়ে সরকার--'

'কিধর শুনা?'

'মুনশিজি আদমী ভেজা, উ আদমী কহা। সচ?'

বোঝা গেল, রঘুনাথ সিংয়ের ভোটে দাঁড়ানো উপলক্ষে মুনশি আজীবচাঁদ গাঁয়ে-গঞ্জে আর মহকুমা শহরে লোক পাঠিয়ে লাড্ডু খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছে। গণেরি ঘাড় কাত করে বলল, 'হাঁ, সচ—'

লোকগুলোর চোখ চকচকিয়ে উঠল, 'কা মিঠাইয়া?'

'লাড্ডু।'

'হর আদমীকো ক'গো মিলা?'

'দোগো।'

লোকগুলো দাঁড়াল না। উর্ধ্বশ্বাসে রঘুনাথ সিংয়ের বড় মকানের দিকে দৌড় লাগাল। লাড্ডু ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তাদের সেখানে পৌঁছুনো দরকার।

চার

কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্মারা হাইওয়ের সেই জায়গাটায় এসে পড়ল যেখানে দক্ষিণ কোয়েলের শুখা খাতটা মিশিরলালজির বিজুরি তালুকের পাশ দিয়ে চলে গেছে।

ধর্মা বলল, 'তোরা গাঁওয়ে ফিরে যা। আমি পরে আসছি।' বলে এক মুহূর্তও দাঁড়াল না, লাফ দিয়ে কোয়েলের মরা খাতটায় নেমে ছুটতে লাগল।

এখন পূর্ণিমা চলছে। এই সন্ধেবেলাতেই চাঁদির কটোরার মতো গোল একখানা চাঁদ উঠে এসেছে আকাশে। গলানো রুপোর মতো টলটলে তরল জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। কোথাও একফোঁটা মেঘ নেই। জ্যৈষ্ঠের ঝকঝকে নীলাকাশ সমস্ত চরাচরের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। তার গায়ে জরির ফুলের মতো অগুনতি তারা বসানো।

লক্ষ কোটি বছরের পুরনো চাঁদের আলো গায়ে মেখে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতটা ছোটনাগপুরের গায়ে নিঝুম পড়ে আছে। যতদূর চোখ যায়, সাদা ধবধবে শুকনো বালি চিকচিক করে। কোয়েলের দু'ধারে ধুধু ফাঁকা শস্যক্ষেত্র, সেগুলোর গায়ে মানুষের তৈরি নানা জ্যামিতিক নক্‌শা, এলোমেলো ঝোপঝাড় বা দু-একটা ঢ্যাঙা গাছটাছ—সব এই মুহূর্তে কেমন যেন আশ্চর্য মায়াবী মনে হতে থাকে।

বালির ওপর দিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে একসময় ঘন সাবুই ঘাসের জঙ্গলের কাছে এসে পড়ল ধর্মা। ঘাসবনের একধারে একা একা টাঙ্গি হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল কুশী আর মাঝে মাঝেই পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে ডিঙি মেরে মেরে কোয়েলের খাত ধরে সোজা হাইওয়েটার দিকে তাকাচ্ছিল। তাকে রীতিমত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। কুশীর পাশে অনেকগুলো বগেড়ি পাখি বালির ওপর পড়ে আছে. সেগুলোর পায়ে দড়ি বাঁধা। পাখিগুলোর পাশে পড়ে আছে কুড়ি-বাইশটা বাঁশের চৌকো চৌকো জাল্‌সি-কাটা ফাঁদ। ফাঁদের ভেতর থেকে পাখি বার করে ওই অবস্থায় ফেলে রেখেছে কুশী।

ধর্মাকে দেখে কুশী বলল, 'তখন বললি খামারে হাল-বয়েল জমা দিয়ে তুরন্ত চ'লে আসবি।'

ধর্মা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কা করে, বড়ে সরকারের কোঠিতে যেতে হল যে।'

কুশী বলল, 'আমি এদিকে তুহারকে লিয়ে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। কোঈ নেহী ইধর,

গ্রিফ হামনি একেলী। বহোত ডর লাগি।'
ধর্মা জিজ্ঞেস করল, 'কৈয়া নিকলা?'
'নেহী।'
'হামনিকো বহোত চিন্তা হুয়া—তু একেলী হ্যায়, কৈয়া নিকালনেসে মুশকিল হো যায়েগা।' বলে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল ধর্মা। স্বস্তির নিঃশ্বাস।
কুশী এবার বলে, 'কৈয়া নিকলা নেহী, মগর মেজুর নিকলা বহোত—ঝুনকে ঝুন (দলে দলে)—' বলে সে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।
মেজুর অর্থাৎ ময়ূর। ধর্মার চোখে পড়ল খানিকটা দূরে কোয়েলের মরা খাতের চিকচিকে বালির ওপর ঝাঁক ঝাঁক ময়ূর পেখম মেলে ছোটাছুটি করছে। চাঁদের আলো দেখে ওধারের জঙ্গল থেকে ওরা বেরিয়ে এসেছে। ধর্মার একবার লোভ হয় পাথর ছুঁড়ে দু'একটা ময়ূর মারে। পরক্ষণে মনে পড়ে যায়, সরকার থেকে ঢ্যাড়া পিটিয়ে মূয়র মারা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই লোভটিকে দমিয়ে রাখতে হয়।
একটু ভেবে কুশী এবার জিজ্ঞেস করে, 'বড়ে সরকারের কোঠিতে কেন গিয়েছিলি?'
'মিঠাইয়া দিল যে। এই লে—' কুশী এবং তার মা-বাপের ভাগের লাড্ডু দিতে দিতে ধর্মা বলল, 'একেলী খাস না, মা-বাপকেও দিস।'
হাত পেতে লাড্ডু নিতে নিতে কুশী জানতে চাইল, হঠাৎ মিঠাইয়া দিলেন কেন বড়ে সরকার। তাঁর লেড়কা লেড়কীর বিয়ের কথাবার্তা কি পাক্কা হয়ে গেল?
লাড্ডু বিতরণের কারণটা জানাতে জানাতে হঠাৎ ধর্মার নজর এসে পড়ে দড়ি-বাঁধা পাখিগুলোর ওপর। খুশিতে সে প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, 'আরে বহোত চিড়িয়া—' বলেই বালির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে গুনতে শুরু করে, 'এক দো তিন চার—আরে বাপ্পা, পুরা দো ডর্জন।' তিন ডজন অর্থাৎ ছত্রিশ পর্যন্ত নির্ভুল গুনতে পারে ধর্মা, তারপরেই গোলমাল করে ফেলে।
কুশী আবার অতটাও গুনতে পারে না। ধর্মার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'বহোত দাম মিলেগা—নায়?'
ধর্মা ঘাড় কাত করে বলল, 'হাঁ।' বলেই ফাঁদগুলো নতুন করে পেতে রাখে। রোজই খেতির কাজ শেষ হয়ে গেলে এখানে এসে ফাঁদ থেকে পাখি বার করে সেগুলো আবার পেতে রাখে সে। ফাঁদ পাতা হয়ে গেলে ঘাসের জঙ্গলে ঢুকে একটা জায়গা থেকে বালি খুঁড়ে পাউডারের পুরনো ভারি একটা কৌটো বার করল, কৌটোটা রেজগি আর নোটে প্রায় বোঝাই।
পয়সার কৌটোটা কুশীর কাছে দিয়ে এক হাতে বগেড়িগুলো এবং আরেক হাতে লাড্ডুর প্যাকেট ঝুলিয়ে ধর্মা বলল, 'চল—'
রোজই ফাঁদে-পড়া পাখি আর পয়সার কৌটো নিয়ে ওরা এখান থেকে যায়। আজও গলানো চাঁদির মতো টলটলে অলৌকিক জ্যোৎস্না গায়ে মেখে ধর্মা আর কুশী দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের বালি মাড়িয়ে হাইওয়ের দিকে এগিয়ে চলল।
হাইওয়েটা ডান দিকে মিশিরলালজির বিজুরি তালুকের দিকে দৌড় লাগিয়েছে। আর বাঁ দিকে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের খামার বাড়ি আর কোঠির পাশ দিয়ে চলে গেছে গারুদিয়া তালুকের গাঁও আর বাজার-গঞ্জের দিকে।
হাইওয়েতে উঠে ধর্মা আর কুশী বাঁ দিকে চলতে শুরু করল। আপাতত তারা যাচ্ছে গারুদিয়া বাজারে। ওখানে পাটনা থেকে ঠিকাদাররা এসে আস্তানা গেড়েছে। ক'সাল ধরে প্রায় বার মাসই ওরা এখানে পড়ে থাকে। এ অঞ্চলে নতুন নতুন সড়ক তৈরি হচ্ছে, পুরনো রাস্তাঘাট মেরামত করা হচ্ছে, ব্রিজ বানানো হচ্ছে। 'গরমিন'-এর এইসব কাজের ঠিকাদারি নিয়ে ওরা এখানে এসেছে।
হাইওয়ে একেবারে নির্জন। ক্বচিৎ দু'একটা বয়েলগাড়ি ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ করতে করতে রেল স্টেশনের দিকে চলে যাচ্ছে। অনেক দূর থেকে গাড়িটার তলায় দোলায়মান লণ্ঠন জোনাকির মতো মনে হতে থাকে। আচমকা দু'একটা ট্রাক বা লঝ্ঝড় প্রাইভেট বাস দু'ধারের মাঠপ্রান্তর কাঁপিয়ে ছুটে

যায়। তারপর আবার সব কিছু শান্ত, নিঝুম।

খানিকক্ষণ হাঁটবার পর মাঠের মাঝখানে দেহাতের পর দেহাত চোখে পড়ে। ওখানে অগুনতি কেরোসিনের ডিবে কি হেরিকেনের মিটমিটে আলো দেখা যায়। ওই সব গাঁও থেকে মানুষের গলার স্বর আবছাভাবে বাতাসে ভেসে আসতে থাকে।

অনেক মাঠ, অনেক গাঁও পেরিয়ে একসময় ধর্মা আর কুশী গারুদিয়া বাজারে এসে পড়ল।

গারুদিয়া বাজারটা বেশ জমজমাট। এখানে বিজলি বাতি আছে, সার সার দোকানপাট আছে। বেশির ভাগই একতলা দোতলা পাকা মকান। আর আছে পুলিশ চৌকি, হোটেল, স্কুল, দাওয়াখানা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাজার থেকে খানিকটা দূরে মাঝারি গোছের 'গরমিন' রেস্ট হাউস। ওখানেই ঠিকাদারদের আস্তানা।

চেনা জায়গা। দু'আড়াই সাল ধরে প্রায় রোজই একবার করে এখানে আসছে ধর্মারা।

রেস্ট হাউসের সামনের দিকে অনেকটা ঘাসের জমি। সেখানে এই রাত্রিবেলা বেতের চেয়ার পেতে ঠিকাদারবাবুরা তাস খেলছে। বাঁশের খুঁটি পুঁতে বিজলির তার টেনে একটা বাল্ব ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে মাথার ওপর।

ধর্মাদের দেখে ঠিকাদারবাবুদের তাস খেলা বন্ধ হল। তারপরেই তাদের নজর এসে পড়ল বগেড়িগুলোর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জোড়া চোখ চকচকিয়ে উঠল। গলা মিলিয়ে তারা চেঁচাল, 'ইতনা বগেড়ি!' সত্যিই এর আগে একসঙ্গে এতগুলো পাখি ধর্মারা আর আনতে পারেনি।

ধর্মা বলল, 'হাঁ সাব, মিল গিয়া--'

মোটাসোটা চেহারার যে মধ্যবয়সী ঠিকাদারবাবুটি ধর্মার ডাইনে বসে আছে তার নাম অযোধ্যাপ্রসাদ। সে-ই যে এই ঠিকাদার কোম্পানির আসল মালিক, এতদিন যাতায়াতের ফলে সেটা জেনে গেছে ধর্মারা। লোকটা প্রচণ্ড দারু আর মাংস খেতে পারে। বিশেষ করে বগেড়ি পাখির মাংস। দু'তিন বছরে পাঁচ-সাত হাজার বগেড়ি তার পেটে ঢুকেছে। এভাবে চললে আর কিছুদিনের ভেতর ছোটনাগপুরের বগেড়ি বংশ যে সাফ হয়ে যাবে, সে ব্যাপারে ধর্মার সন্দেহ নেই। কিন্তু এ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না সে। পাখির বংশ রইল কি না রইল তাতে তার কী? তার পয়সা পাওয়া নিয়ে কথা। এই পয়সাটা তার মুক্তি কেনার জন্য দরকার। বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের হাত থেকে তাদের আর কুশীদের ছাড়ান পেতে হলে পুরাপাক্কা দু'হাজার রুপাইয়া চাই-ই চাই। দু'তিন সাল ধরে সেই পয়সাই জমিয়ে চলেছে তারা। কিন্তু এসব কথা পরে।

ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ বলল, 'বহোত আচ্ছা।' বলেই ছোঁ মেরে ধর্মার হাত থেকে দড়ি-বাঁধা বগেড়িগুলো প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সেগুলোর পেট টিপে টিপে পরখ করতে লাগল। পাখিগুলোর গা মাংসে ঠাসা। টেপাটেপি করতে করতে আরেক বার সে বলল, 'বহোত আচ্ছা—' শেষের বহোত আচ্ছাটা বগেড়িগুলো সম্পর্কে।

অনেক আশা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ধর্মা। অযোধ্যাপ্রসাদের খুশি খুশি মুখ দেখে তার মনে হতে লাগল, আজ পয়সাটা বেশিই মিলবে।

অযোধ্যাপ্রসাদ পকেট থেকে একটা ব্যাগ বার করল। সেটা নোট আর রেজগিতে ফেটে পড়ছে।

কত রুপাইয়া আছে ঠিকাদারবাবুর ওই ব্যাগটায়? দো হাজার হবে কি? ধর্মা ভাবতে চেষ্টা করল। অতগুলো টাকা নিশ্চয়ই কুশীদের তিনজন আর তাদের তিনজন মোট ছ'জনের মুক্তির দাম। ওই টাকাগুলো পেলে এখনই দৌড়ে গিয়ে রঘুনাথ সিংয়ের মুনশিজির মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আসতে পারত। তারপর আঃ, কী স্বাধীন মুক্ত নিশ্চিন্ত জীবন!

অযোধ্যাপ্রসাদ নোটের তাড়া থেকে বগেড়ির দাম বার করতে করতে বলল, 'আজ তোদের এত দেরি হল কেন রে? কখন থেকে দারু নিয়ে বসে আছি। বগেড়ি ভাজা ছাড়া দারু জমে?'

অন্যদিন সন্ধের আগে আগেই চলে আসে ধর্মারা। আজ সত্যিই দেরি হয়ে গেছে। ধর্মা বলল, 'বড়ে সরকার মিঠাইয়া খিলায়া। উসি লিয়ে--'

অযোধ্যাপ্রসাদ বলল, 'মিঠাইয়া খিলাল কেন রে? লেড়কা লেড়কীর মাঙ্গি?'

'নেহী ঠিকাদার সাব।' লাড্ডু খাওয়ানোর কারণটা জানিয়ে দিল ধর্মা, 'বড়ে সরকার এম্লে বনেগা। উসি লিয়ে--'

এবার বেতের চেয়ারের ভেতর নড়েচড়ে বসল অযোধ্যাপ্রসাদ। হঠাৎ তাকে দারুণ উত্তেজিত মনে হল। অন্য সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, 'সিংজি এম. এল. এ হতে যাচ্ছেন। অন্য ঠিকাদাররা যাওয়ার আগে কাল সকালেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে পরে কাজে লাগবে, না কি বল?'

অন্য সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'হাঁ হাঁ, জরুর। আমাদের যা কাজ তাতে এরকম পাওয়ারফুল লোকেদের হাতে রাখা দরকার। তা হলে বিছানায় শুয়ে শুয়েই এসব জায়গায় কনট্রাক্ট পেয়ে যাব।'

ধর্মা ওদের কথা বিশেষ কিছুই বুঝতে পারছিল না। একদৃষ্টে সে শুধু টাকার ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখে পাতা পড়ে না।

এবার ধর্মার দিকে ফিরল অযোধ্যাপ্রসাদ। বলল, 'বহোত বঢ়িয়া খবর দিয়েছিস। রঘুনাথ সিংজি এম. এল. এ হবেন। বহোত বঢ়িয়া বাত—' বলেই ব্যাগ থেকে তিনটে দশ টাকার নোট বার করে ধর্মার দিকে ছুঁড়ে দিল। কুশীকে দেখিয়ে বলল, 'ভালাই খবরের জন্যে আজ বেশি পয়সা দিলাম। দুলহানিয়াকে একটা শাড়ি কিনে দিস।'

মাটি থেকে নোট তিনটে কুড়িয়ে নেওয়ার পরও ধর্মার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। দু'ডজন বগেড়ির জন্য নগদ ত্রিশ রুপাইয়া! এর আগে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকার বেশি দাম কখনও পাওয়া যায়নি। কৃতজ্ঞতায় মাথাটা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে ধর্মা আর কুশী বলল, 'নমস্তে ঠিকাদার সাব, নমস্তে—'

এই ত্রিশটা টাকার কতখানি বগেড়ির জন্য এবং কতখানি রঘুনাথ সিংয়ের এম. এল. এ হওয়ার খবর দেওয়ার জন্য, ধর্মা ঠিক বুঝতে পারে না। তবে কোয়েলের মরা খাতে ঝুনকে ঝুন মেজুরের ছবি তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। ঠিকাদার বহুবার তাদের ময়ূর মেরে আনতে বলেছে। ময়ূরের মাংস নাকি খুবই সুস্বাদু। ঠিকাদার তাদের নাকের সামনে টোপ ঝুলিয়েই রেখেছে। ময়ূর ধরে আনতে পারলে অনেক বেশি দাম দেবে। দু'ডজন বগেড়ির জন্য মিলেছে ত্রিশ রুপাইয়া। মেজুর এনে দিলে না জানি কত দাম পাওয়া যেত! কিন্তু সরকারি ঢ্যাঁড়া পড়েছে, ময়ূর মারা বারণ। কী আর করা যাবে। ধর্মা বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

অযোধ্যাপ্রসাদ বলল, 'আজ যা, কাল বগেড়ি নিয়ে জলদি জলদি আসবি।'

'জি।' ধর্মারা চলে যায়।

পাঁচ

রোজই ঠিকাদারবাবুদের আস্তানায় বগেড়ি দিয়ে ধর্মা আর কুশী সোজা চলে যায় মাস্টারজির কাছে। আজও তারা সেদিকে চলল।

গারুদিয়া বাজারের এক ধারে 'গরমিন' রেস্ট হাউসে দু'খানা কামরা নিয়ে ঠিকাদাররা থাকে, বাজারের আরেক দিকে 'গরমিন' একটা স্কুল খুলেছে। মাস্টারজি সেখানে পড়ান।

সমাজকল্যাণ দপ্তরের যে কারিক্রম (কার্যক্রম) রয়েছে, এই স্কুলটা তার মধ্যে পড়ে। উদ্দেশ্য হল, সমাজের একেবারে নিচু স্তরে দারিদ্র্যসীমার অনেক তলায় নানা দুরবস্থার মধ্যে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার প্রসার। কিছুটা লেখাপড়া শিখে গ্রামীণ নিরক্ষর গরিব মানুষদের যাতে চোখ ফোটে, তারা যাতে নিজের বুঝ নিজে বুঝে নিতে পারে, সেজন্য এটা একটা সরকারি উদ্যোগ।

কিন্তু এত সব লম্বা-চওড়া কথা ধর্মারা বোঝে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা বাজারের আরেক মাথায় নয়া স্কুলের টালির চাল দেওয়া বাড়িটার সামনে এসে পড়ল।

স্কুলের একপাশে একখানা ছোট টালির ঘরে থাকেন মাস্টারজি বদ্রীবিশাল পাণ্ডে। একাই থাকেন। নিজের হাতে রান্না করে খান। তাঁর রুগ্‌ণ অসুস্থ স্ত্রী এক পাল ছেলেপুলে নিয়ে থাকেন দেশের বাড়ি মোতিহারিতে। এখান থেকে ট্রেন বা বাসে যেভাবেই মোতিহারিতে যাওয়া যাক, দু'তিন বার গাড়ি বদলাতে হয়। সময়ও লাগে অনেকটা।

মাস্টারজি তাঁর ঘরের দাওয়ায় একটা সস্তা কাপড়ের ইজিচেয়ারে বসে দুলে দুলে কী একটা বই পড়ছেন। এই দোল খাওয়াটা তাঁর অভ্যাস। ঘরের চালের বাতা থেকে একটা লাইট ঝুলছে। দাওয়ার তলায় উঠোন। উঠোনের একধারে ছোটখাট ফুলের আর সবজির বাগান। মাস্টারজি নিজের হাতে এই বাগানটা করেছেন।

উঠোন থেকে ধর্মা ডাকল, 'মাস্টারজি—'

মাস্টারজি ঘাড় ফেরালেন। সস্নেহে বললেন, 'ওপরে উঠে আয়।'

ধর্মা আর কুশী দাওয়ায় উঠে এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে।

মাস্টারজির বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। পাতলা দুব্‌লা শরীর। মাথার চুল আধাআধি কালো, আধাআধি সাদা। লম্বাটে মুখ, চশমার পুরু কাচের ওপাশে দু'টি স্নেহময় চোখ। গালে প্রায় সব সময়ই দু'তিন দিনের না-কামানো কাঁচা-পাকা দাড়ি। পরনে ঢলঢলে আধময়লা পাজামা আর মোটা খেলো ছিটের কুর্তা। ধর্মারা জানে এবং মাঝে মাঝেই টের পায় এই হালকা পলকা মাস্টারজির মধ্যে একজন অত্যন্ত শক্তিমান জবরদস্ত মানুষ রয়েছে।

মাস্টারজির সঙ্গে তাদের আলাপ তিন চার সাল আগে। তখন সবে এই নয়া 'গরমিন' স্কুলটা খোলা হয়েছে; মাস্টারজি আরো দু'একজন মাস্টার সঙ্গে করে এটার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। অন্য মাস্টারজিরা এখনও আছেন। গারুদিয়া বাজারের ওধারে ঘর ভাড়া করে ছেলেপুলে আর জেনানা নিয়ে থাকেন।

এখানে এসে ছাত্রের খোঁজে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছেন মাস্টারজি, ফসলের খেতে খেতে হানা দিয়েছেন। সবার হাত ধরে বলেছেন, 'থোড়াসে লিখাপড়া কর, পেটে দু'চারটে কালির অক্ষর ঢোকা। উপকার হবে, আঁখ ফুটবে। দুনিয়ার মানুষ তোদের ঠকাচ্ছে। 'লিখিপড়ী' আদমী হলে কেউ তোদের ঠকাতে পারবে না।'

মাস্টারজির কথা শুনে তাদের মহল্লার বুড়োবুড়ি থেকে ছোকরাছুকরিরা পর্যন্ত সবাই দাঁত বার করে হেসেছে, 'মাস্টারজি কা কহা হো? হামনিকো 'পড়িলিখী' আদমী বনায়গা? জজ ম্যাজিস্টর দারোগা ভকিল বনায়গা? হো রামজি, তেরে কা তামাসা! হো রামজি—'

মাস্টারজি নাছোড়বান্দা। তিনি কোনো কারণেই দমেন না। অপরিসীম তাঁর ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা। হাল না ছেড়ে দিনের পর দিন পুরনো সাইকেলে চেপে ঝক্কর ঝক্কর আওয়াজ তুলে ছাত্র ধরতে বেরিয়েছেন।

এত পরিশ্রম আর সদিচ্ছা বিফলে যায়নি। ছোটনাগপুরের নানা দেহাত থেকে তিনি ভূমিদাস, কিষান, গেঁয়ো মজুর মজুরনী—এরকম কিছু কিছু ছাত্র জুটিয়ে ফেলেছেন। এদের বেশির ভাগই জীবনের আধাআধি কি তিনকাল পার করে দিয়েছে। সারাদিন মাঠে হাল-বয়েল ঠেলার পর তাদের কাছে প্রথম পাঠের বর্ণমালা জটিল ধাঁধার মতো মনে হতে থাকে। অথচ এগুলো না শিখলে নাকি লেখাপড়ার দুনিয়ায় ঢোকা যাবে না। 'অ আ' কি 'ক খ' ইত্যাদি শব্দ আওড়াতে আওড়াতে তাদের চোখ ঘুমে ঢুলে আসে।

যাদের ঢের উমর তারা একদিন আসে তো সাতদিন না-পাত্তা হয়ে যায়। যাদের বয়স কম তারাও রোজ আসে না। তবে একটা কাজ করেছেন মাস্টারজি। এইসব গরিব গাঁওবালা কিষান বা ভূমিদাসদের ঘরের ছোট ছেলেমেয়েদের দুপুরের দিকে তিনি স্কুলে টানতে পেরেছেন। তবে তাও খুব একটা নিয়মিত ব্যাপার নয়। বাপ-মায়ের সঙ্গে যেদিন ওদের খেতে যেতে হয় সেদিন ওরা আর স্কুলে ঘেঁষে না।

অনেককে জোটাতে পারলেও ধর্মা আর কুশীকে লেখাপড়ার জন্য টানতে পারেননি মাস্টারজি।

ওরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, সারাদিন বড়ে সরকারের খেতিবাড়ি কি খামারে হাড্ডি চুর চুর করে কাজের পর পয়সার ধান্দায় তাদের ঘুরতে হয়। কেননা বড়ে সরকারের কাছে কাজের জন্য তারা পায় শুধু পেটের খোরাকি আর হর সাল দু'খানা করে মোটা বনাতের হেটো কাপড় এবং দুটো করে জামা আর কিছু মিট্টি তেল। এদিকে মুক্তির জন্য তাদের পয়সা চাই-ই চাই। যেভাবে হোক তাদের পয়সা কামাই করতেই হবে।

এই মুক্তির বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। ধর্মা এবং কুশীরা কয়েক পুরুষ ধরে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংদের ভূমিদাস। ধর্মার আর কুশীর বাপ, ঠাকুরদা, ঠাকুরদার বাপ রঘুনাথ সিংয়ের বাপ, ঠাকুরদা, ঠাকুরদার বাপ এবং ঠাকুরদার বাপের বাপের জমিতে শুধু খোরাকির বদলে লাঙল ঠেলে আসছে। কত সাল আগে ধর্মাদের কোনো পূর্বপুরুষ রঘুনাথ সিংয়ের কোনো পূর্বপুরুষের কাছ থেকে নাকি অঙ্গুঠার টিপছাপ দিয়ে টাকা 'করজ' নিয়েছিল। ধারের সেই টাকাটা ফুলে-ফেঁপে পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠেছে। সেই টাকা শোধ করার জন্যই পুরুষানুক্রমে তারা বেগার দিয়ে যাচ্ছে।

তারপর কবে নাকি এর মধ্যে জমিদারি প্রথা-ট্রথা উঠে গেছে। কেউ নাকি অনেক বেশি জমিজমার মালিক থাকতে পারবে না। বাজারে-গঞ্জে নানা লোকের মুখে এইরকম কথাবার্তা কিছু কিছু যে ধর্মারা শোনে নি তা নয়। তবে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি।

কয়েক মাস আগে মুনশি আজীবচাঁদজি তাদের ডেকে নিয়ে 'গরমিন'-এর ছাপানো কাগজে (স্ট্যাম্পড পেপারে) দু দু'বার অঙ্গুঠার ছাপ নিয়ে বলেছিল, 'এবার থেকে তোরা জমিজমা খেতখামারের মালিক বনলি। বড়ে সরকার কিরপা করে তোদের নামে জমিন লিখে দিলেন। আর বেশি দিন তোদের বড়ে সরকারের জমিনে খাটতে হবে না। তব্ এক বাত--'

ধর্মাদের মহল্লার বয়স্ক মুরুব্বিরা খুশিতে ডগমগ হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কা বাত মুনশিজি?'

'অ্যায়সা অ্যায়সা তো দুনিয়ায় কিছু হয় না। থোড়ে থোড়ে দাম দিতে হয়। বড়ে সরকারের খেতিতে আগের মতো কামকাজ করে যা। এক রোজ জমিন-উমিন মিলে যাবে।'

তারপর এক সাল যায়, আরেক সাল আসে। আরেক সাল যায়, তার পরের সাল আসে। কিন্তু জমির মালিক হওয়া দূরের কথা, ভূমিদাসের জীবন থেকেই তারা মুক্ত হতে পারে না। ক্রমে ধর্মারা জানতে পারে বড়ে সরকার তাঁর বেশির ভাগ জমিজমা তাদের নামে বেনামা করে অনেক টাকার ঋণে বাঁধা রেখেছেন। যে দুটো কাগজে তাদের আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছে তার একটা 'জমি' বেনামা করার জন্য। অন্যটা মিথ্যে ঋণের দায়ে জমি বাঁধা রাখার জন্য। প্রচুর টাকা দিতে পারলে তবেই জমিগুলো পাবে ধর্মারা। কিন্তু এত টাকা কোথায় তাদের? ফলে জমির মালিক হওয়ার স্বপ্নটা অনেক কাল আগেই উবে গেছে। তা ছাড়া রাগের মাথায় রঘুনাথ সিংয়ের খেতখামার ছেড়ে যাবেই বা কোথায়? প্রথমত, রঘুনাথ সিংয়ের পোষা মাইনে-করা পহেলবান (পালোয়ান) রয়েছে। কেউ এখান থেকে ভাগতে চাইলে মেরে তাদের হাড়গোড় ভেঙে দেবে। দ্বিতীয়ত, তাদের বাপ-ঠাকুরদারা অনেক টাকা নাকি আগে থেকেই রঘুনাথ সিংয়ের বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে কর্জ নিয়েছে। সেই টাকা সুদে আসলে কোন অঙ্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কে জানে। টাকা শোধ না করে এখান থেকে তারা এক পা-ও নড়তে পারবে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শুধু খোরাকির বদলে খেটে খেটে পূর্বপুরুষের ঋণ তাদের শোধ করে যেতেই হবে।

কিন্তু এই পরাধীন পশুর জীবন ধর্মা আর কুশীর কাছে একেবারেই কাম্য নয়। সেই কোন ছেলেবেলা থেকে পরের জমিতে বেগার দিতে দিতে তারা পাশাপাশি দু'টি সতেজ গাছের মতো বড় হয়ে উঠেছে। তারপর কবে একদিন স্বাভাবিক নিয়মেই তারা বুঝেছে একজনকে ছাড়া আরেক জনের চলবে না। আর তা বুঝতে বুঝতেই নিজেদের মতো করে এক বাঞ্ছিত জীবনের স্বপ্ন দেখেছে। ভেবেছে সুযোগ পেলেই এই ঘৃণ্য লাঞ্ছিত ক্রীতদাসের জীবন থেকে অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধবে।

একদিন ভয়ে ভয়ে ধর্মা মুনশি আজীবচাঁদজির কাছে গিয়ে বলেছিল, 'মুনশিজি একগো বাত--'

আজীবচাঁদ কানে পালক গুঁজে সুড়সুড়ি দিতে দিতে বলেছিল, 'বাতা না--'

'মুনশিজি, হামনিকো বাপ-নানা আউর কুশীকো বাপ-নানাকো বড়ে সরকারকে পাশ কিতনা উধার

(ধার) হ্যায়?'

আজীবচাঁদ নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসেছে। দু আঙুল গর্তে ঢোকানো তার চোখ দুটো একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছিল। ভুরু কুঁচকে শিয়ালের মতো ছুঁচলো মুখ আরো ছুঁচলো করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বহোত রুপাইয়া। শোধ করে দিবি নাকি?'

ধর্মা আজীবচাঁদের চোখের দিকে তাকাতে পারেনি। ঘাড় নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে লম্বা লম্বা আঁচড় কাটতে কাটতে আবছা গলায় বলেছিল, 'নায়। রুপাইয়া কঁহা মিলেগা! অ্যায়সাই জানতে ইচ্ছা হল।'

'তাই বল। বহোত রুপাইয়া উধার—এক হাজার।'

এক হাজার যে কত টাকা সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই ধর্মার। প্রতিধ্বনির মতো করে শুধু বলেছিল, 'এক হাজার!'

টেনে টেনে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে আজীবচাঁদ বলেছিল, 'জি মহারাজ।'

'কুশীকো বাপ-নানাকো কিতনা উধার?'

'ওদেরও হাজার রুপাইয়া।'

তার মানে তাদের এবং কুশীদের মুক্তির দাম দু হাজার টাকা। ধর্মা কিন্তু এতটুকু দমেনি। সেদিন থেকেই মুক্তির দাম যোগাড় করার জন্য কুশীকে নিয়ে দক্ষিণ কোয়েলের খাতের দু'ধারের জঙ্গলে আর প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও সাবুই ঘাসের জঙ্গলে গিয়ে ফাঁদ পেতে বগেড়ি ধরেছে। কখনও ঘন শাল বা কেঁদের জঙ্গলে কুকুর নিয়ে ঢুকে শুয়োর মেরে আনছে। কখনও সাপ বা হরিণ মেরে সেগুলোর চামড়া খুলে নিচ্ছে। পাখি, শুয়োরের মাংস, সাপ বা হরিণের ছালের প্রচুর খদ্দের রয়েছে চারদিকে। প্রকৃতির চার ধারে প্রাণী এবং উদ্ভিদ-জগতে যা কিছু আছে সবই মূল্যবান এবং মানুষের কাছে প্রয়োজনীয়। সে সব ধরে বা হত্যা করে মানুষের হাতে তুলে দিলে তার জন্য পয়সা পাওয়া যায়। ধাতুর কিছু রেজগি আর কাগজে ছাপানো কিছু নোট—এ সবই তাদের স্বাধীন জীবনের দাম। যেমন করে হোক, ছোটনাগপুরের সমস্ত পশু আর পাখির জীবনের বিনিময়েও নিজেদের মুক্তি কিনে আনবে ধর্মারা।

মাস্টারজির স্কুলে ঢুকে 'পড়িলিখী' আদমী না বনলেও রোজই ধর্মারা তাঁর কাছে আসে। তাঁর মতো সৎ নির্লোভ মানুষ আগে আর কখনও তারা দেখেনি।

মাস্টারজি বললেন, 'তোদের জন্যে কখন থেকে বসে আছি। এত দেরি করলি কেন?'

দেরির কারণটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিল ধর্মা।

মাস্টারজি বললেন, 'বাহ্, বাহ্, রঘুনাথ সিংয়ের মতো আদমী এম. এল. এ হবেন। বাহ্—'

ধর্মা বলল, 'উসি লিয়েই মিঠাইয়া দিল।'

'বাহ্—'

'এবার হামনিকো পাইসা গিনতি করে দে—' বলে ধর্মা কুশীর কাছ থেকে টাকার কৌটোটা নিয়ে মাস্টারজির হাতে দিল।

মাস্টারজি বললেন, 'এত জলদি কিসের। এই কুশী ঘরে যা। বড় কটৌরার তলায় কী আছে, নিয়ে আয়।'

কুশী মাস্টারজির শোওয়ার ঘরে ঢুকে অ্যালুমিনিয়ামের কটৌরার তলা থেকে দুটো পাকা আতা আর দুটো শসা নিয়ে এল।

মাস্টারজি বললেন, 'তোদের জন্য রেখেছি। খা—'

কুশী বলল, 'তুহারকে লিয়ে—' অর্থাৎ মাস্টারজির জন্য আতা-টাতা আছে কিনা তা জানতে চাইছে সে।

'আমি খেয়েছি।'

মাস্টারজির ছাত্রছাত্রীরা কেউ না কেউ প্রায় রোজই 'পেয়ারসে' তাদের গাছের ফল-ফলারি তাঁকে দিয়ে যায়। গরিব মানুষদের কাছ থেকে এ সব নিতে ভাল লাগে না মাস্টারজির। অনেক বারণ

করেছেন তিনি, রাগারাগি করেছেন, কিন্তু গারুদিয়া বা বিজুরি তালুকের দিনমজুর, বেগারখাটা কিষান আর ভূমিহীন মানুষেরা যে সময়ের যে ফল, মাস্টারজিকে তা দিয়ে যাবেই। না নিলে ওরা মনে মনে খুব কষ্ট পায়। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাত পেতে নিতে হয়।

ছাত্রছাত্রীরা যা দিয়ে যায় তার থেকে মাঝে মাঝে দু-একটা ফলপাকড় ধর্মাদের জন্য রেখে দেন মাস্টারজি।

আতা এবং শসা ভাগাভাগি করে ধর্মারা খেতে লাগল। আজ তাদের পাওয়ার বরাত। বড়ে সরকারের মকানে মিঠাইয়া পাওয়া গেল, ঠিকাদারবাবুর কাছ থেকে বগেড়ির জন্য বেশি পয়সা পাওয়া গেল, তারপর এখানে এসে মাস্টারজির কাছে মিলল গাছপাকা সুস্বাদু আতা আর শসা। আজকের দিনটা ভালই গেল। রোজ যদি এমন যেত!

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা খবর নিচ্ছিলেন মাস্টারজি। রঘুনাথ সিংয়ের হাজার হাজার একর জমির কতটা চষা হয়েছে, ধর্মাদের মহল্লায় কে কেমন আছে—এমনি টুকরো টুকরো নানা খবর। কথায় কথায় রঘুনাথ সিংয়ের 'এম্লে' হওয়ার কথা উঠল। আজ লাড্ডু বিলির সময় তাঁর মকানে কারা কারা ছিল, সেখানে কে কী করল—সব জিজ্ঞেস করতে লাগলেন মাস্টারজি। প্রচুর গুলাল মাখামাখি হয়েছে এবং বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং স্বয়ং নিজের হাতে ধর্মাদের মিঠাইয়া বেঁটে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে বহোত মিঠি গলায় 'আপনা আদমী'র মতো কথা বলেছেন—এসব শুনতে শুনতে চোখ কুঁচকে যেতে লাগল মাস্টারজির। পরক্ষণেই তিনি হেসে ফেললেন। ইজিচেয়ারে বসে দুলে দুলে বলতে লাগলেন, 'ভোটের তৌহার (পরব) তা হলে এসে গেল!'

মাস্টারজির কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ধর্মারা তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

মাস্টারজি ফের বললেন, 'বড়ে সরকার আপনা হাতে তোদের মিঠাইয়া দিল, মিঠাইয়ার থেকে বেশি মিঠি কথা বলল। তোদের কী বরাত রে!'

'হাঁ—' ধর্মা কুশী দু'জনেই মাথা নাড়ল। বড়ে সরকারের আজকের এই আপনজনের মতো ব্যবহারে তারা অভিভূত।

'দ্যাখ, এই সৌভাগ তোদের কপালে কদ্দিন টেকে!' মাস্টারজির স্বরে খানিকটা সূক্ষ্ম বিদ্রূপ যেন মেশানো। ধর্মা আর কুশী অবশ্য তা বুঝতে পারে না।

একটু চুপচাপ। তারপর মাস্টারজিই ফের বললেন, 'একটু চা খাবি নাকি?'

মাস্টারজির কাছে এলে রোজ রোজ ফলফলারি না মিললেও চা'টা মেলে। এই চায়ের ওপর ধর্মাদের বড় লোভ। যেমন তার গন্ধ তেমনি স্বাদ। প্রচুর দুধ চিনি দিয়ে মাস্টারজি নিজের হাতে চা'টা এমনভাবে তৈরি করেন যা গারুদিয়া এবং বিজুরি তালুকের আর কেউ পারে না। এখানে এলে এক 'গিলাস' করে না খেয়ে ধর্মারা যায় না। তবে চায়ের কথা মুখ ফুটে বলতে রোজ রোজ শরম লাগে কিন্তু মাস্টারজি তাদের মনের কথাটা কিভাবে যেন রোজই টের পেয়ে যান।

ধর্মা কুশী দু'জনেই লাজুক মুখে হেসে ঘাড় কাত করল। অর্থাৎ চা নিশ্চয়ই খাবে।

মাস্টারজি বললেন, 'যা, ঘর থেকে সব এখানে নিয়ে আয়।'

সব বলতে 'মিট্টি তেলকা চুলহা' (কেরোসিনের স্টোভ), পাত্তি চা আর চিনির কৌটো, দুধের কড়া, কেটলি, এনামেলের গেলাস ইত্যাদি ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম। দৌড়ে গিয়ে কুশী সেগুলো ঘরের ভেতর থেকে নিয়ে আসে।

মাস্টারজি স্টোভ ধরিয়ে চা চাপিয়ে দিলেন। তারপর কুশীকে বললেন, 'তোকে একটু খাটাব।'

খাটুনিটা কিসের, কুশী জানে। মাস্টারজি একা মানুষ। নিজের হাতে রাঁধা-বাড়া করে খান। কিন্তু এ ব্যাপারটায় তাঁর ভীষণ আলসেমি। ইচ্ছে হল তো দু'খানা রোটি বা লিট্টি সেঁকে নিলেন, নইলে চালে আলু ডাল কি অন্য সবজি ফেলে ফুটিয়ে নিলেন। ঘরে ভয়সা ঘি আর হরা মিরচি মজুদই থাকে। আর যেদিন ইচ্ছে হয় না সেদিন চাট্টি চিড়ে মুড়ি চিবিয়ে বা ছাতু গুলে খেয়ে নেন। তবে কিছুদিন ধরে কুশীরা আসছে। ওরা এলেই তিনি কুশীকে চালটাল ধুয়ে স্টোভে চড়িয়ে দিতে বলেন। ওরা বেশিক্ষণ থাকলে কুশীকে দিয়ে ভাত নামিয়ে ফেন গালিয়ে নেন। অচ্ছুৎ দোসাদদের মেয়েটা

প্রথম প্রথম কিছুতেই বামহনের জন্য ভাত বসাতে চাইত না। কিন্তু মাস্টারজি নাছোড়বান্দা। এমনিতে তিনি উদার মানুষ, ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন না, জাতওয়ারি সওয়াল নিয়ে মাথা ঘামান না। ছোটখাট কিছু সংস্কার থাকলেও তিনি মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে জানেন। আগে আগে ভাত বসাবার জন্য কুশীকে ধমকধামক দিতে হত, জোরজারও করতে হত। এখন আর ওসব কিছুই করতে হয় না। মাস্টারজির মুখ থেকে কথা খসবার সঙ্গে সঙ্গে কুশী চাল এবং আলু টালু ধুয়ে নিয়ে আসে। মানুষ যেভাবে দেবতার ভোগ সাজায়, মাস্টারজির জন্য ভাত বসাবার ব্যাপারে কুশীর ঠিক তেমনই যত্ন আর ভক্তি মেশানো থাকে।

মাস্টারজি আবার বললেন, 'চা খাওয়া হয়ে গেলে আমার ভাত চাপিয়ে দিস--'

কুশী কিন্তু চা খাওয়া পর্যন্ত বসে থাকে না, চাল এবং আনাজের খোঁজে তক্ষুনি উঠে যায়। খানিকক্ষণ পর সিলভারের ছোট্ট হাঁড়ি রুপোর মতো ঝকঝকে করে মেজে তাতে চাল ডাল আলু ধুয়ে পরিমাণমতো জল দিয়ে নিয়ে আসে। এর মধ্যে চা হয়ে যায়।

চা ছেঁকে গেলাসে গেলাসে ঢেলে দুধ চিনি মেশাতে থাকেন মাস্টারজি। এই ফাঁকে স্টোভে ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে দেয় কুশী।

মাস্টারজির চা হয়ে গিয়েছিল। গেলাসে গেলাসে ঢেলে ধর্মাদের দেওয়ার পর নিজেও একটা গেলাস নিলেন।

পাছে চট করে ফুরিয়ে যায়, সেজন্য চায়ে লম্বা চুমুক দেয় না ধর্মারা। চুক চুক করে একটু একটু খায়। যতক্ষণ চায়ের স্বাদটা জিভে ধরে রাখা যায়।

চা খেতে খেতে ধর্মা বলে, 'মাস্টারজি অব্ পাইসা গিনতি কর দে। আজ ঠিকাদারকো পাস তিশ রুপাইয়া মিলা। সব কুছ জোড়কে দেখ কিতনা হুয়া—' বলে পয়সার সেই ঢাউস কৌটোটা এগিয়ে দেয়।

মাস্টারজি হাত বাড়িয়ে কৌটোটা নিতে নিতে বললেন, 'তোদের কত বার বলেছি থোড়েসে 'পড়িলিখী' বন। তা হলে অন্যের কাছে পয়সা গোনাতে যেতে হবে না।'

ধর্মা বলল, 'নায় নায় মাস্টারজি, আভি নায়। আগে বড়ে সরকারের পাইসা শোধ করি, উসকে বাদ পড়িলিখী বনব।'

রোজ একই কথা বলেন মাস্টারজি আর ধর্মারা একই উত্তর দেয়।

মাস্টারজি কৌটোর ঢাকনা খুলে নোট এবং রেজগিগুলো বারান্দায় ঢেলে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুনতেও শুরু করেন। মোট দুশ দশ টাকা সত্তর পয়সা।

মাস্টারজি জানেন এই টাকাটা ধর্মাদের মোট দু-আড়াই বছরের সঞ্চয় এবং আরো জানেন, এটা ছোটনাগপুরের কয়েক হাজার বগেড়ি পাখি, কয়েক ডজন সাপ শুয়োর এবং হরিণের জীবনের দাম। অগুনতি পশু অর পাখির মৃত্যুর বিনিময়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ স্বাধীন জীবন কেনার জন্য তাদের এই সঞ্চয়।

ধর্মা জিজ্ঞেস করল, 'দো শ দশ রুপাইয়া সত্তর পাইসা কিতনা পাইসা? বহোত — নায়?'

মাস্টারজি হাসলেন। কিছু না বলে আস্তে আস্তে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন।

ধর্মা আবার বলল, 'দো হাজার পুরা হোনেসে আউর কিতনা লাগেগা?'

অর্থাৎ রঘুনাথ সিংয়ের কাছে পূর্বপুরুষের সেই দু হাজার টাকা ঋণের কতটা কাছাকাছি তারা আসতে পেরেছে? মাস্টারজি কী করে বোঝাবেন, যে পরিশ্রমে যে কষ্টে এবং যেভাবে তারা পয়সা জমাচ্ছে তাতে রঘুনাথ সিংয়ের কর্জ শোধ করতে তাদের আয়ু কেটে যাবে। কিন্তু উজ্জ্বল স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখছে যারা তেমন দু'টি আশাবাদী নিষ্পাপ সরল আনপড় যুবক-যুবতীকে হতাশ করতে ইচ্ছা হয় না। মাস্টারজি বলেন, 'জমিয়ে যা। একদিন 'করজ' ঠিক শোধ হয়ে যাবে।'

ধর্মা বলে, 'বহোত রাত হো গিয়া। হামনিকো যানা পড়ে —'

'হাঁ, যা —'

'কাল ফির আয়েগা।' যাবার সময় এই কথাটা ধর্মারা রোজই বলে।

মাস্টারজি বলেন, 'হাঁ, নিশ্চয়।'

ধর্মারা উঠে পড়ে।

মাস্টারজির ঘর থেকে বেরিয়ে কোনোদিনই ওরা হাইওয়ে দিয়ে নিজেদের মহল্লায় ফেরে না। গারুদিয়া বাজারের উত্তর দিকে খানিকটা গেলেই মাঠের মাঝখানে এলোমেলো ছড়ানো দেহাত। সেই সব দেহাতের ভেতর দিয়ে ওরা ঘুরতে ঘুরতে যায়। অনেকটা ঘোরার পর দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতটার পাশে সাবুই ঘাসের জঙ্গলে গিয়ে প্রথমে পয়সার কৌটোটা বালির তলায় পুঁতে রাখে, তারপর পাখি ধরার ফাঁদগুলো পেতে তবে নিজেদের ঘরে ফেরে।

গারুদিয়া বাজারের উত্তর দিকটা দক্ষিণ আর পুব দিকের মতো জমাট নয়। এখানে দোকানপাট খুব কম। যা আছে সবই এলোমেলো, ছড়ানো-ছিটানো। তবে এ অঞ্চলেই রয়েছে কলালি (দিশি মদের দোকান)।

অন্য দোকানগুলো এত রাতে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কলালি এখন সরগরম। কোশ, দু কোশের মধ্যে যত গাঁ আছে সে সব জায়গা থেকে নেশাখোরেরা সাঁঝের আঁধার নামলেই এখানে জমা হতে থাকে। রাত যত বাড়ে, এখানকার আসর ততই জমে ওঠে। কলালির গাহেকদের বেশির ভাগই দেহাতী তাতমা, দোসাদ, ধোবি, গঞ্জু, গোয়ার, আদিবাসী সাঁওতাল, কুর্মী, মুণ্ডা ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে নেশার কোনো জাতপাত নেই। লুকিয়ে চুরিয়ে উচ্চবর্ণের দু-একজন বামহন কায়াথও এখানে হানা দেয়।

মাস্টারজির ঘর থেকে বেরিয়ে কলালির পাশ দিয়ে যেতে যেতে রোজ রাতেই শরাবিদের ভিড় চোখে পড়ে ধর্মাদের। গলা পর্যন্ত দারু গেলার পর তাদের জড়ানো গলার হই-হল্লা কানে ভেসে আসে। কলালির এই পথটুকু ওরা দু'জনে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝড়ের বেগে পার হয়ে যায়।

আজও যেতে যেতে দারুখানার আড্ডায় আচমকা নেশাখোরদের মধ্যে রামলছমনকে দেখতে পেল ধর্মারা। আজীবচাঁদ যেমন বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের প-চাটা কুত্তা, রামলছমন তেমনি খামারবাড়ির কর্তা হিমগিরিনন্দনের পা-চাটা কুত্তা। বয়েস পঞ্চাশ বাহান্ন। বকের মতো চেহারা, বাঁকানো পিঠ, বাঁকানো নাক, লম্বা লম্বা লিকলিকে হাত-পা, গোল গোল চোখ, উঁচু কপাল, পাতলা চুল, কপালে আর কানের লতিতে চন্দনের ফোঁটা। পরনে হাঁটুঝুল ধুতি আর কুর্তা, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা।

লোকটার আওরতের দোষ রয়েছে। বিল্লী যেমন মাছের গন্ধ পেলে ছোঁক ছোঁক করে, তেমনি কম বয়সের ছিরিছাঁদওলা মেয়ে বা ছমকি আওরত দেখলেই রামলছমন ঘাড় গুঁজে হামড়ে পড়ে।

কুশী ভয়ের গলায় বলল, 'কলালিমে বগুলা ভকত !' গারুদিয়ার মানুষজন, বিশেষ করে দোসাদ মহল্লার লোকেরা বিদ্রূপ করে রামলছমনকে বলে বগুলা ভকত অর্থাৎ বকধার্মিক। তার কারণও আছে। সে কথা পরে।

দু-আড়াই বছর ধরে শীত-গ্রীষ্ম বারমাস কলালির পথ ধরে ধর্মারা বাড়ি ফিরছে। কিন্তু আগে কোনোদিনই দারুখানায় রামলছমনকে তারা দেখতে পায়নি। ধর্মা বলল, 'চুহাটা দারুও খায়! তুরন্ত ভাগ ইঁহাসে।' বলেই আরো জোরে পা চালিয়ে দেয় সে। বলা যায় না, কুশীকে দেখলেই বগুলা ভকত কলালি থেকে দৌড়ে চলে আসতে পারে।

চোখের পলকে কলালির রাস্তাটা পেরিয়ে যায় দু'জনে।

ছয়

কলালির পর দু-চারটে টিনের চালা, পাঁচ সাতটা ভাঙাচোরা মেটে বাড়ি। তার পর শুরু হয়েছে ছোটনাগপুরের আদিগন্ত ফসলের খেত। এই জষ্ঠি মাসে কোথাও ধান বা গেহুঁর একটা চারাও চোখে পড়ে না। ফাঁকা মাঠ একেবারে হা হা করতে থাকে।

রুপোর কটোরার মতো সেই চাঁদটা এখন আকাশের মাঝ মধ্যিখানে উঠে এসেছে। গলানো চাঁদির মতো বহুকালের প্রাচীন জ্যোৎস্নায় বহুকালের পুরনো এই পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। আজন্মের চেনা

ছোটনাগপুরের এই উঁচু নিচু ঢেউখেলানো প্রান্তর। কিন্তু এই মুহূর্তে কেমন যেন অপরিচিত আর আশ্চর্য মায়াবী মনে হতে থাকে।

উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পুব থেকে পশ্চিমে হু-হু করে উলটোপালটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে। এই হাওয়া বড় সুখের। কে বলবে এখানকার মাঠঘাট এবং ফাঁকা শস্যক্ষেত্র দিনের বেলা জ্যৈষ্ঠের গনগনে রোদে একেবারে আগুন হয়ে থাকে! জ্যোৎস্নাধোয়া এই পৃথিবীতে কী মধুর স্নিগ্ধতা!

গারুদিয়া বাজার ছাড়িয়ে ধর্মারা মাঠে চলে এসেছিল। তাদের মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পরদেশি শুগা (বিদেশি টিয়াপাখি) বাতাসে ডানা ছড়িয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্মা আব কুশী মাঠের মাঝখানে একটা গাঁয়ে এসে পড়ে। গোয়ারদের (গোয়ালাদের) গাঁ। গোয়ালারা অবশ্য নিজেদের বলে যদুবংশীছত্রি।

যদুবংশী বা গোয়ারদের গাঁখানা কিন্তু চমৎকার। চারদিকে তকতকে ঝকঝকে টিন কি মাটির বাড়িঘর, সামনের দিকে ঢালা 'আঙ্গন'। 'আঙ্গনে' ছোটখাটো ফুলের বাগান। এ গাঁয়ে হেন বাড়ি নেই যেখানে দশ বিশটা ভইস বা গাই নেই। বার মাস দিনরাত গোয়ারদের এই গাঁয়ের বাতাসে একটা ভারি সুন্দর গন্ধ ভাসতে থাকে। ভয়সা ঘিয়ের সুগন্ধ। প্রতিদিনই কোনো না কোনো বাড়িতে এখানে ঘি জ্বাল দেওয়া হয়। সেই ঘি বড় বড় টিনে বোঝাই হয়ে চলে যায় ভারি টৌনে — রাঁচীতে, ডালটনগঞ্জে, ধানবাদে, পাটনায়, কলকাতায়।

এখন, এই রাত্রিবেলা ঘরে ঘরে লাল মিট্টি তেলের ডিবিয়া কি কাচ-বসানো লণ্ঠন জ্বলছে।

এখানে, এই মুহূর্তে চারপাশে টুকরো টুকরো ঘর-সংসারের ছবি চোখে পড়ে। ঘরের দাওয়ায় বসে কোনো সুহাগিন আওরত এনামেলের থারিতে (থালায়) তার মরদ আর ছেলেপুলেকে খেতে দিচ্ছে। কেউ চুলহার ধারে বসে রোটি বা লিট্টি সেঁকছে আর তার ঘরবালা কাছে বসে চাকী-বেলনায় আটার গোল গোল ডেলা বেলে বেলে দিচ্ছে। কোথাও কোনো পুরুষ সারাদিন গতর-চূরণ খাটুনির পর তার প্যারা ঘরবালীর গা ঘেঁষে বসে খুনসুটি করে যাচ্ছে।

কোথাও বসেছে গান-বাজনার আসর। একটা গোটা পরিবারের মেয়ে পুরুষ কাচ্চাবাচ্চা ঢোলক এবং ঢাউস ঢাউস করতাল বাজিয়ে হোলির গান গেয়ে চলেছে।

'খেলনে নিকালি অযোধাবালী —
হোলি খেলনে, কিনকার হাতে
আবির কি ঝোলি, রামজিকি হাতে
কনক পিচকারি। লছমনকি হাতে
আবিরকা ঝোলি.....
হোলি খেলনে নিকালি অযোধাবালী
হোয় হোয় হোয়, আয়া রে হোলি
নিকালি অযোধাবালী —

এবার সেই কোন চৈত্র মাসে হোলি হয়ে গেছে। এখন জেঠ মাহিনা চলছে। দু-আড়াই মাস পার হতে চলল কিন্তু ছোটনাগপুরের এই গাঁ থেকে হোলির তৌহারের দিনগুলো যেন আর কাটতে চায় না। শুধু গোয়ার বা যদুবংশীদের এই গাঁয়েই নাকি, ধর্মাদের নিজেদের মহল্লাতেও হোলির জের চলছে।

দুর্ভাবনাশূন্য এই সুখী স্বাধীন মুক্ত মানুষদের দেখতে দেখতে ধর্মা আর কুশীর চোখ লোভে চকচক করতে থাকে। যৌবনের শুরু থেকে এই রকম একটা কাম্য জীবনের স্বপ্নই তো তারা দেখে আসছে। কিন্তু ওই স্বপ্ন পর্যন্তই।

রোজই গোয়ারপাড়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বেশ খানিকটা সময় নেয় ধর্মারা। চোখ ভরে এই সব মানুষের ঘরকন্না এবং আদর সোহাগের ছবি যতক্ষণ দেখা যায়।

গাঁ'টার নাম চৌকাদ। চৌকাদের সব মানুষই কুশীদের চেনে। রোজ এখান দিয়ে যাতায়াতের ফলে ভূমিদাস অচ্ছুৎ দোসাদদের এই ছেলেমেয়ে দুটোকে মোটামুটি সবাই স্নেহও করে। অবশ্য জলচল

গোয়ারদের পক্ষে দূরত্ব রেখে এবং ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে, যতখানি স্নেহ দেখানো সম্ভব ততটুকুই দেখায়, তার একচুল বেশি না।

ওরা যখন চৌকাদের ভেতর দিয়ে যায় তখন রোজই গোয়ার আর গোয়ারিনরা ডেকে ডেকে কথা বলে। আজও তারা ডাকাডাকি করতে থাকে।

'এ কোশিয়া, এ ধম্মা — আ যা। বৈঠা ইঁহা —'

সবাই তাদের বসতে বলে, তবে ঘরে উঠতে দেয় না। উঠোনে বা 'আঙ্গনে'র একধারে তাদের বসতে হয়।

ধর্মা বলে, 'নায় জি, রাত বহোত হো গিয়া —'

'আরে বৈঠ না —'

'নায় জি, আজ মাফি মাঙে। কাল বৈঠেগা।'

কেউ বলে, 'চায় পীকে যা —'

ধর্মারা একই জবাব দেয়। রাত অনেক হয়ে গেছে। আর দেরি করা যাবে না। এমন কি, চায়ের লোভেও না।

কেউ ঠাট্টার গলায় বলে, 'কালাপন দুলহানিয়াকে নিয়ে তিন চার সাল সিরেফ চরকির মতো ঘুমছিস ফিরছিস। এবার শাদি করে ফেল —'

রোজ রাত্রিবেলা মাস্টারজিকে দিয়ে টাকা গুনিয়ে চৌকাদ গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে এই বিয়ের কথাটা কম করে দশ বিশজনের কাছে শুনতে হয় ধর্মা এবং কুশীকে। অন্যদিনের মতো আজও তার মাথা লজ্জায় নিচু হয়ে যায়। পাশে দাঁড়িয়ে সে টের পায়, কুশীর মুখও আরক্ত হয়ে উটেছে। ধর্মা আবছা কাঁপা গলায় বলে, 'রামজির কিরপা হলে শাদি জরুর হয়ে যাবে।'

আজ চৌকাদ গাঁয়ের মাঝামাঝি আসার পর ভিখুন গোযারের ঘরবালী বলে ওঠে, 'তুই পুরুখ (পুরুষ) না কি রে? জোয়ানী মুরগিকে সাথ সাথ নিয়ে তিন চার সাল ঘুমছিস। শাদিউদির ফিকির নেই। তুরন্ত ছোকরির কপালে সিনুর (সিঁদুর) চড়িয়ে বিস্তারায় (বিছানায়) নিয়ে ফেল —' বলে কোমরে লছক তুলে গা দুলিয়ে দুলিয়ে আর আঙুল মটকে মটকে অশ্লীল একটা ছড়া কাটে।

এই মাঝবয়সী মেয়েমানুষটার চুল আধাআধি সফেদ হয়ে গেছে। গায়ে চাপ চাপ চর্বি। দাঁত তুরপুনে ফুটো করে রুপো দিয়ে বাঁধানো। সেই বাঁধানো দাঁত মেলে হেন নোংরা অশ্লীল কথা নেই যা সে মুখ দিয়ে বার করতে পারে না। তা ছাড়া এ গাঁয়ের সব চাইতে দুর্ধর্ষ কুঁদুলে আর শ্রেষ্ঠ ঝগড়াটি সে। তার বাঁশ-ফাটা গলার আওয়াজে ভয় পায় না তেমন পুরুষ বা আওরত চৌকাদ গাঁয়ে এখনও জন্মায় নি। কাজে কাজেই ভিখুন গোয়ারের এই ঘরবালীকে দেখলে বুক শুকিয়ে যায় ধর্মার। জড়ানো গলায় কিছু একটা বলে কুশীকে নিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে সে এগিয়ে যায়।

ঘুরতে ঘুরতে একসময় দু'জনে চৌকাদ গাঁয়ের দক্ষিণ দিকে এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো অত্যন্ত চেনা গলা শোনা যায়, 'এ ধম্মা, এ কোশিয়া—'

ঘাড় ফিরিয়ে ধর্মা এবং কুশী দেখে সফেদ গোয়ারিন আর কালা গোযাব ওদের উঠোনের এক কোণে বড় বড় চুল্হার পাশে বসে প্রকাণ্ড লোহার কড়াইতে ঘি জ্বাল দিচ্ছে। ভয়সা ঘিয়ের সুঘ্রাণে বাতাস এখানে ভারি হয়ে আছে।

চোখাচোখি হতেই সফেদ গোযারিন আর কালা গোয়ার হাত নাড়তে লাগল, 'আ যা, আ যা —'

ওদের অবশ্য ওই নাম নয়। কালা গোয়ারের আসল নাম মহাদেও, গায়ের রং কয়লার মতো ঝিম কালো বলে সে কালা গোয়ার অর্থাৎ কালো গয়লা নামে এ অঞ্চলে বিখ্যাত। তার ঘরবালী অর্থাৎ বউয়ের নাম বিজ্‌রি; বিজ্‌রির গাত্রবর্ণ স্বামীর একেবারে উলটো। মেমেদের মতো সে ধবধবে ফর্সা। রঙের গৌরবে সে মেম গোয়ারিন বা সফেদ গোয়ারিন। দুটো নামের মধ্যে শেষ নামটাই তার বেশি চালু।

অন্য গোয়ারদের বাড়ি না ঢুকলেও বিজ্‌রি আর মহাদেওর কাছে না গিয়ে পারে না ধর্মারা। তাই

বলে কি ওরা মাস্টারজির মতো জাতপাত মানে না বা তাদের ঘরে তুলে বিছানায় নিয়ে বসায়? কোনোটাই না। অচ্ছুৎ ধর্মা আর কুশীকে তারা দূরে দূরেই রাখে। তবে অন্য গোয়ারদের মতো ওদের উঠোনে বসিয়ে নিজেরা উঁচু দাওয়ায় বসে কথা বলে না। কাছাকাছি বসে গল্প করে, হাসে, রসাল ঠাট্টা করে। মহাদেও আর বিজ্‌রির কথায় ব্যবহারে এমন একটা প্রাণখোলা ভালবাসা আর টান আছে যা এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

বিজ্‌রিদের বাড়িটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে। পুবে এবং পশ্চিমে দুই সীমানায় কাঁটাওলা পুটুস গাছের বেড়া, উত্তরের ভিটেতে পর পর তিনটে কাঠের দেওয়াল আর টালির ছাউনির দক্ষিণমুখো ঘর। ঘরের পর বিরাট উঠোন। দক্ষিণ দিকটা একেবারে খোলা।

গাঁয়ের রাস্তা থেকে ধর্মা আর কুশী বাড়ির ভেতর ঢুকল এবং বিজ্‌রিদের সামনে এসে খানিকটা তফাতে বসল। অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের সতর্ক করে দিতে হয় না। আজন্মের সংস্কারবশেই তারা উঁচু জাতের মানুষদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

বিজ্‌রি বলল, 'মাস্টারজির কাছ থেকে পাইসা গিনতি করে এলি?'

ধর্মা মাথা নাড়ে, 'হাঁ —'

এই পয়সা জমানোর ব্যাপারটা যে সামান্য ক'টি লোককে ধর্মারা জানিয়েছে তাদের মধ্যে বিজ্‌রি এবং মহাদেও-ও রয়েছে। ধর্মারা ওদের বিশ্বাস করে আর 'আপনা আদমি' বলেই ভাবে।

ধর্মারাই শুধু না, বিজ্‌রিও তাদের আপনজন মনে করে। দু তরফে এই রকম ভাবার যথেষ্ট কারণও আছে।

বিজ্‌রির বয়েস তিরিশ বত্রিশ হবে, মহাদেওর বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। শাদি হয়েছিল তাদের পনের ষোল সাল আগে কিন্তু ছেলেপুলে আর হয় না। বিয়ের পর দু সাল যায়, পাঁচ সাল যায়, দশ সাল বার সালও পার হয় তবু বিজ্‌রি আর মহাদেও ছেলেমেয়ের জন্ম দিতে পারে না। চৌকাদ গাঁয়ের লোকেরা তাদের, বিশেষ করে বিজ্‌রির মুখ দেখত না। বাঁজা আওরত পড়তি জমিনের (বন্ধ্যা জমি) মতোই অকেজো। তার মুখ দেখা পাপ, তার ছায়া মাড়ানো পাপ। চৌকাদ গাঁয়ে প্রায় একঘরে হয়েই ছিল বিজ্‌রিরা। পারতপক্ষে কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলত না, কালা গোয়ারের হুক্কা-পানি একরকম বন্ধ হয়েই গিয়েছিল। ঠিক এই সময় ধর্মাদের সঙ্গে তাদের আলাপ। ধর্মারা তখন গারুদিয়া বাজারে বগেড়ি বেচে মাস্টারজিকে দিয়ে পয়সা গুনিয়ে চৌকাদ গাঁয়ের ওপর দিয়ে যাতায়াত শুরু করেছে।

একঘরে মনমরা বিজ্‌রিরা যখন চুপচাপ একধারে পড়ে থাকত সেই সময় ধর্মা আর কুশী অনেকক্ষণ তাদের কাছে বসে বসে গল্প করত। ওদের দুঃখের কারণ জানতে পেরে কুশী তার এক বুড়ি মাসিকে দিয়ে কী সব শেকড় বাকড় আনিয়ে বিজ্‌রিকে খাইয়েছিল। মাসি নানারকম ওষুধ বিষুধ এবং তুকতাক জানে। সেই ওষুধের গুণেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক বিজ্‌রির বাচ্চা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ে। মহাদেওর হুক্কা-পানি আবার চালু হয়। এই জন্য কুশীদের কাছে ওদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

মহাদেও বলে, 'আর কত রুপাইয়া হলে তোরা রাজপুত সিংয়ের হাত থেকে ছাড়া পাবি?'

ধর্মা বলে, 'মাস্টারজি বলেছে, আবো বহোত বহোত রুপাইয়া —'

বিজ্‌রি বলে 'জলদি জলদি রুপাইয়া জমিয়ে ফেল —' তারপর কুশীর দিকে ফিরে বলতে থাকে, 'তোর শাদিতে কী দেব জানিস?'

বিয়ের কথায় মুখ নিচু করে বসে থাকে কুশী, কিছু বলে না।

বিজ্‌রি ফের বলে, 'সপরনার (সাজগোজের) সব জিনিস পাবি। চাঁদির কাকাই (চিরুনি), বিছিয়া, করণফুল (দুল), বঢ়িয়া কাপড়া, জুতুয়া —'

ওদিকে চুল্‌হার আগুনে পাক খেতে খেতে ভয়সা ঘি ক্রমশ ঘন হতে থাকে। আগে কুশীরা লক্ষ করে নি, ঘি যে চুল্‌হাতে জ্বাল হচ্ছে তার পাশের আরেকটা চুল্‌হায় শুখা লকড়ির উনুনে ভাত ফুটছে। দূরে, ছোট বাগানে অগুনতি সফেদিয়া আর রাতকি রানী ফুল ফুটে আছে। ঘিয়ের ঘ্রাণ, ফুলের আর ফুটন্ত ভাতের ম ম খুশবুর সঙ্গে সফেদ গোয়ারিনের মুখে বিয়ে আর দামি দামি উপহারের নামগুলি

মিশে গাঢ় স্বপ্নের মতো মনে হতে থাকে কুশীর।

এদিকে বিজ্‌রির কথাব মধ্যেই ওপাশের ঘর থেকে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। বোঝা যায়, ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ঘরে শুইয়ে রেখে ওরা ঘি জ্বাল দিতে বসেছিল। ছেলের কান্না কানে আসতেই বিজ্‌রি দৌড়ে ঘরের দিকে চলে যায়। একটু পর বাচ্চাকে বুকে চেপে ভোলাতে ভোলাতে ফিরে আসে, 'মেরে বেটা রো মাত্, রো মাত্, মাত্ রোনা (কাঁদিস না) —'

কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় কান্না থামে না বাচ্চাটার। অগত্যা আড় হয়ে বসে বুকের কাপড় সরিয়ে তাকে দুধ খাওয়াতে থাকে বিজ্‌রি। আর সমানে বলে যায়, 'মেরে সোনা, মেরে চাঁদি, মেরে হীরা, মেরে মোতি। কলকাত্তাসে মেমসাব বহু এনে দেব। রো মাত্, রো মাত্—'

মহাদেও হেসে হেসে বলে, 'শুনা ধম্মা, শুনা হো কোশিয়া, সফেদ গোয়ারিনের লম্বা চওড়া খোয়াবটার কথা শুনলি? কলকাত্তাসে মেমসাব পুতহু (ছেলের বউ) আনবে। হোয় হোয় হোয় —'

বিজ্‌রি ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'আনবই তো, জরুর লায়েঙ্গী।'

বুকের দুধ খেয়ে বাচ্চাটা ঠাণ্ডা হলে ফের এধারে ঘুরে বসে বিজ্‌রি। মাখনের দলার মতো দেড় দু'বছরের ছেলেটাকে আদর করতে করতে, নাক দিয়ে পেটে সুড়সুড়ি দিতে দিতে আর চুমু খেতে খেতে বলে, 'এ বিল্লীবাচ্চা, মেরে বিল্লীবাচ্চা —'

মহাদেও মুখচোখে নকল দুঃখের ভঙ্গি ফুটিয়ে ধর্মাদের বলে, 'দেখ দেখ, আপনা আঁখোসে দেখ, ছেলেকে কেমন সুহাগ করছে। যাকে দিয়ে বিল্লীবাচ্চের মা বনেছে তাকে আর পাত্তাই দ্যায় না।' বলে নিজের আওরতের দিকে তাকায়, 'এ মেমসাব গোয়ারিন, হমেনিকো থোড়া থোড়া সুহাগ কর —'

বিজ্‌রি ওপাশ থেকে একটা শুখা লকড়ীর টুকরা তুলে আপন মরদের পিঠে আস্তে করে ঘা বসিয়ে দেয়। বলে, 'চুপ হো বেশরম কালা গোয়ার —' পেয়ার উথলে উঠলে আপনা মরদকে সে মাঝেমধ্যে কালা গোয়ার বলে।

এ সবই যে গাঢ় ভালবাসার প্রকাশ, বুঝতে অসুবিধা হয় না কুশীর। আওরত, মরদ আর তাদের বাচ্চা — এই নিয়ে কী সুন্দর সুখের সংসার বিজ্‌রিদের। দেখতে দেখতে উজ্জ্বল রুপোর পাতে রোদ ঝলকাবার মতো তার চোখ চকচকিয়ে ওঠে। চোখের কোণ দিয়ে আড়ে আড়ে সে ধর্মার দিকে তাকায়। লক্ষ করে, ধর্মাও তাকে দেখছে। দু'জনের মুখে একটু মলিন হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যেতে থাকে।

আরো কিছুক্ষণ বাদে ধর্মা বলে, 'অনেক রাত হয়ে গেল। বহোত দূর যেতে হবে। আভি চলে —'

বিজ্‌রি বলে, 'নায় নায়, এখানে খেয়ে যাবি তোরা।' চৌকাদ গাঁয়ে এলে মাস্টারজির মতো তারাও ধর্মাদের না খাইয়ে ছাড়তে চায় না।

ধর্মারা আপত্তি করে। কিন্তু রাত বাড়ার দোহাই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয় বিজ্‌রিরা। শেষ পর্যন্ত খেতে বসতেই হয়।

বিজ্‌রি জবরদস্ত খাটিয়ে আওরত। একা দশ হাতে কাজ করতে পারে। বাচ্চাটাকে মহাদেওর কোলে ছুঁড়ে দিয়ে চুল্‌হা থেকে ভয়সা ঘিয়ের কড়াই নামিয়ে ঘরে রেখে আসে। তারপর অন্য একটা চুল্‌হা থেকে ভাতের তসলা (হাঁড়ির মতো পাত্র) নামিয়ে ওধারের বাগান থেকে কলাপাতা কেটে এনে কুশীদের খেতে দেয় এবং খানিকটা তফাতে নিজেরাও খেতে বসে।

খাওয়ার ব্যবস্থা সামান্যই। আগুন আগুন মাড়ভাত্তা (ফেনভাত), মেটে আলু সেদ্ধ, খানিকটা করে টাটকা ভয়সা ঘি, রহেড় ডাল আর পুদিনার চাটনি।

খেতে খেতে আর নানারকম এলোমেলো কথা বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যায় মহাদেওর। সে বলে, 'আরে ধম্মা, শুনলাম বড়ে সরকার রঘুনাথজির মকানে আজ লাড্ডু বিলি হয়েছে।'

ধর্মা বলে, 'হাঁ। কে বললে?'

'রামলছমনজি সন্ধেবেলা মুহ্ আন্ধেরার সময় এসেছিল। বড়ে সরকারের মকানে যেতে বলল — মুগের আর চানার লাড্ডু নাকি দেওয়া হবে। লেকেন বিশ সের ঘিউর অডার (অর্ডার) আছে। তাই যাওযা হয় নি। লাড্ডু দিলে কেন? এখন তো কোনো তৌহার নেই।'

'বড়ে সরকার এম্লে বনেগা। পাটনা থেকে এম্লে বনার টিকস নিয়ে এসেছে। উসি লিয়ে —

'হাঁ?'

'হাঁ।'

খাওয়া দাওয়ার পর নিজেদের এঁটো পাতা বাইরে ফেলে দিয়ে খাবার জায়গাটা জলে ধুয়ে ধর্মারা বিদায় নেয়।

আসার সময় বিজ্‌রি আরেক বার মনে করিয়ে দেয়, জলদি জলদি ধর্মা যেন কুশীর কপালে সিনুর চড়াবার ব্যবস্থা করে।

একসময় যদুবংশীছত্রিদের চৌকাদ গাঁ পেরিয়ে আবার ওরা আরেকটা গাঁয়ে এসে পড়ে। সেখান থেকে আরেক গাঁয়ে। এইভাবে ছোটনাগপুরের মাঠের মাঝখানে একের পর এক গাঁ পার হয়ে যায় ধর্মারা। সব জায়গায় একই ছবি। সুপ্রাচীন আকাশের তলায় সুখী স্বাধীন মানুষেরা একই ছাঁচে স্নেহ-আনন্দ-সোহাগ-খুনসুটি দিয়ে বুনে বুনে কী সুন্দর এক সাংসারিক নক্‌শাই না গড়ে তুলেছে।

গাঁয়ের পর গাঁ পেরিয়ে যেতে যেতে অচ্ছুৎ ভূমিদাস এক যুবক আর এক যুবতী বুকের ভেতর গাঢ় তৃষ্ণা অনুভব করে। ভাবে, বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে কবে তারা এরকম ঘর-সংসার পাততে পারবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্মারা ফের হাইওয়েতে এসে ওঠে। রাস্তাটা এখন একেবারে ফাঁকা। রাঁচি বা পাটনা, কোনোদিকেই ট্রাক বা বাসের চিহ্নমাত্র নেই। এমনকি মানুষজনও চোখে পড়ছে না।

আকাশ জুড়ে অগুনতি জরির ফুলের মতো নক্ষত্রমালা। এধারে ওধারে ঝোপেঝাড়ে এবং হাওয়ায় জোনাকি উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

চাঁদের নরম অপার্থিব আলো গায়ে মেখে কুশী আর ধর্মা পাশাপাশি হাঁটছিল। একসময় ধর্মা কুশীর কাঁধের ওপর হাতের বেড় দিয়ে তাকে কাছে টেনে আনল। গায়ের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'গোয়ারলোগ, বামহনলোগ, কায়াথলোগ ক্যায়সা বঢ়িয়া ঘর বনায়া —'

কুশীর বুকের ভেতর থেকে বলে ওঠে, 'হাঁ —' চৌকাদ গাঁ পার হয়ে এসেছে তারা অনেকক্ষণ। কিন্তু এখনও বিজ্‌রির কথাগুলো কুশীর কানে যেন সুরে বেজে যাচ্ছে। বার বার ধর্মাকে সে 'সিনুর চড়াবার' জন্য তাগাদা দিয়েছে। তা ছাড়া বিয়ের সময় দামি দামি উপহার দেওয়ার আশাও দিয়েছে। বিছিয়া, চাঁদির করণফুল, কাকাই, সপরনার নানা জিনিস —

ধর্মা আস্তে করে এবার বলে, 'অয়সা ঘর হামনিকো চাহে —'

কুশী গভীর গলায় বলে, 'হাঁ —'

রোজ রাতেই মাঠের মাঝখানের গাঁগুলো পেরিয়ে হাইওয়েতে আসার পর এই কথাগুলো একবার করে ওরা বলে যায়। ঘর-সংসারের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে সব পাওয়ার জন্য সংকল্পও করে।

একটু পর আবছা গলায় কুশী ফের বলে, 'থোড়ে জলদি বড়ে সরকারের করজটা শোধ করে দে —'

ধর্মা বলে, 'হাঁ, দিতেই হবে।'

'একেলী থাকতে আমার আর ভাল লাগে না।'

'উরে কালাপান দুলহানিয়া —' বলতে বলতে আচমকা কী হয়ে যায় ধর্মার। কুশীকে নিজের ঢালের মতো বুকটার ওপর টেনে এনে দু হাতে ঘন করে জড়িয়ে ধরে। সতেজ লতার মতো কুশীর দুটো হাতও ধীরে ধীরে উঠে এসে ধর্মার গলা বেষ্টন করে তার মুখ নিজের মুখের ওপর নামিয়ে আনে। তারপর সীমাহীন স্বাধীন আকাশের তলায় জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরে মানুষের তৈরি নির্দয় পৃথিবীর এক ক্রীতদাস এবং এক ক্রীতদাসী মিথুনমূর্তির মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

একসময় দু'জনের হাত আলগা হয়ে খসে পড়ে। ধর্মা আস্তে করে বলে, 'চল —'

আরো খানিকক্ষণ পর দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের ধারে সাবুই ঘাসের জঙ্গলে পয়সার কৌটোটা বালির তলায় পুঁতে ওরা দোসাদটোলায় ফিরতে থাকে।

সাত

দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতটার পাশে সাবুই ঘাসের জঙ্গল। জঙ্গলটা বাঁয়ে ফেলে খানিকটা এগুলে যতদূর চোখ যায়, শক্ত পাথুরে অনাবাদী মাটির ডাঙা। এখানে বলে 'পড়তি জমি'। এ জমি এমনই কর্কশ, কাঁকর এবং পাথরে মেশানো যে মরা মরা হলদেটে ঘাস, দু-চারটে খেজুর, সিমার, গামায়ের, কোমর-বাঁকা সিসম আর আগাছা ছাড়া কিছুই জন্মায় না।

এই ডাঙা জায়গাটা বড় সরকাব রঘুনাথ সিংয়ের খাস তালুকের মধ্যে পড়ে। এরই একধারে গা জড়াজড়ি করে বেঁটে বেঁটে দমচাপা অনেকগুলো মেটে ঘর কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। বেশির ভাগ ঘরেরই দেওয়াল থেকে মাটি খসে পড়েছে। দেওয়ালের গায়ে যে ছোট ছোট বেঢপ ফোকর রয়েছে সেগুলোর নাম হয়ত জানালাই কিন্তু তাতে না আছে গরাদ, না পাল্লা। দরজা বলতে পেটানো টিন বা খেলো কাঠের একটা করে পাল্লা। দরজাটা এত ছোট যে ঘাড় গুঁজে ভেতরে ঢুকতে হয়।

এই হল ধর্মাদের দোসাদটোলা। পৃথিবীতে এত ফাঁকা জমি, এত অফুবন্ত মৃত্তিকা কিন্তু এখানকার বাসিন্দাদের জন্য মাথা পিছু হাত পাঁচেক জায়গাব বেশি পড়েনি। পৃথিবীব যে যে জায়গায় ঘন বসতির চাপ সব চাইতে বেশি তার মধ্যে ধর্মাদের এই দোসাদটোলাও হয়ত পড়বে।

এখানকার ঘরগুলো এমনই যে আলো-হাওয়া পর্যন্ত ভাল করে ঢোকে না। পৃথিবীর সেই আদিম যুগে অর্ধপশুগঠন মানুষদের উপনিবেশ যেমন ছিল, এ অনেকটা সেইরকম। বহু কাল, পঞ্চাশ ষাট কি এক দেড়শ বছর আগে রঘুনাথ সিংয়ের বাপ, ঠাকুবদা বা ঠাকুরদার বাপ ধর্মার বাপ, ঠাকুরদা বা ঠাকুবদার বাপেদের জন্য এই মহল্লা বানিয়ে দিয়েছিলেন। বাজার-গঞ্জ আর ভাবি ভারি টৌন থেকে অনেক দূরে অচ্ছুৎ ভূমিদাসেরা পৃথিবীর সবটুকু ঘৃণা গায়ে মেখে বংশ পরম্পরায় এখানে পড়ে আছে।

ধর্মা এবং কুশী দূর থেকে দেখতে পেল, তাদের দোসাদটোলাটা এখনও ঘুমিয়ে পড়ে নি। ঘরে ঘরে মিট্টি তেলের ডিবিয়া জ্বলছে। ওখান থেকে চিৎকার চেঁচামেচি এবং হল্লার আওয়াজ ভেসে আসছে। মনে হয়, কোনো কারণে তুমুল ঝগড়াঝাঁটি বেধেছে। এই দোসাদপাড়ায় সামান্য, অসামান্য বা নিতান্ত অকাবণেই প্রচণ্ড ধুন্ধুমার লেগে যায়। তখন অশ্লীল খিস্তির আদান প্রদানে রাজ্যের কাক চিল দশ মাইল তফাতে পালিয়ে যায়।

মহল্লার কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ে, ঘর-দুয়ার ফেলে কুশীর মা-বাপ আর ধর্মার মা-বাপ অর্থাৎ চার বুড়োবুড়ি মেঠো রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। কুশীদের দেখে চার মা-বাপ একসঙ্গে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে গলা মিলিয়ে মড়াকান্না জুড়ে দিল। ধর্মা আব কুশী চমকে উঠে একসঙ্গে শুধোয়, 'কা হুয়া, কা হুয়া? চিল্লাচ্ছিস কেন?'

চার বুড়োবুড়ির বয়স যথেষ্ট। গায়ের চামড়া কুঁচকে জালি জালি হয়ে গেছে; মাড়িতে বেশির ভাগ দাঁতই নেই। পাটের ফেঁসোর মতো চুল। বুড়ো দুটোব পরনে কোমর-ঢাকা চিটচিটে সামান্য টেনি। বুড়িদুটোর আচ্ছাদন আরেকটু বেশি। নিচের দিকে হাঁটু পর্যন্ত আর ওপরে বুকটা কোনোরকমে ঢাকা পড়েছে।

একসঙ্গে কান্না-মেশানো গলায় হড়বড় কবে বলার জন্য তাদের কথা দুর্বোধ্য ঠেকে কুশীদেব কাছে। ধর্মা এবং কুশী দু'জনেই এবার চেঁচিয়ে ওঠে, 'চিল্লাবি না বুড্‌হা বুড়হী। ধীরেসে বল কী হয়েছে—'

ধমকানিতে কাজ হয়। কান্নার শব্দটা মিইয়ে আসে। তবে একেবারে থামে না। বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই গলা সাফ করে চাব বুড়োবুড়ি বলতে থাকে, 'কঁহা হামনিকো মিঠাইয়া? বড়ে সরকারকা কোঠিসে দিয়া —'

এতক্ষণে বোঝা যায়, লাড্ডু বিলির খবরটা দোসাদটোলায় পৌঁছে গেছে। যাবারই কথা। ধর্মাদেব সঙ্গে আর যারা বড়ে সরকাবেব হাভেলিতে গিয়েছিল তাদের তো বগেড়ি বেচে পয়সা জমাবাব ফিকিব নেই। তারাই লাড্ডু নিয়ে মহল্লায় ফিবে খবরটা দিয়েছে।

আজ দু সাল কুশীর এবং ধর্মার চার মা-বাপ রঘুনাথ সিংয়ের খেতের কাজে যাচ্ছে না। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমের সেই শক্তি আর নেই। তাকত না থাকলে অকেজো লোককে খোরাকি এবং কাপড় দিয়ে পোষার মানে হয় না। জানবুঝ হওয়ার পর থেকে প্রায় গোটা জীবন পেটভাতায় পিতৃপুরুষের ঋণশোধের জন্য রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে খেটে গেছে ধর্মা এবং কুশীর মা-বাপেরা। এর ভেতর কখন যৌবন এসেছে আর গেছে, প্রৌঢ়ত্ব এসেছে আর গেছে, টেরও পায়নি। ছোটনাগপুরের কঠিন নির্দয় মাটি নিজেদের রক্তে আর ঘামে উর্বর করে রঘুনাথ সিংদের জন্য বছরের পর বছর ফসল ফলিয়ে গেছে তারা। তারপর শেষ বয়সে শরীরে সারবস্তু বলতে যখন আর কিছুই নেই তখন একেবারেই খারিজ হয়ে গেছে।

কিন্তু বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং বড়ই মহানুভব। খেতির কাজ থেকে বাতিল করে দিলেও তিনি ওদের ভোলেন নি। মনে করে প্রত্যেকের জন্য গুনে গুনে লাড্ডু পাঠিয়ে দিয়েছেন, ভয়সা ঘিয়ে বানানো বড় বড় উৎকৃষ্ট লাড্ডু। চার বুড়োবুড়ি নিজেরা গিয়ে বড়ে সরকারের হাত থেকে লাড্ডু নিতে পারে নি, তাতে কী! তাই বলে ভাগের মিঠাই তো আর ছাড়া যায় না।

দোসাদটোলার মানুষজনের বেশির ভাগই সারাদিন খেতখামারে জীবনীশক্তির অনেকটা ক্ষয় করে আসার পর সন্ধে হতে না হতেই ঘরে ফিরে নাকেমুখে গুঁজে মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ে। পরের দিন ভোরের আগে সে ঘুম ভাঙে না।

কিন্তু আজ যে গোটা পাড়াটা ডিবিয়া জ্বালিয়ে জেগে আছে আর ধর্মা এবং কুশীর মা-বাপেরা ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার একমাত্র কারণ বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের ওই লাড্ডু বিতরণ। তাদের জীবনে রঘুনাথ সিংয়ের হাত থেকে মিঠাইয়া পাওয়া একটা বড় রকমের তৌহারের ব্যাপার, দুর্দান্ত উত্তেজক ঘটনা। সেই উত্তেজনাই এত রাত পর্যন্ত কাউকে ঘুমোতে দেয় নি।

ধর্মা বলে, 'বড়ে সরকার মিঠাইয়া দিয়েছে, তোদের কে জানালো?'

মা-বাপেরা চেঁচাতে চেঁচাতে বলে, 'সব কোঈ। এক এক আদমিকো দো দো লাড্ডুয়া। তুহারকে লিয়ে বৈঠে বৈঠে বড়ে সরকারকে মকান গিয়া থা। মুনশিজিনে বাতায়া, হামনিকো মিঠাইয়া তুহারকে হাতমে দে দিয়া। খুদ বড়ে সরকার আপনা হাতোসে বাঁট দিয়া —'

ধর্মা এবং কুশী অনেকক্ষণ হাঁ হয়ে থাকে। লাড্ডু বিলির খবর পেয়ে চার বুড়োবুড়ি যে বড়ে সরকারের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে, এতটা তারা ভাবতে পারে নি।

মা-বাপেরা আবার চিৎকার করে ওঠে, 'কঁহা হ্যায় হামনিকো মিঠাইয়া? কঁহা রে?'

ধর্মারা জানায় দুর্ভাবনার কারণ নেই, মিঠাই তাদের সঙ্গেই আছে।

মা-বাপেরা খুব একটা যে আশ্বস্ত হয়, এমন মনে হয় না। তারা চেঁচাতেই থাকে, 'আভি নিকাল হামনিকো লাড্ডুয়া, আভি নিকাল —'

'আরে বুড়হা বুড়হিয়া মিঠাইয়া মিলবে, আগে ঘরে তো চল। লাড্ডুয়াকে লিয়ে মবতা হ্যায় —'

'কায় নায় মরোগে — অ্যাঁ? কেন মরব না? আমাদের ভাগের লাড্ডুয়া!'

ঘরের দিকে যেতে যেতে মথুরা লচ্ছু ফির্তুলাল, এমনি অনেকের ঘর থেকে তুমুল চিৎকার শোনা যেতে লাগল। নিশ্চয়ই লাড্ডুর ভাগ নিয়ে ঝগড়া চলছে।

দোসাদটোলার একেবারে মুখের দিকে রাস্তার কাছে পাশাপাশি দুটো ঘরে ধর্মা আর কুশী তাদের মা-বাপদের নিয়ে থাকে। এত পাশাপাশি যে এ ঘরে নিচু গলায় কথা বললে ও ঘরে পরিষ্কার শোনা যায়।

ঘরে এসে ম্যাচিস ধরিয়ে ওরা ডিবিয়া জ্বালায়। তারপর ধর্মা এবং কুশী তাদের মা-বাপের প্রাপ্য মিঠাই বুঝিয়ে দেয়। এতক্ষণে চার বুড়োবুড়ির মুখে হাসি ফোটে। দামি দুর্লভ লাড্ডুগুলো ডিবিয়ার আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লুব্ধ চকচকে চোখে খানিকক্ষণ তারা দেখে, তারপর খেতে শুরু করে। খাওয়া হয়ে গেলে কুশীর মা-বাপ কুশীকে এবং ধর্মার মা-বাপ ধর্মাকে বলে, 'আভি খা লে —' অর্থাৎ রাতের খাওয়ার কথা বলছে তারা।

ধর্মা এবং কুশী জানায়, চৌকাদ গাঁয়ে সফেদ গোয়ারিন আর কালা গোয়ারের বাড়ি থেকে তারা খেয়ে এসেছে। এখন আর খাবে না।

এ খবরটা দু'জনের মা-বাপের কাছে নতুন কিছু নয়। সপ্তাহে দু-এক দিন চৌকাদ গাঁ থেকে তারা রাতের খাওয়া চুকিয়ে আসে। তবু চার বুড়োবুড়ি জানায়, আজ একটু বঢ়িয়া রান্নাবান্না হয়েছে। ছেলেমেয়ে না খেলে কি মা-বাপের ভাল লাগে!

পাশাপাশি দুই ঘরে কুশী আর ধর্মা জানতে চায়, 'কী রেঁধেছিস?'

মা-বাপেরা জানায় — ভাত, সুথনির তরকারি আর শিকার।

শিকার অর্থাৎ মাংস। মাংসের নামে এ ঘরে কুশীর, ও ঘরে ধর্মার চোখ ঝকমকিয়ে ওঠে। তারা শুধোয়, 'কিসের শিকার?'

'বন পেরোয়ার (পায়রা)।'

'মিলা কিধরি? (কোথায় পাওয়া গেল)?'

'জঙ্গলে সুথনি তুলতে গিয়ে কোনো জানবর কি বদমাস চিড়িয়া (বাজপাখি) জখম করেছিল। পেরোয়াটা উড়তে পারছিল না। ধরে নিয়ে এলাম।'

রঘুনাথ সিংয়ের কাছ থেকে খারিজ হয়ে গেলেও ধর্মার মা-বাপ আর কুশীর মা-বাপের খিদে-তেষ্টা তো আর শেষ হয়ে যায় নি। পেট আছে কিন্তু বড়ে সরকারের কাছ থেকে একদানা খোরাকি মেলে না। অথচ না খেলে বাঁচে কী করে? ধর্মা আর কুশী বড়ে সরকারের খামার বাড়ি থেকে যে খোরাকি পায় তাতে নিজেরা খাওয়ার পর এমন কিছু বাড়তি থাকে না যা দিয়ে বাপ-মাকে বাঁচানো যায়। কাজেই চার বুড়োবুড়িকে নিজেদের খাদ্য নিজেদেরই যোগাড় করে নিতে হয়।

ধর্মার মা-বাপ আর কুশীর মা-বাপ এই চারজনের মধ্যে প্রচুর মিল, প্রচুর খাতির। কখনও কোনো কারণেই তাদের ঝগড়াঝাঁটি নেই। এই বনিবনার জন্য দোসাদটোলার অনেকেই তাদের হিংসে করে।

যাই হোক, খাদ্যের খোঁজে এখান থেকে তিন মাইল তফাতে দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ের জঙ্গলে রোজই চলে যায় ওরা। কন্দ, কচু, মেটে আলু, লতাপাতা, এমনি সব জিনিস যোগাড় করতে করতে ক্বচিৎ কখনও তারা এক-আধটা খরগোশ কি পাখি টাখি পেয়ে যায়। যেমন আজ একটা বন পেরোয়া বা বন্‌পায়রা পেয়েছে। যেদিন শিকার মেলে সেদিন বাড়িতে যেন তৌহার লেগে যায়।

ধর্মা আর কুশী বিজ্‌রিদের বাড়ি থেকে পেট ভরে খেয়ে এসেছে। তবু কি আর মাংস দিয়ে দু-চার গরাস ভাত খেতে পারে না? খুবই পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খায় না। দু'জনে তাদের দুই মাকে ভাগের মাংস আর ভাত তরকারি রেখে দিতে বলে। বলে, 'ভাতে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখ। কাল সবেরে খেয়ে জমিনে যাব।'

দুই পরিবারে দু'জনের একবেলার খোরাকি বেঁচে যায়। দোসাদদের জীবনে এ ঘটনা সামান্য নয়।

দোসাদটোলার সব ঘরেরই চেহারা প্রায় একরকম। খানকয়েক করে খেলো সিলভারের তোবড়ানো থালা, মাটির হাঁড়িকুড়ি, দু-চারটে ময়লা ঠেঁটি জামাকাপড়, ছেঁড়া বালিশ, চট, কাঁথাকানি, ধুলো-বোঝাই ইঁদুরে-কাটা ধুসো কম্বল। ক্বচিৎ কারুর ঘরে বাঁশের ফ্রেমে নারকেল দড়ি দিয়ে বোনা চৌপায়া চোখে পড়ে। ধর্মা আর কুশীদের ঘরদুয়ারেরও এই একই হাল। তবে কুশীদের চৌপায়া নেই, ধর্মাদের একটা আছে। রাতে সেটায় তুলো-ওড়া ফাটা বালিশ পেতে শোয় ধর্মা। এটুকুই তার জীবনে মহার্ঘ শৌখিনতা।

খানিকটা পর দুই ঘরে চার বুড়োবুড়ি রাতের খাওয়া সেরে ডিবিয়া নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। তাদের আগেই ধর্মা আর কুশী শুয়ে পড়েছিল।

রাত এখন অনেক। দোসাদপাড়া খানিকটা ঝিমিয়ে পড়লেও একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে নি। দূর থেকে নাথুয়ার বউর গুনগুনানি ভেসে আসে :

'বাবু হমার নিন্দ (ঘুম) করে,
সারি শহর বাবু ঘুরত রহে,
আ যা রে নিন্দ, তু আ যা,

বাবু হমার শুলা যা রা —
বাবু হমার নিন্দ করে।
সারি শহর বাবু ঘুরত রহে
আ যা সৈয়া, তু আ যা
বাবুকে দুধ পিলাহা যা রা —'

বোঝা যায়, নাথুয়ার বউ গান গেয়ে গেয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

ওধারে মঙ্গেরি, ভিরগুলাল, গুলাবিদের ঘর থেকেও কথাবার্তার আবছা শব্দ ভেসে আসে। তবে সব চাইতে স্পষ্ট করে যা শোনা যায় তা হল গঞ্জুরামের মায়ের একটানা বিনিয়ে বিনিয়ে কান্নার আওয়াজ।

ধর্মা দড়ির চৌপায়ায় চিত হয়ে শুয়ে ছিল। এবার খানিকটা কাত হয়ে অন্ধকারে ঝাপসাভাবে দেখল, দেওয়ালের গা ঘেঁষে তার মা-বাপ শুয়ে আছে, তবে ঘুমিয়ে পড়ে নি। ধর্মা জিজ্ঞেস করে, 'গঞ্জুর মা কাঁদে কেন?'

ধর্মার মা বলে, 'গঞ্জু ওর মায়ের ভাগের লাড্ডু খেয়ে ফেলেছে।'

গঞ্জুটা এরকমই , মা-বাপকে দেখে না। ঘোর স্বার্থপর। ধর্মা বলে, 'হারামী জানবর।' সে জানে আজ বাকি রাত গঞ্জুর মায়ের একটানা বিলাপ চলতে থাকবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে শ্বাস ওঠার মতো অদ্ভুত এক শব্দ করতে করতে ধর্মার মা-বাপ ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু সারাদিন 'হাড্ডি তোড়' খাটুনির পরও ঘুম আসে না ধর্মার। সে জানে দশ হাত তফাতে আরেকটা ঘরে কুশীর মা-বাপ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু তাদের মেয়ে ঠিকই জেগে আছে।

শুয়ে থাকতে থাকতে অন্য সব দিনের মতো আজও ঠিকাদার আর গোয়ারদের, বিশেষ করে বিজ্‌রি এবং মহাদেওর কথা মনে পড়ে যায় ধর্মার। ওরা কালাপন দুলহানিয়া অর্থাৎ কুশীর কপালে 'সিনুর চড়ানো'র জন্য রোজ তাগাদা দেয়। সাদির সময় কী কী উপহার দেবে তাও রোজ একবার করে শোনায়।

ধর্মা ভাবতে থাকে, কবে রঘুনাথ সিংয়ের কাছে তাদের 'খরিদী' জীবন শেষ হবে, কবে তারা পূর্বপুরুষের করজ শোধ করে স্বাধীন হতে পারবে, কে জানে। মুক্তি না পেলে শাদির কথাই ওঠে না। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে ধর্মার। হয়ত তার মতোই দশ হাত তফাতে আরেকটা ঘরে এক ক্রীতদাসী দোসাদ যুবতী চোখের পাতা মেলে একই কথা ভেবে যায়।

ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে ধর্মা। তাদের জীবনের একটা দিন এভাবেই কেটে যায়।

আট

দোসাদটোলায় অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের জীবনে ঘটনা খুবই অল্প। চমক দেবার মতো বড় মাপের নাটকীয় ঘটনা দু-পাঁচ বছর পর ক্বচিৎ কখনও ঘটে, যেমন ঘটেছিল কাল সন্ধেবেলায়। বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং নিজের হাতে তাদের মতো অচ্ছুৎ জনমদাসদের খাঁটি ঘিয়ে তৈরি লাড্ডু বেঁটে দিলেন, এমন চোখ-ধাঁধানো আশ্চর্য ব্যাপার দোসাদদের জীবনে আর কখনও ঘটেছে বলে কেউ শোনেনি। মহল্লার যারা পুরনো প্রাচীন মানুষ, যাদের বয়স ষাট সত্তর কি শ'য়ের কাছাকাছি তারাও এমন ঘটনা দেখে নি বা তাদের বাপ-ঠাকুরদার মুখে শোনেনি। রঘুনাথ সিংয়ের মিঠাইয়া বিলির ব্যাপারটা বেশ কয়েক মাস দোসাদদের উত্তেজিত করে রাখবে। তাদের যাবতীয় কথাবার্তায় এটা বার বার এসে পড়বে।

এ জাতীয় দু-চারটে ঘটনার কথা বাদ দিলে অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের জীবন একেবারেই ম্যাড়মেড়ে এবং গতিশূন্য। উপমা দিয়ে বলা যায়, বালির চড়ার মধ্যে শুখা মরশুমের নদীর মতো। এ দেশ তো কবেই স্বাধীন হয়ে গেছে, পর পর কত পাঁচ সালা পরিকল্পনা পার হয়ে যায়, কতবার চুনাও আসে এবং যায়, ভোটের লোকেরা আকাশ ফাটিয়ে আর গলায় রক্ত তুলে 'ভোট দো ভোট দো' করে চেঁচাতে থাকে,

গত দশ বিশ বছরে পাটনা-রাঁচীর হাইওয়েতে বাস-ট্রাক, হাওয়া গাড়ির সংখ্যা বিশগুণ বেড়ে যায়, ভারি টৌনে (শহরে) কত অদল বদল ঘটতে থাকে, সেখানে কত আলো কত জেল্লা কত নতুন চমকদার মকান, ঝকঝকে দিশি এবং বিলাইতি গাড়ির স্রোত, কত দামি দামি পোশাক, কত দামি দামি খাদ্য। কিন্তু গারুদিয়া তালুকের জল-অচল জনমদাসেরা আজাদীর আগে যেখানে ছিল অবিকল সেখানেই পড়ে আছে। স্বাধীন ভারতের যেদিকে পর্যাপ্ত আলো, অজস্র আরাম, অঢেল প্রাচুর্য তার উলটোদিকে এদের বাস। স্বাধীন উজ্জ্বল দীপ্তিমান ভারতের এতটুকু জলুস তাদের মহল্লায় এসে পড়ে না। বিশ পঞ্চাশ কি একশ বছর আগে এদের পূর্বপুরুষেরা যেভাবে জীবন কাটিয়ে গেছে এরাও হুবহু সেই ভাবেই কাটিয়ে যাচ্ছে। জীবনযাত্রার প্যাটার্নে কোথাও এতটুকু পরিবর্তন নেই। এদের আজকের দিনটা কালকের মতো, কালকের দিনটা পরশুর মতো, পরশুটা তরশুর মতো। একটা দিনের সঙ্গে আরেকটা দিনের তফাত খুঁজে বার করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। প্রত্যেকটা দিন যেন একই ছাঁচ থেকে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

অন্য সব দিনের মতো আজও অন্ধকার থাকতে থাকতে দোসাদটোলার ঘুম ভাঙল। এদেব জীবনে রাত যত তাড়াতাড়ি আসে, দিনও ঠিক তেমনি। সূর্যাস্তের পর সারা পৃথিবী যখন অনেকক্ষণ জেগে থাকে তখন তারা ঘুমিয়ে। সূর্যোদয়ের আগে অন্ধকারে বাকি পৃথিবী যখন বিছানায় তখন এই জনমদাসদের চোখ থেকে ঘুম ছুটে যায়। কেননা রোদ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বড়ে সবকারের খামারবাড়িতে হিমগিরিনন্দনের কাছে হাজিরা দিতে হয়। এটুকু সময়ের ভেতর কিছু খেয়ে আর কালোয়া (দুপুরের খাদ্য) বানিয়ে নিতে হয়।

ঘরে ঘরে চুল্হা ধরে গেছে। শুকনো লকড়ি জ্বালিয়ে দোসাদবা মাড়ভাত্তা চড়িয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ ভোরেই ভাত খেয়ে দুপুরের জন্য মকাই বা মাড়োয়া সেদ্ধ কিংবা চানার ছাতু, কাঁচা মরিচ, নুন আর খানিকটা তেঁতুলগোলা সঙ্গে করে মাঠে নিয়ে যায় দুপুরে খাবে বলে। কারুর আদত একেবারেই উলটো। ভোরে ছাতু বা মকাই, দুপুরে মাড়ভাত্তা, সঙ্গে সামান্য সবজি-টবজি।

ধর্মাদের ঘরের সামনের দাওয়ার এক কোণে রান্নার জায়গা। সেখানে ওর মা চুল্হা ধরিয়ে ভাত বসিয়ে দিয়েছে। একটু দূরে বসে আছে তার বাপ, আর থেকে থেকে কেশে যাচ্ছে। পুরনো শ্লেষ্মার কাশি। একধারে ঘুণে-ধরা বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে আছে ধর্মা। এর মধ্যেই তার 'নাহানা' টাহানা হয়ে গেছে। নাহানা আর কী? রঘুনাথ সিংয়ের বাপ বা ঠাকুরদা ভূমিদাসদের সুবিধার জন্য কোন জন্মে যেন একটা কুয়ো কাটিয়ে দিয়েছিলেন। বালি পড়ে পড়ে সেটার অবস্থা কাহিল, প্রায় বুজেই গিয়েছিল বার কয়েক। রঘুনাথ সিং বালি কাটিয়েদের দিয়ে সাফ করে দিয়েছেন তিন চার বার। শেষ বার যে করেছিলেন, তাও বছর দশেক আগে। নতুন করে বালি পড়ে ওটা আবার বুজতে বসেছে। কোনোরকমে তলার দিকে একটু কালচে জল যে পড়ে থাকে এই গরমের সময়টায় দোসাদটোলার এতগুলো লোকের পক্ষে তা মোটেই যথেষ্ট নয়। তাই কারুর ঘুম ভাঙার আগেই ধর্মা উঠে গিয়ে খানিক জল তুলে মাথায় ঢেলে আসে। অবশ্য এখান থেকে মাইল দুই হেঁটে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতে বালি সরিয়ে জল বার করে গা-মাথা ভিজিয়ে আসা যায় কিন্তু 'নাহানা'র জন্য অতদূর গেলে সূর্য ওঠার সময় খামার বাড়িতে হাজিরা দেওয়া অসম্ভব।

এখন এই জষ্ঠি মাসে শুখার সময়টা জলের বড় কষ্ট এখানে। কুয়োর বালি না কাটালেই আর নয়। মালিক বড়ে সরকারের কাছে যাওবার সাহস তাদের নেই। কয়েক সাল ধরে হিমগিরিনন্দনের কাছে বালি কাটাবার জন্য প্রচুর আর্জি, প্রচুর কাকুতি মিনতি করে আসছে তারা কিন্তু সব কিছুই হিমগিরির এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

দাওয়ায় বসে দূরে তাকিয়ে ছিল ধর্মা। কুয়োটার কাছে এতক্ষণে ভিড় জমে গেছে এবং জলের বখরা নিয়ে চিল্লাচিল্লি আর গালাগাল শুরু হয়েছে। ফি শুখা মরশুমে দোসাদপাড়ায় এ ঘটনা একেবারে দৈনন্দিন। ঝগড়া, গালাগাল এবং চিৎকার দিয়ে তাদের দিন আরম্ভ হয়।

কুয়োর দিক থেকে চোখ দু'টো সরিয়ে কুশীদের ঘরে এনে ফেলল ধর্মা। ওখানেও কুশীর মা ফেনাভাত চড়িয়ে দিয়েছে। আর কুশী নিজে সস্তা দু-আনা দামের প্লাস্টিকের কাকাই (চিরুনি) দিয়ে

জট পাকানো চুল আঁচড়াচ্ছে। কুশীটার ভোরে 'নাহানা'র অভ্যাস নেই, রাত্রে ধর্মার সঙ্গে ফিরে সে চান-টান করে।

পুব দিকটা ফর্সা হয়ে আসছে। এধার থেকে ধর্মা তাড়া লাগায়, 'জলদি জলদি চুল আঁচড়ানো শেষ করে খেয়ে নে। রওদ (রোদ) চড়তে বেশি দেরি নেই।' কুশী একবার কাকাই হাতে পেলে সময়ের হুঁশ থাকে না। চুল আঁচড়ানোটা ওর প্রিয় বিলাসিতা। কিন্তু মেয়েটা বোঝে না, যাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বড়ে সরকারের কাছে বিকিয়ে দেওয়া আছে তাদের চুলের বাহার তুলে সময় নষ্ট করা সাজে না।

রোজ সকালে কুশী ধর্মার সঙ্গে মাঠে যায়। এদিকে ফিরে খুব ব্যস্তভাবে সে বলে, 'আভি হো যায়েগা —' বলেই ঘন চুলের ভেতর জোরে জোরে কাকাই চালাতে থাকে।

ধর্মা আর কিছু বলে না।

ঘরে ঘরে এখন ফেনাভাত টগবগিয়ে ফুটতে শুরু করেছে। বড়ে সরকারের খামার বাড়ি থেকে খোরাকি বাবদ যে মোটা অরোয়া চালটা (আতপ) ধর্মাদের দেওয়া হয় তা বহুকালের পুরনো। ফুটন্ত আতপের গুমো গন্ধে দোসাদটোলার বাতাস ভারি হয়ে উঠতে থাকে।

ঘরের দাওয়ায় বসে থাকতে থাকতে রোজকার মতো আজও ধর্মা দেখতে পায়, আধবুড়ো মাঙ্গীলাল তার দুটো বাঁদর আর একটা বকরি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। মাঙ্গীলাল এবং তার তিনটে পশুর গায়ে একই রকম পোশাক, রং-বেরঙের টুকরো টাকরা কাপড় দিয়ে বানানো জামা। বাড়তির মধ্যে মাঙ্গীলালের একটা ঠেঁটি তালিমারা প্যান্ট আর মাথায় পাগড়ি রয়েছে।

মাঙ্গীলারের কেউ নেই। না ছেলেপুলে, না জেনানা। দুনিয়ায় সে একা মানুষ। ধর্মাদের স্বজাত দোসাদ হয়েও সে রঘুনাথ সিংয়ের 'খরিদী কিষান' বা ভূমিদাস নয়। তার বাপ ছিল এক পুরুষের কেনা চাষী। রঘুনাথ সিংয়ের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার সময় 'করজ পাট্টা' বা ঋণপত্রে লেখানো হয়েছিল যতদিন শারীরিক শক্তি সামর্থ থাকবে ততদিন মাঙ্গীলালের বাপ পেটভাতায় বেগার দিয়ে যাবে। তবে তার ছেলেমেয়ে বা বউকে বেগার দিতে হবে না। এদিক থেকে মাঙ্গীলাল স্বাধীন মানুষ এবং সৌভাগ্যবানও। তার পেশা হল গারুদিয়া বিজুরি কি আরো দূরের বাজারে-গঞ্জে ঘুরে বকরি-বাঁদর নিয়ে মাদারী খেল দেখিয়ে বেড়ানো। এতে যা রোজগার হয়, তিনটে পশু আর একটা মানুষের পেট মোটামুটি চলে যায়। স্বাধীন মাঙ্গীলালকে মনে মনে ঈর্ষা করে ধর্মা।

গুনগুনিয়ে চাপা গলায় গাইছিল মাঙ্গীলাল :

> 'নাচ বান্দরী
> পাকোল পুন্দরী
> তুড়ুক তুন্দরী
> হা রে গুগুনগুচা, হা রে গুগুনগুচা।'

বাঁদর নাচাবার গান। বিশ পঁচিশ সাল ধরে এক গান গাইতে গাইতে এমন আদত হয়ে গেছে যে নিজের অজান্তেই যখন তখন গলায় সুর উঠতে থাকে তার।

ধর্মা ডাকে, 'এ মাঙ্গীচাচা —'

সুর ভাঁজা থামিয়ে মাঙ্গীলাল ঘাড় ফেরায়, 'কা রে?'

'আজ কোথায় যাচ্ছ?'

'নজদিগ। চৌকাদে যাব।'

অর্থাৎ কাছাকাছি গোয়ারদের গাঁয়ে খেলা দেখাবে মাঙ্গীলাল। ধর্মা এবার শুধোয়, 'ফিরবে কখন?'

এসব খুব দরকারি প্রশ্ন নয়। তা ছাড়া দু'জনের জীবনযাত্রা একেবারেই মেলে না। ধর্মা পরাধীন ভূমিদাস, মাঙ্গীলাল স্বাধীন মানুষ। পৃথিবীর সব স্বাধীন মানুষকেই ধর্মা ঈর্ষা এবং শ্রদ্ধা করে। সেদিক থেকে মাঙ্গীলাল তার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মানুষ — একই সঙ্গে শ্রদ্ধেয় এবং ঈর্ষণীয়। তার সঙ্গে কথা বলতে সে গৌরববোধ করে।

মাঙ্গীলাল বলে, 'সামকো। মুহ্ আন্ধেরা (মুখ আঁধারি) হলেই ফিরে আসব।'

'কাল কোথায় যাবে?'

'কাল নায় নিকলেগা। পরশু, তরশু, নরশুভি নায়। তবিয়ত আচ্ছা নেহী —'

পর পর চারদিন দোসাদটোলা ছেড়ে বেরুবে না মাঙ্গীলাল। এর জন্য কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না বা হিমগিরি লোক পাঠিয়ে তার ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যাবে না কিংবা বরাদ্দ খোরাকিও কাটা যাবে না। গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধর্মা বলে, 'তুমি ভাল আছ মাঙ্গীচাচা, বহোত সৌভাগ তুমহার। আমাদের মতো বাঁধা নৌকর হয়ে যাওনি।'

এ জাতীয় কথা ধর্মার মুখে অনেক বার শুনেছে মাঙ্গীলাল। সে আর দাঁড়ায় না, নিজের পশুবাহিনী নিয়ে এগিয়ে যায়।

মাঙ্গীলাল চলে যাওয়ার একটু বাদেই আসে ফাগুরাম। ফাগুরামও একজন স্বাধীন মানুষ। মাঙ্গীলালের মতো তার বাপ-ঠাকুরদাও ছিল এক পুরুষের ভূমিদাস। পরে তাদের বংশে যারা জন্মেছে 'করজপাট্টা'র দায়ে তাদের বেগার দিতে হয় নি। তবে আগেই বলা হয়েছে মালিক রঘুনাথ সিং বড়ই মহানুভব। ঋণের দায় থেকে মুক্তি পেলে কিংবা শারীরিক দিক থেকে অপারগ হয়ে খারিজ হয়ে গেলেও তিনি কাউকে দোসাদটোলা থেকে তাড়ান না, যার যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকতে পারে।

ফাগুরাম এক কালে নৌটঙ্কীর দলে গান গাইত। বয়স হবার পর এমনিতেই দুবলা, কমজোর হয়ে পড়েছিল। রাতের পর রাত আরা মজঃফরপুর পূর্ণিয়া আব ভাগলপুর জেলার গান গেয়ে গেয়ে বুকে দোষ হয়ে গেল। তারপর পড়ল ভারি বোখারে। এখন তার রাত জাগার শক্তি নেই, আর নেই একসঙ্গে চার পাঁচ ঘণ্টা আসর জমিয়ে রাখার মতো দম। ফলে নৌটঙ্কীর দল থেকে বাতিল হয়ে গেছে।

শরীর ভাঙলেও, দম কমে এলেও ফাগুরামের গানের গলা এখনও অটুট, তার জোয়ান বয়সের মতোই সুরেলা এবং মাদকতায় ভরা। যে তার গান শুনেছে সে-ই বলেছে 'যাদু-ভরি' গলা। কেউ বলে 'গারুদিয়াকা কোয়েল'।

নৌটঙ্কীর দল থেকে বেরিয়ে আসার পর ফাগুরাম ইদানীং দু-তিন সাল নিজেই একা একা গেয়ে রোজগার করছে। রোজ ভোর হতে না হতেই দোসাদটোলা থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে দিয়ে সোজা রেল স্টেশনে চলে যায়। প্ল্যাটফর্মের বাইরে একটা ছায়াওলা প্রকাণ্ড পিপর গাছের তলায় বসে পুরনো বেলো-ফাঁসা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়। আজকাল ট্রেনে লোক চলাচল অনেক বেড়ে গেছে। সারা দিনে কামাই ভালই হয় ফাগুরামের।

ধর্মা বলল, 'চললে?'

ফাগুরাম ঘাড় কাত করে, 'হাঁ —'

মাঙ্গীলাল আর ফাগুরামের মতো স্বাধীন মানুষ দোসাদটোলায় আরো জনকয়েক আছে। বেঁচে থাকার জন্য তাদের নানা ধরনের পেশা। যেমন, বিরখু ঠিকাদারদের মাটি কাটে, মুঙ্গেরি বাসযাত্রীদের মাল বয় কিংবা লখিয়া গারুদিয়া বাজারে এক কাঠগোলায় কাঠ চেরাই করে। সবাই যে যার কাজে একের পর এক বেরিয়ে যেতে থাকে। ধর্মাদের ঘরটা একেবারে বড় রাস্তায় বেরুবার মুখ ঘেঁষে বলে এখান দিয়েই দোসাদটোলার লোকজনকে যাতায়াত করতে হয়। কাজেই ঘরের দাওয়ায় বসে সবাইকে দেখতে পায় ধর্মা।

একের পর এক অনেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বাঁকা একটা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বুড়ি সৌখী এল। ততক্ষণে ধর্মার মা চুল্হা থেকে মাড়ভাত্তা নামিয়ে ফেলেছে।

ধর্মা বরাবর লক্ষ করেছে, তার মা ভাত নামাবার সঙ্গে সঙ্গে সৌখী এসে হাজির হয়। একটু আগেও না, একটু পরেও না। বুড়ির সময়জ্ঞান বেজায় টনটনে।

সৌখীর বয়েস সত্তর আশি না শ'য়ের কাছাকাছি, বোঝা মুশকিল। বুড়ির কোমর পড়ে গেছে কবেই, খাড়া হয়ে সে দাঁড়াতে পারে না। দাঁড়াবার জন্য লাঠির ঠেকনো দরকার। গায়ের চামড়া কুঁচকে ঝুলে পড়েছে। চোখে তেজ নেই, পাতলা সরের মতো ছানি পড়েছে. দৃষ্টি ঘোলাটে। মাথার চুল শণের নুড়ি যেন, মাড়িতে একটা দাঁতও আর অবশিষ্ট নেই।

রঘুনাথ সিংয়ের সিন্দুকে ভূমিদাসদের নামাবলীর যে বিরাট লিস্ট রয়েছে সৌখী সেখান থেকে কবেই খারিজ হয়ে গেছে। অথচ যখন শরীরে তাকত ছিল বড়ে সরকারের জমিতে 'গতর চূরণ' করে

দিয়েছে। তিন কুলে কেউ নেই সৌখীর। একটা ছেলে ছিল — গণেশ বা গণা। গণা ছিল রঘুনাথ সিংয়ের ভূমিদাস। বছরখানেক আগে একদিন রাতের অন্ধকারে গারুদিয়া ছেড়ে সে পালিয়ে যায়। এই নিয়ে রঘুনাথ সিংয়ের পা-চাটা কুত্তা হিমগিরিনন্দন কম হুজ্জুত আর ঝামেলা করে নি। 'বাঁধি কিযান'দের এভাবে ভেগে যাওয়া যে কোনো মালিকের পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক। হিমগিরির মতে এতে অন্য ভূমিদাসদের ওপর 'কানটোল' রাখা যায় না। গোটা দোসাদটোলা বার বার তোলপাড় করেও গণার পাত্তা মেলে নি।

গণা ভেগে যাওয়ার পর থেকেই হাল খারাপ হয়ে পড়ে সৌখীর। পেটই তার চলতে চায় না। এখন সে ভিখমাংনি। ভোরবেলা উঠে গারুদিয়া তালুকের যে ক'টা গাঁয়ে পারে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে। কিন্তু কেউ চাল দেয় না। যা দেয়, তা হল মকাই বা মাড়োয়া। ক্বচিৎ দু-চারটে পয়সা।

দাঁতহীন মাড়ি দিয়ে মকাইদানা চিবোতে বড় কষ্ট হয় সৌখীর। তাই দুটো ভাতের আশায় রোজ ভোরে ধর্মাদের ঘরে হানা দেয় বুড়ি। তার সম্বন্ধে ধর্মার যে খানিকটা সহানুভূতি আছে, সেটা কেমন করে যেন টের পেয়ে গেছে সে।

কিন্তু ভোরবেলা সৌখীকে দেখলে একেবারে খেপে যায় ধর্মার মা। এমনিতেই তাদের ঘোর অভাবের সংসার। একজনের বাঁধা খোরাকির সঙ্গে এটা-সেটা করে জোড়াতালি দিয়ে তিনজনের পেট চালাতে হয়। তার মধ্যে রোজ ভাতের বখরা দিতে হলে তাদের চলে কী করে?

অন্য দিনের মতো আজও গলায় রক্ত তুলে চেঁচাতে থাকে ধর্মার মা, 'বুড়ি ভিখমাংনী, শরমের মাথা চিবিয়ে খেয়েছিস! গিধ কাঁহিকা! হর রোজ পরের ঘরে গিয়ে ভাত গিলতে শরম লাগে না! যা ভাগ — ভাগ —'

সৌখী এসব গালাগাল গায়ে মাখে না। নিদাঁত মাড়ি বার করে নিঃশব্দে হাসে। তারপর দুলতে দুলতে বারান্দায় এসে লাঠি এবং ভিক্ষের কৌটোটা রেখে বসে পড়ে।

ধর্মার মা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'বৈঠনে কৌন বোলা তুহারকে। যা, আভি নিকাল যা —' লোকে যেভাবে কুকুর বেড়াল বা কাক তাড়ায় সেইভাবে সৌখীকে ভাগাতে চেষ্টা করে সে।

সৌখী উত্তর দেয় না। করুণ মুখে ধর্মার দিকে তাকিয়ে থাকে শুধু।

ধর্মা তার মাকে বলে, 'বহ্‌নে দো। উসকি কোঈ নেহী —'

ধর্মার মা গলার স্বর আরেক পর্দা চড়ায়, 'কোঈ নেহী তো হামনি কা করেগী? আমরা কী করব? হর রোজ এখানে মরতে আসে। কা, টোলামে আউর কোঈ নেহী? সেখানে যাক না বুড়হী—'

ধর্মা বলে, 'কতদিন আর বুড়হী বাঁচবে! দে — ওকে ক'টা ভাত দে —'

ধর্মার মা গজ গজ করতে থাকে। এ বুড়ি এত সহজে মরছে না, গিধের মতো আরো বিশ পঞ্চাশ সাল নিশ্চয়ই বেঁচে থেকে আমাদের হাড় চুষে খাবে, ইত্যাদি। খেপে যায় বটে, তবে একমাত্র রোজগেরে ছেলের কথা অগ্রাহ্য করতে পারে না। একটা শালপাতায় খানিকটা ফেনাভাত আর নুন দিয়ে সৌখীর দিকে ছুঁড়ে দেয়। পরম যত্নে গুমো গন্ধওলা আতপ চালের সেই থকথকে গলা মণ্ড কোলের কাছাকাছি টেনে আনে সৌখী। খেতে খেতে তার ছানিপড়া ঘোলাটে চোখে আলো ফুটে ওঠে।

ধর্মা বলে, 'সিরিফ মাড়ভাত্তা দিলি বুড়হীকে? কাল রাত্তিরে শিকার (মাংস) রেঁধেছিলি না —'

ধর্মার কথা শেষ হওয়ার আগেই গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠে ধর্মার মা, 'আউর কুছ নায় দুঙ্গী। ফির দেওয়ার কথা বললে বুড়হীর মুহমে আগ (আগুন) চড়িয়ে দেব।'

এমনিতেই সৌখীকে ফেনাভাতের ভাগ দিয়ে যথেষ্ট মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে তার মা। মাংস দেবার জন্য জোরাজুরি করতে আর সাহস হয় না ধর্মার। ধর্মার মা এবার ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, 'কী খেয়ে জমিনে যাবি — মাড়ভাত্তা না রাতের পানিভাত?'

কাল রাতে সফেদ গোয়ারিনদের বাড়িতে খেয়ে আসার জন্য ধর্মার ভাগের যে ভাতটা বেঁচেছিল তা ভিজিয়ে রেখেছে তার মা। ধর্মা একটু ভেবে জানায়, এখন পানিভাত খাবে। মাড়ভাত্তা আর শিকার নিয়ে জমিতে যাবে দুপুরে খাওয়ার জন্য।

ধর্মার মা কানা ভাঙা তোবড়ানো সস্তা সিলভারের থালায় পান্তা এবং বাসি সবজি টবজি বেড়ে

ছেলেকে খেতে দিয়ে নিজের এবং ধর্মার বাপের জন্য মাড়ভাত্তা বেড়ে নেয়। এই ভোরবেলায় পেটে কিছু দিয়ে তাদেরও খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে।

নিঃশব্দে খাওয়া দাওয়া চলছিল। জীবনের সবটুকু পরিতৃপ্তি মুখে ফুটিয়ে দুর্গন্ধওলা আধপচা আতপের ফেনাভাত খেতে খেতে সৌখী বলে, 'আর বেশিদিন তোহারকে তকলিফ দেব না ধম্মার মাঈ—'

ধর্মার মা এ কথার উত্তর দেয় না, শুধু তীব্র বিরক্তিতে আর রাগে চোখ কুঁচকে সৌখীর দিকে তাকায়।

সৌখী ফের বলে, 'হামনি গারুদিয়াসে চলী যায়েগী।'

ধর্মার চমক লাগে। সে শুধোয়, 'সচ?'

ধর্মার মা ওধার থেকে চিৎকার করে, 'বুড়হী যাবে এখান থেকে! তা হলে আমাদের হাড্ডি চুষবে কে? বিলকুল ঝুটফুস (বাজে এবং মিথ্যে)।'

সৌখীর মুখ ফেনাভাতে ঠাসা। কোনোরকমে গিলে হাত নেড়ে ব্যস্তভাবে বলে, 'নায় নায় ধম্মাকি মাঈ — বিলকুল সচ। হামনি হিঁয়াসে চলী যায়েগী।'

'কব্ রে গিধি (শকুনি)?'

'দো-চার রোজের ভেতর। কাল ভিখ মাংতে গিয়েছিলাম টিশনে। ওখানে গণার সাথ দেখা হয়ে গেল।'

ধর্মা এবং ধর্মার মা চমকে ওঠে। শুধোয়, 'গণা!'

সৌখী আস্তে আস্তে তার সরু লিকলিকে গলার ওপর মাথাটা নাড়তে থাকে 'হাঁ, গণা—'

ধর্মার বাপ শিউলাল অল্প কথার লোক। বলে কম, শোনে বেশি। এমন যে চুপচাপ আদমী সে পর্যন্ত নড়েচড়ে বসে। বলে, 'তোর তো আঁখে তেজ নেই! ঠিক চিনতে পেরেছিস তো?'

'হাঁ হাঁ, জরুর। আমার সাথ বাতচিত করল। আঁখ আন্ধা হয়ে গেলেও মা তার লেড়কাকে ঠিকই চিনবে রে ধম্মাকে বাপ —'

ধর্মা কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় তার চোখে পড়ে কখন যেন তাদের অজান্তে বারান্দার সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে নওরঙ্গী। কতক্ষণ নওরঙ্গী ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেউ টের পায়নি। তাকে দেখামাত্র বুকের ভেতরটা কেঁপে যায় ধর্মার।

নওরঙ্গী মাঝবয়সী আওরত। এত বয়সেও তার শরীরটি টাটোই রয়েছে, কোমরে রয়েছে লচক, চোখে বিজ্‌রি। মেয়েমানুষটা ধর্মাদেরই স্বজাত অর্থাৎ দোসাদিন। সাজগোজের বাহারও তার চোখ ধাঁধাবার মতো। পরনে জমকালো চড়া রঙের নক্‌শাওলা গাজীপুরী শাড়ি। চোখে সরু করে বাসি কাজলের টান। বাসি খোঁপা অনেকটাই ভেঙে গেছে, তবু তাতে গয়ার কাজ-করা জালিকাটা চাঁদির কাকাই আটকানো। গলায় রুপোর চওড়া তেতরপাতা (তেঁতুল) হার, বুকের কাছে মাছের আকারে 'লকেট' ঝুলছে। কানে করণফুল, পায়ের আঙুলে বিছিয়া, নাকে বেশর।

ত্রিভুবনে কেউ নেই নওরঙ্গীর। তিনবার স্বজাতের ঘরে তার বিয়ে হয়। কিন্তু বিবাহিত জীবনের ভিত একেবারেই মজবুত না, তিন বারই দু চার মাসের মধ্যে তার বিয়ে টুটে যায়। তেঘরিয়ার (তিন জনের ঘর করেছে যে মেয়েমানুষ) পর চৌঘরিয়া হওয়া তার কপালে জোটে নি। সে জন্য খুব একটা আপসোস নেই নওরঙ্গীর।

প্রথম বার যখন তার বিয়ে হয় তখন বয়স আর কত! পনের কি ষোল সাল। তখনও নওরঙ্গীর মা-বাবা বেঁচে আছে। বিয়ে হলে কী হয়, আচমকা বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের নজর এসে পড়ে তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সফেদিয়া ফুলের মতো দেখতে এই মেয়েটার জন্য আট বেহারার রুপোর গুল-বসানো দামি পালকি পাঠিয়ে দিতে লাগলেন তিনি। দিনের বেলায় দোসাদ টোলাতে থাকত সে কিন্তু সন্ধে হলেই চলে যেত রঘুনাথ সিংয়ের হাওয়া মহলে। হাওয়া মহল রঘুনাথ সিংয়ের ফুর্তি লোটার জায়গা। মালিক বড়ে সরকার যখন অচ্ছুৎ দোসাদিনকে কৃপা করেছেন তখন গলা দিয়ে কারুর টুঁ শব্দটি বার করার উপায় নেই। দিনের বেলা নওরঙ্গী তার স্বামীর ঘরে কাটাতে পারে

কিন্তু তার রাতগুলো রঘুনাথ সিংয়ের। গারুদিয়াব জমিজমা গাছগাছালি পশুপাখি নদী-নহরের মতো অচ্ছুৎ ভূমিদাসেরাও তাঁর খাস তালুকের সম্পত্তি। তাদের যাকে নিয়ে যখন খুশি যা ইচ্ছা তিনি করতে পারেন।

প্রথম বিয়েটা ভেঙে বছরখানেক বাদে আবার দু নম্বর বিয়ে হল নওরঙ্গীর, আর তিন বছর পর তিন নম্বর শাদি। তিন বার কেন, চোদ্দ বার শাদি হলেও মালিকের আপত্তি নেই। দিনের বেলা যত খুশি সে তার স্বামীর অধীন থাক কিন্তু আন্ধেরা নামলেই চাঁদির কাজ-করা পালকিতে তাকে উঠতেই হবে।

বছর দশেক এভাবে চলার পর নেশা ছুটে যায় রঘুনাথ সিংয়ের। বগুলা চুনি চুনি খায় অর্থাৎ বক বেছে বেছে ভাল মাছটি খায়, এই বাক্যটি সার্থক করার জন্য তিনি তখন নতুন আওরত জুটিয়ে ফেলেছেন। পুরনো, বহুবার চটকানো, বহুবার ব্যবহৃত দোসাদিন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ নেই। ততদিন মা-বাপ দু'জনেই মরে ফৌত হয়ে গেছে নওরঙ্গীর এবং তার তিসরী স্বামীর সঙ্গেও কাটান ছাড়ান হয়ে গেছে। তাতে বড় রকমের লোকসান হয় নি নওরঙ্গীর। রঘুনাথ সিং তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর এখন সে হিমগিরিনন্দনের রাখনি। হিমগিরি মোটামুটি অনেকখানিই ক্ষতিপূরণ করে দিতে পেরেছে তার।

পরের রক্ষিতাকে, বিশেষ করে রাজপুত ক্ষত্রিয়ের ভোগ-করা মেয়েমানুষকে রাখা হিমগিরির পক্ষে খুব একটা সম্মানজনক ব্যাপার নয়। তবে মালিকের, সে যত নিচু জাতই হোক, উচ্ছিষ্টে খুব সম্ভব জাতের দোষ অর্শায় না। হিমগিরি মোটামুটিই খুশিই। খুশি নওরঙ্গীও। মালিক বড়ে সরকারের কৃপা থেকে বঞ্চিত হলেও তাঁরই সব চাইতে বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিটি তাকে রেখেছে। রঘুনাথ সিংয়ের পরেই এই গারুদিয়া মৌজায় হিমগিরি সর্বাধিক ক্ষমতাবান মানুষ। মর্যাদার দিক থেকে খানিকটা নেমে গেলেও মুখে একেবারে চুনকালি লাগবার মতো কিছু ঘটে নি। বরং দোসাদটোলায় আগের মতো দাপটের সঙ্গেই সে আছে। হিমগিরির যে রাখনি তার গায়ে টোকা মারার সাধ্য কার!

রোজ সন্ধেয় সাজগোজ করে মনরঙ্গোলি মেজুরটি হয়ে বসে থাকে নওরঙ্গী। রঘুনাথ সিংয়ের আমলে চাঁদির কাজ-করা পালকি আসত তার জন্য। হিমগিরিনন্দনের জিম্মায় যাওয়ার পর আসে ভৈসা বা গৈয়া গাড়ি।

মালিক বড়ে সরকার বা উচ্চবর্ণের বামহন দেওতার রাখনি হওয়াটা দোসাদসমাজে দোষের ব্যাপার নয়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চালু রয়েছে। দাসখত দেওয়া ভূমিদাসদের সুন্দরী যুবতীরা চিরকালই মালিকদের ভোগের বস্তু। এ নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় না। বরং ক্ষমতাবান মানুষদের সঙ্গে জুড়ে থাকার মধ্যে এক ধরনের সামাজিক মর্যাদা জড়িয়ে থাকে। স্বজাতের মানুষজন এ জাতীয় আওরতদের খানিকটা সমীহই করে থাকে। কিন্তু নওরঙ্গীর ব্যাপারটা উলটো। তাকে দোসাদ মহল্লার প্রতিটি মানুষ একই সঙ্গে ঘেন্না এবং ভয় করে। মনে মনে দশ বার করে তার নামে থুতু ফেলে। অবশ্য নিজেদের মনোভাব তারা গোপনই রাখে। সে সব প্রকাশ করে কে আর নিজের বিপদ ডেকে আনতে চায়!

নওরঙ্গী সম্পর্কে ভয় আর ঘৃণার কারণ এই রকম। সে রোজ রাত্তিরে দোসাদটোলার যাবতীয় খুঁটিনাটি খবর — যেমন কে কী ভাবছে, কে কী করছে — হিমগিরিকে দিয়ে আসে। গণা যে পালিয়ে গিয়েছিল, সে খবর প্রথম হিমগিরি পায় নওরঙ্গীর কাছে। রঘুনাথ সিং রাজপুতের এত বিশাল তালুক এবং এত অগুনতি ভূমিদাস চালানো মুখের কথা নয়। দিনকাল ক্রমশই খারাপ হয়ে আসছে। যদিও তাদের এখানে কিছুই হয় নি, বিশ পঞ্চাশ কি শ বছর আগের মতোই এখানকার ভূমিদাসেরা ঘাড় গুঁজে জমি চষে চলেছে, তবু সাবধানের মার নেই। ভোজপুর কি পূর্ণিয়া থেকে মাঝে মাঝে গোলমেলে খবর আসে। শহুরে লোকেদের উসকানিতে ওখানকার খরিদী কিষানেরা বেশ কয়েক বার খেপে উঠেছে। তাই হিমগিরিকে ভূমিদাসদেব সম্পর্কে আগাম খবর রাখতে হয়। যার মারফত এই খবর আসে সে হল নওরঙ্গী। সেই কারণে তার সামনে পারতপক্ষে কেউ মুখ খুলতে চায় না।

সৌখী তার ছানিপড়া ঘোলাটে চোখে নওরঙ্গীকে দেখতে পায় নি। আগের ঝোঁকেই সে বলে যেতে

লাগল, 'আচ্ছা নৌকরি মিলেছে গণার, তলব শ'ও রুপেয়াসে জ্যাদা। দো-চার রোজের ভেতর সে আমাকে নিয়ে যাবে।'

নওরঙ্গীর সামনে এ সব কথা মুখ থেকে বার করা যে কতটা বিপজ্জনক, সৌখীকে কে বোঝাবে। চোখের ইশারা করলেও আবছা অন্ধকারে তার কমজোর দৃষ্টিতে পড়বে না। কিছু করতে না পেরে ধর্মার উদ্বেগ ভেতরে ভেতরে বাড়তে থাকে। এমন যে ধর্মার মা, সৌখী যার দু চোখের বিষ, সে পর্যন্ত তার জন্য ভীষণ ঘাবড়ে যায়। ভগোয়ান রামজি আর ভগোয়ান কিষুণজিকে মনে মনে ডাকতে থাকে। দেওতাদের কিরপায় গণার যেন কোনো বিপদ না হয়।

নওরঙ্গী আর দাঁড়ায় না। দামি একটা খবর যোগাড় করে হেলেদুলে দোসাদপট্টির রাস্তা ধরে কুয়োর কাছে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

নওরঙ্গী অনেক দূরে যখন চলে গেছে, সেই সময় ধর্মার মা চাপা গলায় গজগজিয়ে ওঠে, 'বুড়হী গিধ, শয়তান আওরতটা দাঁড়িয়ে ছিল আর তুই গণার কথা বললি! নিজের বেটাকে তুই খতম করতে চাস!'

'কৌন শয়তান আওরত?' সৌখী মুখ তুলে তাকায়।

'টোলামে শয়তান আওরত ক'গো হ্যায়? বিলকুল এক — উ নওরঙ্গী।'

'গণার খবর শুনেছে নওরঙ্গী?' ভয়ে সৌখীর মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

'হাঁ রে বুড়হী আন্ধী। আপনা বেটাকে আপনা হাতসে খতম কর দিয়া?'

সৌখী এবার মাথায় চাপড় মেরে ফুঁপিয়ে ওঠে, 'হামনি কা কিয়া, গণাকো জীওনমে আফত লায়ী। হো রামজি —' তার কান্নার শব্দ ভোরের বাতাসে ভর দিয়ে দোসাদটোলায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

নয়

খাওয়া দাওয়ার পর একটা টিনের কৌটোয় কালোয়া অর্থাৎ দুপুরেব জন্য মাড়ভাত্তা, বাসি মাংস আর মিরচি-নিমক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ধর্মা। সেই সঙ্গে কাপড়ের তিনটে থলে আর বড় বোতল। আজ খোরাকি বাবদ তাদের চাল, মকাই, নিমক ইত্যাদি এবং রাতে জ্বালাবার জন্য 'মিট্টি' তেল পাওয়ার দিন। ধর্মা একাই না, কুশীও ওধারের ঘর থেকে নেমে এসে তার সঙ্গ নেয়। সে-ও তার কালোয়া এবং থলেটলে গুছিয়ে নিয়েছে।

শুধু কি কুশী আর ধর্মাই, গণেরি বুধেরি কুঁদরি শনিচারী — দোসাদটোলার সব খরিদী কিষানই ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের সঙ্গে চলেছে যত খারিজ মানুষের দল। ধর্মার মা-বাপ, কুশীর মা-বাপদের মতো রঘুনাথ সিংয়ের তালিকা থেকে বাতিল-হওয়া অসমর্থ কমজোর বুড়োবুড়িরা। এইসব বাতিল মানুষদের বেশির ভাগই খাদ্যের খোঁজে যাবে তিন মাইল দূরে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের ধারের জঙ্গলে। এদের সবার সঙ্গেই রয়েছে বড় বড় পোড়া মাটির তসলা বা হাঁড়ি। দোসাদটোলায় 'পীনেকা পানি' বা খাবার জল নেই। আসার সময় খাদ্যের সঙ্গে দক্ষিণ কোয়েলের শুখা বালি খুঁড়ে খুঁড়ে বার করে তসলা ভরেও নিয়ে আসবে। এদের মধ্যে জনকয়েক যাবে দু মাইল ফারাকে মৈথিলী বামুনদের গাঁয়ে বা যদুবংশীছত্রিদের টোলায় কিংবা গারুদিয়া বাজারে। বাড়ি বাড়ি বা দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে নানা ধরনের কাজ জুটিয়ে নেয় তারা। যেমন ঘর ছাওয়ার কাজ, মাল বওয়ার কাজ, বাড়ি সাফ করার কাজ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া কয়েকজন যাবে রঘুনাথ সিংয়ের শ দু'তিনেক দুধেল গাই আর বকরি চরাবার কাজে।

ধর্মা তার মা-বাপকে বলে, 'হোঁশিয়ার হয়ে জঙ্গলে ঢুকবি।'

বুড়োবুড়ি দু'জনেই মাথা নাড়ে, 'হাঁ—'

'জ্যাদা দের নায় করনা —'

'নায়।'

'মুহ্ আন্ধেরা হওয়ার আগেই মহল্লায় লৌটবি। আন্ধেরা নামলেই হাড় চেবুয়ারা (নেকড়ে) বেরিয়ে পড়বে।'

'হাঁ, জানি —'

রোজই খেতে কাজে যাবার সময় মা-বাপকে এই একই হুঁশিয়ারি দিয়ে যায় ধর্মা।

এদিকে বুড়ি সৌখীও সবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে। সে সমানে কেঁদে যাচ্ছিল, 'কা কিয়া হামনি? আপনা বেটোয়াকো মৌত ডেকে আনলাম। হো রামজি, হো কিষুণজি গণাকো বঁচা দে, বঁচা দে —'

তার একটানা কান্নার শব্দ ধর্মাকে বিষণ্ণ করে রাখে। নরম গলায় সৌখীকে সে বলে, 'নায় রোনা (কাঁদিস না), নায় রোনা —'

কান্না থামে না সৌখীর।

হঠাৎ কী মনে হওয়ায় ধর্মা শুধোয়, 'গণা কোথায় কাজ করে জানিস?'

জোরে জোরে মাথা ঝাকায় সৌখী, 'নায়। পুছা নেহী।'

ধর্মা ভেবেছিল, গণার ঠিকানা পেলে খেতের কাজের পর রাত্রে গিয়ে সাবধান করে দিয়ে আসা যেত। হতাশ ভঙ্গিতে সে বলে, 'বহোত মুসিবত। আভি রামজিকা কিরপা —'

দোসাদপট্টি আর হাইওয়ের মাঝামাঝি জায়গায় মেটে রাস্তাটা দু-ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। একটা হাইওয়ের দিকে, আরেকটা কোনাকুনি কাঁকুরে ডাঙার ওপর দিয়ে দক্ষিণ কোয়েলের দিকে। ধর্মারা সেখানে এসে পড়ে একসময়।

বয়স্ক বাতিল দোসাদ-দোসাদিনরা রোজকার মতো এখান থেকে কোয়েলের মরা খাতের দিকে চলে যায়। কেউ কেউ অবশ্য যায় মাঠ পেরিয়ে দূর বাজার আর গাঁওলোর দিকে। আর ধর্মারা যায় হাইওয়ের দিকে। পাক্কী বা পাকা সড়ক ধরে ওরা এখন ছুটবে রঘুনাথ সিংয়ের খামার বাড়িতে। ওদের সঙ্গে সৌখীও যেতে থাকে। খুব সম্ভব বিজুরি তালুকের বাজার কি মৈথিলীদের গাঁয়ে আজ সে ভিখ মাঙতে যাবে।

এর মধ্যেই হাইওয়েতে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। রাঁচী থেকে পাটনার বাস, পাটনা থেকে রাঁচীর বাস। তা ছাড়া দূরপাল্লার ট্রাক, সাইকেল রিক্‌শা এবং ভৈসা গাড়িও বেরিয়ে পড়েছে। রোদ উঠতে না উঠতেই হাইওয়ে সরগরম হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ পর বাতাসে কান্নার ভনভনে আওয়াজ ছড়িয়ে হাইওয়ের ওধারের মাঠে নেমে পড়ে সৌখী। মাঠ ধরে গেলে মৈথিলীদের গাঁয়ে অনেক আগে পৌঁছুনো যায়।

পুব দিকটা দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। রোদ এখনও ওঠে নি, তবে উঠতে খুব বেশি দেরি নেই। আধবুড়ো গণেরি পেছন থেকে তাড়া লাগায়, 'কত বেলা হয়ে গেল। জলদি চল —'

সবাই জোরে জোরে পা চালাতে থাকে।

খামারবাড়িতে আসতেই দেখা গেল, হিমগিরিনন্দন এর মধ্যেই তার 'কানটোল রুম'-য়ে এসে বসে আছে। মৈথিলী বামহনটা রাত কাটায় নওরঙ্গীকে নিয়ে, তার পর ভোর হতে না হতেই নাহানা সেরে কপালে চন্দন চড়িয়ে খামারবাড়িতে নিজের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে বসে থাকে। এ নিয়মের নড়চড় নেই। এমন একটা দিন ধর্মাদের মনে পড়ে না যেদিন এসে তারা দেখেছে হিমগিরি তার 'কানটোল রুম'-য়ে বসে নেই।

এ সময়টা অচ্ছুৎ দোসাদদের সঙ্গে কথা বলে না হিমগিরি। চোখ বুজে, দুলে দুলে আর আস্তে আস্তে হাতে তালি বাজিয়ে 'রামচরিতমানসে'র পদাবলী গুনগুনিয়ে গাইতে থাকে —

"ছিতি জল পাবক গগন সমীরা
পঞ্চ রচিত অতি অধম শরীরা।"

সারারাত নওরঙ্গীর সঙ্গে শরীরের চর্চা করে রোজ ভোরবেলা সেই শরীরেই নশ্বরতা এবং অসারতা প্রমাণ করার জন্য গুনগুনাতে থাকে হিমগিরি।

'কানটোল রুম'-য়ের পেছন দিকে একটা লম্বা অ্যাসবেস্টসের চালা থেকে 'র‍্যাশন' (বরাদ্দ

খোরাকিকে হিমগিরি র‍্যাশন বলে) মেলে। ধর্মারা ওখানে তাদের থলে কৌটো বোতল রেখে রামধনিয়ার কাছে চলে আসে। খোরাকির দানা এখন মিলবে না, খেতির কাজের পর সন্ধেবেলা পাওয়া যাবে। থলে নিয়ে মাঠে যাওয়ার অনেক হাঙ্গামা, তাই ধর্মারা ওখানেই ওগুলো রেখে যায়।

রামধনিয়ার কাছ থেকে হাল এবং বয়েল বুঝে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা বেরিয়ে পড়ে।

খামারবাড়ি থেকে হাইওয়েতে আসতে আসতে রোদ উঠে যায়। পুব দিকে গোয়ারদের গাঁ এবং গারুদিয়া বাজার ছাড়িয়ে অনেক দূরে আকাশ যেখানে ঘাড় ঝুঁকিয়ে নেমে গেছে ঠিক সেইখানে আগুনের গোলার মতো লাল টকটকে সূর্যের মাথা দেখা যায়।

ভোরবেলা ধর্মারা যখন মহল্লা থেকে বেরোয়, হাওয়ায় ছিল ঠাণ্ডা ভাব। এখন তাত বাড়তে শুরু করেছে। রোদ যত চড়বে, বাতাস ততই আগুনের হলকা হয়ে উঠতে থাকবে।

ওরা যখন মাঠের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সেই সময় রাঁচীর দিক থেকে একটা বাস রাস্তার ধারের বড় পিপর গাছটার তলায় এসে থামে। ওটা বাস 'ইস্টান্ড' (স্ট্যান্ড)। রাঁচী বা পাটনা যেদিক থেকে বাস আসুক এখানে খানিকক্ষণের জন্য থামে, একটু জিরিয়ে কিছু পাসিঞ্জার কুড়িয়ে আবার দৌড় লাগায়। পিপর গাছটার তলায় ফুটিফাটা টিনের ছাউনি দিয়ে তিন চারটে দোকান গজিয়ে উঠেছে — একটা পানবিড়ির, একটা চা-বিস্কুটের, একটা ছাতু-নিমক-মরিচের। দু'খানা ইট পেতে একটা হাজমও সারাদিন দেহাতী মানুষজনের চুলদাড়ি কামিয়ে যায়।

রাঁচীর বাসটা থেকে জনকয়েক লোক নেমেছিল। তাদের একজন চেঁচাতে চেঁচাতে অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের কাছে এসে পড়ে, 'এ ধম্মা, ধম্মা হো —'

ধর্মা থমকে দাঁড়ায়। যে লোকটা চেঁচাচ্ছিল সে-ও সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার নাম টিরকে।

টিরকের বয়েস চল্লিশ বেয়াল্লিশ, রাঁচীর ওরাওঁ খ্রিস্টান ওরা। বেঁটেখাট চেহারা, পেটানো স্বাস্থ্য, তামাটে রং, ট্যান-করা চকচকে চামড়া, ছোট ছোট চোখ, পুরু কালচে ঠোঁট, খাড়া চুল। পরনে খাকি হাফ প্যান্ট আর সাদা হাফ শার্ট, পায়ে কেডস, গলায় কালো কারে সিলভারের ক্রুশ ঝুলছে।

রাঁচীতে একটা বড় হোটেলে ওয়েটারের কাজ করে টিরকে। ছেলেবেলায় পাদ্রীদের কাছে মানুষ হয়েছে। তা ছাড়া বড় হোটেলে বিদেশ থেকে অনবরত গণ্ডা গণ্ডা সাহেব আসছে। তাই টিরকের মুখে সবসময় আংরেজির খই ফুটতে থাকে।

টিরকে প্রায়ই রাঁচী থেকে গারুদিয়া তালুকে ধর্মার কাছে আসে। তার কারণ পরদেশি সাহেবদের তাজ্জব সব শখ। এরা এদেশের জন্তু-জানোয়ার পশুপাখির নখ-দাঁত-শিং-পালক ইত্যাদি কেনে। সাহেবরা এ সব যোগাড়ের দায়িত্ব দেয় টিরকেকে। কিংবা টিরকেই সাহেবদের কাছে ঘুরে ঘুরে আর ঘ্যানর ঘ্যানর করে জুটিয়ে দেওয়ার 'অর্ডার' নেয়। হোটেলের টানা ডিউটির পর এত জন্তু-জানোয়ারের নখ-দাঁত কোত্থেকে সে জোটাবে? তাই তাকে ধর্মার মতো লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়।

সাহেবদের মেজাজ এবং হাত দুটোই দরাজ। পশুপাখির শিং-টিংয়ের জন্য দেদার পয়সা দেয় তারা। তার থেকে অর্ধেক কেটে নিয়ে বাকি অর্ধেক ধর্মাকে দেয় টিরকে। ভাল ফায়দা না থাকলে কে আর শুধু শুধু খাটে? গরজই বা কী?

টিরকে আসা মানেই দু-চারটে বাড়তি পয়সার আমদানি। ধর্মা বেজায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে, 'আরে ভেইয়া, তুম — এত্তে সুবে! কঁহাসে?'

টিরকে জানায়, ভোর চারটের দূরপাল্লার বাস ধরে রাঁচী থেকে সে আসছে।

ধর্মা জিজ্ঞেস করে, 'ক্যা বাত, বাত ক্যা?'

টিরকে বলে, 'বহোত 'ইমপর্টিন্ট' বাত।'

'পাইসা-রুপাইয়া কুছ মিল যায়গা?'

'জরুর মিলেগা -- বহোত মিলেগা। বহোত 'মানি' —'

ধর্মা নড়ে চড়ে দাঁড়ায়। তার চোখ চকচকিয়ে ওঠে। আগেও টিরকে মারফত পরদেশি সাহেবদের

জন্য জন্তু-জানোয়ারের ছালচামড়া যোগাড় করে দিয়ে ভাল পয়সা কামিয়েছে। গভীর আগ্রহে সে শুধোয়, 'তুহারকে মুহ্‌মে 'ঘিউ-শক্কর' (তোমার মুখে ঘি-মিষ্টি পড়ুক)। বোলো, জলদি বোলো ভেইয়া, ক্যা করনে পড়েগা? এখনই খেতিতে যেতে হবে, দাঁড়িয়ে বাতচিত করার 'টেইম' (টাইম) নেই।'

টিরকে বলে, 'চল, যেতে যেতে বাতাই —'

'হাঁ —'

মাঠের দিকে হাঁটতে হাঁটতে টিরকে বলে, 'এক আমরিকী সাহাব এসেছে। তাকে একজোড়া কোটরার (barking deer) বাচ্চা জুটিয়ে দিতে হবে।'

'কত পাইসা-রুপাইয়া মিলবে?'

'দশ —'

'নায় নায়, ইতনা কমতি নায়। জঙ্গলমে যানা পড়েগা। দো-তিন রোজ খেতির কাম বরবাদ। খোরাকি কাটা যাবে। আউর কুছু দো ভেইয়া —'

একটু ভেবে টিরকে বলে, 'ঠিক হ্যায়। বিশ টাকা পাবি —'

ধর্মা তবু বলে, 'লেকেন —'

'লেকেন ফেকেন নেহী। সিরেফ তোর জন্যেই ওই দাম। দামের ব্যাপারে আর মুহ্‌ খুলবি না। আর শোন, পরশু আসব। কোটরার বাচ্চা রেডি করে রাখবি। এক হাতে পাইসা, এক হাতে মাল —'

'নায় নায় ভেইয়া, পরশু নায় হোগা। কোটরার বাচ্চার জন্যে কত দিন জঙ্গল টুঁড়তে হবে, রামজি জানে। সাত রোজ 'টেইম' দাও —'

'নায় নায়, আমরিকী সাহাব এত রোজ থাকবে না। হামনি তরশু আয়েগা —'

'নায়, আউর এক রোজ। নরশু আও —'

চোখ কুঁচকে কিছু চিন্তা করে টিরকে বলে, 'ঠিক হ্যায়, নরশুই আসব। পাক্কি বাত?'

ধর্মা ঘাড় হেলিয়ে দেয়, 'পাক্কি বাত —'

টিরকে আর দাঁড়ায় না, ঘুরে হাইওয়ের দিকে চলে যায়।

কথা বলতে বলতে ধর্মা পিছিয়ে পড়েছিল। তার সঙ্গে কুশীও। কুশীটা সর্বক্ষণ তার গায়ে আঠার মতো সেঁটে থাকে। অন্য ভূমিদাসরা এবং তাদের ভাগের পশুগুলো নিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। ধর্মা তাব বয়েল দুটোর লেজে মোচড় দিয়ে জিভ আর আলটাকরা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বার করে। তারপর চেঁচায়, 'চল বেটোয়া, জলদি কর—'

বয়েলদের গতি বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে ধর্মা এবং কুশীরও।

কুশী এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার মুখ খোলে, 'বিশ রুপাইয়া মিলেগা?'

'হাঁ —' ধর্মা আস্তে মাথা নাড়ে।

কুশী বলে, 'বহোত রুপাইয়া —'

ধর্মা উত্তর দেয় না। সে শুধু ভাবে এই বিশ টাকা যোগ হলে তাদের মুক্তি কেনার জন্য আর কত বাকি থাকবে? মাস্টারজির কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

দশ

জষ্ঠি মাসের বেলা বেশ চড়ে গেছে। আর খানিকটা পরেই সূর্যটা খাড়া মাথার ওপব উঠে আসবে। গরম লু-বাতাস চারদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে যেন। গাছপালা বা মানুষের ছায়া দ্রুত ছোট হয়ে আসছে।

ঝলসানো মাঠের মাঝখানে পূর্বপুরুষদের মতোই লাঙল ঠেলে চলেছে ধর্মা। তার পেছন পেছন ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্যদিনের মতোই দৌড়তে দৌড়তে কোদা বেছে চলেছে কুশী।

ওধারে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের পাশে বিজুরি তালুকে অন্য সব দিনের মতো ট্রাক্টর

চলছে। হাইওয়ের ওপর বাস-লরি, সাইকেল রিক্‌শার স্রোতে কামাই নেই। যে কোনো দিনের মতোই গারুদিয়ার এই অঞ্চলটায় আজও সেই একই চিত্র। হাল চষতে চষতে একটা তফাত শুধু চোখে পড়েছে। হাইওয়ে দিয়ে একটা জিপে করে ক'টা ছোকরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে খানিকক্ষণ আগে বিজুরির দিকে চলে গেছে, 'রঘুনাথ সিংকো —'

'বোট দো —'

কালই পাটনা থেকে চুনাওর টিকিট নিয়ে ফিরেছেন রঘুনাথ সিং। আর আজই তাঁর লোকজনেরা ভোট মাঙার জন্যে দিগ্বিদিক চষে বেড়াতে শুরু করেছে।

বহুদর্শী আধবুড়ো গণেরি ওধারের একটা খেত থেকে শুধু বলে উঠেছে, 'বোটকা খেল চালু হো গিয়া —'

দুপুরের ঠিক আগে একটা লঝ্‌ঝড় সাইকেলে চেপে ঝক্কর ঝাঁই ঝক্কর ঝাঁই শব্দ করতে করতে এল রামলছমন। আগেই জানানো হয়েছে, আজীবচাঁদ যেমন রঘুনাথ সিংয়ের পা-চাটা কুত্তা, এই রামলছমন তেমনি বড়ে সরকারের খামারবাড়ির সর্বেসর্বা হিমগিরিনন্দনের পা-চাটা কুত্তা।

রামলছমনের কাজ হল, রঘুনাথ সিংয়ের চাষের জমিগুলোতে ঘুরে জনমদাসদের কাজের তদারকি করা। সোজা কথায় কে কোথায় ফাঁকি মারছে, কে আড্ডা দিচ্ছে, কে গা ঢিলে দিয়ে কাজে গাফিলতি করছে, এ সব দিকে নজর রাখা এবং দরকারমতো হিমগিরিকে খবরগুলো জানিয়ে দেওয়া। লোকটার গিদ্ধড়ের চোখ — সে চোখে ধুলো ছিটিয়ে কিছু করার উপায় নেই।

কাল রামলছমন জমিনে আসে নি। আজ নিশ্চয়ই তার শোধ তুলে ছাড়বে। ধর্মারা ভয়ে বুকের ভেতর শ্বাস আটকে লাঙল ঠেলে যেতে থাকে। লোকটা যে কথায়বার্তায় বা ব্যবহারে মারাত্মক ধরনের, তা নয়। কিন্তু হিমগিরির কাছে গিয়ে কখন কী লাগিয়ে বসবে তার ঠিকঠিকানা নেই। তার ফলাফল বেশির ভাগ সময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

সাইকেলটা মাঠের একধারে একটা কোমর-বাঁকা সিসম গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে 'রামসীয়া'র গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসে রামলছমন, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া —' প্রায় সারাদিনই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই পদ সে গেয়ে থাকে। হিমগিরির যেমন 'কানমে ঘুষল', রামলছমনের তেমনি 'চলে বনবাস রামসীয়া —' এগুলো তার ধরতাই বুলি।

রামসীয়া জানকীয়ার গান গাইলে কী হবে, রামলছমনের নজরটা সর্বক্ষণ ভাগাড়ের দিকে। ভূমিদাসদের কাজকর্মের ওপর নজর তো সে রাখেই, তা ছাড়া তার চোখ চরকির মতো ছুঁক ছুঁক করে অচ্ছুৎদের ডাঁটো যুবতী মেয়েদের দিকেই বেশি ঘুরতে থাকে। শুধু ভূমিদাসদের মেয়েই না, যে কোনো ঢঙ্গিলা যুবতী ছুকরি দেখলেই রামলছমন চনমনিয়ে ওঠে। 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া —' গাইতে গাইতে তার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ায় সে। এই স্বভাবের জন্য গারুদিয়া এবং বিজুরি তালুকের লোকজনেরা তাকে বলে 'বগুলা ভকত' বা বকধার্মিক। আর ভূমিদাসরা বগুলা ভকত তো বলেই, তা ছাড়া আরো বলে 'চুহা'। সেটা হিমগিরির কাছে অনবরত তাদের নামে রামলছমন লাগায় বলে। ও যা লোক, অচ্ছুৎদের পান থেকে চুনটা একবার খসলে আর উপায় নেই। সেটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে হিমগিরির কানে গুজগুজিয়ে তুলে দেয়।

দূর থেকে রামলছমনকে দেখামাত্র সবাই সতর্ক হয়ে গেল। চাপা গলায় আধবুড়ো গণেরি বলে, 'হোঁশিয়ার —'

অন্যরা অস্পষ্ট স্বরে বলাবলি করে, 'চুহাকে বচ্চে আ গিয়া—'

যুবতী মেয়েদের মধ্যে দুর্দান্ত বেপরোয়া এবং ডাকাবুকো যারা তারা বলে 'আ গিয়া গারুদিয়াকে নাগরিয়া বগুলা ভকত —'

গানের সেই পদটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার গাইতে গাইতে পরনের কাপড় লিকলিকে উরু পর্যন্ত গুটিয়ে এ খেত থেকে ও খেতে চরকিপাক দিতে থাকে রামলছমন। ঘুরতে ঘুরতে সে চলে আসে আধবুড়ো ধানপতের ছ'কোনা জমিতে। তার বয়সী অনেকেই আছে ভূমিদাসদের মধ্যে। কিন্তু ধানপত

কমজোরি দুব্‌লা মানুষ। গেল সাল চেচকের ব্যারামে খুবই কাবু হয়ে পড়েছিল। সেই থেকে শরীর ভেঙে গেছে। লাঙল ঠেলতে ঠেলতে এ বছর যেভাবে ধুঁকছে তাতে বেশিদিন আর তাকে খোরাকি দিয়ে রঘুনাথ সিং রাখবেন বলে মনে হয় না। খুব শীগ্‌গিরই সে খারিজ হল বলে।

রামলছমনকে দেখে গায়ের সবটুকু শক্তি হাতের মুঠোয় জড়ো করে ধানপত পাথরের মতো নিরেট মাটিতে প্রাণপণে লাঙলের শীষ ঢোকাতে থাকে। পরিশ্রমে এবং কষ্টে হাত আর গলার শির দড়ির মতো পাকিয়ে ওঠে তার, ঘোলাটে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে। পোড়া তামাটে রঙের গা বেয়ে স্রোতের মতো গল গল করে ঘাম ছুটতে থাকে।

কতটা জমি চষা হয়েছে, চোখ কুঁচকে দেখতে দেখতে রামলছমন বলে, 'ক্যা রে বুড়হা, আধি রোজ কাম করে এতটুকু জমিন চষেছিস!' সত্যি সত্যিই বেশি চষতে পারে নি ধানপত। অবশ্য বেশি চষলেও রামলছমন এই এক কথা প্রতিটি জমিতে ঘুরে ঘুরে বলবেই। এটা ওর কথার মাত্রা বা মুদ্রাদোষ, যাই বলা যাক না।

ধানপত উত্তর না দিয়ে লাঙল ঠেলতে থাকে। ঠিকমত জমি চষতে না পারলে তার ফলাফল কী দাঁড়াবে, সে জানে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই ভীত হয়ে পড়েছে ধানপত।

রামলছমন ফের বলে, 'হারামজাদ অচ্ছুৎ ভৈস! চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া —' কথার ফাঁকে ফাঁকে এক পদ গেয়েই আবার শুরু করে, 'ধান্দেবাজ ফাঁকিবাজ নিকম্মা উল্লু কাঁহিকা! আধি রোজে এই কাম! বিনা কামে খোরাকি মারার মতলব! অ্যায়সা অ্যায়সা পেটের দানা মেলে! চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া—'।

ওধারের খেত থেকে আধবুড়ো গণেরি হাতজোড় করে এগিয়ে আসে। দোসাদটুলির সে মাতব্বর মানুষ। সবার বিপদে একেবারে বুক দিয়ে পড়ে। ধানপতের হয়ে সে কাকুতি মিনতি করতে থাকে, 'ধানপতিয়া দুব্‌লা আদমী; পিছরে সাল ভারি বুখার হুয়া থা। বামহন দেওতা গুস্‌সা নায় হোনা। বহোত রওদ (রোদ)—'

গণেরির দিকে ফিরে খেঁকিয়ে ওঠে রামলছমন, 'বহোত রওদ! শালে লোগদের মাখ্‌খনের তবিয়ত, রোদে গলে যাবে! চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া— বারিষ নামার আগে পুরা জমিন চষা না হলে সব হারামজাদদের খোরাকি বিলকুল বন্ধ—'

গণেরি বলে, 'হো যায়গা দেওতা, জরুর হো যায়েগা। গুস্‌সা নায় হোনা —'

রামলছমন বলে, 'কথায় কাম হবে না। জমিন চষা না হলে সবার বুকে শুখা চানা ফেলে রগড়ানো হবে।' বলেই সামনের দিকের জমিতে তাকায়। সেখানে লাঙল দিচ্ছে বুধেরি। তার একটা পা সামান্য ছোট। রামলছমন চেল্লায়, 'অ্যাই বুধেরি, ল্যাংড়া বকরা (ছাগল), তোর জমিনের আধাআধিতেই তো আঁচড় পড়ে নি।'

বুধেরি ভয়ে ভয়ে হাতজোড় করে বলল, 'বারিষকো মুহ্‌মেই (শুরুতেই) হো যায়েগা হুজৌর —'

'দেখেগা।'

শুধু ধানপত বা বুধেরিকেই না, আরো কয়েকজনকে ধমকধামক দিল রামলছমন, তর্জন গর্জন করল। বোঝা যায়, যাদের ওপর সে বেশি হম্বিতম্বি করেছে তাদের যথেষ্ট দুর্ভোগ আছে। খেতি থেকে সোজা খামারবাড়িতে গিয়ে হিমগিরির কাছে তাদের নামে লাগাবে রামলছমন। ফলে খোরাকি বাবদ যে মাড়োয়া গেঁহু মকাই বা গুমো আতপ মেলে তার থেকে কিছু কাটা যেতে পারে। হিমগিরি আর রামলছমন আংরেজি করে বলে 'ফাইন' বা জরিমানা। রামলছমনের চুকলির জন্য ফি সপ্তাহে কাউকে না কাউকে 'ফাইন' দিতে হয়।

রামলছমন এবার আলাদাভাবে কাউকে না, তাবত খরিদী ভূমিদাসের উদ্দেশেই গলায় অনেকখানি আবেগ ঢেলে বলে, 'কাম কর। থোড়া পেয়ারসে লাঙল চালা। বড়ে সরকার মালিক তোদের জন্য এত করছেন, খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখছেন। নিমকহারামী না করে তাঁর জন্যে তোরা কিছু কর। কতবার তোদের বলেছি, মালিকের জন্যে করলে 'পুণ' (পুণ্য) হয়—'

খেতে খেতে ভূমিদাসেরা বয়েলের ল্যাজ মোচড়াতে মোচড়াতে চেঁচাতে থাকে, 'উররা— উরর

— উরর—'

বুধেরির খেতে দাঁড়িয়ে রামলছমন শকুনের চোখ দিয়ে চারদিক দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে আর 'রামসীয়া জানকীয়া' গাইতে গাইতে খানিকক্ষণ পর ধর্মার জমিতে চলে আসে। ধর্মার পেছন পেছন দৌড়ুতে দৌড়ুতে যথারীতি আগাছা বাছছিল কুশী, কখনও বা একটু থেমে, ঝুঁকে মাটি ভেঙে ঝুরঝুরে করে দিচ্ছে।

আলের ওপর দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ ধর্মা এবং কুশীর কাজ লক্ষ করে রামলছমন। কিন্তু না, হাজার চেষ্টা করেও কোথাও এতটুকু খুঁত বার করতে পারে না। তাতে মনে মনে কিছুটা খেপে যায়। কী ভেবে সে ডাকে, 'এ ধম্মা —'

ধর্মা লাঙল ঠেলতে ঠেলতেই ঘাড় ফেরায়। বলে, 'কা দেওতা?'

'কাল রাতে বাজারে কলালির কাছে তোকে আর কোশীকে দেখলাম না?'

ধর্মা তটস্থ হয়ে ওঠে। ঢোক গিলে বলে, 'উধরি গিয়া থা।'

রামলছমন শুধোয়, 'আমাকে দেখে তুরন্ত ভেগে পড়লি যে তোরা?'

ধর্মা ভাবে, সত্যি সত্যিই গিধের চোখ জানবরটার। কুশী আর সে যে তাকে দেখে দারুখানার রাস্তা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে এসেছিল, সেটা তা হলে রামলছমনের নজর এড়ায় নি! তার চোখে ধুলো দেওয়া খুবই মুশকিল। শ্বাসটানার মতো শব্দ করে সে বলে, 'নায় দেওতা, নায়। আপহিকো নায় দেখা হামনি—'

'ঝুটফুস —'

'নায় দেওতা, নায় —'

এ ব্যাপারে আর জল ঘোলা করে না রামলছমন। সরু মরকুটে বাঁশের মতো পা ফেলে ফেলে কাছে এসে কুশীর গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। কুশী চলতে শুরু করলে সে-ও চলতে থাকে। কুশী থামলে সে-ও থামে।

এই ভয়টাই করা হয়েছিল। যুবতী ছুকরি দেখলে বিশ হাত তফাতে আলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে, তেমন ধাতই নয় রামলছমনের। এ ব্যাপারটা নিত্য নৈমিত্তিক। জমিতে এসে চাষটাষ নিয়ে খানিকক্ষণ একথা সেকথা বলার পর মেয়েদের গায়ের সঙ্গে আঠার মতো সেঁটে যায় বগুলা ভকতটা।

রামলছমন গ্যাদগেদিয়ে একটু হাসে। তারপর দ্রুত 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া' কলিটা গেয়ে বলে, 'কী গতর করেছিস কোশিয়া! ক্যা গদরাই জওয়ানি! ফিলমকা হিরোইন য্যায়সা। হোয় হোয়, চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া—' গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকে বর্ষাকাল বাদে সারা বছর তাঁবু খাটিয়ে যে টেম্পোরারি সিনেমা হল বসানো হয় সেখানে গিয়ে প্রচুর হিন্দি ছবি দেখে রামলছমন। যে ছবিই আসুক সে দেখবেই। 'রামসীয়া জানকীয়া'র সঙ্গে তার কথায় 'ফিলমকা' হিরো-হিরোইনেরা এসে যায়।

লোভের বদবু মাখানো রামলছমনের গোল গোল ছোট ছোট চোখ কুশীর বুক কোমর এবং কোমরের তলার দিকে অনবরত ছোটাছুটি করতে থাকে। আর মাঠের কোদা বাছতে বাছতে দম আটকে আসে কুশীর, শরীর কুঁকড়ে যেতে থাকে। কেননা খাটো হেটো শাড়ি আর জামায় তার পুষ্ট সতেজ শরীর পুরোপুরি ঢাকা পড়ে নি। আগাছা বাছার ফাঁকে ফাঁকে একবার বুকে হাত চাপা দেয় কুশী, একবার শাড়ির খুঁট টেনে কোমরের কাছের ফাঁকা জায়গাটা ঢাকতে চেষ্টা করে।

কুশীকে দেখতে দেখতে কুর্তার পকেট থেকে কৌটো বার করে রামলছমন। সেটার ভেতর থেকে বেরোয় চুন এবং তামাকপাতা। হাতের পাতায় ডলে ডলে খৈনি বানিয়ে প্রথমে নিজের ঠোঁটের ফাঁকে খানিকটা ঢুকিয়ে দেয়। তারপর কুশীকে বলে, 'লে —'

কুশী খৈনি যে খায় না তা নয়। কিন্তু রামলছমনের কাছ থেকে নেশার এই উপহার নেওয়ার ফলাফল কতদূর গড়াতে পারে সে সম্বন্ধে তার মোটামুটি ধারণা আছে। দূর থেকে শুধু শরীর দেখার দাম হিসাবে খৈনি দেওয়ার মতো শৌখিন লোক রামলছমন নয়। কিছু নিলে এই বগুলা ভকত তার দশগুণ উশুল করে ছাড়ে অন্যভাবে। কুশী একটা হাত নেড়ে কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'নায় দেওতা, নায়—'

'লে না—' রামলছমন একরকম জোরই করতে থাকে।

'নায় নায় —'

'ঠিক হ্যায় —' অগত্যা বাকি খৈনিটুকুও দাঁতের গোড়ায় পুরে পিচিক করে থুতু ফেলে রামলছমন ফের বলে, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। ক্যা বদন, ক্যা আঁখ, ক্যা সিনা রে তোর কোশিয়া! বামহন-কায়াথ-রাজপুতদের ঘরে অ্যায়সা মেলে না।'

নিজের শরীরটা নিয়ে কী করবে, কোথায় লুকোবে, ভেবে পায় না কুশী। করুণ মুখে সে বলতে থাকে, 'নায় নায় দেওতা, অ্যায়সা নায় বোলো —'

রামলছমন আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাল-বয়েল চালাতে চালাতে হঠাৎ থমকে ঘুরে দাঁড়ায় ধর্মা। এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি সে। এবার বলে, 'বামহন দেওতা, এক বাত —'

'কী?'

'কুশী জমিন সাফ করতে না পারলে বারিষ নামার আগে কাম পুরা হবে না। অব আপহিকো কিরপা।' বলে রামলছমনের মুখের দিকে তাকায় ধর্মা। বগুলা ভকত যেভাবে কুশীর পেছনে লেগেছে তাতে তাকে ঠেকানো দরকার। কিন্তু ও যা ধূর্ত শয়তান আদমী তাতে কাজের দোহাই ছাড়া অন্য কোনোভাবেই আটকানো যাবে না। রামলছমনের রকমসকম দেখে ভেতরে ভেতরে ভয়ানক রেগে যাচ্ছিল ধর্মা। ইচ্ছা হচ্ছিল দৌড়ে ঘর থেকে একটা টাঙ্গি বার করে এনে চুহাটার ঘাড়ে কোপ ঝেড়ে দেয়। শালে শয়তানের বাচ্চাটা কেন কুশীর পেছনে লেগেছে, সে বোঝে। কিন্তু টাঙ্গি ঝেড়ে ফায়দাও যে নেই, তাও সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হয়। তার আর কুশীর জীবন স্রেফ খতরা হয়ে যাবে। তার চাইতে কৌশলে ওকে যতটা তফাতে হটিয়ে রাখা যায়।

গোল গোল স্থির চোখে কিছুক্ষণ ধর্মাকে দেখে রামলছমন। পিচিক করে আরেক বার থুতু ফেলে। থেমে থেমে বলে, 'এ ছোকরিয়া তুহারকা দুলহানিয়া হোগী — নায়?' তারপর উত্তরের জন্য না দাঁড়িয়ে 'চলে বনবাস —' গাইতে গাইতে ডান দিকের চারটে খেত পেরিয়ে গিধনির কাছে চলে এল।

গিধনি মাধোলালের জমিতে তার লাঙলের পেছনে দৌড়ে দৌড়ে মাটি সাফ করে। রামলছমনকে দেখে বুক চিতিয়ে চোখ কুঁচকে সে বলে, 'আও আও বামহনিয়া, হামনিকো প্যারা দুলহা—' দোসাদটুলির এই একটা মেয়ে যার মুখে কিছুই আটকায় না। কাউকে রেয়াত করে কথা বলা তার ধাতে নেই। বিশেষ করে রামলছমনকে সে আদপেই পরোয়া করে না। যে নিজের মান-সম্মান রাখতে জানে না তাকে কে রেয়াত করবে?

রামলছমন ট্যারাবাঁকা কালচে দাঁত বার করে শিয়ালের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, 'তু বহোত হারামী ছোকরিয়া —'

গিধনি বলে, 'তা হলে আমার গায়ে গা ঘষতে রোজ রোজ আসো কেন রে বামহনিয়া?'

রামলছমন উত্তর দেয় না। আরেক দফা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে। হাসিটায় নোংরা থকথকে ক্বাথ মেশানো যেন।

গিধনি আবার বলে, 'ক্যা মাংতা হামনিকো পাস? কী চাও?'

রামলছমন হাসতে হাসতেই চোখ টেপে। তারপর তড়িঘড়ি বলে, 'বুঝিস না, জওয়ান আদমী জওয়ানী ছোকরির কাছে কেন ঘোরে?'

দ্রুত এক পলক মধ্যবয়সী গিধটাকে দেখে নেয় গিধনি। তারপর বলে, 'তুম জওয়ান ছোকরে —'

'তব ক্যা, বুড়হা? উমর তিশ সাল পুরা হয় নি। গেল বছর গর্মীতে আধা শির সফেদ হয়ে গেল। আগর —'

'এক কাম করোগে বামহনিয়া?'

'কা?'

'আমাকে শাদি করবে?'

অন্যদিন রামলছমনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নোংরা অশ্লীল ঠাট্টা করে গিধনি। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। অচ্ছুৎ দোসাদদের ঘরের মেয়ে হয়ে কিনা সে রামলছমনকে শাদি

করতে বলার মতো হঠকারিতা দেখায়! বগুলা ভকত যত খারাপ যত গন্ধী লোকই হোক না, বামহন তো — দুনিয়ার সেরা জাত। কী করে যে গিধনির সিনায় এত সাহস হয়, কে জানে। গোটা গারুদিয়া তালুকটাই যেন কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বাজ পড়ার পরের অবস্থার মতো স্তব্ধ হয়ে যায়।

এদিকে হাসতে হাসতে থমকে গিয়েছিল রামলছমন। মুখ আলগা হলেও গিধনিকে আগে আর কখনও এমন কথা বলতে শোনে নি। রাগে রামলছমনের মুখচোখ এবং কানের লতি গনগনে আগুনের মতো হয়ে উঠতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলে, 'বদ আওরত! রেন্ডি কাঁহিকা —' বলেই ঘাড়টা বাঁই বাঁই করে ডাইনে এবং বাঁয়ে ঘোরাতে থাকে।

প্রথমটা চারধারের জমিতে খরিদী কিষানরা ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পরে মজা পেয়ে তারা দাঁত বের করে হাসতে শুরু করেছে। রামলছমনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ধাঁ করে মুণ্ডু ঘুরিয়ে তারা আবার বয়েলের ল্যাজ মোচড়াতে মোচড়াতে চেঁচাতে থাকে, 'উরর — উরর — উররা—'

এদিকে গিধনি রামলছমনকে বলে, 'শাদি না করে মধু পীতে চাও? তা হলে রাতমে ঘরের দুরাজ (দরজা) খুলে রাখব। চলে এস—'

উচ্চবর্ণের লোকেরা, বিশেষ করে মালিক বড়ে সরকার এবং হিমগিরি বা রামলছমনের মতো তাঁব প্রবল দাপটওলা নৌকরেরা পুরুষানুক্রমে খরিদী কিষাণদের ঘরের যুবতী মেয়েদের ভোগদখল করে আসছে। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের মতো এটা স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু তা নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে কেউ ঠাট্টা করবে, মজা করবে — সেটা খুবই অসম্মানজনক।

গিধনির কথায় চারপাশ থেকে হাসির শব্দ ওঠে। একসঙ্গে অনেক আতসবাজি ফাটলে যেরকম হয় অবিকল সেই শব্দ। জষ্ঠি মাসের তাতানো বাতাসে ভর করে সেই আওয়াজ ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

রামলছমন ক্ষিপ্তের মতো হাত-পা ছুঁড়ে এধার ওধার দেখতে দেখতে চিৎকার করতে থাকে, 'কৌন হাসতা, কৌন রে বান্দরকে বাচ্চা—'

কেউ উত্তর দেয় না। নিপাট ভালোমানুষের মতো মুখ করে ঘাড় গুঁজে সবাই ফের জমি চষতে থাকে।

গিধনির দিকে ফিরে রামলছমন আবার বলে, 'হারামী আওরত কাঁহিকা! তুহারকে হালচাল বদ, জবান বদ, তোর সারা গায়ে বদবু —'

'তা হলে বদবু শুঁকবার জন্য আসো কেন রে বামহনিয়া? বগুলা ভকত, তোমাকে কে অচ্ছুৎদের মেয়েদের কাছে আসতে বলে!'

রামলছমন গলার স্বর শেষ পর্দায় তুলে এবার চেঁচাতে থাকে, 'তোকে আমি সিধা করে ছেড়ে দেব রেন্ডি —'

আজ যেন গিধনির ওপর জিন বা সাঁখরেল (ভূত বা শাঁকচুন্নী) ভর করেছে। দু হাত নেড়ে তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করে সে। তারপর নানারকম অঙ্গভঙ্গি করতে কবতে বলে, 'আরে যা যা বামহনিয়া, তোর মতো সিধা করনেবালা আমি বহোত দেখেছি। যা যা, তুহারকে মুহ্‌মে থুক —' বলে তার মুখে ঠিক না, জমিতে গুনে গুনে সাত বার থুতু ফেলে গিধনি।

গিধনির মা-বাপ এবং ওপর দিকের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে খিস্তি খেউড় করতে করতে রামলছমন বকের মতো পা ফেলে ফেলে তার সেই সাইকেলটায় গিয়ে ওঠে। তারপর খেতের পাশের শক্ত পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে ঝক্কর ঝাঁই, ঝক্কর ঝাঁই আওয়াজ তুলতে তুলতে হাইওয়ের দিকে চলে যায়।

বড় সড়ক বা হাইওয়ের বাঁকে রামলছমনের সাইকেল অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর চারদিকের খেত থেকে সবাই উঠে এসে গিধনিকে ঘিরে ধরে, 'তোর জন্যে ওই বামহনিয়া চুহাটা আমাদের সবার পেট (খোরাকি বা রোজগার) কাটার ব্যওস্থা করবে। বিলকুল ভুখা থাকতে হবে ক'রোজ।'

গিধনি বোঝাতে চেষ্টা করে, 'কসুর করেছি আমি। পেট যদি কাটে আমারটা কাটবে। তোমাদের কেন কাটবে? কভ্‌ভি নায় —'

'চুহাটার কথায় আমরা হাসলাম যে। হারামজাদা বগুলা ভকত গুস্‌সা হুয়া। শোধ না তুলে কি আমাদের ছাড়বে ওই বামহনিয়া গিধটা? জানিস না ও কেত্তে বড়ে খতরনাক আদমী—'

গিধনি হাত নাড়তে নাড়তে বলে, 'ডরো মাত। আমি সব ঠিক করে দেব।'

মাধোলাল গলার শির ফুলিয়ে চেঁচায়, 'কী ঠিক করবি তুই, কী ঠিক করবি? মর গিয়া হামনিলোগ, জরুর মর গিয়া—' কোনো ব্যাপারে জোর দিতে হলে বা উত্তেজিত হয়ে উঠলে একই কথা দু'বার করে বলে সে।

গিধনি বলে, 'আরে নায় নায়। বগুলা ভকতের কথায় যদি খোরাকি কাটা যায় আমি সিধা বড়ে সরকারের মকানে চলে যাব। বলব, গলতি আমার। খোরাকি কাটতে হলে আমারটা কাটো।'

এতক্ষণ অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী গণেরি একটা কথাও বলে নি! চুপচাপ সবার চিৎকার চেঁচামেচি আর গিধনির কথা শুনে যাচ্ছিল। এবার সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে বলে, 'তোরা ডরাস না, এখন খোরাকির মাড়োয়া কি গেঁহু কাটা যাবে না।' গণেরির বলার ভঙ্গিটি ধীর কিন্তু অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়।

সবাই সমস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কায় কায়?' গণেরির কথায় তারা রীতিমত অবাকই হয়েছে।

গণেরি বুঝিয়ে দেয়, 'চুনাও আ গিয়া না? বড়ে সরকার হামনিলোগকো মিঠাইয়া খিলায়া। ভোট মাংনেকো টেইমমে খোরাকি নায় কাটেগা।'

গণেরি বহুদর্শী মানুষ। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা বিপুল। এই ভূমিদাসদের মধ্যে যে কোনো বিষয়ে তার জ্ঞান সব চাইতে বেশি। আগেও অনেক বার দেখা গেছে সে যা বলে তার ষোল আনাই ফলে যায়। অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে সে বুঝেছে এই নির্বাচনের সময় বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং তাঁর ভোটদাতাদের চটাবেন না — তা তারা তাঁর জমির খরিদী ভূমিদাসই হোক, জল-অচল অচ্ছুৎই হোক আর ভিখমাঙোয়া গরিব মানুষই হোক।

গণেরির কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে আবার সবাই চাষের কাজে নামে। এখন আর তাদের কোনোরকম দুর্ভাবনা নেই।

সন্ধের আগে আগে সূর্য ডোবার মুখটায় রঘুনাথ সিংয়ের ভূমিদাস এবং অবোধ বয়েলের পাল যখন খামারবাড়িতে ফিরছে সেই সময় সবার চোখে পড়ে ভোটের সেই গাড়িটা বিজুরি তালুকের দিক থেকে ফিরে আসছে।

'রঘুনাথ সিংকো —'

'বোট দো।'

'রঘুনাথ সিংকো —'

'বোট দো।'

জিপটা তাদের পাশ কাটিয়ে একসময় বাঁকের আড়ালে উধাও হয়ে যায়।

গণেরি যে সত্যি সত্যিই অত্যন্ত জ্ঞানী এবং দূরদর্শী, খামারবাড়িতে এসে তা টের পাওয়া যায়। ধর্মাদের এক দানা খোরাকিও কাটা গেল না।

এগার

আজ সকাল থেকেই রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলিতে বিপুল তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বড়ে সরকার কিছুক্ষণের ভেতর বিজুরি তালুকে মিশিরলালজির সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। রঘুনাথ সিংয়ের ভাগে যে নির্বাচনকেন্দ্রটি পড়েছে তার একদিকে গারুদিয়া তালুকের গোটা সতের আঠার গ্রাম, অন্যদিকে বিজুরি মৌজার পনের ষোলটা গ্রাম। সব মিলিয়ে বত্রিশ তেত্রিশটা গ্রাম। মোট ভোটদাতা লাখের ওপরে। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, এই নির্বাচনকেন্দ্রের এবং তার ভোটদাতাদের অর্ধেকটাই বিজুরিতে। চুনাওতে জিততে হলে বিজুরির ভোটদাতাদের কথা ভাবতেই হবে। তাদের বাদ দিয়ে জেতা অসম্ভব। এই নির্বাচনে আরো কয়েকজন প্রার্থী রয়েছে। তাদের কেউ যদি আগেভাগেই এসে মিশিরলালজিকে ভজিয়ে নিজের দিকে টানতে পারে তা হলে ভরাডুবি অনিবার্য। তাই এক মুহূর্ত সময়

নষ্ট না করে রঘুনাথ সিংকে বিজুরিতে ছুটতে হচ্ছে।

বিজুরি তালুক যাঁর খাস দখলে এবং সেখানকার মানুষজনের ওপর যাঁর পুরো কনট্রোল, তিনি হলেন মিশিরলালজি — উচ্চবর্ণের শাক্যদ্বীপী ব্রাহ্মণ। তাঁর কথায় বিজুরির দু-তিন লাখ মানুষ ওঠে বসে, বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। অতএব এই মানুষটির সঙ্গে দেখা হওয়াটা রঘুনাথ সিংয়ের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিশিরলালজি একটা আঙুল তুললে বিজুরি মৌজার তাবত ভোটদাতা ভোটের কাগজে রঘুনাথ সিংয়ের নামের পাশে মোহর মেরে দেবে।

মিশিরলালজির সঙ্গে কোনোরকম অসদ্ভাব নেই রঘুনাথ সিংয়ের। বরং এক ধরনের প্রীতি এবং বন্ধুত্বের সম্পর্কই রয়েছে। মিশিরলালজি উঁচু জাতের ব্রাহ্মণ আর রঘুনাথ সিং রাজপুত ক্ষত্রিয়। এমনিতে জাতপাতের প্রচণ্ড কড়াকড়ি আর বাছবিচারের দেশ এই বিহারে তাঁদের মধ্যে পারিবারিক কোনো সম্পর্ক থাকার কথা নয়। নিমন্ত্রণ করলে মিশিরলালজি গারুদিয়ায় রঘুনাথ সিংয়ের কোঠিতে যান কিংবা রঘুনাথ সিং বিজুরিতে আসেন। তৌহারের দিনে কিংবা বিয়ে টিয়ের মতো পারিবারিক উৎসবে পাশাপাশি বসে খেতে, গল্প-গুজব বা ঠাট্টা-তামাসা করতে তাঁদের আটকায় না।

সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে মিশিরলালজি যে 'ক্লাস'-এ পড়েন, রঘুনাথ সিংও হুবহু সেই ক্লাসেরই একজন জবরদস্ত প্রতিনিধি। দু'জনেই স্বাধীন ভারতের এক প্রান্তে পুরনো ফিউডাল সিস্টেমকে বিপুল দাপটে কায়েম করে রেখেছেন। এদিক থেকে তাঁরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। রক্তের সম্পর্কের চাইতেও ক্লাসের এই সম্পর্ক অনেক বেশি গাঢ় এবং গভীর।

একই শ্রেণী বা ক্লাসের মানুষদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাই স্বাভাবিক কিন্তু অন্য অসুবিধাও আছে। একজনের প্রতিপত্তি বা বাড়বাড়ন্ত অন্যের ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে অনেক সময়। রঘুনাথ সিং বা মিশিরলালজি পরস্পরকে হয়ত ঈর্ষা করেন কিন্তু তা খুবই সূক্ষ্ম এবং ভেতরকার ব্যাপার। বাইরে তার প্রকাশ নেই। উলটে বাইরের দিকে অতীব ভদ্রতা এবং বিনয়ের একটা চকচকে চোখ-ধাঁধানো পালিশ রয়েছে।

কাল রাতেই সাবেক আমলের ঢাউস ঢাউস চাকাওলা এবং হুডখোলা প্রকাণ্ড ফোর্ড গাড়িটাকে দু গণ্ডা নৌকর ধুয়েমুছে তকতকে করে রেখেছিল। আজ ভোরেও মুনশি আজীবচাঁদের তদারকিতে নতুন করে আরেক দফা মোছা টোছা চলছে। গলার শিরায় দড়ি পাকিয়ে সে সমানে চেঁচিয়ে যায়, 'এ বুদ্ধু, এ লাঙ্গুর হিঁয়া কাপড়া মার (কাপড় দিয়ে মোছ), এই টায়রিয়া (টায়ার) সাফা কর —' তারপরেই গদগদ ভঙ্গিতে বলে ওঠে, 'মেরে সরকার এম্লে বনে! হোয় হোয় —'

খানিক দূরে চৌকো চৌকো শ্বেতপাথর বসানো বারান্দায় পুরু গদিওলা ইজিচেয়ারে আধশোয়ার মতো করে কাত হয়ে আছেন রঘুনাথ সিং। তাঁর পরনে দামি চুস্ত বা মলমলের কলিদার পাঞ্জাবি বা নাগরা টাগরা নেই। তার বদলে অত্যন্ত সস্তা পোশাক—খেলো হ্যান্ডলুমের সাদা পাঞ্জাবি, ঢোলা পাজামা, মোটা চামড়ার চপ্পল। গলায় না সোনার হার, আঙুলে না হীরে-বসানো আংটি। এখন হাজার লোকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে তাঁকে আলাদা করে চেনা যাবে না, একেবারে জনগণের একজন হয়ে গেছেন তিনি।

রঘুনাথ সিংকে ঘিরে বারান্দা আলো করে বসে আছেন বড় ভকিল গিরধবলালজি, বঙ্গালী ডাগদর শ্যামদুলাল সেন, হেড মাস্টারজি বদ্রীবিশাল চৌবে। অর্থাৎ রঘুনাথ সিংয়ের বন্ধুবান্ধব বা তাঁর পা-চাটা কুত্তার দল। বড়ে সরকারের সঙ্গে তাঁরাও বিজুরিতে যাবেন। এঁদের বাদ দিয়ে এক পা-ও চলতে পারেন না রঘুনাথ।

বারান্দার আরেক ধারে রয়েছে টাটকা ভয়সা ঘিয়ের একটা টিন, বাদামের বরফি আর মুগের লাড্ডুর বিরাট ঝুড়ি, দুটো আমের টুকরি, লাল টকটকে মজঃফরপুরী লিচুর একটা বস্তা আর চিতাবাঘের আস্ত ছাল এবং হাতির ধবধবে দুটো দাঁত। রঘুনাথ সিংয়ের তরফ থেকে মিশিরলালজিকে এগুলো উপহার দেওয়া হবে। সূক্ষ্মভাবে এটাকে এক ধরনের ঘুষই বলা যায়।

মিশিরলালজির কাছে বিজুরি তালুকের ভোট পাওয়ার ব্যাপারে কিভাবে সাহায্য চাইবেন তাই নিয়ে ভকিল সাহেব ডাগদর সাহেবদের সঙ্গে পরামর্শ করতে করতে ফোর্ড গাড়িটার দিকে নজর রেখে

যাচ্ছিলেন রঘুনাথ সিং। এবার তিনি আজীবচাঁদকে তাড়া লাগালেন, 'অনেক সাফসুতরো হয়েছে। আর দেরি করা যাবে না। জষ্ঠি মাসের রোদ যেভাবে চড়ছে, এরপর বেরুলে বিজুরি থেকে ফিরে আসতে আসতে 'লু' ছুটতে শুরু করবে--'

আজীবচাঁদ ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'হো গিয়া বড়ে সরকার। আপ গাড়ি পর চড়িয়ে —'

দলবল নিয়ে বারান্দা থেকে নামতে নামতে রঘুনাথ সিং ফল মিষ্টির টুকরি-ফুকরির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'ওগুলো ক্যারিয়ারে তুলে দাও —'

তৎক্ষণাৎ আদেশ পালিত হয়।

একটু পর পুরনো মডেলের ফোর্ড গাড়ি শব্দ করতে করতে স্টার্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

পেছন থেকে আজীবচাঁদ গুনগুনিয়ে বলতে থাকে, 'মেরে সরকার এম্লে বনেগা। রামরাজ আ যায়েগা রে, রামরাজ আ যায়েগা।'

ঘণ্টাখানেকের ভেতর বিজুরি তালুকে মিশিরলালজির হাভেলিতে পৌঁছে গেলেন রঘুনাথ সিংরা।

প্রায় তিন একর জায়গা জুড়ে মিশিরলালজির হাভেলি। বিরাট কমপাউন্ড ঘিরে রয়েছে উঁচু মজবুত দেওয়াল। ভেতরে ঢোকার জন্য লোহার বড় বড় গুল বসানো প্রকাণ্ড দরজা। সেখানে বন্দুক কাঁধে এক জোড়া সাড়ে ছ'ফুট মাপের দারোয়ান। তাদের গায়ে খাকি উর্দি, গলা থেকে কোমর পর্যন্ত নেমে আসা টোটার মালা, নাকের তলায় চৌগাফা।

এ অঞ্চলে জমির বড় বড় মালিকদের বাড়ি যেমন হয়, মিশিরলালজির বাড়িটা প্রায় তেমনিই। ভেতরে ঢুকলে প্রথমে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। তার একধারে অ্যাসবেস্টসের শেডের তলায় ঝকঝকে নতুন মডেলের খান পাঁচেক দিশি এবং ইমপোর্টেড গাড়ি। রঘুনাথ সিংয়ের মতো ওয়েলার ঘোড়া, টমটম বা হাতি মিশিরলালজির নেই।

যেদিকে গাড়ির শেড তার উলটো দিকেও একটা ছোট শেডের তলায় খানকতক বেঞ্চ পাতা রয়েছে। এ বাড়িতে যারা একবারও এসেছে তারাই জানে শেডের তলায় ওই বেঞ্চগুলো মিশিরলালজির দর্শনমাঙনেওলা লোকেদের জন্য। সকালের দিকে বেলা এগারটা পর্যন্ত মিশিরলালজি লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন। নিয়ম হল, নৌকর এসে একজন করে দর্শনপ্রার্থীকে মিশিরলালজির কাছে নিয়ে যাবে। একজনের সঙ্গে কথা শেষ হলে আর একজনের পালা।

ঢাকা জায়গাটার পর মধ্যযুগের দুর্গের মতো তিন ফুট পুরু দেওয়াল আর মোটা মোটা থামওলা বিশাল তেতলা বাড়ি। বাড়িটার মাথায় রামসীতার মন্দির। মন্দিরের চূড়াটা দু মাইল দূর থেকে নজরে পড়ে।

জোড়া দারোয়ান সসম্ভ্রমে স্যালুট ঠুকে রঘুনাথ সিংয়ের ফোর্ড গাড়ির জন্য রাস্তা করে দিল। রঘুনাথ সিংকে তারা চেনে।

ভেতরে বাঁ দিকের শেডের তলায় মিশিরলালজির সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেক লোক বসে আছে। তা ছাড়া এধারে ওধারে রয়েছে নৌকরেরা।

এ বাড়ির দারোয়ানদের মতো নৌকরেরাও রঘুনাথ সিংকে চেনে। বেশ কয়েক বার পারিবারিক উৎসব বা অন্য কোনো তৌহারের দিনে তিনি এখানে এসেছেন। ফোর্ড গাড়ি একধারে থামতেই গণ্ডাখানেক নৌকর দৌড়ে এল। ঘাড় নুইয়ে বলল, 'নমস্তে সরকার —' একজন আবার তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিল। এরা সবাই জানে তাদের মালিক মিশিরলালজির মতোই বহোত বড়ে আদমী এই রঘুনাথ সিং। রাজা মহারাজা য়্যায়সা। শুধু দু'জনের তালুকই যা আলাদা।

রঘুনাথ সিং জিজ্ঞেস করলেন, 'মিশিরলালজি হাভেলিমে হ্যায়?'

'জি সরকার —'

রঘুনাথ সিং গাড়ি থেকে নেমে এলেন। তাঁর সঙ্গীরাও নামতে যাচ্ছিলেন, তাঁদের বললেন, 'আপনারা একটু বসুন। আমি আগে গিয়ে দেখা করি।'

এ বাড়ির প্রতিটি ইঁট রঘুনাথ সিংয়ের পরিচিত। সকালবেলা কোথায় মিশিরলালজির আম-দরবার

বসে, কোথায় কিভাবে বসে তিনি দর্শন-মাঙোয়াদের সঙ্গে কথা বলেন — সবই জানা আছে। সুতরাং লম্বা লম্বা সিঁড়ি ভেঙে বিশাল বারান্দায় উঠে ডান দিকে খানিকটা যাওয়ার পর একটা বিরাট ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন রঘুনাথ সিং।

ভেতরে ছ ইঞ্চি পুরু কার্পেট পাতা। একেবারে বিলিতি কেতায় চারদিকে দামি দামি সোফা আর সেন্টার টেবল সাজানো। একটা প্রকান্ড সোফায় দু পা তুলে বসে আছেন মিশিরলালজি। পয়সাওলা বড়লোক মাত্রেরই কিছু পা-চাটা কুত্তা থাকে। তেমনি জনকয়েক মিশিরলালজিকে ঘিরে আছে।

একটা ব্যাপার বরাবরই লক্ষ করেছেন রঘুনাথ সিং, মিশিরলালজির বাড়িটা বাইরে থেকে মধ্যযুগের দুর্গের মতো মনে হলেও ভেতরে একেবারে ঝকঝকে বিলাইতি চাল। বাড়িটা ভেঙে ওখানে নতুন ধরনের বাংলো বানাবার ইচ্ছা মাঝে মাঝে জাগে মিশিরলালজির। বানান না, তার একমাত্র কারণ, এটা তাঁর ঠাকুরদার তৈরি হাভেলি। পুরনো সেন্টিমেন্টকে কিছুটা দাম তিনি এখনও দিয়ে থাকেন।

পৃথিবীর এই অংশে মধ্যযুগ যখন মোটামুটি কায়েম হয়ে আছে তখন মিশিরলালজি পুরনো চাল পুরনো কেতার সঙ্গে হাল আমলকে অনেকখানি মিশিয়েছেন। হাতি ঘোড়া আর সাবেক মডেলের গাড়িটাড়ি বিদায় দিয়ে তিনি নতুন মডেলের ঝকমকে 'কার' আনিয়েছেন। হাল-বয়েল দিয়ে মান্ধাতার বাপের আমলের চাষ বাসের বদলে ট্রাক্টর দিয়ে জমি চষার বন্দোবস্ত করেছেন। এ অঞ্চলে, এ অঞ্চল কেন, বিশ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে মিশিরলালজি ছাড়া আর কারুর জমিতে 'মিসিন'য়ের লাঙল নামে নি। তা ছাড়া বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াতে পাঠিয়েছেন কলকাতায় আর লন্ডনে। তিনি নিজে সাবেকী চালে ধুতি-কুর্তা বা পাঞ্জাবি পরলেও ছেলেমেয়েদের পোশাক খাস বিলাইতি ধাঁচের। মিশিরলালজির ধ্যানধারণা বা জীবনযাত্রায় 'পুরাপাক্কা' না হলেও বার আনা সাহেবি কেতা।

রঘুনাথ সিং যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে কোনাকুনি তাকালে মিশিরলালজিকে দেখা যায়। তবে মিশিরলালজি এখনও তাঁকে লক্ষ করেন নি। তিনি ভেতরে ঢুকতে যাবেন, একটা নৌকর অন্য দরজা দিয়ে আরেকটা লোককে নিয়ে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই লোকটা মিশিরলালজির পায়ের দিকে হাত বাড়ায়।

লোকটা পায়ে হাত দেবে বলে মিশিরলালজি যেন কতই বিব্রত হয়েছেন এমন ভঙ্গি করে দু হাত নাড়তে নাড়তে বলেন, 'আরে নেহী নেহী —' বলেন ঠিকই, কিন্তু লোকটার কপালের কাছে জোড়া পা বাড়িয়ে দেন।

রঘুনাথ সিং জানেন, শুধু তিনিই না, বিশ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে যে কয়েক লাখ মানুষ বাস করে তারা সবাই জানে মিশিরলালজিকে প্রণাম করতে গেলে মুখে 'না না' বলবেন কিন্তু পা দুটো ঠিক কপাল বরাবর এগিয়ে দেবেন। এ অঞ্চলে তাঁর নাম 'চরণ ছুঁ মহারাজ'।

লোকটার চরণ ছোঁয়া হয়ে যাওয়ার পর মিশিরলালজি বললেন, 'বৈঠো —'

লোকটা কার্পেটের এক কোণে হাতজোড় করে জড়সড় হয়ে বসল।

মিশিরলালজি ফের বললেন, 'বাতাও ক্যা মাঙতা হ্যায় —' কিন্তু লোকটা উত্তর দেওয়ার আগেই রঘুনাথ সিংকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন, 'আরে মেরা ক্যা সৌভাগ! সবেরে কার মুখ দেখে আজ উঠেছিলাম! আসমানকা তারা মেরা দরোয়াজা পর খাড়া হ্যায়। আইয়ে আইয়ে রঘুনাথজি —' বলে নিজে উঠে এসে রঘুনাথ সিংয়ের হাত ধরে তাঁর পাশের সোফাটায় বসালেন। তারপর নিজের জায়গায় বসতে বসতে সেই লোকটাকে বললেন, 'আজ যাও। পরশু এস—'

লোকটা আরেক বার মিশিরলালজির পা ছুঁয়ে চলে গেল।

সেই নৌকরটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মিশিরলালজি তাকে জানিয়ে দিলেন, আজ আর কারুর সঙ্গে দেখা করা যাবে না। দর্শনমাঙোয়াদের যেন চলে যেতে বলা হয়।

রঘুনাথ সিং মিশিরলালজিকে বললেন, 'কৃপা করে যদি হুকুম করেন—'

'হুকুমকা ক্যা বাত! কহিয়ে কহিয়ে —'

'আমার তিন বন্ধু এসেছেন, বাইরে গাড়িতে বসে আছেন। কিছু জিনিসও এনেছি। নৌকর বন্ধুদের যদি ডেকে আনে আর জিনিসগুলি নিয়ে আসে —'

'ক্যা তাজ্জবকা বাত, বন্ধুদের বসিয়ে রেখে এসেছেন!' বলেই নৌকরের দিকে তাকালেন মিশিরলালজি, 'যা, রঘুনাথজির দোস্তদের ডেকে আন আর ফাগুয়াকে পাঠিয়ে দে।'

নৌকর দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

এবার রঘুনাথের দিকে পুরোপুরি ঘুরে মিশিরলালজি বললেন, 'ক্যা, দিনমে ম্যায় খোয়াব দেখ রহা হো? আপনি আসল রঘুনাথ সিংজি তো?'

রঘুনাথ সিং হাসলেন।

এদিকে মিশিরলালজির পা-চাটা কুত্তারা ঘাড় ঝুঁকিয়ে এধার ওধার থেকে সমানে 'নমস্তে' বা 'পরণাম' জানাতে লাগল। তাদের মালিকের সমান স্তরের এই মানুষটার সঙ্গে খাতির রাখা ভাল। কখন মিশিরলালজির 'গুস্‌সা' হয়ে যাবে তখন দাঁড়াবার মতো আরেকটা আশ্রয় আগে থেকেই ঠিক করে রাখা উচিত। এ জাতীয় পরগাছাদের নিয়মই এই।

মিশিরলালজি ফের বললেন, 'আপনি এসেছেন, ভারি খুশ হয়েছি রঘুনাথজি।'

রঘুনাথ সিং বললেন, 'খবর না দিয়ে আচানক চলে এসে খুব অসুবিধা ঘটালাম। কিন্তু না এসে উপায় ছিল না। একটা জরুরি কাজের —'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে মিশিরলালজি বললেন, 'কাজের কথা পরে হবে। আগেই একটা আর্জি পেশ করছি। দয়া করে যখন এসেছেন, দুপুরে এখানে 'ভোজন' করে যেতে হবে।'

হাত জোড় করে রঘুনাথ সিং বলেন, আজ তাঁকে ক্ষমা করে দিতে হবে। পরে আরেক দিন এসে নিশ্চয়ই খেয়ে যাবেন।

এ ব্যাপারে আর জোর করলেন না মিশিরলালজি।

এই সময় গাট্টাগোট্টা চেহারার ফাগুয়া নৌকর এসে ঘরে ঢোকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকলেন গিরিধরলালরা অর্থাৎ রঘুনাথ সিংয়ের পা-চাটা তিন কুত্তা। অন্য দুটো নৌকর ঘাড়ে এবং মাথায় করে সেই লাড্ডু বরফির ঝোড়া টোড়াও নিয়ে এসেছে।

উপহারের জিনিসগুলো দেখে একটু অবাক হয়েই মিশিরলালজি জিজ্ঞেস করেন, 'এসব কী?'

রঘুনাথ সিং জানান, খুব সামান্য ব্যাপার। মহারাজের দর্শন করতে এলে কিছু নজরানা আনা নিয়ম।

অত্যন্ত বিব্রত যে হয়ে পড়েছেন, মিশিরলালজির মুখচোখের ভাবে তা প্রকাশ পায়। তবে 'মহারাজ' বলায় মনে মনে তিনি বেজায় খুশি। বলেন, 'ইসকা ক্যা জরুরত থা রঘুনাথজি!'

'বললাম তো, তুচ্ছ ক'টা জিনিস। স্রেফ আপনার সম্মানের জন্যে আনা —' বলেই হাত নেড়ে নৌকর দুটোকে ফল-মিঠাইয়ের টুকরিগুলো বাড়ি ভেতরে নিয়ে যেতে বলেন রঘুনাথ সিং।

হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো ভাব করেন মিশিরলালজি। বলেন, 'আপনাকে নিয়ে আব পারা যায় না।'

এদিকে গিরিধরলালেরা মাথা ঝুঁকিয়ে মিশিরলালজিকে 'নমস্তে' বা 'পরণাম' (প্রণাম) জানাতে থাকেন। মিশিরলালজির পোষা কুকুরেরা এইভাবেই রঘুনাথ সিংকে 'নমস্তে' জানিয়েছিল। মালিকের সমগোত্রীয় লোকদের তোয়াজ এবং তোষামোদ করাটা চাটুকারদের পবিত্র কর্তব্য। দুনিয়ার পা-চাটা সব কুত্তারই এক আদত।

মিশিরলালজি ঈষৎ হেসে এবং দু-একটা কথা বলে গিরধরলালদের চোদ্দ পুরুষকে কৃতার্থ করে ফাগুয়া নৌকরের দিকে তাকান। বলেন, 'মাঈজিকে খবর দে, গারুদিয়া থেকে রঘুনাথ সিংজি এসেছেন —' মাঈজি অর্থাৎ মিশিরলালজির স্ত্রীকে এই খবর দেওয়ার মধ্যে একটা ইঙ্গিত রয়েছে। তা হল অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা।

'জি — ' ফাগুয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এবার রঘুনাথ সিং নতুন করে আসল কথাটা তুলতে চান। যে কারণে জষ্ঠি মাসের গনগনে রোদ

মাথায় নিয়ে ঝলসানো মাঠের মাঝখান দিয়ে এতদূর ছুটে এসেছেন এবং তাঁরই মাপের একটা লোককে বাড়তি পাঁচশ গুণ মর্যাদা চড়িয়ে 'মহারাজা' পর্যন্ত বলেছেন, এমন কি উপহারের নাম করে অত্যন্ত চতুরভাবে ভেট বা ঘুষ দিয়েছেন সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে এক ধরনের অস্বস্তি আর উত্তেজনা হচ্ছে। রঘুনাথ বললেন, 'একটা বিশেষ দরকারে আপনার কাছে —'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দেন মিশিরলালজি, 'জীওনভর দরকার তো আছেই। আগে বাড়ির খবর বলুন। আমার বহেনজিরা কেমন আছেন?' রঘুনাথ সিংয়ের কায়াথ এবং রাজপুত দুই স্ত্রীকে তিনি 'বহেনজি' বলেন।

রঘুনাথ বললেন, 'ঠিক আছে।'

'দুই বহেনজির বনিবনা হল?'

কায়াথনী এবং রাজপুতানীর ঝগড়া এ অঞ্চলের এক বিখ্যাত ঘটনা। প্রায় কিংবদন্তির মতো ব্যাপার। গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকের প্রতিটি মানুষ এ ব্যাপারটা জানে। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে রঘুনাথ সিং বলেন, 'মৌত পর্যন্ত বনিবনা হবে না। বলা যায় না, মরার পরও হয়ত শাঁখরেল হয়ে দু'জনে লড়াই করবে। তবে এ নিয়ে আমি ভাবি না।'

'ছেলেমেয়েরা?'

'ভালই আছে।'

রঘুনাথ সিংও মিশিরলালজির বাড়ির খুঁটিনাটি খবর নেন। এই সব অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার মধ্যে ফাগুয়া নৌকর ঢাউস ঢাউস রুপোর থালায় বিরাট আকারের গণ্ডা গণ্ডা মিঠাই আর গরমকালের যাবতীয় দামি ফল এনে সবার সামনে সাজিয়ে দেয়। চাঁদির কারুকার্য-করা গেলাসে ঠাণ্ডাইও নিয়ে আসে সে। পেস্তা বাদাম দই বরফ দিয়ে তৈরি আর খুসবু মেশানো উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই। এই জষ্ঠি মাসে স্নায়ু এবং মস্তিষ্ক শীতল রাখার পক্ষে এর চাইতে ভাল জিনিস আর হয় না।

খাবারের পরিমাণ দেখে ভীতভাবে রঘুনাথ সিং বলেন, 'আরে বাবা, এ যে আমার দশদিনের 'র‍্যাশন'। এত খাওয়া যায় নাকি?'

এ ঘর থেকে অন্দরের দিকে যাওয়ার জন্য একটা দরজা আছে। সেখানে পর্দা ঝুলছে। পর্দার ওধার থেকে কোনো মহিলার মৃদু সুরেলা গলা ভেসে আসে, 'না বললে শুনছি না। এমন কিছুই দেওয়া হয় নি।'

মিশিরলালজির স্ত্রী পদ্‌মাবতী। এমনিতে বাড়ি থেকে বিশেষ বেরোন না, তবে পর্দানশিন নন। খুবই কম কথা বলেন, তাঁর মধ্যে অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মেশানো আছে স্নেহপ্রবণতা। মিশিরলালজির বিশাল সংসার এবং অগুনতি আশ্রিত আত্মীয়-স্বজনকে অত্যন্ত সুচারুভাবে তিনি সামলান। এ বাড়িতে এলে তাঁর যত্ন এবং মমতার ছোঁয়া পাওয়া যায়।

রঘুনাথ সিং সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দেখাদেখি মিশিরলালজি বাদে ঘরের বাকি সবাইও। রঘুনাথ হাতজোড় করে বললেন, 'নমস্তে ভাবীজি। আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন?'

পদ্‌মাবতী বললেন, 'নমস্তে। আপনি এসেছেন, আমি আসব না! কষ্ট কিসের?'

'হুকুম করলে নৌকরই আপনার কাছে হাজির হত।'

'ছি ছি, কী বলছেন আপনি! বিনয়ের আর শেষ নেই। এখন ভাল ছেলের মতো বসে সব খেয়ে নিন। আমি দাঁড়াচ্ছি।'

আরা জেলার রাজা খেতাবওলা বাপের মেয়ে পদ্‌মাবতী। তাঁর আচার ব্যবহার, রাহান সাহানই আলাদা। মহিলাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন রঘুনাথ সিং। বলেন, 'এত খেতে হলে বিলকুল মরে যাব ভাবীজি।' মুখচোখের অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে তাঁর।

পদ্‌মাবতীর হয়ত করুণা হয়। বলেন, 'ঠিক আছে, যা পারেন খান।'

অগত্যা রুপোর থালার দিকে রঘুনাথ সিং এবং ঘরের বাকি লোকজনেরা হাত বাড়ায়। খেতে খেতে এলোমেলো টুকরা টাকরা কথা হয়। এরই ফাঁকে মিশিরলালজির মতো পদ্‌মাবতীও জানান,

দুপুরে রঘুনাথ সিংরা এখানে ভোজন করে গেলে তাঁর আনন্দের কারণ হত। ক্ষমা চেয়ে আগের মতোই রঘুনাথ সিং উত্তর দেন, আরেক দিন এসে অবশ্যই খেয়ে যাবেন।

পদ্‌মাবতী বলেন, 'তা হলে দিন ঠিক করে আমাদের জানিয়ে দেবেন। আর বহেনজিরাও সেদিন যেন দয়া করে আসেন। মঞ্জুর?'

'মঞ্জুর।'

খাওয়া দাওয়ার পর নৌকররা এসে থালা-গেলাস তুলে নিয়ে যায়। পর্দার ওধার থেকে পদ্‌মাবতীও সরে যান।

এবার রঘুনাথ সিং মুখ খোলার আগেই মিশিরলালজি শুরু করেন, 'আপনি কী জরুরি কাজে এসেছেন, আমি বোধহয় জানি। বলছি, দেখুন তো মেলে কিনা—'

খানিকটা অবাক হয়েই মিশিরলালজির দিকে ঘুরে বসেন রঘুনাথ সিং।

মিশিরলালজি বলতে থাকেন, 'চুনাওতে নামছেন, এম.এল.এ হয়ে পাটনার অ্যাসেম্বলিতে যাবেন — এই জরুরি ব্যাপারে আমার কাছে এসেছেন তো?'

রঘুনাথ সিংয়ের বিস্ময় এক লাফে অনেকখানি বেড়ে যায়। তিনি বলেন, 'আপনি জানলেন কী করে?'

'আরে ভেইয়াজি, আপনাদের গারুদিয়া আর আমাদের বিজুরি তালুকের গাঁওকে গাঁও জেনে গেল। শুধু আমি জানব না? পাটনায় চুনাওর বাত পাক্কা করে ফিরে এসে গারুদিয়ার হর আদমীকে মিঠাই খাইয়েছেন, এ খবরও আমার কানে পৌঁছে গেছে।'

'তবে তো আপনি সবই জানেন।'

'লেকিন ভেইয়াজি —'

'কী?'

'আপনি পোলটিকসে গেলেন কেন?' পোলটিকস বহোত গান্ধা চীজ। উসমে বহোত বহোত বদবু—' খুব বেশি লেখাপড়া শেখেন নি মিশিরলালজি। তবে দেখেছেন অনেক, জেনেছেন তার চাইতেও বেশি। তার কথার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা আংরেজি বুলি ঢুকে যায়।

একটু থেমে মিশিরলালজি ফের বলেন, 'আমরা যারা জমিজমার মালিক তাদের আঁখ জমিতেই রাখাই ভাল। অন্য দিকে আঁখ ফেরালে জমিও যায়, অন্য ব্যাপারটাও যায়। অবশ্য আমার কথা শোনা বা না-শোনা আপনার মর্জি।'

অত্যন্ত বিনীতভাবে রঘুনাথ সিং এবার বলেন, 'আপনি যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা বলি—'

'হাঁ হাঁ, জরুর। একটা কেন, বিশটা বলুন না।'

'জমি-জায়গীরের মালিকদের স্বার্থেই আমাদের কাউকে না কাউকে পোলটিকসে ঢুকতে হবে। জনতার প্রতিনিধি হয়ে অ্যাসেম্বলিতে যেতে হবে। না হলে এত জমিজমা কিছুই রাখতে পারবেন না।'

ভুরু কুঁচকে যায় মিশিরলালজির। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কিরকম? থোড়েসে সমঝা দিজিয়ে —'

রঘুনাথ সিং বুঝিয়ে যা বলেন তা মোটামুটি এই রকম। ল্যান্ড রিফর্মের কানুন দিনকে দিন যেরকম কড়া হচ্ছে তাতে পুরনো ফিউডাল সিস্টেম আর খরিদী কিষানদের পেটবেগারি চিরকাল চালিয়ে যাওয়া যাবে না। এখনও যে তারা চালাচ্ছেন তা বে-কানুনি। বড় বড় শহরের খবরের কাগজে এই নিয়ে লেখালিখিও হচ্ছে। নানা 'পোলটিক্যাল' দলের নজরও এসে পড়েছে এদিকে। এই সব রাজনৈতিক দলের কাজই হল একটা কিছু হুজ্জুত বাধিয়ে বাজার গরম করা। এখন না হলেও ভবিষ্যতে এ নিয়ে ঝামেলা হবেই।

ফি বছরই লোকসভায় বা বিধানসভায় একবার করে ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে কানুন পাশ হয়ে যায়, তাতে জমির মালিকদের ক্ষমতা কমতে থাকে। এভাবে কিছুকাল চলতে থাকলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দশ ইঞ্চি মাটিও কেউ রাখতে পারবে না। এই বিপজ্জনক ভূমিসংস্কার যেভাবেই হোক রুখতে হবে। সেই কারণে যারা কানুন বানায় তাদের মধ্যে নিজেদের লোক ঢোকানো প্রয়োজন। রঘুনাথ

সিং জমিজমার মালিকদের প্রতিনিধি হিসেবে আপাতত বিধানমণ্ডলে যেতে চাইছেন।

শুনতে শুনতে বিশাল সোফার ভেতর নড়েচড়ে বসেন মিশিরলালজি। বলেন, 'আপনি খুব ভাল ভেবেছেন। আমি এসব চিন্তা করি নি। হামে আপনা ইন্টারেস্ট জরুর দেখনা হ্যায়। হাম আপনে লিডরোসে সোসালিজম পর লম্বি চওড়ি বাত শুনতা আয়ে হ্যায়। ও চীজ আনেসে হাম বিলকুল চৌপট হো যায়েঙ্গে।'

রঘুনাথ সিং এবং মিশিরলালজির পা-চাটা কুত্তারা সমস্বরে বলে, 'জরুর, জরুর, —' এরা সব হাঁ'তে হাঁ মিলানোর দল। মালিক প্রভুরা মুখ দিয়ে যা বার করবেন এরা তাতেই সায় দেবে।

রঘুনাথ সিং বলেন, 'এই জন্যেই তো সবেরা হতে না হতেই আপনার কাছে দৌড়ে এলাম। চুনাওর ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।'

মিশিরলালজি জিজ্ঞেস করেন, 'কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন—'

রঘুনাথ জানান, দিল্লির লোকসভা বা পাটনার বিধানসভায় যেতে হলে জনগণের ভোট পেয়ে পাশ করতেই হবে। এবারের চুনাওতে তিনি যে নির্বাচনকেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়েছেন তার শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জন ভোটদাতাই বিজুরি তালুকের। মিশিরলালজি দয়া করে যদি একবার আঙুল তোলেন, এই ভোটদাতাদের মতদান পুরোটাই রঘুনাথ সিংয়ের স্বপক্ষে যেতে পারে। একবার বিধানসভায় যেতে পারলে ক্লাস ইন্টারেস্ট দেখার জন্য তিনি সমস্ত রকম চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এখন সবটাই মিশিরলালজির অনুগ্রহ।

মিশিরলালজি বলেন, 'এ তো আপনা ইন্টারেস্ট আপনা জাতওয়ারিকা সওয়াল (এখানে স্বজাত অর্থাৎ নিজের ক্লাসের স্বার্থের প্রশ্ন)। আপনাকে বিধানসভায় পাঠাতে যা করা দরকার সব করব।'

হাত বাড়িয়ে মিশিরলালজির দু হাত জড়িয়ে ধরেন রঘুনাথ সিং। বলেন, 'কী বলে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না। আমি আপনার খরিদী নৌকর হয়ে রইলাম।'

এ সবই যে উৎকৃষ্ট চাটুকারিতা বুঝতে অসুবিধা হয় না মিশিরলালজির। তবে মন্দ লাগে না। মনেপ্রাণে তিনি স্বীকার করেন, রঘুনাথ সিং তাঁর আঁখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। দূরদর্শী হলেও ভূমি সংস্কারের দিকে এতকাল তাঁর নজর পড়ে নি। অথচ পড়া উচিত ছিল। ভূমি সংস্কারের বিপজ্জনক দিকটা সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত ছিল। তিনি বলেন, 'আপনি কেন ধন্যবাদ দেবেন, আমারই ওটা দেওয়া উচিত। ভূমি সমস্কারের কথাটা আপনি মনে করিয়ে না দিলে ওটা আমি ভাবতামই না।'

'তা হলে বিজুরির ভোট নিয়ে আমি কিন্তু কিছু ভাবছি না।'

'বিলকুল না। সব তো ঐরু-গৈরু-নাথু আর ভৈরুর (রামা-শ্যামা-যদু-মধু) দল। যাকে যা বলব বকরার পালের মতো লাইন দিয়ে তাই করে আসবে। একেবারে দুশ্চিন্তা করবেন না।'

এরপর সামান্য দু-একটা কথা বলে বিদায় নেন রঘুনাথ সিং এবং তাঁর তিন পা-চাটা কুকুর।

আরো খানিকক্ষণ বাদে বিজুরি তালুক পেরিয়ে হাইওয়ে ধরে গারুদিয়া তালুকের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে রঘুনাথ সিংয়ের চোখে পড়ে, জষ্ঠি মাসের রোদে ঝলসে যেতে যেতে তাঁর জমিগুলোতে লাঙল ঠেলে চলেছে ধর্মারা। এইসব আনপড় অচ্ছুৎ খরিদী মানুষগুলো জানে না আগামী চুনাওতে তাদের ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ কিভাবে নির্ধারিত হতে চলেছে।

বার

টিরকে সেদিন একজোড়া কোটরার বাচ্চা যোগাড় করে দেওয়ার কথা বলে গিয়েছিল। ধর্মা ভেবেছিল পরের দিনই খেতির কাজে ডুব মেরে জঙ্গলে যাবে। কিন্তু যাওয়া হয় নি। অবশ্য টিরকের কাছ থেকে দিন তিনেক সময় নেওয়া আছে।

দু'দিন পর সে দেখল, এখন জঙ্গলে না গেলেই নয়। হাতে আর একটা দিন মোটে রয়েছে। এক দিনে কোটরার ছানা জোটানো যাবে কিনা সে সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত নয় ধর্মা. তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। সে ঠিক করল, পরের দিন ভোর হলেই মাঠকুড়ানি, জঙ্গলকুড়ানিদের সঙ্গে সে দক্ষিণ

কোয়েলের শুখা খাতের দিকে বেরিয়ে পড়বে।

কিন্তু শেষ দিনেও যাওয়া হল না। তার কারণ, আগের দিন খেতির কাজের পর খামার বাড়িতে হাল-বয়েল জমা দিতে এসে সে শুনল, পরের দিন তাকে রামলছমনের সঙ্গে চার মাইল তফাতে চাহাড়ের হাটে যেতে হবে। ফি বছর চাষ-আবাদের মরশুমে আদিবাসী ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল আর চেরোরা ওখানে কাজের আশায় এসে বসে থাকে। জমিজমার মালিকরা দরকারমতো তাদের ভেতর থেকে বেছে বেছে লোক নিয়ে যায়। পুরো চাষের সময়টা পেটভাতায় তারা জমিতে খাটবে। যাওয়ার সময় মাথাপিছু মজুরি বাবদ কিছু পয়সা আর কিলো কয়েক করে মকাই বা জনার বা গুমো আতপ চাল দেওয়া হবে তাদের। আবার ওরা আসবে সেই ফসল কাটার মরশুমে। দ্বিতীয় দফায় এসে ফসল খামারবাড়িতে তুলে রবিশস্যের কাজ চুকিয়ে ফিরে যাবে। বছরের পর বছর, আবহমান কাল এই নিয়মেই চলছে।

চাহাড়ের হাটে রামলছমনের সঙ্গে ধর্মাকে যে যেতে হবে, তার কারণটা হল এই রামলছমন মুণ্ডা আর ওরাওঁ-টোরাওঁদের ভেতর থেকে খেতমজুর বেছে দিয়ে সাইকেলে চলে আসবে। আর ধর্মা তাদের সঙ্গে করে রাস্তা দেখিয়ে আনবে। ভূমিদাসদের মধ্যে থেকে একেক বছর একেক জনকে রামলছমনের সঙ্গে পাঠানো হয় আদিবাসী মজুর আনতে। এবার ধর্মার পালা।

তুরপুন চালানোর মতো সরু গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হিমগিরিনন্দন বলেছে, 'কাল সবেরা হওয়ার আগে আন্ধেরা থাকতে থাকতে 'পাক্কী'তে (হাইওয়ে) বাস ইস্টান্ডে গিয়ে বড়া পিপর গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকবি। রামলছমন ওখানে গিয়ে তোকে সাথে করে নিয়ে যাবে। কানমে ঘুষল্?' বলেই ভয়সা দুধের বোতল বার করে গলায় ঢেলে দিয়েছে। খাওয়া হলে ধুতির খুঁটে ঠোঁট মুছে একটা পান মুখে পুরে চিবোতে শুরু করেছে।

চাহাড়ে যাওয়া মানে জঙ্গলে যাওয়া হবে না। জঙ্গল থেকে কোটরার বাচ্চা ধরে আনতে না পারলে টিরকের কাছ থেকে বিশটা টাকা পাওয়ার আশা পুরোপুরি চৌপট। কিন্তু হিমগিরির মুখের ওপর 'না' বলে দেওয়ার হিম্মত ধর্মার মতো ভুমিদাসদের সিনায় থাকে না। ঘাড় নুইয়ে সে বলেছে, 'হাঁ হুজৌর—'

হিমগিরি এবার বলেছে, 'চাহাড় থেকে ফিরে আসার পর কাল আর খেতির কাম করতে হবে না তোকে। বাকি রোজ বিলকুল ছুট্টি — সমঝা?'

অর্থাৎ এতটা রাস্তা যাতায়াতের জন্য ধর্মাকে যে ধকল পোয়াতে হবে সেই বাবদে ছুটি না হয় দেওয়া হল কিন্তু তাতে বিশটা টাকা ক্ষতির কতটা পূরণ হবে, সে পুরোপুরি বুঝতে পারে না। তবু মাথা নাড়িয়ে কৃতার্থ ভঙ্গিতে বলেছে, 'হাঁ দেওতা —'

'চাহাড়ের হাটে নাস্তা আর একবেলার খোরাকিও পেয়ে যাবি।'

ফি বছরই দেখা গেছে, চাহাড়ে যারা মুণ্ডা ওরাওঁ জাতীয় মরশুমী কিষাণ আনতে যায় তাদের ওখানকার দোকানে নাস্তা আর দুপুরের কালোয়া খাইয়ে দেওয়া হয়। অস্বীকার করার উপায় নেই এই নাস্তা এবং কালোয়াটা ভালই দেন বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং। রীতিমত একটা ভাতকা ভোজই বলা চলে। শিকার অর্থাৎ মাংস, ডাল, ভাজি, আচার, হরা মিরচি, পেঁয়াজ দিয়ে এরকম উৎকৃষ্ট 'ভোজন' জীবনে ক'দিন করেছে, অচ্ছুৎ ভূমিদাসরা গুনে বলে দিতে পারে।

কালোয়ার লোভও ধর্মাকে তেমন চাঙ্গা করে তুলতে পারে না। বিশ রুপাইয়া যে বহোত বড় ব্যাপার। তবু মুখে চোখে হাসি ফুটিয়ে তাকে বলতে হয়েছে, 'হাঁ হুজৌর —'

পরের দিন ভোর হতে না হতেই এক পেট মাড়ভাত্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ে ধর্মা। আজ খেতে গিয়ে কুশীকে গণেরি বা অন্য কারুর পেছন পেছন দৌড়ে কোদা বাছতে হবে বা বড় বড় শক্ত মাটির ডেলা পিটিয়ে গুঁড়ো করতে হবে।

হাইওয়ের বাসস্ট্যান্ডে প্রকাণ্ড পিপর গাছের তলায় ধর্মা যখন এসে পৌঁছয় তখনও আকাশে অগুনতি তারা ফুটে আছে। এখানে গোটা তিনেক যে দোকান রয়েছে তার মধ্যে চায়ের দোকানটা ছাড়া আর কোনোটাই খোলে নি। 'পাক্কী'তে এখন গাড়িঘোড়ার ভিড় নেই। ফাঁকা রাস্তায় অন্ধকারে কচিৎ এক-আধটা দূর পাল্লার বাস চোখে পড়ে।

এখনও রাত ঝিম ঝিম করছে। পিপর গাছের মাথায় বাদুড়েরা ডানা ঝাপটায়। কামার পাখিরা (এক ধরনের পেঁচা) থেকে থেকে অদ্ভুত আওয়াজ করে ডাকতে থাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি উড়ছে রাস্তায়, ঝোপেঝাড়ে এবং ওধারের আদিগন্ত শস্যক্ষেত্রে। আর আছে লাখ বেলাখ মশা। ধর্মার চামড়ায় অনবরত সুই (ছুঁচ) ফোটাতে থাকে তারা।

যতক্ষণ না রামলছমন আসছে, এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে মশার কামড় খেতে হবে ধর্মাকে। অবশ্য ওপাশের চায়ের দোকানটা এর মধ্যে খুলে গেছে। ওটার সামনে চেরা বাঁশের বেঞ্চিটা এখন বিলকুল ফাঁকা, খদ্দের-টদ্দের একজনও নেই। সকালে রোদ উঠলে চারদিক যখন আলো হয়ে যাবে সেই সময় এই 'চায়কা দুকান' গাহেকে ভরে উঠবে। তখন থেকে অনেক রাত পর্যন্ত ওখানে ভনভনে মাছির মতো ভিড় জমে থাকবে।

বাঁশের ফাঁকা বেঞ্চিটায় বসলে কারুর কোনো ক্ষতি হওয়ার কারণ নেই কিন্তু ধর্মার পক্ষে ওখানে বসা সম্ভব নয়। কেননা সে জল-অচল অচ্ছুৎ ভূমিদাস আর দোকানটা হল উচ্চবর্ণ এক কায়াথের। সে ওখানে বসলে মেরে হাড় ঢিলে করে দেবে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ একসময় পাটনার দিক থেকে দূর পাল্লার একটা বাস এসে পিপর গাছের তলায় দাঁড়িয়েই আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগায়।

বাস থেকে একটা লোকই নেমেছে। প্রথমটা অন্ধকারে খেয়াল করে নি ধর্মা। কখন রামলছমন আসবে সে জন্য সে প্রায় দম আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটা তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। বলে, 'কৌন — ধম্মা?'

ধর্মা চমকে তার দিকে তাকায় কিন্তু তৎক্ষণাৎ চিনতে পারে না। শেষ রাতে পাটনার দিক থেকে আসা বাসটা থেকে কেউ নেমে তার নাম ধরে ডাকবে, একটু আগেও ভাবতে পারে নি সে। তার ধ্যানজ্ঞান জুড়ে এখন রামলছমন ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। তাই চমকটা থিতিয়ে যেতে খানিকটা সময় লাগে।

অবাক চোখে তবু তাকিয়েই থাকে ধর্মা। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'আপ — আপ —'

লোকটা আরো কাছে এসে ধর্মার কাঁধে হাত রাখে। বলে, 'নায় পয়চানা হামনিকো? আমাকে চিনতে পারছিস না নালায়েক?'

'নায় —' আস্তে মাথা নাড়ে ধর্মা।

'হামনি গণা —'

বিস্ময়টা আচমকা কয়েক গুণ বেড়ে যায় ধর্মার। এই কি বুড়ি সৌখীর বেটোয়া, তার আজন্মের চেনা গণেশ বা গণা? এর পরনে এখন বিলাইতি ফুর পান্ট (ফুল প্যান্ট), বিলাইতি কুর্তা, পায়ে জুতিয়া, হাতে ঘড়ি, গলায় রঙ বেরঙের রেশমি রুমাল বাঁধা, মাথার চুল কাকাই দিয়ে বাহার করে আঁচড়ানো। এক হাতে চামড়ার দামি বাক্স (স্যুটকেশ)। দেখেও বিশ্বাস হয় না মূল্যবান পোশাক-পরা এই চমকদার ছোকরাটাই গণা। পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত বদলে গেছে সে। অথচ বছরখানেক আগেও এই গণা তাদের সঙ্গে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে মাটি চষত, ফসল রুইত, ধান-গেঁহু-তিল-তিসি পাকলে কাটতে যেত। সারা দিন মাঠে মাঠে ঘুরে তার রুখা কর্কশ চামড়া থেকে খই উড়তে থাকত, খরায় পুড়ে বারিষে ভিজে, শীতে কুঁকড়ে হাত-পা ফেটে যেত, সারা শরীরে ছিল ভুখ আর কষ্টের ছাপ।

এক বছর আগে যেদিন গণা দোসাদটোলা থেকে ভেগে যায় সেদিন থেকেই মনে মনে একই সঙ্গে তাকে শ্রদ্ধা এবং ঈর্ষা করে আসছে ধর্মা। অচ্ছুৎ ভূমিদাসের ঘৃণ্য জীবন থেকে নিজের হাতে মুক্তি জুটিয়ে নেওয়ার জন্য শ্রদ্ধা, আর ধর্মা নিজে তা না পেরে পরাধীন ক্রীতদাসের মতো দিন কাটাচ্ছে বলে ঈর্ষা।

এই মুহূর্তে অন্ধকারে স্বাধীন মানুষটাকে বড় মহিমান্বিত মনে হয় ধর্মার। কোনো দিন যে গণা তার সঙ্গে মাঠে নেমে হাল-বয়েল চালাত, রঘুনাথ সিংয়ের খামারবাড়িতে ফসল কেটে নিয়ে যেত—সে সব যেন কোনো মিথ্যে স্বপ্নের মতো। নিজের মাথাটা আপনা থেকেই যেন গণার পায়ের দিকে নুয়ে

পরাস কড়াইয়ার তলায় রোদ এবং ছায়া মেশানো জায়গাটায় অনেকগুলো মুণ্ডা ওরাওঁ চেরো আর সাঁওতাল মেয়েপুরুষ তাদের কাচ্চাবাচ্চা সমেত বসে আছে।

ফি বছর চাষবাসের সময় আদিবাসীরা এভাবে চাহাড়ের হাটের একধারে এই সব গাছের তলায় গা জড়াজড়ি করে বসে থাকে। চারপাশ থেকে জমির মালিক বা তাদের লোকজনরা এসে এখান থেকে খেতমজুর বাছাবাছি করে নিয়ে যায়।

এতকাল হিমগিরিনন্দন স্বয়ং খেতমজুর নেবার জন্য চাহাড়ের হাটে আসত। ইদানীং বছর দুই তিন রামলছমন আসছে। তবে ধর্মা এই প্রথম এল।

পাঁচ মাইল পাক্কীতে সাইকেল চালিয়ে আসার দরুন জিভ বেরিয়ে গিয়েছিল রামলছমনের। সাইকেলটা একটা চিলাম গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে ওরাওঁ মুণ্ডাদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে সে বসে এবং বাছরির (বাছুরের) মতো জিভ বা'র করে হাঁপাতে থাকে। ধর্মাও একটা কড়াইয়া গাছের তলায় বসে হাঁপায়।

খানিকটা ধাতস্থ হওয়ার পর উঠে দাঁড়ায় রামলছমন। বলে, 'আমি আগে চায়-পানি খেয়ে আসি। বহোত ভুখ ভি লাগ গিয়া। আমি এলে তুই খেতে যাবি। ততক্ষণ সাইকেলের ওপর নজর রাখ। আর ওরাওঁ মুণ্ডাগুলোর ভেতর কাকে কাকে খেতির কামে নিবি দেখে রাখ। দুব্‌লা কমজোর আদমী চলবে না। সমঝা?'

ধর্মা ঘাড় কাত করে, 'হাঁ।'

রামলছমন এগিয়ে গিয়ে হাটের থিকথিকে ভিড়ে মিশে যায়।

কড়াইয়া গাছের ছায়ায় বসে বসে এক অচ্ছুৎ ভূমিদাস একদল ভূমিহীন আদিবাসী খেতমজুরের দিকে তাকায়। জষ্ঠি মাসের বেলা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এ সময় চড়তি সূরযের ভয়ানক তেজ।

ধর্মা লক্ষ করল, এখনও অন্য খেতমালিক বা তাদের লোকজনেরা আদিবাসী কিষান নিতে আসে নি। তবে দুটো লোক ওরাওঁ-মুণ্ডাদের গা ঘেঁষে ওধারের পরাস গাছটার তলায় বসে আছে। লোক দুটো পাহাড় জঙ্গলের আদিবাসী না। মনে হয় টৌনের (শহরের) লোক। পরনে ফুর পান্ট (ফুল প্যান্ট), ভাল কামিজ, পায়ে জুতো। তারা হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাচ্ছিল, 'লোকের জমিনে কাজ করে ক'টা পাইসা আর পাবি! এক দো মাহিনা বাদ তো ভাগিয়েই দেবে। আমাদের সাথ চল। রোজ এক এক আদমী পাঁচ সাত রুপাইয়া মজুরি পাবি, খোরাকি পাবি, চার মাহিনা বাদ বাদ নয়া কাপড়া মিলবে, কামিজ ভি। আওরতরা শাড়ি পাবি, চোলিয়া পাবি —' একটু থেমে ফের শুরু করে, 'এক-দো মাহিনার পর কেউ তোদের ভাগাবে না। সালভর (সারা বছর) কামাই করতে পারবি। পেটের জন্যে, কাপড়ের জন্যে কোনো চিন্তা থাকবে না। বিলকুল গিরান্টি।'

বছরভর যাদের পায়ে পায়ে দুর্ভিক্ষ ঘুরতে থাকে, সারা গা ঢাকার মতো যথেষ্ট আচ্ছাদন যাদের নেই তেমন একদল সরল নিষ্পাপ ক্ষুধার্ত আদিবাসী মেয়েপুরুষের চোখ লোভে চকচক করতে থাকে। কানে শোনার পরও তাদের বোধহয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। একজন মধ্যবয়সী মুণ্ডা বলে ওঠে, 'ঝুটফুস।'

লোকদুটো প্রাণপণে হাত নেড়ে বলতে থাকে, 'নায় নায়, বিলকুল সচ। তোদের জাতের বহোত আদমী পাইসা কামাতে আমাদের সাথ গেছে।'

'হাঁ, শুনা। রোজ পাঁচ সাত রুপাইয়া মিলেগা?'

'জরুর।'

'নয়া কাপড়া ভি?'

'হাঁ।'

'কোথায় যেতে হবে তোদের সাথ?'

'আসাম, আগরতলা---'

'বহোত দূর?'

'নায় নায়, নজদিগ। হাজারিবাগসে থোড়া দূর —'

এ অঞ্চলের লোক হাজারিবাগের নামটা জানে। মধ্যবয়সী মুণ্ডা কিছুক্ষণ কী চিন্তা করে। তারপর বলে, 'টিরেনের ডিব্বায় চড়ে যেতে হয়?'

লোকদুটো মাথা নাড়ে, 'হাঁ। তা হলে আর বসে থেকে কী হবে। আমাদের সাথ চল। নে নে, উঠে পড়। দুকানে গিয়ে চায়-পানি, নিমকিন, বুন্দিয়া (বোঁদে), সমোসা খাইয়ে দিচ্ছি। টিসনে গিয়ে ভাতকা ভোজ লাগিয়ে দেব। ওঠ ওঠ —'

দূরে বসে ওদের কথা শুনছিল ধর্মা। আগেই তাকে কে যেন বলেছে, খুব সম্ভব মাস্টাবজিই হবেন— আড়কাঠিরা মুণ্ডা ওরাওঁ আর সাঁওতালদের দূর দেশে নিয়ে যায়।

কিন্তু ভাল ভাল দামি খাবার এবং নিশ্চিন্ত ভবিষ্যতের প্রলোভন সত্ত্বেও উঠে পড়ে না আদিবাসীরা। প্রবীণ মুণ্ডা নিজেদের ভাষায় স্বজাতের লোকজনের সঙ্গে কী সব পরামর্শ করে। সাঁওতাল এবং ওরাওঁদের মধ্যে যারা বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ তারাও উঠে এসে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকে। বোঝা যায়, অজানা জায়গায় যাবে কিনা সে জন্য তারা মনস্থির করতে পারছে না। কিন্তু টাকাপয়সা আর দু'বেলা ভরপেট খাওয়ার ব্যাপারটা রয়েছে। সেটা এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আড়কাঠি দুটো তাড়া লাগাতে থাকে, 'কী হল রে, জলদি উঠে পড়। ধুপ (রোদ) চড়ে যাচ্ছে —' তাদের ব্যস্ততার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমত, খেতমালিকের লোকেরা এসে গেলে আদিবাসীদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ হবে না। ভাল হোক, মন্দ হোক, পুরুষানুক্রমে জমির মালিকদের তারা চেনে। তাদের কাছ থেকে কতটুকু কী পেতে পারে সে সম্বন্ধে আদিবাসীদের স্পষ্ট ধারণা আছে। হাজার লোভ দেখানো সত্ত্বেও দূরে অজানা জায়গায় যেতে এরা ভয় পায়।

আড়কাঠিদের তাড়াতেও লোকগুলো ওঠে না। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ চালাতেই থাকে।

এইসময় রামলছমন চা এবং নাস্তা খেয়ে ফিরে আসে। এসেই শুধোয়, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। আদমী পসন্দ করে রেখেছিস?'

আদিবাসী এবং আড়কাঠিদের কথা শুনতে শুনতে এ ব্যাপারটা পুরোপুরি মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ধর্মার। সে বেজায় ভয় পেয়ে যায় এবং বুকের ভেতর দম আটকে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'কসুর হো গিয়া দেওতা। আভি পসন্দ্ কর লেতা —'

প্রচুর সুখাদ্যের তলায় চনচনে খিদেটা চাপা পড়ার দরুনই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, রাগ যতটা চড়া উচিত ঠিক ততটা চড়ে না রামলছমনের। সে বলে, 'ভইস কাঁহিকা! তুহারকা ফাইন হো গিয়া — নাস্তা বন্ধ্। এক দফে দুপহরমে কালোয়া মিলেগা—'

সকালে ভাল নাস্তার আশা ছিল। সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভয়নাক মন খারাপ হয়ে যায় ধর্মার। পাল্কী ধরে পাঁচ মাইল দৌড়ে আসার জন্য খিদেটাও পেয়েছে মারাত্মক। কিন্তু কিছু করার নেই আর। দুপুর পর্যন্ত পেটে ভুখ নিয়ে তাকে থাকতে হবে।

বিষণ্ণ মুখে ধর্মা আদিবাসীদের দিকে এগিয়ে যায়। রামলছমনও হাত দশেক দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু পিছু এগুতে থাকে।

রামলছমন আর সে যে খেতমালিকের লোক তা বোধহয় আগে টের পায় নি আড়কাঠি দুটো। এখন পেয়েছে। তারা ভীষণ ব্যস্তভাবে উঠে পড়ে এবং খানিকটা দূরে অন্য একটা চিলাম গাছের তলায় গিয়ে বসে।

এই সব আড়কাঠিরা খেতমালিকদের ভয় পায়। তার কারণ অস্থায়ী কিষাণ ছাড়া মালিকদের চাষ আবাদের খুবই অসুবিধা। অথচ বেশ কিছুকাল ধরে এই মরশুমী কিষানদের ফসলে সুদূর আসাম বা ত্রিপুরার চা-বাগান কিংবা ইটখোলায় কাজে নিয়ে যাচ্ছে আড়কাঠিরা। ফলে জমিমালিকের লোকেরা এদের ওপর ক্ষিপ্ত। ক' বছর বেশ কয়েকজন আড়কাঠি মালিকদের লোকের হাতে বেদম মার খেয়েছে। স্বার্থে চোট লাগলে যা হয় আর কি।

দূর থেকেই রামলছমন আদিবাসীদের শুধোয়, 'কি রে, গারুদিয়ায় গিয়ে খেতের কাজ করবি তো?' এটা বলার জন্যই বলা। সে জানে খেতের কাজ না করে ওদের গতি নেই।

রামলছমনকে ওরাওঁ মুণ্ডাদের অনেকেই চেনে। কেননা ক' বছর ধরে সে মরশুমী কিষান নিতে

আসছে। আড়কাঠিদের কথা ভুলে গিয়ে এই মুহূর্তে ওরা বলে, 'হাঁ। সেই জন্যেই তো বসে আছি হুজৌর।'

কী করে খেতমজুর বেছে নিতে হয় সে সম্বন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও তাদের দোসাদটোলার আধবুড়ো গণেরি এবং মাধোলালের কাছে এ ব্যাপারে অনেক শুনেছে ধর্মা। আদিবাসীদের কাছে এসে একটা ওরাওঁকে সে বলে, 'ওঠ —'

ওরাওঁটা উঠে দাঁড়ায়। ধর্মা তার আগাপাশতলা এক নজর দেখে নিয়ে বলে, 'যা, ওধারে গিয়ে দাঁড়া —' লোকটাকে তার পছন্দ হয়েছে।

ওরাওঁটা ডান দিকে পা বাড়িয়েছিল, রামলছমন পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে উল্লু, একবার আঁখে দেখেই পসন্দ্ করে ফেললি? চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। ভাল করে টিপে টিপে হাত দ্যাখ, পা দ্যাখ, পিঠ দ্যাখ, সিনা দ্যাখ — অ্যায়সা অ্যায়সা কিষান পসন্দ্ করা যায়!'

অগত্যা রামলছমনের হুকুম অনুযায়ী লোকটার গা টিপে দেখতে হয়।

রামলছমন ফের বলে, 'কী মালুম হল, জানবরটার গায়ে তাকত আছে?'

ধর্মার একটা কথায় ওরাওঁটা নাকচ হয়ে যেতে পারে, আবার মাসখানেক মাস দেড়েকের জন্য দু'বেলা তার পেটের চিন্তা ঘুচতেও পারে। যখন তার শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের পরীক্ষা চলছে সেইসময় করুণ চোখে সে ধর্মার দিকে তাকায়। মুখে কিছু না বললেও, চাউনি দেখে টের পাওয়া যায় — ধর্মা যেন তাকে বাতিল করে না দেয়।

ধর্মা বলে, 'আছে হুজৌর।'

ধর্মার কথায় ভরসা করলেও রামলছমনও ওরাওঁটাকে শুধোয়, 'দু'বেলা পটনাই বয়েলের লাঙল টানতে পারবি তো?'

'পারব হুজৌর।'

'ঠিক হ্যায়। ওধারে গিয়ে গাছের নিচে বসে থাক।' বলে ধর্মার দিকে তাকায়, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। এবার দুসরা আদমী —'

পুরুষদের বেলায় হাত-পা টিপে পরখ করে নিলেও মেয়েদের গায়ে হাত দেয় না ধর্মা। কিন্তু বামলছমনের একান্ত ইচ্ছা পুরুষদের মতো মেয়েদেরও যাচিয়ে বাজিয়ে নেওয়া হোক। সে জন্য ধর্মাকে ধমক ধামকও দিতে থাকে, 'গায়ে হাত দিলে কি ফোস্কা পড়ে যাবে! রাজা মহারাজার ঘরবালী সব! চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। লাগা হাত কুত্তীদের গায়ে।' পারলে কাপড় খুলিয়ে শারীরিক শক্তি যাচাই করিয়ে নেয় সে।

ধর্মা কুঁকড়ে যেতে থাকে। ভয়ানক কাঁচুমাচু মুখে সে বলে, 'নায়, নায় দেওতা। ও আওরত হ্যায়—'

প্রচুর চেঁচামেচি করেও কোনো মেয়ের গায়ে ধর্মাকে হাত দেওয়াতে পারে না রামলছমন। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ব্যাপারটা তাকে মেনে নিতে হয়।

কিষান বাছতে বাছতে বকরি কি গো-হাটের কথা মনে পড়ে যায় ধর্মার। যেভাবে মানুষ টিপেটুপে বকরি বা ছাগরি বা গাই-বয়েলের শাঁস দেখে নেয় সেইভাবে এই মনুষ্যসন্তানদের বেছে নিতে হচ্ছে। বড় খারাপ লাগে তার।

বাছাবাছি করে মেয়েপুরুষ মিলিয়ে মোট চল্লিশ জনকে একধারে জড়ো করল ধর্মা আর রামলছমন। এ ছাড়া বার চোদ্দটা বাচ্চাও রয়েছে মেয়েগুলোর সঙ্গে। বাচ্চাগুলো গুনতির মধ্যে নয়, ওরা পুরোপুরি হিসেবের বাইরে। বাপ-মা গতর খাটিয়ে মজুরি আর খোরাকি পাবে কিন্তু বাচ্চাদের জন্য কিছুই মিলবে না। যাদের বাচ্চা, খাওয়াবার দায় তাদেরই। এই নিয়মই বছরের পর বছর চলে আসছে। তবু রামলছমন কথাটা আরেক বার মনে করিয়ে দেয়, 'তোদের আণ্ডাবাচ্চার জন্যে কিন্তু কিছু পাবি না।'

আদিবাসীরা মাথা নাড়ে, 'জানতা হ্যায় হুজৌব—'

'পরে আবার ঝামেলা বাধাস না।'

'নায় নায়।'

এবার শিশুগুলোকে বাদ দিয়ে অন্যদের মাথা গুনে গুনে প্রত্যেককে একটি করে টাকা দেয় রামলছমন। বলে, 'এক রুপাইয়া 'ইডভাঙ্গ' দিলাম। যা, খেয়ে আয়। খাওয়া হলে এখানে লৌটবি। সমঝা?'

'হাঁ হুজৌর —' একটা করে টাকা হাতে পেয়ে আদিবাসী মানুষগুলো ভীষণ খুশি। তারা ছাতু বা মকাই টকাই কেনবার জন্য দোকানের খোঁজে চলে যায়।

এই সময় চাহাড়ের হাটের আরেক দিক থেকে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে আসে।

'সুখন রবিদাসকো —'

'বোট দো, বোট দো —'

'সুখন রবিদাসকো —'

'বোট দো, বোট দো —'

চেঁচাতে চেঁচাতে লোকগুলো এদিকে চলে আসে। সব মিলিয়ে তিরিশ চল্লিশ জন। তাদের মাঝখানে সাতাশ আটাশ বছরের, মাঝারি মাপের, পেটানো চেহারার হাসিমুখ সুখন রবিদাসকে দেখা যায়। পরনে মোটা সুতোর খাটো ধুতি আর মোটা কাপড়ের কামিজ, পায়ে সস্তা খেলো স্যান্ডেল। সর্বক্ষণ তার মুখে হাসি লেগেই থাকে।

গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকের বাইরেও অনেক দূর পর্যন্ত চামারদের এই ছেলেটাকে বহু লোক চেনে এবং খাতির টাতিরও করে। সুখন 'পড়িলিখী' আদমী, পাটনায় গিয়ে কয়েক সাল 'কালেজে' পড়েছে। তা ছাড়া বহোত তেজীও। বামহন, কায়াথ, ভকিল, ডাগদর, সরকারি অফসর — সবার মুখের ওপর ঠাঁই ঠাঁই কথা বলতে পারে। আংরেজি বলে জলের মতো। উঁচু জাতের লোকেদের সঙ্গে নানা ব্যাপারে তর্কাতর্কি করার জন্য অনেক বার মারধরও খেয়েছে। একবার এমন মার খেয়েছিল যে পুরা দু দিন বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল।

সুখনকে অনেক কাল ধরেই চেনে ধর্মা। ওদের বাড়িও গারুদিয়া মৌজায— চামারটোলায়। চামারটোলাটা যদুবংশীছত্রীদের অর্থাৎ গোয়ালাদের গাঁ চৌকাদের পশ্চিম ধারে। যাই হোক, অচ্ছুৎ হয়েও সুখন বামহন কায়াথদের পরোয়া করে না। এই সব নানা কারণে তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে ধর্মা। জল-অচল অচ্ছুৎ হলেও একটা আদমীর মতো আদমী বটে সুখন রবিদাস, বহোত তেজী আদমী। বহোত উঁচা শির।

রামলছমনও সুখনের ভোটের দলটাকে লক্ষ করছিল। ক্রমশ তার ভুরু দুটো কুঁচকে যাচ্ছে আর মুখে তাচ্ছিল্য বিরক্তি আর প্রচণ্ড রাগ ফুটে উঠছে। সে বলে, 'আচ্ছা, অচ্ছুৎ চুহার বাচ্চাটা তা হলে চুনাওতে নেমেছে! বোট মাঙতে বেরিয়েছে! হাঁথীর সাথ চুহা লড়তে এসেছে! এক লাথ খেয়ে যে চ্যাপটা হয়ে যাবি হারামজাদের ছৌয়া (ছেলে)।' এখানে যাঁর সম্বন্ধে হাতির উপমা দেওয়া হল তিনি রঘুনাথ সিং।

রামলছমনের কথাগুলো পুরোপুরি কানে ঢোকে না ধর্মার। দু চোখে শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় নিয়ে সুখনের দিকে তাকিয়েই থাকে। যতদূর মনে আছে, সুখন রবিদাস এই প্রথম চুনাওতে নামল। অন্যমনস্কের মতো রামলছমনকে সে শুধোয়, 'সুখন রবিদাস কি বড়ে সরকারের সাথ চুনাওতে লড়বে?'

রামলছমন বড় বড় গজালের মতো কালচে দাঁত বার করে খিঁচিয়ে ওঠে, 'হাঁ রে উল্লু, হাঁ। চুহাকা বাচ্চাটার পাখনা গজিয়েছে। মরেগা, জরুর ফৌত হো যায়েগা। কাঁহা বড়ে সরকার, কাঁহা ও চামারকে ছৌয়া।'

সুখন রবিদাস তার চুনাওর দল নিয়ে ধর্মাদের সামনে দিয়ে উত্তর দিকে থিকথিকে ভিড়ের ভেতর মিশে যায়। সেদিকে তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে তাকিয়ে থাকে রামলছমন।

বেলা আরো বেড়ে গেছে। চড়তি সূরয আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। ধর্মা হঠাৎ টের পায় সেই গনগনে খিদেটা পেটের ভেতরটা যেন জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

রামলছমন সুখনদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ধর্মাকে বলে, 'ওরাওঁ মুণ্ডাগুলো ফিরে এলে আর

দেরি করব না, গারুদিয়ায় ফিরে যাব।'

খিদের কথাটা 'বলব না বলব না' করেও শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলে ধর্মা, 'হুজৌর দেওতা, বহোত ভুখ লাগা।'

রামলছমন চেঁচিয়ে উঠে, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া! হারামজাদ তুহারকো আভি 'ফাইন' কর দিয়া—নাস্তা বন্ধ! ভুল গিয়া?' বলতে বলতেই তার মনে পড়ে যায়, ক' দিন আগে বড়ে সরকার নিজের হাতে অচ্ছুৎ দোসাদদের ভৈসা ঘিয়ে তৈরি দামি লাড্ডুয়া বেঁটে দিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই চুনাও। এখন ছোট-বড় চামার-দোসাদ-গঞ্জু-ধোবি তাতমা-ধাঙড়, কাউকেই চটানো ঠিক নয়। চুনাওর দিক থেকে এরা কেউ মানুষ না, একটা করে ভোট। দেশে বামুন কায়াথ আর কত? এইসব গরিব জল-অচল মানুষই তো গুনতিতে বেশি। এরা সবাই খেপে গেলে মতদান রঘুনাথ সিংয়ের বিরুদ্ধে চলে যাবে। সাধে কি আর বড়ে সরকার ভুখা, আধা-নাঙ্গা, জানবর য্যায়সা অচ্ছুৎগুলোকে আর তাবত গারুদিয়া তালুকের দেহাতী মানুষগুলোকে মিঠাইয়া বিলোন! মাথাটা ভীষণ সাফ তাঁর।

সরকার এই এক 'মিশিন' বার করেছে — চুনাওকা মিশিন। ভোট হল এই মিশিনের তেল। বেশি লোকের ভোট যে পাবে মিশিন তার পক্ষেই চালু থাকবে। তাই জলচল হোক, চল-অচল হোক, লিখীপড়া হোক আর আনপড়ই হোক — চুনাওতে জেতার জন্য সবাইকেই খাতির করতে হয়, তোয়াজ করতে হয়। চুনাওর মরশুম পার হলে মাথার ওপর থেকে নামিয়ে এদের উপযুক্ত জায়গায় ঝেড়ে ফেলা হবে। অর্থাৎ বড়ে সরকারের নাগরার তলায় তখন আবার এরা ফিরে যাবে।

এসব কথা এই মুহূর্তে রামলছমনের মনে পড়বার কথা ছিল না। সুখন রবিদাসের ভোটের দলটাকে দেখে হঠাৎ খেয়াল হয়। যার ভোট আছে, এমন কোনো লোককেই এখন চটানো ঠিক নয়। সে তাড়াতাড়ি ফের বলে ওঠে, 'ফাইন মাপ কর দিয়া। এই নে, এক রুপাইয়া নাস্তার জন্যে, দো রুপাইয়া কালোয়ার জন্যে। তুরন্ত খেয়ে আয়।'

নগদ তিনটে টাকা পাওয়া আর আকাশের তিনটে তারা হাতে পাওয়া ধর্মার কাছে একই ব্যাপার। খুশি এবং উত্তেজনায় তার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড লাফাতে থাকে। আর সেই অবস্থাতেই হাটের দিকে দৌড়য় ধর্মা। কিছুক্ষণ পর পুরাপাক্কা দু'টাকা খরচা করে রহেড় ডাল, বেইগন আর বদির তরকারি, শিকার এবং পুদিনার আচার দিয়ে ভাতকা ভোজ খেয়ে পরাস আর কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ফিরে আসে। নাস্তার একটা টাকা তার হাতেই থেকে যায়। এটাই তার মস্ত লাভ। এই টাকাটা খরচ না করে সে জমিয়ে রাখবে ভবিষ্যতের জন্য।

এদিকে ওরাওঁ এবং মুণ্ডারাও খেয়েদেয়ে ফিরে এসেছে। রামলছমন আর দেরি করতে চাইল না। তাড়া দিয়ে বলে, 'পেট ঠাণ্ডা করেছিস। এবার চল সব —'

ওরাওঁরা তৎক্ষণাৎ রাজি, 'হাঁ হাঁ —'

ধর্মারা যে চল্লিশ জনকে বেছে নিয়েছে তারা ছাড়াও পরাস গাছগুলোর তলায় আরো অনেক আদিবাসী বসে ছিল। চারপাশের অন্য খেতমালিক বা তাদের লোকজনেরা ওই সব ঝড়তিপড়তি ওরাওঁ মুণ্ডাদের ঝাড়াই বাছাই করে নিচ্ছে। ধর্মা যখন খেতে গিয়েছিল সেই ফাঁকে অন্য খেতমালিকেরা এসে এখানে হানা দিয়েছে।

আদিবাসীদের সঙ্গে করে এক সময় ধর্মারা রওনা হয়ে যায়। তার আগেই মেয়েরা তাদের বাচ্চাগুলোকে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে। আগে আগে লঝঝড় সাইকেলে ঝক্কর ঝাঁই ঝক্কর ঝাঁই আওয়াজ তুলতে তুলতে পাক্কী ধরে গারুদিয়ার দিকে এগুতে থাকে রামলছমন। পেছনে বাকি সবাই।

চড়তি সুরয খাড়া মাথার ওপরে উঠে এসে এখন গনগনে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই জষ্ঠি মাসের দুপুরে রোদের তাপ মারাত্মক হলেও হাওয়া দিচ্ছে প্রচুর। উলটোপালটা সতেজ হাওয়া উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে আড়াআড়ি ছুটে চলেছে।

মাতব্বর গোছের সেই আধবুড়ো মুণ্ডাটার পাশাপাশি হাঁটছিল ধর্মা। খানিকক্ষণ আগে আড়কাঠি দুটো কড়াইয়া গাছের তলায় এরই গা ঘেঁষে বসে আসাম বা ত্রিপুরা কোথায় যেন নিয়ে যাবার জন্য অনবরত ফুসলে যাচ্ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে মাঝবয়সী মুণ্ডার সঙ্গে নানারকম গল্প হতে থাকে। কথায় কথায় ধর্মা জানতে পারে, ওদের গাঁও এখান থেকে কম করে পনের বিশ ক্রোশ উত্তরে। সালভরই তাদের বড় কষ্ট। বিশেষ করে এই শুখা গরমের সময়টা।

রোদে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। এক দানা খাদ্য কোথাও নেই, দশ হাত বালি খুঁড়লে তবে হয়ত এক লোটা খাবার জল মেলে।

মুণ্ডাটা আরো যা বলে যায় তা এইরকম। এখন চাষের মরসুম বলে তাদের মতো কিছু শক্তসমর্থ তাকতওলা মানুষকে জমির মালিকেরা কাজের জন্য ডাকে। বাদবাকিদের যে কী হাল, ভাবা যায় না। কাজ নেই, খাদ্য নেই, পাইসা নেই। একমাত্র ভরসা হল মহুয়ার ফল আর সুথনি। টৌনের লোকেরা এসে মাঝে তাদের অনেককে কাজের আর ভরপেট খাওয়ার লোভ দেখিয়ে বহু দূরের কোনো অজানা দেশে নিয়ে যায়।

ধর্মার মতো ভূমিদাসদের সঙ্গে এই ভূমিহীন আদিবাসী খেতমজুরদের তফাৎ সামান্যই। জীবনযাত্রা প্রায় একই ধাঁচের। তফাতের মধ্যে এরা মোটামুটি স্বাধীন আর ধর্মারা বাপ-নানার করজের শেকলে পুরুষানুক্রমে বাঁধা হয়ে আছে। তবু খানিকটা কৌতূহল দেখায় ধর্মা। জিজ্ঞেস করে, 'টৌনের লোকেরা তোদের জাতের আদমীদের কোথায় নিয়ে যায়?'

মুণ্ডাটা হাত নেড়ে বলে, 'মালুম নেহী।'

'যারা বাইরে যায়, ফিরে এসে কী বলে? খেতে পায়? পাইসা পায়?'

'মালুম নেহী।'

'কায়?'

'যারা বাইরে গেছে তাদের কেউ এখনও ফেরে নি। পিছা সাল গাঁও ধামুদা থেকে শ আদমী গেল। তার আগের সাল গোলগোলি, পাট্টন, চৌহট — এই সব গাঁও থেকে গেল দেড় শ আদমী। কোই নেহী লৌটা।'

'বেঁচে আছে তো?

'মালুম নেহী—'

এরপর চুপচাপ। পাশ দিয়ে দূর পাল্লার বাস গরম বাতাস চিরে খ্যাপা জানবরের মতো অনবরত ছুটে যায়, সাইকেল-রিক্‌শা যায়, ভৈসা আর গৈয়া গাড়ি যায়। আর এক ভূমিদাস মুক্ত আকাশের তলা দিয়ে একদল ভূমিহীন মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

রামলছমন ধর্মার কাঁধে মরশুমী খেতমজুরদের দায়িত্ব চাপিয়ে জোরে জোরে সাইকেল চালিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন আর তাকে দেখা যায় না।

মাইলখানেক যাওয়ার পর চাহাঢ় হাটের সেই আড়কাঠি দুটো দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে তাদের ধরে ফেলে। খুব সম্ভব তারা পেছন পেছন আসছিল। রামলছমনকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে এখন এগিয়ে এসেছে। খেতমালিকের লোক রামলছমন তাদের দেখলে গোলমাল বাধিয়ে দেবে। তাই এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে সুযোগ বুঝে এগিয়ে আসা।

ধর্মা যে মধ্যবয়সী মুণ্ডাটার সঙ্গে কথা বলছিল, তার গা ঘেঁষে চলতে চলতে আড়কাঠিদের একজন জিজ্ঞেস করে, 'তোরা কোথায় যাচ্ছিস?'

মুণ্ডাটা জানায়, 'গারুদিয়া তালুকে।'

'কার জমি চষতে যাচ্ছিস?'

'মালুম নেহী। ইসকো পুছো —' বলে মধ্যবয়সী মুণ্ডা ধর্মাকে দেখিয়ে দেয়।

আড়কাঠিরা চাহাঢ় হাটের একধারে খানিকক্ষণ আগে কড়াইয়া গাছের তলায় ধর্মাকে দেখেছে। খেতমালিকের লোকের সঙ্গে এলেও চেহারা এবং জামাকাপড়ের হাল দেখে তারা টের পেয়ে গেছে, ধর্মা তুচ্ছ কিষান বা ওই জাতীয় কিছু। তাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তারা জানতে চায়, গারুদিয়ার কার জমিনে আদিবাসীদের লাগানো হবে?

ধর্মা বলে, 'বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের।'

আড়কাঠিরা আর দাঁড়ায় না, নতুন কোনো প্রশ্নও করে না। ঘুরে চাহাড়ের হাটের দিকে ফিরে যেতে থাকে।

সামান্য এই খবরটার জন্য জেঠ মাহিনার এই ঝলসানো রোদে এতটা রাস্তা কেন যে ওরা দৌড়ে এসে আবার ফিরে যাচ্ছে, জানবার ইচ্ছা হয় ধর্মার। সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত আর কথাটা জিজ্ঞেস করা হয় না।

রাস্তায় মাঝে মাঝে জিরিয়ে শেষ পর্যন্ত গারুদিয়ায় রঘুনাথ সিংয়ের খামার বাড়িতে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে যায়। এর মধ্যে গণেরি মাধোলাল কুশীরা হাল-বয়েল জমা দিয়ে দোসাদটোলায় ফিরে গেছে।

তের

আদিবাসী মরশুমী খেতমজুরদের যেদিন আনা হয় সেদিন হিমগিরিনন্দন তার 'কানটোল রুমে' বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করে। কেননা প্রথম দিন তাদের খোরাকির ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু আজ তাকে দেখা গেল না। এমনকি তার পা-চাটা কুত্তা রামলছমনও নেই।

এই দু'জন না থাকলেও অন্য লোকজন আছে। তারা জানালো হিমগিরি আদিবাসীদের জন্য সব বন্দোবস্ত করে রেখে গেছে। ওরাই তাদের মকাইয়ের ছাতু, নিমক, মিরচা, মিট্টি তেল ইত্যাদি মেপে দিল। থাকার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নেই। খামার বাড়ির লম্বা লম্বা টিনের চালাগুলোর পেছনে আদিবাসীদের জন্য স্থায়ী মেটে ঘর রয়েছে। খেতের কাজ যতদিন চলবে ততদিন ওরা ওখানেই থাকবে।

আদিবাসীদের রাতের খোরাকি টোরাকি দিতে দিতে খামারের লোকজনেরা ধর্মাকে জানায়, হিমগিরি এবং রামলছমন তাদের দোসাদটোলায় গেছে।

ধর্মা অবাক হয়ে যায়। রামলছমন বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে মাঝে মাঝেই তাদের টোলায় হানা দেয়। সে যায় খেতখামারের কোনো একটা কাজের ছুতো ধরে। তবে আসল উদ্দেশ্য হল, মেয়েদের পেছন পেছন ছোঁক ছোঁক করে বেড়ানো। কিন্তু নওরঙ্গী হিমগিরিনন্দনের রাখনি হলেও কখনও কোনো কারণেই দোসাদটোলায় তাকে যেতে দেখা যায় না। অচ্ছুৎ দুসাদিনকে রাতের আন্ধেরাতে বিছানায় নিয়ে তুললেও তাদের পাড়ায় গিয়ে উচ্চবর্ণের হিমগিরি ব্রাহ্মণত্বকে বিপন্ন করতে পারে না।

ধর্মা শুধোয়, 'আমাদের ওখানে কেন গেছে?'

'মালুম নেহী —' খামারের লোকজনেরা জানায়।

'কখন গেছে?'

'আভ্‌ভি। তুই গেলেই দেখতে পাবি।'

কী কারণে হিমগিরি এবং রামলছমন এই ভর সন্ধেয় অচ্ছুৎদের মহল্লায় ছুটল, ভেবে পায় না ধর্মা। এক অজানা ভয়ের শিহরন তার শিরদাঁড়ায় খেলে যেতে থাকে। আর দাঁড়ায় না সে। ঝাঁ ঝাঁ রোদে পুরা পাক্কা পাঁচ মাইলের বেশি রাস্তা ভেঙে চাহাড়ে গেছে ধর্মা, আবার ততটা পথই হেঁটে এসেছে। এতক্ষণ হাতপায়ের জোড় ঢিলে হয়ে আসছিল তার। সে সব ভুলে এখন দোসাদটোলার দিকে দৌড়ুতে থাকে।

মহল্লার সিকি 'মিলে'র (মাইলের) মধ্যে আসতেই দূর থেকে বাতাসে গোঙানির মতো শব্দ ভেসে আসে। ধর্মা একটু থমকায়। টের পায়, বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠেছে। কান খাড়া করতেই সে বুঝতে পারে, ওটা গোঙানি না, কান্নার আওয়াজ। কেউ গলার সুর কখনও উঁচুতে তুলে, কখনও নামিয়ে ঘ্যানঘেনে টিপির টিপির 'বারিষে'র মতো শব্দ করে কেঁদে চলেছে। কান্নাটা কোনো আওরতের। কে হতে পারে? বুকের ভেতর দম আটকে ধর্মা শক্ত কাঁকুরে মাটির ওপর দিয়ে ছোটার

গতি হঠাৎ তিনগুণ বাড়িয়ে দেয়।

কাছাকাছি আসতেই ভয়ে হাড় কেঁপে যায় ধর্মার। দোসাদটোলার সামনের জমিতে ক'টা লণ্ঠন জ্বলছে। সেই আলোয় দেখা যায়, গণা মুখ গুঁজে মাটিতে পড়ে আছে। তার হাত-পা বাঁধা। খালি গা। চামড়া ফেটে পা থেকে মাথা পর্যন্ত রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে। গালের কষ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। দেখেই বোঝা যায় এখনও পুরোপুরি বেহুঁশ হয়ে যায় নি গণা। থেকে থেকে কামারের হাপরের মতো বুক তোলপাড় করে একেকটা শ্বাস পড়ছে।

গণার এধারে হিমগিরি রামলছমন এবং বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের তিন চারটে পহেলবান দাঁড়িয়ে আছে। রঘুনাথের বাপ, ঠাকুরদা এবং তাঁদেরও আগে থেকে পুরুষানুক্রমে পহেলবান পোষা হচ্ছে। এক জমানা যায়, আরেক জমানা আসে। তার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো বুড়ো পহেলবানদের জায়গায় নয়া পহেলবান আসে। এদের পোষার উদ্দেশ্য একটাই — বেয়াড়া ঠেঁটা প্রজা বা ভূমিদাসদের শাসন। ঘরে আগুন দেওয়া থেকে খুন করে রাতারাতি লাশ গুম করে দেওয়া পর্যন্ত হেন কাজ নেই যা তারা পারে না। এতক্ষণে বোঝা যায়, হিমগিরি আর রামলছমন কেন এই ভর সন্ধেয় দোসাদটোলায় হানা দিয়েছে।

শেষ রাতে বড সড়কে পিপর গাছের তলায় গণার সঙ্গে দেখা হতেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল ধর্মা। হোঁশিয়ার হয়ে সে বচপনেব বন্ধু গণাকে দোসাদটোলায় ঢুকতে বলেছিল। ধর্মা জানত, ধরা পড়লে রঘুনাথ সিংয়েব পোষা পহেলবানেবা তার কী হাল করে ছাড়বে। 'করজে'র রুপাইয়া শোধ না করে টৌনে পালিয়ে যাওয়া কোনোমতেই বড়ে সরকার বরদাস্ত করবেন না। তারপর চাহাঢ়ের হাটে আদিবাসী খেতমজুর বাছাবাছি করে তাদের নিয়ে গনগনে রোদের মধ্য দিয়ে গারুদিয়ায় ফিরতে ফিরতে গণাব কথা ভুলে গিয়েছিল ধর্মা। ভূমিদাসদের নোংবা পরাধীন পশুর জীবন থেকে পালিয়ে গিয়েছিল গণা। পুরোপুরি স্বাধীন হওয়ার এক বছর বাদে ভিখমাঙনি মাকে নিতে এসে ধরা পড়ে গেল সে। কিন্তু একটা খটকা ধর্মার যায় না। গণা ধরা পড়ল কী করে? একমাত্র নওরঙ্গী ছাড়া দোসাদটোলার আর কেউ তো যেচে গিয়ে হিমগিরিদের কাছে গণার খবব দেবে না। গণা জনমদাসের জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে দোসাদবা তার সম্পর্কে খুবই ঈর্ষান্বিত। তাই বলে তার ক্ষতির কথা কেউ ভাবে না। গণা পালিয়ে যাওয়ার পর অনেকদিন পর্যন্ত দোসাদটোলায় সবাই বলাবলি করেছে, 'হামনিলোগ নায় সাকা, লেকেন গণানে সাকা। ছোকরা বচ্ গিয়া।'

'বড়ে সরকার আর তার কুত্তাদের আঁখে ধুলো দিয়ে বুদ্ধু বানিয়ে গণা ভাগল। বহোত সাবাস!'

মনে মনে গোটা দোসাদটোলা এরকম একটা কৃতিত্বের জন্য গণার সম্বন্ধে এক ধরনের শ্রদ্ধাই পোষণ করে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, একমাত্র নওরঙ্গীই হিমগিরিকে তার খবর দিয়ে আসতে পারে। কিন্তু শেষ রাতে যখন গণা দোসাদটোলায় গেছে তখন ওই ছমকি আওরতের তো হিমগিরির বিছানায় থাকার কথা। অবশ্য খুব ভোরে আকাশ ফর্সা হতে না হতেই সে হিমগিরির কাছ থেকে ফিরে আসে। ধর্মা ভাবে, কিভাবে গণা ধরা পড়ল, সেটা জানা দরকার। পরে কুশীর কাছ থেকে সে জেনে নেবে।

ওদিকে গণার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীরে হাত বলোতে বুলোতে তার ভিখমাঙনি মা বুড়ি সৌখী জড়ানো শব্দ করে নাগাড়ে কেঁদে চলেছে। তার কোঁচকানো গালের ওপর দিয়ে চোখের জলের স্রোত গড়াতে থাকে অনবরত। দূর থেকে সৌখীর কান্নাই তাহলে শুনতে পেয়েছিল ধর্মা।

মাঝখানে গণা আর সৌখী, এপাশে পহেলবানসুদ্ধু হিমগিরি, রামলছমন আর ওপাশে দোসাদটোলার লোকজনেরা। তাদেরই একজনের স্বাধীন হতে চাওয়ার পরিণাম কী দাঁড়াতে পারে দেখতে দেখতে দোসাদ আর দোসাদিনরা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। ওখানে ভিড়ের মধ্যে কুশীকে দেখতে পেয়ে চোরের মতো চুপি চুপি তার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ায় ধর্মা।

এদিকে হিমগিরি ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ সরু গলায় কানের পর্দায় তুরপুন চালাতে থাকে, 'দেখা, চুহাকে বাচ্চাকো হাল দেখা। করজ শোধ না করে ভাগলে কী ফল, নিজের আঁখে তোরা দ্যাখ। কেউ যদি এভাবে ভাগার মতলব করিস হাড্ডি ঢিলা করে দেব। কানমে ঘুষল্ হামনিকো বাতরি?'

দোসাদ দোসাদিনরা এত ভয় পেয়ে গেছে যে তাদের গলা দিয়ে আওয়াজ বার হয় না। নিঃশব্দে

ঘাড় কাত করে শুধু জানায় — ঘুষেছে।

হিমগিরি ইচ্ছা করলে গণাকে খামারবাড়িতে টেনে নিয়ে পহেলবান দিয়ে হাড়-মাংস আলাদা করে দিতে পারত। তার বদলে সিধা দোসাদটোলায় এসে ভূমিদাসদের ডেকে তাদের চোখের সামনে গণাকে এই যে বেধড়ক মারধর করানো হল, সেটা একটা মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। অর্থাৎ অচ্ছুৎ কুত্তার দল, তোরা সবাই দ্যাখ, ভূমিদাসের জীবন থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে ফল কী দাঁড়ায়। এরকম একটা ভয়াবহ দৃষ্টান্ত দেখা থাকলে কেউ আর স্বাধীনতার খোয়াব দেখতে সাহস করবে না।

গণাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুড়ি সৌখী সমানে কেঁদে চলেছে। আর গণার ঠোঁট কপাল ভুরু ঘাড় — বলা যায় সারা শরীরটাই রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

হিমগিরিনন্দন ঘাড়টা এদিকে হেলিয়ে ওদিকে হেলিয়ে চোখ কুঁচকে গণার মারের বহরটা দেখে নেয়। ঠ্যাঙানোটা বেশ ভালই হয়েছে। হিমগিরির মুখেচোখে পরিতৃপ্তির চিকণ একটু হাসি ফুটে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে যায়। ছুঁচের মতো সরু গলায় সে আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে, 'কা রে গণোয়া, বুলা লে তেরে পুলিশ বাপকো! পুলিশ দিখলায়া! কানুন দিখলায়া! আরে হারামজাদকে বেটোয়া, এই গারুদিয়া তালুকে একজন আদমীরই কানুন চালু আছে — ও আদমী বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং। কানমে ঘুষল?'

আধা বেহুঁশ গণা কিছু বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তা বোঝা যায় না। তার রক্তাক্ত ঠোঁটদুটো অল্প অল্প কাঁপে শুধু। তবে বুড়ি সৌখী জড়ানো বিকৃত গলায় অবিরাম বলে যায়, 'ঘুষা হুজৌর, ঘুষা হুজৌর—'

কুশীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ধর্মার মনে পড়ে যায়, ভোরবেলা হিমগিরির কথা তুলতে গণা বলেছিল, দেশে পুলিশ আছে, জজ-ম্যাজিস্টার আছে, বে-কানুনি কাম করা অত সোজা নয়। নিশ্চয়ই এসব কথা হিমগিরিকেও বলেছিল। তাই নিয়ে বড়ে সরকারের পা-চাটা এই কুত্তাটা এখন তাকে বিদ্রূপের সঙ্গে হুঁশিয়ারিও দিচ্ছে।

হিমগিরি ফের গর্জে ওঠে, আজ তোকে কিছুই করলাম না। আবার যদি এখান থেকে ভাগার মতলব করিস হাড্ডি বিলকুল 'চূরণ' করে বালির তলায় তোর লাশ পুঁতে দেব। তোর পুলিশ বাপেরা কিছু করতে পারবে না। কানমে ঘুষল?'

সৌখী আগর মতোই বলে যায়, 'ঘুষা হুজৌর, ঘুষা হুজৌর —'

আধবুড়ো গণেরি খানিকটা এগিয়ে এসে বলে, 'ভাগবে না হুজৌর, গণা ভাগবে না—'

হিমগিরি বলে, 'আচ্ছা বাত। তুই তো এদের মাতব্বর। গণা চুহার বেটোয়াটাকে থোড়া-বহোত সমঝে দিস, এখান থেকে ভাগবার ফল ভাল হবে না। কানমে ঘুষল?'

'হাঁ দেওতা —'

এরপর আর দাঁড়ায় না হিমগিরিনন্দন। একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপনের পর দলবল নিয়ে চলে যায়।

এদিকে গণেরি, মাধোলাল, নাথু, এমনি আরো জনাকয়েক গণাকে ধরাধরি করে দোসাদটোলায় তাদের ঘরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। বুড়ি সৌখী গোঙানির মতো একটানা শব্দ করে ফোঁপাতে ফোঁপাতে তাদের পেছন পেছন যায়। বাদবাকি সকলেও শক্ত কাঁকুরে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে না।

কুশীর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সেই কথাটা মনে পড়ে যায় ধর্মার। গণাটা হিমগিরির হাতে ধরা পড়ল কী করে? সে কি তার হুঁশিয়ারি গ্রাহ্য করে নি? কুশীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে ধর্মা বলে, 'আজ সবেরে যখন চাহাঢ়ে যাই তখন 'পাক্কী'তে পিপর গাছের তলায় গণার সাথ দেখা হয়েছিল।'

কুশী অবাক হয়ে বলে, 'হাঁ!'

'হাঁ।' তারপর গণার সঙ্গে কী কী কথা হয়েছে সব বলে যায় ধর্মা। শুধোয়, 'ও ধরা পড়ল কী করে?'

কুশী যা উত্তর দেয় তা এইরকম। ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে দোসাদটোলায় ফিরে চুপি চুপি বুড়ি সৌখীকে নিয়ে পালিয়ে যায় নি গণা। বরং এতকাল বাদে এসেছে বলে সবার ঘরে ঘরে গিয়ে গল্পটল্প করে, মাঝখানের পুরা এক বছর কোথায় কোথায় ঘুরেছে, কী কী করেছে, সে সব কথা

বলে এবং গারুদিয়া তালুকে এই জানবরের জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে ফোসলায়। তখন সবারই খেতিতে যাবার তাড়া। তাই জমিয়ে বেশিক্ষণ গল্প করার সময় কারুর ছিল না।

এদিকে সারা রাত হিমগিরির কাছে কাটিয়ে ভোর ভোর দোসাদটোলায় ফিরেই গণাকে দেখে ফের হিমগিরির কাছে ফিরে যায় নওরঙ্গী। গণাকে নিয়ে দোসাদরা এত মেতে ছিল যে তার আসা বা যাওয়া কোনোটাই কেউ লক্ষ করে নি। সবাই যখন গণার সঙ্গে কথাটথা বলে নাস্তা সেরে বেরুতে যাবে সেই সময় হিমগিরি পোষা পহেলবানদের নিয়ে দোসাদটোলায় আসে। তখন কিন্তু গণাকে মারধর করা হয় না। শুধু কুয়োর পাড়ে একটা মোটা সাগুয়ান গাছের সঙ্গে তাকে বেঁধে দু'জন পহেলবানকে পাহারায় রেখে দেওয়া হয়। গণা তখন চেঁচাতে থাকে — সে থানায় যাবে, পুলিশের কাছে নালিশ করবে, কোমরে দড়ি পরিয়ে সবাইকে ফাটকে ঢোকাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর জমি থেকে কামকাজ সেরে দোসাদটোলার বাসিন্দারা সন্ধের মুখে মুখে যখন ফিরে এল সেই সময় আবার হানা দেয় হিমগিরি। কানুন বা পুলিশের কথা না বলে পায়ে পড়লে হিমগিরি গণাকে অত মারধর করাত না, হয়ত ক্ষমাই করে দিত। তবে এটা মানতেই হবে, গণার বুকের ছাতিতে দুর্দান্ত সাহস। বহোত তেজী ছোকরা।

শুনতে শুনতে আগের অনেক বারের মতো আরো একবার গণার সম্পর্কে শ্রদ্ধায় ধর্মার মাথা নুয়ে পড়তে তাকে।

চোদ্দ

দেখতে দেখতে দিন কয়েক কেটে গেল। কিন্তু এর মধ্যে এমন একটু ফুরসত পাওয়া যায় নি যাতে কোটরা হরিণের বাচ্চা যোগাড়ের জন্য ধর্মা জঙ্গলে যেতে পারে।

রাঁচী থেকে টিরকের আসার কথা ছিল পরশু দিন। ধর্মার পক্ষে বাঁচোয়া, সে আসে নি। হয়ত কোনো কাজে আটকে গিয়ে থাকবে। তবে যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।

অন্য দিনের মতো অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে পড়ল ধর্মা। সে ঠিকই করে ফেলেছে আজ আর জমিতে লাঙল ঠেলতে যাবে না। মাঠ-কুড়ানি জঙ্গল-কুড়ানিদের সঙ্গে মাড়ভাত্তা খেয়েই বেরিয়ে পড়বে। দক্ষিণ কোয়েলের শুখা খাতের ওধারে সেই জঙ্গলটায় গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখবে — কোটরার বাচ্চা জোটাতে পারে কিনা। যদি দুপুরের মধ্যে যোগাড় করা যায়, বিকেলে টিরকের হাতে তুলে দেওয়া যাবে। টিরকের সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে।

জমিতে না যাওয়ার ব্যাপারটা কুশীকে আগে জানায় নি ধর্মা। কুয়োয় নাহানা সেরে মাড়ভাত্তা খেয়ে সবাই যখন দোসাদটোলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে তখন সে কুশীকে বলল, 'আমি আজ খেতিতে যাব না।'

কুশী জিজ্ঞেস করে, 'কায়?'

কাঁধে করে একটা টাঙ্গি নিয়ে এসেছিল ধর্মা। সেটা নামিয়ে কুশীর সামনে ঘুরিয়ে বলে, 'এটা দেখলি তো? আজ জঙ্গলে যাব।'

হঠাৎ টিরকের কথা মনে পড়ে কুশীর। সে বলে, 'কোটরার তালাসে?'

'হাঁ। পরশু টিরকের আসার কথা ছিল। আসে নি। আজ এলে দাঁড়াতে বলবি।'

'ঠিক হ্যায়। বেশি দেরি করিস না।'

'নায়।'

'বগুলা ভকত তোর কথা পুছলে কী বলব?'

'বলবি বুখার হয়েছে।' বলে একটু থেমে ফের শুরু করে ধর্মা, 'আজ তুই গণেরিচাচার সাথ কাম করিস।'

কুশী মাথা নাড়ে, 'ঠিক হ্যায়।'

দোসাদটোলার বাইরে শক্ত কাঁকুরে মাঠের ওপর দিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর কুশীরা বাঁ দিকে পাকা সড়কে গিয়ে ওঠে আর মাঠ-কুড়ানিদের সঙ্গে ডান দিকে হাঁটতে থাকে ধর্মা। সে যে দলটার সঙ্গে যায় তাতে তার এবং কুশীর মা-বাপেরাও রয়েছে। আর রয়েছে দোসাদটোলার অগুনতি বাচ্চাকাচ্চা। দলের প্রায় সবার মাথাতেই একটা করে মেটে হাঁড়ি। কোয়েলের বালি খুঁড়ে খুঁড়ে খাবার জল বার করে আনবে।

ধর্মারা যখন নদীর শুখা খাতের মাঝামাঝি চলে আসে সেই সময় দেখা যায় জষ্ঠি মাসের সূর্য পুব আকাশে মাথা তুলতে শুরু করেছে। এই সকাল বেলাতেই তার রং গনগনে আগুনের মতো। দিনের প্রথম রোদ পড়ে লক্ষ কোটি সোনার দানার মতো কোয়েলের মরা খাতের বালি ঝিকমিকিয়ে উঠেছে। বাতাস গরম হচ্ছে ক্রমশ।

এখান থেকে রাঁচী আর পাটনাগামী পাকা সড়কের দু'পাশে গারুদিয়া এবং বিজুরি তালুকের শস্যক্ষেত্রগুলো ধু ধু দেখায়।

মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পরদেশি শুগা বাতাসে ভেসে চলেছে। এই গরমের সময়টা কোত্থেকে যেন শুগার ঝাঁক এদিকে চলে আসে। শুগা ছাড়া ক্বচিৎ দু-একটা চোটা আর পেরোয়া চোখে পড়ে।

আকাশ এখন গাঢ় নীল, মাঝে মাঝে তুলোর পাহাড়ের মতো সফেদ মেঘ। রোদ লেগে মেঘের কানাতে সোনার ঝিলিক লাগে।

পাখি আকাশ মেঘ —কোনো দিকেই নজর নেই ধর্মার। একজোড়া কোটরার বাচ্চা জঙ্গল থেকে তাকে ধরে আনতেই হবে। বাচ্চা দুটোর দাম নগদ বিশ রুপাইয়া। কুড়িটা টাকা মানে স্বাধীন জীবনের দিকে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া। কিভাবে কোটরার বাচ্চা খুঁজে বার করবে, ভাবতে ভাবতে বালিতে পা গেঁথে গেঁথে এগুতে থাকে ধর্মা।

একসময় সবাই সেই সাবুই ঘাসের জঙ্গলটার কাছাকাছি চলে অসে। এখানেই রোজ ধর্মা আর কুশী বগেড়ির জন্য ফাঁদ পেতে রেখে যায়।

সাবুই ঘাসের ঘন ঝোপটার পব রশিভর গেলেই দক্ষিণ কোযেলের শুখা খাতের দু'ধারে পাতলা জঙ্গল আর আছে ঘাসেভরা অনেকটা মাঠ। এখানে বিজুরি আর গারুদিয়া তালুকের গৈয়া আর বকরি-চরানিরা তাদের জন্তুগুলোকে খাওয়াতে নিয়ে আসে। কিন্তু এবার চৈত্র মাস থেকে আকাশে না একফোঁটা মেঘ, না ঝরছে এক বুঁদ বারিষ। মাঠে যেটুকু ঘাস ছিল চোত পেরিয়ে বৈশাখের পাঁচ-সাতটা দিনও কেটেছে কিনা সন্দেহ, তার আগেই প্রায় খতম হয়ে গেছে। বাদবাকি যা আছে তা গনগনে রোদের তাতে জ্বলে হেজে হলদে মরকুটে হয়ে উঠেছে। গরু ছাগলে তা ছুঁয়েও দেখে না। কাজেই আজকাল বকরি-চরানি আর গৈয়া-চরানিরা এদিকে বড় একটা আসে না।

ধর্মার সঙ্গে দোসাদটোলা থেকে যারা এসেছিল তাদের জনাকতক মেয়েপুরুষ আর সবগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ে কোয়েলের বালির ডাঙা খুঁড়ে খুঁড়ে জল বার করার জন্য বসে গেল। এক হাঁড়ি জল যোগাড় করার পর তারা জঙ্গলে আসবে সুথনি রামদানা বা অন্য কোনো কন্দ অথবা ফল ফলারির খোঁজে। তবে বেশির ভাগই জঙ্গলে যাওয়ার জন্য ধর্মার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। জঙ্গল থেকে কিছু খাদ্য জুটিয়ে এনে তারা বালি খুঁড়ে জল বার করতে আসবে।

সাবুই ঘাসের ঝোপগুলো থেকে আরো দু রশি যাওয়ার পর ওরা জঙ্গলের মুখে এসে পড়ে।

এখানে বন ঘন নয়, বেশ ছাড়া ছাড়া। এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে কড়াইয়া পরাস সিমার সাগুয়ান আর কাঁটাওলা পুটুস গাছের ঝাড়। এই জষ্ঠি মাসে পরাস আর সিমার গাছগুলোর ডালে থোকা থোকা আগুনের মতো ফুল ফুটে আছে। তবে খুব বেশি করে যা নজরে পড়ে তা হল মহুয়া। ফুল আর ফলের খুসবুতে বাতাস এখানে ভারি হয়ে আছে।

ধর্মার সাথীরা এই পাতলা জঙ্গল থেকেই খাদ্যটাদ্য সংগ্রহ করবে। কিন্তু ধর্মা যাবে আরো তিন রশি — জঙ্গল ক্রমশ ঘন হতে হতে যেখানে চাপ বেঁধে আছে সেইখানে। কোটরা হরিণ সেখানে না গেলে মিলবে না।

কিন্তু জঙ্গলের এই মুখটায় এসেই ধর্মারা থমকে গেল। ঘাস ফুরোবার পরে এখানে গৈয়া বা বকরি-চরানিরা আর আসে না। জঙ্গল নিঝুম থাকে। কিন্তু আজ হট্টাকাট্টা চেহারার অনেকগুলো লোককে দেখা গেল। তারা মহুয়ার ফল পেড়ে পেড়ে ঢাউস বাঁশের ঝোড়া বোঝাই করছে। লোকগুলোকে ধর্মারা চেনে।

গারুদিয়া এবং বিজুরি তালুকে রঘুনাথ সিং এবং মিশিরলালজিকে বাদ দিলে আরো জনকয়েক পয়সাওলা লোক রয়েছে। রঘুনাথদের তুলনায় তারা অবশ্য কিছুই না। রঘুনাথদের মতো অত বিপুল জমিজমা বা খেতখামারও তাদের নেই। এ অঞ্চলের প্রায় তাবৎ চাষের জমি ওঁরা দু'জনেই পুরুষানুক্রমে দখল করে রেখেছেন। বাকি যেটুকু ছিটেফোঁটা রয়েছে তা পড়েছে ওই ক'জন ভাগ্যবানের ভাগে। জমিজমা না থাকলেও এদের আছে সুদের কারবার, গারুদিয়া আর বিজুরির বাজার-গঞ্জে বড় বড় আড়ত, দোকান, ভাড়ায় খাটানোর জন্য গৈয়া আর ভৈসা গাড়ি, লরি, সাইকেল-রিক্‌শা, ইত্যাদি। এ ছাড়া আছে পাল পাল গরু মোষ এবং ছাগল। যে লোকগুলো মহুয়া পাড়ছে তারা ওই সব পয়সাওলা আদমীদের বকরি-চরানি, গাই-চরানি, মোষ-চরানির দল।

বৈশাখ মাস পড়তে না পড়তেই কচু, সুথনি, মেটে আলু ইত্যাদি খাওয়ার যোগ্য যাবতীয় জিনিসই সাবাড় হয়ে আসছিল। এই গরমের সময়টা বড় কষ্ট এদিকের মানুষের। এখন না মেলে জল, না মেলে খাদ্য। কচু কন্দের টান পড়তে কিছুদিন ধরেই ধর্মার মা-বাপ থেকে শুরু করে দোসাদটোলার বাতিল মানুষেরা মহুয়ার ফল নিয়ে যাচ্ছিল। পেট তো কোনো কথা শোনে না। অন্য বঢ়িয়া খাদ্য না পেলে মহুয়ার ফলই সই। দু-একটা মাস এই মহুয়ার ফল তাদের বাঁচিয়ে রাখে। বেশ কয়েক বছর ধরে এরকম চলছে। সে যাই হোক, ধর্মারা কিন্তু আগে আর কোনোদিন গাই-চরানিদের এভাবে মহুয়ার ফল পেড়ে নিয়ে যেতে দেখে নি।

ধর্মার গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দোসাদটোলার অন্য সবাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এইভাবে পয়সাওলা আদমীদের লোকেরা যদি তাদের মতো গরিব না-খাওয়া মানুষের খাদ্যে হাত বাড়ায় তা হলে বড়ই বিপদ, বিলকুল ভুখা মরে যেতে হবে। কী যে করবে, ভেবে উঠতে পারছিল না ওরা।

হঠাৎ পেছন দিকে বহু লোকের পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরায় ধর্মারা। শ দেড় দুই আদিবাসী মুণ্ডা ওরাওঁ আর সাঁওতাল বালিতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে এগিয়ে আসছে। হাড্ডিসার ক্ষুধার্ত চেহারা, চোখ এক আঙুল করে গর্তে ঢুকে গেছে। পরনে ময়লা চিটচিটে টেনি। মেয়েগুলোর বেশির ভাগেরই কোমরে একটি করে বাচ্চা ঝুলছে। মায়েদের মরুভূমির মতো ধু ধু নির্জলা বুকের বোঁটায় চোঁ চোঁ করে দু-একটা টান দিয়েই তারা চিৎকার করে উঠছে। না, কিছুই নেই সেখানে। দেখেই টের পাওয়া যায়, দু-তিনদিন ওদের কারুর খাওয়া হয় নি।

ওরাওঁ মুণ্ডারা ধর্মাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল। ধর্মারা কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে ক্ষুধার্ত আধ-ন্যাংটা মানুষগুলোকে দেখে। আগে আর কখনও আদিবাসী ওরাওঁদের দক্ষিণ কোয়েলের এদিকটায় আসতে দেখা যায় নি। দোসাদটোলার প্রতিনিধি হিসেবেই যেন ধর্মা শুধোয়, 'কা বাত? তোরা কোথাকার আদমী?'

আদিবাসীদের ভেতর থেকে একটা বুড়ো ওরাওঁ বেরিয়ে এসে আঙুল বাড়িয়ে খাড়া পশ্চিম দিকটা দেখিয়ে বলে, 'উঁহাকা —'

'এখানে তো কোনোদিন তোদের দেখি নি —'

'নায়। এই পয়লা এলাম।'

'কা বাত ?'

গর্তে ঢুকে যাওয়া নিজের চিমড়ে পেট দেখিয়ে ওরাওঁটা বলে, 'ইসকে বাস্তে —'

ধর্মা পুরোটা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে।

বুড়ো ওরাওঁ ফের বলে, 'আমাদের ওদিকে কিছু নেই — নায় চাওর (চাল), নায় গেঁহু, নায় রামদানা, নায় মাড়োয়া, নায় মকাই — কুছ নায়। জঙ্গলের গাছপাতাও পুরা খতম। পরশু শুনলাম, এখানকার জঙ্গলে কুছ না কুছ মিলবে। কমসে কম মৌয়াকে ফল। শুনেই গাঁও ফেলে সব বেরিয়ে

পড়েছি। কিছু না পেলে ভুখা মর যায়েগা।'

ধর্মা খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা অর্থাৎ অচ্ছুৎ ভূমিদাসেরাও ভুখা-নাঙ্গা আদমী। কিন্তু এমন ভয়াবহ দুর্দশার কথা যেন ভাবা যায় না। অবশ্য সেদিন চাহাড়ের হাটে মরশুমী খেতমজুর আনতে গিয়ে আদিবাসীদের কাছে কিছু কিছু শুনেছিল। উত্তর না দিয়ে আঙুল দিয়ে জঙ্গলের দিকটা দেখায় সে। ওখানে এখনও মহুয়ার ফল পাড়া চলছে।

বুড়ো ওরাওঁ এবং তার সঙ্গীরা দৃশ্যটা দেখার পর ভয়ানক হতাশ হয়ে যায়। হাপরের মতো জোরে শ্বাস ফেলে বালির ওপর সে বসে পড়ে। বলে, 'মর যায়েগা, হার্মনিলোগ জরুর ভুখা মর যায়েগা।'

ধর্মা আর দাঁড়ায় না। পায়ে পায়ে জঙ্গলের ভেতর যেখানে মহুয়াব ফল পাড়া হচ্ছে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। এই লোকগুলো তো পয়সাওলা আদমীদের গাই বকরি চরায় এবং দু'বেলা ভরপেট খেতে পায়। তা হলে গরিবের খাদ্য মহুয়ার ফল পাড়ছে কেন? অনেকক্ষণ ধরেই জানার জন্য কৌতূহল হচ্ছিল ধর্মার। সে শুধোয়, 'কা ভেইয়া, মৌয়ার ফল নিচ্ছ কেন?'

বড়ে আদমীদের গাই-বকরি চরানিদের মেজাজই আলাদা। প্রথমটা তারা ধর্মার কথার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না। অনেক বার ঘ্যান ঘ্যান করার পর একজন রুক্ষ গলায় বলে, 'গাই বকরির জন্যে।'

'গাই বকরি মৌয়া দিয়ে কী করবে?'

'কী আবার করবে? খাবে।'

'মৌয়া খাবে?'

'না তো কী ? দশ বিশ মিলের মধ্যে কোথাও ঘাসপাতা আছে? সব জ্বলে গেছে। জানবরগুলো কি ভুখা মরবে?'

জানবরের চাইতে মানুষের বেঁচে থাকাটা অনেক বেশি জরুরি, এই কথাটা বলতে গিয়েও বলা হয় না ধর্মার। দক্ষিণ কোয়েলের পাড় ধরে মাইলের পর মাইল এই জঙ্গলের মালিক কে, সে জানে না। তবে তার মনে হয়, বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের পায়ে পড়লে কিছু সুরাহা হলেও হতে পারে। তাঁকে জানাতে হবে এই শুখা মরশুমে প্রচণ্ড কষ্টের দিনগুলোতে গাই-বকরি চরানিরা যেন মহুয়া ফলের দিকে হাত না বাড়ায়, ওগুলো যেন গরিব ভুখা মানুষদের জন্যই থাকে। রঘুনাথ সিং বলে দিলে কারুর ক্ষমতা নেই গাই-বকরির জন্য জঙ্গলে যায়। রঘুনাথ সম্পর্কে এই কথাটা যে ধর্মা ভাবতে পারল তার কারণ একটাই । তা হল সেদিনকার সেই লাড্ডু বিতরণ। মাস্টারজির কথায় ভোটকা ভোজ। যে মানুষ এত আদর করে নিজের হাতে তাদের মতো অচ্ছুৎদের মিঠাইয়া বেঁটে দিয়েছেন তিনি কি আর গরিব লোকদের না খেয়ে মরতে দেবেন? কিন্তু তাঁকে গিয়ে ধরবে কে ? ধর্মা ভাবল, পরে এ নিয়ে গণেরিদের সঙ্গে কথা বলবে।

এধারে মহুয়ার ফলে বার চোদ্দটা ঝোড়া বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। গাই-বকরি চরানিরা সেগুলো মাথায় চাপিয়ে চলে গেল।

ধর্মা জানে, জঙ্গলের সামনের দিকে খুব বেশি মহুয়ার গাছ নেই, তবে একটু ভেতর দিকে গেলে অগুনতি রয়েছে। কিন্তু গাই-ছাগলের জন্য অনবরত মহুয়া ফল নিয়ে গেলে ফুরিয়ে যেতে আর কতক্ষণ! কিন্তু এসব পরের কথা পরে চিন্তা করা যাবে। এখন আর দেরি করার উপায়. নেই। বেলা চড়ে যাচ্ছে। এখান থেকে তিন রশি রাস্তা ভেঙে গভীর জঙ্গলে ঢুকে কোটরার বাচ্চার খোঁজ করতে কতটা সময় লাগবে, কে জানে। রাঁচী থেকে টিরকে এসে যেতে পারে। বিকেলের মধ্যেই জঙ্গল থেকে তার ফিরে যাওয়া দরকার।

পেছন ফিরে সে দোসাদটোলার লোকজনকে আর আদিবাসী ওরাওঁ মুণ্ডাদের ডাকে, 'আও আও —'

কুশীর আর তার চার বাপ-মা এবং ওরাওঁ মুণ্ডারা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে। ধর্মা তাদের জানায় জঙ্গলের ভেতর খানিকটা গেলে আরো অজস্র মহুয়া গাছ আছে। তারা যেন সেখানে যায়।

সেই বুড়ো ওরাওঁটা, যে একেবারে ভেঙে পড়েছিল, এবার বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তার গর্তে-ঢোকা

চোখ ঝকমকাতে থাকে। সে বলে, 'তুমি আমাদের বাঁচালে।' তারপর সঙ্গীদের দিকে ফিরে হাত নাড়তে থাকে, 'আ যা —'

রশিখানেক যাওয়ার পর চাপ-বাঁধা মহুয়ার বন দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে সবাইকে রেখে এগিয়ে যেতে থাকে ধর্মা। পেছন থেকে তার এবং কুশীর চার মা-বাপ সাবধান করে দেয়, 'জঙ্গলে হোঁশিয়ার থাকবি।'

ধর্মা বনভূমির বেলেমাটির ওপর দিয়ে বড় বড় পা ফেলতে ফেলতে বলে, 'হাঁ —'

'হাড়চেঁবুয়া হ্যায় —'

'জানি।'

'শের হ্যায়—'

'জানি।'

'সাঁপ হ্যায় —'

'জানি।'

'ভালু হ্যায় —'

'জানি।'

'বহোত বদমাস জানবর ভি হ্যায়—'

'জানি।'

চার বুড়োবুড়ির গলার স্বর ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে পেছনে মিলিয়ে যায়।

পনের

ঘন জঙ্গলে গিয়ে ধর্মা যখন পৌঁছয় তখন প্রায় দুপুর। কিন্তু বন এখানে এত নিবিড়, মাথার ওপর ডালপালা আর পাতা এত ঘন হয়ে আছে যে জষ্ঠিমাসের গনগনে রোদ ভেতরে ঢুকতে পারে নি। চিকরি-কাটা টুকরো টুকরো আলো এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে।

জঙ্গলের ভেতরটা এই আগুনঢালা গরমের সময়ও বড় ঠাণ্ডা, ছায়াচ্ছন্ন। গা একেবারে জুড়িয়ে যায় যেন। অল্প অল্প হাওয়াও বয়ে যাচ্ছে। একধারে দক্ষিণ কোয়েলের একটা আধমরা খাতও চোখে পড়ে। এই গরমের সময় জল শুকিয়ে সেটা সরু হয়ে গেছে। সামান্য যেটুকু জল রয়েছে তা কাচের মতো পরিষ্কার আর টলটলে। দোসাদটোলার লোকজন এখানে যে জল নিতে আসে না তার কারণ ভয়ঙ্কর সব জন্তুজানোয়ার — চিতা, ভাল্লুক, হাড়চেঁবুয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই জঙ্গল ধর্মার বহুকালের চেনা। এখানকার প্রতিটি গাছ আর লতার নাম এবং ঝোপঝাড়ের চেহারা তার মুখস্থ। এই বনভূমিতে বেশির ভাগ গাছই হল শাল, মহুয়া, সাগুয়ান, গামায়ের, কাঁটাওলা পুটুস, তেতর, আমলকি, পরাস, কেঁদ, ইত্যাদি।

এধারে ওধারে, যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, থোকা থোকা মনরঙ্গোলি, সফেদিয়া, রাত-কি-রানী আর হলুদ রঙের চিলাম ফুলে বনের ভেতরটা রানীর মতো সেজে আছে। মাথার ওপর রয়েছে লাল ডগডগে সিমার আর পরাস ফুল। দূর থেকে মনে হবে মাইলের পর মাইল জুড়ে বনের মাথায় আগুন ধরে আছে। মহুয়া ফুলের গন্ধে বাতাস ম ম করছে।

এতটা পথ হেঁটে আসার দরুন হাঁপ ধরে গিয়েছিল ধর্মার। কাঁধের টাঙ্গি একটা ঝাঁকড়া- মাথা গামায়ের গাছের তলায় রেখে বসে পড়ল ধর্মা। খানিকক্ষণ জিরিয়ে কোটরার খোঁজে বেরিয়ে পড়বে সে।

চারপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা উড়ছে, আর উড়ছে ফড়িং। গাছের পাতার ফাঁক থেকে পরদেশি শুগা আর চোটাদের অবিশ্রান্ত কিচিরমিচিব ভেসে আসছে। দূরে দূরে দু-একটা ময়ূর দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে।

একসময় ধর্মা লক্ষ করে সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর এসে উঠেছে। কাজেই আর বসে থাকা যায় না। টাঙ্গি ফাঙ্গি কাঁধে চাপিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর পরাস সাগুয়ান সিসম ইত্যাদি গাছের পাশ দিয়ে ডান দিকে এগুতে থাকে। খানিকটা যাওয়ার পর চোখে পড়ে একটা হড়হড়িয়া (হেলে সাপ) এঁকে বেঁকে ওধারে ঘন ঝোপটার ভেতর ঢুকে যায়।

ধর্মা ঝোপটা পেছনে ফেলে ক'পা গিয়েই থমকে যায় এবং চোখের পাতা পড়ার আগেই কাঁধ থেকে টাঙ্গি নামিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সামনে দশ হাত তফাতে মোটা সাগুয়ান গাছটার গা ঘেঁষে একটা হাড়চেঁবুয়া দাঁড়িয়ে ধর্মার দিকে তাকিয়ে আছে। জানবরটার ছুঁচলো মুখ। জঙ্গলের ঘন ছায়ায় সেটার চোখ আগুনের মতো জ্বলছে।

যে কোনো মুহূর্তে ধর্মার ওপর জন্তুটা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। গলার ভেতর থেকে একটু পরে পরেই চাপা হিংস্র শব্দ বার করছে সেটা। মাঝে মাঝে করাতের মতো ধারাল দাঁতও বার করছে।

ধর্মা তৈরি হয়েই আছে। জানবরটা ঝাঁপাবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওটার ঘাড়ে টাঙ্গি হাঁকিয়ে দেবে। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত হাড়চেঁবুয়াটা ঝাঁপাল না; পিছু হটতে হটতে আচমকা ঘুরে গিয়ে এক দৌড়ে কোয়েলের মরা খাত পেরিয়ে ওধারের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জোরে একটা শ্বাস ফেলে ধর্মা। একসময় টাঙ্গিটা হাতে ঝুলিয়েই এগিয়ে যায়।

আরো অনেকটা সময় কাটে। ধর্মা টের পায়, পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে সূর্য বেশ খানিকটা নেমে গেছে। চিকরি-কাটা যে রোদের টুকরোগুলো বনের ভেতর এসে পড়েছে সেগুলোর রং হলুদ হয়ে যেতে শুরু করেছে।

হাতে আর বেশি সময় নেই। দিন থাকতে থাকতে ধর্মাকে এই ভয়ঙ্কর বনভূমি থেকে যেভাবেই হোক বেরিয়ে পড়তে হবে। চোখের সবটুকু জোর দিয়ে সে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে অনবরত তাকাতে থাকে। কিন্তু কোটরা হরিণেরা আজ যেন ষড়যন্ত্রই করেছে, কিছুতেই গভীর জঙ্গল থেকে বেরুবে না। শুধু কি কোটরা — শজারু ভালুক চিতা লাকরা শিয়াব শুয়ার — কিছুই চোখে পড়ছে না।

এই জঙ্গলের হাড়হদ্দ, এখানকার জন্তুজানবর পশুপাখির স্বভাব, সব কিছুই ধর্মার জানা। তক্ষুনি একটা কথা মনে পড়ে যায় তার। বানরদের সঙ্গে হরিণদের খুবই দোস্তি। দূরে ডোরাকাটা শেব কিংবা চিতা-টিতা দেখলে গাছের মাথা থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হরিণদের হুঁশিয়ার করে দেয় তারা। আবার গলার ভেতর থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বের করে ওদের ডেকে আনে। হরিণরা কাছাকাছি এসে গেলেই গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে তাদের পিঠে পড়ে শিং ধরে মজাসে জঙ্গলের ভেতর ঘোড়দৌড় লাগিয়ে দেয়।

বানরের ডাক হুবহু নকল করতে পারে ধর্মা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সে। তারপর টাঙ্গিটা মাটিতে রেখে দু হাত মুখের দু'পাশে চোঙার মতো ধরে উপ উপ করে অবিরাম ডাকতে থাকে। এভাবে আওয়াজ করতে করতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়, দম ফুরিয়ে আসে কিন্তু কোটরা দূরে থাক, অন্য জাতের সাদা সাদা ফুটকিওলা হরিণও চোখে পড়ে না।

মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ধর্মার, ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ে সে। আজকের দিনটাই বেফায়দা বববাদ হয়ে গেল।

সূর্য আরো খানিকটা পশ্চিমে নেমে গেছে। জঙ্গলের ভেতর ছায়া আরো গাঢ় হতে থাকে। সন্ধে হওয়ার আগেই এখানে অন্ধকার নেমে যাবে। তার আগেই বেরিয়ে পড়া উচিত। বনভূমির সর্বত্র বিপদ ওৎ পেতে আছে। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে কখন চিতা বা লাকরা ঘাড়ে লফিয়ে পড়বে, আগে হদিশ পাওয়া যায় না। ক্লান্ত নিরানন্দ ধর্মা আজকের মতো কোটরার আশা ছেড়ে দেয়। তার মানে বিশটা টাকা পাওয়ার কোনো ভরসাই নেই। অগত্যা সে ফেরার পথ ধরে।

জঙ্গল যেখানে পাতলা হতে শুরু করেছে তার কাছাকাছি আসতেই আচমকা চোখে পড়ে তিন চারটে খেরাহা অর্থাৎ খরগোস আস্তে আস্তে একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আরেকটা ঝোপের দিকে চলেছে। ধর্মা যতদিন এই জঙ্গলে এসেছে, খালি হাতে ফেরে নি। কিছু না কিছু নিয়ে গেছে। ঠিক করে ফেলে, আজও খালি হাতে ফিরবে না।

খরগোস যখন চোখে পড়েছে তখন এই নিরীহ জানবরগুলোকেই মারবে। পয়সা রুপাইয়া না মিলুক, দুটো দিন পেট ভরে মাংস তো খাওয়া যাবে। ঝড়ের বেগে টাঙ্গিটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বাগিয়ে ধরে ধর্মা। কিন্তু সন্তর্পণে পা টিপে টিপে জন্তুগুলোর দিকে এগুবার আগেই বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে একটা তীর ছুটে এসে একটা চলন্ত খরগোসকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। নিরীহ, শান্ত, তুলোর মতো নরম প্রাণীটা বার দুই ছটফট করেই স্থির হয়ে যায়।

ধর্মা চমকে ওঠে। তীরটা কে মারতে পারে? এটুকু ভাবতে যতটা সময় লাগে তার মধ্যেই দেখতে পায় বাকি খরগোস ক'টা বিজরি চমকের মতো ছুটে চলে যাচ্ছে। সে দৌড়ুবার জন্য পা বাড়ায় কিন্তু ক'পা যাওয়ার আগেই আরেকটা তীর ছুটন্ত একটা খরগোসকে বিঁধে ফেলে। অন্য খরগোসগুলোকে আর দেখা যায় না।

এমন অব্যর্থ নিশানা আগে আর চেখে পড়ে নি ধর্মার। ছুটন্ত জানবরকে বিঁধতে পারে, কে এই তীরন্দাজ? এদিকে সেদিকে তাকাতেই সে দেখতে পায়, একটা বিরাট সাগুয়ান গাছের আড়াল থেকে লোকটা বেরিয়ে আসছে। খইওড়া চামড়া, ফাটা পা, খাড়া খাড়া চুল, হলদেটে চোখ, পরনে নোংরা একটা টেনি। বয়স চল্লিশ হতে পারে, পঞ্চাশ হতে পারে, পঞ্চান্নও হতে পারে। দেখেই টের পাওয়া যায়, সে আদিবাসী মুণ্ডা। মুণ্ডাটার সাবা গায়ে দুর্ভিক্ষের ছাপ মারা।

এই মুণ্ডাটাকে আগে আর কখনও দেখি নি ধর্মা। এমন কি দুপুরের আগে আগে যে আদিবাসীদের জঙ্গলের মুখে সে রেখে এসেছে তাদের মধ্যেও এই লোকটা ছিল না। তা হলে এ এল কোত্থেকে?

মুণ্ডাটা তীরবেঁধা তার দুই রক্তাক্ত শিকারের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ধর্মাকে দেখে থেমে যায়। এই জঙ্গলে দু'নম্বর শিকারিকে সে খুব সম্ভব আশা করে নি।

ধর্মাই পায়ে পায়ে মুণ্ডাটার দিকে এগিয়ে যায়। এখানে আর কেউ আসুক, সেটা সে চায় না। ভুরু কুঁচকে বেজায় বিরক্ত গলায় সে শুধোয়, 'কে তুই?'

লোকটা বলে, 'রুখিয়া মুণ্ডা।'

'তোকে তো আগে দেখি নি।'

'আমি এখানকার লোক না।'

'কোথাকার?'

রুখিয়া পশ্চিম দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়, 'ওইখানে, দশ মিল পছিমে।'

ধর্মা বলে, 'এখানে এসেছিস কী করতে?'

খরগোস দুটোকে দেখিয়ে রুখিয়া বলে, 'কী করতে এসেছি তা তো দেখতেই পাচ্ছিস।'

'খেরাহা দুটো মারলি কেন?'

'কী করি, তিন রোজ বালবাচ্চা ভুখা রয়েছে। আমাদের ওদিকে পেটে দেওয়ার মতো দানা নেই। কামের খোঁজে বেরুলাম, কাম নেই। ভিখ মাঙতে বেরুলাম, ভিখ নেই। একজনের কাছে শুনলাম, এখানকার জঙ্গলে জানবর আছে, সুথনি আছে, মিট্টি আলু আছে। দিনের আলো ফুটতে না ফুটতে তীরধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।'

দক্ষিণ থেকে এসেছে সকালের সেই আদিবাসীবা, পশ্চিম থেকে এসেছে রুখিয়া। হয়ত দু-চারদিনের মধ্যে আরো অনেকে এসে পড়বে। দেখা যাচ্ছে, এই জঙ্গলের অনেক দাবিদার।

প্রাণে বাঁচতে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারদিক থেকে মানুষ ছুটে আসছে। এতকাল এই গভীব জঙ্গল ছিল ধর্মার একান্ত নিজস্ব। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে একে নিয়ে কাড়াকাড়ি ভাগাভাগি শুরু হয়ে যাবে, এটা জানা সত্ত্বেও রুখিয়ার ওপর তেমন খেপে উঠতে পারে না সে। উলটে কিছুটা সহানুভূতিই বোধ করে; আহা, ভুখা নাঙ্গা আদমী! সে বলে, 'ওই খেরাহা দুটোকে মারবার জন্য আমি তাক করেছিলাম। তার আগেই তুই তীর বেঁধালি।'

রুখিয়া কী ভেবে বলে, 'ঠিক হ্যায়। তুই একটা খেরাহা নে, আমি একটা নিই।'

এই ভাগ বাটোয়ারা খাবাপ লাগে না ধর্মার। কিছু না বলে সে ঘাড় হেলিয়ে দেয়। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় তার পুরোপুরি সায় আছে।

রুখিয়া মরা খরগোস দুটোর গা থেকে ধারাল তীরের ফলা বার করে ফেলে। একটু পর দেখা যায়, দু'জনে দুটো মৃত প্রাণী হাতে ঝুলিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে কোয়েলের শুকনো খাতে ধু ধু বালির চড়ায় এসে দাঁড়ায়।

জায়গাটা এখন একেবারে ফাঁকা, জনশূন্য। দোসাদটোলার খারিজ লোকজন আর দক্ষিণ থেকে আসা সেই আদিবাসীরা কেউ নেই। জঙ্গলের সামনের দিক থেকে কচু, কন্দ, মহুয়ার গোটা যোগাড় করে কখন চলে গেছে, কে জানে।

সূর্যটা এখন আরো হেলে গেছে। পশ্চিমের আকাশ গনগনে লাল, ফিনকি দিয়ে সেখানে রক্ত ছুটছে। বেলা পড়ে এলেও রোদের তাত কিন্তু এখনও কমেনি। বালি যেন মাইলের পর মাইল জুড়ে আগুনের দানা হয়ে আছে। পা ফেললেই মনে হচ্ছে ফোস্কা পড়ে যাবে। তবে হাওয়া আছে প্রচুর, সেটুকুই যা বাঁচোয়া।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ধর্মা বলে, 'তুহারকা নিশানা বহোত আচ্ছা। ছুটন্ত খেরাহার গায়ে তীর বেঁধালি। এরকম বেঁধাতে আমি আগে আর কাউকে দেখিনি।'

রুখিয়া বলে, 'উড়াল পঞ্ছীকেও আমি তীর মেরে আকাশ থেকে নামাতে পারি।'

ধর্মা অবাক হয়ে যায়, 'হাঁ!'

'হাঁ রে। নিজের আঁখে দেখতে চাস?'

ধর্মা কী উত্তর দেবে বুঝতে পারে না।

রুখিয়া এবার জানায় এখন থেকে প্রায় রোজই সে এই জঙ্গলে আসবে। ধর্মাও যদি আসে তীর বিঁধিয়ে তাকে আকাশ থেকে উড়ন্ত পাখি নামিয়ে দেখাবে।

ধর্মা আর কিছু বলে না। রুখিয়ার পাশাপাশি বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে সে। রুখিয়ার তীরন্দাজি এতক্ষণ তাকে যেন যাদু করে রেখেছিল। ওদিকে টিরকে এসেছে কিনা কে জানে। সূরয ডোবার আগেই খেতিতে পৌঁছে যাওয়া চাই তার। সে লম্বা লম্বা পা ফেলতে শুরু করে। দেখাদেখি রুখিয়াও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দেয়। একসময় সে বলে, 'তোদের এদিকে আজই পয়লা এলাম।'

অন্যমনস্কর মতো উত্তর দেয় ধর্মা, 'হাঁ।'

'ওই জঙ্গলটায় অনেক জানবার আর পঞ্ছী আছে —না?'

'হাঁ।'

'বরা?'

'হাঁ।'

'হীরণ?'

'হাঁ।'

'কোটরা?'

'হাঁ।'

'তেতর?'

'ও ভী—'

'হরমদেওর কিরপা। বালবাচ্চা তা হলে ভুখা মরবে না।'

ধর্মা উত্তর দেয় না।

রুখিয়া থামে নি। সে বলতে থাকে, 'কাল থেকে রোজ তোদের এই জঙ্গলে আসব।'

এই কথাটা আগেও একবার জানিয়েছে রুখিয়া। ধর্মা এবারও জবাব দেয় না। হাঁটার গতিটা শুধু আরো বাড়িয়ে দেয়।

সেই সাবুই ঘাসের ঝাড়গুলো পেরিয়ে রশি খানেক যাবার পর রুখিয়া বলে, 'আমি এবার বাঁয়ে যাব।'

ধর্মা ঘাড় কাত করে, 'ঠিক হ্যায়।'

'জঙ্গলে তুই রোজ আসিস?'

'নায়। কভী কভী।'

'এলে দেখা হবে।'

রুখিয়া মুণ্ডা হাতে খরগোস ঝুলিয়ে কোয়েলের মরা খাতের বালি পেরিয়ে বাঁ দিকের উঁচু পাড়ে ওঠে। তারপর বড় বড় পা ফেলে খাড়া পশ্চিমে হাঁটতে থাকে। তার কাঁধে তীরের শানানো ফলাগুলো শেষবেলার রোদে অনবরত ঝলকাতে থাকে। একসময় গাছপালা এবং একটা মাঝারি টিলার আড়ালে সে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে, সূর্যটা একসময় সেখানে আধাআধি ডুবে যায়। বাকি অর্ধেক ওপরে মাথা তুলে থাকে। ঠিক সেই সময় ধর্মা এসে পাক্কীতে ওঠে। দেখে বাস 'ইস্ট্যান্ডে' পিপর গাছের তলায় টিরকে দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মাকে দেখে সে কাছে এগিয়ে আসে এবং তার হাতে ঝুলন্ত খরগোসটা দেখে বলে, 'ইয়ে ক্যা! তোকে জ্যান্ত কোটরার বাচ্চার 'অডার' দিলাম। আর তুই নিয়ে এলি কিনা মুর্দা খেরাহা!'

ধর্মা বলে, 'খেরাহা তোর জন্যে না।' একটু থেমে শুধোয়, 'রাঁচী থেকে কখন এসেছিস?'

'দুপহরমে। এখন সূরয ডুবতে চলল। খেতিতে যেতে কুশী বলল তুই জঙ্গলে গেছিস। জঙ্গল থেকে এখান দিয়ে তো লৌটতে হবে। তাই দাঁড়িয়ে আছি। সোচলাম, কোটরা জরুর পেয়ে যাবি। তার বদলে কিনা মরা খেরাহা!'

'বহোত চেষ্টা কিয়া, কোটরা নায় মিলা। কা করে?'

একটু ভেবে টিরকে বলে, 'আমরিকি সাব আজ রাতে চলে যাবে। ফির আসবে এক মাহিনা বাদ। তখন কোটরা জুটিয়ে দিতে পারবি?'

ধর্মার উৎসাহকে উস্কে দেবার জন্য হাফ প্যান্টের পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করে দিতে দিতে টিরকে বলে, 'এই নে। পুরাটাই 'ইডভান্স' করে দিলাম।'

টিরকের কথা শেষ হতে না হতেই রাঁচীর বাস এসে যায়। লাফিয়ে উঠতে উঠতে সে বলে, 'আমি আজ চলি। কোটরার কথা ভুলে যাস না।'

'নায় নায়।' হাতে একমাস সময় পেয়ে ধর্মা খুশিই হয়েছে। কোটরার বাবদে বিশটা টাকার আশা সে ছেড়েই দিয়েছিল। আচমকা অপ্রত্যাশিত সেই টাকাটা পেয়ে তার উৎসাহ উদ্দীপনা দশগুণ বেড়ে গেছে। এর ভিতর কোটরার বাচ্চা সে যোগাড় করে ফেলবেই।

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই রাঁচীর বাস ছেড়ে দেয়। টাকাটা প্যান্টের কোমরে যেখানে দড়ি ঢোকানো থাকে সেই ফোকরে পুরতে পুরতে সোজা হাইওয়ে বরাবর পুব দিকে হাঁটতে থাকে ধর্মা। খানিকটা যাওয়ার পর তার চোখে পড়ে, সকালবেলার সেই আদিবাসীগুলো সড়কের ধারের পড়তি জমিতে চুল্‌হা ধরিয়ে রান্না চড়িয়েছে। জঙ্গল থেকে শাকপাতা মহুয়ার ফল যা যোগাড করেছিল, খুব সম্ভব সে সব সেদ্ধ করে নিচ্ছে। তাদের মধ্যে সেই বুড়ো ওরাওঁটাকেও দেখা যায়। ধর্মা চেঁচিয়ে বলে, 'তোরা এখানেই থেকে যাবি নাকি?'

বুড়ো ওরাওঁ বলে, 'যদ্দিন মৌয়ার ফল আর শাকপাতা মিলবে তদ্দিন থেকে যাব।'

ধর্মা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই চিৎকার শোনা গেল।

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো।

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো'।

সেই চেনা জিপ গাড়িটা হাইওয়েতে লাল ধুলো উড়িয়ে রঘুনাথ সিংয়ের বাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। অর্থাৎ চুনাওর পরব সমানে চলছে।

সামনের বাঁকে জীপটা অদৃশ্য হওয়ার পর কোনাকুনি শস্যের খেতগুলোর দিক তাকায় ধর্মা। না,

কেউ নেই ওখানে। ফসলের বিশাল মাঠ এখন একেবারে জনশূন্য। সারাদিন কাজের পর দোসাদটোলার খরিদী কিষানরা হাল-বয়েল নিয়ে ফিরে গেছে।

ধর্মা আর দাঁড়ায় না, হাইওয়ে ধরে এগিয়ে যেতে থাকে।

ষোল

আকাশের কোথাও সূর্যটাকে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। চরাচরে মুহ্ আন্ধেরা অর্থাৎ সন্ধে নেমে এসেছে।

ধর্মা ডাইনে-বাঁয়ে কোনো দিকে না গিয়ে সিধা দোসাদটোলায় ফিরে এল। এর মধ্যে জমির কাজ চুকিয়ে হাল-বয়েল রঘুনাথ সিংয়ের খামার বাড়িতে জমা দিয়ে ভূমিদাসেরা ফিরে এসেছে। ঘরে ঘরে মিট্টি তেলের ডিবিয়া জ্বলে উঠেছে।

নিজেদের ঘরে এসে ধর্মা খরগোসটা বারান্দায় রাখতেই তার মায়ের চোখ চকচকিয়ে উঠল। খুশিতে প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে সে, 'খেরাহা মেরে এনেছিস!'

'হাঁ, জঙ্গলমে মিলা।' বলে ঘাড় গুঁজে সুড়ঙ্গের মতো ছোট দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল ধর্মা। টাঙ্গিটা জায়গামতো রেখে আবার বারান্দায় ফিরে এল। লক্ষ করল, বাপ শিউলাল কোথাও নেই। এমনটা ক্কচিৎ কখনও হয় কিনা সন্দেহ। সারাক্ষণ মা আর বাপ কাছাকাছিই থাকে। যখন খাদ্য আর জলের জন্য যায়, একসঙ্গেই যায়। ঘরে এসে চুল্হা ধরিয়ে মা রসুই করতে বসলে বাপ বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে থাকে। আজই শুধু ব্যতিক্রম। ধর্মা শুধোয়, 'বাপু কঁহা?'

হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায় ধর্মার মায়ের। সে ব্যস্তভাবে জানায় গণেরির ঘরের সামনে দোসাদটোলার পুরষেরা গিয়ে জমা হয়েছে। গণেরি বলে গেছে, ধর্মা এলেই যেন তাকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ধর্মা শুধোয়, 'কায়?'

তার মা বলে, 'মালুম নেহী। যা, তুরন্ত চলা যা—'

ধর্মার গলার আওয়াজ পেয়ে পাশের ঘর থেকে কুশী বেরিয়ে আসে। খরগোস দেখে সে-ও রীতিমত উত্তেজিত এবং খুশি হয়। কেননা মাংসের ভাগ তারাও পাবে। দু ঘরে যারই ভাল রান্নাবান্না হয় আরেক ঘর তার ভাগ পায়।

খরগোসটা কী করে পেল, সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে কুশী বলে, 'টিরকে এসেছিল।'

ধর্মা জানায়, 'দেখা হয়েছে।'

'কোটরার বাচ্চা দিয়েছিস?'

'মিলা নেহী।'

কথা বলতে বলতে ঘরের দাওয়া থেকে নিচে নামে ধর্মা।

কুশী বলে, 'জঙ্গলে বেফায়দাই গেলি।'

'হাঁ। একটা রোজ বরবাদ।' বলে গণেরির ঘরের দিকে পা বাড়ায় ধর্মা। পেছন থেকে কুশী বলে, 'বগুলা ভকত খেতিতে গিয়েছিল। তুহারকা বাত পুছা।'

'কী বলেছিস তাকে?'

'তুহারকে বুখার হুয়া।'

'বগুলা ভকত কী বলল?'

'কুছ নায়।'

ধর্মা চলার গতি বাড়িয়ে দেয় এবং দোসাদটোলার মাঝামাঝি গণেরির ঘরের কাছে এসে পড়ে।

গণেরির ঘরের সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে গোল হয়ে বসে আছে দোসাদটোলার তাবৎ পুরুষেরা। মধ্যিখানে একটা কেরোসিনের মশাল জ্বলছে। ভিড়ের মধ্যে রঘুনাথ সিংয়ের খরিদী

ভূমিদাসরা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে খারিজ হয়ে যাওয়া মানুষগুলো। তা ছাড়া মাঙ্গীলাল ফাগুরামের মতো স্বাধীন মানুষও রয়েছে। জটলার একধারে রুক্ষ এবড়ো খেবড়ো পাথরে-কাটা মূর্তির মতো বসে আছে গণেরি। সে এই দোসাদ সমাজেব মাতব্বর। হাওয়ায় মশালটা অল্প অল্প কাঁপছিল। তার আলো সবার মুখের ওপর দুলে দুলে যাচ্ছে।

গণেরিই প্রথম ধর্মাকে দেখতে পায়। সে ডাকে, 'আয় ধম্মা, বেঠ ইঁহা—' নিজের পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দেয় সে।

বসতে বসতে ধর্মা শুধোয়, 'কা হুয়া? ডেকেছ কেন গণেরিচাচা?'

'জরুরি কথা আছে।'

'কী?'

কেশে গলাটা সাফ করে নেয় গণেরি। তারপর গম্ভীর মুখে শুরু করে, 'এই সাল বহোত খতরনাক খরা চলছে। এমন খরা বিশ-পঁচাশ সালের মধ্যে কেউ কখনও দেখে নি। রওদের তেজে খেতি জমি ফেটে গেছে, নদী শুকিয়ে সিরেফ বালি; নায় পীনেকো পানি, নায় খানেকো দানা। আমাদেব দোসাদটোলায যারা বড়ে সবকারেব খেতিতে মিট্টি চষতে যায় না, এই শুখায় এক দোঠো মাহিনা তাদের ভরোসা হল জঙ্গলের মৌয়া ফল। লেকেন এহী সাল পাইসাবালা বড়ে আদমীদের লোকেরা এসে গাই বকরাদের খিলাবার জন্যে সেই ফল নিয়ে যাচ্ছে। এমন কি বড়ে সরকারের গাই-বকরি চরানিরাও এদের মধ্যে আছে। রোজ যদি এভাবে মৌয়া নিয়ে যায় আমাদের মতো গরিব বাঁচবে না।' একদমে কথাগুলো বলে একটু থামে গণেরি।

ধর্মা বুঝতে পারে দোসাদটোলার খারিজ মানুষগুলো গণেরির কাছে গাই-বকরি চরানিদের মহুয়া নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে। সেই কারণেই আজ এই জরুরি 'মিটিন'। 'মিটিন' শব্দটা চুনাওর দৌলতে এ অঞ্চলের ছেলেবুড়ো, মেয়ে পুরুষ, জলচল, অচ্ছুৎ, সকলেরই জানা। ভোটের বাবুরা দো-চার সাল বাদে বাদে এখানে 'মিটিন' বসায়।

ধর্মা বলে, 'হামনি আজ নিজের আঁখে দেখছি গাই-বকরি চরানিরা মৌয়া নিয়ে যাচ্ছে। লেকেন এ 'মিটিন' কিসের জন্যে?'

গণেরি বলে, 'তুই আসার আগে আমরা ঠিক করেছি সবাই বড়ে সরকারের কাছে যাব।'

'কায়?'

'জানবরদের জন্যে মৌয়া নেওয়াটা রুখতেই হবে। বড়ে সরকারের পা ধরে বলব, গরিবের মা-বাপ, আপনি আমাদের বাঁচান।'

ভিড়ের ভেতর থেকে নাথু বলে ওঠে, 'মালিক কি শুনবে? তারও তো কত ভৈস, গৈয়া, বকরি—'

গণেরি বলে, 'শুনবে রে নাথুয়া, জরুর শুনবে। এহী সাল আমাদের কথা বড়ে সরকারকে শুনতেই হবে।'

ধর্মা অবাক হয়ে যায়, 'কায়?'

'এহী সাল চুনাও। আমাদের বোট পেতে হবে না মালিককে?'

ধর্মা এবং জটলার প্রতিটি মানুষ অভিজ্ঞ বহুদর্শী গণেরির কথায় চমৎকৃত হয়ে যায়। ঠিকই বলেছে গণেরি। এই ভোটের সময়টা রঘুনাথ সিং নিশ্চয়ই তাদের খুশি রাখবেন। নিজের হাতে তাদের মতো অচ্ছুৎ জনমদাসদের দামি উৎকৃষ্ট ভয়সা ঘিয়ের লাড্ডু যখন বেঁটে দিয়েছেন তখন মহুয়া ফলেব আর্জিটাও মঞ্জুর করে দেবেন। আর তিনি বললে গারুদিয়া-বিজুরির অন্য পয়সাওলা আদমীরাও মহুযার ফলের জন্য জঙ্গলে লোক পাঠাবে না। চারদিকে এত নজর আছে বলেই না গণেরি তাদের মাতব্বর।

গণেরি ফের বলে, 'আজ এখনই আমরা বড়ে সরকারের কোঠিতে যাব। তা হলে কাল থেকে গাই-বকরি চরানিদের জঙ্গলে যাওয়া রোখা যাবে।'

গণেরির কথায় কেউ কখনও 'না' বলে না। তা ছাড়া মহুয়া ফলের সঙ্গে দোসাদদের বাঁচা মরার ব্যাপার জড়িয়ে আছে। সবাই যখন উঠতে যাবে সেই সময দূর থেকে রামলছমনেব গলা শোনা গেল, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। হা রে ফাগুরাম—ফাগুরাম হো, টোলাতে আছিস?'

কখনও কোনো কারণেই রঘুনাথ সিং বা তাঁর পা-চাটা কুত্তারা ফাগুরামের খোঁজ করে না। তার বাপ ভিগুরাম ছিল এক পুরুষের বেগার দেওয়া কিষান। ভিগুরাম মরল, সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেরও মুক্তি ঘটে গেল। বিশ তিরিশ সালের ভেতর রঘুনাথ সিংদের তরফ থেকে কেউ এসে তাকে ডাকে নি। ফাগুরাম নামে যে একটা আদমী দোসাদটোলায় আছে, ভাবগতিক দেখে মনে হয়েছে, রঘুনাথ সিংরা সে খবরও রাখেন না। কিন্তু হঠাৎ এই রাত্রিবেলায় উচ্চবর্ণের বামহন রামলছমনকে তারই খোঁজে অচ্ছুৎদের পাড়ায় ঢুকতে দেখে সবাই হতবাক হয়ে যায়। ফাগুরাম ভয়ে ভয়ে সাড়া দেয়, 'হাঁ হুজৌর—' বলেই উঠে দাঁড়ায়। তার ভয়ের কারণটা এইরকম। নিজের অজান্তে সে কোনো অপরাধ করে ফেলেছে কিনা, কে জানে। হয়ত সেই জন্যই এই তলব।

এর মধ্যে জটলাটার কাছে এসে পড়ে রামলছমন। ফাগুরামের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার সঙ্গে তোকে যেতে হবে ফাগুয়া—'

'কঁহা হুজৌর?' দম-আটকানো গলায় জানতে চায় ফাগুরাম।

'বড়ে সরকারকে হাভেলিমে। মালিক তোকে নিয়ে যেতে বলেছেন। চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। চল, জলদি কর—'

বড়ে সরকারের নাম শুনেই ফাগুরামের দুই পা বেজায় কাঁপতে শুরু করে। দাঁতে দাঁতে লেগে যায় যেন। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে প্রাণপণে, গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না।

গণেরি এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। ভীত মুখে শুধোয়, 'কুছ কসুর হুয়া ফাগুয়াকা হুজৌর?'

রামলছমন বলে, 'নেহী নেহী। চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। বড়ে সরকার যানে বোলা, ব্যস। এর বেশি আমি কিছু জানি না। চল ফাগোয়া, চল—'

রঘুনাথ সিংয়ের নামে দাঁতে দাঁত লেগে গিয়েছিল ফাগুরামের। এবার শরীরের হাড্ডি আলগা হয়ে যাওয়ার উপক্রম। সে গণেরির একটা হাত ধরে চাপা ভয়ার্ত গলায় বলে, 'ভেইয়া, তোমরাও হামনিকো সাথ চল—' অর্থাৎ একা একা যেতে তার সাহস হচ্ছে না।

গণেরি বলে, 'আমাদের তো মৌয়া ফলের জন্যে বড়ে সরকারের কাছে যেতেই হবে।' জটলাটার দিকে চোখ বুলিয়ে তাড়া লাগায়, 'উঠে পড় সবাই—'

রামলছমন বলে, 'কা রে, পুরা দোসাদটোলা ফাগোয়ার সাথ যাবি নাকি?'

গণেরি জানায়, তারা আগে থেকেই বড়ে সরকারের হাভেলিতে যাওয়া ঠিক করে রেখেছে।

রামলছমন আর কোনো প্রশ্ন করে না। শুধু বলে, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। আর দেরি করিস না।' বলেই পা বাড়িয়ে দেয়।

রামলছমনের পেছনে পেছনে হেঁটে দোসাদটোলার অচ্ছুতেরা যখন রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলিতে পৌঁছয় তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

বাড়ির বিশাল কমপাউন্ডে চার পাঁচটা বিজলি বাতি জ্বলছে। বাতিগুলোর এত তেজ যে একটা 'সূই' পর্যন্ত মাটি থেকে কুড়িয়ে নেওয়া যায়।

রঘুনাথ সিং চৌকো চৌকো পাথর-বসানো বারান্দায় তাঁর নির্দিষ্ট ইজি চেয়ারটিতে আধশোয়ার মতো করে পড়ে আছেন। তাঁর তিন পা-চাটা কুত্তা—ডাগদরসাব ভকিলসাব আর মুনশি আজীবচাঁদ কাছাকাছিই রয়েছে।

আচমকা রামলছমনের সঙ্গে দোসাদটোলার এতগুলো লোককে দেখে একটু অবাকই হন রঘুনাথ সিং। ভুরু টান করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসে রামলছমনকে বলেন, 'তোমাকে বললাম ফাগুরামকে ডেকে আনতে। আর তুমি পুরা দোসাদটোলাটাকেই তুলে আনলে! বুদ্ধু, নালায়েক।'

রামলছমন ভয়ে ভয়ে বলে, 'চলে বনবাস রামসীয়া জানকীয়া। আমি তো একা ফাগোয়াকে নিয়েই আসছিলাম। লেকেন ওরাও চলে এল। আপনার সাথ কী জরুরি বাত আছে।'

রঘুনাথ সিং গণেরিদের দিকে তাকিয়ে শুধোন, 'কা বাত রে গণেরি?'

দোসাদটোলার তাবৎ মানুষ হাত জোড় করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রঘুনাথ সিংকে সম্মান জানায়। তারপর সবার প্রতিনিধি হিসেবে গণেরি খানিকটা এগিয়ে যায় এবং জোড়হাতেই মহুয়া ফল সম্পর্কে তার আর্জি পেশ করে।

সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন রঘুনাথ সিং। কী ভেবে অন্যমনস্কের মতো বলেন, 'ঠিক হ্যায়। গাই-বকরি চরানিরা মহুয়া আনতে যাবে না।'

দোসাদরা চমৎকৃত হয়ে যায়। গণেরি ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও তাদের ভয় এবং সংশয় ছিল, মহুয়ার ব্যাপারে তাদের আর্জি বিলকুল না-মঞ্জুর হবে। কিন্তু উলটোটাই ঘটল। সত্যিই দুরদর্শী মানুষ গণেরি, মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে তার জ্ঞান অঢেল। এই না হলে মাতব্বর! তার সম্বন্ধে গোটা দোসাদটোলার শ্রদ্ধা হঠাৎ দশগুণ বেড়ে যায়।

এই সময় গণেরির আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। সুযোগ বুঝে সে বলে, 'হুজৌর আউর একগো বাত—'

'কী?'

'আমাদের কুয়াটা বিশ সাল কাটাই হয় নি, বালিতে বুজে এসেছে। পানিকা বহোত তখলিফ। হুজৌরের যদি ওটা কাটাবার হুকুম হয়—'

'ঠিক হ্যায়। হিমগিরিকে আমি বলে দেব।'

মহুয়ার ব্যাপারে গণেরির ওপর দোসাদদের যে শ্রদ্ধা দশগুণ বেড়েছিল, এক লাফে সেটা আরো বিশ-পঁচিশ গুণ বেড়ে যায়।

চুনাওর সময় কাউকে চটাবেন না রঘুনাথ সিং, যে যা চাইবে কল্পতরু হয়ে তা বিতরণ করবেন। এটা বুঝে সুযোগটাকে পুরো কাজে লাগিয়েছে গণেরি। দোসাদটোলার কিসে হিত কিসে সুখ, সর্বক্ষণ এই সবই চিন্তা করে সে। এই জন্যই তো দোসাদরা তাকে মাথায় করে রেখেছে।

ওদিকে রঘুনাথ সিংয়ের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুনশি আজীবর্চাদ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চিৎকার করে এক কাণ্ডই বাধিয়ে দেয়, 'এ দোসাদিয়া, মালিককো কিরপাসে মৌয়া পেলি, কুয়ার বালুকাটাই মঞ্জুর হল। রামরাজ আ গিয়া রে, রামরাজ আ গিয়া—'

কানের কাছে অনবরত এ জাতীয় ফেনানো চাটুকারিতা ভালই লাগে। তবু চোখেমুখে নকল বিরক্তি ফুটিয়ে রঘুনাথ সিং বলেন, 'আ আজীবচাঁদ, চুপ হো বাবা—।'

মালিকের কোন কথায় থামতে হয়, কোন কথা এক কানে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বার করে দিতে হয়, সে তালিম পুরোপুরিই পেয়ে গেছে আজীবর্চাদ। গলার স্বর আরো তিন পর্দা চড়িয়ে সে চেঁচিয়ে যায়, 'রামরাজ আ গিয়া রে, আ গিয়া রামরাজ—'

নিতান্তই হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো ভাব করে রঘুনাথ সিং বলেন, 'হারামজাদাটাকে নিয়ে আর পারা যায় না।' বলেই গণেরির দিকে ফেরেন, 'সব মঞ্জুর করে দিলাম। এবার তোরা যা। শুধু ফাগোয়া থাক। ওর সঙ্গে দরকার আছে।'

জোড়হাতে নুয়ে পড়তে পড়তে গণেরি বলে, 'হুজুরের হুকুম হো যায় তো—'

'কী?'

'আমরা থেকে যাই। ফাগোয়ার কাম হয়ে গেলে একসাথ টোলায় লৌটব। অব হুজৌরকা কিরপা—'

'ঠিক আছে। তোরা ওখানে গিয়ে বোস। ফাগোয়া খালি এখানে থাক।' রঘুনাথ সিং কমপাউন্ডের শেষ মাথায় ওয়েলার ঘোড়ার আস্তাবলের সামনেটা গণেরিদের দেখিয়ে দেন।

ফাগুরাম বারান্দার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে। আর গণেরিরা দূরে গিয়ে ঘাসের জমিতে বসে পড়ে।

রঘুনাথ সিং এবার ফাগুরামের দিকে তাকান। স্নেহের আরকে গলা ভিজিয়ে বলেন, 'তোর কথা সবার কাছে শুনি; আগে নৌটঙ্কীর দলে ছিলি?'

রামলছমন দোসাদটোলায় গিয়ে রঘুনাথ সিংয়ের এত্তেলা দেওয়ার পর থেকে সেই যে হাঁটু কাঁপতে শুরু করেছিল ফাগুরামের, এখানে আসার পরও সেটা থামে নি। তবে রঘুনাথ সিংয়ের গলার নরম

স্বর তাকে খানিকটা সাহস যোগায় যেন। ফাগুরাম বলে, 'হাঁ হুজৌর।'

'সবাই বলে তোর গলা নাকি বহোত মিঠি, যাদু-ভরি। তোর গান শুনলে লোকে ভুলতে পারে না। লেকেন—'

বড়ে সরকারের প্রশংসার কথায় ঘাড় নুয়ে যায় ফাগুরামের। সে কিছু বলে না। রঘুনাথ সিং ফের বলেন, 'নৌটঙ্কীর দলে থাকতে তোর নাম হয়েছিল গারুদিয়াকা কোয়েল—না রে?'

মুখ না তুলে মাথা নাড়ে ফাগুরাম। আবছা গলায় বলে, 'জি হুজৌর। মানুষজন পেয়ার করে ওই নাম দিয়েছিল।'

'নৌটঙ্কীর দলে এখন তো আর তুই নেই?'

'নায় হুজৌর। তিন সাল দল ছেড়ে দিয়েছি।'

'বুকের দোষ হয়েছিল বলে?'

'জি হুজৌর।'

'এখন টিসনের কাছে বসে গান গেয়ে পাইসা কামাই করিস?'

ফাগুরাম অবাক হয়ে যায়। তার মতো নগণ্য পোকার চাইতেও অধম একটা লোক সম্পর্কে রঘুনাথ সিংয়ের মতো বড় আদমী কী করে এত খবর যোগাড় করেছেন, তিনিই জানেন। সে বলে, 'জি হুজৌর।'

একটু চুপচাপ। তারপর রঘুনাথ সিং বলেন, 'শুনেছি তুই নাকি গান বাঁধতে পারিস।'

লাজুক মুখে ফাগুরাম বলে, 'হুজৌরকা কিরপা। নৌটঙ্কীর দলে থাকতে গান বাঁধতে হত।'

'বহোত আচ্ছা। শোন, কাল থেকে তোকে আর টিসনে গান গেয়ে ভিখ মাঙতে হবে না।'

মুখ তুলে দু চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকায় ফাগুরাম, 'হুজৌব ভিখ না মাঙলে খাব কী? ভুখা মর যায়েগা বড়ে সরকার।'

'ভুখা তোকে মরতে হবে না। এখন থেকে তোর পেটের ভার আমার।'

'হুজৌরকা কিরপা।'

রঘুনাথ সিং একটু ভেবে বলেন, 'তোকে শুধু একটা কাজ করতে হবে।'

বিনা কাজে নিতান্ত দয়াপরবশ এত সাল বাদে খোঁজখবর করে তার যাবতীয় দায়দায়িত্ব কাঁধে নেবেন, এতটা মহানুভব নিশ্চয়ই রঘুনাথ সিং নন। ফাগুরাম তাঁর আদেশের জন্য দম-আটকানো মানুষের মতো অপেক্ষা করতে থাকে।

রঘুনাথ সিং বলেন, 'চুনাও হচ্ছে, সে খবর জানিস?'

'জানি হুজৌর।' ফাগুরাম ঘাড় হেলিয়ে দেয়।

'আমি এবার পয়লা চুনাওতে নেমেছি। আমি ছাড়া আছে আরো পাঁচজন। সুখন রবিদাস, প্রতিভা সহায়, নেকীরাম শর্মা, আবু মালেক, আর পাঁচ নম্বর যে আছে তাকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।' রঘুনাথ না থেমে সমানে বলে যেতে থাকেন, 'ওই চারজন আমার আঁখ থেকে নিদ ছুটিয়ে দিয়েছে। সুখন রবিদাস অচ্ছুৎ চামার। ও বিজুরি আর গারুদিয়া তালুকের জল-অচলদের ভোট টানতে চেষ্টা করবে। প্রতিভা সহায় পাটনাবালী, বহোত বড় ঘরকা বহু। ঝরিয়ার দিকে বিশটা আর রাঁচীতে দশ বারটা করখানার মালিক ওরা। প্রতিভাজি কায়াথদের ভোট টানবে। গারুদিয়া তালুকের নেকীরাম শর্মা বামহনদের ভোট কবজা করতে চাইবে। বিজুরি তালুকের মাস্টার আবু মালেক টানবে মুসলমান ভোট। কা রে ফাগোয়া, সমঝা?'

ফাগুরাম নৌটঙ্কীর দলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বহু ঘাটের জল খেয়েছে। মানুষ সম্পর্কে তার প্রচুর অভিজ্ঞতা। কেউ হাঁ করলে তার পেটের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পায়। ফাগুরাম বলে, 'সমঝ গিয়া হুজৌর—'

'কা সমঝা?'

'বামহন, কায়াথ, মুসলমান আর অচ্ছুতিয়াদের বোট যদি ওবা টানতে পারে চুনাওতে আপনি জিততে পারবেন না। বিলকুল সব চৌপট হয়ে যাবে।'

রঘুনাথ সিং খুশি হলেন। তারিফের গলায় বললেন, 'বুঝেছিস তা হলে। বহোত সমঝদার আদমী তুই। তোকে দিয়ে আমার কাজ হবে।'

ফাগুরাম বলে, 'আমাকে কী করতে হবে মালিক?'

রঘুনাথ সিং এবার যা বলেন তা এইরকম। তিনি নেকীরাম শর্মা, প্রতিভা সহায়, আবু মালেক আর সুখন রবিদাসের নানা গুপ্ত কেচ্ছা যোগাড় করে দেবেন। সেই সব মালমশলা দিয়ে ফাগুরামকে রসাল মজাদার গান বাঁধতে হবে এবং রঘুনাথ সিংয়ের লোকেরা যেখানে যেখানে তাঁর জন্য 'ক্যামপিন' করতে যাবে বা যেখানে যেখানে তাঁর 'ভোটকা মিটিং' হবে সেই সেই জায়গায় ফাগুরামকে ওই গানগুলো গাইতে হবে।

করণীয় ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিয়ে রঘুনাথ সিং জিজ্ঞেস করেন, 'পারবি তো?'

'আপহিকো কিরপায় পারব হুজৌর।'

'তবে কাল থেকে লেগে যা—'

'আপহিকো যো হুকুম। লেকেন বড়ে সরকার—'

'কী?'

'আমার হরমুনিয়াটা বিলকুল বরবাদ হয়ে গেছে। বড়ে সরকারকা ইজ্জতকা সওয়াল। ওটা নিয়ে চুনাওর গান গাইতে বেরুলে লোকে আমার গায়ে থুক দেবে। বলবে মালিকের চুনাওতে এই হরমুনিয়া বার করেছিস! মালিকের ইজ্জত চৌপট করে দিলি। তোর—'

রঘুনাথ সিং হাত তুলে ফাগুরামকে থামিয়ে দিলেন। তিনি ওর মতলবটা টের পেয়ে গেছেন। চুনাওর মওকায় একটা ভাল হারমোনিয়াম বাগিয়ে নিতে চাইছে। অতিশয় ঝানু এবং তুখোড় লোক ফাগুরাম। চুনাওর মতো রাজসূয় ব্যাপারে একটা হারমোনিয়াম অতি তুচ্ছ জিনিস। ফাগুরামকে ডাকিয়ে পাঠাবার আগেই তিনি ওটার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। বললেন, 'ঠিক হ্যায়। কালই নয়া হারমোনিয়াম পেয়ে যাবি।'

খুশিতে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল ফাগুরাম, 'হরিমুনিয়া হো গিয়া রে, মালিককা কিরপাসে হরমুনিয়া হো গিয়া—'

রঘুনাথ সিং একটু হাসলেন শুধু। তাঁর ঠিক পাশেই বসে ছিলেন বদ্রীবিশাল চৌবে। তিনি বলে উঠলেন, 'হারমোনিয়াম পেয়ে যাবি। গানা কিন্তু আচ্ছা হওয়া চাই—'

ফাগুরাম বলে, 'চিন্তা নায় করনা। এমন গানা বানাব যে পুরা গারুদিয়া আর বিজুরির সব আদমী মাতোয়ারা বন যায়েগা। ওহী চার আদমীর চুনাও যদি কাঁচাতে না পারি আমার নাম ফুগুরাম নৌটঙ্কীবালা নেহী।' বলে রঘুনাথ সিংয়ের দিকে তাকায়, 'বহোত রাত হয়ে গেল। হুজৌরকো হুকুম হো যায় তো হামনিলোগ ঘর লোটে—' বড়ে সরকারের মুখের ওপর ঘরে ফেরার কথা বলার সাহস অন্য দোসাদদের হত না। রঘুনাথ সিং যতক্ষণ মুখ ফুটে যাওয়ার কথা না বলতেন ওরা চুপচাপ বসেই থাকত। কিন্তু ফাগুরামের আদতই আলাদা। সে পরিপূর্ণ স্বাধীন মানুষ বলেই হয়ত বলতে পারল।

রঘুনাথ সিং বললেন, 'হাঁ, চলে যা।'

খানিকক্ষণ পর বড়ে সরকারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোসাদটোলায় ফিরতে ফিরতে গণেরি ফাগুরামকে বলে, 'আমার বড় চিন্তা হচ্ছে রে ফাগোয়া—'

একটা নতুন হারমোনিয়াম পাওয়ার খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে ছিল ফাগুরাম। মুখ ফিরিয়ে সে বলে, 'কা চিন্তা গণেরিচাচা?'

'প্রতিভাজি বড়ে ঘরকা বহু। বহোত রুপাইয়া ওদের, বহোত পহেলবানও ওদের পোষা। সুখন আমাদের মতোই অচ্ছুৎ। দুই তালুকের সব অচ্ছুৎই ওকে মানে। নেকীরামজি, আবু মালেক সাবের হাতেও রয়েছে অনেক লোক। বুঝে সমঝে গানা বাঁধবি, গাইবি।'

'ডরো মাত গণেরিচাচা। সব দিক আমি সামহাল দিয়ে নেব।'

'সামহাল দিতে পারলেই ভাল। তবু বার বার বলে দিচ্ছি, বহোত হোঁশিয়ার।'

'তোমার হোঁশিয়ারি আমার মনে থাকবে গণেরিচাচা—'

একসময় সবাই দোসাদটোলায় পৌঁছে যায়।

সতের

মহল্লায় ঢুকবার মুখে একটা ঝাঁকড়া-মাথা কড়াইয়া গাছ। দূর থেকেই ধর্মাদের চোখে পড়েছিল গাছটার তলায় ছইওলা বয়েলগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেটার পাটাতনের নিচে একটা লণ্ঠন ঝুলছে বলেই অনেক তফাত থেকে গাড়িটা নজরে পড়েছিল।

অবশ্য দোসাদটোলার যে কেউ চোখ বুজেও বলে দিতে পারত সন্ধের পর ওখানে একটা বয়েল গাড়ি ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। কেননা ক' বছর ধরে রাত একটু গাঢ় হলে গাড়িটা ওখানে এসে দাঁড়ায়। আজ বরং দেরিই হয়ে গেছে।

বয়েলগাড়িটা পাঠায় হিমগিরিনন্দন। দোসাদটোলার সবাই জানে সূরয ডুবে যাবার পর চান্দা উঠতে না উঠতেই সাজতে বসে নওরঙ্গী। তারপর রাত একটু গাঢ় হলে কড়াইয়া গাছের তলায় হিমগিরির বয়েল গাড়ি এসে দাঁড়ালেই সে সেটায় গিয়ে ওঠে। আর ওঠামাত্র গাড়িটা ক্যাঁচোর কোঁচর আওয়াজ তুলে খামারবাড়ির দিকে চলতে শুরু করে।

বড়ে সরকারের একজন উৎকৃষ্ট পা-চাটা কুকুরের রাখনি বলে দোসাদটোলার কেউ নওরঙ্গীর মুখের ওপর কিছু বলতে সাহস করে না। কিন্তু সবাই তাকে ঘেন্না করে, আড়ালে যা-তা বলে।

বয়েল গাড়িটার ছায়া মাড়ানোও যেন পাপ, এভাবে খানিকটা তফাত দিয়ে দোসাদটোলায় ঢুকতে থাকে ধর্মারা। যেতে যেতে চাপা হিংস্র গলায় কে যেন বলে ওঠে, 'রেণ্ডি ঔরত—'

বুধেরি বলে, 'সন্ধেবেলা গণাটাকে কী মারই না খাওয়াল! হারামী ছমকি কুত্তী—'

রঘুনাথ সিং আচমকা ফাগুরামকে ডেকে পাঠানোর জন্য দোসাদপাড়ায় যে ভয় এবং আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তার তলায় গণার বেধড়ক মারধরের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। বুধেরির কথায় আবার সেটা সবার মনে পড়ে যায়। গণেরি থুতু ফেলে বলে, 'সব ওই শাঁখরেলটার জন্যে।'

চাঁদের আলোয় দেখা যায়, দোসাদদের চোখগুলো জ্বলছে। নওরঙ্গী সম্পর্কে তাদের মনের গুহায়িত ঘৃণা এবং বিদ্বেষ আচমকা বহুগুণ বেড়ে যায়।

কেউ আর কোনো কথা বলে না, দাঁতে দাঁত চেপে একে একে দোসাদটোলায় ঢুকে পড়তে থাকে।

আরো কিছুক্ষণ বাদে গোটা মহল্লাটায় খাওয়া দাওয়া চুকে যায়। ঘরে ঘরে মিট্টিতেলের ডিবিয়াগুলো আর দেখা যায় না। সারাদিন 'গতর চূরণ' খাটুনির পর দোসাদরা বিছানায় শরীর ছেড়ে দিয়েছে।

ধর্মা কিন্তু শুয়ে পড়েনি। দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের ওপর দিয়ে তিন মাইল পথ ভেঙে সে জঙ্গলে গেছে, সারাদিন নিঝুম বনভূমিতে ঘুরে কোটরা হরিণের খোঁজ করেছে। তারপর আবার তিন মাইল ভেঙে ফিরে আসা, ফাগুরামের সঙ্গে বড়ে সরকারের কোঠিতে যাতায়াত — সব মিলিয়ে তার শরীরেও কিছু আর নেই। তবু একটা বিড়ি ধরিয়ে বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে সে। পহেলবানদের হাতে বেদম মার খাওয়ার পর গণার কী হাল হয়েছে দেখা দরকার। তার বচপনের দোস্ত গণা। গণার জন্য খুবই কষ্ট অনুভব করতে থাকে ধর্মা।

সে যে বসে বসে বিড়ি ফুঁকে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, তার কারণ একটাই। ধর্মা নজর রেখেছে এখনও নওরঙ্গী বয়েল গাড়িটায় গিয়ে ওঠেনি। রেণ্ডিটা কেন যে আজ এত দেরি করছে রামজি জানে। সে না যাওয়া পর্যন্ত গণাদের ঘরে যেতে সাহস হয় না ধর্মার। কেননা, আওরতটা যদি তাকে গণার কাছে যেতে দেখে, বলা যায় না এই নিয়ে হিমগিরির কাছে কী লাগিয়ে বসবে! মাঝখান থেকে তার জানটি চৌপট হয়ে যাবে। যতক্ষণ না নওরঙ্গী দোসাদটোলা ছেড়ে যাচ্ছে, একটার পর একটা বিড়ি ফুঁকে যাবে ধর্মা।

হাতের বিড়ির আগুন যখন সুতোর কাছাকাছি চলে এসেছে সেই সময় ঠুন ঠুন করে চাঁদির পৈড়ীব (মল) আওয়াজ কানে আসে ধর্মার। ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখে কুয়োর ওধার থেকে নওরঙ্গী আসছে। বুকের ভেতর অফুরন্ত ঘৃণা এবং বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও চাঁদের আলোয় মাঝবয়সী ডাঁটো চেহারার রাখনি আওরতটাকে পরীর মতো মনে হয় ধর্মার। সেজেছেও সে মারাত্মক।

কাছাকাছি এসে নওরঙ্গী থমকে দাঁড়িয়ে যায়। বলে, 'এখনও ঘুমোস নি?'

'নায়—' ধর্ম মাথা নাড়ে।

'জেগে আছিস কেন?'

'নিদ আসছে না।'

'শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে।' বলে আর দাঁড়ায় না নওরঙ্গী। রুপোর পৈড়ীতে ফের ঠুন ঠুন মিঠা আওয়াজ তুলে কড়াইয়া গাছের তলায় সেই বয়েল গাড়িটায় গিয়ে ওঠে।

একটু পর গাড়িটা ক্যাঁচর কোঁচর শব্দ করে চলতে থাকে। আর ধর্মা তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। তারপর এই নিশুতি রাতে দোসাদটোলার শেষ মাথায় গণাদের ঘরে এসে সে অবাক হয়ে যায়। একটা ডিবিয়া জ্বেলে সৌখী এবং গণা তাদের মালপত্র বাঁধাছাঁদা করছে। মালপত্র আর কি, কলাই-করা দু-চারটে বাটি, অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো দুটো থালা, পেতলের লোটা, কিছু হাঁড়িকুঁড়ি, সৌখীর দু-তিনটি ছেঁড়া ময়লা চিটচিটে কাপড়, ইত্যাদি।

এত রাতে ধর্মাকে দেখে গণারা চমকে যায়। তারপব গণাই ডাকে, 'আয়, ভেতরে আয় —'

ধর্মা শুধোয়, 'কা হুয়া? জিনিসপত্র বাঁধছিস যে?'

'চলা যায়েগা।'

'তোকে না বড়ে সরকারের পহেলবানেরা এত মারল!'

সৌখী ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমিও তো গণাকে কেত্তে বার বুঝিয়েছি। ওরা একবার তোকে মেরে গেছে। আবার যদি করজ না শুধে ভাগিস খতম করে দেবে।'

গণা রেগে যায়, 'এত সোজা না!' একটু থেমে বলে, 'তিন পুরুষ ধরে ওহী রাজপুতের খেতিতে আমরা বেগার দিয়ে গেছি। তাতেও কি করজের পানশ রুপাইয়া শোধ হয় নি? জান গেলেও আমি আর বেগার দেব না। কভী নেহী।'

ধর্মা হঠাৎ নিরানন্দ বোধ করে। সে যদি গণার মতো ওভাবে বলতে পারত! কিন্তু তার যে হাজারটা পিছুটান। বুড়ো মা-বাপ তো রয়েছেই, তার ওপব আছে কুশী এবং তার মা-বাপ। গণা অবশ্য বলেছে, তার জন্য ওদের কারখানায় একটা নৌকরি জুটিয়ে দেবে। কিন্তু ধর্মা ভীরু, দুর্বল। গণার মতো অত সাহস তার সিনায় নেই। পাঁচ পাঁচটি মানুষের দায়িত্ব নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঝাঁপ দিতে তার বুক কাঁপে।

গণা ফের বলে, 'তোরাও আব বেগার দিস না ধর্মা। আগেও তোকে বলেছি, এখনও ফের বলছি নৌকরি তোকে একটা জুটিয়ে দেবই। ওই হারামী রঘুনাথ রাজপুত আর তার পোষা কুত্তাদের মুখে তিন লাথ মেরে এখান থেকে ভেগে যা।'

এ জাতীয় কথা গণার মতো মুক্ত মানুষের মুখেই মানায়। ধর্মা বুঝতে পারে, যে একবার স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, তাকে আর কোনোভাবেই দোসাদটোলার এই ঘৃণ্য পরাধীন জীবনের সুড়ঙ্গে ঢোকানো যাবে না। ধর্মা বলে, 'তোর কথা আমার মনে থাকবে গণা।'

বাঁধাছাঁদা হয়ে গিয়েছিল। গণা শুধোয়, 'তুই তো ওদিক থেকে এলি। ওই রেণ্ডিটাকে দেখলি? জানবর আওরতটা এতক্ষণ ওর ঘরে বসে আমার ওপর নজর রাখছিল। এখন আর ওটার সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।'

জানবর আওরত আর রেণ্ডি যে কে, বুঝতে অসুবিধা হয় না ধর্মার। কেন যে নওরঙ্গী আজ এত দেরি করে হিমগিরির কাছে গেল তাও টের পাওয়া যায়। ধর্মা বলে, 'নওরঙ্গী এইমাত্র হিমগিরির বয়েল গাড়িতে উঠে চলে গেল।'

গণা বলে, 'আমারও মনে হল আওরতটা ঘরে নেই। তখন ডিবিয়া ধরিয়ে মায়ের বর্তন-উর্তন কাপড়া-উপড়া বাঁধতে বসেছি। ওটাকে একবার যদি ধানবাদ বাজারে পাই—' একটা মারাত্মক ইঙ্গিত দিয়ে সে থেমে যায়।

ধর্মা চুপ করে থাকে।

গণা ভারি ভারি মালগুলো ঘাড়ে এবং হাতে ঝুলিয়ে নেয়, সৌখীকেও ছোটখাট হালকা পুঁটলি-

পাঁটলা নিতে বলে। তারপর ফুঁ দিয়ে ডিবিয়াটা নিভিয়ে সেটা একটা ঝোলায় পুরতে পুরতে বলে, 'চলি রে ধম্মা—'

কাল বেধড়ক মারের জের এখনও কাটে নি। গণা ভাল করে হাঁটতে পারছিল না। কোনোরকমে পা টেনে টেনে সে এগিয়ে যেতে থাকে। তার পাশাপাশি ধর্মাও হাঁটে, পেছনে সৌখী।

একটু পর ধর্মাদের ঘর ছাড়িয়ে বাইরের রাস্তায় গিয়ে নামে গণা আর সৌখী। ধর্মা আর এগোয় না। ঘাড় ফিরিয়ে গণা আরেক বার বলে, 'যাই রে ধর্মা—'

ধর্মা ঘাড় হেলিয়ে দেয়, 'হাঁ—'

বুড়ি মাকে নিয়ে জ্যোৎস্না-ধোয়া কাঁকুরে মাঠের ওপর দিয়ে স্বাধীন জীবনের দিকে এগিয়ে যায় গণা। আর দোসাদটোলার সুড়ঙ্গের মুখে এক পরাধীন জনমদাস স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের ভেতরে হঠাৎ একটা অসহ্য কষ্ট টের পায় সে।

আঠার

হিমগিরির সঙ্গে রাত কাটিয়ে পরের দিন ভোরে ফিরে এসে প্রথমেই গণার খোঁজ নেয় নওরঙ্গী। গণা এবং তার মাকে না পেয়ে একাই গলা ফাটিয়ে শোর তুলতে তুলতে দোসাদটোলা মাথায় তুলে ফেলে।

একটু পর গণার উধাও হবার খবরটা কিভাবে যেন রঘুনাথ সিংয়ের খামারবাড়ি পর্যন্ত রাষ্ট্র হয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ হিমগিরি, রামলছমন এবং তাদের পহেলবানেরা দৌড়ে আসে। গোটা দোসাদটোলা ভয়ে সিঁটিয়ে যায়।

কিন্তু যার জন্য এত হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে আসা তাকে কোথায় পাবে হিমগিরিরা? গণা এতক্ষণে রঘুনাথ সিংয়ের তালুকের মধ্যে যে ভারতবর্ষ তার সীমানা ছাড়িয়ে খাস ধানবাদ না হলেও মাকে নিয়ে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

জনমদাসটাকে ধরেও আটকে রাখা গেল না। এ আপসোস হিমগিরিদের মরলেও যাবে না। ধরার পর গণাকে বেদম মার দেওয়া গেছে, এটুকুই যা সান্ত্বনা। কিন্তু আমৃত্যু যার বড়ে সরকারের জমি চষার কথা তাকে ঠেঙিয়ে হাতের সুখ করলে কতটুকু আর ক্ষতিপূরণ হয়?

প্রচণ্ড মার খাওয়ার পরও গণার এভাবে ভেগে যাবার দৃষ্টান্ত খুবই মারাত্মক। একটা লোক না থাকলে মালিকের স্বনামে এবং বেনামে হাজার হাজার একর জমি চষার ব্যাপারে কিছুই অসুবিধা হবে না। কিন্তু গণার দৃষ্টান্ত দোসাদটোলার অচ্ছুৎগুলোকে যদি সাহস আর উৎসাহ যোগায় তার ফলাফল হবে ভয়াবহ।

সরু গলার স্বর সাত পর্দা চড়ায় তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে হিমগিরি বলে, 'বল ভৈসের ছৌয়ারা, গণা কী করে এখান থেকে ভাগল? তার সিনায় এত সাহস হল কোত্থেকে?'

ভীরু কাঁপা গলায় গোটা দোসাদটোলাটা জানায়, 'আমরা কিছু জানি না হুজৌর—'

'একটা হারামজাদ একটা বুড়হীকে নিয়ে তো হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি! তোদের টোলার ভেতর দিয়েই হেঁটে হেঁটে গেছে। তোরা এতগুলো আদমী রয়েছিস এখানে, কেউ টের পেলি না! এ আমাকে বিশোযাস করতে হবে?'

দোসাদটোলার বাসিন্দাদের তরফ থেকে আধবুড়ো গণেরি জানায়, সারাদিন তারা গতর চূরণ খাটে। সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে বিস্তারায় লেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে মুর্দা বনে যায়। দুনিয়ায় তখন কে কী করছে, বিলকুল হুঁশ থাকে না হুজৌর। তাদের নিদের ভেতর কখন গণা আর সৌখী পালিয়ে গেছে, টের পায় নি।

গলা আরো তিন পর্দা চড়িয়ে সবার কানে তুরপুন চালিয়ে দেয় হিমগিরি, 'জানবরের দল।'

গণেরি কিছু বলার জন্য হাঁ করতে যাচ্ছিল, আচমকা ওধার থেকে নওরঙ্গী ডাকে, 'অ্যাই ধম্মা—'

চমকে ধর্মা নওরঙ্গীর মুখের দিকে তাকায়, 'কা?'

'কাল তুই অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে ছিলি। কা রে, থা নেহী?'

ধর্মার বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যায়। নওরঙ্গী যে কোন দিকে যাচ্ছে, সে আগে থেকেই তার গন্ধ পায় যেন, কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না।

সাপিনীর মতো স্থির চোখে ধর্মাকে দেখতে দেখতে নওরঙ্গী ধারাল গলায় ফের বলে, 'কা রে, গুংগা (বোবা) বন্ গিয়া?'

অতি কষ্টে গলার ভেতরটা এবার সাফ করে নেয় ধর্মা, দুর্বল স্বরে কোনোরকমে বলতে পারে, 'তুমি কাল রাত্তিরে বয়েলগাড়িতে ওঠার পর আমি আর বসি নি। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।' ধর্মা টের পায়, এই সামান্য মিথ্যেটুকু বলতে বুকের ভেতর ভূমিকম্পের মতো কিছু একটা অনবরত যেন ঘটে চলেছে।

রাত্তিরে নওরঙ্গীর বয়েল গাড়িতে ওঠার কথাটা ভেল্‌কি দেখিয়ে ছাড়ে। একেবারে যাদুকা খেল যেন। বয়েল গাড়িতে চেপে রোজ রাত্তিরে এই ছমকি আওরতটা যে হিমগিরির কাছে যায়, এটা কিছু গোপন ব্যাপার না। গারুদিয়া তালুকেব তাবৎ আদমী তো বটেই, কুকুর-বেড়াল-ছুঁচো আর রাতচরা গিধেরাও তা জানে। একেবারে নিয়মিত এবং দৈনন্দিন ঘটনা। কিন্তু যে যত পারে জানুক, এমন কি স্বচক্ষে এক বামহন আর তার অচ্ছুৎ রাখনির কুকীর্তি দেখুক কিন্তু এই নিয়ে তাদের সামনে কথাবার্তা বা নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি চলবে না। এতে নাকি হিমগিরিব সামাজিক মানমর্যাদা জাহান্নামে যায়। লোকটার মনস্তত্ত্ব অদ্ভুত।

হিমগিরি দ্রুত বলে ওঠে, 'একটা জরুরি বাত তোরা শুনে বাখ, গণা কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারবে না। আজ হোক, কাল হোক, পরশু হোক, ওর গলায় রশি দিয়ে ধরে নিয়ে আসব। এবার ওকে বাঁচিয়ে রাখা হবে না, জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হবে। গণার দেখাদেখি কেউ যদি এখান থেকে ভাগার মতলব করে থাকিস তা হলে তোদের কপালে কী আছে আন্দাজ করে নে। হামনিকো বাতঠো কানমে ঘুষল?'

গোটা দোসাদটোলা তৎক্ষণাৎ ঘাড় হেলিয়ে জানিয়ে দিল— ঘুষেছে।

এবার হিমগিরি আকাশের দিকে আঙুল বাড়ায়। বলে, 'দেখছিস?'

অন্য দিন আলো ফুটতে না ফুটতেই রঘুনাথ সিংয়ের খামারবাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়ে ভূমিদাসেরা। আজ গণা এবং সৌখী ভেগে পড়ায় এবং হিমগিরিরা দৌড়ে আসায় সময়ের দিকে কারুর হুঁশ ছিল না। এদিকে কখন যেন রোদ উঠে গেছে। জষ্ঠি মাসের সকাল। রোদ উঠতে না উঠতেই তাপ ছড়াতে শুরু করে।

আকাশের দিকে এক নজর তাকিয়েই হিমগিরির ইঙ্গিতটা বুঝে নেয় গণেরিরা। অর্থাৎ সূরয চড়ে গেছে, সংয়ের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে এখনই জমিনে যাও। হুড়মুড় করে জনমদাসেরা দোসাদটোলার দিকে দৌড়ে যায়। নাকেমুখে মাড়ভাত্তা কিংবা বাসি পানিভাত্তা গুঁজে, পিঠে কালোয়া বেঁধে একটু পরেই তারা খামার বাড়িতে চলে আসে। সেখান থেকে হাল বয়েল নিয়ে মাঠের দিকে ছোটে।

যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার খামারের পেছন দিকে তাকায় ধর্মা। সেখানে শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো যে ঘরগুলো গা জড়াজড়ি করে রয়েছে সেগুলো এখন ফাঁকা। তার মানে রামলছমন আর সে যে মরশুমী ওরাওঁ আর মুণ্ডা কিষানদের চাহাঢের হাট থেকে নিয়ে এসেছিল তারা খেতে চলে গেছে। এখানে আসার পর থেকে রোজই ধর্মাদের সঙ্গে সকালে ওরা বড়ে সরকারের জমিতে চলে যায়, সারা দিন কাজের পর ফেরেও একই সঙ্গে। আজ বেলা চড়তে দেখে তারা আর বসে থাকে নি।

জমিতে আসার পর কারুর নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। হাল বয়েল নিয়ে যে যার খেতে নেমে পড়ে। চাবদিক থেকে আওয়াজ উঠতে থাকে. 'উররা, উররা, হট হট —।' আওয়াজের সঙ্গে লাঙলেব শীষ রুক্ষ পাথুরে মাটির পেট চিরে চিরে ছুটতে থাকে।

একটানা অনেকক্ষণ লাঙল চালাবার পর ঘাড় তুলে একবার চাবপাশে তাকায় ধর্মা। বাঁ দিকে যতদূর নজর যায়, আদিবাসী কিষানরা মাটি চষে চলেছে।

ওদিকটায় কাল বিকেল পর্যন্ত লাঙল পড়ে নি। খুব সম্ভব কাল রাতে হিমগিরি মরশুমী কিষাণদেব

না-চষা জমিতে লাঙল চালাতে বলে দিয়েছিল। হয়ত আজ ভোরে খেত চিনিয়ে দেওয়ার জন্য কাউকে ওদের সঙ্গে পাঠিয়েও থাকবে। ওরাওঁ মুণ্ডাদের ঘামে-ভেজা পিছল চামড়ায় জ্যৈষ্ঠের রোদ ঠিকরোতে থাকে।

ছোটবেলা থেকে ধর্মা জানে, পাহাড় বা জঙ্গলের আদিবাসীদের কাজে কোনো ফাঁকি নেই। এই যে মাটি চষা আর বীজ রোয়ার দায়িত্ব নিয়ে তারা এসেছে, এরপর আর ওদের পেছনে লেগে থাকতে হবে না, তাড়া লাগাবারও দরকার নেই। ঝড় উঠুক, বাড় (বন্যা) আসুক, রোদে পুড়ে সব ছারখার হয়ে যাক, কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখন আর কোনোদিকে ওরা তাকাবে না।

হাইওয়ের ওপাশে সেই চিরকালের চেনা ছবি। দক্ষিণ কোয়েলের শুকনো মরা খাতের গা ঘেঁষে মিশিরলালজির জমিতে অন্য দিনের মতো আজও ট্রাক্টর চলছে। ভট ভট আওয়াজ জষ্ঠি মাসের লু বাতাসে ভেসে ভেসে চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাথার ওপর উড়ছে ঝাঁক ঝাঁক পরদেশি শুগা। বড় সড়কের পাশে টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে খুদে খুদে চোটারা। তবে আজ একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ছে। তা হল পছিমা মেঘ। খুব একটা জমকালো নয়। টুকরো টুকরো, পেঁজা পেঁজা মেঘগুলো কোথাও দানা বাঁধছে না, আলস্যে গা ভাসিয়ে দিয়ে পশ্চিম আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটু থেমে ভুরুর ওপর হাতের আড়াল দিয়ে মেঘের গতিবিধি লক্ষ করে ধর্মা। লাঙল থামতে কুশীও থেমে গিয়েছিল। পেছনে থেকে সে এবার ধর্মার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, 'ঘটা (মেঘ)—'

ধর্মা ঘাড়টা সামান্য হেলিয়ে দেয়, 'হাঁ—'

পাশের খেত থেকে গণেরিও মেঘ দেখছিল। সে বলে, 'এই সালের পয়লা মেঘ। তবে 'বারিষ' নামতে দেরি আছে।'

'কত দেরি গণেরিচাচা?'

'আট দশ রোজ জরুর।'

'এত্তে দের?'

গণেরি বুঝিয়ে দেয়। এ বছর মেঘের আনাগোনা সবে আজ থেকে শুরু হল। এত অল্প মেঘে তো বৃষ্টি হয় না। অঢেল মেঘ জমে জমে পছিমা আকাশ 'কালা পাথর' বনে যাবে, তবে না 'বারিষ' নামবে। কিন্তু সে সব একদিনে হয় না। গণেরি বলতে থাকে, বারিষ না হলে কেউ আর বাঁচবে না। নদী-নহর, মানুষ-জানবর, পাহাড়-জঙ্গল সব জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে।

ধর্মা বলে, 'বারিষ দো-দশ রোজ বাদ শুরু হোক। মাথার ওপর মেঘটা থাকলেও আরাম। জেঠ মাহিনার রওদে জান যায়।'

গণেরি কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় হাইওয়ে থেকে চিৎকার ভেসে আসতে থাকে, 'প্রতিভাজিকো—'

'বোট দো—'

'কৌন জিতেগি?'

'প্রতিভা সহায়, আউর কৌন?'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে ধর্মারা হাইওয়ের দিকে তাকাল। লাল ধুলো উড়িয়ে একটা খোলা জিপ বিজুরি তালুকের দিকে চলেছে। দশ বারটা জোয়ান ছোকরা গাদাগাদি করে সেটার ওপর দাঁড়িয়ে গলায় রক্ত তুলে সামনে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। জিপটার সামনের দিকে লাল শালুর কাপড়ে একটা ঘোড়া আঁকা। তার তলায় কী সব যেন লেখা রয়েছে। অক্ষরপরিচয়হীন আনপড় জনমদাসেরা তা পড়তে পারে না। পারলে জানত, সামনের চুনাওতে প্রতিভা সহায়কে জেতাবার জন্য ঘোড়ার চিহ্নে মোহর মারতে বলা হয়েছে।

দেখতে দেখতে জিপটা অনেক দূরে, লাল ধুলোয় আকাশ যেখানে ঝাপসা হয়ে আছে, একটা ফুটকির মতো মিলিয়ে যায়।

জোরে শ্বাস টেনে জ্যৈষ্ঠের খানিকটা তাতানো বাতাস ফুসফুসে ভরে নেয় গণেরি। বলে, 'চুনাওর লড়াইতে তা হলে এবার আওরত নামল?' এতদিন পর্যন্ত গারুদিয়া তালুকে যে নির্বাচনী যুদ্ধ হয়ে

গেছে তা পুরুষে পুরুষে। একজন মহিলাকে এবার নামাতে দেখে গণেরি অবাকই হয়েছে।

ধর্মা বলে, 'পরতিভাজি কৌন চাচা?'

গণেরি বলে, 'ওহী রোজ মালিকের মুখে শুনলি না? বড় ঘরকা বহু।' তারপর সে যা জানায় তা এইরকম। বিজুরি তালুকের মনপথল গাঁয়ে তার সসুরাল। শ্বশুরবাড়ি শুধু নামেই, ওখানে কেউ থাকে না। পুরনো আমলের বাড়িঘর ভেঙেচুরে ধসে যাচ্ছে। আগাছায় ঢেকে গেছে সব কিছু। পরতিভাজিদের কারখানা রয়েছে ঝরিয়াতে, আর রাঁচিতে। ওরা আজ যদি থাকে পাটনায়, কাল কলকাত্তায়, পরশু দিল্লিতে, নরশু বোম্বাইতে। বহোত বহোত পাইসা ওদের ঘরে।

হাঁ করে শুনতে থাকে ধর্মারা। শুধু ওরা দু'জনই নয়, গণেরিদের কথা বলতে দেখে চারদিকের খেতগুলো থেকে আরো অনেক উঠে এসে কখন তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল কারুর খেয়াল হয়নি। এবার গণেরি সবাইকে তাড়া লাগায়, 'যা যা, আপনা আপনা জমিনে চলা যা—'

সবাই ফের খেতে নেমে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ছাড়া-ছাড়া আলগা-আলগা মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যটা যখন খাড়া মাথার ওপর উঠে আসে সেই সময় কালোয়া খাওয়ার সময় হয়ে যায়। সবাই বয়েলগুলোর গলার রশি খুলে দিয়ে ঝোপঝাড় কি কোমর-বাঁকা ত্রিভঙ্গ চোহারার সিসম গাছের ছায়া খুঁজে বসে পড়ে। খানিকক্ষণ জিরিয়ে গামছা কি ন্যাকড়ার গিঁট খুলে ভাত-সবজি-ডাল-নিমক-মিরচা বার করে খেতে শুরু করে।

একটা বাজে-পোড়া তালগাছের গোড়ায় খেতে বসেছিল ধর্মা আর কুশী। আজ তাদের খাওয়ার আয়োজন সামান্যই। বাজরার রুটি, খানিকটা কালো কালো আস্ত কলাই সেদ্ধ, ভেরোয়া (ঢেড়স) ভাজা, নিমক, হরা মিরচি এবং খানিকটা করে তেঁতুল গোলা।

খেতে খেতে হঠাৎ কুশীর চোখে পড়ে, বাঁ দিক থেকে হাইওয়ের ওপর দিয়ে সাইকেলে করে মাস্টারজি আসছেন। তাজ্জব বনবার মতো কোনো দৃশ্য নয়। কয়েক সাল ধরে মাস্টারজিকে এভাবেই সাইকেলে চেপে রওদ-বারিষ মাথায় নিয়ে গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। পাঁচ সাত 'মিল' জায়গা জুড়ে ঘুরে ঘুরে তিনি তাঁর স্কুলের জন্য ছেলেমেয়ে জোটান।

কোনো কোনো দিন মাস্টারজি সটান হাইওয়ে ধরে বিজুরি তালুকের দিকে চলে যান। আজ কিন্তু গেলেন না। বাস স্ট্যান্ডের কাছে ঝাঁকড়া পিপর গাছটার তলায় এসে নেমে পড়লেন। তারপর জমিতে এসে সাইকেলটা ঠেলে ঠেলে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন।

কুশী বলে, 'মাস্টারজি আসছে—'

ততক্ষণে ধর্মাও দেখতে পেয়েছিল। সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'ইঁহা মাস্টারজি—আমাদের এই জমিনে—'

রঘুনাথ সিংয়ের জমির চারদিক থেকে নানা গলা শোনা যায়, 'মাস্টারজি আয়া, মাস্টারজি আয়া—'

মাস্টারজিকে এ অঞ্চলের গরিব ভুখা অচ্ছুৎ মানুষেরা খুবই সম্ভ্রমের চোখে দেখে। তাঁকে যেমন ভালও বাসে তেমনি শ্রদ্ধাও করে। সব চাইতে বড় কথা আপনজন বলে ভাবে।

মাস্টারজি কাছাকাছি আসতেই এধার ওধার থেকে গণেরি, বুধেরি, মাধোলালরা উঠে আসে। তাঁকে নিয়ে কী করবে, কোথায় বসাবে, ভেবে উঠতে পারে না। ভীষণ ব্যস্তভাবে নিজের গামছাটা দশ বার ঝেড়ে জমিতে পেতে দেয় গণেরি। বলে, 'বৈঠিয়ে মাস্টারজি, বৈঠিয়ে—'

মাস্টারজি গামছার ওপর বসেন না। সাইকেলটা সামনের সিসম গাছটার গায়ে দাঁড় করিয়ে আলের মরা ঘাসের ওপর বসে পড়েন। মোটা খদ্দরের ধুতির খুঁটে কপালের ঘাম মুছে সবাইকে দেখতে দেখতে সস্নেহে হাসেন। বলেন, 'কী খবর তোদের? ভাল আছিস?'

ধর্মারা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে জানায়, 'হাঁ, রামজিকো কিরপা।'

'কালোয়া খাওয়া হয়ে গেল?'

'হাঁ।'

গণেরিদের শরীর-স্বাস্থ্য ঘর-সংসার সম্পর্কে আরো কিছুটা খোঁজ খবর নিয়ে আসল কথায় আসেন

মাস্টারজি, 'তোদের মতলবটা কী, খোলসা করে বল তো।'

মাস্টারজির কথায় যে ইঙ্গিতটা আছে, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে গণেরি। ফিকে হেসে ভয়ে ভয়ে শুধোয়, 'কিসের মতলব?'

'ইস্কুলে ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছিস না কেন?' সোজাসুজি প্রশ্নটা করে সেই পুরনো কথাটা আরেক বার নতুন করে মনে করিয়ে দেন মাস্টারজি। জমানা বদলে গেছে। গণেরিদের যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কামিয়া হয়ে পরের জমিতে বেগার দিতে দিতেই এই জনমটা বরবাদ করে ফেললি। ছেলেপুলেদের পেটে দু-চারটে কালির হরফ ঢোকাবার বন্দোবস্ত কর। তাদের আঁখ ফুটুক, নইলে তোদের মতোই তারাও পরের জমিনে হাল-বয়েল ঠেলে ঠেলেই খতম হয়ে যাবে। নিজেদের হক কোনোদিনই বুঝে নিতে পারবে না।

গণেরি নিরুপায় হতাশ মুখে বলে, 'কা করে মাস্টারজি? তুই আমাদের সবই জানিস। এই গরমের সময়টা ছেলেমেয়েগুলোকে পড়তে পাঠাই কী করে? দশ সাল আমাদের কুয়ো কাটানো হয় নি। টোলাতে এক বুঁদ পীনেকা পানি নেই। সূরযদেও উঠতে না উঠতে বালবাচ্চাদের পানি আনতে পাঠিয়ে দিই। শুখা নদী থেকে বালি খুঁড়ে পানি না আনলে সবাই ছাতি ফেটে মরবে। বারিষ নামুক, তখন ওদের পাঠাব।'

'বারিষ শুরু হলে তো ধান রোয়ার জন্যে ওদের খেতিতে নিয়ে আসবি।'

কথাটা ঠিকই বলেছেন মাস্টারজি। আস্তে আস্তে খুবই দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ে গণেরি।

ক'মাস ধরেই মাস্টারজি দেখছেন গরমের সময় লাঙল দিয়ে জমি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর যেই আকাশ থেকে বৃষ্টির দানা নামতে শুরু করে, ধান বোনাও চালু হয়ে যায়। ছোট্ট ফালি জমিতে বীজ রুয়ে প্রথমে ধানচারা করে নেওয়া হয়। চারাগুলো বিঘৎ খানেক বড় হওয়ার পর শেকড় সুদ্ধ তুলে এনে জমিতে লাইন ধরে ফাঁক ফাঁক করে লাগাবার পালা। এই সময়টা প্রচুর লোকজন দরকার। আদিবাসী মরশুমী কিষানরা থাকা সত্ত্বেও সব দিক সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে উঠে। অগত্যা মা বাপেরা হাতে হাতে সাহায্যের জন্য ছেলেমেয়েদের খেতিতে টেনে আনে। না এনে উপায়ই বা কী? তারপর ধান বোয়া শেষ হতে না হতেই জোর বর্ষা নেমে যায়। দিনরাত তখন জল ঝরছে তো ঝরছেই। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে রাস্তাঘাটের হাল বেজায় খারাপ হয়ে যায়। এই গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকে পাক্কী আর ক'টা? পাটনা আর রাঁচিতে যাওয়ার ওই হাইওয়েটা বাদ দিলে সবই কাঁচা সড়ক। বর্ষার মরশুমে সেখানে হাঁটুভর থকথকে কাদা জমে থাকে। তখন কোশ দু-কোশ কাদা ঠেলে ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাতে কোনো মা-বাপই রাজি না।

বর্ষার পর দুটো মাস অবশ্য ভূমিদাসদের হাড়ে কিছুটা বাতাস লাগে। তখন জমির কাজ পুরা বন্ধ। মাঠে মাঠে তখন ধানের শীষ লকলকিয়ে বাড়তে থাকে। সবুজ আবরণের ভেতর দুধ দ্রুত ঘন হয়। কিছুদিনের মধ্যেই মাইলের পর মাইল শস্যক্ষেত্রের রং একেবারে বদলে যাবে। যতদূর নজর চলবে, মাঠ জুড়ে শুধু অফুরন্ত সোনালি ধান। যতদিন না ধান পাকছে, রঘুনাথ সিংয়ের খামার বাড়িতে গিয়ে গত সালের ধান-কলাই মুগ-মুসুর ইত্যাদি হরেক শস্য ঝেড়ে বেছে রোদে শুকিয়ে রাখতে হয় জনমদাসদের। এই সময়টা মাস্টারজির ইস্কুলের কথা আচমকা মনে পড়ে যায় তাদের। সকাল হতে না হতেই দোসাদাটোলার মা-বাপেরা ছেলেমেয়েদের ঘুম ভাঙিয়ে মাড়ভাত্তা খাইয়ে তাড়া দিয়ে দিয়ে 'পাক্কী'র ওধারের কাঁচা সড়ক পৌঁছে দেয়। এখান থেকে বাচ্চাগুলো গারুদিয়া বাজারের পাশে মাস্টারজির ইস্কুলে ঠিকই চলে যেতে পারবে। ছুটির পর মাস্টারজি নিজে সঙ্গে করে তাদের এই 'পাক্কী' পার করে দিয়ে যান। হাইওয়েতে দিনরাত উজানে ভাটিতে বাস-ট্রাক বেপরোয়া দৌড়য়। বাচ্চাগুলোকে পার না করে দিলে গাড়ির তলায় চলে যাবার ভয়।

কিন্তু যাদের জন্ম ভূমিদাসদের ঘরে তাদের পক্ষে বছরের ক'টা দিনই বা পড়াশোনা সম্ভব? ধান যেই পাকলো, মাস্টারজির ইস্কুল ফাঁকা করে ছেলেমেয়েরা মা-বাপের পিছু পিছু মাঠে গিয়ে নামল। ধান ওঠার পরও কাজের কি কামাই আছে? আবার লাঙলের ফলায় জমি তৈরি করে কলাই তিল তিসি মুগ মুসুর লাগাতে হবে। লাগাতে হবে আখ ভুট্টা বাজরা জনার। তখনও মা-বাপের সঙ্গে

ছেলেমেয়েরা খেতিতে আসবে। রবিশস্যের মরশুম ফুরোতে না ফুরোতেই ফের গরম শুরু হয়ে যাবে। এই ভাবেই ওদের জীবনে ঋতুর চাকায় বছর ঘুরে যায়। কাজেই ছেলেপুলের পেটে দু-চারটে কালির হরফ ঢোকাবার ফুরসত কোথায় ওদের?

মাস্টারজি বলেন, 'বারিষ থামলে দো-চার রোজের জন্যে ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠাবি। তারপর বাকি সাল ওরা আর ইস্কুলের মুখ দেখবে না। এভাবে কি পড়াশোনা হয়?'

কাঁচুমাচু মুখে হাত কচলাতে কচলাতে গণেরি বলে, 'কা করে মাস্টারজি. কাম তো ওঠাতে হবে। কাম না ওঠালে বড়ে সরকার কি ছেড়ে দেবে?' তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের শুরু করে, 'জনমভর আমরা খরিদীই হয়ে রইলাম।'

মাস্টারজি কোনো কারণেই হতাশ হন না। মানুষ এবং জীবন সম্বন্ধে তিনি বড়ই আশাবাদী। বলেন, 'এর মধ্যেই সময় করে নিতে হবে গণেরি। ছেলেমেয়েগুলোকে আনপড় মূরখ করে রাখা কোনো কাজের কথা নয়।'

'হাঁ।'

কথায় কথায় বেলা হেলতে শুরু করে। খানিক আগে যে পাতলা পাতলা মেঘ পছিমা বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল, দিগন্তের ওপারে কখন যেন সেগুলো উধাও হয়ে গেছে। জষ্ঠি মাসের সূর্য খাড়া মাথার ওপর থেকে পশ্চিমের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে।

মাস্টারজি কী বলতে যাচ্ছিলেন, আচমকা হাইওয়ের দিক থেকে চিৎকার ভেসে আসে।

'নেকীরাম শর্মাকো—'

'বোট দো, বোট দো—'

'উটকা চিহ্ন্ পর—'

'মোহর মার, মোহর মার—'

ঘাড় ঘুরিয়ে সবাই বড় সড়কের দিকে তাকায়। একটা টেম্পো বিজুরি তালুক থেকে গারুদিয়া বাজারের দিকে চলেছে। গাড়িটার সামনে উট-আঁকা একটা লাল শালুর টুকরো আটকানো। বোঝা যায়, এবারের নির্বাচনে নেকীরামের প্রতীক হলো উট। টেম্পোটার পেছনে দিকে আট দশটা ছোকরা নেকীরামকে ভোট দেওয়ার জন্য অনবরত গলায় রক্ত তুলে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

গাড়িটা লাল ধুলো উড়িয়ে ডান দিকের একটা বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

যতক্ষণ নেকীরাম শর্মার ভোটের গাড়িটা দেখা যায়, তাকিয়ে ছিলেন মাস্টারজি। হাইওয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে এবার তিনি গণেরিকে শুধোন, 'কৌন নেকীরাম রে? বড় ইস্কুলের পণ্ডিতজি?'

গণেরি বলে, 'অ্যায়সাই শুনা?'

'বামহন বলে বড় দেমাক — না? ছুঁয়াছুত খুব মানে?'

'শুনা অ্যায়সা।'

'পণ্ডিতজিও তা হলে চুনাওতে নেমে গেল?'

কী ভেবে গণেরি বলে, 'জেনানাও চুনাওতে নেমেছে।'

একটু অবাক হয়ে মাস্টারজি জিজ্ঞেস করেন, 'কৌন জেনানা?'

'বড়ে ঘরকা বহু — পরতিভা সহায়। বড় বড় আপিস আছে ওদের, কারখানা ভি আছে। বহোত পাইসাবালী।'

মাস্টারজির চমক লাগে। বলেন, 'আচ্ছা —'

গণেরি বলে, 'থোড়া আগে পরতিভাজিকো ভোটের গাড়ি বিজুরি তালুকের দিকে গেল।'

মাস্টারজি আপন মনে এবার বলেন, 'ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট প্রতিভা সহায়, জমিমালিক রঘুনাথ সিং, বামহন নেকীরাম শর্মা — সবার ভোট চাই। গরুদিয়া-বিজুরিতে এবার চুনাওর পরব জমবে মনে হচ্ছে।'

গণেরি স্থির চোখে মাস্টারজির দিকে তাকিয়ে ছিল। তাঁর কথাগুলোর গভীর অর্থ সে বুঝতে পারে না। শুধোয়, 'কা বোলা মাস্টারজি?'

'ও কিছু না।' প্রসঙ্গটা বদলে মাস্টারজি জিজ্ঞেস করেন, 'আর কে কে ভোটে নামল জানিস?'

'সুখন রবিদাস —'

'বহোত তেজী ছোকরা। আউর?'

'শুনেছি বিজুরির এক মুসলমান আদমীও নেমেছে।'

মাস্টারজি আবছা গলায় বিড় বিড় করতে থাকেন, 'হিন্দু মুসলমান, জাতপাত, ইন্ডাস্ট্রি, ল্যান্ড-ওনার— সব কুছ চুনাওকা ছত্রির তলায় এসে গেল। বহোত আচ্ছা—'

এই সময় দূর থেকে খ্যাসখেসে গলার চিৎকার শোনা যায়, 'আরে উল্লু, গাধধে, পাঠ্ঠে, হারামজাদকা ছৌয়ারা—'

গলার স্বরটা খুবই চেনা। চমকে সবাই দেখল, পুরনো লঝ্ঝড় সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে জমির পর জমি পেরিয়ে রামলছমন আসছে। তার মুখের কামাই নেই। সমানে সে চেল্লাচ্ছে, 'আসতে একটু দেরি করেছি, অমনি কাজে ফাঁকি! আসমানে আজ মেঘ দেখা দিয়েছে। দশ-পন্দর রোজের মধ্যে বারিষ নেমে যাবে। আভিতক খেতি চষা পুরা হল না। হারমাজাদকো বেটোয়া বিটিয়া, দয়া করে গতর তুলে জমিনে নামো। উল্লু, পাঠ্ঠে, গাধ্ধে—'

মাস্টারজির চারপাশে যারা ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, রামলছমনের চোখের পাতা পড়তে না পড়তে হাল-বয়েল নিয়ে জমিতে নেমে পড়ে। চারপাশ থেকে আওয়াজ উঠতে থাকে, 'হট্ হট্, উররা হট্ হট্, উররা হট্ হট্ —'

তার ভয়ে এতগুলো হট্টাকট্টা চেহারার দোসাদ-দুসাদিন সারাক্ষণ তটস্থ। ভেতরে ভেতরে এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করে রামলছমন। চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ ভূমিদাসদের মাটি চষা লক্ষ করে। তারপর হাতের সাইকেলটা একটা পরাস গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে মাস্টারজির দিকে তাকায়, 'কা মাস্টারজি, কা খবর?'

রামলছমনকে একেবারেই পছন্দ করেন না মাস্টারজি। খুবই নিস্পৃহ মুখে বলেন, 'চলতা হ্যায়—'

'তোমার ইস্কুল কেমন চলছে?'

'ভাল না।'

'এখানে?'

অর্থাৎ বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে মাস্টারজি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন, রামলছমন তা-ই জানতে চায়। মাস্টারজি এ প্রশ্নের উত্তর দেন না। কেননা আগেও অনেক বার এই খেতিতে রামলছমনের সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং কম করে পঞ্চাশ বার এই একই প্রশ্ন করেছে সে। মাস্টারজিও একই উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু একই প্রশ্নের জবাব কত বার দেওয়া যায়! বিরক্ত মাস্টারজি এখন আর জবাব দেওয়াটা প্রয়োজন বোধ করেন না।

রামলছমন ট্যারাবাঁকা, পোকায়-খাওয়া, কালচে দাঁত বার করে বিশ্রী হাসে। বলে, 'সমঝা। ইস্কুলের জন্যে ছেলেমেয়ে পাকড়াতে এসেছ।'

কথাটা ঠিকই বলেছে বগুলা ভকত। সে তো বটেই, গারুদিয়া এবং বিজুরি তালুকের তাবৎ মানুষ জানে মাস্টারজি সাইকেলে করে গাঁওয়ে গাঁওয়ে খেতিতে খেতিতে ঘুরে তাঁর স্কুলের জন্য ছাত্র ধরতে বেরোন। তিনি এবারও কিছু বলেন না।

রামলছমন মাস্টারজির মুখের ওপর ঝুঁকে এবার শুধোয়, 'মিলা?'

ছাত্র পাওয়া গেল কিনা, রামলছমনের তা-ই জিজ্ঞাস্য। মাস্টারজি ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট বিরক্ত হলেও বাইরে তা ফুটে উঠতে দেন না। গম্ভীর গলায় শুধু বলেন, 'নেহী।'

উত্তরটা শুনে বেজায় খুশি রামলছমন। সবগুলো দাঁত একসঙ্গে বার করে এবার সে বলে, 'ও আমি বহোত আগে থেকে জানি। মাস্টার, এই জায়গাটা হল পড়তি জমি। এখানে লেখাপড়ার চাষ হয় না। ইস্কুল খুলে গরমিনের পাইসাই বরবাদ। আর তুমিও এখানে ওখানে ঘুরে ছেলে মেয়ে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাচ্ছ। তার চেয়ে এক কাম কর—'

সন্দিগ্ধ চোখে মাস্টারজি তাকান, 'কী কাম?'

'ইস্কুলের দুকান এখানে চলবে না। এখান থেকে ইস্কুল উঠিয়ে ভাল জায়গায় নিয়ে বসাও। গাহেক মিলবে। না হলে পরেসানিই সাব—' উৎকৃষ্ট একটি রসিকতা করা হয়েছে ভেবে রামলছমন খুশিতে ডগমগ। হিক্কার মতো শব্দ করে করে সে হাসতে থাকে।

বিনা পয়সায় এরকম একটা দামী পরামর্শ পেয়েও মাস্টারজিকে আদৌ উৎসাহিত হতে দেখা যায় না। নিরানন্দ একটু হেসে তিনি উঠে পড়েন। একটি কথাও না বলে পাশের সিসম গাছের গা থেকে নিজের সাইকেলটা নিয়ে বড় সড়কের দিকে চলতে শুরু করেন। মনে মনে সংকল্প দৃঢ় হতে থাকে। এই পড়তি জমিতেই লেখাপড়ার চাষ করে রামলছমনকে দেখিয়ে দেবেন।

মাস্টারজি চলে যাওয়ার পর লম্বা লম্বা পা ফেলে বগুলা ভকত এ জমি থেকে ও জমিতে, ও জমি থেকে সে জমিতে চরকির মতো ঘুরতে থাকে। এভাবে ঘুরে ঘুরে কিছুক্ষণ সবার কাজ লক্ষ করে। তারপর যুবতী মেয়েদের পেছনে লেগে যায়। প্রথমেই তার চোখ পড়ে শনিচারীর ওপর। অন্য সব দিনের মতো মাধোলালের জমিতে গত সালের মরা গাছের শেকড় বেছে বেছে রাখছিল সে।

শনিচারীর পেটে ছ-সাত মাসের বাচ্চা রয়েছে। সোজাসুজি সেদিকে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে খ্যা খ্যা করে হাসে রামলছমন। বলে, 'কা রে শনচারী, পেটটার কা হাল করেছিস! তোর পেটের ছৌয়া কত বড় হল?' তার হাসিতে দুনিয়ার সব দুর্গন্ধ মেশানো।

শনিচারী তার ছ-সাত মাসের গর্ভ নিয়ে কী করবে, ভেবে পায় না। খাটো শাড়ির খুট টেনে সেটা ঢাকতে চেষ্টা করে কিন্তু শাড়ির বহর এতই ছোট যে কোমর আর বুক ঢাকার পর বাড়তি কিছু পাওয়া যায় না। দু হাতে পেটটা চেপে ধরে লজ্জায় সঙ্কোচে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পৃথিবী এই মুহূর্তে দু ভাগ হয়ে গেলে সে তার ভেতর ঢুকে যেত।

শনিচারীর এই জড়সড় সন্ত্রস্ত ভাবটা দেখতে দেখতে বেশ মজা পায় রামলছমন। চোখ নাচাতে নাচাতে সে বলে, 'তোর ছৌয়াকে পেট থেকে মাটিতে কবে ফেলবি?'

শনিচারী এবারও উত্তর দেয় না, মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রামলছমন আবার কী বলতে যাচ্ছিল, ওধারের খেত থেকে গিধনী ডাকে, 'এ রামহনিয়া, আমার এখানে এস। শনচারী কবে ছৌয়া মাটিতে ফেলবে, আমি তোমাকে সমঝিয়ে দিচ্ছি।'

চমকে গিধনীর দিকে তাকায় রামলছমন। দুসাদটোলার এই একজনকেই সে যমের মতো ভয় পায়। ছুকরির জিভে চাকুর ধার। কিছু তার মুখে আটকায় না। ক'দিন আগে এই বদ আওরতটা তার হাল খারাপ করে ছেড়ে দিয়েছিল। সন্দিগ্ধ ভীত চোখে সে গিধনীকে দেখতে থাকে।

গিধনী হাত নেড়ে নেড়ে ডাকে, 'আও আও হামনিকো দুলহা। আ যাও —'

বগুলা ভকত আর দাঁড়ায় না। ছুকরির মতলব ভাল নয়। মনে হচ্ছে সেদিনের মতো আজও নিশ্চয়ই কোনো ফ্যাসাদে ফেলে দেবে। বজ্জাত আওরতের ত্রিসীমানায় থাকা ঠিক নয়। বকের মতো পা ফেলে ফেলে চোখের পলকে অনেক দূরে যেখানে আদিবাসী মরশুমী কিষানরা জমি চষছে সোজা সেখানে চলে যায় রামলছমন।

ভূমিদাসরা নিশ্চিন্ত। আজ অন্তত বগুলা ভকতটা তাদের এদিকে আসবে না।

সন্ধেবেলা বড়ে সরকারের খামারবাড়িতে হাল-বয়েল জমা দেওয়ার পর ধর্মা আর কুশী ছাড়া বাকি সবাই দোসাদটোলায় ফিরে গেল। আর ওরা দু'জনে সোজা চলে এল সাবুই ঘাসের জঙ্গলে। চার দিন হয়ে গেল, বগেড়ি ধরার ফাঁদ পাতা হচ্ছে না। এক দিন গেছে কোটবার পেছনে, একদিন চাহাড়ের হাটে কিষান আনতে। গণাকে যেদিন হিমগিরি পহেলবান দিয়ে পেটালো সেই দিনটাও বরবাদ হয়েছে। আরেকটা দিন শরীর খারাপ লাগছিল।

মোট চারটে দিন। চার দিনে ঠিকাদারদের কাছে বগেড়ি বেচে কমসে কম পনের বিশটা টাকা কামাই তো হত। অতগুলো টাকা মানে নিজেদের মুক্তির দিকে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া। তা ছাড়া বর্ষা নামলে বগেড়ি আর পাওয়া যাবে না। তল্লাট ছেড়ে ঝাঁক বেঁধে তারা উধাও হয়ে যাবে। তার মানে পুরো বারিষের সময়টা কামাই প্রায় থাকবে না বললেই চলে। বেফায়দা চার দিনের রোজগার নষ্ট হয়ে গেল।

ফাঁদ টাদ পাতা হয়ে গেলে কুশী বলল, 'এবার কী করবি?'

ধর্মা বলল, 'কী আর করব, ঘরে ফিরব।'

'অনেকদিন সফেদ গোয়ারিনদের কাছে যাই না। যাবি?'

গোয়ারদের চৌকাদ গাঁয়ের আলাদা একটা আকর্ষণ আছে ধর্মাদের কাছে। ওখানে গেলে সময়টা ভালই কাটে। সফেদ গোয়ারিন আর কালা গোয়ার, স্বামী স্ত্রী দু'জনেই মানুষ বড় ভাল। ধর্মার একবার ইচ্ছা হল, কুশীকে সঙ্গে করে চৌকাদে চলে যায়। পরে কী ভেবে বলল, 'আজ থাক। কাল তো বগেড়ি নিয়ে ঠিকাদার বাবুদের কাছে যাব। তখন চৌকাদে যাওয়া যাবে।'

কুশী আর কিছু বলে না।

কিছুক্ষণ বাদে হাইওয়ে ঘুরে ওরা দোসাদটোলায় এসে রীতিমত অবাক হয়ে যায়। মহল্লার পশ্চিম দিকে যেখানে কুয়োটা রয়েছে সেখানে পাঁচ ছ'টা হ্যাজাক জ্বলছে। ওদিকের অনেকটা জায়গা রোশনাইতে ভরে গেছে, আর পুরো দোসাদটোলাটা ওখানে ভেঙে পড়েছে।

ধর্মা আর কুশী তাদের চার মা-বাপকে নিজেদের ঘরে দেখতে পেল না। কুয়োর কাছে কেন এত রোশনাই, জানার জন্য খুবই কৌতূহল হতে থাকে দু'জনের; পায়ে পায়ে তারা এগিয়ে যায়।

কাছাকাছি আসতেই ধর্মাদের চোখে পড়ে, পুরনো কুয়োতে বালি কাটার কাজ চলছে। সেই সঙ্গে ঠিক পাশেই একটা নতুন কুয়োও কাটা হচ্ছে। কুয়োতে বসাবার জন্য পোড়া মাটির বিরাট বিরাট অগুনতি চাকা একধারে ডাঁই করে রাখা হয়েছে। বার চোদ্দটা কুয়াকাটোয়া নতুন এবং পুরনো দুটো কুয়ো কাটতে কাটতে ঘেমে নেয়ে উঠছে।

ভিড়ের ভেতর খুঁজে খুঁজে গণেরিকে বার করে ধর্মা। জিজ্ঞাসা করে, 'কা বাত চাচা? একসাথ দো কুঁয়া?'

'হাঁ—' গণেরি আস্তে মাথা নাড়ে।

'কুঁয়াকাটোয়ারা এল কখন?'

'থোড়া আগে। বড়ে সরকার নিজে সঙ্গে করে দিয়ে গেছে।'

ধর্মার গলার স্বর কেঁপে যায়, 'খুদ বড়ে সরকার!' তার চোখ গোল হয়ে গেল।

'হাঁ রে, হাঁ। খুদ এসে পুরানা কুঁয়ার বালি তুলতে আর নয়া কুঁয়া বানাতে হুকুম দিয়ে গেল।'

কুয়া কাটানোর এই ঘটনাটা দোসাসটোলার বাসিন্দাদের খুবই উত্তেজিত করে তুলেছে। হ্যাজাকের আলোয় তাদের চকচকে উজ্জ্বল মুখগুলো দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। কারা যেন ওখান থেকে বলে ওঠে, 'বড়ে সরকারকা বহোত কির্‌পা।'

এধার থেকে আরো কয়েকজন বলে, 'হানিলোগনকো বহোত সৌভাগ—'

সৌভাগ্য তো নিশ্চয়ই। তাদের মতো অচ্ছুৎদের পাড়ায় বড়ে সরকারের পায়ের ধুলো পড়েছে। এমন উত্তেজক ঘটনা তার জন্মের পর থেকে বাইশ চব্বিশ সালের মধ্যে আর কখনও ঘটেছে কিনা, ধর্মা ভাবতে চেষ্টা করে। দশ বছর ধরে পুরনো কুয়োটা বালিতে বুজে এসেছিল। কতবার তারা বালি কাটাবার জন্য হিমগিরিনন্দনের কাছে আর্জি করেছে। কিন্তু কোনো ফল হয় নি। অথচ বড়ে সরকার আজ শুধু পুরনো কুয়োর বালি সরাবার ব্যবস্থাই করেন নি, নিজে এসে নতুন কুয়ো কাটাবার হুকুমও দিয়ে গেছেন। এটা দোসাদদের চোদ্দ পুরুষের সৌভাগ্য নয়!

ধর্মা গণেরির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসায়, 'বড়ে সরকার আচানক দুটো কুঁয়া কাটিয়ে দিচ্ছে কেন?'

চোখ কুঁচকে চাপা গলায় গণেরি বলে, 'মুরুখ গাধ্ধে কাঁহাকা। শুনলি না সবাই বলছে, এটা বড়ে সরকারের কির্‌পা আর আমাদের বাপ, নানা, নানাকে বাপকে বাপ— সবার সৌভাগ।'

গলার স্বর কেমন যেন শোনায় গণেরির। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে ধর্মা, 'নায় নায়—'

রুক্ষ গলায় এবার গণেরি বলে, 'কী না?'

'তুমি যা বলছ।'

অনেকটা সময় চুপ করে থাকে গণেরি। তারপর মুখটা ধর্মার কানের ভিতর গুঁজে দিয়ে বলে, 'চুনাওকা তৌহার এসে গেল না? বোটমাঙোয়ারা এখন কত কী করে, দ্যাখ না।'

ধর্মা আর কিছু শুধোয় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুয়োকাটা দেখতে থাকে। চারপাশের লোকজন বড়ে সরকারের মহানুভবতা সম্পর্কে অনবরত বকে যায়। এত বড় একটা মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত দেখে তারা যেমন বিগলিত তেমনি কৃতার্থ। একসময় কুয়োতলার ধার থেকে ভিড়টা আস্তে আস্তে পাতলা হতে থাকে। সূর্যোদয় থোকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোসাদটোলার বেশির ভাগ মানুষ রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে হাল-বয়েল ঠেলে এসেছে। আরেক দল গিয়েছিল দক্ষিণ কোয়েলের মরা শুখা খাতে বালি খুঁড়ে জল আনতে বা জঙ্গলে সুথনি আর মহুয়ার গোটা যোগাড় করতে। ফিরেই রঘুনাথ সিং এবং কুয়োকাটোয়াদের দেখে তারা একই সঙ্গে এতই উত্তেজিত, অভিভূত আর অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ভুখ-তিয়াসের কথা বেমালুম ভুলে গেছে। প্রথম দিকের সেই চমক এবং উত্তেজনা এখন খানিকটা থিতিয়ে আসায় সবাই টের পাচ্ছে পেটের ভেতর খিদেটা খ্যাপা জানবরের মতো দাপাদাপি করছে। ফলে একজন দু'জন করে সবাই ঘরে ফিরতে শুরু করেছে।

ধর্মা আর কুশীও তাদের চার মা-বাপকে ভিড়ের ভেতর থেকে খুঁজে বার করে। বলে, 'বহোত ভুখ লেগেছে। ঘরে চল—'

দোসাদটোলার পুব দিকে কুশী এবং ধর্মাদের ঘর। কুয়োর পাড় থেকে দু'জনে সেদিকে হাঁটতে থাকে।

খানিকটা যাওয়ার পর ডান দিকে ফাগুরামের ঘর। সেখান থেকে হারমোনিয়ামের বাজনার সঙ্গে গানের সুর ভেসে আসছে। চেনা গলা। গারুদিয়ার কোয়েল ফাগুরাম গানের কথা সুরে বসাবার জন্য গলা সাধছে।

থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধর্মা। বছর কয়েক আগেও গানের দিকে দুর্দান্ত ঝোঁক ছিল তার। তখন ফাঁক পেলেই ফাগুরামের কাছে এসে বসত সে। ফাগুরাম তাকে নৌটঙ্কীব অনেক গান শিখিয়েছিল, পুরনো বেলো-ছেঁড়া হারমোনিয়ামে তালিম দিয়েছিল। তার খুবই আশা হয়েছিল, ধর্মাকে নিজের সাকরেদ করে তুলতে পারবে। কিন্তু ফাগুরাম হল স্বাধীন মানুষ। ফাগুরামের যা মানায় ধর্মার মতো জনমদাসের তা কি কখনও শোভা পেতে পারে? সারাদিন বড়ে সরকারের জমিতে গতরচূরণ মেহনতের পর নিজেদের মুক্তির দাম যোগাড় করতে করতে কবে গানের শখ মুছে গেছে, মনেও নেই। চর্চা না থাকলে যা হয়, ফাগুরামের কাছে গান-বাজনায় যেটুকু তালিম নিয়েছিল তা কবেই ভুলে গেছে। তবু কখনও কখনও গানের সুর ভেসে এলে সে কান খাড়া করে।

ফাগুরাম তাকে দেখতে পেয়েছিল। তবে অন্ধকারে ঠিক চিনতে পারে নি। গান থামিয়ে সে শুধোয়, 'কৌন রে?'

ধর্মা সাড়া দেয়, 'আমি ধম্মা ফাগ্‌গুচাচা—'

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? অন্দর আ যা—'

কুশীদের পাঠিয়ে দিয়ে ধর্মা ফাগুরামের ঘরে ঢোকে। ঢুকেই তাজ্জব বনে যায়। দোসাদটোলার সবার ঘরেই লাল কেরোসিনের ডিবিয়া জ্বলে কিন্তু ফাগুরামের এখানে ঝকঝকে কাচ বসানো নতুন দামি লণ্ঠন চোখে পড়ছে। যে হারমোনিয়ামটা সে বাজাচ্ছে সেটা আনকোরা নতুন। লণ্ঠনের আলোয় সেটার গা থেকে জেল্লা ঠিকরে বেরুচ্ছে। ধর্মা লক্ষ করে, ফাগুরামের পুরনো রং-ওঠা, রিড-ভাঙা হারমোনিয়ামটা একধারে পড়ে আছে। তার আরো নজরে পড়ে, ঘরের এককোণে রশিতে ক'টা নতুন কাপড় আর কুর্তা ঝুলছে, একজোড়া কাঁচা চামড়ার চকচকে নাগরাও আরেকটা কোণ আলো করে পড়ে আছে। তিন-চার সালের ভেতর ফাগুরামকে নাঙ্গা পায়ে ছাড়া কখনও দেখেনি ধর্মা। নতুন ধুতি নতুন জামা তো বেজায় তাজ্জবের কথা, সবসময় তার পরনে থাকত তালি-মারা সেলাই-করা পুরনো ময়লা জামাকাপড়। কী এক জাদুতে সব বিলকুল বদলে গেছে।

ধর্মার মুখচোখের ভাব লক্ষ করছিল ফাগুরাম। গর্বিত হেসে সে বলতে থাকে, 'ওই যে নয়া ধোতিয়া, জামা, নয়া লানটিন (লণ্ঠন), হারমোনি — সব বড় সরকার দিয়েছে। একশ রুপাইয়া ভি। তা

দিয়ে নাগরা কিনেছি, সিলভারকা কড়াইয়া কিনেছি, মাথায় দেওয়ার তেল, নয়া কাকাই, এমন অনেক জিনিস।'

ফাগুরাম এক নাগাড়ে যে সব জিনিসের নাম কবল সে সব ধর্মার মতো জনমদাসের কাছে একান্তভাবেই স্বপ্নের বস্তু। ফাগুরামের কথাব উত্তর না দিয়ে চকচকে চোখে সে ধুতি নাগরা লণ্ঠন দেখতেই থাকে। দেখতে দেখতে তার মনে পড়ে যায়, সেদিন বড়ে সবকার ফাগুরামকে একটা নতুন হারমোনিয়াম দেবার কথা বলেছিলেন। চুনাওর সময় তাতে গান বাঁধতে সুবিধা হবে। কিন্তু হারমোনিয়াম, নয়া ধুতি, জামা, লণ্ঠন ইত্যাদি দামি দামি জিনিস ছাড়াও নগদ একশ টাকা ফাগুরাম পেয়েছে জেনে এক ধরনের ঈর্ষা বোধ করতে থাকে ধর্মা।

ফাগুরাম ফের বলে, 'সব কুছ বড়ে সরকারকা কির্‌পা।' একটু থেমে বলে, 'চুনাওর গানের জন্যে এত সব মেলে কে জানত। বড়ে সরকারকা কির্‌পাসে বহোত কুছ হো গিয়া।' রঘুনাথ সিংয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসে ফাগুরামের।

ধর্মা ভাবে, গানেব তালিমটা বরাবব নিয়ে গেলে এই চুনাওর সময়টা কাজে লেগে যেত। ভাবে আর আপসোস হয়। পরক্ষণে তার মনে হয়, এখন আর আক্ষেপ করে ফায়দা নেই। শুকনো গলায় সে বলে, 'চুনাওর গান বেঁধে ফেলেছ?'

ফাগুরাম বলে, 'পুরাটা হয় নি, থোড়া থোড়া হয়েছে। যা হয়েছে শুনবি নাকি?'

'শোনাও না—'

ফাগুরাম ভাবে, এককালের পুরনো সাকরেদ ধর্মাকে হাতের কাছে পেয়ে ভালই হয়েছে। বড়ে সরকার যে জন্য তাকে এত খাতির যত্ন করেছেন, টাকা-পয়সা-হারমোনিয়াম দিয়েছেন তা হল তার গান। তাকে বলা হয়েছে চুনাওর মিটিংয়ে মিটিংয়ে নতুন নতুন গান বেঁধে শোনাতে হবে। গানে এমন সব কথা থাকবে যাতে রঘুনাথ সিংয়ের বিরুদ্ধে চুনাওতে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের সম্বন্ধে শ্রোতাদেব মন বিরূপ হয়ে ওঠে। রাতের পর রাত নৌটঙ্কীর গান গেয়ে আসর মাত করে দিলেও চুনাওব গান ফাগুবামের কাছে পুরোপুরি নতুন। যেটুকু সে বেঁধেছে সেই নমুনাটুকু কাউকে শোনাতে পারলে আন্দাজ পাওয়া যেত এই কিসিমের গান মিটিংয়ের শ্রোতাবা পছন্দ করবে কিনা।

ঝড়ের বেগে গাঁটওলা সরু সরু মাংসহীন আঙুলগুলো হারমোনিযামের রিডের ওপর চালাতে চালাতে গান শুরু করে দেয় ফাগুরাম।

আপ সিং রঘুনাথ হ্যায়
ছত্রিয়কুল প্রধান
ভোট দিজিয়ে সিংকো
হোগা সব কল্যাণ
বোল প্যারে বোল প্যাবে
রঘুপতি রাঘব রাজারাম।

ভারি মিঠে গলা ফাগুবামেব। গান থামিয়ে সে শুধোয়, 'কেমন লাগল ধম্মা?'

শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ধর্মা। খানিক আগের ঈর্ষার অনেকখানিই এখন আর নেই। বড়ে সবকার এমন গলার দাম দিয়ে ভালই করেছেন। ধর্মা বলে, 'আচ্ছা—'

'লোকের পসন্দ্ হবে?'

'জরুর।'

ফাগুরাম খুশি হয়। এবাব হালকাভাবে হারমোনিয়াম বাজাতে থাকে সে।

ধর্মা বলে, 'থামলে কেন? বাকিটা গেয়ে ফেল ফাগ্‌গু চাচা।'

ফাগুরাম জানায়, গানের শেষ অংশটা এখনও বানানো হয় নি। হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'তুই এখন ঘরে যা ধম্মা।'

এত খাতিব করে গান শোনাতে শোনাতে আচমকা ফাগুবাম কেন যে তাকে চলে যেতে বলছে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে ধর্মা।

ফাগুরাম ধর্মার মনোভাবটা টের পায়। এবার সে বুঝিয়ে বলে, 'কাল গারুদিয়া বাজারে বড়ে সরকার চুনাওর মিটিন করবেন। সেখানে আমাকে শুরুতেই গাইতে হবে। রাতভর জেগে এখন বাকি গানটা বাঁধব, সুর চড়াব। তুই থাকলে গান বানানো, সুর চড়ানো কিছুই হবে না। গুস্‌সা হোস না।'

এবপর আর গুস্‌সার প্রশ্ন ওঠে না। ধর্মা মানুষ হিসেবে যথেষ্টই বিবেচক। সে উঠে পড়ে। ফাগুরাম বলে, 'গানটা পুরা হলে তোকে পরে শুনিয়ে দেব।'

'ঠিক হ্যায়।' ফাগুরামের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে নামে ধর্মা।

উনিশ

পরের দিন সকালে খামারবাড়িতে হাল-বয়েল নেওয়ার জন্য আসতেই হির্মাগিরি ধর্মাদের জানায়, 'আজ তুবন্ত খেতির কাম চুকিয়ে ফেলবি। সূরয ডুববার অনেক আগে হাল-বয়েল এখানে জমা দিয়ে বসে থাকবি। এখান থেকে মুনশিজি তোদের এক জায়গায় নিয়ে যাবে। কানমে ঘুষল—'

সবাই সমস্বরে জানায়, 'হাঁ হুজৌর—'

ধর্মার আচমকা মনে পড়ে, অনেকদিন পর কাল বগেড়ির জন্য সাবুই ঘাসের জঙ্গলে ফাঁদ পেতে রেখে এসেছে। খামারবাড়িতে মুনশি আজীবচাঁদের জন্য কতক্ষণ বসে থাকতে হবে জানা নেই। তারপর মুনশিজি কোথায় নিয়ে আরো কতটা সময় আটকে রাখবে তারও ঠিক নেই। রাত বেশি হয়ে গেলে বগেড়ি নিয়ে ঠিকাদারদের কাছে যাওয়া যাবে না। কয়েকটি টাকার যে আশা ছিল তা পুরোপুরি বরবাদ।

ভয়ে ভয়ে ধর্মা শুধোয়, 'হুজৌর, মুনশিজি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?'

হিমগিরিনন্দন সরু গলায় খেঁকিয়ে ওঠে, 'গেলেই দেখতে পাবি। সূরয চড়ে যাচ্ছে। আভ্‌ভি জমিনে চলে যা।'

আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না ধর্মার। এই সকালবেলাতেই হঠাৎ তার মাথায় খুন চড়ে যায়। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, কভ্‌ভী নায়, কভ্‌ভী নায়। সূরয ডোবার আগে হাল-বয়েল জমা দিয়ে মুনশিজির জন্য সে কিছুতেই বসে থাকবে না। কিন্তু যা ইচ্ছে করে তা কি মুখ ফুটে সব সময় বলা যায়? বিরক্ত অসন্তুষ্ট ধর্মা রাগে ঘাড় গোঁজ করে রঘুনাথ সিংয়ের খেতিতে এসে জমি চষতে শুরু করে দেয়।

অন্য সব দিনের সঙ্গে আজকের কোনো তফাত নেই। দুপুর পর্যন্ত একটানা লাঙল ঠেলা, দুপুরে কালোয়া খেয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে ফের খেতিতে নেমে পড়া — সব কিছু একই নিয়মে ঘটে যায়। এর মধ্যে হাইওয়ে দিয়ে বড়ে সরকারের ভোটের গাড়ি আর নেকীরাম শর্মার ঘোড়ায়-টানা টাঙ্গা 'বোট দো' 'বোট দো' করতে করতে বিজুরি তালুকের দিকে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। বড়ে সরকার আর প্রতিভা সহায়ের মতো নেকীরামের জিপ নেই। অগত্যা টাঙ্গায় করেই কয়েকটা ছোকরা তার জন্য ভোট চাইতে বেরিয়েছে।

কাল তবু আকাশে অল্পস্বল্প টুকরো টাকরা মেঘ ভেসে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল। আজ তার ছিটেফোঁটাও নেই। গলা কাঁসার মতো গনগনে আকাশ থেকে জেঠ মাহিনার ঝাঁ ঝাঁ রোদ নেমে আসছে।

বিকেল হতে না হতেই দেখা গেল, লঝ্‌ঝড় সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে বগুলা ভকত এসে হাজির। অন্য দিন বিদঘুটে ট্যারাবাঁকা চেহারার সিসম বা পরাস গাছের গায়ে সাইকেলটা ঠেসান দিয়ে রেখে রামলছমন খেতিতে খেতিতে ঘুরে সবার কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তারপর বকের মতো ঠ্যাং ফেলে ফেলে যুবতী দুসাদিনদের পেছনে পেছনে ছোঁক ছোঁক করতে থাকে। আজ কিন্তু সাইকেলটা ধরে রেখেই ভীষণ ব্যস্তভাবে চেঁচাতে লাগল, 'এ গণেরি, এ ধম্মা, এ মাধো — আজ আর কাম করতে

হবে না। হাল-বয়েল নিয়ে তুরন্ত আমার সাথ চল—'

শুধু ধর্মাদেরই না, তাড়া দিয়ে দিয়ে মরশুমী আদিবাসী কিষানগুলোর কাজও বন্ধ করে দেয় রামলছমন। তারপর সবাইকে নিয়ে সোজা খামারবাড়িতে চলে আসে। সূরয ডোবার আগে জমি চষা থামালে বড়ে সরকারের পা-চাটা কুত্তারা যেখানে খেপে ওঠে সেখানে আজ কী এমন হয়েছে যে কাজ বন্ধ করিয়ে বগুলা ভকত তাদের ডেকে নিয়ে এল!

বড় সড়ক দিয়ে আসতে আসতে গণেরি জিজ্ঞেস করে, 'কা দেওতা, আজ সূরয ডোবার আগেই কাম বন্ধ করে দিলে কেন?'

রামলছমন দাঁত বার করে বলে, 'তোদেরই তো দিন এখন গিদ্ধড়েরা। ভোটের পরব এসেছে। পাওকা জুত্তি এবার মাথায় চড়বে।'

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় না। গণেরি বিমূঢ়ের মতো শুধোয়, 'কা মতলব দেওতা?'

'চল না, গেলেই বুঝতে পারবি।'

খামারবাড়িতে এসে ধর্মারা দেখতে পায়, শুধু তারাই না, দোসাদটোলার বাতিল বুড়োবুড়ি বাচ্চা-কাচ্চারা গাদা মেরে বসে আছে। দোসাদরা ছাড়াও গারুদিয়া তালুকের দূর দূর গাঁ থেকেও এনে জড়ো করা হয়েছে আরো চার পাঁচ হাজার লোককে। খামারবাড়ির সামনের দিকে রাস্তায় কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ষাট সত্তরটা বয়েল এবং ভৈসা গাড়ি।

এত লোকজন, এত গাড়ি দেখে ধর্মারা তাজ্জব। গণেরি, বুধেরি, ধর্মা অর্থাৎ জমিন থেকে যারা যারা রামলছমনের সঙ্গে এসেছে, চাপা নিচু গলায় তারা দোসাদটোলার বাতিল বুড়োবুড়িদের শুধোয়, 'কা রে, তোরা এখানে?'

বুড়োবুড়িরা জানায়, হিমগিরি লোক পাঠিয়ে তাদের ডাকিয়ে এনেছে।

'কায়?'

'কা জানে—'

অন্য গাঁয়ের মানুষজনকে জিজ্ঞাসা করেও একই উত্তর পাওয়া যায়। তাদেরও লোক পাঠিয়ে ডেকে আনা হয়েছে। কী উদ্দেশ্যে এতগুলো লোক যোগাড় করা হয়েছে, কেউ জানে না। শুধু বলা হয়েছে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের তলব। তাতেই সুড়সুড় করে সবাই 'এক মিল' 'দো মিল' 'তিন মিল' কি আরো বেশি রাস্তা জেঠ মাহিনার তেজী রোদ মাথায় নিয়ে গৈয়া কি ভৈসা গাড়িতে চেপে চলে এসেছে।

আচমকা হিমগিরিনন্দন তুরপুন চালানো সরু গলায় ধর্মাদের উদ্দেশে চেঁচাতে থাকে, 'তুরন্ত সবাই হাল-বয়েল জমা দিয়ে ভৈসা আর বয়েল গাড়িতে গিয়ে ওঠ।' বলে সামনের গাড়িগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায়, শুধু ধর্মাদেরই না, তাড়া দিয়ে দিয়ে হিমগিরি এবং রামলছমন অন্য সবাইকেও গাড়িগুলোতে তুলে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ষাট সত্তরটা গাড়ি লাল ধুলো উড়িয়ে মিছিল করে চলতে শুরু করে।

এদিকে জ্যৈষ্ঠের সূর্য ডুবে গেছে। গারুদিয়া তালুকের ওপর আবছা অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। এতক্ষণ উলটোপালটা বাতাস গরম ভাপ ছড়াচ্ছিল। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক আস্তে আস্তে জুড়িয়ে যাচ্ছে।

একসময় গাড়িগুলো গারুদিয়া বাজারের পশ্চিম দিকের খোলা মাঠে এসে পড়ে। এধারে ওধারে তাকিয়ে ধর্মারা বেজায় হকচকিয়ে যায়। মাঠ জুড়ে যতদূর চোখ যায় অগুনতি মানুষ আগে থেকেই এসে বসে আছে। তা দশ পনের হাজার তো হবেই। লোকজনের ফাঁকে ফাঁকে বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুঁতে বিজলি বাতি আর লাউড স্পিকারের চোঙ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। চারদিকে শুধু রোশনি আর রোশনি।

সামনের দিকে লাল সালুর কাপড় দিয়ে মোড়া বিরাট উঁচু মঞ্চ। সেখানে প্রচুর চেয়ার টেবিল সাজানো হয়েছে। একদিকে রয়েছে সাদা ফরাস পাতা। গোটা মঞ্চটা এখন একেবারে ফাঁকা।

একটা বয়েল গাড়িতে ধর্মার পাশে বসে ছিল গণেরি। বলে, 'অব সমঝ গিয়া—'

ধর্মা শুধোয়, 'কা গণেরিচাচা?'

'বড়ে সরকারকা চুনাওকা 'মিটিন' হোগা ইধরি। উসি লিয়ে হামনিলোগনকো হিঁয়া লেকে আয়া—'

'হাঁ?'

'হাঁ।'

সকালবেলা হিমগিরি তাড়াতাড়ি খেতির কাজ চুকিয়ে আজ ধর্মাদের চলে আসতে বলেছিল। তাতেও তর সয়নি। দুপুরের তেজ পড়তে না পড়তেই রামলছমনকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণে বোঝা যায়, কেন সূর্যাস্তের আগেই তাদের জমি থেকে উঠিয়ে এত খাতির করে গাড়িতে চাপিয়ে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

গণেরি চাপা নীচু গলায় বলে, 'হামনিলোগনকো বহোত সৌভাগ—'

গণেরির গলার স্বরে এমন কিছু রয়েছে যাতে ধর্মা ঘাড় ফেরায়, 'কায় চাচা?'

'আরে মূরখ গাধ্ধে, গাড়িতে চড়িয়ে মিটিনে নিয়ে এল; আমাদের সৌভাগ না?'

ধর্মা কী বলতে যাচ্ছিল, বলা হয় না। এই সময় কোত্থেকে মাটি ফুঁড়ে মুনশি আজীবচাঁদ, ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ আর কয়েকটা ছোকরা উঠে আসে। জমি চষতে চষতে এই ছোকরাগুলোকে বড়ে সরকারের ভোটের গাড়িতে করে পাক্কী দিয়ে অনেক বার বিজুরি তালুকে যাতায়াত করতে দেখেছে ধর্মারা।

মুনশি আজীবচাঁদ চিৎকার করে বলতে থাকে, 'রুখ যা, রুখ যা—'

কাতার দিয়ে বয়েল আর ভৈসা গড়িগুলো মাঠের একধারে দাঁড়িয়ে যায়। আজীবচাঁদ এবং অযোধ্যাপ্রসাদরা সবগুলো গাড়ির কাছে ছোটাছুটি করতে করতে সওয়ারিদের উদ্দেশে চেঁচাতে থাকে, 'উতারকে আ, উতারকে আ—' এর মধ্যে অযোধ্যাপ্রসাদের উৎসাহই সব চাইতে বেশি। বোঝা যায়, এত সব গৈয়া ও ভৈসা গাড়ির ব্যবস্থা সে-ই করেছে।

হুড়মুড় করে গাড়িগুলো থেকে লোকজন নেমে পড়ে।

মাঠের যেখানটায় আগে থেকেই কয়েক হাজার মানুষ বসে পড়েছে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে অযোধ্যাপ্রসাদরা বলতে থাকে, 'উধার যাকে বৈঠ। ধীরেসে — ধীরেসে। বড়ে সরকার আভ্‌ভি আ যায়েগা। উসকা বাদ মিটিন চালু হোগা—'

গাড়ি থেকে নেমে ধর্মারা মাঠের ভিড়ে মিশে যায়। মিটিং কখন শুরু হয় তার ঠিকঠিকানা নেই। ধর্মা এবং তার সঙ্গীসাথীরা আগে থেকে যারা এসে বসে আছে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। কথায় কথায় জানা যায়, আজ ভোর থেকেই বড়ে সরকারের লোকেরা বয়েল আর ভৈসা গাড়ি পাঠিয়ে তাদের আনিয়েছে। সেরেফ মিটিনকা লিয়ে।

রাত একটু বাড়লে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং তাঁর পা-চাটা কুত্তাদের নিয়ে দামি টমটম চালিয়ে মিটিংয়ের মাঠে চলে আসেন এবং টমটম থেকে নেমে সোজা মঞ্চে গিয়ে ওঠেন। কা তাজ্জবকি বাত, বড়ে সরকারদের পেছন পেছন ফাগুরামকেও দেখা যায়। তাব গলায় রঘুনাথ সিংয়ের দেওয়া সেই নতুন ঝকমকে দামি হারমোনিয়ামটা। পরনে নতুন ধুতি কুর্তা পাগড়ি, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। ভোল একেবারে পালটে গেছে ফাগুয়ার। সে গিয়ে ফরাসে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে পড়ে। বোঝা যায়, চুনাওর এই মিটিংয়ে বড়ে সরকার কিছু গানবাজনার ব্যবস্থা করেছেন।

বড়ে সবকার এবং তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গীরা মঞ্চের চেযারগুলো দখল করে বসে। অযোধ্যাপ্রসাদ এবং কয়েকটা ছোকরাও তাঁদের সঙ্গে ওপরে উঠেছিল। তারা গলা ফাটিয়ে মাইকে স্লোগান দিতে শুরু করে।

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো।'

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো।'

'রঘুনাথ সিং এম্লে হোনেসে কা মিলেগা?'

'রামরাজ, রামরাজ।'

'হাঁথি চিহ্ন্‌ পর—'

'মোহর মার, মোহর মার।'

লাউডস্পিকারে এইসব কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ে। সারা মাঠ গমগম করতে থাকে।

একসময় স্লোগান শেষ হয়। মিটিং-এর পরিবেশটা মোটামুটি তৈরি হয়ে যায়। বড়ে সরকারের প্যারা দোস্ত মহকুমার বড় ভকিল গিরধরলালজি ছোকরাদের হাতের ইশারায় সরিয়ে দিয়ে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ান। বলেন, 'ভাইলোগ আউর বহেনো, আপনারা সবাই জানেন বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংজি এবার গারুদিয়া আউর বিজুরি তালুক থেকে চুনাওতে নেমেছেন। এ আমাদেব সবার বহোত বহোত সৌভাগের কথা। ভগোয়ানের দয়ায় আউর রঘুনাথজির কির্‌পায় দুই তালুকের হর আদমীর দুখ, কষ্ট, অভাব—বিলকুল সব চলে যাবে। এখানকার সব আদমীব মুখে হাসি ফুটবে। ভুখা-নাঙ্গা কাউকে থাকতে হবে না। তব্ হাঁ, এ সব চাইলে একটা কথা মনে রাখতে হবে। চুনাওতে যাতে বড়ে সরকার জিততে পারেন তার ব্যওস্থা করা দবকাব। ভাইয়া আউর বহিনরা, সেই ব্যওস্থা রয়েছে আপনাদের হাতে। আজাদীর পর থেকে আপনারা কতবার চুনাও দেখলেন, কত লোককে এম. এল. এ বানালেন, এম পি বানালেন। মগর কিছু হল কী? কিচ্ছু হয় নি। চুনাও আসে, চুনাও যায়। আজাদীর আগে আপনাবা যেখানে ছিলেন ঠিক সেখানেই পড়ে আছেন। আপনাদের দুখ দেখে বড়ে সরকার মনমে বহোত দুখ পান। তাঁকে অনেক বলে কয়ে হাতে-পায়ে ধরে এবার আমরা চুনাওতে নামিয়েছি। হাতিমার্কা কাগজে মোহর মেরে তাঁকে জেতান। মনে রাখবেন, বড়ে সরকার জিতলে গারুদিয়া আউর বিজুরি তালুকে জরুর রামরাজ নেমে আসবে।' বলেই হাতের ইশারায় সেই ছোকরাগুলোকে ডেকে স্লোগান দিতে বলেন গিরধরলালজি।

মঞ্চের পেছন থেকে ছোকবাগুলো মাইকের কাছে এসে আবার স্লোগান দিতে থাকে।

'হাঁথি চিহ্ন্‌ পর—'

'মোহর মার, মোহর মার।'

'রঘুনাথ সিং জিতনেসে কা মিলেগা—'

'রামরাজ, রামরাজ।'

দ্বিতীয় প্রস্থ স্লোগানের পর গিবধরলাল ফের বলেন, 'ভাইয়া আর বহিনরা আপনারা সবাই শুনেছেন, এবার চুনাওতে রঘুনাথজি ছাড়া আর যাঁরা নেমেছেন তাঁরা হলেন প্রতিভা সহায়, নেকীরাম শর্মা, সুখন রবিদাস আউর আবু মালেক। মনে রাখবেন দুখ-কষ্ট-অভাব, এ সবের হাত থেকে বাঁচতে হলে রুঘুনাথজিকে ভোট দিতেই হবে। মনে রাখবেন হাতিমার্কা কাগজে মোহর মারতে হবে।' বলেই আকাশের দিকে হাত তুলে গিরধরলাল চেঁচিয়ে ওঠেন, 'রঘুনাথ সিং—'

সেই ছোকরাগুলোকে আগে থেকেই শেখানো ছিল। তারা একসঙ্গে শূন্যে হাত ছুঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'যুগ যুগ জীও—'

'রঘুনাথ সিং—'

'যুগ যুগ জীও।'

'বঁচনা হ্যায় তো—'

'হাঁথিমে মোহর।'

'বঁচনা হ্যায় তো—'

'হাঁথিমে মোহর।'

মিটিং সরগরম করে বড় উকিল গিরধরলাল বলেন, 'ভাইয়া আউব বহিনরা, এবার বড়ে সবকারের মুখ থেকে আপনারা কিছু শুনুন—' বলেই নিজের নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে গিয়ে বসে পড়েন।

রঘুনাথ সিং তাঁব বিপুল শরীর নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ান। তাঁর চেহাবার যা বহর তাতে 'হাতি'র প্রতীকটি বড়ই মানানসই হয়েছে। মাইকের ডাঁটিটা ধরে তিনি বলেন,

'ভাইয়া আর বহিনরা, আমি আগে কিছু বলব না। আমার বলার আগে থোড়াকুছ গানবাজনা হবে। গারুদিয়ার কোয়েল ফাগুরামকে তো আপনারা চেনেন।'

কয়েক হাজার শ্রোতা সমস্বরে চিৎকার করে জানাল, 'হাঁ হাঁ, সরকার। ও নৌটঙ্কীবালা—'

'হাঁ — নৌটঙ্কীবালা। ওর গলায় আওয়াজ বড়ী মিঠি। ফাগুরাম ক'টা গান বেঁধেছে। আগে সেই গানগুলো শুনে নিন।' বলে ফাগুরামের দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করেন।

সঙ্গে সঙ্গে দু হাতের দশ আঙুল চালিয়ে হারমোনিয়াম বাজাতে শুরু করে ফাগুরাম। তার সামনেও একটা মাইক রয়েছে।

ফাগুরাম নৌটঙ্কীবালার নাম জানে না, বিশ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে এমন লোক নেই। নেহাত কয়েক সাল ফাগুরামের খারাপ সময় যাচ্ছে। বুকের দোষ হওয়াতে এখন আর নৌটঙ্কীর আসরে গাইতে পারে না। তবে আগে যারা একবার তার গান শুনেছে, এখনও ভুলতে পারেনি। গারুদিয়া বাজারের গায়ে এই চুনাওর মিটিংয়ের কয়েক হাজার শ্রোতা চনমনিয়ে উঠে পিঠ খাড়া করে বসে।

একসময় বাজনা থামিয়ে ফাগুরাম বলে, 'বড়ে ভকিলজির মুহ্‌সে আপনারা শুনেছেন, এহী সাল চুনাওতে নেকীরাম শর্মা, পরবতিভা সহায়, সুখন রবিদাস, আর মালেক নেমেছে। আমি এদের নিয়ে গানা বেঁধে সবাইকে শোনাব।' বলেই ফের হারমোনিয়ামে ঝড় তুলে বাজাতে শুরু করে। 'আ আ' করে সুরটাকে গলায় বসিয়ে গানও ধরে :

বোল প্যারে বোল প্যারে
রঘুপতি রাঘব রাজারাম—
শর্মাজিকো দেখিয়ে
ভুল ধরমকা জ্ঞেয়ান।
চারো হাতসে সুদ মাঙতা,
সুদমেই পুরা ধেয়ান।
ভোট মাঙনে আয়ে হে
হোতে সব হয়রান।
বোল প্যারে বোল প্যারে . . . . . .

গানের সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোকরাগুলো মঞ্চের পেছনে দাঁড়িয়ে তালে তালে দু হাতে তালি বাজাতে লাগল। তেজী বিজলি আলোয় দেখা যাচ্ছে বড়ে সরকার মুখ টিপে টিপে হাসছেন। তাঁর সঙ্গীদের মুখেও হাসি। বোঝা যায়, ফাগুরামের গান শুনে তাঁরা পরিতৃপ্ত।

শ্রোতারাও খুব হাসছিল। গণেবির পাশে বসে হেসে গড়িয়ে পড়তে থাকে ধর্মা। সে বলে, 'ফাগুচাচা বহোত আচ্ছা গানা বেঁধেছে। কা মজাদার।'

এখানে বলে নেওয়া দরকার, নেকীরাম শর্মা স্কুলে পড়ালেও তার গোপন সুদের ব্যবসা আছে। এ অঞ্চলের বিখ্যাত সুদখোর সে। তার কাছ থেকে 'করজ' নিলে ফি মাসে এক টাকায় দু টাকা সুদ। গারুদিয়ার কত লোকের রক্ত চুষে চুষে সে যে ছিবড়ে করে দিয়েছে তার হিসেব নেই।

ফাগুরাম এবার তার দু নম্বর গান শুরু করে

কায়াথকুলকি পরবতিভা
হ্যায় নখরোকি খান
ভোট মাঙনে আয়ী হ্যায়
হাঁসে সারা জাহান।
পরতিভাকে ভোট দেনেসে
হো যায়গা বাজরাজ (বাঁজা মেয়ে মানুষের রাজত্ব)
বোল সখী বোল সখী
ক্যায়সে মিলে রামরাজ?

হাততালির তোড় এবার বেড়ে যায়। মঞ্চের সেই ছোকরাগুলোই না, শ্রোতাদের মধ্যেও সংক্রামক ব্যাধির মতো তা ছড়িয়ে পড়ে।

পয়সাওলা বড়ে ঘরকা বহু আঁটকুড়ী প্রতিভা সহায়কে এবারকার চুনাওয়ে ভোট মাঙবার জন্য দু-চারটে গাঁওয়ে ঘুরতে দেখা গেছে। তাঁর সাজগোজ ঠাট ঠমকই অন্যরকম। ফাগুরাম তাঁর চালচলনকে খোঁচা দিয়ে এই গান বেঁধেছে।

ভিড়ের ভেতর আর সবার সঙ্গে প্রাণভরে হেসেই যাচ্ছে ধর্মা।

ফাগুরাম এবার তিন নম্বর গান শুরু করে :

চুনাওরাজমে দেখিয়ে
হ্যায় আশ্চরকে (আশ্চর্য) খান
চোরচামারকি জাত হ্যায়
সুখন দাস মহান।
বোল প্যারে বোল প্যারে
রঘুপতি রাঘব রাজারাম।

জাতপাতের দারুণ কড়াকড়ি এখানে। নিজে অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের বংশধর হয়েও রঘুনাথ সিংয়ের জন্য আরেক অচ্ছুৎকে নিয়ে গান বানিয়েছে ফাগুরাম। হাজার হাজার অচ্ছুৎ, ভুখানাঙ্গা জনমদাস, মরশুমী কিষান, নির্ভূম খেতমজুর এই গানের ভেতর কী আছে, তলিয়ে বোঝে না। বুঝবার শক্তিও নেই। গানটার বাইরের দিকে যে গাঁজানো মোটা রসের মজা আছে তাতেই তারা খুশি। তারা হাসতেই থাকে।

চার নম্বর গানটা ধরার আগে হারমোনিয়াম থামিয়ে মাইকের কাছে মুখ এনে ফাগুরাম বলতে থাকে, 'শর্মাজি, পরতিভাজি আউর সুখন রবি দাস ক্যায়সা আদমী, আপনারা জানেন। তবু আরেক বার মনে করিয়ে দিলাম। এইসব আদমী, চুনাওতে জিতে এম্লে বনলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আভি শুনিয়ে—' বলে রঘুনাথ সিংয়ের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে গান ধরে ফাগুরাম:

আপ রঘুনাথ সিং হ্যায়
ছত্রিয়কুল প্রধান
ভোট দীজিয়ে সরকারকো
হোগা সব কো কল্যাণ
বোল প্যারে বোল প্যারে
রঘুপতি রাঘব রাজারাম। ......

গান থামার পর সেই ছোকরাগুলো ফের হাতি চিহ্নে মোহর মেরে রঘুনাথ সিংকে চুনাওতে জেতাবার জন্য স্লোগান দিতে থাকে।

স্লোগানের পর রঘুনাথ সিং ফের মাইকের সামনে দাঁড়ান। আবার বলতে শুরু করেন, 'ভাইরা আউর বহিনরা, আপনারা গিরধরলালজির কথা শুনেছেন, ফাগুরামের গান শুনেছেন। শুনে প্রতিভা সহায়, নেকীরাম শর্মা, সুখন রবিদাস — এরা কে কিরকম আদমী, জরুর বুঝতে পেরেছেন। নেকীরাম বামহন হয়েও সুদখোর, যে তার কাছ থেকে করজ নেয় সে তার খুন চোষে। সুখন রবিদাস অচ্ছুৎ, সে জন্যে আমি তাকে ঘেন্না করি না, তার নামে উঁচা জাতের লোকেদের মতো তিনবার 'থুক' দিই না। তবে ও জানে কী? বোঝে কী? এম. এল. এ হওয়া কি সোজা ব্যাপার? ছেঁড়া জুত্তি কি রামচন্দরজির সিংহাসনে উঠতে পারে? আর ওই প্রতিভা সহায়? বড়ে ঘরকা বহু। মোটরিয়া ছাড়া এক কদম ফেলতে পারে না। হাজার রুপাইয়ার কমে শাড়ি পরে না। শহরবালী পাইসাবালী আওরতের শখ হয়েছে চুনাওতে নামবে। লেকেন ও ভুখানাঙ্গা গরিব গাঁওবালা ভারতবাসীর দুঃখকষ্টের কী জানে! এর আগে ক'রোজ ও গাঁওয়ে এসে থেকেছে? কোনটা ধানগাছ, কোনটা গেঁহু গাছ, ও ফারাক করতে পারবে? ও

আওরত কভ্ভি সড়কের চায় দুকানে বসে কিষানদের সঙ্গে চায় খেয়েছে, কভি গাঁওকা খেতিসে নহরকা বগলমে ট্রাট্রী কী? ও আপনাদের কেউ নয়, ওর সঙ্গে আপনাদের কোঈ সম্পর্ক নেহী। একটা কথা শুধু বলে রাখি, আমিই একমাত্র আপনাদের লোক — আপনা আদমী। জনম থেকে আপনাদের পাশাপাশি এই গাঁওয়েই আছি। আপনাদের ছেড়ে কোনোদিন শহরে চলে যাই নি। আমি জানি আপনা-পরায়া চিনে নিতে ভুল করবেন না আপনারা। আমার কথা খতম। ভাইয়া আউর বহিনরা, সবাইকে পরণাম। কোঈ পায়দল চলে যাবেন না। আপনাদের জন্য গাড়ি মজুদ রয়েছে। আপনাদের সবাইকে ঘরে পৌঁছে দেবে। পরণাম, পরণাম—'

রঘুনাথ সিং মাইকের কাছ থেকে সরে যান। সেই ছোকরারা আরেক বার গলার শিরা ছিঁড়ে স্লোগান দিতে থাকে।

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো।'

'হাঁতি চিহ্ন পর—'

'মোহর মার, মোহর মার।'

মধ্যরাতের কিছু আগে আগে গৈয়াগাড়িতে ফিরে আসছিল ধর্মা। তার পাশেপাশি বসে আছে আধবুড়ো গণেরি। সামনে পেছনে আরো শ'খানেক গাড়ি চলেছে। দিগন্ত জুড়ে এক শ গাড়ির দু'শ চাকায় অনবরত ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হতে থাকে।

গোটা রাস্তাটা এখন সরগরম। চাকার আওয়াজ তো আছেই। তা ছাড়া প্রতিটি গাড়িতেই রঘুনাথ সিংয়ের এই 'চুনাওকা মিটিন' নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা চলছে।

ক'দিন আগেই পূর্ণিমা গেছে। আকাশের মাঝখানে রুপোর প্রকাণ্ড কটোরার মতো গোল চাঁদ তখন চোখে পড়ত। এখন চাঁদটার বার আনা ক্ষয়ে ক্ষয়ে সিকি ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে.

রাস্তার দু'ধারে অবারিত শস্যক্ষেত্র। দূরে দূরে ঝাপসা দু-একটা দেহাত ঘুমে অসাড় হয়ে আছে। চারপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে লক্ষ কোটি জোনাকি উড়ছে।

ধর্মা হঠাৎ ডেকে ওঠে, 'চাচা—'

দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি গুঁজে বসে ছিল গণেরি। মুখ তুলে সে বলে, 'কা?'

'ফাগ্গুচাচা বহোত আচ্ছা গাইল আজ। গানগুলোও আচ্ছাই বেঁধেছে। তাই না গণেরি চাচা?'

গম্ভীর গলায় গণেরি বলে, 'তা বেঁধেছে। লেকেন আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'কী?'

'ফাগ্গুটার জান চৌপট না হয়ে যায়।'

ধর্মাকে এবার চিন্তিত দেখায়। ভীতু গলায় সে শুধোয়, 'কায় চাচা?'

গণেরি এবার যা বলে তা এইরকম। যাদের খোঁচা দিয়ে ফাগুরাম এই গান বেঁধেছে তারাও পাইসাওলা বড়ে আদমী। এই গান শুনে নিশ্চয়ই তারা খুশি হবে না। ফাগুরাম বাড়াবাড়ি করলে তার বিপদ ঘটে যেতে পারে।

ধর্মার আচমকা মনে পড়ে যায়, খানিকক্ষণ আগে চুনাওর মিটিংয়ে ফাগুরামের গান শুনে সবাই যখন হেসে গড়িয়ে পড়ছিল, গণেরি থমথমে মুখে চুপচাপ বসে ছিল। তা ছাড়া সেদিন বড়ে সরকার যখন ফাগুরামকে ডাকিয়ে প্রতিভা সহায়, নেকীরাম শর্মাদের নামে গান লেখার দায়িত্ব দেন তখনও তার দুশ্চিন্তার কথা বলেছে গণেরি।

চুনাওর এই সব গানের মধ্যে শুধু হাসি আর মজাই নেই, মারাত্মক বিপদও রয়েছে। ফাগুরামের ভবিষ্যতের কথা ভেবে হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠে ধর্মা।

একসময় কয়েকটা গৈয়াগাড়ি দোসাদটোলায় পৌঁছে যায়। বাকিগুলো গারুদিয়া তালুকের নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কুড়ি

রঘুনাথ সেই যে কুয়োকাটাইদের পাঠিয়েছিলেন, তারা পুরনো কুয়োর বালি তো সাফ করেছেই, নতুন একটা কুয়োও কাটিয়ে দিয়ে গেছে। ফলে দোসাদটোলায় জলের কষ্টটা আর নেই। আগে কুয়ো ছেঁচে ময়লা শ্যাওলা-ভাসা জল দু-এক লোটা তুলে মাথায় ঢালতে হত। এখন, এই গরমের সময়টা সবাই প্রাণভরে স্নান করতে পারছে। পীনেকা পানি অর্থাৎ খাবার জলের জন্য কাউকে আর কোয়েলের মরা খাতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বালি খুঁড়তে হয় না। নিজেদের মহল্লাতেই টলটলে সুস্বাদু খাবার জল পাওয়া যায়। এ জন্য জনমদাসেরা বাকি জীবন বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল। তবে বহুদর্শী গণেরি আগে বার বার যা বলেছে, পরেও বার বার সেই একই কথা বলে, এ সবই নাকি চুনাওকা লিয়ে। বড়ে সরকার চুনাওতে না নামলে নতুন কুয়ো তো কপালে জুটতই না, পুরনো কুয়োর বালিও যে কবে কত সাল বাদে সরানো হত তার ঠিক নেই।

সারাদিন জমি চষে, হাল বয়েল খামারে জমা দিয়ে ঠিকাদারদের কাছে বগেড়ি বেচে দোসাদটোলায় ফিরতে ফিরতে আজ বেশ রাত হয়ে গেল ধর্মা আর কুশীর। ঢোকার মুখে হঠাৎ তাদের চোখে পড়ে কুয়োর এধারের ফাঁকা জায়গাটায় জটলা চলছে। এখন কোনো ঘরেই লোকজন নেই। সবাই বাচ্চাকাচ্চা সুদ্ধু ওখানে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে। হঠাৎ দোসাদটোলায় কী এমন হল, ধর্মারা বুঝতে পারে না। খানিকটা অবাক হয়েই পায়ে পায়ে তারা জটলাটার কাছে চলে আসে।

চারপাশে গোটা কয়েক মিট্টি তেলের লণ্ঠন জ্বলছে। তার আলোয় দেখা যায়, ভিড়ের মাঝখানে একটা হাতলভাঙা পুরনো চেয়ারে বসে আছে অবোধনারায়ণ পাণ্ডে। বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। লম্বা-চওড়া বিশাল চেহারা। গোল মুখ, ছোট ছোট ধূর্ত চোখ, ধারাল থুতনি, পুরু কালচে ঠোঁট। তার কানে সোনার মাকড়ি। কপালে লাল চন্দনের বড় ফোঁটা, টিকির তলায় একটা গিঁট বাঁধা। পরনে মোটা সুতোর ধুতি আর জামা, পায়ে কাঁচা চামড়ার ভারি জুতো। অবোধজি এ অঞ্চলের বড় ব্যওসাদার। বিজুরি বাজার আর চাহাঢের হাটিয়ায় তার ধান চাল চিনি গেঁহু, তিল তিসি, মুগ মুসুরের অনেকগুলো আড়ত। শোনা যায় ধানবাদে এক ছেলে সাইকেলের ব্যবসা দেখছে, আরেক ছেলে কাটিহারে রেডিও সেলাইকল হারমোনিয়ামের কারবারে বসেছে। লোকে বলে, অবোধনারায়ণের সিন্দুকভর্তি অগাধ টাকা। এত বড় পাইসাওলা আদমী তাদের মতো গরিব ভুখানাঙ্গা অচ্ছুতিয়াদের পাড়ায় এত রাত করে কেন যে হাজির হয়েছে, ধর্মা ভেবে পায় না।

অবোধনারায়ণ বলছিল, 'কা গণেরি, আমার কথাটা শুনলি তো।'

ধর্মা বুঝতে পারে, কুশী এবং সে আসার আগেই অবোধজির সঙ্গে গণেরিদের কিছু কথা হয়েছে। কী কথা জানবার জন্য তার আগ্রহ চড়তে থাকে।

গণেরি ঘাড় কাত করে, 'হাঁ, শুনা তো পাণ্ডেজি।'

পকেট থেকে রুপোর প্রকাণ্ড একটা চৌকো কৌটা তুলে এনে সেটার ভেতর থেকে গোছা গোছা তামাক পাতা এবং চুন বার করে গণেরি বুধেরিদের হাতে দিতে দিতে অবোধনারায়ণ বলে, 'খৈনি বানিয়ে সবাইকে দে।' তারপর নিজেও বাঁ হাতের তালুতে তামাক-চুন দিয়ে ডলতে শুরু করে।

অবোধনারায়ণের মতো বড়ে আদমীর কাছ থেকে চুন-তামাক পাওয়া মস্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। বিগলিত গদগদ অচ্ছুৎ জনমদাসেরা পরম ভক্তিভরে খৈনি বানাতে থাকে। শুধু গণেরির মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়।

টাটকা খৈনির খানিকটা বাঁ হাতের তালু থেকে দু আঙুলে তুলে নিচের পাটির দাঁত এবং ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে কিছুক্ষণ থম মেরে বসে থাকে অবোধনারায়ণ। তারপর পিচিক করে কালচে রঙের থুতু ফেলে বলতে থাকে, 'সাত আট রোজ বাদে গরুদিয়া বাজারের মাঠে পরতিভা সহায়জি চুনাওর মিটিন করবেন। তোদের সবাইকে যেতে হবে। রঘুনাথ সিং তোদের ভৈসা আউর গৈয়া গাড়ি করে মিটিনে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা তোদের কিসে করে নিয়ে যাব জানিস?'

বোঝা যায়, ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ যেমন রঘুনাথ সিংয়ের মিটিংয়ের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে তেমনি ব্যওসাদার অবোধনারায়ণ পাণ্ডে নিয়েছে প্রতিভা সহায়কে নির্বাচনে তরিয়ে দেওয়ার দায়।

এদিকে চারপাশের ভিড়টা নড়ে চড়ে বসে। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে সবাই শুধোয়, 'কিসে করে?'

'হাওয়াই গাড়িতে চাপিয়ে। পরতিভাজি বিশগো হাওয়াই গাড়ি তোদের জন্যে মজুদ রেখেছে। সমঝা?' আতাফলের দানার মতো কালো কালো দাঁত আর মাড়ি বার করে হাসে অবোধনারায়ণ। মোটরে চড়ার লোভটা দোসাদদের ওপর কী প্রতিক্রিয়া করছে, ঘাড় ঘুরিয়ে তা লক্ষ করতে থাকে।

এই জনমদাসেরা চোদ্দ পুরুষে দু-একবার বাসে চড়া ছাড়া কখনও মোটরে চড়ে নি। হাওয়াই গাড়িতে তাদের চুনাওর মিটিংয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। নিজেদের কানে শুনেও এত বড় সৌভাগ্যের ব্যাপারটা তারা যেন পুরো বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। খানিকক্ষণ অবাক বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকার পর একসঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'সচমুচ মোটরিয়া চড়ে?'

অবোধনারায়ণ হাসে, 'সচমুচ না তো কি ঝুটফুস?'

'নায়। অ্যায়সাই পুছা।'

অবোধনারায়ণ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই কুয়োর পশ্চিম ধারের একটা বারান্দা থেকে ধনপতের বাপ বুড়ো গৈরুনাথ চিলের গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'হামনি মোটরিযা চড়েগা, হামনি মোটরিয়া চড়কে মিটিন যায়েগা।'

গৈরুনাথের বয়েস হয়েছে শ'য়ের কাছাকাছি। পন্দর বিশ সাল আগে তার কোমর পড়ে গেছে, পায়ে শোথ ধরেছে, চামড়া ফেটে এখন কষ বেরোয়। চোখের রোশনি কবেই মরে গেছে। কিন্তু যম তাকে এখন পর্যন্ত ছোঁয় নি। বোধ হয় বিনাশ নেই গৈরুনাথের। অকেজো পঙ্গু বাতিল এই মানুষটা দিনরাত বারান্দায় দড়ির চৌপায়ায় শুয়ে থাকে। ছেলে ধনপত, পুতহু লখিয়া এবং নাতি-নাতনিরা সর্বক্ষণ তার মৃত্যু কামনা করে, কেননা তার পাকস্থলীটা এই বয়সেও মারাত্মক রকমের তেজী। একটা টগবগে জোয়ান মরদের পুরো খাদ্য সে হজম করে ফেলতে পারে। যে একটা পয়সা কামায় না, এক কণা খাবার জুটিয়ে আনার ক্ষমতা যার নেই তাকে শুইয়ে শুইযে খাওয়াতে কে আর চায়? কিন্তু কী আশ্চর্য, গৈরুনাথ বছরের পর বছর বেঁচেই থাকে। চোখে তেজ না থাকলেও কানদুটো তার অত্যন্ত প্রখর। এই একশ বছর বয়সে মোটর গাড়ি চড়ার দুর্মর লোভ হঠাৎ তাকে পেয়ে বসে।

গৈরুনাথের পুতহু অর্থাৎ ধনপতের বউ লখিয়া বারান্দায় বুড়োর কাছাকাছি বসে লম্বা ঘোমটা টেনে অবোধনারায়ণদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার ঘোমটার তলা থেকে চাঁচাছোলা খনখনে গলায় চেঁচাতে থাকে, 'বুড়হা শিয়ারের মোটরিয়া চড়ার শখ গজিয়েছে! গিধ কাঁহাকা! মোটরিয়ায় তুলে তোকে চিতায় দিয়ে আসব। মর, মর, মর—' মেয়েমানুষটার গলায় বিষ, জিভে ছুরির ধার।

ধনপত স্বামীর অধিকারে গর্জে ওঠে, 'চুপ হো যা মানুয়াকি মাঈ, চুপ হো যা —' নিজেরা অকর্মণ্য বাপের সঙ্গে ঘরে যে ব্যবহারই করুক, সেটা নিজেদের ব্যাপার। কিন্তু এত লোকের, বিশেষ করে অবোধনারায়ণের মতো মান্যগণ্য আদমীর সামনে বউ তার বাপকে এভাবে অসম্মান করবে সেটা ছেলে হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ব্যাপারটা তার পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর।

দোসাদটোলার মাতব্বর হওয়ার অধিকারে গণেরিও চাপা গলায় ধমকায়, 'চুপ হো যা ধনপতকি বহু—'

লখিয়ার গলার স্বর খানিকটা নামে ঠিকই কিন্তু ঘোমটার তলায় সে গজ গজ করতেই থাকে।

নিজের সংসারে গৈরুনাথের দাম একটা ফুটো কড়িও নয়। ছেলে, পুতহু, নাতিনাতনি — সবার কাছে বিলকুল বাতিল হয়ে গেলেও চুনাওর চোখে সে একটি অত্যন্ত মূল্যবান মানুষ। একটা মানুষ মানে একটা ভোট।

অবোধনারায়ণ মূরখ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক নয়। সে চটপট বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ, জরুর মোটরিয়ায় চড়ে তুমি মিটিনে যাবে।' বলে জমায়েতের দিকে ফেরে, 'সাত আট রোজ বাদে সন্ধেবেলায় সূরয ডোবার পর গাড়ি পাঠিয়ে দেব, মনে রাখিস। ওই সময়টা সবাই মহল্লাতেই থাকিস। কবে মিটিন তার আগের দিন এসে জানিয়ে যাব।'

ভিড়ের ভেতর মোটরে চড়ে মিটিংয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে চাপা উত্তেজনা এবং গুঞ্জন চলতে থাকে।

অবোধনারায়ণ ফের বলে, 'একটা কথা ভেবে দেখিস, পরতিভাজিকে ভোট দিলে তোদের ভালাই হবে। বহোত বড় ঘরকা লেড়কি পরতিভাজি, বড়ে ঘরকা বহু। উনি যা বলবেন গরমিন্ট তা করবে। পরতিভাজিকে যদি এম্লে বানিয়ে দিতে পারিস, গারুদিয়া আউর বিজুরির হাল ফিরে যাবে। এখান অসপাতাল বসবে, ডর্জন ডর্জন পাক্কী সড়ক হবে, গাঁয়ে গাঁয়ে ইস্কুল চালু হবে, কারখান্না ভি বসে যাবে। পরের জমিনে হাল ঠেলে জান বরবাদ করতে হবে না, কারখান্নায় মোটা তলবে তোরা নৌকরি পেয়ে যাবি।'

জনমদাসেরা কেউ কোনো কথা বলে না। তারা একবার অবোধনারায়ণকে, আরেক বার নিজেদের মাতব্বর গণেরিকে দেখতে থাকে। গারুদিয়া-বিজুরিতে কারখানা বসবে, নৌকরি মিলবে, বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে গতর চূরণ করে লাঙল ঠেলতে হবে না — এ সব নতুন কথা বটে এবং খুবই লোভনীয়।

অবোধনারায়ণ পাণ্ডে আরো বলে, গণেরিদের সে একটু আধটু আভাস দিল মাত্র। তারা আরো কী সুবিধা পাবে, এ অঞ্চলের আর কী কী উন্নতি হবে, প্রতিভা সহায় ভাল করে বিস্তারিতভাবে তাদের বুঝিয়ে দেবেন। শুধু তাই না, যারা তাঁর চুনাওর মিটিনে যাবে তাদের নগদ নগদ কিছু লাভও আছে।

গণেরি জিজ্ঞেস করে, 'কী লাভ?'

অবোধনারায়ণ অল্প একটু হাসে। জানায়, মোটরিয়াতে চড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে তিনগো করে রুপাইয়া পাবে।

মিটিংয়ে গেলে এতগুলো করে টাকা! সবার চোখ বিস্ময় এবং আশায় ঝকমক করতে থাকে।

অবোধনারায়ণ আর বেশিক্ষণ বসে না। ভুখানাঙ্গা অচ্ছুৎদের বুকের ভেতরকার নিদ্রিত লোভকে উসকে দিয়ে একসময় উঠে পড়ে। বলে, 'রাত অনেক হল, এখন যাই রে।' চেয়ারের দুবলা হাতলে আস্তে ভর দিয়ে বিপুল চর্বিওলা শরীর টেনে তোলে সে।

এই সময় ধনপতের বারান্দা থেকে বুড়ো গৈরুনাথ জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'তিনগো রুপাইয়া মিলেগা। হামনি মিটিন যায়েগা—'

এবার আর ঘোমটার তলায় লখিয়া খনখনে গলায় খেঁকিয়ে ওঠে না। তিনটে টাকা যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে মোটরিয়াতে চড়ে শ্বশুরের মিটিংয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার পুরো সায় আছে। একশ বছরের এই পঙ্গু অথর্ব লোকটা যে একেবারে অপদার্থ গলগ্রহ নয়, নেহাতই সুদীর্ঘ পরমায়ুর জোরে সেও যে দুটো পয়সা কামাই করতে পারে, এবারকার চুনাও তা টের পাইয়ে দেয়।

অবোধনারায়ণ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে গণেরিরাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বাইরের রাস্তা পর্যন্ত তারা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। এটা সম্মান দেখাবার ব্যাপার। অবোধনারায়ণ বলেছে, সারাদিন সবাই খেটেখুটে এসেছে। কষ্ট করে তাদের আর সঙ্গে যেতে হবে না। একরকম জোর করেই গণেরিদের এখানে রেখে সে চলে যায়।

অবোধনারায়ণ গেল বটে কিন্তু মোটরিয়া এবং মাথাপিছু নগদ তিনটে করে টাকার প্রতিশ্রুতি গোটা দোসাদটোলার শিরায় শিরায় উত্তেজনা ছড়িয়ে দিতে থাকে। সবাই গণেরির দিকে তাকিয়ে বলে, 'অব হামনিলোগ কা করেগা?'

'সোচনা পড়েগা—' গণেরি গম্ভীর মুখে বলে।

'সোচবার কী হল?' গোটা দোসাদটোলা ভয়ানক অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, 'পরতিভাজি আমাদের মোটরিয়া চড়াবে, নগদ রুপাইয়া দেবে। তিনগো রুপাইয়া কৌন দেতা? এর ভেতর সোচবার কিছু নেই।'

'জরুর আছে।'

'কা?'

গণেরি যা উত্তর দেয় তা এইরকম। প্রতিভা সহায় বড়ে সরকারের বিরুদ্ধে এবার চুনাওতে

নেমেছে। এদিকে তারা দোসাদরা রঘুনাথ সিংয়ের খরিদী কষান, তাঁর খেতিতে পুরুষানুক্রমে খাটছে, তাঁর জমিতে ঘরবাড়ি তুলে থাকছে। এখন মোটরিয়া চড়া আউর তিনগো করে রুপাইয়ার লালচে তারা যদি প্রতিভা সহায়ের চুনাওর মিটিনে যায় তাতে বড়ে সরকার কি খুশি হবেন? বিলকুল না। গণেরি বলতে থাকে, 'আমার এই কথাটা ভেবে দ্যাখ।'

সবাই চমকে ওঠে। এদিকটা কেউ চিন্তা করে দেখেনি। চুনাওতে তাঁরই ক্রীতদাসেরা লোভের বশে তাঁরই শত্রুপক্ষকে মদত দিতে যাবে আর এটা তিনি বরদাস্ত করবেন, এতখানি মহানুভবতা রঘুনাথ সিংয়ের কাছে আশা করা অন্যায়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এই কথাটা তারা বুঝতে পারে। তবু নগদ নগদ তিনটে করে টাকার লোভ একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। তারা শুধোয়, 'তা হলে কী করা দরকার?'

এতগুলো মানুষকে হতাশ করতে ইচ্ছা হয় না গণেরির। সে বলে, 'মিটিনের তো দেরি আছে। বীচমে পুরা সাত আট রোজ। ভেবে দেখি কী করা যায়। রাত হল, আর তেল পুড়িয়ে বসে থেকে কা ফায়দা? সব ঘরে যা—'

ঘরে ফিরে আরেক বার তাজ্জব বনে যায় ধর্মারা। শুধু সে-ই না, তার মা-বাপ, কুশী এবং কুশীর মা-বাপ পর্যন্ত। অবোধনারায়ণ আসার পর কেউ আর ঘরে ছিল না। এ পাড়ার সব দোসাদ আর দোসাদিন তার কথা শোনার জন্য কুয়োর পাড়ের ফাঁকা জায়গায় চলে গিয়েছিল।

অন্ধকারে বারান্দায় একটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে বিড়ি ফুঁকছে টিরকে। রাঁচী থেকে কখন সে এসেছে, টের পাওয়া যায় নি।

ভীষণ ব্যস্তভাবে ধর্মা বলে, 'আরে তুম টিরকে ভেইয়া!'

'ইয়াস, আমিই।' টিরকে হাসে।

'কতক্ষণ এসেছ?'

'পাক্কা ওয়ান আওয়ার — এক ঘণ্টা।'

'ডাকো নি কেন?'

টিরকে জানায়, এতক্ষণ চুনাওর ব্যাপারে জমায়েত বসেছে বলে সে তাদের বিরক্ত করে নি।

টিরকে আগেও বারকয়েক দোসাদটোলায় ধর্মাদের ঘরে এসেছে। তাকে ধর্মা এবং কুশীর মা-বাপেরা চেনে, যথেষ্ট খাতিরও করে। তারা জানে, টিরকের দৌলতে ধর্মা আর কুশী দু-চারটে বাড়তি পয়সা কামাই করতে পারে।

টিরকেকে এত রাত্তিরে দেখে চার বুড়োবুড়ি কী করবে, ভেবে পায় না। ধর্মার মা দৌড়ে ঘরে ঢুকে ডিবিয়া এনে ধরিয়ে ফেলে, চুলহায় আগুন দেয়। তারপর ঘর থেকে বাজরার আটা বার করে জল ঢেলে ছানতে ছানতে বলে, 'লিট্টি বানাচ্ছি। রাত্তিরে খেয়ে যাবে।'

টিরকে মাথা ঝাঁকিয়ে সমানে না না করতে থাকে। জানায় এত রাত্তিরে তার জন্য হুজ্জুত করতে হবে না। পরে দিনের বেলা এসে একদিন পেট পুরে ভোজন করে যাবে। ধর্মার মা কিছুতেই শুনতে চায় না। অনেক বলে কয়ে শেষ পর্যন্ত তার লিট্টি বানানো বন্ধ করে টিরকে।

ওদিকে কুশীর মা চা করে কলাই-করা গেলাসে ঢেলে টিরকের সামনে রাখে। ধর্মাদেরও দেয়।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ধর্মা শুধোয়, 'এত রাত্তিরে কোত্থেকে এলে?'

টিরকে জানায়, 'সিধা রাঁচী থেকে।'

'জরুরত কিছু আছে?'

'হাঁ। না হলে এটা কি আসার সময়? বহোত আরজিন (আর্জেন্ট) কাম আছে তোর সাথ।'

'বল।'

'আগে চা তো শেষ কর।'

চা খেয়ে আচমকা উঠে পড়ে টিরকে। ধর্মাকে বলে, 'আমার সাথ বাইরে চল —'

দু'জন দোসাদটোলার বাইরে কাঁকুরে জমিটায় চলে আসে। টিরকের চালচলন কথাবার্তা আজ

কেমন যেন রহস্যজনক মনে হতে থাকে ধর্মার। এক ধরনের দুর্জ্ঞেয় কৌতূহলও সে বোধ করতে থাকে। আবছা অন্ধকারে টিরকের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'এবার বল—'

টিরকে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বার করে একটা ধরিয়ে নেয়। ধর্মাকেও একটা দেয়। টিরকের জ্বলন্ত সিগারেট থেকে নিজেরটা ধরিয়ে নিয়ে গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে ধর্মা।

টিরকে বলে, 'কোটরার বাচ্চার কী হল?'

ধর্মা বলে, 'আর জঙ্গলে যাই নি। টেইম (টাইম) নায় মিলা।' একটু থেমে ফের বলে, 'তুমি তো এক মাহিনা টেইম দিয়ে গেলে সেদিন। তার ভেতর কোটরা ধরে আনব জরুর।'

একটু চুপ করে থেকে টিরকে বলে, 'গোলি মার দো কোটরাকা ছৌয়াকো।'

'মতলব?' রীতিমত অবাক হয়ে যায় ধর্মা।

গলা নামিয়ে টিরকে শুধোয়, 'বহোত রুপাইয়া কামাই করতে চাস?'

টাকা কামাতে কে আর না চায়? ধর্মা বলে, 'চাই তো। লেকেন দেয় কে?'

'আমি দেব।'

ধর্মা মজাদার একটা ভঙ্গি করে হাত পাতে, 'দাও—'

টিরকে বলে, 'মজাক না, কাজের কথা শোন। যে আমরিকী সাহাব কোটরার বাচ্চা চেয়েছিল সে আবার রাঁচী ফিরে এসেছে।'

ধর্মা উত্তর না দিয়ে টিরকের মুখের দিকে তাকায়।

টিরকে বলতে থাকে,'কোটরার বাচ্চা তার চাই না। সাহাবের শখ হয়েছে চিতার বাচ্চা পুষবে। একজোড়া ইন্ডিয়ান চিতার বাচ্চা চাই তার। দেশে ফেরার সময় নিয়ে যাবে।'

ধর্মা এবার বলে, 'জঙ্গল থেকে জিন্দা চিতিয়ার বাচ্চা ধরে আনা বহোত খতরার কাজ।'

টিরকে এবার ধর্মার লোভটা উসকে দেয়, 'মেনি রুপিজ মিলেগা। তুই তো রঘুনাথ সিংয়ের 'করজ' শোধ করার জন্যে রুপাইয়া জমাচ্ছিস। এই টাকাটা পেলে ফ্রি ম্যান হয়ে যেতে পারবি।' ধর্মা যে ভূমিদাস, বাপ-নানার করজের দায়ে সে যে রাজপুত ক্ষত্রিয় রঘুনাথ সিংয়ের 'খরিদী' হয়ে আছে, টিরকে তা ভাল করেই জানে।

ধর্মার আচমকা মনে পড়ে যায়, স্বাধীন জীবন কেনার জন্য তাদের অনেক পয়সা দরকার। দু-আড়াই বছরে বগেড়ি বেচে দুশ টাকার ওপর আর সামান্য কিছু তারা জমাতে পেরেছে। তাদের প্রয়োজন নগদ দু'টি হাজার। এখনও কত জমাতে হবে সেই জটিল অঙ্কের হিসাব ধর্মারা জানে না। তবে মাস্টারজি জানিয়েছেন, এখনও প্রায় কিছুই জমেনি, ঋণশোধের জন্য আরো বহোত বহোত পয়সা চাই। টিরকে যে সুযোগ নিয়ে এসেছে তা হাতছাড়া করা ঠিক নয়।

ধর্মা জিজ্ঞাসা করে,'কিতনা রুপাইয়া দেওগে?'

'বহোত —' ধর্মাকে লুব্ধ করার একটা ভঙ্গি করে টিরকে, 'ডোন্ট ওরি।'

হরিণের বাচ্চা, মোষের শিং ইত্যাদি জুটিয়ে দেওয়ার টাকা পয়সা বা দরদাম নিয়ে কোনোদিন কথা বলে না ধর্মা কিন্তু আজ বলল, 'বহোত তো ঠিক হ্যায়। লেকেন কেত্তে?'

টিরকে জিজ্ঞেস করে, 'তুই কত চাস?'

আর কত হলে দু হাজার পূর্ণ হয়, ধর্মার স্পষ্ট ধারণা নেই। খানিকক্ষণ ভেবে মনে মনে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী হিসেবপত্র কষে সে বলে, 'দেড় হাজার।'

'দেড় হাজার? থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হানড্রিড! নায়, নায়। বহোত জেয়াদা মাঙতা হো ধম্মা ভেইয়া। হাই প্রাইস!'

'এর থেকে এক পয়সা ভি কমতি নেব না। চিতিয়ার বাচ্চা আনতে গিয়ে আমার জান চলে যেতে পারে। কা, হামনিকা জানকা দাম দেড় হাজারসে কমী?'

দামটা কমাবার জন্য অনেকক্ষণ টানা হ্যাঁচড়া করল টিরকে কিন্তু ধর্মাকে টলানো গেল না। সে দেড় হাজারেই অনড় হয়ে রইল। অগত্যা ওই টাকাতেই রাজি হতে হল টিরকেকে। তাতে টিরকের

অবশ্য লোকসান নেই। আমরিকী সাহেবের কাছে সে একজোড়া চিতার বাচ্চার-দর হেঁকেছে আড়াই হাজার টাকা। তার মতলব ছিল, ধর্মাকে আধাঅধি ঠেকিয়ে বাকিটা নিজেই নিয়ে নেবে। কিন্তু এবার দোসাদদের এই নিরীহ মুখচোরা ছোকরাটা কেন যে বেঁকে বসল, কে জানে। যাক গে, একরকম ফোকটেই আড়াই হাজার থেকে এক হাজার তার পকেটে ঢুকতে যাচ্ছে। রাঁচী থেকে বাসে বার দু-তিন গারুদিয়ায় ধর্মার কাছে ছোটাছুটি করে যদি একরকম বিনা পরিশ্রমে অতগুলো টাকা এসে যায়, মন্দ কী। সে তো আর নিজে চিতার বাচ্চা ধরতে যাচ্ছে না। তার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগছে না। অথচ টাকাটা দিব্যি এসে যাবে।

টিরকে বলে, 'ঠিক আছে, দেড় হাজারই পাবি। বাচ্চা দুটো কবে 'ডিলভারি' দিবি?'

'ডিলভারি' অর্থাৎ ডেলিভারি। টিরকের সঙ্গে কাজ-কারবার করতে করতে দু-চারটে আংরেজি শব্দ শিখে ফেলেছে ধর্মা। সে বলে, 'থোড়েসে টেইম লাগবে। চিতিয়ার মুহ্ থেকে তার ছৌয়া কেড়ে আনা তো সোজা না। মুহ্ থেকে কথা খসালেই অয়সা খতরনাক জানবরের বাচ্চা মেলে না।'

টিরকে বলে, 'আমেরিকী সাহাব এখন পন্দ্র রোজ রাঁচী থাকবে। তারপর টু উইকের জন্যে কলকাতায় গিয়ে ফির রাঁচী লৌটবে।' মনে মনে হিসেব কষে বলল, 'এক মাহিনার ভেতর বাচ্চাদুটো দিতে পারবি?'

টিরকে এবার পকেট থেকে এক গোছা টাকা বার করে তার ভেতর থেকে একশ টাকার একটা নোট ধর্মাকে দিতে দিতে বলে, 'ইডভান্স (অ্যাডভান্স) রুপাইয়া দিয়ে গেলাম। তুরন্ত কামে লেগে যা।'

আগে আর কখনও একসঙ্গে এত টাকা আগাম দেয় নি টিরকে। চিতার একজোড়া বাচ্চার ব্যাপারে তার গরজ কতখানি সেটা টের পায় ধর্মা।

টিরকে ফের বলে, 'বাত ফাইনিল হয়ে গেল। আমি এখন যাই।'

ধর্মা একশ টাকার নোটটা পাকিয়ে হাফ প্যান্টের কোমরের সেলাই খুলে পটির ভেতর পুরতে পুরতে ঘাড় কাত করে, 'ঠিক হ্যায়।' কালই সাবুই ঘাসের জঙ্গলে গিয়ে নোটটা পয়সার কৌটোর ভেতর রেখে আসবে সে।

টিরকে আর দাঁড়ায় না। কাঁকুরে মাঠ পেরিয়ে দূরে হাইওয়ের দিকে চলে যায়।

আর ধর্মা ভাবতে থাকে, দু-চার দিনের মধ্যেই চিতার বাচ্চার খোঁজে তাকে জঙ্গলে যেতে হবে। অন্যমনস্কর মতো দোসাদটোলার দিকে পা বাড়ায় সে।

একুশ

গারুদিয়া-কোয়েল ফাগুরামের এখন নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। নাওয়া-খাওয়া ঘুম-বিশ্রাম কোনো কিছুই তার ঠিক থাকছে না। সকালবেলা গলায় নতুন হারমোনিয়ামটা ঝুলিয়ে দোসাদটোলা থেকে সে বেরিয়ে পড়ে। রাতে কখন ফেরে কেউ টের পায় না। কেননা এ পাড়ার ভূমিদাসেরা তখন গভীর ঘুমে ডুবে থাকে।

ইদানীং ফাগুরাম সারাক্ষণই ব্যস্ত। না হয়ে উপায়ই বা কী। চুনাওর তারিখ যত এগিয়ে আসছে ততই বড়ে সরকার বিজুরি এবং গারুদিয়া তালুকের এ গাঁ সে গাঁ করে বেড়াচ্ছেন। প্রায় রোজই কোনো না কোনো হাটে বা গঞ্জে বা বাজারে মিটিং করছেন। মিটিং হলে ফাগুরামকে হাজির থাকতেই হয়। রঘুনাথ সিংয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নামে নিত্য নতুন রকমারি গান বাঁধছে সে আর মিটিংয়ে সেই সব গান গেয়ে আসছে।

সেই কতকাল আগে, বুকে তখনও তার দোষ হয় নি, রাতের পর রাত জেগে নৌটঙ্কীর আসরে গাইত ফাগুরাম। কিন্তু সে সব আসরের সঙ্গে মিটিংয়ের মঞ্চের বিস্তর ফারাক। ছেঁড়া বস্তা কি খড় বিছিয়ে নৌটঙ্কীর আসর বসত, মাথার ওপর জ্বলত টিমটিমে লণ্ঠন। ম্যাড়মেড়ে আলোয় লাখ লাখ মশা আর বারিষের সময় রানীপোকার কামড় খেয়ে গান ধরত ফাগুরাম। কিন্তু বড়ে সরকারের

মিটিংয়ের ব্যাপারই আলাদা। এখানে থাকে লাল নীল শালু দিয়ে চমৎকার করে সাজানো মঞ্চ। ফাগুরাম গাইবে বলে আলাদা ফরাস বিছিয়ে দেওয়া হয়। গণ্ডা গণ্ডা ডে-লাইট, হ্যাজাক বা বিজলি বাতির ঝকমকানো আলোয় মাইকের সমনে বসে নতুন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইতে গাইতে নেশা ধরে যায় তার। হোক না চুনাওর গান, হাজার হাজার শ্রোতা যখন শুনতে শুনতে মজা পেয়ে হাসতে থাকে বা তালিয়া বাজায় তখন বুকে রক্ত ছলকাতে থাকে ফাগুরামের। নৌটঙ্কীর দল থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার পর তার একসময় মনে হয়েছিল, জনমটাই পুরা বরবাদ। সে গাইয়ে, সে নাটুয়া। নাচাগানা তার জীবন থেকে বাদ চলে গেল রইলটা কী? বড়ে সরকার যে তাকে হারমোনিয়াম দিয়েছেন, সুসজ্জিত মঞ্চে বসে হাজারো শ্রোতার সামনে গাইবার সুযোগ করে দিয়েছেন, এ জন্য সে কৃতজ্ঞ। ফাগুরাম মরে যায় নি। এই বয়সে বুকের দোষ হওয়া সত্ত্বেও তার গলায় যে যাদু রয়েছে, এখনও সে যে হাজার লাখ আদমীকে মাতিয়ে দিতে পারে, সেটা জানতে পেরে নিজের ওপর বিশ্বাস বেড়ে যায়। মনে মনে ফাগুরামেব একটা ধারণা হয়েছে, তারই গানের জোরে এবার বড়ে সরকার চুনাওতে জিতে যাবেন। এই ধাবণার কারণও রয়েছে। আজকাল যখনই কোথাও মিটিং বসে, তার আগে রঘুনাথ সিংয়ের লোকেরা সাইকেল রিক্‌শা কি বয়েল গাড়িতে ঘুরে ঘুরে জানিয়ে দেয়, বক্তৃতার আগে গারুদিয়া-কোয়েল নৌটঙ্কীবালা ফাগুরাম 'চুনাওকা গীত' গাইবে। সে নামী আদমী। কয়েক বছর আগেও নৌটঙ্কীর দৌলতে আশেপাশের পঞ্চাশ কি শও মাইলের মধ্যে সবাই তার নাম জানত। মাঝখানে কিছুদিন নৌটঙ্কীর আসরে না দেখলেও তাকে কেউ বিলকুল ভুলে যায় নি। তার টানেই যে গাঁওবালা দেহাতী মানুষেরা ঝাঁকে ঝাঁকে চুনাওর মিটিংয়ে হাজির হচ্ছে, ফাগুরাম তা বোঝে।

যে সব দিন মিটিং থাকে না, বড়ে সরকার তাকে হাটে গঞ্জে বা কোনো গাঁয়ে পাঠিয়ে দেন। হারমোনিয়াম বাজিয়ে লোক জড়ো করে ফাগুরাম নিজের বাঁধা গানগুলো গাইতে থাকে। রঘুনাথ সিংয়ের এ-ও এক বড় চাল। চুনাওর লড়াইতে জেতার জন্য অনবরত যে বিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচাব চালিয়ে যেতে হয়, এই কৌশলটা ভালই জানেন তিনি।

রঘুনাথ সিংয়ের উৎসাহ আর চুনাওর মিটিংয়ে মিটিংয়ে শ্রোতাদের অনবরত তালিয়া বাজানো, এই দুটো ব্যাপার এই বয়েসে ফাগুরামকে একেবারে মাতিয়ে দিয়েছে যেন। সারাক্ষণ সে একটা ঘোবের মধ্যে থাকে। পলকে তার বুকের ভেতর থেকে স্রোতের মতো তোড়ে নতুন নতুন গান এবং সুর বেরিয়ে আসতে থাকে। সেই সব গান ইদানীং বিজুরি আর গারুদিয়া তালুকের গাঁয়ে-গঞ্জে হাটে-বাজারে ছোটবড় কাচ্চাবাচ্চা বুড়োবুড়ির মুখে মুখে ফেরে।

আজ সকালে উঠে মনপথল বাজারে চলে গিয়েছিল ফাগুরাম। গারুদিয়া থেকে পাক্কী ধরে 'কোশভর' গেলেই বিজুরি তালুকের সীমানা। বিজুরিতে ঢুকে নাক বরাবর খানিকটা গিয়ে বাঁয়ে মাঠে নামলেই কাচ্চী। কাচ্চী দিয়ে রশিভর হাঁটলে মনপথল বাজার। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাজারটা।

ওখানে পৌঁছতে জেঠ মাহিনার রোদ চড়ে গিয়েছিল। এতটা আসার ধকলে এবং রোদের তেজে হাঁপিয়ে গেছে ফাগুরাম। চেনাজানা এক চায়ের দোকানের বাঁশেব বেঞ্চিতে বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেয় সে।

তাকে দেখে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে দোকানদাবটা। খাতির করে নতুন চা-পাত্তি দিয়ে চা বানিয়ে তাকে খাওয়ায়, সঙ্গে নিমকিন, বিস্কুট। দাম দিতে গেলে জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে দোকানদার বলে, 'নায় নায়। তোমরা মতো বড়ে আদমী আমার দুকানে চায় খেতে এসেছ, সেটা আমার সৌভাগ।'

ফাগুরাম জোরজার করে তার হাতে দাম গুঁজে দেয়। বড়ে সরকারের কিরপায় তার পকেট আজকাল দশ বিশ টাকার নোট আর রেজগিতে বোঝাই থাকে। যাই হোক, এ অঞ্চলের তিরিশ বত্রিশটা গাঁও জুড়ে সে এখন সব চাইতে জনপ্রিয় এবং বিখ্যাত মানুষ। সে যেখানে যায় সেখানেই তার জন্য প্রচুর খাতির, প্রচুর যত্ন।

ফাগুরামকে দেখে একজন দু'জন করে লোক আসতে শুরু কবে। ক্রমশ রীতিমত একটা ভিড়ই জমে যায়।

চারদিক থেকে সবাই বলতে থাকে, 'কা, ফাগুও ভাইয়া, গানা হবে তো?'

ফাগুরাম হাসে, 'জরুর। তোমাদের গান শোনাব বলেই তো এসেছি।'

'মজাদার গানা?'

'শুনে তোমরাই বল মজাদার কিনা—'

এমনি কথায় কথায় বেলা বাড়তে থাকে। একসময় হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে উঠে পড়ে ফাগুরাম। তারপর মনপথল বাজারের মাঝখানে একটা ঝাঁকড়ামাথা প্রকাণ্ড কড়াইয়া গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। তার পেছনে পেছনে চায়ের দোকানের ভিড়টাও চলে এসেছে। শুধু তাই নয়, বাজারের নানা দিক থেকে আরো মানুষজন দৌড়ে আসতে থাকে।

ঘুরে ফিরে, নেচে নেচে, সরু সরু আঙুলে অনেকক্ষণ হারমোনিয়াম বাজায় ফাগুরাম। আসরটা তৈরি হয়ে গেলে সে বলে, 'শুন ভাইয়ালোগ, পয়লা সুখন রবিদাস পর যো গান বনায়া ও গাতা হ্যায়—' বলেই সুর ধরে :

> ইয়ে কলযুগিয়া
> বাজ ভাইয়া
> ইয়ে কলযুগিয়া রাজ।
> ভোট লড়নেকো সুখন আয়া
> চোর চামার বাটমার ।
> তাড়ি-দারু চোরচামারি ভোটনকে হাতিয়াব।
> সুখনকো ঘব ছৌরি নাচে
> মহিমা অপরাম পার ভাইয়া
> মহিম অপরাম—

সুখন রবিদাস সম্পর্কে গানে গানে যে কথাগুলো ফাগুবাম বলতে থাকে তার কোনোটাই সত্যি না। কিন্তু মানুষ যেমন হোক — গরিব-ভুখা, পয়সাওলা-অভাবী, জমিদাব-খেতমজুর — অন্যেব কুৎসা বা কেচ্ছা শুনতে ভালবাসে। ফাগুরামেব মনপসন্দ মজাদাব গান শুনতে শুনতে তাবা হেসে হেসে ঢলে পড়তে থাকে।

সুখনকে নিয়ে বাঁধা গানটা শেষ কবেই আবু মালেককে নিয়ে পড়ে ফাগুরাম .

> গলি গলি শোর হ্যায়
> আবুল মালেক চোর হ্যায়
> রঘুনাথ সিংকো ভোট দো
> অবুল মালেককো ফোঁক দো—

এইভাবে এক এক কবে রঘুনাথ সিংযেব প্রতিদ্বন্দ্বীদেব সবাব সম্পর্কেই পব পব গেয়ে যেতে থাকে ফাগুরাম। গান শেষ হতে হতে সূরয খাড়া মাথার ওপব উঠে আসে।

চাবপাশে মনপথল বাজারেব যে মানুষজন ভিড় করে আছে তারা বলাবলি করতে থাকে, 'শুনা হ্যায় তো, ফাগুরাম নৌটঙ্কীবালা গানামে কা বোলা' সব কোঈ চোব-চোট্টা বদমাস। সিরেফ রঘুনাথ সিং বাদ। চোর-চোট্টাদের বোট দিয়ে ফাযদা নেই।'

যে উদ্দেশ্যে এই সব মজার গান বাঁধানো বা গাওয়ানো তা বীতিমত সফল। মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে তার আঁচ পাওয়া যায়। ফাগুরাম আর দাঁড়ায় না। ভিড় ঠেলে বাইরে এসে একটা সাইকেল রিক্শায় ওঠে। আজ সে গাকদিয়ায় ফিরে সোজা দোসাদটোলায় চলে যাবে। বড়ে সবকারের চুনাওর গান যেদিন থেকে সে গাইতে শুরু করেছে সেদিন থেকে দুপুরে আর ঘবে ফেরা হয় না। হাটে বাজারে কি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে ঘুবতে চায়-রোটি বা চায়-বিস্কুট বা ভাতের দোকানে গিয়ে ডাল-ভাত সবজি আর শিকার খেয়ে নেয়। আজ দোসাদটোলায় গিয়ে নিজেব হাতে বসুই চড়িয়ে দেবে। বয়স তো কম হয নি। গানের নেশায় যতই বুঁদ হয়ে থাক, কিছুদিন ধরে অনবরত ঘোবাঘুরিব ফলে শরীর আর সায় দিচ্ছে না। আজ খাওয়া দাওয়ার পর সন্ধে পর্যন্ত টানা ঘুম লাগাবে ফাগুরাম।

সাইকেল রিক্‌শাটা মনপত্থল বাজার পেছনে ফেলে কাঁচা রাস্তা ধরে হাইওয়ের দিকে যখন সিকি রশির মতো এগিয়ে গেছে এই সময় পেছন থেকে চিৎকার শোনা যায়, 'সাইকেল রিক্‌শা রুখ যা, রুখ যা—'

রিক্‌শাওলা গাড়ি থামিয়ে দেয়। অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকায় ফাগুরাম। পাঁচ ছ'টা গাট্টাগোট্টা চেহারার —পহেলবান য্যায়সা, চৌগাফাওলা লোক, হাতে পেতলের গুল বসানো লাঠি — হাঁই হাঁই করতে করতে ঝড় তুলে কাছে এসে পড়ে।

ফাগুরাম শুধোয়, 'কা বাত?'

লোকগুলো অচেনা। পাথরের মতো শক্ত মুখ তাদের। ছোট ছোট গোল চোখ থেকে আগুন ঠিকরোচ্ছে যেন। একজন বলে, 'মরণে মাঙতা চুহা কাঁহিকা—'

লোকগুলোর চেহারা, চাউনি এবং রকমসকম দেখে ভীষণ ঘাবড়ে যায় ফাগুরাম। সে হাসতে চেষ্টা করে, 'কা হুয়া ভেইয়ালোগ?'

'কা হুয়া!' সেই লোকটা লাঠি ঠুকে গর্জে ওঠে, 'শালে গারুদিয়া-কোয়েল হয়েছে! অ্যায়সা মারেগা, বিলকুল কৌয়া বন যাওগে।'

ফাগুরাম বলে, 'ভাইয়া, হামনিকো কা কসুর? থোড়াকুছ সমঝা তো দো—'

'এতক্ষণ মনপত্থল বাজারে হারমুনিয়া বাজিয়ে বড়ে বড়ে আদমীদের নামে কী বলে এলি? সব কোঈ চোর, চামার, বাটমার, ঘড়িয়াল — নায়?'

এবার চমকে ওঠে ফাগুরাম। তার গানগুলো তো গঙ্গাপানিতে ধোয়া নির্দোষ ব্যাপার নয়। রঘুনাথ সিংয়ের বিপক্ষে যারা চুনাওতে নেমেছে তাদের সবাইকে এইসব গানে হুল ফোটানো হয়েছে। বোঝা যায় এই হট্টাকাট্টা ডাকুমার্কা চেহারার লোকগুলো তাতে খেপে গেছে। ঢোক গিলে ফাগুরাম ফিকে হাসে, 'ও তো গানা ভেইয়া।'

'গানা!'

'মতলব তামাসা।'

'ফির অ্যায়সা তামাসা করলে গলেকা নালিয়া ফেঁড়ে ফেলব। সমঝা?'

'সমঝ গিয়া ভাইয়া, সমঝ গিয়া।'

'যা ভাগ। লেকেন হোঁশিয়ার।'

'হাঁ হাঁ, হোঁশিয়ার জরুর থাকব।'

সামনে থেকে সরে গিয়ে রাস্তা সাফ করে দেয় লোকগুলো। সাইকেল রিক্‌শা ফের চলতে শুরু করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঠো রাস্তা থেকে পাক্কীতে এসে ওঠে।

জষ্ঠির গনগনে লু বাতাস চিরে বিজুরি তালুকের দিকে যেতে যেতে আগাগোড়া গোটা ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে ফাগুরাম। মজাদার তামাসার গান শুনে ওই লোকগুলো এত খেপে গেল কেন? গানের মধ্যে অবশ্যই রঘুনাথ সিংয়ের বিরুদ্ধে যারা চুনাওতে নামছে তাদের সবাইকে খোঁচা দেওয়া হয়েছে। তবে কি তাদেরই কেউ মনপত্থল বাজারের ডাকু-য্যায়সা লোকগুলোকে তার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে? কে লেলাতে পারে? নেকীরাম শর্মা, আবুল মালেক, প্রতিভা সহায় না সুখন. রবিদাস?

আচমকা গণেরির হুঁশিয়ারি মনে পড়ে যায় ফাগুরামের। সে বলেছিল, বড়ে সরকারের বিপক্ষের লোকেরাও ঐরু-গৈরু-ভৈরু বা নাত্থুর দল না। তাদেরও পয়সা আছে, জনবল আছে। বহুদর্শী গণেরি ঠিকই বলেছে দেখা যাচ্ছে।

ফাগুরাম ঠিক করে ফেলে, এখন আর দোসাদটোলায় গিয়ে রসুই চড়াবে না, সিধা গারুদিয়ায় ফিরে রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলিতে চলে যাবে। বড়ে সরকারকে খবরটা জানানো অত্যন্ত জরুরি। সে রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে।

রঘুনাথ সিংকে তাঁর বাড়িতেই পাওয়া যায়। চুনাওর জন্য বিরাট কমপাউন্ডের ভেতর তেরপল খাটিয়ে তিন চারটে ক্যাম্প বসানো হয়েছে। তাঁকে নির্বাচনে তরিয়ে দিতে যে সব ছোকরা হাটে-বাজারে আর গাঁয়ে গাঁয়ে 'রঘুনাথ সিংকো বোট দো, বোট দো—' করে গলায় খুন তোলে, দুপুরে ফিরে তারা ওখানে খায়, জিরোয়, খবরের কাগজে ইস্তাহার লেখে, ভোটারদের লিস্টি ঠিক করে। চুনাও তো কথার কথা নয়, একসঙ্গে হাজারটা তৌহারের মতো ব্যাপার।

এই মুহূর্তে চুনাও কর্মীরা কাতার দিয়ে খেতে বসে গেছে। বড়ে সরকার নিজে সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়া তদারক করছেন। ফাগুরাম দৌড়ুতে দৌড়ুতে তাঁর কাছে চলে আসে।

অনেকটা রাস্তা গনগনে রোদের ভেতর দিয়ে এসেছে ফাগুরাম। তার গায়ের চামড়া ঝলসে গেছে যেন। তা ছাড়া ভেতরে ভেতরে যে উত্তেজনা এবং ভয়ের ব্যাপারটা চলছিল, মুখেচোখে সেটা ফুটে উঠেছে।

এক পলক ফাগুরামের দিকে তাকিয়ে রঘুনাথ সিং শুধোন, 'কী রে, কোত্থেকে এলি?'

শ্বাস টেনে ফাগুরাম বলে, 'মনপত্থল বাজার হুজৌর। চুনাওর গানা গাইতে গিয়েছিলাম।'

'গানা কেমন হল?'

'আপকি কিরপায় বহোত আচ্ছা। লেকেন—'

'লেকেন কী?'

'একটা বুরা খবর আছে।'

ভাল করে ফাগুরামকে লক্ষ কবতে করতে রঘুনাথ সিং বলেন, 'কী বুরা খবর?'

এক নিশ্বাসে সেই লোকগুলোর শাসানির কথা জানায় ফাগুরাম। শুনতে শুনতে চোয়াল লোহার মতো শক্ত হয়ে ওঠে রঘুনাথ সিংয়ের। চোখের তারা থেকে আগুন ঠিকরোতে থাকে। তিনি বলেন, 'জানবরের বাচ্চাগুলো কারা? নাম বল? কোন গাঁওয়ের আদমী?'

ফাগুরাম বলে, 'জানি না হুজৌর।'

'আগে আর কখনও দেখেছিস?'

'নেহী সরকার।'

চোখ কুঁচকে একটু চিন্তা করেন রঘুনাথ সিং। তারপর আস্তে করে বলেন, 'এর একটা ব্যওস্থা করা দরকার।' বলেই যে চুনাও কর্মীরা খেতে বসেছে তাদের দিকে ঘাড় ফেরান, 'মহেশ্বর, রামরতন, মুকলাল, বজরঙ্গী — তোমাদের চারজনকে এখনই একবার মনপত্থল বাজারে যেতে হবে। সেখান থেকে সিধা মিশিরলালজির সাথ গিয়ে দেখা করবে।'

রঘুনাথ সিংয়ের মুখ থেকে কথা খসার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া ফেলে চারজন তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। হাত নেড়ে তাদের ফের বসিয়ে দেন রঘুনাথ। বলেন, 'আগে খেয়ে নাও। খেতে খেতে শোন, ওখানে গিয়ে কী করতে হবে।'

ফাগুরামের বর্ণনা অনুযায়ী চার হট্টাকাট্টা ডাকুমার্কা হারামজাদার কথা বলে রঘুনাথ নির্দেশ দেন, মনপত্থল বাজারে গিয়ে তাদের পাত্তা লাগাতে হবে। যদি খোঁজ পাওয়া যায় ভালই। পাওয়া যাক বা নাই যাক, সোজা বিজুরিতে গিয়ে মিশিরলালজির সঙ্গে দেখা করতে হবে। কেননা ওই এলাকাটা তাঁরই। মিশিরলালজিকে জানাতে হবে, তাঁরই খাস তালুকে বড়ে সরকারের চুনাও কর্মী ফাগুরামকে শাসানো হয়েছে। তিনি যেন এর বিহিত করেন।

নাকেমুখে তুরন্ত ভাত-চাপাটি ডাল-সবজি গুঁজে রঘুনাথ সিংয়ের চার চুনাও কর্মী জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যতক্ষণ না বিকেল হয় আর ওরা মনপত্থল এবং বিজুরি থেকে ফিরে আসে ততক্ষণ বড়ে সরকার ফাগুরামকে আটকে রাখেন।

বিকেলে ওরা জিপ থেকে নামতেই রঘুনাথ সিং জিজ্ঞেস করেন, 'হারামজাদ কুত্তাকা ছৌযাগুলোর পাত্তা মিলল?'

'নায়—' চুনাও কর্মীরা একসঙ্গে মাথা নাড়ে।

'মনপত্থল বাজারে ভাল করে খোঁজ নিয়েছিলে?'

'জি। সবাইকে পুছেছি, লেকেন কেউ কিছু বলতে পারল না।'

কপালে ভাঁজ পড়তে থাকে রঘুনাথ সিংয়ের। ভুরু কুঁচকে তিনি বলেন, 'মনে হচ্ছে, বাইরে থেকে কেউ গুণ্ডা আনিয়েছে।'

চার চুনাও কর্মী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

রঘুনাথ সিং এবার জিজ্ঞাস করেন, 'বিজুরিতে গিয়েছিলে?'

'জি।'

'মিশিরলালজির সাথ দেখা হল?'

'হয়েছে।'

'তাঁকে সব জানিয়েছ?'

'জি।'

'কী বললেন মিশিরলালজি?'

'আমাদের মুখে শুনে তখনই বদমাসগুলোকে তালাশ করতে লোক পাঠালেন। একবার ধরতে পারলে ওদের হাড্ডি থেকে মাংস সিবেফ আলাগ করে ফেলবেন। আপনাকে জানাতে বলেছেন, বিজুরিতে ওই হারামীরা আর যাতে ঝামেলা বাধাতে না পারে সেদিকে তাঁর পুরা নজর থাকবে।'

রঘুনাথ সিং বেজায় সন্তুষ্ট। মিশিরলালজি সেদিন মুখের কথাই শুধু দেন নি, এই চুনাওতে তাঁকে সবরকম সাহায্য করতেও প্রস্তুত। বোঝা যাচ্ছে তাঁর কথার দাম আছে।

রঘুনাথ সিং তাঁর চুনাও কর্মীদের বলেন, 'ঠিক হ্যায়। তোমরা এখন জিরিয়ে নাও। কাল সজ্জনপুরার হাটিয়ায় আমাদের চুনাওর মিটিং আছে না?'

'জি—'

'সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে?'

'জি।'

'যাও—'

চুনাও কর্মীরা তেরপলের ছাউনির তলায় একটা ক্যাম্পে ঢুকে পড়ে। রঘুনাথ সিং এবার ফাগুরামের দিকে ফেরেন, 'যা, তুই তোদের মহল্লায় চলে যা। মনে রাখিস, কাল সজ্জনপুরায় যেতে হবে।' বলে সামনের দিকে দু'পা বাড়িয়ে কী ভেবে ঘুরে দাঁড়ান। কী আশ্চর্য, ফাগুরামের যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, চোখেমুখে খানিকটা উদ্বেগ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

রঘুনাথ সিং বলেন, 'কি রে, ঘরে গেলি না? কিছু বলবি?'

ভয়ে ভয়ে ফাগুরাম বলে, 'হাঁ হুজৌর।'

'কী?'

'বহোত ডর লাগতা—'

'কেন?'

'ওহী আদমীলোগন গলার নালিয়া ফেঁড়ে দেবে বলেছে।'

ফাগুরামের পিঠে সস্নেহে চাপড় মারতে মারতে রঘুনাথ সিং বলেন, 'ডরের কিছু নেই। আমি তো আছি। যা এখন—'

রঘুনাথ সিং ভরসা দেন বটে, তবু যেন মনের দিক থেকে পুরোপুরি জোর পায় না ফাগুরাম। কিন্তু এখন আর ফেরার রা[illegible] নেই। চুনাওর গান বন্ধ করলে বড়ে সরকার গুস্‌সা হবেন। আবার এই গান চালিয়ে গেলে তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা গুস্‌সা হবে। রঘুনাথ সিংকে আজন্ম চেনে সে। খাতির করে তাকে ডাকিয়ে নিয়ে নয়া কাপড়া, নয়া হারমুনিয়া, টাকা পয়সা দিয়েছেন! মরুক বাঁচুক, তাঁর চুনাওর গান গেয়ে যেতেই হবে ফাগুরামকে।

বাইশ

তৃপ্ত উজ্জ্বল সুখী মানুষের পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক দূরে গারুদিয়া তালুকের এই দোসাদটোলা। এখানকার বাসিন্দারা বাপ-দাদার করজের দায়ে কত কাল ধরেই তো ক্রীতদাসের জীবন যাপন করে চলেছে। কিন্তু কী তাজ্জবকা বাত, গরিবের চাইতেও গরিব, ভুখার চাইতেও ভুখা, নাঙ্গার চাইতেও নাঙ্গা এই হতচ্ছাড়া জনমদাসদের মধ্যেও মনুষ্যজাতির অনেক লক্ষণই দেখা যায়। অঢেল প্রাচুর্যে বোঝাই বহুদূরের ঝলমলে জগতের মানুষজনের মতোই এখানকার বাসিন্দাদের জন্ম মৃত্যু ঘটে। মা-বাপের রক্তস্রোত থেকে সুপ্রাচীন সব আকাঙ্ক্ষা নিজের শরীরের মধ্যে পুরে যে ছৌযাটি জন্মায় ক্রমে সে যুবক বা যুবতী হয়ে ওঠে। বহুকালের সামাজিক নিয়মেই একদিন তাদের শাদি হয়। শক্তিমান একটি পুরুষ উর্বরা যুবতীর গর্ভে নতুন জন্মের বীজ বুনে দেয়। এইভাবে আবার মানুষ আসে পৃথিবীতে। মানুষ না, আরেকটি জনমদাস। বাপ-দাদার মতোই রঘুনাথ সিংদের জমি চষে তাদের খামারের গোলাগুলি মহার্ঘ সোনালি শস্যে বোঝাই করে একদিন দুনিয়া থেকে মুছে যায় কিন্তু তার আগেই নিজের সন্তান অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের জনমদাসকে পৃথিবীতে পৌঁছে দেয় সে। এইভাবে রঘুনাথ সিংদের জন্য বেগার-খাটা ক্রীতদাসের অভাব কখনও ঘটে না।

আজ দোসাদটোলার টিউমলের বড় ছেলে শিউমলের শাদির কথা পাকা হবে। তিন ক্রোশ ফারাকে তিলাই গাঁওয়ের গৈবীনাথের ছোটা লেড়কি রাধিয়ার সঙ্গে তার বিয়ে আগামী ছট পরবের পর ফসল কাটা মরসুমের ঠিক আগে আগে। সেই উপলক্ষে গৈবীনাথ তার দুই ভাই, এক বেয়াই আর ভাঞ্জাকে নিয়ে দুপুরের ঢের আগেই এসে পড়বে। এই বিয়ের ব্যাপারে টিউমলের সঙ্গে গৈবীনাথদের দু-চার প্রস্থ কাঁচা কথা হয়ে গেছে। গৈবীনাথের মেয়ে রাধিয়া খুবসুরত ডাগর মেয়ে, চোদ্দ বছর উমর। দোসাদদের ঘরে এত বড় এবং এত শ্রীছাঁদওলা মেয়ে চোদ্দ সাল পর্যন্ত পড়ে থাকে না। রাধিয়ার যে এতদিন বিয়ে হয় নি তার একমাত্র কারণ গৈবীনাথ। মেয়ের পণ হিসেবে দেড় শ টাকা দর হেঁকে বসেছিল সে। তার যা মেয়ে তাতে এই দামটা এমন কিছু বেশি নয়। আশেপাশের বিশ পঞ্চাশটা তালুকে আর কোনো দোসাদের ঘরে রাধিয়ার মতো এমন একটা মেয়ে কেউ দেখাক দেখি। সে লাখোমে এক।

বিয়ের বাজারে রাধিয়ার দেড়শ রুপাইয়া দরটা যতই ন্যায্য হোক, তা দেবার ক্ষমতা বিশ-পঞ্চাশটা মৌজায় কোনো দোসাদের নেই। মেয়ে দেখে যে এগিয়ে আসে, দর শুনে তখুনি ভেগে পড়ে।

পুতহু আনার জন্য মেয়ে খুঁজতে বেরিয়ে রাধিয়াকে দেখে তাক লেগে যায় টিউমলের। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, এই মেয়েকে যেভাবে পারে ঘরে আনবেই। আনবে তো, কিন্তু রুপাইয়া-পাইসা কাঁহা? আগুপিছু না ভেবে ঝোঁকের মাথায় সে দর দেয় পঞ্চাশ টাকা। গৈবীনাথ দেড় শ'তেই অনড় থাকে। অনেক বার গারুদিয়া থেকে তিলাইতে ছোটাছুটি করে পায়ের শিরা ছিঁড়ে ফেলে টিউমল। পণের ব্যাপারটা নিয়ে এক বছর ধরে প্রচুর টানাহ্যাঁচড়া করে শেষে পর্যন্ত গৈবীনাথকে বেশ খানিকটা টলাতে পারে সে। গৈবীনাথ একটু একটু করে দর নামাতে থাকে, টিউমলও অল্প অল্প চড়িয়ে যায় এবং একশ টাকায় রফা হয়। কিন্তু একশ টাকা একজন ভূমিদাসের কাছে কোটি টাকার সমান।

এই দোসাদটোলায় যার ঘরেই যা হোক না কেন, সবাই সবার সঙ্গে পরামর্শ করে, বিশেষ করে গণেরির সঙ্গে। ছেলের বিয়ের ব্যাপারে যেদিন থেকে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই গণেরিকে সব জানিয়ে গেছে টিউমল। গৈবীনাথ যেদিন একশ টাকায় বাজি হল সেদিন নাচতে নাচতে দোসাদটোলায় ফিরে সারা মুখ জেল্লাদার হাসিতে ভরিয়ে বলতে থাকে, 'হো গিয়া গণেরি ভেইয়া, সওদা হো গিয়া—'

গম্ভীরভাবে মাথা নেড়েছে গণেরি। বলেছে, 'সওদা তো হো গিয়া। লেকেন শও রুপাইয়া কঁহা মিলেগা?'

'মুনশিজির কাছ থেকে নিয়ে নেব।' সবল মুখে উত্তর দিয়েছে টিউমল। দোসাদ জাতির সেরা মেয়েটিকে পুতহু করে ঘরে তুলবে, সেই খুশিতেই তখন সে ডগমগ।

কিন্তু গণেরি চমকে উঠেছে, 'করজ তো নিবি, শোধ করবি কী করে?'

'হো যায়েগা গণেরি ভেইয়া, জরুর হো যায়েগা।'

বিষণ্ণ হেসেছে গণেরি। সে জানে মুনশি আজীবচাঁদের কাছ থেকে ধার নেওয়া মানেই বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের ফাঁদে পা ঢোকানো। এইভাবেই ঝোঁকের মাথায় বিয়ে শাদিতে করজ নিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ঘটায় দোসাদরা। ভাবে, কোনোরকমে টাকা শোধ করে ফেলতে পারবে। কিন্তু সুদের পাহাড় জমে জমে গলায় ফাঁসটা পাকে পাকে আরো কঠিন ভাবে জড়িয়েই যায়। নিজের জীবন তো বটেই, বংশানুক্রমে কারুর পক্ষেই এই ফাঁস কেটে বেরুবার রাস্তা নেই।

টিউমল এক পুরুষের খরিদী কিষান। তার সঙ্গে সঙ্গেই এই বংশের দাসত্ব শেষ হয়ে যেত। তারপর থেকে তার বংশের সবারই স্বাধীন, মর্যাদাবান নাগরিক হওয়ার কথা। কিন্তু সমস্ত জেনেশুনেও নিজের ছেলের গলায় বড়ে সরকারের ফাঁস জড়িয়ে দিচ্ছে সে। গণেরি বলেছে, 'ফেঁসে যাবি টিউমলিয়া।'

করজ নিলে ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে সেটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে টিউমল বলেছে, 'আরে নায় নায় গণেরি ভেইয়া। রামজির কিরপায় কেমন পুতহু আনছি বল। দেখনেকো আউর দেখলানেকো চীজ।' দেখবার এবং দেখাবার মতো যে রূপসী মেয়েটিকে ঘরে আনা ঠিক করেছে, তার চিন্তাতেই তখন টিউমল ভরপুর হয়ে আছে।

কিন্তু জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা গণেরিকে ভবিষ্যতের বহুদূর পর্যন্ত দেখতে সাহায্য করে। এই করজের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়বে সেটা চোখের সামনে দেখতে দেখতে বিমর্ষ গলায় গণেরি বলেছে, 'এই শাদিয়া ভেঙে দে টিউমল। ছেলেটাকে ফাঁসিয়ে যাস না।'

টিউমল শিউরে উঠেছে, 'নায় নায় ভেইয়া, এমন কথা বলো না।'

'আরে মূরুখ, শাদি না হলে মানুষ মরে না।'

'জওয়ানিকা ধরম, শাদি দিতেই হবে ভেইয়া।' বলে টিউমল দার্শনিকের মতো গভীর কিছু কথা আওড়ায়। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, এই তিনটে ব্যাপার ভগোয়ানের নির্দেশে চলেছে। এই নিয়ম অমান্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

সুতরাং অদৃশ্য ভগোয়ানের আঙুলের সংকেতে গারুদিয়া তালুকের ভূমিদাস টিউমলের ছেলের সঙ্গে তিলাই গাঁওয়ের গৈবীনাথ দোসাদের মেয়ে রাধিয়ার বিয়ে হতে চলেছে। ভগবানের রাজ্যে এ নিয়ম নাকি অব্যর্থ এবং অনিবার্য।

এখানে কারুর ঘরে বিয়ে শাদি হলে সারা দোসাদটোলায় যেন তৌহার লেগে যায়। টিউমল এবং দোসাদটোলার বাকি সবাই সিধা রঘুনাথ সিংয়ের কাছে গিয়ে দরবার করেছিল, আজ টিউমলের বিয়ের বাত পাকা হবে, বড়ে সরকার যেন একটা বেলার জন্য খেতির কাজ থেকে রেহাই দেন। রঘুনাথ পরম উদারতায় একবেলা না, পুরা একটা দিনই মকুব করে দিয়েছেন। দোসাদটোলার প্রতিটি মানুষ এতে বেজায় খুশি এবং অভিভূত। তবে গণেরি সব কিছুই একটু টেঁড়া চোখে দেখে। সে বুঝেছে সামনে চুনাও, এখন ভোটদাতাদের চটানোটা কোনো কাজের কথা নয়, বরং খুবই ক্ষতিকর।

আজ ভোরে সূর্য ওঠার ঢের আগে থেকেই দোসাদটোলার নানা বয়সের মেয়েরা থোকায় থোকায় বা আলাদা হয়ে টিউমলদের ঘরের সামনে জমায়েত হয়ে শাদির গান শুরু করে দিয়েছে :

> আঙ্গনমে আজ আয়া গোরী সামহাল করকে
> ইঁহা হ্যায় গরিব আঙ্গন, তুম হো সপুত সাজন
> ধীরেসে অপনে প্যারকো রখনা সামহাল করকে
> দাদা ও তেরে আয়ে আভি বরাতী বনকে
> দাদী যো তেরী আয়ী রেশ্তিকি ভৈস বন কর
> আঙ্গনমে আজ আয়া ....

একদল দম নেওয়ার জন্য গান থামাতেই আরেক দল আরম্ভ করে দেয় ·

> সৌগতকে গালি শুনাও, শুনাও মেরে সখিয়া
> সব বড়ী আতিয়ানকে ভরুয়াকে শিরুহনমে টোপি নেহী হ্যায়
> বহিনিকে চটি লাগাও, লাগাও মেরে সখিয়া

সব বড়ী আতিয়ানকে ভরুয়াকে ধোতি নেহী,
বহিনিকে শাড়ি প্যাহনাও
সব বড়ী আতিয়ানকে ভরুয়াকে গঞ্জি নেহী
উনকি যো বহিনিকে চোলি প্যাহনাও
সব বড়ী আতিয়ানকে ভরুয়াকে পাওমে জুতি নেহী
ভরুয়াকে বহিনিকে সন্ডেল প্যাহনাও
প্যাহনাও মেরে সখিয়া ....

রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দোসাদটোলার জনকয়েক ফুর্তিবাজ মরদও ঢোলক বার করে গানের সঙ্গে বাজনা জুড়ে দেয়। সত্যি সত্যিই শিউমলের বিয়েটা ঘিরে এখানে পরব শুরু হয়ে গেছে যেন।

সূর্য যত চড়তে থাকে দোসাদটোলার একটা প্রাণীও আর নিজের ঘরে থাকে না। সবাই এসে টিউমলের ঘরের সামনে জমা হয়। সবাই বেজায় খুশি। অন্তত এই বিয়ে উপলক্ষে তারা যে পুরো একটা রোজ গতরচূরণ মাটি চষার পরিশ্রম থেকে রেহাই পেয়েছে, সেটা দোসাদদের জীবনে খুব সামান্য ঘটনা নয়।

বরের বাপ টিউমল আর মা পহেলী আনন্দে আজ যেন হাওয়ায় উড়তে থাকে। ভোরবেলাতেই কুয়োর জলে 'নাহানা' সেরে বাদরার ছাই দিয়ে কাচা পরিষ্কার জামাকাপড় পরে একবার এর কাছে যাচ্ছে, একবার ওর কাছে। সবার হাতে হাতে চা, বুন্দিয়া আর ভাজা চানা দিতে দিতে খুবই বিনীতভাবে বলছে, 'লো ভেইয়া, লো। আমার লেড়কার শাদির ব্যাপারে তোমরা যে এসেছ, এ বহোত সৌভাগ—'

দোসাদটোলার প্রতিটি মানুষ আজন্মের চেনা টিউমলের। তার বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। যারা তার সমবয়সী তাদের সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে সে। যারা ছোট তাদের জন্মাতে দেখেছে। এই দোসাদটোলার আর সব ভূমিদাসের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বড়ে সরকারের জমি চষেছে সে, ফসল কেটেছে। কারণে-অকারণে এদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, আবার বিপদের দিনে বুক দিয়ে পড়েছে। সীমাহীন কষ্ট, দুঃখ, অভাব ভাগাভাগি করে এখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গেই কতকাল ধরে পাশাপাশি এই পৃথিবীতে টিকে আছে টিউমল। দোসাদটোলার প্রতিটি মানুষের হাড়ের ভেতর পর্যন্ত তার চেনা। কিন্তু আজকের দিনটা একেবারেই আলাদা।

আজ এরা সবাই তার মেহমান। দোসাদটোলাবাসী প্রতিটি মানুষের কাছে গিয়ে তো খাতিরদারি দেখাতেই হবে। নইলে মেহমানদারির অপমান।

টিউমল যেমন দোসাদটোলার পুরুষদের কাছে গিয়ে খাতির-যত্ন করছে, তেমনি তার বউ যাচ্ছে মেয়েদের কাছে।

দূরে ঘরের দাওয়ায় বসে আছে টিউমলের ছেলে শিউমল। ভোরে উঠবার পর তাকেও 'নাহানা' সেরে নিতে হয়েছে। চানের আগে মাথায় প্রচুর পরিমাণে তেল ঢেলেছে। ফলে চুলগুলো এখনও জবজবে, কানের ধার এবং কপাল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে তেল গড়াচ্ছে। শিউমলের পরনে এখন হলুদ ছোপানো পরিষ্কার ধুতি আর চাহাড়ের হাটিয়া থেকে কিনে আনা জালিকাটা আনকোরা সৌখিন গেঞ্জি। গেঞ্জির ওপর রবার স্ট্যাম্পে কোম্পানির মোহর ছাপা রয়েছে। শিউমলের মুখে একটু লাজুক হাসি মাখানো। তা ছাড়া তারই জন্য যে এত আয়োজন আর এত মেহমানের আনাগোনা, সেই কারণে রীতিমত গর্বও।

শিউমলকে ঘিরে বসে রয়েছে তারই সমবয়সী দোসাদপাড়ার ছেলেছোকরারা। বিয়ের ব্যাপারে ইয়ার-বন্ধুরা তাকে ঠাট্টা করছে বা মজাক ওঠাচ্ছে। হেসে হেসে শিউমল তার উপযুক্ত জবাবও দিচ্ছে। এদের মধ্যে ধর্মাকেও দেখা যায়।

জমায়েতের এক প্রান্তে একটা ঝাঁকড়া-মাথা পরাসগাছের তলায় হাঁটুর ফাঁকে থুতনি গুঁজে বসে আছে গণেরি। চারদিকে এত লোকজন, এত গানবাজনা, এত হাসিঠাট্টা, মজা— সব কিছুর ভেতরে থেকেও সে যেন কোনো কিছুর মধ্যে নেই। সমস্ত কিছু থেকেই সে অনেক ফারাকে। তাকে নিরানন্দ,

গম্ভীর দেখায়।

ঘুরতে ঘুরতে একসময় বুন্দিয়া, চানা ভাজা, চা ইত্যাদি নিয়ে টিউমল গণেরির কাছে হাজির হয়। আপ্যায়নের সুরে বলে, 'লো গণেরি ভেইয়া, চায় পানি পীও—'

কালচে ক্বাথের মতো চা রয়েছে কলাই-করা গেলাসে আর বুন্দিয়া টুন্দিয়া শালপাতার মোড়কে। হাত বাড়িয়ে গেলাস আর শালপাতার ঠোঙা ধরতে ধরতে গণেরি বলে, 'এত লোককে চা খাওয়াচ্ছিস, মিঠাইয়া খাওয়াচ্ছিস! পাইসা পেলি কোথায়?'

টিউমল বিব্রত বোধ করে। গণেরির চোখের দিকে একবারও না তাকিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলে, 'মিলা গিয়া ভেইয়া—'

কিভাবে টিউমল এত খরচ টরচ করছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না গণেরির। তীক্ষ্ণ নজরে তাকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করে, 'অঙ্গুঠার ছাপ মেরে মুনশিজির কাছ থেকে কত রুপাইয়া করজ নিয়েছিস?'

মুখ নামিয়ে খুব আস্তে টিউমল মাথা নাড়ে। বলে, 'থোড়া কুছ, জ্যাদা নেহী।'

গণেরিকে বড়ই বিমর্ষ দেখায়। আধবুড়ো এই দোসাদ টিউমলদের সংসারের অন্ধকার ভবিষ্যৎ দেখতে দেখতে হতাশ গলায় বলে, 'বুরবাক কাঁহাকা। ছৌয়ার শাদি তো দিচ্ছিস না, তার মৌত ডেকে আনছিস। বিলকুল খতম হয়ে যাবি তোরা।'

তৌহারের মতো এই আনন্দের দিনে গণেরির এ জাতীয় কথা খুবই অস্বস্তিকর। সে উত্তর না দিয়ে বলতে থাকে, 'পী লেও ভেইয়া, চায়পানি ঠাণ্ডি হো যায়গা—'

টিউমলের কথা কানে ঢোকে না গণেরির। সে রুক্ষ স্বরে শুধোয়, 'গলায় কত টাকার ফাঁস চড়িয়েছিস আগে বল্?'

'বললাম তো, জ্যাদা নেহী।'

'জ্যাদা তো নেহী, তবু বাতা কত টাকার করজ নিয়েছিস—'

নতমুখে টিউমল জানায়, 'দোশ—'

'করজ নিয়ে মেহমানের খাতিরদারি করছিস! লাখেড়া (লক্ষ্মীছাড়া) ভৈস কাঁহাকা!' খেপে গিয়ে গণেরি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় গোটা দোসাদটোলাটায় সাড়া পড়ে যায়। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে অনেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আ গিয়া, আ গিয়া—'

দেখা যায়, ক্ষারে-কাচা সাফসুতরো কপড়-জামা আর দু কেজি ওজনের কাঁচা চামড়ার ভারি নাগরা পড়ে টিউমলের ভাবী সমধী-সমধীন (বেয়াই-বেয়ান), তাদের ভাঞ্জা, বোনাই আর ওদের এক বয়স্ক পণ্ডিতজি (খুব সম্ভব পুরুত) কুয়োপাড়ের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে। সমধীন অর্থাৎ বেয়ানের আসার কথা আগে জানায় নি গৈবীনাথ। জানান না দিয়ে তার আসাটা একটা চমকপ্রদ ঘটনা। তা ছাড়া কনের মা হলে কী হবে, বয়সের তুলনায় সমধীনকে যুবতী দেখায়। পতলী 'কোমরা', টান টান চটকদার চেহারা, হাত পা এবং মুখের ছিরিছাঁদ চমৎকার, চোখে বিজরি খেলার মতো চাউনি। হাতে আর দুই ভুরুর মাঝখানে উলকি। পরনে বাহারে শাড়ি, হাতে রুপোর কাঙনা, কানে 'করণফুল', নাকে ঝুটা পাথর-বসানো নাকছাবি, পায়ের মাঝখানের আঙুলে রুপোর চুটকি। মাথা থেকে গন্ধতেলের ভুরভুরে খুশবু ভেসে আসছে। দোসাদদের ঘরে এমন চেহারা এমন সাজগোজ ক্বচিৎ চোখে পড়ে। পুতহুর জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে মেয়ের মাকে দেখে মজে এসেছে টিউমল। এমন না হলে আর সমধীন! দোসাদদের ঘরের মেয়েমানুষদের এমনিতেই তো কড়া-পড়া হাত, তামাক আর খৈনি খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো আতার দানার মতো কালো, চোখেমুখে না ছিরি না ছাঁদ। হাঁ করলে গলায় যেন দশটা কৌয়া কি কামার পাগি ডেকে ওঠে। আর এই গৈবীনাথের বউ! সে যেন স্বর্গের পরীটি। বিয়ের পর শিউমল ক'দিন সসুরালে যাবে, সেটা সে বুঝবে। তবে সমধীনের টানে টিউমল যে মাঝে মাঝেই তিলাই গাঁয়ে হানা দেবে, সেটা চাঁদ সূরয ওঠার মতো একরকম নিশ্চিত।

গৈবীনাথদের দেখে বেজায় চঞ্চল হয়ে পড়ে টিউমল। সে বলে, 'ওরা এসে গেছে, আমি যাই ভেইয়া—' গণেরির উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সে একরকম দৌড়ই লাগায়।

সেই ভোর থেকে একটানা 'শাদির গানা' গেয়ে আর অনবরত ঢোল পিটিয়ে গাইয়ে-বাজিয়েরা খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছিল। টিউমলের নতুন কুটুম্বদের দেখে গানবাজনা দশগুণ তুমুল হয়ে ওঠে। এর মধ্যেই টিউমল, তার বউ এবং দোসাদটোলার অন্যান্য মেয়েপুরুষ গৈবীনাথদের যথেষ্ট সমাদর করে ঘরের বারান্দায় নিয়ে বসায়। পণ্ডিতজির খাতিরদারির জন্য দ্রুত অন্য ব্যবস্থা করা হয়। তার হাত-পা ধোওয়ার জন্য নতুন কুয়ো থেকে টাটকা জল তোলা হয়, বসার জন্য আনা হয় দড়ির চৌপায়া। এ জাতীয় বামহনেরা যারা অচ্ছুৎদের নানা ক্রিয়াকরম শাদি-শরাধের কাজ করে তারা ব্রাহ্মণকুলে পতিত। উচ্চবর্ণের 'শুধ্' (শুদ্ধ) বামহনের কাছে এদের হুক্কা-পানি বন্ধ।

সবাইকে বসাবার পর চা আসে, বুন্দিয়া আসে। এটা প্রাথমিক আপ্যায়ন। তারপর নানা মজার এবং রসের কথার পর আসল কাজের কথা শুরু হয়। পণ্ডিতজি পাঁজিপুঁথি দেখে বিয়ের দিন পাকা করে দেয়। ছট পরবের পর প্রথম 'পুনমকা রাতে' টিউমলের ছেলের সঙ্গে গৈবীনাথের মেয়ের বিয়ে হবে।

ভাবী জামাইকে পাঁচটা কাঁচা টাকা আর নতুন কোরা ধুতি দিয়ে আশীর্বাদ করে গৈবীনাথ এবং তার বউ।

খুশিতে ডগমগ টিউমল চেঁচিয়ে বলে, 'হো গিয়া, বামাজিকা কিরপাসে শাদিকা বাত পাক্কা হো গিয়া—'

এ সবের মধ্যে আরো একটা ব্যাপার ঘটতে থাকে। সবাই যখন বিয়ের কথা বা গান বাজনায় ব্যস্ত তখন বার বার কুশী আর ধর্মার চোখাচোখি হয়। কুশীর চোখে বিষণ্ণ করুণ চাউনি। যত বার কুশীর দিকে চোখ যায়, ততবারই ধর্মা দেখে মেয়েটা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বিয়ের কথা পাকা হতে হতে বেলা হেলে যায়। সূর্য খাড়া মাথার ওপর থেকে পশ্চিমে নামতে শুরু করে। জমায়েত ভেঙে একে একে দোসাদটোলার বাসিন্দারা যে যার ঘরে ফেরে। টিউমলের ঘরে তাদের শুধু চায-পানি খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল। দুপুরের খাওয়া যার যার নিজের ঘরে। তবে নতুন কটুম্বরা টিউমলদের ওখানেই দুপুরের 'ভোজন' সারবে। সে জন্য ভাত, ডাল, সবজি, মাংস, টক দহি, বুন্দিয়া — রীতিমত একটা ভোজের আয়োজন করেছে টিউমল।

সবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মা, কুশী এবং তাদের চার মা-বাপও নিজেদের ঘরে ফিরে এসেছিল। এখন কুশীদের ঘরের বারান্দায় কুশীরা আর ধর্মাদের ঘরের বারান্দায় ধর্মারা খেতে বসেছে।

মোটা দানার লাল লাল ভাত কালচে বিউড়ির ডাল দিয়ে মেখে বড় বড় গরাস মুখে পোরে ধর্মা আর তার বাপ। মাঝে মাঝে পেঁয়াজ আর হরা মিরচিতে কামড় দেয়।

ওদিকে ধর্মার মাও ভাত মেখে নিয়েছিল। খেতে খেতে সমানে বকতে থাকে সে, 'সবার ছেলেমেয়ের শাদি হয়ে যায়। আমাদের ঘরেই সিরিফ আন্ধেরা।'

মায়ের গলার সুরেই আন্দাজ পাওয়া যায়, তার কথাবার্তা এবার কোন দিকে বাঁক নেবে। এই দোসাদটোলায় যখনই কোনো ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় তখনই বুড়ির গজর গজর শুরু হয়। তার বড় আশা, ছেলের বিয়ে দিয়ে কুশীকে পুতহু করে ঘরে তোলে। মায়ের কথার উত্তর না দিয়ে পাতে ঘাড় ঝুঁকিয়ে দেয় ধর্মা, ঝড়ের বেগে নাকেমুখে ভাত-ডাল গুঁজতে থাকে। এভাবে খাওয়ার একমাত্র কারণ, তাড়াতাড়ি মায়ের সামনে থেকে সরে পড়া।

বুড়ি ফের বলে, 'কা রে, তোর মতলবটা কী?'

ধর্মা বলে, 'কিসের মতলব?'

'শাদি উদি করবি না? নাকি বনভৈসার (বুনো মোষ) মতো সারা জীওন ঘুরে বেড়াবি? তোর চেয়ে ছোট ছেলেদের সব শাদি হয়ে গেল।'

পাশের ঘরের বারন্দায় বসে খেতে খেতে মা আর বেটার সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল কুশীর মা। গলা তুলে সে বলে, 'বেটোয়াকে সমঝা ধর্মাকে মাঈ, শাদিটা এবার চুকিয়ে ফেলুক।'

ধর্মার মা বলে, 'তোরাই সমঝা। শাদির কথা বলে বলে আমার মুখে খুন উঠে গেছে।'

ধর্মা বলে, 'শাদি করব না বলেছি? লেকেন—'

'লেকেন কী?'

'রুপাইয়া পাইসা কঁহা? বিয়ের খরচ খরচা আসবে কোত্থেকে?'

'কেন বগেড়ি মেরে যে পাইসা জমাচ্ছিস তার থেকে শাদির খরচা দিবি।' পাখি এবং বনের নানারকম জানোয়োর মেরে সেগুলোর নখ-দাঁত-চামড়া টিরকে মারফত সাহেবদের কাছে বেচে ধর্মা আর কুশী যে টাকা জমাচ্ছে, বুড়ি সে খবর রাখে।

'ওই পাইসা শাদির জন্যে না।'

'তবে?'

'করজ শুধবার জন্যে।' ধর্মা যা বলতে থাকে তা এইরকম। বড়ে সরকারের পাই পয়সাটি হিসেব করে মিটিয়ে দেওয়ার পর যখন তারা পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারবে, ভূমিদাসদের গ্লানিকর কুৎসিত জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবে, তখনই বিয়ের কথা ভাববে সে।

'ততদিনে যে মৌতের বয়েস হয়ে যাবে রে ভূচ্চর—'

'হয় হোক।'

পাশের ঘরের দাওয়া থেকে কুশীর মা চেঁচিয়ে ওঠে, 'হো রামজি, তোর বেটোয়ার জন্যে আমার বেটির শাদি রুখে রয়েছে। জানবর লাখেড়া কাঁহিকা—'

নিজের পেটের ছৌয়াকে যা খুশি বলতে পারে ধর্মার মা। তাকে মারতে পারে, কাটতে পারে কিন্তু পরে কোন অধিকারে গালাগাল দেবে? সে ফোঁস করে ওঠে, 'কা রে, তুই আমার বেটোয়াকে গালি দিচ্ছিস! বুড়হী গিধ, বুড়হী শাঁখরেল কাঁহিকা! তোর মুহ্‌মে আগ ধরিয়ে দেব—'

কুশীর মা-ও ছাড়বার পাত্রী নয়। সে-ও কোমর বেঁধে লেগে যায়। লাফ দিয়ে নিচে নেমে প্রবল বেগে হাত-পা নেড়ে ভেংচায়, চেঁচায়, নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে। ধর্মার মা-ও বসে থাকে না। শুরু হয়ে যায় তুমুল ধুন্ধুমার। চিৎকারে গালাগালিতে দোসাদটোলা থেকে তাবৎ কাকচিল উধাও হয়ে যায়।

'দেব না তোর বেটোয়ার সাথ আমার লেড়কীর শাদি। বিয়ে দিলে এতদিনে আমার কুশীটার দুটো ছৌয়া হয়ে যেত।'

'তুই দিবি না কী, আমিই তোর লেড়কীকে পুতহু করব না। তোদের রিস্তাদারির মুহ্‌মে দশ বার থুক, দশ বার লাথ।'

যখনই এখানে কারুর ঘরে বিয়ে শাদি লাগে, কুশীর মা এবং ধর্মার মায়ের মধ্যে এক প্রস্থ লড়াই বেধে যায়। শুধু যাদের নিয়ে এই মহাসমর তারা পাশাপাশি দুই ঘরের দাওয়ায় বসে মুখ টিপে হাসে।

তেইশ

দুপুরে ভাত-ডাল-মাংস-সবজি-আচার এবং লাড্ডু-দহি দিয়ে উৎকৃষ্ট 'ভোজন'সেরে টিউমলের ভাবী সমধী-সমধীন আরো খানিকক্ষণ 'গপসপ' করেছে, হালকা মেজাজে ঠাট্টা-তামাসা করেছে। তারপর জষ্ঠি মাসের সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকখানি নেমে গেলে তারা তিলাই গাঁওয়ে রওনা হয়ে গেছে।

অন্যদিন দোসাদটোলাটা ভোর থেকে সেই সন্ধে পর্যন্ত ফাঁকা পড়ে থাকে। এটা যে একটা মানুষের বসতি তখন তা একেবারেই মনে হয় না। অন্যদিন এখানে কারুর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, চারদিক নিঝুম হয়ে থাকে। আজ দোসাদটোলা একেবারে সরগরম। টিউমলের বিয়ে উপলক্ষে আচমকা এক রোজ ছুটি পেয়ে যাওয়ায় এখানকার বাসিন্দারা বেজায় খুশি। এমনকি দোসাদটোলার যারা স্বাধীন মানুষ বা কমজোর দুব্‌লা বুড়ো-বুড়ি, তারা পর্যন্ত আজ আর খাবারের খোঁজে বোরোয় নি। এখন এই পড়তি বেলায় ফাঁকা জায়গাগুলোতে দড়ির চৌপায়া পেতে থোকায় থোকায় পুরুষ এবং মেয়েরা গল্প করছে। কেউ কেউ আবার গানের আসর বসিয়ে দিয়েছে। গোটা দোসাদটোলা জুড়ে ঢিলেঢালা আলস্যের ভাব।

আচমকা দূর থেকে বহু গলার চিৎকার ভেসে আসে। আওয়াজটাই শুধু শোনা যায় কিন্তু

লোকগুলো কী বলছে পরিষ্কার বোঝা যায় না। তবে দোসাদটোলার বাসিন্দারা কথাবার্তা এবং গানবাজনা থামিয়ে কান খাড়া করে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে টের পাওয়া যায়, চিৎকারটা এদিকেই আসছে। গলার স্বরগুলোও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'সুখন রবিদাসকো—'
'বোট দো।'
'সুখন রবিদাসকো—'
'বোট দো, বোট দো।'
'উটকা পর—'
'মোহর মার, মোহর মার।'

একসময় দোসদটোলার তাবৎ মেয়েপুরুষ বাইরের ফাঁকা কাঁকুরে ডাঙায় বেরিয়ে আসে। ততক্ষণে হাইওয়ের দিক থেকে শ'খানেক মানুষের একটা দলও চিৎকার করতে করতে কাছে চলে এসেছে। সবার আগে আগে রয়েছে স্বয়ং সুখন রবিদাস।

বিজুরি এবং গারুদিয়া তালুকের, শুধু এই দুটো জায়গারই বা কেন, পঞ্চাশ-ষাট মাইলের মধ্যে যত গাঁ-গঞ্জ হাট-বাজার রয়েছে, সব জায়গার তাবৎ মানুষ সুখনকে চেনে। বিশেষ করে জল-অচল অচ্ছুতেরা। তারা শুধু সুখনকে চেনেই না, মনে মনে তার নামে পুজোও চড়ায়। চামারদের এই ছেলেটা বহুত তেজী। বামহন-কায়াথ-রাজপুত, সরকারি অফসর, থানার দারোগা কি মাজিস্টার, কাউকেই সে রেয়াত করে না। ঠাঁই ঠাঁই সবার মুখের ওপর কথা বলে। হাঁ, সিনায় সাহস আছে ছোকরার।

সুখনকে যেমন এ তল্লাটের সবাই চেনে, সুখনও তেমনি অনেককেই চেনে। বিশেষ করে এই দোসাদটোলার গণেরি, বুধেরি, টিউমল থেকে শুরু করে মাধোলাল বৈজু পর্যন্ত অন্তত দশ বিশজন তার 'জানপয়চান আদমী'।

হাত তুলে সুখন তার সঙ্গীদের থামিয়ে সোজা গণেরির কাছে এগিয়ে এল। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'এমন আছ চাচা?'

গণেরির চোখমুখ দেখে বোঝা যায়, সুখনকে দেখে সে খুশি হয়েছে। সুখন এ অঞ্চলে বহু জনেরই প্রিয়। গণেরি খুব আন্তরিক গলায় বলে, 'ভাল। তুমি কেমন আছ?'

'আচ্ছা—'

এরপর ঘুরে ঘুরে দোসাদটোলার সবার কাছেই যায় সুখন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের নানা খবর নিয়ে ফের গণেরির কাছে ফিরে আসে। বলে, 'চাচা, একটা দরকারি কাজে তোমাদের কাছে এসেছিলাম।'

সুখনের কাজের ব্যাপারটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে গণেরি। তবু শুধোয়, 'কী কাজ, বল—'

'জরুর শুনেছ, আমি এবার চুনাওতে নেমেছি।'

'শুনা হ্যায়।'

'আমি তোমাদের কাছে কী জন্যে এসেছি, এবার বুঝতে পারছ তো?'

আধবুড়ো, অভিজ্ঞ গণেরিকে কেমন যেন বিপন্ন দেখায়। সে অন্যমনস্কর মতো আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে সুখন বলে, 'আমি এসেছি চুনাওতে তোমাদের ভোট চাইতে। বহোত আশা করে এসেছি। তোমাদের হর আদমীর ভোট আমার চাই। একটা ভোটও যেন আর কেউ না পায়।'

গণেরি চুপ করে থাকে।

সুখন বলে যায়, 'আমার মার্কা হল উট। উটে মোহর মারবে। আমি জানি তুমি দোসাদটোলার সব। তুমি বললে আমাকে ভোট না দিয়ে কেউ পারবে না। কেন আমাকে চুনাওতে জেতানো দরকার সবাইকে বুঝিয়ে দিই, না কি বল চাচা?'

গণেরি এবারও উত্তর দেয় না।

সুখন খানিকটা পিছিয়ে ছোটখাট একটা টিলার মতো জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর গলা চড়িয়ে বলতে থাকে, 'ভেইয়া আর বহিনরা, তোমরা অচ্ছুৎ, দোসাদ। তার ওপর কামিয়া। বাপ-দাদা কি দাদাকা বাপের আমল থেকে পুরা জীওন পরের জমিনে বেগারি দিয়ে যাচ্ছ। আমিও অচ্ছুৎ — চামারকা বেটোয়া। আমাদের নাম শুনলে উঁচা জাতের লোকেরা দশ বার থুক দেয়। আমাদের ছায়া যেখানে পড়ে তার দশ মাইল তফাৎ দিয়ে হাঁটে।'

দোসাদটোলার বাসিন্দারা নিঃশ্বাস বন্ধ করে সুখনের কথা শুনতে থাকে। তাদের চোখের পাতা পড়ে না।

সুখন সমানে বলে যায়, 'দেশমে চালু হ্যায় বামহনরাজ, কায়াথরাজ, উঁচা জাতোকা রাজ। তোমরা আমরা, মতলব চামার ধোবি দোসাদ ধাঙড়েরা চান্দা-সূরয যত কাল ধরে উঠছে সব কোঈ উঁচা জাতের জুতির নিচে পড়ে আছি। জানবরের মতো ওরা আমাদের খাটায়, জানবরের মতো আমাদের সাথ ব্যবহার করে। লেকেন এ নেহী চলেগা, নেহী চলেগা। তোমার আমার মতো অচ্ছুৎদের ভালাইয়ের জন্যে আমাকে জেতানো দবকার। চুনাওতে তোমবা যদি আমাকে জিতিয়ে দাও, আমরা সবাই যাতে মানুষের মতো বাঁচতে পারি তার কোসিস করব। কমসে কম পাটনার বিধানসভায় গিয়ে দুনিয়ার মানুষকে তো জানাতে পারব আমরা অচ্ছুৎরা কী অবস্থায় আছি, তোমরা কামিয়ারা কিভাবে পরের জমিনে জান খতম করে দিচ্ছ। ইয়াদ রেখ আমার মার্কা হল উট। উট মার্কায় মোহর মারবে।'

সঙ্গে সঙ্গে সুখনের সঙ্গীরা চিৎকার করে ওঠে :

'সুখন রবিদাসকো—'

'বোট দো, বোট দো।'

'উটমে—'

'মোহর মার, মোহর মার।'

'সুখন জিতনেসে—'

'অচ্ছুৎ বঁচেগা।'

'সুখন জিতনেসে—'

'জামানা বদল যায়েগা।'

হাতের ইঙ্গিতে সঙ্গীদের থামিয়ে টিলা থেকে নেমে ফের গণেরির কাছে চলে আসে সুখন। তার বুকে একটা হাত রেখে বলে, 'তোমার ওপর ভরোসা করে রইলাম চাচা।'

গণেরিকে খুবই চিন্তিত দেখায়। সে বলে, 'মগর—'

'মগর-উগর কুছ নায়। দুসরা বাত নেহী শুনেগা। তোমার আদমীদের সবার ভোট আমার চাই, চাই, চাই।'

'মগর—'

'ফির মগর!'

গণেরি বলে, 'আমি কী বলতে চাই, শুনেই নাও না—'

একটু ভাবে সুখন। কপাল কুঁচকে বলে, 'ঠিক হ্যায়, বল—'

গণেরি যা বলে তা এইরকম। তারা বাপ-দাদা কি তারও আগের আমল থেকে পুরুষানুক্রমে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের কাছে খরিদী হয়ে আছে। সেই বড়ে সরকার এবার চুনাওতে নেমেছেন। এদিকে সুখন রবিদাসও নেমেছে। সুখন তাদের আপনা আদমী। মনমে বহোত ইচ্ছা তাকেই ভোট দিয়ে চুনাওতে জিতিয়ে দেয়। কিন্তু মুসিবৎ হয়ে গেছে রঘুনাথ সিংয়ের জন্য। তাঁরই জনমদাস হয়ে, তাঁরই কাটানো কুয়োর জল খেয়ে, তাঁরই দেওয়া জায়গায় ঘর তুলে আজীবন বাস করে চুনাওর সময় তাঁর হাতি মার্কার বদলে উট মার্কায় মোহব মারলে ঘাড়ের ওপর মাথাটা কী আব খাড়া থাকতে দেবেন রঘুনাথ? পোষা পহেলবানদের লেলিয়ে জরুর তাদের ঘরে আগ লাগিয়ে দেবেন, জানে খতম করে লাশ গুম করে ফেলবেন।

সুখন বলে, 'ঘাবড়াও মাত্ চাচা। সবাই যদি বড়ে সরকারদের নামে ডরে যায় আমাদের হাল কী

হবে? সারা জীওন আমরা উঁচা জাতের নাগরার নিচে পড়ে থাকব? তাদের জমিনে কামিয়া খেটে খেটে খতম হয়ে যাব? এ হবে না গণেরি চাচা, সিনার ভেতর খোড়েসে তাকৎ আনো।' বলে দু কাঁধ ধরে গণেরিকে ঝাঁকায় সুখন। খুব সম্ভব তার মধ্যে খানিকটা সাহস সঞ্চার করতে চেষ্টা করে।

ভীরু গলায় গণেরি জানায়, তোমার কথাটা ভেবে দেখব।'

গণেরির কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে সুখন বলে, 'ঠিক হ্যায় চাচা, আজ যাই, আবার আমি আসব। অন্য দোসাদদের দিকে হাত তুলে বলে, 'চলি ভেইয়া বহিনরা—' তারপর দলবল নিয়ে কাঁকুরে ডাঙা পেরিয়ে দূরে হাইওয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

সুখনরা খানিকটা দূরে চলে গেলে ভিড়ের ভেতর থেকে নওরঙ্গী বেরিয়ে আসে। সুখনের চিৎকার শুনে সবার সঙ্গে সে-ও দোসাদটোলার বাইরে চলে এসেছিল। পরে তার কথা আর কারুর খেয়াল ছিল না।

নওরঙ্গী হাত-পা নেড়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে বলে, 'ভূচ্চর জানবরটার মরার জন্যে ডানা গজিয়েছে। মরেগা, ও হারামী জরুর মরেগা, বিলকুল ফৌত হো যায়েগা।'

ভূচ্চর জানবর এবং হারামী— এই তিনটে বাছা বাছা উৎকৃষ্ট গালাগাল কার উদ্দেশে দেওয়া হল, দোসাদদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুখন যে এখানে ভোট চাইতে এসেছিল, এই খবরটা জানতে রঘুনাথ সিংয়ের খুব বেশি দেরি হবে না। নওরঙ্গী যখন তাকে দেখে ফেলেছে তখন নিশ্চয়ই সুখনের কথা হিমগিরি মারফত বড়ে সরকারের কানে উঠে যাবে।

এখানে সুখনের ভোট মাঙতে আসাটা যেন গণেরিদের মস্ত এক অপরাধ। নওরঙ্গীর নানা অঙ্গভঙ্গি দেখে বা তার মুখে সুখন সংক্রান্ত খিস্তিখেউড় শুনেও কেউ মুখ খোলে না, সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে।

নওরঙ্গী ফের বলতে থাকে, 'কুত্তাটার সিনায় বহোত তাকৎ! বড়ে সরকারের আপনা আদমীদের কাছে ভোট মাঙতে এসেছে! ঘাড়ের ওপর দশটা শির গজিয়েছে হারামজাদের, শিরগুলো নামিয়ে দেওয়ার ব্যওস্থা করতে হবে।'

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নওরঙ্গীর কথা শুনতে শুনতে রামলছমনের কথা মনে পড়ে যায় ধর্মার। সেদিন চাহাড়ের হাটে সুখনদের দেখে এই রকমই খেপে গিয়েছিল বগুলা ভকতটা। দেখা যাচ্ছে বড়ে সরকারের পা-চাটা কুত্তারা, তিনি ছাড়া আর যারাই চুনাওতে নেমেছে তাদের সবার ওপর ক্ষিপ্ত।

ওদিকে নওরঙ্গী আর দাঁড়ায় না, সুখনকে আরো কয়েক প্রস্থ খিস্তিখাস্তা করে লম্বা লম্বা পা ফেলে দোসাদটোলায় ঢুকে যায়। বাকি সকলেও ফিরে যেতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর গোটা দোসাদটোলাটা অবাক হয়ে দেখে, সেজেগুজে নওরঙ্গী চলে যাচ্ছে। অন্য দিন সূর্যাস্তের অনেক পর রাত বেশ ঘন হলে তাকে হিমগিরির কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য খামারবাড়ি থেকে গৈয়া গাড়ি আসে। আজ এখন সন্ধে পর্যন্ত নামে নি। পশ্চিম দিকের আকাশের গায়ে লাল রঙের সূর্যটা আটকে আছে। এত তাড়াতাড়ি এত ব্যস্তভাবে স্রেফ পায়দল নওরঙ্গীর বেরিয়ে পড়ার কারণ কী, দোসাদটোলার বাসিন্দাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। তারা চুপচাপ বসে বসে নিজেদের ভীরু হৃৎপিণ্ডের টিপ টিপ শব্দ শুনতে থাকে। তবু তারই মধ্যে কে যেন ফিসফিসিয়ে গণেরিকে শুধোয়, 'কা হোগা ভেইয়া? ও ছমকী রেণ্ডি আওরত জরুর মিশরজিকা পাস সুখনকো খবর পৌঁছা দেগী—'

গণেরি আস্তে মাথা নাড়ে, 'ঠিক বাত—'

'মিশিরজি জরুর বড়ে সরকারকে জানাবে।'

'ও ভি ঠিক।'

'তব্—'

'দ্যাখ কী হয়। কেউ আমাদের কাছে এলে বলব, ভাগো—তাই কখনও হয়?

·

খুব বেশি দেরি হয় না। সূর্য ডুববার পর আকাশ থেকে মিহি অন্ধকার যেই নামতে শুরু করে, লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে রামলছমন এসে দোসাদটোলায় হাজির হয়। চনমন করে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে বলে, 'কী ভেবেছিস তোরা? একেবারে চৌপট হয়ে যাবি যে রে উল্লুর বেটোয়া-বেটিয়ারা।'

দোসাদরা ভয়ে ভয়ে শুধোয়, 'কা হুয়া দেওতা?'

'কা হুয়া?' রামলছমন বলতে থাকে, 'চল আমার সাথ। গেলেই বুঝতে পারবি। যত মরদ আছিস, উঠে পড়—'

'কঁহা যায়গা হুজৌর?'

'গেলেই মালুম পাবি। চল—' ধমকে, চেঁচিয়ে গোটা এলাকাটা মাথায় তুলে ফেলে রামলছমন।

একটু পরেই দেখা যায়, দোসাদটোলার তাবৎ পুরুষেরা বগুলা ভকতের পিছু পিছু হাইওয়ের দিকে চলেছে। রামলছমন তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তবে নওরঙ্গীর ওভাবে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়া, তারপরেই রামলছমনের এখানে আসা—সব কিছুর মধ্যেই একটা অনিবার্য ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তবু দেখাই যাক।

শেষ পর্যন্ত রামলছমন দোসাদদের যেখানে এনে তুলল সেটা বড়ে সরকারের হাভেলি। রঘুনাথ সিং শ্বেতপাথরের ঢালা বারান্দায় তাঁর সেই গদিমোড়া বিরাট ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে আছেন। তাঁকে ঘিরে তাঁর সর্বক্ষণের সহচরেরা। ডাগদরজি, ভকিলজি, মাস্টারজি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আছে তাঁর হয়ে চুনাওর জন্য যারা খাটছে সেই সব কর্মীরা।

এধার ওধারে গণ্ডা গণ্ডা বিজলি বাতি জ্বলছে। রোশনিতে চারদিক দিনের মতো স্পষ্ট।

রামলছমন রঘুনাথ সিংকে বলে, 'সবাইকে ধরে নিয়ে এসেছি।'

আস্তে মাথা হেলিয়ে রঘুনাথ সিং হাতের ইশারায় তাকে চলে যেতে বলেন।

দোসাদদের কাছে এবার ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। বড়ে সরকারই তাদের তলব করে এনেছেন। তারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু রঘুনাথ সিংয়ের চোখমুখ দেখে মনেই হয় না তিনি গুস্সা হয়েছেন। বরং তাঁর তাকানোর মধ্যে রয়েছে অগাধ স্নেহ এবং প্রশ্রয়। খুব মিষ্টি করে বলেন, 'কী রে, সব দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বসে পড়।'

নিচের ঘাসের জমিতে গা জড়াজড়ি করে দলা পাকিয়ে বসে পড়ে গণেরিরা। কী কারণে বড়ে সরকার ডাকিয়ে এনেছেন, সেটা না জানা পর্যন্ত বুকের কাঁপুনি তাদের থামে না।

রঘুনাথ সিং বলেন, 'টিউমলের বেটার শাদির বাত পাক্কা হয়ে গেল?'

টিউমল কাঁপা গলায় জানায়, হুজৌর বড়ে সরকারের কিরপায় পাকা কথা হয়ে গেছে।

মেয়ের বাড়ি থেকে কথা পাকা করতে কারা কারা এসেছিল, কী কী কথা হল, নতুন কুটুম্বদের কী খাইয়েছে টিউমলরা, সমস্ত অনুষ্ঠানটা ভালভাবে চুকেছে কিনা, ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন রঘুনাথ সিং। তারপর ফস করে শুধোন, 'শুনলাম তোদের ওখানে সুখন রবিদাস ভোট মাঙতে এসেছিল। লম্বে লম্বে বহোত লেকচার ভি দিয়া।'

টিউমলের ছেলের বিয়ের ব্যাপারে এত আন্তরিক কথাবার্তা বলছিলেন রঘুনাথ সিং যে ভয়টা অনেকখানি কেটে গিয়েছিল দোসাদদের। আচমকা সুখনের কথা উঠতেই সবাই ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে গেল। চোখেমুখে আবার দুর্ভাবনার ছাপ পড়েছে তাদের। গণেরিই শুধু দুর্জয় সাহসে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলে, 'হাঁ সরকার, আয়া থা, কুছ বাত ভি বোলা—'

'ভোট মাঙা?'

'হাঁ হুজৌর।' বলে জোরে জোরে শ্বাস টানে গণেরি। তারপর নতুন উদ্যমে ফের বলতে থাকে, 'কা করে সরকার? কেউ আমাদের কাছে এলে ভাগাই কী করে? বহোত গরিব আদমী হামনিলোগ। আপ হামনিলোগনকো মা-বাপ—'

রঘুনাথ সিং বলেন, 'কভি নায। গণতন্ত্রমে যে চুনাওতে নামবে তারই ভোট মাঙবার অধিকার আছে। তোদের কাছে আজ সুখন এসেছে, কাল প্রতিভা সহায় আসবে, পরশু আবু মালেক আসবে, নরশু শর্মাজি আসবে। তবে এর 'বীচমে' একটা লেকেন আছে—'

গণেরি শুধোয়, 'কা হুজৌর?'

'যেই ভোট মাঙুক, তোরা হাতি মার্কায় মোহর মারবি। মনে রাখবি, হাতিতে মোহর মারলে ভোটটা

আমিই পাব। আমি তোদের আপনা আদমী। আমাকে চুনাওতে জেতালে তোদের ভালাই হবে। সমঝা?'

গণেরির ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে, বুকের সেই টিপটিপানি থামে। রঘুনাথ সিং তা হলে তাদের ওপর গুস্সা হননি। গণেরি বলে, 'সমঝ গিয়া হুজৌর।' বলতে বলতে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে যায় তার। শুধোয়, 'একগো বাত সরকার—'

'হাঁ হাঁ, পুছ না।'

'সেদিন আমাদের টোলাতে অবোধজি এসেছিল।'

'অবোধজি কৌন?'

'বিজুরি বাজারের বড়ে ব্যওসাদার।'

'সমঝ গিয়া, অবোধ পাণ্ডে। প্রতিভা সহায়ের হয়ে চুনাওতে খাটছে।'

গণেরি বলে, 'পরতিভাজির জন্যে 'বোট' মাঙতে এসেছিল।'

উদার ভঙ্গিতে রঘুনাথ সিং উত্তর দেন, 'জনতাকে রাজ গণতন্ত্রমে কারুর ভোট চাইতে দোষ নেই।'

সাহস পেয়ে গণেরি ফের বলে, 'আউর একগো বাত বড়ে সরকার।'

'কা?'

'সাত আট রোজের মধ্যে গারুদিয়া বাজারে পরতিভাজির চুনাওকা মিটিন হবে।'

'চুনাওতে নামবে আর মিটিং হবে না? জরুর মিটিং হবে। লেকেন আসল কথাটা কী?'

'সেই মিটিনে অবোধজি আমাদের যেতে বলেছে। গাড়িতে চড়িয়ে আমাদের নিয়ে যাবে।'

'কা গাড়ি? গৈয়া না ভৈসা?'

'হাওয়া গাড়ি সরকার।'

ওধার থেকে হেড মাস্টারজি বদ্রীবিশাল চৌবে বলে ওঠেন, 'চুনাও আসতে তোদেরই দেখছি বরাত খুলে গেল। কা সৌভাগ তোদের! হাওয়া গাড়িতে চড়িয়ে অচ্ছুতিয়াদের মিটিংয়ে নিয়ে যাবে। কলযুগের বাকি যেটুকু ছিল তাও 'পূরণ' হয়ে গেল।'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দেন রঘুনাথ সিং। বলেন, 'অ্যায়সা না কহিয়ে চৌবেজি। গণতন্ত্রমে সব কোঈকো হাওয়া গাড়ি চড়নেকো অধিকার হ্যায়।' গণেরির দিকে ফিরে বলেন, 'যাবি, নিশ্চয়ই হাওয়া গাড়ি চড়ে তোরা প্রতিভা সহায়ের মিটিং শুনতে যাবি।'

গণেরির সাহস এবার চারগুণ বেড়ে যায়। সে বলে, 'সরকার, অবোধজি বলেছে, যে পরতিভাজির চুনাও মিটিনে যাবে তার তিনগো রুপাইয়া মিলবে। রুপাইয়া নেব?'

'রুপাইয়া দিতে চাইছে আর নিবি না! গাধ্ধা কাঁহাকা! গণতন্ত্রমে রুপাইয়া নিতে কোথাও মানা নেই। লেকেন—'

'কা সরকার?' দু চোখে প্রশ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েই থাকে গণেরি।

'চুনাওর মওকায় যত পারিস হাওয়া গাড়ি চড়ে নে, যত পাবিস পাইসা কামাই কর, লেকেন ভোটটা আমার চাই। হাতি মার্কায় মোহর মারার কথা জান গেলেও ভুলবি না।'

'নায় হুজৌর।'

ডান দিকে যেখানে তেরপল দিয়ে নির্বাচন কর্মীদের জন্য অস্থায়ী ক্যাম্প বসানো হয়েছে সেখান থেকে চিৎকার ওঠে।

'আপনা ভালাইকে লিয়ে—'

'রঘুনাথ সিংকো বোট দো, বোট দো।'

'হাতি মার্কামে—'

'মোহর মার, মোহর মার।'

চিৎকার থামলে রঘুনাথ সিং গণেরিদের বলেন, 'অনেক রাত হল, তোরা ঘরে যা।'

দোসাদরা ফিরে যায়।

রঘুনাথ সিংয়ের প্রধান কুত্তাদের একজন ভকিলজি এবার বলে ওঠেন, 'কারখানাবালীর বহোত পাইসা হয়েছে। চুনাওতে খুব ছড়াচ্ছে।'

চৌবেজি বললেন, 'চারদিকে সব গরিব মানুষ। রুপাইয়া পাইসার লালচে ভোট টোট কারখানাবালীকে না দিয়ে বসে!'

এতক্ষণ বেশ হাসিখুশিই ছিলেন রঘুনাথ সিং। এবার তাঁর মুখটা ভয়ানক গম্ভীর দেখায়। তবে তিনি আপাতত প্রতিভা সহায় সম্পর্কে কোনোরকম মন্তব্য করেন না।

বাঙালি ডাগদর শ্যামদুলাল সেন বলেন, 'আরো একটা কথা আছে রঘুনাথজি।'

রঘুনাথ সিং বিশাল শরীর কাত করে ডান পাশে শ্যামদুলালের দিকে তাকান। শ্যামদুলাল বলেন, 'এবার আমাদের এই জায়গায় চুনাওর ক্যারেক্টারটা বড়ে আজীব।'

'কিরকম?'

'মোট ছ'জন চুনাওর লড়াইতে নেমেছে। প্রতিভা সহায়, নেকীরাম শর্মা, সুখন চামার, আবু মালেক, আপনি অউর ছে নম্বর যে আছে তাকে না ধরলেও চলে। নিজের ফ্যামিলির আট দশ জনের ছাড়া বাইরের আধখানা ভোটও সে পাবে না।'

রঘুনাথ সিং বলেন, 'চুনাওতে কোথাও পাঁচ ক্যান্ডিডেট লড়ে, কোথাও সাত ক্যান্ডিডেট, কোথাও দশ পন্দ্রভি। এর মধ্যে আজীব কেরেক্টারটা কোথায় পেলেন?'

হাত তুলে রঘুনাথ সিংকে থামিয়ে দেন শ্যামদুলাল। তারপর গারুদিয়া-বিজুরির চুনাওতে এবার যে আশ্চর্যজনক লক্ষণীয় ব্যাপারটা ঘটেছে সবিনয়ে এবং সংক্ষেপে তা বলে যান। এখানকার পাঁচ নির্বাচন প্রার্থীর ভেতর থেকে প্রথমেই রঘুনাথ সিংকে ধরা যাক। রঘুনাথ সিং হলেন জমির মালিক, সান অফ দি সয়েল — পুরুষানুক্রমে মিট্টিকা সন্তান। দু নম্বর প্রতিভা সহায়। বিজুরিতে তাঁর সসুরাল হলেও তিনি গাঁওকা আদমী নন, তিনি শহরের মানুষ — ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, কারখানাবালী। দেশের মিট্টিতে তাঁর 'রুট' নেই। তিন নম্বর হল সুখন রবিদাস। সে অচ্ছুৎ জল-অচলদের প্রতিনিধি। চার নম্বর আবু মালেক, মাইনোরিটিদের রিপ্রেজেন্টেটিভ। আর পাঁচ নম্বর নেকীরাম শর্মা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের তরফ থেকে এই চুনাওতে নেমেছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে জমিমালিক, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, অচ্ছুৎ, মুসলিম মাইনোরিটি আর উঁচা জাতের হিন্দু — পাঁচ ক্লাসের রিপ্রেজেন্টেটিভ এই অঞ্চলের নির্বাচনে ভোটপ্রার্থী।

খুবই মনোযোগ দিয়ে শ্যামদুলালের কথা শুনে যান রঘুনাথ সিং, তবে তেমন গুরুত্ব দেন না। হালকা ভাবেই বলেন, 'এর মধ্যে আজীব বা নয়া কিছু নেই। এ সব আমাদের জানা। আগেও এই নিয়ে অনেক কথা হয়েছে।'

শ্যামদুলাল ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, 'ও তো ঠিক বাত। লেকেন আমার আরো কথা আছে।'

'কী?'

'সোসাইটির পাঁচ ক্লাসের রিপ্রেজেন্টেটিভ যখন চুনাওতে নেমেছে তখন ভোট জরুর পাঁচ ভাগ হয়ে যাবে। সেটা কিন্তু চিন্তার কথা।'

রঘুনাথ সিং হাতের ভর দিয়ে উঠে বসতে বসতে এবার বলেন, 'চিন্তার কথা কেন? থোড়াসে সমঝা দিজিয়ে।'

শ্যামদুলাল এবার যা বলেন তা এইরকম। গারুদিয়া-বিজুরিতে কমসে কম থার্টি পারসেন্ট অচ্ছুৎ আছে। সুখন চামার এই ভোটের প্রায় পুরাটাই টানবে। দুই তালুকে উঁচা জাতের হিন্দু আছে থার্টি ফাইভ থেকে ফর্টি পারসেন্ট। বিজুরি তালুকের মিশিরলালজি ভরসা দিলেও নেকীরাম জাতওয়ারি সওয়াল তুলে ব্রাহ্মণদের ভোট অনেকটাই পেয়ে যাবে। এখানে মাইনোরিটি মুসলিম রয়েছে ফিফটিন থেকে সেভেনটিন পারসেন্ট। আবু মালেক তাদের প্রায় সব ভোটই পাবে। আর কারখানাবালী প্রতিভা দশ হাতে পয়সা ছড়িয়ে প্রচুর ভোট কিনে নেবে। ফলে কেউ অন্যের চাইতে খুব বেশি একটা ভোট টানতে পারবে না। যেই জিতুক, সামান্য ভোটের মার্জিনে জিতবে।

রঘুনাথ সিংয়ের কপালে ভাঁজ পড়ে। শ্যামদুলালের কথাগুলো তাঁর মস্তিষ্কের ভেতর দ্রুত বসে যেতে থাকে। গম্ভীর মুখে তিনি বলেন, 'চুনাওর এ দিকটা তো খেয়াল করি নি। করা উচিত ছিল।'

শ্যামদুলাল ছাড়া রঘুনাথ সিংয়ের অন্য পা-চাটা কুত্তারা নড়েচড়ে বসে। রঘুনাথ যখন শ্যামদুলালের কথায় পর্যাপ্ত গুরুত্ব দিয়েছেন তখন তাঁদেরও না দিলে চলে না। সব হাঁ-তে হাঁ মিলানোর দল। তাঁরা

সমস্বরে বলে ওঠেন, 'সচমুচ করা উচিত ছিল।'

রঘুনাথ সিং বলেন, 'বহোত চিন্তাকি বাত।'

'হাঁ হাঁ—'

অস্বস্তির মধ্যে খানিকটা সময় চুপচাপ কাটে। তারপর বদ্রীবিশাল চৌবে বলে ওঠেন, 'প্রতিভা সহায় কারখান্না ফারখান্না চালাচ্ছিল, তাই নিয়ে থাকলেই তো পারত। এই চুনাওর ভেতর কেন যে আওরতটা নাক ঢোকাল—'

শ্যামদুলাল নাকের ভেতর শব্দ করে বলেন, 'ক্লাস ইন্টারেস্ট চৌবেজি, খ্রিফ ক্লাস ইন্টারেস্ট—'

'সুখন চামার, আবু মালেক আর নেকীরাম শর্মা — এদের ইন্টারেস্টটা কিসের?'

'এ তো জলের মতো সোজা ব্যাপার। জাতওয়ারি ইন্টারেস্ট। পলিটিক্যাল পাওয়ার হাতে থাকলে জোর কত বাড়ে, ভেবে দেখেছেন?'

রঘুনাথ সিংকে এবার চিন্তাগ্রস্ত দেখায়। তিনি বলেন, 'আপনাদের কী মনে হয়, চুনাওতে আমি হেরে যাব?'

নির্বাচনের নানা দিক নিয়ে চুলচেরা হিসাব করলেও রঘুনাথ সিংয়ের হারের কথা বদ্রীবিশাল চৌবেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। গিদ্ধড়ের মতো ঝাঁক বেঁধে তাঁরা চেঁচিয়ে ওঠেন, 'নেহী নেহী, কভী নেহী।'

'এই পয়লা চুনাওতে নামলাম। হেরে গেলে কাউকে আর মুখ দেখাতে পারব না। এটা আমার ইজ্জৎকা সওয়াল।'

'আপনার বেইজ্জতি পুরা গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকের হর আদমীকা বেইজ্জতি। আমাদের গায়ে এক বুঁদ খুন থাকতে আমরা তা হতে দেব না।' বলে একটু থামেন সবাই। পরমুহূর্তে দম নিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করেন, 'আপনি যদি হারেন সূরয পছিমা আকাশে উঠবে।'

সর্বক্ষণের সঙ্গী এতগুলো মানুষের জোরাল মৌখিক মদতে রঘুনাথ সিংয়ের দুর্ভাবনা কিছুটা কাটে। তিনি বলেন, 'বিশ ত্রিশ পুরুষ ধরে আমরা গারুদিয়ায় পড়ে আছি। কোনোদিন গাঁও ছেড়ে কোথাও যাই নি। আমি হলাম আসল মিট্টিকা সন্তান। ভোট চাইবার হক একমাত্র আমারই আছে।'

'আলবত। আজীবচাঁদ মুনশি যে কথাটা বলে সেটা হাজার বার ঠিক। আপনি চুনাওতে জিতলে গারুদিয়া-বিজুরিতে রামরাজ নেমে আসবে। এখানকার মানুষ বেঁচে যাবে।'

এ সব শুনে রঘুনাথ সিং গলার ভেতর এমন এক ধরনের শব্দ করেন যা শুনে আন্দাজ করা যায়, তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

চুপচাপ খানিকটা সময় কাটে। তারপর বদ্রীবিশাল চৌবে গলা ঝেড়ে একটু কেশে নেন। একসময় শুরু করেন, 'তবে একটা কথা রঘুনাথজি—'

চৌবের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে রঘুনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কী কথা?'

'আপনার জেতার ব্যাপারে পুরা নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।'

'এ ব্যাপারে আপনার সন্দেহ আছে নাকি?'

হিক্কা তোলার মতো শব্দ করে চৌবেজি চেঁচিয়ে ওঠেন, 'নেহী নেহী। তবে কিনা সাবধানের মার নেই।'

রঘুনাথের কপালটা মসৃণ হয়ে গিয়েছিল। আবার সেখানে ভাঁজ পড়ে। স্থির চোখে বদ্রীবিশালকে দেখতে দেখতে বলেন, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বলছিলাম ভোটগুলো পাঁচ ভাগ হয়ে গেলে অসুবিধা হলেও হতে পারে।'

'ভাগাভাগি রুখবেন কী করে?'

'যারা চুনাওতে নেমেছে তারা ভাল ভোট টানবে। এটাই বড় সমস্যা।'

'কী করা যায় তা হলে?'

বদ্রীবিশাল বলেন, 'ব্যওস্থা কিছু একটা করতেই হবে। এই পাঁচ ক্যান্ডিডেটের মধ্যে দু-একজন যদি না দাঁড়ায়, অত ভোট ভাগাভাগি হবে না।'

রঘুনাথ সিংয়ের মতো প্রখর বুদ্ধিমান লোকেরও কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়। তিনি বলেন, 'সরে দাঁড়াবার জন্যে ওরা চুনাওতে নেমেছে নাকি?'

'সহজে কি কেউ সরে! তবে তার রাস্তা আছে।'

'আপনি কি ওদের গুম করে দেওয়ার কথা ভেবেছেন? লেকেন চৌবেজি আমার বাপ-দাদার আমলের সেই পুরানা জামানা আর নেই। কান্ট্রিতে গণতন্ত্র চালু হয়েছে। চুনাওর ক্যান্ডিডেটের গায়ে হাত লাগালে কী হবে ভাবতে পারেন?'

দুই কান ধরে জিভ কাটতে কাটতে শিউরে ওঠার ভঙ্গি করেন বদ্রীবিশাল চৌবে, যেন মারাত্মক পাপের কথা শুনেছেন। সেই অবস্থাতেই বলেন, 'ছিয়া ছিয়া ছিয়া, কী বলেন রঘুনাথজি! আমার কি নরকের ভয় নেই? গুম করা ছাড়া কাউকে কি সরানো যায় না?'

'কিভাবে?'

বদ্রীবিশাল বাঁ চোখ কুঁচকে ডান হাতের বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করেন।

রঘুনাথ সিংকে তেমন উৎসাহিত হতে দেখা যায় না। নিরুৎসুক মুখে তিনি বলেন, 'পয়সা দিয়ে কি সবাইকে কেনা যায়? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'সুখন চামারটা বড় ঠেঁটা, রুপাইয়া-পাইসা দিয়ে তার গর্দান নোয়ানো যাবে না। জান গেলেও চুনাওর লড়াই থেকে সে হটবে না। প্রতিভা সহায়কে কেনার কথাই ওঠে না, ওরা হল ক্রোড়পতি। বাকি রইল নেকীরাম শর্মা আর আবু মালেক। নেকীরাম সুদখোর, পয়সার লালচ ওর আছে, তবে আবু মালেকের পিঠের হাড্ডি শক্ত, ওকে বাঁকানো সোজা হবে না।'

রঘুনাথ সিং যেভাবে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেন তাতে কোথাও ফাঁক নেই। তাঁর পা-চাটা কুত্তাদের খুবই চিন্তিত দেখায়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটে। তারপর রঘুনাথ সিং ফের বলে ওঠেন, 'বড়ে মুসিবত—'

আচমকা ভকিল গিরধরলালজি রঘুনাথ সিংকে বলে ওঠেন, 'যদি হুকুম দেন তো একটা কথা বলি।'

'জরুর আপনি বলবেন। এক কথা কেন, শও কথা বলুন।'

'সব দিক পুরা ভেবে দেখলাম, সুখন চামার আউর প্রতিভা সহায়কে হটানো যাবে না। তবে আবু মালেক আর নেকীরাম শর্মাকে সরানোর একটা ফিকির হতে পারে।'

'কী ফিকির?'

'পয়সা রুপাইয়া হয়ত লাগবে। সাথ সাথ একটা কথাও ওদের জানাতে হবে।'

'কী কথা?'

'নেকীরামকে বলতে হবে, ব্রাহ্মণদের পুরা ইন্টারেস্ট আপনি দেখবেন। আবু মালেককে বলতে হবে, মুসলমান মাইনোরিটির স্বার্থ আপনি ছাড়া এখানে অন্য কেউ রক্ষা করতে পারবে না।'

রঘুনাথ সিং চোখ কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর তারিফের গলায় বলেন, 'আচ্ছা বাত। এদিকটা আমি ভেবে দেখিনি। মগর—'

'মগর কী?'

'বামহন আর মাইনোরিটির স্বার্থের কথা বলে ওদের না হয় হটানো গেল। তাতে ফায়দা ওঠানো যাবে কি?'

'যাবে রঘুনাথজি।'

'ক্যায়সে? ওরা চুনাওকা লড়াই থেকে সরে গেলে ওদের ভোটগুলো আমি যে পাব তার গিরান্টি (গ্যারান্টি) আছে?'

'তা নেই।'

'তব্?'

'যাতে নেকীরাম আর আবু মালেকের ভোটাররা হাতিমার্কায় মোহর মারে তার ব্যওস্থা করতে হবে।'

'ক্যায়সে?'

'নেকীরাম আর আবু মালেককে আপনার সাপোর্টে ক্যাম্পেনে নামাতে হবে। বামহন আর মুসলিম মাইনোরিটিদের ওরা বোঝাবে, আপনাকে ভোট দিলে তাদের ইন্টারেস্ট পুরা রক্ষা করা হবে। নেকীরাম আর আবু মালেক চুনাওতে জিতলে তাদের যতটা ভালাই হবে, আপনি জিতলে ডবল ভালাই হবে।'

রঘুনাথ সিং নড়েচড়ে বসেন। মুখচোখ দেখে মনে হয়, তিনি খুশি হয়েছেন। নেকীরামেরা তাঁর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে নামলে ব্রাহ্মণ আর মুসলমানদের ভোট যে প্রচুর পাবেন এবং ফলত চুনাওতে তাঁর জয় যে অবধারিত সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। রঘুনাথ বলেন, 'তা হলে নেকীরাম আর আবু মালেকের কাছে আমাদের প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠাতে হয়।'

বদ্রীবিশাল চৌবে বলেন, 'তা তো পাঠাতেই হবে।'

'কাকে পাঠানো যায়?'

বিশাল কমপাউন্ডের একধারে তেরপল খাটিয়ে যে অস্থায়ী নির্বাচনী ক্যাম্প বসানো হয়েছে সেখানে শিরদাঁড়া টান টান করে বসে এতক্ষণ রঘুনাথ সিংদের কথা শুনে যাচ্ছিল ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ। এবার সে বলে ওঠে, 'হুজৌর, হুকুম হো যায় তো হামনি চলা যায়েগা।'

ঘণ্টাখানেক গভীর পরামর্শের পর স্থির হয়, ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ এবং বদ্রীবিশাল গোপনে রাতের অন্ধকারে নেকীরামের কাছে যাবেন; গিরধরলালজি এবং শ্যামদুলাল যাবেন আবু মালেকের কাছে।

চব্বিশ

আজ দুপুরে কালোয়া খাওয়ার পর ধর্মারা আবার হাল-বয়েল নিয়ে জমিতে নেমে পড়েছে। ধান রোয়ার আগে পর্যন্ত এখন তাদের একই ধরনের কাজ । অনবরত লাঙলের শীষ চালিয়ে চালিয়ে পাথরের মতো শক্ত জমাট মাটি আবাদের যোগ্য করে তোলা।

আজ দক্ষিণ দিকের জমি চষছে ধর্মা। তার ঠিক পরের জমিটা থেকেই মরশুমী ওরাওঁ আর মুণ্ডা কিষানরা লাঙল ঠেলছে। সুবিশাল আকাশের নিচে পুবে-পশ্চিমে উত্তরে-দক্ষিণে যতদূরে দেখা যায়, রঘুনাথ সিংয়ের খেতিগুলোর নানা দিক থেকে নানা গলায় ক্রমাগত আওয়াজ শোনা যায়, 'উররা উররা — চল্ বেটা, চল্।' ভূমিদাস আর ওরাওঁ মুণ্ডারা আলটাকরা এবং জিভ দিয়ে শব্দ করে করে বয়েল চালাচ্ছে।

কোয়েলের মরা খাতের ওধারে অর্থাৎ উত্তর দিকটাতেও সেই একই ছবি। অন্য দিনের মতো ওখানেও মিশিরলালজির খেতিগুলোতে ভট ভট করে ট্রাক্টর চলছে।

ক'দিন আগে ছেঁড়া ছেঁড়া, টুকরো টুকরো পছিমা মেঘ দেখা দিয়েছিল। এখন আকাশে সে সবের চিহ্নমাত্র নেই। মাথার ওপর থেকে জেঠ মাহিনার গনগনে রোদ নেমে আসছে শুধু। আর মাঠের ওপর দিয়ে ঝলসানো লু-বাতাস উলটো পালটা ঘাড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে।

অর্থাৎ হাইওয়ের এধারের এবং ওধারের জমিগুলোতে সেই চৈত্র মাস থেকে বারিষ না পড়া পর্যন্ত রোজ এই একই ছবি দেখা যাচ্ছে। এই চলমান চিত্রের কোনো পরিবর্তন নেই।

রোজকার মতো আজও ধর্মার পিছু পিছু দৌড়ুচ্ছে কুশী আর সমানে মাটি থেকে কোদা বেছে যাচ্ছে। আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে যায় সে। খানিকটা উত্তেজিতভাবেই নিচু গলায় ডাকে, 'ধম্মা—এ ধম্মা—'

ধর্মা লাঙলের মাথাটা শক্ত মুঠে চেপে ধরে তেজী পাটনাই বয়েল দুটোকে থামিয়ে ঘাড় ফেরায়। শুধোয়, 'কা?'

'দ্যাখ দ্যাখ—হুই—'বলে তাদের পাশের জমিটার দিকে আঙুল বাড়ায় কুশী।

হাত দিয়ে কপালের ঘাম চেঁছে নিয়ে ধর্মা ডাইনে তাকায়। ফুর প্যান্ট (ফুল প্যান্ট), দামি জামা, দামি জুতো পরা দুটো লোক পাশের জমির আধবুড়ো কিষানটার সঙ্গে কথা বলছে। কিষানটাকে ধর্মা চেনে, চাহাঢ়ের হাটিয়ায় তাকে প্রথম দেখেছে। তারপর এখানে রোজ কত বার দেখছে তার হিসেব নেই। যে সব মরশুমী আদিবাসী কিষান এবার রঘুনাথ সিংয়ের খেতিতে কাজ করতে এসেছে তাদের ভেতর বেশির ভাগই মুণ্ডা। আধবুড়ো লোকটা মুণ্ডা কিষানদের মাতব্বর।

ফুর প্যান্ট পরা লোকদুটোর মুখও বেশ চেনা। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ে যায়, রামলছমনদের সঙ্গে চাহাঢ়ের হাটিয়ায় মরশুমী কিষান আনতে গিয়ে এই লোক দুটোকেও দেখেছিল। ওরা গুজ গুজ করে আদিবাসীদের সঙ্গে কী সব কথা বলছিল যেন। তারপর ধর্মারা যখন ওরাওঁ মুণ্ডাদের নিয়ে হাইওয়ে ধরে গারুদিয়া ফিরে আসছিল তখন লোকদুটো দৌড়ে এসে আদিবাসীরা কোথায় খেতির কাজে যাচ্ছে, কোথায় থাকবে, ইত্যাদি খবর জেনে নিয়েছিল। ওরা যে একদিন মরশুমী কিষানদের খোঁজে এখানে হানা দেবে তখনই তা টের পাওয়া গেছে।

মাতব্বর মুণ্ডাটার সঙ্গে লোকদুটো যে সব কথা বলেছে তার পুরোটা শোনা যাচ্ছে না। টুকরো টুকরো যা কানে আসছে তা থেকে বোঝা যায়, তারা আদিবাসীদের রেলের ডিব্বায় চড়িয়ে আগরতলা বা আসাম ইত্যাদি জায়গায় নিয়ে যেতে চায়। সেখানে গেলে সালভর কাম মিলবে, ভরপেট খাওয়া জুটবে, বহোত পাইসা রুপাইয়া পাওয়া যাবে।

এ সব ধর্মার অজানা নয়। চাহাঢ়ের হাটিয়ায় এরকম বলেই আড়কাঠি দুটো ওরাওঁ মুণ্ডাদের ফুসলাতে চেয়েছিল।

আধবুড়ো মাতব্বরটা বলে, 'সোচনা হোগা—'

আড়কাঠি দুটো একই সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ, সোচবিচার তো জরুর করতে হবে। মগর যা করার তুরন্ত করে ফেলবি। সমঝা?'

মাতব্বর মাথা নাড়ে।

আড়কাঠি দুটো ফের বলে, 'আগরতলা আসামে গেলে তোদের ভালাই হবে। ভুখে কষ্ট পাবি না, অভাব-দুখ থাকবে না —' আধা নাঙ্গা আধবুড়ো আদিবাসীটার চোখের সামনে তারা গাঢ় রঙে স্বপ্নের ছবি আঁকতে থাকে।

মাতব্বর কী বলতে যাচ্ছিল, আচমকা উত্তরের খেতিওলোর দিক থেকে গরম বাতাস চিরে চিরে অত্যন্ত পরিচিত একটা কর্কশ গলা ভেসে আসে, 'চলে বনবাস, রামসীয়া জানকীয়া—'

অর্থাৎ বগুলা ভকত রামলছমন খেতির কাজের তদারকিতে বেরিয়েছে। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দ্রুত একবার তাকে দেখে নেয় ধর্মা। তারপর বয়েল দুটোর লেজে মোচড় দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'উররা, হট্—হট্—' লাঙলের ধারাল শীষ আবার মাটি চিরতে চিরতে এগিয়ে যায়।

ওদিকে পাশের জমিতে আড়কাঠি দুটো আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না। রামলছমন যে খেতিমালিকের আপনা আদমী, চাহাঢ়ের হাটিয়াতেই সেটা তারা টের পেয়ে গিয়েছিল। মালিকের জমিতে এসে তাঁরই কিষানদের কেউ লোভ দেখিয়ে ফুসলে নিয়ে যেতে চাইছে, এ খবর জানাজানি হয়ে গেলে রক্ষা নেই। মালিকের লোকেরা তাদের ছাল ছাড়িয়ে লাশ মাটিতে পুঁতে দেবে।

লাঙল ঠেলতে ঠেলতে ধর্মা ভাবে, আসাম বা আগরতলা কোথায়, কতদূরে? উত্তরে তালুক মনপত্থল, পশ্চিমে বিজুরির রেল টিসন, পুবে হাঁথিয়াগঞ্জ, দক্ষিণে নওশেরাগঞ্জ — এই হল তার পরিচিত পৃথিবীর সীমা। এর বাইরে কোথায় কতদূরে আসাম আর কোথায়ই বা আগরতলা, তার জানা নেই। আনপড় ধর্মা তার সবটুকু কল্পনাশক্তি দিয়েও সেই দূরত্বটা মাপতে পারে না।

সন্ধের আগে আগে সূর্যটা দিগন্তের তলায় যখন নেমে যাচ্ছে সেই সময় চাষের খেত থেকে হাল-বয়েল তুলে জনমদাসেরা আর ওরাওঁ মুণ্ডা কিষানেরা হাইওয়েতে এসে ওঠে। তারপর লাল ধুলো ওড়াতে ওড়াতে কাতার দিয়ে রঘুনাথ সিংয়ের খামারবাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

চলতে চলতে আচমকা চোখে পড়ে, হাইওয়ের ধার ঘেঁষে নাবাল পড়তি জমিতে যেখানে

আদিবাসীরা কিছুদিন ধরে আস্তানা গেড়েছে, সেখানে দুপুরের আড়কাঠি দুটো ঘোরাঘুরি করছে। এই ওরাওঁ মুণ্ডা সাঁওতালেরা এসেছে পুব দিক থেকে। ওদিকে খরায় মাঠঘাট জ্বলে যাওয়ায় খাদ্যের খোঁজে এধারে চলে এসেছে ওরা।

আড়কাঠি দুটোর কী মতলব? মরশুমী কিষানদের মতো এই আদিবাসীদেরও ওরা আসাম বা আগরতলা নিয়ে যাওয়ার ধান্দা করছে নাকি?

আচমকা ধর্মার মনে হয়, ওই ফুর প্যান্ট-পরা লোকদুটোকে ধরে আসামে চলে গেলে কেমন হয়? ওরা তো আদিবাসীদের ভরসা দিয়েছেই — ভরপেট খানা মিলবে, রুপাইয়া-পাইসা মিলবে, সালভর কাম মিলবে। ওরাওঁ-মুণ্ডাদের যদি নিয়ে যায়, কুশী এবং তাদেরও কি নিয়ে যাবে না? নিশ্চয়ই নেবে। রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে জনমভর লাঙল ঠেলার হাত থেকে তা হলে রেহাই পাওয়া যাবে। অত দূরের আসাম বা আগরতলায় পহেলবান পাঠিয়ে নিশ্চয়ই বড়ে সরকার তাদের ধরে আনতে পারবেন না। গণেরি চাচার সঙ্গে এই নিয়ে একটু পরামর্শ করে দেখতে হবে।

উজ্জ্বল স্বাধীন জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে একসময় আদিবাসীদের এলাকাটা পেরিয়ে যায় ধর্মারা।

আরো কিছুক্ষণ পর ওরা যখন হাইওয়ে থেকে নেমে খামারবাড়ির দিকের কাচ্চীতে নামতে যাবে সেই মুহূর্তে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতটার ওধার থেকে আগুনতি মানুষের চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধর্মারা। ঘাড় ফেরাতেই নজরে পড়ে, দু-আড়াই শ লোক ধুলো উড়িয়ে তাদের দিকেই দৌড়ে আসছে।

কাছাকাছি আসতেই বোঝা যায়, ওরা দোসাদটোলার দুব্‌লা কমজোর বুড়াবুড়ির দল। অর্থাৎ রঘুনাথ সিং যাদের খেতির কাজ থেকে বাতিল করে দিয়েছেন সেই সব মানুষ। তাদের সঙ্গে রয়েছে উত্তর দিক থেকে আসা জনকতক ওরাওঁ মুণ্ডা। রোজ সকালে উঠে এরা খাদ্যের খোঁজে দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ে সেই জঙ্গলে চলে যায়।

লোকগুলো সমানে চেঁচাচ্ছিল। দোসাদটোলার মাতব্বর গণেরি তাদের সামনে এগিয়ে এসে চিৎকার করে বলে, 'কা হুয়া? এত্তে চিল্লাতা কায়?'

একসঙ্গে সবাই গলাব শির ছিঁড়ে চেঁচানোর কারণ জানাতে চায়। ফলে কিছুই বোঝা যায় না।

এবার ধমকধামক দিয়ে সবাইকে থামায় গণেরি। বলে, 'চুপ হো যা। বিলকুল চুপ। সিরিফ একজন বল—'

বুড়ো বজরঙ্গী বুক চাপড়ে বলে, 'মর গিয়া রে গণেরি, পুরা মর গিয়া—'

সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই ফের ডুকরে ওঠে, 'মর যায়গা, হামনিলোগন মর যায়েগা—'

হাত তুলে আবার তাদের থামিয়ে গণেরি বলে, 'একসাথ নায়, একসাথ নায়। সিরিফ এক আদমী—'

বজরঙ্গী ভয় উত্তেজনা দুশ্চিন্তা ইত্যাদি মিলিয়ে দম-আটকানো গলায় এবার যা বলে যায় তা এইরকম। রোজকার মতো আজও তারা কোয়েলের মরা খাতটার ওপর দিয়ে মহুয়ার গোটা আনতে জঙ্গলে গিয়েছিল। গিয়ে একেবারে তাজ্জব বনে যায়। কাল সন্ধেবেলায় ওরা যখন জঙ্গল থেকে ফেরে তখনও আগুনতি গাছে মহুয়ার ফল ছিল। আজ গিয়ে দেখে, তারা পৌঁছুবার আগেই সেই সব গাছের আধাআধি সাফ করে কারা ফল নিয়ে চলে গেছে।

মালিক রঘুনাথ সিং ভরসা দেওয়া সত্ত্বেও কিছুদিন ধরেই বজরঙ্গীদের সন্দেহ হচ্ছিল, আগের সন্ধেয় তারা যত ফল দেখে আসে, পরের দিন তার চাইতে কম কম লাগে। এ ক'দিন তাদের মনে হয়েছে, হয়ত চোখের ভুল। কিন্তু আজ বজরঙ্গীরা নিশ্চিত, ভোরবেলা তারা জঙ্গলে যাওয়ার আগে কিংবা সন্ধেবেলা ওখান থেকে ফেরার পর রাত্তিরে কেউ না কেউ লুকিয়ে মহুয়ার ফল পেড়ে নিয়ে যায়। এভাবে নিয়ে গেলে গরমের এই সময়টা সবাইকে ভুখা মরে যেতে হবে।

সব শুনে গণেরি গম্ভীর হয়ে যায়। আস্তে আস্তে বলে, 'বহোত চিন্তাকি বাত।' একটু ভেবে ফের বলে, 'তোমরা এখানে বসো। আমরা হাল-বয়েল জমা করে আসছি।'

কাঁচা সড়কের ধারে কাঁকুরে ডাঙায় বজরঙ্গীরা বসে পড়ে।

কিছুক্ষণ পর খামার থেকে দোসাদটোলার জনমদাসদের নিয়ে ফিরে আসে গণেরি। ওরাওঁ-মুণ্ডা কিষানরা অবশ্য আসে না, খামারের পেছন দিকে নিজেদের আস্তানায় চলে যায়।

গণেরিকে দেখে ভিড়ের ভেতর থেকে বুড়ো বজরঙ্গী, নাথুর বাপ চৌপটলাল, বুধেরির চাচা জগন — এমনি অনেকে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকে।

'অব কা করে গণেরি?'

'কা হোগা হামনিলোগনকা?'

'বড়ে সরকারকা পাশ যায়েগা — কা?'

দু হাত নেড়ে সবাইকে থামাতে থামাতে গণেরি বলে, 'বড়ে সরকারের কাছে এখন যাওয়া ঠিক হবে না।'

সবাই শুধোয়, 'কখন যাবি?'

গণেরি ঠাণ্ডা মাথার পাকা লোক। সে যা বলে তা এইরকম। আগে দেখতে হবে কারা মৌয়ার ফল চুরাচ্ছে। চোরদের ধরে সিধা বড়ে সরকারের মকানে নিয়ে যেতে হবে।

'তা হলে তো পেহ্‌রা বসাতে হয়।'

'তাই করতে হবে।'

একটু চুপচাপ। তারপর গণেরিই আবার শুরু করে, 'আমার কী মনে হয় জানো?'

সবাই জানতে চায়, 'কা?'

'সুবে কেউ মৌয়া চুরাতে আসে না।'

'কখন আসে?'

'তোরা জঙ্গল থেকে ফেরার পর রাতমে—'

'তব্‌ তো রাতভরি পেহ্‌রাদরি করতে হয়।'

গণেরি বলে, 'হাঁ। এখন ঘরে চল। আন্ধেরা নামলে তুরন্ত রাতকা খানা চুকিয়ে সবাই জঙ্গলে যাব। এক রাত পেহ্‌রা দিলেই মালুম হয়ে যাবে, কারা চুরাতে আসে —' ওরাওঁ-মুণ্ডাদের বলে, 'তোরাও যাবি।'

এই ব্যবস্থাই সবার মনে ধরে। গণেরির পিছু পিছু একদল চলে যায় দোসাদটোলায়, আর ওরাওঁ-মুণ্ডারা হাইওয়ের দিকে।

পঁচিশ

এখন বেশ রাত হয়ে গেছে। দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ের সেই জঙ্গলে দোসাদটোলার বাসিন্দারা আর কিছু ওরাওঁ-মুণ্ডা অগুনতি মহুয়া, পরাস, সিমার গাছ এবং নানা ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে আছে। কেউ লণ্ঠন বা অন্য কোনোরকম আলো টালো আনে নি। দূর থেকে রোশনি দেখলে চোরেরা সাবধান হয়ে যাবে, এদিকে আর ঘেঁষবে না। গণেরির ইচ্ছা, চোরেদের একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তার ধারণা, এটা নির্ঘাত সেই গাই-বকরি চরানিদের কাজ। রঘুনাথ সিংয়ের হুঁশিয়ারিতে ওরা দিনের বেলা আসে না, রাতে লুকিয়ে চুরিয়ে মহুয়া গাছ ফাঁকা করে দিয়ে যায়।

আজ কী তিথি, জনমদাস বা ভূমিহীন ওরাওঁ-মুণ্ডারা তার খবর রাখে না। জেঠ মাহিনার ঝকঝকে নীলকাশে ক্ষয়ে-যাওয়া চাঁদের একটা টুকরো দেখা যায়। মহুয়া পাতার ফাঁক দিয়ে চিকরি-কাটা আবছা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে নিচে। চারপাশের ঝোপেঝাড়ে লক্ষ কোটি জোনাকি উড়ছে, জ্বলছে এবং নিভছে। তাদের গায়ে সবুজ আলো ছুঁচের মতো অন্ধকারের গায়ে ফোঁড় তুলে চলেছে যেন। ঝাঁকে ঝাঁকে জঙ্গুলে পোকা আর মশা অনবরত গণেরিদের চামড়ায় হুল ফুটিয়ে বিষ ঢালতে থাকে।

নাথুর চাচা রামখিলাওন অন্ধকারে এলোপাথাড়ি চাপড় মেরে মশার ঝাঁক নিপাত করতে করতে বলে, 'কা রে গণেরিয়া, তোর মতলবটা কী?'

গণেরি বলে, 'কিসের মতলব?'

'মচ্ছরদের দিয়ে আমাদের খাওয়াবার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছিস?'

'আরেকটু সবুর কর।'

'সেই সাম থেকেই তো সবুর করে আছি। কাঁহাতক আর থাকা যায়? নিদে আঁখ ভেঙে আসছে।'

'পেটের ভুখ বড়, না আঁখের নিদ বড়?' গণেরি চাপা গলায় প্রায় ধমকে ওঠে।

রামখিলাওন এরপর আর গলা দিয়ে আওয়াজ বার করে না, একেবারে চুপ মেরে যায়।

তবে বুড়ো বজরঙ্গী শুধোয়, 'তোর কি মনে হয়, শয়তানের ছৌয়াগুলো জঙ্গলে আসবে?'

গণেরি গলার স্বরে জোর দিয়ে বলে, 'জরুর আসবে। আজ নায় আবেগা তো কাল আয়েগা। কাল নায় তো পরশু, পরশু নায় তো নরশু।'

এবার অনেকেই গলা মেলায়। সমস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'রোজ রোজ আন্ধেরাতে এসে আমরা এই জঙ্গলে পেহ্‌রাদারি করব?'

গণেরি বলে, 'হাঁ, সিরিফ পেটকে লিয়ে। ভুখা যদি মরতে না চাও, আসতেই হবে।'

সবাই আবার কী বলতে যাচ্ছিল, আচমকা চোখে পড়ল, দূরে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের ওপর দিয়ে ক'টা মশাল ফ্যাকাসে অন্ধকারে দুলতে দুলতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। বাদামি বালির দানাগুলো মশালোর রোশনিতে চিকচিক করতে থাকে।

গণেবি হঠাৎ ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তীব্র চাপা গলায় সে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেয়, 'বিলকুল চুপ রহো।'

শিরদাঁড়া খাড়া করে সবাই টান হয়ে বসে। উত্তেজনায় তাদের বুকে শ্বাস আটকে আসে যেন, চোখের পাতা পড়ে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে মশালগুলো জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ে। কাছাকাছি আসার জন্য দেখা যায়, মোট তিরিশ চল্লিশটা হট্টাকাট্টা চেহারার তাগড়া লোক, তাদের হাতে পাকানো বাঁশের লাঠি আর চটের বোরা। বোঝা যায়, ওরা মহুয়ার গোটা পেড়ে বোরা বোঝাই করে নিয়ে যাবে।

লোকগুলো অচেনা নয়। এ অঞ্চলের ছোট-বড় যত জমিমালিক আর পয়সাওলা মানুষ আছে, ওরা তাদের গাই-বকরি চরায়। এমনকি এদেব মধ্যে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের গাই-ভয়েস চরানিরাও রয়েছে।

লোকগুলো এক মুহূর্তও অপেক্ষা করে না। জ্বলন্ত মশালেব নিচের দিকগুলো মাটিতে পুঁতে যেই তারা মহুয়া গাছে চড়তে যাবে সেইসময় আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে গণেরি। তার দেখাদেখি কয়েক শ অচ্ছুৎ জনমদাস এবং আদিবাসী ওরাওঁ মুণ্ডা।

গণেরি গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে ওঠে, 'নায় নায়, কভী নায়।'

গাই-বকরি চরানিবা থমকে যায়। এই মাঝরাতে এত লোক জঙ্গলে বসে আছে, তারা ভাবতেও পারে নি।

গণেরি আগের মতোই আবার চেঁচায়, 'মৌয়া কিছুতেই নিতে দেব না।'

তার সঙ্গীরা তার সঙ্গে গলা মেলায়, 'কিছুতেই না। কভী নায়—'

গাই-বকরি চরানিরা প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও পরে সামলে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে হুমকে ওঠে, 'হট যা ভুচ্চরের দল।'

গণেরি বলে, 'নায় হটেগা। মৌয়া হামনিলোগনকা—'

আব সবাই চেঁচায়, 'হামনিলোগনকা।'

'তুহরকা বাপকা। হট যা কুত্তেকা ছৌয়ারা—' মারমুখি গাই-বকরি চরানিরা তেড়ে আসে।

গণেরিও রুখে দাঁড়ায়, 'তুলোগন হট যা। বড়ে সরকার এই মৌয়া আমাদের দিয়েছেন।'

'তোদের বাপেদের দিয়েছেন রেণ্ডিকা ছৌয়ারা। ভাগ কুত্তা, ভাগ—' বলেই একটা গাই-বকরি চরানি লোহার গুল-বসানো মোটা লাঠি সিধা গণেরির মাথায় বসিয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে তার কপাল দু ফাঁকা হয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে। চিৎকার করে গণেরি ঘুরে পড়ে

যায়।

জনমদাসেরা পুরুষানুক্রমে বেগার দিয়ে দিয়ে জনমভীতু হয়ে আছে। কয়েক পা পিছিয়ে ভয়ার্ত গলায় তারা ফিসফিসিয়ে বলতে থাকে, 'গণেরি চাচাকো খতম কর দিয়া রে।'

আদিবাসী ওরাওঁ-মুণ্ডারা কিন্তু পিছু হটে না, একই জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের মধ্যে কয়েকজন দৌড়ে গিয়ে গণেরিকে তুলে একধারে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং একজন নিজের ঠেটি কাপড়ের খুঁট ছিঁড়ে রক্তাক্ত কপালে ফেট্টি বাঁধতে থাকে।

গণেরির মাথা ফাটাবার মতো প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করে এক মুহূর্তও আর দাঁড়ায় না গাই-বকরি চরানিরা, ফের মহুয়াগাছে চড়ার জন্য এগিয়ে যায়।

গণেরি পুরোপুরি বেহুঁশ হয় নি। নির্জীব দুর্বল গলায় সে তাদের বলে, 'নায়, নায় — মৌয়া হামনিলোগনকা—'

তার কথার প্রতিধ্বনি করেই ভূমিহীন, স্বাধীন আদিবাসীরা গর্জে ওঠে, 'রুখ যা—'

বাপ-মা এবং চোদ্দপুরুষ তুলে গালাগাল দিতে দিতে গাই-বকরি চরানিরা এবার ওরাওঁ-মুণ্ডাদের দিকে দৌড়ে যায়। কিন্তু ডর বস্তুটা তাদের সিনায় নেই। ওদের বেশির ভাগেরই কাঁধে রয়েছে টাঙ্গি বা তীর ধনুক। সেগুলো বাগিয়ে তারা রুখে দাঁড়ায়।

জমি মালিকের লোকেদের লাঠি এলোপাথাড়ি পড়তে থাকে আদিবাসীদের ওপর। ওরাওঁ-মুণ্ডাদের টাঙ্গির ধারাল ফলাগুলো মশালের অলোয় ঝিলিক মারতে থাকে। বাঁশের ধনুক থেকে ঝাঁক ঝাঁক তীর ছুটে যায়। দু পক্ষের দশ বারটা লোক ধপাধপ মাটিতে পড়ে যায়। তাদের কারুর মাথা কি কপাল চৌচির, কারুর সিনা এফোঁড় ওফোঁড় করে তীরের ফলা বেরিয়ে গেছে। রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। চারদিকে গোঙানি, লাঠি এবং তীর ছোটার সাঁই সাঁই আওয়াজ। দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ে নিঝুম মহুয়ার জঙ্গল জষ্ঠি মাসের মধ্যরাতে পৃথিবীর আদিম রণভূমি হয়ে উঠতে থাকে।

ডরপোক জনমদাসেরা জঙ্গলের ভেতর অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে ভীত গলায় অনবরত চিৎকার করতে থাকে। কয়েক শ বছর ধরে পরের জমিতে লাঙল ঠেলতে ঠেলতে তাদের ওপর নির্বীর্য, ভীরু ক্রীতদাসদের আত্মা যেন ভর করে আছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য তারা অস্ত্র ধরতে শেখে নি। কোনোরকম যুদ্ধের পদ্ধতিই তারা জানে না।

কতক্ষণ মহুয়া জঙ্গলের এই মহাযুদ্ধ চলেছিল, কারুর হুঁশ নেই। আচমকা দেখা যায়, দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের ধু ধু বালির ওপর দিয়ে একটা তেজী ঘোড়া দৌড়ে আসছে। তাদের পেছনে অগুনতি মানুষ। লোকগুলোর হাতের উঁচু লাঠিতে হ্যাজাক বাঁধা, কয়েকজনের হাতে মশাল।

ঘোলাটে চাঁদের আলো আর হ্যাজাক ইত্যাদির রোশনিতে ঘোড়সওয়ারকে চেনা যায় — বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং। তাঁর এক হাতে লাগাম, আরেক হাতে বন্দুক। মাঝে মাঝে বন্দুকটা আকাশের দিকে তুলে তিনি ফাঁকা আওয়াজ করছেন। পেছনের লোকগুলোকেও চিনতে অসুবিধা হয় না, ওরা তাঁর পোষা পহেলবানের দল। আর আছে তাঁর চুনাওকা এজেন্ট ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ। লোকগুলো সমানে চিৎকার করে হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছে, 'রুখ যা। না রুখলে গোলি চলবে—'

রঘুনাথ সিং কিভাবে মহুয়া জঙ্গলের এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের খবর পেয়েছেন, তিনিই জানেন। হয়ত হাইওয়ে দিয়ে যেতে যেতে গারুদিয়া তালুকের কোনো লোক হই চই চেঁচামেচি শুনে তাঁকে জানিয়েছে।

কেশরওলা তেজী ঘোড়া, বন্দুক, পহেলবান এবং স্বয়ং বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংকে দেখে লড়াই থেমে যায়। দু পক্ষের যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে।

ঘোড়া থেকে বন্দুকসুদ্ধ লাফ দিয়ে নেমে পড়েন রঘুনাথ সিং। যারা প্রচণ্ড রকমের জখম এবং রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়ে ছিল তাদের দ্রুত এক পলক দেখে নেন তিনি। খুন-জখম-রক্তারক্তি এ সব তাঁর কাছে খুব একটা অচেনা বা অনভ্যস্ত ব্যাপার নয়। সব দেখা হয়ে গেলে মারাত্মক গম্ভীর স্বরে জানতে চান, 'কা হুয়া?'

কেউ গলা দিয়ে আওয়াজ বার করে না।

রঘুনাথ সিং গর্জে ওঠেন, 'কি রে, চুপ কেন? বাতা কী হয়েছে?'

দোসাদ ভূমিদাস থেকে ওরাওঁ-মুণ্ডা পর্যন্ত সবাই চমকে ওঠে। তাদের সামনে যে রঘুনাথ সিং তিনি ভোট-মাঙোয়া, স্নেহশীল, মহানুভব রঘুনাথ সিং নন। যে সরকার বড় মমতায় তাদের মতো অচ্ছুৎদের ঘিয়ের উৎকৃষ্ট লাড্ডু নিজের হাতে বিলিয়েছিলেন তাঁকে এঁর মধ্যে পাওয়া যাবে না। এই রঘুনাথ সিং দোসাদদের চিরকালের চেনা — বন্দুকবাজ, হিংস্র, ভয়ঙ্কর।

গণেরি একধারে পড়ে ছিল। বুক টেনে টেনে সে রঘুনাথ সিংয়ের কাছে চলে আসে। বলে, 'হুজৌরকা হুকুম হো যায় তো হামনি বাতায়গা—'

রঘুনাথ সিং বলেন, 'হাঁ, বল—'

গণেরি কাঁপা, কমজোরি গলায় শুরু করে, 'বড়ে সরকার, ইয়ে হামনিলোগনকা পেটকা সাওয়াল—'

বিরক্ত মুখে রঘুনাথ ধমকে ওঠেন, 'বকবাস না করে আসল কথাটা বলে ফেল।'

গণেরি এবার যা বলে তা এইরকম। বড়ে সরকার স্বয়ং হুকুম দিয়েছেন, এ বছর এই মারাত্মক খরার সময়টা যখন গাঁকে গাঁ জ্বলে যাচ্ছে, কোথাও একদানা খাদ্য নেই, তখন বড়ে সরকার গরিবের মা-বাপ, বহোত কিরপা করে তাদের মতো ভুখানাঙ্গাদের এই জঙ্গলের মহুয়ার গোটা নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। গাই-বকরি চরানিদের হুকুম দিয়েছেন, তারা যেন মহুয়ার জঙ্গল থেকে তফাতে থাকে। লেকেন তারা হুজৌরের হুকুমের পরোয়া না করে মাঝরাতে এসে মহুয়ার ফল নিয়ে যায়। তারপর কিভাবে আজ দোসাদ এবং আদিবাসীরা এখানে এসে পাহারা দিতে থাকে এবং কিভাবে গাই-বকরি চরানিদের সঙ্গে তাদের, বিশেষ করে ওরাওঁ-মুণ্ডাদের লড়াই বাধে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে যায় গণেরি।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন রঘুনাথ সিং। চোখের কোণ দিয়ে গাই-বকরি চরানিদের লক্ষ করেন। এদের ভেতর তাঁর নিজের লোকেরাও রয়েছে।

আসলে চতুর পরিকল্পনাটা ছিল তাঁরই। চুনাওর দিকে নজর রেখে, বিপুল মহানুভবতা দেখিয়ে রঘুনাথ বাতিল ভূমিদাস আর ওরাওঁ-মুণ্ডাদের মহুয়ার ফল নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। সবার সামনে গাই-বকরি চরানিদের হুঁশিয়ারও করে দেন, তারা যেন এ বছর মহুয়ার জঙ্গলে না যায়। কিন্তু তলায় তলায় তাদের জানান, রাত্তিরে দোসাদরা যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তারা গিয়ে যেন মহুয়া পেড়ে আনে। এই ধূর্ত চালে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। ভোটদাতা জনমদাসেরাও খুশি থাকবে, আর নিজের এবং অন্য জমি-মালিকের গাই-বকরির জন্য মহুয়ার ফলও পাওয়া যাবে। এখন যা কিছু করণীয় সবই সুকৌশলে করা প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ফন্দিটা শেষ পর্যন্ত খাটল না। হারামীর ছৌয়া দোসাদগুলো তাঁর চালটা হয়ত টের পায় নি, তবে মহুয়া যে কমে যাচ্ছে — সেটা ঠিকই ধরে ফেলেছে।

গণেরি ফের বলে, 'হুজৌর, এবার বলুন জানবর বাঁচবে, না মানুষ বাঁচবে!'

রঘুনাথ সিং পরম উদারতায় ঘোষণা করেন, 'মানুষ—' তাঁর হিসেব ঠিক আছে। চুনাওর আর বেশি দেরি নেই। ভালয় ভালয় নির্বাচনটা একবার হয়ে গেলে কী করতে হবে, তিনি ভাল করেই জানেন। বৃহৎ লাভের জন্য আপাতত সামান্য স্বার্থত্যাগ বুদ্ধিমান মাত্রেই করে থাকে। এই আপ্তবাক্য রঘুনাথ সিংয়ের অজানা নয়। গাই-বকরি চরানিদের দিকে ফিরে বলেন, 'কুত্তার বচ্চেরা, এধারে আর কখনও আসবি না। যদি শুনি এসেছিস, কোয়েলের বালির তলায় তোদের লাশ পুঁতে দেব।'

রঘুনাথ সিংয়ের গোপন নির্দেশেই গাই-বকরি চরানিরা রাতে জঙ্গলে আসে। সুতরাং অকারণে এই গালাগাল যে তাদের প্রাপ্য নয়, এ কথা গলা দিয়ে বার করার হিম্মত কারুর নেই। তারা সংয়ের পুতুলের মতো মাথা নেড়ে একই সঙ্গে বলে ওঠে, 'জি হুজৌর।'

রঘুনাথ সিং এবার তাঁর ব্যক্তিগত সামরিক বাহিনী অর্থাৎ পহেলবানদের হুকুম দেন, 'জখমী লোকগুলোকে নিয়ে ভকিলগঞ্জের হাসপাতালে চলে যা—'

'জি হুজৌর—' পহেলবানেরা দু পক্ষের আহত রক্তাক্ত মানুষগুলোকে কাঁধের ওপর তুলতে থাকে। এমন কি আধবুড়ো গণেরিও এই মওকায় একজনের কাঁধে চড়ার দুর্লভ সুযোগ পায়।

রঘুনাথ চারপাশের দোসাদ আর আদিবাসীদের দেখতে দেখতে বলেন, 'যারা জখম হয়েছে তাদের বাপ-মা কি জরুরা কাল এসে মুনশি আজীবচাঁদের কাছ থেকে দশগো করে রুপাইয়া নিয়ে যাবি।'

রঘুনাথ সিংয়ের এও এক উৎকৃষ্ট চাল। মাত্র দশটা করে টাকা মাথাপিছু খরচ করে লোকগুলোকে যদি খুশি রাখা যায়, মন্দ কী। চুনাওর জন্য এই চালটা যথেষ্ট কাজে দেবে।

ভুখানাঙ্গা লোকগুলো একেবারে কৃতার্থ হয়ে যায়। তারা অভিভূত গলায় বলে, 'হুজৌর মা-বাপ—'

রঘুনাথ সিং আর দাঁড়ান না. রেকাবে পা ঢুকিয়ে লাফ দিয়ে ফের ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়েন। গোড়ালি দিয়ে পেটে একটা গুঁতো মারতেই তেজী জানোয়ারটা দৌড়তে শুরু করে। ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ তার পেছন পেছন ছুটতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ার কোয়েলের বালির ওপর দিয়ে হাইওয়ের দিকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এদিকে জখমী লোকগুলো পহেলবানদের কাঁধে চড়ে সাত মাইল তফাতে ভকিলগঞ্জের দিকে রওনা হয়। বাকি ওরাওঁ-মুণ্ডা এবং দোসাদরা যে যার আস্তানায় ফিরতে থাকে।

এখন কত রাত, কে জানে। তবে ক্ষয়িত ঘোলাটে চাঁদ পছিমা আকাশের দিকে ঢলে পড়েছে।

ছাব্বিশ

গাই-বকরি চরানিদের সঙ্গে লড়াইয়ের ঘটনা এবং রঘুনাথ সিংয়ের অপার মহানুভবতা ক'টা দিন ভূমিদাস দোসাদদের যুগপৎ উত্তেজিত এবং আপ্লুত করে রাখে। এর মধ্যে ভকিলগঞ্জের হাসপাতাল থেকে গণেরি ফিরে এসেছে। প্রচুর রক্তপাত হওয়ায় শরীর ভয়ানক কাহিল হয়ে গেছে তার। রঘুনাথ সিং এতই বিবেচক এবং দয়ালু যে স্বয়ং হিমগিরিকে খবর পাঠিয়ে গণেরিকে কাজ থেকে রেহাই করিয়ে দিয়েছেন। যতদিন না সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়, তাকে খেতিতে যেতে হবে না।

এটুকু ছাড়া দোসাদটোলাব জীবন পুরনো নিয়মেই বয়ে চলেছে। তাদের দিন যেভাবেই কাটুক, চুনাওর তৌহার কিন্তু ক্রমাগত জমে উঠছে।

এর ভেতর পর পর দু'দিন সন্ধেবেলা গারুদিয়া বাজারে হ্যাজাক জ্বলিয়ে নেকীরাম শর্মা এবং আবু মালেকের চুনাওর মিটিং হয়ে গেল। তাদের কথা শোনার জন্য লোকজনও ভালই হয়েছিল।

রোজকার মতো খেতির কাজ চুকিয়ে হাল-বয়েল রঘুনাথ সিংয়ের খামার বাড়িতে জমা দিয়ে ধর্মা আর কুশী চলে গেছে কোয়েলের মরা খাতের ধারে সাবুই ঘাসের ঝোপে। সেখান থেকে ফাঁদের বগেড়ি নিয়ে গেছে ঠিকাদারদের কাছে। পাখি বেচে মাস্টারজিকে দিয়ে পয়সা গুনিয়ে গারুদিয়া বাজারের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে চুনাওর মিটিং নজরে পড়েছে তাদের। ভিড়ের মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে গেছে।

প্রথম দিন ছিল নেকীরাম শর্মার মিটিং। রোগা পাকানো চেহারার হাড্ডিসার নেকীরামের পিঠ ধনুকের মতো বাঁকানো, চোখ দুটো গিধের মতো ধারাল। নাকের ফুটোয় এবং কানের লতিতে পর্যাপ্ত লোম। কপালে তার ত্রিপুণ্ড্রক, পায়ে লম্বা চটি।

মঞ্চের ওপর নিজের খুবসুরত শালীকে তুলেছে নেকীরাম। এটা বাড়তি আকর্ষণ। গদরা জওয়ানী যেখানেই ঘুরুক ফিরুক, মাছির মতো ভনভনে ভিড় জমে যায়।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে চিলের মতো তীক্ষ্ণ গলায় সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিয়েছে, 'কলযুগ, ঘোর কলযুগ! বেদ-বরাম্ভনকে কেউ মানে না আজকাল। তাই দেশের এই হাল। কভী দেখা আয়সা খরা, অ্যায়সা বাড়! কিসের জন্য এসব হচ্ছে? ঘোর অনাচার, ভ্রষ্টাচার চল রহা হ্যায়। বরাম্ভন কারা? জাতওয়ারি সওয়ালে তারা শ্রেষ্ঠ কেন? ইয়ে ভগোয়ানকা লীলা। স্বয়ম্ ব্রহ্মা ঔর বিষুণ বরাম্ভনকে শ্রেষ্ঠ জাত বানিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছে। এ কলযুগে তাকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। রামায়ণ মহাভারত পড়ুন। রামচন্দজি থেকে যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন — সবাই বরাম্ভনকে পূজা চড়িয়েছেন। বরাম্ভনরাজই হল সেরা রাজ। তাদের হাতে দেশ গেলে আসল কল্যাণ হবে। শান্তি আসবে, খরা-বাড় বন্ধ হবে,

মড়ক বন্ধ হবে। ভগোয়ানের তাই ইচ্ছা। তাই বলছিলাম, এবার চুনাওতে আপনারা আমাকে ভোট দিন। ভৈস মার্কায় মোহর মারুন।'

অঞ্চলের প্রসিদ্ধ সুদখোর নেকীরাম শর্মার বক্তৃতা শেষ হতে না হতেই ভিড় ফুঁড়ে গারুদিয়া-কোয়েল ফাগুরাম বেরিয়ে এসেছিল। তার মাথায় বঙিন পাগড়ি, পরনে হলুদ ধুতি, লাল জামা, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। ইদানীং এই পোশাকেই সে চুনাওর মিটিংয়ে গান গেয়ে বেড়ায়।

ঝড়ের বেগে হারমোনিয়ামের রিডের ওপর আঙুল চালিয়ে ফাগুরাম মজা করে নেচে কুঁদে লাফিয়ে তার যাদুভরি গলায় গান ধরেছিল :

'শর্মাজিকে লম্বী চটি
আউর তিলক ত্রিপুণ্ড
তিন লোককে পাপ বাটোরাঁয় টোনে,
বাজায় ডমরু ডুং
ভোট লড়নেকো শর্মা আয়ে
কীর্তনীয়া হ্যায় গুম।
শর্মাজিকে শালী দেখো নাগন যেইসি চাল
তিতলি বনকে উড়তি-ফিরতি
ভোটনকে ব্যেপার।
ভেইয়া হো যাও হোঁশিয়ার,
ভেইয়া হো যাও হোঁশিযার।'

গান থামিয়ে একটা হাত আকাশে ছুঁড়ে ফাগুরাম চিৎকার করে ওঠে :

'ভৈসকা টাং তোড় দো,
নেকীরামকে ফোঁক দো।'

ফাগুরামের গান টান শেষ হতে না হতেই মিটিংয়ের ভিড়ে হাসির বান ডেকে গিয়েছিল। নেকীরামের চুনাও কর্মীরা খেপে গালাগাল করতে থাকে। কেউ কেউ ফাগুরামের দিকে তেড়ে যায়। হইচই, চিৎকার এবং হাসাহাসিতে চুনাওকা মিটিংয়ের বারটা বাজে। সব মিলিয়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড।

ধর্মা আর দাঁড়ায় নি, কুশীর একটা হাত ধরে ছুটতে ছুটতে কলালী পেরিয়ে আদিগন্ত মাঠে গিয়ে নেমেছে।

পরের দিন ছিল আবু মালেকের চুনাওর মিটিং। যথাবীতি মাস্টারজিকে দিয়ে পয়সা গুনিয়ে ভিড়ের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল ধর্মারা।

আবু মালেক বিশাল চেহারার মধ্যবয়সী আদমী। ইয়া লম্বা, ইয়া চওড়া। গায়ের রং টকটকে। থুতনিতে কাঁচাপাকা ছুঁচলো দাড়ি। পরনে ধবধবে চুস্ত আর চিকনের কাজ-করা পাঞ্জাবি। মাথায় রেশমের ফুলতোলা ফেজ।

বিরাট পাঞ্জা দিয়ে মাইকটা চেপে ধরে আবু মালেক গমগমে গলায় যা বক্তৃতা দিয়েছিল তা এইরকম :

মাইনোরিটি, মতলব সংখ্যালঘুর কথা কেউ ভাবে না। এ দেশে যো কুছ হোতা হ্যায়, সিরিফ সংখ্যাগুরুকে লিয়ে। লেকিন ইয়ে নায় চলেগা। সংখ্যালঘুদের কথা ভাবতেই হবে। তাদের অবহেলা করা চলবে না। তাদের জন্য সরকারি দপ্তরে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে জায়গা রিজার্ভ রাখতে হবে। চাকরি-বাকরির গেরান্টি দিতে হবে।

এখন সংখ্যালঘু কারা? শুধু মুসলমানেরা? নেহী নেহী। যে সব অচ্ছুৎ হিন্দু রয়েছে, খিরিস্তান রয়েছে — তাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের আদমীরা জানবরের মতো ব্যবহার করে। এদের সবার স্বার্থে আমাকে ভোট দেওয়া দরকার। ইয়াদ রাখবেন, আমার মার্কা হল হীরণ (হরিণ)। হীরণ মার্কামে মোহর মারবেন। সিরিফ সংখ্যালঘুকা স্বার্থে।

বক্তৃতা শেষ হতে না হতেই আগের দিনের মতো ভিড় ফুঁড়ে উঠে দাঁড়ায় ফাগুরাম এবং হারমোনিয়ামে ঝড় তুলে গাইতে থাকে। গানের কথাগুলোতে থাকে শানানো অস্ত্রের ধার। ঘুরে ফিরে নেচে লাফিয়ে গাইতে গাইতে ফাগুরাম বুঝিয়ে দেয়—আবু মালেক আসলে চোর, ফেরেববাজ, বাটপাড়।

গাওয়া শেষ করে যথারীতি চিৎকার করে বলে :

'গলি গলি শোর হ্যায়,
আবু মালেক চোর হ্যায়,
হীরণকা শির তোড় দো,
আবু মালেককো ফোঁক দো।'

এইভাবেই দিন কাটতে থাকে।

সাতাশ

আজ দুপুরে কালোয়া খাওয়ার পর সিসম গাছের রুগ্ণ ছায়ায় ধর্মারা জিরিয়ে নিচ্ছিল। হাইওয়ের দিক থেকে আচমকা টিরকে এসে হাজির। পাশে বসে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সে বলে, 'কা রে, চিতিয়ার বাচ্চার কী হল?'

ধর্মা মুখ কাঁচমাচু করে বলে, 'জঙ্গলে যেতে পারি নি ভেইয়া। দু-এক রোজের ভেতর জরুর যাব।'

'লেট নায় করনা।'

'নায় নায়।'

'আমরিকী সাব বিশ বাইশ রোজের মধ্যে রাঁচি ফিরে আসবে। চিতিয়ার বাচ্চা না পেলে মুসিবত হো যায়েগা। আন্ডারস্ট্যান্ড?'

ধর্মা বলে, 'ঘাবড়াও নেহী ভেইয়া। চিতিয়া বাচ্চা জরুর মিল যায়েগা।'

তাগাদা দেওয়ার জন্যই রাঁচী থেকে এতদূর ছুটে আসা। আরো কিছুক্ষণ চিতার বাচ্চা সম্পর্কে ঘ্যানর ঘ্যানর করে টিরকে হাইওয়ের দিকে ফিরে যায়। তারপরও অনেকটা সময় জিরোতে থাকে ধর্মারা।

সূর্য পশ্চিম আকাশের দিকে ঢলতে শুরু করলে জনমদাস এবং মরশুমী আদিবাসী কিষানরা যখন ফের জমিতে নামতে যাবে সেইসময় বড় সড়কের দিক থেকে চিৎকার ভেসে আসে।

'প্রতিভা সহায়কো—'

'বোট দো, বোট দো।'

'ঘোড়েকা পর—'

'মোহর মার, মোহর মার।'

চুনাওর তারিখ যত এগিয়ে আসছে ততই হাইওয়ে ধরে ভোটের গাড়িগুলোর যাতায়াত বেড়ে যাচ্ছে। কখনও জিপ হাঁকিয়ে রঘুনাথ সিং কি প্রতিভা সহায়ের চুনাও কর্মীরা যায়, কখনও টাঙ্গা হাঁকিয়ে নেকীরাম এবং আবু মালেকের লোকেরা যায়। তবে পায়দল যায় সুখন রবিদাসের দল। গাড়ি করে যাওয়ার মতো পয়সার জোর ওদের নেই।

শান্ত, কৌতূহলশূন্য চোখে প্রতিভা সহায়ের চুনাওর গাড়িগুলোর দিকে তাকাতেই হঠাৎ চমক লাগে ধর্মাদের। গাড়িগুলো পাক্কীর কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর একটা জিপ থেকে অবোধনারায়ণ পাণ্ডে নেমে নয়ানজুলির গাড্ডা পেরিয়ে এদিকেই আসছে। অবোধনারায়ণ প্রতিভা সহায়ের নির্বাচনী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এজেন্ট।

ধর্মাদের কাছ থেকে খানিক দূরে একটা কড়াইয়া গাছের তলায় বসে ছিল গণেরি। তার মাথায় এখনও তিন পরত পুরু ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে। বড়ে সরকারের হুকুমে এবং মহত্বে তাকে আপাতত লাঙল ঠেলতে হচ্ছে না, তবে রোজই অন্য সবার সঙ্গে জমিনে আসে, সারা দিন কড়াইয়া কি সিসম

গাছের তলায় বসে থাকে। সূর্য ডুবে গেলে সবার সঙ্গেই আবার দোসাদটোলায় ফিরে যায়।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে ভুরুর ওপর একটা হাতের ছাউনি দিয়ে রোদ ঠেকাতে ঠেকাতে হাইওয়ের দিকে গণেরি তাকায়। বলে, 'অবোধজি আসছে না?'

আশপাশ থেকে সবাই বলে ওঠে, 'হাঁ।'

একটু পর অবোধনারায়ণ কাছে এসে পড়ে। দোসাদটোলার মাতব্বর হিসেবে গণেরিকে বেছে নিয়ে বলে, 'কা রে, সেদিন তোদের যা বলেছিলাম, মনে আছে তো?'

গণেরির মনে পড়ে যায়। সেদিন রাত্তিরে অত্যন্ত লোভনীয় প্রস্তাব নিয়েই অবোধনারায়ণ দোসাদটোলায় হানা দিয়েছিল, তবু খুব একটা উৎসাহিত হয়ে ওঠে না গণেরি। নিরুৎসুক গলায় বলে, 'আছে।'

'কাল গারুদিয়া বাজারে প্রতিভাজির চুনাওর মিটিন। তোরা কাজকাম চুকিয়ে সিধা ঘরে চলে যাবি। আমি গাড়ি নিয়ে তোদের আনতে যাব। যাদের ভোট আছে তাদের তো জরুর, যাদের ভোট নেই তাদেরও মাথাপিছু তিন রুপাইয়া করে দেব। জবান দিয়ে এসেছিলাম, তা তো রাখতেই হবে।' বলে একটু থামে অবোধনারায়ণ। পরক্ষণে ফের শুরু করে, 'কাল গাড়িতে উঠবার আগে তোদের হাতে নগদনারায়ণ দিয়ে দেব।'

গাড়িতে চড়ে প্রতিভা সহায়ের মিটিংয়ে যাওয়া এবং তিনটে করে রুপাইয়া নেওয়ার বাবদে রঘুনাথ সিংয়ের কাছ থেকে আগাম হুকুম নিয়ে রেখেছে গণেরি। তবু এই ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি থেকেই যায়। গণেরি খুব একটা উৎসাহ দেখায় না, নিতান্ত সাদামাঠাভাবে বলে, 'ঠিক হ্যায় দেওতা—'

'কথাটা তোদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে এলাম। এখন যাই, কাল আবার দেখা হবে।'

পরের দিন ধর্মা এবং কুশীর সাবুই ঘাসের জঙ্গলে যাওয়া হয় না। নগদ তিনটে করে টাকা পাওয়া যাবে। সেটা তাদের মতো হাভাতে জনমদাসদের কাছে খুব সামান্য ঘটনা নয়।

সূর্য ডুবতে না ডুবতেই খামার বাড়িতে হাল-বয়েল জমা দিয়ে অন্য সবার সঙ্গে দোসাদটোলায় ফিরে আসে ধর্মারা এবং নিজের নিজের ঘরে শিরদাঁড়া খাড়া করে দূব সড়কের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। কখন অবোধনারায়ণ আসবে সে জন্য দমবন্ধ প্রতীক্ষা।

সন্ধে নামার কিছুক্ষণ পরেই সামনের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে পঁচিশ তিরিশটা দামি ঝকঝকে লাক্সারি বাস এসে কাতার দিয়ে দাঁড়ায়। একটা গাড়ি থেকে স্বয়ং অবোধনারায়ণ নেমে সোজা দোসাদটোলায় ঢোকে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাড়া লাগাতে থাকে, 'চল সব, চল। তোদের জন্যে গাড়ি নিয়ে এসেছি। তুরন্ত উঠে পড়।'

দোসাদ ভূমিদাসরা যে যার ঘর থেকে মুহূর্তে বেবিয়ে আসে এবং লাক্সারি বাসগুলোর দিকে দৌড়ে যায়। এমন গাড়িতে চড়া দূরের কথা, বাপের জন্মে তারা চোখেও দেখে নি। কাছাকাছি এসে সবাই থমকে যায়। হাজামজা চেহারা তাদের, গায়ের ফাটা খসখসে চামড়ার ওপর জমাট ময়লা, পরনের কাপড়গুলো কমসে কম দু মাস ধোয়া হয় নি। এরকম নোংরা শরীরে এবং নোংবা পোশাকে অত দামি গাড়িতে চড়তে তাদের সাহসে কুলোয় না।

পেছন থেকে অবোধনারায়ণ সস্নেহে তাড়া লাগায়, 'কী হল রে, উঠে পড়, উঠে পড়।'

প্রতিটি গাড়ির দরজার মুখে দুটো করে লোক দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে স্টিলের পাতলা পরাতে কাঁচা টাকার পাহাড় সাজানো রয়েছে। অনবরত তাড়া খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত দোসাদরা গাড়িতে উঠতে থাকে। উঠবার মুখে দ্বিতীয় লোকটা পরাত থেকে তিনটে করে টাকা গুনে প্রত্যেকের হাতে দেয়। বাচ্চাদের জন্য বরাদ্দ টাকাটা পায় তাদের মা-বাপেরা।

একটা লোকও বোধ হয় আর ঘরে নেই। গোটা দোসাদটোলা ফাঁকা করে কাচ্চাবাচ্চা থেকে শুরু করে বুড়ো-হাবড়া পর্যন্ত সবাই লাক্সারি বাসগুলোতে উঠে পড়েছে।

অন্য সবার মতো আরামদায়ক নরম গদিতে অতি সন্তর্পণে বসে ধর্মা ভাবতে থাকে, এমন

সৌভাগ্যের কথা তাদের চোদ্দ পুরুষের কেউ কখনও চিন্তাও করতে পারে নি। চুনাওর তৌহার কেন যে হর সাল দু-চার বার করে আসে না?

এদিকে অবোধনারায়ণ নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সব তদারক করছিল। এবার সামনের দিকে একেবারে প্রথম বাসটায় উঠে ড্রাইভারকে স্টার্ট দেওয়ার কথা বলতে যাবে, আচমকা দোসাদটোলার ভেতর থেকে কারা যেন চিৎকার করে ওঠে, 'রুখ যাও, রুখ যাও—'

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অবোধনারায়ণ দেখতে পায়, একশ বছরের বুড়ো অথর্ব গৈরুনাথকে কাঁধে করে তার ছেলে ধনপত আসছে। ওদের পেছনে গৈরুনাথের পুতহু এবং নাতি-নাতনিরা। যে গৈরুনাথের দিকে ছেলে, ছেলের বউ ফিরেও তাকায় না, যার পায়ে শোথ, দিনরাত সংসারের সবাই যার মৃত্যুকামনা করে, চুনাওর দৌলতে আজ সে চিতায় ওঠার আগেই একবার ছেলের কাঁধে চড়ে নেয়। নগদ তিনটে টাকা পাওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়!

যতই বয়স হোক, যতই পঙ্গু হয়ে যাক, চামড়া ফেটে কষ পড়ুক, গৈরুনাথ তো চুনাওর চোখে একটা মানুষ নয় — আস্ত একটা ভোট। নির্বাচনের যখন আর বারটা দিনও বাকি নেই তখন গৈরুনাথকে অবহেলা করা যায় না। অবোধনারায়ণ দ্রুত নেমে এসে সসম্ভ্রমে বলে, 'আও আও —' নগদ তিনটে করে টাকা গুনে দিয়ে একটা বাসে গৈরুনাথ, তার ছেলে, পুতহু এবং নাতি-নাতনিদের আরামে বসার ব্যবস্থা করে দেয়।

একসময় লাক্সারি বাসগুলো ধুলো উড়িয়ে চলতে শুরু করে।

গারুদিয়া বাজারের সেই বড় মাঠটায় এসে ধর্মাদের চোখের তারা একেবারে কপালে চড়ে যায়। জায়গাটাকে আজ আর চেনাই যায় না। যেদিকে যতদূর তাকানো যাক, শুধু রোশনি আর রোশনি। প্রতিভা সহায়ের চুনাও কর্মীরা বার চোদ্দটা বিরাট বিরাট জোরাল জেনারেটর এনে চারদিকে আলোর বান ডাকিয়ে দিয়েছে। জেনারেটরগুলো থেকে অনবরত ভট ভট আওয়াজ উঠছে।

মাঠের শেষ মাথায় বিশাল সাজানো মঞ্চ। মঞ্চের সামনে মানুষ আর মানুষ। ডাইনে রাস্তার ধার ঘেঁষে সারি সারি ট্রাক, লাক্সারি বাস এবং নতুন নতুন ঝকঝকে প্রাইভেট কার। বোঝা যায়, এই গাড়িগুলো করেই বিজুরি এবং গারুদিয়া তালুকের তিরিশ চল্লিশটা গাঁ সাফ করে সব মানুষ তুলে আনা হয়েছে।

ভিড়ের ভেতর চারদিকে অগুনতি বাঁশের খুঁটি পোঁতা। সেগুলোর গায়ে লাউড স্পিকারের লম্বা লম্বা চোঙা আটাকানো রয়েছে।

আগেও গারুদিয়া বাজারের এই মাঠে নেকীরাম শর্মা, আবু মালেক, এমন কি স্বয়ং রঘুনাথ সিংও চুনাওর মিটিং করে গেছেন। রঘুনাথ চারপাশের গাঁওলোতে অগুনতি গৈয়া এবং ভৈসা গাড়ি পাঠিয়ে প্রচুর লোকজন জুটিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু প্রতিভা সহায়ের এই মিটিংয়ের কাছে সে মিটিং একেবারেই কিছু না।

ধর্মা তার অল্প অভিজ্ঞতা এবং তার চাইতেও কম বুদ্ধি দিয়ে টের পায়, মাথা-পিছু নগদ তিনটে করে টাকা আর দামি হাওয়া গাড়িতে চড়ার লোভটা নাকের সামনে ঝুলিয়ে না দিলে প্রতিভা সহায়ের চুনাও কর্মীরা এত লোকজন জোটাতে পারত না। বাপ ভালা না, ভালা ভেইয়া, সবসে ভালা রুপাইয়া। এটাই হল জগতের সার সত্য। এর ওপরে আর কিছু নেই।

মঞ্চের ওপর সারি সারি চেয়ার এবং টেবিল পাতা। সেখানে প্রতিভা সহায়কে মাঝখানে রেখে বিজুরি এবং গারুদিয়া তালুকের বহু বড়ে বড়ে আদমী বসে আছেন। রঘুনাথ সিংয়ের চারপাশে ভকিল, ডাগদর, বড় স্কুলের মাস্টারজি জমা হয়েছেন। ওঁরা ছাড়াও এই দুই মৌজায় আরো অনেক ডাগদর, ভকিল, মাস্টারজি, পণ্ডিতজি আছেন। তাঁরা প্রতিভা সহায়ের কাছে জড়ো হয়েছেন। ভুখানাঙ্গা জনমদাসেরা জানে না, যেখানে রুপাইয়া-পাইসা আর রাজনৈতিক ক্ষমতার গন্ধ সেখানেই মানুষের ভিড়। চিটে গুড়ের গায়ে যেমন মাছির ঝাঁকের ভনভনানি।

প্রতিভা সহায়ের নির্বাচনী এজেন্ট অবোধনারায়ণ ধর্মাদের মিটিংয়ে পৌঁছে কোন ফাঁকে বিশাল শরীর টেনে দৌড়তে দৌড়তে মঞ্চে গিয়ে উঠেছিল, কেউ টের পায় নি। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সে-

ই মিটিংয়ের কাজ পরিচালনা করতে থাকে। লোকটার সাংগঠনিক ক্ষমতা বিপুল।

অত্যন্ত সুচারুভাবে বিজুরির বড় ভকিলকে আজকের মিটিংয়ে সভাপতি করা হয়। একটা বাচ্চা মেয়ে এসে তাঁর এবং মঞ্চের অন্যান্য মান্যগণ্য মানুষগুলোর গলায় টাটকা গোলাপের মালা পরায়। পর্যাপ্ত হাততালির মধ্যে এই আনুষ্ঠানিক পর্বটি সমাধা হয়। তারপর অবোধনারায়ণের ইশারায় এবং অন্য ভারি টৌনের ঢংয়ে প্রতিভা সহায়ের চুনাও কর্মীরা আকাশে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করতে থাকে :

'পরতিভা সহায়—'

'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।'

'পরতিভা সহায়কো—'

'বোট দো, বোট দো।'

'ঘোড়েকা পর—'

'মোহর মার, মোহর মার।'

প্রতিভা সহায়ের নির্বাচনী প্রতীক হল ঘোড়া।

স্লোগানে স্লোগানে চুনাওর মিটিং সরগরম হয়ে ওঠে। তরপর একে একে প্রতিভা সহায়ের সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষক, দুই তালুকের মানী লোকেরা গলার শির ছিঁড়ে এবং মাইক ফাটিয়ে বক্তৃতা করে যায়। তাঁদের সবার বক্তব্যই মোটামুটি এক। ভেইয়া এবং বহিনরা, প্রতিভাজিকে আপনারা সবাই ভোট দিন। তিনি জিতলে এখানে রামরাজ এসে যাবে। দুঃখ কষ্ট অভাব গরিবি — কিছুই থাকবে না। নহরে নহরে দুধের বান ডেকে যাবে। সবার পাকা মকান হবে। কেউ ভুখা থাকবে না, নাঙ্গা থাকবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একজন তো বলেই ফেললেন, 'ভেইয়া আউর বহিনরা, একটা ব্যাপার আপনারা নজর করে দেখেছেন? এই কেন্দ্র থেকে এবার যাঁরা চুনাওর লড়াইতে নেমেছেন তাঁদের কারুর সিম্বল, মতলব প্রতীক চিহ্ন হল উট, কারুর হাতি, কারুর হীরণ, কারুর ভৈস। হাতি বহোত দামি জানবর। কথায় বলে হাতি মরলেও লাখো রুপাইয়া। মগর এত বড় জানবর কোনো উপকারে লাগে? একেবারেই না। উপকার দূরের কথা, সিরিফ বসে বসে খাওয়া ছাড়া এর দুসরা কাম নেই। হাতিকে আপনারা নাকচ করে দেবেন। উটও আমাদের এখানে অচল। হীরণ বহোত উমদা জানবর। মগর সে-ও কোনো কাজে লাগে না। ভৈস কামে লাগে বটে, মগর বড়া স্লো জানবর। তার চাল বহোত ধীরা। ইস যুগ হ্যায় প্রগতিকা যুগ। যা কিছু ধীর, স্লো — সে সব বাতিল হয়ে যাবে। আপনারা জানেন, লাখো লাখো বরষ আগে দুনিয়ায় হাতির চাইতেও বড়ে বড়ে জানবর ছিল। তারা ডাইনোসর। সব খতম হয়ে গেছে। এখন চাই স্পিড, মতলব গতি। যো কুছ করনা তুরন্ত করনা। ইস লিয়ে প্রতিভাজি ঘোড়েকা প্রতীক নিয়েছেন। একবার ওঁকে জিতিয়ে দিন, দেখবেন প্রতিভাজি গারুদিয়া বিজুরির সড়ক সোনাচাঁদি দিয়ে বাঁধিয়ে দেবেন।'

বিজুরি এবং গারুদিয়া তালুকের তিরিশ বত্রিশটা গাঁয়ের আধ-ন্যাংটো ক্ষুধার্ত আনপড় লোকগুলো হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। নানা বক্তার জ্বালাময়ী ভাষণের শতকরা দশভাগ হয়ত তাদের মাথায় ঢোকে, বাকি নব্বই ভাগ দুর্বোধ্যই থেকে যায়। তবে এটুকু তারা বোঝে, সব বক্তাই প্রতিভা সহায়ের নির্বাচনী প্রতীক ঘোড়া চিহ্নে মোহর মারতে বলছেন।

সবার বক্তৃতা হয়ে যাওয়ার পর প্রতিভা সহায় স্বয়ং সামনে উঠে দাঁড়ান। তিনি এভাবে শুরু করেন—'আমাদের বংশের কেউ কোনোদিন রাজনীতি করে নি, চুনাওতে নামে নি। তবে আচানক আমি কেন এতে এলাম? তার উত্তরে আমি বলব, বিজুরি আমার সসুরাল। আপনারা জানেন আওরতের কাছে সসুরালই হল আপনা ঘর।'

'আমরা থাকি বড় শহরে। গাঁও-ঘরে একটা আসা হয় না। দো সাল চার সাল বাদে একবার হয়ত আসি। নজরে পড়ে গাঁওয়ের হাল আরো বুরা হয়ে গেছে। গরিব আরো গরিব হয়ে গেছে, নাঙ্গা আরো নাঙ্গা। এবার গাঁওয়ে এসে সব দেখে চোখে আঁশু এসে গেল। ভাবলাম, কিছু একটা করা দরকার।

গাঁও না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না। গাঁওবালাদের যেমন করে হোক রক্ষা করতেই হবে। বিজুরি আমার সসুরাল, তাই এই জায়গার ওপর আমার কর্তব্য আছে।'

'ভেইয়া আউর বহিনরা, আপনারা জানেন আমার নিজের কোনো অভাব নেই। আমার স্বামী শ্বশুর ফ্যাক্টরি আর কয়লাখাদান থেকে যা টাকা পান তাতে আমার পরও বিশ-পঁচিশ পুরুষ পায়ের ওপর পা তুলে আরামে কাটিয়ে যেতে পারবে। মগর আমি একটা মানুষ, আপনাদের মতোই আমার গায়ে লাল খুন রয়েছে। এখানে এসে দেখলাম হাজারো লাখো আদমী করজের ফাঁদে আটকে আছে। কামিয়া প্রথা, বেটবেগারি, জাতপাতের সাওয়াল নিয়ে অত্যাচার চলছে। মগর এ আমি চলতে দেব না। গরিবি, কামিয়াগিরি, ছুঁয়াছুত ভারতকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এ চলতে দেওয়া যায় না। মগর হাতে যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকে এ সব জঘন্য নিয়ম ঠেকাব কী করে? তাই এবার চুনাওতে নেমেছি। এখন সবই আপনাদের হাতে, আপনাদের কিরপা। আপনারা যদি আমাকে ভোট দিয়ে জেতান, প্রাণ দিয়ে আপনাদের সেবা করতে চেষ্টা করব। মনে রাখবেন আমার প্রতীক চিহ্ন ঘোড়া।'

প্রতিভা সহায়ের কথা শেষ হওয়ার পর তাঁর চুনাও কর্মীরা যখন স্লোগান দিয়ে মিটিংটাকে শেষ বারের মতো গরম করতে যাবে সেই সময় একটা কাণ্ড ঘটে যায়। ভিড়ের ভেতর কোথায় হারমোনিয়াম নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে ছিল ফাগুরাম নৌটঙ্কীবালা, কেউ টের পায় নি। আচমকা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝড়ের বেগে হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে নেচে কুঁদে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে তার মজাদার গান শুরু করে দেয় :

'কায়াথকুল শিরোমণি
পরতিভা সহায়।
ভোট মাঙনে আয়ী হ্যায়
হাম দুখিয়ানকে পার।
হাম দুখিয়ানকে পার।
পরতিভা দেবী বড়ী সয়ানী
ঠম্মক ঠম্মক চাল,
ভোট মাঙতী রোতী ফিরতী
ও য্যায়সা ঘড়িয়াল।
য্যায়সা ঘড়িয়াল।'

নেকীরাম শর্মা বা আবু মালেকের চুনাওর মিটিংয়ে যেমন হয়েছে, এখানেও হুবহু তাই ঘটে। ভিড়ের লোকজন মজাদার গান শুনে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়তে থাকে।

আর সমঝদারদের প্রতিক্রিয়া দেখে উৎসাহ দশগুণ বেড়ে যায় গারুদিয়া কোয়েল ফাগুরামের। সেই সঙ্গে নাচন কোঁদন এবং লাফঝাঁপও। গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে সে নতুন উদ্যমে গাইতে থাকে :

'কায়াথকুল শিরোমণি
পরতিভা দেবী সহায়
ভোট মাঙনে আয়ী হ্যায়—'

গানটা আর শেষ করতে পারে না ফাগুরাম। আচমকা মাটি ফুঁড়ে হট্টাকাট্টা ডাকু-য্যায়সা চেহারা ক'টা লোক উঠে আসে। তাদের হাতে লোহার গুল-বসানো লাঠি।

'হারামজাদকা ছৌয়া, কুত্তেকা বাচ্চা—' অকথ্য খিস্তিখেউড় করতে করতে লোকগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে ফাগুরামের ওপর। এলোপাথাড়ি লাঠি পড়তে থাকে তার মাথায় পিঠে ঘাড়ে কাঁধে। একটা চোট খেয়ে নতুন হারমোনিয়ামটা ভেঙে ছেতরে যায়। আর দু-হাত দিয়ে মুখ মাথা আড়াল করতে করতে চিৎকার করতে থাকে ফাগুরাম, 'বঁচাও, বঁচাও—' ঘা খেতে খেতে তার তিন চারটে দাঁত উপড়ে যায়। মাথা মুখ কপাল, সব জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে। একসময় বুকফাটানো চিৎকার করতে করতেই রক্তাক্ত বিধ্বস্ত ফাগুরাম মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

'শালে গারুদিয়া-কোয়েল বনেছে! গলার নলিয়া একেবারে ফেঁড়ে ফেলব—' লোকগুলোর লাঠি সামনে পড়তেই থাকে।

প্রথমটা মিটিংয়ের লোকজন, বিশেষ করে দোসাদটোলার ভূমিদাসেরা ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গিয়েছিল। কী করবে, ভেবে উঠতে পারছিল না কেউ। হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ে যায় গণেরি। মা-পাখি যেভাবে ডানা মেলে ছানা আগলায়, অবিকল সেইভাবে দু-হাত ছড়িয়ে লাঠির ঘা থেকে ফাগুরামকে বাঁচাতে বাঁচাতে চেঁচাতে থাকে, 'মার মাত্, মার মাত্—'

এদিকে চারধারে গোটা মাঠ জুড়ে চেঁচামেচি হইচই শুরু হয়ে গেছে। লোকজন ভয় পেয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। মঞ্চ থেকে মাইকে কারা যেন অনবরত কী বলতে থাকে। সে সব কিছুই বোঝা যায় না।

হট্টাকাট্টা লোকগুলো কী ভেবে আর লাঠি চালায় না। হয়ত ভাবে, আপাতত এই পর্যন্তই থাক। একটা বেয়াড়া গান গাওয়ার পরিণাম হিসেবে মারটা মোটামুটি মন্দ হয় নি। তারা ফাগুরামকে ফেলে রেখে চোখের পলকে ভিড়ের ভেতর উধাও হয়ে যায়।

প্রথমে কলিজা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছিল ফাগুরাম। ক্রমশ তার স্বর নির্জীব হয়ে আসে। গলার ভেতর থেকে থেমে থেমে গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরুতে থাকে। ফাগুরাম পুরোপুরি বেহুঁশ হয়ে গেছে।

একটু দূরে দোসাদটোলার বাসিন্দারা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দিকে ফিরে গণেরি ধমকে ওঠে, 'বুরবাকরা, তুরন্ত এখানে আয়। ফাগ্‌গুকে নিয়ে আভ্‌ভী অসপাতাল যেতে হবে!'

প্রথমেই দৌড়ে আসে ধর্মা। তার পেছনে পেছনে মাধোলাল শিউমল নাটুয়া ধানো, এমনি আরো অনেকে।

মুহূর্তে ফাগুরামের রক্তাক্ত বেহুঁশ দেহ ধর্মার কাঁধে ওঠে। ধর্মা নাটুয়া শিউমল ধানো এই চারটে জোয়ান ছোকরাকে থাকতে বলে বাকি সবাইকে দোসাদটোলায় ফেরত পাঠিয়ে দেয় গণেরি। এত লোকজন নিয়ে হাসপাতাল যাওয়াটা কাজের কথা নয়, অকারণ ঝঞ্ঝাট শুধু।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, মিটিংয়ের জায়গাটা পেছনে ফেলে গারুদিয়া বাজারের উত্তর দিকের সেই কলালীটার পাশ দিয়ে গণেরিরা আদিগন্ত ফাঁকা মাঠে গিয়ে নামে। মাঠের ওপর দিয়ে কোনাকুনি রশিভর হাঁটলে হাইওয়ে।

এখান থেকে সব চাইতে কাছের শহর ভকিলগঞ্জ। তাও কমসে কম মাইল ছয়েক তফাতে। এতটা রাস্তা কোনো একজনের পক্ষে একটা বেহুঁশ লোককে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাই চারটে ছেলেকে সঙ্গে নিয়েছে গণেরি। পালা করে তার ফাগুরামকে বইতে পারবে।

অন্ধকারে নিঃশব্দে মাঠ ভাঙছিল ওরা। কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ ধর্মা ডাকে, 'গণেরিচাচা—'

গণেরি সাড়া দেয়, 'কা?'

'ফাগ্‌গুচাচার এ কী হল?'

অন্ধকারের ভেতর থেকে গণেরির অলৌকিক, বিষণ্ণ গলা উঠে আসে যেন, 'এ আমি জানতাম, আমি জানতাম।'

ধর্মার মনে পড়ে, এমন একটা ভয়াবহ পরিণামের কথা গণেরি বহুবার দোসাদটোলার সবাইকে জানিয়েছে।

হাইওয়েতে ওঠার পর আচমকা কী মনে পড়তে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে গণেরি। বলে, 'ডাইনা নেহী, বাঁয়া চল—'

ধর্মারা অবাক। পাক্কী ধরে ডাইনে না গেলে ভকিলগঞ্জে যাওয়া যাবে না।

ধর্মাদের মনোভাব মুহূর্তে বুঝে ফেলে গণেরি। বলে, 'অসপাতাল যাওযার আগে একবার বড়ে সরকারেব কোঠিতে যাব। হুজৌরকে ফাগ্‌গুর খববটা দিতে হবে। তার কী হাল হয়েছে, সেটা দেখানো দরকার।'

কেউ আর কোনো প্রশ্ন করে না। সবাই হাইওয়ে ধরে বাঁ দিকে হাঁটতে থাকে।

আটাশ

এখন বেশ রাত হয়েছে।

রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলিতে সেই পাথর-বসানো বিশাল বারান্দায় নির্বাচন সংক্রান্ত কথাবার্তা চলছে। এটা কোনো প্রকাশ্য অধিবেশন নয়। যেদিন কোথাও চুনাওর মিটিং থাকে না সেদিন সন্ধের পর একান্ত এবং বিশ্বস্ত ক'জন বন্ধুবান্ধব, পরামর্শদাতা এবং চামচাকে নিয়ে রঘুনাথ নিগূঢ় ও গোপন আলোচনায় বসেন। চামচা শব্দটা হিন্দি সিনেমার দৌলতে ইদানীং এ অঞ্চলে বেশ চালু হয়ে গেছে। এটাকে ইংরেজিতে ইনার সার্কেলের মিটিং বলা যেতে পারে। এখানে বসেই চুনাও নামক লড়াইয়ের নানা সূক্ষ্ম এবং চতুর চাল ঠিক করা হয়।

আজও ইনার মার্কেলের সেই মিটিং চলছে। রঘুনাথ সিংকে মাঝখানে বসিয়ে অন্য সবাই তাঁকে ঘিরে রয়েছে। রঘুনাথের সেই চিরস্থায়ী পা-চাটা কুত্তার দল অর্থাৎ মাস্টারজি, ডাগদর সাহেব, ভকিলজি— এঁরা তো রয়েছেনই। সেই সঙ্গে নতুন দু'টি মুখও দেখো যাচ্ছে—নেকীরাম শর্মা এবং আবু মালেক। রাতের অন্ধকারে বিশ্বাসী এজেন্টদের পাঠিয়ে নেকীরাম আর মালেক সাহেবের সঙ্গে সমঝোতা করে ফেলেছেন রঘুনাথ। তবে খালি হাতে নয়। এ বাবদে তাঁকে বেশ কিছু খরচও করতে হয়েছে। ব্যাপারটা এখনও জানাজানি হয় নি, তবে ঠিক হয়েছে নেকীরাম আর আবু মালেক এবারের চুনাও থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেবে এবং রঘুনাথ সিংয়ের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারেও নামবে। তারা বোঝাবে, উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ একজনই রক্ষা করতে পারেন। তিনি আর কেউ নন—রঘুনাথ সিং। আশা করা যাচ্ছে, এর ফলাফল ভালই হবে। নেকীরাম আর আবু মালেকের ভোটের যে হিস্যা পাওয়ার কথা, সেগুলো তিনিই পেয়ে যাবেন। গারুদিয়া-বিজুরির জনগণ কাল পরশুর মধ্যেই চুনাওর মিটিংয়ে সুসজ্জিত মঞ্চে রঘুনাথ সিংয়ের সঙ্গে আবু মালেক এবং নেকীরাম শর্মাকে পাশাপাশি দেখতে পাবে।

রঘুনাথ সিং বললেন, 'চুনাওর লড়াইটা শেষ পর্যন্ত তা হলে তিন জনের মধ্যেই হচ্ছে — প্রতিভা সহায়, সুখন চামার আর আমার।'

সবাই ঘাড় নাড়ে। ডাক্তার শ্যামদুলাল ইংরেজি করে বলেন, 'ট্র্যাঙ্গুলার ফাইট।'

'আপনাদের কি মনে হয়, এই লড়াইতে বেরিয়ে যেতে পারব?'

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে, 'নিশ্চয়ই।'

নেকীরাম শর্মা বলে, 'আপনি যে ভোটটা পেতেন তার সঙ্গে আমার আর মালেক সাহেবের ভোটটা জুড়ে নিন। জরুর জিতবেন।'

তবু পুরোপুরি সংশয় কাটে না রঘুনাথ সিংয়ের। তিনি বলেন, 'প্রতিভা সহায় দশ হাতে পয়সা ছড়াচ্ছে। আমাব মনে হয় ও আওরত জরুর ভাল ভোট টানবে। সুখন রবিদাসের কথা যদি বলেন—'

সবাই বিপুল আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে রঘুনাথের দিকে তাকায়। তিনি বলতে থাকেন, 'ওই চামারের ছৌয়াটাও ভোট পাবে। আমার ক'জন দোসাদ কিষান বাদ দিলে গারুদিয়া-বিজুরির সব অচ্ছুতিয়ারা ওকেই ভোট দেবে।'

সবাই সমস্বরে হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'কভী নায়, কভী নায়—'

গলার স্বরে যথেষ্ট জোর দিয়ে রঘুনাথ বলেন, 'নিশ্চয়ই দেবে।'

সবাই থতিয়ে যায়। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'কী করে বুঝলেন?'

এ ক'দিন চুনাওর ব্যাপারে গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকের গাঁয়ে-গঞ্জে হাটে-বাজারে ঘুরে ঘুরে ভোট মাঙতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার আদ্যোপান্ত নিখুঁত বিবরণ দিয়ে বঘুনাথ বলেন, 'অচ্ছুতিয়াদের কাছে যখনই ভোট দেওয়ার কথা বলেছি, কুত্তাগুলো চুপ করে গেছে। বিলকুল যেন গুংগা। যারা ভোট দেবে তাদের মুহ্ দেখলে বোঝা যায়।'

রঘুনাথ সিংয়ের পর্যবেক্ষণ শক্তির সবাই উচ্ছ্বসিত তারিফ করে কিন্তু তাতে সমস্যার সুরাহা হয় না। এ অঞ্চলের হরিজন ভোটের ভাল একটা অংশ কিভাবে পাওয়া যাবে, সেই প্রশ্নটাই সবার মাথায়

ঘুরপাক থেকে থাকে। ইনার সার্কেলের পরামর্শ সভাটা হঠাৎ নিঝুম হয়ে যায়। এখন একটা পাতা খসে পড়লেও আওয়াজ পাওয়া যাবে।

একসময় রঘুনাথ হঠাৎ বলে ওঠেন, 'আমার মাথায় একটা শতরঞ্জের চাল এসেছে। দেখুন আপনাদের কিরকম লাগে?'

'কী চাল?' চোখে মুখে অনন্ত কৌতূহল নিয়ে সবাই রঘুনাথের দিকে তাকায়।

চাপা নিচু গলায় ফিস ফিস করে রঘুনাথ সিং তাঁর দাবার চাল সম্পর্কে বিশদভাবে বলে যান। রাতের আন্ধেরাতে পাঁচ সাতটা হরিজন গাঁ মিট্টি তেল দিয়ে প্রথমে জ্বালিয়ে দিতে হবে। তারপর অচ্ছুৎদের বন্ধু সেজে ওদের নয়া ঘর বানাবার জন্য ঢালাও টিন খড় বাঁশ এবং নগদ টাকা বিলোতে হবে। এতে স্বাভাবিক নিয়মেই গঞ্জু-ধোবি-ধাঙড়েরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে। তার ফল পাওয়া যাবে ভোটের বাক্সে।

পরিকল্পনার চমৎকারিত্বে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। চুনাও-শতরঞ্জের খেলায় এর চাইতে ভাল এবং দামি চাল নাকি কেউ আর কখনও ভাবতে পারে নি।

রঘুনাথ সিং জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা তা হলে এটা মঞ্জুর করছেন?'

'অবশ্যই। তবে কাজটা বহোত হুঁশিয়ারিসে করতে হবে।'

অচ্ছুৎদের গাঁয়ে আগুন লাগাবার ব্যবস্থাটা পাকা হয়ে যায়। কিভাবে কোন কোন গাঁ জ্বালানো হবে তাই নিয়ে সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম আলোচনার মধ্যে ঠিকাদার অযোধ্যাপ্রসাদ এসে হাজির। অযোধ্যাকে দেখে হঠাৎ রঘুনাথের মনে পড়ে যায়, বিকেলে তাকে গারুদিয়া বাজারে প্রতিভা সহায়ের চুনাওর মিটিংয়ের খবর আনতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি শুধোন, 'কিরকম দেখলে?'

অযোধ্যাপ্রসাদ মেঝেতে বসতে বসতে বলে, 'বহোত ভারি মিটিন রঘুনাথজি।'

'কেমন লোকজন হয়েছিল?'

'কমসে কম লাখো আদমী হবে। তিন সাল এখানে চুনাও দেখছি। মগর এত বড় মিটিন আর নজর পড়ে নি।'

রঘুনাথ সিংয়ের মুখ ভয়ানক গম্ভীর হয়ে যায়। সেটা লক্ষ করে বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে অযোধ্যাপ্রসাদের। রুদ্ধশ্বাসে দ্রুত এবার সে বলে ওঠে, 'হবে নাই বা কেন? লাখো লাখো রুপাইয়া ওড়াচ্ছে যে আওরতটা। পাইসার লালচে ভুখা হাভাতের দল দৌড়ে গেছে। মাংসের একটা টুকরা ফেঁকলে বিশটা কুত্তা দৌড়ে আসে না? মিটিনে গেছে বলেই কি ওই আরওরতটাকে ওরা ভোট দেবে নাকি? কভী নেহী।'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় রঘুনাথ সিংয়ের। মনে পড়ে, তিনিও নিজের খরিদী কিষানদের প্রতিভা সহায়ের মিটিংয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। তাতে গরিব লোকগুলো ক'টা করে পয়সা পাবে।

একটু ভেবে রঘুনাথ এবার জিজ্ঞেস করেন, 'ওরা কী বলল?'

অযোধ্যাপ্রসাদ বলে, 'মামুলি বাত। এই করব সেই করব। আসমান থেকে স্বরগ পেড়ে এনে গারুদিয়া-বিজুরিতে বসিয়ে দেব।' প্রতিভা সহায়দের বক্তৃতার সারমর্ম আশ্চর্য দক্ষতায় পেশ করতে থাকে সে। করতে করতে মাঝখানে হঠাৎ থমকে যায়।

'কী হল? চুপ করে গেলে যে?'

অযোধ্যাপ্রসাদ বলে, 'একটা বুরা খবর আছে রঘুনাথজি।'

কা বুরা খবর?' রঘুনাথ সিংয়ের ভুরু কঁচকে যায়।

'ফাগুরামকে নিয়ে মিটিনে গণ্ডগোল হয়েছে।'

রঘুনাথ সিং শিরদাঁড়া খাড়া করে বসেন। বলেন, 'কিসের গণ্ডগোল?'

অযোধ্যাপ্রসাদ কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় বড় ফটকের বাইরে থেকে কার গলা শোনা যায়, 'হুজৌর—'

ঘাড় ফিরিয়ে রঘুনাথ সিং এবং তাঁর পা-চাটা কুত্তারা দেখতে পায় গণেরি দোসাদ দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে আলোটালো নেই। অন্ধকারে গণেরির পেছনে আরো কয়েকজনকে আবছাভাবে চোখে পড়ে।

রঘুনাথ সিং এই মুহূর্তে তাঁর খরিদী কিষানদের এখানে আশা করেন নি। অন্য সময় হলে নৌকর দিয়ে ভাগিয়ে দিতেন। কিন্তু চুনাওর তারিখ দ্রুত এগিয়ে আসছে। এ সময় হঠকারিতা কোনো কাজের কথা নয়। ভেতরে ভেতরে খেপে উঠলেও মুখে দেখন-হাসি ফুটিয়ে রঘুনাথ বলেন, 'কা রে, এত্তে রাতমে?'

বড়ে সরকারের ডাক না এলে তাঁর কোঠিতে ঢোকার সাহস নেই গণেরিদের। আগে যে ক'বার এসেছে, তা রঘুনাথ সিংয়ের তলব পেয়েই। গণেরি ভয়ে ভয়ে বলে, 'হুজৌরের হুকুম হলে আমরা অন্দরে আসি।'

'আয়—'

গণেরিরা ভেতরে ঢুকতেই ধর্মার কাঁধে রক্তাক্ত বেহুঁশ ফাগুরামকে দেখে রঘুনাথ সিং চমকে ওঠেন, 'ফাগ্‌গুর এ হাল হল কী করে?'

গণেরি প্রতিভা সহায়ের চুনাওর মিটিংয়ে ফাগুরামকে নিয়ে যা যা ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে বিমর্ষ মুখে বলে, 'মার দিয়া সরকার। ফাগুয়াকে বিলকুল খতম করে দিয়েছে পরতিভাজির পহেলবানেরা। অসপাতাল নিয়ে যাওয়ার আগে আপনাকে দেখিয়ে গেলাম।'

ধর্মা এমনিতে চুপচাপ থাকে। আচমকা তার মধ্যে কী যেন ঘটে যায়। সে বলে ওঠে, 'হুজৌর, আপনার জন্যে চুনাওর গানা গাইতে গিয়ে ফাগ্‌গুচাচা মরতে চলেছে।'

পোকামাকড়ের চাইতেও তুচ্ছ জনমদাস যে এভাবে কথা বলতে পারে, এটা রঘুনাথ সিংয়ের ধারণার বাইরে। ধর্মার সীমাহীন স্পর্ধায় তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। তাঁর চোখমুখ ভয়ঙ্কর দেখায়। চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। জুতিয়ে অথবা চাবুক চালিয়ে দোসাদটার মুখের চামড়া ছিঁড়ে নেবেন কিনা, ভাবতে গিয়ে মনে পড়ে, চুনাওর বেশি দেরি নেই। নিজেকে দ্রুত সামলে নিতে নিতে দাঁতে দাঁত চেপে রঘুনাথ সিং বলেন, 'ওই বাঁজা কারখান্নাবালী কুত্তেকা বেটিয়াকে আমি দেখে নেব। গারুদিয়ায় এসে আমার আপনা আদমীকে পিটিয়ে যাবে, এ আমার অপমান। এর বদলা যদি তুলতে না পারি তো আমি ক্ষত্রিয় রাজপুতের ছৌয়া নই।' তাঁর ভেতর থেকে সামন্ততান্ত্রিক যুগের এক বর্বর প্রতিনিধি যেন বেরিয়ে আসে।

প্রতিভা সহায়ের ওপর বদলা নেওয়ার ব্যাপারে দোসাদরা কতটা সান্ত্বনা পায় তারাই জানে। গণেরি কাঁপা গলায় বলে, 'হুজৌরকা হুকুম হো যায় তো হামনিলোগন অসপাতল চলে—'

রঘুনাথ বলেন, 'নেহী। আমার গান গাইতে গিয়ে ফাগুয়ার এই হাল। আমিই ওকে হাসপাতাল পাঠাব।' হাঁকডাক করে তক্ষুনি চুনাওর জন্য নির্দিষ্ট একটি জিপ বার করান। ফাগুরামকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়ে যায়। রঘুনাথ সিংয়ের মহানুভবতায় গণেরিরাও তার সঙ্গে যেতে পারে।

কিছুক্ষণ পর জিপটা হাইওয়ে দিয়ে ভকিলগঞ্জ হাসপাতালের দিকে ছুটতে থাকে। পাঁচ দোসাদ স্তব্ধ হয়ে ফাগুরামের ক্ষতবিক্ষত শরীব আগলে বসে থাকে। চুনাওর মিটিং থেকে রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলির দিকে যাওয়ার সময় ফাগুরামের গলা দিয়ে গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরুচ্ছিল। এখন আর কোনো শব্দই নেই।

হাসপাতালে পৌঁছবার পর ডাক্তার ফাগুরামের নাড়ি ইত্যাদি দেখে ঘোষণা করেন, অন্তত ঘণ্টাখানেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে।

বহুদর্শী আধবুড়ো গণেরি দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জড়ানো গলায় বলতে থাকে, 'এ আমি জানতাম, এ আমি জানতাম।'

চুনাওর জন্য এ অঞ্চলে প্রথম প্রাণ দেওয়ার স্বর্গীয় গৌরব অর্জন করে অচ্ছুৎ নৌটঙ্কীবালা ফাগুরাম দোসাদ।

উনত্রিশ

রঘুনাথ সিং সেদিন তাঁর পরামর্শদাতা, চামচা এবং গণেরিদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন, ফাগুরামকে মারার বদলা অবশ্যই নেবেন। প্রতিভা সহায়কে তিনি ছাড়বেন না। কিন্তু ফাগুরামের মৃত্যুর পর তিন চার দিন কেটে গেল, এ ব্যাপারে তাঁর কোনোরকম গরজ দেখা যাচ্ছে না। হয়ত ভেবেছেন, চুনাওর মুখে এ নিয়ে হুজ্জুত করতে গেলে এমন ঝামেলায় জড়িয়ে যাবেন যেটা তাঁর নির্বাচনী ফলাফলের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। তা ছাড়া একটা নগণ্য দোসাদের জীবন গারুদিয়া বিজুরিতে এমন কিছু অমূল্য নয় যা নিয়ে রঘুনাথ সিংয়ের মতো মানুষকে সমস্ত কাজকর্ম ফেলে ভেবে ভেবে সময় অপচয় করতে হবে।

বড়ে সরকার চুনাও নিয়ে এখন সর্বক্ষণ ব্যস্ত। গারুদিয়া বিজুরির গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁর জিপ প্রায় সারাদিনই ধুলো উড়িয়ে ছুটতে থাকে। বাজারে-গঞ্জে নিয়মিত মিটিং করে চলেছেন তিনি। ইদানীং প্রতিটি মিটিংয়ে তাঁর সঙ্গে আবু মালেক আর নেকীরাম শর্মাকে দেখা যায়। তারা আগামী নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। নেকীরাম এবং আবু মালেক প্রতিটি উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং মাইনোরিটিকে রঘুনাথ সিংকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছে। বোঝাচ্ছে, রঘুনাথজিকে ভোট দিলেই তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে, তাদের নিরাপত্তা একেবারে 'গিরান্টিড'।

প্রতিভা সহায় বা সুখন রবিদাসও বসে নেই। তারাও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চুনাওর মিটিং করে যাচ্ছে।

যে যা খুশি করে যাক, ফাগুরামের বেঘোরে এই মৃত্যু গণেরিদের দোসাদটোলাকে কয়েকটা দিন বিমর্ষ করে রাখে।

আজ সকালে খামারবাড়ি থেকে হাল-বয়েল নিয়ে খেতির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ অবাক হয়ে যায় ধর্মা। হাইওয়ের তলায় নিচু পড়তি জমিতে যেখানে কিছুদিন আগে আদিবাসী ওরাওঁ-মুণ্ডারা এসে চট বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে অস্থায়ী ছাউনি করে নিয়েছিল, তার গা ঘেঁষে সারি সারি গৈয়া এবং বয়েল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই লোকদুটো, চাহাড়ের হাটিযায় যাবা আদিবাসীদের আসাম না আগরতলা কোথায় নিয়ে যাওয়ার জন্য অনবরত ফোসলাচ্ছিল — তাদের দেখা যায়। তারা হাঁকডাক করে তাড়া দিয়ে দিয়ে ওরাওঁ-মুণ্ডাদের গাড়িগুলোতে তুলছে।

হঠাৎ কী মনে পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধর্মা। একেবারে সামনে যে জোয়ান মুণ্ডাটাকে পায় তাকে শুধোয়, 'কোথায় যাচ্ছিস তোরা?'

মুণ্ডাটা বলে, 'আসাম।'

জোরে শ্বাস ফেলে ধর্মা। আড়কাঠি দুটো বলেছিল, আসাম বা আগরতলায় গেলে পেট ভরে খেতে পাবে, পাইসা মিলবে, জামাকাপড় মিলবে। আদিবাসীগুলো তো বেঁচে গেল। কিন্তু তাদের মতো জনমদাসদের আমৃত্যু হয়ত বড়ে সরকারের জমিতে লাঙল ঠেলেই যেতে হবে।

পেছন থেকে বুধেরি বলে, 'কা রে ধম্মা, পাক্কীতেই দাঁড়িয়ে থাকবি, না জমিনে যাবি?'

ধর্মা উত্তর দেয় না। ঘাড় গুঁজে বিষণ্ণ মুখে ফের হাঁটতে থাকে।

খেতিতে আসার পর দুপুর পর্যন্ত আর কোনো দিকে তাকাবার ফুরসত পায় না কেউ। দুপুরে সূর্যটা যখন খাড়া মাথার ওপর এসে ওঠে সেই সময় অন্য সবার সঙ্গে গামছায় মুখ মুছে কালোয়া খেতে বসে ধর্মা আর কুশী। তখনই দেখা যায় হাইওয়ের দিক থেকে টিরকে আসছে। এই ঝাঁ ঝাঁ জ্যৈষ্ঠের দুপুরে যখন লু-বাতাস চারদিকে আগুন ছাড়াচ্ছে সেই মুহূর্তে তার আসার উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয় না ধর্মার। টিরকে কাছাকাছি এসে গেলে সে বলে, 'দো-চার রোজকা অন্দর জঙ্গলমে যায়েগা টিরকে ভাইয়া। ইডভান্স পাইসা নিয়েছি। চিতার বাচ্চা ঠিক এনে দেব। চিন্তা করো না।'

টিরকে বলে, 'ও তো ঠিক আছে। মগর বাচ্চা দুটো তাড়িতাড়ি চাই। আমরিকী সাব আগলা উইকমে আয়েগা। সাত রোজ থাকবে। তার ভেতর যেভাবে পারিস যোগাড় করে দে।'

'ঠিক হ্যায়। মগর—'

'কা?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে ধর্মা। তারপর বলে, 'ভেইয়া আউর দোশ রুপাইয়া দিতে হবে।'

টিরকে চমকে ওঠে প্রথমটা। তারপর স্থির চোখে ধর্মাকে দেখতে দেখতে বলে, 'তোর সাথ তো সেদিনই দাম ফাইনিল হয়ে গেল। আবার টু হানড্রেড চাইছিস যে?'

'এটা দিতে হবে। না হলে তোমার ইডভান্স ওয়াপাস নিয়ে যাও।' ধর্মা বলে। আসলে মাস্টারজিকে দিয়ে সে গুনিয়ে দেখেছে ওই বাড়তি দুশ টাকা না হলে বড়ে সরকারের করজটা শোধ করা যাবে না। আন্দাজে সেদিন দেড় হাজারের কথা বলেছিল সে।

টিরকে বলে, 'এ বহোত জুলুমকা বাত।'

ধর্মা কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'তুমি ইস টেইম রুপাইয়াটা দাও। পরে তোমাকে বিনা পয়সায় অন্য জানবর জুটিয়ে দেব।'

লাভ কিছুটা কম হবে। কিন্তু এখন আর ফেরার রাস্তা নেই। আমেরিকান সাহেবের কাছ থেকে আগাম বহু টাকা নিয়ে ফেলেছে টিরকে। সন্দিগ্ধ গলায় সে বলে, 'পরে আবার দামটা চড়াবি না তো?'

'নায় নায়, রামজি বিষ্ণুজি কসম—'

'ঠিক হ্যায়। টু হানড্রেড জ্যাদাই দেব — মগর জঙ্গলে দু-এক রোজের মধ্যে চলে যা।'

'হাঁ, জরুর।'

টিরকে আর বসে না, নিরানন্দ মুখে চলে যায়। বাড়তি দুশ টাকা দিতে কার প্রাণই বা খুশিতে নেচে ওঠে!

পশ্চিম আকাশে সূর্য যখন আধাআধি ডুবে গেছে সেই সময় ভুমিদাসেরা জমিন থেকে হাল-বয়েল তুলে অন্য দিনের মতোই বাড়িতে ফিরতে থাকে। হাইওয়ে ধরে যেতে যেতে ধর্মা দেখতে পায়, নিচের সেই পড়তি জমিটা এখন একেবারে ফাঁকা। ওরাওঁ মুণ্ডাদের একজনকেও কোথাও দেখা যায় না। এমন কি তাদের আস্তানার এক টুকরো বাঁশ বা এক ফালি চটও পড়ে নেই। ক্ষণস্থায়ী আস্তানার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে তারা চলে গেছে।

হাল-বয়েল জমা দেওয়ার পর দৈনন্দিন কর্মসূচি অনুযায়ী সাবুই ঘাসের জঙ্গলে চলে যায় ধর্মা এবং কুশী। সেখান থেকে ঠিকাদারদের কাছে। তারপর মাস্টারজিকে দিয়ে পয়সা গুনিয়ে বেশ রাত করেই কলালীর পাশ দিয়ে যখন তারা জ্যৈষ্ঠের ফাঁকা শস্যক্ষেত্রে নামে সেই সময় অচমকা দূর থেকে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। ধর্মা এবং কুশী থমকে দাঁড়িয়ে যায়। হইচই এবং চেঁচামেচিটা কোন দিক থেকে আসছে, বোঝার জন্য এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে চমকে ওঠে। গারুদিয়া বাজারের পেছন দিকে কোনাকুনি দক্ষিণের গোটা আকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

চাপা ভয়ার্ত গলায় কুশী বলে ওঠে, 'আগ—'

ঠিক এই কাথাটাই ভাবছিল ধর্মা। ওই দিকটায় কোথাও আগুন লেগেছে। সে আস্তে মাথা নাড়ে, 'হাঁ—'

'ওধারে গঞ্জুদের দোগো গাঁও—'

'হাঁ, চামার লোগনাকা গাঁও ভি হ্যায়—'

ধর্মা এবং কুশী জানে ওই দক্ষিণ দিকটায় পর পর গোটা কয়েক অচ্ছুৎদের গাঁ গা-জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। ধর্মা বলে, 'কাদের গাঁওয়ে আগ লাগল কে জানে।'

কুশী উত্তর দেয় না।

কতক্ষণ দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সুদূর রক্তবর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, নিজেরাই জানে না। হঠাৎ পায়ের শব্দে তাদের চমক লাগে। দেখতে পায়, সাত আটটা হট্টাকাট্টা চেহারার লোক দৌড়ে আসছে। পাশ দিয়ে ওরা যখন চলে যাচ্ছে সেই সময় অন্ধকারেও চিনে ফেলে ধর্মারা। লোকগুলো রঘুনাথ সিংয়ের পোষা পহেলবান। তাদের হাতে লাঠি এবং মিট্টি তেলের টিন।

ওরাই কি তা হলে অচ্ছুৎদের গাঁগুলোতে আগুন লাগিয়ে এল? কথাটা মনে হতেই হাড়ের ভেতর

পর্যন্ত ভয়ে হিম হয়ে যায় ধর্মাদের।

ওদের পেছনে ফেলে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে লোকগুলো। ধর্মা এবং কুশীকে ভয়ঙ্কর চোখে দেখতে দেখতে বলে, 'তোরা এই অন্ধেরাতে দাঁড়িয়ে কী করছিস?'

ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে ধর্মা বলে, 'মাস্টারজির কাছে এসেছিলাম। এখন ঘরে ফিরছি।'

'আমাদের যে দেখেছিস, কাউকে বলবি না। যদি বলিস গলার নালিয়া ফেঁড়ে ফেলব।'

জিভের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেছে ধর্মার। কোনো রকমে গলার ভেতর থেকে দুটো মাত্র শব্দ বার করতে পারে, 'নায়, নায়—'

'হোঁশিয়ার।'

ধর্মা এবং কুশীকে সতর্ক করে দিয়ে চলে যায় লোকগুলো।

অনেক রাতে দোসাদটোলায় ফিরে ধর্মা এবং কুশী গণেরিকে কাঁচা ঘুম থেকে তুলে ফিসফিসিয়ে অচ্ছুৎদের গাঁয়ে আগুনের এবং রঘুনাথ সিংয়ের পহেলবানদের কথা জানায়।

সব শুনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে গণেরি। তারপব বলে, 'যা দেখেছিস মুহ্ দিয়ে কখনও তা বার করবি না। হোঁশিয়ার।'

পরের দিন সকালে খামার বাড়িতে এসে তাজ্জব বনে যায় ধর্মাবা। স্বয়ং রঘুনাথ সিংকে সেখানে দেখা যায়। একটা প্রকাণ্ড চেয়ারে তিনি বসে আছেন। তাঁর সামনে একান্ত বশংবদ ভঙ্গিতে শিরদাঁড়া টান টান করে দাঁড়িয়ে আছে হিমগিরি। খানিকটা দূরে হাতজোড় করে বসে আছে কয়েক হাজার ধোবি, গঞ্জু এবং রবিদাস। গারুদিয়া বাজারের দক্ষিণে এদের গাঁগুলো কাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সমানে ওরা কেঁদে যাচ্ছে আর বলছে, 'মর গিয়া হুজৌর, মর গিয়া।'

ধর্মারা জানে না, ভোর রাত্তিরে গঞ্জু ধোবিদের লোক পাঠিয়ে খামারে ডাকিয়ে এনেছেন রঘুনাথ সিং। অপার স্নেহে মধুর গলায় তিনি বলেন, 'কেন মরবি? আমি আছি না? আমি তোদের নিজের লোক, মেরে আপনে। আমি তোদের গাঁ নতুন করে বানিয়ে দেব।' হিমগিরির দিকে ফিরে বলেন, 'এদের যার যা লাগে, বাঁশ, খড়, নয়া টিন — সব দেবে। আর হাঁ, দশ রোজ খোরাকির জন্য গেঁহু, বাজরা, মকাই, মিট্টি তেল, নিমকও দেবে।'

অচ্ছুৎরা অভিভূত হয়ে যায়। কৃতজ্ঞ আপ্লুত মানুষগুলো রুদ্ধ গলায় বলতে থাকে, 'হুজৌর হামনিকো মা-বাপ। আপনার কিরপায় হামনিলোগ বঁচ যায়েগা। হুজৌর ভগোয়ান।'

যেন কতই বিব্রত হয়েছেন এমন ভঙ্গিতে রঘুনাথ সিং বলেন, 'এ সব বলতে নেই। মনে রাখিস আমি তোদের আপনজন — সিরিফ মেরে আপনে।'

ত্রিশ

ইদানীং ক'দিন ধবে ধর্মা খেতের কাজকর্ম সেবে কাঁধে একটা টাঙ্গি ফেলে চলে যাচ্ছে দূর জঙ্গলের ভেতরে। আর কুশীকে পাঠাচ্ছে সাবুই ঘাসের জঙ্গলে, যদি মেয়েটা দু-চারটে বগেড়ি ধরে ঠিকাদারদের কাছে বেচে এক-আধটা টাকা আনতে পারে—এই আশায়। চিতাব বাচ্চা ধরে দেওয়াব জন্য আগাম টাকা নেওয়া আছে টিরকের কাছ থেকে। তা ছাড়া বাকি টাকাটা না পেলে জনমদাসের জীবন থেকে মুক্তি নেই। কাজেই চিতার বাচ্চা তাকে ধরে আনতেই হবে।

চিতা লাকড়া, দাঁতাল শুয়োর এবং অন্য সব ভয়ানক জানোয়ারে ঠাসা ওই জঙ্গলটায় একা একা ধর্মা যাক, এটা একেবারেই চায় না কুশী। সে বলে, 'ওহী জঙ্গলমে খতরনাক জানবব হ্যায়। নায় যা, নায় যা—'

কুশীর কথা কানে না তুলে আগে কয়েক বার ওখানে গেছে ধর্মা। এখনও যেতে লাগল। ধর্মা তাকে বোঝায়, একবার চিতাব বাচ্চা দুটো সে যোগাড় করে আনুক, তারপর আর ওখানে যাবে না।

কুশীর মন খারাপ হয়ে যায়। তার মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যায়, ভীষণ ভয় পেয়েছে। শঙ্কাতুর

গলায় কুশী বলে, 'তাহলে আমাকেও নিয়ে চল।'

ধর্মা বোঝায়, তার জন্য ভয় নেই। হাতে যতক্ষণ টাঙ্গি রয়েছে, কোনো জানোয়ারের সাধ্য নেই গায়ে একটা আঁচড় কাটতে পারে। বরং সঙ্গে একটা অওরত থাকলে অনেক ঝামেলা। আচমকা কোনো জানোয়ার ঝাঁপিয়ে পড়লে তখন নিজেকে বাঁচাবে, না কুশীকে বাঁচাবে?

রোজই সূর্যাস্তের সময় খামারে হাল-বয়েল জমা দিয়ে কাঁধে টাঙ্গি ফেলে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের স্তূপাকার বালির ওপর দিয়ে দৌড়তে থাকে ধর্মা। তার পেছন পেছন কুশী। বিশাল আকাশের তলায় ধু ধু ফাঁকা বালির ডাঙার ওপর এক ক্রীতদাস যুবক আর এক ক্রীতদাসী যুবতী স্বাধীনতার দাম যোগাড় করার জন্য রোজ এইভাবে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে।

সাবুই ঘাসের বন পর্যন্ত ওরা একসঙ্গে যায়। ওখানে পৌঁছুলেই ধর্মা বলে, 'ফাঁদে বগেড়ি পড়েছে কিনা দ্যাখ, আমি যাই।'

কুশী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুখটা তার করুণ হয়ে যায়। আস্তে করে সে বলে, 'দের নায় করনা। তুরন্ত চলে আসবি।'

ধর্মা দাঁড়ায় না। দিনের আলো থাকতে থাকতেই সে জঙ্গলে ঢুকতে চায়। জঙ্গলে রাত নামা আর অন্ধ হয়ে যাওয়া এক কথা। দৌড়ুতে দৌড়তেই সে বলে, 'হাঁ, আসব—'

কুশী কিন্তু তক্ষুনি সাবুই ঘাসের বনে ফাঁদ দেখতে ঢোকে না, দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের বালির ওপর যতক্ষণ ধর্মাকে দেখা যায়, তাকিয়ে থাকে। শেষ বেলার আলোয় ধর্মার বিশাল কাঁধে টাঙ্গির ফলাটা ঝকমক করতে থাকে। দেখতে দেখতে মনে হয় ও পারবে, নিশ্চয়ই চিতার মুখ থেকে তার বাচ্চাদের উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। পরমুহূর্তেই ভয় হয়, জঙ্গল বড় বুরা জায়গা আর চিতা ভীষণ খতরনাক জানোয়ার। আশায় এবং ভয়ে তার বুকের ভেতরটা দুলতে থাকে।

দক্ষিণ কোয়েলের শুকনো খাত অনেক দূরে যেখানে বেঁকে ডানদিকে ঘুরেছে একসময় সেখানে অদৃশ্য হয়ে যায় ধর্মা। তখন কুশী বিড় বিড় করে বলতে থাকে, 'হো রামজি, হো ভগোয়ান, তেরে কিরপা, তেরে কিরপা—' ধর্মার যাতে কোনোরকম ক্ষতিটতি না হয় সে জন্য ঈশ্বর রামচন্দজির কাছে তার এই প্রার্থনা। নিজের মনে ধর্মার মঙ্গল কামনা করতে করতে সে ঘাসবনে ঢুকে যায়।

ওদিকে আরশির মতো জলের ধারে শাল-পরাস-কড়াইয়া আর কেঁদের জঙ্গলে ধর্মা গিয়ে যখন ঢোকে তখন সন্ধে নামতে শুরু করে। খরগোশের মতো কান খাড়া করে সতর্ক চোখে চারদিক দেখতে দেখতে পা টিপে টিপে জঙ্গলের গভীরে যেতে থাকে সে।

দিন তিনেক এইভাবে কেটে যায়। এ ক'দিনে জঙ্গলে একটা লাকড়া, গোটা দুই দাঁতাল, আখছার হরিণ খরগোশ ছাড়া চিতা দূরে থাক, তার গায়ের একটা ফুটকিও চোখে পড়েনি। যাও দু-একটা জন্তু-জানোয়ার দেখা গেছে তা দূর থেকে। তবে একদিন সাপের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল ধর্মা। টাঙ্গির কোপে সেটার মুণ্ডু উড়িয়ে দিয়েছিল সে।

জঙ্গলে চিতার খোঁজে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর ক্লান্তিতে শরীর যখন টলতে থাকে সেই সময় বেরিয়ে আসে ধর্মা। দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাত ধরে আবার সে ফিরে যায়।

কোয়েলের বালি ভেঙে সাবুই ঘাসের জঙ্গল পেরিয়ে খানিকটা আসার পর রোজই ধর্মার চোখে পড়ে, হাইওয়ের কাছে উঁচু বালির স্তূপের ওপর কুশী দাঁড়িয়ে আছে। রোজই তার জন্য ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটা। রাত তখন নিঝুম হয়ে যায়, আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। ধু ধু শস্যক্ষেত্র, আদিগন্ত মাঠ, ঝাপসা আকাশ, সব একেবারে ফাঁকা। সুবিশাল আকাশের তলায় আবছা চাঁদের আলো গায়ে মেখে যে মানবীটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখতে দেখতে স্বপ্নের কোনো পরী মনে হয়। হঠাৎ চিরকালের ক্রীতদাস ধর্মা আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে তার দিকে ছুটতে থাকে।

একত্রিশ

নির্বাচনের আর মাত্র চারটে দিন বাকি। গারুদিয়া এবং বিজুরি তালুকের তিরিশ বত্রিশটা গাঁ তিন চুনাওপ্রার্থীর ফেস্টুনে পোস্টারে সেজে উঠেছে। লাল শালুতে নিজের প্রতীক-চিহ্ন আঁকিয়ে সুখন রবিদাস, প্রতিভা সহায় এবং রঘুনাথ সিং চারদিকে টাঙিয়ে দিয়েছেন। এমনকি হাইওয়ের পরাস বা কড়াইয়া গাছগুলোও রেহাই পায় নি, আঠা দিয়ে সেগুলোর গায়েও পোস্টার সেঁটে দেওয়া হয়েছে। মোট কথা, চুনাওর ব্যাপারটা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।

আজ এখনও ভাল করে ভোর হয় নি। আকাশে আবছা আবছা আলোর ছোপ ধরেছে মাত্র। এরই মধ্যে কিন্তু দোসাদটোলাটা জেগে উঠেছে। খানিকটা মাড়োয়া সেদ্ধ বা মাড়ভাত্তা কিংবা মকাই ভাজা খেয়ে এখনই তাদের ছুটতে হবে খামারবাড়িতে, সেখান থেকে খেতিতে।

হঠাৎ আধবুড়ো গণেরি সামনের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল,'হো রামজি আজ কা হুয়া? কা হুয়া আজ? আঁখ সচমুচ দেখতা হ্যায় তো?'

গণেরির চারপাশে যারা ছিল তার সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হল, অ্যাঁ, কী হল?'

'ওই দেখ—' গণেরি রাস্তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

সবাই সেদিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। খানিকক্ষণ কারুর গলা দিয়ে একটু আওয়াজও বেরুল না। আকাশ থেকে চাঁদ সূরয নেমে এলেও কেউ এতটা অবাক হত না। স্বয়ং বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং পায়ে হেঁটে তাদের মতো এই অচ্ছুৎ দোসাদদের মহল্লায় আসছেন। এই নিয়ে দু'বার তিনি এখানে এলেন। রঘুনাথ সিং তাঁর পঞ্চান্ন বছরেব জীবনে একবারও এ তল্লাট মাড়ান নি। এই চুনাওর সময় পনের দিনের মধ্যে দু দু'বার এলেন। ভোটের জন্য তাঁর হয়ে যারা খাটছে তারা তো সঙ্গে রয়েছেই। তা ছাড়াও রয়েছে তাঁর একান্ত বশংবদ কুত্তাব দল। হিমগিরিনন্দন, আজীবচাঁদ, রামলছমন — এমনি অনেকে।

ধর্মাদের চোদ্দ পুরুষে কখনও যা ঘটে নি, এখন তা বার বার ঘটছে। সূরয কি আজকাল পছিমা আকাশে উঠতে শুরু করেছে! বড়ে সরকার ভূমিদাস অচ্ছুৎদেব পাড়ায় আজ রাত পোহাতে না পোহাতে যে আসবেন, বহুদর্শী গণেরিও তা ভাবতে পারে নি।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকার পর গোটা দোসাদটোলাটা প্রায় একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'বড়ে সরকার আয়া রে—'

যারা ঘরের ভেতরে ছিল তারাও দৌড়ে বেরিয়ে আসে। তারপর রঘুনাথ সিংয়ের জন্য কে যে কী করবে, কোথায় বসাবে, ঠিক করে উঠতে পারে না। বড়ে সরকারের পা রাখার জন্য তারা বুক পর্যন্ত পেতে দিতে পারে। যদিও নিজের হাতে তাঁর লাড্ডু বিলি করার একটা মহৎ দৃষ্টান্ত আছে, তবু এই ভোরবেলা তাদের মতো অচ্ছুৎদের ছুঁলে যদি সরকারের পাপ লাগে তাই ভরসা করে বুকটা আর পাতে না।

এর মধ্যে গিধনী সাহস করে তার ঘর থেকে একটা পুরনো চেয়ার বার করে এনে পেতে দিয়েছে। এর চাইতে ব্যক্তিগত দামি সম্পত্তি আর কারুর নেই।

যদিও আগে রঘুনাথ সিং নিজেকে তাদের আপনজন বলে বারকয়েক ঘোষণা করেছেন তবু সবাই ভয়ে ভয়ে হাতজোড় করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের ধারণা ছিল, বড়ে সরকার গিধনীর চেয়ারটা পায়েব বুড়ো আঙুল দিয়ে ছুঁয়েও দেখবেন না। কিন্তু সবাইকে একেবারে তাজ্জব বানিয়ে তিনি চেয়ারটায় বসেই পড়েন। হাসি হাসি মুখ করে বলেন, 'অনেক দিন ভেবেছি, তোদের কাছে মাঝে মাঝে আসব, গল্প করব। আমি তো তোদেরই লোক। লেকেন নানা ঝামেলায় আসতে পারি না।'

ধর্মারা কি কথাগুলো ঠিক শুনছে? তারা কেউ কিছু বলে না। হাতজোড় করে আগের মতোই দাঁড়িয়ে থাকে।

রঘুনাথ সিং এবার জনে জনে ডেকে কে কেমন আছে, কার কী সুবিধা অসুবিধা, জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। সবার খবর নেওয়ার পর বললেন, 'এবার তোদের একটা ভাল খবর দিচ্ছি।'

ধর্মা আধফোটা গলায় বলে, 'হুজৌর—'

রঘুনাথ সিং বলতে লাগলেন, 'আজ থেকে তিন রোজ তোদের কাম করতে হবে না। স্রিফ খাও, পীও আউর আরাম কর। চাওর, গেঁহু, ঘিউ, মিরচি, আলু — সব কিছু আমার লোক দিয়ে যাবে। বহোত রোজ তোরা আমার খেতিতে কাম করছিস। এই তিন রোজ তোদের বিলকুল আরাম আউর আরাম।'

বলছেন কী রঘুনাথ সিং! তিনি যা বলেছেন তা বুঝ-সমঝ করে বলছেন! না কি তারাই ভুলটুল শুনছে!

এদিকে রঘুনাথ সিংয়ের এক নম্বর পা-চাটা কুত্তা আজীবচাঁদ আচমকা যেন খেপে ওঠে, 'হোয় হোয় হোয়, অ্যায়সা বাত কো-ই কভী নায় শুনা। রামচন্দ্রজি খুদ স্বরগসে উতারকে আয়ে রে। হোয়—হোয়—হোয়—'

হাতের ইশারায় আজীবচাঁদকে থামিয়ে দিয়ে রঘুনাথ সিং আবার বলেন, 'কাল থেকে তিন রাত আমার কোঠির সামনে নৌটঙ্কীর আসর বসবে। পুরা রাত ধরে চলবে। তোরা সবাই যাবি কিন্তু—'

পুরো তিনদিন কাজ করতে হবে না অথচ ভাল ভাল খাদ্যবস্তু আসবে বড়ে সরকারের খামার থেকে। শুধু তাই না, তিন রাত তাদের নৌটঙ্কীও দেখানো হবে। চোদ্দ পুরুষে এমন ঘটনা গারুদিয়া তালুকের দোসাদদের জীবনে আর কখনও ঘটে নি।

আজীবচাঁদ ফের চিৎকার করে, 'হোয় হোয় হোয়, রামরাজ জরুর আ যায়েগা, জরুর আ যায়েগা--'

রঘুনাথ সিং আর বসলেন না। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'তা হলে আজ আমরা যাই। তোরা নৌটঙ্কী শুনতে যাস কিন্তু—'

তাঁর সঙ্গের সেই চুনাও কর্মী ছোকরারা চেঁচিয়ে উঠল :

'রঘুনাথ সিং—'

'অমর রহে—'

'রঘুনাথ সিং—'

'অমর রহে—'

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো—'

'রঘুনাথ সিংকো—'

'বোট দো—'

চিৎকারটা থামলে রঘুনাথ সিং ধর্মাদের বলেন, 'তোরা তো সবাই জানিস আমি এবাব ভোটে নেমেছি।'

ধর্মারা ঘাড় কাত করে দেয়, 'জি বড়ে সরকার। এই জন্যে তো সেদিন আমরা লাড্ডুয়া খেলাম।'

'আমি তোদেব লোক, তোদের আপনা আদমী। ভোটের কাগজে হাতি মার্কায় মোহর মারবি। তা হলে আমি ভোট পাব। হাতি মনে রাখবি।'

'জি সরকার—' সবাই আবার ঘাড় কাত করে।

আজীবচাঁদ ঘুরে ঘুরে চিৎকার করতে থাকে, 'হোয় হোয়, রামরাজ আ যায়েগা রে, রামরাজ আ যায়েগা। শুন তুলোগন, শুনকে লে। তোদের ভালাইর জন্যে সবাই বড়ে সরকারকে ভোট দিবি—'

বুধেরি ঢোঁড়াই বুধনী কুঁদরী — সবাই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে, 'জরুর দেব, জরুর দেব।'

রঘুনাথ সিং হাসি হাসি মুখ করে বলেন, 'চলি রে, গাঁওয়ে গাঁওয়ে ঘুরে সবাইকে নৌটঙ্কী শোনার নেমন্তন্ন করতে হবে।'

রঘুনাথ সিং তাঁর দলবল নিয়ে চলে যাওয়ার পর আচমকা ধর্মার মনে পড়ে গেল, এই তিনটে দিন খেতির কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে ভালই হয়েছে। যেভাবেই হোক, যদি পুরো তিনটে দিনও দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ে কেঁদ শাল পরাস সাগুয়ানের জঙ্গলে কাটাতে হয়, কাটিয়ে চিতার জোড়া বাচ্চা

যোগাড় করবে। এর চাইতে বড় সুযোগ এ জীবনে আর আসবে কিনা সন্দেহ। রঘুনাথ সিং তিনদিনের ছুটি দিয়ে মুক্তির পুরো ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এখন সব কিছু তার নিজের ওপর নির্ভর করছে।

রঘুনাথ সিং চলে যাবার ঘণ্টা তিনেক পর তাঁর খামার বাড়ি থেকে দু-তিনটে লোক ভৈসের গাড়িতে চাপিয়ে চাল-ডাল-গম-মকাই, এমন কি ঘি পর্যন্ত দিয়ে গেল।

অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের মহল্লায় এখন সুখের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। এত সুখ আগে আর তারা কখনও তো পায় নি, তাদের বাপ দাদা, দাদার বাপ, দাদার বাপের বাপ, তার বাপের বাপ পর্যন্ত ওপরের দিকের কয়েক পুরুষে কেউ কখনও পেয়েছে বলে শোনা যায় নি। আজীবচাঁদ যে রামরাজের কথা বলে গেল, তবে কি এই গারুদিয়া তালুকে সত্যি সত্যি তাই নেমে আসতে চলেছে!

গোটা পাড়া জুড়ে এখন ঢিলেঢালা আর আলস্যের ভাব। মেয়েরা রান্নাবান্নার তোড়জোড় করছে। পুরুষেরা চৌপায়ায় বসে বসে খৈনি বানাতে বানাতে রঘুনাথ সিংয়ের কথাই হাজার বার করে বলতে থাকে। বড়ে সরকারের দিল রাতারাতি কী করে যে এরকম দরাজ হয়ে গেল তা ভেবে অবাক হয়ে যায়। সবই ভগোয়ান রামচন্দজিকা কিরপা।

কেউ কেউ এরই মধ্যে গলা পর্যন্ত মহুয়া গিলে এসে মাতোয়ালা হয়ে বসে আছে কিংবা জড়ানো গলায় চেঁচাচ্ছে।

ঠিক দুপুরবেলা সূর্য যখন খাড়া মাথার ওপর, সেই সময় খাওয়া দাওয়া সেরে কোমরে আধ হাত লম্বা বাঁকানো ছুরি গুঁজে আর কাঁধে টাঙ্গি ফেলে বেরিয়ে পড়ে ধর্মা। তার সঙ্গে সঙ্গে কুশীও যায়। দুপুরের জ্বলন্ত রোদে টাঙ্গির ফলা ঝলকাতে থাকে।

একসময় ওরা হাইওয়েতে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতটার কাছে এসে পড়ল। বড় সড়কের বাঁ দিকে যতদূর চোখ যায়, একেবারে ধু ধু দিগন্ত পর্যন্ত রঘুনাথ সিংযের খেতগুলো আজ একেবারে ফাঁকা। কোথাও লোকজন চোখে পড়ছে না। সব কিছু নির্জন আর শূন্য। আজ থেকে পুরো তিনটে দিন রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে হাল-বয়েল পড়বে না। তারা তো মাঠে নামেই নি, এমনকি সেই মরশুমী ওরাওঁ আর মুণ্ডা কিষানগুলোকেও তিনদিনের জন্য ছুটি দিয়েছেন রঘুনাথ সিং।

তবে হাইওয়ের ওপারে মিশিরলালজির জমিতে যথারীতি মিশিনের লাঙল চলেছে। বিশাল প্রান্তর জুড়ে ভট ভট শব্দ উঠছে।

হাইওয়ে থেকে ধর্মা আর কুশী অন্য দিনের মতো কোয়েলের মরা খাতে নেমে এল। একসঙ্গে সাবুই ঘসের জঙ্গল পর্যন্ত দু'জনে এসে কুশী দাঁড়িয়ে পড়ল আর ধর্মা বালির ডাঙার ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল জঙ্গলের দিকে।

আগে থেকেই ওদের কথা হয়ে আছে, এ ক'দিন সাবুই ঘসের বন পর্যন্ত ওরা একসঙ্গে আসবে। কুশী এখানে ফাঁদ পেতে পাখি ধরবে। আর একা একাই ধর্মা চলে যাবে আরশির মতো সেই স্বচ্ছ জলের পাড়ে শাল-কেঁদের জঙ্গলে।

পেছন থেকে কুশী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'তুরন্ত লৌটনা। আমার বহোত ডর লাগছে।'

ধর্মা ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'তুরন্তই আসব। ডর কিসের?' কাঁধের সেই ধারাল টাঙ্গির ফলাটা দেখিয়ে বলে, 'এটা তো আছে। জানবর যত খতরনাক হোক, আমার চামড়া ছুঁতে পারবে না।' কথাটা আগে আরো কয়েক বার বলেছে সে। কিন্তু ডরপোক কুশীটার ভয় কিছুতেই যায় না।

কুশী এবার বলে, 'বড়ে সরকারের কোঠিতে আন্ধেরা নামলেই নওটঙ্কী বসবে—'

'তুই নওটঙ্কী শুনতে চলে যাস। আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকিস না।'

'নায় নায়। তুই না এলে আমি যাব না।'

'একেলী এখানে দাঁড়িয়ে থাকবি না কুশী। হাইওয়ে দিয়ে বহোত আদমী যায়। তাদের মধ্যে খতরনাক হারামজাদও রয়েছে। বুরা মতলব নিয়ে কেউ চলে আসতে পারে। তুই একেলী আওরত, তাদের ঠেকাতে পারবি না।'

কুশী ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ধর্মার কথামতো চলে যাওয়ার ইচ্ছা তার নেই।

ধর্মা আবার বলে, 'বগেড়ি মিললে ঠিকাদার সাবদের কাছে বেচে বড়ে সরকারের কোঠিতে নওটঙ্কী শুনতে চলে যাবি। আমি সিধা ওখানে যাব।' বলে চলে যায় সে।

আগের সব দিনের মতো যতক্ষণ নদীর ধু ধু বাঁকে ধর্মা আর তার টাঙ্গির ফলাটা দেখা গেল ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কুশী। তারপর সাবুই ঘাসের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

বিকেলের আগে আগে শাল-কেঁদের জঙ্গলে পৌঁছে গেল ধর্মা। খুব সতর্ক চোখে চারদিক দেখতে দেখতে ক্রমশ আরো গভীরে চলে যেতে লাগল।

আজও চিতার বাচ্চা খুঁজতে খুঁজতে তার চোখে পড়ে, অগুনতি হরিণ লাফিয়ে চলেছে। একেবারে ঝুনঝুনকে। গোটা তিনেক বনবেড়াল, একটা শজারুও দেখতে পেল। অনেক দূরে দেখা গেল, একটা দাঁতাল শুয়োর ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ঘন ঝোপের দিকে চলে যাচ্ছে।

বনবেড়াল, হরিণ, শুয়োর ইত্যাদি সম্পর্কে ধর্মার কোনোরকম উৎসাহ নেই। তার ছুরির তাক মারাত্মক। ইচ্ছা করলে দূর থেকে ছুঁড়ে কোনো একটা জানোয়ারকে বিঁধতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে শক্তি বা সময় নষ্ট করতে সে চায় না। কার লক্ষ্য হল চিতার বাচ্চা।

ঘুরতে ঘুরতে সূর্য ডোবার সময় হয়ে গেল। জঙ্গলের ছায়া দ্রুত ঘন হয়ে আসতে লাগল। এরপর এখানে থাকা খুবই বিপজ্জনক। কেননা অন্ধকারে পেছন থেকে কিংবা মাথার ওপর গাছের ডাল থেকে কোনো হিংস্র জন্তু আচমকা ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়তে পারে।

একসময় ধর্মা জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। ছুটির একটা দিন কেটে যায়। অথচ কোনো কাজই হল না। ফলে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আসে তার।

এখনও অবশ্য পুরো দুটো দিন রয়েছে। কাল আরো আগে আগে জঙ্গলে চলে আসতে হবে।

আজ আর ধর্মার জন্য সাবুই ঘাসের জঙ্গলের কাছে কিংবা হাইওয়ের ধারে উঁচু বালির স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে নি কুশী। ধর্মা একা একাই দোসাদটোলায় ফিরে এল।

এখন বেশ রাত হয়ে গেছে। ভরা পূর্ণিমার পর অমাবস্যার পক্ষ চলছে বেশ কয়েক দিন ধরে। চাঁদ উঠবে আরো অনেকক্ষণ পর, সেই মাঝরাতের কাছাকাছি সময়। এখনকার চাঁদ বড় কৃপণ। তার গায়ে যেটুকু আলো আছে এই গারুদিয়া তালুক পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। ফলে এ অঞ্চলের মাঠ প্রান্তর, দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের স্তূপাকার বালি, গাঁও-গঞ্জ-বাজার, সব অন্ধকারে ডুবে থাকে।

দোসাদদের পাড়াটা এখন একেবারে ফাঁকা। কোনো ঘরেই কেউ নেই, এলাকা খালি করে সবাই রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলিতে নৌটঙ্কী শুনতে গেছে।

নিজেদের ঘরে ঢুকে ছুরি আর টাঙ্গি দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে হাতড়ে হাতড়ে লণ্ঠন বার করে ধরিয়ে নেয় ধর্মা। তারপর পরনের ঘাম-ভেজা জবজবে হাফ প্যান্ট আর জামাটা ছেড়ে ডোরাকাটা পাজামা আর লাল কুর্তা গায়ে চড়িয়ে রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলির দিকে যায়।

বড়ে সরকারের মকানের সামনে যেন দশেরা পরবের মেলা বসে গেছে। গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকের কোনো গাঁওয়ের একটা মানুষও আজ আর বুঝি ঘরে নেই। সব ঝেঁটিয়ে এখানে চলে এসেছে।

সেদিন ফাগুরামের বেহুঁশ দেহ কাঁধে করে আনার পর এবাড়িতে আর আসেনি ধর্মা। এর মধ্যে নৌটঙ্কীর জন্য কবে যে বিশাল শামিয়ানা খাটানো হয়েছিল সে টের পায় নি।

শামিয়ানার তলায় শুধু মানুষ আর মানুষ। মাঝখানে উঁচু মঞ্চে নৌটঙ্কীর আসর বসেছে। প্রচুর জোরাল আলো জ্বলছে গোটা শামিয়ানা জুড়ে।

ভিড়ের ভেতর খুঁজে খুঁজে কুশীকে ঠিক বার করে ফেলে ধর্মা। চাপ-বাঁধা মানুষের মধ্যে রাস্তা করে করে তার গা ঘেঁষে বসে পড়ে।

কুশী আজ সস্তা সাবানে কাচা একটা খাটো হলুদ শাড়ি আর লাল জামা পরেছে। উঁচু করে চুল বেঁধে গুঁজে দিয়েছে বুনো ফুল, কপালে দিয়েছে কাচপোকার টিপ।

কুশী জিজ্ঞেস করে, 'কখন ফিরলি?'

ধর্মা বলে, 'এই তো। ঘরে চাকু আর টাঙ্গি রেখেই চলে এসেছি।'

'চিতার বাচ্চা মিলল?'

'নায়। মুল্লুক ছেড়ে সব চিতা ভেগেছে। এত ঢুঁড়লাম, একটাও চোখে পড়ল না। কাল সুবে নিদ ভাঙলেই জঙ্গলে চলে যাব।'

এই সময় হারমোনিয়াম, তবলা আর ফ্লুট একসঙ্গে বেজে উঠল। তারপর চড়া মিঠে সুরে কোনো আওরতের গলা কানে এল; রঘুনাথ সিংয়ের লোকেরা আসরে মাইকের ব্যবস্থা করেছে যাতে শামিয়ানার শেষ মাথার শ্রোতাটিও শুনতে পায়।

দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে আসরের দিকে তাকায় ধর্মারা। প্রচুর সাজগোজ করে, গিল্টির গয়না পরে নৌটঙ্কী দলের পরীর মতো ছোকরিটা গলায় গিটকিরি খেলিয়ে গান ধরেছে। চোখমুখের কিবা ঠমক তার! গোটা শামিয়ানা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে।

বালমোয়া ঘর না আয়ে রে
    ওমরিয়া বীতি যায়ে রে
যো ম্যায় ইতনা জানতী
    প্রীত কিয়ে দুখ হোয়
নগর টিঢড়ো (ঢেঁড়া) পিটতী
প্রীত না করিয়ো কোঈ
কোঠা উপর কোঠ লী
    উসমে কালা নাগ
ঝরোখা পরকে লায়লী পুকারে
মজনু ডসিয়ো (কামড়ানো) না যায়
নদী কিনারে ধুঁয়া উঠৎ হ্যায়
ম্যায় জানু কুছ হোয়
কোঠা পর লায়লী পুকারে
মজনু জ্বলিয়ো যায়—

ধর্মা বলে, 'বহোত বঢ়িয়া গানা—'

গান শুনতে শুনতে কুশী অন্যমনস্কের মতো বলে, 'হাঁ, ফরবিশগনকা (ফরবেশগঞ্জকা) নওটঙ্কী—'

'উসি লিয়ে ইতনা বঢ়িয়া। সারা দুনিয়া ফরবিশগনের নওটঙ্কীর নাম জানে।'

গান চলতে লাগল।

শুধু ফরবেশগঞ্জেরই নয়, আরারিয়া ঘাট, পূর্ণিয়া, সুদূর মীর্জাপুর — এমনি নানা জায়গা থেকে নৌটঙ্কীর দল আনিয়েছেন রঘুনাথ সিং। একেক রাত একেক দল গাইবে।

সারা রাত নৌটঙ্কী শুনে ভোরবেলা ঢুলতে ঢুলতে ধর্মারা দোসাদটোলায় ফিরে আসে।

রাতভর গান শোনার ফল হয় এই, পরের দিন সকালবেলা চিতার বাচ্চার খোঁজে জঙ্গলে যেতে পারে না ধর্মা। রঘুনাথ সিংয়ের মকান থেকে মহল্লায় ফিরেই শুয়ে পড়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। ঘুম যখন ভাঙল, দুপুর হয়ে গেছে।

ধড়মড় করে উঠে ধর্মা দেখল গোটা দোসাদপাড়া তখনও বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মা-বাপও অঘোর ঘুমে ডুবে আছে। ডাকাডাকি করে তাদের আর জাগালো না ধর্মা। তাড়াতাড়ি কুয়োর জলে চানটান করে বাসি কুঁদরুর তরকারি দিয়ে খানকতক বাজরার রুটি খেয়ে কোমরে ছুরি গুঁজে আর কাঁধে টাঙ্গি ফেলে জঙ্গলে ছোটে সে।

কি আশ্চর্য, পুরো দোসাদপাড়াটা ঘুমোলেও কুশী ঠিক জেগে আছে। তক্কে তক্কে ছিল মেয়েটা। ধর্মা জঙ্গলের রাস্তা ধরতেই সে তার পিছু নেয়। তারপর অন্যদিনের মতো সাবুই ঘাসের বনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে আর গনগনে আকাশের তলা দিয়ে ধর্মা চল্লে যায় শাল-কেঁদের জঙ্গলের দিকে।

আজও জঙ্গলের ভেতর অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল ধর্মা। কিন্তু না, চিতার বাচ্চা পাওয়া গেল না। সূর্যাস্তের সময় বনভূমিতে ছায়া যখন ঘন হয়ে আসে তখন বেরিয়ে এল সে। আগের দিনের মতোই ফাঁকা দোসাদটোলায় ফিরে, ছুরি টাঙ্গি রেখে, জামাকাপড় বদলে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের মকানে নৌটঙ্কী শুনতে চলে গেল। শামিয়ানার তলায় গিজগিজে ভিড়ের ভেতর কালকের মতোই কুশীকে খুঁজে বার করে তার পাশে গিয়ে বসে পড়ল। তারপর সারারাত আরা জেলার নাম-করা দামি দলের মনমাতানো গান শুনল।

মেরে গোরে বদন পর সভী রাজি
সাসুভি রাজি সসুর ভি রাজি
বালমা আনাড়ী, নেহী রাজি
মেরে গোরে বদন পর সভী রাজি
ভাসুরাজি রাজি, ননদভি রাজি
দেওরা বেদরদী নেহী রাজি
মেরে গোরে বদন পর সভী রাজি—

ভোরবেলা যখন ধর্মারা ঘরে ফেরে তখন সবার চোখ ঘুমে জুড়ে আসছে। এইভাবে পর পর দুটো দিন বরবাদ হয়ে গেল। বাকি রইল মোটে একটা দিন।

বত্রিশ

আজ ছুটির শেষ দিন। আবার কাল থেকে হাল-বয়েল নিয়ে গোটা দোসাদপাড়াকে রঘুনাথ সিংয়ের খেতিতে নামতে হবে। কাজেই যা করার আজকের ভেতরেই করে ফেলতে হবে ধর্মাকে। কারণ কাল থেকে জমিতে নামলে তার হাতে কতটুকু আর সময় থাকবে! সারাদিন মাটি চষার পর জঙ্গলে যেতে যেতেই তো রাত নেমে যাবে। খতরনাক জন্তু জানোয়ারে বোঝাই শাল-কেঁদের ওই বনভূমি খুবই বিপজ্জনক। তাছাড়া হুট করে এক-আধদিন খেতির কাজ ফেলে যে জঙ্গলে যাবে তার উপায়ও নেই। বারিষ নামার আগে জমি পুরো চষে ফেলতেই হবে। চুনাও বলে এখন বড়ে সরকার বা তাঁর লোকেরা খাতিরদারি করছে। কিন্তু চুনাও তো মাসভর সালভর থাকবে না। তখন?

আজ যদি সারারাত জঙ্গলে কাটাতেও হয় তাই কাটাবে ধর্মা। মোট কথা, দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ের ওই বনভূমি তোলপাড় করে চিতার বাচ্চা তাকে আনতেই হবে।

আগের দু দিনের মতো আজও দুপুরবেলা ঘুম ভাঙল ধর্মার। তবে মা-বাপ এখনও ঘুমোচ্ছে। তাদের না জাগিয়ে গতকাল এবং পরশুর মতো চান করে টাঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ধর্মা। কুশী রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। ছায়ার মতো মেয়েটা তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে।

হাইওয়ে থেকে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাত ধরে চলতে চলতে হঠাৎ ধর্মাদের চোখে পড়ে, ধুলো উড়িয়ে বড়ে সরকারের ছাদখোলা প্রকাণ্ড মোটরটা বিজুরি তালুকের দিক থেকে আসছে। কৌতূহলের বশে ধর্মা আর কুশী দাঁড়িয়ে যায়।

মোটরটা যখন কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন দেখা যায় সেটার ভেতরে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের পাশাপাশি বিজুরি তালুকের মালিক মিশিরলালজি এবং তাঁদের আরো কয়েকজন প্যারা দোস্ত বসে আছেন। ধর্মারা বুঝতে পারে, মিশিরলালজিদের আনবার জন্যই রঘুনাথ সিং বিজুরি তালুকে গিয়েছিলেন। ধর্মারা যা জানে না তা এইরকম। রঘুনাথ সিংয়ের নির্বাচনী এলাকা গারুদিয়া এবং বিজুরি — এই দুই তালুকের ত্রিশ বত্রিশটা গ্রাম জুড়ে পড়েছে। গারুদিয়া তালুকের গাঁওবালাদের ভোট সম্পর্কে রঘুনাথ মোটামুটি দুশ্চিন্তামুক্ত। কিন্তু বিজুরির ভোট সম্বন্ধে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। তবে মিশিরলালজি যদি তাঁর হয়ে একবার আঙুল তোলেন বকরির পালের মতো ওখানকার সবাই গিয়ে ভোটের কাগজে মোহর মেরে আসবে। মিশিরলালজিকে একটু বেশি করে খুশি করার জন্য তিনি আজ তাঁকে গারুদিয়ায় তোয়াজ করে নিয়ে এসেছেন।

মিশিরলালজি সম্পর্কে এখানে কিছু বলে নেওয়া যেতে পারে। ষাটের কাছাকাছি বয়স হলেও আজ প্রচুর সাজগোজ করে এসেছেন তিনি। কাঁচা-পাকা চুল পাট করে মাথার বাঁ দিকে ফেলে রাখা হয়েছে। ডান দিকে সিঁথি। প্রচুর ভয়সা ঘি আর দুধ-মাখন-শক্কর খাওয়া শরীরে এখন মলমলের পাঞ্জাবি আর ফিনফিনে ধুতি। দু হাতে কম করে আটটা আংটি। তার মধ্যে একটা হীরে-বসানো, একটা মুক্তো-বসানো, একটা চুনি আর একটা পান্না-বসানো। তাঁর পাঞ্জাবির বোতামগুলোতেও হীরে সেট-করা, কানে সোনার মাকড়ি। পায়ে কারুকাজ-করা লখনৌর নাগরা। তবে তিনি যে ব্রাহ্মণ সেটা প্রমাণ করার জন্য কপালে এবং কানের লতিতে চন্দনের ছাপ মারা রয়েছে। মলমলের পাঞ্জাবির তলায় এক গোছা মোটা পৈতাও দেখা যাচ্ছে।

এ অঞ্চলে গারুদিয়া, বিজুরি এবং চারপাশের দশ বিশটা তালুকের সবাই তাকে বলে 'চরণ ছুঁ জমিন্দার' বা 'চরণ ছুঁ মহারাজ'। জমিদারি প্রথা উঠে গেলেও ওই নামটা মিশিরলালজির গায়ে আঠার মতো আটকে আছে।

এছাড়াও চরণ ছুঁ জমিদারের অন্য কারণে খ্যাতি আছে। চারপাশের দশ বিশটা তালুকের সব মানুষ জানে এই লোকটার ভীষণ আওরতের দোষ। রোজ রাতে একটা না একটা ছুকরিকে তাঁর কাছে যোগান দিতেই হয়। মেয়েমানুষের ব্যাপারে মিশিরলালজির বাছবিচার নেই। ওরাওঁ-সাঁওতাল, মুণ্ডা-ভূঁইহার, ধোবি-দোসাদ—জল-চল, জল-অচল অচ্ছুৎ, যা-ই হোক না, যুবতী মেয়ে পেলেই তিনি খুশি। এজন্য বিজুরি তালুকের অল্প বয়সের ছুকরিরা সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে। মিশিরলালজির লোকেরা কখন যে কাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে, কেউ জানে না। অবশ্য এজন্য তিনি আওরতদের ন্যায্য দামও দিয়ে থাকেন।

বড়ে সরকারের ছাদখোলা প্রকাণ্ড গাড়িটা সামনে দিয়ে চলে গেল। সেটা দেখতে দেখতে ধর্মা ভয়ে ভয়ে বলে, 'আওরতখোর লাকড়াটা এখানে এল কেন? আমার ডর লাগছে। হোঁশিয়ার থাকবি কুশী।'

কুশী বলে 'হাঁ হাঁ, থাকব। তুই ডরাস না। এখন চল—'

আবার হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। কিছুক্ষণ পর টাঙ্গি কাঁধে করে জঙ্গলের দিকে চলে যায় ধর্মা আর সাবুই ঘাসের বনে ঢোকে কুশী। দেখতে পায় ফাঁদের ভেতর সাত আটটা বগেড়ি পড়ে আছে।

পাখিগুলোকে ফাঁদ থেকে বার করে পায়ে দড়ি বেঁধে বালির ওপর ফেলে রাখে কুশী। তরপর নতুন করে ফাঁদ পেতে পাখিগুলো হাতে ঝুলিয়ে নেয়। এখন সে যাবে ঠিকাদারদের কাছে।

ধর্মা সঙ্গে থাকে না। তাই আজকাল আর বালি খুঁড়ে পয়সার কৌটো বার করে মাস্টারজির কাছে গোনাতে যায় না কুশী। একলা মেয়ে সে, কেউ তাকে মেরেধরে কৌটোটা লুটে নিতে পারে। দুনিয়ায় বদমাস দুশমনের অভাব নেই।

ঠিকাদারদের কাছে বগেড়ি বেচে যে ক'টা পয়সা পাওয়া যায় তা ইদানীং নিজের ঘরে নিয়ে লুকিয়ে রাখে কুশী। ধর্মা জঙ্গল থেকে চিতার বাচ্চা ধরে আনার পর পয়সাগুলো তার হতে তুলে দেবে।

ঠিকাদারদের কাছে বগেড়ি বেচে আজ আড়াইটা টাকা পাওয়া গেল। পেটের কাছের শাড়িতে টাকাটা গিঁট দিয়ে বেঁধে গুঁজে রাখল কুশী। তারপর যখন নিজেদের মহল্লায় ফিরে এল, বিকেল হয়ে গেছে।

দোসাদদের পাড়ায়, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে সাজগোজের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে এর মধ্যে। সন্ধে হলেই তারা নৌটঙ্কী শুনতে যাবে।

গরিবের চাইতেও গরিব ভূমিদাস অচ্ছুৎদের ঘরে সাজসজ্জার কী উপকরণই বা থাকতে পারে! সাজি-মাটি দিয়ে চুল ঘষে, ক্ষারে-কাচা শাড়ি-জামা পরে, চোখে ঘরে-পাতা কাজল টেনে, চুলে ফুল গুঁজে নেওয়া -- এই তো সাজের বহর। এটুকুর জন্যই বিকেল থেকে তারা হাত-আয়না, কাকুই আর ধোয়া শাড়ি-জামা নিয়ে বসে গেছে।

কুশী আসতেই তাদের উলটোদিকের বারান্দা থেকে গিধনী চেঁচিয়ে উঠল, 'তুরন্ত সেজে নে, সূরয ডুবতে বসেছে।'

কুশী বলে, 'এখনও অনেক বেলা আছে। নওটঙ্কী শুরু হবে তো আন্ধেরা নামার পর।'

কুশী নিজেদের ঘরে ঢুকে কোমরের গিঁট খুলে সেই আড়াই টাকা বার করে বালিশের খোলের ভেতর পুরে রাখল। তারপর বাইরের বারান্দায় এসে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল। সেই দুপুর থেকে ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাথায় নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে একবার সাবুই ঘাসের জঙ্গলে গেছে সে; সেখান থেকে ঠিকাদারদের কাছে। তারপর ঘরে ফিরেছে। এখন খানিকটা না জিরিয়ে নিলে এক পাও হাঁটতে পারবে না।

দোসাদটোলার যুবতী মেয়েরা সবাই দল বেঁধে রোজ নৌটঙ্কী দেখতে যায়। তাদের ভয়, দেরি করে গেলে আসরের সামনের দিকে জায়গা পাওয়া যাবে না। সূর্য ডুববার অনেক আগেই এ-গাঁও সে-গাঁও থেকে গাদা গাদা লোক এসে ভাল ভাল জায়গাগুলো দখল করে বসে থাকবে। তাই সকলেরই আগে যাবার গরজ।

এধার ওধার থেকে গিধনী, কুঁদরী, তিসি, মুংলী, সোমবারীরা তাড়া লাগায়, 'অ্যাই কুশী ওঠ না, তাড়াতাড়ি কর। দেরি করে গেলে শামিয়ানার বাইরে বসতে হবে। আসলে কেউ কুশীকে ফেলে যেতে চায় না।

কুশী বলে, 'উঠছি উঠছি। আরেকটু জিরিয়ে নিই।'

কুঁদরীরা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেইসময় ঝুম ঝুম আওয়াজ কানে আসে। কুশীরা দেখল, সামনের কাঁকুরে মাঠের ওপর দিয়ে দুটো ফিটন গাড়ি ছুটে আসছে। ঘোড়ার গলায় ঘুণ্টি বাঁধা। তাই ওইরকম শব্দ হচ্ছে।

দূর থেকে দেখামাত্র কুশীরা চিনতে পারল — বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের ঘোড়ার গাড়ি। কিন্তু ফিটন দুটো এখানে এল কেন? বড়ে সরকারের ঘোড়ার গাড়ি তো কখনও এদিকে আসে না। বিমূঢ়ের মতো সবাই তাকিয়ে থাকে।

কাছাকাছি এসে ফিটন দুটো দাঁড়িয়ে গেল। আর সামনের গাড়িটা থেকে নেমে এল বগুলা ভকত রামলছমন।

দোসাদটোলার লোকজন অবাক। চোখের পলকে বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে ভেতরে ঢুকে পড়েছে রামলছমন। তাকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ায়।

রামলছমন বড় বড় ট্যারাবাঁকা দাঁত বার করে বলে, 'সবাই শোন, আজ তোদের ছুটির শেষ দিন। বড়ে সরকার খুশি হয়ে তোদের নওটঙ্কীর আসরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনা হাতে বড়ে সরকার তোদের মরদদের ধোতিকুর্তা আর অওরতদের শাড়ি-জামা দেবেন।'

বলে কি বগুলা ভকত! ক' দিন ধরে এসব কী হচ্ছে! রাতারাতি তাদের ভাগ্য কি নতুন করে ফিরে গেল!

ভিড়ের ভেতর থেকে বুধেরি ভয়ে ভয়ে, খানিকটা অবিশ্বাসের গলায় জিজ্ঞেস করে, 'সচমুচ দেওতা?'

'সচমুচ না তো ঝুট নাকি? দেখবি?' বলেই সামনের ফিটনটার দিকে দৌড়ে যায় রামলছমন। ভেতর থেকে চারটে চটকদার রঙিন শাড়ি এনে ফের শুরু করে, 'তোদের বিশোয়াসের জন্যে এগুলো নিয়ে এসেছি। সমঝা?'

বিহ্বলের মতো সবাই শাড়ি ব্লাউজগুলো দেখতে লাগল। এরপর তারা যে কী বলবে, ভেবে উঠতে পারছিল না।

রামলছমন এবার এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড করে বসে। একটা করে শাড়ি আব জামা গিধনী, কুশী, সোমবারী আর তিসির দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে বলে, 'যা, তুরন্ত পরে আয়। ফিটনে তো বেশি লোকের জায়গা হবে না। আগে তোদের বড়ে সরকারের মকানে রেখে আসি। তারপর এসে এক এক করে সবাইকে নিয়ে যাব।'

দামি শাড়ি-জামা পেয়ে যুবতী দুসাদিনরা একেবারে ডগমগ। চুনাওর কল্যাণে ঝকঝকে হাওয়া

গাড়িতে সেদিন চড়িয়েছিলেন প্রতিভা সহায়। সেটা বাদ দিলে যারা চোদ্দ পুরুষে কোনোদিন ভাল গাড়িতে চড়েনি তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য বড়ে সরকার তেজী ঘোড়ায়-টানা ঝকঝকে ফিটন পাঠিয়ে দিয়েছেন। অল্পবয়সী সরল গরিব মেয়েগুলো একেবারে দিশেহারা হয়ে যায়। কোনো চিন্তা ভাবনা না করেই নতুন শাড়ি-জামা বুকে চেপে দৌড়ে ঘরের ভেতর চলে যায়। কিছুক্ষণ পর যখন বেরিয়ে আসে তাদের আর চেনাই যায় না।

বগুলা ভকত রামলছমন চোখ গোল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর লুব্ধ গলায় বলে, 'তোদের যা দেখাচ্ছে না — বিলকুল স্বরগকা পরী য্যায়সা। কা খুবসুরত!' বলেই তাড়া লাগায়, 'চল চল, তুরন্ত গাড়িতে উঠে পড়।'

গিধনী কুশী সোমবারী আর তিসি দৌড়ে গিয়ে ফিটনে ওঠে।

রামলছমন দোসাদপাড়ার বাদবাকি লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোরা কোথাও যাস না, আমি আবার ফিটন নিয়ে আসছি।' বলতে বলতে লাফ দিয়ে সামনের গাড়িটায় উঠে কোচোয়ানের পাশে গিয়ে বসতে বসতে বলে, 'হাঁকাও গাড়ি—'

বহুদর্শী গণেরি এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। তবে তীক্ষ্ণ চোখে রামলছমনের কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছিল। আচমকা তার কী যেন মনে পড়ে যেতে জোরে জোরে পা ফেলে ফিটনটার দিকে এগিয়ে যায়। ডাকে, 'বরাম্ভনজি—'

ফিটন ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে। ঘাড় ফিরিয়ে রামলছমন, বলে, 'কা—'

'আমাকে ওই লেড়কীদের সাথ নিয়ে চলুন—'

'তু পিছা যায়েগা।'

'মগর—'

'ডরো মাত। বড়ে সরকার যেতে বলেছেন, ডরের কী? বড়ে সরকার সব কোঈকা মা-বাপ।'

গণেরি আবার কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ততক্ষণে ফিটন দুটো ঝড়ের গতিতে প্রায় উড়েই হাইওয়েতে গিয়ে ওঠে। এতদূর থেকে গলা ফাটিয়ে ফেললেও তার কথা রামলছমন শুনতে পাবে না।

মেয়ে চারটেকে এভাবে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কী যেন আছে! ঠিক কী আছে, বুঝতে পারছে না গণেরি। তবে তার মনে খিঁচ লাগার মতো কিছু একটু লেগে থাকে।

কুশীদের নিয়ে ফিটন দুটো চলে যাওয়ার পর অনেকটা সময় কেটে গেছে। ভূমিদাসদের মহল্লায় সবাই উন্মুখ হয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে — কখন রামলছমন আসবে, কখন ঘোড়ার গাড়িতে তুলে তাদের সবাইকে নৌটঙ্কীর আসরে নিয়ে যাবে।

কিন্তু নৌটঙ্কী নিয়ে গণেরির দুর্ভাবনা নেই। নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে গালে হাত দিয়ে অনবরত সে ভেবে চলেছে, রামলছমন এভাবে মেয়েগুলোকে নিয়ে গেল কেন?

দেখতে দেখতে সন্ধে নেমে আসে। ক্রমশ রাত বাড়তে থাকে। কিন্তু না দেখা যায় রামলছমনকে, না তার ফিটন দুটোকে।

অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই সবাই নৌটঙ্কী শুনতে বেরিয়ে পড়ে।

রঘুনাথ সিংয়ের হাভেলিতে বিশাল শামিয়ানার তলায় এসে দোসাদপাড়ার লোকজন ঠাসাঠাসি ভিড়ের ভেতর জায়গা করে বসে পড়ে। আপাতত গান শোনা যাক। পরে নয়া জামা-কাপড়ের জন্য রামলছমনকে ধরা যাবে। কিন্তু গণেরির দুশ্চিন্তা কাটে না। সে চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল কিন্তু আসরের কোথাও রামলছমন কিংবা কুশীদের দেখা যাচ্ছে না। ভয়ে ভাবনায় তার রক্ত যেন জমাট বেঁধে যেতে থাকে। তাদেরই তো মেয়ে ওরা। দোসাদটোলার সবাই তাকে মুরুব্বি বলে মানে। গণেরির একটা নৈতিক দায়িত্ব তো আছে। কিন্তু গেল কোথায় ওরা?

হঠাৎ গণেরির চোখে পড়ে নৌটঙ্কীর আসরের একেবারে ধার ঘেঁষে গদি আর মখমল মোড়া দুটো সিংহাসনে পাসাপাশি বসে আছেন বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং আর বিজুরি তালুকের মিশিরলালজি।

মিশিরলালজিকে দেখামাত্র বুকের ভেতর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় গণেরির। আওরতখোর, চরণ ছুঁ

জমিন্দার এখানে কেন? গারুদিয়া তালুকে মিশিরলালজির নৌটঙ্কী শুনতে আসার সঙ্গে কুশীদের ফিটনে করে নিয়ে যাওযার কোনোরকম সম্পর্ক আছে কি?

একসময় গান শুরু হয়ে যায়। আজ উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুর আর আজমগড় থেকে সেরা নৌটঙ্কীর দল আনিয়েছেন রঘুনাথ সিং।

মীর্জাপুরের দলটা এখন গাইতে শুরু করেছে :

দধিয়া ক্যায়সে রে মথু
কানহা ধাইলে রে মনথনিয়া
অভন ডোলে, পবন ডোলে
আউর ডোলে সারি দুনিয়া
শেষনাগকা মস্তক ডোলে
নাগিনকে রে নাথুনিয়া
তবলা বোলে ঢোলক বোলে
আউর বাজে হারমুনিয়া—
শ্রীকিষুণকি মুরলা বোলে
রাধাকে হো পায়জুনিয়া
দধিয়া ক্যায়সে রে মথু—

কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই গণেরির। শামিয়ানার ধার দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মিশরলালজির ওপর সে নজর রাখতে লাগল।

গান যখন জমে উঠেছে সেই সময় আচমকা উঠে পড়লেন রঘুনাথ সিং আর মিশিরলালজি। লোকজন সরে সরে তাঁদের বেরুবার রাস্তা করে দিল।

গণেরি দাঁড়িয়ে ছিল অনেকটা দুরে — শামিয়ানার আরেক মাথায়। আচমকা বিজুরি চমকানোর মতো একটা ভাবনা তার মাথার ভেতর দিয়ে খেলে যায়। শামিয়ানার বাইরে দিয়ে সে রুদ্ধশ্বাসে ছোটে। রঘুনাথ সিংরা যেদিকে ছিলেন অনেকটা ঘুরে যখন সে পৌঁছয়, যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। রঘুনাথ সিং আর মিশিরলালজিকে নিয়ে পুরনো আমলের একটা হুডখোলা মোটর তখন হুস করে তার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

তেত্রিশ

বিকেলবেলা রামলছমন যখন ফিটন নিয়ে ভূমিদাসদের পাড়ায় এসেছিল, সেই সময় শাল-কেঁদের জঙ্গলে কাঁধে টাঙ্গি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধর্মা।

দুপুরের কিছু আগে আগে বনভূমিতে ঢুকেছিল সে। সেই থেকে অনবরত ঘুরেই চলেছে।

ঘুরতে ঘুরতে ঘন জঙ্গলের মাথার রোদের রং বদলে যখন হলুদ হয়ে যেতে শুরু করেছে সেই মুহূর্তে তিনটে চিতার বাচ্চা তার চোখে পড়ল। দক্ষিণ কোয়েলের খাত থেকে একটা সরু স্রোত জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেছে। অনেকটা নহরের মতো। নানা গাছের ডালপালা স্রোতটার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। জঙ্গল অবশ্য এখানে খুব ঘন নয়। বেশ পাতলাই। শাল কি কেঁদ কি কড়াইয়া গাছগুলো ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একটা পিপর গাছের তলায় জলের ধার ঘেঁষে চিতার বাচ্চা তিনটে খেলা করছে।

দেখতে দেখতে ধর্মার চোখ ঝকমকিয়ে উঠল। পুরো তিনটে দিন সে এখানে ঘুরছে। তার আগেও কয়েকটা দিন খেতিতে কাজকর্ম চুকিয়ে জঙ্গলে ঘুরে গেছে। কিন্তু চিতা দূরের কথা, তার গায়ের একটা ফুটকিও চোখে পড়েনি। আশেপাশে বাচ্চা তিনটের বাপ-মা নেই। এমন অরক্ষিত অবস্থায় চিতার ছানা যে পাওয়া যাবে, ভাবতে পারেনি ধর্মা। তাড়াহুড়ো না করে ধীরে সুস্থে সে পিপর গাছটার দিকে এগুতে লাগল। যখন ধর্মা বাচ্চাগুলোর কাছাকাছি এসে পড়েছে সেই মুহূর্তে সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে গর্জন উঠল।

চমকে বাঁ দিকে তাকায় ধর্মা। একটা ঝাঁকড়ামতো ঝোপের পাশ থেকে একটা চিতা বাঘিন গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসছে। তার চোখদুটো জ্বলছে। ধারাল দাঁতগুলো বার করে পায়ে পায়ে এগুচ্ছে জানোয়ারটা। গলার ভেতর থেকে গর-র-র, গর-র-র করে হিংস্র আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

চিতার বাচ্চাগুলোকে যত সহজে তুলে নেওয়া যাবে ভাবা গিয়েছিল, ব্যাপারটা তত সোজা না। কাঁধ থেকে টাঙ্গিটা নামিয়ে ধর্মা সতর্ক ভঙ্গিতে একটু তেরছা হয়ে দাঁড়ায়। ওদিকে চোখের পলক পড়তে না পড়তেই বাঘিনটা হাওয়ায় ভর করে উড়ে এল যেন। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা সরে গিয়ে শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে ঘাড়ের কাছে কোপ মারে ধর্মা।

বাঘিনটার গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে আর জন্তুটা ছিটকে গিয়ে পড়ে হাত দশেক তফাতে, পড়েই বনভূমিকে চমকে দিয়ে গর্জে ওঠে।

কয়েক পলক মাটিতে পড়ে থাকে বাঘিনটা। তারপর উঠেই আবার ধর্মার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টাঙ্গির ঘা খেয়ে জন্তুটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

ধর্মা এবারও আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল। বাঘিনটার মুখে টাঙ্গির ঘা মারল সে। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা রক্তাক্ত হয়ে গেল সেটার। তবে নিজেকে পুরোটা বাঁচাতে পারল না ধর্মা। বাঘিনীটার সামনের দিকের একটা থাবা লেগে তার কাঁধের খানিকটা মাংস উপড়ে গেল।

ওদিকে দ্বিতীয় কোপটা খেয়ে বাঘিনটা খানিকটা দমে গেল বোধহয়। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে খানিকক্ষণ গড়াগড়ি দিয়েই দূরে ঘন জঙ্গলের দিকে দৌড়ল।

ধর্মা তারপরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু না, বাঘিনটার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

খুব সম্ভব পর পর দুটো মারাত্মক ঘা খেয়ে জানোয়ারটা পালিয়ে গেছে। এদিকে জঙ্গলের মাথার ওপর রোদ নিভু নিভু হয়ে আসতে শুরু করেছে। বনভূমির ভেতরটা আরো ছায়াছন্ন হয়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকার নামার আগে এখান থেকে বেরিয়ে যেতেই হবে। ওই বাঘিনটা ছাড়াও জঙ্গলে আরো অগুনতি হিংস্র জানোয়ার রয়েছে। বেকায়দায় পেলে ধর্মাকে তারা ছাড়বে না।

ধর্মা আর দেরি করে না। চিতার বাচ্চা তিনটেকে কোলে তুলে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে যায়।

খানিকটা যাওয়ার পরই ডান দিক থেকে গর-র-র আওয়াজ আসতে লাগল। চমকে ঘাড় ফেরাতেই ধর্মা দেখতে পায়, খানিকটা দূরে কেঁদ গাছের আড়াল দিয়ে বাঘিনটা তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। জানোয়ারটা তা হলে পালায় নি।

ধর্মা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখে, বাঘিনটাও দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাচ্চা তিনটেকে নিয়ে এই বনভূমির বাইরে ধর্মাকে সে যেতে দেবে না।

মনে মনে ধর্মা ঠিক করে ফেলে, জঙ্গল যেখানে বেশি ঘন সেখান দিয়ে যাবে না। গাছপালা যেখানে পাতলা সেখানে দিয়ে যাওয়াই নিরাপদ। কেননা ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর জখমী বাঘিনের ওপর লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়।

মোটামুটি ফাঁকা জায়গা দেখে দেখে এগুতে থাকে ধর্মা। বাঘিনটাও দূরে দূরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দিয়ে চলেছে। তার ক্রুদ্ধ গর-র-র, গর-র-র গর্জন এই অরণ্যকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

অনেকটা ফাঁকা জায়গা পেরুবার পর ফের জঙ্গল ঘন হয়ে আসে। খুব সাবধানে চারদিকে নজর রাখতে রাখতে ধর্মা চলেছে। হঠাৎ মাথার ওপর গর্জন শোনা গেল। বাচ্চাগুলো কোল থেকে নামিয়ে টাঙ্গি বাগিয়ে ধরতেই বাঘিনটা উঁচু গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ল। এক থাবায় ধর্মার বুকের খানিকটা মাংস এবার ছিঁড়ে নিল জানোয়ারটা। রক্তে গোটা শরীর ভিজে যেতে লাগল তার। আর এরই মধ্যে দ্রুত কোমর থেকে ছুরি বার করে বাঘিনটার পেটে আমূল ফলাটা বসিয়ে দেয় ধর্মা। যন্ত্রণায় জানোয়ারটা চিৎকার করে দৌড় লাগায়।

ধর্মা অপেক্ষা করল না। বাচ্চা তিনটেকে ফের কোলে তুলে নিয়ে জোরে জোরে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটতে লাগল। এই নিবিড় জঙ্গলে দৌড়নো অসম্ভব।

ছুরির ঘা খাওয়ার পরও বাঘিনটা যে পিছু ছাড়েনি, একটু পরেই টের পাওয়া যায়। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে এবং মাথার ওপর — সব দিক থেকে তার গর-র-র, গর-র-র আওয়াজ শোনা যেতে

থাকে।

এদিকে শেষবেলার নিভু নিভু আলোটুকু জঙ্গলের মাথা থেকে একটানে কেউ সরিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে বনভূমিতে ঝপ করে সন্ধে নেমে আসে।

সতর্ক ভঙ্গিতে জঙ্গলটা পার হয়ে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের বালির ডাঙায় এসে পড়ে ধর্মা। এখানে অন্ধকারটা বনভূমির ভেতরকার মতো অত ঘন নয়।

হঠাৎ সে দেখল, খানিকটা দূরে সেই বাঘিনটা আস্তে আস্তে পা ফেলে আসছে। অর্থাৎ জানোয়ারটা তাকে কিছুতেই ছাড়বে না।

গা থেকে অনেকটা টাটকা রক্ত বেরিয়ে গেছে। মাথা ঝিম ঝিম করছিল ধর্মার। বাঘিনটার সঙ্গে লড়াই করার ইচ্ছে তার আর নেই। জানেয়ারটাকে পাশ কাটিয়ে কোনোরকমে হাইওয়েতে যেতে পারলেই হয়। ওখানে মানুষজন, গাড়িঘোড়া রয়েছে। বাঘিনটা হাইওয়েতে যেতে সাহস করবে না।

এবার লুকোচুরি শুরু করে ধর্মা। নদীর মরা খাত ধরে সোজা না গিয়ে কখনও অনেকখানি ডাইনে যায় সে, কখনও অনেকখানি বাঁয়ে। বাঘিনটা খুব সম্ভব তার মতলব বুঝতে পেরেছে। সে-ও খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে।

সাবুই ঘাসের জঙ্গলটার কাছাকাছি আসার পর হঠাৎ কী যেন হয়ে যায় বাঘিনটার। আর দূরে দূরে না, একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। হয়ত জানোয়ারটা বুঝতে পেরেছে আর দেরি করা ঠিক নয়, সামনের দিকে খানিকটা যেতে পারলেই ধর্মা বাচ্চাগুলোকে নিয়ে তার হাতের বাইরে চলে যাবে।

ধর্মাও বুঝতে পারছিল বাঘিনটার সঙ্গে যুদ্ধ না করে তার বাচ্চা তিনটেকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। একবার সে ভাবল, মায়ের ছানা মায়ের কাছেই ফেরত দেবে। পরক্ষণেই মনে পড়ল, এই বাচ্চাগুলোর ওপর তাদের এবং কুশীদের স্বাধীনতা নির্ভর করছে। বাচ্চাগুলো তাদের ছ ছ'জন মানুষের মুক্তির দাম। সে ঠিক করে ফেলল, লড়াই-ই করবে। বাচ্চাগুলোকে বালির ডাঙায় নামিয়ে রেখে ধর্মা টাঙ্গি উঁচিয়ে দাঁড়াল। বাঘিনটাও ওৎ পেতেই রয়েছে।

দেখতে দেখতে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতটা পৃথিবীর আদিম রণভূমি হয়ে উঠল। ঘণ্টা তিনেক পর দেখা যায়, বাঘিনটা বালির ডাঙার ওপর মরে পড়ে আছে। আর রক্তাক্ত ধর্মা মড়ার মতো ঘাড় গুঁজে রয়েছে। তির তির করে নাকের ভেতর দিয়ে একটু একটু নিঃশ্বাস পড়ছে তার।

অনেকক্ষণ ওভাবে পড়ে থাকার পর একসময় উঠে বসে ধর্মা। চিতার বাচ্চাগুলো একধারে শুয়ে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সেগুলোকে তুলে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে হাইওয়েতে চলে এল ধর্মা।

এখন মাঝরাত। চারদিকের সীমাহীন শস্যক্ষেত্র জুড়ে আশ্চর্য নিশুতি। হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে ধর্মা ভাবল দোসাদটোলায় ফিরে যাবে। পরমুহূর্তেই মনে পড়ল, সেখানে এখন কেউ নেই। সবাই নৌটঙ্কী শুনতে চলে গেছে। সে ঠিক করে ফেলল, সিধা রাঁচী চলে যাবে। এই সময়টায় একটা দূর পাল্লার বাস পাটনা থেকে রাঁচীর দিকে যায়। আগে দু-একবার হরিণের শিং কি বাঘছাল নিয়ে ধর্মা এই বাসে রাঁচী গেছে। টিরকের কাছে মাল 'ডিলভারি' দিয়ে দাম টাম নিয়ে ভোরের বাস ধরে ফিরে এসে জমি চষতে নেমেছে।

কোমরে প্যান্টের পটির ভেতর সবসময় দু-চারটে টাকা থাকে তার। কাজেই ভাড়ার জন্য চিন্তা নেই। একমাত্র অসুবিধা নিজের জখমী চেহারা। আঁচড় কামড়ে বাঘিনটা তার হাল 'বুরা' করে দিয়েছে। জামা-প্যান্ট ছিঁড়েটিড়ে গেছে। কিন্তু কী আর করা যাবে।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। একটু পরেই রাঁচীর বাস এসে ধর্মাকে তুলে নিয়ে গেল।

শেষ রাতে রাঁচীর হোটেলে গিয়ে টিরকেকে জাগায় ধর্মা। তার অবস্থা দেখে টিরকে ভয় পেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি হোটেল-এর মেডিক্যাল অফিসারের ঘুম ভাঙিয়ে ধর্মার হাতে-পায়ে-বুকে ব্যান্ডেজ করিয়ে দেয়। তারপর তাকে নিয়ে যায় আমরিকী সাহেবের কাছে। সাহেব সব দেখেশুনে এবং দুটোর জায়গায় তিনটে চিতার বাচ্চা পাওয়ায় দারুণ খুশি হয়ে ধর্মাকে দুশ টাকা বখশিসও করে। টিরকে কথামতো দাম আগেই চুকিয়ে দিয়েছিল।

চৌত্রিশ

দামটাম বুঝে ধর্মা যখন ফেরার বাস ধরল, তখনও অন্ধকার রয়েছে। গারুদিয়া তালুকে এসে হাইওয়ের ওপর নেমে দৌড়তে দৌড়তে দোসাদপাড়ার দিকে ছুটল সে। আজ সে ছ'জন মানুষের মুক্তি কিনে আনতে পারবে। জীবনে এত বিপুল আনন্দ কখনও তার হয়নি। আজ থেকে এই পৃথিবীতে সে আর কারুর ভূমিদাস নয়, এক মহিমান্বিত স্বাধীন মানুষ। প্রায় অর্ধেক রাত বাঘিনীর সঙ্গে লড়াই করে সে স্বাধীনতার দাম নিয়ে এসেছে।

দোসাদটোলায় ধর্মা ওখন পৌঁছুল, বিরাট সোনার থালার মতো সূর্যটা আকাশের তলা থেকে উঠে আসছে।

মহল্লায় পা দিয়েই সে থমকে গেল। কুশী গিধনী সোমবারী আর তিসিদের ঘরের সামনে গোটা পাড়া জড়ো হয়েছে। ওদের চার মা আর চার বাপ কপাল চাপড়ে সমানে ডুকরে কেঁদে চলেছে। বাকি সবাই শোকাচ্ছন্ন বিষাদ-মাখা মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটু দূরে আধবুড়ো মুরুব্বি গণেরি মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

ধর্মার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এক রাত সে এখানে ছিল না। তার ভেতর কেউ কি মরে গেল? আস্তে আস্তে ধর্মা গণেরির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, জিজ্ঞেস করে, 'কা হুয়া চাচা?'

'সব খতম—' বলে একটু থেমে গণেরি ভাঙা ভাঙা গলায় যা বলে তা এইরকম। কাল বিকেলে ধোঁকা দিয়ে মহল্লার চারটে মেয়েকে রামলছমন নিয়ে গিয়েছিল। তাদের শেষ পর্যন্ত তুলে দেওয়া হয় মিশিরলালজির হাতে। সারা রাত আটকে রাখার পর খানিকক্ষণ আগে তাদেব পৌঁছে দিয়ে গেছে বড়ে সরকারের পহেলবানেরা।

শুনতে শুনতে হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে যেতে থাকে ধর্মার। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। টলতে টলতে বসে পড়ল।

সেদিনই দুপুরের দিকে মুনশি আজীবচাঁদের সঙ্গে দেখা করে ধর্মা। সর্বনাশ যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। গারুদিয়া তালুকে সে আর একটা দিনও থাকবে না। পূর্বপুরুষের 'করজে'র টাকা শোধ করে কুশীদের নিয়ে গারুদিয়া তালুক ছেড়ে চলে যাবে।

আজীবচাঁদ জিজ্ঞেস করে, 'কি রে, কী খবর? তোর হাল এরকম হল কী করে?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ধর্মা বলে, 'আমাদের 'করজে'র কাগজ দিয়ে দিন। রুপাইয়া শোধ করে এখান থেকে চলে যাব।'

আজীবচাঁদ খাড়া হয়ে বসে। চশমার ফাঁক দিয়ে ধর্মাকে দেখতে দেখতে বলে, 'রুপাইয়া শোধ দিবি! পেলি কোথায়! চোরি করেছিস, না ডাকাইতি?'

'যাই কবি, আপনাদের রুপাইয়া নিয়ে নিন।'

'কত রুপাইয়া হুঁশ আছে?'

'আছে। কুশীদের আর আমাদেব মিলে দো হাজাব —'ধর্মা বলে। সঙ্গে কবে পুরো টাকাটাই নিয়ে এসেছে সে। আসার আগে মাস্টারজিকে দিয়ে গুনিয়ে নিয়েছে।

আলমারি থেকে কী একটা কাগজ বার কবে দেখতে দেখতে আজীবচাঁদ বলে, 'দো হাজাব তোকে কে বলল? পুরা পাঁচ হাজার।'

ধর্মার মাথার ভেতরটা প্রচণ্ড শব্দ করে যেন চৌচির হয়ে যেতে থাকে। কাঁপা গলায় সে বলে, 'আগে যতবার আপনাকে পুছেছি বলেছেন দো হাজার। এখন বলেছেন পাঁচ হাজার!'

'ঝুট! কক্ষনো তোকে দো হাজার বলি নি। যা, ভাগ। আমাব জরুবি কাম আছে।'

রাগে ধর্মার গায়েব বক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। হাতেব কাছে টাঙ্গিটা থাকলে সে আজীবচাঁদের ঘাড়ে হয়ত বসিয়ে দিত। আজীবচাঁদ জানে না, এই মুহূর্তে একটা পরাধীন ভূমিদাসের বুকে কতখানি বিস্ফোরকের সৃষ্টি করল সে।

প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে আসে ধর্মা।

পঁয়ত্রিশ

সুতরাং বাপ-ঠাকুর্দার এবং তাদের বাপ-ঠাকুর্দার মতো আবার হাল-বয়েল নিয়ে বড়ে সরকার রঘুনাথ সিংয়ের জমিতে নামে ধর্মা। লাঙলের ফলায় ফলায় পাথুরে মাটি উপড়ে ফেলতে থাকে। তার পেছন পেছন আগাছা বাছতে বাছতে কুশীও অনবরত দৌড়ুতে থাকে।

এরই মধ্যে একদিন গারুদিয়া আর বিজুরি তালুকে ভোট হয়ে গেল। ভূমিদাসদের পাড়ার চার ঘর আর গণেরিরা বাদে বাকি সবাই লাইন দিয়ে চুনাওর কাগজে মোহর মেরে এল।

পাঁচ ঘরের ভোট না পড়াতে কিছুই যায়-আসে নি। রঘুনাথ সিং শেষ পর্যন্ত সুখন রবিদাস আর প্রতিভা সহায়কে হারিয়ে জিতে গেলেন।

জেতার পর তাঁকে ঘিরে নতুন করে অকালে ফাগোয়া শুরু হল। আবির আর গুলালে গোটা গারুদিয়ার আকাশ বাতাস লাল হয়ে যেতে লাগল। গলায় গোছা গোছা মালা পরে একটা জিপে উঠে হাতজোড় করে গাঁওয়ের পর গাঁওয়ে ঘুরতে লাগলেন বড়ে সরকার রঘুনাথ সিং। যারা তাঁকে ভোট দিয়েছে তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে বেরিয়েছেন। তাঁর চুনাও কর্মীরা 'রঘুনাথ সিং অমর রহে—' করে করে আকাশ ফাটিয়ে ফেলছে। আর পা-চাটা কুত্তারা 'হোয় হোয়, রামরাজ আ গিয়া রে' করতে করতে গলায় রক্ত ওঠাচ্ছে।

ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত ভূমিদাসদের পাড়ায় এলেন রঘুনাথ সিং। ভোটের রেজাল্ট বেরুবার পর তিনি আজ লাঙল চষা থেকে ছুটি দিয়েছেন ওদের।

রঘুনাথ সিং জিপে দাঁড়িয়েই বললেন, 'তোদের জন্যেই আমি জিততে পারলাম। তোদের কী বলে যে ধন্যবাদ দেব! আর দেবই বা কেন? আমি তো তোদেরই একজন— তোদেরই লোক। তোদের ভালাইর—'

ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল ধর্মা আর দেখছিল। রঘুনাথ সিংয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই চিৎকার করে উঠল, 'ঝুট ঝুট ঝুট। তু হামনিকো আদমী নেহী। তুই আমাদের লোক না, আমাদের লোক না, আমাদের লোক না—'

আচমকা বাজ পড়লেও কেউ এত চমকাতো না। মুহূর্তে সমস্ত এলাকাটা স্তব্ধ হয়ে যায়। আর তার মধ্যেই বিস্ফোরণের মতো গারুদিয়া-বিজুরির সীমাহীন মাঠ প্রান্তরের ওপর দিয়ে ধর্মার কণ্ঠস্বর চারদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে, 'তুই আমাদের লোক না, তুই আমাদের লোক না—'

এই একটা কথা উচ্চারণ করতে বেশ কয়েক পুরুষ আর কয়েক'শ বছর কেটে গেছে তাদের।

দায়বদ্ধ

সবে অঘুন বা অঘ্রাণ মাসের শুরু। এর মধ্যেই উত্তর বিহারের এই অঞ্চলটায় শীত পড়ে গেছে। বাতাসে এখন ছুরির ধার। হিমালয় এখান থেকে খুব দূরে নয়। তার বরফ সারা গায়ে মেখে উত্তুরে হাওয়া উলটোপালটা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে।

এখনও ভাল করে ভোর হয় নি। গাঢ় কুয়াশা এবং অন্ধকারে চরাচর আচ্ছন্ন। চারদিক ঘুমের আরকে ডুবে আছে যেন।

উত্তর বিহারের এক প্রান্তে ধুরুয়া গাঁ। তার শেষ মাথায় অচ্ছুৎটুলি। এখানকার বাসিন্দারা গঞ্জু দোসাদ তাতমা বা গাঙ্গোতা জাতের মানুষ। জাতওয়ারি সওয়াল বা জাতপাতের বিচারে এরা সবাই জল-অচল। এদের ছায়া মাড়ালেও নাকি উচ্চবর্ণের বামহন কায়াথদের দশ বার স্নান করে শুধ্ (শুদ্ধ) হতে হয়।

অচ্ছুৎটুলির বাসিন্দাদের সবাই বড় জমি-মালিক রাজপুত চন্দ্রিকা সিংয়ের বান্ধুয়া কিষান অর্থাৎ ভূমিদাস। বাপ, দাদা বা তারও আগের কারুর ঋণের দায়ে পুরুষানুক্রমে এরা চন্দ্রিকা সিংয়ের জমিতে বেগার দিয়ে যাচ্ছে। এই জনমদাসেরা যদি বিদ্রোহ করে বা বেগার না দিয়ে পালাতে চায়, সে জন্য জমি-মালিকের পোষা পহেলবানেরা তাদের কড়া নজরে রাখে। পহেলবানদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে তাদের কিছু করার উপায় নেই।

এই মুহূর্তে অচ্ছুৎটুলির একটি মানুষও জেগে নেই। শুধু কোণের দিকের একটা কোমর-বাঁকা ধসে-পড়া মাটির ঘরে লাল মিট্টি তেলের ডিবিয়া জ্বলছে। তার আলোতে দেখা যায়, চব্বিশ পঁচিশ বছরের হট্টাকট্টা এক জোয়ান ডোরা-কাটা ময়লা পাজামা, পুরনো তালিমারা জামা আর সোয়েটার পরে, সেগুলোর ওপর পোকায়-কাটা ধুসো কম্বল জড়িয়ে নিয়েছে। অঘ্রাণ মাসের মারাত্মক হিম ঠেকানোর পক্ষে এই পোশাক যথেষ্ট নয় কিন্তু কী আর কবা যাবে! তাদের মতো ভুখা গরিবদের ঘরে এর বেশি কিছু নেই।

জোয়ান ছেলেটার নাম ধনপত। তার বাপ বুধিরাম আর মা লছিয়াকেও দেখা যাচ্ছে।

মধ্যবয়সী বুধিরামের চেহারাটা ভাঙাচোরা, মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি। নিরীহ ভিতু পশুর মতো সে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে। আর লছিয়া একটা বড় কাপড়ের টুকরোয় খানকতক বাজরার রুটি, গোটা কয়েক লিট্টি, খানিকটা মকাই ভাজা, দুটো পুরনো জামা আর পাজামা সযত্নে গুছিয়ে বেঁধে দিচ্ছে। একটু দূরে দেওয়ালের গা ঘেঁষে ধনপতের তিনটে ছোট ছোট ভাইবোন কম্বল মুড়ি দিয়ে বুকের ভেতর হাঁটু গুঁজে ঘুমোচ্ছে।

বুধিরাম ভয়ে ভয়ে একসময় বলল, 'বহোত ডর লাগতা।'

ধনপত বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোঈ ডর নেহী।'

'বড়ে সরকারের পহেলবানেরা তোকে ধবতে পারলে বিলকুল খতম করে দেবে।'

'চিন্তা নায় করনা। পহেলবানেরা আমার চামড়াও ছুঁতে পারবে না।'

বুধিরামের দুর্ভাবনা এবং ভয় তবু কাটে না। সে ভীরু গলায় বলে, 'এখনও সময় আছে, ভেবে দ্যাখ যাবি কিনা।'

ধনপতের মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'আমি যাবই। জনমভর বেগার দিয়ে দিয়ে তো মরছিই। এবার কোসিস করে দেখি, বাঁচা যায় কিনা। তুমি আমার মন দুব্‌লা করে দিও না বাপু।'

ব্যাপারটা এইরকম। মা-বাপের সঙ্গে চন্দ্রিকা সিংয়ের জমিতে বেগার খাটতে খাটতে কিছুদিন হল মন বেঁকে বসেছে ধনপতের। সে খবর নিয়ে জেনেছে, বাপের দাদা চন্দ্রিকা সিংয়ের দাদার কাছ থেকে তিনশ টাকা 'করজ' নিয়েছিল। সেটা সুদে-আসলে কয়েক পুরুষে তিন হাজার টাকায় নাকি দাঁড়িয়েছে। বাপের দাদার আমলে তাদের বার বিঘা পনের ধুর জমি ছিল। ঋণের দায়ে প্রথমে সেই জমিটা চন্দ্রিকাবা কেড়ে নেয়, তাতেও ওদের পেট ভরে নি। পুরুষানুক্রমে বেগার খেটে এখন সেই টাকা শোধ

করতে হচ্ছে ধনপতদের।

শুধু ধনপতদেরই নয়, ঋণের দায়ে বা হাজারটা আছিলায় অচ্ছুৎটুলির মানুষদের যার যেটুকু জমিজমা ছিল সব দখল করে নিয়েছে চন্দ্রিকারা। 'করজে'র দায়ে সবাই এখন ভূমিদাস।

ধনপত লেখাপড়া জানে না, সামান্য অক্ষর পরিচয়টুকু পর্যন্ত তার হয় নি। সে পুরোপুরি আনপড়। লিখতে পড়তে না জানলেও তার সহজাত বুদ্ধি তাকে জানিয়ে দিয়েছে, মাত্র তিনশ টাকা 'করজে'র জন্য তিন চার পুরুষ ধরে এভাবে বেগার দিয়ে দিয়ে নিজেদের ধ্বংস করা ঠিক নয়।

সে শুনেছে শহরে গেলে প্রচুর কাজকর্ম পাওয়া যায়। সে সব জায়গায় হাওয়ায় টাকা উড়ছে। মনে মনে ধনপত ঠিকই করে ফেলেছিল, ধুরুয়া গাঁ থেকে পালিয়ে কোনো শহরে যাবে। সেখান থেকে তিন হাজার টাকা কামাই করে এনে প্রথমে চন্দ্রিকা সিংয়ের ঋণ শোধ করবে। তারপর মা-বাপ-ভাইবোনদের সঙ্গে করে আবার শহরে ফিরে যাবে। ধুরুয়া গাঁয়ের শৃঙ্খলিত ভূমিদাসের জীবন থেকে যেভাবেই হোক মুক্তি চাই।

মা-বাপকে এ সব জানাতে তারা শিউরে উঠেছিল। এখান থেকে পালাবার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়ে বুধিরাম এবং লছিয়া বলেছে, এ রকম মারাত্মক কথা ধনপত যেন ভুলেও আর না ভাবে, বাপ বা দাদার মতো যেন একই নিয়মে জীবন কাটিয়ে দেয়। রামজি কিষুণজির এরকমই ইচ্ছা, এ-ই তাদের অনিবার্য নিয়তি।

কিন্তু বাপ-মা'র কথায় আদৌ সায় ছিল না ধনপতের। মুক্তির চিন্তাটা অদৃশ্য পোকার মতো ধারাল দাঁতে অনবরত তার বুকের শিরা কেটে গেছে। সে জানিয়েছে, এভাবে চলতে পারে না, পারে না। বড়ে সরকার চন্দ্রিকা সিংরা ভূমিদাসের ওপর যেভাবে জুলুম ওঠাচ্ছে তা বন্ধ হওয়া দরকার। এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে সে মুক্তির দাম কিনে আনবে।

ছেলের জেদ দেখে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে বুধিরাম এবং লছিয়া। ঠিক হয়েছে, আজ ভোরে কাকপক্ষি চোখ মেলবার আগেই ধনপত ধুরুয়া গাঁ ছেড়ে চলে যাবে।

জামা কাপড় এবং খাবারের পুঁটলিটা বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। সেটা ধনপতের হাতে দিয়ে কাঁপা গলায় লছিয়া বলল, 'দের নায় করনা। এবার বেরিয়ে পড়। লোক জেগে গেলে মুসিবত হয়ে যাবে।'

আর দাঁড়ায় না ধনপত। মা-বাপকে আরেক বার সাহস দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বুধিরাম এবং লছিয়া তার সঙ্গে সঙ্গে সামনের কাচ্চী (কাঁচা রাস্তা) পর্যন্ত এল। তাদের পেছনে ফেলে দূরে পাকা সড়কের দিকে এগিয়ে চলল ধনপত।

খানিকটা যাওয়ার পর একবার পেছন ফিরে তাকাল সে। ঘুমন্ত অচ্ছুৎটুলির একধারে কাঁচা রাস্তার ধারে কুয়াশা এবং অন্ধকারে এখনও দাঁড়িয়ে আছে লছিয়া আর বুধিরাম। দুটো ঝাপসা মূর্তির মতো দেখাচ্ছে তাদের। বিড় বিড় করে আবছা গলায় তারা শুধু বলছে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি, তেরা কিরপা—'

কিছুক্ষণের মধ্যে ধুরুয়া গাঁ পেছনে ফেলে পাক্কীতে এসে পড়ল ধনপত। দু'ধারে আদিগন্ত ধানের খেত। ডাইনে এবং বাঁয়ে যেদিকে যতদূর চোখ যায়, সমস্ত জমিই রাজপুত চন্দ্রিকা সিংয়ের।

রাস্তাটা এখনও একেবারে ফাঁকা। ক্বচিৎ কখনো এক-আধটা 'লৌরি' বা সাহারসা-গামী দূর পাল্লার বাস পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে আবছা মতো আলো ফুটল। এখন দু পাশের ধানখেত অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। হাওয়ায় পাকা ধান লক্ষ কোটি সোনার দানার মতো দুলছে। মাঠ জুড়ে শব্দ হচ্ছে—ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন। ধনপত জানে, আর ক'দিনের মধ্যেই চন্দ্রিকা সিংয়ের জমিতে ধান কাটাই শুরু হয়ে যাবে।

এই সাতসকালে আলো চোখে লাগতেই পরদেশি শুগারা (টিয়া) ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়েছে। উড়ে উড়ে তারা গিয়ে নামছে ধানখেতে।

ধনপত ভাবছিল, সেই দশ বার বছর বয়স থেকে মা-বাপের সঙ্গে চন্দ্রিকা সিংয়ের খেতিতে ধান কেটে আসছে সে। এই প্রথম বার সে বেগার খাটবে না।

ভাবনাটা বেশিদূর এগুলো না। হঠাৎ পেছন থেকে অস্পষ্ট চিৎকার ভেসে আসে, 'হেই-হেই—'একটা গলা নয়, অনেকে একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে।

চমকে ঘাড় ফেরাতেই ধনপত দেখতে পেল, সাত আটটা লোক হাঁই হাঁই করতে করতে পাক্কীর ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে। এখনও কুয়াশা পুরোপুরি কাটে নি। তাই লোকগুলোর মুখটুখ পরিষ্কার বোঝা যায় না।

আরেকটু কাছাকাছি আসতেই চেনা গেল। চন্দ্রিকা সিংয়ের পোষা পহেলবান ওরা। সবার হাতেই মোটা মোটা ভারি লাঠি। ধনপতের মনে হয়েছিল, ধুরুয়া গাঁয়ের বিপজ্জনক সীমানা সে পেরিয়ে আসতে পেরেছে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, পহেলবানদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় নি। কিভাবে ওরা টের পেয়ে গেছে, কে জানে!

মুহূর্তের জন্য ভয়ে বুকের ভেতর শ্বাস আটকে গেল ধনপতের। মোষের মতো ওই পহেলবানগুলোর হাতে পড়লে তার হাল কী দাঁড়াবে, সেটা যেন চোখের সামনে দেখতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিজরি চমকের মতো কিছু একটা খেলে গেল। পাক্কী থেকে লাফ দিয়ে ধানখেতে নেমে সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

'হেই ভূচ্চরকা ছৌয়া, রুখ যা, রুখ যা—'চেঁচাতে চেঁচাতে পহেলবানেরাও জমিতে নেমে পড়েছে।

আশ্বিন পর্যন্ত ধানখেতে বর্ষার জল জমে ছিল। কার্তিক পড়তে না পড়তেই মাঠ শুকিয়ে একেবারে খটখটে। কখনো শক্ত আলের ওপর দিয়ে, কখনও ধানগাছের ভেতর দিয়ে, এঁকে বেঁকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ুচ্ছে ধনপত।

পহেলবানেরা পিছু ছাড়ে নি। 'রুখ যা, রুখ যা'—করতে করতে তারা সমানে তাড়া করে আসছে।

জামা-কাপড়ের পুঁটলিটার জন্য ভাল করে ছুটতে পারছিল না ধনপত। মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে পহেলবানেরা ক্রমশ কাছে এসে পড়ছে।

পনের বিশ হাতের ভেতর যখন তারা এসে গেছে সেই সময় ধানখেতের শেষ মাথায় বরখা নদী চোখে পড়ল ধনপতের।

বরখা বিরাট নদী। কম করে মাইল দেড়েকের মতো চওড়া। হিমালয়ের বরফ গলে গলে বরখায় নেমে আসে বলে এই অঘ্রাণ মাসেও তার জলে প্রচণ্ড তোড়। উন্মাদের মতো ছুটতে ছুটতে খাড়া পাড় থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধনপত। যেভাবে পহেলবানেরা তাকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছিল তাতে এ ছাড়া বাঁচার কোনো রাস্তা নেই।

শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে পহেলবানদের চোখেমুখে একই সঙ্গে রাগ, আক্রোশ, হতাশা ফুটে বেরোয়। বিশাল লাঠিগুলো মাটিতে ঠুকে দাঁতে দাঁত ঘষে তারা চেঁচায়, 'গিদ্ধড়কা ছৌয়া, ভাগ গিয়া—'

ওদিকে ঠাণ্ডা জলস্রোত প্রবল টানে ধনপতকে কোনাকুনি ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রথমে কিছুক্ষণ হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতরাতে চেষ্টা করে ধনপত কিন্তু জলের শক্তি এমনই বিপুল যে তার বিশেষ কিছুই করার থাকে না। তা ছাড়া মারাত্মক হিমে তার রক্তকণা জমে যেতে থাকে। সে আবছাভাবে টের পায় তার হাত-পা দ্রুত অসাড় হয়ে আসছে, আর বেশিক্ষণ জলের সঙ্গে যুঝতে পারবে না। ক্রমশ বরখা নদী, অঘ্রাণ মাসের সকাল, ধুরুয়া গাঁয়ের সোনালি ধানখেত—সব কিছু তার চোখের সামনে থেকে মুছে যায়।

দুই

হুঁশ ফেরার পর ধনপত দেখল, বালিতে মুখ গুঁজে সে পড়ে আছে। পাশ দিয়ে বিপুল জলস্রোত ছুটে চলেছে।

এখন দুপুর, সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। অঘ্রাণ মাস বলে রোদে তেমন তেজ বা ধার নেই। তবে কুয়াশা কেটে গেছে।

এখানে কিভাবে এল বা কে তাকে স্তূপাকার বালিতে শুইয়ে দিয়ে গেছে, প্রথমটা বুঝে উঠতে পারে না ধনপত। শরীর বেজায় কমজোরি, মাথাটা টলছে। তবু আস্তে আস্তে হাতে ভর দিয়ে সে উঠে বসে। সঙ্গে সঙ্গে নাক মুখ দিয়ে হড় হড় করে জল বেরিয়ে আসতে থাকে।

বমি করার পর খানিকটা আরাম বোধ করে ধনপত। এবার সব কিছু মনে পড়ে যায়। পহেলবানদের তাড়া খেয়ে সে বরখা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্রোতের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে প্রচুর জল তার পেটে ঢুকে যায় এবং ক্রমশ বেহুঁশ হয়ে পড়ে। ধনপত বুঝতে পারছে, বরখা নদীই টানতে টানতে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। এখনও কী করে যে বেঁচে আছে, সেটা ভেবে সে অবাক হয়ে যায়। হো রামজি, হো কিষুণজি, তেরে কিরপা—

কতক্ষণ বালিতে পড়ে ছিল, ধনপত জানে না। তবে রোদে তার গায়ের জামা টামা, এমন কি কম্বল পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। খুব সম্ভব অনেকক্ষণ জলে থাকার জন্য তার হাত-পায়ের আঙুল এবং ঠোঁট এখনও সিঁটিয়ে আছে।

হঠাৎ পুঁটুলিটার কথা মনে পড়ে যায় ধনপতের। ওটাব মধ্যেই রয়েছে তার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি। চমকে এধাবে ওধারে তাকিয়েই দেখা যায়, খানিকটা দূরে সেটা পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ তার হাত চলে যায় কোমরের কাছে। ওখানে কয়েকটা টাকা বাঁধা ছিল। সেগুলো সেখানেই আছে। বরখা নদী তার কিছুই ছিনিয়ে নেয় নি।

এবার ভাল করে চারদিকে লক্ষ করে ধনপত। সে আন্দাজ করে নেয়, স্রোতের টানে ওপার থেকে কোনাকুনি সে এপারে ভেসে এসেছে। এখান থেকে চন্দ্রিকা সিংয়ের আদিগন্ত জমিগুলোর একটা ধানের শিষও চোখে পড়ে না। ওপারে সোজাসুজি যেটুকু দেখা যায় তা ধু ধু, ঝাপসা। সামনে বরফ-গলা জল একটানা গম গম শব্দ করে দুর্জয় বেগে ছুটে যাচ্ছে। এছাড়া আর কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। ধনপতের দু ধারে মাইলের পর মাইল বাদামি বালির পাড় অঘ্রাণের রোদে ঝিকমিক করছে। মাথার ওপর দিয়ে পরদেশি শুগার ঝাঁক উড়ে উড়ে নদী পেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

জায়গাটা খুবই নির্জন। কোথাও মানুষজন চোখে পড়ছে না।

ধনপত আর বসে থাকল না, পুঁটুলিটা তুলে নিয়ে বালির পাড় ধরে হাঁটতে লাগল। তাকে শহরে যেতে হবে।

শরীর ভীষণ দুর্বল, আস্তে আস্তে পা ফেলতে লাগল সে।

কিন্তু খানিকটা যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল ধনপতকে। একটু দূরে জলের ধার ঘেঁষে উপুড় হয়ে বালিতে ঘাড় গুঁজে কে যেন পড়ে আছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। তবে পরনের আলুথালু শাড়ি আর মাথার পর্যাপ্ত চুল দেখে বোঝা যায় সে মেয়েমানুষ।

আওরতটা এই নির্জন নদীর পাড়ে এল কোত্থেকে ? তার মতোই কি বরখার প্রবল তোড়ে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ঠেকেছে? কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ধনপত। তারপর আস্তে আস্তে ডাকে, 'তুম কৌন হো—'

সাড়া পাওয়া গেল না। নড়াচড়ারও কোনো লক্ষণ নেই। হঠাৎ রক্তের ভেতর চমক খেলে যায় ধনপতের। আওরতটা বেঁচে আছে তো? পরক্ষণেই সে ভাবে, বেঁচে থাক বা মরে যাক, তাতে তার কিছুই যায় আসে না। ধনপতের সহজাত বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা তাকে অস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, যে মেয়েমানুষ এভাবে নির্জন নদীর পাড়ে পড়ে থাকে তার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো মারাত্মক ধরনের ঝঞ্ঝাট রয়েছে। এক মুহূর্তও তার এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। ভাবে বটে, কিন্তু চলে যেতে পারে না। অদৃশ্য অলৌকিক কিছু একটা তাকে যেন ধাক্কা মারতে মারতে জলের কিনারে মেয়েমানুষটার কাছে ঠেলে নিয়ে যায়।

দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় নি। কাছে এসে শিউরে ওঠে ধনপত। আওরতটার শাড়ির অনেক জায়গা ফালা ফালা। তাতে রক্তের অজস্র ছোপ। তবে টাটকা রক্ত নয়। মনে হয়, কেউ তাকে খুন বা জখম করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। বহুক্ষণ জলে ভেজার পর যেমন হয়, কাপড়চোপড়ে তেমনই ফিকে রক্তের দাগ।

রুদ্ধশ্বাসে ধনপত ডাকে, 'এ আওরত—'

এবারও উত্তর মেলে না।

কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে ধনপত। তারপর পুঁটুলিটা একধারে রেখে হাঁটু গেড়ে মেয়েমানুষটার পাশে বসে পড়ে। তার কাঁধ ধরে আস্তে আস্তে চিত করে শুইয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আরেক বার তাকে শিউরে উঠতে হয়।

আওরতটার বয়স বেশি নয়, বড় জোর বিশ বাইশ। তার আধ-বোজা চোখের দৃষ্টি স্থির। গাল এবং গলার মাংস খোবলানো, কপালের চামড়া অনেকটা ছিঁড়ে গেছে। কণ্ঠার হাড় আর দু হাতের আঙুল থ্যাঁতলানো। গায়ে জামা নেই। সেটা যে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে তা টের পাওয়া যায়। একটা হাতা শুধু ডান হাতে আটকে আছে। আঘাতের জায়গাগুলো টকটকে লাল। সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। মনে হয়, কোনো হিংস্র জানোয়ার আঁচড়ে কামড়ে দুমড়ে মুচড়ে মেয়েটাকে শেষ করে দিয়েছে।

কী ভেবে দ্রুত মেয়েটার নাকের নিচে হাত রাখল ধনপত। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতব তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। খুব আস্তে তির তির করে নিঃশ্বাস পড়ছে মেয়েটার। এবার আলগোছে তার কপালে হাত দিল ধনপত। শরীরে এখনও তাপ আছে, অর্থাৎ মরে যায় নি। চেষ্টা করলে তাকে বাঁচানো যায়।

মেয়েটার শরীর পুরোপুরি বালির ডাঙায় নেই, হাঁটু পযন্ত দুটো পা জলের ভেতর ডুবে আছে।

দুই হাতে মেয়েটার শরীর তুলে নিয়ে খানিকটা দূরে বালির ওপর টান টান করে শুইয়ে দিল ধনপত। নিজের পুঁটুলিটা তার মাথার নিচে বালিশের মতো করে রাখল।

মেয়েটার চুল, হাত-পা—সবই ভেজা। প্রথমে খুব যত্ন করে সে-সব মুছিয়ে দিল ধনপত। একটু গরম জল পাওয়া গেলে খুব ভাল হত। মেয়েটাকে বাঁচাতে হলে যা দরকার তা হল উত্তাপ। ধনপত তার দুই হাত এবং পায়ের তালু অনবরত ঘষে ঘষে তার শরীরে জরুরি উষ্ণতাটুকু ফিবিয়ে আনতে লাগল। অনেকক্ষণ পর চোখের পাতা নড়ে ওঠে মেয়েটার। আগের চেয়ে জোরে শ্বাস পড়তে থাকে। বোঝা যায়, মৃত্যুর শেষ সীমারেখা থেকে সে ফিরে আসছে।

আরো কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে চোখ মেলে মেয়েটা। তার চাউনি ঘোলাটে, আচ্ছন্ন। কিছুই সে যেন চিনতে পারছে না।

একসময় ঘোলা ভাবটা কেটে যায়। মুখের ওপর একটা অপিরিচিত জোয়ান ছোকরাকে ঝুঁকে থাকতে দেখে একটু অবাকই হয় মেয়েটা, ঝাপসা দুর্বল গলায় শুধোয়, 'হামনি কঁহা হ্যায়?'

ধনপত জানায় সে বরখা নদীর পাড়ে শুয়ে আছে।

কী বলতে গিয়ে পরক্ষণে মেয়েটার নজর এসে পড়ে নিজের ওপর। তক্ষুনি শিউরে ওঠে সে, রক্তমাখা ফালা ফালা শাড়িটা টেনে সারা গা ঢাকতে ঢাকতে দু হাতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেছে তার।

মেয়েটার জন্য এক ধরনের মমতা বোধ করে ধনপত। নরম গলায় বলে, 'রো মাত্, রো মাত্। দুব্‌লা শরীরে কাঁদলে শরীর আরো কমজোরি হয়ে যাবে।'

মেয়েটা ধনপতের কথা খুব সম্ভব শুনতে পায় না, একটানা কেঁদেই চলে।

বেশ কিছুক্ষণ পর কান্না থামে। কিন্তু মুখ থেকে হাত সরায় না মেয়েটা। ধনপত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এখানে এলে কী করে?'

ভাঙা উদাস গলায় মেয়েটা বলে, 'চৌবেজি আর তার লোকেরা কাল রাত্তিরে আমাকে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। মনে হয়, ভাসতে ভাসতে এখানে চলে এসেছি।' একটু চুপ করে থেকে ফের বলে, 'আমি তো মরেই যেতাম। জরুর তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ।'

ধনপত থতমত খায়। বলে, 'হাঁ—মতলব—'

'কেন আমাকে বাঁচালে? মরলেই ভাল হত।'

এ কথার জবাব হয় না, ধনপত চুপ করে থাকে।

মেয়েটা এবার শুধোয়, 'তুমি এখানে এলে কী করে?'

ধনপত বলে, 'আমার কথা পরে শুনো। তোমার কথা বল। চৌবেজি কৌন?'

'আমার গাঁওকা আদমী। বহোত জমিনকা মালিক। বরাম্ভন।'

'সে-ই তোমার এমন বুরা হাল করে নদীতে ফেলে দিয়েছে?'

উত্তর দেয় না মেয়েটা, আস্তে মাথা নেড়ে চুপ করে থাকে।

চৌবেজির মতো বড় জমি মালিক কেন মেয়েটাকে এভাবে জখম করে রক্তাক্ত অবস্থায় নদীতে ফেলে দিয়েছে, ভেবে পায় না ধনপত। জিজ্ঞেস করতে গিয়ে তার মনে হয়, এ সব জেনে কী লাভ! তাকে অনেক দূরের শহরে যেতে হবে। বরখা নদীর পাড়ে বসে কারুর দুঃখের কথা শুনবার মতো অঢেল সময় হাতে নেই। কিন্তু মেয়েটার শরীরের যা হাল, তাতে তাকে ফেলে যাওয়াও যায় না। মেয়েটা সম্পর্কে কেমন একটা দায়িত্ব যেন এসে গেছে ধনপতের। একটা কিছু ব্যবস্থা না করে গেলে যেখানেই যাক, মনটা খচখচ করতে থাকবে।

ধনপত ডাকল, 'এ আওরত—'

আধফোটা গলায় সাড়া দিল মেয়েটা, 'হাঁ—'

'তোমাদের ঘর কোথায়?'

'দধিপুরা গাঁওয়ে—নদীর ওপারে।' মেয়েটা বলে যায়, 'আমাদের গাঁও দিয়ে কী হবে?'

দধিপুরার নাম শুনেছে ধনপত। সেখানে না গেলেও গাঁ-টা কোথায়, সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা আছে। সে বলে, 'চল, তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

মেয়েটা প্রায় শিউরে ওঠে, 'নেহী, নেহী, নেহী।'

'কী হল?' ধনপত অবাক হয়ে যায়।

'হামনি গাঁওমে নেহী লোটেগি (আমি গায়ে ফিরব না)। কভি নেহী।'

'কায়?'

'আমাকে দেখলে চৌবেজি জরুর খুন করে ফেলবে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ধনপত বলে, 'তাহলে কোথায় যাবে বল। তোমাকে সেখানে রেখে যাই।'

মেয়েটা জানায়, এই পৃথিবীতে তাকে আশ্রয় দেওয়ার মতো কোথাও কেউ নেই।

এবার বিরাট সমস্যায় পড়ে যায় ধনপত। শুশ্রূষা করে মেয়েটার জ্ঞান ফেরাবার আগে কে ভাবতে পেরেছিল, তাকে নিয়ে এরকম ঝঞ্ঝাট হবে। সে খুবই বিপন্ন বোধ করতে থাকে।

মেয়েটা খুব সম্ভব ধনপতের মনোভাব বুঝতে পারে। বলে, 'আমার জন্যে তুমি অনেক করেছ। আরেকটু কষ্ট করে আমাকে দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় যদি দিয়ে যাও—'

দুধলিগঞ্জের হাটিয়া বা হাটের কথা ধনপতের অজানা নয়। বিশ পঁচিশ মাইলের ভেতর এত বড় হাট এ অঞ্চলে আর নেই। তবে কখনও সেখানে তার যাওয়া হয় নি।

'দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় যেতে চাইছ কেন?' ধনপতের চোখে মুখে এবং গলার স্বরে রীতিমত বিস্ময়ই ফোটে।

মেয়েটা এবার যা বলে তা এইরকম। এই অঘ্রাণ মাসে ধান কাটার মরশুম শুরু হয়ে যাবে। এ দিকের তাবত ভূমিহীন খেতমজুর এসময় দুধলিগঞ্জের হাটের একধারে গিয়ে সারাদিন বসে থাকে।

জমি মালিকরা তাদের ভেতর থেকে শক্তসমর্থ চেহারার কিষান বেছে নিয়ে যায়। তাতে ভাল মজুরি আর খোরাকি বাবদ গেঁহু বা বাজরার আটা আলু তেল লবণ মরিচ ইত্যাদি মেলে। ধানকাটা হয়ে গেলে মালিক কাজ থেকে অবশ্য ছাড়িয়ে দেয়। মেয়েটার ইচ্ছা, আপাতত ওখানে গিয়ে একটা কাজ জুটিয়ে নেবে।

শুনতে শুনতে ধনপতের ভাবনার মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। নেহাৎ ঝোঁক এবং জেদের বশে বেগারি প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই সে ধুরুয়া গাঁ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। তার মাথায় ভাসা ভাসা একটা ধারণা আছে, শহরে গেলে পয়সা কামাইয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু সে শহর কোথায়, কত দূরে, কী ধরনের কাজ সেখানে পাওয়া যাবে—এ সব সম্বন্ধে পরিষ্কার করে ধনপত কিছু জানে

না। জনমদাসের আবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অদম্য মনের জোর তার। ধুরুয়া গাঁ থেকে বেরুবার আগে সে ঠিকই করে রেখেছিল, একটা শহর খুঁজে বার করবেই। পাটনা রাঁচি ধানবাদ বা ঝরিয়া—এই সব 'ভারি ভারি টৌনে'র নাম সে জানে। লোকের কাছে হদিশ জেনে এই সব শহরের কোনো একটাতে সে কি আর পৌঁছুতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে।

অজানা শহর খোঁজার ব্যাপারটা তো আছেই। তার আগে মেয়েটার কাছে দুধলিগঞ্জের যে খবর পাওয়া গেছে সেটা কাজে লাগানো যেতে পারে। কাজ জুটলে খোরাকি যা মিলবে তাতে পেটটা চলে যাবে; মজুরিটা পুরোপুরিই বাঁচবে। কিছু পয়সা জমিয়ে নতুন উৎসাহে সে অজানা শহর খুঁজতে বেরুবে। পয়সা হাতে থাকলে মনের জোর বেড়ে যায়।

ধনপত শুধোয়, 'দুধলিগঞ্জের হাটিয়া তুমি চেনো?'

মেয়েটা ঘাড় হেলিয়ে জানায়—চেনে।

'কতদূর এখান থেকে?'

'লগভগ দো মিল। নদীর কিনার দিয়ে দিয়ে চলে যাওয়া যাবে।'

এদিকে বেলা বেশ বেড়ে গেছে। পুব দিকে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তের নিচে নেমেছে ঠিক সেইখান থেকে লাফ দিয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। ছিটেফোঁটা কুয়াশার চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও। চারদিক ঝকঝকে পরিষ্কার। ভোরের দিকে দু-চারটে পরদেশি শুগা দেখা যাচ্ছিল আকাশে। এখন তারা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়েছে। বেলা চড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপও কিছু বেড়েছে। বাতাসে হিমের ভাব ততটা আর নেই।

ধনপত জিজ্ঞেস করল, 'দুধলিগঞ্জের হাটিয়া কখন বসে?'

'সুবেসে—'মেয়েটা বলে।

'কতক্ষণ চলে?'

'সন্ধে পর্যন্ত।'

'চল, এবার যাই। দো মিল রাস্তা যেতেও তো সময় কম লাগবে না।'

বলামাত্রই কিন্তু ওঠে না মেয়েটা, বালির ওপর যেমন পড়ে ছিল তেমনই পড়ে থাকে।

ধনপত তাড়া লাগায়, 'কা হুয়া, উঠে পড়। সূরয চড়ে যাচ্ছে।'

এবারও নড়াচড়ার লক্ষণ নেই মেয়েটার। সে শুধু অস্পষ্ট কাঁপা গলায় বলে, 'ক্যায়সে যাওগী?'

এতক্ষণে হুঁশ হয় ধনপতের। যে রক্তাক্ত ছেঁড়াফাঁড়া কাপড়টা গায়ে কোনোরকমে জড়িয়ে জড়সড় হয়ে মেয়েটা পড়ে আছে, সেটা পরে দুধলিগঞ্জের হাটিয়া পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব। হঠাৎ নিজের পুঁটুলিটার কথা মনে পড়ে যায় তার। ওটাতে ঠেটি 'ফুর' প্যান্ট পাজামা এবং একটা ধুতি রয়েছে।

দ্রুত পুঁটুলি থেকে ধুতিটা বার করে মেয়েটার দিকে ছুঁড়ে দেয় ধনপত। বলে, 'এটা তুরন্ত পরে নাও।' বলেই বড় বড় পা ফেলে খানিকটা দূরে গিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়ায়।

কিছুক্ষণ পর আবছা গলা ভেসে আসে, 'আমার হয়ে গেছে।'

ঘাড় ফেরাতেই ধনপত দেখতে পায়, মেয়েটা ধুতি পরে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তার সেই রক্তের দাগ-ধরা ছেঁড়া শাড়িটা। আস্তে আস্তে ধনপত তার কাছে ফিরে আসে। শাড়িটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ওটা দিয়ে আর কী হবে? ফেলে দাও—'

'লেকেন—'

'কা?'

'তোমার কাপড়া তো ফেরত দিতে হবে। তখন পরব কী?'

এ দিকটা ভেবে দেখে নি ধনপত। একটু চিন্তা করে সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মেয়েটা আবার শুরু করে, 'দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় গিয়ে সুই-সুতো যোগাড় করে দিও। আমার শাড়িটা শেলাই করে তোমার কাপড়া ফেরত দেব।'

ধনপত জানায়, শাড়িটার যা হাল হয়েছে, হাজার মেরামত করলেও আর পরা চলবে না।

ব্যবহারের অযোগ্য এই বস্তুটা অকারণে বয়ে নিয়ে যাওয়ার অর্থ নেই। ধুতিটা ফেরত দিতে হবে না। ওটা যখন মেয়েটা পরেই ফেলেছে তখন গা থেকে খুলে নেবে—এমন চামার ধনপত নয়।

মেয়েটার সংকোচ যেন হাজার গুণ বেড়ে গেল। একে তো এই অচেনা জোয়ান ছেলেটা তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তার ওপর একটা আস্ত ভাল ধুতি একেবারেই দিয়ে দিতে চাইছে। কুণ্ঠিত মুখে সে বলে, 'লেকিন—'

'লেকেন উকেন কুছ নেহী—' প্রবলভাবে হাত এবং মাথা নেড়ে মেয়েটার সব কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে ধনপত। তারপর নিজের পুঁটুলিটার দিকে এগিয়ে যায়। সেটা বালির ওপর খোলা পড়ে আছে।

পুঁটুলিটা ফের বাঁধতে গিয়ে ধনপতের চোখে পড়ে, 'ফুর' প্যান্ট, পাজামা ইত্যাদির ভাঁজে ভাঁজে চাপাটি, লিট্টি, ঘাটো এবং সেদ্ধ রাঙা আলু রয়েছে। রাস্তায় খাবার জন্য মা এগুলো গুছিয়ে দিয়েছিল।

জলে ভিজে চাপাটি আর লিট্টি একেবারে কাদার তাল হয়ে গেছে। ওগুলো আর খাওয়া চলে না। তবে ঘাটো এবং সেদ্ধ রাঙা আলু এখনও ভালই আছে। সেগুলো দেখতে দেখতে পেটের ভেতর খিদেটা চনমনিয়ে ওঠে ধনপতের। কাল ভোরে ধুরুয়া গাঁ থেকে বেরুবার পর যে সব ভয়াবহ এবং উত্তেজক ঘটনা ঘটেছে তাতে খাওয়ার কথা মনেই ছিল না তার।

গলে যাওয়া রুটি আর লিট্টিগুলো ফেলে রাঙা আলু সেদ্ধ এবং ঘাটো বার করতে গিয়ে মেয়েটার কথা খেয়াল হয় ধনপতের। ঘাড় ফিরিয়ে হাত নেড়ে তাকে কাছে ডাকে সে। বলে, 'জরুর তোমার ভুখ লেগেছে?'

খিদে নিশ্চয়ই পেয়েছে। কিন্তু এই অপরিচিত জোয়ান ছেলেটা অযাচিতভাবে তাকে অনেক কিছু দিয়েছে। এরপরও তার খাবারে ভাগ বসাবার কথায় একেবারে কুঁকড়ে যায় মেয়েটা। মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সে। বিব্রত ভাবে বলে, 'নেহী, নেহী, নেহী—'

স্থির চোখে মেয়েটার দিকে তাকায় ধনপত। জিজ্ঞেস করে, 'কাল শেষ কখন খেয়েছ?'

'সামকো (সন্ধ্যায়)।'

'তারপর পুরা রাত কেটেছে। এখন চড়তি সূরয মাথার ওপর উঠে আসছে। আর বলছ ভুখ লাগে নি?'

মা-বাপ ছাড়া এমন সহানুভূতি বা মমতার সুরে আর কেউ তার সঙ্গে কথা বলে নি। মেয়েটার চোখে প্রায় জল এসে যায়। সে চুপ করে থাকে।

ধনপত ঘাটো আর আলুসেদ্ধ সমান দু ভাগ করে একটা অংশ মেয়েটাকে দেয়। তারপর নিজেব ভাগ থেকে গোগ্রাসে খেতে থাকে।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, পুঁটুলিটা কাঁধে ফেলে নরম সোনালি বালির ওপর পা ফেলে ফেলে খাড়া দক্ষিণে হাঁটতে থাকে ধনপত। তার পাশাপাশি মেয়েটাও চলেছে।

তিন

একপাশে ববখা নদী প্রবল তোড়ে ছুটে যাচ্ছে। আরেক পাশে, বালির পাড়ের ওপর থেকে ঝোপঝাড় আগাছার জঙ্গল। ফাঁকে ফাঁকে পরাস সিমার এবং পিপর গাছগুলো আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে। তবে সব চাইতে বেশি করে যা চোখে পড়ে তা হল ট্যারাবাঁকা চেহারার অজস্র সিসম গাছ। মাঝে মাঝেই ঝোপঝাড় থেকে সর্বন পাতার খুশবু ভেসে আসছে।

এই নির্জন চরাচরে পরদেশি গুগাব ঝাঁক ছাড়া প্রচুর মানিক পাখি এবং সিল্লি দেখা যাচ্ছে। শীতের সময় কোন সুদূর অজানা দেশ থেকে তারা এখানে চলে আসে কে জানে।

নদী আকাশ পাখি গাছপালা বা অঘ্রাণ মাসের ঘন সোনালি রোদ—কোনোদিকেই লক্ষ্য নেই ধনপতের। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তার চোখ বার বার সঙ্গিনীর দিকে চলে যাচ্ছিল।

এই মেয়েটা সম্পর্কে যেটুকু ধনপত জেনেছে তা খুবই সামান্য। ক্রমশ সঙ্গিনীর ব্যাপারে তার কৌতূহল বাড়তে থাকে। একসময় সে বলে, 'তখন বলেছিলে তোমাদের গাঁওয়ের নাম দধিপুরা, তাই না?'

মেয়েটা বলে, 'হাঁ।'
'সেখানে আর কে কে আছে?'
'বাপ-মা-ভাই-বহীন।'
'শাদি উদি হুয়া?'
'নেহী।'

একটু ভেবে ধনপত এবার শুধোয়, 'মা-বাপ থাকতে তাদের কাছে না গিয়ে দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় কাজের খোঁজে যাচ্ছ যে?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে মেয়েটা। তারপর বিষণ্ণ মুখে বলে, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, দধিপুরায় ফিরে গেলে চৌবেজি আমাকে খুন করে ফেলবে।' একটু থেমে জানায়, মা-বাপ তাকে চৌবেজির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। তা ছাড়া তার কারণে তারাও বিপন্ন হয়ে পড়বে। ভয়ানক খতরনাক আদমী চৌবেজি।

ধনপত জিজ্ঞেস করে, 'তোমাকে খুন করবে কেন চৌবেজি?'

এরপর এলোমেলোভাবে নিজের জীবনের যাবতীয় কথা বলে যায় মেয়েটা। সে সব সাজিয়ে নিলে মোটামুটি যা দাঁড়ায় তা এইরকম।

মেয়েটার নাম চাঁদিয়া। জাতে তারা কোয়েরি অর্থাৎ জল-অচল অচ্ছুৎ। ধনপতদের মতো চাঁদিয়ারা ঠিক বেগার খাটা জনমদাস নয়, তার থেকে সামান্য ওপরের স্তরের মানুষ।

চাঁদিয়ার বাপ দুধনাথের সাত বিঘে এগার ধুর চাষের জমি আছে। মোট ছ'জনের সংসার তার। দুধনাথ, তার ঘরবালী কবুতরী এবং চার ছেলেমেয়ে। ভাইবোনদের ভেতর সবার বড় চাঁদিয়া।

সাত বিঘে এগার ধুর এক-ফসলী জমিতে যেটুকু ধান টান ফলে তাতে ছ'টা মানুষের পেট চলে না। তাই দধিপুরা গাঁয়ের সব চাইতে বড় জমিমালিক চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ অধিকলাল চৌবের জমিতে বা খামারে সপরিবারে চাষের সময় এবং ফসল কাটাইয়ের মরশুমে খাটতে হয় দুধনাথকে। এই রকম আরো কিছু কিছু উঞ্ছবৃত্তি করে সংসার চালাতে হয় তাকে।

মোটামুটি দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু বিপদ বাধাল চাঁদিয়ার যৌবন।

চৌবেজি এমনিতে ভয়ানক শুদ্ধাচার মেনে চলে। সকালে স্নান টান সেরে বিষুণজির মন্দিরে পূজা না চড়িয়ে জল পর্যন্ত খায় না। জাতপাতের বিচারও তার মারাত্মক। অচ্ছুৎদের ছায়া মাড়ায় না। কোনো কারণে দোসাদ-ধাঙড়-তাতমা বা কোয়েরিদের ছোঁয়া লেগে গেলে দশ বার নাহানা সেরে নিজের দেহকে শুধ্ বা শুদ্ধ করে নেয় সে।

অচ্ছুৎদের সম্বন্ধে চৌবেজির মনোভাব যেমনই হোক, তাদের ঘরের সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ব্যাপারে জাতওয়ারি সওয়ালটা সে বেমালুম ভুলে যায়। অচ্ছুৎদের যুবতী মেয়েরা তার কাছে একেবারেই অস্পৃশ্য নয়, বরং খুবই কাম্য বস্তু। এ ব্যাপারে তার ডাবল স্ট্যাণ্ডার্ড। দধিপুরা এবং তার চারপাশের গ্রামগুলোতে কোয়েরি দোসাদদের ঘরের মেয়েরা বড় হয়ে উঠলে রেহাই নেই। চৌবেজি পহেলবান পাঠিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাবেই। আবহমান কাল ধরে এটা একটা অনিবার্য প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে যেন।

অবধারিত নিয়মেই চৌবেজির নজর এসে পড়েছিল চাঁদিয়ার ওপর। প্রথম প্রথম গোপনে চর পাঠিয়ে তাকে লোভ দেখাতে চেয়েছে চৌবেজি। দামি জগমগ শাড়ি, গোছা গোছা রঙিন বেলোয়াড়ি চুড়ি, সপরনার (সাজগোজের) জিনিস, কজরৌটি, চাঁদির গয়না থেকে শুরু করে টাকা পয়সা পর্যন্ত দিতে চেয়েছে।

কিন্তু অচ্ছুৎটুলির অন্য মেয়েদের থেকে চাঁদিয়া একেবারেই আলাদা। তার শিরদাঁড়া বেশ শক্ত। চৌবেজির চরদের মুখে তিন বার 'থুক' দিয়ে সে ভাগিয়ে দিয়েছে। আওরতের জীবনের সব চেয়ে যা সেরা বস্তু অর্থাৎ শুধ্ দেহ—সেটা সে কোনোমতেই খোয়াতে রাজি নয়। এতে তার যা হওয়ার হবে।

অধিকলাল চৌবে খুবই নাছোড়বান্দা খতরনাক জানোয়ার। একবার যখন চাঁদিয়া তার নজরে

পড়েছে, তার মাংস না চিবিয়ে সে ছাড়বে না। লোভ দেখিয়ে যখন কাজ হল না তখন 'টেড়া' রাস্তা ধরল। লোক দিয়ে শাসাতে লাগল। কিন্তু তাতেও চাঁদিয়াকে কবজা করা সম্ভব হল না। সব সময় সে একটা ধারাল দা কোমরে গুঁজে ঘুরত: চৌবের লোকেরা কাছাকাছি এলেই অস্ত্রটা বার করে দেখাত।

অধিকলালের পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে এমন ব্যাপার আর কখনও ঘটে নি। সে হাত বাড়িয়েছে, অথচ কোন যুবতী তার কাছে ধরা দেয় নি—এ প্রায় অবিশ্বাস্য। কাজেই কোয়েরিদের এক যুবতী মেয়ের তেজী শিরদাঁড়া 'চূরণ' (চূর্ণ) করার জন্য চৌবেজির রোখ চেপে গিয়েছিল।

দধিপুরার অচ্ছুৎটুলিতে চাঁদিয়াদের পাশাপাশি দু'খানা টুটাফুটা টিনের চালের ঘর। এক ঘরে সে আর তার ছোট ভাইবোনেরা শোয়, অন্য ঘরটা দুধনাথ এবং কবুতরীর। কাল রাতে অঘ্রাণ মাসের মারাত্মক হিমে গোটা দধিপুরা গাঁ যখন কাঁথা এবং কম্বলের তলায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে সেই সময় টিনের চাল কেটে চাঁদিয়ার ঘরে ঢুকেছিল চৌবেজির পোষা পহেলবানেরা। চাঁদিয়া কিছু বুঝবার বা চেঁচিয়ে উঠবার আগেই মুখে কাপড় গুঁজে দরজা খুলে তাকে তুলে নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল চৌবেজির খামার বাড়িতে। সেখানে চতুর্বেদী শুধ্ বরাম্ভন প্রথমে তার চরম ক্ষতিটি করে। পরে চৌবের উচ্ছিষ্ট নিয়ে তার পহেলবানেরা কামড়াকামড়ি শুরু করে দেয়। অবশেষে বেহুঁশ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত চাঁদিয়াকে ওরা বরখা নদীতে ফেলে দিয়েছিল।

চৌবেজির ধারণা সে আর বেঁচে নেই। তার মৃত্যুই ওদের কাছে একান্ত কাম্য। চাঁদিয়া যদি এখন গাঁয়ে ফিরে যায়, চৌবেজির কুকর্মের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে, সেটা কোনোভাবেই তার কাছে বাঞ্ছনীয় নয়।

অবশ্য এর আগে কি অচ্ছুৎদের ঘরের যুবতী মেয়ের সর্বনাশ করে নি চৌবেজি? নিশ্চয়ই করেছে। কিন্তু সে সব লুকিয়ে ছাপিয়ে। অচ্ছুৎরা এ নিয়ে বিশেষ গোলমাল করে নি, চিরাচরিত প্রথা বা নিয়তি হিসেবেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু প্রথম থেকেই চাঁদিয়া ঘাড় বাঁকিয়ে বসেছে। অনেক করেও যখন তাকে বাগে আনা যায় নি তখন বাঁকা পথ ধরেছে চৌবেজি। যেভাবে সে চাঁদিয়াকে তুলে নিয়ে গেছে তা জানতে পারলে দধিপুরা গাঁয়ের লোকেরা ভয়ে হয়ত মুখ খুলবে না, তবে মনে মনে তিনবার তাকে থুক দেবে। তা ছাড়া মেয়েটা যেরকম তেজী তাতে বেঁচে থাকলে একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বে। পাপের সাক্ষী রাখবে না বলেই শীতের বরফগলা জলে চাঁদিয়াকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ এখন যদি সে ফিরেও যায় চৌবেজি তাকে কিছুতেই বেঁচে থাকতে দেবে না।

আত্মহত্যা তো করা যায় না। তাই চাঁদিয়া ঠিক করেছে দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় গিয়ে একটা কাজ টাজ জুটিয়ে নেবে। নিজের পেটের জন্য কিছু কামাই করা দরকার।

ধর্ষিতা মেয়েটার কথা শুনতে শুনতে গভীর সহানুভূতিতে মন ভরে যায় ধনপতের।

ধনপত সম্পর্কেও চাঁদিয়ার কৌতূহল কম নয়। নিজের কথা শেষ করার পর সে বলে, 'এখানে তুমি কী করে এলে? তোমাদের গাঁও কোথায়?'

ধনপত নিজের কথা বলে যায়। জীবনের কোনো ঘটনাই প্রায় বাদ দেয় না।

সব শুনে গভীর দুঃখের গলায় চাঁদিয়া বলে, 'তোমার আর আমার হাল একই রকম। বাপ-মা-ভাইবোনের কাছে ফেরার রাস্তা দু'জনেরই বন্ধ।'

'হাঁ।' ধনপতকে বিমর্ষ দেখায়।

'জীওনে আর হয়ত কেউ গাঁওয়ে ফিরতে পারব না।' চাঁদিয়ার গলার স্বর গাঢ় বিষাদে বুজে আসে।

ধনপত খানিকটা জোর দিয়ে বলে, চাঁদিয়ার কথা সে জানে না। তবে সে নিজে তাদের ধুরুয়া গাঁয়ে ফিরবেই। টাকাপয়সা কামাই করে জনমদাসের ঘৃণ্য জীবন থেকে মা-বাপ-ভাইবোনদের মুক্ত করে আনবেই।

চাঁদিয়া বলে, 'তুমি তো টৌনে যাবে?'

'হাঁ।'

'কোন টৌনে?'

ধনপত জানায়, কোন টৌন সে জানে না। আপাতত সে স্থির করেছে চাঁদিয়ার সঙ্গে দুধলিগঞ্জের

হাটিয়াতেই যাবে। কোনো জমিমালিক যদি তাকে পছন্দ করে, তার কাছেই কাজ নেবে।

চাঁদিয়ায় চোখমুখ উজ্জ্বল দেখায়। সে বলে, 'ভালই হল, দেখি যদি এক জগহতেই (জায়গাতেই) দু'জনের কাজ জুটে যায়।'

ধনপত উত্তর দেয় না।

চাঁদিয়া একটু পর বলে, 'ভগোয়ান রামজিকা কিরপা, তাই বরখা নদীতে ভাসতে ভাসতে এখানে চলে এসেছিলে। না হলে—'

ধনপত শুধোয়, 'না হলে কী?'

'আমি বাঁচতাম না। নদীর কিনারে মরে পড়ে থাকতাম। গিধেবা আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত।'

ধনপত কিছু বলে না, মুখ ফিরিয়ে সঙ্গিনীকে একবার দেখে মাত্র। তার দু চোখে অপার মমতা।

রশিভর হাঁটার পর হঠাৎ ধনপতের নজরে পড়ে, স্বাভাবিকভাবে পা ফেলতে পারছে না চাঁদিয়া। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে। মুখচোখ দেখে বোঝা যায়, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার।

ক্ষতবিক্ষত জখমী শরীরে এই যে চাঁদিয়া হাঁটছে, সে শুধু অদম্য মনেব জোরে।

ধনপত বলে, 'কা, পাও দুখাতা হ্যায (পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে)?'

শারীরিক কষ্টটা অগ্রাহ্য করবার জন্যই বোধ হয় শরীবটা টান টান করে দাঁতে দাঁত চেপে হাঁটতে চেষ্টা করে চাঁদিয়া। বলে, 'নেহী, নেহী—' প্রথম প্রথম ধনপতের কাছে তার যেটুকু সংকোচ বা লজ্জা ছিল, ক্রমশ তা কেটে যাচ্ছে। এই জোয়ান ছেলেটার মমতা যত্ন এবং সহানুভূতিতে সে অভিভূত। যদিও তার খোয়াবার মতো আর কিছুই নেই তবু যুবতী মেয়ের পক্ষে একা একা চলা খুবই বিপজ্জনক। পাছে ধনপত তাকে ফেলে চলে যায়, সেই কারণে দৈহিক যন্ত্রণাকে সে অস্বীকার করেছে।

কিন্তু বালির ওপর দিয়ে কয়েক পা যেতে না যেতেই আবার খোঁড়াতে থাকে চাঁদিয়া।

কোমল গলায় ধনপত বলে, 'একটু জিরিয়ে নাও।' সে আরো বলে, জখমী দুবলা শরীরে একটানা 'দো মিল' হেঁটে দুধলিগঞ্জে যাওয়া ঠিক হবে না।

যন্ত্রণাটা এবার বোধহয় বেশিই হচ্ছিল। আর কিছু না বলে বালির ওপর বসে পড়ে চাঁদিযা। তার কাছাকাছি ধনপতও বসে। শুধোয়, 'তোমার শরীরেব যা হাল, দুধলিগঞ্জে যেতে পারবে তো?'

'যেতে আমাকে হবেই। কাম না জুটলে খাব কী, থাকব কোথায়?' করুণ গলায় চাঁদিয়া বলতে থাকে, 'আমার জন্যে তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—না?'

ধনপত বলে, 'না না, দেরি আর কি।'

'বেশিক্ষণ বসব না, কষ্টটা একটু কমলেই আবার হাঁটতে পারব। তুমি কি চলে যাবে?' চাঁদিয়া ধনপতের চোখের দিকে তাকায়।

তার মনোভাবটা বুঝতে পারে ধনপত। ভরসা দেবার সুরে বলে, 'না না, তোমাকে ফেলে আমি যাচ্ছি না।'

কিছুক্ষণ জিরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে দু'জনে। তাড়াতাড়ি দুধলিগঞ্জে পৌঁছুবার জন্য জোরে জোরে পা ফেলতে থাকে চাঁদিয়া। কাজ পাওযার ব্যাপারে তার মধ্যে মারাত্মক এক উদ্বেগ চলছে খুব সম্ভব। ধনপত বলে, 'আস্তে আস্তে চল। তখন বললে, সন্ধে পর্যন্ত হাটিয়া চলে। বহোত সময় আছে।'

চলাব বেগ খানিকটা কমিয়ে দেয চাঁদিয়া। কিন্তু আরো সিকি রশি যাওয়ার পর আবার তাকে বসে পড়তে হয়।

এইভাবে জিরিয়ে জিরিয়ে, প্রায ধুঁকে ধুঁকে শেষ পর্যন্ত যখন তারা দুধলিগঞ্জের হাটিযায় পৌঁছয় সূর্য খাড়া মাথার ওপর চলে এসেছে।

চার

পঞ্চাশ ষাট মাইলের ভেতর দুধলিগঞ্জের মতো এত বড় হাটিয়া বা হাট আর নেই। সপ্তাহে দু'দিন ওখানে হাট বসে। বুধবার এবং রবিবারে। আজ রবিবার।

বরখা নদীর পাড়ে মাইল খানেক জায়গা জুড়ে হাটটা বসে। এখানে না পাওয়া যায় কী? তামাক মরিচ ধান গেঁহু কাপড়া থেকে গৈয়া বকরি ভৈস পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কিছু।

যেদিকে তাকানো যাক, সারি সারি হাটিয়ার চালা আর মানুষ। কমসে কম লাখ খানেক মানুষ তো হবেই।

এই দুপুরবেলায় হাট একেবারে জমজমাট, চারপাশ গমগম করছে। এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে দিশেহারা হয়ে পড়ে ধনপত।

চাঁদিয়া বলে, 'চল, ওধারে যাই—' সে ডান দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

ধনপত শুধোয়, 'ওদিকে কী?'

চাঁদিয়া জানায়, দক্ষিণ দিকে হাটের শেষ মাথায় অনেকগুলো কড়াইয়া আর পিপর গাছ গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে মরশুমী খেতমজুররা গাছতলায় গিয়ে বসে থাকে। জমিমালিকরা তাদের ভেতর থেকে কাজের লোক বেছে নিয়ে যায়। চাঁদিয়া আগেও বার কয়েক এখানে এসেছে বলে দুধলিগঞ্জের খুঁটিনাটি সব খবর জানে।

লোকজনের ভিড় ঠেলে কিছুক্ষণের মধ্যে দু'জনে কড়াইয়া এবং পিপর গাছগুলোর তলায় গিয়ে পাশাপাশি বসে পড়ে।

সেখানে আগে থেকেই বেশ কিছু পুরুষ এবং আওরত এসে বসে আছে। তাদের বেশির ভাগই আদিবাসী সাঁওতাল ওরাওঁ এবং মুণ্ডা। প্রায় সবগুলো মেয়েমানুষের কোলেই বাচ্চাকাচ্চা রয়েছে, তারা মায়েদের বুক ধামসাচ্ছে।

কড়াইয়া এবং পিপর গাছগুলোর মুখোমুখি তিন-চারটে হাটের চালা। সেখানে বাঁশের কয়েকটা বেঞ্চি পাতা রয়েছে। চাঁদিয়া জানাল, জমিমালিকরা খেতমজুর খোঁজার জন্য ওখানে এসে বসে। কিন্তু চালাগুলো এই মুহূর্তে ফাঁকা, কাউকেই সেখানে দেখা যাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও কেউ যখন মরশুমী কিষানের খোঁজে আসে না তখন চাঁদিয়াকে খুবই চিন্তিত দেখায়। সে নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই যেন বলে, 'কা হুয়া, কেউ তো এখনও আসছে না। না এলে, কাম না জুটলে কী হবে আমাদের?'

এদিকে পাশের একটা মধ্যবয়সী রোগা চেহারার লোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে ধনপত। তার নাম রামদেওরা, জাতে গঞ্জু, বাড়ি তেহরী নদীর পাড়ে পিপরিয়া গাঁয়ে। সে-ও কাজের খোঁজে দুধলিগঞ্জে এসেছে। ফি বছরই নাকি চাষের এবং ধানকাটাইয়ের মরশুমে সে এখানে আসে।

ধনপত শুধোয়, 'জমি মালিকরা এখানে কখন আসে?'

রামদেওরা বলে, 'সূরয চড়তে না চড়তেই তো মালিকরা চলে আসে। মালুম হোতা—'

'কা?'

'ধানকাটাইয়ের জন্যে আগেই জমিমালিকরা লোক বাছাই করে নিয়ে গেছে।'

ডান পাশে একটা ভুখা চেহারার বুড়ো দুই হাঁটুর ভেতর থুতনি ঢুকিয়ে ধনপতদের কথা শুনছিল। হঠাৎ সে বলে ওঠে, 'অঘ্রাণ মাস পড়ে গেছে। এখনও কি আর ধানকাটাইয়ের লোক নেওয়া বাকি আছে? মালিকরা অনেক আগেই ওই কাজটা শেষ করে ফেলেছে।'

ধনপতের চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে। রোজগারের যে আশাটুকু দেখা গিয়েছিল তা যেন এক ফুঁয়ে কেউ নিভিয়ে দিল। ঘাড় ফিরিয়ে সে বুড়োটাকে বলে, 'তা হলে এত লোক এখানে এসে বসে আছে কেন?'

বুড়োটা জবাব দেওয়ার আগেই রামদেওরা বলে ওঠে, 'যদি দু-একজন মালিক এসে পড়ে, তাই—' কথা শেষ না করে সে থেমে যায়।

একসময় আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্যটা পশ্চিম দিকে নামতে শুরু করে। রোদের রং বদলাতে থাকে।

সেই কখন খানিকটা ঘাটো আর রাঙা আলু সেদ্ধ খেয়েছিল ধনপত। তারপর বালির ওপর পাক্কা দু মাইল হেঁটে দুধলিগঞ্জে পৌঁছেছে। এখানে আসার পরও বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে।

ধনপত পাহাড়ের মতো জোয়ান ছেলে। ওই সামান্য খাদ্যে তার কী-ই বা হয়। পেটের ভেতর নতুন করে খিদেটা আগুনের মতো গনগন করতে থাকে। একবার চাঁদিয়ার দিকে তাকায় সে। নিশ্চয়ই তারও খিদে পেয়েছে কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করলে লজ্জায় সংকোচে মেয়েটা শুধু 'নেহী নেহী' করবে।

ধনপত তার পুঁটুলিটা চাঁদিয়ার হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'এটা রাখ, আমি হাটিয়া থেকে ঘুরে আসছি।'

হঠাৎ ধনপতের হাটে যাওয়ার কী কারণ ঘটল, বুঝতে পারে না চাঁদিয়া। জানার জন্য প্রবল কৌতূহল বোধ করে সে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করে না।

কিছুক্ষণ পর হাটের ভেতর থেকে ফিরে আসে ধনপত। তার হাতে দুটো মাটির খোরায় চা আর সস্তা লাল আটার পাঁউরুটি। চা এবং পাঁউরুটির ভাগ চাঁদিয়াকে দিয়ে গোগ্রাসে নিজের রুটিটা চিবুতে থাকে সে।

খেতে খেতে ধনপত শুধোয়, 'আমি যতক্ষণ হাটিয়ায় ছিলাম, তার ভেতর কোনো জমিমালিক এসেছিল?'

'নেহী—'

ধনপতের কপালে ভাঁজ পড়ে। সে বলে, 'তব্ তো বহোত মুসিবত হো যায়গা।'

এই অচেনা অনাত্মীয় পুরুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই চাঁদিয়ার। বাঁচিয়ে তোলার পর নিজের ভাগ থেকে অনবরত খাবার দেওয়া পর্যন্ত এ যাবত যা যা ধনপত করেছে তাতে চোখে জল এসে যায়।

ধনপত কী উদ্দেশ্যে 'মুসিবত' কথাটা বলেছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না চাঁদিয়ার। এক ঢোক চা খেয়ে সে বলে, 'হাঁ।'

'জমিমালিক না এলে কাম মিলবে না। তখন কী করব আমরা?'

চাঁদিয়া চুপ করে থাকে। তার খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

ধনপত আবার বলে, 'আমি একটা পুরুখ (পুরুষ)—জওয়ান আদমী, যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে পারি। লেকেন মুসিবত তোমাকে নিয়ে। আওরতের চারপাশে বহোত খতরা (বিপদ)।'

ধনপত তার জন্য যথেষ্ট করেছে। নিজের জন্য তাকে আর আটকে রাখা ঠিক নয়। মুখ নামিয়ে বিমর্ষ গলায় চাঁদিয়া বলে, 'কাম না মিললে তুমি চলে যেও। আমার যা হওয়ার হবে।'

ধনপত হঠাৎ যেন খেপেই ওঠে, 'একবার লাকরারা তোমাকে ছিঁড়ে খেয়েছে। দুনিয়ায় আরো লাখ লাখ লাকরা রয়েছে। তারা তোমাকে আবার ছিঁড়ে খাক—তা-ই চাও?'

ধনপতের রাগটা বড় ভাল লাগে চাঁদিয়ার। এমন করে তার জন্য কেউ কখনও চিন্তা করেনি। বাপ-মা নিশ্চয়ই তার বিষয়ে ভেবেছে কিন্তু তারা বেজায় গরিব, খুবই অসহায়। আবছা গলায় সে বলে, 'নেহী। লেকেন—'

'লেকেন কা?'

'কী করব আমি? কোথায় যাব?'

চাঁদিয়ার কথা শেষ হতে না হতেই কোত্থেকে চার পাঁচটা লোক এসে পড়ে। তাদের কারুর পরনে ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে পুরু চামড়ার নাগরা, মাথায় মোটা টিকি এবং কাঁধে আনকোরা নতুন গামছা; কারুর গায়ে ফুর প্যান্ট, দামি জামা।

এদের মধ্যে যার বয়স সব চাইতে বেশি তার চেহারাটা ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা, নাম মুনোয়ারপ্রসাদ। বাঁ হাতের তেলোয় খৈনি ডলতে ডলতে সে ধনপতদের কাছে এগিয়ে আসে। খুব নরম গলায় বলে, 'কা রে, তোরা সব কামের খোঁজে বসে আছিস?'

ধনপতেরা সবাই নড়েচড়ে বসে। সেই দুপুর কিংবা তার আগে থেকে এতগুলো লোক যে জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সেই কাম্য বস্তুটি কি শেষ পর্যন্ত হাতের কাছে চলে এসেছে? সবাই একসঙ্গে সায় দেয়, 'হাঁ হুজৌর।' ধনপতরা মুনোয়ারপ্রসাদকে বড় জমিমালিক ভেবে নিয়েছে।

এবার মুনোয়ারপ্রসাদ গাছতলার মানুষগুলোকে গুনতে শুরু করে, 'এক, দো, তিন, চার .... বিশ .... পচাশ .... একশ এক ...... একশ দো ..... একশ দশ .....' গোনা হয়ে গেলে বলে, 'তোদের সবাইকে আমার দরকার।'

গোটা জটলাটা আচমকা উত্তেজনায় হই চই বাধিয়ে দেয়। বলে, 'আমরা কাম পাব হুজৌর?'

'জরুর। বহোত বড়িয়া কাম।' মুনোয়ারপ্রসাদ বলতে থাকে, 'দো চার রোজকে লিয়ে নেহী, কমসে কম ছে মাহিনাকা কাম—হাঁ।'

গরিবের চাইতেও গরিব, ভুখা, আধনাঙ্গা লোকগুলো প্রথমটা একেবারে তাজ্জব বনে যায়। একটানা ছ মাসের জন্য পেটের চিন্তা থাকবে না, এমন ঘটনা তাদের জীবনে একেবারেই অবিশ্বাস্য। আজ পেটের দানা জুটলে, কালই যাদের উদ্‌ভ্রান্তের মতো খাদ্যের খোঁজে ছুটতে হয় তাদের কাছে এটা কোনো অপার্থিব স্বপ্নের মতো।

বামদেওরা অবাক বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, 'একসাথ ছে মাহিনাকা কাম!'

'হাঁ।' মুনোয়ারপ্রসাদ জানায়, শুধু ছ মাসের কাজই নয়, মজুরি যা মিলবে তা তারা ভাবতেও পারে না। হররোজ মাথাপিছু এই লোকগুলোকে দশ টাকা করে দেওয়া হবে।

এখানে যে আদিবাসী বা অচ্ছুতেরা জমা হয়েছে, তাদের চোদ্দ পুরুষে কেউ কখনও দৈনিক দশ টাকা কামাইয়ের কথা চিন্তা করতে পারে নি। বিস্ময়ে তারা একেবারে হাঁ হয়ে যায়।

এতগুলো মানুষের লোভ এবং আশাকে আরো খানিকটা উসকে দেয় মুনোয়ারপ্রসাদ, 'মজুরি ছাড়াও রোজ খোরাকি পাবি। একটা পাইসাও তোদের খরচা নেই। রোজ পুরা দশগো করে রুপাইয়া তোদের জমবে—হাঁ।'

মুনোয়ারপ্রসাদ যেন কোনো অকল্পনীয় স্বপ্নের জগৎ থেকে সুখ আর আরামের খবর নিয়ে সিধা এই দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় নেমে এসেছে। শ্বাসরুদ্ধের মতো তারা বলে, 'সচ?'

'সচ না তো কা ঝুট ? মুনোয়ারপ্রসাদ তিওয়ারীর গলার নলিয়া দিয়ে কোনোদিন ঝুট বেরোয় না। কভী নেহী।' বলতে বলতে একটু থামে মুনোয়ার। পরক্ষণেই আবার শুরু করে, 'ছে মাহিনায় এক এক আদমী কেত্তে পাইসা জমাতে পারবি, একবার মনে মনে হিসেব করে দ্যাখ।'

ছমাস রোজ মাথাপিছু দশ টাকা করে পেলে মোট কত টাকা হয়, এত বিরাট একটা অঙ্ক কষতে লোকগুলো একেবারে হিমসিম খেয়ে যায়। একদিনের মজুরিই যারা জমাতে পারে না তাদের পক্ষে ছ মাসের হিসেব কষা অসম্ভব ব্যাপার। ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে, 'আপনিই হিসেব করে দিন হুজৌর—'

হাতের চেটোয় খৈনি ডলা হয়ে গিয়েছিল। মুনোয়ারপ্রসাদ তার সঙ্গীদের এক চিমটি করে দিয়ে বাকিটা নিচের ঠোঁটের তলায় গুঁজে খানিকক্ষণ আরামে চোখ বুজে থাকে। তারপর পিচিক করে খয়েরি রঙের খানিকটা থুতু ফেলে বলে, 'এত তাড়াহুড়োর কী আছে, কাম কাজ চালু কর। পরে হিসেব করে দেব।'

কেউ আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করে না।

মুনোয়ার কী ভেবে বলে, 'ছে মাহিনায় লগভগ এক এক আদমীর দেড় দো হাজার জমে যাবে।'

শুনতে শুনতে উত্তেজনায় দম আটকে আসে ধনপতের। ছ মাসে দেড় দু হাজার টাকা! তা হলে বছর খানেক খাটলেই জনমদাসের জীবন থেকে বাপ-মা-ভাইবোন সবাইকে সে মুক্ত করে আনতে পারবে। মোটে একটা বছর! তারপর পৃথিবীর আর সব স্বাধীন মানুষের মতোই তারা মর্যাদা এবং সম্মান পাবে। চন্দ্রিকা সিংয়ের পহেলবানেরা লাঠি ঠুকে তাদের বেগার খাটাতে নিয়ে যাবে না।

অনেকক্ষণ পর জোরে শ্বাস টানে ধনপত। মুক্তির আগাম আনন্দে তার হৃৎপিণ্ড প্রবল বেগে উথল পাথল হতে থাকে।

জটলার মধ্যে বসে রামদেওরা কিছু ভাবছিল। আচমকা সে শুধোয়, 'ছে মাহিনার কামের কথা বলছেন তো হুজৌর—'

'হাঁ। এতক্ষণ তা হলে শুনলি কী?' দ্বিতীয় বার খৈনির পিচকি ফেলে মুনোয়ারপ্রসাদ।

রামদেওরা বলে, 'লেকেন সরকার—' তার মনে কোথায় যেন একটা খটকা দেখা দিয়েছে।

'লেকেন কী?' সরাসরি রামদেওরার চোখের দিকে তাকায় মুনোয়ারপ্রসাদ।

'ধানকাটাই তো ছে মাহিনা চলে না, এক দেড় মাহিনাতেই খতম হয়ে যায়।'

একটু যেন থতিয়ে যায় মুনোয়ারপ্রসাদ। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে, 'ধানকাটাইয়ের জন্যে তোদের নিতে আসি নি।'

'তব্?'

'জঙ্গল কাটাইয়ের জন্যে।'

এতক্ষণে বোঝা যায়, মুনোয়ারপ্রসাদ বড় জমিমালিক নয়। সে অন্য উদ্দেশ্যে দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় এসেছে।

ভিড়ের পেছন দিক থেকে একটা হট্টাকট্টা চেহারার লোক বলে ওঠে, 'কঁহা হোগা জঙ্গলকাটাই?'

মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'সাহারাসাকা নাম শুনা হ্যায় কভী?'

সবাই মাথা নাড়ে—শুনেছে।

মুনোয়ারপ্রসাদ এবার বলে, 'ইঁহাসে হোগা যাট পঁয়যট মিল। ওখানে জঙ্গল কাটতে যেতে হবে। পেঁড় উড় (গাছপালা) সাফাইয়ের পর বহোত ভারি কারখান্না বসবে। সমঝা?'

মুনোয়ারপ্রসাদ বলতে থাকে, 'কোঈ চিন্তা নেহী। ওখানে ঘর তুলে রেখেছি। বর্তন উর্তন (বাসন কোসন), বিস্তারা (বিছানা), হেরিকেন, মিট্টি তেল আউব চুলহা ভি হ্যায়। সিরিফ আপনা হাত-পা নিয়ে গেলেই চলবে। ওখানে পৌঁছেই দেখতে পাবে, সব কিছু 'বিডি'।' 'রিডি' মানে রেডি।

এত সব অভাবনীয় সুযোগ সুবিধার কথা শুনবার পরও কেউ কিছু বলে না। মুখচোখ দেখে বোঝা যায়, দূরে যাওয়ার নামে লোকগুলো দ্বিধাগ্রস্ত।

মুনোয়ারপ্রসাদ জটলাটার ওপর দিয়ে দ্রুত একবার দু চোখ ঘুরিয়ে নেয়। লোকগুলোর মুখটুখ দেখে তাদের মনোভাব সে আন্দাজ কবতে পারে। এবা যেতে না চাইলে তার খুবই বিপদ।

আসলে মুনোয়ারপ্রসাদ একটা আড়কাঠি। ঠিকাদারদের মজুর জুটিয়ে দেওয়ার বদলে সে প্রচুর 'কমিশন' পেয়ে থাকে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কাজের লোকদেব নিয়ে। এ অঞ্চলের আনপড় ভূমিহীন মানুষেরা এমনই ঘরকুনো যে না খেয়ে ভুখা মবতে রাজি কিন্তু কিছুতেই দূরে যেতে চাইবে না। কী কষ্টে, কত লোভ টোভ দেখিয়ে যে এদের ফাঁদে ফেলতে হয তা শুধু মুনোয়ারপ্রসাদই জানে। হাত-পা-মুখ-মাথা নেড়ে, গলার স্বর কখনও উঁচুতে তুলে, কখনও খাদে নামিয়ে সে বলতে থাকে, 'ওখানে গেলে বঢ়িয়া ভোজন মিলবে। রোজ রাত্তিরে নওটঙ্কী লাগিয়ে দেব, গানা শুনতে পাবি। আরামে থাকবি। তা হলে বাত পাক্কা হয়ে গেল।'

তবু সংশয় কাটে না লোকগুলোব। একজন বলে, 'লেকেন হুজৌর—'

দু হাত প্রচণ্ডভাবে নাড়তে নাড়তে মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'লেকেন উকেন কুছ নেহী।' বলেই বুক পকেট থেকে সুতোয় বাঁধা ঢাউস একটা ঘড়ি বাব করে, 'দো বাজকে বিশ। সাড়ে চারটেয় টিরেন হ্যায়। তুরন্ত সব উঠে পড়। হোটেলে ভাত-মাংস খাইয়ে তোদের টিরেনে তুলব। ওঠ ওঠ—'

ভাত-মাংসের নামে এবং আরামে থাকার লোভে বেশির ভাগই উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তবে বিশ তিরিশ জন একেবারে বেঁকে বসে।

মুনোয়ারপ্রসাদ বোঝাতে থাকে, ষাট পঁয়ষট্টি মাইল কতটা আর দূর! ট্রেনে উঠলে চার পাঁচ ঘণ্টায় পৌঁছে যাবে। ইচ্ছা হলেই তারা যখন ইচ্ছা ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু ওখানে গেলে যা মিলবে—টাকাপয়সা, আরাম, সুখ, বঢ়িয়া খাদ্য—এমনটা দুনিয়ার আর কোথাও পাবে না। বোকামি করে কেউ যেন এই সুযোগ না হারায়। নইলে পরে পস্তাতে হবে।

এতেও ওই বিশ তিরিশ জনকে টলানো যায় না। তারা নিজেদের প্রতিজ্ঞায় অনড় থাকে।

এদিকে নিচু গলায় ধনপত আর চাঁদিয়া নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। ধনপত শুধোয়, 'কী করবে? সাহারসায় যাবে, না অন্য কামের ধান্দা করবে?'

চাঁদিয়া জানায়, এই মুহূর্তে অন্য কাজ আর কোথায় জুটবে? হাতের কাছে যা পাওয়া যাচ্ছে সেটা নেওয়াই ভাল।

ধনপত বলে, 'পাইসা কামাইয়ের জন্যে বেরিয়েছি। যেখানে পাইসা সেখানেই চলে যাব। জরুরত হো যায় তো দুনিয়ার শেষ মাথায় যেতেও রাজি।'

'ঘরে ফিরতে পারব না। যেখানে পেটের দানা মিলবে সেখানেই তো যেতে হবে।'

ঘরে ফেরা সম্বন্ধে চাঁদিয়ার মতো অতখানি হতাশ নয় ধনপত। তার বিশ্বাস, টাকাপয়সা রোজগার করে একদিন না একদিন সে ধুরুয়া গাঁয়ে ফিরে আসতে পারবে। সাহারসা যাওয়ার ব্যাপারে দু'জনে একমত হয়ে যায়।

পাঁচ

শেষ পর্যন্ত মোট ছিয়াত্তর জন মুনোয়ারপ্রসাদের সঙ্গে সাহারসা যেতে রাজি হয়। কথাবার্তা পাকা করে তাদের নিয়ে মুনোয়ার এবং তার সঙ্গীরা সোজা চলে যায় হোটেলে। সপ্তাহে দু'বার হাট বসে বলে দুধলিগঞ্জে তিন চারটে স্থায়ী ভাত-রুটির হোটেল আছে।

ভাত ডাল সবজি এবং মাংস দিয়ে একটা উৎকৃষ্ট 'ভাতকা ভোজন' করিয়ে ছিয়াত্তর জনকে আধ মাইল দূরের রেল স্টেশনে নিয়ে যায় মুনোয়ারপ্রসাদ। ট্রেনে ওঠার আগে সবাইকে হাত-খরচ বাবদ পাঁচ পাঁচটা করে টাকা দেয়।

চারটে দশে ট্রেন আসার কথা। প্রায় দেড় ঘণ্টা 'লেট' করে ট্রেনটা এল সাড়ে পাঁচটায়।

সবাইকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে একটা মোটামুটি ফাঁকা কামরায় তুলে ফেলল মুনোয়ারপ্রসাদ এবং তার দলের লোকেরা। ওরা উঠতে না উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

জানালার ধারে মুখোমুখি বসার জায়গা পেয়েছিল ধনপত আর চাঁদিয়া।

কয়লার ইঞ্জিন গল গল করে বাতাসে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটে চলেছে। দু ধারের দৃশ্যাবলী কিছুই এখন স্থির নেই। গাছপালা, ধানের খেত, মজা নহর, টেলিগ্রাফের থাম, সব কিছু ঊর্ধ্বশ্বাসে পেছন দিকে সরে সরে যাচ্ছে।

শীতের রোদ নিভে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। সূর্যটাকে আকাশের কোথাও এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পশ্চিম দিগন্তের নিচে কখন যে সেটা নেমে গেছে, কে জানে। সমস্ত চরাচর জুড়ে শীতের ঝাপসা সন্ধ্যা দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসে লক্ষ কোটি হিমের সূক্ষ্ম দানা মিশতে শুরু করেছে। থেকে থেকে উলটোপালটা উত্তুরে হাওয়ার একেকটা ঝলক চামড়ায় যেন ছুরি চালিয়ে দিচ্ছে।

একসময় জানালার কাচ নামিয়ে দেয় ধনপত। তাতে হাওয়াটা ঠেকানো গেলেও ঠাণ্ডা খুব একটা কমে না। কামরাসুদ্ধ সবাই হি হি কাঁপতে থাকে। পরনে সামান্য যেটুকু আচ্ছাদন রয়েছে সেটুকু টেনে টুনে গায়ে ভাল করে জড়িয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছে তারা।

ওধারের একটা বেঞ্চে দু পা তুলে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে গাঁজার কল্কের মতো করে এক টানে অর্ধেকটা পুড়িয়ে ফেলে মুনোয়ারপ্রসাদ। হুস করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গোটা কামরাটা আস্তে আস্তে দেখে নেয়। চুক চুক করে সহানুভূতির সুরে বলে, 'বহোত জাড়। তোদের বড় তখলিফ।'

কেউ উত্তর দেয় না। শুধু মনোয়ারপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুনোয়ার দ্বিতীয় টানে সিগারেটটা শেষ করে ফের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'সাহারসায় গেলে তোদের তখলিফ আর থাকবে না। সবার জন্যে কম্বলের ব্যওস্থা আছে সেখানে।' একটু থেমে ফের বলে, 'আমার কাজে ফাঁকি পাবি না। সব দিকে আমার নজর আছে—হাঁ। যাদের কামে লাগাব তাদের সুখ-আরাম দেখব না, আমার কাছে সেটি হবে না।'

অনেকেই বলে, 'আপহীকা কিরপা—' কম্বলের প্রতিশ্রুতি পেয়ে তারা মোটামুটি চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ওদের কারুরই গরম জামা কাপড় নেই। বিহারের অসহ্য শীতে ফি বছরই 'ঘুর' (আগুনের কুণ্ড) জ্বেলে তার পাশে শুয়ে শরীর উত্তপ্ত রাখতে হয়। এই প্রথম তারা কম্বল পেতে চলেছে। মুনোয়ারপ্রসাদের মহানুভবতায় ছিয়াত্তরটা পুরুষ এবং আওরত একেবারে অভিভূত হয়ে যায়।

ট্রেন যত এগুচ্ছে ততই মন খারাপ হতে থাকে ধনপতের। প্রথম দিকের সেই আশা এবং উৎসাহ ক্রমশ ম্লান হয়ে যায়। ধুরুয়া এবং তার আশেপাশের বিশ বাইশটা গাঁয়ের বাইরে এর আগে আর কখনও কোথাও যায় নি সে। নিরানন্দ মুখে বলে, 'ঘরমুল্লুক থেকে কেত্তে দূর চলে যাচ্ছি—' বলতে বলতে থেমে যায়।

অস্ফুট গলায় চাঁদিয়া কী জবাব দেয়, বোঝা যায় না।

ধনপত আবার বলে, 'মা-বাপের সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা, কে জানে।'

চাঁদিয়া এবার বলে, 'তখন যে বললে পাইসা কামাই করে জমিমালিকের কাছ থেকে মা-বাপ-ভাইবোনকে ছাড়িয়ে আনবে। গাঁওয়ে ফিরলে তাদের সঙ্গে তো দেখা হবেই।'

ধনপত বলে, 'বলেছিলাম ঠিকই। লেকেন—'কথাটা আর শেষ করে না সে।

তার মনোভাব বুঝতে পারে চাঁদিয়া। সেও আর কোনো প্রশ্ন করে না।

বাইরের হিম এবং অন্ধকারের মতো কামরার ভেতরেও ঘন হয়ে বিষাদ নামতে থাকে।

ছয়

মুনোয়ারপ্রসাদ জানিয়েছিল মাঝ রাতে তারা পৌছে যাবে। কিন্তু অনেক জায়গায় লাইন ক্লিয়ার না পেয়ে, থেমে থেমে এবং টিকিয়ে টিকিয়ে শেষ পর্যন্ত যখন ডুমনিগাঁও স্টেশনে ট্রেনটা পৌঁছুল, ভোর হয়ে গেছে। রোদ অবশ্য ওঠে নি। কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা হলেও আকাশের গায়ে আলোর আভা ফুটতে শুরু করেছে।

তাড়িয়ে তাড়িয়ে যেভাবে মুনোয়ারপ্রসাদ লোকগুলোকে গাড়িতে তুলেছিল ঠিক সেইভাবেই গাড়ি থেকে নামালো।

ডুমনিগাঁও ছোট স্টেশন। একধারে পুরনো লাল বাড়িটা স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে শুরু করে টিকেট কাউন্টার পর্যন্ত যাবতীয় কিছু। সেটার লাগোয়া টালির চালের ছোট একটা শেডের তলায় 'চায় কা দুকান'। সেখানে বাজে বেকারির লাল লাল পাঁউরুটি আর বিস্কুট মেলে।

প্ল্যাটফর্ম বলতে দু ধারে উঁচু খানিকটা করে জমি। তারপর থেকেই ফসলের মাঠ শুরু হয়েছে। যতদূর চোখ যায় ধু ধু প্রান্তর। ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর গাছপালা আর দু-একটা হতচ্ছাড়া চেহারার দেহাতী গাঁ।

নির্জন দ্বীপের মতো এই ডুমনিগাঁও স্টেশনে ধনপতরা ছিয়াত্তর জন এবং মুনোয়ারপ্রসাদের দলটা ছাড়া আর কেউ নামে নি। তারা নামার পর ট্রেনটা এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না, ঝুক ঝুক করতে করতে ডিসট্যান্ট সিগনাল পেরিয়ে দূরের বাঁক ঘুরে ধানখেতের ভেতর দিয়ে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে।

এদিকে মুনোয়ারপ্রসাদ অনবরত তাড়া দিতে দিতে ধনপতদের 'চায়কা দুকান'টায় নিয়ে আসে। বলে, 'পয়লে চায়-পানি পী লে, পিছা দুসরি বাত।'

ধনপতরা আগে লক্ষ করে নি, প্ল্যাটফর্মটা ফাঁকা হলেও চায়ের দোকানে আট দশটা লোক বসে আছে।

লোকগুলোর কারুর পরনে খাটো ধুতি, এবং মোটা কাপড়ের জামার ওপর কম্বল জড়ানো। কেউ কেউ ফুর প্যান্ট আর রোঁয়াদার উলের সোয়েটার পরেছে। মাথায় সবারই কান-ঢাকা গরম টুপি। নাকের ডগা, ঠোঁট এবং চোখ দুটো ছাড়া তাদের আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

মুনোয়ারপ্রসাদ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের দেখে চায়ের দোকানের ওই লোকগুলো উঠে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে ফুর প্যান্ট-পরা মধ্যবয়সী একটা লোক বলে, 'আ গিয়া তুমলোগন—'

বোঝা যায়, এই লোকগুলো মুনোয়ারপ্রসাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

মুনোয়ারপ্রসাদ মাথা নাড়ে, 'হাঁ মিশিরজি—'

'কাল রাত্তিরে তোমাদের পৌঁছুবার কথা। সেই থেকে আমরা এখানে বসে আছি। এত্তে দেরি হল যে?'

'কা করে! টেরেন জ্যাদা লেট কিয়া।'

'পুরা রাত জাড়ে (ঠাণ্ডায়) আর মচ্ছরের কামড়ে জান চৌপট হো গিয়া।'

'কা করে মিশিরজি, রেল কোম্পানির ওপর আমার হাত নেই। টিরেন আপনা মর্জিসে চলে। কারুর সুবিধা-অসুবিধা থোড়াই পরোয়া করে। আপনাদের তকলিফের জন্যে মনমে বহোত দুখ হোতা হ্যায়।' মুনোয়ারপ্রসাদের কথাবার্তার ধাঁচ শুনে টের পাওয়া যায়, মিশিরজি নামে এই লোকটাকে বেশ খাতিরদারিই করে সে।

'ঠিক হ্যায়—' মিশিরজি মাথা নাড়ে। অর্থাৎ মুনোয়ারপ্রসাদের কথাটাকেই সে মেনে নেয়—রেল কোম্পানির মর্জি-মেজাজের ওপর কারুর হাত নেই। পরক্ষণেই তার চোখ গিয়ে পড়ে ধনপতদের ওপর। দ্রুত তাদের দেখে নিয়ে মোটামুটি সংখ্যাটা আন্দাজ করে নেয়। বলে, 'এ কা! শও আদমীও তো আনতে পার নি। তোমাকে বলে দিয়েছিলাম, কমসে কম তিন চার শ আদমী লাগবে। এত্তে বড় জঙ্গল কাটাই হবে কী করে?'

চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত একবার ধনপতদের দেখে নেয় মুনোয়ারপ্রসাদ। তারপর ইশারায় মিশিরজিকে দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলে, 'এ ক'জনকে জোটাতেই বহোত তখলিফ হয়েছে। চিন্তা নায় করনা। দশ রোজের মধ্যে বাকি আদমী জরুর পেয়ে যাবেন।'

'দশ রোজের বেশি দেরি করো না। সাহাবরা জোর তাগাদা লাগাচ্ছে।'

'ঠিক হ্যায়। সাহাবদের আমার কমিশনের পাইসাটা থোড়েসে বাড়িয়ে দিতে বলবেন।'

'কাম ঠিকমতো কর। পাইসার জন্যে চিন্তা করতে হবে না। সমঝা?'

'সমঝ গিয়া। অব্ উধর চলিয়ে—'

ফের চায়ের দোকানে ফিরে এসে মুনোয়ারপ্রসাদ দোকানদারকে বলে, 'হর আদমীকো চায় আউব এক এক পাঁও দেও।'

ডুমনির্গাঁও স্টেশনের টিমটিমে হতচ্ছাড়া চেহারার চা দোকানের মালিক এত বড় 'অর্ডার' সারা জীবনে আর পেয়েছে কিনা মনে করতে পারে না। মুহূর্তে প্রচণ্ড ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়।

চা-রুটি খাওয়ার পর মুনোয়ারপ্রসাদ আনুষ্ঠানিকভাবে মিশিরজির সঙ্গে ধনপতদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, 'এই হচ্ছে আসল লোক। জঙ্গল কাটাইয়ের জায়গায় মিশিরজি তোদের নিয়ে যাবে। বহোত আচ্ছা আদমী—সব দিকে এর নজর। তোদের দেখ-ভাল করবে। কোঈ চিন্তা নেহী।'

একে তো মুনোয়ারপ্রসাদ তাদের সম্পূর্ণ অচেনা। তবু কাল দুপুর থেকে আজকের এই সকাল পর্যন্ত একসঙ্গে কাটিয়ে লোকটাকে খারাপ লাগে নি, বরং তাদের সম্পর্কে বেশ সহানুভূতিপ্রবণই মনে হয়েছে। কথায় বার্তায় মমতা ঝরে ঝরে পড়ে তার। কিন্তু মিশিরজি লোকটা কেমন, কে জানে। মিশিরজির হাতে তুলে দিয়ে মুনোয়ারপ্রসাদ কোন অনিশ্চয়তার দিকে তাদের ঠেলে দিচ্ছে, তাই বা কে বলবে! সবাই বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

রামদেওরা বলে, 'আপ হামনিকো সাথ নেহী যায়েগা?'

মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'আমি পরে যাব। তোমরা মিশিরজির সঙ্গে চলে যাও। কোঈ চিন্তা নেহী।'

'ফির কখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে?'

'সামকো (সন্ধে বেলায়)।'

রামদেওরা আর কোনো প্রশ্ন করে না। তারা জানে না, মুনোয়ারপ্রসাদের সঙ্গে জীবনে আর কখনও দেখা হবে না। বিহারের নানা জায়গা থেকে মজুর জুটিয়ে এনে ডুমনির্গাঁও স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্তই তার কাজ। মিশিরজির কাছে এইসব লোকের দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারলেই তার ভূমিকা শেষ। লেবার কনট্রাক্টরদের খাতায় মজুর সাপ্লাই বাবদে তার নামে মোটা টাকার কমিশন লেখা হবে।

এদিকে কুয়াশা কেটে যেতে শুরু করেছে। অঘ্রাণ মাসের সূর্য রক্তাভ মাথা তুলে আস্তে আস্তে

দিগন্তের তলা থেকে উঠে এসেছে। হু হু করে উত্তুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে দু ধারের গাছপালা নহব শস্যক্ষেত্র ইত্যাদির ওপর দিয়ে।

এবার আর মুনোয়ারপ্রসাদ নয়, মিশিরজিই তাড়া লাগায়, 'আর বসে থাকতে হবে না। ওঠ, ওঠ, উঠে পড় সব। টিশনের বাইরে গাড়িয়া রয়েছে।'

ধনপতেরা আগে লক্ষ করে নি। এখন তাদের চোখে পড়ে দশ দশটা ভৈসা গাড়ি স্টেশনের বাইরের কাচ্চীতে অর্থাৎ কাঁচা মাটির রাস্তায় কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মিশিরজি এবং তার সঙ্গীরা ধনপতদের গাড়িতে তুলে দেয়। মুনোয়ারপ্রসাদ তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ফাঁকা স্টেশনে বসে থাকে।

কিছুক্ষণ পর দশটা গাড়ির বিশটা চাকায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করতে করতে ভৈসা গাড়িগুলো চলতে শুরু করে। ভৈসোয়াররা তালুতে জিভ ঠেকিয়ে চুর্‌র্‌ চুর্‌র্‌ শব্দ করতে করতে মাঝে মাঝে মোষগুলোর গায়ে খোঁচা মেরে চলার বেগ বাড়িয়ে দেয়।

দু ধারে মাইলের পর মাইল ধানের খেত। মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা কাঁচা সড়কে ভৈসা এবং বয়েল গাড়ির চাকার অগুনতি দাগ।

একটা গাড়ির ছইয়ের তলায় আরো সাত-আট জনের সঙ্গে বসে আছে ধনপত এবং চাঁদিয়া। কেউ কথা বলছে না। নির্জন ফসলের মাঠের ওপর দিয়ে ভৈসা গাড়িগুলো পৃথিবীব কোন সুদূর প্রান্তে তাদের নিয়ে চলেছে, কে জানে।

সাত

দিনটা যখন দুপুর এবং বিকেলের মাঝামাঝি জায়গায় থমকে আছে ঠিক সেই সময় ভৈসা গাড়িগুলো একটা বিরাট জঙ্গলের কাছে এসে থামল।

প্রথম গাড়িটা থেকে নেমে মিশিরজি হাঁক দিয়ে বলে, 'আ গিয়া হামলোগন। উতার আ, উতার আ—সব কোঈ—'

ধনপতরা গাড়িগুলো থেকে নেমে আসে। আর নামতেই তাদের চোখে পড়ে, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে সার দিয়ে টালির চাল আর চুন-সুরকির গাঁথনি-দেওয়া ইটের দেওয়াল দিয়ে নিচু নিচু অগুনতি অস্থায়ী ঘর বানিয়ে রাখা হয়েছে। ওগুলোর কাছেই পর পর অনেকগুলো নতুন কুয়ো। সেখানে কিছু লোকজন বসে ছিল, ভৈসা গাড়িগুলো দেখে তারা ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে।

মিশিরজি ওই লোকগুলোর উদ্দেশে বলে, 'সব ঠিক করে রেখেছ তো?'

লোকগুলো সমস্বরে জানায়, 'হাঁ।'

এবার ধনপতদের দিকে ফিরে মিশিরজি বলে, 'চল, আগে অফিসে গিযে পয়লা কামটা চুকিয়ে নিই। দশ 'মিনট'কা (মিনিট) কাম। তারপর তোমাদের ভোজন উজনের ব্যওস্থা করব। আও মেরা সাথ—' বলে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তার পেছন পেছন ধনপতরা নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। কাল পড়তি বেলায় দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় ভাত খাওয়ার পর সাবা রাত পেটে আর কিছু পড়ে নি। অবশ্য সকালে ডুমনিগাঁও স্টেশনে চা পাঁউরুটি মিলেছে। কিন্তু পুবা রাত ভুখা থাকার পর ওতে কী হয়! তারপরও এই বিকেল পর্যন্ত আর কিছুই জোটে নি। পেটের ভেতর এখন হু হু করে আগুন জ্বলছে সবার। তা ছাড়া ট্রেন এবং ভৈসা গাড়ির অনবরত 'গতরচূরণ' ঝাঁকানিতে শরীরে আর কিছু নেই, পা থেকে মাথা পর্যন্ত যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে।

সেই সারিবদ্ধ টালির ঘরগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে মিশিরজি চেঁচিয়ে বলে, 'এই ঘরগুলো তোমাদের। দেখ, তোমাদের থাকার জন্যে কেমন বঢ়িয়া ব্যওস্থা করে রেখেছি।'

কেউ উত্তর দেয় না। এখন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তে পারলে তারা বেঁচে যায়।

সারিবদ্ধ ঘরগুলোর পর খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর আবার খানকতক ঘর। এগুলো আগের ঘরগুলোর মতো চাপা আর নিচু নয়—বেশ উঁচু এবং বড় মাপের। একটা ঘরের সামনে হিন্দিতে

সাইনবোর্ড লেখা আছে : 'সাইট অফিস, পিপরিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, পিপরিয়া, বিহার।' আনপড়, অক্ষর পরিচয়হীন ধনপতেরা অবশ্য তা পড়তে পারে না।

ঘরটা দেখিয়ে মিশিরজি বলে, 'এটা আমার হেড অফিস। যার যা দরকার হবে, এখানে এসে 'রিপোর্ট' করতে হবে—সমঝা?'

সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয়।

এবার মিশিরজি তার সাঙ্গপাঙ্গদের দিকে ফিরে বলে, 'এ ঘনুয়া, চেয়ার টেবুল আর রেজিস্টারি খাতা বাইরে নিয়ে আয়।'

একটা তাগড়াই জোয়ান ছোকরা দৌড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করে। ঘরের ভেতর থেকে বাইরের ইট-বসানো বারান্দায় চেয়ার টেবল এনে পেতে দেয়। একটা ঢাউস খাতা, টিনের বাক্স, দোয়াত কলম আর 'অঙ্গুঠার টিপছাপ' (বুড়ো আঙুলের ছাপ) দেওয়ার জন্য কালির প্যাড গুছিয়ে রাখে।

মিশিরজি এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করে না। চেয়ারে বসে মোটা খাতাটা খুলতে খুলতে হাঁকে, 'সব কোঈ বৈঠ যাও। আমি যাকে যখন ডাকব সে উঠে আসবে।'

ধনপতরা চুপচাপ বসে পড়ে।

মিশিরজি এবার আরেকটা ছোকরাকে ডেকে বলে, 'কনটেরাক্টের কাগজ বার করে টিপছাপ নেওয়ার ব্যওস্থা কর জগদেও।'

জগদেও নামধারী ছোকরাটি টিনের বাক্স থেকে অনেকগুলো ছাপানো কাগজ বার করে টেবলের ওপর সাজিয়ে কালির প্যাডটা খুলে অপেক্ষা করতে থাকে।

মিশিরজি সামনের দিকে তাকিয়ে প্রথম লোকটিকে ডাকে, 'ইধর আও—'

লোকটা উঠে আসে। মিশিরজি শুধোয়, 'তোমার নাম কী?'

ভীরু গলায় লোকটা বলে, 'ঘমণ্ডি—'

নামটা লিখতে লিখতে মিশিরলাল প্রশ্ন করে, 'মুলুক কঁহা?'

'পূর্ণিয়া জিলা—'

'গাঁও?'

'ধরমপুর—'

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে খোপ-কাটা ঘরে ঘরে লেখাও চলতে থাকে।

'তোমার সঙ্গে আর কে আছে?'

'আমার ঘরবালী, আউর ছোটা এক লেড়কী।'

'ঘরবালীর নাম?'

'জান্‌কী।'

'সেও কাম করবে তো?'

'হাঁ।'

'তোমার জেনানাকে ডাক।'

ঘমণ্ডি এবং জান্‌কী সম্পর্কে যাবতীয় বিবরণ লেখা হয়ে গেলে মিশিরজি জগদেওকে বলে, 'কনটেরাক্ট কাগজে এদের অঙ্গুঠার ছাপ লাগিয়ে নাও।'

জগদেও আলাদা দুটো কনট্রাক্ট ফর্মে দু'জনের আঙুলের ছাপ নিয়ে নেয়। এই ফর্মটা অঙ্গীকারপত্র। এতে হিন্দিতে যা লেখা আছে তা এইরকম। 'আমি সজ্ঞানে এই অঙ্গীকার করছি যে দৈনিক মজুরিতে পিপরিয়া সিমেন্ট কারখানার জন্য জঙ্গল কাটব। যতদিন এই কাজ চলবে ততদিন আমি এখান থেকে কোথাও যেতে পারব না।'

টিপছাপ নেওয়া হলে নিজের দলের মধ্যবয়সী একটা লোককে ডেকে মিশিরজি বলে, 'বদ্রিকা, ভাণ্ডারা থেকে ওদের চাল-ডাল-আটা-নিমক-মিরচি-মিট্টি তেল—সাত রোজের জন্যে হিসেব করে দিয়ে দাও। আর দেবে লালটীন কম্বল বর্তন কড়াইয়া—সম্‌সার করতে যা যা লাগে।' ঘনুয়াকে বলল, 'তুমি ওকে একটা ঘর দেখিয়ে দেবে। সেখানে ওরা থাকবে।'

বদ্রিকা এবং ঘনুয়া ঘমণ্ডিদের নিয়ে ওধারের একটা বড় ঘরের দিকে চলে যায়। ওটা ভাণ্ডারা বা স্টোর।

এবার ধনপতদের দিকে ফিরে অন্য একজনকে ডাকে মিশিরজি। সে উঠে এলে শুধোয়, 'নাম কা?'

লোকটা বলে, 'তৌহরলাল—'

আগের মতোই তার গাঁও মুল্লুকের ঠিকানা, সঙ্গে কে কে আছে ইত্যাদি জেনে লিখে নেয় মিশিরজি। তারপর জগদেওকে দিয়ে কনট্রাক্ট ফর্মে আঙুলের টিপছাপ লাগিয়ে বদ্রিকার সঙ্গে ভাণ্ডারায় পাঠিয়ে দেয়।

এইভাবে যান্ত্রিক নিয়মে একেক জনের ডাক পড়ে। তাদের যাবতীয় বিবরণ খাতায় লেখা হয়ে যায়, কনট্রাক্ট ফর্মে টিপসই নেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকা আর খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়।

সবার শেষে বসে ছিল ধনপত এবং চাঁদিয়া। মিশিরজি হাত নেড়ে ধনপতকে ডাকে। সে কাছে এলে নাম ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে। তারপর জানতে চায়—সঙ্গে কেউ আছে কি না।

চাঁদিয়াকে দেখিয়ে ধনপত বলে, 'ওই আওরত আছে।'

'তোমার জেনানা?'

'নেহী, নেহী—' প্রায় চমকেই ওঠে ধনপত।

সোজাসুজি ধনপতের চোখের দিকে তাকিয়ে মিশিরজি সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে শুধোয়, 'তব্ কা?'

সঠিক কী উত্তর দেবে সেটা ভেবে বার করতে খানিকটা সময় লাগে ধনপতের। তার মধ্যে মিশিরজির সন্দেহটা আরো ঘন হয়। আবার সে প্রশ্ন করে, 'লেড়কীকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছ নাকি?'

'নেহী নেহী—' নাকমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে ধনপতের।

'তা হলে আসল ব্যাপারটা কী?'

এতক্ষণে ঠিক জবাবটা খুঁজে পায় ধনপত। বলে, 'রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। কামের খোঁজে দু'জনে দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে এখানে এসেছি।' কিভাবে কোথায় এবং কী অবস্থায় চাঁদিয়াকে সে দেখেছে, সেটা আর বিশদভাবে জানায় না ধনপত।

তার কথা পুরোপুরি হয়ত বিশ্বাস করে না মিশিরজি। তবে চাঁদিয়া প্রসঙ্গে আর কোনো কৌতূহল না দেখিয়ে শুধু শুধোয়, 'জিলা আউর গাঁওকা নাম?'

তাবত বিবরণ লেখা হয়ে গেলে জগদেও যখন কনট্রাক্ট ফর্ম বার করে তার নাম লিখে টিপসই দিতে বলে তখন বেঁকে বসে ধনপত। অঙ্গুঠায় টিপছাপের ব্যাপারে ভীষণ ভয় তার। ধনপত শুনেছে, তার দাদার দাদাকে দিয়ে কী একটা করজপত্রে অঙ্গুঠার ছাপ লাগাবার ফলে তাদের সামান্য জমিটুকু চন্দ্রিকা সিংরা দখল করে নিয়েছে। তাতে তিন পুরুষ ধরে তাদের জনমদাসের জীবন কাটাতে হচ্ছে। মুক্তির জন্য ধুরুয়া গাঁ থেকে পালিয়ে এসে আবার কোনো মারাত্মক দায়ে আবদ্ধ হতে চলেছে কিনা কে জানে। ভীরু গলায় সে বলে, 'একগো বাত মিশিরজি—'

'কা?'

'আমাদের টিপছাপ নিচ্ছেন কেন?'

'বড়ে কোম্পানিতে কাম করতে হলে কনটেরাক্ট করতে হয়। এ হল কোম্পানিকা কানুন—সমঝা?'

ভয়ে ভয়ে ধনপত এবার জিজ্ঞেস করে, 'খতরা কুছ নেহী হোগা তো?'

ভরসা দিয়ে মিশিরজি বলে, 'আরে নেহী নেহী, চিন্তাকা কোঈ বাত নেহী। লাগাও টিপছাপ—'

সংশয় পুরোটা কাটে না ধনপতের। তবে পিপরিয়া পর্যন্ত এসে এখন আর পিছানো যায় না। মনে খিঁচ নিয়েই সে টিপসই দেয়।

ধনপতের পর চাঁদিয়া। তারপর একে একে বাকি সবাই। মোট ছিয়াত্তর জনের নামধাম মিশিরজির পাকা খাতায় উঠে যায়।

মিশিরজি বলেছিল, দশ 'মিনটে'র ভেতর সব কাজ চুকিয়ে ফেলবে। কিন্তু এতগুলো লোকের সমস্ত বিবরণ লিখে, টিপছাপ নিয়ে, খোরাকি বাবদ চাল গম আটা নিমক ইত্যাদি দিতে দিতে সন্ধে নেমে যায়।

আট

জায়গাটার একদিকে চাপ-বাঁধা ঘোর জঙ্গল। আরেক দিকে আদিগন্ত ফাঁকা মাঠ বলে শীতটা এখানে মারাত্মক। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, আকাশ থেকে যেন বরফ পড়ছে। মাটির লক্ষকোটি ছিদ্র দিয়ে উঠে আসছে অজস্র হিমের কণা। মনে হয়, শরীরের সব রক্ত বুঝি জমাট বেঁধে যাবে।

সারিবদ্ধ ঘরগুলোর শেষ মাথায় পাশাপাশি দুটো ঘর পেয়েছে চাঁদিয়া এবং ধনপত।

এর মধ্যেই যে যার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। দুই ঘরেই হেরিকেন জ্বলছে। শুধু তাদের ঘরেই নয়, পাশাপাশি সব ঘরেই আলো দেখা যাচ্ছে। রাতের খাদ্য তৈরির জন্য তোড়জোড় চলছে পুরোদমে। সকলেরই ইচ্ছা রাতের খাওয়া চুকিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কম্বলের ভেতর ঢুকে যাবে।

আর সবার মতোই আটা ছেনে বেলে নিয়েছে ধনপত। আলু এবং ভিণ্ডি কুটে ধুয়ে রেখেছে সিলভারের একটা বাটিতে। রুটি আর আলু ভিণ্ডির ভাজি দিয়ে আজকের রাতটা চালিয়ে নেবে। কিন্তু রসুই করার কায়দাকানুন কিছুই জানে না ধনপত। তারা গরিবের চাইতেও গরিব। পেটের জন্য দিনরাত তাদের ঘাড় গুঁজে পশুর মতো খাটতে হয়। তাই বলে কোনোদিন ভাত বা রুটি তাকে নিজের হাতে বানিয়ে নিতে হয়নি। বাড়িতে মা-ই এ সব করে।

জীবনে এই প্রথম রুটি বানাতে গিয়ে ভয়ানক বিপদে পড়ে যায় ধনপত। ভাণ্ডারা থেকে সবাইকে চুলহা এবং শুকনো লকড়ি দেওয়া হয়েছে। নিজের চুলহাটা ধরিয়ে রুটি সেঁকতে গিয়ে প্রথম দু-তিনটে সে পুড়িয়ে ফেলে। রুটিগুলো কতক্ষণ আগুনের ওপর ধরে রাখতে হয় সে সম্পর্কে তার আন্দাজ নেই। ধনপত একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই ঝঞ্ঝাটের চেয়ে একসঙ্গে চাল-ডাল-সবজি-টবজি বসিয়ে ফুটিয়ে নেওয়াটা সহজ ছিল। রুটি বানানো স্থগিত রেখে তা-ই করবে কিনা যখন ভাবছে সেই সময় পাশের ঘর থেকে চাঁদিয়া বলে ওঠে, 'কা, তোমার রোটি বানানো হয়ে গেল?'

ধনপত বলে, 'নেহী।'

চাঁদিয়া টের পেয়েছে, অনেকক্ষণ ধরেই রান্নার তোড়জোড় করছে ধনপত। এতক্ষণে সব হয়ে যাওয়ার কথা। সে একটু মজা করে বলে, 'অনেক কিছু রসুই করছ বুঝি?'

'অনেক আর কোথায়? সিরেফ রোটি আউর ভিণ্ডি-আলু ভাজিয়া।' ধনপত বলে।

শুনে বেশ অবাকই হয়ে যায় চাঁদিয়া, 'রোটি ভাজিয়া বানাতে এত্তে সময় লেগে যাচ্ছে!'

বিব্রতভাবে ধনপত বলে, 'বহোত মুসিবত হো গিয়া—'

'কা মুসিবত?'

হঠাৎ ধনপতের মনে হয়, রান্নার ব্যাপারে এই মেয়েটার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কথাটা প্রথম থেকেই কেন যে খেয়াল হয়নি তার! নিজের অক্ষমতা আনাড়িপনা জানিয়ে ধনপত বলে, 'রোটি বানাতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছি।'

'দাঁড়াও আসছি।'

একটু পর চাঁদিয়া এসে বলে 'কোঈ কামকা নেহী। চুলহার কাছ থেকে সর।'

রান্নার আগেই বিছানা পেতে রেখেছিল ধনপত। গায়ে কম্বল জড়িয়ে সে সেখানে গিয়ে বসে। আর ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে রুটি এবং ভাজি বানাতে বানাতে চাঁদিয়া কিছু ভাবে। তারপর বলে, 'একগো বাত।'

'কা?'

'রসুই করতে তো শেখো নি। পাশের ঘরে তুমি ভুখা থাকবে, এ তো আর হয় না। কাল থেকে চাল-ডাল-আটা আমাকে দিও। ভাত-রোটি বানিয়ে দেব।'

মনে মনে খুশিই হয় ধনপত। মুখে অবশ্য বলে, 'তোমার তখলিফ হবে।'

চাঁদিয়া জানায়, তার প্রাণ বাঁচানো থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যা যা ধনপত করেছে, সেই তুলনায় রান্না করে দেওয়াটা কিছুই না। তাছাড়া নিজের জন্যও ভাত ফোটাতে বা রুটি সেঁকতে তো হবেই। সেই সঙ্গে ধনপতেরটা রেঁধে দিলে এমন কিছুই বাড়তি পরিশ্রম হবে না।

কথায় কথায় রুটি এবং ভাজি তৈরি হয়ে যায়। চুলহা নিভিয়ে উঠে দাঁড়ায় চাঁদিয়া। বলে, 'এখবার যাই।'

'ঠিক হ্যায়।'

চাঁদিয়া চলে যায়।

আরো কিছুক্ষণ পর টানা ব্যারাকের মতো সারি সারি ঘরগুলোতে আলো নিভে যায়। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে সবাই এখন কম্বলের তলায় ঢুকে গেছে।

মানুষের চেনাজানা পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক দূরের, ভূগোলের এই জনহীন প্রান্তে রাত গভীর হতে থাকে। কুয়াশা এবং অন্ধকার আরো ঘন হয়। বাতাসে আরো হিম মিশতে থাকে।

নয়

কাদের চিৎকারে যেন সকালে ঘুম ভেঙে যায় ধনপতের।

'হেই—হেই—উঠে পড়ে সব, উঠে পড়। সকাল হয়ে গেছে।'

'হেই — হেই—'

একসঙ্গে পাঁচ সাতজন এক দিক থেকে আরেক দিকে হাঁটতে হাঁটতে হেঁকে যাচ্ছে।

কম্বলের তলা থেকে মুখ বাড়ায় ধনপত। দরজা বন্ধ থাকলেও টের পাওয়া যায় বাইরে বেশ আলো আছে। প্রথমটা সে বুঝতে পারল না, কোথায় রয়েছে।

চিৎকারটা আবার কানে এল, 'কামকা 'টেইম' (টাইম) হো গিয়া। দের নায় করনা—'

এবার সব মনে পড়ে যায় ধনপতের। ধড়মড় করে উঠে দ্রুত দরজা খুলে বাইরে আসে। তার চোখে পড়ে, প্রায় সব ঘর থেকেই লোকজন বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ভেতর চাঁদিয়াকেও দেখা যাচ্ছে।

একটু দূরে ঘনুয়া এবং আরো কয়েক জনকে দেখা গেল। এরা মিশিরজির লোক। ঘনুয়া বলে, 'তুরন্ত মুখটুখ ধুয়ে চায়-পানি খেয়ে অফিসের সামনে চলে এস। সাত বজ গিয়া। সাড়ে সাতটার ভেতর জরুর আসবে। হাজিরা খাতায় টিপছাপ দিয়ে আটটায় কাম চালু করতে হবে। জলদি জলদি চলা আও, মিশিরজি বুলায়া হ্যায়।' বলে ঘনুয়া তার দলবলসমেত অফিসের দিকে চলে যায়।

ঘনুয়ারাই তাহলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাদের ঘুম ভাঙিয়েছে! ধনপতের চোখ জুড়ে এখনও ঘুম লেগে আছে। কাল ভোর থেকে তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। শরীরে সারবস্তু আর কিছুই নেই তার। হাত-পায়ের জোড়গুলো একেবারে আলগা হয়ে গেছে। পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত অসহ্য ব্যথা। আজকের দিনটা পুরো ঘুমিয়ে নিতে পারলে শরীর চাঙ্গা হয়ে যেত। কিন্তু তার উপায় নেই। মুনোয়ারপ্রসাদ এবং মিশিরজিরা ট্রেন আর ভৈসা গাড়িতে চড়িয়ে এখানে এনে উৎকৃষ্ট 'ভোজন' এবং থাকার যে ব্যবস্থা করে দিয়েছে তা নিশ্চয়ই ঘুমোবার জন্য নয়। কাজে তাকে বেরুতেই হবে।

চাঁদিয়া তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ধনপতকে দেখে সে কাছে এগিয়ে আসে। বলে, 'মুহ্ ধুয়ে নাও। কালকের সব রোটি খেয়ে ফেলেছ?'

'নেহী।' ধনপত জানায়, 'দো-চারগো আছে।'

'খেয়ে টেয়ে মিশিরজির কাছে চল।'

অনিচ্ছুক শরীর টেনে টেনে ওধারের কুয়োগুলোর দিকে চলে যায় ধনপত।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, ছিয়াত্তর জন লোক মিশিরজির অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মিশিরজি কালকের সেই চেয়ারটায় বসে আছে। টেবলের ওপর নতুন ঢাউস একটা হাজিরা খাতা। প্রতিদিনের তারিখ দিয়ে এতে হাজিরা বাবদে মজুরদের টিপসই নিয়ে রাখা হবে।

খাতাটা খুলতে খুলতে মিশিরজি ছোটখাট একটি বক্তৃতা দিয়ে নেয়। একটু আগে ঘনুয়া যা বলেছিল সেগুলোই আরেক বার জানিয়ে বলে, 'সুবে আটটা থেকে বিকেল আটটা পর্যন্ত তোমাদের ডিপটি

(ডিউটি)। তার মধ্যে আধা ঘন্টা কালোয় (দুপুরের খাবার) খাওয়ার জন্যে ছুটি। সমঝা?'

সবাই ঘাড় হেলিয়ে দেয়—বুঝেছে।

মিশিরজি আবার শুরু করে, 'রোটি-ওটি যা বানাবার ডিপটির পর বেশি করে বানিয়ে রাখবে—যাতে পরের দিন সুবে আর দুফারে চলে যায়। না হলে সারা দিনে টেইম পাবে না। সমঝা?' 'সমঝা' তার কথার মাত্রা।

নিঃশব্দে এবারও সকলে মাথা ঝাঁকাল।—সমঝেছে।

মিশিরজি ফের বলে, 'মনে রেখ, সুবে ঠিক সাড়ে সাতটায় এখানে হাজিরা দেবে। আটটায় 'ডিপটি' চালু হবে। কোম্পানিকা 'ডিপটি', টেইমের এধার ওধার হওয়া চলবে না। সমঝা?'

সকলে মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মিশিরজি বলে, 'এবার হাজিরা খাতায় টিপছাপ্পা মার—'

ছিয়াত্তর জনের টিপসই নেওয়ার পর মিশিরজি ডান দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ডাকে, 'রামধনিয়া, এ রামধনিয়া—'

রামধনিয়া নামে মধ্যবয়সী একটা লোক ডান দিক থেকে দৌড়ে আসে। তার চৌকো মুখে অগুনতি বসন্তের দাগ। মজবুত হট্টাকট্টা চেহারা, শক্ত চোয়াল, ছোট ছোট গোল চোখ দুটোতে গিধের দৃষ্টি। সারা গা এবং মাথা ভারি কম্বলে জড়ানো। পায়ে কাঁচা চামড়ার ভারি জুতো।

মিশিরজি বলে, 'তোমার লোকজনরা 'রিডি'?'

ঘাড় কাত করে রামধনিয়া বলে, 'রিডি।'

'ভাণ্ডারা থেকে দা-করাত-কুড়াল নিয়েছে?'

'নিয়েছে।'

'এবার এদের নিয়ে জঙ্গলে চলে যাও। আজ পয়লা রোজ। ওরা কালোয়া বানায় নি—মালুম হচ্ছে। 'ডিপটি'র হালচাল জানে না। এক বাজলে ছুট্টি দিয়ে দিও। কালসে পুরা চার বাজে তক ডিপটি। সমঝা?' বলে ধনপতদের দিকে তাকায় মিশিরজি, 'রামধনিয়ার সঙ্গে চলে যাও তোমরা।'

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায়, হাতে কুড়াল করাত ইত্যাদি ঝুলিয়ে ছিয়াত্তর জন ভূমিহীন মজুর সামনের জঙ্গলটার দিকে কাতার দিয়ে চলেছে। সবার আগে যাচ্ছে রামধনিয়া এবং তার দলবল। এরাই ধনপতদের কাজের তদাবক করবে।

দশ

প্রায় মাইল ছয়েক জায়গা জুড়ে সুবিশাল বনভূমি। পিপরিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরির মালিকরা পুরো জঙ্গলটা কিনে নিয়েছে। এখানে বসবে সিমেন্টের কারখানা। এরপর একে একে আরো বড় বড় ফ্যাক্টরি বসানো হবে।

গোটা জঙ্গলটার যেদিকেই তাকানো যাক, পিপর কড়াইয়া অর্জুন এবং আঁওলা গাছের ছড়াছড়ি। আর আছে ট্যারাবাঁকা চেহারার অগুনতি সিসম গাছ। ফাঁকে ফাঁকে অনেকটা জায়গা জুড়ে চাপ-বাঁধা কুলের জঙ্গল বা কাশের ঝোপ। দু মাস আগেও সাদা কাশ ফুলে চারদিক আলো হয়ে থাকত। অঘ্রাণ মাস পড়তে না পড়তেই অসহ্য হিমে ফুলগুলো বিবর্ণ হয়ে ঝরে গেছে, এখন শীর্ণ ডাঁটাগুলো শুধু খাড়া হয়ে আছে। তবে কুলগাছগুলোতে সতেজ নতুন পাতা দেখা দিয়েছে, কচি কচি অজস্র সবুজ ফুলে গাছগুলো বোঝাই।

কাশফুলগুলো যতই ম্লান হয়ে ঝরে যাক, গোটা জঙ্গল জুড়ে এখানে ওখানে কত যে মনরঙ্গোলি আর গোলগোলি ফুল ফুটে আছে! মাঝে মাঝে দু-একটা বিল ঘন গাছপালার ভেতর প্রচুর টোপা পানা, শ্যাওলা এবং আগাছায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। চারধার থেকে সেগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়েছে নানা গাছের ডালপালা।

এই অঘ্রাণে পরদেশি শুগারা ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে এসে হানা তো দিয়েছেই। এ ছাড়া এসেছে হাজার হাজার শীতের মরশুমি পাখি—সিল্লি কাঁক মানিকপাখি। বনভূমির মাথায় এই সব পাখি নানা রঙের ফোয়ারা হয়ে উড়ছে।

জঙ্গলের কাছাকাছি এসে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় রামধনিয়া। অগত্যা সবাইকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

রামধনিয়া বলে, 'কিভাবে তোমাদের ডিপটি দিতে হবে, বুঝিয়ে দিচ্ছি।' সে যা জানায় তা এইরকম। সঙ্গে তার যে চারজন সহকারী আছে তারা ধনপতদের চার ভাগে ভাগ করে জঙ্গল সাফাইয়ের কাজ চালু করবে। বড় বড় পেঁড় বা গাছগুলো কাটবে শক্তসমর্থ পুরুষেরা। ছোট ছোট গাছ আর ঝোপঝাড় সাফ করবে আওরতেরা। তা ছাড়া কাশের জঙ্গলগুলোও পুড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আওরতদেরই। এই কারণে রামধনিয়ার লোকেরা কয়েক টিন পেট্রোল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

রামধনিয়া ছিয়াত্তর জনকে চার দলে ভাগ করে তার চার সহকারীর হাতে একেকটা দল তুলে দেয়। দেখা যায়, ধনপত এবং চাঁদিয়া একই দলে পড়েছে।

পুরুষ এবং আওরত মিলে ধনপতদের দলে মোট উনিশ জন। পাঁচ জন আওরত, বাকি সব পুরুষ। যে হুকুমদারের কাছে তাদের 'ডিপটি' দিতে হবে তার নাম বজরঙ্গীলাল।

বজরঙ্গীলালের বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। পোড়া তামাটে রং। লম্বা আখাম্বা চেহারা। পরনে ফুল প্যান্ট এবং জামাব ওপর ভারি রোঁয়াওলা কম্বল। নাকচোখ ছাড়া মাথা কান এবং মুখের বাকি অংশ কম্ফোর্টারে ঢাকা।

রামধনিয়ার নির্দেশে চারটে দল জঙ্গলের চারদিকে যায়। বজরঙ্গীলাল তার দলটাকে নিয়ে যায় পুব দিকে।

এখানে এক রশি জায়গা জুড়ে কাশ এবং কুলের জঙ্গল। তার পাশেই সারিবদ্ধ সিমার পরাস এবং পিপর গাছ। গাছগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে নানা ধরনের বুনো লতা।

রামধনিয়া সামনের পিপর গাছটা দেখিয়ে পুরুষদের উদ্দেশে বলে, 'তোমরা এই পেঁড়টা কাটতে শুরু কর। পয়লে ডালগুলো কেটে পরে গুঁড়ি কাটবে।'

ধনপতরা পিপর গাছের কাছে চলে যায়।

এবার রামধনিয়া আওরতদের কাশের জঙ্গল পোড়াবার প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেয়। প্রথমে কাশঝোপের ওপর পেট্রোল বা কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেই শুকনো ডাঁটিগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অবশ্য কুলগাছগুলো এই পদ্ধতিতে নির্মূল করা সম্ভব নয়, সেগুলো কেটে ফেলতে হবে।

সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার পর পেট্রোলের একটা টিন ধরিয়ে চাঁদিয়াদের হাতে দেয় বজরঙ্গীলাল। বলে, 'পিটরোল বহোত খতরনাক চীজ। শলাই (দেশলাই) জ্বালিয়ে দিলে আগ লাফিয়ে লাফিয়ে চারদিকে ছুটতে থাকে। হোঁশিয়ার—'

চাঁদিয়া ছাড়া অন্য আওরতরা জানায়, পেট্রোল যে কতখানি বিপজ্জনক বস্তু তা তারা জানে। কাজের সময় নিশ্চয়ই খুব সতর্ক থাকবে।

এবার বজরঙ্গীলাল চাঁদিয়ার দিকে তাকায়, 'কি, তুমি তো কিছু বললে না! পিটরোল ক্যায়সা চীজ—জানো?'

আজ ডিউটিতে আসার সময় চাঁদিয়া লক্ষ করেছে, বার বারই এই আখাম্বা চেহারার বজরঙ্গীলাল তার দিকে তাকাচ্ছিল। তাকানোতে দোষ নেই। চাঁদিয়া সাদাসিধা 'গাঁওকা লেড়কী'। আগে হলে বজরঙ্গীলালের এই তাকানোর পেছনে খারাপ কিছু খুঁজে পেত না। কিন্তু এই কয়েক দিনে তার মধ্যে অনেক ভাঙচুর হয়ে গেছে। দুবেজি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা তার শরীরটা ছিঁড়েখুঁড়ে যা করেছে তাতে সেই গ্রাম্য সরলতার চিহ্নমাত্র নেই। ধনপতকে বাদ দিলে অন্য সব মানুষের ওপর সে বিশ্বাস হারিয়েছে। চাঁদিয়ার মনের কোনো অদৃশ্য জায়গায় কেউ যেন জানান দিয়ে যাচ্ছে—এই লোকটা ভাল নয়।

বজরঙ্গী পেট্রোলের ভযাবহতা সম্পর্কে আরেক বার প্রশ্ন করে।

চাঁদিয়া মাটিতে চোখ রেখে অন্য মেয়েমানুষগুলোকে দেখিয়ে বলে, 'আমি ঠিক জানি না। তবে এদের কাছ থেকে জেনে নেব।'

'ঠিক হ্যায়। আমিও ডিপটির সময় কাছে কাছে থাকব, জরুরত হলে পুছতাছ করে নিও। যাও, আভি কাম চালু কর দো।'

চাঁদিয়ারা কাশের জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, উঁচু পিপর গাছে ধনপতরা বার জন উঠে মোটা মোটা ডাল কাটতে শুরু করেছে। নিস্তব্ধ বনভূমি জুড়ে শব্দ উঠছে—খট খট খট খট—

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ধনপত চন্দ্রিকা সিংয়ের খেতিতে এবং খামারে কাজ করে আসছে। চাষ ছাড়া অন্য কাজের অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা কিছুই নেই তার। গাছ কাটতে তার খুবই অসুবিধা হচ্ছিল।

ধনপত যে ডালটা কাটছিল তার পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে আরেকটা ঝাঁকড়া মোটা ডাল বেরিয়ে গেছে। একটা কমজোর রোগাটে বুড়ো সেটা কাটছে। দুর্বল হলেও গাছকাটাব কায়দা বা নিয়ম সে জানে।

গাছে কোপ বসাতে বসাতে বুড়োটা কাশছিল। কাশতে কাশতে সে বলে, 'দুনিয়ায় আর পেঁড়উড় থাকবে না।'

কথাগুলো কানে এসেছিল ধনপতের। সে শুধোয়, 'মতলব?'

বুড়ো লোকটা বলে, 'দুনিয়া জুড়ে জঙ্গল সাফ করে কারখান্না আউর টৌন বসছে। পেঁড়উড় বাঁচে কী করে?'

ধনপতের দুনিয়ার পরিধি হল ধুরুয়া এবং তার চারপাশের বিশ পঁচিশটা দেহাতী গাঁ। এর বাইরে পরশু ভোরেই সে প্রথম পা বাড়িয়েছে। তাও পিপরিয়ার নির্জন স্তব্ধ বনভূমি পর্যন্তই তার দৌড়। এতকাল যেখানে যেখানে গেছে, কোথাও গাছপালা কাটতে দেখেনি। অথচ এই বুড়োটা একেবারে অন্য কথা বলছে। একটু অবাক হয়েই সে বলে, 'তোমার কথা বুঝলাম না।'

গাছকাটা আপাতত স্থগিত রেখে বুড়োটা এবার যা বলে, সংক্ষেপে এইরকম। তার নাম রামবনবাস। বিহারের এমন এক জায়গায় তার ঘর যেখানে মাইলের পর মাইল কাঁকর মেশানো পড়তি জমি। সেখানকার মাটি ফাটিয়ে পাঁশুটে রঙের আগাছা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই জন্মায় না। তাই কাজ এবং খাদ্যের খোঁজে আজীবন তাকে গোটা বিহার এফোঁড় ওফোঁড় করে বেড়াতে হচ্ছে।

যেহেতু এমন এক জায়গায় রামবনবাসের গাঁ যেখানে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই, তাই গাছপালা দেখলে সে খুশি হয়। তার মধ্যে বৃক্ষপ্রেমিক একটি মন আছে কিন্তু এমনই বরাত, এই বুড়ো বয়স পযন্ত যত কাজ সে পেয়েছে তার বেশির ভাগই বন কাটাইয়ের কাজ। বিহারের এ মাথা থেকে ও মাথায় ছুটতে ছুটতে তার নিজের হাতে কত স্নিগ্ধ শান্ত বনভূমি যে ধ্বংস হয়েছে, নির্মূল হয়েছে কত যে মহিমান্বিত বনস্পতি তার হিসেব নেই।

গাছ কাটতে কাটতে দুঃখে রামবনবাসের মন ভরে গেছে। বৃক্ষলতা তার কাছে 'ভগোয়ানের সন্তানে'র মতো। অথচ এ ছাড়া তার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। গাছ মরলে সে বাঁচবে, তার পেটের দানা জুটবে।

রামবনবাস জানায়, তার বয়স এখন ষাট পঁয়ষট। এর মধ্যে কত জঙ্গল নির্মূল হয়ে যেতে দেখল সে। অরণ্যের কাছ থেকে মাটি ছিনিয়ে নিয়ে বসছে কলকারখানা, বসছে ভারি ভারি শহর। এভাবে চললে পৃথিবী একদিন বৃক্ষলতাশূন্য মরুভূমি হয়ে যাবে।

রামবনবাস যখন একটানা নিজের কথা বলে চলেছে সেই সময় খানিকটা দূরে 'বশি'খানেক জায়গা জুড়ে আগুনের লকলকে ফণা আকাশের দিকে উঠতে থাকে। ওখানে কাশবনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে চাঁদিয়ারা। তার আঁচে পট পট করে কাশের শুকনো ডাঁটিগুলো একটানা ফেটে যাচ্ছে।

হঠাৎ কথা বন্ধ করে উদাস চোখে কাশবনের আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে রামবনবাস। তার দেখাদেখি ধনপতও সেদিকে তাকায়। তার হাতও অজান্তে থেমে যায়।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, আচমকা পিপর গাছের তলা থেকে বজরঙ্গীর চিৎকার ভেসে আসে, 'এই ভূচ্চরের ছৌয়ারা, কাম বন্ধ করে আগ দেখছিস! মজুরির পাইসা কেটে নিলে মালুম পাবি—' লোকটার শকুনের নজর। তাকে ফাঁকি দিয়ে চুপচাপ বসে বনভূমির জন্য শোক করার উপায় নেই কারুর।

ধনপতেরা চমকে ওঠে। তারপরই হাতের কুড়াল চলতে থাকে। খট-খট-খট-খট—

বজরঙ্গী শাসানোর ভঙ্গিতে ফের বলে, 'হোঁশিয়ার। কামে ফাঁকি দিবি না। আমি বহোত খতরনাক আদমী। ফাঁকি দিলে জান চৌপট করে দেব।' বলে আর দাঁড়ায় না, লম্বা পা ফেলে ওধারে জ্বলন্ত কাশবনের দিকে চলে যায়।

কাশঝোপগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদিয়া এবং আরো চার আওরত। আগুনের অগুনতি লকলকে শিষ সামনে যা পাচ্ছে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে স্নিগ্ধ নীলাকাশ।

· বজরঙ্গী চাঁদিয়ার পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'পিটরোল দিয়ে কী করে আগ ধরাতে হয়, শিখে নিয়েছ?'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় চাঁদিয়া। বজরঙ্গীকে এত কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াতে দেখে ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়ে যায়। কাঁপা গলায় বলে, 'হাঁ।'

'বহোত আচ্ছা!'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কী ভেবে বজরঙ্গী নিচু গলায় বলে, 'তুমি তো একলাই এখানে এসেছ?'

'হাঁ।' চাঁদিয়া মাথা নাড়ে।

'বরখা নদীর ওপারে দধিপুরায় তো তোমাদের গাঁ—'

চাঁদিয়া অবাক হয়ে বলে, 'হাঁ। আপনি কী করে জানলেন?'

বজরঙ্গী একটা চোখ কুঁচকে রহস্যময় হেসে আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'জানতে পারলাম। এই খবরটার জন্যে চোখকান খোলা রাখতে হয়েছে।' বলতে বলতে খৈনির ছোপ-ধরা ট্যারাবাঁকা দাঁত বার করে নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

একটু ভাবতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। মিশিবজি যখন বড় খাতায় তাদের নামধাম লিখছিল সেইসময় বজরঙ্গী নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও ছিল। তখনই তার নাম শুনে থাকবে।

বজরঙ্গী আবার বলে, 'গাঁওমে কৌন হ্যায় তুমনিকা?'

লোকটার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না চাঁদিয়ার। মা-বাবা-ভাই-বোনের প্রসঙ্গ উঠলে বজরঙ্গী অনেক কিছু জানতে চাইবে। সে বলল, 'কোঈ নেহী।'

'দুনিয়ায় তুমনি একেলী—হাঁ!' রীতিমত অবাকই যেন হয়ে যায় বজরঙ্গী। তারপর জিভের তলায় সহানুভূতিসূচক চুক চুক আওয়াজ করে বলে, 'বহোত দুখকা বাত।'

চাঁদিয়া উত্তর দেয় না।

বজরঙ্গীর হঠাৎ খেয়াল হয়, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদিয়ার সঙ্গে কথা বলছে। একা চাঁদিয়াকে পেলেই ভাল হত। কিন্তু অন্য চারটে আওরত চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কাজের সময়টা এভাবে নষ্ট করা ঠিক নয়। সে বলে, 'এখন ডিপটিকা টেইম। পরে তোমার কথা ভাল করে শুনব।' অন্য আওরতদের দিকে ফিরে বলে, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগ দেখলে চলবে না। কাশের জঙ্গল জ্বলুক। তোমরা আমার সঙ্গে চল।'

আওরতদের নিয়ে খানিকটা দূরে কুলগাছের জঙ্গলের কাছে চলে আসে বজরঙ্গী। বলে, 'এগুলো সাফ করতে থাক।'

ওয়েস্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির পুরনো গোল একটা ঘড়ি বজরঙ্গীর বাঁ কবজিতে স্টিলের চওড়া ব্যান্ডে বাঁধা রয়েছে। সেটার দিকে চোখ রেখে কাঁটায় কাঁটায় দুটোয় চেঁচিয়ে ওঠে, 'আজকের মতো 'ডিপটি' খতম।' তার চিৎকার কুল জঙ্গলের ওপর দিয়ে দূরে পিপর গাছগুলোর দিকে ছুটে যায়।

আরো দূরে ঘন বনঝাউ দেওদার এবং সিমার গাছের জটলার পাশ থেকে অন্য হুকুমদারদেরও গলা ভেসে আসে, 'ডিপটি খতম।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, ক্লান্ত মজুরেরা 'বারিকে' (ব্যারাকে) ফিরে চলেছে। সবার সঙ্গে চাঁদিয়া এবং ধনপতও হাঁটছিল।

জঙ্গল কাটাইয়ের প্রথম দিনটা কেমন কাটল, এই নিয়ে টুকরো টুকরো কথা বলছে সকলে।

চাঁদিয়া ধনপতকে বলে, 'কাশের জঙ্গল আজ অনেকটা সাফ করে ফেলেছি। দো দোগো কুলগাছও কেটেছি। তুমি কী করলে?'

ধনপত বলে, 'কাশের ঝোপ সাফ করা কী এমন কাজ! আগ ধরিয়ে দিলেই হল। আর কুল তো ছোট ছোট গাছ, দিনে বিশ পঁচিশটা কেটে ফেলা যায়। লেকেন—' সে জানায়, পিপর গাছ কাটা বহোত ভারি কাম। একটা গাছ নিশ্চিহ্ন করতে দশ বারটা আদমির কমসে কম পনের রোজ লেগে যাবে।

কথাটা মেনে নেয় চাঁদিয়া। মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ—'

'গাছ কাটার কাজ আগে করিনি। ভারি কষ্ট হচ্ছে। তবে—'

'কা?'

'জ্যাদা পাইসা পেলে এই কষ্টটা আর কষ্ট মনে হবে না।'

'হাঁ।'

একটু চুপচাপ। তারপর ঝপ করে গলার স্বরটা অনেক নিচে নামিয়ে ধনপত বলে, 'পিপর গাছের ডাল কাটতে কাটতে একগো চীজ নজরে পড়ল।'

'কা?' চাঁদিয়া উৎসুক চোখে ধনপতের দিকে তাকায়।

'হুকুমদার বজরঙ্গীজি তোমার সঙ্গে বহোত কথা বলছিল। যখন কুলগাছ কাটছিলে তোমার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছিল। বহোত মজাদার গপসপ হচ্ছিল—না?'

প্রথমটা অবাক হয়ে যায় চাঁদিয়া। অতদূর থেকে ধনপত যে তার ওপর নজর রেখেছে—বিস্ময়টা সেই কারণে।

ধনপত এবার শুধোয়, 'কী এত গপ করছিল হুকুমদার?'

'আমার খবর নিচ্ছিল। গাঁও কঁহা, ঘরমে কৌন কৌন হ্যায়—এইসব। লেকেন—'

'কা?'

বিমর্ষ গলায় চাঁদিয়া বলে, 'ও আদমি আচ্ছা নেহী—'

একটু হকচকিয়ে যায় ধনপত, 'কায়? গাঁও-ঘরের খবর নিলে আদমি বুরা হবে কেন?'

চাঁদিয়া জানায়, বজরঙ্গীর তাকানো এবং কথা বলার ভঙ্গি ভাল নয়। বজবঙ্গী বলেছে পরে তার সঙ্গে জমিয়ে আলাপ করবে। এসব চাঁদিয়ার খুবই অপছন্দ।

ধনপত মজা করে বলে, 'হুকুমদারের নজরে পড়ে গেছ। এ তো বহোত সৌভাগ।'

চাঁদিয়া বলে, 'এমন সৌভাগের মুখে তিনবার থুক।'

চাঁদিয়াকে রেগে উঠতে দেখে ধনপত আর ঠাট্টা টাট্টা করে না।

চাঁদিয়া আবার বলে, 'আমার মনে হছে, আদমীটা আমার ঘরেও আসবে। তুমি একটু নজর রেখ।'

ধনপত বুঝতে পারে, এই দুঃখী মেয়েটা তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে শুরু করেছে। সে বলে, 'ঠিক হ্যায়—রাখব।'

কথায় কথায় তারা সেই সারিবদ্ধ ঘরগুলোর কাছে পৌঁছে যায়।

এগার

ছিয়াত্তর জন জঙ্গলকাটোয়া যে যার নিজের ঘরে গিয়ে প্রথমে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেয়। তারপর ওধারের কুয়োগুলো থেকে 'নাহানা' চুকিয়ে এসে চুলহা ধরিয়ে রান্না চড়িয়ে দেয়।

এদিকে অঘ্রান মাসের বেলা আরো হেলে গেছে। অনেক দূরে পছিমা আকাশ যেখানে দিগন্তে ঝুঁকে পড়েছে, সূর্যটা সেখানে নেমে গেছে। আর কিছুক্ষণ পর ওটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

রোদের রং এখন বাসি হলুদের মতো। পৃথিবীব তাপ দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে। হিমালয় এখান থেকে বেশি দূরে নয়। উত্তুরে বাতাস সারা গায়ে বরফ মেখে সামনের বনভূমির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে যেন।

অন্য সবার মতো চাঁদিয়াও চুলহা ধরিয়েছে। তার আগে ধনপতের কাছ থেকে চাল ডাল আলু পেঁয়াজ নিয়ে এসেছিল। আজ তারা ভাত খাবে। শুধু আজ রাতের মতোই না, কাল দুপুর পর্যন্ত যাতে চলে সেই রকম হিসেব করে দু'জনের চাল ডাল মেপে নিয়েছে চাঁদিয়া।

রান্নার ঝামেলা না থাকায় পুরোপুরি ঝাড়া হাত-পা হয়ে গেছে ধনপত। 'নাহানা' চুকিয়ে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে, তাব ওপর নতুন রোঁয়াওলা কম্বল চাপিয়ে চাঁদিয়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। বলে, 'রসুই হতে কতক্ষণ লাগবে?'

'এই তো চুলহা ধরালাম। ভাত হবে, ডাল হবে, ভাজি হবে। অনেক সময় লাগবে।' চাঁদিয়া মুখ তুলে জানায়।

ধনপত বলে, 'তা হলে আমি আফিস থেকে ঘুরে আসি।'

'আফিসে কী?'

অফিসে যাওয়ার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে ধনপতের। দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় মুনোয়ারপ্রসাদ জানিয়েছিল, দৈনিক মাথাপিছু দশ টাকা করে মিলবে। মজুরিটা কিভাবে পাওয়া যাবে, সেটা জানা হয়নি। অফিসে গিয়ে মিশিরজির কাছে তা জানতে চেষ্টা করবে। এই কথাগুলোই ধনপত চাঁদিয়াকে বলল।

চাঁদিয়া বলে, 'ঠিক হ্যায়। বেশি দেরি করো না। সূরয ডুবে আন্ধেরা নামতে নামতেই আমার রসুই হয়ে যাবে।'

এধারে ঘরের পর ঘর। তারপর কাচ্চী বা কাঁচা রাস্তা। রাস্তার ওধারে কুয়োর সারি। কাচ্চী ধরে অফিসের দিকে এগিয়ে যায় ধনপত। কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার আগেই কে যেন ডেকে ওঠে, 'এ ভেইয়া—ভেইয়া হো।'

ধনপত থমকে দাঁড়ায়। ডাকটা যে তাবই উদ্দেশে সেটা বুঝতে পেরে এধারে ওধারে তাকায়।

'ইঁহা—ইঁহা—'

এবার চোখে পড়ে যায়। ডানপাশের একটা ঘর থেকে একটা আধবুড়ো লোক তাকে হাত নেড়ে ডাকছে। অগত্যা অফিসে যাওয়া আপাতত স্থগিত রেখে লোকটার দিকেই পা বাড়ায় ধনপত।

লোকটা তার ঘরের সামনে ছেঁড়া চট বিছিয়ে বসে আয়েশ করে হাতেব চেটোতে খৈনি ডলছিল। এর মধ্যে তার 'নাহানা' হযে গেছে। ক্ষারে কাচা পরিষ্কার জামাকাপড় পরে, কাকই দিয়ে পরিপাটি চুল আঁচড়ে নিয়েছে। লোকটাকে বেশ শৌখিন মনে হয়। একটু দূরে চুলহা ধরিয়ে একটা আওরত রুটি সেঁকছে। ঘরের ভেতর দুটো বাচ্চা বেজায় হুড়োহুড়ি করছে। বোঝা যায় এরা আধবুড়ো লোকটার বউ বাচ্চা।

লোকটা চটের একটা কোণা দেখিয়ে বেশ খাতিরদারি করে বলে, 'বসো ভেইয়া, বসো।' তারপর কী মনে হতে শুধোয়, 'কোথাও যাচ্ছিলে নাকি? আটকে দিলাম?'

অফিসে যাওযার কথাটা আর জানায় না ধনপত। বলে, 'নেহী। এমনিই ঘুরছিলাম।'

খানিকটা খৈনি ধনপতকে দিয়ে লোকটা বলে, 'দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় তোমাকে দেখেছি। টিরেন আর ভৈসা গাড়িতে একসাথ পিপরিয়ায় এলাম। একসাথ অনেক দিন থাকব। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে আলাপটা করে নিই।'

লোকটাকে হয়ত আগে দেখেছে ধনপত। তবে ভাল করে লক্ষ করেনি। তার কথায় সায় দিয়ে ধনপত বলে, 'হাঁ হাঁ, একসাথ থাকব। কার কখন কী দরকার হয়—'

লোকটা বেশ মিশুক। কথায় কথায় ধনপতেব নামধাম থেকে যাবতীয় খবর জেনে নেয় সে। তারপব রীতিমত অবাক হয়েই বলে, 'এখনও শাদি কর নি! তা হলে একটা আওরতের সঙ্গে তোমাকে সেই দুধলিগঞ্জের হাটিয়া থেকে দেখছি। ও তোমার জেনানা নয়?'

ধনপত বুঝতে পারে, চাঁদিয়ার কথা বলছে লোকটা। আগে মিশিরজিকে যা বলেছিল, একেও সেই উত্তরটাই দেয়। অর্থাৎ চাঁদিয়ার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, রাস্তায় পরিচয় হয়েছে, ইত্যাদি।

আরো কিছুক্ষণ চাঁদিয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন ট্রশ্ন করে নিজের কথা বলে লোকটা। তার নাম ভানচাঁদ। তার বাড়ি রাঁচির কাছে। এবছর সেখানে প্রচণ্ড খরায় মাঠঘাট টুটিফাটা হয়ে গেছে। বারিষ (বর্ষা) না হওয়ার দরুন এক দানা ফসল হয়নি। এদিকে ভানচাঁদ গরিব ভূমিহীন কিষান। এক ধুর জমিও নেই তার। পরের খেতে কাজ করে সে এবং তার জেনানা পেটের দানা যোগাড় করে।

তা এবার এক বুঁদ বৃষ্টিও পড়েনি আকাশ থেকে। বৃষ্টি না হলে চাষ হয় কী করে? আর চাষই যদি মার খায়, ভানচাঁদরা কাজ পাবে কোথায়? সুতরাং কাজের খোঁজে তারা গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে এসেছিল দুধলিগঞ্জে, সেখান থেকে এই পিপরিয়ায়। রামজি বিষুণজির কিরপা, পেটের চিন্তা এখন কিছুদিন করতে হবে না।

ভানচাঁদ নিজের একটা গুণের কথাও বলে। সে ভাল নৌটঙ্কী গান জানে। তার ইচ্ছা, দু-চার দিনের মধ্যেই এখানে সন্ধেবেলায় গান-বাজনার আসর বসাবে। সারাদিন কাজের পর একটু আমোদ ফুর্তি তো দরকার।

গভীর আগ্রহে ভানচাঁদ শুধোয়, 'তোমার গান টান আসে?'

'নেহী নেহী—' ধনপত বলে, 'আমি গাইতে পারি না।'

'চিন্তা নায় করনা।' ভানচাঁদ ভরসা দেয়, 'তালিম দিয়ে দশ বিশ রোজের ভেতর তোমাকে ভাল গাইয়ে বানিয়ে নেব। গাধার গলায় আমি কোয়েলের সুর ফোটাতে পারি।'

ভানচাঁদ চমৎকার গল্প করতে পারে। কথায় কথায় কখন যে সূর্য ডুবে যায়, কখন যে সন্ধ্যা নেমে আসে, খেয়াল ছিল না। অন্ধকার নামতেই ধনপত ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আজ চলি ভানচাঁদ ভেইয়া।'

'ঠিক হ্যায়। নৌটঙ্কীর কথাটা মনে রেখ।' ভানচাঁদ বলে।

ফের কাচ্চীতে নামতেই ধনপত দেখতে পায়, অফিসের দিক থেকে দলবল নিয়ে মিশিরজি আসছে। সেই দলে বজরঙ্গীও রয়েছে। ধনপত দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ে, মিশিরজি ছাড়া বাকি সবার হাতেই শুকনো লকড়ি, ইট বা কেরোসিনের টিন।

মিশিরজিকে দেখে মজুরদের ঘর থেকে অনেকে বেরিয়ে আসে। সন্ধেবেলা কাঠ টাঠ নিয়ে লোকগুলো কেন এদিকে এসেছে, বুঝতে না পেরে তারা বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

মিশিরজিই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেয়। বলে, 'এখানে বহোত জাড় (শীত)। তাই তোদের জন্যে ক'টা 'ঘুর' (আগুনের কুণ্ড) বানিয়ে দেব। তাতে আরাম পাবি। তা ছাড়া—'

কে যেন শুধোয়, 'তা ছাড়া কী?'

'ডরনেকা কুছ নেহী। জঙ্গল থেকে লাকরা কি ভাল্লুটাল্লু এদিকে আসতে পারে, ঘুরের আগুন দেখলে ভেগে যাবে।'

যদিও অভয় দিয়েছে মিশিরজি তবু মজুরদের চোখেমুখে লাকরা এবং ভালুকের কথায় ভয়ের ছায়া পড়ে। সন্ত্রস্ত গলায় তারা বলে, 'লাকরা উকরা এদিকে এলে তো জানে মেরে দেবে মিশিরজি। কা হোগা হামনিলোগনকা?'

মিশিরজি দু'হাত নেড়ে বোঝাতে থাকে, 'বললাম তো, ভয়ের কিছু নেই। আগকে সব খতরনাক জানবর ডরায়। তা ছাড়া আমার কাছে বন্দুক আছে। জানবর এদিকে এলে জান নিয়ে ফিরবে না। সমঝা?'

মুখ দেখে মনে হয় না মজুররা বিশেষ সমঝেছে। ভিড়ের ভেতর থেকে ভানচাঁদের গলা শোনা যায়, 'এখানে না হয় ঘুর জ্বালিয়ে দিলেন, জানবর এলে গোলি ছুঁড়বেন। লেকেন জঙ্গলে তো আমাদের যেতে হবে। জানবরের হাত থেকে সেখানে কে আমাদের বাঁচাবে?'

'কাল থেকে বন্দুক নিয়ে পেহারাদাররা জঙ্গলে যাবে। চিন্তা নায় করনা—' বলেই সাঙ্গপাঙ্গদের দিকে ফিরে মিশিরজি হুকুম দেয়, 'ঘুর বানিয়ে ফেল। কমসে কম আট দশগো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই হুকুম তামিল করা হয়। ইট এবং মোটা মোটা কাঠের টুকরো সাজিয়ে কেরোসিন ছিটিয়ে মোট দশটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি হয়।

মিশিরজি তার লোকজনকে এবার বলে, 'রাতে উঠে দেখবি। ঘুর নিভে এলে ফের নয়া লকড়ি দিবি। সমঝা?'

'হাঁ—' সবাই সমস্বরে সায় দেয়।

'অব হমনি চলতা হ্যায়—' মিশিরজি আর দাঁড়ায় না। যেদিক থেকে এসেছিল, অর্থাৎ অফিসের দিকে ফিরে যেতে থাকে। তার সাঙ্গপাঙ্গরাও ঝাঁক বেঁধে পিছু নেয়।

নিজের অজান্তেই মিশিরজির সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেছিল ধনপত। অফিসের কাছাকাছি এসে সে মিশিরজির নজরে পড়ে যায়। থমকে দাঁড়িয়ে মিশিরজি শুধোয়, 'কা রে, কিছু বলবি?'

যে উদ্দেশ্যে আসা সেটা বলতে গিয়ে হঠাৎ ঘাবড়ে যায় ধনপত। বলে, 'হাঁ, তব্—'

'তব্ কা?'

'পরে বলব।'

'পরে কেন, এখনই বল।'

'নেহী মিশরজি—'

মিশিরজি জোরাজুরি না করে সোজা এগিয়ে গেল। অগত্যা ধনপতকে ফিরতে হয়।

নিজের ঘরের কাছে আসতেই বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে ধনপতের। সে ভেবেছিল, প্রথমে চাঁদিয়ার ঘরে যাবে। তার কাছ থেকে ভাত-ডাল-ভাজি নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকবে। কিন্তু কাচ্চী থেকেই চোখে পড়ে চাঁদিয়ার ঘরে জমিয়ে বসে গল্প করছে বজরঙ্গী। লোকটা কখন যে দলছুট হয়ে এখানে চলে এসেছে, ধনপত লক্ষ করেনি। প্রথমটা সে কী করবে ভেবে পেল না। চাঁদিয়া আগেই আন্দাজ করেছিল, বজরঙ্গী তার ঘরে হানা দেবেই। কিন্তু তা যে আজ থেকেই, সেটা ভাবা যায় নি। চাঁদিয়া বলেছিল, লোকটার হালচাল, তাকানোর ভঙ্গি—সবই বহোত খারাপ। ধনপত যেন তার দিকে একটু নজর রাখে। সোজা কথায় বজরঙ্গীর হাত থেকে তাকে রক্ষা করার কথাই বলেছে চাঁদিয়া। কিন্তু ধনপতের মতো তুচ্ছ এক জঙ্গল-কাটোয়ার পক্ষে প্রবল পরাক্রান্ত হুকুমদারের বুরা নজর থেকে চাঁদিয়াকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

এমনিতে বরখা নদীর পাড়ে চাঁদিয়াকে সে বাঁচিয়েছে, তারপর দুধলিগঞ্জ হয়ে এই পিপরিয়া পর্যন্ত এসেছে—এতেই ধনপতের কর্তব্য শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

ধুরুয়া গাঁ থেকে সে পালিয়ে এসেছে গভীর এক উদ্দেশ্য নিয়ে। জনমদাসের দায়াবদ্ধ জীবন থেকে মা-বাপ-ভাই-বোনদের মুক্ত করে তাকে আনতেই হবে। চাঁদিয়াকে আগলে আগলে রাখা তার কাজ নয়।

কিন্তু বজরঙ্গীকে চাঁদিয়ার ঘরে জাঁকিয়ে বসে থাকতে দেখে বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে ধনপতের। চব্বিশ পঁচিশ বছরের হট্টাকট্টা জোয়ান সে, কিন্তু আগে আর কোনো যুবতী মেয়ের এত কাছাকাছি আসেনি। দু-একবার বাপ-মা তার শাদির কথা তুলেছে। কিন্তু সে শুধু কথাই। পরের খেতিতে বেগার দিয়ে পশুর জীবন যাদের যাপন কবতে হয় তাদের কাছে শাদি ব্যাপারটা ঝুটা স্বপ্নই থেকে যায়।

আচমকা যেন মরিয়া হয়েই ধনপত চাঁদিয়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ভেতরে একধারে লণ্ঠন জ্বলছে। সেটার কাছে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে চাঁদিয়া। আর বজরঙ্গী তার বিছানাটা দখল করেছে।

হাসি হাসি মুখে কী একটা মজার কথা বলতে যাচ্ছিল বজরঙ্গী, ধনপতকে দেখে তার চোখ বিরক্তিতে কুঁচকে যায়। বলে, 'কা রে, এখানে কিসের ধান্দায়?'

চট করে কিছু ভেবে নিয়ে ধনপত বলে, 'আমার ভাত-ডাল নিতে এসেছি।'

'ভাত-ডাল! মতলব?'

ধনপত জানায়, সে রান্নাবান্না করতে পারে না। তাই চাঁদিয়া তার রসুইয়ের দায়িত্বটা নিয়েছে।

নাকের ভেতর থেকে বিদ্রূপসূচক একটা আওয়াজ বার করে বজরঙ্গী বলে, 'শালে রাজা-মহারাজকে ছোঁয়া এসেছে! ওর রসুই আর একজন করে দেবে! নৌকরনী পেয়েছিস চাঁদিয়াকে? কাল থেকে নিজের রসুই নিজে ক'রে নিবি। না হলে লাথ মারকে হাড্ডি ঢিলা করে দেব। শালে ভূচ্চর—'

ধনপতকে দেখে অনেকখানি ভরসা পেয়েছে চাঁদিয়া। সে দ্রুত বলে ওঠে, 'আমি রসুই না করে দিলে আদমীগো ভুখা থাকবে।'

চাঁদিয়ার কথায় এবার যেন করুণাই হয় বজরঙ্গীর। বলে, 'চাঁদিয়া যব বোলা তব তো ঠিক হ্যায়।' পরক্ষণে নাক কুঁচকে ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'শালে মনিস্টার আ গিয়া!—দাও চাঁদিয়া, ওর ভাত-ডাল দিয়ে দাও।'

চাঁদিয়া সিলভারের থালা বাটিতে ভাত-ডাল সাজিয়ে ধনপতকে দেয়। কাজেই এখানে দাঁড়িয়ে থাকার আপাতত আর কোনো অজুহাত নেই।

খিদেয় পেটের ভেতরটা জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিজের ঘরে এসে খাওয়ার কথাটা খেয়াল থাকে না ধনপতের। মস্তিষ্ক থেকে নতুন অছিলা বার করে আবার তাকে চাঁদিয়ার ঘরে যেতে হবে। মেয়েটাকে একা বজরঙ্গীর কাছে রাখা নিরাপদ নয়।

ভাবতে ভাবতে ঝাঁকে ঝাঁকে অজুহাত হাতের সামনে এসে যায়। দ্রুত উঠে ফের পাশের ঘরে আসে ধনপত।

বজরঙ্গী বেজায় বিরক্ত হয়ে বলে, 'ফির কা?'

ধনপত কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'নমক নেহী।—থোড়েসে দো।' বলেই চাঁদিয়ার দিকে হাত বাড়ায়।

বজরঙ্গী কর্কশ গলায় শুধোয়, 'ভাণ্ডারা থেকে নমক আনিস নি?'

'ভুল গিয়া।' ধনপত ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়। নুন সে অবশ্যই এনেছিল কাল বিকেলে। কিন্তু মিথ্যে না বললে এখানে আসা হয় না।

'কাল জরুর নিয়ে নিবি।'

'জরুর নেব।' বিনীতভাবে জানিয়ে এবং চাঁদিয়ার কাছ থেকে নুন নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসে ধনপত।

কিন্তু কতক্ষণ আর? একটু পরেই একটা লোটা নিয়ে আবার করুণ মুখে চাঁদিয়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় ধনপত। বজরঙ্গী খেপে উঠে কিছু বলার আগেই বলে, 'থোড়েসে পীনেকা পানি।'

বজরঙ্গী খেঁকিয়ে ওঠে, 'শালে কাচ্চীর ওধারে কুয়া রয়েছে, দেখিস নি? অন্ধা কঁহাকা! যা, ওখান থেকে নিগে যা। হারামজাদকা ছোঁয়ার হাতে সব তুলে দিতে হবে?'

বার বার এ ঘরে আসার কারণটা ধরে ফেলেছিল চাঁদিয়া। বজরঙ্গীকে কোনো রকমেই স্থির হয়ে বসতে বা খারাপ মতলব হাসিল করতে দেবে না ধনপত। চাঁদিয়া বলে, 'এই রাত করে আর কুয়ায় যেতে হবে না। আমার ঘরে পানি আছে; দিচ্ছি।'

জল আনার পরই একে একে 'হরা মিরচি' (কাঁচা লঙ্কা), পরের দিনের ভাত রাখার জন্য বর্তন, এমনি নানা জিনিসের জন্য হানা দেয় ধনপত। তাকে দেখতে দেখতে মাথায় আগুন ধরে যায় বজরঙ্গীর। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'শালে মেজাজটা বিগড়ে দিলে।' বলেই হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে পড়ে। চাঁদিয়াকে বলে, 'আজ চলি—'

বজরঙ্গী চলে যাওয়ার পর চোখে চোখে হাসে চাঁদিয়া এবং ধনপত। চাঁদিয়া বলে, 'বঁচ গিয়া।'

ধনপত উত্তর দেয় না।

চাঁদিয়া আবার বলে, 'আজকের মতো তো বাঁচলাম। লেকেন কাল পরশু তরশু নরশু কা হোগা? ও আদমীগো আমাকে ছাড়বে না। জরুর ঘুরে ঘুরে আসবে।'

ধনপত বলে, 'ওকে ঠেকাবার জন্যে রোজই মাথা থেকে কিছু না কিছু মতলব বার করতে হবে।'

বিমর্ষ মুখে চাঁদিয়া বলে, 'এভাবে কেত্তে রোজ ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে?'

ধনপত বলে, 'যতদিন পারি।'

বার

পর দিন সকালে মিশিরজির অফিসে হাজিরা দেওয়ার সময় দেখা গেল, জন দশেক মজুর নেই। বাঘ ভালুক লাকরা এবং অন্যান্য খতরনাক জানোয়ারের ভয়ে রাত্তিরে তারা পালিয়ে গেছে।

এমনিতেই জঙ্গল কাটাইয়ের ব্যাপারে লোকজন পাওয়া মুশকিল। জন্তু জানোয়ারের ভয়ে এ ধরনের কাজে বিশেষ কেউ আসতে চায় না। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে যাদের জুটিয়ে আনা হয়েছে তাদের ভেতর থেকেও যদি লোক পালায় তাহলে এই বিশাল বনভূমি কতদিনে সাফ হবে? কবে বসবে সিমেন্টের কারখানা?

মিশিরজি প্রায় খেপেই ওঠে। তার সাঙ্গপাঙ্গদের উদ্দেশে বলে, 'ভূচ্চবগুলো ভাগল, আর তোরা টের পেলি না? মরে গিয়েছিলি নাকি রে গিদ্ধরের ছৌয়ারা?'

কাঁচুমাচু মুখে তার দলবল জানায় শীতের রাতে গভীর ঘুমে তারা ডুবে গিয়েছিল। মজুররা কখন পালিয়েছে বুঝতে পারেনি।

মিশিরজি চিৎকার করে হুঁশিয়ারি দেয়, 'আজ রাত থেকে নজর রাখবি, কেউ যেন ভাগতে না পারে। সমঝা?'

খানিকটা দূরে ছেষট্টি জন মজুরের ভেতর দাঁড়িয়ে সব শুনছিল ধনপত। সে চমকে ওঠে। ধুরুয়া গাঁয়ে জনমদাসের জীবনে তাদের এতটুকু মুক্তি ছিল না। চন্দ্রিকা সিংয়ের পহেলবানেরা তাদের চোখে চোখে রাখত। জমিমালিকের এইসব কুত্তাগুলোর চোখে ধুলো ছিটিয়ে কিছু করার ছিল না। এখানে এই পিপরিয়ায় বিশাল অরণ্যের পাশে তেমনই এক ফাঁদের ভেতর এসে পড়ল নাকি সে?

দিন দশেক কেটে গেল।

এর ভেতর জঙ্গল অনেকটা সাফ হয়ে গেছে। তা ছাড়া ভৈসা গাড়ি বোঝাই হয়ে আরো কিছু মজুর এসে পড়েছে।

ধনপত জানতে পেরেছে, মুনোয়ারপ্রসাদ নামে সেই আড়কাঠিটা পূর্ব এবং উত্তর বিহারের নানা হাটিয়া থেকে নতুন মজুরদের জুটিয়ে এনে ডুমনিগাঁও রেল স্টেশনে মিশিরজির হাতে তুলে দিয়ে গেছে। তারপর ডুমনিগাঁও থেকে ভৈসা গাড়িতে এখানে। সে টের পেয়েছে, ওভাবে লোক জোটানোই মুনোয়ারপ্রসাদের কাজ।

এদিকে পিপরিয়ার জঙ্গলের ধারে ধনপতদের জীবন একই খাতে বয়ে যাচ্ছে। সকালে উঠে আগের দিনের বাসি রুটি বা পানিভাত্তা খেয়ে কটৌরাতে দুপুরের কালোয়া ভরে জঙ্গলে ছোটা, একটানা কাজের ফাঁকে গোগ্রাসে দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে একটু জিরিয়েই আবার কুড়াল চালানো বা কাশের ঝোপে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। চারটে বাজলে চারদিক থেকে হুকুমদারদের চিৎকার ওঠে, 'ডিপটি খতম।'

জঙ্গল থেকে ফিরে রান্নাবান্না এবং খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে শীতের সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে নেমে আসে। হিমবর্ষী আকাশের নিচে সারাদিন 'গতরচূরণ' খাটুনির পর পেটে দানা পড়তে না পড়তেই মজুরদের চোখ জুড়ে আসে। ক্লান্ত পশুর মতো তারা কম্বলের তলায় ঢুকে যায়। সংক্ষেপে এই হল এখানে তাদের জীবনযাত্রার মোটামুটি নমুনা। মাঝে অবশ্য দিন দুই রাতে নৌটঙ্কীর গান গেয়ে সবাইকে শুনিয়েছে ভানচাঁদ। বেশ সুরেলা 'যাদুভরি' গলা তার। কিন্তু গোটা দিন জীবনীশক্তির অনেকটা অংশ জঙ্গলে ক্ষয় করে আসার পর শরীরে এমন কিছু সারবস্তু আর থাকে না যাতে রোজ রোজ গান-বাজনার উৎসাহ পাওয়া যায়।

এই দশ দিনে জানা গেছে, এক সপ্তাহ বাদে বাদে সবাইকে খোরাকি বাবদ একসঙ্গে সাত দিনের চাল-ডাল-আটা-নিমক ইত্যাদি দেওয়া হবে। কিন্তু এখনও কাউকেই মজুরির একটা পয়সাও দেয় নি মিশিরজি। এ ব্যাপারে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় আছে ধনপত। রোজই মজুরির কথাটা 'বলব বলব' ভাবে সে কিন্তু মিশিরজির কাছে গেলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। সাহস করে কিছু বলতে পারে না।

এ ক'দিনে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে ধনপত। সেদিন মিশিরজি হুকুম দেওয়ার পর রাতে তার লোকেরা পাহারা দিতে শুরু করেছে। নিজের ঘরে শুয়ে শুয়েই সে টের পায়, মাঝরাতে ভোররাতে বা

প্রথম রাতে কেউ না কেউ মজুরদের 'বারিকে'র সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে। মানুষের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে বনভূমির ধারে বলে রাতগুলো এখানে বড় বেশি গভীর আর নিস্তব্ধ। এত স্তব্ধতা বলেই হয়ত পায়ের সামান্য আওয়াজ কানে আসে।

এদিকে হুকুমদার বজরঙ্গীর উৎপাত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। জঙ্গলে বিশাল বিশাল পিপর কি সিমারগাছের গায়ে করাত কিংবা কুড়াল চালাতে চালাতে ধনপতের চোখে পড়ে চাঁদিয়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর হেসে হেসে মজার মজার কথা বলছে সে। সন্ধেবেলায় চাঁদিয়া 'বারিকে' ফিরে এসে রসুই চড়ায়। সেই সময় বজরঙ্গী তার ঘরে হানা দেয়। চাঁদিয়ারই বিছানার একধারে জাঁকিয়ে বসে 'গপসপ' করে, কথায় কথায় খ্যা খ্যা করে হাসে।

বজরঙ্গী যাতে বেশিদুর এগুতে না পারে সেই কারণে রোজই একটা না একটা অছিলা মাথা থেকে বার করে ধনপত। গোবেচারা ভালমানুষের মতো মুখ করে অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে এমন সব কাণ্ডকারখানা করে যাতে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বজরঙ্গীকে উঠে যেতে হয়। ধনপত টের পায়, তার ওপর মনে মনে বেজায় খেপে আছে বজরঙ্গী।

রোজই ধনপত ভাবে, বজরঙ্গীর নামে মিশিরজির কাছে নালিশ করবে। এই নিয়ে চাঁদিয়ার সঙ্গে অনেক পরামর্শও করেছে সে। কিন্তু নালিশ জানাতে গিয়ে যদি হিতে বিপরীত হয়, তাই দু পা এগিয়ে দশ পা পিছিয়ে আসে। তা ছাড়া একটা ব্যাপার তার চোখে পড়েছে, আরো তিন হুকুমদার মজুরদের আওরতদের পেছনে ঘুর ঘুর করতে শুরু করেছে।

হয়ত একই প্রথা দুনিয়া জুড়ে সব জায়গায় চালু রয়েছে। গরিব অচ্ছুৎদের ঘরের যুবতী মেয়েরা হয় জমির মালিক, না হয় হুকুমদারদের চিরকালের ভোগের বস্তু।

আজ সকালেও অন্য সবার সঙ্গে জঙ্গলের দিকে চলেছে চাঁদিয়া আর ধনপত। হুকুমদার আগে আগে হাঁটছে। তাদের মধ্যে টহলরামকেও দেখা যাচ্ছে। তার কাঁধে দোনলা বন্দুক। ইদানীং রোজই ধনপতদের সঙ্গে জঙ্গলে যাচ্ছে টহলরাম। যতক্ষণ ধনপতরা গাছ টাছ কাটে ততক্ষণ সে জঙ্গলের এ মাথা থেকে ও মাথায় টহল দিয়ে বেড়ায়। যাতে জানবররা কাছাকাছি না আসে সেজন্য মাঝে মাঝেই বন্দুকটা আকাশের দিকে তুলে ফাঁকা আওয়াজ করে। তাতে গাছপালার মাথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানিক পাখি, বক আর শুগারা উড়ে যায়।

টহলরাম এমনিতে মিশিরজির অফিসের দারোয়ান। তার বন্দুকের নিশানা নাকি অব্যর্থ।

যেতে যেতে চাপা গলায় চাঁদিয়া বলে, 'একগো বাত—'

ধনপত শুধোয়, 'কা?'

'বহোত বুরা।'

চমকে ওঠে ধনপত, উদ্বিগ্ন মুখে চাঁদিয়ার দিকে তাকায়।

চাঁদিয়া গলার স্বর আরো নামিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, 'হুকুমদার আজ কী বলেছে জানো?'

'কী?'

'সন্ধ্যার সময় সে আর আসবে না।'

ধনপত নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বলে, 'তা হলে ভালই হল। তুম বঁচ গিয়া।'

'সবটা শুনেই নাও।' চাঁদিয়া বলতে থাকে, 'হুকুমদার বলেছে রাত্তিরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আসবে। দরবাজায় টোকা দিলে খুলে দিতে বলেছে। অব কা করেগী হামনি?'

ধনপতকে এবার ভয়ানক চিন্তিত দেখায়। সে বলে, 'বহোত মুসিবত।'

'ও আদমী আচ্ছা নেহী।'

'হাঁ, বহোত খতরনাক।'

একটু চুপচাপ। তারপর চাঁদিয়া শুধোয়, 'কী করব তা তো বললে না—'

খানিকক্ষণ ভেবে ধনপত বলে, 'দরবাজা খুলবে না। দেখি কী করতে পারি।'

কাজ থেকে ফিরে অন্য দিনের মতো আজও খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল ধনপত। পাশের ঘরেও দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পাওয়া গেল।

অন্য সব দিন শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে সে। আজ রাজ্যের ঘুম তাড়িয়ে চোখ টান টান করে জেগে থাকে। বাইরে একটা পাতা খসার শব্দ হলেই তার কান কুকুরের মতো খাড়া হয়ে যায়।

টের পাওয়া যায়, পাশের ঘরেও চাঁদিয়া ঘুমোয় নি। এক সময় ধনপত ডাকে, 'এ চাঁদিয়া—'

দ্বিতীয় বার ডাকতে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া মেলে। চাপা গলায় চাঁদিয়া বলে, 'হাঁ—'

'এখনও ঘুমোও নি?'

'কা করে, নিদ আসছে না।'

'আমারও না।'

খানিকক্ষণ পর পর এই একই কথা হয় দু'জনের।

কতক্ষণ বাদে খেয়াল নেই, হঠাৎ চাঁদিয়ার দরজায় আস্তে টোকা পড়ে। যত আস্তেই হোক, বনভূমির পাশের স্তব্ধ প্রান্তরে শব্দটা বন্দুকের গুলির মতোই কানের পর্দায় ধাক্কা মারে ধনপতের। কম্বলের ভেতর তার হৃৎপিণ্ড মুহূর্তের জন্য যেন থমকে যায়।

ওদিকে চাঁদিয়ার দিক থেকে কোনোরকম সাড়া নেই। ধনপত জানে, আওরতটা ভয়ে কাঠ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে।

আবার টোকা পড়ে। তারপর বার বার। শেষ পর্যন্ত ধাক্কাই দিতে শুরু করে বজরঙ্গী। কিন্তু চাঁদিয়া যে জেগে আছে, তার কোনো লক্ষণ বোঝা যায় না। ধনপত জানে, সারারাত ধাক্কাধাক্কি করলেও বজরঙ্গী চাঁদিয়ার ঘুম ভাঙাতে পারবে না।

এবার চাপা গলায় বজরঙ্গী বলে, 'কা রে, ওঠ—

চাঁদিয়ার উত্তর নেই।

বজরঙ্গী ফের বলে, 'বনভৈসীর মতো ঘুম দেখছি তোর। উঠে পড়, উঠে পড়। বাইরে বহোত জাড়। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে।'

চাঁদিয়া জবাব দেয় না।

বজরঙ্গী এতক্ষণে ভয়ানক অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। বলে, 'এ আওরত, এ ভূচ্চব—এত ডাকাডাকি করছি তবু তোর নিদ টুটছে না! মনে করছিস তোর শয়তানি বুঝতে পারছি না? জেগে আছিস, লেকেন উঠছিস না।' আচমকা গলাটা সামান্য চড়িয়ে হুঁশিয়ারি দেয়, 'এখনই দরবাজা খুলে না দিলে ভেঙে ঘরে ঢুকব।'

ধনপত বুঝতে পারে, আর শুয়ে থাকা যাবে না। দ্রুত উঠে পড়ে সে। তারপর কম্বল জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

চারদিক কুয়াশা এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই দশটা আগুনের কুণ্ড অসহ্য হিমে নিভু নিভু হয়ে এসেছে। সেগুলো দেখে ধনপতের মাথায় হঠাৎ যেন বিজলি খেলে যায়। সে ঠিক করে ফেলে এই 'ঘুর'গুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

পাঁচ হাত দূরে চাঁদিয়ার ঘরের সামনে সারা শরীব কম্বলে মুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বজরঙ্গী সিং রাজপুত। শীতের এই মধ্যরাতে ধনপতকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে সে।

আকাশ থেকে পড়ার মতো ভঙ্গি করে ধনপত বলে, 'কা সিংজি, আপ ইঁহা?'

প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণে প্রচণ্ড রাগে এবং বিরক্তিতে প্রায় ফেটে পড়ে বজরঙ্গী, 'আমি হুকুমদার, যেখানে যখন খুশি যাব। লেকেন তুই এখানে কেন? এত্তে রাতকো? কা ধান্দা তুহারকা?'

'ঘুব'গুলো দেখিয়ে ধনপত বলে, 'ওগুলো নিভে এসেছে। নয়া লকড়ি দিতে হবে। মিশিরজি বোলাথা ও রোজ—'

কথাটা মনে পড়ে যায় বজরঙ্গীর। সত্যিই বলেছিল মিশিরজি। প্রথম দিন মিশিরজির লোকেরা 'ঘুর' জ্বালিয়ে দিলেও তারপর থেকে মজুরদেরই এই কাজটা করতে হবে। শুধু তাই নয়, রাতে মাঝে মাঝে উঠে তাদেরই কাউকে নিভন্ত অগ্নিকুণ্ডে কাঠ গুঁজে আগুনটা চাঙ্গা করে তুলতে হবে।

বজরঙ্গী দাঁতে দাঁত ঘষে জেরা করে, 'আজ তোর লকড়ি গোঁজার দিন নাকি?'

'হাঁ।'

'শালে গিদ্ধড়, লকড়ি দেওয়ার আর দিন পেলে না! যা শালে—'

বলে আর দাঁড়ায় না বজরঙ্গী, সোজা অফিস ঘরের দিকে চলে যায়। আজকের রাতটা বৃথাই গেল।

এইভাবে রোজই রাত্তিরে হানা দেয় বজরঙ্গী, আর রোজই একটা না একটা অজুহাতে বাইরে বেরিয়ে এসে তাকে ঠেকায় ধনপত।

বজরঙ্গী ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না, দিন কয়েকের মধ্যেই ধনপতের কৌশলটা ধরে ফেলে সে।

সেদিন সকালে জঙ্গলে যেতে যেতে ধনপতকে ডেকে নিয়ে ভয়ঙ্কর গলায় বজরঙ্গী বলে, 'আজ রাত্তিরে যদি ঘর থেকে বেরোস, তোকে মাটিতে পুঁতে ফেলব। হোঁশিয়ার—'

ধনপত ভয় পেয়ে যায়। বজরঙ্গীর এমন মূর্তি আগে আর কখনও দেখা যায়নি। বিকেলে কাজ থেকে ফিরে এসে চাঁদিয়াকে বলে, 'আর বোধহয় হুকুমদারকে রোখা যাবে না। আজ রাত্তিরে বেরুলে সে আমাকে খুন করে ফেলবে।'

ভয়ার্ত মুখে চাঁদিয়া বলে, 'তব্ কা হোগা?'

একটু চিন্তা করে ধনপত বলে, 'এখান থেকে ভাগতে হবে। লেকেন হোঁশিযার, কেউ যেন টের না পায়।'

তারপর দু'জনে পরামর্শ করে পালাবার পরিকল্পনা ছকে ফেলে। আজ রাত্তিরে সবাই শুয়ে পড়লে, বজরঙ্গী আসার আগেই তারা এখান থেকে উধাও হয়ে যাবে। এখন তাদের একটা মাত্র কাজ, মিশিরজির কাছ থেকে এ ক'দিনের কাজের মজুরি আদায় করে নেওয়া।

ধনপত বলে, 'নাহানা চুকিয়ে মিশিরজির কাছে যাই। মজুরির কথাটা বলি—'

'মজুরি আদায় করে চলে যাব, এ কথা বলবে নাকি মিশিরজিকে?' উদ্বিগ্ন চোখে ধনপতের দিকে তাকায় চাঁদিয়া।

'আরে নেহী, নেহী—'

ধনপত অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলে, 'যাওয়ার কথা বললে একগো পাইসাও দেবে না মিশিরজি। বহোত ঝামেলায় ফেলে দেবে আমাদের।'

'আমার পাইসা তো তোমাকে দেবে না। সঙ্গে যাব তোমার?'

'নেহী। আগে আমার কথাটা বলি। তেমন বুঝলে পরে তোমাকে পাঠাব।'

কিছুক্ষণ পর কুয়োর জলে 'নাহানা' চুকিয়ে পরিষ্কার জামা-কাপড়ের ওপর কম্বল চাপিয়ে সোজা অফিস ঘরে চলে আসে ধনপত। মিশিরজিকে অফিসেই পাওয়া যায়।

মিশিরজি প্রথম প্রথম মজুরদের 'তুমি' করেই বলত। এখন তুই তোকারি করে। ধনপতকে দেখে সে বলে, 'কা রে, কা ধান্দা?'

ভয়ে ভয়ে ধনপত বলে, 'একগো বাত—'

'কা বাত?'

ধনপত মজুরির কথা বলে।

খানিকক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকার পর সন্দিগ্ধভাবে মিশিরজি শুধোয়, 'মজুরির পাইসা দিয়ে কী হবে?'

মিশিরজি এরকম প্রশ্ন করবে, ভাবতে পারেনি ধনপত। প্রথমটা সে হকচকিয়ে যায়। তারপর বলে, 'ঘরমে ভেজেগা।'

মিশিরজি বলে, 'পাঠাবি কী করে? এখানে ডাকঘর নেই। তা ছাড়া—'

'কা?'

'মজুরির পাইসা এখন পাবি না। জঙ্গল সাফাই হলে পুরা পাইসা একসাথ পেয়ে যাবি। সমঝা?'

কত দিনে জঙ্গল সাফাই হবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। ধনপত ভেতরে ভেতরে ভয়ানক দমে যায়।

মিশিরজি ফের বলে, 'রাতকা ভোজন হো গিয়া?'

'নেহী—'

'য়া। সারাদিন খেটে এসেছিস। খেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে।'

ধনপত ফেরার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, মিশিরজি ডাকে, 'একগো বাত শুনে যা—'

ধনপত ঘাড় ফেরায়, 'কা?'

সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে মিশিরজি প্রশ্ন করে, 'পাইসা হাতে পেলে সবাই ভাগার চেষ্টা করে। তাই আমরা আগে কাউকে পাইসা দিই না। সমঝা?'

বিমর্ষ দেখায় ধনপতকে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সে।

মিশিরজি বলতে থাকে, 'তুই ভাগবার মতলব করছিস নাকি?'

লোকটা কি বুকের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পায়? ধনপত চমকে ওঠে। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে রুদ্ধ গলায় বলে, 'নেহী, নেহী—'

স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে মিশিরজি। আস্তে আস্তে বলে, 'তোদের সাথ কোম্পানির 'কনটেরাক্ট' হয়ে গেছে, ছাপানো কাগজে অঙ্গুঠার টিপছাপ দিয়েছিস। কাম পুরা না হলে এখান থেকে কারুর পালাবার উপায় নেই। সমঝা?'

কাঁপা গলায় ধনপত বলে, 'সমঝ গিয়া মিশিরজি।'

'অব যা—'

ফিরে এসে মিশিরজির সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছে সব চাঁদিয়াকে জানায় ধনপত। চাঁদিয়া বলে, 'অব কা হোগা?' তাকে খুবই চিন্তিত দেখায়।

ধনপত এর মধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে। সে বলে, 'তোমার সঙ্গে তখন যা কথা হয়েছে তা-ই করতে হবে। আজই আমরা পিপরিয়া থেকে চলে যাব। তুরন্ত খাওয়া চুকিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।'

'আমরা সঙ্গে করে কিছুই আনিনি। এ সব কম্বল বর্তন-উর্তন তো মিশিরজির।'

'মিশিরজির ওপর তোমার খুব টান দেখছি।' তীব্র গলায় ধনপত বলে, 'সে আমাদের মজুরির পাইসা দিয়েছে? একগো জিনিসও ফেলে যাবে না। ওরা যা দিয়েছে সব বেঁধে নেবে। মজুরির পাইসা এভাবে যতটা তোলা যায়।'

'ঠিক হ্যায়।'

খাওয়া দাওয়ার পরে মজুরদের ঘরে ঘরে আলো নিভে যায়। চারদিক দ্রুত নিস্তব্ধ হতে থাকে। ঝিঁঝির ডাক এবং থেকে থেকে কামার পাখিদের চিৎকার ছাড়া পৃথিবীর কোথাও এখন অন্য কোনো শব্দ নেই।

তবু চাঁদিয়া আর ধনপত রুদ্ধশ্বাসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর রাত যখন আরো গভীর হয়, বাতাসে কুয়াশা আরো গাঢ় হতে থাকে, সেই সময় দু'জনে কাঁধে দুটো বড় পুঁটলি চাপিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু মজুর ব্যারাকের শেষ ঘরটা পেরুবার আগেই কে যেন রাতের আকাশ ফেঁড়ে চিৎকার করে ওঠে, 'ভাগতা হ্যায়, ভাগতা হ্যায়। রুখ যা, রুখ যা।'

ধনপতরা জানে না, পাহারাদারদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে এখান থেকে পালানো প্রায় অসম্ভব।

প্রথমটা মারাত্মক ভয়ে দু'জনে সিঁটিয়ে যায়। কী করবে, বুঝতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

টের পাওয়া যাচ্ছে, পাশের লোকটার চিৎকারে অফিসের ওধারের ঘরগুলো থেকে অনেকেই বেরিয়ে পড়েছে। তারা হই চই বাধিয়ে ছুটে আসছে, 'পাকড়ো শালে লোগকো, পাকড়ো—পাকড়ো—'

মুহূর্তে ধনপতের সারা শরীরে প্রচণ্ড ঝাঁকানি লাগে যেন। চাপা গলায় সে চাঁদিয়াকে বলে, 'যত জোরে পার দৌড়তে থাক। ওরা ধরতে পারলে খতম করে দেবে।'

দু'জনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সামনের দিকে ছুটতে থাকে।

পেছনের লোকগুলো উর্ধ্বশ্বাসে তাড়া করে আসছে। ছুটতে ছুটতে অন্য এক রাত্রির কথা মনে পড়ে যায় ধনপতের। চন্দ্রিকা সিং রাজপুতের পহেলবানদের তাড়া খেয়ে এইভাবেই তাকে পালাতে

হয়েছিল।

খানিকটা ছুটবার পর ধনপত বুঝতে পারে, কাচ্চী ধরে সোজা ছুটলে চলবে না। পেছনের লোকগুলো আর তাদের মধ্যে দূরত্বটা দ্রুত কমে আসছে। তার কারণও আছে। প্রথমত একটা আওরতকে সঙ্গে নিয়ে তাকে ছুটতে হচ্ছে। যত জোরেই ছুটুক, চাঁদিয়ার পক্ষে পুরুষের মতো দৌড়ুনো সম্ভব নয়। হাজার হোক, সে একটা আওরত। ক'দিন আগে দধিপুরায় অধিকলাল চৌবে আর তার সঙ্গী সাত আটটা গিধ চাঁদিয়ার শরীরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে বরখা নদীতে ছুঁড়ে ফেলেছিল। ইজ্জতের সওয়ালে তার যে মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার তা তো হয়েই গেছে কিন্তু দৈহিক ক্ষতিটা তার চাইতে এতটুকু কম নয়। শরীর তার এখনও ঠিকমতো সেরে ওঠে নি। তবু এর মধ্যেই জঙ্গল কাটাইয়ের মতো 'গতর চূরণ' খাটুনি শুরু করতে হয়েছিল।

দু'জনের জোরে দৌড়ুতে কষ্ট হচ্ছিল, কেননা তাদের কাঁধে রয়েছে বিস্তর মালপত্রের বোঝা।

ধনপত চাপা গলায় বলে, 'সামান ফেলে দাও, সামান ফেলে দাও—'

পার্থিব সম্পত্তি যেটুকু আছে তা ফেলে দিলে পরে তাদের চলবে কী করে? ছুটতে ছুটতেই বিমূঢ়ের মতো চাঁদিয়া শুধু বলে, 'ফেলে দেব!'

শশব্যস্তে চেঁচিয়ে ওঠে ধনপত, 'হাঁ হাঁ, আভ্‌ভি। দের নায় করনা।'

চাঁদিয়া মালপত্র ফেলে শুধু বলে, 'লেকেন—'

তার দ্বিধার কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না ধনপতের। কিন্তু ভারমুক্ত না হলে ছোটার গতি বাড়ানো যাবে না, ফলে যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়বার সম্ভাবনা। ধনপত তাড়া লাগায়, 'ফেলে দাও— ফেলে দাও—' বলে কাঁধ থেকে নিজের পুঁটুলিটা ছুঁড়ে ফেলে সে।

অগত্যা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের বিরাট বোঁচকাটা ফেলে দিতে হয় চাঁদিয়াকে।

ধনপত বলে, 'এবার ধানখেতে নেমে যাও।'

দু'জনেই খেতে নেমে পড়ে, তারপর আঁকাবাঁকা উঁচু আল ধরে দৌড়তে থাকে। কিন্তু মিশিরের লোকজনদের একেবারে নাছোড়বান্দা শুয়োরের গোঁ, তারাও পেছন পেছন ধাওয়া করে আসছে।

ছুটতে ছুটতে আচমকা গর্তে পা ঢুকে যেতে হুমড়ি খেয়ে আলের তলায় ধানখেতে পড়ে যায় চাঁদিয়া। তার গলা থেকে কাতর গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসে, 'মর গিয়া—'

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায় ধনপত। তার হৃৎপিণ্ডের ওঠা-নামা হঠাৎ থেমে যায়। পরক্ষণেই শরীরের সমস্ত শক্তি দুই পায়ে জড়ো করে দৌড়ুতে থাকে।

মাঝরাতে ধনপত একটা নির্জন হাটে এসে পৌঁছয়। কোথাও কেউ নেই। না একটা মানুষ, না একটু আলো। চারদিক একেবারে হা হা করছে।

এই মধ্যরাতে কুয়াশা এত ঘন যে দু'হাত দূরের কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। আকাশে হয়ত চাঁদ আছে। কিন্তু ঘন সাদা কুয়াশার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে তার এক ফোঁটা আলোও এখানে এসে পৌঁছয় নি। সমস্ত চরাচর গাঢ় হিমের তলায় একেবারে কুঁকড়ে আছে।

যেদিকে তাকানো যাক, সমস্ত হাটটা জুড়ে অগুনতি সারিবদ্ধ চালা দাঁড়িয়ে আছে। চালাগুলোর মাথার ফুটিফাটা টিন বা টালির ছাউনি, চারপাশ একেবারে উদোম—বেড়া টেড়া কিছুই নেই। মেঝের মাটি পৌষের মারাত্মক হিমে জমাট বেঁধে আছে।

বরফের চাকের মতো ঠাণ্ডা কনকনে মেঝেতে শোওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা চালার তলায় বাঁশের লম্বাটে বেঞ্চি চোখে পড়ে ধনপতের। বেঞ্চিটা কী উদ্দেশ্যে কারা বানিয়েছিল, সে সব ভাবার এখন সময় নয়। তার শরীরে এক ফোঁটা শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই, সবটুকু তাগদ ক্ষয় করে মরিয়া হয়ে সে এতদূর ছুটে এসেছে। ফসল-কাটা ফাঁকা মাঠ এবং ঝোপঝাড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কত মাইল তাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে হয়েছে, ধনপত জানে না। শুধু তার মনে হচ্ছে, এতটা দৌড়ুনোর ধকলে তার হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে যাচ্ছে। ছিঁড়ে পড়ছে কাঁধ ঘাড় এবং কোমরের হাড়। তা ছাড়া অসহ্য ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে সারা দেহের রক্ত-মাংস।

ধনপত এক মুহূর্তও আর দাঁড়ায় না। কিংবা নিজের অজান্তেই হয়ত তার শরীর ভেঙেচুরে হুড়মুড় করে বাঁশের বেঞ্চিটায় পড়ে যায়।

ধনপতের গায়ে রয়েছে খেলো জ্যালজেলে জামা-প্যান্টের ওপর রোঁয়াওলা উলের ধুসো সোয়েটার এবং পাতলা একটা চাদর। কোনোরকমে চাদরটায় মাথা এবং মুখ মুড়ে নেয় সে। এরপর আর তার হুঁশ থাকে না।

চারদিক থেকে পৌষের বাতাস ধনপতের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকে। মাটির কোটি কোটি ছিদ্র দিয়ে উঠে আসতে থাকে অজস্র হিম। এরই মধ্যে বুকের ভেতর হাঁটু গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেহুঁশ পড়ে থাকে ধনপত।

তের

পরদিন পাখির ডাক এবং কুকুরের চিৎকারে ঘুম ভাঙে ধনপতের। চোখ মেলতেই দেখা যায়, বেলা বেশ চড়ে গেছে। পুব আকাশের ঢালু দেওয়াল বেয়ে বেয়ে সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। দূরে মাঠ এবং ঝোপঝাড়ের মাথায় নরম রেশমের মতো কুয়াশার পর্দা। সেই কুয়াশা ছিঁড়ে খুঁড়ে অঢেল মায়াবী রোদের ঢল নেমে আসছে। এধারে ওধারে গাছপালার মাথায় প্রচুর পাখি উড়ছে—পরদেশি শুগা, মানিক পাখি, চোটা, কাক, এমনি অনেক। এ ছাড়া ধনপতের চালাটার ঠিক নিচেই আট দশটা কুকুর একটা মরা চড়াইয়ের দখল নিয়ে তুমুল চেঁচামেচি আর কামড়াকামড়ি করে যাচ্ছে।

প্রথমটা ধনপত বুঝতে পারল না, এখানে কিভাবে এসেছে। একটু পরেই তার সব মনে পড়ে গেল। নির্জন হাটের চালায় বাঁশের বেঞ্চিতে বসে কাল রাতের ঘটনাগুলো তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। কাল নিজের প্রাণ বাঁচানো ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে নি ধনপত। কিন্তু এই মুহূর্তে চাঁদিয়ার মুখটা বার বার তার মনে পড়তে লাগল। যে মেয়েটা তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেছিল তাকে একপাল গিধের মুখে ফেলে ওভাবে পালিয়ে আসা ঠিক হয় নি। তাকে ধরতে পারলে মিশিরজির লোকেরা নিশ্চয়ই মাটির তলায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলত। তবু পিপরিয়ার একটা অসহায় মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে মনে মনে হাজার বার নিজেকে ধিক্কার দেয় ধনপত। সে ভীরু, কাওয়ার, পুরুষানুক্রমে বেগার খেটে তার মেরুদণ্ড কবেই দুমড়ে গেছে, ধ্বংস হয়েছে সাহস এবং মনের জোর। আচমকা তার রক্তস্রোতে কিসের যেন বিস্ফোরণ ঘটে যায়। আজই সে পিপরিয়ায় যাবে, যেমন করে হোক চাঁদিয়াকে ওখান থেকে নিয়ে আসতে হবে।

বাঁশের চালি থেকে নামতে গিয়ে ধনপত টের পায় তার হাত-পা ঠাণ্ডায় একেবারে জমে আছে। সে যে এখনও বেঁচে আছে, এটাই এক বিস্ময়কর ঘটনা।

আস্তে আস্তে পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে আড়ষ্টতা কাটিয়ে নেয় সে। দু হাত ঘষে ঘষে শরীরে বাড়তি উত্তাপ নিয়ে আসে। তারপর নিচে নামে।

এত বেলাতেও হাট একেবারেই ফাঁকা, লোকজন দেখা যাচ্ছে না। বোঝাই যায়, আজ হাটের দিন নয়।

শূন্য চালাগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় ধনপত বুঝতে পারে, তার পেটে আগুন জ্বলছে। কিছু না খেলে বেশিক্ষণ সে হাঁটতে পারবে না।

হাটের চৌহদ্দি পেরিয়ে আসার পর ধনপতের চোখে পড়ে চারদিকে শুধু ফসলহীন ধু ধু মাঠ। কোথাও মানুষজন বা দেহাত দেখা যায় না। কোন দিকে গেলে গ্রাম পাওয়া যাবে সে বুঝে উঠতে পারে না।

ধনপত হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। সামনে পেছনে ডাইনে এবং বাঁয়ে একবার তাকায়। তারপর কী ভেবে মাঠ ভেঙে সোজাসুজি হাঁটতে শুরু করে। ফসলের জমি যখন আছে তখন আশেপাশে গাঁ-ও নিশ্চয়ই আছে। মানুষ তো দশ বিশ মাইল দূর থেকে জমি চষতে বা ফসল কাটতে আসে না।

মাইল দুয়েক হাঁটার পর সূরয যখন আরো ওপরে উঠে এসেছে, রোদের তেজ সামান্য বেড়েছে,

সেই সময় ধুঁকতে ধুঁকতে ছোটখাট একটা গেঁয়ো বাজারে এসে পড়ে ধনপত।

বিহারের অজ গাঁ-গুলতে যেমন দেখা যায়, এই বাজারটা তার থেকে আলাদা কিছু নয়। কাচ্চী বা কাঁচা সড়কের ওপর দশ বারটা দোকান গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানগুলোর কোনোটা মুদিখানা, কোনোটা চায়ের, কোনোটা সস্তা মিঠাইয়ের, ইত্যাদি। রাস্তার উলটোদিকে একটা ঝাঁকড়া-মাথা পিপর গাছ, সেটার তলায় চার-পাঁচটা বয়েল গাড়ি কাত হয়ে পড়ে আছে। বয়েলগুলো গাড়ির সঙ্গে জোতা নেই, সড়কের নিচে যে ঘাসের মাঠ রয়েছে সেখানে চরে বেড়াচ্ছে। সওয়ারি পাওয়া গেলে ওগুলোকে এনে গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। গাড়োয়ানেরা গাড়িতে বসে রোদ পোহাচ্ছে আর হাতের তেলোতে খৈনি ডলতে ডলতে কথা বলছে। ওদের ঠিক পাশেই এক নাপিত তার এক খদ্দেরের মাথা পরিষ্কার চেঁছে সযত্নে মোটা একটি টিকি বার করছে। নাপিতের পাশেই হতচ্ছাড়া চেহারার একটা লিট্টির দোকান। মাথার ওপর ছাউনি টাউনি নেই। স্রেফ গাছতলায় বসে একটা লোক চিমটে দিয়ে উনুনের গনগনে আঁচে গোল গোল লিট্টি সেঁকছে।

বাজারে ঢুকতেই যান্ত্রিক নিয়মে ধনপতের হাত তার কোমরের কাছে চলে যায়। ধুরুয়া গাঁ থেকে কয়েকদিন অগে সে যখন মুক্তির দাম যোগাড় করতে বেরোয় সেই সময় মা-বাবা ক'টা টাকা তাকে দিয়েছিল। দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় নিজের এবং চাঁদিয়ার জন্য চা আর পাঁউরুটি কিনে সামান্য কিছু খরচ করেছিল। তারপর তো মুনোয়ারপ্রসাদের সঙ্গে পিপরিয়াতেই চলে গেল। জঙ্গল কাটাইয়ের ঠিকাদাররা তাদের দায়িত্ব নেওয়ার পর আর খরচ টরচ হয়নি। কাজেই বাকি টাকা থেকেই গেছে। পিপরিয়া থেকে কাল রাতে তারা যখন বেরোয় বাকি টাকাটা 'ফুর প্যান্টে'র কোমরের পটির ভেতর পুরে নিয়েছিল। যদিও বাড়তি জামা-কাপড়, কম্বল, সবই তাকে ফেলে আসতে হয়েছে, টাকাটা সঙ্গেই আছে। কোমরে হাত দিয়ে ধনপত অনেকটা আরাম বোধ করল।

মিঠাইয়ের দোকানে নোংরা কাঠের বারকোষে থরে থরে সাজানো রয়েছে আটার তৈরি কালচে বালুসাই নিমকিন বুন্দিয়া জিলাবি আর সমোসা। খাবারগুলোর ওপর ধুলোর সিকি ইঞ্চি পুরু আস্তর। আর রয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে ভনভনে মাছি। বালুসাই টাই দেখে জিভে জল এসে যায় ধনপতের, চোখদুটো চকচকিয়ে ওঠে। পরক্ষণেই দামের কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে যায়। যে সামান্য ক'টা টাকা তার কাছে রয়েছে তাতে বালুসাই খাওয়ার বিলাসিতা মানায় না। দামি দামি খাবার খেয়ে টাকাটা উড়িয়ে দিলে চলবে কী করে? কবে সে কাজটাজ পাবে, কবে পয়সা কামাই করতে পারবে, তার কোনো ঠিক নেই। যতদিন কিছু একটা না জুটছে, এই সামান্য টাকা ক'টাই তার ভরসা।

শেষ পর্যন্ত পিপর গাছের তলায় লিট্টিওলার কাছেই চলে যায় ধনপত। আট আনায় গরম গরম চারটে লিট্টি কিনে উবু হয়ে বসে খেতে শুরু করে।

খাওয়া শেষ হলে লিট্টিওলার কাছ থেকেই এক লোটা জল চেয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে নেয়। সবজির পুর দেওয়া আটার ডেলার ভার অনেকটা সময় এখন পেটে থাকবে। আপাতত সন্ধে পর্যন্ত কিছু না খেলেও চলে যাবে।

পেটটা ঠাণ্ডা হতেই আচমকা চাঁদিয়ার মুখ আবার মনে পড়ে যায় ধনপতের। তার কথা আজ সকালেও ঘুম ভাঙার পর একবার ভেবেছে সে। হঠাৎ দুর্জয় এক সাহস যেন ধনপতের ওপর ভর করে। যেমন করেই হোক, চাঁদিয়াকে পিপরিয়ার ঠিকাদারদের ফাঁদ থেকে বার করে আনতে হবে, আনতেই হবে।

কিন্তু পিপরিয়া কোথায় ধনপত জানে না। কাল রাতে কিভাবে কোন দিকের মাঠ-জঙ্গল ভেঙে ফাঁকা হাটে চলে গিয়েছিল, মনে নেই। কুয়াশায় অন্ধকারে এবং হিমে সমস্ত চরাচর যখন ঝাপসা আর আড়ষ্ট হয়ে আছে তখন রাস্তাঘাট চিনে রাখা অসম্ভব। তা ছাড়া নিজের প্রাণ বাঁচানো ছাড়া অন্য কোনো দিকে লক্ষ্যও ছিল না। সে লিট্টিওলাকে শুধোয়, 'ভেইয়া, পিপরিয়া কঁহা, বলতে পার?'

'হাঁ হাঁ, জরুর—' লিট্টিওলা হাত তুলে উত্তর দিকটা দেখাতে দেখাতে বলে, 'উধার—'

'কেত্তে দূর?'

'হোগা লগভগ দো তিন 'মিল'—'

পিপরিয়াগামী রাস্তা সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো কিছু জানার ইচ্ছা ছিল ধনপতের কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া যায় না। এর মধ্যে লিট্টির দোকানে আরো ক'জন খদ্দের এসে হাজির হয়। তাদের নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়ে লিট্টিওলা।

অগত্যা দাম মিটিয়ে উঠে পড়ে ধনপত। লিট্টিওলা যে দিকটা দেখিয়ে দিয়েছিল সেদিকেই হাঁটতে থাকে সে।

বাজারের পাশের সেই কাঁচা সড়কটা বরাবর উত্তর দিকে চলে গেছে। বিহারের এইসব দেহাতের রাস্তাঘাটের চেহারা যেমন হয় কাচ্চীটাও অবিকল তাই—শুধু ধুলো আর ধুলো। হাঁটুভর ধুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে ধনপত এগিয়ে যায়। এদিকে পৌষের সূর্য এতক্ষণে খাড়া মাথাব ওপর এসে উঠেছে। যদিও কনকনে উত্তুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে দু'ধারের ফাঁকা ধানখেতের ওপর দিয়ে তবু রোদের তেজ বাড়ায় আরামদায়ক একটু উষ্ণতাও টের পাচ্ছে ধনপত। হাঁটতে ভালই লাগছে তার। তবে পিপরিয়ার দিকে যত এগুচ্ছে, ভেতরে ভেতরে উৎকণ্ঠাটা ততই বেড়ে চলেছে। সে নিজে তো পালাতে পেরেছিল। কিন্তু ধরা পড়ার পর চাঁদিয়ার কী হাল হয়েছে, তাকে মিশিরজির লোকেরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে কিনা, কিংবা বেঁচে থাকলে তার ওপর কতটা পাহারাদারি চলছে, আদৌ তার সঙ্গে দেখা করা যাবে কিনা, ইত্যাদি নানা দুশ্চিন্তায় এবং আকণ্ঠ উদ্বেগে ধনপতের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে।

লিট্টিওলা বলেছিল মোটামুটি দু-তিন মাইল হাঁটলেই পিপরিয়া পৌঁছুনো যাবে। কিন্তু দেহাতের মানুষজনের মাইলের হিসেব বেজায় গোলমেলে। প্রায় মাইল আটেক পেরুবার পর সূর্য যখন পশ্চিম আকাশের নিচের দিকে ঘন গাছগাছালির ওপারে নেমে গেছে সেই সময় ধনপত পিপরিয়া পৌঁছে যায়।

প্রথমেই সে জঙ্গল কাটাইয়ের ঠিকাদারদের সেই ব্যারাকগুলোর দিকে যায় না। আগে হালচাল বুঝে নিতে হবে। তারপর খুব হুঁশিয়ার হয়ে তাকে এগুতে হবে। ঝোঁকের মাথায় বা আবেগের বশে হুট করে কিছু করে বসা ঠিক নয়। তাতে তারও ক্ষতি, আর চাঁদিয়া যদি এখনও বেঁচে থাকে, সেও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

ব্যারাকগুলো ডাইনে রেখে অনেকটা ঘুরে জঙ্গলের দিকে চলে যায় ধনপত।

উত্তর দিকে মাইলের পর মাইল চাপ-বাঁধা জঙ্গল। বাকি তিন দিকে ফাঁকা সুনসান মাঠ। জঙ্গলের দিকে গেলে ঘন গাছপালার আড়ালে লুকোবার সুবিধা। ফাঁকা জায়গায় কারুর না কারুর চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। ধনপত অতটা ঝুঁকি নিতে পারবে না।

জঙ্গলে ঢুকতেই লোকজনের গলা শুনতে পায় ধনপত। অর্থাৎ গাছকাটা চলছে। সে দ্রুত একটা বিশাল সিমার গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। মোটা গুঁড়ির পেছন থেকে অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে মুখ বাড়িয়ে চারপাশ লক্ষ করতে থাকে।

হঠাৎ ধনপতের চোখ পড়ে, খানিকটা দূরে বুনো কুলের ঝাড়ের ওধারে মজুররা গাছ কাটছে। অনবরত কুড়ুল এবং করাত চালাবার শব্দ আসছে। সেই সঙ্গে কথাবার্তার আওয়াজ। মাঝে মাঝে হুকুমদারের হাঁকার, 'গপ বন্ধ করে হাত চালা শালেলোগ—'

হুকুমদারের গলার স্বরটা খুবই চেনা ধনপতের। লোকটা আর কেউ নয়—স্বয়ং বজরঙ্গী। ধনপতের বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে তাকিয়েই থাকে, যদি চাঁদিয়াকে দেখতে পায়। কিন্তু না, কোথাও নেই মেয়েটা।

বেশ কিছুক্ষণ পর কুলের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে ভানচাঁদকে দেখতে পায় ধনপত। লোকটা প্রাণপণে, শরীরের সমস্ত শক্তিতে একটানা করাত চালিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই দেখা যায় বজরঙ্গীকে, সে বাঁ হাতের তালুতে খৈনি ডলতে ডলতে এধারে ওধারে ঘুরে জঙ্গল কাটাই তদারক করছে।

এ ছাড়া আরো দু-চারজনকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারা সবাই পুরুষ। কিন্তু একটা মেয়েও নজরে পড়ছে না। আজ কি তবে আওরতরা জঙ্গল কাটতে আসে নি?

কুল জঙ্গলের ওধারে পলকহীন তাকিয়ে থাকতে থাকতে ধনপতের মনে হয়, চাঁদিয়া হয়ত বেঁচে আছে। একটা খুনটুন কিছু হয়ে গেলে এখনকার আবহাওয়াই বদলে যেত। আর যা-ই হোক, বজরঙ্গী

এভাবে অন্তত খৈনি ডলতে ডলতে নজরদারি করতে পারত না।

দিনের তাপ দ্রুত জুড়িয়ে আসছে। বনভূমির মাথায় শীতের শেষ বেলায় যে আবছা নিস্তেজ আলোটুকু আছে তার আয়ু আর কতক্ষণ? একটু পরেই ঝপ করে কালচে ডানায় চরাচর ঢেকে দিয়ে শীতের সন্ধে নেমে আসবে।

জঙ্গলের মাথায় হাজার হাজার পাখি একটানা চেঁচামেচি করে চলেছে। সারাদিন টো টো করে দুনিয়া ঘুরে ফিরে আসছে তারা। অগুনতি পোকামাকড় ধনপতের গায়ের ওপর উড়ে উড়ে এসে পড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা তাকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে। গায়ের সবটুকু রক্ত শুষে না নিয়ে ওরা বুঝি তাকে ছাড়বে না।

গলা দিয়ে টুঁ শব্দটি বার না করে দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করতে থাকে ধনপত।

আরো কিছুক্ষণ পর লম্বা পায়ে যখন সন্ধে নামতে থাকে, সেই সময় বজরঙ্গীর চিৎকার শোনা যায়। গলা অনেক উঁচুতে তুলে সে চেঁচাতে থাকে, 'আজ কাম বন্ধ্। সব কোঈ বারিকমে লৌট আ—আ—আ—' তার হুকুম জঙ্গলের ভেতর দিয়ে উত্তুরে হাওয়ার পিঠে চড়ে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়, কাতার দিয়ে জঙ্গল কাটানিরা কুলের ঝাড়গুলোর ওধার থেকে বেরিয়ে আসছে। সবার সামনে রয়েছে বজরঙ্গী, তারপর কুডুল দা বা করাত হাতে পুরুষেরা, তারপর মেয়েরা, সবার শেষে আবার কিছু পুরুষ। দলটার পাশে পাশে বড় বড় পা ফেলে আসছে আখাম্বা চেহারার দুটো পাহারাদার। তাদের কাঁধে ভারি দোনলা বন্দুক, বুকে টোটার মালা। হিংস্র খতরনাক জানোয়ারদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এই বন্দুকওলারা জঙ্গল কাটানিদের পাহারা দেয়।

পুরুষ এবং আওরতদের বিরাট দলটা ধনপতের সিমার গাছটার দশ হাত তফাত দিয়ে ব্যারাকের দিকে এগিয়ে যায়। চোখ টান করে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকে ধনপত।

একে একে সবাই চলে যাচ্ছে, এমন কি মেয়েদের দঙ্গলটাও। কিন্তু চাঁদিয়া নেই। ধনপত যখন আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, গভীর নৈরাশ্যে তার মন ভরে গেছে, তখনই আওরতগুলোর মাঝখানে চাঁদিয়াকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের উত্থান পতন হাজার গুণ বেড়ে যায়। রক্তের ভেতর উথলপাথল স্রোত ছুটতে থাকে। চাঁদিয়া বেঁচে আছে, চাঁদিয়া বেঁচে আছে।

নিজের অজান্তেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ধনপত। পরক্ষণেই হুঁশ ফিরে পায় সে, হাত দিয়ে তক্ষুনি নিজের মুখটা চেপে ধরে। সে এখানে মাত্র দশ হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে, বজরঙ্গীরা জানতে পারলে তার ফলাফল হবে মারাত্মক। মেয়েদের দলটা চলে যাওয়ার পর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরো ক'টি পুরুষ ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসতে থাকে। এদের থেকে খানিকটা দূরে, কিছুটা দলছুটের মতো আসছিল রামবনবাস। জগতের সবকিছু সম্পর্কে উদাসীন, বৃক্ষপ্রেমিক এই মানুষটিকে মোটামুটি ভালই লেগেছিল ধনপতের। মনে হয় সে বিশ্বাসযোগ্য। যে মানুষ গাছ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, সে আর যা-ই করুক ক্ষতি অন্তত করবে না। তা ছাড়া কাউকে না কাউকে বিশ্বাস তো করতেই হবে। অন্যের সাহায্য ছাড়া চাঁদিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা আদৌ সম্ভব নয়।

ধনপত গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে ডাকে, 'রাম ভেইয়া, রাম ভেইয়া—'

রামবনবাস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, এদিক সেদিক তাকায় কিন্তু কাউকেই দেখতে পায় না।

ধনপত ফের ডাকে, 'ভেইয়া—ইধর—'

এবার চোখে পড়ে যায় রামবনবাসের। ধনপত হাতের ইশারায় তাকে কাছে যেতে বলে।

বিমূঢ়ের মতো অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রামবনবাস। ধনপতকে এই জঙ্গলের ভেতর এভাবে দেখবে, সে যেন ভাবতে পারে নি। তারপর 'আরে তুম!' বলে দ্রুত সিমার গাছের দিকে এগিয়ে যায়।

ওধারে জঙ্গল কাটাইয়ের দলটা অনেক দূরে চলে গেছে। বজরঙ্গী বা তার পাহারাদারেরা কেউ লক্ষ করে নি, রামবনবাস জঙ্গলেই থেকে গেছে।

কাছে এসে রামবনবাস আবার বলে, 'তুমি এখানে এলে কী করে? কাল না পালিয়ে গিয়েছিলে!' বলতে বলতে বিস্ময় কেটে গিয়ে প্রচণ্ড ভয় তার ওপর ভর করে। চারদিকে তাকাতে তাকাতে চাপা

গলায় এবার সে বলে, 'ভাগ যাও, ইধরসে আভ্‌ভি ভাগ যাও। বজরঙ্গী দেখেগা তো জান চলা যায়েগা—ভাগো—'

'একলা ভাগার জন্যে আমি ফিরে আসিনি রাম ভেইয়া।'

'তবে কি মরবার জন্যে এসেছ? জানো কাল রাতে তুমি চলে যাওয়ার পর মিশিরজির লোকেরা জঙ্গল কাটানিদের হোঁশিয়ার করে দিয়ে গেছে, কেউ ভাগার মতলব করলে খতম করে দেবে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে ধনপত। এরকমই সে আন্দাজ করেছিল।

রামবনবাস থামে নি। সে একটানা বলে যায়, 'মিশিরজি আর বজরঙ্গী বলেছে তোমাকে ধরতে পারলে মাটির তলায় পুঁতে ফেলবে। তোমার এখানে আসা ঠিক হয় নি।'

এখানে আসাটা কতখানি বিপজ্জনক এবং এর মধ্যে কতটা ঝুঁকি রয়েছে ধনপত তা জানে। ঢোক গিলে সে বলে, 'আমি সব জানি ভেইয়া। লেকেন—'

'লেকেন কা?'

রামবনবাস খানিকটা ঝুঁকে শুধোয়, 'চাঁদিয়াকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছ?'

দেখা যাচ্ছে, চাঁদিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী, রামবনবাস তা জানে। হয়ত এখানকার সবাই সেটা আন্দাজ করেছে। বিশেষ করে কাল রাতে যখন পালাতে গিয়ে চাঁদিয়া ধরা পড়ে যায়, তারপরই ব্যাপারটা ব্যাপকভাবে চাউর হয়ে থাকবে।

মুখ নামিয়ে ধনপত বলে, 'একগো বাত পুছেগা ভেইয়া?'

'হাঁ হাঁ—'

'কাল আমি চলে যাওয়ার পর চাঁদিয়াকে ওরা মেরেছিল?'

'নেহী, বিলকুল নেহী। তব্—'

চাঁদিয়াকে যে বজরঙ্গীরা মেরে শেষ করে দেওয়া দূরের কথা, তার গায়ে আঙুলের টোকাটা পর্যন্ত দেয় নি, এতে উৎকণ্ঠা অনেকখানি কেটে যায় ধনপতের। অবশ্য কিছুক্ষণ আগে পলকের জন্য চাঁদিয়াকে দেখেছে সে। মেয়েটার গায়ে মারধরের কোনো চিহ্নই চোখে পড়ে নি। সে বলে, 'তব্ কা?'

রামবনবাস বলে, 'ওকে অন্য সবার থেকে বেশি করে হোঁশিয়ারি দিয়েছে, আর দিনরাত ওর ওপর নজর রাখছে বজরঙ্গীর লোকেরা।'

আস্তে আস্তে ফের মুখ তোলে ধনপত। বলে, 'মেয়েটা বহোত দুখী। ওদের গাঁওয়ের বড়ে সরকারের লোকেরা ওকে মেরে জখম করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। মরেই যেত, লেকেন ভাগোয়ান রামজিকা কিরপা, ও জানে এখনও বেঁচে আছে।' সহানুভূতিতে ধনপতের গলার স্বর আর্দ্র শোনায়। চাঁদিয়াকে মারের কথাটাই শুধু বলে সে। কিন্তু তার ইজ্জৎ যে ধ্বংস করা হয়েছে, সে যে ধর্ষিতা সেটা আর বলে না।

কেন চাঁদিয়াকে খুন করতে চাওয়া হয়েছিল, কোন গাঁওয়ে তাদের বাড়ি—এসব নিয়ে কোনো প্রশ্নই করে না রামবনবাস। আস্তে আস্তে শুধু মাথা নাড়ে। মুখচোখ দেখে বোঝা যায়, চাঁদিয়ার ওপর এই ভয়াবহ অত্যাচারের বিবরণ শুনে সে খুবই দুঃখিত হয়েছে।

আচমকা রামবনবাসের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে ধনপত বলে, 'একটা উপকার করবে ভেইয়া?'

'কা?'

'চাঁদিয়াকে আমার খবরটা দিয়ে বলবে আমি এই জঙ্গলে তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।' বলে, তৎক্ষণাৎ চাপা গলায় সতর্ক করে দেয়, 'দেখো, কেউ যেন শুনতে না পায়।'

রামবনবাস বলে, 'ঠিক হ্যায়, লেকেন—'

'কা?'

'অন্ধেরা হয়ে আসছে। এই জঙ্গলে একেলা থাকা ঠিক না। খতরনাক জানবর রয়েছে।'

'তবে কোথায় থাকব? বজরঙ্গীর পেহারাদাররা আমাকে দেখলে মুসিবত হয়ে যাবে।'

রামবনবাসকে চিন্তিত দেখায়। জঙ্গলে না থেকে ধনপত যদি ফাঁকা জায়গায় যায়, ধরা পড়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। কিছুক্ষণ ভেবে সে বলে, 'এক কাম কর—'

'কা?'

'ওই জমিনে গিয়ে পেঁড়গুলোর পেছনে দাঁড়াও, আমি গিয়ে চাঁদিয়াকে খবর দিচ্ছি।' বলে দূরে মাঠের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় রামবনবাস।

জঙ্গলের পুব দিকে ধানকাটা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে অনেকগুলো ট্যারাবাঁকা চেহারায় সিসম গাছ গা-জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালে বজরঙ্গীরা দেখতে পাবে না। অন্তত যে ছোকরা কাল রাতে পালিয়ে গেছে সে যে আজই বিকেলে আবার এখানে হানা দেওয়ার দুঃসাহস দেখাবে, এটা নিশ্চয়ই বজরঙ্গী বা মিশিরজির লোকেরা ভাববে না। মাঠের মাঝখানে সিসম গাছের পেছনে তার দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারটা ওদের মাথাতেই আসবে না।

ধনপত বলে, 'ঠিক হ্যায়। আমি ওখানেই যাচ্ছি।'

রামবনবাস বলে, 'একগো বাত—'

'কা?'

'তুমি কি চাঁদিয়াকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ধনপত। তারপর চোখ নামিয়ে আস্তে করে বলে, 'হাঁ ভেইয়া, লেড়কী বহোত দুখী।'

'বহোত দুখী' কথাটা আগে আরো একবার বলেছে ধনপত। এই কথাতেই রামবনবাস টের পেয়ে যায়, চাঁদিয়ার জন্য ধনপতের বুকের ভেতর টানটা ঠিক কোথায় এবং কী ধরনের। এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করে না সে। শুধু বলে, 'জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দিয়ে জমিনের দিকে চলে যাও। হোঁশিয়ার। আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছি।'

রামবনবাস সোজা মজুরদের ঘরগুলোর দিকে চলে যায়। আর ধনপত অনেকটা ঘুরপথে, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে, সতর্ক পশুর মতো স্নায়ু টান টান করে একসময় মাঠের মাঝখানে সেই সিসম গাছগুলোর পেছনে গিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে। ততক্ষণে ঝপ করে শীতের সন্ধে নেমে এসেছে।

চোদ্দ

কতক্ষণ ধনপত দাঁড়িয়ে আছে, খেয়াল নেই। পৃথিবীর এই অংশে সন্ধের পর সময় অনড় হয়ে থাকে। সমস্ত চরাচর জুড়ে হিম নামছে। কুয়াশায় হাজার হাজার জোনাকি অনবরত আলোর ছুঁচের মতো ফোঁড় তুলে যাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এবং বাড়িয়া পোকা তার চামড়ায় ক্রমাগত হুল ফুটিয়ে চলেছে। সিসম গাছের ডালে রাতজাগা কামার পাখিরা থেকে থেকে উৎকট ভৌতিক গলায় চেঁচিয়ে উঠছে।

কোনদিকে লক্ষ্য নেই ধনপতের। চোখের পাতা টান করে সে পিপরিয়া সাইট অফিসের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘন কুয়াশা এবং হিমের ভেতর দু-একটা ঝাপসা আলোর ফুটকি চোখে পড়ছে অর্থাৎ ওখানে এখনও কেউ ঘুমিয়ে পড়ে নি।

মাথার ওপর খোলা আকাশ থেকে নেমে আসছে মারাত্মক হিম। পায়ের তলাতেও মাটি ফুঁড়ে উঠে আসছে পৃথিবীর আদিম দুঃসহ শীতলতা। পৌষের হিংস্র বাতাস উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে এলোপাথাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। এভাবে, শীতের হিমবর্ষী এই রাত্তিরে হা হা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। অসহ্য ঠাণ্ডায় ধনপতের কান ঝিঁ ঝিঁ করতে থাকে। সে টের পায় সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে যাবে। তবু প্রচণ্ড মনের জোরে সে অপেক্ষা করতে থাকে।

রামবনবাস নিশ্চয়ই চাঁদিয়াকে খবর দিয়েছে। সবাই ঘুমিয়ে না পড়লে মেয়েটা আসে কী করে? যেভাবে কড়া পাহারাদারি চলছে তাতে বললেই তো আর হুট করে চলে আসা যায় না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও কিন্তু চাঁদিয়া এল না। ওদিকে জঙ্গল-কাটানিদের ব্যারাকে আলো নিভে গেছে। ধনপত স্থির করে ফেলল, আর দাঁড়িয়ে থাকবে না। চাঁদিয়া কখন আসবে, আদৌ আসতে

পারবে কিনা, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে চরাচর জুড়ে ঘন হয়ে যে হিম নামছে তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানে অবধারিত মৃত্যু। এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে শেষবার সে চেষ্টা করে দেখবে, চাঁদিয়াকে মিশিরজিদের ফাঁদ থেকে বার করে আনতে পারে কিনা।

অন্তহীন দুঃসাহসে পায়ে পায়ে ব্যারাকটার দিকে এগিয়ে যায় ধনপত। যদিও হিম এবং অন্ধকারে তাকে দেখে ফেলার সম্ভাবনা খুবই কম তবু অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে সে পা ফেলতে থাকে।

ব্যারাকের কাছাকাছি এসে তার চোখে পড়ে ঘরগুলোর সামনে চার পাঁচটা 'ঘুর' জ্বলছে। খতরনাক জানোয়াররা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাতে এখানে হানা দিতে না পারে, সেই জন্যই এই আগুনের ব্যবস্থা।

ব্যারাকটা এখন একেবারে নিঝুম। খুব সম্ভব সারাদিন জঙ্গল কাটার মতো প্রচণ্ড খাটুনির পর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ধনপত ঘাড় নিচু করে সরীসৃপের মতো প্রায় বুকে হেঁটে আরো এগুতে থাকে।

খানিকটা যাওযার পর সে এবার ভানচাঁদের ঘরটা দেখতে পায়। দু-এক দিনের আলাপে লোকটাকে বেশ ভাল লেগেছিল। ভানচাঁদ বলেছিল দশ বিশ রোজ তালিম দিলে সে তাকে নৌটঙ্কীর আসরে নামিয়ে দেবে। সে নাকি এমন ওস্তাদ যে কৌয়ার গলায় কোয়েলের 'বোল' তুলে দিতে পারে।

ভানচাঁদের ঘর থেকে কথাবার্তার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে। ওরা তা হলে এখনও ঘুমোয় নি। ধনপত একবার ভাবল, ওদের ডাকবে কিনা। পরক্ষণেই তার মনে হয়, এই রাত্তিরে আচমকা তাকে দেখলে ভানচাঁদ হই চই বাধিয়ে দিতে পারে। সেটা তার পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠবে।

সামনের দিকে যাওয়া বিপজ্জনক, তাই ঘরগুলোর পেছন দিয়ে ধনপত এগুতে থাকে। ভানচাঁদের ঘরের পর রামদেওরার ঘর। তারপর একে একে তৌহরলাল জগদেও ঘমণ্ডি ধুন্নিরাম, এমনি অনেকের ঘর পেরিয়ে রামবনবাসের ঘরের পেছনে এসে দাঁড়ায়। পাঁচ ইঞ্চি ইটের পাতলা দেওয়ালে কান রেখে বুঝতে চেষ্টা করে সে ঘরে আছে কিনা। কিন্তু ভেতরে কোনোরকম সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। রামবনবাস কি ঘুমিয়ে পড়েছে? খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর ধনপত খুব আস্তে করে ডাকে, 'ভেইয়া—'

রামবনবাসের সাড়া মেলে না।

ধনপত গলার স্বর আরেকটু উঁচুতে তোলে, 'ভেইয়া, হো ভেইয়া—'

এবারও রামবনবাসের উত্তর নেই।

ধনপত ডান পাশে ঘরের সামনের দিকে তাকায়। তক্ষুনি হৃৎপিণ্ডের ওঠানামা থমকে যায়। পাহারাদার টহলরাম কাঁধে বন্দুক ফেলে ঠিকাদারের অফিসের দিক থেকে এধারে আসছে। তার পেছনে রামধনিয়া এবং আরো ক'টা লোক। যদিও হিংস্র জানোয়ারদের জন্য বন্দুক নিয়ে এই টহলদারির ব্যবস্থা, আসল উদ্দেশ্যটা কিন্তু অন্যরকম। রাতের অন্ধকারে জঙ্গলকাটানিরা যাতে ভাগতে না পারে সেই কারণে তাদের চোখে চোখে রাখার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করেছে মিশিরজি।

দ্রুত মুখটা রামবনবাসের ঘরের পেছন দিকের দেওয়ালের আড়ালে টেনে নেয় ধনপত।

রামবনবাসের ঘরটার পর আরো দশ বারটা ঘর পেরুলে পাশাপাশি চাঁদিয়া এবং তার ঘর। কিন্তু সেদিকে এখন আর যাওয়া যাবে না। টহলরামের দলটা ওধারেই গেছে। তাকে দেখামাত্র নির্ঘাত ওরা গুলি চালিয়ে দেবে।

দম বন্ধ করে ধনপত দাঁড়িয়ে থাকে। টহলরামরা ওধার থেকে ফিরে সাইট অফিসের দিকে গেলে সে একবার চাঁদিয়ার ঘরে যেতে চেষ্টা করবে, কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও ওরা ফেরে না।

এদিকে মশা আর বাড়িয়া পোকার অনবরত কামড়ে চামড়া জ্বলে যাচ্ছে। ধনপত কী করবে যখন ভেবে পাচ্ছে না সেই সময় টহলরামরা ফিরে এসে রামবনবাসের ঘরের সামনাসামনি 'ঘুর'টার চারপাশ ঘিরে গোল হয়ে বসে। ঝাপসা অন্ধকারেও ধনপত দেখতে পায় ওরা পোড়া মাটির কল্কেতে গাঁজা ঠাসছে। পৌষের শীতে গা গরম রাখার জন্য এমন অব্যর্থ দাওয়াই আর নেই।

ধনপতেব প্রাণে যেটুকু আশাও বা ছিল সব মুহূর্তে চুরমার হয়ে যায়। টহলরামদের গাঁজার আসর সহজে ভাঙবে বলে মনে হয় না। তার অর্থ সামনের দিক দিয়ে চাঁদিয়ার ঘরের দিকে যাওয়া একেবারেই

অসম্ভব। যেখানে নিশ্চিত মৃত্যু সেখানে পা বাড়াবার মতো হঠকারিতা সে করতে পারে না।

গভীর নৈরাশ্যে বুক ভরে যায় ধনপতের। অকারণে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? এলোমেলো পা ফেলে আবার সে ফাঁকা ধানখেতের দিকে এগিয়ে যায়। মনে মনে বলে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি হামনি তো কোসিস কিয়া। লেকেন অব কা করেগা?' সে নিজেকেই যেন বোঝাতে চায়, হে রামজি, হে কিষুণজি, চাঁদিয়াকে উদ্ধার করবার জন্য কম চেষ্টা করিনি। আর কী করতে পারি আমি! এখন সবই তোমার মর্জি।

ধানখেতে পা দিতে না দিতেই ধনপতের চোখে পড়ে উলটো দিক থেকে আলের ওপর দিয়ে কে যেন আসছে। একবার ধনপত ভাবে মাঠে নেমে দৌড় লাগায়। কিন্তু তার আগেই লোকটা খুব কাছে এসে পড়েছে। তার সারা শরীর, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধুসো কম্বলে মোড়া। শুধু নাকের ডগা এবং চোখ দুটো বেরিয়ে আছে। দেখামাত্রই চেনা যায়—লোকটা রামবনবাস।

ধনপত বিমূঢ়ের মতো বলে, 'রাম ভেইয়া, তুম!'

রামবনবাস বলে, 'তোমার খোঁজে মাঠে গিয়েছিলাম। বহোত ঢুঁড়া থা, লেকেন কিধরভি তুমনি নেহী। তোমাকে না পেয়ে এখন ফিরে যাচ্ছি। কিধর গিয়া থা তুমনি?'

ধনপত জানায়, বেঁটে বেঁটে সিসম গাছগুলোর তলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও যখন রামবনবাস এল না তখন খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। রামবনবাস ভেইয়া কি.চাঁদিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে কোনোরকম বিপদে পড়ে গেল? সে তাই দু'জনের খোঁজে 'বারিকে' গিয়েছিল। কিন্তু কারুর সঙ্গেই দেখা হয় নি।

রামবনবাস আঁতকে ওঠে। বলে এভাবে, 'বারিকে' তার যাওয়া উচিত হয় নি। এরকম হঠকারিতার ফল ভয়াবহ হতে পারত। রামচন্দ্‌জির কৃপায় যে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে, এই ঢের।

ধনপত কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। রামবনবাস যা বলেছে তার প্রতিটি অক্ষর সত্যি। একসময় বলে, 'চাঁদিয়ার কী হল?'

'কিছুই করা গেল না।' জোরে জোরে, গভীর হতাশায় মাথা নাড়ে রামবনবাস, 'বহোত কোসিস কিয়া। লেকেন—'

'লেকেন কা?' গলার স্বরটা ভাঙা শোনায় ধনপতের।

'বজরঙ্গী ওর ওপর এমন পেহেরাদারি চালাচ্ছে যে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলতে পারি নি। জঙ্গল থেকে ফেরার পর একবার কুয়ার পাড়ে দেখা হয়েছিল। তোমার কথা ওকে বললাম। শুনে কাঁদতে লাগল। বলল, ওকে চলে যেতে বল এখান থেকে। আমার আর বেরুনো হবে না। আর বলল, যদি পার, তুমি যেন দধিপুরায় চাঁদিয়ার মা-বাপের কাছে ওর খবরটা দিও। ওর বাপের নাম দুখনাথ।' রামবনবাস বলতে থাকে, 'আমরা যখন কথা বলছি দশ হাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে গিধের মতো তাকিয়ে ছিল বজরঙ্গী। সে আচানক চিল্লিয়ে উঠল, 'কী গুজুর গুজুর করছিস রে ভূচ্চর? পানিয়া লেকে আভ্‌ভি ভাগ যা।' কী আর করি, চাঁদিয়াকে বললাম, রাত্তিরে ওর ঘরে যাব। যদি সুবিধা হয় তো ওকে নিয়ে খেতিতে তোমার কাছে পৌঁছে দেব। লেকেন—'

রুদ্ধশ্বাসে ধনপত জিজ্ঞেস করে, 'কা?'

'শুনে কী হবে? মনমে বহোত কষ্ট হোগা।'

'হোক, তুমি বল।'

অনেকটা সময় চুপ করে থাকে রামবনবাস। তারপর বলে, 'কিছুক্ষণ আগে বারিকের লোকজন ঘুমিয়ে পড়লে চাঁদিয়ার কাছে গিয়েছিলাম। লেকেন ঘরের দরজা বন্ধ। গলার আওয়াজে মালুম হল ভেতরে বজরঙ্গী রয়েছে। গিধটা বলছিল, রাত্তিরে ওর ঘরেই থাকবে। আমি আব দাঁড়াইনি, সিধা তোমাকে খবর দিতে চলে এসেছি।'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ধনপত। মাত্র কয়েক দিনের চেনা একটি মেয়ের জন্য তার বুকের ভেতরটা ভেঙেচুরে তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে।

রামবনবাস ধনপতের কাঁধে একটা হাত রাখে। বলে, 'তুমি এখান থেকে চলে যাও ধনপত।

চাঁদিয়াকে তুমি পাবে না।' একটু থেমে ফের বলে, 'লেড়কীটার জন্যে বহোত কষ্ট হয়। লেকেন কা করে?' গভীর সহানুভূতি এবং দুঃখে বুড়ো বৃক্ষপ্রেমিক মানুষটির গলা ভারি হয়ে আসে।

'নেহী—' আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে ধনপত।

রামবনবাস অবাক। ধনপতের কাঁধ থেকে দ্রুত হাত নামিয়ে বলে, 'কা হুয়া?'

'নেহী যায়েগা ইধরিসে।' গলার স্বর আরো চড়িয়ে দেয় ধনপত, 'বজরঙ্গীকা শির তোড়েগা পহেলে, তারপর চাঁদিয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব। এখনই যাচ্ছি চাঁদিয়ার ঘরে। শালে ভূচ্চরকা ছৌয়া।'

শেষের গালাগালটা যে বজরঙ্গীর উদ্দেশে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। হঠাৎ শান্ত নিরীহ ভীরু এই যুবকটিকে খেপে উঠতে দেখে ঘাবড়ে যায় রামবনবাস। ছোকরার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি? সে জানে এই মুহূর্তে চাঁদিয়ার ঘরে ধনপত গেলে তার পরিণতি কী হতে পারে? সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'কা, আপনা মৌত ডেকে আনতে চাইছ?'

ধনপত কোনো কথাই যেন শুনতে পাচ্ছে না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো উদ্‌ভ্রান্ত ভঙ্গিতে সে চাঁদিয়ার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। চোখমুখ দেখে মনে হয়, একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

দ্রুত হাত বাড়িয়ে ধনপতের কাঁধ চেপে ধরে রামবনবাস। চাপা ভয়ার্ত গলায় বলে, 'মাত্ যাও, মাত্ যাও।'

রামবনবাসের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে যাতে থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধনপত। বুঝতে পারে নৈরাশ্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সে হঠকারিতা করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে ভাঙা গলায় বলে ওঠে, 'অব্ কা করে হামনি?'

তার কাতর গোঙানির মতো স্বর রামবনবাসের হৃৎপিণ্ড তোলপাড় করে দিতে থাকে। কিছুক্ষণ কী ভাবে সে, তারপর বলে, 'আজ রাতটা কোথাও থাকতে পারবে?'

'কায়?'

'কাল মওকা বুঝে চাঁদিয়ার সঙ্গে আরেক বার কথা বলব। যদি কিছু ব্যওস্থা করতে পারি।'

'এত্তে জাড়! এই ফাঁকা জমিনে রাত কাটাতে হলে বিলকুল মরে ফৌত হয়ে যাব।'

রামবনবাস বলে, 'সেদিন টিসন থেকে গৈয়া গাড়িতে আসার সময় একটা ছোটা দেহাত দেখেছিলাম, মনে আছে?'

ধনপতের আবছাভাবে মনে পড়ে যায়। পিপরিয়া সাইট অফিস এবং রেল স্টেশনের মাঝামাঝি একটা ছোট হতচ্ছাড়া চেহারার গাঁ চোখে পড়েছিল ঠিকই। সে আস্তে ঘাড় হেলায়।

রামবনবাস বলে, 'আজ রাতটা ওহী গাঁওমে থাক গিয়ে। কাল সন্ধের সময় আবার ওখানে পেঁড়গুলোর তলায় এসে দাঁড়িও। আমি খবর নিয়ে আসব।'

এ ছাড়া আর কী-ই বা করা যায়! ধনপত বিমর্ষ মুখে দূরে অচেনা গ্রামের দিকে পা বাড়ায়, আর রামবনবাস চলে যায় মজুর ব্যারাকে।

মাঝরাতে অজানা ঘুমন্ত গাঁয়ে পৌছে সামনে যে কোমর-বাঁকা টিনের চালের বাড়িটা দেখতে পায়, তার দরজায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে লোকজনদের ঘুম ভাঙায় ধনপত। অফুরন্ত জীবনীশক্তির জোরেই হয়ত পৌষের প্রচণ্ড হিমে এতটা রাস্তা এসেও সে একেবারে মরে যায়নি। কোনোরকমে বলতে পারে, আজকের রাতটা সে আশ্রয় চায়। এ সব বলতে বলতেই ঘাড়মুখ গুঁজে পড়ে যায়।

বাড়ির লোকজনেরা গরিব হলেও অমানুষ নয়। তাড়াতাড়ি তাকে তুলে একটা দড়ির চৌপায়ায় শুইয়ে দেয়। মেয়েরা তক্ষুনি আগুন জ্বেলে সেঁক দিয়ে দিয়ে তার জমে-যাওয়া শীতল শরীরে উত্তাপ ফিরিয়ে আনে। রাতে খাওয়ার পর যে বাড়তি চাপাটি বেঁচে ছিল. যত্ন করে ধনপতকে খাওয়ায়। এমন কি ঘুমোবার জন্য একটা ভারি কম্বল পর্যন্ত দেয়।

ধনপত ভেবেছিল, সকালে উঠেই চলে যাবে কিন্তু লোকগুলো এত ভাল এবং হৃদয়বান যে যেতে দেয় না। দুপুরে খাইয়ে দাইয়ে তবে ছাড়ে। দুনিয়ায় এখনও ভাল মানুষ কিছু আছে। কৃতজ্ঞ ধনপতের চোখে গাঢ় আবেগে জল এসে যায়।

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে গেলে ধনপত বিদায় নিয়ে আবার পিপরিয়া সিমেন্ট কোম্পানির সাইট অফিসের দিকে হাঁটতে থাকে। যতই এগোয় উদ্বেগে বুক কাঁপতে থাকে। রামবনবাস আজ কী খবর নিয়ে আসবে কে জানে।

এক সময় সন্ধে নামার মুখে মুখে ফাঁকা মাঠে সেই সিসম গাছগুলোর নিচে পৌঁছে যায় ধনপত। বেশিক্ষণ অবশ্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। কিছুক্ষণ পরেই আজকের মতো জঙ্গল কাটা শেষ করে রামবনবাস এসে পড়ে। রুদ্ধশ্বাসে ধনপত শুধোয়, 'কী হল ভেইয়া?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে রামবনবাস, 'কিছুই করতে পারলাম না। বজরঙ্গী আর তার আদমীরা চাঁদিয়াকে দিনরাত নজরে নজরে রাখছে। কেউ ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটার বেশি দুটো কথা বললে ভাগিয়ে দিচ্ছে।'

অস্পষ্ট গলায় কিছু বলে ধনপত কিন্তু তার একটা কথাও বোঝা যায় না।

রামবনবাস বলে, 'তবু জঙ্গলে চুপকে চুপকে চাঁদিয়ার সঙ্গে কথা বলেছি। ও বলল—'

'কা?'

'কাল যা বলেছিল তা-ই।' বলে, একটু থামে রামবনবাস। তারপর বিষণ্ণ গলায় শুরু করে, 'তুমি চলে যাও। চাঁদিয়াকে ভূচ্চরের ছৌয়াদের হাত থেকে বার করে আনা যাবে না।'

এবার বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে ধনপত। ঝাপসা অন্ধকারে তার মুখচোখ দেখে মনে হয়, তার বুকের ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

রামবনবাস থামে নি, সে বলতে থাকে, 'একগো বাত ধনপত—'

'কা?'

'চাঁদিয়া আজও বলছিল তুমি যদি থোড়েসে কষ্ট করে একবার ওদের গাঁও দধিপুরায় যাও—'

'যাব।'

'চাঁদিয়া যে পিপরিয়ায় জঙ্গল কাটাই করছে সে খবরটা ওর বাপ মাকে দিলে বহোত উপকার হয়। ওর মা-বাপ জানুক, তাদের লেড়কী এখনও জিন্দা আছে।' রামবনবাস বলতে থাকে, 'দধিপুরা গাঁওয়ের অচ্ছুৎটুলিতে ওদের ঘর।'

আবছা কাঁপা গলায় ধনপত বলে, 'ঠিক হ্যায়।' তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আলের ওপর দিয়ে এলোমেলো পায়ে দিগন্তের দিকে এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে বিশাল প্রান্তরের গাঢ় হিম এবং অন্ধকার তার শরীরটাকে দ্রুত গ্রাস করে ফেলে।

রামবনবাস তার পরও বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ফিসফিসিয়ে কাঁপা গলায় বলতে থাকে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি, তেরে কিরপা।'

পনের

চাঁদিয়া যখন বলেছে তখন ধনপতকে দধিপুরায় যেতেই হবে। তার মা-বাপ অন্তত এটুকু জেনে সান্ত্বনা পাক, তাদের মেয়ে এখনও পৃথিবীর এক কোণে বেঁচে আছে। দুধনাথ হয়ত পিপরিয়ার ঠিকাদারদের ফাঁদ থেকে কোনোদিনই চাঁদিয়াকে উদ্ধার করে আনতে পারবে না তবু সে যে মরে যায় নি, মা-বাপের কাছে এটা খুবই বড় ব্যাপার। একটু ভীরু আশা তাদের বুকে ধুকপুক করতে থাকবে, হয়ত কোনো একদিন—দো সাল, পাঁচ সাল কিংবা দশ সাল পরে নিজেদের খোয়ানো সন্তানকে ফিরে পাবে।

পুরো একটা দিন খানিকটা ট্রেনে এবং বাকিটা পায়ে হেঁটে শেষ পর্যন্ত ধনপত দধিপুরায় পৌঁছে যায়। একে ওকে জিজ্ঞেস করে যখন সে অচ্ছুৎটুলিতে দুধনাথ দোসাদের ভাঙাচোরা টালির ঘরে গিয়ে হাজির হয়, সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকটা নেমে গেছে। পৌষের শেষ বেলায় রোদেব তাপ দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে।

আধবুড়ো কোলকুঁজো দুধনাথ এবং তার ঘরবালী কবুতরী সবে নিজেদের জমি থেকে ফিরে

এসেছে। মাঠ থেকে সবে ধান উঠেছে কিন্তু রবিফসলের জন্য এর মধ্যেই ধানের গোড়া তুলে, শুকনো মরকুটে ঘাস এবং আগাছা উপড়ে জমি তৈরি করতে শুরু করেছে দুধনাথরা। আসলে চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে ওরা বসে থাকতে পারে না। সারা বছরই নিজেদের খেতিতে এবং অধিকলাল চৌবের জমিতে হয় ফসল রুইছে, নয় ধান কাটছে, কিংবা আগাছা বাছছে।

ধনপত যখন বলে সে বিশেষ একটা জরুরি কাজে তাদের কাছে এসেছে তখন দুধনাথ এবং কবুতরী খুবই অবাক হয়ে যায়। কেননা এই সম্পূর্ণ অচেনা যুবকটির তাদের কাছে আসার উদ্দেশ্য কী হতে পারে, কেউ ভেবে পায় না।

ঝুঁকে-পড়া ঘরের বারান্দায় মুখোমুখি বসে দুধনাথ শুধোয়, 'তুম কিধরসে আয়া?'

একটু দূরে টিনের নানারকম তাপ্পি-মারা দরজার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে, কিছুটা বা উদ্বিগ্ন চোখেই ধনপতকে লক্ষ করছে কবুতরী। ওদের তিন ছেলেমেয়ে বারান্দার আরেক ধারে বসে আছে, তাদের চোখও অজানা আগন্তুক অর্থাৎ ধনপতের দিকে।

সবাইকে দ্রুত একবার দেখে নেয় ধনপত। তারপর বলে, 'পিপরিয়া।'

মুখচোখের প্রতিক্রিয়া দেখে মনেই হয় না, এই নামটা আগে আর কখনও দুধনাথরা শুনেছে। পৃথিবীর কোন প্রান্তে পিপরিয়া সেটা দেহাত না ভারি টৌন বা হাটিয়া কিংবা বাজার কি গঞ্জ—এ সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আসলে দধিপুরাকে ঘিরে দশ বিশ মাইলের ওধারে যে বিপুল বিস্তীর্ণ জগৎ পড়ে আছে তার আদৌ কোনো খবর ওরা রাখে না।

বিমূঢ়ের মতো দুধনাথ শুধোয়, 'পিপরিয়া কঁহা?'

ধনপত দক্ষিণে সুদূর দিগন্তের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়, 'উধরি—'

'কেত্তে দূর?'

'হোগা ষাট পঁয়ষট 'মিল'।'

একটু চুপ করে থেকে দুধনাথ এবার শুধোয়, 'হামনিকো পাস তুমহারা কা জরুরত?'

ধনপত সামনের দিকে ঝুঁকে, গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে বলে, 'আমাকে চাঁদিয়া পাঠিয়েছে।'

মুহূর্তে বিজরি চমকের মতো কিছু ঘটে যায়। দুধনাথ কবুতরী এবং সেই ছোট ছেলেমেয়ে তিনটের চোখেমুখে উৎকণ্ঠা আশা উত্তেজনা—এমনি অনেক কিছু এক সঙ্গে ফুটে উঠতে থাকে।

দুধনাথ ধনপতের একটা হাত ধরে তীক্ষ্ণ গলায় প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কা, কা বোলা?'

চাঁদিয়ার কথাটা আবার বলে ধনপত।

'বেঁচে আছে চাঁদিয়া?'

'হাঁ।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দু হাতে মুখ ঢেকে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে কবুতরী। পরক্ষণে তার শীর্ণ বুকের হাড় চিরে একটা চিৎকার বেরিয়ে আসে, 'মেরে চান্দি, মেরে চান্দি—মেরে বচ্চী—' কান্নার উচ্ছ্বাসে তার শরীর উথলপাথল হয়ে যেতে থাকে।

অন্য সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। কবুতরীর বুকের ভেতর অনেক দিনের কান্না জমাট হয়ে আটকে ছিল। এখন সেটা প্রবল স্রোতে বেরিয়ে এসেছে।

একসময় কবুতরীর দেখাদেখি বারান্দার ওধারে সেই ছেলেমেয়ে তিনটেও কাঁদতে শুরু করেছে। দুধনাথও অনবরত ঢোক গিলে কান্নার তোড় ঠেকিয়ে যাচ্ছিল। জোরে জোরে বুক ফাটিয়ে সে কাঁদছে না! তবে তার চোখও জল ভরে উঠেছে, পুরু কালচে ঠোঁট দুটো থরথর কাঁপছে। অনেকক্ষণ পর কবুতরীর উদ্দেশে সে বলে, 'রো মাত্, রো মাত্—'

কবুতরীর কান্না তাতে থামে না, আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তার একটানা বিলাপ পৌষের বাতাসে ছড়িয়ে গিয়ে চারদিক বিষাদে ভরে দিতে থাকে।

একটানা কাঁদার পর কবুতরী একটু শান্ত হলে দুধনাথ ধরা গলায় ধনপতকে শুধোয়, 'চৌবেজির পহেলবানরা চান্দিকে বরখা নদীতে ফেলে দিয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম, মরেই গেছে। লেকেন ও পিপরিয়া গেল কী করে? তোমার সঙ্গে দেখাই বা হল কিভাবে?'

বরখা নদীর পাড়ে বেহুঁশ রক্তাক্ত অবস্থায় চাঁদিয়াকে পড়ে থাকতে দেখা, তারপর সেখান থেকে দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় যাওয়া, দুধলিগঞ্জ থেকে আড়কাঠিদের পাল্লায় পড়ে পিপরিয়ায় পৌঁছুনো, সেখানে টিপছাপ দিয়ে নিকৃষ্ট ভূমিদাসের মতো জীবন, তারপর পিপরিয়া থেকে দু'জনে পালাতে গিয়ে চাঁদিয়ার খেতিতে পড়ে যাওয়া, এমনি যাবতীয় খবরই দিয়ে যায় ধনপত। সব বলা হয়ে গেলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বিষণ্ণ গলায় আবার শুরু করে, 'পিপরিয়া থেকে তোমাদের লেড়কীকে বার করে আনার জন্যে বহুত কোসিস কিয়া, লেকেন কুছ নেহী হুয়া।'

দুধনাথ উত্তর দেয় না।

ধনপত ফের বলে, 'লেড়কীর খবর দিয়ে গেলাম। যদি পার ওকে ঘরে ফিরিয়ে এনো।'

দুধনাথের বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। করুণ হতাশ মুখে সে বলে, 'তোমার মতো হট্টাকট্টা জোয়ান আদমীই তাকে আনতে পারল না। আমি কী করে পারব?'

ধনপত কী বলবে ভেবে পায় না।

দুধনাথ তীব্র হতাশায় এবং কষ্টে জোরে জোরে মাথা নাড়ে, 'লেড়কীটার সঙ্গে এ জীওনে আর দেখা হবে না।'

'দেখা হবে না কেন? থোড়সে কোসিস কর?'

কথাটা আর শেষ করতে পারে না ধনপত। তার আগেই কবুতরী এবং তার সঙ্গে সেই ছেলেমেয়ে তিনটে কেঁদে ওঠে।

তাদের কান্নার মধ্যেই দুধনাথ বলে ওঠে, 'চান্দি যে গাঁওয়ে ফিরে আসবে তারও উপায় নেই। চৌবেজি ওকে—' এই পর্যন্ত বলেই থেমে যায়।

দুধনাথ চুপ করে গেলেও সে যা বলতে চায়, বুঝতে অসুবিধা হয় না ধনপতের। সে কোনো উত্তর দেয় না। অধিকলাল চৌবের মতোই হুকুমদার বজরঙ্গী নামে একটা ভূচ্চরের ছোঁয়া পিপরিয়াতে আছে এবং সে-ই যে খতরনাক জানোয়ারের মতো চাঁদিয়ার শরীরটা চিবিয়ে খাচ্ছে, সে কথা আর বলতে পারে না। একটা দুঃখী দুর্বল কাতর বাপকে বাড়তি কষ্ট দিতে ইচ্ছা হয় না ধনপতের।

কিছুক্ষণ আগেও বাসি হলুদের রঙের মতো ম্যাড়মেড়ে একটু রোদ আকাশের গায়ে আটকে ছিল। হঠাৎ ঝপ করে শীতের সন্ধে নেমে এল। এই সময়টার জন্য উত্তুরে বাতাস যেন ওৎ পেতে ছিল। অদৃশ্য খাপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সেটা সাঁই সাঁই চাবুক হাঁকিয়ে দিগন্তের ওপর দাপিয়ে বেড়াতে লাগল।

দুধনাথ এবার উদাস হতাশ মুখে বলে, 'দেখতে না পাই, তবু তোমার জন্যে জানতে পারলাম, লেড়কীটা আমার মরে যায় নি। ভগোয়ান রামজি তোমার ভালাই করবে।'

ধনপত বলে, 'অন্ধেরা হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি যাই।'

'নেহী, নেহী—' দুধনাথ বলতে থাকে, 'ষাট পঁয়ষট 'মিল' দূর থেকে এত্তে তখলিফ করে চান্দির খবর নিয়ে এলে। এখন তোমাকে ছাড়া হবে না। আজ রাতটা আমাদের এখানে থেকে কাল যেও।'

ধনপতেরও সেই রকমই ইচ্ছা। তিনটে রাত মারাত্মক হিমে সে খুবই কষ্ট পেয়েছে। অবশ্য কাল কিছুক্ষণের জন্য পিপরিয়ার কাছে সেই গাঁওটায় যে আশ্রয় পেয়েছিল। হিমের বিরুদ্ধে যুঝবার মতো তার শারীরিক শক্তি আর বেশি অবশিষ্ট নেই। একটা রাতও যদি আর তাকে খোলা আকাশের তলায় পড়ে থাকতে হয়, নির্ঘাত মরে যাবে।

দুধনাথ বলে, 'তুমি আমাদের এত উপকার করলে, লেকেন তোমার খবরটাই ভাল করে নেওয়া হল না। তখন বলছিলে না, বরখা নদীর পারে বেহোঁশ চান্দিকে দেখেছিলে?'

বরখা নদীর আরেক ধারে ধুরুয়া গাঁ থেকে কিভাবে এবং কোন ভয়াবহ কারণে বেরিয়ে পড়েছিল আর জমি মালিক চন্দ্রিকা সিংয়ের পহেলবানদের তাড়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল—সব বলে যায় ধনপত। নদীর ধারে বেহুঁশ চাঁদিয়াকে দেখার পর থেকে যা যা ঘটেছিল সে সব আগেই বলেছে।

সমস্ত শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে দুধনাথ। যে কবুতরী এতক্ষণ একনাগাড়ে কাঁদছিল সে-ও থেমে গেছে; একদৃষ্টে সজল চোখে সে ধনপতের দিকে তাকিয়ে থাকে। অচ্ছুৎটুলির শেষ মাথায়

এই ভাঙাচোরা ঘরটাকে ঘিরে অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এসেছে।

এক সময় দুধনাথ বিমর্ষ মুখে বলে, 'তোমরা বান্ধুয়া কিষান?'

'হাঁ।' আস্তে ঘাড় হেলিয়ে দেয় ধনপত।

'কেত্তে রোজ বেগার খাটছ?'

ধনপত জানায় সেই ঠাকুরদার আমল থেকে তিন পুরুষ ধরে তারা চন্দ্রিকা সিংয়ের জমিতে পেট-ভাতায় খেটে আসছে। আরো কত দিন, কত পুরষ খাটতে হবে, কে জানে।

দুধনাথ বলে, 'বহোত দুখকা বাত।'

ধনপত উত্তর দেয় না।

দুধনাথ কী ভেবে এবার বলে, 'তোমাদের গাঁওয়ের কথা যা বললে তাতে সেখানে তো আর ফিরতে পারবে না?'

'নেহী। ওখানে গেলে চন্দ্রিকা সিংয়ের পহেলবানেরা আমাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।'

'তা হলে কী করবে? কোথায় যাবে ঠিক করেছ?'

'নেহী।'

রাত্তিরটা দধিপুরা গাঁয়ে চাঁদিয়াদের ঘরে কাটিয়ে পর দিন সকালে বেরিয়ে পড়ে ধনপত।

ষোল

দুধনাথের কাছ থেকে চলে আসার পর কয়েকটা দিন কেটে যায়। এর মধ্যে যে ক'টা টাকা সঙ্গে ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। তারপর ভিখমাঙোয়াদের মতো লোকের কাছে হাত পেতে আরো তিন চার দিন কাটে। কিন্তু যে মানুষ স্বাধীনতার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে তার পক্ষে এ ভাবে পরের করুণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা খুবই অসম্মানজনক।

কয়েকটা দিন সে হাটে গঞ্জে মাল বয়ে কাটিয়ে দেয় কিন্তু তাতে পেটটা ঠিকমতো চলে না। পরনে যে 'ফুর' প্যান্ট আর জামা টামা ছিল তা ছাড়া আর কিছুই সে পিপরিয়া থেকে আনতে পারে নি। না বাড়তি জামাকাপড়, না বাসনকোসন, না একটা কম্বল। সারাদিন তবু একরকম কেটে যায় কিন্তু রাতগুলো আর পার হতে চায় না। পিপরিয়ার কাছের সেই গাঁয়ের লোকজন বা দুধনাথের মতো মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। কেউ রাত্তিরে তাকে ঘরের ভেতর আশ্রয় দিতে চায় না। তাকে পড়ে থাকতে হয় হাটের শূন্য চালায় বা কারুর বাড়ির উদোম বারান্দায়। শীতের দুঃসহ হিম আর উত্তুরে হাওয়া তার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ক্রমশ তার শরীর ভেঙেচুরে কমজোর হয়ে যেতে থাকে। স্বাধীনতার দাম যোগাড় করতে একদিন বেরিয়েছিল সে। শরীরই যদি শেষ হয়ে যায় মুক্তির মূল্য জোটাবে কোত্থেকে?

একদিন মাল বওয়ার কাজকর্ম না পেয়ে লক্ষ্যহীনের মতো এক গাঁয়ের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল ধনপত। হঠাৎ একটা বড় কড়াইয়া গাছের তলায় ভিড় চোখে পড়ে। একটা হট্টাকট্টা চেহারার লোক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে আর গাঁয়ের মানুষেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে সব শুনছে। পায়ে পায়ে ধনপত সেদিকে এগিয়ে যায়।

লোকটা তখন বলছে, 'আমার সঙ্গে তোমরা আসাম চল। বেত কাটাইয়ের কাম পাবে। রোজ মজুরি পন্দ্র রুপাইয়া—'

ধনপতের একটা কাজ দরকার। নিয়মিত রোজগার করতে না পারলে তাকে 'ভুখা' মরতে হবে। রোজ পনের টাকা মজুরির কথায় সে অবাক হয়ে যায়। তার কাছে এত টাকা স্বপ্নের মতোই অবিশ্বাস্য।

ধনপত নিজের অজান্তে শুধোয়, 'পন্দ্র রুপাইয়া মজুরি মিলবে! সচ?'

লোকটা বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ, সচ।' তারপর নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে গলার স্বর কয়েক পর্দা

উঁচুতে চড়ায়, 'এই নৌটেয়ারলালের গলা দিয়ে কখনও ঝুট বেরোয় না। কভী নেহী।'

আসাম জায়গাটা কোথায়, ধনপতের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সে শুধোয়, 'আসাম ইঁহাসে কেত্তে দূর?'

'নজদিগ। কাটিহারের নাম জানো?'

'শুনা হ্যায়।'

'তার কাছে। এখান থেকে টিরেনে কাটিহার। কাটিহারসে টিরেনমে লগভগ দশ বিশ 'মিল' হোগা।'

'আমি যাব বেত কাটাইয়ের কাজে।'

'বহোত খুশকা বাত।'

শুধু ধনপতই না, এই অচেনা গাঁয়ের আরো পঁচিশ তিরিশ জনও আসাম যেতে রাজি হয় এবং পরদিন নৌটেয়ারলাল এদের সঙ্গে করে কাটিহার চলে যায়।

সন্ধেবেলা কাটিহার পৌঁছে দেখা যায়, আরো শ পাঁচেক লোক নৌটেয়ারের জন্য স্টেশনের বিশাল প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে জানা গেল, এরাও বেত কাটাইয়ের কাজে আসাম চলেছে।

মাঝরাতে ধনপতদের ট্রেনে তোলা হল। গাড়ি ছাড়ার পর নৌটেয়ারলাল এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা ছাপানো কাগজ বার করে সবার অঙ্গুঠার ছাপ নিতে থাকে।

দেখতে দেখতে চমকে ওঠে ধনপত। ঠিক এইভাবে মিশিরজিও ছাপ নিয়েছিল। তার আগে চন্দ্রিকা সিংয়ের বাপ তার ঠাকুরদার টিপছাপ নিয়েছে।

ব্যাপারটা তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। যেখানে যাচ্ছে সেখান থেকে পালাবার উপায় নেই। আঙুলের একটি ছাপে সে আবার দায়বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে একবারে ভেঙে পড়ে ধনপত। চোখেমুখে গাঢ় বিষাদ ফুটে ওঠে।

কোথায় কতদূরে তাদের ধুরুয়া গাঁয়ে পড়ে রইল মা বাবা ভাই বোনেরা। চাঁদিয়া নামের কাম্য নারীটি পিপরিয়ার জঙ্গলে আটকে রইল, বজরঙ্গী গিধের মতো তাকে আগলে আছে। সব প্রিয়জনকে পেছন ফেলে সে কোথায় ক্রমশ দূরে, আরো দূরে, বহুদূরে চলে যাচ্ছে।

একদিন স্বাধীনতার দাম যোগাড় করতে ধুরুয়া গাঁ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল ধনপত। তখন কি জানতো গোটা পৃথিবী জুড়ে ফাঁদ পাতা আছে?

তার মতো জনমদাসদের জন্য কোথাও মুক্তি নেই।

প্রস্তুতিপর্ব

নমকপুরা টৌন বা টাউনে আজ তুমুল উত্তেজনা। শুধু আজই নয়, সপ্তাহখানেক আগে যেদিন প্রথম রটে গেল পবিত্র চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ রামঅবতার চৌবের ছেলে অর্জুন অচ্ছুৎ দোসাদদের মেয়ে কমলাকে বিয়ে করবে সেদিন থেকেই উত্তেজনার শুরু। সেটা চড়তে চড়তে আজ একটা বিস্ফোরণের পর্যায়ে চলে এসেছে। যে কোনো মুহূর্তে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে।

পুরো সাত দিন এই শহরটা ঘুমোয়নি, বিপজ্জনক এক ঘোরের মধ্যে তার স্নায়ু টান টান হয়ে আছে।

অসবর্ণ, এমন কি নানা ধর্মের এবং নানা প্রভিন্সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আকছার বিয়ে হচ্ছে। তা হলে অর্জুন আর কমলার বিয়ে নিয়ে এত হই চই কেন? তার সঠিক জবাব পেতে হলে নমকপুরা সম্পর্কে দু-চারটে খবর জানা একান্তই জরুরি।

নমকপুরা উত্তর বিহারের অতি তুচ্ছ এক শহর। স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারতের মানচিত্রে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব মিলিয়ে এখানে হাজার চল্লিশ মানুষ। উচ্চবর্ণের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং লালদাসিয়া কায়াথ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, বাকি পঞ্চাশ ভাগ অচ্ছুৎ—গঞ্জু, ধাঙড়, দোসাদ, তাতমা, গাঙ্গোতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। অচ্ছুৎদের বেশির ভাগই হিন্দু, তবে কিছু কিছু খ্রিস্টানও রয়েছে। দু-তিন জেনারেশন আগে এরা 'ধরম বদল' করেছে। তবে দশ বার বছরের ভেতর কনভার্সন বা ধর্মান্তরের কোনো ঘটনা এই শহরে ঘটেনি।

নমকপুরার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় এক পাক ঘুরে এলে মনে হবে, সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো সত্য যুগ এখানে অনড় হয়ে আছে। এমন কোনো রাস্তা বা গলিঘুঁজি নেই যেখানে অন্তত দুটো করে রামসীতা, বিষুণজি, কিষুণজি বা বজরঙ্গবলীর মন্দির পাওয়া যাবে না। তবে শহরের শেষ মাথায় অচ্ছুৎটুলির গা ঘেঁষে ছোটখাট পুরনো একটা গীর্জা দাঁড়িয়ে আছে, সেটার মাথায় সিমেন্টের ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তি, ভেতরে থাকেন একজন দিশি পাদ্রী।

নমকপুরার উত্তর দিক দিয়ে বয়ে গেছে রুগ্‌ণ চেহারার একটা নদী—বরখা। বরখা আসলে গঙ্গার ফ্যাকড়া, গঙ্গার গা থেকে বেরিয়ে কয়েক মাইল ঘুরে নমকপুরার পাশ দিয়ে অনেক দূরে পূর্ণিয়ার দিকে চলে গেছে। সারা বছর নদীটায় জল প্রায় থাকেই না। শীত এবং শুখা মরশুমে এধারে ওধারে বালির ডাঙা জেগে ওঠে, ফাঁকে ফাঁকে আটকে থাকে হাঁটুভর চিকচিকে জল, কোথাও আবার তা-ও থাকে না। শীত-গ্রীষ্ম পেরিয়ে বর্ষা নামলে সামান্য একটু স্রোত নামে বরখায়। কিন্তু তা আর ক'দিন? বড়জোর মাস দেড়-দুই, তারপর জল শুকিয়ে ফের নদীর হাড় পাঁজরা বেরিয়ে পড়ে।

নমকপুরার জীবন শুখা মরশুমের বরখার মতোই। সেখানে না আছে ঢেউ, না কোনোরকম চাঞ্চল্য।

এই সেঞ্চুরিতে গোটা পৃথিবী জুড়ে, এমন কি এই ভারতবর্ষেও বিরাট বিরাট সব ঘটনা ঘটে গেছে। দুটো দুনিয়াজোড়া গ্রেট ওয়ার, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, পার্টিশন, স্বাধীনতা—এমনি কত কী। স্বাধীনতার পর আরো কত কিছুই তো হয়েছে—লোকসভা, বিধানসভা, প্রজাতন্ত্র, সংবিধান, পাকিস্তানের সঙ্গে দু দুটো যুদ্ধ, চীনের সঙ্গে একটা লড়াই, স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি—এমনি হাজার রকমের ব্যাপার। এখানকার বাসিন্দারা সে সব আবছাভাবে টের পেয়েছে। তাদের মনে হয়, এগুলি দূরবর্তী কোনো অলীক জগতের দুর্বোধ্য কিছু শব্দ। তবে পাঁচ বছর পর পর বিধানমণ্ডলের আর দু'বছর পর পর নমকপুরা মিউনিসিপ্যালিটির চুনাও আসে। সেই সময় কয়েকটা দিনের জন্য এখানকার আবহাওয়ায় কিঞ্চিৎ উত্তেজনা ছড়িয়ে যায়। আসলে মান্ধাতার বাপের আমলের সংস্কার, ছুঁয়াছুতের বিচার, গোঁড়ামি নিয়ে ইন্ডিয়ান রিপাবলিকের এক কোণে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে নমকপুরা।

মোটামুটি এইভাবেই এই সেঞ্চুরি এবং তারপরেও আরো বহু বহু বছর এখানে কেটে যেত কিন্তু আচমকা পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশের ছেলের সঙ্গে নরকের পোকা দোসাদদের মেয়ের বিয়ের ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই নমকপুরার মাথায় আগুন ধরে গেছে। উচ্চবর্ণের, বিশেষ করে

বামহনদের রক্তে অসহ্য রাগ রি রি করে চলেছে। আর অচ্ছুৎটুলি ভয়ে আতঙ্কে একেবারে কুঁকড়ে রয়েছে।

এতদিনে দোসাদ গঞ্জু ধাঙড়দের পাড়াগুলো পুড়ে সাফ হয়ে যাওয়ার কথা। বামহনটুলির লোকেরা পোষা পহেলবান পাঠিয়ে জীবন্ত অচ্ছুৎদের লাশ বানিয়ে বরখা নদীর বালির তলায় পুঁতে ফেলত। তাদের একটা হাড়ের খোঁজও কেউ কোনোদিন পেত না। এমন কি হাওয়ায় হাওয়ায় এমন খবরও রটে গিয়েছিল, অর্জুন এবং কমলাকেও পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো উধাও করে দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা যে হতে পারেনি, তার কারণ ওরা দু'জন সাতদিন ধরে পুলিশ পাহারায় এস. ডি. ও'র বাংলোতে রয়েছে এবং তাদের বিয়েও হবে ওখানেই, বিরাট শামিয়ানা খাটিয়ে।

এ বিয়েতে স্বয়ং এস. ডি. ও তো থাকবেনই, তা ছাড়া ডিস্ট্রিক্ট টাউন থেকে আসছেন ডি. এম, এ.ডি.এম, এস.পি, ডি.এস.পি, কালেক্টর, সার্কেল অফিসার থেকে শুরু করে তাবত সরগনা আদমী অর্থাৎ গণ্যমান্য ব্যক্তি বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা সবাই। আর যিনি আসছেন তিনি একজন বড় মাপের মন্ত্রী। মন্ত্রী প্রায় একটি বাহিনী নিয়ে পাটনা থেকে আসবেন। স্থানীয় এম.এল.এ তাঁকে আনতে চলে গেছেন।

এ তো গেল মন্ত্রী-টন্ত্রী এবং বড় বড় সরকারি অফিসারদের ব্যাপার। এঁরা ছাড়াও থাকবেন 'জাতিভেদ দূরীকরণ সংস্থান'-এর কয়েক জন নেতা। এঁরা সবাই আসছেন এই বিয়েকে বিশেষ একটি মর্যাদা দিতে এবং কমলা ও অর্জুনকে আশীর্বাদ জানাতে।

মন্ত্রী, সরকারি অফিসার, পুলিশ যেখানে জড়িয়ে গেছে সেখানে হঠকারী কিছু ঘটিয়ে ফেলতে সাহস হয়নি বামহনদের। অচ্ছুৎরা তাই এখন পর্যন্ত কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে আছে এবং তাদের টোলাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়নি। আর অর্জুন এবং কমলার গায়ে হাত ওঠাতে হলে স্বয়ং এস.ডি.ও'র বাংলোয় হানা দিতে হয়। অতটা ঝুঁকি নেওয়ার মতো দুঃসাহস আপাতত বামহনদের নেই। তবে ভেতরে ভেতরে তারা টগবগ করে ফুটছে। শেষ পর্যন্ত কী ঘটে যাবে, নিশ্চিতভাবে তা বলা যাচ্ছে না।

অর্জুন এবং কমলার বিয়ের ব্যাপারটা নমকপুরায় এই সেঞ্চুরির সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর এবং উত্তেজক ঘটনা। এর একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে। কিন্তু সে কথা পরে।

এই মুহূর্তে এস.ডি.ও'র বাংলোয় অর্জুনকে লক্ষ করা যেতে পারে। কেননা, কয়েক সেঞ্চুরির স্থিতাবস্থা ভেঙেচুরে নমকপুরায় সে-ই প্রথম রেভোলিউশন ঘটাতে চলেছে।

বরখা নদীর ধার ঘেঁষে উঁচু টিলার মাথায় এস.ডি.ও'র বিশাল বাংলো। প্রায় একরখানেক জায়গা জুড়ে এর কম্পাউন্ড। মাঝখানে টালির ছাদ-দেওয়া ইট-রঙের দোতলা বাড়ি। সামনে এবং পেছনে ফুল ফল এবং সবজির বাগান। বাগানের মাঝখান দিয়ে সুরকির পথ চলে গেছে। পেছনে একতলা সারভেন্টস কোয়ার্টার্স। সেখানে বাগানের মালী এবং ড্রাইভারও থাকে।

বিরাট কমপাউন্ডটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সামনের দিকে প্রকাণ্ড এবং মজবুত লোহার গেট। সেখানে অন্য সময় দু'জন জবরদস্ত সেন্ট্রি কাঁধে রাইফেল নিয়ে পাহারা দেয়। কিন্তু এখন অর্জুন আর কমলার নিরাপত্তার কারণে একটা কালো পুলিশ ভ্যানও দেখা যাচ্ছে। সেটা সাতদিন ধরে ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আর গেটের গা ঘেঁষে যে ছোট গোল ঘরটা দেখা যায় তার ভেতর বেঞ্চ পেতে বসে আছে জন ছয়েক বাড়তি আর্মড গার্ড।

এই বাংলোটা তৈরি হয়েছিল ষাট সত্তর বছর আগে, সেই ব্রিটিশ আমলে। কলোনিয়াল মাস্টারদের আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারটা মাথায় রেখে ইংলন্ডের কান্ট্রি-হাউসের ধাঁচে এটা বানানো হয়।

একতলা দোতলা মিলিয়ে মোট বারখানা বিশাল বিশাল ঘর। পাঁচ ছ'টা বাথরুম, একশ-দেড়শ জন খেতে পারে এমন বিরাট ডাইনিং হল। যখন ইলেকট্রিসিটি আসেনি তখন ঘরে ঘরে টানা পাখা চলত, সিলিং থেকে ঝুলত ঝাড়বাতি। প্রতিটি কামরার দেওয়ালে মহারানী ভিক্টোরিয়া, পঞ্চম ও ষষ্ঠ জর্জের পাঁচ ফুট লম্বা অয়েল পেইন্টিং আটকানো থাকত। মাঝে মাঝে কোনো পার্টি টার্টি হলে কোবাসে শোনা যেত 'গড সেভ দ্য কিং'। তার সুর বাতাসে রাজভক্তি ছড়াতে ছড়াতে নমকপুরা টাউনের ওপর দিয়ে দূর দিগন্তে ছড়িয়ে যেত।

স্বাধীনতার পর অবশ্য দিনকাল বদলে গেছে। ঝাড়বাতির জায়গায় এসেছে ফ্যাশনেবল ল্যাম্পশেড, টানা পাখার বদলে ঝকঝকে নতুন মডেলের ফ্যান, দেওয়াল ডিসটেম্পার করা। কামরাগুলো থেকে ভিক্টোরিয়া বা পঞ্চম ষষ্ঠ জর্জকে বিদায় দিয়ে সেখানে বসানো হয়েছে গান্ধীজি, জওহরলাল এবং ইন্দিরার ছবি। ব্রিটিশ আলের পুরনো বাংলোটা হুবহু একই রকম রেখে রাজভক্তির জায়গায় দেশভক্তির একটা আবহাওয়া জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

এই বাংলোতেই দোতলার একটি ঘরে ডাবল-বেড খাটের বিছানায় বসে আছে অর্জুন। তার চোখ সামনের জানালার দিকে ফেরানো।

ঘরটা চমৎকার সাজানো। অ্যাটাচড্ বাথ ছাড়া, ডান দিকের দেওয়াল-জোড়া ওয়ার্ডরোব, বুককেস, সোফা, মেঝেতে দামি কার্পেট, ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়া যে খাটটায় অর্জুন বসে আছে সেটা তো রয়েছেই।

অর্জুনের বয়স চব্বিশ পঁচিশ। পাঁচ ফিট ন'ইঞ্চির মতো হাইট। গায়ের রং টকটকে। জোড়া ভুরু, খাড়া নাক, টান টান শিরদাঁড়া, দৃঢ় চোয়াল, ঘন চুল— সব মিলিয়ে তাকে ঘিরে এক ধরনের ব্যক্তিত্ব টের পাওয়া যায়।

কিছুক্ষণ আগে সকাল হয়েছে। সূর্য দিগন্তের তলা থেকে আস্তে আস্তে মাথা তুলতে তুলতে আচমকা লাফ দিয়ে অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে।

সময়টা ফাল্গুনের শেষাশেষি। শীত কেটে গেছে কবেই। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তৌহার বা উৎসব হোলি ক'দিন আগেই শেষ হয়েছে। হোলির পরই এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে গরম পড়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এ বছর ফাল্গুনের গোড়া থেকেই মাঝে মাঝে দিন কয়েক বৃষ্টি হয়েছে। সেই কারণে রোদ এখনও তেমন তেতে ওঠেনি। বাতাসে, বিশেষ করে সকালের দিকটায়, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একটা আমেজ ছড়িয়ে থাকে।

রোদ ওঠার অনেক আগেই আজ উঠে পড়েছিল অর্জুন। তখনও চারদিকে বেশ অন্ধকার। গোটা নমকপুরা গাঢ় ঘুমের আরকে একেবারে ডুবে ছিল। এমনকি একটা পাখির ডাক কোথাও শোনা যাচ্ছিল না। সেই থেকে জানালার বাইরে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে সে।

এখান থেকে সোজাসুজি তাকালে বরখা নদীর মরা খাতে অজস্র বালি, তার ওপারে ফাঁকা শস্যক্ষেত্র একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত ছুটে গেছে। একটানা মাঠের মাঝে ট্যারাবাঁকা চেহারার সিসম কি সিমার কিংবা পরাস গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

রোদ ওঠার পর থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি বেরিয়ে পড়েছে। এখন আকাশ জুড়ে শুধু পরদেশি শুগা, মানিক, সিল্লি এবং বুলবুলি। বাতাসে ডানা ভাসিয়ে ডজন ডজন বক এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে উড়ে যাচ্ছে।

অর্জুনের ডান দিকেও একটা বড় জানালা। সেটার বাইরে তাকালে নমকপুরা টাউনের অনেকটা অংশ চোখে পড়ে। এখানে বেশির ভাগই টিনের চালের বাড়ি, ফাঁকে ফাঁকে বেঢপ চেহারার পুরনো একতলা দোতলা। কচিৎ দু-চারটে ঝকঝকে নতুন তেতলা চারতলা বাড়িও দেখা যায়। আর দেখা যায় অগুনতি মন্দিরের চুড়ো। রাস্তাগুলো আঁকাবাঁকা, ভাঙাচোরা এবং ধুলোয় বোঝাই। পা ফেললে সেখানে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। চারদিকে আবর্জনার পাহাড়। এ শহরে যে একটা মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে, রাস্তাঘাট বাড়িঘরের দিকে তাকিয়ে বোঝার জো নেই।

অর্জুন শহরের চেহারা দেখছিল না। কিংবা সামনের জানালা দিয়ে দূরের শস্যক্ষেত্র, বরখা নদীর বালি বা পাখিটাখিও লক্ষ করছে না। গেটের পাশের কালো পুলিশ ভ্যানটা আবছাভাবে দেখছে সে। মাঝে মাঝেই তার চোখ এসে পড়ছে সামনের ফুলবাগানের পাশে, যেখানে দু'দিন আগেও ছিল অনেকটা ফাঁকা ঘাসের জমি। এখন সেখানে মোটামুটি বেশ বড় মাপের একটা প্যান্ডেল বানানো হয়েছে; তার তলায় পূর্ণিয়া থেকে ডেকরেটররা এসে প্রচুর চেয়ার-টেয়ার দিয়ে সাজিয়েছে। একধারে উঁচু একটা মঞ্চ দেখা যাচ্ছে, সেটা লাল টকটকে জুট কার্পেট দিয়ে মোড়া। সেখানে দামি দামি গদি-বসানো অগুনতি চেয়ার। চেয়ারগুলোর মাঝখানে সিংহাসন টাইপের দুটো প্রকাণ্ড সোফা। অর্জুন

শুনেছে তাকে এবং কমলাকে ওই সোফা দুটোয় বসানো হবে। বিয়েটা হবে ওখানেই। হোম যজ্ঞ করে বিয়ে নয়, একেবারে সিভিল ম্যারেজ। এজন্য পাটনা থেকে একজন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে আনা হচ্ছে। তিনি আসবেন মন্ত্রীর সঙ্গে।

অর্জুন জানে, তাদের বিয়েতে আসার জন্য এস.ডি.ও নমকপুরার প্রতিটি মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁর ডিপার্টমেন্টের ক'জন এমপ্লয়ি বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই সাত দিন সবাইকে এস.ডি.ও'র তরফ থেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছে, তারা এসে যেন অর্জুন এবং কমলাকে শুভ কামনা ও আশীর্বাদ জানিয়ে যায়।

এ শহরের মান্যগণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বসার জন্য শামিয়ানার তলায় চেয়ারের ব্যবস্থা। বাইরে যে জায়গা আছে তাতেও হাজার কয়েক লোক দাঁড়াতে পারবে।

এই যে বিপুল আয়োজন, এর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য। এস.ডি.ও, ডি.এম, মন্ত্রী, এম.এল.এ এবং সরকারের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চান নমকপুরার মানুষ এই বিয়েটাকে স্বাগত জানাক, আন্তরিকভাবে মেনে নিক।

এখানকার মানুষজন সত্যি সত্যিই বিয়ের সময় আসবে কিনা, অর্জুন জানে না। অন্যেরা কে কী করবে, সেটা তাদের ব্যাপার। কিন্তু বাপুজি, মা এবং আত্মীয়স্বজনেরা শেষ পর্যন্ত আসবে কিনা, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে অর্জুনের। কেননা সাত দিন আগে তারা এতই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে বাড়ি থেকে এখানে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। তা ছাড়া এ বিয়ের আরো একটি মারাত্মক দিক আছে।

মন্ত্রী, এম.এল.এ বা ডি.এম'রা বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর চলে যাবেন। এস.ডি.ও চিরকাল তাকে এবং কমলাকে বাড়িতে পুলিশ পাহারায় আশ্রয় দিয়ে রাখবেন না। তখন কী হবে তাদের? মা-বাবা বাড়িতে যদি থাকতে না দেয়, কোথায় গিয়ে তারা দাঁড়াবে? অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তা এবং দুর্ভাবনা চাক চাক বরফের চাঁইয়ের মতো তার মাথায় চাপ দিতে থাকে।

হঠাৎ কার ডাকে চমকে ঘাড় ফেরায় অর্জুন। দেখতে পায় দরজার কাছে মধ্যবয়সী ভরত দাঁড়িয়ে আছে। সে এই বাংলোর আর্দালি।

ভরত সসম্ভ্রমে বলে, 'সাব, মেমসাব আপনাকে নাহানা সেরে ডাইনিং রুমে যেতে বলেছেন।'

অর্জুন লক্ষ করেছে, এখানে আসায় ভরত তো বটেই, অন্য আর্দালি এবং চাকর-বাকরেরাও তাকে এবং কমলাকে যথেষ্ট খাতিরদারি করছে। এতটা খাতির বা সম্ভ্রম তাদের প্রাপ্য নয়। এখান থেকে চলে যাওয়ার পর রাস্তায় দেখা হলে হয়ত ওরা চিনতেই পারবে না। যেহেতু এই বাংলোতে আসার পর এস.ডি.ও এবং তাঁর স্ত্রী তাদের দিকে যথেষ্ট নজর দিচ্ছেন, অনবরত সাহস এবং উৎসাহ যুগিয়ে তাদের শিরদাঁড়া শক্ত রাখছেন, চাকর-বাকরদের স্তরেও তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

খাট থেকে নামতে নামতে অর্জুন বলল, 'ঠিক আছে। আমি আধঘণ্টার ভেতর চলে আসছি।'

'আচ্ছা সাব।' ভরত চলে গেল।

এখানে আসার পর ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, বিকেলের টিফিন এবং রাতের ডিনার—সবই এস.ডি.ও এবং তাঁর স্ত্রী সরযূর সঙ্গে গল্প করতে করতে খায় তারা। কমলা এবং তার প্রতি যত্নের শেষ নেই এই দু'টি মানুষের। প্রায় গোটা নমকপুরা শহর যেখানে তাদের ওপর খেপে আছে, হাতের কাছে পেলে তাদের টুঁটি টেনে ছিঁড়ে ফেলবে তখন এস.ডি.ও চন্দ্রকান্ত উপাধ্যায় এবং সরযূ যা করছেন, ভাবা যায় না। পৃথিবীতে হৃদয়বান ভাল মানুষের ঘাটতি এখনও হয়নি।

অর্জুন আর দাঁড়ায় না, বড় বড় পা ফেলে সোজা অ্যাটাচড বাথরুমে চলে যায়। সকালে স্নান করা যে তার অভ্যাস, এতদিনে জেনে গেছেন সরযূরা।

আধঘণ্টা পর অর্জুন যখন বিশাল ডাইনিং হলে এল, চন্দ্রকান্ত সরযূ এবং কমলা তার জন্য অপেক্ষা করছে। একটা চেয়ারে বসতে বসতে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে, কিছুটা ভয়ে ভয়েই অর্জুন বলল, 'ক্ষমা করবেন, একটু দেরি হয়ে গেল।'

টেবলের উলটোদিকে তার মুখোমুখি বসে আছেন চন্দ্রকান্ত, তাঁর পাশে কমলা। এধারে তার পাশের চেয়ারে সরযূ। এইভাবে মুখোমুখি এবং পাশাপাশি বসে তারা সাত দিন ধরে ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার পর্যন্ত খেয়ে আসছে।

চন্দ্রকান্তের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ইউ.পি'র বড় বংশের ছেলে। প্রায় ছ'ফিটের মতো হাইট, টান টান চেহারা, গায়ের রং বাদামি, ব্যাকব্রাশ করা ঘন চুল, লম্বাটে মুখ। চোখে পুরু লেন্সের ভারি চশমা। এমনিতে ভয়ানক গম্ভীর। যে বিরাট প্রশাসনিক দায়িত্বে তিনি আছেন সেখানে গাম্ভীর্যটা একান্ত জরুরি। কিন্তু একটু লক্ষ করলে টের পাওয়া যায়, গাম্ভীর্যের খোলসের তলায় তাঁর মধ্যে একটি মজাদার মানুষ রয়েছে।

চন্দ্রকান্ত দিল্লিতে স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেছেন। উদার কসমোপলিটান আবহাওয়ায় বড় হয়েছেন। তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের বেশির ভাগই নানা ধর্মের, নানা কমিউনিটির এবং নানা প্রভিন্সের মানুষ। ছুঁয়াছুত, জাতপাতের গোঁড়ামি—এ সব কিছুই তিনি মানেন না।

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ডোন্ট বী সো ফরমাল। তোমাকে আগেই বলেছি, এটাকে নিজের বাড়ি মনে করবে। তোমার জন্যে পাঁচ মিনিট ওয়েট করতে হয়েছে, তাতে এমন কিছু ক্ষতি হয়নি।'

চন্দ্রকান্তর উদারতা এবং মহানুভবতার তুলনা নেই। প্রথম দিন থেকেই তিনি অর্জুনদের লেভেলে নেমে এসে মিশতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু অর্জুনরা কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছে না। তারা ভুলতে পারছে না, সামাজিক স্টেটাসের দিক থেকে চন্দ্রকান্ত অনেক উঁচু স্তরের মানুষ, তিনি এই সাব-ডিভিসনের সবচেয়ে ক্ষমতাবান অফিসার। সংকোচ এবং আড়ষ্টতা, হয়ত এক ধরনের ভয়ও, কোনোভাবেই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না তাদের পক্ষে।

যাই হোক, অর্জুন উত্তর দেয় না। মুখ নিচু করে বসে থাকে।

সরযূ বেয়ারাকে ব্রেকফাস্ট দিতে বলে গ্রীবা সামান্য হেলিয়ে পাশের চেয়ারের অর্জুনের দিকে তাকান। মজার গলায় বলেন, 'কেমন লাগছে আজকের দিনটা? এ গোল্ডেন ডে অফ ইওর লাইফ—তাই না?'

সরযূর বয়স চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ। ভারতীয় মেয়েদের তুলনায় তিনি অনেক লম্বা—প্রায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। মুখ ডিম্বাকৃতি। বড় বড় দুই চোখে বুদ্ধির দ্যুতি। গায়ের রং বিকেলের রোদের মতো হলুদ। নিভাঁজ গলাটি যেন সোনার ফুলদানি। মুঠোয় ধরা যায় এমন সরু কোমর, মসৃণ ত্বক। বাদামি চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা। সুগোল হাত দুটি কাঁধ থেকে সটান নেমে এসেছে।

সরযূর পরনে ঘি-রঙের মার্সেরাইজড কটনের শাড়ি এবং ওই রঙেরই জামা। পায়ে হালকা ফোমের স্লিপার। গলায় সরু একটি সোনার হার, মীনে-করা পানপাতার মতো লকেটটা বুকের কাছে ঝুলছে। ডান হাতের মাঝখানের আঙুলে পান্না-বসানো আংটি। এ ছাড়া সারা শরীরে ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই। অবশ্য বাঁ হাতের কবজিতে রয়েছে একটি চৌকো ফ্যাশনেবল ইলেকট্রনিক ঘড়ি।

এই সামান্য সাজেই সরযূকে প্রায় অলৌকিক দেখাচ্ছে।

অর্জুন শুনেছে, চন্দ্রকান্তর মতো সরযূদেরও আদি বাড়ি ইউ পি'তে। তবে তাঁর জন্ম, লেখাপড়া এবং বড় হয়ে ওঠা—সবই কলকাতায়। কলকাতার কসমোপলিটন আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ার কারণে তাঁর মধ্যে চন্দ্রকান্তর মতো কোনোরকম গোঁড়ামি টোঁড়ামি নেই। সবরকম নীচতা এবং সঙ্কীর্ণতা থেকে তিনি মুক্ত। সকল দিক থেকেই তিনি এবং চন্দ্রকান্ত আদর্শ দম্পতি—ইংরেজিতে যাকে বলে 'মেড ফর ইচ আদার'।

সরযূর ছেলেমেয়ে হয়নি এখনও। ফলে তাঁকে বয়সের তুলনায় অনেক কম দেখায়। বড়জোর পঁচিশ ছাব্বিশ।

বিদুষী এবং সুন্দরী এই মহিলাটির ব্যবহার এক কথায় চমৎকার। তাঁর চোখেমুখে, চেহারায় প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে। সেই সঙ্গে আছে নিষ্পাপ এক সারল্য।

লাজুক ভঙ্গিতে একবার মুখ তুলেই নামিয়ে নেয় অর্জুন।

সরযূ হেসে হেসে বলেন, 'বিয়েটা লজ্জার কোনো ব্যাপারই না। তোমাদের আগে পৃথিবীতে কোটি

কোটি মানুষ বিয়ে করেছে, পরেও কোটি কোটি মানুষ বিয়ে করবে। তবে তোমরা এখানে যা করতে যাচ্ছ সেটা একটা রেভেলিউশন—একেবারে বিপ্লব। রিবেলদের অত গুটিয়ে থাকলে চলে না। বী স্টেডি অ্যান্ড ব্রেভ।'

অর্জুন মুখ নামানো অবস্থাতেই চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত একবার কমলাকে দেখে নেয়। টেবলের উলটোদিকে কোনাকুনি সে বসে আছে।

কমলার বয়স আঠার উনিশ। লম্বাটে সতেজ চেহারা। গায়ের রং ঝকঝকে কাঁসার ফলার মতো। মুখ ঈষৎ চৌকো ধরনের, নাকটা সামান্য চাপা। অঢেল স্বাস্থ্য তার, কোমর ছাপানো পর্যাপ্ত চুল, ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চোখ, ঝকঝকে সাদা দাঁত। তার সর্বাঙ্গে কোথায় যেন একটা অটুট দৃঢ়তা রয়েছে। এই সকালবেলায় কমলার পরনে মেরুন রঙের শাড়ি, দু হাতে রুপোর নকশা-করা কাংনা বা কঙ্কণ।

এই মুহূর্তে কমলার ঠোঁট দু'টি শক্ত করে আঁটা, সারা মুখ আরক্ত। চোখ দু'টিতে চাপা হাসির আভা।

সরযূ বলেন, 'জানো, আমি তোমাদের ভীষণ হিংসে করতে শুরু করেছি।'

রীতিমত অবাক হয়েই অর্জুন থুতনি তুলে একবার সরযূর দিকে তাকায়, নিজের অজান্তেই যেন বলে ফেলে, 'কেন?'

এই সময় বেয়ারা খাবার নিয়ে আসে। পরটা, আলুর তরকারি, বেগুনভাজা, কিছু ফল, পেঁড়া এবং চা।

সরযূ নিজের হাতে খাবার সাজিয়ে প্লেটগুলো সবার সামনে রাখেন। চা টী-কোজির ভেতর সুরক্ষিত থাকে। খাওয়ার পর চা তৈরি করে সবাইকে দেবেন। নিজের হাতে সার্ভ করে অন্যকে খাওয়াতে পছন্দ করেন সরযূ। এটা তাঁর একটা প্রিয় শখ।

চন্দ্রকান্ত এবং সরযূর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে আদৌ গোঁড়ামি নেই। মাছ মাংস থেকে শুরু করে তাঁরা সমস্ত কিছুই সমান আগ্রহে এবং তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে থাকেন। কমলা সম্পর্কেও সেই একই কথা। এখানকার অচ্ছুৎরা খাদ্যাখাদ্য নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। কিন্তু অর্জুনের ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। তাদের প্রচণ্ড গোঁড়া চতুর্বেদী বংশ পুরুষানুক্রমে নিরামিষাশী। মাছ মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, নাম শোনাটাও তাদের কাছে পাপ।

অর্জুনরা আসার পর এই বাংলোয় সবজি এবং দুধ-ঘি-মাখন ছাড়া আর কিছু ঢুকছে না। এতে খুবই সংকোচ বোধ করছে অর্জুন। বার বার জানিয়েছে, অন্যরা মাছ মাংস খেলে তার এতটুকু অসুবিধা হবে না। কিন্তু সরযূরা তার কথা কানে তোলেন নি।

এক টুকরো পরটা এবং আলুভাজা মুখে পুরে সরযূ বলেন, 'হিংসে হবে না, বল কী!'

তাঁর কথা বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো তাকায় অর্জুন।

টেবলের ওধার থেকে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'সরযূ বলতে চাইছে, আমাদের বিয়েটা ঠিক করেছিলেন আমাদের দু'জনের মা-বাবারা। আমরা শুধু অতি সুবোধ ছেলেমেয়ের মতো সুড়সুড় করে মালা বদল করেছিলাম। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ছাড়া কেউ কিছু জানল না, শুনল না, কোথাও একটা ধাক্কা লাগল না, স্রেফ ট্র্যাডিশনাল মামুলি রাস্তায় বিয়েটা হয়ে গেল। আর তোমরা যা ঘটিয়ে বসেছ সেটা হল এক্সপ্লোসন। সারা নমকপুরা টাউন একেবারে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। এমন কি পাটনা পর্যন্ত এ খবর পৌঁছে গেছে। ইউ টু আর ভেরি ফেমাস নাউ। সরযূর হিংসেটা এই কারণে—বুঝেছ?'

সংকোচে নিজেকে গুটিয়ে নেয় অর্জুন।

চন্দ্রকান্ত বলতে লাগলেন, 'লাস্ট হানড্রেড ইয়ার্সে এরকম বিয়ের রেকর্ড আর একটিও নেই। এটা এই শহরের একটা বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা। ভেরি ভেরি বিগ ইভেন্ট। তোমাদের কথা এখানকার মানুষ কোনোদিন ভুলবে না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর হঠাৎ সরযূ বলে উঠলেন, 'ম্যারেজ রেজিস্ট্রার না ডেকে বিয়েটা যদি পুরোহিত দিয়ে করানো সম্ভব হত, তা হলে খুব আনন্দ করা যেত। সবাই এগিয়ে এসে উবটান (গায়ে হলুদ জাতীয় অনুষ্ঠান) থেকে শুরু করে সব রকম নিয়ম টিয়ম মানা যেত। বিয়ে হবে অথচ পাড়ার মেয়েরা এসে

বিয়ের গান গাইবে না, মার্জাদ (বরযাত্রীরা মেয়ের বাড়ি এলে তাদের আদর-যত্ন করা) হবে না—আমার কিন্তু ভীষণ খারাপ লাগছে।' একটু থেমে ফের শুরু করেন, 'আমার বিয়ে হয়েছে ঠিকই কিন্তু বিয়ের আচার কিছুই মনে নেই, গানটানও জানি না। তা হলে আমিই আর্দালিদের বউ টউদের ডেকে সেসব করতাম।'

ডাইনিং হলের আবহাওয়া মুহূর্তে ভারি হয়ে ওঠে।

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়েন চন্দ্রকান্ত, 'সবাই যাতে বিয়েটা মেনে নেয়, সে চেষ্টা তো কম করিনি। কিন্তু কিছুতেই কিছু করা গেল না। যে যার সুপারস্টিশন আর গোঁড়ামি নিয়ে বসে রইল। এটা ভেঙে তাদের বার করে আনা খুবই ডিফিকাল্ট ব্যাপার।'

অর্জুন অন্যমনস্কর মতো খেতে খেতে চন্দ্রকান্তর কথা শুনে যাচ্ছিল। সে জানে, তারা এই বাংলোতে আশ্রয় নেওয়ার পর চন্দ্রকান্ত নিজে নমকপুরা টাউনের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সবাইকে বুঝিয়েছেন, এ বিয়েটা যেন সবাই মেনে নেয়। এটা অন্যায় কোনো ব্যাপার নয়—খুবই সঙ্গত এবং মানবিক। ছুঁয়াছুত এবং জাতপাতের বিচার নিয়ে থাকলে ভারতবর্ষ এক কদমও ভবিষ্যতের দিকে এগুতে পারবে না, তার প্রগতি চিরদিনের মতো থমকে যাবে। শুধু তা-ই নয়, কট্টর জাতপাত এবং সাম্প্রদায়িক কারণে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। অন্য কেউ হলে, উচ্চবর্ণের লোকেরা, বিশেষ করে ব্রাহ্মণেরা প্রচণ্ড ঘৃণায় এবং রাগে লাথি মারত, কিংবা পোষা পহেলবান লেলিয়ে চামড়া তুলে ফেলত কিন্তু এস.ডি.ও-কে তো সেভাবে অভ্যর্থনা করা যায় না। তারা শুধু কঠিন গম্ভীর মুখে চোয়াল শক্ত করে জানিয়ে দিয়েছে, চন্দ্রকান্ত যেন ক্ষমা করেন, এ বিয়ে তারা কোনোভাবেই মেনে নেবে না।

শুধু ব্রাহ্মণ এবং কায়াথদের পাড়াতেই যাননি চন্দ্রকান্ত, অচ্ছুৎ টুলিগুলোতেও বার বার গেছেন। কিন্তু ভয়ে ভয়ে তারা জানিয়েছে, এ বিয়েতে তাদেরও সায় নেই। কেননা দেওতা-য্যায়সা (দেবতার সমতুল্য) চন্দ্রকান্ত আজীবন নমকপুরায় থাকবেন না। বদলি হয়ে বা প্রোমোশন পেয়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন। তখন ব্রাহ্মণদের আক্রোশ এসে পড়বে তাদের ওপর। খুন করে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে তাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে। অচ্ছুৎদের মতে এ বিয়ে না হওয়াই মঙ্গল। দু পক্ষই চাইছে স্থিতাবস্থা বজায় থাক। জাতপাত ছুঁয়াছুতের বিচার নিয়ে সোসাইটি হাজার হাজার বছর ধরে যেভাবে পড়ে আছে, সেভাবেই থাক। কোনোক্রমেই তার শান্তিভঙ্গ যেন ঘটানো না হয়।

চন্দ্রকান্ত বোঝাতে চেয়েছেন, দেশটা মগের মুল্লুক নয়, যার যা ইচ্ছা তা করা যায় না। আইন-কানুন বলে কিছু পদার্থ এখনও রয়েছে। তা ছাড়া আপাতত বছর দুয়েক তিনি নমকপুরাতেই আছেন, এখান থেকে ট্রান্সফার হওয়ার কোনোরকম সম্ভাবনাই নেই। আর তিনি যতদিন আছেন, অচ্ছুৎদের গায়ে কাউকে একটা আঙুলও ঠেকাতে দেবেন না। যখন তিনি চলে যাবেন, পরের এস.ডি.ও'কে বলে যাবেন অচ্ছুৎদের দিকে যেন নজর রাখেন। কিন্তু এত সব প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও তাদের উদ্বেগ এবং দুর্ভাবনা এতটুকু কাটেনি। আসলে ওরা নিরাপত্তা বোধ করতে পারছিল না। আবহমান কাল ধরে বামহন-কায়াথদের কাছ থেকে অপমান এবং ঘৃণা পেয়ে পেয়ে এতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। পান থেকে চুন খসলে উচ্চবর্ণের মানুষেরা তাদের ওপর চালিয়েছে চরম নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচার। এটা যেন এই অঞ্চলের চিরাচরিত প্রথা। ফলে অচ্ছুৎদের মেরুদণ্ডে সাহস বা জোর বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ভয়টা তাদের কাছে ধর্মপালনের মতো একটা ব্যাপার।

অচ্ছুৎরা, বিশেষ করে কমলার মা-বাপ এবং আত্মীয়স্বজন জোড়হাতে সবিনয়ে জানিয়েছে, চন্দ্রকান্ত যেন এ বিয়ে ভেঙে দেন। এ বিয়ে হলে তারা খুবই বিপন্ন হবে।

কমলার মা-বাপের মতো অর্জুনের মা-বাবাও বিয়েটা ভেঙে দেওয়ার জন্য চন্দ্রকান্তর কাছে প্রচুর আর্জি জানিয়েছে। বলেছে, চন্দ্রকান্ত স্বয়ং উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ হয়ে আরেকটি সৎ শুধ্ ব্রাহ্মণ বংশের চরম সর্বনাশ যেন না করেন, কিন্তু তাঁকে টলানো যায়নি। অদম্য এক জেদ চন্দ্রকান্তকে যেন পেয়ে বসেছে। এই বিয়ে তিনি দেবেনই। সংস্কার ভাঙতে হলে কাউকে না কাউকে তো প্রথম এগিয়ে যেতে হবে।

কমলা এবং অর্জুনের মা-বাপেরা কিংবা নমকপুরার অন্য কেউ এগিয়ে এলে হিন্দু প্রথা মেনে যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে বিয়েটা দেওয়া যেত কিন্তু তা হওয়ার নয়।

অবশ্য চন্দ্রকান্ত একেবারে হতাশ হয়ে পড়েননি। নমকপুরার বাসিন্দারা তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরও জিপে করে নিজের ডিপার্টমেন্টের একটি ক্লার্ককে তিনি ক'দিন ধরে সারা শহরে টহল দেওয়াচ্ছেন। ক্লার্ক ছেলেটি অর্থাৎ অবিনাশ দারুণ কাজের—যেমন চটপটে তেমনি তার টগবগে এনার্জি। সে একটা পোর্টেবল মাইক গলায় ঝুলিয়ে দিনে আট দশ ঘণ্টা করে চেঁচিয়ে নেমন্তন্ন করেছে—সবাই যেন এ বিয়েতে কির্পা করে যোগ দেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরযূ বললেন, 'শেষ পর্যন্ত কেউ না এলে কী আর করা যাবে!' তাঁকে সামান্য হতাশই দেখায়।

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'এ শহরের কে আসবে, কতজন আসবে, এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে—'

'তবে কী?'

স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে কমলা এবং অর্জুনকে লক্ষ করতে করতে হালকা গলায় চন্দ্রকান্ত বলেন, 'তেমাদের বিয়েতে বরযাত্রী হিসেবে মন্ত্রী, এম.এল.এ, এস. পি, ডি. এম এমনি অনেকে আসছেন। আমাদের বিয়েতে কিন্তু এত সব ভি.আই.পি আসেননি।'

অর্জুন কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আধফোটা গলায় প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন সরযূ, 'এই যা—'

অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকান চন্দ্রকান্ত, 'কী হল?'

'একটা ভীষণ ভুল হয়ে গেছে।'

'কিসের ভুল?'

'বিয়ের দিন দুলহা দুলহনকে উপোস থাকতে হয়। আমার একেবারে খেয়াল ছিল না। এদিকে অর্জুন আর কমলা ব্রেকফাস্ট করতে শুরু করেছে।'

একটু চুপ করে থাকেন চন্দ্রকান্ত। তাঁর মনে সামান্য খুঁতখুঁতুনি চলতে থাকে। আগে খেয়াল হলে অর্জুনদের ব্রেকফাস্টে ডাকা হত না। বিয়ের লগ্ন পর্যন্ত তাদের উপোস করিয়ে রাখতেন। চন্দ্রকান্ত যতই প্রোগ্রেসিভ হোন, যতই জাতপাত ভাঙতে চান, দু-চারটে প্রাচীন সংস্কার তাঁর মধ্যে থেকেই গেছে। তবে ব্যাপারটা স্বাভাবিক করে নেওয়ার জন্য বলেন, 'এতে দোষ কিছু হয়নি। ওদের তো আনকনভেনশনাল ম্যারেজ। সব সিস্টেম যখন ভাঙতে চলেছে তখন উপোস দিয়ে থাকার মানে হয় না।' অর্জুনরা হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'খাও—খাও—'

দ্বিধাগ্রস্তের মতো আবার খেতে শুরু করে অর্জুন এবং কমলা। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কী মনে পড়ায় অর্জুনের চোখে মুখে প্রবল দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে বেরোয়। ভয়ে ভয়ে সে বলে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'নিশ্চয়ই।'

'বিয়ের পর আমাদের কী হবে?'

'মানে?'

অর্জুন বলে, 'আমাদের বিয়েতে মা, বাবুজি কি আত্মীয়স্বজন, কেউ আসবে বলে মনে হচ্ছে না। বিয়ের পর কোথায় গিয়ে উঠব, বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া—'

'কী?' চন্দ্রকান্ত সোজা অর্জুনের মুখের দিকে তাকান।

'আমার তো চাকরি বাকরি কিছু নেই। কমলা ছোটখাট একটা কাজ করে। কিন্তু তাতে তো চলবে না।'

'সে জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই।'

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকে অর্জুন। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যবস্থা?'

চন্দ্রকান্ত হাসেন। রহস্য কাহিনীর ঢংয়ে বলেন, 'সেটা এখন বলছি না। বিয়ের সময় তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দেওয়া হবে। আর সারপ্রাইজটা দেবেন স্বয়ং মিনিস্টার।'

কী বিস্ময় তার জন্যে অপেক্ষা করছে, সে ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয় না অর্জুনের।

ব্রেকফাস্ট শেষ হতে আটটা বেজে যায়।

চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে সরযূ বলেন, 'তোমরা সবাই একবার আমার সঙ্গে ওধারের ঘরটায়

চল—' আঙুল বাড়িয়ে তিনি দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটা দেখিয়ে দেন।

অর্জুন এবং কমলা উৎসুক চোখে সরযূর দিকে তাকায়, তবে কোনো প্রশ্ন করে না।

তাদের মনোভাব আন্দাজ করে সরযূ সস্নেহে বলেন, 'তোমাদের বিয়ের জন্যে নতুন জামা-কাপড় কেনা হয়েছে। দেখবে চল—'

অর্জুন এবং কমলা দু'জনেই জানে, ক'দিন ধরে তাদের জন্য কী সব কেনাকাটা করছেন সরযূ। এই কারণে একদিন কাটিহারের বড় মার্কেটেও চলে গিয়েছিলেন। কাপড় চোপড় কী কিনেছেন, সে ব্যাপারে আগে কিছু বলেননি সরযূ। অর্জুনরাও জানতে চায়নি। তবে তারা ভীষণ সংকোচ বোধ করছে। দু'টি মানুষকে সরযূরা সাত দিন ধরে নিজেদের কাছে রেখেছেন। তার ওপর বিয়ের জন্য যেভাবে খরচ টরচ করছেন তাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করারই কথা। দু-একবার সামান্য বাধা দিতে চেষ্টা করেছে অর্জুন কিন্তু সে সব উড়িয়ে দিয়েছেন সরযূ।

চন্দ্রকান্ত এবং সরযূর সঙ্গে দক্ষিণের শেষ ঘরটায় এসে একেবারে হাঁ হয়ে গেছে অর্জুনরা। এ ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা খাট। দেয়ালের ধার ঘেঁষে আলমারি, ওয়ার্ডরোব ইত্যাদি। এক কোণে নিচু ডিভান। আলাদাভাবে বসার জন্য বেতের ক'টি মোড়ার মাঝখানে ছোট টেবল।

খাটের ওপর ডাঁই-করা রয়েছে অনেকগুলো প্যাকেট এবং বাক্স, প্রচুর কসমেটিকসের ফ্যাশনেবল শিশি, টিউব, কৌটো, দুটো দামি নতুন স্যুটকেস, এমনি প্রচুব জিনিসপত্র।

সরযূ একটার পর একটা প্যাকেট খুলে ঝলমলে শাড়ি বা ট্রাউজার্সের পিস বার করে অর্জুনদের দেখাতে দেখাতে বলতে লাগলেন, 'দেখ তো পছন্দ হয় কিনা।'

শাড়ি টাড়ি না দেখে অর্জুনরা বিমূঢ়ের মতো সরযূদের দিকে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'এ আপনারা কী করেছেন! আমাদের জন্যে এত টাকা কেন নষ্ট করলেন!'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'তোমাদের কি ধারণা, এই সব জিনিস আমরা কিনেছি? অত টাকা আমাদের নেই।'

'তা হলে?'

'বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের কাছে তোমাদের বিয়ের কথা জানাতে তারা উপহার পাঠিয়েছে। তবে বিয়ের সময় কমলা যে শাড়ি ব্লাউজ আর তুমি যে ধুতি-পাঞ্জাবি পরবে সেগুলো আমরা কিনেছি।' চন্দ্রকান্ত বলতে লাগলেন, 'আগে জানালে যদি বেঁকে বসো তাই পাঞ্জাবিটা আর অর্ডার দিয়ে বানানো হয়নি। তোমার মাপ আন্দাজ করে রেডিমেড কেনা হয়েছে।'

অর্জুনের আর কিছু বলার নেই, সে চুপ করে থাকে।

এদিকে ছোট ছোট ভেলভেটের ক'টি বাক্স খুলে সরযূ এক সেট রুপোর গয়না বার করে কমলাকে দেখান, 'এগুলো তোমার।'

কমলা অত্যন্ত বিব্রতভাবে বলে, 'জামাকাপড়ই তো যথেষ্ট। আবার গয়না কেন?'

সরযূ স্নিগ্ধ হাসেন, 'না সাজিয়ে কি মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো যায়?'

কমলার কুণ্ঠা এবং সংকোচ আচমকা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। কী উত্তর দেবে সে ভেবে পায় না। সরযূ এবং চন্দ্রকান্তকে যত দেখছে ততই মুগ্ধ হচ্ছে কমলারা। তাঁদের উদারতা আর মহানুভবতায় তারা অভিভূত।

সরযূ বলেন, 'বিয়ের সময় আমি নিজের হাতে তোমাকে সাজিয়ে দেব।'

কৃতজ্ঞ কমলা তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

দুই

দুপুর থেকেই পুরোদমে তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। মন্ত্রী এবং এম.এল.এ আসছেন। তাঁরা অর্জুনদের বিয়ের সুযোগটা কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না। সমাজে অসবর্ণ বিয়ের উপকারিতা এবং ভারতবর্ষকে প্রগতির দিকে কয়েক কদম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এর উপযোগিতা সম্পর্কে অবশ্যই একটি করে জমকাল ভাষণ দেবেন। সেদিকে লক্ষ রেখে ডেকরেটররা মাইক নিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝেই 'হ্যালো মাইক টেস্টিং, এক দো তিন চার—' ইত্যাদি শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ মাইকটা কতখানি ঠিক আছে তা পরখ করে নেওয়া হচ্ছে। পরে মিনিস্টারদের বক্তৃতার সময় গোলমাল হলে বিশ্রী ব্যাপার হবে।

এত সব গণ্যমান্য লোক আসবেন। তা ছাড়া বিয়ে বলে কথা। সবার ভোজনের জন্য দু'দিন আগেই কিছু লাড্ডু, পেঁড়া, গুলাবজামুন এবং নিমকিনের অর্ডার দিয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত। দুপুর হতে না হতেই পূর্ণিয়া থেকে মিঠাইবালার লোকেরা মাতাডোর ভ্যানে করে সেগুলো পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে। এই মিঠাই-টিঠাইয়ের খরচা দিচ্ছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

এখন আড়াইটার মতো বাজে। চারটে নাগাদ মিনিস্টার, এম.এল.এ এবং অন্যান্য ভি.আই.পি'দের পৌঁছে যাবার কথা। মাঝখানে ঘণ্টা দেড়েক মাত্র সময় রয়েছে।

সরযূ লম্বা বারান্দা পেরিয়ে সোজা উত্তর দিকের একটা ঘরে চলে এলেন। সঙ্গে তাঁদের আর্দালি ভরতের স্ত্রী পার্বতী। পার্বতী ভারি চেহারার মেয়েমানুষ। কপালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তার ঘোমটা টানা। হাতে পেতলের রেকাবিতে নতুন আয়না, চিরুনি, তেল, বাটা হলুদ, গন্ধ তেলের শিশি এবং দই ভর্তি একটা বাটি। সরযূর হাতে রয়েছে একটা ব্যাগ। তাতে সাজের নানা জিনিসপত্র।

যে ঘরে সরযূরা এসেছেন সেটা কমলাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে।

এই মুহূর্তে কমলা জানালার মোটা মোটা গরাদ ধরে বাইরের 'লন'-এ বিরাট শামিয়ানাটার দিকে দূরমনস্কর মতো তাকিয়ে আছে। হয়ত অর্জুনের সঙ্গে জড়ানো অনিশ্চিত এবং বিপজ্জনক ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল।

পেছন থেকে সরযূ কোমল গলায় ডাকলেন, 'কমলা—'

চমকে ঘুরে দাঁড়ায় কমলা। সরযূর সঙ্গে পার্বতী এবং তার হাতের রেকাবিটা দেখে রীতিমত অবাকই হয়। কয়েক পলক দু'জনকে লক্ষ করার পর পায়ে পায়ে সরযূর কাছে এগিয়ে আসে।

সরযূ সস্নেহে বলেন, 'সময় আর বেশি নেই। এবার তোমাকে স্নান করিয়ে নিজের হাতে সাজিয়ে দেব। আমি উত্তর প্রদেশের মেয়ে, থেকেছি কলকাতায়। এখানকার বিয়ের ব্যাপার ট্যাপার কিছুই প্রায় জানি না। তাই পার্বতী বহীনকে ডেকে নিয়ে এলাম।' একটু থেমে কিছুটা আক্ষেপের গলায় আবার বলেন, 'আগে পার্বতী বহীনের কথা মনে পড়লে সব নিয়ম মানা যেত। কেন যে পড়ল না! আমারই ভুল। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বাকি যেটুকু আছে সেটুকু করা যাক, না কি বল পার্বতী বহীন?'

সরযূ এবং চন্দ্রকান্তর ভদ্রতা, রাহান সাহান এবং ব্যবহার একেবারে অন্যরকম। দু'জনে দুই ধরনের কসমোপলিটান আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন বলে এটা সম্ভব হয়েছে। মানুষকে তাঁরা সম্মান দিতে জানেন। না হলে সামান্য আর্দালির স্ত্রীকে 'বহীন' বলতেন না। আসলে যারাই তাঁদের বাংলোর কাজ-টাজ করেন, বা চন্দ্রকান্তর অফিসে সাব-অর্ডিনেট স্টাফ, তাদের সবাইকে ভাই বা বহীন বলে থাকেন।

সরযূ এবার বলেন, 'পার্বতী বহীন, যা করার শুরু করে দাও—'

পার্বতীর যথেষ্ট বয়স হলেও অত্যন্ত লাজুক ধরনের মানুষ। পুরুষ হোক, মহিলা হোক, কারুর সামনেই সে ঘোমটা ছাড়া বেরোয় না। কথা বলে খুব আস্তে আস্তে। মৃদু গলায় সে বলল, 'কমলা বহীন, বৈঠ—' বলে ঘরের মেঝে দেখিয়ে দেয়।

কমলা নিঃশব্দে বসে পড়ে। তার মুখোমুখি বসেন সরযূ এবং পার্বতী।

পার্বতী বলে, 'চুল খুলে ফেল।'

বাধ্য বালিকার মতো চুল খোলে কমলা। পার্বতী বলে, 'পেছন ফিরে বসো।'

কমলা সেভাবেই বসে। এবার পার্বতী প্রথমে সযত্নে তার চুলে চিরুনি চালিয়ে জট টট ছাড়িয়ে, সুগন্ধি তেল মাখিয়ে দেয়। তারপর ফের তাকে ঘুরে বসতে বলে সারা মুখে, গলায়, হাতে এবং পায়ের পাতা থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের নানা জায়গায় তেল-হলুদ মাখাতে মাখাতে গুনগুন করে চাপা দেহাতি সুরে বিয়ের গান গাইতে থাকে।

'আঙ্গনকে আজ আয়া মোরী সামহাল করকে
ইঁহা হ্যায় গরিব আঙ্গন, তুমি তো সপুত সাজন
ধীরেসে আপনে প্যারকো রাখনা সামহাল করকে
দাদা ও তেরে আয়া আভী বরাতী বনকে
দাদী যে তেরি আয়ী............'

তেল-হলুদ মাখানো হয়ে গেলে পার্বতী বলে, 'যাও, নাহানা করে এস।'

একটা সাদামাঠা আটপৌরে শাড়ি, জামা এবং তোয়ালে কাঁধে ফেলে বাথরুমে চলে যায় কমলা। সরযূ আর পার্বতী বসেই থাকে।

সরযূ বলেন, 'স্নান হয়ে গেলে আমি কিন্তু সাজিয়ে দেব কমলাকে। তুমি নজর রাখবে কোনো ভুলটুল হচ্ছে কিনা।'

পার্বতী বিনীত ভঙ্গিতে মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয়।

মিনিট পনের বাদে কমলা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলে সরযূ ফুল স্পিডে ফ্যান চালিয়ে তার চুল শুকিয়ে সাজাতে বসেন। পার্বতী আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, কিভাবে দুলহনের চুল বাঁধতে হবে।

কমলার দীর্ঘ ঘন চুল প্রথমে দই এবং কাঁচা সিঁদুর দিয়ে মেখে নেন সরযূ। সেগুলোর ভেতর আট দশখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে প্রচুর লাল-নীল রিবন এবং ক্লিপ দিয়ে বিশাল খোঁপা বেঁধে নাইলনের জাল আটকে দেন। তারপর গুঁজে দেন প্রজাপতিওলা দুটো রুপোর কাঁটা। প্রজাপতির তলায় লেখা রয়েছে 'সদা সুখী রহো'।

সরযূ পার্বতীর কাছে আগেই শুনেছেন, এত ফিতে, ক্লিপ এবং ভেতরে টাকা গুঁজে খোঁপা বাঁধার কারণ একটাই। শ্বশুরবাড়িতে পা দেওয়ার পর এই জবরদস্ত জটিল খোঁপা খুলতে হবে দুলহনের ননদকে। চুলের ভেতর অদৃশ্য টাকা তারই প্রাপ্য।

দই এবং সিঁদুর মাখার ফলে চুলটা আর কালো নেই, লাল-সাদা-কালোয় মিশে কেমন যেন একটা রং ধরেছে। তা ছাড়া দইয়ের কারণে চটচটে হয়েও আছে। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে শুকিয়ে গেলে গোটা মাথাটা কড়কড়ে হয়ে উঠবে।

বিহারের এই অঞ্চলে বিয়ের কনের চুল বাঁধাটা এক বিরাট ব্যাপার। সেটা চুকে যাওয়ার পর সরযূ পার্বতীকে জিজ্ঞেস করেন, 'এবার কী করতে হবে?'

'নয়া কাপড়া-টাপড়া পরিয়ে দিতে হবে।'

'তাতেও কি দই-সিঁদুর মাখাতে হয়?'

'নেহী।' পার্বতী বুঝিয়ে দেয় দুলহনের পোশাক পরার ব্যাপারে আর কোনো নিয়ম পালন করতে হয় না। এবার যেভাবে ইচ্ছা, সরযূ তাকে সাজিয়ে দিতে পারেন।

দুশ্চিন্তা কেটে যায় সরযূর। হেসে হেসে বলেন, 'বাঁচা গেল। আমার মতো আনাড়িদের ভীষণ মুশকিল।'

পার্বতীও হাসে।

হঠাৎ কী মনে পড়তে সরযূ বলেন, 'আচ্ছা, অর্জুনকেও তো তেল হলদু মেখে স্নান করতে হবে।'

'হাঁ।'

'তাব মাথাতেও দই-সিঁদুর লাগাতে হবে নাকি?'

সরযূর অজ্ঞতায় হেসে ফেলে পার্বতী এবং কমলা। মুখে কাপড় দিয়ে পার্বতী বলে, 'নেহী নেহী, দুলহা নাহানা সেরে যেমন চুল আঁচড়ায় তেমনি আঁচড়ে নেবে।'

সরযূ বলেন, 'আমি কমলাকে শাড়ি টাড়ি পরাচ্ছি. তুমি অর্জুনের ঘরে যাও। তাকে তেল-হলুদ

দিয়ে বলবে, ওগুলো মেখে যেন নাহানা সেরে নেয়।'

বিব্রত মুখে পার্বতী বলে, 'নেহী, আমি পারব না। বড়ী শরমকি বাত।'

'আরে বাবা, অর্জুন তোমার ছোট ভাইয়ের মতো। আচ্ছা লেড়কা। ওর কাছে লজ্জার কিছু নেই। যাও—যাও—'

এরপর আর কিছু বলার থাকে না। অত্যন্ত নিরুপায় হয়েই তেল-সিঁদুর নিয়ে অর্জুনের ঘরের দিকে চলে যায় পার্বতী।

এদিকে সরযূর ব্যাগ থেকে দামি সিল্কের শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি বার করে কমলাকে বলে, 'বাথরুম থেকে পরে এস।'

শাড়িটাড়ি নিয়ে বাথরুমে চলে যায় কমলা। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলে কাপড়ের কুঁচি এবং ভাঁজগুলো ঠিক করে দিতে থাকেন সরযূ। ব্লাউজের হাতা যেখানে যেখানে কুঁচকে আছে সে সব জায়গা টেনে সমান করে দেন। পোশাকটা পরিপাটি করে পরানো হলে তাকে খাটে বসিয়ে প্রথমে সরু করে চোখে কাজল টেনে, নখে নেল-পালিশ লাগাতে থাকেন। তারপর গলায় হার, কানে করণফুল, নাকে সাদা পাথর-বসানো নাকফুল, হাতে কাংনা এবং চুড়ি, আঙুলে আংটি ইত্যাদি পবিয়ে কমলার সারা গায়ে দামি সেন্ট ছড়িয়ে দেন। মুহূর্তে ঘরের বাতাস সুগন্ধে ভরে যায়। এবার পাতলা নরম তোয়ালে দিয়ে কমলার মুখ এবং গলা ভাল করে মুছে, তার গালে হালকা রঙের গোলাপি রুজ আলতো করে লাগিয়ে দেন সরযূ। তারপর আঙুল দিয়ে কমলার চিবুকটি সামান্য তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার মুখটি দেখতে দেখতে বলেন, 'চমৎকার।'

লজ্জায় চোখের পাতা দু'টি বুজে আসে কমলার।

সরযূ আবার বলেন, 'এমন বহু দেখলে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের মাথা ঘুরে যাবে।'

হঠাৎ কমলা চাপা গলায় বলে ওঠে, 'আমার ভীষণ ডর লাগছে বহীনজি।' এই বাংলোতে আসার পর প্রথম প্রথম সরযূকে 'মেমসাহেব' বলত কমলা এবং অর্জুন। তাতে খুবই ক্ষুব্ধ হতেন সরযূ। তিনিই ওদের 'বহীনজি' বলতে শিখিয়েছেন।

'বিয়ের সময় ওইরকম একটু আধটু ডর সব মেয়েরই লাগে। আমারও লেগেছিল। ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমি সে ডরের কথা বলছি না।'

'তবে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কমলা বলে, 'আচ্ছা, আপনারা সত্যিই কি আমাকে আমার সসুরাল পাঠাবেন?'

এবার কমলার ভয়ের কারণটা বুঝতে পারেন সরযূ। সেখানে তার অভ্যর্থনাটা কিরকম হবে, সেটাও মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। খানিকটা অন্যমনস্কর মতো তিনি বলেন, 'বিয়ের পর মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যাওয়াই তো নিয়ম।'

কমলা আবছা গলায় বলে, 'লেকেন আমাদের এই বিয়েটা তো সব নিয়ম কানুনের বাইরে।'

বুকের ভেতর থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে সরযূর। দোসাদদের এই সুশ্রী শিক্ষিত এবং অত্যন্ত বিনীত মেয়েটির জন্য তিনি বিষণ্ণ বোধ করেন।

কমলা আবার বলে, 'আমাদের বিয়েতে সসুরাল থেকে কেউ আসবে না মনে হচ্ছে। এর পরও আমরা যদি যাই, বাড়ির ভেতর কি ঢুকতে দেবে?'

কমলার কাঁধে একটি হাত রেখে সস্নেহে সরযূ বলেন, 'তোমাদের মতো সংস্কার ভাঙার সাহস আগের জেনারেশনের মানুষদের নেই। তবু বলব তোমরা তোমাদের কর্তব্য করবে। তারপরও যদি বাড়িতে ঢুকতে না দেয় তখন সোজা এখানে চলে আসবে। আমরা দেখব কী করা যায়। আর কেউ থাক বা না থাক, আমরা তোমাদের পাশে আছি।'

কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে কমলা বলে, 'সে আমরা জানি।'

সরযূ বলেন, 'একটা কথা তোমাদের সব সময় মনে রাখা দরকার।'

'কী কথা?'

'যারা রিভোল্ট করে তাদের অনেক রকমের কষ্ট স্বীকারের জন্যে তৈরি থাকতে হয়।'

কমলা চুপ করে থাকে। সরযূর কথার মধ্যে যে গভীর ইঙ্গিতটি রয়েছে তা বুঝতে তার অসুবিধা হয় না। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পার্বতী এসে জানায়, গায়ে হলুদ মেখে অর্জুন স্নান সেরে নিয়েছে, এখন সে নতুন পোশাক পরছে।

তার কথা শেষ হতে না হতেই বাইরে চেঁচামেচি হট্টগোল শোনা যায়। চমকে উঠে সরযূরা দেখতে পান, বাংলোর গেটের বাইরে অনেক লোক জমা হয়েছে। তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উত্তেজিতভাবে কী যেন বলছে; এতদূর থেকে তা একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটুকু মনে হল, লোকগুলো এ শহরেরই বাসিন্দা।

সরযূ পার্বতীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারা?'

পার্বতী বলে, 'মালুম নেহী।'

'ভরত ভাইকে পাঠিয়ে খবর নাও তো।'

পার্বতী বেরিয়ে যায় এবং মিনিট পাঁচেক বাদেই ফিরে এসে জানায়, নমকপুরার বামহন আর কায়াথরা একজোট হয়ে এই অসবর্ণ বিয়ের বিরুদ্ধে হল্লা মচাচ্ছে।

গোঁড়া সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মণদের না হয় উত্তেজিত হওয়ার মতো কারণ আছে। তবে কায়াথরা তাদের সঙ্গে হাত মেলালো কেন? পরক্ষণেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় সরযূর কাছে। ব্রাহ্মণদের ঘরে যে মারাত্মক ঘটনাটি ঘটতে চলেছে, সেটা যে সেখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে, তার কোনো মানে নেই। ব্যাপারটা খুবই ছোঁয়াচে, জঘন্য ধরনের সংক্রামক রোগের মতো। আজ অর্জুন দোসাদদের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। কাল কায়াথদের ঘরের কোনো ছেলে যে গঞ্জু বা ধাঙড়দের একটি মেয়েকে ঘরে এনে ঢোকাবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? তাই আগে থেকে হুঁশিয়ার হওয়া ভাল। গোড়াতেই বাধা দিলে রোগটা সহজে ছড়াতে পারবে না। তাই উচ্চবর্ণের বামহন কায়াথরা হাতে হাত মিলিয়ে এখানে হানা দিয়েছে। তাই এত হল্লা, এত হইচই, এত স্লোগান।

পার্বতী ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'বহীনজি, কোনো গোলমাল হবে না তো?'

সরযূ এক পলক পার্বতীকে দেখেই দ্রুত ঘুরে কমলার দিকে তাকান। কমলার মুখ আশঙ্কায় ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছে। গলগল করে ঘামতে শুরু করেছে সে।

ভেতরে ভেতরে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন সরযূ। কিন্তু পার্বতী এবং কমলাকে তা বুঝতে দিলেন না। তাদের ভরসা দেবার জন্য বললেন, 'ওই হল্লাটল্লা ছাড়া আর কিছু করতে ওরা সাহস পাবে না। ভয় নেই।'

পার্বতী বা কমলা উত্তর দিল না। সরযূ সাহস দিলেও কমলা কিন্তু আদৌ নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তার বুকের ভেতরটা এত ধকধক করছে যে সেই শব্দ যেন কানেও শুনতে পাচ্ছে।

ভয়ার্ত চোখে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কমলার চোখে পড়ল, ঝাঁকে ঝাঁকে আরো অজস্র লোকজন এগিয়ে আসছে। সে টের পায়, নিজের হৃৎপিণ্ডটা মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়েই একশ গুণ জোরে লাফাতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে অসহ্য ভয়ে তার বুকের ভেতরটা ফেটে চুরমার হয়ে যাবে।

তিন

এখন চারটে বেজে সতের মিনিট।

এস. ডি.ও'র বিশাল বাংলোটা এই মুহূর্তে গমগম করছে। তার কারণও রয়েছে।

কিছুক্ষণ আগে ডিস্ট্রিক্ট টাউন থেকে ডি.এম, এ.ডি.এম, এস.পি, সার্কেল অফিসার, জেলা জজ ইত্যাদি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে গেছেন। তাঁরা বাংলোর কমপাউন্ডে পা দিতে না দিতেই পাটনা থেকে মিনিস্টার, স্থানীয় এম.এল.এ, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এবং আরো কিছু বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথিকে নিয়ে

বিশাল এক কনভয় এসে হাজির হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ডজনখানেক ঝকঝকে নতুন মডেলের প্রাইভেট কার এধারে ওধারে ছড়িয়ে রয়েছে।

আগে থেকেই অর্জুন এবং কমলার কারণে বাংলোর কমপাউন্ডে একটা পুলিশ ভ্যান এবং কয়েকজন আর্মড গার্ড মজুত ছিল। এখন মন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য আর ব্রাহ্মণ ফাণ্ডামেন্টালিস্টরা যদি কোনো অপ্রীতিকর ঝঞ্ঝাট বাধায়, সেই আশঙ্কায় এস.পি আরো দু ভ্যান পুলিশ নিয়ে এসেছেন। এ ছাড়া মন্ত্রীর নিজস্ব সিকিউরিটি গার্ড তো রয়েছেই।

প্যান্ডেলের একদিকে যেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য উঁচু মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে সেখানে এখন পাশাপাশি বসে আছেন মন্ত্রী শুকদেও ঝা, এম.এল.এ মঙ্গেরিলাল। এঁরা ছাড়াও রয়েছে ডি. এম, এ. ডি. এম ইত্যাদি। মঞ্চের নিচে প্যান্ডেলের বিশাল অংশ জুড়ে যে অগুনতি চেয়ার পাতা রয়েছে সেখানেও কিছু কিছু লোকজন বসে আছে।

মন্ত্রী এসেই প্রথমে নির্দেশ দিয়েছিলেন, গেটটা যেন নমকপুরার মানুষজনের জন্য খুলে দেওয়া হয়! কেননা এই বিয়েটা আন্তরিকভাবে তাদের মেনে নেওয়ার ওপর একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ওপর থেকে কোনো কিছু চাপিয়ে দিলে তার ফলাফল শেষ পর্যন্ত ভাল হয় না।

মন্ত্রীর কথামতো লোহার গেটের বিশাল দুই পাল্লা খুলে দেওয়া হয়েছে।

স্বয়ং ডি. এম মন্ত্রী আসার পর থেকেই মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। অনবরত অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বলে যাচ্ছেন, 'সম্মানিত মন্ত্রী শ্রীশুকদেও ঝা'কা তরফসে হাম আপলোগোকা স্বাগত করতা হ্যায়। আপনারা কৃপা করে ভেতরে এসে বসুন এবং একটি মহৎ কাজে আমাদের সাহায্য করুন।'

ডি. এম মারফত মন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে কেউ কেউ ভেতরে এসে বসে পড়েছে। কেউ কেউ এসেছে নিছক কৌতূহলে। কেননা মন্ত্রী দর্শন তাদের বরাতে ক্বচিৎ ঘটে থাকে। হাইওয়ে দিয়ে দৈবাৎ বছরে এক আধ বার হুস করে তাঁদের দামি মোটর প্রচণ্ড স্পিডে বেরিয়ে যায়। গাড়ির কাচের ভেতর দিয়ে তাঁদের মুখ আবছাভাবে দেখা যেতে না যেতেই অদৃশ্য হয়।

মন্ত্রী বা ডি. এম জাতীয় মানুষেরা এদের কাছে সুদূর কল্পজগতের বাসিন্দা। তাঁদের দেখা পাওয়াটা এক বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। এখন, এই মুহূর্তে জলজ্যান্ত এক মন্ত্রী তাঁর চুস্ত-পাঞ্জাবি পরা বিপুল দেহ ঈষৎ এলিয়ে মাত্র বিশ ফুট দূরত্বে প্রকাণ্ড এক চেয়ারে বসে আছেন। ইচ্ছা করলে উঠে গিয়ে তাঁকে ছোঁয়াও যায়। তাঁর শরীরের ব্যাস এবং ওজনের ব্যাপারটা মাথায় রেখে চন্দ্রকান্ত ডেকরেটরকে দিয়ে ওই স্পেশাল চেয়ারটা আনিয়েছেন।

ভেতরে যারা এসেছেন তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। বাইরেই বেশির ভাগ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখমুখের ভঙ্গি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং হিংস্র। তবে দুপুর থেকে গলার শির ছিঁড়ে তারা যে চিৎকার করছিল, মন্ত্রী আসার পর সেটা আপাতত বন্ধ আছে। কিন্তু আবহাওয়া রীতিমত থমথমে। যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে।

ডি. এম এক নাগাড়ে নামতা পড়ার সুরে বলে যাচ্ছেন, 'আইয়ে আইয়ে, কৃপা করকে অন্দর আইয়ে—'

কিন্তু নতুন করে কেউ আর ভেতরে ঢুকছে না।

এদিকে মন্ত্রীরা আসার পর চন্দ্রকান্তর এক মুহূর্ত দাঁড়াবার সময় নেই। এতগুলি ভি. আই. পি'র কাছে তিনি অবিরাম ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছেন। কারুর যেন এতটুকু অসুবিধা না হয়। যদিও এই বিয়েটা তাঁর একার দায় নয়, মন্ত্রী থেকে প্রতিটি সরকারি কর্মচারীর, তবু তিনিই সব চাইতে বেশি করে জড়িয়ে গেছেন। তিনি একই সঙ্গে কন্যাকর্তা এবং বরকর্তা। এ বিয়ের ভালমন্দ সব কিছু দায়িত্ব যেন তাঁরই।

মন্ত্রী শুকদেও ঝা হাতের ইশারায় চন্দ্রকান্তকে কাছে ডেকে বললেন, 'আর দেরি করে কী হবে, অনুষ্ঠানটা শুরু করে দিন।'

'হাঁ স্যার।' শশব্যস্তে তৎক্ষণাৎ সায় দেন চন্দ্রকান্ত।

'বিয়েটা এই মঞ্চেই হবে তো?'

'হাঁ স্যার।'

'দুলহা দুলহন কোথায়?'

'আমাদের বাংলোতেই আছে।'

'তাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন।'

মঞ্চ থেকে নেমে চন্দ্রকান্ত সোজা বাংলোর ভেতর চলে আসেন। অর্জুন এবং কমলা তাদের ঘরেই ছিল। কমলার কাছে ছিলেন সরযূ এবং পার্বতী। অর্জুন অবশ্য একাই রয়েছে।

চন্দ্রকান্ত প্রথমে কমলার ঘরে আসেন। সরযূকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা রেডি?'

সরযূ বললেন, 'হ্যাঁ। অনেকক্ষণ কনে সাজিয়ে বসে আছি।'

'এবার ওদের নিয়ে যেতে হবে। মিনিস্টার তাড়াতাড়ি যেতে বলছেন। দানের জিনিসপত্রগুলোও নিয়ে চল।'

অর্থাৎ যে সব নতুন শাড়ি গয়না স্যুটকেস নানা জায়গা থেকে পাওয়া গেছে সেগুলো মঞ্চে নিয়ে যেতে হবে।

একটু অবাক হয়ে সরযূ প্রশ্ন করেন, 'ওগুলো দিয়ে কী হবে? পরে যখন কমলা শ্বশুরবাড়ি যাবে তখন সঙ্গে দিয়ে দেব।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'আরে বাপু, নিজেও তো একটা বিয়ে করেছিলে। সেটা কি ভুলে গেলে?'

'মানে?'

'বিয়ের আসরে দানের জিনিসপত্র সাজিয়ে দিতে হয় না?'

সরযূর সব মনে পড়ে যায়। ব্যস্তভাবে তিনি বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ, তাই তো।'

'তুমি কাউকে দিয়ে শাড়ি জামাগুলো প্যান্ডেলে পাঠিয়ে দাও। আমি অর্জুনকে নিয়ে আসছি। তারপর একসঙ্গে সবাই বিয়ের আসরে যাব।' বলে আর দাঁড়ান না চন্দ্রকান্ত, সোজা অর্জুনের ঘরে চলে যান।

মিনিট পনের পর দেখা যায় সরযূ এবং চন্দ্রকান্ত অর্জুনদের সঙ্গে করে নিচের শামিয়ানায় চলে এসেছেন। তাদের পেছন পেছন জামাকাপড়, বাসনকোসন এবং প্রসাধনের জিনিসগুলি নিয়ে এসেছে ভরত, পার্বতী এবং এস. ডি. ও বাংলোর অন্য আর্দালি এবং শোফারদের বৌরা। জিনিসগুলো একটা বড় টেবলে সাজিয়ে দিয়ে পার্বতীরা চলে যায়।

অর্জুন এবং কমলার সঙ্গে প্রথমে মন্ত্রী শুকদেও ঝা'র পরিচয় করিয়ে দেন চন্দ্রকান্ত।

শুকদেও সস্নেহে এবং সহাস্যে বলেন, 'কনগ্রাচুলেসনস। সদা সুখী রহো।'

চন্দ্রকান্তর ইশারায় শুকদেওকে প্রণাম করার জন্য অর্জুন এবং কমলা যখন ঝুঁকে পড়ে, তৎক্ষণাৎ দু'জনকে ধরে ফেলেন তিনি, 'পায়ে ধুলো-ময়লা রয়েছে, হাত দিতে হবে না। রামচন্দ্রজি তোমাদের ভাল করুন।'

এরপর একে একে প্রতিটি গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে অর্জুনদের আলাপ করিয়ে দেন চন্দ্রকান্ত। সবাই তাদের অভিনন্দন এবং আশীর্বাদ জানান। কামনা করেন দু'জনের দাম্পত্য জীবন যেন আমৃত্যু অটুট থাকে, সুখে এবং মাধুর্যে পূর্ণ হয়।

আলাপ-টালাপের পর দুলহা এবং দুলহনের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে অর্জুনদের বসানো হয়।

শুকদেও স্থানীয় এম.এল.এ মঙ্গেরিলালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'এবার তা হ'লে শুরু করা যাক।'

তৎক্ষণাৎ সায় দেন মঙ্গেরিলাল, 'হাঁ হাঁ, অবশ্যই।'

'ডি. এম সাহেবের আপিলে বিশেষ কাজ হচ্ছে না। আপনি অ্যাসেম্বলিতে লোকাল পিপলের রিপ্রেজেন্টেটিভ। মাইকের সামনে গিয়ে বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের দয়া করে অনুরোধ করুন, যেন ভেতরে চলে আসে। এ এমন একটা বিয়ে যাতে সব মানুষের পার্টিসিপেসন হলে ভাল হয়।'

'নিশ্চয়ই। আমি বলছি স্যার।'

মন্ত্রীর কথা ডি. এম শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি মাইকের সামনে থেকে সরে গিয়ে সসম্ভ্রমে এম. এল. এ'কে বলেন, 'আসুন স্যার—'

বিকেল ফুরিয়ে আসছে কিন্তু এখনও রোদে বেশ ধার। হাওয়া থেকে তাপ জুড়িয়ে যায়নি। সামনের রাস্তায় উলটোপালটা বাতাসে প্রচুর ধুলো উড়ছে।

মঙ্গেরিলাল মাইকের স্ট্যান্ডটা ধরে গাঢ় গলায় শুরু করেন, 'ভাই সব, সম্মানিত মন্ত্রী শুকদেও ঝা'জি আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছেন, কৃপা করে সকলে ভেতরে আসুন। এখনই শ্রীমান অর্জুন আর শ্রীমতী কমলার শুভবিবাহের কাজ শুরু হবে। আপনাদের আশীর্বাদ ছাড়া এ বিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে না।'

গেটের বাইরের একটি লোকও তাঁর কথা শুনছে বলে মনে হয় না। জ্বলন্ত চোখে তারা পলকহীন তাকিয়ে থাকে।

মঙ্গেরিলাল শুকদেওর কানের কাছে ঝুঁকে চাপা গলায় বলেন, 'কেউ ভেতরে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। ওদের চোখ মুখ লক্ষ করেছেন?'

'এখানে আসার পর থেকেই করছি। ভয়ঙ্কর হোস্টাইল।'

'হাঁ স্যার। ওদের মতলব বুঝতে পারছি না।'

শুকদেও মজা করে হাসলেন, 'না বোঝার কিছু নেই। নিশ্চয়ই ওরা খুশিতে ডগমগ হয়ে এখানে আসেনি। আমি যা খবর পেয়েছি তাতে লোকগুলো খুব সম্ভব গোলমাল পাকাতে পারে। সে যাক, আপনি আরেক বার জানিয়ে দিন বিয়ের কাজ এখনই শুরু হচ্ছে।' ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার কাগজপত্র রেডি তো?'

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বিনোদানন্দ সহায় ডান দিকে খানিকটা দূরে একটা চেয়ারে বসে আছেন। রোগা ক্ষয়াটে চেহারা। বয়স ষাট বাষট্টি। লম্বা বোতলের মতো মুখ, ভাঙা গাল। পরনে ঢলঢলে স্যুট। গলা থেকে নেক-টাই ঝুলছে। পায়ে ব্রাউন রঙের চকচকে শু।

বিনোদানন্দ দ্রুত ঢাউস একটা ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বার করে সামনের টেবলে গোছগাছ করে রাখতে রাখতে বলেন, 'হাঁ স্যার, আমি রেডি। কারা এ বিয়ের সাক্ষী থাকবেন?'

শুকদেও বলেন, 'আমি থাকব, এম.এল.এ মঙ্গেরিলালজি থাকবেন, আর থাকবেন এখানকার এস.ডি.ও চন্দ্রকান্ত উপাধ্যায়।'

বিনোদানন্দ সবিনয়ে জানান, 'তিন জনের ঠিকানা দরকার।'

মন্ত্রী, এম.এল.এ এবং এস.ডি.ও—তিনজনই তাঁদের ঠিকানা জানিয়ে দেন। বড় মোটা একটা খাতায় সাক্ষীর নামধাম দ্রুত টুকে নেন বিনোদানন্দ। তারপর ছাপানো ফর্মে কী সব লিখতে থাকেন।

অর্জুন এবং কমলার নামে তাদের নাম-ঠিকানা এবং দু'জনের বাবা-মা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আগেই পাটনায় বিয়ের নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কাজেই তাদের ব্যাপারে আর কিছু জানতে চান না বিনোদানন্দ।

এদিকে মঙ্গেরিলাল আবার মাইকের সামনে গিয়ে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে জানান, 'বিয়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে। কেউ যেন আর বাইরে দাঁড়িয়ে না থাকেন, ভেতরে এসে এই মহান ঘটনার সাক্ষী হন।'

এবারও কোনোরকম প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ এবং কায়াথেরা আগের মতোই গেটের বাইরে অনড় দাঁড়িয়ে থাকে।

অগত্যা শুকদেও ঝা'কে এগিয়ে আসতে হয়। মঙ্গেরিলাল মাইকের সামনে থেকে সরে এসে নিজের চেয়ারে বসে পড়েন।

মন্ত্রী শুকদেও ঝা'র বক্তা হিসেবে গোটা বিহার জুড়ে বিপুল খ্যাতি। একবার মাইক ধরলে তিনি আর ছাড়তে চান না। কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় অ্যানুয়াল সোশালে নাটক-টাটক করার প্রচণ্ড শখ ছিল। সেই নাট্যপ্রতিভাকে তিনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ার সময় কাজে লাগিয়ে

থাকেন। কণ্ঠস্বর উঠিয়ে নামিয়ে এবং আবেগ নামক বস্তুটিকে নানা অনুপাতে গলায় মিশিয়ে এমনভাবে অনর্গল বলে যান, যাতে শ্রোতারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে যায়।

শুকদেও ঝা গলার স্বর খাদে নামিয়ে, সামান্য কাঁপিয়ে এভাবে শুরু করেন। 'ভাই সব, ভারতবর্ষ আজ সব দিক থেকেই বিপন্ন। ঘরে বাইরে তার অনেক শত্রু। বাইরে থেকে কারা শত্রুতাচরণ করছে তা আপনারা সবাই জানেন। এই বিয়ের আসরে, এই আনন্দের মুহূর্তে সে প্রসঙ্গ টেনে আনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের একটা বিরাট বিপদ, কোনো কোনো সামাজিক প্রথা।

'আমরা চারদিকে দেখতে পাই মাঝে মাঝেই প্রাদেশিকতা আর মৌলবাদী সাম্প্রদায়িকতার শক্তিগুলো মাথা চাড়া দিচ্ছে। মানুষে মানুষে বিভেদ এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তবে মানুষের শুভ বুদ্ধির ওপর এখনও আমার আস্থা আছে। এই সব অশুভ শক্তিকে সাধারণ মানুষই একদিন ধ্বংস করে দেবে।

'শুধু প্রাদেশিকতা আর সাম্প্রদায়িকতাই নয়, হিন্দু সমাজে জাতপাতের সওয়ালটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। বামহন কায়াথ হরিজন অচ্ছুৎ—এইভাবে যদি নিজেদের ভাগ করে রাখি, ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে আবহমান কালের এই মহান দেশ।

'আজ আমরা যে কারণে এখানে এসেছি সেটা হল শ্রীমান অর্জুন এবং শ্রীমতী কমলার শুভবিবাহ। আপনারা সকলেই জানেন অর্জুন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে আর কমলা হরিজন মা-বাপের সন্তান। দু'জনে জাতপাতের দীবার ভেঙে যে মিলিত হতে চলেছে সেটা এই নমকপুরা টাউনে একটা মহান ঐতিহাসিক ঘটনা। এমন ঘটনা এই শহরে কেন, সারা বিহারেই আর ঘটেছে কিনা আমার অন্তত জানা নেই।

'এ জাতীয় বিয়ে একটা বিরাট শুভ লক্ষণ। এমন শাদি যত হয় দেশের পক্ষে তত মঙ্গল, জাতীয় সংহতির ভিত তত মজবুত হবে। জাতপাত আর ছুঁয়াছুতের বেড়া আমরা যত ভাঙতে পারব, মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ভেদাভেদ ততই কেটে যাবে। এই বিশাল দেশ, মহান জাতি তা হলে বাঁচবে। এর প্রতিক্রিয়া হবে বহুদূর পর্যন্ত।

'আপনারা অভিমান, জাতপাতের দম্ভ, সমস্কার নিয়ে দূরে সরে থাকবেন না। যারা চিরকাল আপনাদের কাছাকাছি রয়েছে তাদের আরো কাছে টেনে নিন। সব বাউন্ডারি ভেঙেচুরে অখণ্ড ভারতীয় নেশন আর সোসাইটি গড়ে তুলুন। নইলে দেশ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কায়াথ হরিজন, এমনই ছোট ছোট কামরায় ভাগ হয়ে যাবে। সেটা হবে পুরোপুরি খুদখুসির (আত্মহত্যা) সামিল।

'অর্জুন আর কমলা যে মহান ঐতিহাসিক নজির তৈরি করতে যাচ্ছে, আসুন আমরা তাকে স্বাগত জানাই।'

বক্তৃতা দিতে দিতে ভেতরে ভেতরে বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করছিলেন শুকদেও ঝা। যেমনটি আশা করেছেন, হুবহু সেইভাবেই স্রোতের মতো উপযুক্ত এবং জরুরি শব্দগুলি পর পর বেরিয়ে আসছিল।

তাঁর বক্তৃতা যে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে, এমনকি বিরুদ্ধ পক্ষের মানুষেরা পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনে মনে তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়ে—এ বিষয়ে শুকদেও-এর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। বিহারে ভোট ক্যাচার হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম। জমায়েতে মানুষ টানার ম্যাজিকটি তাঁর হাতের মুঠোয়। এ ব্যাপারে তাঁর নিজেরও প্রবল আত্মবিশ্বাস।

বক্তৃতার পর দীর্ঘকালের অভ্যাস অনুযায়ী শুকদেও যখন অজস্র হাততালি প্রত্যাশা করছেন, সেই সময় গেটের বাইরে থেকে একটা প্রচণ্ড চিৎকার শোনা যায়, 'বন্ধ্ কর ইয়ে শাদি, বন্ধ কর ইয়ে বকোয়াস।'

তারপরেই দেখা যায় একটা মাঝবয়সী লোক গেট পেরিয়ে উন্মাদের মতো মঞ্চের দিকে দৌড়ে আসছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের থমথমে আবহাওয়াটাকে চুরমার করে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে ব্রাহ্মণ এবং কায়াথরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'বন্ধ্ কর ইয়ে শাদি।'

'বন্ধ্ কর, বন্ধ্ কর।'

গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে অন্য লোকগুলোও আগের প্রৌঢ়টির পেছন পেছন ছুটে আসছে। সব মিলিয়ে ক্রুদ্ধ জনতার একটি ঢল যেন।

নিজের প্রতি আস্থা মুহূর্তের জন্য টলে যায় শুকদেও-এর। তিনি বুঝতে পারেন, এমন জমকাল বক্তৃতায় এতটুকু কাজ হয়নি। ব্রাহ্মণ কায়াথদের ক্ষোভ, ক্রোধ এবং বিদ্বেষ অটুট রয়েছে। হাজার বছরের সংস্কার কি দশ মিনিটের বক্তৃতায় মুছে দেওয়া যায়?

এই যে পাটনা থেকে একটি তুচ্ছ বিয়ের ব্যাপারে শুকদেও এতদূর ছুটে এসেছেন, এর পেছনে রয়েছে তাঁর সুদূরপ্রসারী এক পরিকল্পনা। দু'বছর পর বিধানমণ্ডলের যে চুনাও আসছে তাতে নমকপুরা কেন্দ্র থেকে শুকদেও-এর কনটেস্ট করার ইচ্ছা। এই শহরে হরিজন ভোট রয়েছে শতকরা তিরিশ বত্রিশ ভাগ। তাঁর ধারণা ছিল, সামনে দাঁড়িয়ে অর্জুনদের বিয়ে দিতে পারলে অচ্ছুৎদের ভোট তিনি পুরোটাই পেয়ে যাবেন। তার ওপর বামহন কায়াথদের ভোট আর কিছু টানতে পারলে তাঁর জয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষগুলোর প্রচণ্ড রাগের যা নমুনা দেখা গেল তাতে তাদের একটি ভোটও তাঁর পক্ষে পড়বে কিনা, সে সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তা ছাড়া অচ্ছুৎটোলি থেকে একজনও এখানে আসেনি। সেটা খুব সম্ভব বামহন-কায়াথদের ভয়ে। এই ভয়টা যদি চুনাও পর্যন্ত স্থায়ী হয় তা হলে এ শহর থেকে জিতে বেরিয়ে আসার এতটুকু সম্ভাবনা নেই। যেচে কে আর নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে চায়! পরের নির্বাচনে এখান থেকে দাঁড়াবার আগে দশ বার ভাবতে হবে শুকদেওকে।

প্রথমটা কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না শুকদেও। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে উত্তেজিত ক্ষিপ্ত মানুষগুলোকে লক্ষ করতে লাগলেন।

এদিকে এস.পি, ডি. এম, এ. ডি. এম থেকে শুরু করে মঞ্চের সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছেন। এস. পি কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠলেন, 'রুখ যাও, রুখ যাও। এক কদম মাত্ বড়াও—'

তাঁর হুকুম কেউ কানে তুলল না, হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো যেমন ছুটে আসছিল তেমনি আসতে লাগল। এখানে মন্ত্রী এবং অন্যান্য সকলের নিরাপত্তার যাবতীয় দায়িত্ব এস.পি'র। ওই লোকগুলো যেভাবে খেপে উঠেছে তাতে হঠকারিতার বশে হঠাৎ কী করে বসবে, বোঝা যাচ্ছে না। সামনের দিকে দু পা এগিয়ে আর্মড গার্ডদের উদ্দেশে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, 'হটা দো এ আদমীলোগকো—'

পুলিশ বাহিনী রাইফেল উঁচিয়ে লোকগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, তার আগেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন শুকদেও। রাজনীতি করে করে তাঁর হাড় পেকে গেছে। বামহন-কায়াথদের গায়ে হাত ওঠালে তার ফলাফল হবে মারাত্মক। না, দু'বছর পরের সাধারণ নির্বাচনের কথা ভাবছেন না শুকদেও। এই মুহূর্তে যে বিয়েটি তিনি দিতে যাচ্ছেন সেটা অবশ্য পণ্ড হবে না, পুলিশ পাহারায় কোনোরকমে তা চুকিয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু বিয়ের পর তাঁরা তো এখান থেকে চলে যাবেন, তারপর অর্জুন আর কমলার হাল কী দাঁড়াবে? পুলিশ দিয়ে কি সব সমস্যার সমাধান হয়?'

শুকদেও একটা হাত তুলে পুলিশদের থামিয়ে দেন। তারপর হাতজোড় করে আবেদনের ভঙ্গিতে বলেন, 'শান্ত হো যাইয়ে, শান্ত হো যাইয়ে। আপনাদের যা বলার আস্তে আস্তে বলুন। এত হই চই করলে কাজের কাজ কিছু হয় না।' একটু থেমে লোকগুলোকে ভাল করে লক্ষ করতে করতে আবার শুরু করেন, 'কৃপা করে আপনারা বসুন।'

শুকদেও এমনিতে খুবই বিচক্ষণ। তাঁর ধীর স্থির চেহারায় এবং মার্জিত কণ্ঠস্বরে এমন একটি ব্যক্তিত্ব রয়েছে যাতে এবার খানিকটা কাজ হয়। লোকগুলো মঞ্চের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তবে বসে না। তাদের চোখেমুখে এখনও প্রবল উত্তেজনা।

শুকদেও হাতজোড় করেই আছেন। স্নিগ্ধ হেসে বলেন, 'বসুন না। বসে বসে কথা হোক।'

লোকগুলো এবারও বসে না।

শুকদেও বুঝতে পারেন, তাঁরা 'ক্যারিসমা' এই লোকগুলোকে পুরোপুরি টলাতে পারেনি। তবু সবটুকু আশা বা আত্মবিশ্বাস একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। তাঁর ধারণা এরা যদি একটু শান্ত হয়ে বসে,

শেষ পর্যন্ত এদের দিয়ে অর্জুনদের বিয়েটা মানিয়ে নিতে পারবেন।

শুকদেও হেসে হেসে বলেন, 'বসে কথা বললে ভাল হত। যাই হোক, কী বলতে চান বলুন—'

সেই প্রৌঢ় লোকটা—যার বয়স পঞ্চান্ন ছাপান্ন, গোলগাল ভারি চেহারা, কাঁচাপাকা চুলে কদমছাঁট, গালে কয়েক দিনের না-কামানো দাড়ি, পরনে খাটো ধুতি এবং মোটা লং-ক্লথের পাঞ্জাবি, মাথার পেছনে একগোছা মোটা টিকি, পায়ে তালিমারা চপ্পল—আরো একটু এগিয়ে এসে জোড়হাতে অত্যন্ত অনুনয়ের সুরে বলেন, 'মিনিস্টারজি, আপনি আমাদের রক্ষা (রক্ষা) করুন।' তার হয়ত খেয়াল নেই কিছুক্ষণ আগে শুকদেও ঝা'ই অসবর্ণ বিয়ের পক্ষে সওয়াল করে ঝাড়া দশ মিনিট নাটকীয় ভঙ্গিতে বক্তৃতা দিয়েছেন।

যে লোকটা কিছুক্ষণ আগে প্রচণ্ড রাগে উন্মত্তের মতো ছুটে এসেছিল, মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সব কিছু ভেঙেচুরে ধ্বংস করে ফেলবে, হঠাৎ তাকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে রীতিমত হতভম্ব হয়ে যান শুকদেও। বলেন, 'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'এস. ডি. ও সাহেব আমার জাত মারতে চেষ্টা করছেন। আপনি না বাঁচালে আমাদের নরকে যেতে হবে।'

চন্দ্রকান্ত খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দ্রুত শুকদেও-এর কাছে এসে তাঁর কানে চাপা নিচু গলায় বলেন, 'স্যার, ইনি রামঅবতার চৌবে, অর্জুনের পিতাজি।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা শুকদেও-এর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি সাগ্রহে এবং আন্তরিকভাবে বলেন, 'আপনি অর্জুনের পিতাজি—এই অনুষ্ঠানের সব চাইতে সম্মানিত অতিথি। আসুন, মঞ্চে চলে আসুন—' বলে সসম্ভ্রমে মঞ্চে ওঠার সিঁড়ি দেখিয়ে দেন।

রামঅবতারের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল ঘাড়ে-গর্দানে-ঠাসা বিপুল চেহারার একটা আধবুড়ো লোক। তার পরনেও ধুতি এবং বুক-খোলা আধময়লা একটা ফতুয়া। বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি মোটা পৈতার গোছা। ভারিক্কি গমগমে গলা যতটা সম্ভব মোলায়েম করে বলে, 'মাফ কীজিয়ে মিনিস্টারজি। রামঅবতার মঞ্চে যাবে না।'

শুকদেও-এর মতো ঝানু পার্লামেন্টারিয়ানের মুখেও কয়েক সেকেন্ড কথা যোগায় না। তারপর একসময় জিজ্ঞেস করেন, 'আপ?'

লোকটা বলে, 'আমাকে চিনবেন না, বহুত ছোটে আদমী। নৌকরের নাম মান্ধাতা শর্মা।'

চন্দ্রকান্ত শুকদেও-এর কানে আগের মতোই ফিসফিসিয়ে জানান, মান্ধাতা শর্মা নমকপুরা মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিশনার।

শুকদেও মান্ধাতার উদ্দেশে বলেন, 'রামঅবতারজি মঞ্চে আসবেন না কেন? ছেলের শাদিতে বাপ না থাকলে চলে!'

'এর নাম শাদি!' ঘৃণায় নাকমুখ কুঁচকে যায় মান্ধাতার।

এদিকে রামঅবতার অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'নেমে আয় ওখান থেকে। আভ্‌ভি—' চাপা ক্রোধে তার গলা রি রি করতে থাকে। এখানে প্রবল প্রতাপান্বিত একজন মন্ত্রী, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, এস.পি বা এস.ডি.ও'র মতো ব্যক্তিরা যে রয়েছেন, এবং ওঁদের সামনে তার মতো তুচ্ছ একটি মানুষের যে এভাবে গলা চড়িয়ে কথা বলা উচিত নয়, সে সব খেয়াল থাকে না রামঅবতারের।

শুকদেও হকচকিয়ে যান। পরক্ষণেই নিজের অজান্তে তাঁর চোখ চলে যায় অর্জুন এবং কমলার দিকে। দু'জনের মুখ ভয়ে আতঙ্কে রক্তশূন্য। তারা ঘাড় নিচু করে বসে আছে। পারলে মাটিতে মিশে যেত যেন।

কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর শুকদেও রামঅবতারকে একটু লক্ষ করেন। তারপরই তাঁর দুই চোখ এসে স্থির হয় মান্ধাতার মুখের ওপর। শুকদেও-এর স্নায়ুগুলো আবছাভাবে টের পাচ্ছে, যদিও রামঅবতার ছেলের বংশধারাবিরোধী বিবেকহীন কাজের জন্য উত্তেজিত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে আছে, আসল নেতৃত্বটা মান্ধাতারই হাতে। খুব সম্ভব নমকপুরা টাউনের তাবৎ উচ্চবর্ণের মানুষজনকে জুটিয়ে সে প্রোটেস্ট জানাতে এসেছে।

শুকদেও-এর ধৈর্য অপরিসীম। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় নাটক করার কৌশলটাকে তিনি সময়মতো সঠিক কাজে লাগাতে জানেন। মধুর একটি হাসি ঠোঁটের কোণে ধরে রেখে, আগের কথার খেই ধরে বলেন, 'এটা শাদি নয় কেন?'

তীব্র গলার মান্ধাতা বলে, 'ব্রাহ্মণের জাত মারাটাকে আপনি শাদি বলেন?'

এভাবে তাঁর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ কথা বলতে পারে, মন্ত্রী হওয়ার পর এমন অভিজ্ঞতা আর কখনও হয়নি শুকদেও-এর। ইচ্ছা করছিল, লোকটার গালে একটা চড় কষিয়ে দেন। কিন্তু সেই বিরল নাটকীয় কৌশলটা ভেতরে ভেতরে কাজ করতে থাকে। ঠোঁট থেকে হাসিটাকে তিনি বিচ্ছিন্ন হতে দেন না। অবিচল মধুর গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা কি অচ্ছুৎদের মানুষ মনে করেন না মান্ধাতাজি?'

'আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারছি। লেকেন স্যার, আপনারা বোধহয় হিন্দু-মুসলমান ব্রাহ্মণ-অচ্ছুৎ-ছত্রিয় সব বিলকুল বরাবর করে দিতে চাইছেন?'

হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দেন শুকদেও। বিয়ের এই আসরটাকে ইউনিভার্সিটির ডিবেট ক্লাস কিংবা বিধানমণ্ডলের উত্তপ্ত সভা বলে মনে হচ্ছে। ভেতরে ভেতরে একটু মজাই অনুভব করেন তিনি। বলেন, 'আমাদের সংবিধান কিন্তু সেইরকমই চাইছে।'

ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে মান্ধাতার মতো নমকপুরার এক নগণ্য মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'সচমুচ?'

'আমার ঝুট বলে ফায়দা আছে?'

'বামহন-কায়াথ-চামার-গাঙ্গোতা-ধাঙড়, সব কোঈ বরাবর?'

'সব কোঈ বরাবর। প্রত্যেকের সমান অধিকার, ইকোয়েল রাইটস। দ্যাখেন না চুনাও-এর সময় ব্রাহ্মণের ভোটের যে দাম, তাতমা কি দোসাদের ভোটেরও সেই একই কীম্মৎ। ডান হাতের তিন আঙুলে মুদ্রা ফুটিয়ে বলেন, 'এক পাইসা কমতি নেহী।'

কথাটা যে শতকরা একশভাগ ঠিক, মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে কনটেস্ট করে মান্ধাতা সেটা ভাল করেই জানে। বলে, 'চুনাওতে যা হওয়ার হোক, তাই বলে অচ্ছুতের মেয়েকে পুতহু করে ঘরে তুলতে হবে? ইয়ে ভ্রষ্টাচার।'

'ভ্রষ্টাচার!'

'হাঁ হাঁ, জরুর ভ্রষ্টাচার।' রামঅবতার এবং মান্ধাতার পেছনে যারা এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, এবার তারা গলা মিলিয়ে চিৎকার করে ওঠে।

হাসিটা বেশিক্ষণ অম্লান রাখা যায় না। ক্ষোভের গলায় শুকদেও বলেন, 'আপনারা তা হলে পুরানা সম্‌স্কার ছাড়তে চান না?'

'সম্‌স্কার তো একদিনে তৈরি হয় না স্যার।' মান্ধাতা বলতে থাকে, 'হাজারো সাল ধরে বাপ, দাদা, দাদার বাপ, তার বাপ, তার বাপ—সবাই মিলে বুঁদ বুঁদসে এটা বানিয়েছে। এক কথায় আচানক সেটা ছাড়া যায়? এ বিচার ঠিক নেহী।'

শুকদেও বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'দিনকাল বদলে যাচ্ছে। সব মানুষকে যদি আমরা সম্মান না দিই, সোসাইটি বিলকুল নষ্ট হয়ে যাবে।'

'যদি হুকুম দেন, গম্ভীর বাত ছেড়ে একটা ছোট্টি কথা জিজ্ঞেস করব?'

'হাঁ হাঁ, জরুর।'

'আপনার লেড়কা লেড়কী আছে তো?'

মান্ধাতার দিক থেকে আক্রমণটা কিভাবে আসছে, সঠিক আন্দাজ করতে না পেরে সতর্ক ভঙ্গিতে শুকদেও বলেন, 'আছে। কেন?'

মান্ধাতা সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, 'ছেলের জন্যে অচ্ছুতের ঘর থেকে পুতহু আনতে পারবেন? মেয়েকে সোসাইটির ভালাই-এর নাম করে হরিজনের ঘরে পাঠাবেন?'

শুকদেও চমকে ওঠেন। অন্য ব্যাপার হলে নমকপুরার সামান্য একজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার

তাঁর মতো জবরদস্ত মন্ত্রীর কাছে এসে এভাবে চোখের দিকে তাকিয়ে তর্ক করার সাহসই পেত না। কিন্তু এখানে সমস্যাটা হচ্ছে জাতপাতের, ছুঁয়াছুতের এবং চিরাচরিত সংস্কারের। রাজনৈতিক জটিলতা দেখা দিলে ধমকে, ভয় দেখিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু সমস্যাটা যেখানে সামাজিক স্তরে সেখানে জোর খাটানো, ভয় দেখানো একেবারেই অসম্ভব। এই সব প্রশ্নে মান্ধাতার মতো ফান্ডামেন্টালিস্টরা আদৌ আপস করে না। সামাজিক লেভেলে কোথাও একটু পরিবর্তন দেখা দিলে কিংবা পুরনো অভ্যাস, ধ্যানধারণা এবং সংস্কারের গায়ে এতটুকু আঁচড় পড়লে এরা একেবারে মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়ায়। এইসব ব্যাপারে তারা ভয়ঙ্কর বেপরোয়া আর একরোখা।

মান্ধাতা যে প্রশ্নটা করেছে তার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না শুকদেও। প্রথমটা তিনি হকচকিয়ে যান। কিন্তু ব্যক্তিগত আক্রমণ করে একজন ঝানু রাজনৈতিক নেতা এবং পার্লামেন্টারিয়ানকে কতক্ষণ আর কাবু করে রাখা যায়? শুকদেও বলেন, 'সেরকম কোনো ঘটনার সম্ভাবনা এখনও তো দেখতে পাচ্ছি না।'

মান্ধাতা নাছোড়বান্দা জেদে বলে যায়, 'যদি সেরকম হয় কী করবেন?'

নিজের মনের দিকে চোখ না ফিরিয়ে শুকদেও বলেন, 'যদি তেমন কিছু হয়, মেনে নিতে হবে। তবে—' এই পর্যন্ত বলে তিনি হঠাৎ থেমে যান।

'তবে কী?'

'এসব বিয়েতে ছেলে বা মেয়ের বাপ-মা তো আগ বাড়িয়ে সম্বন্ধ করতে যায় না। ছেলেমেয়েরাই বিয়ে ঠিক করে, যেমন অর্জুন আর কমলা করেছে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর শুকদেও আবার বলেন, 'অনেকটা সময় গেল। এবার তা হলে আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে বিয়ের কাজটা শেষ করে ফেলা যাক।'

'নেহী।' মান্ধাতা বলে, 'নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে একজন শুধ্ ব্রাহ্মণের জাত নষ্ট করবেন না স্যার।'

শুকদেও বলেন, 'জাত নষ্ট হবে না, বরং ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব এতে বাড়বে। এ বিয়ে বন্ধ করা যাবে না।'

ক্রুদ্ধ চোখে শুকদেওকে এক পলক দেখে মান্ধাতা রামঅবতারকে বলে, 'চল। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাপকর্মের সাক্ষী হতে পারব না। দেখব, অর্জুন অচ্ছুতিয়ার মেয়েকে নিয়ে কী করে নমকপুরায় ঘর করে?'

আচমকা মাথায় প্রবল রক্তচাপ অনুভব করেন শুকদেও। এতক্ষণের সহিষ্ণুতা শেষ বিপজ্জনক সীমাটি পার হয়ে যায়। তিনি গম্ভীর থমথমে গলায় বলেন, 'একটু দাঁড়ান।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন একটা কর্তৃত্বের সুর রয়েছে যাতে পা বাড়াতে গিয়েও রামঅবতার মান্ধাতা এবং অন্য সবাই থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

শুকদেও আগের সুরেই বলে যান, 'একটা কথা সবাইকে জানিয়ে রাখছি, অর্জুন আর কমলার যদি কোনো ক্ষতি হয়, তার ফল অনেক দূর গড়াবে। সরকার থেকে ওদের ওপর যে কোনো হামলার মোকাবিলা করা হবে। আমি এস. ডি. ও'কে সব বলে দিয়ে যাচ্ছি। ইয়ে হুঁশিয়ারি ইয়াদ রাখনা চাহিয়ে।'

মান্ধাতা বা অন্য কেউ উত্তর দেয় না। হিংস্র চোখে একবার শুকদেওকে দেখে আস্তে আস্তে গেটের দিকে এগিয়ে যায়।

রামঅবতারও তাদের সঙ্গে চলে যাচ্ছিল, শুকদেও পেছন থেকে ডাকেন, 'রামঅবতারজি, আপনি যাবেন না। আপনার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে।'

রামঅবতার রীতিমত ঘাবড়ে যায়। মন্ত্রীকে চটানো যায় না, আবার মান্ধাতারা অসন্তুষ্ট হলেও বিপদের কথা। কেননা মান্ধাতাদের সঙ্গে তাকে আমৃত্যু এই শহরে থাকতে হবে।

দ্বিধান্বিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে রামঅবতার। ভয়ে ভয়ে একবার মন্ত্রীর দিকে তাকায়, একবার মান্ধাতার দিকে।

মান্ধাতার হয়ত কিঞ্চিৎ করুণাই হয়। সে বলে, 'রামঅবতার, তুমি মন্ত্রীজির সঙ্গে কথা বলে এস।

আমরা যাচ্ছি।' বলেই সে এবং তার সঙ্গীরা চলে যায়। আগে যারা এসে শামিয়ানার তলায় বসে ছিল, তারাও মান্ধাতাদের পেছন পেছন গেট পেরিয়ে রাস্তার বাঁকে উধাও হয়।

মন্ত্রী, কিছু সরকারি কর্মচারী, জনকয়েক আর্মড গার্ড, এস.ডি.ও'র কিছু আর্দালি, ড্রাইভার এবং তাদের ঘরবালীরা ছাড়া শামিয়ানার তলায় এখন আর কেউ নেই।

শুকদেও পরম সমাদরে রামঅবতারকে মঞ্চে ডেকে নেন। প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ওপরে উঠে আসতে হয়। শুকদেও তার হাত ধরে নিজের পাশের চেয়ারটিতে বসিয়ে দেন।

ভয়ে উৎকণ্ঠায় রামঅবতারকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে। সে শুকনো গলায় বলে, 'বহুত বিপদে পড়ে গেলাম মিনিস্টারজি?'

শুকদেও প্রশান্ত মুখে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন, কী হল?'

'ওরা চলে গেল। আপনি আমাকে রুখে দিলেন। পরে ওরা ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে আমার জীওন বরবাদ করে দেবে।' বলতে বলতে রামঅবতারের বুকের ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। দেখে মনে হয়, দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে সে একেবারে ভেঙেচুরে যাচ্ছে।

রামঅবতারের দুর্ভাবনা এবং শঙ্কার কারণ যে মান্ধাতা এবং এই শহরের উচ্চবর্ণের লোকজন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না শুকদেও-এর। তিনি তার কাঁধে একটা হাত রেখে কোমল গলায় বলেন, 'দেশ থেকে আইন-কানুন-থানা-পুলিশ-আদালত—এসব উঠে যায়নি রামঅবতারজি। চিন্তা নেহী করনা—'

'আমি প্রাণের ভয় করছি না।'

'তা হলে?'

রামঅবতার জানায়, দোসাদদের মেয়েকে পুতহু করে ঘরে তুললে ব্রাহ্মণ সমাজে তারা বিলকুল পতিত হয়ে যাবে। মান্ধাতারা তাকে নিশ্চয়ই অচ্ছুৎ বানিয়ে ছাড়বে।

শুকদেও চমকে ওঠেন। এ ধরনের বিপজ্জনক সম্ভাবনার কথা তিনি আগে ভেবে দেখেন নি। আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে বলেন, 'প্রথম প্রথম থোড়াকুছ গোলমাল হবে। দুনিয়ায় নতুন কিছু কেউ কি সহজে মেনে নিতে চায়? তারপর দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। সব কুছ টাইমকা সওয়াল। ডরিয়ে মাত্‌।'

শুকদেও-এর একটি কথাও রামঅবতারের মস্তিষ্কে ঢোকে না। ঝাপসা চোখে তাকিয়ে সে বলে, 'সত্যনাশ হো গিয়া। জাতও যেতে বসেছে। নরকের থুকও চাটতে হবে, লেকেন পেটও ভরবে না।'

বুঝতে না পেরে শুকদেও বলেন, 'মতলব?'

'দেখুন মিনিস্টারজি, অর্জুন যে কাণ্ড করে বসেছে তাতে আমার জাতের লোকেরা তো খেপে উঠেছেই, রিস্তেদাররাও কোনো সম্পর্ক রাখবে না, দেখা হলে গায়ে থুক দেবে। তার ওপর ছেলেটা বেকার। এতদিন তাকে পুষছিলাম। এখন যদি আপনারা জবরদস্তি অচ্ছুৎদের মেয়েটাকে আমাদের ঘরে পাঠান, বিলকুল মরে যাব। নিজেরাই বা খাব কী, ওদেরই বা কী খাওয়াব? আমি গরিব লোক।'

শুকদেও ভেবেছিলেন, আরো মারাত্মক কিছু শোনাবে রামঅবতার। তিনি ভেতরে ভেতরে বেশ আরাম বোধ করেন। বলেন, 'এ নিয়ে ভাববেন না, আমরা আগের থেকেই তার ব্যওস্থা করে রেখেছি।'

বিমূঢ়ের মতো রামঅবতার জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যওস্থা?'

'আগে বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর বলছি।' বলেই শুকদেও ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বিনোদানন্দ সহায়ের দিকে তাকান, 'বিনোদানন্দজি, আপনি শুভকাজটা এবার সেরে ফেলুন।

বিনোদানন্দ সসম্ভ্রমে বলেন, 'আমি পেপার রেডি করে বসে আছি। দুলহা-দুলহন আর সাক্ষীরা সই করলেই কাজটা চুকে যাবে স্যার। মিনিট দশেকের বেশি সময় লাগবে না।'

শুকদেও বলেন, 'এই হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টের আমি একজন সাক্ষী থাকতে চাই। চন্দ্রকান্তজি দুলহা-দুলহনের গডফাদার। তিনিও একজন উইটনেস হোন। আর অর্জুনের বাপুজি রামঅবতার চৌবেজি আমাদের মধ্যে রয়েছেন। আমার ইচ্ছা তিনিও একজন সাক্ষী থাকুন।'

শশব্যস্ত এবং অত্যন্ত বিপন্ন মুখে রামঅবতার বলেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার।'

'ক্ষমা কেন?'

'আমাদের বংশে কাগজে সই করে কারুর কখনও বিয়ে হয়নি। আমি পরম্পরা ভাঙতে পারব না।'

শুকদেও বললেন, 'আপনার ছেলে তো ভেঙেছে।'

'ভাঙুক। আমি এর মধ্যে থাকতে চাই না।'

শুকদেও বুঝতে পারছেন, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই রামঅবতার এখানে বসে আছে। কিন্তু তার সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন মন কোনোভাবেই এ বিয়েতে সায় দিতে পারছে না। সে মন্ত্রীকে চটাতে পারছে না, আবার জাতপাতের বাউন্ডারি পেরিয়ে আসতেও সাহস করছে না। দুইয়ের মাঝখানে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মতো আটকে গেছে। এই অসহায় ভীরু মানুষটার ওপর জোরজার করতে আর ইচ্ছা হল না শুকদেও-এর। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আপনাকে সাক্ষী থাকতে হবে না। ডি. এম সাহেবকে তিন নম্বর উইটনেস হতে অনুরোধ করছি।'

শুকদেও-এর ডান পাশে বসে ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি তক্ষুনি বলে উঠলেন, 'আমি রাজি স্যার। এরকম একটা ঘটনার সাক্ষী থাকতে পারব জেনে খুব ভাল লাগছে।'

দশ মিনিটের মধ্যেই ছাপানো খাতার খোপ-কাটা ঘরে সই সাবুদ হয়ে যায়। প্রথমে সই করে অর্জুন এবং কমলা, তারপর একে একে সরকারি প্রশাসনের তিন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

স্টেনলেস স্টিলের রেকাবিতে রাখা নতুন সিঁদুর কৌটোটা তুলে অর্জুনের হাতে দিতে দিতে বিনোদানন্দ সহায় বলেন, 'ধরমপত্নীর কপাল আর সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়ে দাও।'

অর্জুন কাঁপা হাতে কমলাকে সিঁদুর পরিয়ে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে নমকপুরায় ব্রাহ্মণ-হরিজন বিয়ের প্রথম ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটি মোটামুটি শেষ হয়।

এবার শুকদেও অর্জুনদের বলেন, 'এত মানুষকে সাক্ষী রেখে তোমরা স্বামী-স্ত্রী হলে। সবাইকে প্রণাম কর।'

অর্জুন এবং কমলা প্রথমেই শুকদেও-এর দিকে এগিয়ে আসছিল। তিনি বলে ওঠেন, 'আমাকে পরে। আগে বাবুজিকে প্রণাম কর বেটা—' বলে রামঅবতারকে দেখিয়ে দেন।

রামঅবতার প্রায় আঁতকে ওঠে। রুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে বলতে চায়, 'নেহী, নেহী—' কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না। তার আগেই অর্জুনরা এসে তাকে প্রণাম করেছে।

কমলা যখন ঝুঁকে রামঅবতারের পা ছোঁয়, তার সমস্ত শরীর একটা পিছল ঘিনঘিনে অনুভূতিতে গুটিয়ে আসতে থাকে। তার গায়ে এই প্রথম একটি অচ্ছুতের ছোঁয়া লাগল। যদিও মন্ত্র পড়ে দোসাদদের মেয়েটা গোত্রান্তরিত হয়নি, তবুও আইনতঃ এতগুলো মান্যগণ্য মানুষের সাক্ষির জোরে সে তার পুতহু হয়েছে। তা সত্ত্বেও আজন্মের সংস্কারে তার স্পর্শে রামঅবতারের ধমনীতে প্রবাহিত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ রক্ত পুরোপুরি অপবিত্র হয়ে যায়। সে একেবারে কাঠ হয়ে শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে থাকে।

এরপর একে একে শুকদেও থেকে শুরু করে সরযূ পর্যন্ত সবাইকে প্রণাম করে অর্জুনরা। শুকদেওরা আন্তরিকভাবেই আশীর্বাদ করেন, 'সদা সুখী রহো। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।'

প্রণামের পর অর্জুন এবং কমলা তাদের নির্দিষ্ট চেয়ার দু'টিতে গিয়ে বসলে শুকদেও উঠে দাঁড়িয়ে এভাবে শুরু করেন, 'আপনারা এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সবাইকে, এবং বিশেষ করে রামঅবতারজিকে একটা সুখবর দিচ্ছি। সরকার সম্প্রতি একটা কানুন পাশ করেছে। ব্রাহ্মণ কায়াথ বা অন্য উঁচু জাতের ছেলেমেয়েরা যদি অচ্ছুতের ঘরে বিয়ে করে, তাদের সরকারি নৌকরি আর পাঁচ হাজার টাকা নগদ উপহার দেওয়া হবে।

'আপনাদের আরো জানাই, নমকপুরায় হরিজন মেয়েকে বিয়ে করার জন্য এখানকার ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসে অর্জুনের নৌকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আর উপহারের টাকা আমি সঙ্গে করে এনেছি। বলতে পারেন এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এটা সরকারি তরফের যৌতুক।'

শুকদেও-এর কথা শেষ হতে না হতেই নিঃশব্দে, প্রায় যান্ত্রিক কোনো পদ্ধতিতে তাঁর পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট একটি কারুকাজ-করা সুদৃশ্য কাঠের বাক্স এনে হাতে তুলে দেয়। বাক্সটি লাল সিল্কের রিবনে বাঁধা।

এবার একটি চতুর ডিপ্লোম্যাটিক চাল চালেন শুকদেও। বাক্সটি খুলে তার ভেতর থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বার করে অর্জুনকে ডেকে বলেন, 'এই নাও বেটা, আসছে মাসের পয়লা তুমি অফিসে জয়েন করবে।'

এ জীবনে চাকরি পাবে এবং স্বয়ং একজন প্রবল প্রতাপশালী মন্ত্রী নিজের হাতে করে তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দেবেন, এ ছিল অর্জুনের পক্ষে একান্তই অভাবনীয়। কৃতজ্ঞ, অভিভূত অর্জুনের চোখের কোণে কোনো অদৃশ্য অশ্রুবাহী শিরা সিরসির করতে থাকে। শুকদেও ঝা নামে এই মানুষটি দেবদূতের মতো এসে তাকে যেন পুনর্জন্ম দিয়ে গেলেন। নিজের অজান্তে কখন যে তার মাথা শুকদেও-এর পায়ে নুয়ে পড়েছে, খেয়াল নেই।

অর্জুনকে তুলে শুকদেও বুকে জড়িয়ে ধরেন। তার প্রতিক্রিয়াটা তিনি বুঝতে পারছিলেন। একসময় তাকে মুক্ত করে গাঢ় আবেগে বলে ওঠেন, 'যাও বেটা, বসো—'

অর্জুন চলে গেলে রামঅবতারকে ডাকেন শুকদেও, 'একটু কষ্ট করে এখানে আসুন রামঅবতারজি—'

রামঅবতার অবাক বিস্ময়ে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ করছিল। মান্ধাতাদের সঙ্গে মাথায় বারুদ ঠেসে যখন সে ছেলের বিয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আসে তখন এত বড় একটা চমকের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। আচ্ছন্নের মতো সে উঠে আসে।

শুকদেও-এর হাতে বাক্সটা খোলাই ছিল, তার ভেতর নতুন করকরে একশ টাকার পঞ্চাশখানা নোট সিল্কের সরু ফিতে দিয়ে বাঁধা। বাক্সটা রামঅবতারের হাতে দিতে দিতে বললেন, 'এটা আমাদের দিক থেকে আপনাকে ভেট। ছেলের শাদি হল, এ দিয়ে রিস্তেদার আর পড়শিদের মুহ্‌মিঠা করাবেন।'

একসঙ্গে এত টাকা নিজের হাতে আর কখনও পায়নি রামঅবতার। স্বজাতের ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক সে আদায় করতে পারত কিনা, এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। আর যদিও টানাহ্যাঁচড়া করে টাকাটা আদায় করা যেত, বেকার দামাদের জন্য মেয়ের বাপেরা কেউ যে চাকরি জুটিয়ে দিতে পারত না, এটা সে জোর দিয়েই বলতে পারে।

কে ভাবতে পেরেছিল অচ্ছুৎদের মেয়েটা এত বিরাট আকারে তাদের জন্য সুখ এবং সৌভাগ্য নিয়ে আসবে? অর্জুন এবং তার নিজের হাতে সৌভাগ্যের সলিড প্রমাণ রয়েছে। কমলার কাছে যে আমৃত্যু কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং শুকদেও ঝা'কে যে অন্তত ধন্যবাদ দেওয়াটাও কর্তব্য, সে-সব আর মনে রইল না রামঅবতারের। বিমূঢ়ের মতো সে শুধু তাকিয়ে থাকে।

শুকদেও তার মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। মধুর হেসে বলেন, 'কি, খুশি তো?'

আচমকা কিছু মনে পড়ে যেতে রামঅবতার শ্বাস টানার মতো শব্দ করে দ্রুত বলে ওঠে, 'অর্জুনের চাকরিটা পাকা তো?'

'হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই। পার্মানেন্ট সারভিস। এমন কি এক বছর যে প্রবেশনার হিসেবে থাকতে হয়, অর্জুনকে তা-ও থাকতে হবে না। প্রথম দিন থেকেই তার পাকা নৌকরি।' শুকদেও বলতে থাকেন, 'আশা করি এবার আপনার চিন্তা দূর হবে।'

আর কোনো প্রশ্ন না করে রামঅবতার ফিরে যায় এবং তার চেয়ারে বসে পড়ে।

শুকদেও চন্দ্রকান্তকে বলেন, 'এখানকার কাজ তো মিটল, এবার আমাদের ফিরতে হবে।'

চন্দ্রকান্ত ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, 'স্যার, একটু মিঠাইয়ের ব্যওস্থা করেছি। দয়া করে পাঁচ মিনিট যদি বসে যান—'

'মিঠাই? ভেরি গুড।' শুকদেও হেসে হেসে বলেন, 'মুহ্‌মিঠা না করলে শুভকাজ কমপ্লিট হয় না। নিশ্চয়ই বসে থাকব—'

আর্দালি ভরত মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে ডেকে অতিথিদের জন্য মিঠাই আনতে বলেন চন্দ্রকান্ত। দু মিনিটের ভেতর ভরত এবং সাব-ডিভিশনাল অফিসের ক্লার্ক অবিনাশ, দু'জনে দুটো বিরাট ট্রে নিয়ে আসে। একটা ট্রেতে প্রচুর পরিমাণে লাড্ডু, নিমকিন, গুলাবজাম এবং পেঁড়া। আরেকটি ট্রেতে কাগজের প্লেট এবং স্টিলের ঝকঝকে অগুনতি চামচ।

চন্দ্রকান্ত চোখের ইশারায় সরযূকে নিজের হাতে মিঠাই পরিবেশন করতে বলেন। আর্দালিদের সঙ্গে করে সরযূ প্রথমে আসেন রামঅবতারের কাছে। শুকদেও-এর কাছে আগে গেলে তিনি যে রামঅবতারকে প্রথমে আপ্যায়ন করতে বলবেন, সরযূ তা জানেন। কেননা কিছুক্ষণ আগেই বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর তিনি প্রথমে প্রণাম নেননি, রামঅবতারের কাছে অর্জুন এবং কমলাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

একটা কাগজের প্লেটে অনেকগুলো মিষ্টি, নিমকিন আর চামচ সাজিয়ে রামঅবতারের দিকে বাড়িয়ে দেন সরযূ। খুবই বিনীত ভঙ্গিতে বলেন, 'এই নিন—'

রামঅবতার অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করে। সে জানে সরযূরা ব্রাহ্মণ কিন্তু যে বেয়ারা দুটো খাবার-দাবার বয়ে এনেছে তাদের কী জাত, কে জানে। তা ছাড়া যে হালুইকরেরা এসব বানিয়েছে তারা জল-চল কিনা তার কোনো গ্যারান্টি নেই। যদিও আধঘণ্টা আগে তার ছেলে অচ্ছুৎ মেয়ে বিয়ে করেছে এবং এই বিয়ের কারণে একটি পার্মানেন্ট সারভিস এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে যাওয়ায় মন কিছুটা দুর্বল যে হয়নি তা নয়। কিন্তু জাতপাতের ব্যাপারে হাজার বছরের সংস্কার তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে এখানে বসে মিষ্টি খাওয়ার মতো উদারতা বা মহত্ত্ব এখনও অর্জন করে উঠতে পারেনি সে। কিন্তু এস. ডি. ও'র মতো নমকপুরার প্রবল প্রতাপশালী একজন অফিসারের স্ত্রীকে মুখের ওপর 'না' বলে দেওয়া যায় না। তাছাড়া মন্ত্রী, ডি. এম, এস. পি ইত্যাদি বিশাল ক্ষমতাবান মানুষগুলি দশ ফুট দূরত্বে বসে আছেন এবং সকলের চোখ তাঁর দিকেই ফেরানো। কাজেই মনে মনে চতুর একটি চাল ভেবে নিয়ে রামঅবতার করুণ মুখে বলেন, 'মাতাজি, আমি বাইরে কিছু খাই না। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

সরযূ আরো নম্র হয়ে অনুরোধ করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই শুকদেও বলে ওঠেন, 'থাক থাক, রামঅবতারজি যখন বাইরে খান না তখন আর ওঁকে বিব্রত করার দরকার নেই।' আসলে তিনি জানেন, ধীরে ধীরে সব কিছু স্বাভাবিক করে নেওয়া ভাল। তাড়াহুড়ো করতে গেলে তার ফল উলটো হতে পারে। এই সবে অচ্ছুতের মেয়ে রামঅবতারের পুতহু হয়েছে, তার ওপর মিঠাই খাওয়াবার জন্য জোর না করাই উচিত। তাতে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে তাব সবটাই গিয়ে পড়বে কমলার ওপর। মেয়েটার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।

সরযূ শুকদেও-এর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি আর কিছু বললেন না। ঘুরে ঘুরে সবার কাছে গিয়ে মিষ্টির প্লেট দিতে থাকেন। অন্য দুই আর্দালি নিয়ে আসে চা, পান আর জলের গেলাস।

খাওয়া দাওয়ার পর শুকদেও হাতজোড় করে সবার কাছ থেকে বিদায় নেন। বিশেষ করে রামঅবতারের সামনে এসে তার হাত দু'টি ধরে বলেন, 'মনে কোনোরকম ক্ষোভ রাখবেন না। অচ্ছুৎদের মেয়ে হলেও কমলা আপনার পুতহু। তার সম্মান যাতে থাকে সেদিকে কৃপা করে নজর রাখবেন।'

তিনি কী বলতে চান, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না রামঅবতারের। অর্থাৎ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর কেউ যাতে দোসাদদের মেয়েটার ওপর অত্যাচার বা উৎপাত না করে, সেটাই জানিয়েছেন শুকদেও। সে উত্তর দিল না, শুধু অনিশ্চিতভাবে মাথাটা একদিকে সামান্য কাত করল।

'আচ্ছা, নমস্তে —'

শুকদেও মঞ্চ থেকে নেমে গেটের দিকে এগিয়ে চললেন। তার পেছন পেছন ডি. এম, এস. পি, এ. ডি. এম, চন্দ্রকান্ত, সরযূ এবং বাকি সবাই যেতে থাকেন।

শুকদেওরা গাড়িতে ওঠার পর বিরাট কনভয় নমকপুরার আকাশে ধুলোর ঝড় তুলে উধাও হয়ে যায়। চন্দ্রকান্ত আর সরযূরা আবার মঞ্চে ফিরে আসেন।

রামঅবতার, অর্জুন বা কমলা কেউ মন্ত্রীকে এগিয়ে দিতে যায়নি। যে যেখানে ছিল সেখানেই কাঠের পুতুলের মতো বসে আছে। রামঅবতার এবারও ছেলে বা পুতহুর দিকে তাকায় নি, অর্জুনরাও তার দিকে মুখ ফেরায়নি। মনে হয় তারা পরস্পরকে চেনে না, আগে কেউ কাউকে কখনও দেখেনি পর্যন্ত।

দূরে গাছপালা এবং ছোটখাট পাহাড়ী রেঞ্জের তলায় সূর্য ডুবে যাচ্ছে। রোদের রং এখন

ম্যাড়মেড়ে, বাসি হলুদের মতো। আরো খানিকক্ষণ নির্জীব একটু আলো ছড়িয়ে দিনটা ফুরিয়ে যাবে। বাতাস দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে, সমস্ত চরাচর জুড়ে এখন আরামদায়ক শীতলতা।

চন্দ্রকান্ত রামঅবতারের কাছে এসে বলেন, 'চৌবেজি, সন্ধে হয়ে আসছে। আপনি বাড়ি গিয়ে খবর দিন, ঘন্টাখানেকের ভেতর অর্জুন আর কমলা যাচ্ছে।'

পুত্রবধূকে আজই, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে, এই ব্যাপারটা এতক্ষণ রামঅবতারের মাথায় একেবারেই আসে নি। ছেলের বিয়ে, মন্ত্রী, ডি. এম, অর্জুনের চাকরি, পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক, ইত্যাদি মিলিয়ে তার মাথায় একখানা চাকা ঘুরে যাচ্ছিল যেন। এই মুহূর্তে চন্দ্রকান্তর কথায় মারাত্মক রূঢ় বাস্তবের একটি ছবি চোখের সামনে সমস্ত ডিটেল নিয়ে ফুটে উঠতে থাকে। অচ্ছুতের মেয়েটা বাড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে যে তুমুল হুলস্থূল বেধে যাবে, সেটা ভাবতেই শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে আগুনের স্রোত নেমে যায়। বিকেলের এই সুখকর বাতাসেও গল গল করে ঘামতে থাকে সে।

রামঅবতার শুকনো ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আজই ওদের পাঠাবেন স্যার?'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'হ্যাঁ।'

আর কোনো প্রশ্ন করে না রামঅবতার। অত্যন্ত অবসন্ন ভঙ্গিতে নিজের শরীরটাকে টেনে তুলে আস্তে আস্তে মঞ্চ থেকে নেমে যায়। গেটের দিকে চলতে চলতে তার মনে হয়, মান্ধাতাদের সঙ্গে তখন চলে গেলেই ভাল হত। তা হলে তাকে এভাবে বিপন্ন হতে হত না। তার মানে হয়, এই মুহূর্তে যেন আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সে।

চার

রামঅবতার চলে যাওয়ার পর চন্দ্রকান্ত এবং সরযূ কমলাদের কাছে চলে আসেন।

সরযূ কমলার কাঁধে সস্নেহে একটি হাত রেখে বলেন, 'ভীষণ ঘেমে গেছ। কপালের চন্দন সিঁদুর সব লেপেটে গেছে। ভেতরে চল, নতুন করে তোমাকে আবার সাজিয়ে দিই।'

চন্দ্রকান্ত অর্জুনকে বলেন, 'তুমিও চল। ঘেমে জামাকাপড় একেবারে ভিজিয়ে ফেলেছ। ওগুলো বদলে নেবে।'

বাংলোর ভেতরে এসে কমলাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে ফের সাজাতে বসেন সরযূ। চন্দ্রকান্তর সঙ্গে অর্জুন তার ঘরে চলে যায় কিন্তু ভেজা সপসপে পোশাক সে আর বদলায় না, শুধু মুখটা ধুয়ে ভাল করে মুছে নেয়। সে জানে, শুকনো জামাকাপড় পরলেও দশ মিনিটের ভেতর ভয়ে, নার্ভাসনেসে সেই একই হাল হবে। কাজেই পালটাবার মানে হয় না।

সাজানো শেষ করে সরযূ অর্জুনের ঘরে চলে আসেন। স্বামীকে বলেন, 'সন্ধে হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। ওদের পাঠাবার কী ব্যবস্থা করেছ?'

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'আমাদের বড় গাড়িটা করে পাঠিয়ে দেব।'

'সে-ই ভাল। সঙ্গে প্রেজেন্টেশনের অতগুলো প্যাকেট ট্যাকেট যাবে। বড় গাড়ি না হলে জায়গা হবে না।'

'হ্যাঁ। কমলা এখন বেরুতে পারবে তো?'

'পারবে।'

চন্দ্রকান্ত অর্জুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'এস।'

অর্জুনের ঘর থেকে বেরিয়ে চন্দ্রকান্তরা কমলার ঘরের কাছে এসে তাকে ডেকে নেন। তারপর একটানা লম্বা বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান।

এদিকে সূর্য কিছুক্ষণ আগে ডুবে গেছে। তবে রাত্রি এখনও গাঢ় হয়নি। পাতলা অন্ধকারে চারদিক দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

এস.ডি.ও'র বাংলোর প্রতিটি ঘরে বারান্দায় প্যাসেজে এবং সামনের লন-এ শামিয়ানাটার তলায় আলো জ্বলে উঠেছে।

আলোকিত সিঁড়ি দিয়ে সবাই নিচে নেমে আসে। শামিয়ানার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ অর্জুন বলে, 'বাড়ি না গেলেই কি নয়? আমাদের অন্য জায়গায় থাকার যদি একটা ব্যবস্থা করে দেন—'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'সেটা পরে ভাবা যাবে। বিয়ে করলে, মা'কে তার পুতহুর মুখ দেখাবে না! দেখো, কমলাকে দেখে তিনি খুব খুশি হবেন।'

অচ্ছুৎ পুত্রবধূর মুখ দেখে মা যে আহ্লাদে কতখানি নেচে উঠবে, বাড়িতে তার কী ধরনের অর্ভথানা জুটবে, সেটা অর্জুনের চাইতে ভাল করে কেউ জানে না। সে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না, ঠোঁট দুটি অল্প অল্প কাঁপতে থাকে শুধু।

চন্দ্রকান্ত সবই বুঝতে পারেন। গভীর সহানুভূতিতে অর্জুনের একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেন, 'তুমি তোমার কর্তব্য করবে। তোমার বাবা-মা যদি কমলাকে শেষ পর্যন্ত মেনে না নেন, তখন অন্য রাস্তা তো খোলাই আছে। আমার মনে হয়—'

আবছা গলায় অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'চ্যালেঞ্জের অনেকগুলো স্টেজ তো পেরিয়ে এসেছ। এখন ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলে চলবে না। যাই-ই ঘটুক না, যুদ্ধের শেষ রাউন্ড পর্যন্ত তোমাকে লড়তেও হবে, জিততেও হবে। নইলে—'

'কী?'

'এ দেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

ভারতের মতো বিশাল দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আদৌ কোনোরকম দুশ্চিন্তা নেই অর্জুনের। তার সমস্যা খুবই ছোট, অতি নগণ্য এবং একান্তই ব্যক্তিগত। প্রচুর অপমান এবং গোলমালের পর যদি বাবা-মা তাদের একটু জায়গা দেয়, তাতেই খুশি হয়ে যাবে অর্জুন। সে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যা বলছেন তা-ই হবে। আমরা বাড়িই যাব।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, একটা দামি ঝকঝকে গাড়ির ক্যারিয়ারে উপহারের অজস্র প্যাকেট, নতুন স্যুটকেস এবং অন্যান্য জিনিস তুলে দেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রকান্ত নিজের হাতে গাড়ির দরজা খুলে বলেন, 'ওঠ—'

কমলা এবং অর্জুন চন্দ্রকান্ত আর সরযূকে প্রণাম করে গাড়িতে উঠে বসে।

মাত্র সাত দিন চন্দ্রকান্তদের সঙ্গে অর্জুন এবং কমলার পরিচয়। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের স্নেহ-মমতা এবং সহানুভূতি তারা যেভাবে পেয়েছে, আজীবন তা মনে থাকবে। এঁরা যদি অনবরত সাহস না যোগাতেন এবং আশ্রয় না দিতেন, বিয়েটা কোনোদিনই হত না। অসহায় সন্ত্রস্ত একটি তরুণ এবং একটি তরুণীকে নমকপুরার বামহন-কায়াথরা একেবারে শেষ করে ফেলত। গাঢ় আবেগে অর্জুন আর কমলার চোখে জল এসে যায়।

অর্জুন ঝাপসা গলায় বলে, 'চলি—'

অর্জুনদের আবেগ চন্দ্রকান্ত এবং সরযূর বুকের ভেতর অদৃশ্য গোপন কোনো প্রক্রিয়ায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে গিয়েছিল। ভারি গলায় তাঁরা বলেন, 'এস—'

শোফার সামনের সিটে স্টিয়ারিং ধরে বসে ছিল। চন্দ্রকান্ত তাকে বললেন, 'এদের পুরানা টৌলিতে পৌঁছে দিয়ে এস।'

শোফার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আস্তে আস্তে সেটাকে গেটের বাইরে রাস্তায় নিয়ে এল। এবার গাড়িটা ডাইনে ঘুরে শহরের ভেতর ঢুকে যাবে।

পেছন ফিরে অর্জুনরা দেখতে পেল, শামিয়ানার বাইরে লন-এর মাঝখানের রাস্তায় চন্দ্রকান্ত এবং সরযূ স্তব্ধ মূর্তির মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পর গাড়িটা ক্ষিপ্র একটি মোচড়ে ডান দিকে ঘুরতেই চন্দ্রকান্তদের আর দেখা যায় না।

ডাইনের এই রাস্তাটা নমকপুরা টাউনের শিরদাঁড়া। সেটার ওপর দশ ইঞ্চি পুরু লালচে ধুলোর

স্তর। দু'ধারে কাঁচা নর্দমা দুটো লক্ষ লক্ষ মশার মেটার্নিটি হোম। তারপর বেঢপ পুরনো চেহারার একতলা দোতলা তেতলা। মাঝে মাঝে চমকে দেবার মতো দু-একটা ঝকঝকে নতুন বাড়ি। তবে টিন এবং খাপরার চালাও রয়েছে অজস্র! বেশির ভাগ বাড়ির মাথাতেই রামসীতা বা শিবের মন্দির। অবশ্য সামনের দিকে গরু বা মোষ বাঁধা।

রাস্তায় নমকপুরা মিউনিসিপ্যালিটির বাতিগুলো টিম টিম করে জ্বলছে। এখানে ভোল্টেজ ভীষণ কম।

বিশ ফুট পর্যন্ত উঁচু বায়ুস্তরকে ধুলোয় আচ্ছন্ন করে গাড়িটা পুরানা মহল্লার দিকে মাঝারি স্পিডে ছুটে চলেছে।

অর্জুন জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। উলটো দিক থেকেও জিপ, মোটর, ট্রাক, টাঙ্গা, ভৈসা ও গৈয়া গাড়ি এবং সাইকেল রিক্‌শা অনবরত পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এই সন্ধেবেলায় চারদিকে প্রচুর লোকজন। খানিকটা দূরে একটা সিনেমা হল রয়েছে—'বিজলি'। ইভিনিং শো বসার আগে সেখান থেকে মাইকে ফুল ভলিউমে হিন্দি গান বাজানো হচ্ছে।

আকাশে চাঁদির থালার মতো পুনমের সুগোল চাঁদটি উঠে এসেছে।

অর্জুন কিন্তু বাড়িঘর, ধুলোর ঝড়, পূর্ণিমার চাঁদ, গাড়িঘোড়া, মানুষজন বা অন্য কিছুই দেখছিল না। গাড়িটা যত পুরানা মহল্লার দিকে এগুচ্ছে, ততই তীব্র উৎকণ্ঠায় তার হৃৎপিণ্ড থেকে একসঙ্গে পঞ্চাশটা উদ্‌ভ্রান্ত তেজী ঘোড়া ছুটে যাওয়ার আওয়াজ উঠে আসছে যেন। চারদিকের দৃশ্যাবলী তার কাছে ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তার বদলে সিনেমার স্ক্রিনের মতো অদৃশ্য কোনো পর্দায় কয়েক বছর আগের দিনগুলো ফুটে উঠতে থাকে।

নমকপুরা টাউনের দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায় পুরানা মহল্লা। জায়গাটাকে শুধ্ (শুদ্ধ) ব্রাহ্মণদের কলোনি বলা যায়। প্রায় পাঁচ জেনারেশন ধরে অর্জুনরা এখানে রয়েছে।

পুরনো একতলা বাড়ি তাদের। আশি বছর আগে এটা তৈরি করিয়েছিল তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা রামআশ্রয় চৌবে। তারপর থেকে ওটার গায়ে আর হাত পড়েনি। আশি বছরের ঝড়বৃষ্টি এবংরোদে বাড়িটার দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে খসে প্রায় সব জায়গায় ইট বেরিয়ে পড়েছে। ভেঙেচুরে গেছে ছাদের কার্নিস, জানালার কাচ। প্রতিটি ঘরের মেঝে ফেটে চৌচির হয়ে আছে। দেওয়ালে এবং ছাদে বট-অশ্বত্থের চারা গজিয়ে বাড়িটার ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে। আর বেশিদিন নয়, কিছু একটা ব্যবস্থা না করলে পাঁচ সাত বছরের মধ্যে হুড়মুড় করে পড়ে একেবারে ধ্বংসস্তূপ হ'য়ে যাবে।

আসলে অর্জুনরা মিডল ক্লাসের একেবারে নিচের লেভেলে পড়ে আছে। ঠাকুরদার ঠাকুরদা বাড়িঘর যেটুকু করে গিয়েছিল সেটাকে ভালভাবে টিকিয়ে রাখার মতো পয়সার জোর পরের চার জেনারেশনের ছিল না।

অর্জুনের বাবার ঠাকুরদা কী করত সে জানে না। ঠাকুরদা ছিল একটা স্কুলের সংস্কৃতের টিচার। বাবা অর্থাৎ রামঅবতারও স্কুলে পড়া'য়। সে প্রাইমারি স্কুলের অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার।

অর্জুনদের ফ্যামিলি প্যাটার্নটা এইরকম। বাবা, মা, তিন বোন এবং দুই ভাই, সব মিলিয়ে ছ'জন। বোনদের দু'জন বড়, একজন ছোট। দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে। একজন থাকে গয়ায়, আরেক জন সাহারসায়। ছোট বোনের এখনও বিয়ে হয়নি। নমকপুরা গার্লস হাইস্কুলে ক্লাস সেভেনে বার চারেক ফেল করার পর নাম কাটিয়ে এখন বাড়িতেই বসে আছে। ছোট ভাই স্কুলে পড়ে।

রামঅবতার যে প্রাইমারি স্কুলটায় পড়ায় সেটা নমকপুরা মিউনিসিপ্যালিটি চালায়। এরকম একটা নগণ্য শহরের আয়ই বা কতটুকু, আর প্রাইমারি স্কুলের টিচারদেরই বা কী স্কেল দিতে পারে! স্টেট গভর্নমেন্টের একজন নতুন ক্লার্ক চাকরিতে ঢুকেই যা মাইনে পায়, তিরিশ বছর পড়াবার পর রামঅবতার তার অর্ধেকও পায় না। কাজেই সংসার চালাবার জন্য হাজার রকমের উঞ্ছবৃত্তি করতে হয় রামাবতারকে। বার মাসই টিউশনি করে সে, তা ছাড়া স্থানীয় রামসীতা মন্দিরে রামায়ণ পাঠ করে কিছু পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে ঘটকালি এবং জমির দালালিও করে থাকে। পঞ্চাশ মাইল দূরে সামান্য

কিছু ল্যান্ড প্রপার্টি আছে তাদের। কিষাণদের কাছে সেগুলো জমা দেওয়া আছে, তাতে ধান গেঁহু এবং রাই-কলাই-মুগ-মুসুরি ফলে। বছরের শেষে ফসল বেচে কিষানরা কিছু পাঠায়। এইভাবে জোড়াতালি দিয়ে কোনোরকমে সংসার চলছে।

এর মধ্যে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে রামঅবতার। তাদের সোসাইটিতে দহেজ (পণ) ব্যাপারটা খুবই মারাত্মক। কাজেই দুই মেয়ের বিয়েতে হাতে যে দু-চার পয়সা জমানো ছিল তা তো গেছেই, এমন কি অর্জুনের মায়ের সোনাদানাটুকুও শেষ। তাতেও কুলোয়নি, দেহাতের কয়েক বিঘে জমি বেচে ফেলতে হয়েছে এবং করজ নিতে হয়েছে হাজার চারেক টাকা। টাকাটা শোধ তো করা যায়ই নি, সুদের একটা পয়সাও মেটাতে পারেনি সে। এভাবে আর কিছুদিন চললে দেনার দায়ে নমকপুরার বাড়িটা খোয়াতে হবে। তার ওপর আরো একটি মেয়ে ঘাড়ের ওপর চেপে আছে। তাড়াতাড়ি তার বিয়েটা চুকিয়ে না ফেললেই নয়।

প্রচুর ঋণ, একটি মেয়ের বিয়ের দুর্ভাবনা, ব্রাহ্মণত্বের প্রাচীন দম্ভ, জাতপাত ছুঁয়াছুতের হাজারটা সংস্কার, ইত্যাদি নিয়ে এই পৃথিবীতে টিকে আছে রামঅবতার।

অতীতের ব্যাপারে মাথা ঘামায় না সে, বর্তমান নিয়ে প্রতি মুহূর্তে সে ঝালাপালা। একটি করে দিন কাটে, তার শিরদাঁড়া এক মিলিমিটার করে দুমড়ে যায়। তার দুই চোখ এখন ভবিষ্যতের দিকে ছড়িয়ে আছে। রামঅবতারের কাছে ভবিষ্যৎ বলতে এখন একটাই। সেটা হল তার বড় ছেলে অর্জুন।

তিন বছর আগে অর্জুন যখন সেকেন্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করল তখন থেকেই স্বপ্ন দেখছে রামঅবতার। অর্জুন চাকরি বাকরি করে তার পেছনে দাঁড়াবে, বোনের বিয়ে দেবে, রামঅবতারকে ঋণমুক্ত করে অকালমৃত্যু থেকে রক্ষা করবে। ছেলেকে ঘিরে তার অনেক উচ্চাশা।

রেজাল্ট বেরুবার পর অর্জুন জানিয়েছিল, কলেজে ভর্তি হবে।

রামঅবতার বলেছিল, 'আমার ক্ষমতা নেই অর্জুন। এখন নৌকরি উকরি করে সম্‌সারটাকে বাঁচা। আমি তোর ওপর ভরসা করে আছি বেটা।'

ক'দিন কান্নাকাটি করে শেষ পর্যন্ত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছিল অর্জুন।

কিন্তু নমকপুরা রাঁচী ধানবাদ সিন্দ্রি বারাউনি বা জামশেদপুব নয়। জায়গাটা বিহারের ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া। এখানে স্বাধীনতার আগে বা পরে ইন্ডাস্ট্রি টিন্ডাস্ট্রি বলতে কিছুই হয়নি। কলকারখানা আর নতুন নতুন অফিস না বসলে নৌকরির সুযোগ কোথায়? অথচ ধোঁকার টাটির মতো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ছোটখাট একটি অফিস আছে নমকপুরায়। ফি বছর দেড় দু হাজার যুবক স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে ওখানে নাম লেখায়। এক্সচেঞ্জের অফিসাররা তার ভেতর থেকে ঝাড়াই বাছাই করে কিছু নাম পাঠায় জামশেদপুরে বা ধানবাদে কিংবা রাঁচীতে। সেই লিস্ট থেকে বছরে দশ বিশ জনের বেশি ইন্টারভিউতে ডাক পায় না। চাকরি পায় বড়জোর চার পাঁচজন।

যেখানে কয়েক হাজার গ্র্যাজুয়েট বছরের পর বছর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে হানা দিচ্ছে সেখানে অর্জুনের মতো একজন ম্যাট্রিকুলেটের আশা আর কতটুকু? তিন চারটে বছর ঘোরাঘুরি করে গোড়ালির আধাআধি ক্ষইয়ে ফেলার পরও যখন একটা ইন্টারভিউ পর্যন্ত জোটানো গেল না তখন সে সিনিক হয়ে পড়তে থাকে।

অবশ্য রামঅবতার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানকে ধরে টরে প্রাইমারি স্কুলে অর্জুনের একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারত কিন্তু যে পে-স্কেলে তার জীবন শুরু হবে তা বলার মতো তো নয়ই, পেটও তাতে ভরবে না। ছেলে সম্পর্কে রামঅবতারের উচ্চাকাঙক্ষা কিঞ্চিৎ বেশি। আরম্ভটা ভদ্র রকমের না হলে অর্জুনকে তার মতো সারা জীবন ধুঁকতে ধুঁকতে এগুতে হবে। রামঅবতারের ইচ্ছা, সরকারি নৌকরি দিয়ে সে জীবন শুরু করুক। তাতে স্কেল তো ভাল পাওয়া যাবেই, বিয়ের বাজারে দরও উঠবে অনেক। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে যায়, সরকারি নৌকরি আর জোটে কই?

নিয়মিত যাতায়াতের কারণে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের এক জুনিয়র অফিসারের সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল অর্জুনের। এমনিতে তার ব্যবহার খুবই নম্র, বিনীত। এই কারণে নমকপুরার সবাই তাকে ভালবাসে। জুনিয়র অফিসারটিও তাকে বেশ পছন্দ করত। এই ভদ্র, মধুর স্বভাবের

যুবকটির জন্য তার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল।

অফিসারটি একদিন তাকে ডেকে জানিয়েছিল, একজন সেকেন্ড ডিভিসনে পাশ করা ম্যাট্রিকুলেটের চাকরি পাওয়া দেশের এই সিস্টেমে প্রায় অসম্ভব। চাকরির জন্য এক্সট্রা কিছু কোয়ালিফিকেশন দরকার। তার পরামর্শ, ইংরেজিতে টাইপ রাইটিং এবং শর্টহ্যান্ডটা শিখে নেওয়া দরকার। সেই সঙ্গে ওই ল্যাংগুয়েজটাও ভাল করে শিখতে হবে। ভাষাটার ওপর দখল না থাকলেই নয়।

অর্জুন হকচকিয়ে গেছে। কেন না কিছুদিন আগেও 'আংরেজি হটাও'ওলারা অঞ্চলে প্রচুর হইচই করেছে। শুধু তাই না, এখানে ওখানে দোকানের মাথায় দু-চারটে ইংরেজি হরফের যে সাইনবোর্ড ছিল সেগুলোর ওপর এক পোঁচ করে আলকাতরা লেপে দিয়েছে। এ সব দেখতে দেখতে অর্জুনের ধারণা হয়েছিল, ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে ইংরেজিকে দেশের বাউন্ডারি পার করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের জুনিয়র অফিসারটি তাকে সেই অচ্ছুৎ ল্যাংগুয়েজটাকেই ভাল করে শিখতে বলেছিল। অর্জুনের বিস্ময় সেই কারণেই।

অর্জুন বলেছিল, 'লেকেন স্যার, আজকাল ইংলিশের হাল তো খুব খারাপ হয়ে গেছে। কেউ আর ওটা তেমন শিখতে চায় না।'

অফিসার গলা নামিয়ে বলেছিল, 'বরং তার উলটোটাই। তুমি পাটনা, রাঁচী, ধানবাদ জামশেদপুর—বড় বড় টাউন একবার ঘুরে এস। 'আংরেজি হটানে'ওয়ালারা ছেলেমেয়েদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে লুকিয়ে পড়াচ্ছে। বেশির ভাগ এম.এল.এ এবং এম.পি আর মিনিস্টারের ছেলেমেয়েরাও বড় বড় মিশনারি স্কুল কলেজ আর কনভেন্টে পড়ছে।

'হাঁ!' অর্জুন অবাক হয়ে গেছে।

অফিসারটি এবার বলেছে, 'এসবের ভেতর অনেক রকম পলিটিকস রয়েছে। তা নিয়ে আমাদের কারুর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তোমার দরকার একটা ভাল চাকরি— তাই তো?'

আস্তে মাথা নেড়েছে অর্জুন।

অফিসারের পরামর্শটা তার কাছে খুবই দামি মনে হয়েছে। সেই দিনই সে টাইপ রাইটিং এবং শর্টহ্যান্ড শেখার জন্য চারদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু নমকপুরার মতো ছোট্ট নগণ্য শহরে এসব শেখাবার মতো একটি স্কুলও নেই। ইংরেজিটাও যে ভাল করে রপ্ত করবে, তেমন টিচার এখানে পাওয়া গেল না। কেননা আজকাল হিন্দি মিডিয়াম স্কুলগুলোতে, বিশেষ করে নমকপুরার মতো ছোটখাট শহরে, ইংরেজির ওপর আদৌ জোর দেওয়া হয় না। কোনোরকমে দায়সারা ভাবে কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়। ইংরেজির যারা ভাল টিচার, বড় শহরে তাঁদের প্রচুর ডিমান্ড, তাঁরা সেখানেই চলে যান।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর অর্জুন খবর পায় নমকপুরা চার্চের রেভারেন্ড টিরকের কাছে একটা দামি টাইপ রাইটার মেশিন রয়েছে। তিনি শর্টহ্যান্ড, টাইপ রাইটিংটা ভালই জানেন। ইংরেজি ভাষাটার ওপর তাঁর প্রচণ্ড দখল।

চার্চের প্রয়োজনে রেভারেন্ড টিরকেকে পাটনা কলকাতা দিল্লি বম্বে ছাড়াও, এমনকি দূর বিদেশেও যোগাযোগ করতে হয়। প্রায় রোজই দশ বারটা করে চিঠি টাইপ করে তিনি ডাকে দেন।

অর্জুন সোজা চার্চে চলে গিয়েছিল। নমকপুরা চার্চটা এই শহরেরই আরেক মাথায়, অচ্ছুতটুলির গা ঘেঁষে।

বছর পঞ্চাশেক আগে চার্চটা বসানো হয়েছিল। তখন ইংরেজ রাজত্ব জাঁকিয়ে চলছে। এটা বসবার সঙ্গে সঙ্গে অচ্ছুতদের মধ্যে ব্যাপক কনভারসন বা ধর্মান্তর ঘটতে থাকে। বেশ কিছু দোসাদ, তাতমা এবং গাঙ্গোতা খ্রিস্টান হয়ে যায়। তবে স্বাধীনতার পর কনভারসনের হার অনেক কমতে থাকে। আজকাল ক্বচিৎ কখনও দু-একজন খ্রিস্টান হয়।

পঞ্চাশ বছরে জনা দশেক পাদ্রী এই চার্চে এসে ধর্মপ্রচার এবং সেবামূলক কাজ করে গেছেন। প্রিচিং আর সোশাল সারভিস।

প্রথমে এখানে এসেছিলেন একজন ইংরাজ পাদ্রী—ফাদার রবার্টস। তারপর যাঁরা এসেছেন তাঁরা

সবাই ভারতীয়। গত দশ বছর ধরে এখানে আছেন রেভারেন্ড টিরকে। তিনি রাঁচী অঞ্চলের আদিবাসী।

রেভারেন্ড টিরকে ধর্মান্তরের বা প্রিচিং-এর ওপর আদৌ জোর দেন না। তাঁর কাজটা হল প্রধানত সমাজসেবার। তিনি আসার পর চার্চে একটা স্কুল আর একটা হাসপাতাল খোলা হয়েছে। খুবই ছোট স্কুল এবং নগণ্য হাসপাতাল। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আসে অচ্ছুৎটুলি থেকে। হাসপাতালের রোগীরাও সবাই হরিজন। খ্রিস্টানরা তো আসেই। এখনও যারা হিন্দুত্ব বজায় রেখে কোনোরকমে টিকে আছে সেই সব দোসাদ তাতমা ধাঙড় গাঙ্গোতাদের ঘর থেকেও ঝাঁকে ঝাঁকে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে, কারুর রোগ হলে এখান থেকে 'দাওয়াই' নিয়ে যায়। তবে নমকপুরায় উচ্চবর্ণের মানুষেরা এখানকার ছায়া মাড়ায় না।

এক রবিবার সকালের দিকে চার্চে এসেছিল অর্জুন। প্রায় আধ একর জমির মাঝখানে ছোটখাট গীর্জা বাড়িটা। বড় জোর চল্লিশ ফুট লম্বা এবং বিশ ফুটের মতো চওড়া, উচ্চতা খুব বেশি হলে সাতাশ আটাশ ফুট। ছাদের মাথায় কাঠের উঁচু ক্রশ।

বিশাল কমপাউন্ডটা বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘেরা। গীর্জার পেছন দিকে ছোট ছোট দুটো একতলা বাড়িতে স্কুল এবং হাসপাতাল। তা ছাড়া বাদ বাকি জায়গা ফাঁকা। সেখানে সবজির এবং নানারকম ফুল-ফলের বাগান। আর রয়েছে একটা মাঝারি পুকুর, কুয়ো। পুকুরের একধারে বাঁধানো ঘাট, সেখানে বসার জন্য সিমেন্টের বেঞ্চ রয়েছে। অবশ্য বাগানেও অনেকগুলো জায়গায় সিমেন্টে বাঁধিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছুটির দিন বলে স্কুল বন্ধ। তবে হাসপাতাল খোলা রয়েছে। সেখানে বেশ ভিড়। কিন্তু এতটুকু হই চই, চিৎকার নেই। শান্ত পবিত্র এই গীর্জার মর্যাদা রেখে এবং শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে চুপচাপ রোগীরা আসছে, যাচ্ছে। এখানকার অগাধ শান্তি এবং পবিত্রতায় যাতে এতটুকু বিঘ্ন না ঘটে, সেদিকে সবার সীমাহীন সতর্কতা।

রেভারেন্ড টিরকে গীর্জাবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর চোখ আকাশের দিকে। ঝাঁকে ঝাঁকে পরদেশি 'শুগা' দূরের সীমাহীন শস্যক্ষেত্রগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। আর আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অগুনতি শঙ্খচিল। রেভারেন্ড টিরকে দূরমনস্কর মতো এই সব পাখি দেখছিলেন।

তাঁর বয়স ষাট বাষট্টি। চুলের বেশির ভাগটাই সাদা হয়ে গেছে। খুব লম্বা নন, আবার বেঁটেও বলা যাবে না তাঁকে। মাঝারি উচ্চতার এই মানুষটির শরীরে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। অথচ স্বাস্থ্যটি খুবই মজবুত। গায়ের রং তামাটে, ঠোঁট পুরু এবং কালচে, ছড়ানো মোটা নাক, চাপা চোখ। পরনে ধবধবে ঢোলা সারপ্লিস।

তাঁর চোখে মুখে এক ধরনের সারল্য এবং শুচিতা মাখানো। বোঝাই যায়, এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘকালের শুদ্ধ জীবনযাপন।

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধান্বিতের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছে অর্জুন। আসলে ঠিক কিভাবে শুরু করবে, সেটাই ভেবে উঠতে পারছিল না। একসময় আস্তে করে নিচু গলায় বলেছিল, 'নমস্তে—'

চমকে আকাশের দিক থেকে চোখ নামিয়েছিলেন রেভারেন্ড টিরকে। একটু অবাক হয়ে অর্জুনকে লক্ষ করতে করতে হাতজোড় করে বলেছিলেন, 'নমস্তে। তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। কোত্থেকে আসছ?'

'আমি নমকপুরাতেই থাকি। আপনি না চিনলেও আমি আপনাকে চিনি।'

'তোমার নামটা জানা হয়নি।'

ব্যস্তভাবে অর্জুন তার নাম জানিয়ে দেয়।

রেভারেন্ড টিরকে বলেছেন, 'ব্রাহ্মণ!'

'হাঁ।'

বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রেভারেন্ড টিরকে বলেছেন, 'এখানে তো কখনও কোনো ব্রাহ্মণ আসে না। আমার কাছে তোমার কিছু দরকার আছে?'

বিনীত ভঙ্গিতে অর্জুন বলেছিল, 'হাঁ।'

'বল।'

চার্চে আসার উদ্দেশ্যটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছিল অর্জুন।

কথাটা ঠিকই বলেছে অর্জুন। রামঅবতার বুঝতে পেরেছিল ইংরেজি শেখা, টাইপ রাইটিং আর শর্টহ্যান্ড চাকরির পক্ষে অত্যন্ত হিতকর এবং জরুরি। একান্ত নিরুপায় হয়ে অত্যান্ত কড়া শর্তে অর্জুনকে এখানে আসতে দিয়েছে সে। এখানকার কোনো কিছুই খেতে পাবে না অর্জুন। এমন কি জল পর্যন্ত না। এখান থেকে ফিরে গিয়ে ঘরে ঢোকার আগে তাকে 'নাহানা' অর্থাৎ স্নান করে মাথায় গঙ্গাপানি ঢেলে শুদ্ধ হতে হবে।

রেভারেন্ড টিরকে একটু ভেবে বলেছিলেন, 'আমার অসুবিধা নেই। কিন্তু—'

'কী?'

'তুমি যে এখানে এসেছ তোমার বাবুজি জানেন?'

'হাঁ।'

রেভারেন্ড টিরকে এবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার বাবুজি একটুও আপত্তি করেননি?'

কোন কোন শর্তে অর্জুনকে এখানে আসতে দেওয়া হয়েছে তা তো আর তার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিছুটা ইতস্তত করে অর্জুন বলেছে, 'না। তেমন কিছু—'

রেভারেন্ড টিরকে এ ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন না করে বলেছিলেন, 'চল, আমার বাংলোতে যাওয়া যাক।'

চার্চ কমপাউন্ডের দক্ষিণ দিকের বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁষে ছোটখাট ছিমছাম একটা বাংলো। দেওয়ালগুলো ইটের। লাল সিমেন্ট জমিয়ে মেঝে। জানালায় দুটো করে পাল্লা—একটা কাচের, আরেকটা কাঠের ঝিলমিল। চারপাশ পরিচ্ছন্ন। কোথাও এক কুচি বাজে কাগজ কি শুকনো পাতা বা এতটুকু ধুলোবালি নেই।

বাংলোটা বেশ কিছুটা উঁচুতে। আট দশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। প্রতিটি সিঁড়ির দু'ধারে টবে সমান মাপের ঝাউ।

রেভারেন্ড টিরকে অর্জুনকে সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে দেখা গেল সামনের দরজাটা খোলা রয়েছে।

ভেতরে ঢুকতে প্রথমেই বিশাল একখানা ঘর। বসবার জন্য বেতের কয়েকটা সোফা এবং গোলাকার পাঁচ সাতটা মোড়া। সেগুলোর মাঝখানে বেতেরই চৌকো সেন্টার টেবল। একপাশের সলিড দেওয়ালের গোটাটা জুড়েই বইয়ের আলমারি। তার ভেতর অজস্র বই ঠাসা রয়েছে। আরেক দিকের দেয়ালে যিশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ মূর্তির বিরাট অয়েল পেইন্টিং। তাছাড়া অত বড় না হলেও বুদ্ধদেব শ্রীচৈতন্য বিবেকানন্দ গান্ধীজি এবং অশোকচক্রের একটি ছবিও টাঙানো রয়েছে। ছবির দেওয়াল ঘেঁষে একটা বড় টেবলে টাইপ রাইটার মেশিন থেকে শুরু করে প্রচুর ফাইল, নানা কাগজপত্র, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি চমৎকার সাজানো রয়েছে। এই বাংলোয় সমস্ত কিছুতেই যত্ন এবং পরিচ্ছন্নতার ছাপ।

অসীম কৌতূহলে সব কিছু দেখতে দেখতে নিজেদের বাড়ির একটা ছবি অর্জুনের চোখের সামনে পাশাপাশি ফুটে উঠেছিল। সেখানকার নোংরা আবহাওয়া, এখানে ওখানে জঞ্জাল এবং গোবরের স্তূপের কথা ভাবতেই তার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

রেভারেন্ড টিরকে একটা সোফা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'বসো—'

অর্জুন বসার পর মুখোমুখি বসতে বসতে রেভারেন্ড টিরকে গলার স্বর সামান্য তুলে ডাকতে শুরু করেছিলেন, 'কমলা, কমলা—'

ঘরটার পেছন দিকেও একটা খোলা দরজা। তার ভেতর দিয়ে ওদিকের বেশ খানিকটা দেখা যাচ্ছিল। সেখানে আরো দু-তিনটে শোওয়ার ঘর, রান্নাঘর এবং বাঁধানো কুয়োতলা।

ভেতর থেকে তক্ষুনি সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, 'কী বলছ?'

কোনো মেয়ের গলা। কণ্ঠস্বরটি মিষ্টি এবং সুরেলা। রেভারেন্ড টিরকে কি বিবাহিত? তাঁর কি ছেলেমেয়ে সংসার আছে? অর্জুন ঠিক বুঝতে পারছিল না।

রেভারেন্ড টিরকে বলেছিলেন, 'কী করছিস তুই?'

'মঙ্গরা বহীন রসুই চড়িয়েছে। আমি তার সবজি কুটে দিচ্ছি।'

'একটু এ ঘরে আসতে পারবি?'

'কেন?'

'একজন গেস্ট এসেছে।'

'যাই।'

কিছুক্ষণ পর কমলা বাইরের ঘরে চলে এসেছিল। তখন তার বয়স ষোল। এখনকার চেয়ে কিছুটা রোগা। পরনে ছিল একটা হলুদ রঙের শাড়ি আর লাল জামা। কপালে, গলায় এবং গালে দানা দানা ঘাম জমেছিল। দু হাতে নক্‌শা-করা রুপোর কাংনা বা কঙ্কণ।

রেভারেন্ড টিরকে অর্জুনকে বলেছিলেন, 'এ হল কমলা। আমার মেয়েই বলতে পার। আমার ঘর-সংসার সব ও দ্যাখে।'

অর্জুন বুঝতে পেরেছে, কমলা রেভারেন্ড টিরকের মেয়ে নয়। 'মেয়েই বলতে পার' বলতে সম্পর্কটা কী দাঁড়ায় সেটা সে ধরতে পারছিল না। তবে যার হাতে ঘর-সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে যে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

রেভারেন্ড টিরকে এবার কমলাকে অর্জুনের পরিচয় দিয়ে কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে, জানিয়ে দিয়েছিলেন।

এ ব্যাপারটা অর্জুনের ভাল লাগেনি। তার আসার কারণটা জানাজানি হোক, এটা একেবারেই কাম্য নয়। যতটা সম্ভব গোপনে এসে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে যাবে, এটুকু হলেই সে খুশি। কিন্তু যে চার্চ ঘিরে অচ্ছুৎ আর খ্রিস্টানদের মেলা বসে থাকে, সেখানে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের ছেলের নিয়মিত যাতায়াতের খবর রটে গেলে নমকপুরা টাউনে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে।

রেভারেন্ড টিরকে অর্জুনের দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'একটু চা দিতে বলি?'

চমকে উঠেছিল অর্জুন। পরক্ষণে শশব্যস্তে বলেছে, 'আমি তো চা খাই না।'

'ও, তাহলে অন্য কিছু—' বলে কমলার দিকে তাকিয়েছিলেন রেভারেন্ড টিরকে, 'কি রে, ঘরে পেঁড়া লাড্ডু কিছু আছে?'

বুকের ভেতর শ্বাস আটকে এসেছিল অর্জুনের। রুদ্ধ গলায় সে বলেছে, 'আমি এইমাত্র খেয়ে এসেছি। এখন আর কিছু খাব না।'

'প্রথম দিন এলে। একটু মিঠাই-টিঠাই—' বলতে বলতে আচমকা থেমে গিয়ে কিছুক্ষণ পর ফের শুরু করেছিলেন, 'আমার একেবারে ভুল হয়ে গেছে। তোমরা তো ব্রাহ্মণ—'

রেভারেন্ড টিরকের চোখে মুখে ক্ষোভ বা ব্যঙ্গের চিহ্নমাত্র ছিল না। ব্রাহ্মণেরা যে খ্রিস্টান বা অন্য কোনো জাতের, এমন কি হিন্দু সমাজের একেবারে নিচু লেভেলে যারা আছে তাদেরও কারুর ছোঁয়া খাবে না, এটাকে তিনি অভ্রান্ত এবং স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবেই মেনে নিয়েছেন। কমলার দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'না রে, ওর জন্যে কিছু আনতে হবে না। যদি পারিস আমাকে একটু চা দিস।'

কমলা পলকহীন অর্জুনের দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখ না সরিয়ে অন্যমনস্কর মতো সে বলেছে, 'আচ্ছা—'

'চা নিয়ে আয়। একটা দরকারি কথা বলব।'

কমলা অর্জুনকে লক্ষ করতে করতে ভেতরে চলে গেছে। তার চোখে এমন কিছু ছিল যাতে ভেতরে ভেতরে একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিল অর্জুন। মেয়েটার কী জাত তখনও সে জানে না। ব্রাহ্মণ না হয়ে অন্তত কায়াথও যদি হত, তার ছোঁয়া খেতে আপত্তি ছিল না। কমলার চেহারা, পোশাক এবং কথাবার্তার ধরন উঁচু ঘরের মেয়েদের মতো। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না অর্জুন। কেননা সেই মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে, নমকপুরার চার্চে অচ্ছুৎ এবং খ্রিস্টান ছাড়া আর কেউ আসে না। কাজেই

কমলার জাতপাত সম্পর্কে সংশয় থাকার কথা নয়।

কয়েক মিনিট বাদে চা নিয়ে ফিরে এসেছিল কমলা। তার চোখে সেই অদ্ভুত চাউনি। আগের মতোই সে অর্জুনকে লক্ষ করছিল। তার তাকানোর ভঙ্গিতে একই সঙ্গে ছিল বিস্ময়, ক্ষোভ এবং হয়ত বা একটুখানি সূক্ষ্ম অপমানবোধ। কোনো উচ্চবর্ণের মানুষ, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ যে চার্চে আসতে পারে, এটা ছিল তার ধারণার বাইরে। বিস্ময়টা সেই কারণে। আর চিরকালের নিয়ম ভেঙে অর্জুন যখন তার জাত খানিকটা খুইয়েই ফেলেছে, দুটো মিঠাই খেলে ব্রাহ্মণত্ব আর কতখানিই বা নষ্ট হত!

অর্জুনকে দেখতে দেখতে কমলা রেভারেন্ড টিরকেকে বলেছে, 'কী বলবে, বল—'

রেভারেন্ড টিরকে তার হাত থেকে চায়ের কাপ নিতে নিতে বলেছেন, 'অর্জুন কেন এসেছে, তোকে বলেছি—'

'হাঁ—' এবার মুখ ফিরিয়ে রেভারেন্ড টিরকের দিকে তাকিয়েছে কমলা।

'আমার তো হাজার রকমের কাজ। তবু তার ভেতর সময় করে ওকে শর্টহ্যান্ড আর ইংরেজিটা দেখিয়ে দেব। তুই কিন্তু টাইপ রাইটিংয়ের ব্যাপারে ওকে হেল্প করবি।'

সাত ফুট দূরত্বে বসে চমকে উঠেছিল অর্জুন। কমলার জাতপাত সম্পর্কে ততক্ষণে সে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। তার ওপর সে একটি যুবতী। টাইপ রাইটিংয়ে তালিম দেওয়ার যোগ্যতা তার আছে কিনা, সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণাই নেই অর্জুনের। তাছাড়া একটি অচ্ছুৎ বা খ্রিস্টান মেয়ের কাছে তাকে কিছু শিখতে হবে এবং সেই কারণে তাকে কমলার কাছে নিয়মিত হাজিরা দিতে হবে আর সেটা জানাজানি হয়ে গেলে বাড়িতে কী মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটে যাবে, এসব ভাবতেই ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিল অর্জুন। সে হঠাৎ বলে উঠেছে, 'রেভারেন্ড, আমার ইচ্ছা আপনিই আমাকে কষ্ট করে টাইপ রাইটিংটাও শেখান।'

রেভারেন্ড মানুষটি খুবই সাদাসিধে, কোনোরকম ঘোরপ্যাঁচ তাঁর মধ্যে নেই। অর্জুনের কেন যে কমলার কাছে শেখার অনিচ্ছা, তার একটি মাত্র সরল অর্থই তিনি নিজের মতো করে, করে নিয়েছিলেন। ব্যস্তভাবে তিনি বলে উঠেছেন, 'তুমি জানো না অর্জুন, টাইপ রাইটিংটা ভালই শিখেছে কমলা। নিজের হাতে আমি ওকে শিখিয়েছি। থার্টি ফাইভের মতো ওর স্পিড। নিশ্চিন্ত থাকতে পার, কমলা তোমাকে যথেষ্ট হেল্প করতে পারবে।' একটু থেমে আবার বলেছিলেন, 'যদি কোনোরকম অসুবিধা হয়, আমি তো আছিই।'

অর্জুন আর কিছু বলেনি, তবে মনের ভেতর অস্বস্তি আর খুঁতখুঁতুনিটা চলছিলই।

এদিকে কমলার দুই চোখ আবার অর্জুনের দিকে ফিরে এসেছে। সে বলেছিল, 'ফাদার, তুমিই ওকে দেখিয়ে দিও।'

অর্জুন লক্ষ করেছিল, কমলা রেভারেন্ড টিরকেকে ফাদার বলে।

রেভারেন্ড টিরকে বলেছিলেন, 'না না, এই দায়িত্বটা তোকেই নিতে হবে। তুই জানিস তো আমার কত কাজ। তার ভেতর থেকে সময় বার করে নেওয়া খুবই মুশকিল।'

চোখের কোণ দিয়ে অর্জুনকে দেখিয়ে কমলা বলেছিল, 'কিন্তু এর তো মেয়েদের কাছে শেখার বিলকুল ইচ্ছে নেই।'

মেয়েটা কি মুখ দেখে মনের কথা পড়তে পারে! অর্জুনের অস্বস্তি কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল।

এদিকে রেভারেন্ড টিরকে বলছিলেন, 'অর্জুন তোকে বলেছে?'

'না। তবে—'

'কী?'

'আমার মনে হচ্ছে।'

'তা হলে তো ভীষণ সমস্যা। আমি এত সময় কোথায় পাই!' রেভারেন্ড টিরকেকে খুবই চিন্তিত দেখিয়েছিল। তিনি আরো একবার অর্জুনকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, কমলা যথেষ্ট যত্ন করে শেখাবে, তার কোনো চিন্তার কারণ নেই, ইত্যাদি।

শেষ পর্যন্ত প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয়েছিল অর্জুন। সে আড়ষ্ট গলায় বলেছে, 'আমার একটা

আর্জি আছে রেভারেন্ড—'

'বল।'

'আমি যে এখানে রোজ আসব, কেউ যেন জানতে না পারে।' বলেই নিজের অজান্তে কমলার দিকে তাকিয়েছিল অর্জুন। চোখে পড়েছে মেয়েটার দৃষ্টি তার ওপর স্থির হয়ে আছে, কমলার মুখে চাপা ধারাল একটু হাসি। হাসিটা কি বিদ্রূপের? ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করেছিল অর্জুন।

রেভারেন্ড টিরকে বলে উঠেছিলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমাদের দিক থেকে তোমার ভয় নেই।' কমলার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তাই না রে কমলা?'

কমলা উত্তর দেয়নি, অর্জুনের মুখ থেকে চোখও সরায়নি।

পরের দিন থেকেই তালিম নেওয়া শুরু হয়েছিল।

সন্ধের পর নমকপুরা টাউনে অন্ধকার নামলে অর্জুন চার্চে চলে আসত। যে সব রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো জ্বলে, লোকজন গাড়িঘোড়ার চলাচল বেশি, সেগুলো বাদ দিয়ে অনেকটা ঘুরে ফাঁকা মাঠ-ঘাট ভেঙে সে আসত। বাড়ি ফিরত বেশ রাত করে। তখন নমকপুরা শহরের হইচই প্রায় থেমে গেছে। রাস্তায় ক্বচিৎ দু'চারটি মানুষ কি এক-আধটা টাঙ্গা বা সাইকেল রিক্‌শা চোখে পড়ত।

চার্চে এসে সোজা সে চলে যেত রেভারেন্ড টিরকের বাংলোয়। সেখানে অভ্রান্ত নিয়মে দেখা যেত, কমলা তার জন্য টাইপ রাইটার, কাগজ, কার্বন ইত্যাদি সাজিয়ে অপেক্ষা করছে। রেভারেন্ড টিরকেকে বেশির ভাগই দিনই বাংলোয় পাওয়া যেত না। তিনি মূল চার্চ বা হাসপাতালের কাজ সেরে ফিরতেন বেশ দেরি করেই।

অর্জুন আসামাত্রই কোচিং শুরু হয়ে যেত। কমলা মেয়েটা আশ্চর্য সাবলীল। তার মধ্যে কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। পাশাপাশি বসে টাইপ রাইটারের বোর্ডে ইংরাজি অক্ষরগুলো কিভাবে সাজানো আছে, জলের মতো বুঝিয়ে দিত।

কোনো অনাত্মীয় যুবতী অর্জুনের এত কাছে আগে কখনও বসেনি। তার ওপর সারা বাংলোয় কাজের মেয়ে মঙ্গলা ছাড়া অন্য কেউ নেই। সে-ও থাকত ভেতর দিকে—রান্নাঘরে কিংবা কুয়োর পাড়ে। চার্চের বিশাল কমপাউন্ডের এক কোণে নিঝুম বাংলোয় তারা দু'জন ছাড়া বাইরের বড় ঘরটায় সন্ধের পর অনেকটা সময় আর কেউ আসত না।

দেড় ফুট দূরত্বে বসার কারণে একেবারে কুঁকড়ে থাকত অর্জুন। কমলার মুখের দিকে তাকাতে পারত না সে। মেয়েটার শরীরের ঘ্রাণ, শাড়ি এবং চুলের গন্ধ নাকের ভেতর ঢুকে গিয়ে তার স্নায়ুমণ্ডলীকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলত। টাইপ রাইটারের হরফগুলো তার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বোধ্য ধাঁধার মতো মনে হত।

এভাবে ঘণ্টাখানেক কাটার পর রেভারেন্ড টিরকে বাংলোয় ফিরতেন। তখন খানিকটা আরাম বোধ করত অর্জুন।

ঘরে ঢুকেই রেভারেন্ড টিরকে রোজই জিজ্ঞেস করতেন, 'কিরকম প্রোগ্রেস করছে তোর স্টুডেন্ট?'

কমলা বলত, 'ভেরি আনমাইন্ডফুল। কিছু মনে রাখতে পারে না।'

কিন্তু তারপরেই যখন রেভারেন্ড টিরকে ইংরেজি ল্যাংগুয়েজ এবং শর্টহ্যান্ড নিয়ে বসতেন তখন একবারের বেশি দু'বার বলতে হত না অর্জুনকে।

রেভারেন্ড টিরকে বলতেন, 'আমার কাছে তো বেশ পারছে। তোর কাছে কি ঘাবড়ে যায়?'

কমলা ঠোঁট টিপে বলত, 'কি জানি। আমি শেরও না, ভাল্লুও না—'

'ওর ওপর নিশ্চয়ই কড়া স্কুল মিস্ট্রেসগিরি চালাচ্ছিস। একটু নরম করে কথা বলবি। নইলে ভরসা পাবে কেন?' বলে হাসতেন।

দিনকয়েক এভাবেই কেটে যায়। এর মধ্যে কমলা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতে পারেনি অর্জুন, যদিও তার কৌতূহল ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছিল। কথায় কথায় রেভারেন্ড টিরকে শুধু বলেছেন, কমলা

ছাত্রী হিসেবে ব্রিলিয়ান্ট। পরের বছর প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে এবং ভাল রেজাল্ট সে করবেই। মাত্র এটুকুই। কিন্তু সে কার মেয়ে, রেভারেন্ড টিরকের সঙ্গে তার যোগাযোগ কিভাবে হল, সে ওই বাংলোতেই থাকে কিনা—এ সব অজানা থেকে গেছে।

যাই হোক, আস্তে আস্তে অর্জুনের আড়ষ্টতা কেটে যাচ্ছিল। টাইপ রাইটারে হরফগুলো কোথায় কিভাবে সাজানো রয়েছে, মোটামুটি তার দখলে চলে এসেছিল। তবু মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যেত।

মনে আছে, একদিন আঙুলগুলো অক্ষরের ওপর সঠিক জায়গায় বসাতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল অর্জুনের। হঠাৎ বসবার মোড়াটা আরো কাছাকাছি টেনে এনে, অর্জুন কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার দু'হাত ধরে আঙুলগুলো জায়গামতো বসিয়ে দিয়েছিল কমলা। চাপা গলায় বলেছিল, 'বুদ্ধু কাঁহিকা, কিছুই মনে থাকে না!' শুধু হাতই না, তার কাঁধ এবং মাংসল উরুর অনেকটা অর্জুনের শরীরের নানা অংশে চেপে বসে গিয়েছিল।

সেই প্রথম তার গায়ে অনাত্মীয় কোনো তরুণীর স্পর্শ। রক্তস্রোতে বিজলি চমকের মতো কিছু বয়ে গিয়েছিল অর্জুনের আর হৃৎপিণ্ডে হাজারটা ঘোড়া ছুটে যাচ্ছিল যেন।

একসময় আচ্ছন্নের মতো কমলার দিকে তাকিয়েছে অর্জুন। সেই তাকানোর মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে মেয়েটার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গিয়েছিল। দ্রুত হাত সরিয়ে নিয়ে ছুটে সোজা ভেতরের একটা ঘরে চলে গেছে সে। সেদিন আর তাকে দেখা যায়নি।

কতক্ষণ বসে ছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ রেভারেন্ড টিরকের ডাকে চমকে উঠেছে অর্জুন।

'কী ব্যাপার, তুমি একা? কমলা কোথায়?'

আঙুল বাড়িয়ে বাংলোর ভেতর দিকটা দেখিয়ে দিয়েছিল অর্জুন।

রেভারেন্ড টিরকে এবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আজকের মতো টাইপ রাইটিংয়ের লেসন নেওয়া হয়ে গেছে?'

আবছা গলায় অর্জুন বলেছে, 'হাঁ। মতলব—' তার কথা পরিষ্কার বোঝা যায়নি।

রেভারেন্ড টিরকে তার চোখ-মুখ ভাল করে লক্ষ করেননি। জুতো মোজা খুলতে খুলতে বলেছেন, 'তা হলে টেবল থেকে পিটম্যানের বইটা নিয়ে এস, শর্টহ্যান্ড শুরু করা যাক। কাল যেন কোন পর্যন্ত হয়েছিল? তারপর—'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই আচমকা উঠে দাঁড়িয়েছে অর্জুন।

রেভারেন্ড টিরকে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী হল?'

'আমি আজ বাড়ি যাব।'

'এখনই? কেন?'

নিতান্ত আনাড়ির মতো মিথ্যে বলেছিল অর্জুন, 'জরুরি কিছু কাজ আছে।'

অন্য কেউ হলে ধরা পড়ে যেত সে। কিন্তু রেভারেন্ড টিরকে এতই ভালমানুষ যে কাউকেই তিনি অবিশ্বাস করতে শেখেননি। বলেছেন, 'ঠিক আছে। যাও—' বলে ভেতর দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর সামান্য তুলে বলেছিলেন, 'কমলা, তোর স্টুডেন্ট চলে যাচ্ছে। এসে গুড নাইট বলে যা—'

ভেতর থেকে কোনো উত্তর এসেছিল কিনা এতকাল পরে মনে পড়ে না।

অর্জুন আর দাঁড়ায়নি, কোনো দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

পরের দিন থেকে প্রায় মাখসানেক অর্জুন বা কমলা কেউ কারুর দিকে ভাল করে তাকাতে পর্যন্ত পারেনি। এমন কি স্বাভাবিকভাবে কথাও বলত না। আগে কাছাকাছিই বসত কমলা। এখন থেকে প্রায় পাঁচ ফুট দূরত্বে বসে 'এখানে আঙুল', 'ওখানে ওয়াই'—এইভাবে যতটা সংক্ষেপে সম্ভব কাজ চালিয়ে যেত। কেউ কারুর দিকে সোজসুজি না তাকালেও অর্জুন হঠাৎ মুখ ফেরালেই দেখতে পেত, চোখের কোণ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে নিঃশব্দে হাসছে কমলা এবং তার সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠছে।

অর্জুন টের পেত, কমলার ঠোঁটের হাসিটা কখন যেন তার ঠোঁটেও উঠে এসেছে।

একটা মাস এভাবে কাটার পর হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা অর্জুন যখন কমলার কাছে টাইপ রাইটিং-এর লেসন নিচ্ছে, হঠাৎ রেভারেন্ড টিরকে বাংলোয় চলে এলেন। এত তাড়াতাড়ি তিনি চার্চ বা হাসপাতাল থেকে ফেরেন না। ঘরে ঢুকেই ব্যস্তভাবে বলেছিলেন, 'অর্জুন, কমলা—এক্ষুনি বিশেষ একটা দরকারে আমাকে পাটনা যেতে হচ্ছে। এই উইকটা ওখানে থাকতে হবে। যে ক'দিন না ফিরি, অর্জুন তুমি একটা কাজ করবে, তোমার লেসন নেওয়া হয়ে গেলে কমলাকে ওদের টোলা পর্যন্ত যদি এগিয়ে দাও ভাল হয়।'

অর্জুন চমকে উঠেছিল। সেদিন সে প্রথম জানতে পেরেছিল, কমলা রাত্তিরে এখানে থাকে না। কাছাকাছি, নাকি অনেক দূরে ওদের টোলা বা মহল্লা?

অর্জুন উত্তর দেওয়ার আগেই কমলা বলে উঠেছে, 'না না, কাউকে কষ্ট করতে হবে না। আমি একাই চলে যেতে পারব।'

রেভারেন্ড টিরকে বলেছিলেন, 'কক্ষনো না, ওদিকটা রাত্তিরে অন্ধকার হয়ে থাকে। মিউনিসিপ্যালিটির বাতি নেই। তা ছাড়া একটা দিশি মদের দোকান রয়েছে। ওখানে যত মাতালের আড্ডা। রাত্তিরে মেয়েদের একা একা ওই সব রাস্তা দিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।'

কমলা আর কিছু বলেনি।

অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল, 'ওদের টোলাটা কোথায়?'

রেভারেন্ড টিরকে যা জানিয়েছিলেন তা এইরকম। চার্চ থেকে আড়াই তিন ফার্লং উত্তরে যে অচ্ছুৎটোলাটা রয়েছে তারই একধারে দোসাদদের মহল্লা। সেখানে কমলাদের ঘর।

আবছাভাবে অর্জুন আগেই টের পেয়েছিল, কমলা হয় অচ্ছুৎ, নতুবা খ্রিস্টান। এরা ছাড়া কেউ তো নমকপুরার গীর্জায় আসে না। কিন্তু এর পাশাপাশি কমলার কথাবার্তা শুনে, চালচলন এবং রাহান-সাহান দেখে তার মনে ক্ষীণ একটু আশা জেগেছিল, হয়ত মেয়েটা খ্রিস্টান বা অচ্ছুৎ না-ও হতে পারে। অনিবার্য কোনো কারণে তাকে এখানে আসতে হয়েছে। কিন্তু যে মুহূর্তে অর্জুন জেনে যায় সে দোসাদ, তৎক্ষণাৎ তার অস্তিত্বের নানা স্তরে জমে থাকা ব্রাহ্মণত্বের আদিম সংস্কার রীতিমত ধাক্কা খায়। কমলা দোসাদ না হলে পৃথিবীর কারুর আদৌ কোনো ক্ষতি হত না। বাতাস তেমনই বয়ে যেত, নদীর জলধারা থেমে থাকত না, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের কোনো ব্যাঘাত ঘটত না। কমলা অচ্ছুৎ হওয়াতে জগতে সামান্য যে ক্ষতিটুকু হয়েছে হয়ত তা একান্তভাবেই অর্জুনের। খুবই ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের বিরাট বিরাট সমস্যার তুলনায় নেহাতই অকিঞ্চিৎকর।

রেভারেন্ড টিরকে অর্জুনের মুখ চোখ দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে বলেছিলেন, 'তোমাকে ভেতরে ঢুকতে হবে না। অচ্ছুৎটোলার মুখ পর্যন্ত সঙ্গে গেলেই ও চলে যেতে পারবে।' একটু থেমে ব্যস্তভাবে ফের শুরু করেছেন, 'না না, অচ্ছুৎটোলার খুব কাছে যেও না। খানিকটা দূরে যে পিপর গাছটা রয়েছে সেই পর্যন্ত গেলেই চলবে। কেউ তোমায় দেখে ফেললে বিপদ হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই তোমার মা-বাবা কিংবা তোমাদের জাতের লোকজনের কাছে খবরটা পৌঁছে দেবে। এতটা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।'

অর্জুনের বুকের ভেতর তোলপাড় চলছিল। দ্বিধান্বিতভাবে সে বলেছে, 'ঠিক আছে।'

এরপর কমলাকে দিয়ে দ্রুত একটা স্যুটকেসে কিছু জামা-কাপড় সারপ্লিস ভরিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন। অর্জুনরাও দেরি করেনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তারাও বেরিয়ে পড়েছে।

চার্চের কমপাউন্ডে আসতেই চারদিকে পাতলা অন্ধকার নেমে গিয়েছিল। নমকপুরা মিউনিসিপ্যালিটি শহরের এদিকটায় রাস্তাঘাটে ল্যাম্প পোস্ট বসানোটা জরুরি মনে করেনি। নেহাত আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ ছিল, গলানো রুপোর মতো জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছিল চরাচর। তাই হাঁটতে তেমন একটা অসুবিধা হচ্ছিল না।

কোনো তরুণীর সঙ্গে আগে আর কখনও এভাবে পাশাপাশি হাঁটেনি অর্জুন। মায়াবী জ্যোৎস্নালোকে মনে হচ্ছিল, তারা যেন অপার্থিব এক স্বপ্নের ভেতর চলে এসেছে। কমলা যে দোসাদ, তাকে ছুঁলেও যে ব্রাহ্মণদের দশ বার নাহানা করে শুদ্ধ হতে হয়—এসব কথা আর অর্জুনের মনে পড়তে চাইছিল

না।

গীর্জার পর থেকে উত্তর দিকটা অনেকখানি ফাঁকা। তারপর ছাড়া ছাড়া ভাবে খ্রিস্টানদের পাড়া। অচ্ছুৎদের ভেতর যারা ষাট সত্তর বছর আগে খ্রিস্টান হয়েছে এটা তাদের কলোনি। নমকপুরার আদি খ্রিস্টানদের বেশির ভাগই মরে ফৌত হয়ে গেছে। কিছু প্রাচীন বুড়োবুড়ি এবং পরের দুই জেনারেশনের মানুষেরা এখানে থাকে।

খ্রিস্টান হওয়ার পরও এই অচ্ছুৎদের হাল প্রায় কিছুই ফেরেনি। অন্য সব অচ্ছুৎ যারা হিন্দু সোসাইটির একেবারে নিচের স্তরে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে, এরা তাদের মতোই গরিব, হাভাতে। তবে গাঙ্গোতা, ধাঙড় বা দোসাদদের থেকে এক দিকে তারা খানিকটা এগিয়ে আছে। কয়েক বছর ধরে তাদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ দেখা দিয়েছে। তারা শুনেছে শিডিউল্ড কাস্ট, শিডিউল্ড ট্রাইব এবং মাইনোরিটিদের অর্থনৈতিক সুরক্ষার জন্য চাকরি-বাকরির 'কোটা' ঠিক করা আছে। অচ্ছুৎ-থেকে-খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া এই সব মানুষের আশা, লেখাপড়া শিখে উচ্চ বর্ণের বামহন-কায়াথদের মতো তাদের ছেলেপুলেরাও একদিন দামি দামি নৌকরি করে দারিদ্র, হতাশা এবং আবহমান কালের অপমান কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।

খ্রিস্টানদের পাড়ায় এখনও বিজলি আসেনি। ঘরে ঘরে কেরোসিনের ডিবে বা হেরিকেন জ্বলছিল। দূর থেকে তাদের কথাবার্তা এবং রান্নার ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছিল।

চুপচাপ দু'জনে খ্রিস্টানদের পাড়াটা পেরিয়ে গেছে। একদিক থেকে বাঁচোয়া, রাস্তাটা একেবারে ফাঁকা, কোথাও লোকজন নেই।

চলতে চলতে বার বার মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকে লক্ষ করছিল কমলা। হঠাৎ সে বলে উঠেছে, 'আপনার বহুত 'ঘিন' (ঘৃণা) লাগছে তো?'

চমকে সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়েছে অর্জুন। বলেছে, 'কেন?'

'আমার মতো একটা অচ্ছুতের মেয়েকে সঙ্গে করে পৌঁছে দিতে হচ্ছে বলে।'

আড়ষ্ট, কাঁপা কলায় অর্জুন বলেছে, 'না না, ঘিন লাগবে কেন?'

কমলা জিজ্ঞেস করেছে, 'তা হলে কী এত ভাবছেন?'

'কই, কিছু না, কিছু না—'

'কিছু না তো, এতক্ষণ পাশাপাশি হাঁটছি, একটা কথাও কিন্তু বলেননি। গুংগার মতো, জাস্ট লাইক ডাম্ব, আমরা চলছি তো চলছিই। ফাদার আপনাকে ভীষণ বিপদে ফেলে দিয়েছেন।'

মনে আছে, কথা বলতে গেলে কমলার মুখ থেকে দু-চারটে ইংরেজি শব্দ বেরিয়ে আসত। একটু আগে সে যা বলেছিল তাতে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ ছিল কি? অর্জুনের পৌরুষে হয়ত কোথাও একটু খোঁচা লেগেছিল। প্রবল বেগে মাথা নেড়ে সে বলে উঠেছে, 'কোনো বিপদে ফেলেননি।'

'ট্রু?'

'হাঁ, ট্রু।'

খ্রিস্টান পাড়ার পর আবার অনেকটা জায়গা একেবারে নির্জন। দু'ধারে বাড়িঘর বা বসতি-টসতি বলতে কিছু নেই। শুধু উঁচুনিচু পড়তি জমি, আগাছার ঝোপ, বুনো লতার ঝাড়। সেই রাত্তিরে আলোর ছুঁচ হয়ে অগুনতি জোনাকি আবছা অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে মাঠের ওপর ওড়াউড়ি করছিল।

জনশূন্য মাঠের পর দারুখানা অর্থাৎ দিশী মদ, তাড়ি, গাঁজা এবং ভাঙের দোকান। সেখানে হ্যাজাক জ্বলছিল, অনেক দূর থেকে তেজী আলোটা চোখে পড়েছে। আর ভেসে আসছিল শরাবীদের জড়ানো গলার হল্লা, চিৎকার এবং অকথ্য খিস্তি-খেউড়।

দারুখানাটা ডানদিকে, একেবারে রাস্তার ধার ঘেঁষে। অর্জুনরা বাঁ পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে, শ্বাসরুদ্ধের মতো এগিয়ে গেছে। দারুখানার মাতালেরা এমন চুর হয়ে ছিল এবং নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত যে কে কার সঙ্গে যাচ্ছে, এসব ব্যাপারে আদৌ তাদের মাথাব্যথা নেই।

যেতে যেতে হঠাৎ অর্জুনের হৃৎপিণ্ডটা থমকে গেছে যেন। দারুখানার ভেতর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার মান্ধাতা শর্মার ভাই চতুর্ভুজ শর্মাকে দেখা গেছে। নমকপুরা শহরের সে একজন প্রথম

শ্রেণীর শরাবী এবং গাঁজাখোর। ক্ষয়াটে ভাঙাচোরা চেহারা তার, তোবড়ানো গাল, মাথায় হেজে যাওয়া সামান্য কিছু কাঁচাপাকা চুল, ঘোলাটে চোখ, সারা মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি।

চতুর্ভুজ তার শির বার-করা রোগা হাতে মুঠি পাকিয়ে গলার নলি ফাটিয়ে চেরা চেরা, খ্যাসখেসে স্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। অন্য সব মাতালের হল্লা ছাপিয়ে তার গলা ক্রমাগত চড়ছিল।

অর্জুন জানত, মদ ভাং গাঁজা-টাঁজা পেলে চতুর্ভুজ নরকের শেষ মাথা পর্যন্ত দৌড়ে যেতে পারে। কিন্তু নমকপুরা টাউনের ওই দারুখানায়, যেখানে অচ্ছুতেরা ছাড়া আর কেউ আসে না সেখানে পবিত্র শর্মা বংশের একটি কুলাঙ্গারকে দেখা যাবে, এটা ভাবা যায়নি। নেশার কারণে নামতে নামতে কোথায় এসে ঠেকেছে সে! হঠাৎ অর্জুনের মনে পড়ে গিয়েছিল, নমকপুরার ব্রাহ্মণেরা পাঁড় শরাবী চতুর্ভুজকে একরকম খারিজই করে দিয়েছে। মান্ধাতা শর্মা কতদিন যে নেশায় চুর চুর চতুর্ভুজকে বাড়ি থেকে বার করে দেয় তার ঠিক নেই।

প্রথমটা ভীষণ অবাক হয়েছিল অর্জুন। পরক্ষণে মারাত্মক ভয়ে তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের স্রোত ছুটতে থাকে। চতুর্ভুজের সঙ্গে লতায় পাতায় তাদের কিরকম যেন আত্মীয়তা রয়েছে। সে যদি আচমকা রাস্তার দিকে মুখ ফেরাত, দেখতে পেত, একটা যুবতীর সঙ্গে বিশুদ্ধ দ্বিবেদী বংশের এক জোয়ান 'ছৌরা' অচ্ছুৎটোলার দিকে চলেছে। তারপর এক ঘণ্টার ভেতর নমকপুরার তাবৎ ব্রাহ্মণের কাছে এই অত্যন্ত উত্তেজক খবরটা চাউর হয়ে যেত।

তেত্রিশ কোটি স্বর্গবাসী দেবদেবীর অপার করুণা, চতুর্ভুজ একবারও রাস্তার দিকে তাকায়নি। অর্জুন নির্বিঘ্নেই কমলাকে সঙ্গে নিয়ে দারুখানা পেরিয়ে গেছে।

এরপর খানিকটা গেলেই ঝাঁকড়া-মাথা বিশাল পিপর গাছ। সেখানে এসে কমলা বলেছে, 'আর আসতে হবে না। এবার আপনি ফিরে যান।'

এখান থেকে শ'খানেক গজ দূরে অচ্ছুৎটোলার ঘরে ঘরে টিমটিমে কেরোসিনের বাতিগুলো দেখা যাচ্ছিল। অর্জুনের মনে পড়ে গেছে, এই পিপর গাছটা পর্যন্তই কমলাকে এগিয়ে দিতে বলেছিলেন রেভারেন্ড টিরকে। সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

কমলা বলেছে, 'আপনার অনেক কষ্ট হল।'

অর্জুন বলেছে, 'না, কিসের কষ্ট !'

কমলা একটু হেসে বলেছে, 'আচ্ছা যাই, কাল আবার দেখা হবে। আপনি আর দাঁড়াবেন না। অনেকটা দূর আপনাকে যেতে হবে।'

কমলা অচ্ছুৎটোলার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। পাতলা অন্ধকারে তার বেতের মতো মেদশূন্য সতেজ শরীর ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল।

ফেরার সময় আগের মতোই অত্যন্ত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে দারুখানাটা পেরিয়ে গেছে অর্জুন। যদিও এবার সঙ্গে একটি যুবতী নেই, তবু অচ্ছুৎটোলার দিকে কোনো সদ্বংশের ব্রাহ্মণ যুবকের আসাটা রীতিমত গর্হিত কাজ। প্রশ্ন উঠতে পারে, চতুর্ভুজও তো এখানকার দারুখানায় হানা দিয়েছে। চতুর্ভুজের এই দুষ্কর্মটি এতই প্রাচীন যে কারুর জানতে বাকি নেই। এটা সবার প্রায় গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু অর্জুনের অপরাধটা এত টাটকা এবং অভাবনীয় যে বারুদের স্তূপে মুহূর্তে আগুন ধরে যাবে।

এবারও রাস্তাব দিকে তাকায়নি চতুর্ভুজ। আগের মতো একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, গলার স্বর এক জায়গায় রেখে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল সে।

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে অর্জুনের মনে হয়েছে, চতুর্ভুজ এখানকার দারুখানায় নিশ্চয়ই নিয়মিত হাজিরা দেয়। কাজেই এদিকে আর আসা ঠিক হবে না। একদিন চতুর্ভুজের চোখ এড়ানো গেছে। কিন্তু রোজই যে সে উলটো দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে যাবে এবং ভুলেও রাস্তার দিকে তাকাবে না, এর কি কোনো গ্যারান্টি আছে?

কিন্তু পরের দিন কমলাকে দেখার পর আগের রাতের সিদ্ধান্তটা আর মনে থাকেনি। টাইপ রাইটিং-এর লেসন নেওয়া হয়ে গেলে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। অচ্ছুৎটোলার দিকে যেতে যেতে

সেদিন আরো অনেক কথা হয়েছিল কমলার সঙ্গে। তখনই সে প্রথম জানতে পেরেছে, কমলার বাবার নাম জগলাল। তাদের সংসারে মা-বাবা ছাড়া রয়েছে বুড়ি দাদী এবং তারা পাঁচ ভাইবোন। ভাইবোনদের মধ্যে কমলাই সবার বড়।

কমলাদের এক ধুর জমিও নেই। তার বাপ জগলাল এবং মা নাথুনিকে উদয়াস্ত মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার মান্ধাতা শর্মার খেত আর খামারে 'গতর চূরণ' খাটাখাটনি করে এত বড় সংসারের পেটের দানা জোটাতে হয়। তারা গরিবের চাইতেও গরিব, কৃমিকীটের মতো জগতের এক কোণে পড়ে আছে।

কমলাদের সংসারের যা হাল তাতে তার লেখাপড়া করে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। এ জাতীয় শৌখিনতা গরিব আনপড় দোসাদদের জীবনে একেবারেই বেমানান। আবহমান কাল ধরে অচ্ছুৎটোলার ছেলেমেয়েরা যা করে এসেছে সে এবং তার ভাইবোনদের ঠিক তা-ই করতে হত। মা-বাপের পিছু পিছু মান্ধাতা শর্মা কি বড় জমিমালিক রাজপুত ক্ষত্রিয় হেমরাজ সিংয়ের জমিতে লাঙল ঠেলতে বা কোদা (এক ধরনের আগাছা) বাছতে যেতে হত। কিন্তু রেভারেন্ড টিরকে এসে সব কিছু ওলটপালট করে দিয়েছেন। গীর্জার কমপাউন্ডে একটা প্রাইমারি স্কুল খুলে কয়েক বছর আগে ছাত্র-ছাত্রীর খোঁজে অচ্ছুৎটোলায় এবং খ্রিস্টানদের পাড়ায় হানা দিয়েছিলেন। খ্রিস্টানদের মহল্লায় তবু কিছু সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু অচ্ছুৎটোলার বাসিন্দারা লেখাপড়ার মতো একটা উটকো বিলাসিতাকে একেবারেই আমল দেয়নি। তাদের কাছে এটা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। এর চেয়ে খেতে গিয়ে বাপ মায়ের সঙ্গে লাঙল চষলে দু-এক সের বেশি গেঁহু কি মকাই পাওয়া যাবে। একমাত্র দোসাদ জগলাল, বরখী ধাঙড় এবং বুদি চামার রেভারেন্ড টিরকেকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়নি। অচ্ছুৎটোলার অন্য বাসিন্দাদের তুলনায় তারা অনেকখানিই দূরদর্শী। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝেছে, লেখাপড়া শেখাটা খুবই জরুরি। এর মধ্যে বিরাট শক্তি ঠাসা রয়েছে।

রেভারেন্ড টিরকে বুঝিয়েছিলেন, কোনোরকমে খানিকটা লেখাপড়া করতে পারলে তাদের হাল একেবারে পালটে যাবে। শিডিউল্ড কাস্ট আর শিডিউল্ড ট্রাইবদের জন্য চাকরি বাকরির আলাদা কোটা রয়েছে।

বি.এ. এম. এ পাশ করলে তো কথাই নেই। যেমন তেমন করে ম্যাট্রিকটা পাশ করলেও চাকরি পাওয়া অবধারিত। শুধু ক'টা বছর একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে, খানিকটা কষ্টও করতে হবে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাবলে এই কষ্টটুকু কিছুই নয়।

প্রথম দিকে দশ বারটি ছেলেমেয়ে নিয়ে স্কুল খুলেছিলেন রেভারেন্ড টিরকে। তাদের ভেতর কমলাও ছিল।

কমলাকে পড়াতে পড়াতে রেভারেন্ড টিরকের মনে হয়েছে, এমন ঝকঝকে ভাল ছাত্রী আগে আর কখনও পাননি। শুরু থেকেই তিনি তার ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিলেন। কমলাকে নিয়ে বুঝিবা তাঁর মনে একটা গোপন চ্যালেঞ্জ ছিল। হয়ত ভেবেছিলেন, সমাজের একেবারে নিচু লেভেল থেকে তুলে এনে অনেক উঁচুতে তাকে পৌঁছে দেবেন। সেজন্য কমলা ক্লাস ফাইভে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার বাপকে বলে তাকে নিজে বাংলোতে নিয়ে আসেন। ভোরে অচ্ছুৎটোলা থেকে এসে সারাদিন ওখানে থাকত কমলা। বাংলো থেকেই স্কুলে যেত, সন্ধেবেলা রেভারেন্ড টিরকের কাছে পড়ে রাতের খাওয়া সেরে ঘরে ফিরত। রেভারেন্ড টিরকে নিজে তাকে পৌঁছে দিয়ে যেতেন।

বাংলোতে থাকতে থাকতে ক'বছরে চিরকুমার রেভারেন্ডের সংসারের যাবতীয় কর্তৃত্ব কমলার হাতে চলে এসেছিল। তার পছন্দ-অপছন্দ বা মতামতের বাইরে ওখানে কিছু হওয়ার নয়।

এভাবে কমলার দায়িত্ব নেওয়ায় জগলাল দোসাদদের সংসারে খানিকটা সুরাহা হয়েছে। অন্তত একটি মানুষের পেটের চিন্তা থেকে সে মুক্তি পেয়েছিল। সেটা গরিব হাভাতের সংসারে কম কথা নয়।

এধারে সব দিক থেকেই কমলাকে চৌকস করে তুলেছিলেন রেভারেন্ড টিরকে। শুধু লেখাপড়াই না, টাইপরাইটিং, ইংরেজিতে করেসপনডেন্স এবং শর্টহ্যান্ডেও পাশাপাশি এমনভাবে তালিম দিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে চাকরি টাকরি পেতে এতটুকু অসুবিধা না হয়। দু-একটা সরকারি দপ্তরে তিনি কথাও

বলে রেখেছেন। সে সব জায়গায় শিডিউল্ড কাস্টদের জন্য ভ্যাকেন্সি রয়েছে। কমলা যে চাকরি পেয়ে যাবে তাতে এতটুকু সংশয় ছিল না।

কথায় কথায় অর্জুনরা দাকখানার কাছে চলে এসেছিল। সেদিন আর ঝুঁকি নেয়নি অর্জুন। রাস্তা দিয়ে সোজা না গিয়ে পাশের মাঠে নেমে অনেকটা ঘুরে কমলাকে সঙ্গে করে আবার রাস্তায় উঠেছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিল, 'এ বছর তো তুমি ম্যাট্রিক দিচ্ছ। রেজাল্ট বেরুবার পর নিশ্চয়ই চাকরি নেবে?'

কমলা অন্যমনস্কর মতো বলেছে, 'এই রকমই ইচ্ছে। তবে--' বলতে বলতে আচমকা দ্বিধান্বিতভাবে থেমে গিয়েছিল।

'তবে কী?'

'চাকরি নিলে সংসারের উপকার হয়। বাবা-মা আমাদের জন্যে খেটে খেটে লাইফ শেষ করে ফেলল। কিন্তু আমার ইচ্ছে বি.এ'টা অন্তত পাশ করি। ম্যাট্রিকুলেশনের পর চাকরি নিলে বড় জোর টাইপিস্ট বা ক্লার্কের পোস্ট পাব। গ্র্যাজুয়েট হলে নিশ্চয়ই অফিসার গ্রেডে আমাকে নিয়ে নেবে। বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলি, যদি আর চারটে বছর কষ্ট করে সংসার টানতে পারে। আমি চাকরিতে ঢুকলে ওদের কাজ করতে দেব না।'

চাকরির কথায় বিষাদ নেমে এসেছে অর্জুনের মুখে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলেছে, 'তোমাদের কত সুবিধা, পাশ করার আগেই চাকরি ঠিক করা আছে। আর আমি যে কবে কাজকর্ম পাব, রামচন্দ্রজিই জানেন।'

মজার গলায় কমলা বলেছে, 'এতদিন আপনারাই তো সব পেয়েছেন। আমরা না হয় এখন দু-একটা পাই।' একটু থেমে গভীর গলায় আবার বলেছে, 'টাইপ রাইটিং যেভাবে শিখছেন তাতে আপনিও চাকরি পেয়ে যাবেন।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর একেবারে অন্য কথায় চলে গিয়েছিল কমলা। সে বলেছে, 'ফাদার কবে পাটনা গেছে বলুন তো--'

একটু অবাক হয়েই অর্জুন বলেছে, 'সে কি, কাল গেলেন না। একদিনের ভেতর সব ভুলে গেছ!'

'আমার কী মনে হয় জানেন—'

'কী?'

'কাল আর আজ না, অনেকদিন ধরে আপনি আমাকে এই রাস্তায় বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছেন।' কমলা যেন পাশে নেই, তার কণ্ঠস্বর বুঝিবা বহুদূর থেকে ভেসে আসছিল।

অর্জুন উত্তর দেয়নি, দ্রুত মুখ ফিরিয়ে কমলার দিকে তাকিয়েছে শুধু।

চোখের পলকে সাতটা দিন ফুরিয়ে গিয়েছিল। তারপর পাটনা থেকে ফিরে এসেছিলেন রেভারেন্ড টিরকে। তিনি যেদিন এলেন সেদিন রাত্তিরে শর্টহ্যান্ড এবং ইংরেজির লেসন নেওয়ার পর হঠাৎ অর্জুন বলেছিল, 'রেভারেন্ড, আমি কি আজ কমলাকে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব?'

সরল, অন্যমনস্ক রেভারেন্ড ভাল করে অর্জুনকে লক্ষ করেননি। করলে তার চোখে মুখে অন্য কিছু দেখতে পেতেন। বুঝতে পারতেন, তার সামনের যুবকটির গোপন আবেগ কোন খাত ধরে ছুটে চলেছে। তিনি বলেছিলেন, 'না না, তোমাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আমি তো এসেই গেছি। ডিনারের পর ওকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'এতটা রাস্তা বাস জার্নি করে এসেছেন। নিশ্চয়ই টায়ার্ড হয়ে আছেন। কাল থেকে আপনি কমলাকে—'

তার কথা শেষ হওয়ার আগে দুই হাত এবং মাথা প্রবলবেগে নেড়ে রেভারেন্ড টিরকে বলে উঠেছেন, 'আরে না না, এইটুকু জার্নিতে আমি টায়ার্ড হই না। আজকাল তো পাটনা যাওয়া অনেক কমে গেছে। তিন বছর আগেও ফি মাসে দু'বার যেতে হত। রাত্তিরে ফিরে এসেই কমলাকে ওদের

ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতাম।' বলে কমলার দিকে তাকিয়েছেন, 'তাই না রে?'

কমলা ঠোঁট টিপে পলকহীন অর্জুনকে লক্ষ করছিল। চমকে উঠে দ্রুত ঘাড় হেলিয়ে সে সায় দিয়েছে, 'হাঁ।'

এরপর কমলাকে অচ্ছুৎটোলায় পৌঁছে দেওয়ার মতো জোরাল কোনো অজুহাত খুঁজে পায়নি অর্জুন।

পরের দিন সন্ধেয় টাইপ রাইটিংয়ের লেসন দিতে দিতে হঠাৎ খুব চাপা গলায় কমলা বলেছিল, 'কাল রাত্তিরে আমাকে ঘরে দিয়ে আসার জন্যে খেপে উঠেছিলেন কেন?' বলে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিল।

মুখ লাল হয়ে উঠেছে অর্জুনের। একসময় গাঢ় গলায় বলেছিল, 'আমার ইচ্ছে—'

দেখতে দেখতে প্রায় তিনটে বছর কেটে গিয়েছিল। এর মধ্যে ফিফটি সেভেন পারসেন্ট মার্কস পেয়ে সেকেন্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে কমলা। তারপর প্রাইভেটে আই. এ দিয়েছে। ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট অবশ্য তখনও বেরোয়নি।

ম্যাট্রিকের পরই একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল কমলা কিন্তু সেটা নেয়নি। মা-বাবাকে বলে আর কয়েকটা বছর সময় চেয়ে নিয়েছে সে। অন্তত গ্র্যাজুয়েট তাকে হতেই হবে। জগলাল আর নাথুনি জানিয়েছে, যতদিন তাদের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে, কমলা লেখাপড়া চালিয়ে যাক। বামহন কায়াথদের 'বরাবর' হয়ে উঠতে হবে তাকে। দুনিয়ার চোখে ঘৃণ্য, ভুখ বুখার এবং অন্ধকারে ঘেরা অচ্ছুৎটোলায় সে-ই প্রথম রোশনি জ্বালিয়ে তুলুক। কমলাকে নিয়ে তার মা-বাপের বিপুল আশা। এমন কি সে ম্যাট্রিক পাশ করার পর অচ্ছুৎটোলার তাবৎ বাসিন্দা গৌরব বোধ করতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে সেই প্রথম একজন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কমলাকে নিয়ে ওদের গর্বের শেষ ছিল না। তার ম্যাট্রিক পাশ করাটা অচ্ছুৎটোলায় বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটিয়ে দিয়েছিল।

এদিকে রেভারেন্ড টিরকে এবং কমলার কাছে শর্টহ্যান্ড টাইপ রাইটিং এবং ইংলিশ ল্যাংগুয়েজটা মোটামুটি ভালই শিখে নিয়েছিল অর্জুন। টাইপ রাইটিংয়ে তার স্পিড উঠেছিল পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, শর্টহ্যান্ডে আশি। তা ছাড়া ইংলিশ করেসপনডেন্সটাও প্রায় নির্ভুল করতে পারত সে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের অফিসে ঘুরে ঘুরে গোড়ালি ক্ষইয়ে ফেলেছিল অর্জুন। গোটা তিনেক ইন্টারভিউ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। তার কোনোটাই নমকপুরায় নয়। একটা রাঁচীতে, একটা ঝরিয়ায়, একটা কাটিহারে। কিন্তু বাড়ির কারুর ইচ্ছা ছিল না অর্জুন অতদূরে চাকরি করতে যায়। সবার অমতে ট্রেনের টিকেটও কেটে ফেলেছিল সে। শেষ পর্যন্ত মা এমনই মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছিল যে টিকেট ক্যানসেল করে কিছু গচ্চা দিয়ে টাকা ফেরত আনতে হয়েছে।

কমলা এবং রেভারেন্ড টিরকে অবশ্য আই. এ'টা দিতে বলেছিলেন। খানিকটা পড়াশোনাও করেছিল অর্জুন কিন্তু সেবার ঠাকুমা মারা যাওয়ায় পরীক্ষাটা আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। মনে মনে সে ভেবে রেখেছিল, পরের বছর যেভাবে হোক পরীক্ষায় বসবে।

মনে আছে, তৃতীয় বছরের শেষাশেষি হঠাৎ টাইফয়েডে বেশ কিছুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল তাকে। এমনিতে তার অটুট স্বাস্থ্য, খুব সহজে অসুখ বিসুখ হয় না। কিন্তু সেবারের অসুখটায় এতই কাহিল হয়ে পড়েছিল যে একটি মাস বাড়ি থেকে বেরুতে পারেনি।

প্রথম দিন সাতেক অর্জুনের প্রায় হুঁশ ছিল না। জ্ঞান ফেরার পর গোড়াতেই যাকে মনে পড়েছে সে বাবা মা ভাইবোন বা বন্ধুবান্ধব কেউ না — সে কমলা। পৃথিবীতে অগুনতি চেনাজানা মানুষজন থাকতে অচ্ছুৎ দোসাদদের মেয়েটাকে কেন যে মনে পড়ে গিয়েছিল, অর্জুন জানে না। তার অজান্তে কমলা কবে কিভাবে যে শ্বাসবায়ুর মতো অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল, মিশে গিয়েছিল অস্তিত্বের সঙ্গে, সে টের পায়নি।

বিছানার পাশে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসে ছিল রামঅবতার। অর্জুন দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করেছে, 'বাবুজি, আমি ক'দিন বিছানায় পড়ে আছি?'

রামঅবতার বলেছিল, 'সাত আট রোজ। জ্বরে বেহুঁশ হয়ে ছিলি।'
'আমাকে কেউ দেখতে এসেছিল?'
'অনেকে।'
দ্বিধান্বিতভাবে এবার অর্জুন জানতে চেয়েছে, 'কারা?'
রামঅবতার যাদের নাম বলেছিল সেই তালিকায় কমলা নেই। সাত আট দিন শয্যাশায়ী হয়ে থেকেছে অর্জুন, অথচ তার কথা একবারও মনে পড়ল না কমলার! বুকের অতল স্তরে চিনচিনে একটা কষ্ট অনুভব করেছিল সে। পরক্ষণেই ভেবেছিল রামঅবতারের ভুলও তো হয়ে থাকতে পারে। সবার কথা হয়ত তার মনে নেই। অর্জুন বলেছে, 'আর কেউ?'
'নেহী।'
এবার দ্বিধান্বিতভাবে অর্জুন জিজ্ঞেস করেছে, 'রেভারেন্ড টিরকেও খোঁজ নিতে আসেননি?' কমলার সম্পর্কে প্রশ্ন করতে তার সাহস হয়নি।
রামঅবতার বুঝতে না পেরে বলেছে, 'ও কৌন?'
'গীর্জার খ্রিস্টান সাধু, যাঁর কাছে টাইপ শিখতে যাই।'
ব্যস্তভাবে রামঅবতার এবার বলে উঠেছে, 'ও হাঁ হাঁ, ওহী পাদ্রী আয়া থা।'
রেভারেন্ড টিরকের সঙ্গে কি কমলা এসেছিল? উৎসুক ভঙ্গিতে অর্জুন জানতে চেয়েছে, 'পাদ্রী কি একাই এসেছেন, না তার সঙ্গে অন্য কেউ ছিল?'
রামঅবতার বলেছে, 'একাই।'
একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল অর্জুন, তার অসুখের খবরটা অন্তত পেয়ে গেছে কমলা।
মাসখানেক বাদে শরীর অনেকটা সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠলে আবার চার্চে যাতায়াত শুরু করেছিল অর্জুন। প্রথন দিন রেভারেন্ড টিরকের বাংলোয় এসে সে কমলাকে জিজ্ঞেস করেছে, 'এতদিন বিছানায় পড়ে রইলাম। একবার দেখতেও গেলে না!' ক্ষোভে তার গলা প্রায় বুজে এসেছিল।
কমলা গভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'আমার পক্ষে তোমাদের বাড়ি যাওয়া সম্ভব?' তিন বছরে কবে কখন যে সে অর্জুনকে 'তুমি' বলতে শুরু করেছে কারুর খেয়াল নেই।
অর্জুন চমকে উঠেছে। প্রথমত কমলা যুবতী, তার ওপর অচ্ছুৎ। হঠাৎ সে তাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারত, সেটা আগে ভেবে দেখেনি অর্জুন। সে শুধু নিজের দিকটা নিয়েই আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। ধীরে ধীরে গাঢ় বিষাদে তার মন ভরে গিয়েছিল।
অনেকক্ষণ পর ঝাপসা গলায় অর্জুন বলেছে, 'না গিয়ে ভালই করেছ। তবে—'
'কী?'
'একটা চিঠি লিখলেও তো পারতে।'
'অনেক বার তা-ও ভেবেছি। কিন্তু লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে, যদি তোমাদের বাড়ির অন্য কারুর হাতে চিঠিটা পড়ে যায়—'
এদিকটা অর্জুনের মাথায় আসেনি। সে শুধু ক্ষোভ এবং অভিমান নিয়ে নিজেই কষ্ট পেয়েছে। একটু চুপ করে থেকে সে বলেছিল, 'না লিখে ভালই করেছ।'
কমলা বলেছিল, 'একটা মাস তোমাকে দেখিনি, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল—'
'আমারও।'
'রোজ ভাবতাম যা হওয়ার হোক, তোমাদের বাড়ি চলে যাই। একদিন চার্চ থেকে বেরিয়েও পড়েছিলাম। কিন্তু খানিকটা যাওয়ার পর ফিরে এসেছি।'
কিছুক্ষণ নীরবতা।
তারপর অর্জুন বলেছিল, 'জানো, অসুখের সময় বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে একটা কথা আমার সব সময় মনে হত—'
'কী?' সোজা অর্জুনের চোখের দিকে তাকিয়েছে কমলা।
গলার স্বর অনেকটা নিচে নামিয়ে ফিসফিস করে অর্জুন বলেছে, 'আমি যদি তোমাদের মতো

দোসাদ হতাম, কি তুমি যদি ব্রাহ্মণ হতে—' কথাটা শেষ না করে আচমকা থেমে গেছে সে। তার বুকের অতল থেকে হৃৎপিণ্ড ভেঙেচুরে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এসেছিল।

অর্জুন কী বলতে চায়, বুঝতে অসুবিধা হয়নি। পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে থেকেছে কমলা। তারপর আস্তে আস্তে কখন যেন উঠে এসে অর্জুনের কাঁধে একটি হাত রেখেছিল।

কমলার স্পর্শে এমন কিছু ছিল যাতে অর্জুনের বাইশ বছরের যৌবন তোলপাড় হয়ে গেছে। আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে কখন তাকে বুকের ভেতর টেনে এনেছিল, সে জানে না। তারপর কখন, কিভাবে, কোন স্বয়ংক্রিয় নিয়মে তার মুখ কমলার ঠোঁটের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল, অর্জুনের খেয়াল নেই। কমলার হৃৎপিণ্ডের শব্দ অনুভব করতে করতে অর্জুন তার ঠোঁট কপাল গাল এবং চিবুক থেকে মধুর উষ্ণতা যেন শুষে নিচ্ছিল।

এই অজস্র চুম্বন বিশুদ্ধ চতুর্বেদী বংশের একটি ছেলে এবং অচ্ছুৎ দোসাদদের একটি মেয়ের মাঝখানের যাবতীয় উঁচু উঁচু দেওয়াল ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছিল।

একমাস টাইফয়েডে ভোগার কারণে প্র্যাকটিস করতে পারেনি অর্জুন। ফলে তার শর্টহ্যান্ড এবং টাইপিংয়ের স্পিড ভীষণ কমে গিয়েছিল। সেটা ফিরে পেতে এক নাগাড়ে ক'দিন বাড়তি দু-এক ঘণ্টা করে তাকে খাটতে হয়েছে। এই এক্সট্রা খাটুনিটুকু ছাড়া সব কিছুই পুরনো রুটিন অনুযায়ী চলছিল।

হঠাৎ একদিন কমলা বলেছিল, 'একটা কথা ক'দিন ধরে ভাবছি—'

অর্জুন উৎসুক চোখে তাকিয়েছে, 'কী কথা?'

'টাইপ আর শর্টহ্যান্ডে তোমার স্পিড এখন যা উঠেছে তাতে নৌকরি পেতে অসুবিধা হবে না। হঠাৎ একটা কিছু পেয়ে যদি নমকপুরা থেকে দূরে কোথাও চলে যাও, তখন —'

'তখন কী?'

দ্রুত এক পলক অর্জুনের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছে কমলা। গাঢ় গলায় বলেছে, 'আমার কথা ভেবে দেখেছ?'

অর্জুনের সারা মুখ কোমল হাসিতে ভরে গিয়েছিল। সে বলেছে, 'চিন্তা নেহী করনা ম্যাডাম। নৌকরি চৌকরি আমার হবে না। হলেও বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। তোমাকে তো বলেছি এর আগে তিন বার বাইরে ইন্টারভিউ পেয়েছিলাম, মা আর বাবুজি যেতে দেয়নি। নমকপুরার বাউন্ডারি ছাপিয়ে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই আমার।' একটু থেমে আবার বলেছে, 'কিন্তু আমার ভাবনা তোমাকে নিয়ে—'

'কিসের ভাবনা?'

'তুমি যদি নৌকরি পেয়ে কোথাও চলে যাও।'

মুখ নামিয়ে চোখের কোণ দিয়ে অর্জুনকে দেখতে দেখতে কমলা চাপা গলায় বলেছে, 'তখন তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। যাবে তো?' বলে ঠোঁট টিপে হেসেছে।

তার হাসিটা অলৌকিক কোনো পদ্ধতিতে অর্জুনের ঠোঁটেও উঠে এসেছিল। সে ধীরে মাথা হেলিয়ে দিয়েছে।

আঙুল তুলে কমলা বলেছে, 'ঠিক আছে, তখন দেখা যাবে।'

অর্জুনের ভারি অসুখটার পর মাস পাঁচেক কেটে গেছে। পুরনো নিয়মের কোথাও এতটুকু হেরফের হয়নি। সমস্ত কিছুই আগের নিয়মে চলছিল।

একদিন বিকেলে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে পাটনা থেকে একটা মফস্বল এডিশানের হিন্দি পত্রিকায় চাকরি বাকরির পাতাটা খুঁটিয়ে দেখছিল অর্জুন। ম্যাট্রিক পাশ করার পর এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মনে মনে সে ভাবছিল, এবার যদি বাইরে ইন্টারভিউ পেয়ে যায়, নিশ্চয়ই যাবে। মা-বাবা বাধা দিলেও মানবে না। বয়স বেড়ে যাচ্ছে, এরপর কোথাও চাকরি মিলবে না।

হঠাৎ বাইরে মান্ধাতা শর্মার গমগমে গলা শোনা গিয়েছিল, 'রামঅওতার, রামঅওতার—'

মান্ধাতা শর্মারা অর্জুনদের পাড়াতেই থাকে। অর্জুনদের বাড়ি থেকে ফার্লংখানেক দূরে রাস্তাব মোড়ে তাদের বিশাল তিনতলা হাভেলি। মান্ধাতার সঙ্গে তাদেব লতায়-পাতায় আত্মীয়তার সম্পর্ক তো আছেই, তা ছাড়া সে অর্জুনদের সত্যিকারের হিতাকাঙক্ষী। প্রায়ই কারণে অকারণে সে ও তাদের বাড়িব লোকেবা অর্জুনদের বাড়ি আসে। অর্জুনরাও যায়। নানাভাবেই মান্ধাতা তাদের সাহায্য কবে। কখনও টাকাপয়সা দিয়ে, কখনও বিপদের সময় পাশে দাঁড়িয়ে। এইসব কারণে তার প্রতি অর্জুনদের পবিবারেব আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতাব শেষ নেই।

এদিকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রামঅবতারেব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, 'আবে মান্ধাতা ভাইয়া, আও আও—'

শুযে শুয়েই অর্জুন টেব পেয়েছে, অত্যন্ত শশব্যস্তে বামঅবতার ওধাবের একটা ঘরে মান্ধাতাকে নিয়ে বসিয়েছিল। ওদের ভেতর কী কথাবার্তা হচ্ছিল, এঘর থেকে শোনা যায়নি।

মিনিট দশেক বাদে আচমকা মায়ের ডাকে চমকে উঠেছে অর্জুন। ধড়মড় করে উঠে বসতেই চোখে পড়েছিল, মা দরজাব বাইবে বাবান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুন বলেছিল, 'কী বলছ মা?'

'তুই একবার ওই ঘরে চল। তোর বাবুজি আর মান্ধাতা ভাইয়া ডাকছে।'

'কেন?'

'গেলেই বুঝতে পারবি।'

বেশ অবাকই হয়েছিল অর্জুন। মান্ধাতা নিযমিত তাদের বাড়ি এলেও এভাবে কখনও আগে ডাকে নি। সে কিছুটা অস্বস্তি কিছুটা কৌতূহল নিয়েই উত্তর দিকের শেষ ঘরখানায় চলে এসেছিল।

দুটো ক্যাম্বিসের ইজি চেয়ারে মুখোমুখি বসে ছিল মান্ধাতা আর রামঅবতার। একধারে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে তক্তাপোষে আধময়লা বিছানা পাতা। সেটা দেখিয়ে মান্ধাতা বলেছিল, 'বৈঠ উহাঁ।'

মান্ধাতা এবং রামঅবতারকে লক্ষ কবতে কবতে অর্জুন বুঝতে চেষ্টা করছিল, তাকে ডাকিয়ে আনার পেছনে এদের কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকতে পাবে। সে মান্ধাতাদের দিকে চোখ রেখে পায়ে পায়ে তক্তাপোষের কাছে গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে পড়েছিল। মা অবশ্য বসেনি, দরজাব একটা পাল্লায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

মান্ধাতা বলেছিল, 'একটা বঢ়িয়া খবর নিয়ে এসেছি অর্জুন। আখেরে তোমার ভালই হবে।'

অর্জুন জিজ্ঞেস করেছে, 'কী খবর?'

নিজে উত্তরটা দেয়নি মান্ধাতা। রামঅবতাবের দিকে ফিবে বলেছিল, 'বেটাকে তুমিই বল।'

দুই হাত এবং মাথা নেড়ে রামঅবতার বলেছে, 'নেহী নেহী ভাইয়া, তুমি বল।' তাবপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বলেছে, 'আরে অর্জুনকা মাঈ, ভাইয়া এত বড় একটা খবব নিয়ে এসেছে, তাকে 'মুহ্‌মিঠা' করাবে না? চায় পানির ব্যওস্থা কর।'

অর্জুনের মা লজ্জা পেয়ে জিভ কেটেছে। বলেছে, 'কা শরমকা বাত! আমাব বিলকুল খেয়াল ছিল না। আভ্‌ভী লাতী হুঁ। যতক্ষণ না আসছি, আপনি কিছু বলবেন না ভাইযা!' অর্থাৎ যা বলাব তার সামনেই যেন বলে মান্ধাতা।

মান্ধাতা হেসে বলেছে, 'ঠিক হ্যায়।'

অর্জুনের মা প্রায় দৌড়েই চলে গিয়েছিল এবং কয়েক মিনিটেব ভেতর ঘরে বানানো মুগের লাড্ডু এবং নমকিন নিযে ফিরে এসেছে। তার পেছনে অর্জুনেব ছোট বোন রাধা। রাধাব হাতে চায়ের কাপ।

ক্ষিপ্র হাতে চা লাড্ডু ইত্যাদি মান্ধাতাকে দিতে দিতে অর্জুনেব মা বলেছে, 'অব বলিয়ে—'

লাড্ডুতে একটা কামড় দিয়ে বারকয়েক চিবিয়ে এক ঢোক চা খেয়েছিল মান্ধাতা। তারপর যা বলেছিল সংক্ষেপে এইরকম।

নমকপুরা মিউনিসিপ্যালিটিতে ক্যাশিয়ারের পোস্টটি খালি আছে। আগে যে ক্যাশিয়ার ছিল দিন কয়েক আগে সে রিটায়ার করেছে। এক সপ্তাহেব ভেতব নতুন লোককে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতেই হবে, কেননা ক্যাশিযারের মতো গুরুত্বপূর্ণ জরুরি পোস্ট ফাঁকা বাখা যায় না। মান্ধাতা মিউনিসিপ্যালিটিব চেয়ারম্যান ধৌলিদাস দুবের হাতে পায়ে ধরে ওই নৌকরিটা অর্জুনকে দেওযাব জন্য রাজি কবিয়েছে।

শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল অর্জুন। মান্ধাতার কাছে তারা সপরিবারে কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতা হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল।

রামঅবতার আপ্লুত গলায় বলেছে, 'তোমার ঋণ আমরা সারা জীবনে শোধ করতে পারব না ভাইয়া—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে মান্ধাতা বলেছে, 'কত সাল ধরে অর্জুন একটা নৌকরির জন্যে কী না করছে! যেই শুনলাম মিউনিসিপ্যালিটি ক্যাশিয়ার নেবে, অমনি ধৌলিদাসজির কোঠিতে ছুটলাম। আমার কথা কি শুনতে চায়! সাত রোজ সুবে-সাম ধরনা দেওয়ার পর ঘাড় পাতল। লেকেন রামঅওতার—'

রামঅবতার তটস্থ ভঙ্গিতে বলেছে, 'কহো ভাইয়া—'

তিন আঙুলে বিচিত্র মুদ্রা ফুটিয়ে, পুরু ঠোঁট দুটো ছুঁচলো করে মান্ধাতা বলেছে, 'ছোটা এক শর্ত হ্যায়—'

'কী শর্ত ?'

'এমন কিছু না। ধৌলিদাসজির এক লেড়কী আছে। উমর চোদ্দ পনের সাল হবে। হাইস্কুলে টেন ক্লাসে পড়ে, আগেলা সাল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। ধৌলিদাসজির ইচ্ছা, অর্জুনকে তার দামাদ করে নেয়। অত বড় আদমী, কমসে কম হাজার একর চাষের জমিন, সোনা চাঁদি জেবর যে কত তার হিসেব নেই। সিরিফ দো লেড়কী ধৌলিদাসজির। বড় লেড়কীর শাদি হয়ে গেছে। ইতনা জায়দাদের আধা হিস্যা পেয়ে যাবে অর্জুন। তা ছাড়া ধৌলিদাসজির দামাদ হওয়ার কিতনা সম্মান! তুমলোগ শুনা তো হ্যায়, আগেলা বিধানমণ্ডলকা চুনাওমে ধৌলিদাসজি কনটেস্ট করেগা। জরুর উনহোনে এম. এল. এ বনেগা। ভগোয়ান রামচন্দ্রজির কৃপা পেলে জরুর মিনিস্টারও হয়ে যাবেন। মিনিস্টারকা দামাদ! ও হো, কিতনা বড়ে সৌভাগ!' বলতে বলতে প্রবল আবেগে এবং উচ্ছ্বাসে তার গলার স্বরে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল।

রামঅবতার এবং তার স্ত্রী ছেলের চাকরি এবং ধৌলিদাস দুবের মতো একজন বিখ্যাত মূল্যবান বেয়াই পাওয়ার অভাবনীয় সৌভাগ্যে যুগপৎ এতই বিচলিত আর ডগমগ হয়ে উঠেছিল যে কী বলবে কী করবে ভেবে উঠতে পারছিল না।

এদিকে শুনতে শুনতে অর্জুনের মাথার ভেতর আগুনের একখানা চাকা ঘুরে যাচ্ছিল যেন। শ্বাসকষ্টের মতো অসহনীয় এক যন্ত্রণা তার শিরাস্নায়ু ফাটিয়ে চুরমার করে দিয়েছে। মনে হচ্ছিল, জিভটা শুকিয়ে খরখরে বালির মতো কাঁটা কাঁটা হয়ে গেছে। ঢোক গিলতে গলা চিরে যাচ্ছিল। চোখের সামনে দৃশ্যমান সমস্ত কিছু একাকার হয়ে একটি মুখ চারদিকে কোনো অদৃশ্য সিনেমার পর্দায় ফুটে উঠছিল। সে মুখটি কমলার। আচমকা চিৎকার করে উঠেছিল অর্জুন, 'নেহী, নেহী—'

ঘরের সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিল। চকিত ভাবটা কাটলে মান্ধাতা বলেছে, 'কী হল ?'

'আমি ওই শর্তে নৌকরিতে ঢুকব না।'

'আরে বাপু, শাদি তো একদিন করতেই হবে, না কি বলিস ?'

'যদি কপালে থাকে, কবব।'

'শাদিতে যখন আপত্তি নেই তখন ধৌলিদাসজির বেটীকে শাদি করলে ক্ষতিটা কী ? কানা না, আন্ধা না, খোঁড়া না, গুংগা না—বিলকুল স্বাস্থ্যবতী খুবসুরত গোরী লেড়কী। তার ওপর টেন ক্লাসে পড়ে। বড়ে ঘর, বহুত জায়দাদ—নমকপুরায় এমন লেড়কী আর কোথায় পাবি ?'

মুখ নামিয়ে ঘাড় গোঁজ করে থেকেছে অর্জুন। চাপা অথচ অবিচলিত স্বরে বলেছে, 'নেহী।'

রামঅবতারের মতো শান্ত নিরীহ মানুষও হঠাৎ খেপে উঠেছে। উৎকৃষ্ট চাকরিসুদ্ধু এমন সৌভাগ্য গোঁয়ার একগুঁয়ে ছেলেটার হঠকারিতায় হাতছাড়া হতে দেখে মাথার ঠিক থাকে নি তার। গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'মান্ধাতা ভাইয়া ধৌলিদাসজির মতো এত বড় আদমীর লেড়কীর সঙ্গে শাদির কথা বলতে এসেছে। তোর এত সাহস যে তার মুখের উপর ঠাঁই ঠাঁই 'না' বলে দিচ্ছিস। উল্লু, তোর কি মনে হয় কোনো রাজা মহারাজা মেয়ে দেওয়ার জন্যে তোর পায়ে ধরে সাধতে আসবে! হারামজাদ,

এ শাদি তোর ঘাড় করবে।'

অদম্য এক জেদ অর্জুনকে পেয়ে বসেছে যেন। সে বলেছে, 'আমার ওপর জবরদস্তি করো না বাবুজি।'

'মতলব!'

এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েছিল রামঅবতার। অসহ্য রাগে এবং উত্তেজনায় তার হাত-পা মারাত্মক কাঁপছিল। শরীরের সব রক্ত উঠে এসেছিল দুই চোখে। হিংস্র দৃষ্টিতে ছেলেকে দেখতে দেখতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো আবার চিৎকার করতে যাচ্ছিল সে। তার আগেই হাত তুলে মান্ধাতা তাকে থামিয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'শান্ত হো যাও রামঅওতার। এত গুস্‌সা হলে ব্লাড প্রেসার চড়ে যাবে। শরীর খারাপ হবে। তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না।'

গজ গজ করতে করতে আবার বসে পড়েছে রামঅবতার। আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে অর্জুনের মা একবার ছেলেকে, একবার স্বামীকে, একবার মান্ধাতাকে দেখে যাচ্ছিল।

মান্ধাতার মাথা বরাবরই খুব ঠাণ্ডা। সামান্য কারণে সে উত্তেজিত হয় না, মেজাজটাকে সর্বক্ষণ নিজের কনট্রোলে রাখতে জানে। অবশ্য দরকারমতো অত্যন্ত বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে।

মান্ধাতা অর্জুনের কাঁধে একটা হাত রেখে নরম গলায় বলেছিল, 'সাফ সাফ বল তো, কেন ধৌলিদাসজির লেড়কীকে শাদি করতে চাস না। কারণটা কী?'

'আমি—আমি—' বলতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেছে অর্জুন।

'তুই কী?'

অর্জুন উত্তর দেয়নি, মাথা নিচু করে বসে থেকেছে।

মান্ধাতা আবার বলেছে, 'ডরনেকা কুছ নেহী। তুই বল—'

প্রথমটা কিছুতেই বলবে না অর্জুন। কিন্তু মান্ধাতার অসীম ধৈর্য। উত্তেজনাশূন্য প্রশান্ত মুখে একই কথা বহুবার জিজ্ঞেস করেছে সে। শেষ পর্যন্ত অর্জুন বলেছে, 'পরে বলব।' আসলে একটি অচ্ছুৎ দোসাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, এমন কথা মান্ধাতার মুখের ওপর বলতে সাহস হয়নি তার।

'ঠিক হ্যায়। কবে বলবি?'

'দু-একদিনের মধ্যে।'

মান্ধাতা আর বসেনি, চলে গিয়েছিল। অর্জুনও তক্ষুনি বেরিয়ে পড়েছে। সোজা সে চলে এসেছিল রেভারেন্ড টিরকের বাংলোয়। অসময়ে তাকে দেখে রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল কমলা। বলেছে, 'কী ব্যাপার, এ সময়ে!' পরক্ষণেই তার মুখচোখের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠেছে, 'কী হয়েছে বল তো—'

কিছুক্ষণ আগে মান্ধাতা কোন প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল এবং সে কী বলেছে, সব জানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন আমি কী করব বলে দাও—'

শুনতে শুনতে মুখটা গভীর বিষণ্ণতায় ভরে গিয়েছিল কমলার। ম্লান হেসে সে বলেছে, 'ধৌলিদাসজির লেড়কীকে শাদি করা তো সৌভাগ্যের কথা। কত কিছু পাবে, তার ওপর একটা নৌকরি। তুমি ওখানেই শাদি করে ফেল।'

অর্জুন বলেছে, 'আমি কাকে চাই, সে তো তুমি জানো।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'তোমরা ব্রাহ্মণ, আমি অচ্ছুৎ। আমাদের শাদি হলে নমকপুরা তোলপাড় হয়ে যাবে।'

'যা হওয়ার হবে। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না কমলা।'

গভীর আবেগে অর্জুনের একটা হাত বুকের ভেতর টেনে নিয়েছিল কমলা।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর অর্জুন বলেছে, 'রেভারেন্ড কোথায়?'

'চার্চে।'

'আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।'

দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে কমলার মুখে। সে বলেছে, 'কেন? ফাদারকে আমাদের কথা বলবে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। তিনি আমাদের পেছনে না দাঁড়ালে শাদির ব্যাপারে এক কদমও বাড়ানো যাবে না।'

এরপর সোজা চার্চে চলে গিয়েছিল অর্জুন। রেভারেন্ড টিরকেকে সব কিছু জানিয়ে বলেছে, 'কমলা আর আমি শাদি করতে চাই। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।'

অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন রেভারেন্ড টিরকে। তারপর বলেছেন, 'তোমার মা-বাবাকে শাদির কথা জানিয়েছ?'

'না।'

'তা হলে?'

'ভাবছি, কমলাকে নিয়ে কোথাও চলে যাব। আপনি কী বলেন?'

'নো, নেভার।' জোরে জোরে মাথা নেড়েছেন রেভারেন্ড টিরকে। তারপর যা বলেছেন তা এইরকম। সামাজিক বিপ্লব যদি করতেই হয় এই নমকপুরায় থেকেই তা করতে হবে। পালিয়ে যাওয়া মানে এক ধরনের ডিফিট। তারা চুরি-রাহাজানি খুনখারাপি বা ওই জাতীয় ঘৃণ্য কোনো অপরাধ করেনি। ব্যভিচারেও তারা লিপ্ত নয় যে চেনাজানা লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। তারা যথেষ্টই প্রাপ্তবয়স্ক, নিজেদের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে। অর্জুনদের একমাত্র অপরাধ, এই সামাজিক সিস্টেমে তাদের একজন ব্রাহ্মণ, আরেক জন দোসাদ। আবহমান কালের নিয়ম ভেঙে তারা যখন বিয়েটা করতেই চাইছে তখন যত বাধা আর সমস্যাই আসুক, এই নমকপুরায় থেকেই সেগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াক। বহুকালের পুরনো সংস্কার যখন নিজেরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে তখন জাতপাত ছুঁয়াছুতের প্রশ্নে জর্জরিত জঘন্য সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে ভাল করেই যুদ্ধ ঘোষণা করুক।

অর্জুন বলেছে, 'আপনি জানেন না রেভারেন্ড, আমার মা আর বাবুজি কতটা গোঁড়া। তা ছাড়া আমাদেব জাতেব লোকজন রয়েছে। তারা এ শাদি কিছুতেই মেনে নেবে না। সবাই ভীষণ গোলমাল কববে।'

'তবু মা-বাবুজিকে জানাতে হবে। কমলার মা-বাপকেও জানাবে।'

রেভারেন্ড টিরকে যা বলেছেন তাতে যথেষ্ট সায় ছিল অর্জুনের। মনে মনে সেটা চেয়েছেও সে। কিন্তু এ ব্যাপারে ভয়টা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিল না।

শেষ পর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে অর্জুনের মধ্যে একজন সাহসী যোদ্ধার স্পিরিটকে প্রবেশ করিয়ে দিতে পেরেছিলেন রেভারেন্ড টিরকে।

অর্জুন অবশ্য সেদিনই মা-বাবাকে বিয়ের ব্যাপারটা জানায় নি। জানিয়েছে আরো দিন তিনেক পরে।

শোনামাত্র খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। আর রামঅবতার বাজ-পড়া মানুষের মতো অনেকক্ষণ থ হয়ে থেকেছে। তারপর মারাত্মক রাগে একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। তার শরীরের সব রক্ত মাথায় গিয়ে উঠেছিল যেন। রক্তবর্ণ চোখ দুটো ফেটে যাবে মনে হচ্ছিল। অঙুল তুলে নাচাতে নাচাতে হিস্টিরিয়ার ঘোরে সে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, 'উল্লু ভুচ্চর, আমাদের শুধ্ বংশকে নরকে ডোবাতে চাস! বামহনকা ঘরমে কুত্তাকা জনম হুয়া। ঠার যা, টৌলিকা সব কোঈকো বুলাতা হ্যায়। মার মারকে তেরা জান খতম কর দুঙ্গা।'

স্ত্রী যে মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, সেদিকে লক্ষ ছিল না রামঅবতারের। ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা এবং বংশের গৌরব রক্ষা করাটা তার কাছে অনেক বেশি জরুরি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

এদিকে বাড়িতে হুলস্থুল শুরু হয়ে গিয়েছিল। ছোট ভাইবোনেরা একসঙ্গে তুমুল কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। তাই শুনে পাশের ঝা'দের বাড়ির লোকজন ছুটে এসেছে। তারা উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করেছে, 'ক্যা হুয়া রে, ক্যা হুয়া?'

অর্জুন উত্তর দেয়নি। দিশেহারার মতো জল এনে সবে মায়ের মাথায় ঢালতে শুরু করেছে, সেই সময় বাইরের রাস্তায় প্রচণ্ড হই চই শোনা গিয়েছিল। চমকে খোলা দরজা দিয়ে সেদিকে তাকাতেই চোখে পড়েছে তিরিশ চল্লিশটা লোক দারুণ উত্তেজিত এবং হিংস্র ভঙ্গিতে হল্লা করতে করতে তাদের বাড়ির দিকেই আসছে। সবার সামনে রয়েছে রামঅবতার মান্ধাতা নওলকিশোর ধনিকরাম সূরযদেও ভানপ্রতাপ, এমনি আরো অনেকে। এরা নমকপুরার ব্রাহ্মণ সোসাইটির মাথা। এদের এতই দাপট এবং ক্ষমতা যে শুধু ব্রাহ্মণরাই নয়, গোটা নমকপুরাই তাদের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। এই ছোট্ট নগণ্য শহরে যে কোনো বিষয়ে এদের মতামতই চূড়ান্ত। এদের কথা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বাণীর মতোই অমোঘ। এদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মাথা তোলার দুঃসাহস এখানকার একটি মানুষেরও নেই। বোঝা গেছে, মান্ধাতাদের ডেকে আনতেই ছুটে গিয়েছিল রামঅবতার।

প্রবল পরাক্রান্ত এতগুলো ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে আসতে দেখে বসে থাকতে সাহস হয়নি অর্জুনের। জলের লোটাটা মায়ের মাথার কাছে নামিয়ে রেখে পেছনের খিড়কি দরজা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গিয়েছিল সে। অর্জুন জানতো মান্ধাতারা ধরতে পারলে তাকে বরখা নদীর শুকনো বালির খাতে পুঁতে ফেলবে। তাদের কাছে জাতপাতের সওয়াল জগতের সব চাইতে মহার্ঘ বস্তু; ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা রক্ষা করা জীবনের সবচেয়ে পবিত্র কাজ।

অর্জুন সোজা চলে এসেছিল চার্চে। রেভারেন্ড টিরকেকে সব জানাবার পরও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি তিনি। শান্ত মুখে বলেছিলেন, 'এটাই আমি ভেবেছিলাম। যাক, তোমার ডিউটি তুমি পালন করেছ। এবার কমলাকে সঙ্গে করে তার মা-বাপের কাছে যাও। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে চার্চে চলে এস।'

অচ্ছুৎটোলার শেষ মাথায় কমলাদের ঘর। তারা গরিবের চাইতেও গরিব। তাদের ফুটোফাটা টিনের চালের ঘরটা অনেকখানি হেলে রয়েছে। ওটার আয়ু বেশিদিন নেই। আগামী বর্ষায় তেমন জোরে ঝড়বৃষ্টি হলে ঘরটা যে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়।

কমলার বাপ আধপুড়ো ক্ষয়াটে চেহারার জগলাল দোসাদ সব শুনে প্রথমটা আঁতকে ওঠে। তারপর হাতজোড় করে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, 'নেহী নেহী দেওতা, ইয়ে হো নেহী সাকতা। যেত্তে রোজ চান্দা-সূরয আসমানে রয়েছে তেত্তে রোজ বামহন আউর অচ্ছুতের শাদি হতে পারে না। ইয়ে পাপ দেওতা, এমনিতেই নরকে পড়ে আছি। আর আমাকে নিচে নামাবেন না।'

কমলার মা নাথুনির চেহারাও রোগা, ভাঙাচোরা। সে-ও হাতজোড় করে শ্বাসরুদ্ধের মতো বলেছিল, 'অ্যায়সা মাত কহো দেওতা। বরাম্ভন হোতা হ্যায় ভগোয়নকা বরাবর। তার হাতে লেড়কী দিই কী করে? আপ এহী নরকসে চলা যাইয়ে।'

অর্জুন সেই প্রথম টের পেয়েছিল, অচ্ছুতেরাও এক ধরনের সংস্কারের শিকার। আবহমান কাল ধরে এরা জেনে এসেছে বিষ্ঠার পোকার চাইতেও তারা অধম, এই হীনম্মন্যতা কোনোভাবেই তাদের মাথা তুলতে দেয় না। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের ছেলে এদের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে ভয়ে আতঙ্কে সিঁটিয়ে যায়। অর্থাৎ বামহন-কায়াথদের মতো তারাও ভাবে, এতকাল যা চলে আসছে তাই চলুক। ব্রাহ্মণরা সোসাইটির মাথায় চড়ে থাক, অচ্ছুৎরা থাক হিন্দু সমাজের একেবারে নিচের লেভেলে। দু পক্ষই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে। অর্থাৎ চিরাচরিত প্রথা ভেঙে যায়, এটা কারুরই কাম্য নয়। সবারই ইচ্ছা, সমান্তরাল ধারায় কাছাকাছি থেকেও তারা কোনোদিন যেন এক স্রোতে মিশে না যায়, দু পক্ষের মাঝখানে ভয় ঘৃণা হীনম্মন্যতা ইত্যাদি দিয়ে একটা চিরস্থায়ী বিভাজিকা রেখা যেন টানা থাকে।

অগত্যা অর্জুন আবার কমলাকে নিয়ে চার্চে ফিরে রেভারেন্ড টিরকেকে জগলালদের ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিল।

রেভারেন্ড টিরকে বলেছেন, 'এটাও আমার জানা ছিল। সম্‌স্কার ভেঙে তোমাদের কারুর মা-বাবাই বেরিয়ে আসতে সাহস পাবে না।'

বিমূঢ়ের মতো অর্জুন বলেছে, 'এখন আমরা কী করব রেভারেন্ড?'

'আশা করি, বিয়েটা তোমরা করবে। কারুর ভয়ে তোমাদের সিদ্ধান্ত পালটে যাবে না।'

'না। কিন্তু—'

'কী?'

'আমাদের বাড়ির এখন কী হাল আর আমাদের জাতের লোকজনেরা কিভাবে খেপে আছে, সব আপনাকে জানিয়েছি। ধরতে পারলে সবাই মিলে, আমাকে শেষ করে ফেলবে। এখন আমি কোথায় থাকব?'

এক মুহূর্তও না ভেবে রেভারেন্ড টিরকে বলেছেন, 'যতদিন কোনো ব্যবস্থা না হয় আমার কাছেই থাক। পরে ভেবেচিন্তে একটা কিছু করা যাবে।'

অর্জুন উত্তর দেয়নি। সৎ সাহসী এবং হৃদয়বান ওই খ্রিস্টান মিশনারি সম্পর্কে তার মন কৃতজ্ঞতায় এবং শ্রদ্ধায় ভরে গেছে।

চার্চে আশ্রয় পাওয়ার পর চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি। পরের দিন সকালেই দলবদ্ধভাবে নমকপুরার ব্রাহ্মণেরা এবং অন্যান্য উচ্চবর্ণের লোকজন গীর্জায় হানা দিয়েছিল। কিভাবে এখানকার খবর পেয়েছিল, তারাই জানে। এই চার্চ তৈরি হওয়ার পর ষাট সত্তর বছর পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে বামহন-কায়াথরা কোনোদিন এখানে আসেনি। তাদের এই অভিযানের কারণটা আন্দাজ করেই রেভারেন্ড টিরকে অর্জুনকে তাঁর বাংলো থেকে গীর্জায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, খ্রিস্টানদের মূল ধর্মস্থানে উঁচু জাতের লোকেরা ঢুকবে না।

অভিজ্ঞ বহুদর্শী মানুষটির ধারণা যে কতটা নির্ভুল, কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাওয়া গিয়েছিল। বামহন-কায়াথরা গীর্জা বাড়িতে না ঢুকে সোজা চলে গিয়েছিল রেভারেন্ড টিরকের বাংলোতে। সেখানে তারা কী করেছিল, তাঁর সঙ্গে ওদের কী কথা হয়েছিল, সে সব কিছুই জানাননি রেভারেন্ড। তবে পরে মঙ্গরা অর্জুনকে জানিয়েছে, ওরা গোটা বাংলো বাড়িটা আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখেছে অর্জুন ওখানে লুকিয়ে আছে কিনা। অর্জুনকে না পেয়ে তারা চলে গিয়েছিল অচ্ছুৎটোলির দিকে। ওদের মনে হয়েছিল, অর্জুন হয়ত সেখানেই পালিয়ে গেছে। নমকপুরার ইতিহাসে সেই প্রথম এতগুলো ব্রাহ্মণ এবং কায়াথ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ধাঙড় দোসাদ গাঙ্গোতাদের পাড়ায় গিয়েছিল। অর্জুন শুনেছে, ওরা অচ্ছুৎদের শাসিয়ে এসেছে, যদি তার সঙ্গে কমলার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, পুরো অচ্ছুৎটোলি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

যাই হোক, চার্চের কমপাউন্ড থেকে বামহন-কায়াথরা বেরিয়ে যাওয়ার পর গীর্জা বাড়িতে চলে এসেছিলেন রেভারেন্ড টিরকে। বলেছেন, 'তোমার জাতের লোকজন তোমাকে ছাড়বে না। আমার পক্ষেও কমলাকে আর তোমাকে বেশিদিন প্রোটেকশন দেওয়া সম্ভব নয়। নমকপুরার আপার কাস্টের লোকেরা খুবই পাওয়ারফুল।'

মারাত্মক ভয় পেয়ে গিয়েছিল অর্জুন। সে বলেছে, 'তা হলে কি থানায় একটা ডায়েরি করে রাখব?'

'কোনো লাভ হবে না অর্জুন। থানা ওদের বিরুদ্ধে একটা আঙুলও তুলবে বলে মনে হয় না।'

'তবে?'

অনেকক্ষণ চিন্তা করে রেভারেন্ড টিরকে বলেছেন, 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি তোমাকে প্রোটেকশন দেয়, তা হলে বাঁচতে পারবে। নইলে ভীষণ বিপদ। পাওয়ারফুল ব্রাহ্মণ আর কায়াথ অ্যাক্সিস তোমার আর কমলার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। এক কাজ কর—'

ভয়ার্ত চোখে অর্জুন জিজ্ঞেস করেছে, 'কী?'

'তুমি এখানকার এস. ডি. ও চন্দ্রকান্ত উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা কর। শুনেছি মানুষটা খুব লিবারেল, জাতপাতের সওয়ালে কোনোরকম সমস্কার নেই। উনি সাহায্য করলে কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।'

অর্জুন খুব একটা ভরসা পায়নি। রেভারেন্ড টিরকে যদিও অকপটে প্রশংসা করেছেন, তবু একজন উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ কতটা লিবারেল হতে পারেন, সে সম্পর্কে তার যথেষ্ট সংশয় ছিল।

অবশ্য চন্দ্রকান্তর কাছে যাওয়া ছাড়া চারপাশে আর কোনো রাস্তাই খোলা ছিল না। গাঢ় অন্ধকারে এটুকুই ছিল সেই মুহূর্তে তার কাছে একমাত্র রুপোলি রেখা।

অনিশ্চয়তা ও দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে যথেষ্ট ভয়ে ভয়েই এস. ডি. ও.'র বাংলোয় গিয়েছিল অর্জুন এবং কমলা। কিন্তু মিনিট পনের কথাবার্তার পর সংশয় আর টেনশন অনেকটাই কেটে গিয়েছিল তাদের। সংস্কারমুক্ত উদার চন্দ্রকান্ত বলেছিলেন, 'ডোন্ট ওরি। আমি তোমাদের দায়িত্ব নিলাম। কনগ্র্যাচুলেশন ফর দিস ভেরি বোল্ড স্টেপ। ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন, ন্যাশনাল ইন্ট্রিগ্রেশন বলে হল্লা করলেই তো হয় না। এই সব ইন্টার-কাস্ট, ইন্টার-প্রভিন্সিয়াল ম্যারেজ দিয়ে জাতীয় সংহতির পিলার বানাতে হয়। এস আমার সঙ্গে—' তিনি অর্জুনদের সঙ্গে করে বাংলোর ভেতরে গিয়ে স্ত্রীর হাতে তাদের সঁপে দিয়েছেন।

সরযূ উপাধ্যায়ও পরম স্নেহে এবং সমাদরে তাদেব গ্রহণ করেছিলেন।

তারপর সাতটা দিন ঝড়ের বেগে কেটে গেছে। এর মধ্যে একবার পাটনায় গেছেন চন্দ্রকান্ত। মিনিস্টার, এম. পি এবং স্থানীয় এম. এল. এ'র সঙ্গে দেখা করে অর্জুন এবং কমলার বিয়ের যাবতীয় ব্যবস্থা করে এসেছেন। এমনকি অচ্ছুতের মেয়ে বিয়ে করলে আইন অনুযায়ী যে চাকরি এবং পাঁচ হাজার টাকা সরকারী ইনসেনটিভ পাওয়া যায়, তারও বন্দোবস্ত করেছেন। একবার গেছেন ডিস্ট্রিক্ট টাউনে। সেখানে ডি. এম, এ. ডি. এম, এস. পি, ডি. এস. পি, সার্কেল ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন।

সাত দিন পর বিয়েটা সুচারুভাবে সম্পন্ন করে অর্জুন এবং কমলাকে বাড়ি পাঠিয়েছেন চন্দ্রকান্ত আর সরযূ।

শিরদাঁড়ার মতো সোজা রাস্তাটা দিয়ে নমকপুরার শেষ মাথায় যখন রামঅবতারের বাড়ির সামনে বিশাল গাড়িটা এসে থামে তখন বেশ খানিকটা রাত হয়েছে।

পুরানা মহল্লার তাবৎ ব্রাহ্মণ এবং কায়াথ এই মুহূর্তে এখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। শুধ্ চতুর্বেদী বংশের ছেলে একটি দোসাদের মেয়ে বিয়ে করে বাড়ি ফিরছে, সবাই এই অবিশ্বাস্য ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী থাকতে চায়।

ভীত চোখে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় কমলা বলে, দেখছ—'

জানালার বাইরে তাকিয়ে চারপাশের চাপ-বাঁধা ভিড়টা দেখতে দেখতে মারমুখী মানুষগুলোর মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করছিল অর্জুন। সেও প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। আস্তে আস্তে স্ত্রীর রক্তশূন্য সন্ত্রস্ত মুখ দেখতে দেখতে সাহস দেবার ভঙ্গিতে বলে, 'ডরো মাত্—'

এদিকে ড্রাইভার নেমে পড়েছিল। লোকটা আসলে গাড়ি চালায় না। সে পুলিশের একজন ছোটখাট অফিসার। নাম লালধারী সিং। লম্বা চওড়া জবরদস্ত চেহারা তার, নাকের তলায় মোমে-মাজা জমকাল পাকানো গোঁফ।

লালধারী গমগমে গলায় হাঁকে, 'রামঅওতারজি কঁহা হ্যায়? কিরপা করকে ইধর আইয়ে।'

সদর দরজার ঠিক মুখে রামঅবতার ভীত, উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। কেননা তার গা ঘেঁষেই রয়েছে মান্ধাতা সূরযদেও ভানপ্রতাপ নওলকিশোর এবং আরো অনেকে।

রামঅবতার দ্বিধান্বিতের মতো দাঁড়িয়েই থাকে। এমনিতে কমলার সঙ্গে অর্জুনের বিয়েতে মান্ধাতাদের একেবারেই সায় ছিল না। তারা ভয়ানক খেপে আছে। এর পর সে গাড়ির কাছে গেলে ওদের রাগ আরো কতটা চড়ে যাবে, সঠিক আঁচ করা যাচ্ছে না। এর পাশাপাশি মিনিস্টার, এম. এল. এ, ডি. এম ও এস. ডি. ও'দের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। একদিকে নমকপুরায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রাহ্মণেরা, আরেক দিকে তার চেয়েও পাওয়ারফুল মিনিস্টার, এস. পি, এস. ডি. ও ইত্যাদি। মাঝখানে জাঁতিকলে পড়া ইঁদুরের মতো আটকে গিয়ে রামঅবতার একেবারে গুঁড়িয়ে যেতে বসেছে। তারই ঔরসে জন্ম নিয়ে অর্জুন যে এত বড় একটা সর্বনাশ করে বসবে, পবিত্র চতুর্বেদী বংশের মুখে চুনকালি লাগিয়ে দেবে, কে ভাবতে পেরেছিল?

পুলিশের লোককে উপেক্ষা করা যায় না, বিশেষ করে স্বয়ং এস. ডি. ও যখন তাকে পাঠিয়েছেন। চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত মান্ধাতাদের একবার দেখে প্রায় মরিয়া হয়েই লালধারীর কাছে চলে আসে।

লালধারী বলে, 'এস. ডি. ও সাহেব আপনার লেড়কা আউর পুতহুকে পাঠিয়ে দিলেন। কোনোরকম ঝামেলা হলে এস. ডি. ও সাহেব খুদ এখানে চলে আসবেন।' পুলিশি মেজাজে এই পর্যন্ত বলে গলার স্বরটা অনেকখানি নরম করে আবার শুরু করে, 'উপহারের অনেক সামান নিয়ে এসেছি। কোথায় রাখব দেখিয়ে দিন। আউর হাঁ, তার আগে পুতহুকে 'স্বাগত্' করে ঘরে নিয়ে যান। 'স্বাগত্' - এর ব্যওস্থা হয়েছে?'

লালধারীর কাছে এস. ডি. ও'র হুঁশিয়ারি শুনে বেজায় ঘাবড়ে যায় রামঅবতার। ঢোক গিলে সে বলে, 'আমার পত্নীর ভারি বুখার। 'স্বাগত্' কে করবে? এস. ডি. ও সাহেব আমাকে যেন ক্ষমা করেন।'

জানালা দিয়ে রামঅবতারকে লক্ষ করছিল অর্জুন। বাবুজি যে মিথ্যে বলছে, তার মুখচোখের চেহারা দেখে টের পেয়ে যায় সে। মা কোনোমতেই, হাজার জবরদস্তি করলেও অচ্ছুতের মেয়েকে 'স্বাগত্' জানাবার জন্য রাস্তায় আসবে না। রামঅবতার তাদের বিয়ের সময় এস. ডি. ও'র বাংলোয় থেকে যাওয়ায় অর্জুনের ক্ষীণ একটু আশা হয়েছিল, হয়ত সমস্যাটা আস্তে আস্তে কেটে যাবে। মুখের কথা খসালেই তো সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। এখন দেখা যাচ্ছে, মিনিস্টার, ডি. এম, এস. ডি. ও'দের ভয়ে আর ছেলের নৌকরি এবং নগদ টাকার লোভে রামঅবতার বিয়ের সময় থেকে গিয়েছিল।

লালধারী সিং বলে, 'আপনার পত্নীর বুখার. লেড়কার চাচী-মাসি-ফুফী কি পড়োশিনরা নেই? তাদের আসতে বলুন—'

আক্রমণটা এই দিক থেকে আসবে, ভাবতে পারেনি রামঅবতার। সে হকচকিয়ে যায়, তবে কোনো উত্তর দেয় না।

লালধারী সিং কিছু একটা আন্দাজ করে কমলার অভ্যর্থনার জন্য আর চাপ দেয় না। ক্যারিয়ার থেকে দামি দামি উপহারের বাক্স এবং প্যাকেটগুলি বার করে নিচে নামাতে নামাতে বলে, 'পুতহুকে 'স্বাগত্' না করেন, এগুলোকে জরুর করবেন—না কী বলেন?' তার গলায় কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ মেশানো রয়েছে।

বিদ্রূপটা উপেক্ষাই করে রামঅবতার। এদিক সেদিক তাকাতেই ভিড়ের ভেতর তার ছোট ছেলে বিনোদ এবং বাড়ির কাজের ছোকরা ধনিয়াকে দেখতে পায়। রামঅবতারের দুই ছেলের মধ্যে বড় অর্জুন, তারপর বিনোদ। হাতের ইশারায় বিনোদদের কাছে ডেকে উপহারের প্যাকেট-ট্যাকেটগুলো বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে বলে।

এদিকে বাক্সটাক্স নামাবার পর গাড়ির দরজা খুলে লালধারী কমলাকে বলে, 'শুনলে তো, তোমার সাস বা আর কেউ তোমাকে 'স্বাগত্' জানাতে আসবে না। বহুত দুখকা বাত। সব কুছ নসিব।' বলে কপাল দেখিয়ে দেয়। কমলার জন্য সে আন্তরিকভাবেই দুঃখিত হয়েছে। একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, 'কী আর করবে, এজন্যে ভেঙে পড়ো না। মনমে তাকত রাখ। সব কুছ ঠিক হো যায়েগা। আও, উতার আও—'

কমলা এবং অর্জুন গাড়ি থেকে নেমে পড়ে।

লালধারী অর্জুনের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'কেউ যখন এল না, তুমিই ধরমপত্নীকে 'স্বাগত্' করে নিয়ে যাও। আপনা পত্নীর সম্মান যাতে থাকে সেদিকে নজর রেখ। ভগোয়ান রামচন্দ্রজি তোমাদের কিরপা করুন।'

অর্জুন কৃতজ্ঞ চোখে লালধারীকে একবার দেখে, তারপব রামঅবতারের দিকে তাকায়, 'বাবুজি, আমরা—' এই পর্যন্ত বলে থেমে যায়।

নিতান্ত নিরুপায় হয়েই যেন রামঅবতার বলে, 'আয—'

রামঅবতারের পিছু পিছু অর্জুন এবং কমলা বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। লালধারী সিং গাড়ির কাছে অনড় দাঁড়িয়ে থাকে।

চলতে চলতে ভয়ে এবং প্রবল অনিশ্চয়তায় হাত-পা ভয়ানক কাঁপতে থাকে কমলার। মনে হয়, কোমর থেকে নিচের অংশটা খসে যাবে। মুখ তুলে সে কারুর দিকে তাকাতে পারছে না। তবু বুঝতে পারছে চারপাশে কয়েক জোড়া হিংস্র ভয়ঙ্কর চোখ থেকে আগুনের হল্‌কা ছুটছে। তার আঁচ সে অনুভব করতে পারছে। নমকপুরার ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রী, এস.ডি.ও'দের চাপে তাদের বিয়ে ঠেকাতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু বোঝা যায়, খুব সহজে তারা এই অপমান মেনে নেবে না।

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে, 'দেখো দেখো অচ্ছুতিয়াকা দামাদ (জামাই) দেখো।'

'জানোয়ার আমাদের জাত মেরেছে। ওকে আমরা ছাড়ব না।'

চাপা গলায়, লালধারীর কান বাঁচিয়ে ইত্যাকার নানারকম মন্তব্য করতে থাকে আশেপাশের লোকজন।

অর্জুন একবার ভাবে, লালধারীর সঙ্গে এস. ডি. ও'র বাংলোয় ফিরে যাবে কিনা, পরমুহূর্তেই ভাবে, না, এতদূর এসে সে কিছুতেই ফিরে যাবে না। একটা মারাত্মক উত্তেজক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে তারা, এর একটা প্রতিক্রিয়া তো হবেই।

দরজা পেরিয়ে অর্জুন সবে বাড়ির ভেতরে এক পা ফেলেছে, মান্ধাতা নিচু কর্কশ গলায় পাশ থেকে বলে, 'কাজটা ভাল করলি না অর্জুন। ভবিষ্যতে তোদের পস্তাতে হবে। মৌত পর্যন্ত কাঁদতে হবে।'

চমকে একবার মান্ধাতাকে দেখেই ঘাড় গুঁজে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায় অর্জুন। দু পা যেতে না যেতেই কোনো একটা ঘর থেকে মায়ের একটানা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে।

রামঅবতার শোওয়ার ঘরগুলোর দিকে যায় না, ঢালা উঠোন পেরিয়ে টিনের ফাঁকা চালাগুলোর দিকে এগিয়ে যায়।

অর্জুন ভয়ে ভয়ে ডাকে, 'বাবুজি—'

রামঅবতার থমকে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। রূঢ় গলায় বলে, 'ক্যা?'

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?'

জ্বলন্ত চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রামঅবতার বলে, 'তোমার কি ইচ্ছে আমি তোমাদের ওখানে নিয়ে তুলব?' বলে আঙুল বাড়িয়ে শোওয়ার ঘরগুলো দেখিয়ে দেয়।

এক ফুঁয়ে বাতি নিবিয়ে দেওয়ার মতো অর্জুনের শেষ শীর্ণ আশাটুকু বিলীন হয়ে যায়। এটা সে ভাবতে পারেনি।

এবার আর মুখে কিছু বলে না রামঅবতার। আঙুল দিয়ে টিনের চালাগুলোর দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে ফের হাঁটতে শুরু করে। সবচেয়ে বড় চালাটার কাছে এসে খোলা দরজা দেখিয়ে বলে, 'যা। তোরা ওখানে থাকবি।' বলে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না, উঠোনের ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে উলটো দিকের পাকা ঘরগুলোর দিকে চলে যায়।

এ বাড়িতে তাদের স্থান কোথায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কমলার সঙ্গে তার বিয়েটাকে মা এবং বাবুজি কিভাবে নিয়েছে, বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় না অর্জুনের। স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে। তাবপর ঝাপসা গলায় কমলাকে বলে, 'এস।' পা বাড়াতে গিয়ে তার চোখে পড়ল, মান্ধাতা ধনিকরাম সূরযদেও এবং আরো অনেকে সদর দরজার কাছে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তারা চালার ভেতর ঢুকলে মান্ধাতারা চলে যায়। অর্জুনেব মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো হঠাৎ কিছু একটা ঘটে যায়। তার মনে হয়, বাবুজি তাদের শোওয়ার ঘরে নিয়ে তোলে কিনা সেটা দেখার জন্য ওরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল।

চালাটার ভেতর নতুন বাল্ব জ্বলছে। ওদিকের কোনো একটা ঘর থেকে তাড়াহুড়ো করে তার টেনে আলোব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একধারে তক্তাপোষে ধবধবে বিছানা পাতা। এবড়ো খেবড়ো মেঝেতে তাদের নতুন দু'টি স্যুটকেস, বাস্কেট, কিছু বাসনকোসন, স্টোভ, প্লাস্টিকের ক্যানে কেরোসিন। ক'টা পলিথিনের ব্যাগে চাল ডাল আটা চিনি চা ইত্যাদি। একটা বেতের ঝুড়িতে আলু এবং অন্যান্য কাঁচা আনাজ। দুটো প্লাস্টিকেব বালতি, কাচের সোরাইও দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ কমলা আর অর্জুনের জন্য একেবারে আলাদা বন্দোবস্ত

করে দেওয়া হয়েছে।

কমলা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। ক'টা দিন ধরে তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। তারপর আজ সকাল থেকে এই রাত পর্যন্ত একটানা উত্তেজনা ভয় এবং আতঙ্কের চাপে তার মাথার ভেতরটা যেন ফেটে চুরমার হয়ে যাবে। আচ্ছন্নের মতো বিছানায় সে নিজেকে ছুঁড়ে দেয়, তারপর দু হাতে মুখ ঢাকে।

একসময় কমলা টের পায়, অর্জুন তার পাশে এসে বসেছে। মুখ থেকে হাত না সরিয়ে সে বলে, 'আমার জন্যে তোমাকে যে এত কষ্ট পেতে হবে, ভাবতে পারিনি।'

স্ত্রীর মাথায় একটি হাত রেখে গাঢ় আবেগে অর্জুন বলে, 'কষ্ট আর অপমান তো তোমারও কম হচ্ছে না কমলা।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আমার জন্যে তোমার বাড়ির লোকেরা তোমাকে ত্যাগ করল। তা ছাড়া—' এই পর্যন্ত বলে থেমে যায় কমলা।

অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'তা ছাড়া কী?'

'তোমার জাতের লোকেরাও তোমার ওপর খেপে আছে।'

কমলার 'স্বাগত্'-এর বহর দেখে এবং মান্ধাতাদের মনোভাব আন্দাজ করে ভেতরে ভেতরে ভীষণ দমে গেছে অর্জুন। তবু স্ত্রীকে ভরসা দেওয়ার জন্যই হয়ত বলে, 'এ রকম শাদি তো আমাদের টাউনে আগে কখনও হয়নি, তাই থোড়া কুছ ঝঞ্ঝাট হচ্ছে। দু-চার দিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

স্বামীর এতটা আশাবাদও কমলার সংশয় আর উৎকণ্ঠা এতটুকু কমাতে পারে না। সে বলে, 'কিছুই ঠিক হবে না। আমার একটা কথা শুনবে?'

'কী?'

'আমাকে আমাদের বাড়ি দিয়ে এস। আমার জন্যেই এত সব সমস্যা।'

অর্জুন চমকে ওঠে। অদ্ভুত এক যন্ত্রণায় তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে যেতে থাকে। বিষণ্ণ গলায় সে বলে, 'চার ঘণ্টাও পার হয়নি আমাদের বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যেই তুমি এমন একটা কথা বলতে পারলে!'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে স্বামীর দিকে তাকায় কমলা। অর্জুনের কষ্টটা কোনো অভ্রান্ত নিয়মে তার মধ্যেও ছড়িয়ে গিয়েছিল। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করে সে, পারে না। ঠোঁট দু'টি শুধু থরথর করতে থাকে।

অর্জুন আবার বলে, 'দু'জনে মিলে এই যে এত দিন লড়াই করলাম, সে কি শাদির রাতেই তোমাকে তোমার মা-বাবার কাছে রেখে আসার জন্যে?'

অর্জুন আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রাধার গলা শোনা যায়, 'ভাইয়া—'

প্রথমটা হকচকিয়ে যায় অর্জুন। তারপর দ্রুত দরজার কাছে চলে আসে। বাইরে রাধা দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স আঠার উনিশ। অঢেল স্বাস্থ্য, দেখতে মোটামুটি ভালই। রাধার হাতে বড় কাঠের পরাতে অনেকগুলো বাটিতে প্রচুর খাবার দাবার।

রাধা বলে, 'বাবুজি এগুলো পাঠিয়ে দিলে। ঘরে চাল ডাল সবজি ঘি আটা—সব রয়েছে। দেখেছ তো?'

আস্তে ঘাড় হেলিয়ে দেয় অর্জুন, 'হ্যাঁ।'

'বাবুজি বলে দিয়েছে আজ আর তোমাদের রসুই করতে হবে না। কাল থেকে করো।'

রাধা এবার যা বলে তা এইরকম। এই ঘরটার ডান পাশে যে ছোট অ্যাসবেস্টসের চালাটা রয়েছে সেখানে অর্জুনদের নাহানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটা লোককে দিয়ে ওখানে জল তুলিয়ে রেখেছে রামঅবতার। কাল সকালে আবার জল দিয়ে যাবে সে। ওটার পাশের চালাটায় এক কালে খাটা পায়খানা ছিল। সেটাকে সাফসুফ করিয়ে রাখা হয়েছে। ওটা অর্জুনরা ব্যবহার করবে। অর্থাৎ পুরোপরি

আলাদাভাবেই তাদের থাকতে হবে। তাদের জন্য রান্নার ভিন্ন ব্যবস্থা। স্নানের ঘর, শোওয়ার ঘর, রান্নাঘর, কোথাও তাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। এমন কি কুয়োটা ছোঁয়ার অধিকার পর্যন্ত তাদের নেই।

এই সব খবর দেওয়ার পর রাধা বলে, 'এই খানা রেখে গেলাম, খেয়ে নিও—' বলতে বলতে কাঠের পরাতটা অর্জুনের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখে।

রাধাকে চলে যেতে দেখে অর্জুন বলে, 'একটু দাঁড়া—'

রাধা থেমে যায়, 'কী বলছ?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অর্জুন। একসময় দ্বিধান্বিতভাবে বলে, 'মা কেমন আছে রে?' দিন সাতেক আগে মান্ধাতাদের ভয়ে মাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে সেই যে পালিয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে মায়ের আর কোনো খবর পায়নি।

রাধার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'বহুত বুরা। সাত রোজ সমানে কাঁদছে।' বলতে বলতে তার চোখ জ্বলতে থাকে, গলার স্বর তীব্র শোনায়, 'সব কুছ তুমহারে লিয়ে।'

কী উত্তর দেবে, ভেবে পায় না অর্জুন। হঠাৎ তার খেয়াল হয়, কিছুক্ষণ আগে বাড়িতে ঢোকার সময় মায়ের একটানা কান্নার আওয়াজ কানে ভেসে এসেছিল। এখন কান্নাটা থেমে গেছে।

রাধা আবার বলে, 'তোমাদের জন্যে মায়ের মৌত (মৃত্যু) হবে।'

প্রবল অনুশোচনায় অর্জুনের বুকের ভেতরটা ভরে যায়। মনে হয়, এ বিয়েটা না করলেই হত। দোসাদদের মেয়েকে ঘরে আনলে এত দিকে এত রকম জটিলতা এবং সমস্যা দেখা দেবে, কে ভাবতে পেরেছিল! পরক্ষণেই নিজেকে ধিক্কার দেয় অর্জুন। বিয়ের পর পুরো একটা দিনও কাটেনি। তার মধ্যে এসব কী ভাবছে? সে রাধাকে বলে, 'মা কি আমাদের ক্ষমা করবে না?'

অর্জুনের গলায় এমন তীব্র ব্যাকুলতা রয়েছে যাতে কিছুটা সহানুভূতিই বোধ করে রাধা। নরম গলায় এবার বলে, 'কি জানি।'

একটু চুপচাপ। তারপর অর্জুন বলে, 'বাবুজি মাসি ফুফী আর চাচাদের খবর দিয়েছে?'

'না। তবে—'

'কী?'

'ওরা খবর পেয়ে গেছে। সবাই জানিয়ে দিয়েছে—'

'কী জানিয়েছে?' অর্জুনের চোখেমুখে গভীর উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে।

'আজ থাক, পরে শুনো।'

'বল না—'

'আমার মুখে না-ই বা শুনলে।'

'বুরা কিছু?'

রাধা উত্তর দেয় না।

উঠোনের ওপারের দালান থেকে রামঅবতারের ভারি গলা ভেসে আসে, 'কিরে রাধা, এত দেরি হচ্ছে কেন?'

রাধা হকচকিয়ে যায়, 'যাই বাবুজি—'

সে আবার যখন ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে, অর্জুন তাকে থামিয়ে দেয়, 'রাধা—'

'কী বলছ?'

নিচু গলায় অর্জুন বলে, 'এস. ডি. ও সাহেবের স্ত্রী কমলার 'পট্টি পরায়' করে দিয়েছেন। ওর চুলের ভেতর দুশ টাকা লুকনো রয়েছে। ওটা তো তোর পাওনা। নিবি না?'

রাধার চোখ চকচক করতে থাকে। কমলা যদি তাদের স্বজাতের ঘর থেকে আসত, এতক্ষণে তার খোঁপা খুলে কখন উপহারের টাকাগুলো বার করে নিত রাধা। 'চল, নিচ্ছি—' বলতে গিয়েও থেমে যায়। টের পায়, অদৃশ্য কঠিন একটি হাত তার গলা টিপে ধরেছে। কোনোরকমে বলে, 'নেহী ভাইয়া—'

'কেন রে?'

'সবাই গুস্‌সা করবে। তা ছাড়া—'

'কী?'

'অচ্ছুতের লেড়কীকে ছুঁলে এই রাত্তিরে আবার নাহানা করতে হবে।'

করুণ মুখে অর্জুন বলে, 'নাহানার তখলিফ করে দরকার নেই। তুই যা—'

রাধা আর দাঁড়ায় না, উঠোন পেরিয়ে ওধারে চলে যায়। আস্তে আস্তে ক্লান্তভাবে ঘরের ভেতর চলে আসে অর্জুন। তক্তাপোষে চুপচাপ পাথরের মূর্তি হয়ে বসে আছে কমলা। হাত দু'টি কোলের ওপর এলিয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পর খেয়ে দেয়ে তারা শুয়ে পড়ে। এত অপমান বিরুদ্ধাচরণ এবং শত্রুতা ভুলিয়ে দিয়ে যৌবনের উষ্ণ আবেগ তাদের দু'জনকে অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসে। কমলাকে বুকের ভেতর টেনে এনে তার ঠোঁট সবে কমলার রক্তাভ উন্মুখ ঠোঁট দু'টিকে ছুঁতে যাবে, আর জগতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পুরুষটির প্রগাঢ় একটি স্পর্শের জন্য কমলা যখন আধবোজা ঘোর-লাগা চোখে তাকিয়ে ব্যগ্র হয়ে আছে, সেই সময় হঠাৎ ওধারের দালান থেকে মায়ের একটানা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। নমকপুরার রাত এখন একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। এমন কি বাড়ির পেছন দিকের গাছপালার মাথায় পাখিদের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজও থেমে গেছে।

রাতের নৈঃশব্দ্য ছিঁড়ে খুঁড়ে মায়ের বিলাপ চলতেই থাকে।

এদিকে দু'টি মুখ পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে থমকে যায়। অর্জুনের যে হাত নিবিড়ভাবে কমলাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে রেখেছিল, নিজের অজান্তে কখন যেন তা শিথিল হয়ে যায়।

স্বামীর মুখের দিকে বিষণ্ণ করুণ মুখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে কমলা। কখন যে তার চোখ জলে ভরে যায়, নিজেই জানে না।

বিয়ের প্রথম রাতটা এইভাবেই কেটে যায় তাদের।

পাঁচ

অন্য সব দিনের মতো আজও বেশ ভোরেই ঘুম ভেঙে যায় কমলার। এটা তার অনেক কালের অভ্যাস।

এধারে ওধারে তাকাতেই টিনের ফুটিফাটা চাল, ছোট চাপা জানালার বাইরে উঁচু উঁচু গাছপালা এবং বিছানায় তারই পাশে অর্জুনকে দেখতে পায় কমলা। প্রথমটা ভাবে, অলৌকিক কোনো স্বপ্নের ঘোরে সে এখানে এসে পড়েছে। পরক্ষণেই সব কিছু মনে পড়ে যায়।

একটু পর বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় কমলা। এখান থেকে বাড়ির ভেতর দিকের পুরোটা এবং পেছনের খানিকটা অংশ দেখা যায়।

এখনও রোদ ওঠেনি। চারদিকে ঝাপসা অন্ধকার। ফাল্গুন শেষ হয়ে এল। তবু আজকাল রাতের দিকে মিহি সিল্কের মতো ফিনফিনে কুয়াশা পড়তে শুরু করে। আকাশের গায়ে এবং এ বাড়ির পেছন দিকের ঝুপসি গাছগাছালির মাথায় এই মুহূর্তে হিম জড়িয়ে আছে।

এ বাড়ির কেউ এখনও ওঠেনি। খুব সম্ভব গোটা নমকপুরা টাউনটাই ঘুমের আরকে ডুবে আছে। শুধু কমলার মতো পাখিদেরও ভোরে ঘুম ভাঙার অভ্যাস। শুধু তারাই পেছন দিকের গাছপালার মাথায় চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। এ ছাড়া সমস্ত চরাচর জুড়ে কোথাও আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

একসময় পুব আকাশে একটু একটু করে আলো ফুটতে থাকে। দূরের 'পাক্কী' থেকে টাঙ্গা আর বয়েল গাড়ি চলাচলের আওয়াজ আসছে। লোকজনের গলাও পাওয়া যায়।

আচমকা উঠোনের ওধারের পাকা দালানে ক্যাঁচ করে দরজা খোলার শব্দ হয়। চমকে সেদিকে মুখ

ফেরাতেই কমলা দেখতে পায়, রামঅবতার একটি মাঝবয়সী মহিলাকে ধরে ধরে একটা ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় নিয়ে আসছে। দেখা মাত্র বোঝা যায়, মহিলাটি ভীষণ অসুস্থ, অন্যের সাহায্য ছাড়া চলাফেরার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই তাঁর। রুক্ষ খোলা চুল মুখের অর্ধেকটা ঢেকে লুটিয়ে আছে, চোখের নিচে গাঢ় কালির ছোপ। মনে হয়, এই মানুষটি বহুদিন ঘুমোয়নি।

আগে না দেখলেও কমলা বুঝতে পারে, মহিলাটি অর্জুনের মা এবং আইনত তার শাশুড়ি। সে আর সোজাসুজি জানালার সামনে থাকে না, দ্রুত একপাশে সরে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়ায় যাতে ওরা তাকে দেখতে না পায়, অথচ সে তাদের দেখতে পাবে।

এদিকে রামঅবতারেরা বারান্দা থেকে নেমে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তারপর পুব দিকে তাকিয়ে সূর্য প্রণাম করে। প্রণাম হয়ে গেলে আবার ধরে ধরে স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে যায়।

কমলাও আর দাঁড়িয়ে থাকে না। ভোরবেলায় স্নান করা তার বহুকালের অভ্যাস। পাশের নাহানা ঘরটার দিকে যেতে যেতে চোখে পড়ে, কাল রাতের এঁটো বাসনগুলো এক কোণে পড়ে আছে। যে বর্তনে অচ্ছুতের উচ্ছিষ্ট লেগে আছে, এ বাড়ির জল-চল কাজের লোকেরা তা আদৌ ছোঁবে কিনা সে সম্পর্কে আদৌ নিশ্চিত নয় কমলা। থালা-ঘটি-বাটি তুলে নিয়ে সে নাহানা ঘরে চলে যায়।

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে বাসনকোসন মেজে, বাসি শাড়িটাড়ি কেচে এবং স্নান সেরে কমলা যখন ফিরে আসে, অর্জুনের ঘুম ভেঙে গেছে। বিছানায় বসে বসে কিছু ভাবছিল সে। স্ত্রীকে দেখে সামান্য হেসে সে বলে, 'এর মধ্যে নাহানা শেষ!'

'হ্যাঁ।' বাসনগুলো একধারে নামিয়ে রাখতে রাখতে কমলা বলে।

'এ কি, বর্তন মাজলে যে!'

কমলা শান্ত ভঙ্গিতে বলে, 'আমি না মাজলে কে মাজবে? অন্য কেউ তো এঁটো বর্তন ছুঁত না।'

কমলার কথায় এমন একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যাতে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে থাকে অর্জুন।

কমলা আবার বলে, 'তুমি মুখ ধুয়ে এস। আমি চা করি। চায়ের সঙ্গে কী খাবার করব?'

'তোমার যা ইচ্ছে।' বলতে বলতে বিছানা থেকে নেমে নাহানা ঘরের দিকে চলে যায় অর্জুন।

বিছানা গুছিয়ে, ভেজা চুলে বারকয়েক চিরুনি চালিয়ে আলগা একটা খোঁপা করে নেয় কমলা। তারপর যখন সে স্টোভ ধরাতে যাবে সেই সময় দরজার বাইরে হঠাৎ রাধার গলা শোনা যায়।

'ভাইয়া—'

কমলা হকচকিয়ে যায়। অর্জুন নাহানা ঘরে। এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত, ভেবে পায় না। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়েই প্রায় রুদ্ধশ্বাসে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। একটা স্টিলের থালায় দু কাপ চা আর প্লেটে গরম পুরি তরকারি নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রাধা।

স্থির পলকহীন চোখে কমলাকে দেখতে থাকে রাধা। কাল রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে টিমটিমে আলোয় উঠোন দিয়ে রামঅবতারের পেছনে পেছনে এই টিনের চালায় তাকে আসতে দেখেছিল। কমলার মুখ ছিল মাটির দিকে নামানো। আলোর তেজ তখন এতই কম যে ভাল করে খুঁটিয়ে তাকে দেখা যায়নি।

কমলা যে এত সুন্দর, এত ঝকঝকে, আগে ভাবতেই পারেনি রাধা। সকালে স্নান করার জন্য তাকে টাটকা ফুলের মতো দেখাচ্ছে। এমন রূপ রামহন কায়াথদের ঘরেও ক্বচিৎ চোখে পড়ে। নিজের অজান্তেই তার দু চোখে মুগ্ধতা ফুটে ওঠে। অচ্ছুৎ হওয়ার কারণে কমলা সম্পর্কে তার মনে যে প্রচণ্ড ঘৃণা এবং বিদ্বেষ রয়েছে তার তীব্রতা যেন কমে যেতে থাকে।

স্নিগ্ধ হেসে কিছুটা দ্বিধান্বিতভাবে কমলা বলে, 'আও বহীন—'

কমলার কণ্ঠস্বর খুবই সুরেলা এবং মিষ্টি। তা ছাড়া রাধা শুনেছে, সে খুবই 'লিখিপড়ী লেড়কী'। কমলার সম্বন্ধে খানিকটা সম্ভ্রমই বোধ করতে থাকে সে। বলে, 'ভাইয়া কোথায়?'

'নাহানা ঘরে—'

'এই তোমাদের সবেরকা ভোজন' (সকালের খাবার) আর চায়পানি রইল। খেয়ে নিও—' বলতে বলতে কাল রাতের খাবারসুদ্ধু কাঠের বড় পরাতটা যেখানে নামিয়ে রেখেছিল, ঠিক সেইখানেই স্টিলের থালাটা রাখে রাধা। অর্থাৎ আজও সে ভেতরে আসবে না।

কালকের মতো আজ আর ততটা বিষাদ বোধ করে না কমলা। রাধারা কোনোদিনই তার ঘরে আসবে না এবং এটাই যখন তাকে মেনে নিতে হবে তখন আর এ নিয়ে নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? কমলা স্টিলের থালাটা তুলে নিতে নিতে বলে, 'কাল তোমার ভাইয়াকে বলে গিয়েছিলে, আজ থেকে আমাদের রসুই করে নিতে হবে। আমি তো স্টোভ ধরিয়ে চা বসাতে যাচ্ছিলাম। তুমি আবার—'

রাধা বলে, 'বাবুজি বলল, তুমি নতুন এসেছ। পুরা জীওন খাটুনি তো আছেই। একটা দিন জিরিয়ে নাও। আজও আমাদের রসুইঘর থেকে 'ভোজনে'র ব্যওস্থা হবে। কাল থেকে তুমি রসুই কর।'

তার জন্য রামঅবতারের মনে তা হলে যত সামান্যই হোক, একটু সহানুভূতি অন্তত আছে। হয়ত আত্মীয়স্বজন এবং স্বজাতের মানুষজনের ভয়ে সেটা মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারছে না। তবু এটুকুতেই খুশিতে এবং কৃতজ্ঞতায় কমলার বুকের ভেতরটা আপ্লুত হয়ে যায়। ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে রামঅবতারকে একটা প্রণাম করে। ইচ্ছা করে, মা-জি কেমন আছে সে খবরটা একবার নেয়। পরক্ষণেই তার খেয়াল হয়, কোনোটাই সম্ভব নয়। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে আস্তে আস্তে ঝুঁকে স্টিলের থালাটা তুলে নিয়ে কমলা বলে, 'ভরোসা দিলে একটা কথা বলি—'

প্রায় সমবয়সী কমলাকে দেখে, তার সঙ্গে কথা বলে আগেকার বিরূপতা অনেকটাই কেটে গিয়েছিল রাধার। সে সহজভাবেই বলে, 'হাঁ হাঁ, বল না—'

'পট্টি পরায় করে এসেছিলাম, খোঁপার ভেতর তোমার জন্যে টাকা ছিল। নেবে না বহীন?'

এই কথাটা অর্জুনও কাল বলেছিল। রাধা দ্রুত মুখ ফিরিয়ে একবার উঠোনের ওধারে তাকায়। রামঅবতার বিনোদ বা ভরতকে আপাতত ওখানে দেখা যায় না। সে ফের কমলার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে, 'নিতে তো চাই। লেকেন মা আর বাবুজি জানতে পারলে বহুত মুসিবত হয়ে যাবে।' একটু থেমে কী ভেবে বলে, 'দেখি, পরে কী করা যায়—'

কমলা বুঝতে পারে, পট্টি পরায়ের টাকাটা নিশ্চয়ই কোনো এক সময় নিয়ে যাবে রাধা। বলে, 'ওটা না নিলে আমার বহুত দুখ হবে বহীন—'

কমলার চোখের দিকে তাকিয়ে রাধা জিজ্ঞেস করে, 'এক বাত পুছেঙ্গি?'

'হ্যাঁ, জরুর।'

'তুমি সচমুচ অচ্ছুতের ঘর থেকে এসেছ?'

'কেন, সন্দেহ আছে?' কমলা হাসে।

'তোমার রাহান সাহান, হালচাল দেখে একেবারেই মনে হয় না।' রাধা বলে যায়।

কমলা হালকা গলায় ঠোঁটের কোণে মজাদার একটা ভঙ্গি করে বলে, 'কী মনে হয় আমাকে?'

'খানদানী বড়ে ঘরকা লেড়কী।'

'যাক, একটা সার্টিফিকেট পাওয়া গেল।'

'সার্টিফিকেট মতলব?'

'পরে বুঝিয়ে দেব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর রাধা বলল, 'তোমার সম্বন্ধে আমি একটা কথা শুনেছি।'

কমলা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

রাধা বলতে থাকে, 'তুমি বহোত 'লিখিপড়ী লেড়কী'। আমাকে থোড়া কুছ আংরেজি শিখিয়ে দেবে?'

কমলা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সার্টিফিকেটের অর্থ যখন রাধা ধরতে পারেনি তখনই বোঝা উচিত ছিল, বিশেষ লেখাপড়া জানে না। কমলা একসময় জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কী পড়ছ?'

'কিছুই না।'

'ম্যাট্রিকটা জরুর পাশ করেছ?'

'নেহী—' বিষণ্ণভাবে তাকায় রাধা।

'সে কী!'

'হ্যাঁ।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে রাধা।

যত শুনছে ততই হাঁ হয়ে যাচ্ছে কমলা। তার ধারণা ছিল উচ্চবর্ণের বামহন কায়াথদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে বি. এ, এম. এ পাশ করে পৃথিবীর সব কিছু দখল করে রেখেছে, এবং ভবিষ্যতেও রাখবে। কিন্তু রাধা যা বলছে তাতে তার এতকালের ধ্যানধারণা মারাত্মক ধাক্কা খায়।

'সবেরেকা ভোজন' অর্থাৎ সকালের খাওয়া চুকিয়ে অর্জুন টিনের চালাতেই বসে থাকে। বাইরে গেলে টৌলির লোকেরা তাকে টিটকিরি দিয়ে, বিদ্রূপ করে অতিষ্ঠ করে তুলবে। তাছাড়া ঘৃণা অসম্মান—এসব তো আছেই। উঠোন পেরিয়ে ওধারের পাকা দালানে যাওয়ারও উপায় নেই। অচ্ছুতের মেয়েকে বিয়ে করার কারণে মা এবং বাবুজির চোখে সেও এখন অস্পৃশ্য। অদৃশ্য এক বিভাজিকা রেখা টানা রয়েছে এ বাড়িতে। সেটা পেরিয়ে কোনোদিন ওধারে সে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ।

কমলা অবশ্য চুপচাপ বসে নেই। চায়ের কাপ এবং পুরি হালুয়ার প্লেটগুলো ধুয়ে একধারে গুছিয়ে রাখতে থাকে সে। এরই মধ্যে হঠাৎ লালধারী সিংয়ের বাজখাঁই গলা শোনা যায়, 'কঁহা হ্যায় রামঅওতারজি?'

অর্জুন এবং কমলা চমকে ওঠে। পরক্ষণেই রামঅবতারের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'আইয়ে আইয়ে—'

খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায়, প্রচুর খাতিরদারি করে রামঅবতার সদরের কাছ থেকে লালধারী সিংকে ওধারের পাকা দালানের বারান্দায় এনে বসাল। একটু দূরে তটস্থ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ভরত রাধা আর বিনোদ।

লালধারী আসার খবর পেয়ে মান্ধাতা ধনিকরাম এবং পুরানা মহল্লার আরো অনেকে এ বাড়ির উঠোনে এসে ভিড় জমায়।

মান্ধাতার এমনই ব্যক্তিত্ব যে সে যেখানে হাজির থাকবে সেখানে আর কারুর মুখ খোলার বিশেষ সুযোগ থাকে না। সমস্ত পরিবেশটা সে মুহূর্তে দখল করে নেয়।

মান্ধাতা বলে, 'কী খবর অফিসার সাহেব? কাল অর্জুনদের পৌঁছে দিয়ে আজ আবার এলেন?'

লালধারী বলে, 'ইনভেস্টিগেশনমে আয়া। এস.ডি.ও সাহেব পাঠিয়ে দিলেন।' বলে রামঅবতারের দিকে তাকায় সে। 'আপনার লেড়কা কঁহা? ওকে এখানে আসতে বলুন।'

ভীরু গলায় রামঅবতার বলে, 'ওকে কী দরকার? গড়বড় কুছ হুয়া?'

পকেট থেকে তামাক এবং চুন বার করে হাতের তেলোয় ডলে ডলে খৈনি বানাতে বানাতে লালধারী বলে, 'ঘাবড়াইয়ে মাত্। ইয়ে রুটিন ইনভেস্টিগেশন। দো-চার বাত পুছকে চলা যায়েগা। অর্জুনকো বুলাইয়ে—'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ লালধারীর দিকে তাকিয়ে থাকে রামঅবতার। তারপর আস্তে আস্তে উঠোনে নেমে ডাকতে থাকে, 'অর্জুন—অর্জুন—'

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই অর্জুন লক্ষ করেছে। ডাকের জন্য মনে মনে তৈরি হয়েই ছিল। টিনের চালাটা থেকে বেরিয়ে বারান্দার কাছাকাছি এসে দাঁড়ায় সে। টের পায়, মান্ধাতা এবং রামঅবতার থেকে শুরু করে সবাই তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

খৈনি বানানো হয়ে গিয়েছিল। নিচের ঠোঁট এবং দাঁতের পাটির ফাঁকে খানিকটা পুরে লালধারী আরামে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকে। তারপর পিচিক করে খয়েরি রঙের থুতু উঠোনের একধারে ফেলে বলে, 'এস.ডি.ও সাহেব জানতে চেয়েছেন, সব কুছ ঠিক হ্যায় তো?'

অর্জুন বুঝতে পারে এতটুকু গোলমেলে উত্তর দিলে মান্ধাতারা তাকে এবং কমলাকে পরে একেবারে শেষ করে ফেলবে। আশেপাশে দাঁড়িয়ে ওরা নিঃশব্দে কোনো দানবীয় শক্তিতে তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে! স্নায়ুর ওপর তাদের অদৃশ্য চাপ সরিয়ে স্বাধীনভাবে তার কিছু বলার ক্ষমতা নেই।

অর্জুন বলে, 'হ্যাঁ।'

ছয়

দেখতে দেখতে সাতটা দিন কেটে যায়।

এর মধ্যে কমলা এক মুহূর্তের জন্য টিনের চালা থেকে বাইরে বেরোয়নি। ওখানেই তাকে নির্বাসনে থাকতে হয়েছে। সে শুনেছে তার বাপ এবং মা'কে সঙ্গে করে রেভারেন্ড টিরকে তাকে দেখতে এসেছিলেন। রামঅবতার তাঁদের বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। মান্ধাতাদের ডাকিয়ে এনে সদরের ওপার থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে।

অর্জুন অবশ্য দিন দুই দুপুরের দিকে বেরিয়েছিল। একদিন সে গেছে এস.ডি.ও'র বাংলোয়, চন্দ্রকান্ত এবং সরযূর সঙ্গে দেখা করে এসেছে। আরেক দিন চার্চে আর অচ্ছুৎটুলিতে গিয়ে রেভারেন্ড টিরকে এবং কমলার মা-বাবার কাছে রামঅবতারদের দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়েছে। যাতায়াতের পথে পুরানা মহল্লার বামহন কায়াথরা তাকে প্রচুর টিটকিরি দিয়েছে, তার উদ্দেশে থুতু ছুঁড়েছে, যদিও তা তার গায়ে লাগেনি।

যে দু'দিন অর্জুন বেরিয়েছিল, চারদিক ভাল করে দেখে, পা টিপে টিপে, বাড়ির সবার নজর এড়িয়ে কমলার কাছে এসেছে রাধা। 'পট্টি পরায়ে'র সেই টাকাটা তো নিয়েছেই, ইংরেজিটাও শিখতে শুরু করেছে। দু'জনের কথা হয়ে গেছে, অর্জুন চাকরিতে জয়েন করার পর যখন দুপুরে কেউ বাড়িতে থাকবে না, রাধা লুকিয়ে লুকিয়ে এসে ইংরেজির তালিম নিয়ে যাবে।

এ ক'দিনে অর্জুনের মা ভোরে সূর্য প্রণামের সময় একটি বার ছাড়া সারাদিনে আর ঘর থেকে বেরোয় নি। মাঝে মাঝে তার একটানা করুণ কান্নার শব্দ ছাড়া, তার যে কোনোরকম অস্তিত্ব আছে, বোঝা যায়নি।

লালধারী সিং বিয়ের পরের দিনটা ছাড়া আর আসেনি। অর্জুন চন্দ্রকান্তকে বার বার অনুরোধ করে এসেছে, বাড়িতে তার এবং কমলার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য যেন পুলিশ পাঠানো না হয়, তাতে জটিলতাই শুধু বাড়বে। তেমন কিছু বলার থাকলে সে নিজে গিয়ে চন্দ্রকান্তজিকে জানিয়ে আসবে।

এর মধ্যে পাটনা দ্বারভাঙ্গা মুঙ্গের এবং ভাগলপুর থেকে আত্মীয়স্বজনেরা কড়া কড়া চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে কমলাকে বাড়ির বার করে দিতে হবে। সাহারসা এবং কাটিহার থেকে অর্জুনের দুই পিসি এবং চক্রধরপুর থেকে এক মেসো এসে জানিয়ে দিয়ে গেছে, জাত নষ্ট করার কারণে রাম অবতারদের সঙ্গে তারা আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না। এমন কি যে চায়-পানি এবং মিঠাই দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করার ব্যবস্থা হয়েছিল সেসব ছোঁয়নি পর্যন্ত। প্রচণ্ড ঘৃণায় এবং রাগে তারা মাটিতে থু থু করে থুতু ফেলে চলে গিয়েছিল। অপমানে ক্ষোভে রামঅবতার একেবারে গুম মেরে গেছে। তার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর যে ঘটনাটি এই সাত দিনে ঘটেছে তা এইরকম। বিয়ের চার দিনের মাথায় পাটনার এক নামকরা দৈনিক পত্রিকা থেকে একজন পত্রকার আর একজন ফোটোগ্রাফার এসে হাজির। তারা পাটনা সেক্রেরটারিয়েটে অর্জুন এবং কমলার বিয়ের খবরটা শোনামাত্র লং ডিসট্যান্স রুটের বাস ধরে চলে এসেছে। প্রথম প্রথম রামঅবতার তাদের বাড়িতে ঢুকতে দিতে চায়নি। কিন্তু পত্রকার সুরেশ পাণ্ডে অতীব তুখোড় লোক, চোখেমুখে কথা বলে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে, নানারকম কথার মারপ্যাঁচে তাকে নরম করে ঢুকে পড়েছে।

এরকম একটা ঐতিহাসিক রেভোলিউশনারি বিয়ের জন্য প্রথমে অর্জুন এবং কমলাকে প্রচুর অভিনন্দন জানিয়েছে সুরেশ আর ফোটোগ্রাফার মনোহর সহায়। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুরেশ এ বিয়ের যাবতীয় হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে নিয়েছে এবং মনোহরকে দিয়ে দু'জনের অনেকগুলো রঙিন ছবিও তুলিয়েছে। তার ইচ্ছা ছিল, গোটা ফ্যামিলির মাঝখানে অর্জুন এবং কমলাকে বসিয়ে একটা গ্রুপ ফোটো তোলা। শুনে আঁতকে উঠেছে অর্জুন। ফোটো তোলার জন্য মা বাবুজি ভাইবোনদের ডাকতে গেলে কী মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেটা জানাতেই দুঃখিতভাবে মাথা নেড়েছে সুরেশ। বলেছে, 'তাহলে থাক।' তার কাঁধে একটি হাত রেখে সহানুভূতির সুরে বলেছে,

'নার্ভাস হবেন না। পৃথিবীর সব মানুষ আপনার বিরুদ্ধে যায়নি। আমাদের মতো অনেকেই আপনাদের সঙ্গে আছে।'

অর্জুন বলেছে, 'ধন্যবাদ। আপনাদের ভরসার কথা সারা জীওন আমার মনে থাকবে।'

পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে অর্জুনের হাতে দিতে দিতে সুরেশ এবার বলেছে, 'ভাইয়া, এতে আমার ঠিকানা রয়েছে। যদি কেউ কোনো ঝামেলা পাকায়, একটা চিঠি লিখে দেবেন কি টেলিগ্রাম করবেন। আমি চলে আসব।'

'আচ্ছা।'

এই ক'দিনে তাদের দু'জনের সংসার ভাল করে গুছিয়ে নিয়েছে কমলা। বিয়ের দিন রাতে এবং পরদিন সকালে রাধা খাবার দাবার দিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে রান্নাবান্না করছে কমলাই।

সাত

এক সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর বেলা ন'টায় খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়ে অর্জুন। তার ইচ্ছা ছিল, প্রথম দিন অফিসে যাওয়ার আগে মা এবং বাবুজিকে প্রণাম করবে। রামঅবতার বারান্দায় বসেও ছিল। সে কাছে গিয়ে উঠোন থেকে যেই হাত বাড়িয়েছে, রামঅবতার এক ঝটকায় পা সরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলে, 'পাও মাত্ ছুঁ—'

অর্জুন বারান্দায় একধারে মাথা ঠেকিয়ে বলে, 'আজ আমি অফিসে জয়েন করতে যাচ্ছি বাবুজি—'

রূঢ় গলায় রামঅবতার বলে, 'ঠিক হ্যায়।'

অর্জুনের ইচ্ছা ছিল মাকেও প্রণাম করে যায়। সেটা করতে গেলে তার ঘরে ঢুকতে হয়। কিন্তু মান্ধাতা তাকে বারান্দায় উঠতে দিলেও শোওয়ার ঘরে ঢোকাটা অর্জুনের কাছে এখনও নিষিদ্ধ। মাকে যে বাইরে আসতে বলবে, রামঅবতারের রুক্ষ মেজাজ দেখে তেমন সাহস হয় না।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে অর্জুন, তারপর আস্তে আস্তে উঠোন পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসটা নমকপুরা টাউনের ঠিক মাঝখানে। যে চওড়া রাস্তাটা এই শহরের শিরদাঁড়া হয়ে উত্তর থেকে খাড়া দক্ষিণে চলে গেছে, ঠিক তার ওপর।

মাঝারি মাপের দোতলা অফিস-বাড়িটায় অর্জুন যখন এসে ঢোকে, ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটা। ঠিক দশটায় অফিস। তার আসতে দেরি হয়ে গেছে।

এখনও লোকজন বেশি আসেনি। বেশির ভাগ চেয়ারই খালি। অফিসার-ইন-চার্জ, সেকশন অফিসার, দু'চারজন কেরানি, টাইপিস্ট এবং বেয়ারা এসে গেছে। আর জমি নিয়ে যারা ঝামেলায় পড়েছে তাদের অনেকেই অফিসের ভেতর এবং বাইরের রাস্তায় অপেক্ষা করছে।

একটা বেয়ারার কাছে জেনে নিয়ে দোতলায় অফিসাব-ইন-চার্জ সুধাকর দুবের কামরায় এসে ঢোকে অর্জুন। রোগা উটের মতো চেহারা, পিঠটা বাঁকা, ফলে তাকে খানিকটা কুঁজো দেখায়। ভাঙাচোরা লম্বাটে মুখ, নাকের তলায় চৌকো গোঁফ, পরনে ঢোলা প্যান্ট-শার্ট, গলা থেকে বুকের ওপর লাল টকটকে টাই ঝুলছে।

সুধাকর দুবে টেবলের ওপর ঝুঁকে কী সব কাগজপত্র দেখছিলেন। পায়ের আওয়াজে মুখ তুলে বলেন, 'আপ?'

হাতজোড় করে ভয়ে ভয়ে অর্জুন বলে, 'নমস্তে স্যার। আমার নাম অর্জুন চতুর্বেদী। আজ আমার এখানে জয়েন করার কথা।'

সুধাকর প্রতি-নমস্কার জানান না। তাঁর ভুরু দু'টি সামান্য কুঁচকে যায়। বলেন, 'জানি, আমার কাছে ওপর থেকে আপনার ব্যাপারে ইনস্ট্রাকশান এসেছে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটাব কোথায়?'

শশব্যস্তে একটা ব্রাউন রঙেব খাম সুধাকরের দিকে বাড়িয়ে দেয় অর্জুন।

সুধাকর বলেন, 'খুলে দেখান।' অর্থাৎ তিনি খামটা ছোঁবেন না।

এবার দ্রুত খাম থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা বার করে সুধাকরের সামনে ধরে অর্জুন। চোখ বুলোতে বুলোতে সুধাকর বলেন, 'মাথা খাটিয়ে ফন্দিটা ভালই বার করেছেন—'

অর্জুন চমকে ওঠে, 'মতলব?'

'কমপিটিটিভ পরীক্‌ষায় (পরীক্ষায়) বসতে হল না, এম. এল. এ কি এম. পি'দের বাড়ি ঘুরে ঘুরে পায়ের হাড্ডি ঢিলা করলেন না, স্রেফ অচ্ছুতিয়ার লেডকীকে শাদি করে নগদ নগদ পাঁচ হাজার রুপাইয়া দহেজ আর দো হাজার রুপাইয়ার এক নৌকরি মিলে গেল! কী খাতির! পাটনা থেকে খুদ মিনিস্টার এসে আপনা হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তুলে দিলেন—' বলতে বলতে কী ভেবে থেমে যান সুধাকর।

সুধাকর যে তার এই চাকরিটা পাওয়ায় আদৌ সন্তুষ্ট হননি তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। অথচ এই লোকটার কাছেই তাকে কাজ করতে হবে। ভবিষ্যতে সুধাকর তাকে কতটা বিপাকে ফেলবেন, কে জানে। সুধাকরের মনোভাব অফিস ছুটির পর চন্দ্রকান্তকে জানিয়ে দেবে কি ? এই সব যখন অর্জুন ভাবছে, সুধাকর বলেন, 'আপনি সেকশন অফিসার বিন্ধ্যাচলী মিশ্র'র কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা নিয়ে যান। উনি আপনার কাজকর্ম বুঝিয়ে দেবেন।'

আরেক বার 'নমস্তে' জানিয়ে সুধাকরের কামরা থেকে বেরিয়ে একে ওকে জিজ্ঞেস করে দক্ষিণ দিকে একটা বড় হল-ঘরে চলে আসে অর্জুন।

এক প্রান্তে জানালার ধার ঘেঁষে একটা বড় টেবলের ওধারে বসে আছে থলথলে ভারি চেহারার একটি মানুষ, খাটো ঘাড়ের ওপর গোলাকার মুখ। কাঁচাপাকা চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি। কপালে এবং কানের লতিতে চন্দনের ফোঁটা তার। নিখুঁত কামানো মুখে তৈলাক্ত মসৃণতা। মাথার পেছন দিকে এক গোছা মোটা টিকিতে ফুল বাঁধা। লোকটার পরনে ধুতি, ঢলঢলে হাতওলা পাঞ্জাবি। ইনিই যে সেকশন অফিসার বিন্ধ্যাচলী মিশ্র, বলে দিতে হয় না।

বিন্ধ্যাচলীর দু'পাশ দিয়ে টেবল চেয়ারের লাইন। সেগুলো দখল করে দশ বার জন বসে আছে। দেখলেই টের পাওয়া যায়, এরা সব ক্লার্ক এবং টাইপিস্ট।

হল-ঘরে ঢুকে ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা বিন্ধ্যাচলীর টেবলের সামনে এসে দাঁড়ায় অর্জুন। 'নমস্তে' বলে নিজের নাম-টাম এবং এখানে আসার উদ্দেশ্য যখন বিস্তৃতভাবে জানাতে যাবে, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয় বিন্ধ্যাচলী, 'আমি সব জানি। আপনি অর্জুন চতুর্বেদী, আজ এই অফিসে জয়েন করতে এসেছেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটাব সঙ্গে এনেছেন নিশ্চয়ই?'

'জি। এই যে—' ব্রাউন রঙের সেই খামটা বার করে টেবলে রাখে অর্জুন।

'অফিস খুলতে না খুলতেই মুসিবত—' বলে টেবলের ড্রয়ার থেকে একটা গঙ্গাজলের বোতল বার করে কয়েক ফোঁটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটার ওপর ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেয় বিন্ধ্যাচলী। তারপর একজন বেয়ারাকে ডেকে সেটা ফাইলে রেখে দিতে বলে অর্জুনেব দিকে ফেরে, 'বামহনের ছৌয়া হয়ে নজরটা এত নিচে নামালে কেন?' গোড়ায় 'আপনি' দিয়ে শুরু করেছিল, এখন সরাসরি 'তুমি'তে নেমে আসে।

অর্জুন হকচকিয়ে যায়, 'আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি না—'

'বামহনের ঘরে লেড়কী ছিল না? কৌয়ার মতো নালিয়ার (নর্দমায়) মুখ ঢোকালে!' বিন্ধ্যাচলীর চোখ এবং কণ্ঠস্বর থেকে ঘৃণা চলকে বেরিয়ে আসতে থাকে।

অর্জুন উত্তর দেয় না।

'ঠিক হ্যায়, গভর্নমেন্ট যখন তোমাকে নৌকরি দিয়েই ফেলেছে তখন কী আর করা! সবার সঙ্গে আগে আলাপ করিয়ে দিই—'

সেকশনেব কর্তা হিসাবে এক এক করে ক্লার্ক এবং টাইপিস্টদের সঙ্গে অর্জুনের আনুষ্ঠানিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এদের পদবী শুনে টের পাওয়া যায় এই সেকশনে একটিও হরিজন নেই।

এখানকার সবাই বামহন বা কাযাথ। পুরনো এমপ্লয়ীদের পরিচয় দেওয়ার পর বিন্ধ্যাচলী অর্জুন সম্বন্ধে বলে, 'আর এ হল অর্জুন চতুর্বেদী। পবিত্র বামহন বংশের ছোঁয়া হয়ে অচ্ছুতের দামাদ হয়েছে।'

অর্জুনের নাক মুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। সে বুঝতে পারে, এই আবহাওয়ায় তার পক্ষে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। এখানে সহকর্মীদের মধ্যে একজন সহৃদয় বন্ধুও সে খুঁজে পাবে কিনা সন্দেহ। কিছু বলতে যাচ্ছিল অর্জুন, হঠাৎ ডান দিকের শেষ প্রান্তের একটা চেয়ার থেকে একজন যুবক, বিজয় দুবে উঠে দাঁড়ায়। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। নাক মুখ কাটা কাটা, দৃঢ় চোয়াল, চোখ দু'টি উজ্জ্বল, পরনে ধুতি এবং ফুলশার্ট। সে বলে, 'মিশ্রজি, কে কাকে শাদি করবে সেটা তার পার্সোনাল ব্যাপাব। এ নিয়ে অর্জুনজিকে কেন বিরক্ত করছেন? ইয়ে তংগ করনা আচ্ছা নেহী। এটা সরকারি দপ্তর, এখানে জাতপাতের সওয়াল টেনে আনা ঠিক না।'

বিন্ধ্যাচলী স্থির চোখে বিজয়কে দেখতে দেখতে বলেন, 'তুমি তো আবার লিবারেল বামহন। হিন্দু ধরমের সমস্কার নিয়ে মাথা ঘামাও। লেকেন এক বাত—'

বিজয় বলে, 'কী?'

'ঘর বল, সমসাব বল, কলেজ ইউনিভার্সিটি বল, পোলিটিকস বল, অ্যাসেম্বলি বল, পার্লামেন্ট বল, আর এই সবকারি দপ্তরই বল—সোসাইটিকে বাদ দিয়ে কোনোটাই সম্ভব না। আর যেখানে সোসাইটি সেখানে জাতপাতের সওযাল আসবেই। হিন্দু ধবমের বিনাশ আমবা হতে দিতে পারি না।'

'অচ্ছুৎরাও কিন্তু হিন্দু—'

'জানি। লেকেন নিচা জাতেব হিন্দু। ওরা যেখানে আছে সেখানে থাক, আমরা যেখানে আছি সেখানে থাকি। কোনো ঝামেলা নেই। লেকেন বামহনের জাত মেরে শাদিউদি চলবে না। তা হলে সোসাইটির সত্যনাশ হয়ে যাবে। এসব বরদাস্ত করা যায় না।'

তীব্র গলায় বিজয় বলে, 'সোসাইটিব চিন্তা পরে করবেন। অর্জুনজি কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে? ওর বসার জায়গা ঠিক করে দিন।'

'ঠিক হ্যায়—' আঙুল বাড়িয়ে ডান ধারের একেবারে শেষ চেযারটি দেখিয়ে বিন্ধ্যাচলী অর্জুনকে বলে, 'যাও, ওখানে গিয়ে বসো।' তারপব আবার বিজয়ের দিকে ফেরে, 'তুম তো সমাজকা পরিবর্তন চাহ্‌তা হো, আউর অর্জুন পরিবর্তন কর চুকা। দুই সমাজ বদল কবনেবালাকে পাশাপাশি বসতে দিলাম।' বলতে বলতে পুরু ঠোঁট দুটো বিদ্রূপে বেঁকে যায় বিন্ধ্যাচলীর।

অর্জুন কাছে এলে বিজয় নিচু গলায় বলে, 'আমরা প্রায় সমান বয়সী। আপনি টাপনি করে বলতে পারব না। 'তুমি' বললে গুস্‌সা হবে?'

এই সাহসী হৃদয়বান যুবকটিকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া, বিশেষ করে এরকম বিরুদ্ধ আবহাওয়ায়—খুবই ভাগ্যেব ব্যাপার। শশব্যস্তে অর্জুন বলে, 'নেহী নেহী, বিলকুল নেহী।'

'চিন্তা মাত্ করনা। আমি তোমার পাশে আছি। কাউকে তোমার চামড়ায় আঁচড় কাটতে দেব না। সরকারি কানুন ভেঙে যদি ওবা তোমার পেছনে লাগে, আমি অনেক দূর যাব।' বলে, একটু থেমে বিজয় ফের শুরু করে, 'এই সব আদমী দেশের সত্যনাশ কবে ছাড়বে।'

অফিস ছুটির পর অর্জুন যখন রাস্তায় বেরিয়ে আসে, সূর্যটা পশ্চিম আকাশের ঢালে অলৌকিক ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও চারদিকে প্রচুর রোদ, তবে তাতে ধার নেই। হলুদ রঙের নরম আলোয় ভরে আছে চরাচর। বরখা নদীর দিক থেকে উলটোপালটা হাওয়া উঠে আসছে, নমকপুরা টাউনের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ছুটে যাচ্ছে দূরের ফাঁকা শস্যক্ষেত্রগুলোর দিকে।

বিজয়ও অর্জুনের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'কোন দিকে যাবে? বাড়ি?'

অর্জুন আগে ভাবেনি কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক করে ফেলে, একবার চন্দ্রকান্তর সঙ্গে দেখা কববে। আজ অফিসে জয়েন করার পর তাব যা অভিজ্ঞতা হল, তাতে রীতিমত ভয়ই হচ্ছে। বিজয়েব মতো একজনকে বন্ধু হিসেবে না পেলে কী হত, চিন্তা করতে সাহস হয় না। এ সব কথা চন্দ্রকান্তকে জানিয়ে

রাখা দরকার।

অর্জুন বলে, 'আমি এস. ডি. ও'র বাংলোয় যাব।'

বিজয় বলে, 'ভালই হল, আমিও ওই দিকেই যাচ্ছি। অনেকটা রাস্তা একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

হাঁটতে হাঁটতে এলোমেলো কথা হয়। অর্জুন বলে, 'আমার কথা তো সব শুনেছ। তোমার সম্বন্ধে কিন্তু কিছুই জানা হয়নি।'

বিজয় জানায়, তাদের বাড়ি মনিহারিতে। বাবা মা ভাই বোন সবাই সেখানে থাকে। জমিজমা আছে প্রচুর। সে অবশ্য মনিহারিতে বেশিদিন থাকেনি। ক্লাস সেভেনে ওঠার পর পাটনায় চলে গিয়েছিল। সেখানে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে বি. এ পাশ করেছে। তারপর ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টে চাকরি নিয়ে কয়েক জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত মাস কয়েক হল, নমকপুরায় এসেছে। এখানে শহরের পশ্চিম দিকে নতুন মহল্লায় দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। খায় হোটেলে।

অর্জুন বলে, 'শাদি করনি?'

মাথাটা সামান্য কাত করে মজার গলায় বিজয় বলে, 'না। তোমার মতো এক রেভেলেউশন যেদিন ঘটাতে পারব সেদিন ওই কাজটা করব।' বলে হাসে।

অর্জুনও হেসে ফেলে। হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে সে বলে ওঠে, 'আচ্ছা বিজয়, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

বিজয় উৎসুক চোখে তাকায়। বলে, 'জরুর।'

'তখন বিন্ধ্যাচলীজি বলছিলেন, তুমি নাকি সোসাইটি বদলে দিতে চাও। ব্যাপারটা কী?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে বিজয়। তারপর জানায়, সে একটি প্রগতিবাদী হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভ্য। নানারকম বৈষম্য, অনাচার, জাতপাতের সওয়াল এবং কুসংস্কার হিন্দু সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে—এ সব দূর করে আমূল সংস্কার করতে না পারলে এ জাতের বিনাশ কেউ ঠেকাতে পারবে না। বিজয়দের সমিতি আপাতত আর্যাবর্তের বিভিন্ন শহরে সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে। যদিও এটা খুবই কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ তবু তাদের ইচ্ছা সারা ভারত জুড়েই হিন্দু সমাজের পুনরুজ্জীবন ঘটাবে।

এস. ডি. ও'র বাংলোয় পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেলা ফুরিয়ে আসে। সূর্যটাকে এখন পশ্চিম আকাশের কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আবছামতো একটু আলো এখনও নমকপুরা শহরের বাড়িঘর, এধারের বরখা নদী এবং চারপাশের গাছপালার মাথায় জড়িয়ে আছে।

চন্দ্রকান্ত বাংলোর একতলায় কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। অর্জুনকে দেখে তাদের দ্রুত বিদায় জানিয়ে বলেন, 'চল চল, ওপরে যাওয়া যাক। তোমার ভাবীজি আজ সকালে তোমার কথা খুব বলছিলেন। অবশ্য তোমার সঙ্গে আমারও জরুবি কাজ আছে। আজ না এলে লালধারী সিংকে পাঠাতে হত।'

চন্দ্রকান্তব কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে ওঠে অর্জুন। তাঁর দিকে তাকিয়ে কিছুটা উদ্বেগই বোধ কবে। বলে, 'কেন, কিছু গোলমাল হয়েছে?'

'আগে ওপরে চল। সব বলছি।'

দোতলায় আসতেই চোখে পড়ে, ওধারের বড় লাউঞ্জে বসে কী একটা বই পড়ছেন সরযূ। পায়ের শব্দে মুখ তুলেই, বইটা নামিয়ে রেখে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসেন। অর্জুনকে দেখে খুশিতে তাঁর মুখ জ্বলজ্বল করতে থাকে। উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন, 'এস এস—'

বিয়ের আগে যে ঘরে কয়েকটা দিন অর্জুন কাটিয়ে গেছে সেখানে গিয়ে তিন জন বসেন। তারপর ভরতকে দিয়ে প্রচুর মিঠাই এবং চা আনানো হয়।

সরযূ বলেন, 'খাও। খেতে খেতে তোমার কথা বল।'

কমলাকে নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পর এ ক'দিনে যা যা ঘটেছে সব বলে যায় অর্জুন।

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'মোটামুটি এরকম ঘটবে, ভেবেছিলাম। লালধারীজিও এসে কিছু কিছু বলেছিল।

অফিসে জয়েন করেছ?'

'হ্যাঁ, আজই করলাম।'

'ওখানকার রি-অ্যাকশন কী?'

অফিসে প্রথম দিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে দেয় অর্জুন।

শুনতে শুনতে চন্দ্রকান্তের চোখেমুখে হতাশা ফুটে ওঠে। বলেন, 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি শেষ হয়ে এল। এখনও যদি বেশির ভাগ মানুষের অ্যাটিচুড এই হয়, আমরা এগুবো কী করে?' একটু থেমে বলেন, 'অবশ্য সিলভার লাইনিং-এর মতো বিজয়ের মতো ছেলেও রয়েছে। ওকে সব সময় কাছে পাবে, এটুকুই যা ভরসা।'

অর্জুন চুপ করে থাকে।

চন্দ্রকান্ত আবার বলেন, 'ছেলেটা খুবই আপরাইট। দু-একবার আমার কাছে এসেছিল। ভাল করে আলাপ করতে হবে। ওকে আসতে বলো তো।'

'আচ্ছা—' অর্জুন বলে, 'তখন বলেছিলেন আজ আমি না এলে লালধারীকে আমার কাছে পাঠাবেন—' বলতে বলতে থেমে যায়।

অর্জুনের অসম্পূর্ণ কথার মধ্যে একটা প্রশ্ন লুকনো রয়েছে। চন্দ্রকান্ত তা বুঝতে পারেন। বলেন, 'হ্যাঁ। ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে—'

উৎকণ্ঠিতের মতো তাকিয়ে থাকে অর্জুন।

চন্দ্রকান্ত আস্তে আস্তে বলেন 'এখান থেকে নমকপুরার লোকজনের সিগনেচার কালেক্ট করে গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাপিল করা হয়েছে, তোমাদের শাদির ব্যওস্থা করে আমি নাকি এখানকার সোশাল সেট-আপকে ডিসটার্ব করছি। ধর্ম আর সমস্কারকে আঘাত দিচ্ছি। আমাকে নমকপুরা থেকে ট্রান্সফার করা না হলে বিরাট মুভমেন্ট করা হবে।'

অর্জুন হকচকিয়ে যায়। বলে, 'লেকেন—'

'কী?'

'খুদ মিনিস্টার, এম. এল. এ, এম. পি, ডি. এম—এঁরা সব শাদির সময় ছিলেন। তা ছাড়া সরকার তো কানুনই করে দিয়েছে উঁচা জাতের ছেলে বা মেয়ে অচ্ছুৎদের ছেলে কি মেয়ে বিয়ে করলে তাকে সুবিধে দেওয়া হবে। সেজন্যে টাকা নৌকরি, সবই পেয়েছি। এখন কেউ গোলমাল করতে চাইলে সরকার জরুর বরদাস্ত করবে না।'

চন্দ্রকান্তকে বেশ চিন্তিত দেখায়। যে মানুষ প্রচণ্ড জেদ সাহস এবং আত্মবিশ্বাসে গোটা নমকপুরা টাউনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অর্জুনের বিয়ে দিয়েছেন, ইনি যেন সেই চন্দ্রকান্ত নন। তিনি বলেন, 'তুমি যা বলছ, সবই ঠিক। লেকেন—'

'কী?'

'শুকদেও ঝা তো একমাত্র মিনিস্টার নন, আরো অনেক মন্ত্রী আছেন। তাছাড়া কানুনের কথা বললে। কানুন বানিয়ে যেমন মানাও হয়, তেমনি কানুন ভাঙার নজিরও কম নেই অর্জুন।'

প্রবল উদ্বেগ বোধ করতে থাকে অর্জুন। সে কিছু বলে না।

নিজের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিতে দূরমনস্কর মতো চন্দ্রকান্ত বলেন, 'খুব প্রবলেম হয়ে গেল।'

খাবারের প্লেট থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল অর্জুন। ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কিসের প্রবলেম?'

'ওপরের একটা সেকশন থেকে ভীষণ প্রেসার আসছে আমার ওপর। কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না।'

'কী ধরনের প্রেসার?'

'আমি যেন এ ধরনের শাদির ব্যাপারে আর মাতামাতি না করি।'

'লেকেন সরকারি কানুন?'

বিষণ্ণ হাসেন চন্দ্রকান্ত, 'তোমাকে তো এখনই কানুনের কী হাল হয় সে কথা বললাম।'

অর্জুন কী বলবে, ভেবে পায় না।

চন্দ্রকান্ত এবার বলেন, 'আরো একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে অর্জুন।'

অর্জুন কিছু না বলে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'খবর পেলাম, আমার বিরুদ্ধে পাটনায় একটা পাওয়ারফুল লবি কাজ করে যাচ্ছে। তারা আমাকে এখান থেকে ট্রান্সফার করিয়ে অন্য জায়গায় পাঠাবার চেষ্টা করছে।'

বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যায় অর্জুনের। সে বলে, 'লেকেন—'

'কী?'

'আপনি এখান থেকে চলে গেলে আমাদের কী হবে? ওরা কমলা আর আমাকে একেবারে খতম করে ফেলবে।'

'জানি, আমি চলে গেলে তোমার অসুবিধে হবে। তবে এত সহজে ছেড়ে দিচ্ছি না। নরম্যাল কোর্সে আমার এখনও বছর তিনেক এখানে থাকার কথা।' চন্দ্রকান্ত একটানা বলে যান, 'দু-চারদিনের মধ্যে একবার পাটনা যাব। আমার বিরুদ্ধে কী চক্রান্ত চলছে, কারা এর সঙ্গে যুক্ত, জানতে চেষ্টা করব। তারপর দেখি কী করা যায়।'

আট

অর্জুন অফিসে জয়েন করার পর কয়েকটা দিন কেটে যায়। এর মধ্যে বাড়ির আবহাওয়ায় তেমন কোনো হেরফের ঘটেনি। উঠোনের ওপারে সবার ছোঁয়া বাঁচিয়ে সেই টিনের চালাতেই সে এবং কমলা আছে। মা সকালে সূর্যোদয়ের সময় মাত্র একবারই বাইরে আসে। পরে সারাদিন আর তাকে দেখা না গেলেও মাঝে মাঝে তার কাতর কান্নার শব্দ বাড়িটাকে বিমর্ষ করে রাখে।

অফিসে জয়েন করার পর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে অর্জুন। যে মান্ধাতা রোজ তাদের বাড়ি হানা দিত, হঠাৎ তাকে দেখা যাচ্ছে না। সে নাকি নমকপুরায় নেই। মান্ধাতা না এলেও পুরানা মহল্লার অন্য বাসিন্দারা নিয়মিত দু'বেলা আসছে।

এদিকে অফিসে কেউ পারতপক্ষে অর্জুনের ধারে কাছে ঘেঁষে না। বিদ্রূপ, টিটকিরি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। একমাত্র বিজয়ই এই সব আক্রমণ থেকে তাকে আগলে আগলে রাখছে। নইলে অনেক আগেই চাকরিটা ছেড়ে দিতে হত।

আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর চায়ের কাপ নিয়ে সবে বসেছে অর্জুন, রাধা এসে দরজার সামনে দাঁড়ায়। বলে, 'বাবুজি তোমাকে ডাকছে।'

বিয়ের পর রামঅবতার কোনোদিন তাকে ডেকেছে বলে মনে করতে পারে না অর্জুন। সে রীতিমত অবাক হয়ে যায়, সেই সঙ্গে মারাত্মক এক দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। এই সকালবেলা আচমকা তাকে ডেকে পাঠানোর পেছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'কেন ডাকছে জানিস?'

'না।' আস্তে মাথা নাড়ে রাধা।

দ্রুত চায়ের কাপ নামিয়ে অর্জুন উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'চল—'

রাধা বলে, 'চা খেলে না?'

'পরে খাব।'

অর্জুন টিনের চালার বাইরে আসতেই দেখতে পায় ওধারের পাকা দালানের বারান্দায় বসে আছে রামঅবতার মান্ধাতা ভানপ্রতাপ আর সূরযদেও। নমকপুরার ব্রাহ্মণ কমিউনিটির এতগুলো দোর্দণ্ডপ্রতাপ চাঁইকে একসঙ্গে তাদের কোঠিতে হানা দিতে দেখে অর্জুনের শিরদাঁড়া দিয়ে বরফের স্রোত নামতে থাকে।

মান্ধাতা তাকে দেখতে পেয়েছিল। প্রায় সবাই হাত নেড়ে তাকে ডাকে, 'আয় অর্জুন—'

অর্জুন তাদের দিকে চোখ রেখে উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় ওঠে। রামঅবতারদের কাছাকাছি একটা

বেতের মোড়া ফাঁকা পড়ে আছে। সে বুঝতে পারে ওটা তার জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে। মান্ধাতা মোড়াটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'বস।'

অর্জুন বসে পড়ে।

মান্ধাতা গলা খাঁকরে এবার বলে, 'অফিসে জয়েন করেছিস, শুনলাম।'

'হ্যাঁ।' ঘাড়টা সামান্য হেলিয়ে দেয় অর্জুন।

'কামকাজ সব ঠিকমতো চলছে?'

একটু চুপ করে থাকে অর্জুন। তারপর দ্বিধান্বিতভাবে বলে, 'হ্যাঁ।'

কী ভেবে নিয়ে মান্ধাতা এবার বলে, 'দ্যাখ বেটা, আজ আমরা একটা বহুৎ জরুরি কাজে তোর কাছে এসেছি।'

সেটা আগেই আন্দাজ করতে পেরেছে অর্জুন। উত্তর না দিয়ে স্নায়ুগুলো টান টান করে সে অপেক্ষা করতে থাকে।

মান্ধাতা বলে, 'একটা কথা এবার বলব, তোকে সেটা মেনে নিতে হবে।'

কাঁপা গলায় অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'তোর একটা নৌকরির জরুরত ছিল। জানি এর জন্যে তিন চার সাল কত জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছিস। আমি অবশ্য মিনসিপ্যালিটিতে ছোটামোটা নৌকরির ব্যওস্থা করেছিলাম, লেকেন সরকারি যে নৌকরিটা পেয়েছিস তার কাছে সেটা কিছুই না।'

অর্জুন বলে, 'নৌকরির কথা থাক। আপনার কী কথা আছে, তাই বলুন।'

মান্ধাতা শান্ত মুখে বলে, 'তাই তো বলছি বেটা। চার সাল ঘুরে যা পারিস নি, অচ্ছুতের লেড়কীকে শাদি করে সাত রোজের মধ্যে তা পেয়ে গেছিস। বহুৎ আচ্ছা।' বলে একটু থামে মান্ধাতা। পরক্ষণেই আবার শুরু করে, 'আমি বলি কি, যেখান থেকে যে সুযোগ পাওয়া যায় সেটা নেওয়া দরকার। কলিযুগে সেটাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। যে কালের যে ধরম।'

অর্জুন কিসের যেন একটা সংকেত পায়। সে স্থির চোখে মান্ধাতাকে লক্ষ করতে থাকে।

এদিকে ভানপ্রতাপ সূরযদেও এবং রামঅবতার সায় দিয়ে বলে, 'ঠিক বাত, ঠিক বাত।'

মান্ধাতা এবার যা বলে তা এইরকম। অচ্ছুতের মেয়ে বিয়ে করে যখন একটা দামি সরকারি নৌকরি বাগানোই হয়ে গেছে তখন আর এ বিয়েটা নিয়ে অর্জুন যেন আদৌ মাথা না ঘামায়। কমলাকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, অচ্ছুৎটোলায় তার মা-বাপের কাছে যেন পাঠিয়ে দেয়। ওর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখার দরকার নেই।

অর্জুন শিউরে ওঠে, 'লেকেন—'

'কী বেটা?'

অর্জুন জানায়, মিনিস্টার, ডি এম, এস. পি, এম পি, এম. এল. এ এবং এস. ডি. ও'র মতো মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সামনে সইসাবুদ করে তার শাদি হয়েছে। কমলাকে এভাবে তাড়িয়ে দিলে তার ফলাফল হবে মারাত্মক। মিনিস্টাররা তাকে কোনোমতেই ছেড়ে দেবেন না।

মান্ধাতা বলে, 'ও সব নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না। হামলোগ সামহাল লেঙ্গে। আজই ওকে তুই টাঙ্গা ডেকে তুলে দে। পবিত্র ব্রাহ্মণের কোঠিতে অচ্ছুৎ এনে বসানো ঠিক না অর্জুন।'

'লেকেন কমলাকে এভাবে তাড়িয়ে দিলে আমার নৌকরি থাকবে না।'

'সরকারি নৌকরি এত সহজে যায় না অর্জুন।'

'রেজিস্ট্রি করে আমাদের শাদি হয়েছে। মুখের কথায় ডিভোর্স হবে না। দু তরফ আর্জি করলে কোর্টে সব শুনে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করতে পারে। কমলারা আর্জি না করলে মুশকিল হবে।'

এদিকটা ভেবে দেখেনি মান্ধাতা। সে থতিয়ে যায়। তারপর চিন্তা করে বলে, 'জগলাল দোসাদের বিটিয়া যাতে আর্জি করে তার ব্যওস্থা করব।'

'জবরদস্তি করে?'

'আরে নেহী নেহী, বুঝিয়ে সুঝিয়ে—'

'আরো একটা সমস্যা যে থেকে যাচ্ছে।'

'কী?'

'আমার কী হবে?'

অর্জুনের প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে মান্ধাতা জিজ্ঞেস করে, 'মতলব?'

অর্জুন বলে, 'অচ্ছুতের মেয়ে শাদি করে আমার জাত তো নষ্ট হয়েই গেছে।'

দুই হাত এবং মাথা প্রবল বেগে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মান্ধাতা বলে, 'আরে নেহী, নেহী। বামহনের ছৌরা মৌত পর্যন্ত বামহনের ছৌরাই থেকে যাবে। সিরফ—'

'কী?'

'নামকা ওয়াস্তে একটা প্রায়শ্চিৎ করিয়ে নেব।' বলে ভানপ্রতাপের দিকে তাকায় মান্ধাতা। বলে, 'কি, তুমি তো অনেকের কুলগুরু, প্রায়শ্চিৎ করিয়ে নিলে সব পাপ খণ্ডন হয়ে যাবে না?'

'জরুর। লেকেন অর্জুন যা করেছে তা পাপ না, জওয়ানিকা ধরম, ছোটিসি পদস্খলন। শ'ও দো শ রুপাইয়া কা মামলা। এক যজ্ঞ, দশ বামহন ভোজন, থোড়েসে দান—ব্যস, গায়ে যে ময়লা লেগেছে সব সাফ।'

মাথা থেকে যেন বিরাট দুশ্চিন্তা নেমে গেছে। মান্ধাতা বেশ হালকা বোধ করে। বলে, 'তা হলে আজই দোসাদদের মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস—'

মুখের ওপর হঠাৎ অদ্ভুত কাঠিন্য নেমে আসে অর্জুনের। সে বলে, 'নেহী—'

'মতলব?'

'আমি কমলাকে ছাড়ব না।'

মান্ধাতা তার কাঁধে সস্নেহে একটি হাত রেখে বোঝাতে চেষ্টা করে, 'আরে বাবা, প্রায়শ্চিৎ হয়ে যাওয়ার পর শুধ্ বামহনের ঘরের লিখিপড়ী খুবসুরত লেড়কীর সঙ্গে আবার তোর শাদি দেব। চুন চুনকে তোর জন্যে দুলহিন নিয়ে আসব।'

দৃঢ় গলায় অর্জুন জানায়, কোনোরকম চাপ বা অনুরোধের কাছে সে মাথা নোয়াবে না, রাজকন্যার সঙ্গে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেও দ্বিতীয় বার শাদি করবে না। কমলাকে ত্যাগ করার প্রশ্নই নেই।'

মান্ধাতা তবু শেষ চেষ্টা করে, 'তোর দিমাগ কি খারাপ হয়ে গেল অর্জুন!'

'দিমাগ ঠিকই আছে।'

'তোর রিস্তেদাররা তোদের কোঠিতে আসে না, তাদের সঙ্গে সব নাতেদারি নষ্ট হয়ে গেছে। তোর মায়ের এই হাল। যে কোনোদিন তার মৌত হয়ে যাবে। মহল্লার লোকজন তোর ওপর খেপে আছে। নেহাত আমি ঠেকিয়ে রেখেছি। না হলে এতদিনে তোকে আর ওই অচ্ছুৎ ছৌরিটাকে ছিঁড়ে ফেলত। এবার একটা কথা ভেবে দ্যাখ —'

'কী?'

'একটা মেয়ের জন্যে তোর মায়ের মৌত হোক, তোদের সম্‌সার বিলকুল নষ্ট হয়ে যাক, এটা তুই চাস?'

একটু চুপ করে থাকে অর্জুন। মায়ের ভেঙে পড়া বিধ্বস্ত চেহারাটা তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। একসময় আস্তে আস্তে সে বলে, 'মা অকারণে কষ্ট পাচ্ছে। কমলার অপরাধটা কী? বামহনের লেড়কীর সঙ্গে তার তফাতটা কোথায়?'

'তফাতটা হল ও বামহনের লেড়কী নয়। ওর জন্যে আমাদের হাজারো সালের সমস্কার ভাঙতে পারি না।'

আচমকা উঠে দাঁড়ায় অর্জুন। বলে, 'আমি এখন যাই।'

অবাক হয়ে মান্ধাতা জিজ্ঞেস করে, 'কোথায়?'

'বাজারে যেতে হবে। ফিরে আসার পর রসুই চড়বে। তারপর খেয়ে অফিস যাব। এখন আর বসার সময় নেই।'

'তা হলে শেষ পর্যন্ত কী ঠিক করলি?'

'নতুন করে ঠিক করার আর কিছু নেই। আমার যা বলার তা একটু আগেই বলে দিয়েছি।'

'অচ্ছুতের বিটিয়াকে তুই ছাড়বি না?'

'নেহী।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মান্ধাতা। হঠাৎ প্রবল রক্তচাপে মুখ লাল হয়ে ওঠে তার। কপালের দু'পাশের রগ দুটো খ্যাপা ঘোড়ার মতো লাফাতে থাকে। অসহ্য রাগে তার চোখের তারা দুটো যেন ফেটে যাবে। সে চিৎকার করে বলে, 'হোঁশিয়ার অর্জুন। পুরা চৌবিশ ঘণ্টা টাইম তোকে দিলাম, এর ভেতর অচ্ছুতের বিটিয়াকে তার বাপের ঘরে পাঠিয়ে দিবি। যা—' বলে উঠোনে নামার সিঁড়ি দেখিয়ে দেয়।

হৃৎপিণ্ডের তলা থেকে ভয়ের শিহরণ ঢেউয়ের মতো উঠে আসে অর্জুনের। হাত পা যেন অসাড় হয়ে যায়। মান্ধাতার এই ভয়ঙ্কর চেহারাটা তার প্রায় অচেনা ছিল। লোকটার চোখমুখ এবং চিৎকার বুঝিয়ে দিয়েছে তার মধ্যে কতটা নিষ্ঠুরতা ঠাসা রয়েছে।

অর্জুন ঘাড় নিচু করে বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে যায়।

বিকেলে অফিস ছুটির পর রাস্তায় বেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায় অর্জুন।

বড় সড়ক ধরে শহরের দক্ষিণ দিক থেকে একটা মিছিল স্লোগান দিতে দিতে আসছে।

'সামাজিক স্থিতি—'

'রক্ষা কর, রক্ষা কর।'

'ব্রাহ্মণকা বিনাশ—'

'বন্ধ কর, বন্ধ কর—'

'সমাজকা নয়া সুধার—'

'নেহী চাহিয়ে, নেহী চাহিয়ে।'

'সরকার—'

'হোঁশিয়ার, হোঁশিয়ার।'

অর্থাৎ যারা নতুন আইন কানুন চালু করে সামাজিক সুস্থিতিতে বিপর্যয় নিয়ে আসছে তাদের বিরুদ্ধে এই মিছিল। তাদের মতে এর ফলে ব্রাহ্মণরা ধ্বংস হয়ে যাবে। যে সরকার সমাজের পরিবর্তন চাইছে তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হচ্ছে, কোনোরকম সংস্কারের বা সংশোধনের প্রয়োজন নেই। আবহমান কাল ধরে যা চলছে তা-ই চলুক।

এরা আরো যা স্লোগান দিচ্ছে তা এইরকম। যদি জবরদস্তি করে ব্রাহ্মণের সঙ্গে অচ্ছুতের বিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণের পবিত্রতা নষ্ট করা হয় এবং স্থানীয় এম.এল.এ বা এম. পি যদি এর প্রতিবাদ না করেন, আগামী নির্বাচনে তাদের একটি ভোটও দেওয়া হবে না। ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উঁচু জাতের স্বার্থ আর মর্যাদা রক্ষার জন্য তারা নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাবে।

সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এরা রাজনৈতিক দিক থেকেও প্রচণ্ড চাপ তৈরি করছে। অর্জুন মিছিলের স্লোগানগুলো শুনতে শুনতে বুঝতে পারে, এর ফল হবে সুদূরপ্রসারী। ভোট না পাওয়ার ভয় থাকলে বা আগমী চুনাওতে নতুন উম্মিদবার দাঁড়িয়ে গেলে এখানকার এম. এল. এ বা এম. পি'রা কতটা প্রগতিবাদী থাকবে, বলা মুশকিল।

অন্য দিনের মতো আজও বিজয় অর্জুনের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছিল। মিছিলটা দেখতে দেখতে বলে, 'একটা শাদি করেছিলে বটে! তার জন্যে নমকপুরায় পুরা ব্রাহ্মণ কমিউনিটি মিছিল বার করে ফেলেছে।' বলতে বলতে তার গলার স্বর তীব্র হয়ে ওঠে, 'এরা হিন্দু সোসাইটিকে বিলকুল খতম করে দেবে।'

অর্জুন উত্তর দেয় না।

এদিকে মিছিলটা তাদের সামনে দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে যায়। সবার আগে আগে চলেছে মান্ধাতা সূরযদেও ধনিকরাম ভানুপ্রতাপ এমনি অনেকে।

মান্ধাতারা অর্জুনকে লক্ষ করেনি, করলে কী হত বলা যায় না। মিছিলটা বেরিয়ে যাওয়ার পর অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'এরা যাচ্ছে কোথায়?'

'কী জানি।' বিজয় বলে, 'তুমি একটু দাঁড়াও। আমি দেখে আসছি।' বলে আর দাঁড়ায় না, মিছিলের পেছন পেছন চলতে থাকে।

প্রায় চল্লিশ মিনিট বাদে ফিরে আসে বিজয়। তাকে রীতিমত উত্তেজিত দেখায়।

অর্জুন ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী হল?' 'ওরা কোথায় গেছে?'

'এস. ডি. ও'র বাংলোয়।' বিজয় বলে, 'গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ওরা স্লোগান দিচ্ছে। বলছে, এস.ডি.ও'কে এখান থেকে চলে যেতে হবে। না হলে তাঁর বাংলো লাগাতার ঘেরাও করে রাখা হবে।'

চন্দ্রকান্ত এবং সরযূর জন্য প্রচণ্ড উদ্বেগ বোধ করে অর্জুন। বলে, 'ওরা বাংলোয় ঢুকে ঝামেলা করবে না তো?'

'তা পারবে না। গেট ভেতর থেকে বন্ধ। তা ছাড়া আর্মড গার্ড রয়েছে অনেক।'

অর্জুনের মনে পড়ে, অফিসে জয়েন করার পর যখন সে চন্দ্রকান্তর সঙ্গে দেখা করতে যায়, তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁকে নমকপুরা থেকে ট্রান্সফার করার চক্রান্ত চলছে পাটনায়। এখান থেকে তাঁর বিপক্ষে প্রচুর সিগনেচার যোগাড় করে অসংখ্য এম. এল. এ, হোম সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে কয়েকজন মন্ত্রী, এমন কি চিফ মিনিস্টারকেও পাঠানো হয়েছে। সে বলে, 'চন্দ্রকান্তজিকে কি এখান থেকে ট্রান্সফার করে দেবে?'

'কী জানি, বুঝতে পারছি না। শুনলাম, ক'জন মন্ত্রী আর লোকাল এম. এল. এ আর এম. পি এসে এখানে মিটিং করবে। এখানকার ব্রাহ্মণ কমিউনিটি তার ব্যবস্থা করছে।'

'ব্রাহ্মণরা যখন মিটিং ডেকেছে তখন জরুর চন্দ্রকান্তজির শ্রাধ্ (শ্রাদ্ধ) করে ছাড়বে। আমাদের শাদির ব্যাপারেও গোলমাল পাকাবে।'

বিজয়কে চিন্তিত দেখায়। বলে. 'তা-ই তো মনে হচ্ছে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, 'এখন কোথায় যাবে?'

অর্জুন বলে, 'চন্দ্রকান্তজির সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম। লেকেন—'

'না। আজ ওখানে তোমার যাওয়া একেবারেই ঠিক হবে না।'

'হ্যাঁ।'

'আজ বাড়িই চলে যাও।'

বিজয় যদিও উলটো দিকে যাবে, তবু অর্জুনের সঙ্গে পুরানা মহল্লার দিকে হাঁটতে লাগল।

খানিকটা যাওয়ার পর অর্জুন বলে, 'জানো, আজ সকালে মান্ধাতা চাচা এসে আমাকে শাসিয়ে গেছে। সেই থেকে ভয়ে ভয়ে আছি।'

হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় বিজয়। বলে, 'কী বলেছে মান্ধাতা শর্মা?'

মান্ধাতার সঙ্গে সকালে যা যা কথা হয়েছে, সব জানিয়ে দেয় অর্জুন।

বিজয় চমকে ওঠে, 'স্রিফ চৌবিশ ঘণ্টা টাইম দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর কী করতে চায়?'

'জানি না। কিছু বলেনি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

এর মধ্যে সূর্য ডুবে গিয়েছিল। নমকপুরার বাড়িঘর গাছপালা, এবং দূরে বরখা নদীর ওপর অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। অর্জুনদের পাশ দিয়ে স্রোতের মতো টাঙ্গা , সাইকেল রিক্‌শা, বয়েল কি ভৈসা গাড়ি, ট্রাক, ঠেলা বা অটো ছুটে চলেছে।

একসময় অর্জুন বলে, 'চন্দ্রকান্তজির পেছনে ওরা যেভাবে লেগেছে, মনে হয় ওঁকে ট্রান্সফার করিয়ে ছাড়বে। উনি এখান থেকে চলে গেলে মান্ধাতা শর্মারা আমাকে আর কমলাকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলবে।'

বিজয় উত্তর দেয় না। প্রচণ্ড সাহসী, একগুঁয়ে এবং হিন্দু সোসাইটির সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী এই যুবকটিকে হঠাৎ অত্যন্ত বিমর্ষ দেখায়। হিন্দু সমাজের সংস্কার সুধার এবং পরিবর্তনের বিপক্ষে যারা একজোট হয়েছে তারা এই ছোট্ট নগণ্য শহরে প্রবল শক্তিমান। তাদের বিরুদ্ধে এককভাবে অর্জুন কতটা কী করতে পারবে, ভেবে সে যেন হতাশ হয়ে পড়ে।

নমকপুরার মাঝামাঝি বাজার মহল্লায় এসে পড়েছিল অর্জুনরা। বিজয় বলে, 'ক'টা জিনিস কিনে আমি এখান থেকে ফিরে যাব। তুমি বাড়ি চলে যাও। যদি ওরা বেশি ঝামেলা পাকায় তোমরা দু'জন সিধা এস. ডি. ও'র বাংলোয় চলে যাবে। যে যতই শাসাক, চন্দ্রকান্তজি যতদিন আছেন, তোমাদের ভয় নেই। কেউ তোমাদের গায়ে হাত ঠেকাতে সাহস করবে না।'

অর্জুন চুপ করে থাকে।

বিজয় আবার বলে, 'কী হল না হল, কাল অফিসে এসে আমাকে জানাবে।'

'জরুর।'

বিজয় ডান পাশে একটা বড় স্টেশনারি দোকানে ঢুকে যায়। আর তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে পুরানা মহল্লার দিকে হাঁটতে থাকে অর্জুন।

নয়

বাড়ির সামনে এসে চমকে ওঠে অর্জুন। তাদের মহল্লার প্রচুর লোকজন সদর দরজার কাছে ভিড় জমিয়েছে। আর ভেতর থেকে হই চই এবং কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে।

প্রথমেই যে আশঙ্কাটা অর্জুনের চিন্তাশক্তিকে মুহূর্তের জন্য অসাড় করে দেয় তা হল তার মা সম্পর্কে। মায়ের কি হঠাৎ খারাপ কিছু হয়ে গেল?'

একসময় অর্জুন টের পায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে দৌড়চ্ছে। তাকে দেখে চাপ-বাঁধা ভিড়টা সরে সরে পথ করে দেয়।

বাড়ির ভেতর ঢুকতেই যে দৃশ্য অর্জুনের চোখে পড়ে, এক মিনিট আগেও এমন একটা সম্ভাবনার কথা তার মাথায় আসেনি। বাজ-পড়া মানুষের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে।

তাদের উঠোনেও মহল্লার বেশ কিছু লোকজন। মাঝখানে দু হাতে মুখ ঢেকে সমানে কেঁদে চলেছে কমলা। ওদিকে রামঅবতার এবং তার ভাই বিনোদ তাদের সেই ভাঙাচোরা টিনের চালাটা থেকে থালা বাসন স্যুটকেস জামাকাপড় বিছানা-বালিশ ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলছে।

অর্জুনের চোখে পড়ে মায়ের কিছুই হয়নি। পাকা কোঠির বারান্দায় বসে সে সমানে কপাল চাপড়াচ্ছে আর গলার শিরা ছিঁড়ে ক্ষীণ আওয়াজ করে একনাগাড়ে কেঁদে চলেছে। তার পাসে বসে কাঁদছে রাধা।

অর্জুনের মস্তিষ্কের ভেতর অগুনতি চাকা একসঙ্গে ঘুরতে থাকে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা সে বাড়ি ছিল না, এর মধ্যে হঠাৎ কী এমন ঘটতে পারে যাতে কমলাকে ঘর থেকে বার করে রামঅবতার তার ছোট ছেলেকে নিয়ে তাদের মালপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে এবং মা আর রাধা ওভাবে মড়া কান্না জুড়ে দিয়েছে?

ভয়ে উদ্বেগে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে অর্জুনের। কাঁপা ঝাপসা গলায় সে বলে, 'কী হয়েছে বাবুজি?'

টিনের চালা থেকে একটা টিনের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে আসছিল রামঅবতার। সেটা উঠোনে আছড়ে ফেলে দৌড়ে অর্জুনের কাছে চলে আসে সে। মুখচোখ দেখে মনে হয়, এই মুহূর্তে তার মাথায় খুন চেপে গেছে। হাত-পা এবং মাথা নেড়ে, দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সে উন্মাদের মতো চেঁচাতে থাকে, 'নিকাল যা, নিকাল যা, আভ্‌ভি হামারা কোঠিসে তু দোনো নিকাল যা—' বলে বিনোদের দিকে তাকায়, 'যা, তুরন্ত একটা টাঙ্গা ডেকে নিয়ে আয়।'

বুকের ভেতর শ্বাস আটকে গিয়েছিল অর্জুনের। সে কাঁপা গলায় বলে, 'কী অন্যায় হয়েছে বলবে তো?'

'তোর সঙ্গে একটা কথাও না। তোদের মুখে থুক—' বলে প্রচণ্ড ঘৃণায় মাটিতে তিন চার বার থুতু ছিটিয়ে দুমদাম পা ফেলে আবার টিনের চালার দিকে যায় রামঅবতার।

পেছন থেকে অর্জুন ডাকে, 'বাবুজি—'

ঘাড় ফিরিয়ে কর্কশ গলায় রামঅবতার চেঁচায়, 'কী, কী বলছিস ভূচ্চর?'

'একটা কথা ভেবে দেখ—'

চোখমুখ আরো উগ্র হয়ে ওঠে রামঅবতারের, 'কী, কী ভাবব?'

অর্জুন করুণ মুখে বলে, 'এই রাত্রিবেলা তুমি আমাদের বার করে দিচ্ছ। আমরা কোথায় গিয়ে উঠব?'

'যে নরকে ইচ্ছা—' হিংস্র ক্রুদ্ধ কুকুরের দাঁতের মতো রামঅবতারের আধভাঙা ক্ষয়া-ক্ষয়া কালচে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে। সে চিৎকার করতে থাকে, 'লেকেন আমার কোঠিতে আর এক মিনিটও না। তোদের মুহ্ আর দেখতে চাই না।' বলেই টিনের চালায় ঢুকে বাকি মালপত্র টেনে এনে উঠোনে ছুঁড়তে থাকে।

এই কাজটি যখন সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়ে এসেছে সেই সময় বিনোদ এসে খবর দেয় টাঙ্গা এসে গেছে।

রামঅবতার বলে, 'যা, এই সামানগুলো টাঙ্গায় তুলে দে।' বলে আবার টিনের চালায় ঢুকে পড়ে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে আসে।

এবার বিমূঢ়ের মতো চারপাশের ভিড়টার দিকে তাকায় অর্জুন। সে জানে এই সব লোকজন তার বা কমলার জন্য একটি আঙুলও তুলবে না। এদের কারুর কাছ থেকে এক ফোঁটা সহানুভূতি পাওয়ার আশা নেই। বরং দরকার হলে তাদের দু'জনকে একেবারে চুরমার করে দেওয়ার জন্য তারা রামঅবতারের সঙ্গে হাত মেলাবে।

নিজের অজান্তেই অর্জুন পাকা কোঠির বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়। মায়ের উদ্দেশে বলে, 'বাবুজিকে বল মা, এভাবে আমাদের যেন তাড়িয়ে না দেয়—' বিয়ের পর বাড়িতে এসে এই প্রথম মায়ের সঙ্গে কথা বলল সে।

অর্জুনের মা উত্তর দেয় না, একটানা কেঁদেই যায়। তার দু চোখ থেকে স্রোতের মতো জল গড়াতে থাকে।

উঠোনের ওধার থেকে মারমুখী হয়ে তেড়ে আসে রামঅবতার। বলে, 'এ বাড়ির কারুর সঙ্গে কোনো কথা নয়। নিকাল যা—'

অর্জুন বিষণ্ণ চোখে মা'কে একবার দেখে বারান্দার পাশ থেকে উঠোনের মাঝখানে কমলার কাছে চলে আসে। বলে, 'চল—'

কমলা মুখ থেকে হাত সরিয়ে আস্তে আস্তে যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়ায়।

এদিকে বিনোদ একাই না, রামঅবতার এবং ধনিয়া ছোটাছুটি করে অর্জুনদের যাবতীয় মালপত্র টাঙ্গায় তুলে দেয়।

অগত্যা নিঃশব্দে পৃথিবীর সব অসম্মান ঘৃণা এবং ধিক্কার মাথায় নিয়ে কমলাকে সঙ্গে করে অর্জুন টাঙ্গায় ওঠে।

টাঙ্গাওলা জিজ্ঞেস করে, 'কহাঁ যায়েগা?'

এই শহরের মাত্র তিনজন মানুষই রয়েছেন যাঁরা তাদের আশ্রয় দিতে পারেন। অর্জুন অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে থেকে বলে ওঠে, 'এস. ডি. ও সাহেবের বাংলোয় চল—'

টাঙ্গাওলা আধমরা ক্ষয়াটে চেহারার ঘোড়াটার পিঠে চাবুক হাঁকায়। তৎক্ষণাৎ কাতর আওয়াজ করে সেটা ছুটতে শুরু করে।

পেছন থেকে রামঅবতারের ক্রুদ্ধ চিৎকার ভেসে আসে, 'এ কোঠিতে আর কোনোদিন যেন তোদের মুহ্ না দেখি। পাপী, কুলাঙ্গার কাঁহিকা!'

একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় অর্জুন। রামঅবতারের পাশে দাঁড়িয়ে পুরানা মহল্লার মানুষগুলো

তার এই চলে যাওয়া লক্ষ করছে। নিশ্চয়ই তারা খুব খুশি।

বাবা মা ভাইবোন এবং আজন্ম পরিচিত মানুষজনের সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্ক চিবকালের মতো ছিন্ন হয়ে যায়।

অনেকটা রাস্তা পেরুবার পর অর্জুন আস্তে করে স্ত্রীকে ডাকে, 'কমলা—'

কমলা নীরবে কেঁদেই যাচ্ছে। তার দু'চোখ ফোলা ফোলা, আরক্ত। গাল বেয়ে জল ঝবে চলেছে। উত্তর না দিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকায় সে।

কমলার কান্নাটা কোনো অদৃশ্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অর্জুনের মধ্যেও ছড়িয়ে যাচ্ছিল। ঝাপসা ভাঙা গলায় সে বলে, 'কেঁদো না কমলা, কেঁদো না।'

কান্না থামে না কমলার, বরং আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। স্ত্রীর একটি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে অর্জুন। তারপর বলে, 'আচানক কী এমন হল যাতে বাবুজি আমাদের এভাবে তাড়িয়ে দিল! তুমি কি কিছু জানো?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় কমলা।

'কী হয়েছে?'

'আজ বিকালে পূর্ণিয়া থেকে একটা চিঠি এসেছিল। সেটা পড়েই তোমার বাবুজি একেবারে খেপে ওঠে।'

'পূর্ণিয়া থেকে কে চিঠি দিল? ওখানে তো আমাদের কোনো রিস্তেদার নেই।'

'ওখানে রাধার যে বাড়িতে শাদি ঠিক হয়েছে তারা লিখেছে।'

চমকে ওঠে অর্জুন, জিজ্ঞেস করে, 'কী লিখেছে ওরা?'

কমলা জানায়, রাধার ভাবী সসুরালের লোকেরা কিভাবে যেন জেনে গেছে দুলহনের ভাই অর্জুন দোসাদদের মেয়ে বিয়ে করে বসেছে। যে বাড়ির পুতহু অচ্ছুৎ সে বাড়ির মেয়ে তারা নেবে না। চিঠি লিখে আজ তারা বিয়ে ভেঙে দিয়েছে।

চিঠিটা পড়ার পর মাথায় খুন চেপে যায় রামঅবতারের। চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে কিছুক্ষণ বাড়িময় দাপিয়ে বেড়ায় সে। তারপর কমলা এবং অর্জুনের উদ্দেশে অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে টিনের চালায় ঢুকে কমলাকে উঠোনে বার করে দিয়ে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। তার চিৎকারে পুরানা মহল্লার লোকজনেরা দৌড়ে আসে।

এদিকে বিয়ে ভাঙার খবর পেয়ে অর্জুনের মা এবং রাধা পাকা কোঠির বাবান্দায় বসে বুক-ফাটা কান্না জুড়ে দেয়। তারপর যা যা ঘটেছে সবই অর্জুনের জানা।

এস. ডি. ও'র বাংলোর সামনে এসে একসময় টাঙ্গা থেমে যায়। টাঙ্গাওলা বলে, 'আ গিয়া মালিক—'

গাড়ি থেকে নেমে অর্জুন টাঙ্গাওলাকে বলে, 'একটু দাঁড়াও। আমি ভেতর থেকে আসছি।'

'জি—'

কমলাকেও একই কথা বলে লোহার ভারি গেটের দিকে এগিয়ে যায় অর্জুন। তার ভয় ছিল, হয়ত এখানে এসে দেখবে মান্ধাতা শর্মারা গেটের কাছে মিছিল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় অর্জুন। মান্ধাতারা এখন নেই। খুব সম্ভব উত্তেজক স্লোগান দিয়ে এবং এস. ডি. ও'কে শাসিয়ে তারা চলে গেছে।

মিছিল চলে গেলেও গেটটা বন্ধই রয়েছে। কমপাউন্ডের ভেতর বিশ পঁচিশ জন আর্মড গার্ড দেখা যাচ্ছে। এত সশস্ত্র পাহারাদার অন্য সময় এখানে থাকে না। নিশ্চয়ই নিরাপত্তার কাবণে তাদের এখানে মোতায়েন করা হয়েছে।

পাহারাদারদের অনেকেই অর্জুনকে চেনে। তারা গেট খুলে দেয়।

অর্জুন ভেতরে ঢুকে সোজা দোতলায় উঠে যায়। চন্দ্রকান্ত এবং সরযূ বাংলোতেই ছিলেন। তাঁদের কাছে আজকের সব ঘটনা জানিয়ে বলে, 'বাবুজি আমাদেব তাড়িয়ে দিয়েছে। কমলাকে টাঙ্গায় বসিয়ে এসেছি। এখন আমরা কী করব?'

চন্দ্রকান্তকে অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিপর্যস্ত দেখায়। তিনি বলেন, 'মরালি তোমাদের শেলটার দেওয়া আমার উচিত। কিন্তু তুমি কি জানো আজ নমকপুরার ব্রাহ্মণ কমিউনিটি আমার বিরুদ্ধে বিরাট প্রসেসান বার করে এখানে এসেছিল?'

'জানি। আমি মিছিলটাকে এদিকে আসতে দেখেছি।'

'তারা বলে গেছে, আমি নাকি ব্রাহ্মণদের পবিত্রতা নষ্ট করে দিচ্ছি। কয়েক দিনের ভেতর এখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে অন্য কোথাও যদি আমি চলে না যাই, ওরা তুমুল মুভমেন্ট শুরু করবে।'

'আমি এই রকমই ভেবেছিলাম।'

চন্দ্রকান্ত বলেন, 'বুঝতেই পারছ, এই অবস্থায় তোমাদের যদি আমরা এখানে থাকতে দিই ওরা তুলকালাম বাধিয়ে দেবে। কয়েকটা দিন তোমরা অন্য কোথাও থাক। উত্তেজনাটা একটু কমে আসুক, তারপর তোমাদের এখানে নিয়ে আসব।'

বোঝাই যায়, চন্দ্রকান্ত বেশ ভয় পেয়েছেন। অর্জুনের বিয়ের সময় আবহাওয়া যা ছিল তা এখন বদলে গেছে। রাজনৈতিক প্রশাসনিক এবং সামাজিক, সব দিক থেকেই তাঁর ওপর চাপ তৈরি হচ্ছে। তিনটি ফ্রন্টে এককভাবে তাঁর পক্ষে যুদ্ধ চালানো খুবই অসুবিধাজনক। তাই রণকৌশল হিসেবে আপাতত অর্জুনদের দূরে রাখতে চাইছেন।

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এখানে এসেছিল অর্জুন। ভেতরে ভেতরে সে ভীষণ দমে যায়। কাঁপা গলায় বলে, 'আমরা কোথায় থাকব? কেউ তো আমাদের জায়গা দেবে না।'

একটু চিন্তা করে চন্দ্রকান্ত বলেন, 'তোমরা চার্চে চলে যাও। রেভারেন্ড টিরকে নিশ্চয়ই তোমাদের আশ্রয় দেবেন। হী ইজ আ গ্রেট সোল।'

চার্চে এসে অর্জুনেরা যখন পৌঁছয়, অনেকটা রাত হয়ে গেছে।

সব শুনে কিছুক্ষণ বিমর্ষ হয়ে থাকেন রেভারেন্ড টিরকে। তারপর বলেন, 'এই রকম কিছু ঘটবে, আগেই ভেবেছিলাম। এতদিন কেন ঘটেনি সেটাই আশ্চর্য। ঠিক আছে, এসে যখন পড়েছ, টাঙা থেকে মালপত্র নামিয়ে আনো।'

সেই সন্ধে থেকে অর্জুনদের ওপর দিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো কিছু একটা ঘটে গেছে। প্রচণ্ড ধিক্কার এবং অসম্মানের পর চার্চে এসে এই প্রথম অনিশ্চয়তা খানিকটা কাটে। উৎকণ্ঠাও কমে যায়। একটা আশ্রয় অন্তত পাওয়া গেছে।

কিন্তু রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর উদ্বেগটা অনেক বেড়ে যায়।

রেভারেন্ড টিরকে বলেন, 'তোমাদের সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে ওঠে অর্জুন। বলে, 'কী কথা?'

'আমি যদি অন্য কোথাও থাকতাম, যতদিন ইচ্ছা তোমরা আমার কাছে থেকে যেতে। কিন্তু এই চার্চে তোমাদের থাকার ফলে ভয়ানক প্রবলেম দেখা দেবে।'

'কেন?'

'তোমাদের ব্যাপারটা এখন আর সামাজিক লেভেলে নেই, পোলিটিকাল লেভেলে পৌঁছে গেছে। শুনেছি, এখানকার ব্রাহ্মণ কমিউনিটির লিডাররা মন্ত্রী-টন্ত্রীদের এনে মিটিং করবে, যাতে ইন্টার-কাস্ট ম্যারেজ আর না ঘটতে পারে তার চেষ্টা করবে। এরা যদি জানতে পারে এখানে তোমরা আশ্রয় পেয়েছ, নিশ্চয়ই হই চই বাধিয়ে দেবে। বলবে চার্চ ব্রাহ্মণদের পেছনে লেগেছে।'

অর্জুন চুপ করে থাকে। তার চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে যায়। অর্জুনের ধারণা এবং বিশ্বাস ছিল, যতদিন অন্য কোনো ব্যবস্থা না হয় রেভারেন্ড টিরকের কাছে থাকতে পারবে। কিন্তু তিনি যা বললেন, এরপর কাল থেকেই নতুন আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে। অবশ্য অচ্ছুৎটোলায় কমলার মা-বাপের কাছে গিয়ে থাকা যায় কিন্তু তাতে তাদের বিপন্ন করা হবে। তা ছাড়া, তার ভেতরকার সব সংস্কার এখনও একেবারে নির্মূল হয়ে যায়নি। দোসাদদের শিক্ষিত সুন্দরী রুচিশীলা মেয়েকে বিয়ে করা এক কথা, আর অচ্ছুৎটোলার নোংরা কুৎসিত পরিবেশে গিয়ে থাকা সম্পূর্ণ আলাদা

ব্যাপার।

রেভারেন্ড টিরকে বলেন, 'মানুষের সেবার জন্য এই গীর্জা। আমাদের আদর্শ হল, সারভিস টু সাফারিং হিউম্যানিটি। আমি এর সঙ্গে রাজনীতি জড়াতে চাই না। তোমরা এখানে দু-চারদিন থেকে বাড়ি খুঁজে নাও। তোমাদের অন্য যে সাহায্য দরকার, সব পাবে। অনেক রাত হয়েছে। যাও, এবার শুয়ে পড়।'

কমলা এবং অর্জুন ভেতরের একটা ঘরে গিয়ে শোয় বটে, বাকি রাতটুকু এক মুহূর্তের জন্য ঘুমোতে পারে না।

চার্চে থাকলে রেভারেন্ড টিরকেকে বিব্রত এবং বিপন্ন করা হবে, কাজেই কাল থেকে বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু এই ছোট শহরে তাদের বিয়ের ব্যাপারটা এত বেশি জানাজানি হয়ে গেছে যে কেউ বাড়ি ভাড়া দেবে না। তা হলে কমলাকে নিয়ে কোথায় যাবে সে? ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে হঠাৎ বিজয়ের কথা মনে পড়ে যায়। একমাত্র বিজয়ই তাদের জন্য হয়ত কিছু করতে পারে।

পরদিন, তখনও ভাল করে ভোর হয়নি, আকাশের গায়ে আবছা অন্ধকার লেগে আছে—অর্জুন উঠে জামা কাপড় পালটাতে থাকে।

কমলা জেগেই ছিল। সে একটু অবাক হয়েই বলে, 'তুমি কি বেরুচ্ছ?'

অর্জুন বলে, 'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবে?'

'ফিরে এসে বলব।'

কমলা আর কোনো প্রশ্ন করে না।

চার্চ থেকে বেরিয়ে বাইরে আসতেই অর্জুন দেখতে পায়, নমকপুরা টাউন গভীর ঘুমের আরকে ডুবে আছে। রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। ক্বচিৎ দু-একটা বয়েল কি ভৈসা গাড়ি নিচে লণ্ঠন ঝুলিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে। মনে হয় না তাদের বিন্দুমাত্র তাড়া আছে। পৃথিবীর সবটুকু ঘুম এখনও যেন গাড়িগুলোর ওপর ভর করে রয়েছে।

বিজয়ের বাড়িতে আগে আর কখনও যায়নি অর্জুন। তবে ঠিকানাটা জানা আছে। নমকপুরা টাউনের পশ্চিম দিকে নয়া মহল্লায় বিজয় থাকে।

অর্জুন যখন সেখানে এসে পৌঁছয়, বিজয় ঘুমোচ্ছে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর তার সাড়া মেলে, 'কৌন?'

অর্জুন বলে, 'আমি অর্জুন—'

একটু পর দরজা খুলে বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে বিজয়। তারপর ঘুমজড়ানো গলায় বলে, 'তুমি—তুমি এত ভোরে!'

'আমার খুব বিপদ বিজয়। তোমার সাহায্য না পেলে কমলা আর আমি একেবারে শেষ হয়ে যাব।'

অর্জুনের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে ওঠে বিজয়। ঘুমের রেশটুকু মুহূর্তে ছুটে যায়। শশব্যস্তে অর্জুনকে ভেতরে নিয়ে বসায় সে। উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে?'

কাল বিকেল থেকে যা যা ঘটেছে সব জানিয়ে অর্জুন বলে, 'এখন আমি কী করব?'

এক মুহূর্তও ভাবে না বিজয়, দ্বিধাহীন গলায় বলে, 'কী আবার করবে? এক্ষুনি চার্চে গিয়ে কমলাকে নিয়ে এস। মালপত্র বেশি এনো না। দু-চারটে জামাকাপড়, মতলব, যা না হলেই নয়, সেটুকুই শুধু আনবে।'

'লেকেন—'

'কী?'

'তোমার এখানে তো একটা মোটে ঘর। তিন জন থাকব কী করে?'

বিজয় জানায়, দিনের বেলা কোনো সমস্যা নেই, রাত্তিরে অর্জুন এবং কমলা এই ঘরে থাকবে। আর পেছনের ঢাকা বারান্দায় সে শোবে।

অর্জুন বিব্রত মুখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বিজয় বলে, 'কোনো কথা

নয়। তবে একটা ব্যাপারে হোঁশিয়ার থাকতে হবে।'

'কী ব্যাপার?'

'আমার বাড়ির মালিক কায়াথ। জাতপাতের সওয়ালে ভীষণ অর্থোডক্স। সে যদি জানতে পারে তোমরা এখানে এসে আছ, বহুৎ ঝামেলা বাধিয়ে দেবে।'

'তা হলে?' হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন থেমে যায় অর্জুনের। যা-ও একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে, সেখানেও স্বাভাবিকভাবে নির্ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলা যাবে না।

তার কাঁধে একটা হাত রেখে বিজয় বলে, 'আমার এখানে না এসে অন্য কোথাও যদি যাও একই অবস্থা হবে। আমাদের এই ফাণ্ডামেন্টালিস্ট সোসাইটি সব সমস্কার কাটিয়ে খুব সহজে তো তোমাদেব মেনে নেবে না। তার জন্যে ধৈর্য আর সাহস চাই। চাই ফাইটিং স্পিরিট। যাও, তুরন্ত চার্চ থেকে কমলাকে নিয়ে এস। এ বাড়ির কেউ জেগে ওঠার আগেই ফিরে আসবে।'

'লেকেন আরেকটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে।'

'কী?'

'আমরা তো সব সময় ঘরে বসে থাকব না। অফিসে বেরুতে হবে। তখন কমলার কী হবে?'

'একদিক থেকে বাঁচোয়া, আমার ঘর বাইরের দিকে। ভেতরের লোকজন তেমন কেউ এখানে আসে না। অফিসে বেরুবার সময় কমলাকে তালা দিয়ে রেখে যাব। ঘরে কে আছে, বাইরে থেকে টের পাওয়া যাবে না।'

'এভাবে কতদিন চলবে?'

'দেখা যাক। তুমি আর দেরি করো না।'

অর্জুন আর কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ে।

দশ

এই গ্রহের তুমুল হই চই এবং ফেনায়িত উত্তেজনা থেকে অনেক দূরে শান্ত নিস্তরঙ্গ নগণ্য নমকপুরা টাউনের ওপর দিয়ে এর পরের দশটা দিন একেবারে ঝড় বয়ে যায়।

এর মধ্যে মান্ধাতারা চক বাজারের সামনেব মাঠে পাটনা থেকে দু'জন মন্ত্রী, তিনজন এম. পি এবং স্থানীয় এম. এল. এ'কে নিয়ে এসে পর পর দু'দিন মিটিং করেছে। গোটা নমকপুরা দু'দিনই মিটিংয়ে ভেঙে পড়েছিল। মন্ত্রী এবং অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা জানিয়ে গেছেন, সরকার যদিও সামাজিক সংস্কার এবং জাতিগত বৈষম্য দূর করার জন্য ইন্টার-কাস্ট ইন্টার-প্রভিন্সিয়াল বিয়েতে উৎসাহ দিতে চাইছেন, তবু এর ফলে কোনো সম্প্রদায় বা জাতির মনে যদি আগাত লাগে, জোর করে কিছু কবা হবে না। জবরদস্তিতে ভাল কিছু হয় না। তার ফল অশুভ এবং ক্ষতিকর হয়ে থাকে। 'দিলসে' মেনে না নিলে চিরাচরিত নিয়মে যা চলছে তাই চলবে। অর্থাৎ কয়েক দিন আগে অর্জুন আর কমলার বিয়ে নিয়ে এখানে যা হয়ে গেছে, নরম করে এঁরা তার উলটোটাই বলে গেলেন।

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর যে ব্যাপারটি এই দশ দিনে এখানে ঘটেছে তা হল চন্দ্রকান্তর ট্রান্সফার, তাঁকে মতিহারিতে বদলি করা হয়েছে। এখানে থেকে যাওয়ার জন্য দু'বার পাটনায় গিয়ে অনেককে ধরাধরি করেছিলেন চন্দ্রকান্ত কিন্তু বৃথাই তাঁর আবেদন নিবেদন। অথরিটির এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

চন্দ্রকান্ত চলে যেতে না যেতেই নতুন এস. ডি. ও মহেশ্বর ত্রিবেদী এই সাব-ডিভিসনের দায়িত্ব নিয়ে নমকপুরায এসে হাজির হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, লোকটি অত্যন্ত গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং কট্টর ফান্ডামেন্টালিস্ট।

অর্থাৎ মান্ধাতা এবং এখানকার ব্রাহ্মণ কমিউনিটি যা যা চেয়েছিল হুবহু তাই ঘটেছে। শহরের বাসিন্দাদের ধারণা, অর্জুন অচ্ছুতের মেয়েকে বিয়ে করার কারণে যে প্রচণ্ড তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল,

এরপর এমন হঠকারী ঘটনা আর ঘটবে না। নমকপুরা আবহমান কালের নিয়মে এবং স্থিতাবস্থায় আবার ফিরে আসবে।

এগার দিনের মাথায় আরো একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। বিজয়ের বাড়িওয়ালা নৈটেয়ার সহায়ের কাছে অর্জুনরা ধরা পড়ে যায়। অচ্ছুতের মেয়েকে ঢুকিয়ে এ বাড়ির পবিত্রতা নষ্ট করার কারণে লোকটা এমন চেঁচায়, মনে হয়, মাথার শিরা ছিঁড়ে এই মুহূর্তে তার দেহান্ত ঘটে যাবে।

একটানা চিৎকারের দরুন ক্লান্ত হয়ে খানিকক্ষণ হাঁপায় নৈটেয়ার। তারপর আলটিমেটাম দেওয়ার ভঙ্গিতে জানায়, অর্জুন আর কমলাকে এখনই তাড়িয়ে না দিলে বিজয়কেও এ বাড়িতে থাকতে দেওয়া হবে না।

বিজয় অবিচলিত মুখে বলে, 'অত হল্লা করবেন না। ওরা চলে যাচ্ছে।'

ঘরে তালা লাগিয়ে তিনজন রাস্তায় নামে।

অর্জুন বলে, 'এবার?'

বিজয় বলে, 'দেখা যাক কী করা যায়।'

এরপর একটা টাঙ্গা নিয়ে তারা নমকপুরার পুরানা মহল্লা বাদে প্রায় প্রতিটি টোলির প্রতিটি বাড়িতে হানা দেয়, যদি কোথাও ঘরভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে চারদিকে এত রটে গেছে যে সবাই মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

ক্লান্ত উৎকণ্ঠিত অর্জুনরা শেষ পর্যন্ত এস. ডি. ও'র বাংলোয় মহেশ্বর ত্রিবেদীর কাছে চলে আসে। সব কিছু জানিয়ে হাতজোড় করে কোথাও একটা বাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে বলে।

মহেশ্বর বলেন, 'বহুত দুখকা বাত। লেকেন আমার কিছু করণীয় নেই।'

অর্জুন বলে, 'আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি। তবে কেন আমাদের এ শহরে কেউ ঘরভাড়া দেবে না? সরকারই তো কানুন বানিয়েছে, যদি কেউ অচ্ছুতের মেয়ে শাদি করে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে মহেশ্বর বলেন, 'সরকার কানুনের বাইরে কিছু করেনি তো। আমি যদিও এখানে নতুন এসেছি, তবু খবর পেয়েছি, সরকার আপনাদের শাদিতে মদত দিয়েছে, আপনাকে ভাল নৌকরি দিয়েছে, পাঁচ হাজার টাকা নগদও দিয়েছে। লেকেন ঘর খুঁজে দেওয়ার দায় তো তার নয়। তবে হাঁ—'

অর্জুনরা ভয়ানক দমে গিয়েছিল। তবু জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

মহেশ্বর বলেন, 'কেউ যদি আপনাদের ওপর উৎপাত করে আমাকে জানাবেন, সিকিউরিটির সবরকম বন্দোবস্ত করব।'

এরপর বলার কিছু থাকে না।

এস. ডি. ও'র বাংলো থেকে বেরিয়ে বিজয় বলে, 'আগেই ভেবেছিলাম লোকটা তোমাদের জন্যে একটা আঙুলও তুলবে না। মান্ধাতাদের ও কোনোমতেই চটাবে না। নেহাত সরকারি নৌকরি করে, কিছু অসুবিধা আছে। নইলে ওর বাংলোয় আমাদের ঢুকতেই দিত না।'

অর্জুন তার কথা প্রায় কিছুই শুনছিল না। চাঁই চাঁই পাথরের মতো অসীম দুর্ভাবনা তার মস্তিষ্কে প্রবল চাপ দিয়ে যাচ্ছিল।

বিজয় বলে, 'সব তো দেখা হল। এবার কী করতে চাও?'

'এখন চার্চে যাওয়া যাক।' রেভারেন্ড টিরকেকে বলে আজ ওখানে থাকব। তারপর কাল যা করার করব।'

'কী করতে চাইছ?'

বিয়ের পর থেকে যে অর্জুন চারদিকের চাপে প্রচণ্ড দিশেহারা এবং সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, হঠাৎ সে যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। তার মুখে কাঠিন্য ফুটে বেরোয়। দৃঢ় গলায় বলে, 'এখন কিছু বুঝতে পারছি না। তবে কিছু একটা করতে হবে। তুমি কাল সকালে একবার চার্চে আসতে পারবে?'

'পারব।'

এগার

রামঅবতার বাড়ি থেকে বার করে দিলে রেভারেন্ড টিরকের বাংলোয় এসে সারারাত না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিয়েছিল অর্জুনরা। আজও তাদের চোখে ঘুম এল না।

মাঝ রাত পর্যন্ত বিছানায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছটফট করতে করতে হঠাৎ অর্জুনের মাথায় বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায়। এক টানে নিজেকে তুলে বিছানায় বসিয়ে দেয় সে। ভেতরে ভেতরে মারাত্মক উত্তেজনা বোধ করতে করতে ডাকে, 'কমলা—কমলা—'

কমলা আস্তে আস্তে উঠে বসে। বলে, 'কী বলছ?'

'এখানে পুরনো খবরের কাগজ নিশ্চয়ই আছে?'

কমলা রীতিমত অবাক হয়ে যায়। তারপর বলে, 'আছে। কেন?'

অর্জুন ব্যস্তভাবে বলে, 'কয়েকটা নিয়ে এস। সেই সঙ্গে কালি, এক টুকরো কাপড় আর মোটা কাঠিও আনবে।'

বিমূঢ়ের মতো স্বামীর দিকে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে যায় কমলা, কিছুক্ষণ পর কাগজ টাগজ নিয়ে ফিরে আসে।

দ্রুত কাপড়ের টুকরো কলমের পেছন দিকে জড়িয়ে তুলি বানিয়ে ফেলে অর্জুন। তারপর মেঝেতে পুরনো কাগজগুলো পেতে পোস্টার লিখতে বসে।

'সরকারকা ন্যায় বিচার—'

'চাহ্‌তা হ্যায়।'

'সমাজকা ন্যায় বিচার—'

'চাহ্‌তা হ্যায়।'

'হামলোগোকা—'

'সাহারা দো—'

'হামলোগ—'

'বঁচনা চাহ্‌তা হ্যায়।'

স্লোগানগুলো লক্ষ করতে করতে কমলা জিজ্ঞেস করে, 'এসব লিখে কী হবে?'

অর্জুন বলে, 'কাল দেখতে পাবে।'

কথামতো পরদিন সকালে বিজয় রেভারেন্ড টিরকের বাংলোয় চলে আসে। পোস্টার দেখে বলে, 'এগুলো দিয়ে কী করবে?'

অর্জুন এবার তার পরিকল্পনাটা জানিয়ে দেয়। এস. ডি. ও'র বাংলোর সামনে পোস্টারগুলো টাঙিয়ে দিয়ে সে আর কমলা যতদিন না কোনো প্রতিকার হচ্ছে, বসে থাকবে। আসলে তাদের ওপর সামাজিক এবং প্রশাসনিক যে অবিচার আর লাঞ্ছনা চলছে, এভাবে বিদ্রোহ জানিয়ে তারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। এ ছাড়া আপাতত তাদের অন্য কোনো পদ্ধতি জানা নেই।

উৎসাহে উত্তেজনায় বিজয়ের চোখ ঝকঝক করতে থাকে। সে বলে, 'ভেরি গুড আইডিয়া। কবে থেকে শুরু করতে চাও?'

'আজ থেকেই।'

'ঠিক আছে, আমিও তোমাদের সঙ্গে থাকব। আর সাহারসা পূর্ণিয়ায় আমাদের সংস্থানের মেম্বারদের খবর পাঠাচ্ছি। তারা যে ক'জন পারে যেন চলে আসে—'

হঠাৎ পত্রকার সুরেশ পান্ডের কথা মনে পড়ে যায় অর্জুনের। তার বিয়ের পর সে পত্রিকার 'স্টোরি' করার জন্য সুদূর পাটনা থেকে ছুটে এসেছিল। জাতপাত ভেঙে বিয়ে করা এবং সোসাইটিকে প্রগতির দিকে এক কদম এগিয়ে দেওয়ার কারণে প্রচুর অভিনন্দন জানিয়ে সে বলেছিল, কোনোরকম প্রয়োজন হলে অর্জুন যেন তাকে চিঠি লেখে। চিঠি পাওয়ামাত্র সে চলে আসবে। অর্জুন বলে, 'এখানে

যদি একটা টেলিগ্রাম করে দাও ভাল হয়।' বলে সুরেশের ঠিকানা লিখে দেয়।

'জরুর।'

সেদিনই দুপুর থেকে নমকপুরার মানুষজন দেখতে পায়, এস ডি. ও সাহেবের বাংলোর উলটো দিকে পোস্টার টাঙিয়ে অর্জুন বিজয় আর কমলা বসে আছে।

বাকি দিন এবং রাতটা এইভাবেই কেটে যায়। এর মধ্যে মহেশ্বর ত্রিবেদীকে একবার বাংলোয় ঢুকতে এবং একবার বেরুতে দেখা গেছে। রাস্তার উলটো দিকে তাকিয়ে তিনি যথেষ্ট বিরক্ত, চোখমুখ দু'বারই তাঁর কুঁচকে গেছে।

রাস্তার লোকজনেরা কেউ কোনো মন্তব্য করেনি, শুধু কৌতূহলী চোখে তিনজনকে লক্ষ করেছে।

পরদিন বেলা একটু চড়লে অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে কমলার মা এবং বাপ নাথুনি আর জগলাল এসে নিঃশব্দে অর্জুনদের কাছে বসে পড়ে। তাদের সঙ্গে দোসাদটোলার আরো কয়েকজন এসেছে। এতদিন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অর্জুনদের গোলমালটা চলছিল, কিন্তু এবার খোদ এস.ডি.ও'র বাংলোর সামনে প্রতিবাদ জানাতে বসে পড়েছে ওরা। সে জন্য খুবই ভয় পেয়ে গেছে জগলালেরা। হাজার হোক, ওরা তার মেয়ে জামাই। তাদের অনিষ্ট হোক, এটা তারা চিন্তাই করতে পাবে না। যদি শেষ পর্যন্ত কোনো বিপদ আসে, ওরা অর্জুন এবং কমলাকে বুক দিয়ে আগলে রাখবে।

দুপুরের দিকে সাহারসা আর পূর্ণিয়া থেকে বিজয়দের সংস্থানের বেশ কিছু লোকজন এসে পড়ে। এসেই তারা স্লোগান দিতে শুরু করে :

'সমাজকা ন্যায়বিচার—'

'চাহ্‌তা হ্যায়।'

'সরকারকো ন্যায়বিচার—'

'চাহ্‌তা হ্যায়।'

বিকেলের দিকে পাটনা থেকে সুরেশ এসে হাজির। বিজয়ের টেলিগ্রাম পৌঁছুবার আগেই সে এসে পড়েছে। তার আসার কারণ খানিকটা কৌতূহল এবং অনেকটা দুশ্চিন্তা। বিয়ের পর অর্জুনরা কিভাবে আছে সেটা দেখার জন্য এবার তার আসা। আর এসেই এস. ডি. ও'র বাংলোর সামনে তাদের পোস্টার নিয়ে বসে থাকতে দেখে সে-ও বসে পড়েছে।

সন্ধে পর্যন্ত একটানা স্লোগান চলতে থাকে। তার মধ্যে অচ্ছুৎটোলা থেকে আরো অনেকেই এসে যায়। তারা সবাই দোসাদ না—ধোবি ধাঙড় এবং কোয়েরিও রয়েছে। তবে উঁচু জাতের বামহন কায়াথরা কেউ আসেনি। হয়ত তারা এ জাতীয় প্রতিবাদে হকচকিয়ে গেছে এবং নতুন করে রণকৌশল তৈরি করছে।

সন্ধের পর রাস্তার ওপারে ভিড় যখন আরো বেড়ে যায়, সেই সময় এস. ডি. ও'র বাংলো থেকে একজন আর্মড গার্ড এসে অর্জুন এবং কমলাকে বলে, 'আপনাদের দু'জনকে এস.ডি.ও সাহাব ডাকছেন।'

অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'স্রেফ আমাদের দু'জনকেই?'

'জি।'

'গেলে আমরা চারজন যাব।' বলে সুরেশ এবং বিজয়কে দেখিয়ে দেয় অর্জুন।

গার্ডটি বলে, 'হুকুম নেহী।' রাস্তা পেরিয়ে চলে যায় সে এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে ফের একই কথা বলে। অর্থাৎ এস. ডি. ও সাহেব শুধুমাত্র অর্জুন আর কমলার সঙ্গেই দেখা করতে চান। কিন্তু অর্জুনকে টলানো যায় না।

বারকয়েক ছোটাছুটির পর শেষ পর্যন্ত গার্ডটি বলে, 'ঠিক হ্যায়, আপনারা চারজনই আসুন।'

গার্ডের সঙ্গে বাংলোর ভেতর ঢুকে সোজা একতলার ড্রইং রুমে চলে আসে অর্জুনরা। মহেশ্বর

ত্রিবেদী তাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর মুখ থমথমে, গম্ভীর। তিনি বলেন, 'বাংলোর সামনে এ জাতীয় হল্লা আমি পছন্দ করি না।'

সুরেশ বলে, 'এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল কি?'

উত্তর না দিয়ে মহেশ্বর অর্জুনের উদ্দেশে বলেন, 'যাই হোক, কোনোরকম গোলমাল হাঙ্গামা আমার ভাল লাগে না। আমি আপনাকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আশা করি অ্যাকসেপ্ট করবেন।'

অর্জুন বলে, 'প্রস্তাবটা না শুনে আমি কিছুই বলব না।'

'ঠিক আছে, শুনুন। আপনাদের জন্যে এখানকার পিস নষ্ট হচ্ছে। আপনাকে ধানবাদ পাটনা কিষেণগঞ্জ কাটিহার, যেখানে বলবেন ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করছি। সেখানে চলে যান। নতুন জায়গায় লোকে জানতেও পারবে না আপনার স্ত্রী দোসাদ।'

অর্জুনের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। অসহ্য রাগে মাথার ভেতরটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। সে বলে, 'আমি এখান থেকে যাব না। তা ছাড়া আমার স্ত্রীর জাতও লুকিয়ে রাখতে চাই না। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আমরা কোনোরকম অন্যায় করিনি।'

সুরেশ অর্জুনের ডান পাশে থেকে বলে ওঠে, 'আপনি কি জানেন আমি একজন পত্রকার?'

'জানি। খবর নিয়েছি।'

'অর্জুনকে যা বলল, সেই কথাগুলো কিন্তু আমাদের পত্রিকায় ছাপা হবে। আমার ধারণা, ব্যাপারটা আপনার পক্ষে খুব হ্যাপি হবে না।'

রীতিমত ঘাবড়ে যান মহেশ্বর। বলেন, 'এই জন্যেই আমি আপনাকে ডাকতে চাইনি। পত্রকারদের কাছে মুখ খোলা খুব বিপদ। আমাকে অর্জুনজির ওয়েল-উইশার ভাবতে পারেন। সেই জন্যেই অন্য জায়গায় বদলির কথা বলেছিলাম। যাক, এতে যখন আপনারা রাজি নন, বলুন আর কী করতে পারি?'

সুরেশ বলে, 'সরকারের অনেক বাড়ি টাড়ি ফাঁকা পড়ে আছে। সেখানে অর্জুনদের থাকার ব্যওস্থা করে দিন।'

একটু চিন্তা করে মহেশ্বর বলেন, 'পি. ডব্লু. ডি বাংলোর দু-একটা কামরা বোধ হয় খালি আছে। সেখানে ওরা এখন থাকুক। পরে কী করা যায় ভেবে দেখব।'

'ধন্যবাদ। আজই কিন্তু ওরা পি.ডব্লু.ডি বাংলোয় যাবে।'

'আচ্ছা।'

অর্জুন মহেশ্বরের দিকে তাকিয়ে আছে। দূরমনস্কর মতো সে ভাবে, যুদ্ধের প্রথম পর্বটা আপাতত শেষ। কিন্তু মান্ধাতারা কিছুতেই তাকে ছেড়ে দেবে না। হাজার বছরের সংস্কার এবং গোঁড়ামির এই পাহারাদারেরা অন্য রণকৌশল তৈরি করে ফেলবে। নতুন আক্রমণের জন্য মনে মনে সে প্রস্তুত হয়ে যায়। কেননা সে জানে, এই যুদ্ধে সে একাই না, আরো অনেকেই তার পাশে আছে।

বার

নমকপুরা টাউনের উত্তর দিকে শেষ মাথায় পি. ডব্লু. ডি বাংলো। বিশাল কমপাউন্ডের মাঝখানে টালির চালের পাকা বাড়ি। সব মিলিয়ে মোট ছ'খানা বিরাট বিরাট ঘর। বিশ ইঞ্চি পুরু দেওয়াল। বড় বড় জানালায় দুটো করে পাল্লা—একটা কাচের, অন্যটা কাঠের। তাছাড়া গ্রিল তো রয়েছেই। দরজা জানালায় দামি পর্দা। সিলিং থেকে চার ব্লেডের ঝকঝকে ফ্যান ঝুলছে।

সবগুলো ঘরই খাট, ড্রেসিং টেবল, ওয়ার্ডরোব ইত্যাদি নানা আসবাবে চমৎকার সাজানো। প্রতিটি কামরার গায়ে অ্যাটাচড বাথ। আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সব রকম উপকরণ এখানে মজুত।

এই ঘরগুলো ছাড়া রয়েছে একধারে কেয়ার টেকারের ছোট অফিস এবং বাংলোর সামনের দিকে কাঠের রেলিং দেওয়া লম্বা বারান্দা। সেখানে অনেকগুলো সোফা আর ছোট, নিচু টেবল সাজিয়ে রাখা আছে।

লম্বা বারান্দার তলা থেকে ফুলের বাগান। ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর ঝাউ আব দেবদারু। বাগানেব মাঝখান দিয়ে সুরকির রাস্তা। রাস্তাটা বাংলোর গেট পর্যন্ত চলে গেছে।

পেছন দিকে কেয়াব-টেকার এবং ক্লাস ফোর স্টাফ কর্মীদের থাকার জন্য নানা মাপেব টালির ঘর। পদমর্যাদা অনুযায়ী ঘরগুলো ছোট বা বড়।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ নতুন এস. ডি ও মহেশ্বর ত্রিবেদী অর্জুন এবং কমলাকে একজন আর্মড গার্ডের সঙ্গে পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় পাঠিয়ে দেন। যাতে অর্জুনদের থাকাব ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় সেজন্য একটা চিরকুট লিখে গার্ডের হাতে দিয়েছেন মহেশ্বর।

জগলাল নাথুনি এবং অচ্ছুৎটোলার আরো দু'চারজন অর্জুনদের সঙ্গে আসতে চেয়েছিল। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে বিজয় আর সুরেশ এসেছে। যদিও একজন আর্মড গার্ড রয়েছে, তবু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারে নি ওবা। যেভাবে নমকপুরার ব্রাহ্মণেরা খেপে আছে, বাস্তায় অর্জুনদেব দেখলে হামলা কবতে পারে। তাছাড়া বাংলোয় অর্জুনবা কতটা নিবাপদ সেটাও হয়ত নিজেদের চোখে যাচাই করে নিতে চায় ওরা।

বাংলোয় পৌঁছুতে পৌঁছুতে ন'টা বেজে যায়। এত রাতে টাঙ্গা বা সাইকেল রিক্‌শা পাওয়া যায় নি। হেঁটেই আসতে হয়েছে সবাইকে।

সন্ধের পর মাত্র অল্পক্ষণ নমকপুরা জেগে থাকে। তারপর গভীর ঘুমের আরকে ডুবে যায়।

এখন, এই রাত ন'টায় নমকপুরা টাউন যেন পুরোপুরি এক নিষুতিপুর। বেশির ভাগ বাড়িঘরের আলো নিভে গেছে। রাস্তায় ক্বচিৎ দু-একটা গৈয়া গাড়ি বা মানুষ প্রায় ঘুমোতে ঘুমোতে এগিয়ে যাচ্ছে।

পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় একটা আলোও জ্বলছে না। চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার। কেয়ার-টেকার থেকে শুরু করে বেয়াবা মালী ঝাড়ুদার, সবাই নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে।

অনেক ডাকাডাকি এবং লোহার গেটে ধাক্কাধাক্কি করে আর্মড গার্ডটা কেয়ার-টেকার মালীটালীদের ঘুম ভাঙায়। ভেতর থেকে বিরক্ত জড়ানো গলা ভেসে আসে, 'কৌন রে, আধা রাতমে হল্লা মচাতা কৌন?'

আর্মড গার্ড বলে, 'বাহার আকে দেখো—কৌন। তুরন্ত আ—'

কিছুক্ষণ পর বারান্দা এবং বাগানের আলো জ্বলে ওঠে। দু-তিনটে লোক এলোমেলো পায়ে গেটেব কাছে এসে একজন আর্মড গার্ডের সঙ্গে এতগুলো লোককে দেখে হকচকিযে যায়।

সবার আগে যে গোলগাল মধ্যবয়সী লোকটি রয়েছে সে এই বাংলোর কেয়ার-টেকার। নাম জগন্নাথ সিং। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার, এত রাতে—' কথাটা শেষ না করে থেমে যায়।

আর্মড গার্ড বলে, 'আগে দরজা তো খুলুন। তারপর বলছি—'

গেটটা ভেতর থেকে তালাবন্ধ। মালীকে দিয়ে চাবি আনিয়ে তালাটা খুলে ফেলে জগন্নাথ। অর্জুনেরা ভেতরে ঢুকে যায়।

আর্মড গার্ড মহেশ্বরের চিরকুটটা জগন্নাথকে দিয়ে বলে, 'এস. ডি ও সাহেব এদের থাকার ব্যওস্থা কবতে বলেছেন।' সে অর্জুন এবং কমলাদের দেখিয়ে দেয়।

এস.ডি.ও'র নাম শুনে মুহূর্তে ঘুম ছুটে যায় জগন্নাথের। শশব্যস্তে চিরকুটে একবাব চোখ বুলিয়ে অসীম কৌতূহলে অর্জুনদের দিকে তাকায় সে। বলে, 'হাঁ হাঁ, জরুর। এখনই সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।' বিজয় এবং সুরেশকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস কবে, 'এঁরা?'

আর্মড গার্ড জানায়, সুরেশরা অর্জুনদেব বন্ধু। ওদেব থাকার ব্যবস্থা হযে গেলেই সুরেশরা চলে যাবে।

'আইয়ে—'

সবাই জগন্নাথের সঙ্গে বাংলোর দিকে এগিয়ে যায়।

বিজয় বলে, 'ওদের জন্যে একটা ভাল কামবা দেবেন।'

চলতে চলতে জগন্নাথের চোখ বার বার অর্জুন এবং কমলাব ওপব এসে পড়ছিল। সে বলে,

'এখানকার সব কামরাই ভাল। তিনটে খালি আছে। দেখে যেটা আপনাদের পছন্দ হবে সেটাই পাবেন।'
বিজয় আর কিছু বলে না।
সুরেশ বলে, 'ওরা খেয়ে আসে নি। খাবার টাবার কিছু পাওয়া যাবে?'
'বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হয় না। তবে এস.ডি.ও সাহেব যখন পাঠিয়েছেন কুককে দিয়ে পুরি ভাজি করিয়ে দেব, গেস্টদের নিশ্চয়ই ভুখা রাত কাটাতে হবে না।' বলে অর্জুনদের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে জগন্নাথ।
বাংলোয় এসে তিনখানা খালি ঘরই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হয়। জগন্নাথ যা বলেছিল তা-ই। ঘরগুলো একই মাপের। আরামের দিক থেকেও হেরফের কিছু নেই।
শেষ পর্যন্ত পুব দিকের শেষ ঘরটা বেছে নেওয়া হয়। বিজয় অর্জুনদের বলে, 'অনেক ঝঞ্ঝাট গেছে। তোমরা রেস্ট নাও। আশা করি কেয়ার-টেকার সাহেব তাড়াতাড়িই তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়। আমরা চলি।'
জগন্নাথ বলে, 'একটু বসে যান। কুককে চা করতে বলি।'
'না না, এত রাতে চায়ের ঝামেলা করতে হবে না। অর্জুন আর কমলা তো রইলই। আমি রোজ একবার আসব। তখন চা খাওয়াবেন।'
জগন্নাথ বলে, 'ঠিক আছে।'
এরপর বিজয় সুরেশ এবং আর্মড গার্ডটি চলে যায়। বিজয় তার ভাড়া বাড়িতে ফিরবে। সুরেশ শহরের আর এক মাথায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের গেস্ট হাউসে উঠেছে। সে সেখানে যাবে। আর আর্মড গার্ডটি যাবে এস. ডি. ও'র বাংলোয়।
জগন্নাথও অর্জুনদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কুককে এখন কিচেনে পাঠাতে হবে।
সবাই চলে যাওয়ার পর সোফায় বসে পড়ে অর্জুন এবং কমলা। সমস্ত দিন শরীর এবং মনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। স্নায়ু টান টান করে সেই সকাল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছিল তাদের। অনিশ্চয়তা উত্তেজনা এবং সংশয়ের প্রচণ্ড চাপ আপাতত অনেকটাই কেটে গেছে। ফলে কষে-বাঁধা স্নায়ুগুলো হঠাৎ আলগা হয়ে যাচ্ছে যেন। ভীষণ অবসাদ বোধ করে তারা।
আজ ক'দিন ধরে গরমও পড়েছে খুব। এত রাতেও উত্তপ্ত ঝড়ো বাতাস বয়ে যাচ্ছে। চারপাশের গাছপালার মাথায় ধাক্কা খেয়ে আওয়াজ হচ্ছে সাঁই সাঁই।
ঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায়, বাইরের বাগানে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি উড়ছে। অন্ধকারে কোনো একটা গাছ থেকে কামার পাখির কর্কশ চিৎকার ভেসে আসে। চরাচর জুড়ে ঝিঁঝিদেব শোকসভা বসে গেছে যেন। চারপাশে তাদের একটানা ক্লান্তিহীন বিলাপ বিষাদ ছড়িয়ে চলেছে।
একসময় কমলা বলে, 'চান না করলে ঘুমোতে পারব না। সারা গা ধুলোয় আর ঘামে চটচট করছে।' হঠাৎ কী মনে হতে একটু হতাশভাবেই আবার বলে ওঠে, 'এই যা, জামাকাপড় তো কিছুই আনা হয়নি। চান করে কী পরব?'
এস. ডি. ও'র সঙ্গে কথাবার্তা বলে একেবারে খালি হাত-পায়ে এই পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় চলে এসেছিল অর্জুনরা। তাদের জিনিসপত্র সবই পড়ে আছে চার্চে, রেভারেন্ড টিরকের বাংলোয়।
অর্জুন বলে, 'আজ আর কাপড়-টাপড় বদলানো যাবে না।'
কমলা বলে, 'এই নোংরা চিটচিটে শাড়ি জামা পরে থাকব?'
অর্জুন আস্তে মাথা নাড়ে, 'তা ছাড়া উপায় কী?'
'কিন্তু চান করার পর গা-মাথা মুছব কী করে? গামছা কি তোয়ালে পাব কোথায়?'
কোনো দিন এ জাতীয় বাংলোয়, এত আরামের উপকরণের মধ্যে কাটায়নি অর্জুন বা কমলা। স্নান করার জন্য বাথরুমে সাবান থেকে শুরু করে তোয়ালে শ্যাম্পু ইত্যাদি যে মজুত থাকে তা জানা ছিল না।
অর্জুন বলে, 'কেয়ার-টেকার এলে চেয়ে নেব।'
কমলা বলে, 'আমার চোখ-মুখ জ্বালা করছে। এখন একটু জলের ঝাপটা দিয়ে আসি। পরে

তোয়ালে টোয়ালে পাওয়া গেলে চান করব।'

কমলা বাথরুমে ঢুকে সুইচ টিপে জোরাল আলো জ্বালতেই একধারে তোয়ালে সাবান-টাবান দেখে অবাক এবং খুশি হয়ে যায়। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অর্জুনকে বলে, 'এখানে সব কিছু আছে। কেয়ার-টেকারকে কিছু বলতে হবে না।' তারপরেই দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেয়।

ঘণ্টাখানেক বাদে জগন্নাথ এবং একটা অল্পবয়সী বেয়ারা এই কামরায় এসে ঢোকে। বেয়ারার হাতে মস্ত অ্যালুমিনিয়ামের ট্রে। সেটায় নানা রকমের প্লেটে গরম চাপাটি, ডাল, দু রকমের তরকারি, পাঁপড়, লেবু, কাঁচা লঙ্কা, জলের গেলাস ইত্যাদি সাজানো।

স্নান করে কমলা এবং অর্জুন সোফায় বসে আজকের সমস্ত দিনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করছিল। জগন্নাথদের দেখে অর্জুন বলে, 'আসুন—'

জগন্নাথ বেয়ারাকে অর্জুনদের সামনের সেন্টার টেবল দেখিয়ে বলে, 'এখানে খানা দিয়ে তুই চলে যা। নজদিগ থাকিস, ডাকলেই তুরন্ত চলে আসবি।'

'জি—' বেয়ারা খাবার দিয়ে চলে যায়।

জগন্নাথ অর্জুনদের দিকে ফিরে বলে, 'খেয়ে নিন। আমি আপনাদের কাছে বসছি।'

বিব্রতভাবে অর্জুন বলে, 'আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আচানক চলে এসে অনেক জ্বালাতন করেছি। দয়া করে আপনি শুতে চলে যান। আমাদের আর কিছু দরকার নেই।'

'তাই কখনও হয়। আপনারা আমার গেস্ট, তার ওপর খোদ এস. ডি. ও সাহেব পাঠিয়েছেন।' বলতে বলতে একটা সোফায় বসে পড়ে জগন্নাথ।

এত খাতিরদারি যে এস. ডি. ও মহেশ্বরপ্রসাদের কারণে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না অর্জুন বা কমলার। বোঝা যায়, তাদের আপ্যায়নের ব্যাপারে কোনোরকম ত্রুটি ঘটতে দেবে না জগন্নাথ। হাজার অনুরোধ করলেও এখান থেকে তাকে এখন নড়ানো যাবে না।

এভাবে খাতির করার জন্য কেউ ঘাড়ের ওপর বসে থাকলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করার কথা নয়। তাছাড়া এতে অভ্যস্তও নয় অর্জুনরা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে তারা চুপচাপ খেতে থাকে।

অর্জুনদের মনোভাব বুঝতে পেরেছিল জগন্নাথ। আবহাওয়াটাকে সহজ করার জন্য সে একতরফা বকে যায়।

'আপনাদের কথা অনেক শুনেছি,' বা 'এই ছোটামোটা টাউনে আপনারা একেবারে রেভোলিউশন ঘটিয়ে দিয়েছেন,' বা 'আমার বহুত সৌভাগ যে আপনাদের মতো মেহমান এখানে পেলাম' বা 'ইন্ডিয়াতে আপনারা একটা গ্রেট একজাম্পল সেট করে দিলেন,' কিংবা 'কত বছর কান্ট্রি স্বাধীন হয়েছে, লেকেন প্রগতি উগতি কিছই হচ্ছিল না। সোসাইটি সেই পুরানা কুয়ার মধ্যে মুখ গুঁজে ছিল। আপনারা সেখানে নয়া স্রোত বইয়ে দিয়েছেন।' ইত্যাদি।

জগন্নাথের কথা শুনতে শুনতে অর্জুনের মনে হচ্ছিল, লোকটা খুবই সংস্কারমুক্ত, এতদিনে একটা ভাল আশ্রয় পাওয়া গেছে। ক্রমশ অস্বাচ্ছন্দ্য কেটে আসতে থাকে অর্জুনদের।

জগন্নাথ একসময় বলে, 'কে যেন বলেছিল, আপনাদের নিয়ে খুব গোলমাল হয়েছে।'

অর্জুন বলে, 'হাঁ। বুঝতেই তো পারেন।'

'একেবারে ঘাবড়াবেন না। রেভোলিউশন ঘটালে প্রথম প্রথম একটু ঝঞ্ঝাট হয়। দু-চার দিন, বড়জোর দু-এক সাল। তারপর দেখবেন সবাই আপনাদের মেনে নিয়েছে। মাঝখানের সময়টাই যা কিছু কষ্ট।'

আধফোটা গলায় কী যেন উত্তর দেয় অর্জুন, বোঝা যায় না।

একটু চুপচাপ।

তারপর জগন্নাথ বলে, 'আজ রাতে আর বিরক্ত করব না। কাল রেজিস্টার বুকটা এনে আপনাব সিগনেচার নিয়ে যাব।'

বেশ অবাক হয়েই জগন্নাথের দিকে তাকায় অর্জুন। জিজ্ঞেস করে, 'কিসের সিগনেচার?'

জগন্নাথ বুঝিয়ে দেয়, এই বাংলোতে কোত্থেকে কারা আসছে, ক'দিন কী উদ্দেশ্যে থাকছে তার

রেকর্ড রাখা হয়। কেননা বাজে লোক এসে যদি কোনোরকম দুষ্কর্ম করে ফেলে, পরে তাদের ধরার জন্য এই রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে খুঁটিনাটি সব লিখে নিয়ে তার তলায় গেস্টদের সই করিয়ে নেওয়া হয়।

অর্জুন বলে, 'ও আচ্ছা—'

কথা বলতে বলতে অর্জুনদের খাওয়ার দিকে নজর রাখছিল জগন্নাথ। বলে, 'আর দু'খানা পুরি দিয়ে যাক।'

অর্জুন এবং কমলা একসঙ্গে জানায়, তাদের পেট ভরে গেছে, আর কিছু দরকার নেই।

'ঠিক তো?'

'হাঁ হাঁ, ঠিক।'

খাওয়া হয়ে গেলে বেয়ারাকে প্লেট গেলাস ইত্যাদি তুলে নিয়ে যেতে বলে জগন্নাথ। বেয়ারা এঁটো বাসন ট্রে-তে তুলে টেবল পরিষ্কার করে চলে যায়।

জগন্নাথ সোফা থেকে উঠতে উঠতে বলে, 'আজ চলি। কাল আবার দেখা হবে।'

কেয়ার-টেকার লোকটির সহৃদয়তা সৌজন্য এবং মধুর ব্যবহার খুব ভাল লেগে যায় অর্জুনদের। আন্তরিকভাবেই সে বলে, 'হাঁ, নিশ্চয়ই। এখানে আসার আগে খুব ভয় হচ্ছিল, না জানি কী ব্যবহার পাব। আপনাকে দেখে খুব ভরসা পাচ্ছি।'

জগন্নাথ বলে, 'চিন্তা নেহী করনা। আমার দিক থেকে যতটা সম্ভব প্রোটেকশান পাবেন।'

অর্জুন আর কিছু বলে না। গভীর কৃতজ্ঞতায় জগন্নাথের দুই হাত জড়িয়ে ধরে।

একটু পর বিদায় নিয়ে চলে যায় জগন্নাথ। তারপর আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে কমলাকে বলে, 'অনেক রাত হল। চল, শুয়ে পড়া যাক। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

জানালার ধার ঘেঁষে ডবল-বেড নিচু খাটে ধবধবে বিছানা। পায়ের দিকে মশারি এবং গায়ে দেওয়ার পাতলা চাদর রয়েছে।

কমলা দ্রুত খাটের ছত্রিতে মশারি খাটিয়ে চারপাশে ডানলোপিলোর গদির তলায় ভাল করে গুঁজে দেয়। তারপর দু'জনে বিছানায় ঢুকে পাশাপাশি শুয়ে পড়ে।

অর্জুন হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপতেই ঘরটা অন্ধকারে ডুবে যায়। মাথার দিকের জোড়া জানালার পাল্লা দুটো খোলা। তার ভেতর দিয়ে আকাশের অনেকখানি চোখে পড়ে। তারার বুটি বসানো অন্ধকারের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ এক কোণে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। সেটা থেকে যে আলোটুকু চুঁইয়ে চুঁইয়ে চরাচরের ওপর নেমে আসছে তাতে কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়। যতদূর চোখ যায়, গাছপালা শস্যক্ষেত্র—সবই ঝাপসা এবং রহস্যময়।

এখন রীতিমত গরম পড়ে গেছে। তবু মধ্যরাতে এই অঞ্চলে অল্প অল্প কুয়াশা পড়ে। মিহি সিল্কের মতো হিম দূরে আবছা একটা পোঁচ টেনে দিয়েছে।

অর্জুন ভেবেছিল শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। জানালার বাইরে তাকিয়ে এই ক'দিনের যাবতীয় ঘটনার কথাই বুঝিবা ভাবছিল সে। হঠাৎ একটি কোমল হাত তার কাঁধে এসে পড়ে। খুব নরম গলায় কমলা বলে, 'জেগে আছ?'

'হাঁ।' কমলার হাতটা জড়িয়ে ধরে অর্জুন বলে।

কমলা বলে, 'আমার জন্যে তোমার এত কষ্ট—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই অর্জুন বলে ওঠে, 'না না, কোনো কষ্ট নেই।' প্রগাঢ় আবেগে বুকের ভেতর কমলাকে টেনে নিয়ে আসে অর্জুন। একটু পর পাতলা উষ্ণ উন্মুখ দু'টি ঠোঁট তার মুখের ভেতর যেন গলে যেতে থাকে।

তের

পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় অর্জুনদের যখন ঘুম ভাঙল তখনও রোদ ওঠেনি। দূরে ফসলের মাঠগুলোর ওপর এবং গাছপালার মাথায় কুয়াশার আবছা একটি রেখা আটকে আছে।

বাংলোর মানুষজন কেউ উঠেছে বলে মনে হয় না। তবে সামনের বাগানে পাখিদের ঘুম অনেক আগেই ভেঙে গেছে। তারা এখন খাদ্যের খোঁজে দূর দিগন্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে ঢুকে যায় অর্জুন। দ্রুত মুখটুখ ধুয়ে ফিরে এসে কমলাকে বলে, 'আমি চার্চ থেকে স্যুটকেস-টুটকেসগুলো নিয়ে আসি।'

দু'দিনের বাসি ময়লা জামাকাপড় তাদের পরনে। ওগুলো আজ না ছাড়লেই নয়। ভীষণ গা ঘিন ঘিন করছে।

কমলা বলে, 'তাড়াতাড়ি চলে এস।'

মাথা হেলিয়ে বেরিয়ে যায় অর্জুন। বাইরের টানা বারান্দায় আসতে চোখে পড়ে সবগুলো কামরাই বন্ধ। শুধু বাগানে মালীটা লম্বা হাতাওলা ঢাউস কাঁচি দিয়ে গাছের পুরনো ডালপালা আর পোকায়-কাটা মরা পাতা ছেঁটে দিচ্ছে।

অর্জুন সিঁড়ি দিয়ে নিচের রাস্তায় নেমে আসে। দূর থেকে সে দেখতে পায়, গেটের তালা ভেতর থেকে বন্ধ। কাল রাত্তিরে লক্ষ করেছিল গেটের চাবি মালীর হেফাজতে থাকে।

এত ভোরে অর্জুনকে দেখে একটু অবাকই হয়ে যায় মালী। বুঝতে পারে কোনো প্রয়োজনে সে বাংলোর বাইরে যেতে চায়। মালী জানে, এস. ডি. ও অর্জুনদের এখানে পাঠিয়েছেন। নিজের চোখে কেয়ার-টেকার জগন্নাথ সিংকে কাল রাতে ওদের যথেষ্ট আদর-যত্ন করতে দেখেছে সে। কাজেই এই সরকারি মেহমানকে তারও খাতিরদারি করা উচিত। শশব্যস্তে মালী কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'তালা খুলে দেব সাব?'

অর্জুন বলে, 'হাঁ।'

দৌড়ে চাবির থোকা নিয়ে এসে গেট খুলে দেয় মালী। বাইরের রাস্তায় চলে আসে অর্জুন।

এই ভোরবেলায় রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। গাড়িঘোড়াও কিছু চোখে পড়ছে না। নমকপুরা টাউন ঘুমের ভেতর এখনও ডুবে আছে।

চার্চ এখান থেকে অনেকটা দূরে। অর্জুন ভেবেছিল, রিক্‌শা বা টাঙ্গা নিয়ে সেখানে চলে যাবে কিন্তু এখন হাঁটা ছাড়া উপায় নেই।

অর্জুন যখন চার্চে পৌঁছয়, বেশ রোদ উঠে গেছে।

রেভারেন্ড টিরকেকে তাঁর ছোট বাংলোটিতেই পাওয়া যায়। দু'দিনের বাসি ডাক এডিশনের খবরের কাগজ পড়ছিলেন। অর্জুনকে দেখে খুব খুশি হলেন। তাড়াতাড়ি কাগজটা ভাঁজ করে টেবলে রেখে বলেন, 'বসো, বসো—'

অর্জুন তাঁর মুখোমুখি বসে পড়ে।

গলার স্বর উঁচুতে তুলে কাজের মেয়ে মঙ্গলাকে দু কাপ কফি দিয়ে যেতে বলেন রেভারেন্ড টিরকে। তারপর ফের অর্জুনের দিকে তাকান, 'আমি তোমাদের সব খবর পেয়েছি। কাল রাত্তিরে একটা জরুরি কাজে আটকে গেলাম, তাই আর পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় যেতে পারিনি। আজ বিকেলে একবার যাব।'

অর্জুন বলে, 'আসবেন।'

একটু চিন্তা করে রেভারেন্ড টিরকে জিজ্ঞেস করেন, 'বাংলোর লোকজনেরা তোমাকে কি রকম রিসিভ করল?'

'ভাল, খুব ভাল।'

'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এ ক'দিন তোমাদের ওপর দিয়ে কী ধকলটা না গেল! এগুলো সিম্পল টরচার।'

অর্জুন উত্তর দেয় না।

রেভারেন্ড টিরকে এবার বলেন, 'গভর্নমেন্ট থেকে যখন তোমাদের শেলটার দিয়েছে, আর ভয় নেই। আমার মনে হয়, এখন তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

অর্জুন এবারও কিছু বলে না।

রেভারেন্ড টিরকে থামেন নি, তিনি সমানে বলে যান, 'শেষ পর্যন্ত তোমরা যে জিতলে সেটা সাহসের জন্য। এই ফাইটিং স্পিরিটটা বজায় রাখা দরকার।' একটু থেমে আবার বলেন, 'বেশির ভাগ মানুষেরই মেরুদণ্ডের জোর থাকে না। খানিকটা লড়াই করার পর ভয় পেয়ে সারেন্ডার করে। যাক, অফিসে যাচ্ছ তো?'

অর্জুন বলে, 'হাঁ, যাচ্ছি।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে, সুটকেশ বাস্কেট ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অর্জুন। ফেরার সময় অবশ্য হেঁটে যেতে হয় না। রিক্শা টাঙ্গা ঝাঁকে ঝাঁকে রাস্তায় ছোটাছুটি করছে। একটা টাঙ্গা ডেকে সে উঠে পড়ে।

পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় ফিরে অর্জুন দেখতে পায়, এখানকার সবাই জেগে উঠেছে। মালীটা বাগানে সকালে গাছের মরা পাতা আর ডাল ছাঁটছিল, এখন মাটি থেকে গোড়াসুদ্ধু আগাছা তুলে ফেলছে। লোকটা আর যাই হোক, ফাঁকিবাজ নয়।

অর্জুনরা আসার আগে তিনটে ঘরে গেস্ট ছিল। কাল রাতে তাদের চোখে পড়েছে, কামরা বন্ধ করে গেস্টরা ঘুমোচ্ছে। আজ অবশ্য তাদের ঘরগুলো খোলা, তবে লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয় সবাই ভেতরে আছে, শুধু তাদের দরজার পর্দাগুলো দমকা হাওয়ায় উড়ছে।

আর দেখা গেল ঝাড়ুদারনী এবং কাল রাতের সেই বেয়ারাটাকে। ঝাড়ুদারনী লম্বা ঝাঁটা দিয়ে কমপাউন্ডের ভেতরকার রাস্তা সাফ করছে আর বেয়ারাটা ব্যস্তভাবে কিচেন থেকে ট্রে-তে খাবার-দাবার এবং চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে গেস্টদের কামরায় কামরায় ছোটাছুটি করছে। এ ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না।

টাঙ্গাওলাকে ভাড়া মিটিয়ে স্যুটকেস আর বাস্কেট নিয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে চলে আসে অর্জুন। বাগানের ভেতরকার রাস্তা দিয়ে সে যখন বাংলোর দিকে যাচ্ছে, আগাছা বাছা স্থগিত রেখে সসম্ভ্রমে মালীটা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে মুখে কিছু বলে না। ঝাড়ুদারনী এবং বেয়ারাটাও কয়েক পলক তাকে লক্ষ করে।

অর্জুন মালী বা ঝাড়ুদারনীর দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসে শুধু। একসময় সিঁড়ি বেয়ে বাংলোয় উঠতেই দেখতে পায়, দূরে কেয়ার-টেকার জগন্নাথ তার নিজস্ব অফিসটিতে বসে টেবলের ওপর ঝুঁকে কী সব লেখালিখি করছে।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায় জগন্নাথ। পরক্ষণে কাগজপত্র পেপার-ওয়েটের তলায় চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসে।

জগন্নাথ বলে, 'আপনার কামরায় দু'বার গিয়েছিলাম। শুনলাম খুব সুবেহ্ বেরিয়ে গেছেন।' তারপর হাতের স্যুটকেস-টুটকেস লক্ষ করতে করতে জিজ্ঞেস করে, 'মালপত্তর আনতে গিয়েছিলেন বুঝি?'

'হাঁ।' অর্জুন আস্তে মাথা নাড়ে।

'আপনার শ্রীমতীজিকে ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। উনি বললেন, আপনি এলে খাবেন।'

অর্জুন উত্তর দিল না।

জগন্নাথ এবার বলে, 'আপনার কামরায় যান। ব্রেকফাস্টের ব্যওস্থা করছি।'

অর্জুন মাথা সামান্য হেলিয়ে তার ঘরে চলে যায়।

কমলা খাটের ওপর চুপচাপ বসে ছিল। অর্জুনকে দেখে বলে, 'এত দেরি হল তোমার? একা একা আমার ভীষণ ভয় করছিল।'

চার্চে যাওয়ার সময় রিক্শা বা টাঙ্গা না পাওয়ায় হেঁটে যেতে হয়েছে, তা ছাড়া রেভারেন্ড টিরকের সঙ্গেও কথা বলতে হয়েছে খানিকক্ষণ, ইত্যাদি নানা কারণে যে দেরি হয়েছে তা জানিয়ে দেয় অর্জুন।

তারপর বলে, 'তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলে নাও। কেয়াব-টেকার বলল, এখনই খাবার পাঠিয়ে দেবে।'

সুটকেশ খুলে পরিষ্কার শাড়ি এবং ব্লাউজ নিয়ে প্রথমে কমলা বাথরুমে চলে যায়। সে বেরিয়ে এলে ফর্সা পাজামা আর হাফ শার্ট নিয়ে অর্জুন ঢোকে।

বাসি চটকানো পোশাক পালটাতে পেরে বেশ আরাম বোধ করে দু'জনে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জগন্নাথ কাল রাতের সেই বেয়ারাটাকে সঙ্গে নিয়ে অর্জুনদের কামরায় আসে। বেয়ারার হাতের ট্রে-তে চা টোস্ট কলা জেলি এবং চা। জগন্নাথের হাতে একটা ঢাউস বাঁধানো খাতা।

জগন্নাথের কথামতো ট্রে-টা সেন্টার টেবলে নামিয়ে রেখে চলে যায় বেয়ারাটা। জগন্নাথ কিন্তু যায় না। সে একটা সোফায় বসে খাতা খুলতে খুলতে বলে, 'আপনাবা খাওয়া শুরু করুন। আমি অফিসিয়াল কাজটা চুকিয়ে ফেলি। আপনাদের পুরা নাম আর ঠিকানা বলুন—'

কাল রাতেই জগন্নাথের সহৃদয় ব্যবহারে আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল অর্জুনদের। খেতে খেতে তার কথার উত্তর দিতে থাকে অর্জুনবা।

নামধাম ইত্যাদি টুকে নেওযাব পব জগন্নাথ জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা এখানে ক'দিন থাকবেন?'

প্রশ্নটা ঠিকমতো বুঝতে না পেবে জগন্নাথের মুখেব দিকে তাকায় অর্জুন। বলে, 'ক'দিন থাকব মানে?'

জগন্নাথ জানায়, এই পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় একটানা সাত দিনের বেশি থাকার নিয়ম নেই। অর্জুনরা ইচ্ছা করলে সাত দিনই থাকতে পাবে।

অর্জুন হকচকিয়ে যায়। তার ওপাশে খাওয়া থামিয়ে চুপচাপ বসে আছে কমলা। সে বেশ ভয় পেয়ে গেছে। তাদের ধারণা ছিল, এই পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় তারা স্থায়ীভাবেই থাকতে পারবে এবং সরকাবি তরফে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

অর্জুন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সাত দিনের বেশি কি কোনোভাবেই থাকা যায় না?'

জগন্নাথ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, 'না, সরকারি কানুন ভাঙাব ক্ষমতা আমাব নেই। ভাঙলে নৌকরি চলে যাবে।'

'সাতদিন পর তা হলে আমরা কোথায় যাব?'

এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করে জানা নেই জগন্নাথের। এই বিপন্ন নবীন স্বামী-স্ত্রীর জন্য তার যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। সাধ্যমতো সে তাদের সাহায্যও করতে চায় কিন্তু সরকারি নিয়ম-কানুনের বাইবে পা ফেলার সাহস নেই তার। কে কোত্থেকে রিপোর্ট করে দেবে, তাব ফল তার পক্ষে আদৌ সুখকব হবে না। জগন্নাথ ঘোর সংসারী মানুষ। দেশে স্ত্রী ছেলেমেয়ে রয়েছে। চাকরি চলে গেলে সবাইকে না খেয়ে মরতে হবে। নিজের দিকটা পুরোপুরি বজায় রেখে এবং কোনোরকম ঝুঁকি না নিয়ে অন্যের জন্য যদি কিছু করা যায়, জগন্নাথের তাতে আপত্তি নেই। তার উদাবতা বা মহানুভবতার সীমারেখা ঠিক ওই পর্যন্ত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে জগন্নাথ। তারপর বলে, 'আমার একটা পরামর্শ যদি নেন তো বলি—'

গভীর আগ্রহে অর্জুন বলে, 'নিশ্চয়ই নেব। আপনি বলুন—'

'হাতে তো কয়েক দিন সময় আছে। আপনারা এর ভেতব বাড়ি খুঁজতে থাকুন। একটু বেশি ভাড়া দিলে ঠিক পেয়ে যাবেন।'

অর্জুন উত্তর দেয় না, শুধু হতাশভাবে মাথা নাড়ে।

জগন্নাথ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী হল?'

অর্জুন বলে, 'এখানে আসাব আগে অনেক খোঁজ করেছি। কেউ আমাদের বাড়িভাড়া দিতে চায় না।'

জগন্নাথের বিস্ময় বেড়েই যায়। সামনেব দিকে অনেকটা ঝুঁকে সে বলে, 'পয়সা দিয়ে থাকবেন, তবু বাড়ি দেবে না?'

'না।'

'বহুত তাজ্জবকি বাত!'

অর্জুন বলে, 'তাজ্জবের কথা নয়। আপনি খুব সম্ভব এখানে নতুন এসেছেন, তাই না?'

জগন্নাথ বলে, 'হাঁ। কেন বলুন তো?'

'তাই এই শহরের হালচাল জানেন না। দোসাদদের মেয়ের ছোঁয়া লাগলে তাদের বাড়ি অশুধ্ হয়ে যাবে যে।'

'সমঝ গিয়া।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। অর্জুনদের সমস্যার গভীরতা ভাল করে আন্দাজ করতে করতে জগন্নাথ এবার বলে, 'ভেরি ডিফিকাল্ট কেস। সারা টাউনের আপার কাস্ট পপুলেশন হোস্টাইল হয়ে গেলে কী করে আপনাদের চলবে, ভাবতে পারছি না।' একটু থেমে ফের বলে, 'তবু হেরে গেলে চলবে না। একটা কিছু ব্যওস্থা করতেই হবে।'

অর্জুন চুপ করে থাকে। বলার মতো কিছু নেই তার।

হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় জগন্নাথের চোখমুখ ঝকমকিয়ে ওঠে। দারুণ উৎসাহের গলায় সে বলে, 'দেখুন, সমস্যাটার একটা সলিউশান হতে পারে।'

অর্জুন উৎসুক চোখে তাকায়, 'কী?'

'এস. ডি. ও সাহেবকে বলে এখানে বেশিদিন থাকার অর্ডার বার করে নিন। আমার মনে হয় তিনি রাজি হবেন। অবশ্য—'

'কী?'

জগন্নাথ বলে, 'স্পেশাল কেস হিসেবে ব্যওস্থা করে দিলেও দু-এক মাসের বেশি আপনারা থাকতে পারবেন না। পার্মানেন্টলি থাকার জন্যে আপনাদের অন্য বাড়ি যোগাড় করতেই হবে।'

মস্তিষ্কের ভেতর দুশ্চিন্তার প্রবল চাপ অনুভব করতে থাকে অর্জুন। ঠিক বলেছে জগন্নাথ। চিরকাল সরকারি বাংলোয় থাকা যায় না। সেটা তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধানও নয়।

জগন্নাথ খাতা বন্ধ করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আচ্ছা, এখন চলি। আপনি কি আজ অফিসে যাবেন?'

অর্জুন বলে, 'হাঁ।'

দ্রুত হাত উলটে ঘড়ি দেখে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে জগন্নাথ, 'পৌনে ন'টা বাজে। আপনার জন্যে এখনই ডাল-ভাত-সবজি-উবজির বন্দোবস্ত করতে হয়। আপনি রেডি হয়ে নিন। ঠিক সাড়ে ন'টায় রসুই হয়ে যাবে।'

অর্জুন বলে, 'আমি কিন্তু শাকাহারী—'

জগন্নাথ জানায়, এখানে পবিত্র ভেজিটারিয়ান এবং নন-ভেজিটারিয়ান, দু'রকম ব্যবস্থাই আছে। অর্জুনের দুর্ভাবনার কারণ নেই। দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় সে। বলে, 'এস. ডি. ও সাহেবের সঙ্গে আজই দেখা করবেন।'

'করব।'

জগন্নাথ আর দাঁড়ায় না, লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যায়।

চোদ্দ

কাঁটায় কাঁটায় পৌনে দশটায় খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়ে অর্জুন। কমলা বাংলোর গেট পর্যন্ত তার সঙ্গে আসে। বলে, 'আমি একা থাকব। তাড়াতাড়ি চলে এস।'

অর্জুন বলে, 'তাড়াতাড়ি কী করে আসব? ছুটির পর এস. ডি. ও সাহেবের কাছে একবার যেতে হবে না?'

কথাটা মনে ছিল না কমলার। সে এবার বলে, 'তুমি একা যেও না। বিজয়জি আর সুরেশজিকে সঙ্গে নিয়ে যেও।'

বিজয় এবং সুরেশ দু'জনেই বেশ জবরদস্ত মানুষ, তারা দাপটের সঙ্গে কথা বলতে পারে। বিজয়রা গেলে তার সুবিধাই হবে। অর্জুন বলে, 'হাঁ. ওদের নিয়েই যাব। তুমি সাবধানে থাকবে। কেউ ডাকলেও দরজা খুলবে না। যা বলার জানালা দিয়ে বলবে।'

'আচ্ছা—'

অর্জুন গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে যায়। যতক্ষণ তাকে দেখা যায়, গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকে কমলা। তারপর সুরকির রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে বাংলোর দিকে এগিয়ে যায়।

দশটার তিন মিনিট আগেই অফিসে চলে আসে অর্জুন।

সেকশন অফিসার বিন্ধ্যাচলী তৈলাক্ত মসৃণ মুখ নিয়ে তার চেয়ারটিতে বসে আছে। প্রথম দিন থেকেই অর্জুন লক্ষ করেছে, বিন্ধ্যাচলী কামাই টামাই করে না, দশটায় অফিসে চলে আসে। দশ মিনিট আগে আসবে কিন্তু এক সেকেন্ডও লেট করবে না। এই একটা ব্যাপারে সে গভীর নিষ্ঠায় নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে।

বিন্ধ্যাচলী ছাড়া এখন পর্যন্ত সেকশনে আব কেউ আসে নি। এই ডিপার্টমেন্টের বেশির ভাগই ডাহা ফাঁকিবাজ এবং লেট-কামার।

এদিক সেদিক তাকিয়ে বিজয়কে কোথাও দেখতে পেল না অর্জুন। সে কিছুটা অসহায়ই বোধ করে। বিজয় কাছে থাকলে সে অনেকটা ভরসা পায়।

বিন্ধ্যাচলী প্রথমটা অর্জুনকে লক্ষ করে নি। নিত্যকর্ম অনুযায়ী নিজের টেবলের ড্রয়ার থেকে গঙ্গাজলের বোতল বার করে ছিপি খুলে খানিকটা হাতের তেলোতে ঢেলে নেয়, তারপর চারদিকে ছিটিয়ে ছিটিয়ে সব কিছু পবিত্র করতে থাকে। কঠোর ধর্মপালনের মতো এই শুদ্ধিকরণের কাজটা রোজ সে করবেই।

গঙ্গাজল ছিটোতে ছিটোতে হঠাৎ বিন্ধ্যাচলী অর্জুনকে দেখতে পায়। বলে, 'আবে দোসাদকা দামাদ, তুম আ গিয়া!'

তার বলার ধরনে এমন একটা বিদ্রূপ আর ঘৃণা মেশানো রয়েছে যে অর্জুন চমকে ওঠে। সে কী উত্তর দেবে,.ভেবে পায় না।

গঙ্গাজল ছিটানো হয়ে গিয়েছিল। বিন্ধ্যাচলী বোতলটা ফের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রুমালে হাত মুছতে মুছতে গলার স্বর পুরোপুরি বদলে দিয়ে বলে, 'তোমাকে একটা অনুরোধ করব। নারাজ হয়ো না।'

কণ্ঠস্বরের এই আকস্মিক পরিবর্তন অর্জুনকে অবাক করে দেয়। সে বলে, 'কী অনুরোধ?'

'আমাদের অফিস দশটায় শুরু। তুমি কিরপা করে সাড়ে দশটার আগে এস না। আধ ঘণ্টা পর এলে লেট মার্ক করব না। ওই টাইমটা তোমাকে গ্রেস দেওয়া হবে।' বলে পকেট থেকে তামাক এবং চুন বার করে হাতের চেটোতে ডলে ডলে খৈনি বানাতে থাকে বিন্ধ্যাচলী।

অর্জুন হকচকিয়ে যায়। এরকম বিস্ময়কর এবং উদ্ভট অনুরোধের কারণ সে বুঝতে পারে না। বিমূঢ়ের মতো বলে, 'দেরিতে আসব কেন? আধঘণ্টা গ্রেসই বা দেবেন কেন?'

একটা হাত তুলে বিন্ধ্যাচলী বলে, 'থাম থাম। সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি হচ্ছ সরকারি দামাদ। গভর্নমেন্টকা প্যারা লাল। তোমাকে থোড়া কুছ খাতিরদারি না করলে চলে! আর—'

'আর কী?' রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করে অর্জুন।

'দেখো ভাই, গুস্সা হয় না। দোসাদের দামাদের মুখ দেখে অফিসের কাজ শুরু করব, এতে গা ঘিন ঘিন করে, নিজেকে অশুধ্ লাগে। আধ ঘণ্টা পর এলে তার মধ্যে আরো অনেকে এসে যাবে। অফিসে ঢুকে পয়লাই তোমার মুখ দেখতে হবে না। এই আর কি।' খৈনি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। দাঁতেব ফাঁকে খানিকটা পুরে দিতেই বিন্ধ্যাচলীর মুখ লালায় ভরে যায়। জড়িত বগবগানো গলায় সে বলতে থাকে, 'আমি সিধাসাদা আদমী, সিধা বাত সিধা করেই বললাম।'

এরকম একটা কারণে বিন্ধ্যাচলী যে তাকে দেরিতে অফিসে আসার কথা বলতে পারে, অর্জুনের কাছে তা খুবই অভাবনীয়। সে বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থাকে শুধু।

বিন্ধ্যাচলী ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের দেওয়ালে পিচকিরির মতো পিচিক করে খানিকটা গাঢ় খয়েরি রঙের থুতু ছিটিয়ে আবার মুখ ফেরায়। অর্জুন লক্ষ করে ওপাশের দেওয়ালটা খৈনির দাগে কালচে হয়ে আছে। বোঝা যায়, দু-চারদিনে অমন রং ধরে নি, বহুকাল থুতু ছেটানোর কারণে দেওয়ালটার চেহারা ওরকম দাঁড়িয়ে গেছে। দেখতে দেখতে গা গুলিয়ে ওঠে তার।

বিন্ধ্যাচলী বলে, 'আজ যখন অফিসে এসে পয়লাই তোমার মুখ দেখলাম তখন আর কিছু করার নেই। তোমরা নাকি কাল কী ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছ!' বলে একটা চোখ ছোট করে, ঠোঁট কুঁচকে সোজা অর্জুনের চোখের দিকে তাকায় বিন্ধ্যাচলী।

অর্জুন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। কাল মরিয়া হয়ে তাকে যা করতে হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করতে আদৌ ইচ্ছে নেই তার। সে চুপ করে থাকে।

বিন্ধ্যাচলী টেবলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে বলে, 'তুমি না বললেও আমি কিন্তু সব শুনেছি। তোমার বাবুজি আর টৌলির লোকেরা বাড়ি থেকে ক'দিন আগে তোমাদের ভাগিয়ে দিয়েছে, তারপর বিজয়ের কাছে গিয়ে শেলটার নিয়েছিলে, লেকেন ওর বাড়িওলা টিকতে দেয়নি। তা দিলে কী হবে, তুমি মানুষ না, বিলকুল শের। এস. ডি. ও'র বাংলোর সামনে কাল পিকেট করে সরকারি বাংলোয় থাকার ব্যওস্থা করে নিয়েছ।' একটু দম নিয়ে ফের এভাবে শুরু করে, 'খেল দেখালে বটে, সম্রাট শাজাহানও তার ধরমপত্নীর জন্যে এতটা করতে পারেনি। পেয়ারকা নয়া তাজমহল!' বলে আবার ঠোঁট দুটো পিচকিরির মুখের মতো ছুঁচলো করে দেওয়ালে খৈনি মেশানো থুতু ছিটিয়ে দেয়।

অর্জুনের মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। সে কোনো উত্তর দেয় না।

বিন্ধ্যাচলী গলার ভেতর হুঁ হুঁ করে অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে দুলতে শুরু করে। বলে, 'আরে ভাই শরমাতা কিঁউ? লজ্জার কিছু নেই। এবার আমার একটা কথা ধ্যানসে শুনে নাও—'

বিন্ধ্যাচলীর দিক থেকে নতুন করে আক্রমণটা কিভাবে কোন দিক থেকে আসছে, বুঝতে না পেরে ভীত চোখে সে তাকিয়ে থাকে।

বিন্ধ্যাচলী বলে, 'পিকেটিং যখন আরম্ভ করেছ তখন বড় কাজের জন্যেই কব।'

নিজের অজান্তে ফস করে অর্জুনের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, 'কী কাজ?'

'ছ মাসের মধ্যে চুনাও আসছে, তাতে নেমে যাও। অচ্ছুতিয়াদের দামাদ হয়েছ। তুমি চুনাওতে নামলে ভুচ্চরের ছৌয়াগুলো জরুর তোমাকে ভোট দেবে। তুমি এম. এল. এ হবে, তারপর এম. পি। বলা যায় না, মিনিস্টারও হয়ে যেতে পার। এখন তো শিডিউল্ড কাস্ট আর মাইনোরিটিদেরই জমানা।'

এই সময় বিজয় আসে। বিন্ধ্যাচলী তোড়ে যে বক্তৃতা দিচ্ছিল, তার একটা বর্ণও শোনে নি সে। তবে অর্জুনের কাঁচুমাচু ভয়ার্ত মুখ দেখে কিছু আন্দাজ করে নেয়। জিজ্ঞেস করে, 'বিন্ধ্যাচলীজি লম্বাচওড়া স্পিচ দিচ্ছিলেন মনে হয়।'

বিন্ধ্যাচলী ঘাড় হেলিয়ে অর্জুনের সঙ্গে যা যা আলোচনা হয়েছে, মোটামুটি জানিয়ে দেয় এবং সামনের নির্বাচনে কনটেস্ট করার কথাটাও বলে। দোসাদদের জামাই হওয়ার দৌলতে অচ্ছুৎদের হানড্রেড পারসেন্ট ভোট যে অর্জুন পাবে, সে ব্যাপারে বিন্ধ্যাচলী গ্যারান্টি দিতে রাজি।

বিজয় বিন্ধ্যাচলীকে বলে, 'খুব ভাল পরামর্শ দিয়েছেন। অর্জুন এম. এল. এ কি এম. পি হলে কোনো শালে তার গায়ে একটা টোকা মারতে পারবে না। সৎ পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। ওকে তা হলে ইলেকশানে নামিয়ে দিই, কী বলেন?'

বিদ্রূপটা এভাবে ফিরে আসবে, ভাবতে পারেনি বিন্ধ্যাচলী। টেবল বাজানো এবং গা দোলানো বন্ধ হয়ে যায় তার। মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। কঠোর চোখে বিজয়কে লক্ষ করতে করতে বলে, 'তুমি ওকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে হিন্দু ধরমের ক্ষতি করছ।'

'আমি ক্ষতি করছি! বাঃ বাঃ—' দারুণ মজাদার ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে হাততালি দিতে থাকে বিজয়।

তার তালি বাজানো এবং বলার ভঙ্গিতে এমন ঝাঁঝ আর ব্যঙ্গ রয়েছে যে শরীরের সব রক্ত মাথায় চড়ে যায় বিন্ধ্যাচলীর। কর্কশ গলায় সে বলে, 'ইয়ে অফিস হ্যায়। খচরাগিরি করার জায়গা নয়। যাও,

আপনা কুর্সিতে বসে কাজ কর।'

বিজয় খেপে ওঠে, 'খচরাগিরি করছেন আপনি। অর্জুনকে তংগ করার রাইট আপনাকে কে দিয়েছে?'

কড়া ধমক দিয়ে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় বিন্ধ্যাচলী। বলে, 'নিজের নিজের জায়গায় যাও।'

'ঠিক হ্যায়।' অর্জুনকে সঙ্গে করে বিজয় সেকশনের শেষ প্রান্তে নিজেদের সিটে চলে যায়।

এর মধ্যে অন্যান্য এমপ্লয়ীরা আসতে শুরু করেছে। বাঁকা চোখে তারা অর্জুনকে লক্ষও করে। তবে একজনও তার সঙ্গে কথা বলে না। অর্জুন যে প্রায় যুদ্ধ করে পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় থাকাব ব্যবস্থা করে নিয়েছে তা জানতে এ শহরের কারুর বাকি নেই। স্বাভাবিকভাবেই অর্জুনের কলিগরা যে জানবে, সেটা তাদের মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যায়।

ডিপার্টমেন্টের সবাই ফাঁকিবাজ হলেও কিছু না কিছু কাজ করে থাকে। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই অর্জুনকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। অফিসে এসে সে শুধু বসে থাকে। বিজয়ের সঙ্গেই তার যা কিছু কথাবার্তা হয়, তারপর ছুটি হলে চলে যায়।

অর্জুন নিজের জায়গায় ফিরে এসে বলে, 'আজ সকালে আমাদের ওখানে তোমাকে আশা করেছিলাম। ভেবেছিলাম সুরেশজিকে নিয়ে তুমি আসবে।'

বিজয় জানায়, সকালে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলো থেকে সুরেশকে তুলে নিয়ে অর্জুনদের কাছে যাওয়ার কথা ভেবে রেখেছিল সে। কিন্তু হঠাৎ খবর পায় মান্ধাতা এবং তার দলবল বড় আকারে অর্জুনদের বিরুদ্ধে ঝামেলা পাকাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য বিজয় কয়েক জায়গায় গিয়ে বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিল। কাজেই এত দেরি হয়ে যায় যে অর্জুনদের কাছে যাওয়ার সময় পাওয়া যায়নি।

গভীর উৎকণ্ঠায় অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'সত্যিই ওরা কিছু করছে নাকি?'

'তেমন খবর পাইনি। তবে আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে।' বিজয় বলতে থাকে, 'সে যাক। বাংলোয় তোমাদের কেউ ডিসটার্ব করেনি তো?'

'না না, কেয়ার-টেকার লোকটি বেশ ভাল। আমাদের খুব যত্ন করছে।'

'অচ্ছুতের মেয়ে বিয়ে করেছ, সেটা কি সে জানে?'

'জানে। আমাদের সম্বন্ধে বেশ সিমপ্যাথি আছে।'

'গুড নিউজ। বিকেলে তোমার সঙ্গে তোমাদেব ওখানে যাব। সুরেশজিও মনে হয়, সোজা পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় চলে যাবেন।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

একসময় বিজয় একটা ফাইল দেখতে দেখতে অর্জুনকে বলে, 'সেকশন অফিসারের কাছ থেকে কাজ নিয়ে এস। চুপচাপ বসে থেকে মাসের শেষে মাইনে নিয়ে গেলে রেকর্ড খারাপ হয়ে যাবে। ওই শালাই ওপরে জানিয়ে দেবে তুমি অপদার্থ।'

অর্জুন আবার বিন্ধ্যাচলীর কাছে চলে আসে।

চোখে মুখে অসীম বিরক্তি ফুটিয়ে বিন্ধ্যাচলী জিজ্ঞেস করে, 'আবার কী হল?'

অর্জুন বলে, 'আমাকে কাজ দিন।'

জিভ কেটে জোরে জোরে মাথা নাড়ে বিন্ধ্যাচলী। তারপর বলে, 'তুমি হলে সরকারি দামাদ। কত তখলিফ করে সবে নৌকরি পেয়েছ। এত তাড়াহুড়োর কী আছে? ক'দিন জিবিয়ে নাও। তারপর কাজ করো। যাও, আপনা কুর্সিতে গিয়ে বসো।'

অর্থাৎ অর্জুনকে কাজ দিতে চায় না বিন্ধ্যাচলী। এর পেছনে হয়ত তার বিচিত্র মনস্তত্ত্ব কাজ করছে। চাকরি পেয়েছ, মাসের শেষে মাইনে পাবে, এ সবই ঠিক আছে। কিন্তু কাজের ভেতর তোমাকে কিছুতেই ঢুকতে দেওয়া হবে না। দোসাদদের মেয়েকে বিয়ে করার কাবণে সরকারি অফিসেও তোমাকে পুরোপুরি অচ্ছুৎ বানিয়ে রাখা হবে।

অর্জুন খুবই অপমানিত বোধ করে। ধীরে ধীরে ক্লান্ত পায়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে গা এলিয়ে বসে পড়ে।

বিজয় তাকে লক্ষ করছিল। ডান পাশে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হল?'

বিন্ধ্যাচলী যা যা বলেছে, সব বিজয়কে জানিয়ে দেয় অর্জুন।

শুনতে শুনতে মুখ শক্ত হয়ে ওঠে বিজয়ের, ভুরু কুঁচকে যায়। গম্ভীর গলায় সে বলে, 'ঠিক আছে, দেখা যাক দু-একদিন। তারপর কাজ না দিলে ওকে আমি ছাড়ব না।'

এই অফিসের কাজকর্মের ধবনটি খুবই ঢিলেঢালা। আড্ডা হইচই খৈনি-ডলা সিনেমা আর নানা ব্যাপারে চিৎকার, এ সবেই ডিউটি আওয়ার্সের বেশির ভাগ সময় কেটে যায়।

একটায় টিফিন।

সবাই যখন যে যার সিট থেকে উঠে পড়ছে সেই সময় বাইরে থেকে তুমুল হল্লার আওয়াজ ভেসে আসে। কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না, তবে বহু লোক একসঙ্গে যে চিৎকার করছে, এটা বোঝা যায়।

সেকশনের সবাই চমকে ওঠে। দু-একজন বলাবলি করে, 'কী হল? কারা শোর মচাচ্ছে?'

কয়েকজন বাইরে বেরিয়ে যায়, তাদেব সঙ্গে বিজয়ও যায়। নিজের চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকে অর্জুন।

কিছুক্ষণ বাদে একটা অল্প বয়সের টাইপিস্ট, নাম মনোহর ঊর্ধ্বশ্বাসে, দৌড়ুতে দৌড়ুতে ফিরে আসে। তার চোখেমুখে প্রবল উত্তেজনা এবং উল্লাসও।

সেকশনে ঢুকেই মনোহর চেঁচাতে থাকে, 'শুনা হ্যায়, কারা এসে শোর মচাচ্ছে?'

যারা টিফিনের সময় বাইরে যায়নি তারা মনোহরের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়ে। এমন কি যে বিন্ধ্যাচলী এই সময় খানিকটা ঘুমিযে নেয়, সে পর্যন্ত জরুরি দিবানিদ্রাটি স্থগিত রেখে নিজের গদিমোড়া চেয়ার থেকে উঠে আসে।

গোটা সেকশন প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করে, 'কারা হল্লা করছে? কারা?'

মনোহর বলে, 'নমকপুরার বামহনরা।'

'কী চাইছে তারা?'

সোজা অর্জুনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মনোহর বলে, 'অচ্ছুতিয়ার দামাদকে এই অফিস থেকে ভাগিয়ে দিতে হবে। এটা ওদের ডিমান্ড।'

বিশ জোড়া চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি অর্জুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার দিকে নজর রেখেই সমস্বরে সকলে জিজ্ঞেস করে, 'সচমুচ?'

'সচমুচ। নিজেরা গিয়ে আপনা আঁখোসে দেখে এস না।'

অর্জুন মারাত্মক ভয় পেয়ে যায়। তার হৃৎপিণ্ড এখন এত প্রচণ্ড গতিতে লাফাচ্ছে যে তার শব্দ পর্যন্ত যেন শুনতে পায় সে। নমকপুরার ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে আক্রমণটা এভাবে আসতে পারে, তার পক্ষে এ ছিল সম্পূর্ণ অভাবনীয়। অর্জুনের ধারণা অফিসে হানা দেওয়ার পেছনে একটি অত্যন্ত জোরাল এবং পাকা মস্তিষ্ক কাজ করছে। সেটা অবশ্যই মান্ধাতা শর্মার। লোকটা কোনোভাবেই তাকে নমকপুরায় টিকতে দেবে না। এই শহর থেকে উৎখাত করার জন্য নানা দিক থেকে চক্রান্ত করে চলেছে।

বেঁটেখাটো হট্টাকাট্টা চেহারার এক কেরানি, যার নাম চুনিলাল, জিভের ডগায় চুক চুক আওয়াজ করে অর্জুনের উদ্দেশে বলে, 'কা দুখকা বাত ! এত তখলিফ করে দোসাদদের দামাদ হলে, আর দামাদ হয়েই সরকারি নৌকরি, রুপাইয়া বাগালে, লেকেন বামহনগুলো কিরকম হারামী দেখ, তোমার পেছনে লেগেছে! শালেদের মতলব বহুৎ বুরা। এত্তে বড়ে রেভোলিউশান ঘটালে, লেকেন ওই বুরবকগুলো এর সম্মান দিতে জানে না।' বলে চোখ কুঁচকে জিভের ছুঁচলো ডগাটি বার করে অনেকক্ষণ চুক চুক আওয়াজ করে।

চুনিলাল লোকটা অতীব ধূর্ত, তার হাড়ের ভেতর পর্যন্ত শয়তানিতে ঠাসা। তার এই সব নকল সহানুভূতির কথাগুলোর ভেতর তীক্ষ্ণ হুল রয়েছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে জানে নমকপুরার

ব্রাহ্মণেরা তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলার জন্য অফিসে হানা দিয়েছে, এতে পুরোপুরি সায় রয়েছে চুনিলালের।

প্রবল ঘৃণায় ঠোঁট কুঁচকে বিন্ধ্যাচলী অর্জুনকে বলে, 'ছো ছো, অফিসের মান-সম্মান তোমার জন্যে আর রইল না।' বলতে বলতে চুনিলালের দিকে ফেরে, 'কত আদমী শোর মচাতে এসেছে?'

চুনিলাল বলে, 'লগভগ বিশ তিশ হোগা।'

এই সময় বিজয় ফিরে আসে। তাকে উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে। গজ গজ করতে করতে সে বলে, 'এ শালেরা কি মানুষ!'

বিন্ধ্যাচলী জিজ্ঞেস করে, 'কাদের কথা বলছ?'

'ওই যারা চেল্লাচ্ছে।' বিজয় গলার স্বর চড়িয়ে বলতে থাকে, 'একটা ছেলে অচ্ছুতের মেয়ে বিয়ে করেছে বলে টাউনের ব্রাহ্মণ সোসাইটি তাকে শেষ করে দিতে চাইছে! গিধের পাল।'

বিন্ধ্যাচলী খেপে ওঠে, 'গালি দিচ্ছ!'

'হাঁ, জরুর।'

'ব্রাহ্মণত্বের সত্যনাশ করে দেবে ওই ছোকরা—' অর্জুনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিন্ধ্যাচলী বলতে থাকে, 'ও যা ভাল বুঝেছে, করেছে। এখন ব্রাহ্মণরা তাদের জাতের পবিত্রতা রক্ষা জন্যে যা চাইছে, করতে দাও। আমাদের গণতন্ত্রে ফ্রিডম অফ স্পিচ রয়েছে না?'

'ফ্রিডম অফ স্পিচের কথা বলছেন? ভেরি গুড। অচ্ছুতেরা যদি কাল এসে অফিসে চড়াও হয়? যদি বলে, অর্জুনের ওপর ব্রাহ্মণদের এই হামলা চলবে না, তখন কী হবে?'

বিন্ধ্যাচলী চমকে ওঠে। এদিকটা সে ভেবে দেখেনি। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'অচ্ছুতিয়ারা এখানে হুজ্জুৎ করতে আসবে নাকি?'

'আমার সঙ্গে ওরা পরামর্শ করেনি। তবে ওদের দামাদকে তংগ করলে ওরা ছাড়বে কেন?'

'তুমি ওদের তাতাচ্ছ নাকি?' বলে কুটিল চোখে তাকায় বিন্ধ্যাচলী।

বাইরে হল্লাবাজি আরো তুমুল হয়ে উঠেছে। মনে হয়, লোকগুলো এখন আর রাস্তায় নেই, অফিসে ঢুকে পড়েছে। এবার তাদের চিৎকার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

'অচ্ছুতিয়াকা দামাদকো—'

'নিকাল দো, নিকাল দো—'

'ইয়ে সরকার—'

'ব্রাহ্মণকো বিনাশ করনে—'

'চাহ্‌তা হ্যায়।'

'ইনকো—'

'রুখনাই পড়েগা।'

এই সব চড়া সুরের স্লোগানের ওপর গলা চড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল বিজয়, তার আগেই অফিসার-ইন-চার্জ সুধাকর দুবের আর্দালি দৌড়ুতে দৌড়ুতে এখানে চলে আসে। বলে, 'বড়ে সাহাব অর্জুন চৌবেকে এখনই তাঁর কামরায় যেতে বলেছেন।'

অর্জুনের বুকের ভেতরটা আশঙ্কায় ধক করে ওঠে। এই অফিসে জয়েন করার দিন একবারই মাত্র সুধাকরের কামরায় গিয়ে রিপোর্ট করেছিল সে। তারপর সেখানে আর ডাক পড়েনি, তাকে কোনো কারণে তলবও করা হয়নি। সে এতই ছোট মাপের সামান্য এমপ্লয়ী যে সুধাকরের মতো বড় অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার আদৌ প্রয়োজন নেই। হঠাৎ এভাবে আর্দালি পাঠিয়ে তলব করায় ভয় পাওয়ারই কথা। অর্জুনের মনে হয়, নমকপুরার ব্রাহ্মণরা এসে এই যে হল্লা শুরু করেছে তার সঙ্গে এই ডাকের সম্পর্ক রয়েছে। চেয়ার থেকে রুদ্ধশ্বাসে উঠে দাঁড়ায় সে। আর্দালির সঙ্গে যাওয়ার জন্য যখন পা বাড়াতে যাবে সেই সময় বিজয় বলে, 'চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

আর্দালি বলে, 'নেহী। বড়ে সাহাব অর্জুনজিকে একলাই যেতে বলেছেন। আপনি যাবেন না।'

'আমাকে যেতেই হবে। তোমার চিন্তা নেই। সুধাকরজিকে যা বলার আমি বলব।' বলে অর্জুনের

দিকে তাকায় বিজয়, 'চল—'

বিজয়ের মতো সাহসী একটি মানুষ সঙ্গে যাচ্ছে। অনেকটা ভরসা পায় অর্জুন।

সাধুকর দুবেব কামবাব সামনে আসতেই পুরনো ভয়টা আবার ফিরে আসে অর্জুনের মধ্যে। নমকপুরার ব্রাহ্মণেরা বাইরেব টানা লবিতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। এদের সবাই অর্জুনের চেনা। সূরযদেও, ভানপ্রতাপ, এমনি অনেকে। তবে এদের মধ্যে মান্ধাতাকে দেখা যায় না।

শুধু ব্রাহ্মণরাই না, এই অফিসের লোকজনও লবিতে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

অর্জুনকে দেখে স্লোগানের তোড় হঠাৎ বেড়ে যায়।

'ব্রাহ্মণকো—'

'রক্‌ষা কর।'

'ব্রাহ্মণ অচ্ছুৎ বরাবর করনা—'

'নেহী চলেগা, নেহী চলেগা।'

'এহী সরকার—'

'তোড় দো, তোড় দো—'

এ জাতীয় অভ্যর্থনার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না অর্জুন। সে ভয়ানক ঘাবড়ে যায়।

নমকপুবার ব্রাহ্মণ কমিউনিটির সমস্ত ব্যাপারে অনিবার্য নিয়মেই মান্ধাতা সবার আগে আগে থাকে। নেতা হওয়ার জন্মগত অধিকার একমাত্র তারই। কিন্তু কোনো কারণে তাকে না পাওয়া গেলে নেতৃত্বটা সাময়িকভাবে এসে যায় ভানপ্রতাপের হাতে। ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টে আজকের এই মিছিলটা সে-ই নিয়ে এসেছে।

হাত তুলে ভানপ্রতাপ স্লোগান থামিয়ে দেয়। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের গলায় বলে, 'অচ্ছুতিয়াকা দামাদ আ গিয়া। অফসারের কামরায় যাওয়ার জন্যে রাস্তা করে দাও।'

সবাই প্রবল ঘৃণায় অর্জুনকে লক্ষ করছিল। তারা সরে সরে জায়গা করে দেয়।

কামরার ভেতরে ঢুকেই অর্জুন এবং বিজয়ের চোখে পড়ে উটের মতো চেহারার সুধাকর দুবে তার চেয়ারটিতে দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছেন। বিরক্তি রাগ উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা—তার চোখেমুখে নানা বিচিত্র ধরনের অভিব্যক্তি খেলে যাচ্ছে। উত্তেজনায় কণ্ঠনালীটা দ্রুত ওঠানামা করছে। সামনের একটা চেয়াব দেখিয়ে সুধাকর বলেন, 'বৈঠ।' তারপর বিজয়ের দিকে ফিরে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি এখানে কেন? তোমাকে তো আসতে বলিনি।'

সুধাকরের বলার তোয়াক্কা না কবে অর্জুনেব পাশেব চেয়ারটায় বসে পড়ে বিজয়। বলে, 'না বললেও আসতে হয়েছে আমাকে। অর্জুন ভালমানুষ। ওর ওপর ঝামেলা হলে কাউকে তো সামলাতে হবে।'

চোখের কোণ দিয়ে বিজয়কে লক্ষ করতে করতে সুধাকব চাপা তীব্র গলায় বলেন, 'তুমি বুঝি ওব প্রোটেকটর? নাকি বডি গার্ড?'

বিজয় খেপে ওঠে না। শান্ত গলায় বলে, 'আপনাব যা ইচ্ছে আমাকে বলতে পারেন।'

সুধাকব এ কথাব উত্তর না দিয়ে ফের তার দুই চোখেব কোঁচকানো নজর এনে ফেলেন অর্জুনের ওপর। জিজ্ঞেস করেন, 'কেন তোমাকে এখানে ডাকিয়ে এনেছি, আন্দাজ করতে পার?'

অর্জুন চুপ করে থাকে।

বিজয় বলে, 'নিশ্চয় পারে। নমকপুরাব আপার কাস্টের লোকেদের প্রেসার এসে পড়েছে আপনার ওপর, তাই না?'

'জবাবটা আমি তোমার কাছে চাইনি।' রূঢ় গলায় বলেন সুধাকর।

বিজয় বলে, 'আপনি তো বললেন আমি ওব প্রোটেকটর, ওকে রক্ষা করবই। যা জিজ্ঞেস কববাব আমাকে করুন।'

'তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ বিজয়।'

'আমি করছি, না আপনারা করছেন?'

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন না সুধাকর। আরক্ত চোখে একবার বিজয়ের দিকে তাকিয়ে আবার অর্জুনের দিকে ফেরেন, 'এই অফিসে কোনোদিন যা হয়নি, তোমার জন্যে আজ তা হল?'

রুদ্ধস্বরে অর্জুন বলে, 'কী?'

এই সময় বাইরের লবিতে নতুন উদ্যমে স্লোগান শুরু হয়ে যায়।

'ব্রাহ্মণকো অশুধ্ করনা—'

'নেহী চলেগা, নেহী চলেগা।'

'ইয়ে বিধর্মী সরকার—'

'তোড় দো, তোড় দো।'

সুধাকর বলেন, 'ওই শুনতে পাচ্ছ? তোমার জন্যে ওরা এই অফিসে হানা দিয়েছে।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই দরজা ঠেলে ভানপ্রতাপ এবং আরো কয়েকজন ঢুকে পড়ে।

সুধাকর বলেন, 'আপনারা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমি এদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই।'

ভানপ্রতাপ ঝাঁঝাল স্বরে বলে, 'আমরা অনেকক্ষণ এসেছি। আর দাঁড়াতে পারব না।'

হাতজোড় করে এবার সুধাকর বলেন, 'ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দিন। তারপর আপনাদের সঙ্গে বসব। আপনার লোকদের কৃপা করে স্লোগান দিতে মানা করুন। এত আওয়াজে কথা বলা যায় না।'

ভানপ্রতাপ গজ গজ করতে করতে বেরিয়ে যায়। তবে সুধাকরের অনুরোধটা সে রাখে। একটু পর স্লোগান বন্ধ হয়ে যায়।

সুধাকর লম্বা ভণিতা ছেড়ে এবার সোজাসুজি কাজের কথায় চলে আসেন, 'নমকপুরার ব্রাহ্মণরা আমাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে, অর্জুনকে এই অফিসে যেন কাজ করতে না দিই।'

বিজয় জিজ্ঞেস করে, 'ও দোসাদদের মেয়ে বিয়ে করেছে বলে?'

আস্তে মাথা নাড়েন সুধাকর।

বিজয় সরাসরি সুধাকরের চোখে চোখ রেখে বলে, 'কাজ করতে দিলে ওরা কী করবে?'

'ঝামেলা টামেলা বাধাবে।'

বিরুদ্ধ পক্ষের ঝানু উকিলের মতো বিজয় প্রশ্ন করে, 'কী ধরনের ঝামেলা?'

কিছুটা বিব্রত বোধ করেন সুধাকর। তাঁর কণ্ঠনালী আবো দ্রুত ওঠানামা করতে থাকে। বারকয়েক ঢোক গিলে বলেন, 'আজ যেরকম মিছিল করে এসেছে, সেই রকম রোজ রোজ এসে ডিসটার্ব করবে। এভাবে চললে তো অফিসের কাজকর্ম চালানোই যাবে না।'

বিজয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। সে বলে, 'এই ব্যাপার? তা আপনি কী করতে চান?'

চতুর ডিপ্লোম্যাটের মতো সুধাকর এবার বলেন, 'সেটাই ঠিক করে উঠতে পারছি না। তাই অর্জুনকে ডাকিয়ে আনিয়েছি।' একটু ভেবে বলেন, 'তুমি সঙ্গে এসেছ, এক রকম তাতে ভালই হয়েছে। ইউ আর এ ভেরি ইনটেলিজেন্ট ফেলো। আশা করি, তোমার কাছ থেকে সৎ পরামর্শ পাওয়া যাবে।'

সুধাকরের চালাকিতে এবং হঠাৎ তার সম্পর্কে সুর বদলে ফেলায় বিজয় যতটা বিরক্ত হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মজা পায়। চোখ দুটো সরু করে বলে, 'কী ব্যাপার স্যার, অর্জুনের সঙ্গে আসার জন্যে কিছুক্ষণ আগে আমার ওপর আপনি না খেপে গিয়েছিলেন?'

সুধাকর হকচকিয়ে যান। বলেন, 'আচানক ব্রাহ্মণ কমিউনিটির লোকেরা এভাবে চলে এসে হল্লা করার জন্যে আমার মাথার ঠিক ছিল না। তাই তোমাকে ওভাবে বলেছি। প্লিজ, ডোন্ট মাইন্ড। আই অ্যাম ভেরি ভেরি সরি।'

একটা বড় অফিস চালাবার মতো চাতুর্য এবং দক্ষতা দুই-ই রয়েছে সুধাকরের। রূঢ় ব্যবহারের পর মধুর কথা বলে কিভাবে মানুষকে ভিজিয়ে ফেলা যায় সেই কৌশলটি তাঁর আয়ত্তে। যে লোক রুক্ষ আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে তাকে আর কীই বা বলা যায়। বিজয় বলে, 'ঠিক আছে। আমি আপনার খারাপ ব্যবহারটা মনে করে রাখলাম না। আই টোটালি ফরগেট। কিন্তু অর্জুন এখানে চাকরি পেয়েছে বলে আপনার কাস্টের লোকেরা ঝামেলা পাকাবে—এ ব্যাপারে আমি কি পরামর্শ

দিতে পারি?'

'মতলব, আমার এই প্রবলেমে তোমাদের, স্পেশালি তোমার সাহায্য চাই।'

বিজয় আচমকা শব্দ করে হেসে ফেলে।

সুধাকর অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। বলেন, 'হাসছ যে?'

বিজয় মজার গলায় বলে, 'হাসির কথায় হাসব না? আমি একজন ছোটামোটা ক্লার্ক। আপনি এই অফিসের খোদ ভগোয়ান, মোস্ট পাওয়ারফুল গড। সেই আপনি কিনা আমার কাছে সাজেসান চাইছেন! বড়ে তাজ্জবকি বাত।'

সুধাকর আন্তরিক গলায় বলেন, 'তাজ্জবকি বাত নয়, সত্যি আমি তোমার সাজেসান চাই।'

এই পরামর্শ চাওয়ার পেছনে যে কারণটি তা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারে বিজয়। সুধাকর জানেন বা শুনে থাকতে পারেন, অর্জুনের ওপর তার বিপুল প্রভাব। তা ছাড়া হিন্দু সমাজ সম্‌স্কার সংগঠনের সে একজন স্থানীয় নেতা এবং অত্যন্ত জেদী ধরনের বেপরোয়া যুবক। তার সাহায্য পেলে অর্জুনকে ঘিরে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার কিছুটা সুরাহা হয়ত হতে পারে। বিজয় বলে, 'অর্জুনকে ওরা এখানে নৌকরি করতে দিতে চায় না। তা সত্ত্বেও যদি সে কাজ করে যায়, ওরা কতটা ডিসটার্ব করতে পারে?'

'বললাম তো, রোজ মিছিল নিয়ে আসবে।'

দ্রুত খানিকটা চিন্তা করে নেয় বিজয়। তারপর বলে, 'দেখুন স্যার, আমার ধারণা রোজ ওরা হল্লা করতে আসবে না।'

সুধাকর অবাক। বলেন, 'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

বিজয় এবার যা বলে তা এইরকম। ব্রাহ্মণ সন্তানের অচ্ছুতের মেয়ে বিয়ে করার ঘটনা নমকপুরায় এই প্রথম ঘটল। সেই কারণে আপার কাস্টের মানুষেরা ভীষণ বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রাথমিক এই ক্রোধ এবং উত্তেজনা বেশিদিন বজায় থাকবে না। কেননা সবারই কাজকর্ম আছে, পেটের ধান্দা আছে। জাতপাতের সওয়াল নিয়ে দীর্ঘদিন পড়ে থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাদের এই মারমুখী 'অ্যাজিটেশন' ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়তে বাধ্য। খানিকটা খিঁচ থেকে গেলেও একসময় সবাই তা ভুলে যাবে, দু-চার বছর পর মেনেও নেবে।

সুধাকর হতাশভাবে আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। বিমর্ষ মুখে বলল, 'তুমি এই সব ফান্ডামেন্টালিস্টদের চেনো না বিজয়। ওরা কোনোদিনই ব্রাহ্মণ-অচ্ছুতের শাদি মেনে নেবে না।'

'তাহলে এক কাজ করুন।'

'কী?'

'আপনি ভানপ্রতাপদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন, ওরা অর্জুনের ব্যাপারে ঠিক কী চায়। তারপর আমাদের ডাকবেন। তখন আমার সাজেশান জানিয়ে দেব।'

'সেই ভাল। তোমরা সেকশানে গিয়ে ওয়েট কর। ঘন্টাখানেক বাদে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

অর্জুন আর বিজয় উঠে পড়ে। সুধাকর বেল বাজিয়ে আর্দালিকে দিয়ে ভানপ্রতাপদের ডেকে আনতে বলেন।

ঘন্টাখানেক নয়, প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টা বাদে সুধাকরের খাস আর্দালি আবার বিজয়দের সেকশনে এসে হাজির। তাদের বলে, 'বড়ে সাহেব আপলোগোনকো বুলায়া হ্যায়। তুরন্ত চলিয়ে।'

সুধাকরের কামরায় আসতেই বিজয়দের চোখে পড়ে ভগ্নস্তূপের মতো বসে আছেন তিনি। অত্যন্ত সন্ত্রস্ত এবং বিপন্ন দেখাচ্ছে তাঁকে। ভানপ্রতাপদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন। নির্জীব সুরে বলেন, 'বসো—'

টেবলের এধারে বসতে বসতে বিজয় বলে, 'কী বললে ভানপ্রতাপজি আর তার দলবল?'

'যা বললে তাতে প্রবলেমটা আরো বেড়ে গেল বিজয়।'

'কিরকম?'

'ওরা বলছে, অর্জুনকে এখান থেকে না তাড়ালে রোজ মিছিল করে আসবে। কাজকর্ম স্রেফ বানচাল করে দেবে। আমি এই অফিসের চার্জে রয়েছি। কাজ বন্ধ হলে আমার বিলকুল ডিসক্রেডিট। অথরিটির কাছে আমাকে পুরা বেইজ্জত হতে হবে।'

সুধাকরের মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না বিজয়ের। লোকটা গোঁড়া ব্রাহ্মণ। দোসাদদের মেয়েকে বিয়ে করার কারণে ব্রাহ্মণত্বের পবিত্রতা যে নষ্ট হয়েছে, এতে সে আদৌ খুশি নয়। কিন্তু চাকরির ভয়টাও সেই সঙ্গে পুরো মাত্রায় রয়েছে। ব্রাহ্মণদের মিছিলের কারণে সরকারি কাজে ব্যাঘাত ঘটলে তার অযোগ্যতা প্রমাণ হয়ে যায়, সে যে ট্যাক্টলেস অর্থাৎ সমস্যা সমাধানে তড়িৎ গতিতে প্রয়োজনীয় কৌশল উদ্ভাবনে অক্ষম, সেটা চারদিকে চাউর হয়ে যাবে। ভবিষ্যৎ প্রোমোশনের পক্ষে তা ক্ষতিকর। সে এমনই একজন মানুষ যে ব্রাহ্মণত্বের শুদ্ধতা বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চাকরির সুরক্ষাও চায়। অর্জুন এ অফিসে জয়েন করে তাকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে যার দু পাশেই অতল খাদ। সামান্য অসতর্ক বা বেহিসেবি পা ফেললে তার চরম সর্বনাশ।

সুধাকরের মেরুদণ্ডের জোর কম, চরিত্রে দৃঢ়তা বলতে তেমন কিছু নেই। প্রাচীন সংস্কার থেকে তিনি যেমন নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না, তেমনি চাকরিতে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেওয়ার মতো সাহসও তাঁর নেই। দু'দিক বজায় রেখে ভারসাম্যে এতটুকু হেরফের না ঘটিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে চান তিনি।

বিজয় নির্লিপ্ত মুখে বলে, 'বেইজ্জত যাতে না হতে হয়, তার ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে।'

'আমার একার পক্ষে তা সম্ভব নয় বিজয়। তোমরাই শুধু আমাকে বাঁচাতে পার।' বলতে বলতে টেবলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বিজয়ের একটা হাত প্রায় ব্যাকুলভাবে জড়িয়ে ধরেন সুধাকর।

খুব আস্তে আস্তে এবং সুকৌশলে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয় বিজয়। তার মুখে অদ্ভুত একটি হাসি ফুটে ওঠে। নিরুত্তেজ, শান্ত ভঙ্গিতে সে বলে, 'আপনার কাস্টের লোকেদের প্রেসারে ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন, তাই না?'

সুধাকর চুপ করে থাকেন।

বিজয় বলে, 'এই প্রবলেমটার একটাই মোটে সলিউশান আছে স্যার। সেটা হলে কারুর আর দুশ্চিন্তা থাকবে না। তখন আপনার শান্তি, আমাদের শান্তি, আপনার কাস্টের শান্তি, অফিসের শান্তি। হোল অ্যাটমসফিয়ার বিলকুল পিসফুল হয়ে যাবে।

গভীর ঔৎসুক্যে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেন সুধাকর। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেন, 'কী সলিউশান বিজয়?'

'যদি অর্জুন এই টাউন ছেড়ে চলে যায়, তবেই আর প্রবলেমটা থাকে না।'

'একজাক্টলি। ব্রাহ্মণ লবি আমাকে ঠিক এই কথাটাই বলছিল।'

'আপনি তাদেব কী বলেছেন?'

'তোমাদের সঙ্গে কথা না বলে আমি কিছুই 'কমিট' করি নি।'

বিজয় হাসে। বলে, 'কমিট না করলেও মনে মনে আপনিও তো তাই চান। নেহাত খুদ মিনিস্টাব নিজের হাতে অর্জুনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়েছেন বলে কিছু করতে সাহস পাচ্ছেন না।'

বিজয়কে রীতিমত সমীহই করে থাকেন সুধাকর এবং কিছুটা ভয়ও। সেটা তার বেপরোয়া ভঙ্গি এবং সাহসিকতাব কারণে। তা ছাড়া অন্য জোরও রয়েছে। একটা বড় সংগঠনের স্থানীয় নেতা সে। যেভাবে বিজয় কথা বলছে, একজন অফিস মাস্টারের সঙ্গে সেভাবে বলা যায় না। কিন্তু ঢোক গিলে সুধাকরকে সবই হজম করতে হয়।

বিজয় আবার বলে, 'স্যার, আপনাকে সাফ সাফ একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই।'

বিজয়ের বলার ভঙ্গিতে রীতিমতো ঘাবড়েই যান সুধাকব। আধফোটা গলায় বলেন, 'কী?'

'ব্রাহ্মণ লবির কাছে আপনি মাথা নোয়াবেন না। সরকারি কানুনে অর্জুন নৌকরি পেয়েছে। সে অন্যায় কিছু করে নি। মিনিস্টার, এম. এল. এ, এম. পি—সবার ব্লেসিং ছিল এই বিয়েতে।'

'আমি জানি।'

'সব জেনেশুনেও যদি নিজের চামড়া আর চাকরি বাঁচাবার জন্যে অর্জুনকে নমকপুবা থেকে অন্য

জায়গায় ট্রান্সফার করবার চেষ্টা করেন, আমরা কিন্তু কোনোভাবেই মেনে নেব না।'

সুধাকরের ইচ্ছে ছিল, অর্জুনকে অন্য কোনো অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে ঝঞ্ঝাট মুক্ত হতে পারবেন। সেই কারণেই তাকে ডাকিয়ে এনেছিলেন, যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে ট্রান্সফারে রাজি করানো যায়। সোজাসুজি ট্রান্সফারের কথাটা তিনি বলেন নি, আভাসে ইঙ্গিতে নিজের মনোভাব জানাতে চেয়েছেন শুধু। কিন্তু বিজয় যথেষ্ট বুদ্ধিমান, তাঁর উদ্দেশ্য চট করে ধরে ফেলতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নি।

শুকনো মুখে সুধাকর বলেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ বিজয়।'

বিজয় অদ্ভুত হাসে। বলে, 'আপনি নিজের দিকটাই শুধু ভাবছেন। অর্জুনের দিকটাও একটু আধটু চিন্তা করুন।'

শশব্যস্তে সুধাকর বলে ওঠেন, 'চিন্তা করেছি বৈকি। আমি ওর সম্পর্কে এত ভাল নোট দিয়ে পাঠাব যে, যেখানে যাবে সেখানে মর্যাদার সঙ্গে কাজ করতে পারবে। কেউ ওকে বিরক্ত করবে না।'

স্থির চোখে সুধাকরকে লক্ষ কবতে করতে বিজয় বলে, 'চমৎকার, চমৎকার—'

তার বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু রয়েছে যাতে চমকে ওঠেন সুধাকর। ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'মানে?'

'বহুৎ সিম্পল। অর্জুনকে এখান থেকে ভাগাতে পারলে বিনা ঝামেলায় আপনি অফিস চালাতে পারবেন। ট্যাক্টফুল এফিসিয়েন্ট অফিসার হিসেবে আপনার নাম ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু একটা কথা আপনাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই স্যার।'

'কী?'

'নমকপুরার ব্রাহ্মণ লবি রোজ এখানে মিছিল নিয়ে এসে যদি হুজ্জুৎ বাধায়, আমাদেরও নিজেদের রক্ষা করার জন্যে অন্য রাস্তা ধরতে হবে। সেটা আপনার পক্ষে কিন্তু আনন্দের কারণ হবে না।'

দুশ্চিন্তায় এবং ভয়ে নিজের অজান্তেই পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে আধাআধি উঠে দাঁড়ান সুধাকর। চেরা চেরা ভীত সুরে বলেন, 'নেহী নেহী।' তারপর ফের বসতে বসতে জিজ্ঞেস করেন, 'কী করতে চাও তোমরা?'

'আমরাও আমাদের লোকজন নিয়ে এখানে মিছিল করে আসব। আপনি কী করে অফিস চালান, দেখতে চাই।'

প্রায় হাতজোড় করে কাকুতি মিনতি করতে থাকেন সুধাকর, 'প্লিজ বিজয়, এসব করো না। তুমি তো জানো বছরখানেক আগে আমার হার্টের ট্রাবল হয়েছিল। ডাক্তার টেনশন-ফ্রি থাকতে বলেছেন। দু তরফের গোলমালের ভেতর পড়ে গেলে আমি আর বাঁচব না। নিশ্চয়ই তুমি আমার মৃত্যু চাও না।'

বিজয় বলে, 'এই কথাগুলো আপনি নমকপুরার ব্রাহ্মণদের ভাল করে বোঝান। ওরা ঝঞ্ঝাট না পাকালে আমরা চুপ করে থাকব। আর যদি অর্জুনের কোনো ক্ষতি করতে চেষ্টা করে, ছেড়ে দেব না। এখন আমরা যাচ্ছি। বাইরে ওরা অস্থির হয়ে উঠেছে। ওদের সঙ্গে কথা বলুন।'

অর্জুনকে সঙ্গে করে বেরিয়ে যায় বিজয়। আর ভানপ্রতাপরা হুড়মুড় কবে সুধাকরের কামরায় ঢুকে পড়ে।

পনের

সুধাকর পাণ্ডের কামরা থেকে বেরিয়ে সোজা পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় চলে যেতে চেয়েছিল অর্জুন। ব্রাহ্মণরা এভাবে অফিসে মিছিল করে আসায় সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তার মনে হয়েছিল, মান্ধাতাদের চক্রান্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর চারদিকের উত্তেজনা এবং উত্তাপ ধীরে ধীবে জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু নমকপুরার ব্রাহ্মণরা যে কত হিংস্র এবং ভয়াবহ জীব, সে সম্পর্কে তাব

ধারণা ছিল না। অথচ সে তাদেরই একজন। যে মারাত্মক জেদ এবং নিষ্ঠুরতা লোকগুলোর ঘাড়ে চেপে বসেছে তাতে এই অফিস থেকে ওরা তাকে না তাড়িয়ে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ায় অর্জুন এমনই বিচলিত এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে যে কী করবে, ঠিক করে উঠতে পারছিল না। এটুকুই শুধু ভাবতে পেরেছে, বাংলোয় ফিরে কমলাকে সমস্ত ব্যাপারটা জানাতে হবে। কিন্তু বিজয় ছুটির পর তাকে ছাড়ল না। অফিস থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গে যেতে যেতে বলে, 'এখন আমরা একবার এস.ডি.ও.'র সঙ্গে দেখা করব।'

চিন্তাশক্তি স্বাভাবিক থাকলে এস.ডি.ও'র কাছে যাওয়ার কারণটা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলত অর্জুন। বিমূঢ়ের মতো সে জিজ্ঞেস করে, 'এস.ডি.ও'র সঙ্গে দেখা করব কেন?'

'আজ অফিসে যা যা ঘটেছে, সব তাঁকে জানাতে হবে। গভর্নমেন্ট তোমাকে নৌকরি দিয়েছে। তোমার প্রোটেকশানের দায়িত্ব তাদের।'

অর্জুন উত্তর দেয় না। অনেকক্ষণ পাশাপাশি হাঁটার পর নিচু গলায় বলে, 'আমার ভয় করছে বিজয়।'

'কিসের ভয়?'

'ওরা আমাকে সহজে ছাড়বে না।'

ওরা বলতে যে নমকপুরার ব্রাহ্মণ কমিউনিটি, সেটা বুঝতে পারছিল বিজয়। সে অর্জুনের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'এতগুলো লড়াই-এর পর আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ, তুমি জানো। এখন ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না।' একটু মজা করে বলে, 'রেভোলিউশান শুরু করেছ, ওটা পুরা করতেই হবে। মাঝ রাস্তায় সব ফেলে পালিয়ে গেলে চলবে না।'

সংশয়ের গলায় অর্জুন বলে, 'এস. ডি. ও আমাদের থাকার জায়গা করে দিয়েছেন। এর ওপর আর কি কিছু করতে রাজি হবেন?'

'রাজি না হলে অন্য ব্যবস্থা তো রয়েছেই।'

অর্জুনের মনে পড়ে যায়, বিজয় সুধাকর পাণ্ডেকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, তাঁর কাস্টের লোকেরা যদি রোজ রোজ মিছিল করে অফিসে হানা দেয়, সে-ও লোকজন জুটিয়ে এনে সুধাকরের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে।

অর্জুন এমনিতে যথেষ্ট সাহসী। নইলে আবহমান কালের সংস্কার ভেঙে দোসাদদের মেয়েকে বিয়ে করতে পারত না। কিন্তু তার সাহস অফুরন্ত কিছু নয়। বিয়ের আগে থেকে এখন পর্যন্ত যুদ্ধ করতে করতে তার জেদ এবং দৃঢ়তার ভিতে চিড় ধরতে শুরু করেছে। বিশেষ করে আজ ভানপ্রতাপরা অফিসে এসে হইচই বাধানোয় রীতিমত ঘাবড়েই গেছে সে। অর্জুন বলে, তুমি পাণ্ডে সাহেবকে যে বললে পালটা মিছিল নিয়ে যাবে, সত্যিই তা করবে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। তোমার কি ধারণা পাণ্ডেকে ঝুটা ভয় দেখিয়ে এসেছি?'

হঠাৎ তীব্র ব্যাকুলতায় বিজয়ের একটা হাত আঁকড়ে ধরে অর্জুন, বলে, 'না না, আর গোলমাল বাধিয়ে দরকার নেই।'

হাঁটতে হাঁটতে স্থির দৃষ্টিতে একবার অর্জুনকে লক্ষ করে বিজয়। তার মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করে। তারপর বলে, 'অর্জুন, বন্দুকের নল থেকে গুলি বেরিয়ে যেতে দেখেছ?'

অর্জুন মাথা নাড়ে—দেখে নি।

তার হাতে আলতো চাপ দিয়ে বিজয় এবার বলে, 'না দেখলেও, নিশ্চয়ই জানো গুলিটা বেরিয়ে গেলে সেটাকে আর রোখা যায় না। আমাদের আর ফেরার পথ নেই।'

অর্জুন চুপ করে থাকে।

বিজয় তাকে নজর করতে করতে বলে, 'তোমার ভয়ের কারণটা বুঝতে পারি। কিন্তু ওরা যদি ঝামেলা করে, আমাদের কি চুপচাপ বসে মার খেয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে? পালটা মার দেওয়া ছাড়া এমন কোনো পথ কি তোমার জানা আছে যাতে ওরা ঢিট হয়ে যায় কিংবা কোনো অশান্তি না ঘটে?'

অর্জুনকে চিন্তিত দেখায়। কিন্তু অশান্তি ঘটবে না, এমন কোনো পদ্ধতির কথা এই মুহূর্তে তার মনে পড়ে না। সে চুপ করে থাকে।

বিজয় বলে, 'এখন যদি ভয়ে থেমে যাও, ওরা তোমাকে আর কমলাকে খতম করে ফেলবে।' একটু থেমে আবার বলে, 'ছুঁয়াছুত আর জাতপাতের সওয়ালের বিরুদ্ধে যে প্রোটেস্ট নমকপুরায় শুরু হয়েছে সেটা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।'

জাতপাতের কূট সমস্যা অগ্রাহ্য করে দোসাদদের মেয়ে বিয়ে করার কারণে হাজার কুসংস্কারে ঘেরা এই নগণ্য শহরের ভিত যে তারা নাড়িয়ে দিতে পেরেছে কিংবা নানা বর্ণে নানা স্তরে ভাগ-করা হিন্দু সমাজের আবহমান গোঁড়ামির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবাদ করতে পেরেছে, ইত্যাকার বড় বড় কোনো ব্যাপারই অর্জুনের মাথায় ঢুকছিল না। সে যে একটা বিপুল সামাজিক বিপ্লব ঘটাবার জন্য কমলাকে বিয়ে করেছে তা একেবারেই নয়। প্রথম দেখেই মেয়েটাকে ভাল লেগে যায়। তারপর প্রতিদিনের সান্নিধ্য তাদের সম্পর্ক ক্রমশ গাঢ় করে তোলে। তখন তারা এমন জোরাল আবেগ এবং মধুর তরল স্বপ্নের মধ্যে ভাসমান যে অন্য কোনো দিকে নজর ছিল না। তারপর একদিন অর্জুনের মনে হল, কমলাকে না পেলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন আর থাকবে না।

যৌবন এমন এক ঋতু যখন পিছুটান থাকে না, চুলচেরা হিসেব করে পা ফেলার কথা কেউ ভাবে না, তখন দুরন্ত উদ্দাম স্রোতে শুধু ভেসে যাওয়া। অর্জুনেরা ভেসেই গিয়েছিল কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, ভাবে নি। বিয়ের পর নমকপুরা তার যাবতীয় নিষ্ঠুর প্রাচীন সংস্কার নিয়ে তাদের ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। অর্জুন এখন শুধু অসীম উৎকণ্ঠায় তার আর কমলার নিরাপত্তার কথাই ভাবছে। তাদের ঘিরে যে বিপুল সামাজিক আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে, সে ব্যাপারটা তার মাথায় একেবারেই নেই।

অর্জুন বিজয়ের কথার উত্তর দেয় না।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

বিজয় মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকে লক্ষ করতে করতে বুঝতে পারছিল সে দুশ্চিন্তা বা আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারছে না। সে তার কাঁধে চাপ দিয়ে দৃঢ় গলায় বলে, 'চিন্তা করো না। গভর্নমেন্ট তোমাকে সবরকম প্রোটেকশান দিতে বাধ্য। তা ছাড়া নমকপুরার আপার কাস্টের ভূচ্চরগুলো ছাড়া অন্য মানুষও আছে। আমার ধারণা, তাদের বোঝাতে পারলে অনেকেই তোমার পেছনে এসে দাঁড়াবে।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এস. ডি. ও'র বাংলোর কাছে এসে পড়েছিল। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ চিৎকার করে ডাকতে থাকে, 'রুখ যাইয়ে, রুখ যাইয়ে—'

চমকে মুখ ফেরাতেই অর্জুনরা দেখতে পায় একটা সাইকেল রিক্‌শায় করে সুরেশ আসছে।

আশ্চর্য, সকাল থেকে নানা উলটো পালটা ঘটনায় সুরেশের কথা একবারও মনে পড়ে নি অর্জুনের। অথচ পাটনার এই পত্রকার তাদের পক্ষে একটা বড় রকমের ভরসা। কাল রাতে পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় পৌঁছে দেওয়ার পর সেই যে সে চলে গিয়েছিল তারপর এখন আবার দেখা হল। সকাল থেকে এই সন্ধে পর্যন্ত সে কী করেছে, কে জানে।

রিক্‌শা অর্জুনদের কাছে এসে থেমে যায়। সিট থেকে রাস্তায় নেমে দ্রুত ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সুরেশ অর্জুনকে বলে, 'আপনাদের অফিসে এসেছিলাম, গিয়ে দেখি ছুটি হয়ে গেছে। তাই পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় যাচ্ছিলাম। ভালই হয়েছে, রাস্তায় দেখা হয়ে গেল।' একটু থেমে ফের বলে, 'অফিসে গিয়ে একটা খারাপ খবর পেলাম। এখানকার ব্রাহ্মণরা নাকি অর্জুনের এগেনস্টে ডেমোনেস্ট্রেশন করেছে?'

আস্তে মাথা নাড়ে অর্জুন, আবছা গলায় বলে, 'হ্যাঁ।'

মুখ শক্ত হয়ে ওঠে সুরেশের। কঠোর গলায় বলে, 'এরা ভেবেছে কী? যা খুশি করবে? দেশটা কি ওদের একার প্রোপার্টি ? ওদের ইচ্ছামতো সব চলবে?'

কেউ উত্তর দেয় না।

সুরেশ এবার জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা নিশ্চয়ই এখন পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় ফিরছেন। ওখানে বসে একটা কিছু ঠিক করে নিতে হবে। এই টরচার কোনোভাবেই চলতে দেওয়া যায় না।'

বিজয় বলে, 'আমরা এখন পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় ফিরছি না।'
'কোথায় যাচ্ছেন তা হলে?'
'এস. ডি. ও'র বাংলোয়।'
বেশ অবাকই হয়ে যায় সুরেশ, 'হঠাৎ ওখানে!'
বিজয় কারণটা জানিয়ে দিলে সুরেশ বলে, 'ঠিক ডিসিসন নিয়েছেন। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।'
বিজয় বলে, 'নিশ্চয়ই যাবেন। যখন পেয়েই গেছি, আপনাকে ছাড়ছে কে?' একটু চিন্তা করে জিজ্ঞেস করে, 'সারাদিন কোথায় ছিলেন?'
অর্জুন এবং বিজয়ের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুরেশ জানায়, পত্রকার হিসেবে অর্জুনদের বিয়েব ব্যাপারে একটা ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করতে চায়। আগের বার যখন এসেছিল, তখন বিয়ের রিপোর্ট এবং শ্বশুরবাড়িতে কমলাকে কিভাবে এবং কতটা মেনে নেওয়া হয়েছে তার ওপর একটা 'স্টোরি' করেছিল। আজ সমস্ত দিন নমকপুরার নানা জায়গায় ঘুরে বিভিন্ন স্তরের মানুষজনের সঙ্গে দেখা কবে এই বিয়ের ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়া যোগাড় কবছিল। স্কুলমাস্টার উকিল কবিরাজ ডাক্তার ছাত্র বিজনেসম্যান কেরানি—এমনি বহু ধরনের লোকেব মন্তব্য টেপ করেছে সে। আরো অজস্র মানুষের বক্তব্য টেপ করে দু-একদিনের মধ্যে লেখাটা পাটনায় তার অফিসে পাঠিয়ে দেবে। নানা জায়গায় ঘোরাঘুরির কারণে সুরেশ তাদের সঙ্গে এতক্ষণ যোগাযোগ করতে পারে নি।
বিজয় হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'লোকজনের রি-অ্যাকশান কেমন দেখলেন?'
সুরেশ অল্প হাসে। বলে, 'সেটা আপনিও জানেন। ভেরি ভেরি ব্যাড রি-অ্যাকশান। এটাই এক্সপেক্টেড ছিল। তবে—'
'তবে কী?'
'এর ভেতর একটা সিলভার লাইনিংও চোখে পড়েছে।'
বিজয় এবং অর্জুন সুরেশকে লক্ষ করতে থাকে। গভীর আগ্রহে বিজয় বলে, 'কিরকম?'
সুরেশ জানায় যারা পুরনো সংস্কার ছাড়ার কথা ভাবতে পারে না, যারা ঝানু ফান্ডামেন্টালিস্ট, তাদের ধারণা ব্রাহ্মণ-অচ্ছুতের বিয়েতে সনাতন হিন্দুধর্মের সত্যনাশ হয়ে যাবে। এই সব ভ্রষ্টাচার আর অন্যায় রুখতে না পারলে ভারতবর্ষের ধ্বংস অনিবার্য। বেদ-উপনিষদের সময় থেকে এ দেশের কিছু নিয়ম কিছু প্রথা চলে আসছে, সেগুলিই ভারতকে স্থিতিশীলতা এবং মর্যাদা দিয়েছে। সেগুলো ভেঙে ফেললে দেশের আর রইল কী? ময়ূর আর নালিয়ার পোকা কি এক হতে পারে? পারে না। তেমনি বামহন আর অচ্ছুতের পক্ষে সমান মর্যাদা পাওয়া সম্ভব নয়। সবাই যদি এক হবে তা হলে ব্রাহ্মণ কায়াথ ক্ষত্রিয় অচ্ছুৎ সব আলাগ আলাগ কেন? ঈশ্বরের মর্জিতে ধর্মের সুরক্ষার জন্য জাতপাতের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে যদি কল্যাণ না থাকত, এত জাত হত না। এক মাপের হাজার ডিব্বা, হাজার গিলাস, হাজার কাকাই কারখানা থেকে বেরোয়। ভগোযান ব্রহ্মা ভাল বুঝলে একহী ছাঁচ বানিয়ে সব মানুষকে বিলকুল একই রকম চেহারা, বুদ্ধি আর রুচি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাতেন। আসলে ভগোয়ানের ইচ্ছা, আলাদা আলাদা জাত আলাদা আলাদা থাক। কোঈ বিরোধ নেহী, কোঈ ঝুট ঝামেলা নেহী। নিজের নিজের বাউন্ডারির ভেতর সবাই থাক। কেউ অন্যের ব্যাপারে নাক ঢুকিও না, স্থিতিশীলতা এবং শান্তি বজায় থাক। কিন্তু অর্জুন আব কমলা যা করেছে তাতে এতদিনের সামাজিক প্যাটার্ন এবং স্থিতাবস্থা একেবারে চুরমার হয়ে যেতে বসেছে। এটা যেভাবেই হোক, আটকাতে হবে।
সুরেশ বলতে থাকে, 'সমস্কার ভাঙার কথায় যাদের রাতের ঘুম ছুটে যায় তারা ছাড়াও ইয়াংগার জেনারেশন রয়েছে। আমি এখানকার কলেজে গিয়েছিলাম। বেশ ক'টি ব্রাইট ছেলেমেয়ে আর অল্প বয়েসের দু'জন লেকচারার এই বিয়েকে স্বাগত জানিয়েছে। এই রকম আরো অনেক মানুষ আছে যারা অর্জুন-কমলাকে সাপোর্ট করবে। ভরসা হচ্ছে, দেশটা ওল্ড ফসিলদের হাতে পুরোপুরি চলে যায় নি।'
উৎসাহে চোখ চকচক করতে থাকে বিজয়ের, 'ওই কলেজ স্টুডেন্ট আর লেকচারার দু'জনের নাম জেনে নিয়েছেন?'

'নিশ্চয়ই। ওদের নাম ঠিকানা কমেন্ট, সব কিছু ওদের ভয়েসে টেপ করে নিয়েছি।'

'আচ্ছা—'

'বলুন।'

'যাদের ইন্টারভিউ টেপ করেছেন তারা কোন কাস্টের?'

'সারনেম শুনে বুঝতে পারছি আপার কাস্টের। ব্রাহ্মণ কায়াথ রাজপুত ক্ষত্রিয়—এইসব। হঠাৎ কাস্টের কথা জানতে চাইলেন?'

বিজয় বলে, 'লোয়ার কাস্টের লোকেরা এ বিয়ে ওয়েলকাম করতে পারে কারণ তারা হয়ত ভাববে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে নাতেদারি করে আমরা উঁচুতে উঠলাম। আপার কাস্টের লোকেরা যদি এটা মেনে নেয় তা হলে বোঝা যাবে এদের ভবিষ্যৎ আছে। কেননা তারাই সোসাইটিকে কনট্রোল করে, দেশ চালায়।'

সুরেশ আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'কারেক্ট, কারেক্ট।'

'আরেকটা কথা সুরেশজি—'

'কী?'

'আমার ধারণা, আপনি আজ শুধু নমকপুরার আপার কাস্টের এডুকেটেড ক্লাসটারই ইন্টাবভিউ নিয়েছেন।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সুরেশ বলে, 'হাঁ। কেন বলুন তো?'

তার কথার উত্তর না দিয়ে বিজয় বলে, 'এই সঙ্গে আপনাকে আরেকটা কাজ করতে হবে।'

'কী?'

'অচ্ছুৎটোলায় গিয়ে তাদের ইন্টাবভিউও নেবেন। ওটারও খুব দরকার।'

এদিকটা আগে ভেবে দেখে নি সুরেশ। বিজয় বলার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝে নেয় ওই ইন্টারভিউ'র প্রয়োজন কেন এবং কতটা। সে উৎসুক সুরে বলে, 'নিশ্চয়ই নেব। ওদের মতামতও ভীষণ জরুরি। কিন্তু আপনি একটু আগে একটা কথা বলেছেন। সেটা—'

সুরেশকে শেষ করতে না দিয়ে বিজয় বলে ওঠে, 'উঁচা জাতের সঙ্গে নাতেদারি করতে পারলে অচ্ছুৎরা খুশি হবে, এই তো?'

'হাঁ।

'আমারও সেই রকম ধারণা। কিন্তু সে কথা ওরা মুখ ফুটে বলতে পারবে কিনা, যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

সুরেশ খানিকটা অবাকই হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'পারবে না কেন?'

'ভয়ে সুরেশজি, ভয়ে। বলছিলাম না, আপার কাস্টের লোকেরা দেশ কনট্রোল করে, সোসাইটি চালায়। ওরা খুশি হয়েছে জানালে মান্ধাতা শর্মারা ওদের শেষ কবে ফেলবে। একটা ব্যাপার হয়ত আপনি ভুলে গেছেন—'

'কী?'

'রামঅবতারজি অর্জুনদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর কমলার বাবা কিন্তু মেয়ে আর দামাদকে নিজের বাড়িতে শেলটার দিতে সাহস পায় নি।'

'ঠিক।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সুরেশ।

কথায় কথায় অর্জুনরা এস. ডি. ও.'র বাংলোর সামনে চলে আসে। গেটের সামনে যথারীতি দু'জন আর্মড গার্ড পাহারা দিচ্ছে। গার্ড দু'জন অর্জুনকে ভাল করেই চেনে, বিজয় এবং সুরেশও তাদের অচেনা নয়।

একটি গার্ড এগিয়ে এসে বলে, 'ভাল আছেন অর্জুনজি—'

অর্জুন মলিন হেসে মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয। বলে, 'এস ডি. ও সাহেব বাংলোয় আছেন?'

'আছেন।'

'আমরা দেখা করতে চাই।'

'একটু দাঁড়ান। আমি খবর দিয়ে আসছি।'

চন্দ্রকান্ত সরযূ যতদিন ছিলেন ভেতরে যাওয়ার জন্য অনুমতির দরকার হত না। পাহারাদারদের হুকুম দেওয়া ছিল অর্জুনকে দেখলেই যেন গেট খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু চন্দ্রকান্তরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বাংলোর নিয়মকানুন একেবারে পালটে গেছে।

একটু পর প্রায় ছুটতে ছুটতে সেই গার্ডটা এসে গেট খুলে দিতে দিতে বলে, 'আসুন। এস. ডি. ও সাব নিচের ঘরে আছেন। আপনাদের ওখানেই যেতে বলেছেন।'

কিছুদিন আগেও এই বাড়িতে একটা সপ্তাহ কাটিয়ে গেছে অর্জুন। সামনের এই 'লন'-এ প্রকাণ্ড শামিয়ানা খাটিয়ে তার আর কমলার বিয়ে হয়েছিল। তাদের নিয়ে সেদিন কী বিপুল সমারোহ! পাটনা থেকে মন্ত্রী শুকদেও ঝা ছাড়া এম. এল. এ, এম. পি, এস. পি, ডি. এম, ইত্যাদি কত যে মান্যগণ্য মানুষ এসেছিলেন তার হিসেব ছিল না। অবশ্য মান্ধাতারা মিছিল করে হানা দেওয়ায় টেনশনও ছিল যথেষ্ট। তবু তাকে ঘিরেই ছিল সেদিনের যাবতীয় উৎসব। সমস্ত কিছুর নায়ক সে। এ জন্য এক ধরনের চাপা গর্ব অনুভব করেছিল অর্জুন। সে ছাড়া নমকপুরার আর কারুর বিয়েতে এত হইচই, এত গোলমাল, এত উত্তেজনা আর কখনও হয়নি। এত বড় বড় সব লোকও নিজেদের সমস্ত জরুরি কাজকর্ম ফেলে রেখে একটি বিয়ের জন্য নমকপুরায় দৌড়ে আসেন নি।

সেদিনের তুলনায় আজ এই বাংলোটা একেবারে নিঝুম। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। শুধু চেনা মালীটা ওধারের বাগানে বড় কাঁচি দিয়ে ফুলগাছের মরা পাতা বা ডাল ছেঁটে যাচ্ছে। অর্জুনকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে হাতজোড় করে সে 'নমস্তে' জানায়। অর্জুনও হাতজোড় করে। যে ক'দিন সে এখানে থেকে গেছে, বাংলোর ক্লাস ফোর স্টাফের লোকেদের ব্যবহারে বিনয়ে মুগ্ধ হয়েছে অর্জুন। মানুষগুলি সত্যি চমৎকার।

একতলার ড্রইং রুমে আসতেই মহেশ্বরপ্রসাদকে দেখা গেল। তাঁর পরনে ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি। নমকপুরার সাব রেজিস্ট্রার ধনিকলাল তেওয়ারির সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন।

অর্জুনদের দেখে ধনিকলাল উঠে পড়েন, বলেন, 'আজ উঠি। পরশু আবার আসব।'

'ঠিক আছে।' মহেশ্বরপ্রসাদও উঠে দাঁড়ান। অর্জুনদের বসতে বলে ধনিকলালকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফের নিজের সোফায় এসে বসতে বসতে নিরুৎসুক সুরে বলেন, 'নতুন কিছু প্রবলেম হয়েছে নাকি?'

সুরেশ বলে, 'হাঁ।'

মহেশ্বরপ্রসাদ বলেন, 'অর্জুন চৌবেকেই বলতে দিন। প্রবলেমটা ওর।' স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, একজন পত্রকারকে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য তিনি খুশি হন নি।

সুরেশ তর্কাতর্কির মধ্যে গেল না। তাতে মহেশ্বরপ্রসাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সে চুপ করে থাকে।

অর্জুন বলে, 'স্যার, অফিসে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।'

ভুরু কুঁচকে যায় মহেশ্বরপ্রসাদের, 'কেন?'

আজ ভানপ্রতাপরা এসে অফিসে যে সব কাণ্ড করেছে তার যাবতীয় বিবরণ দিয়ে অর্জুন বলে, 'এরকম চলতে থাকলে আমি কী করে কাজ করব স্যার?'

বিজয় বলে, 'কোনো সিভিলাইজড কান্ট্রিতে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, ভাবা যায় না।'

বিজয়কে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে মহেশ্বরপ্রসাদ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনাকে কিন্তু সেদিনই একটা পরামর্শ দিয়েছিলাম। আপনি তো শুনলেন না। তখন শুনলে এসব হাঙ্গামা হত না।'

বুঝতে না পেরে অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'কী পরামর্শ?'

'অন্য কোথাও ট্রান্সফার নিয়ে যেতে বলেছিলাম। তারপর টেনশন কমলে এখানে চলে আসতে পারতেন।'

ঠিক একই ধরনের কথা আজ বলেছেন সুধাকর পাণ্ডে। সবাই অর্জুনের সমস্যা নিজের ঘাড় থেকে

নামিয়ে দিতে চায়।

অর্জুন কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই সুরেশ হঠাৎ বলে ওঠে, 'আপনি কি প্রবলেমের সলিউশন হিসেবে এখনও অর্জুনের ট্রান্সফারের কথা ভাবছেন?'

মহেশ্বর বিরক্ত হলেন না। সুরেশের দিকে ফিরে বলেন, 'ঠিক তাই। মাঝে মাঝে সামনাসামনি কনফ্রনটেশনে না গিয়ে ডিপ্লোম্যাসির আশ্রয় নিতে হয়। তাতে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যায়। দু-একটা বছর অন্য জায়গায় থেকে এলে ক্ষতি কী? আপনি অর্জুনজিকে একটু বোঝান না—'

'অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। কিন্তু—'

'কী?'

'অর্জুন কিন্তু একটা প্রিন্সিপ্যালের জন্যে, তার রাইটসের জন্যে লড়ছে। ঝামেলা এড়াতে চাইলে আগেই ও ট্রান্সফার নিতে পারত।'

'তার মানে ও এখান থেকে যাবে না?'

'আমাব তাই মনে হয়। এতটা লড়াই-এর পর পালিয়ে যাওয়ার মানে হয় না।'

মহেশ্বর হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে যান। অনেকক্ষণ পর বলেন, 'আমার কাছে আপনারা কী জন্যে এসেছেন? নমকপুরার ব্রাহ্মণ কমিউনিটি অর্জুনজির অফিসে যে ডেমোনেস্ট্রশন করেছে তার খবর দিতে?'

এবার বিজয় আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'না স্যার।'

'তবে?'

'আমরা অর্জুনের প্রোটেকশনের জন্যে আপনার কাছে অ্যাপিল করতে এসেছি।'

'তার মানে?'

'ওর বিরুদ্ধে যে হামলা হচ্ছে সেটা যাতে বন্ধ হয়, দয়া করে আপনাকে তার ব্যাওস্থা করতে হবে।'

মহেশ্বরের ভুরু কুঁচকে যায়। ঠোঁট কামড়ে কী চিন্তা করেন, তারপর বলেন, 'অর্জুনজির গায়ে কি ওরা হাত তুলেছে? আই মীন কোনো ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট?'

'না স্যার।' বিজয় মাথা নাড়তে থাকে।

'মারধর করে নি, এই অবস্থায় প্রোটেকশনের কোনো প্রশ্নই তো ওঠে না। আর যদি ডেমোনেস্ট্রেশন মিছিল আর স্লোগানের প্রশ্ন তোলেন, তা হলে বলব ডেমোক্রেসিতে ওগুলো সবার বেসিক রাইট।'

সুরেশ বলে, 'যাক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

সুরেশের কথা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে সন্দিগ্ধ গলায় মহেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপারে?'

'আমারও পাল্টা মিছিল ডেমোনেস্ট্রেশন করতে পারব, স্লোগান দিতে পারব।'

মহেশ্বরকে বেশ বিচলিত দেখায়। তাঁর শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায়। বলেন, 'আপনারা ওসব করবেন নাকি?' তাঁর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ফুটে বেরোয়।

'দরকার হলে অবশ্যই করব। আপনিই তো বললেন ডেমোক্রেসিতে ওই রাইটগুলো সবার রয়েছে।'

মহেশ্বর বিব্রত বোধ করেন। বুঝতে পারেন একজন ঝানু প্রশাসক হয়ে অমন আলগাভাবে 'বেসিক রাইটে'র কথা বলা তাঁর উচিত হয় নি। নিজের তৈরি ফাঁদে তিনি আটকে গেছেন। নরম গলায় বলেন, 'ওসব করলে অশান্তি আর টেনশন শুধু বাড়বে সুরেশজি। আপনারা শিক্ষিত রিজনেবল লোক, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আপনাদের কাছ থেকে কো-অপারেশন আশা করে।'

বিজয় বলে, 'আমাদের কাছেই শুধু আশা করেন। ওদের কাছে করেন না?'

ওদের বলতে বিজয় যে আপার কাস্টের লোকজনের কথা বলছে, সেটা ধরতে অসুবিধা হয় না মহেশ্বরের। বলেন, 'ওদের কাছেও নিশ্চয়ই আশা করব। তবে জানেনই তো ওরা বেশ গোঁড়া, সমস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না।'

'যাতে পারে তার ব্যবস্থা করুন। অর্জুন কোনো বে-আইনি কাজ করে নি। মিনিস্টার, এম. পি, এম. এল. এ—এমনি অনেক বড় বড় লোক তার বিয়েতে হাজির ছিলেন। গভর্নমেন্টের আশীর্বাদ সে

পেয়েছে। তার ওপর টরচার করে আপার কাস্টের লোকেবা বরং বে-কানুনি কাজ করছে। তার প্রোটেকশনের বন্দোবস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকেই করতে হবে।'

'কিছুক্ষণ আগে আপনাদের তো বললাম গায়ে হাত না পড়লে আমরা কিছু করতে পারি না।'

'তার মানে খুন-জখম না হলে আপনারা কিছুই করবেন না?'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। কিছু ক্ষমতা থাকলেও আমার হাত-পা বাঁধা। কানুনের বাইরে বেরুবার উপায় আমার নেই।'

বিজয় জানায়, 'ঠিক আছে, অর্জুনের সুরক্ষার দায়িত্বটা তা হলে আমাদেরই নিতে হবে। আচ্ছা নমস্তে—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়।

মহেশ্বর ভেতরে ভেতরে কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে যান। কৌশলী অফিসার হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম। অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে বিজয়রা দেখা করতে চাইলে তিনি তাদের বাংলোয় ঢুকতেই দিতেন না। পাহারাদারদের দিয়ে গেটের বাইরে থেকে হাঁকিয়ে দিতেন। কিন্তু এই 'কেস'টা একেবারে আলাদা।

যদিও মহেশ্বর কট্টর ব্রাহ্মণ এবং উঁচু জাতের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে প্রয়োজনমতো সরকারি ক্ষমতাও কাজে লাগাতে দ্বিধা করেন না তবু অর্জুন তাঁকে যথেষ্ট বিপাকে ফেলে দিয়েছে। এই ছোকরার বিয়েতে মন্ত্রী, এম. পি, এম. এল. এ-রা জড়িয়ে গেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের, বিশেষ করে সরকারি ক্ষমতা যাঁদের হাতে, ভীষণ ভয় করে চলেন মহেশ্বর। ব্রাহ্মণত্বের গায়ে আঁচড় লাগলে তিনি যতটা কাতর হবেন তার হাজার গুণ বিচলিত হবেন যদি রুষ্ট প্রশাসন খেপে গিয়ে তাঁকে কোনো নিরাপদ জায়গায় ছ'মাসও টিকতে না দিয়ে ক্রমাগত ঝঞ্ঝাটের জায়গায় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আজকাল বিহারের নানা অঞ্চলে জাতপাত তো বটেই, জমি বা অরণ্যের অধিকার, বান্ধুয়া কিষানদের মুক্তি, ইত্যাদি ব্যাপারে রোজ খুনখারাপি, গাঁ জ্বালানো, দাঙ্গাহাঙ্গামা, অশান্তি লেগেই আছে। ওই সব 'ট্রাবলড স্পটে' তিনি একেবারেই যেতে চান না।

তা ছাড়া অর্জুনদের সঙ্গে একজন পত্রকার জুটে গেছে। এই শ্রেণীটিকে তিনি এড়িয়েই চলতে চান। কী লিখতে এরা কী লিখে বসবে, ঠিক নেই। তাতে অফিসার হিসেবে মর্যাদা নষ্ট হয়ে যাবে, ডি. এম থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সবাই তাঁর কৈফিয়ত তলব করে বসবেন। চাকরি জীবনে সুনামের এতটুকু হানি ঘটুক, এটা তিনি একেবারেই চান না। নমকপুরায় আসার পর অর্জুনদের কেসটা তাঁকে এমন একটা সরু দড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যার দু'ধারেই অতল খাদ। অসীম ধৈর্যে, খুব সন্তর্পণে তাঁকে পা ফেলতে হবে।

মহেশ্বর ব্যস্তভাবে বলেন, 'আরে উঠে পড়লেন কেন? বসুন বসুন—'

বিজয় তাঁর চোখের দিকে চোখ রেখে আস্তে আস্তে ফের বসে পড়ে।

মহেশ্বর এবার বলেন, 'ওদের নিশ্চয়ই বোঝাব। কিন্তু সবার আগে আপনাদের সহযোগিতা আমার দরকার। বুঝতেই পারছেন ওরা খেপে রয়েছে। আপনারাও যদি মাথা গরম করেন, কাজের কাজ কিছুই হবে না। গোলমালটা ট্যাক্টফুলি সামলানো দরকার।'

মহেশ্বর যে ঝানু প্রশাসক, কথার মারপ্যাঁচে বিরুদ্ধ পক্ষকেও যে নরম করে ফেলতে পারেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর যুক্তি যে একেবারে অসার নয়, বিজয় তা বুঝতে পারে। বলে, 'ঠিক আছে, আমাদের সহযোগিতা পাবেন কিন্তু ওদেরও আপনাকে বোঝাতে হবে, ঝামেলা করলে পার পাবে না। যদি না বুঝতে চায় কী ব্যওস্থা করা দরকার, সেটা আমার চেয়ে আপনি নিশ্চয়ই অনেক ভাল জানেন।'

মহেশ্বর আস্তে মাথা নাড়েন, তবে কোনো মন্তব্য করেন না।

ঠিক এই সময় জরুরি কথাটা মনে পড়ে যায় অর্জুনের। সে বলে, 'স্যার, আরেকটা নতুন প্রবলেম তৈরি হয়েছে।'

মহেশ্বরের কপাল কুঁচকে যায়। তিনি বলেন, 'আবার কী হল?'

অর্জুন জানায়, যে পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় সে এবং কমলা উঠেছে সেখানে সাত দিনের বেশি তাদের থাকতে দেওয়া হবে না।

মহেশ্বর জিজ্ঞেস করেন, 'কেন?'

'ওখানকার কেয়ার-টেকার বলছিলেন, এটাই নাকি নিয়ম।'

'আমি ঠিক জানি না। তবে কেয়ার-টেকাব যখন বলেছে, জেনেশুনেই বলেছে।'

অর্জুন বলে, 'সাত দিন পর আমরা কোথায় যাব স্যার?' তার গলায় উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয়।

তুখোড় প্রশাসকটি এবার মহেশ্বরের ভেতরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নমকপুরার কোথাও থাকার জায়গা না পেলে শেষ পর্যন্ত ট্রান্সফার চাইতেই হবে অর্জুনকে। তাতে দুর্ভাবনা টেনশন কেটে যাবে মহেশ্বরের। তিনি নকল সহানুভূতির সুরে বলেন, 'বহুৎ আপসোসকি বাত। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার যে কিছুই করার নেই।'

'সাতদিন পর আমাদের কি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে?'

'এর জবাব আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কানুনের মধ্যে থেকে যা করতে বলবেন, করব। তার বাইরে পা ফেলা অসম্ভব। আমি কানুনের নৌকর।'

সুরেশ স্থির দৃষ্টিতে মহেশ্বরকে লক্ষ করছিল। এস. ডি. ও'র মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করতে পারছিল সে। বলে, 'ঠিক আছে অর্জুনজি, আপাতত দিন সাতেকই থাকুন। তারপর কী করা যায়, ভাবা যাবে। হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে।'

বিজয় বলে, 'তা হলে এখন যাওয়া যাক।'

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'নমস্তে স্যার—'

মহেশ্বরও উঠে পড়েছিলেন। প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলেন, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

কেউ উত্তর দেয় না।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় ঘুরে দাঁড়ায় বিজয়। বলে, 'আরো একটা কথা ছিল স্যার।'

এবার বিরক্তই হন মহেশ্বর। ঈষৎ রূঢ় গলায় প্রশ্ন করেন, 'অ্যানাদার নিউ প্রবলেম?'

বিজয় বলে, 'প্রবলেমও বলতে পারেন। তবে ষড়যন্ত্র বললেই ঠিক হয়।'

মহেশ্বর ভেতরে ভেতরে সামান্য থতিয়ে যান। সেই সঙ্গে সামান্য কৌতূহলও বোধ করেন। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'কিরকম?'

'অফিসে অর্জুনকে কোনো রকম কাজ দেওয়া হচ্ছে না।'

'মানে?'

সারা দিন বিনা কাজে চুপচাপ বসিয়ে রাখার ব্যাপারটা জানিয়ে দেয় বিজয়।

মহেশ্বর প্রশ্ন করেন, 'এর মধ্যে ষড়যন্ত্র কোথায়?'

'কী বলছেন স্যার! এভাবে বসিয়ে রাখতে রাখতে ওরা একদিন প্রমাণ করে দেবে অর্জুন অপদার্থ, কাজ করার কোনোরকম যোগ্যতাই নেই।'

'এটা ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসেব ব্যাপার। ওখানে আমার কিছু করণীয় নেই। তেমন বুঝলে অর্জুনজি ওই ডিপার্টমেন্টের হায়ার অথরিটিকে জানাতে পারেন।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে বিজয়। তারপরে বলে, 'ঠিক আছে।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে সুরেশ বলে, 'এই ভদ্রলোক অর্জুনের জন্যে বিশেষ কিছু করবেন বলে মনে হয় না। তেমন কোনো সাহায্য ওঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না।'

বিজয় মাথা হেলিয়ে সায় দেয়, 'আমারও সেই রকমই ধারণা।'

'যা করার অর্জুন আর আপনাকেই করতে হবে।'

'হাঁ। আপনাকেও পাশে চাই।'

'আমি আপনাদের পাশেই আছি। তবে সবসময় তো আমার পক্ষে এই নমকপুরায় থাকা সম্ভব নয়। পাটনায় ফিরে যেতেই হবে। অবশ্য যখনই খবর দেবেন, চলে আসব।'

'তা হলেই যথেষ্ট। আপনি সঙ্গে থাকলে আমরা অনেক জোর পাব।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় পৌঁছে যায়।

সূর্য পশ্চিম আকাশের দিগন্তের তলায় নেমে গেছে কিছুক্ষণ আগে। রোদ নেই। তবু হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের মতো লালচে একটু আভা এখনও লেগে আছে গাছপালার মাথায়, ফসলের ফাঁকা মাঠে এবং আকাশের গায়ে।

ষোল

দিন চারেক কেটে যায়

এর মধ্যে রোজই ভানপ্রতাপরা অর্জুনের অফিসে এসে হানা দিয়েছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিকেট করে বসে থেকেছে এবং গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিয়েছে। ব্রাহ্মণত্বের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য অর্জুনকে নমকপুরা থেকে তাড়াতেই হবে। নইলে তার বিপজ্জনক নোংরা দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে উঁচু জাতেব ছেলে ছোকরারা অচ্ছুৎটোলি থেকে একেকটা ছোকবি ধরে এনে 'সত্যনাশ' করে ছাড়বে।

অর্জুনরা খবর পেয়েছে এভাবে অফিসে গোলমাল বাধিয়েই ব্রাহ্মণদের সব শক্তি এবং উদ্যম শেষ হয়ে যায়নি। স্বয়ং মান্ধাতা শর্মা নাকি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা পাটনা চলে গেছে। ক্যাবিনেটে শুকদেও ঝা'ই একমাত্র মন্ত্রী নেই, আরো অনেক মন্ত্রীই রয়েছেন যাঁরা ব্রাহ্মণত্বের পবিত্রতা বক্ষায় আগ্রহী, চরম বিনাশ থেকে উচ্চ বর্ণকে রক্ষাব জন্য তাঁরা সব কিছু কবতে পারেন।

মান্ধাতা ছোট শহরের নগণ্য এক মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হলেও চুনাওতে জিভে তাকে নির্বাচিত হতে হয়েছে। ভোটের রাজনীতি সে ভালই বোঝে। তার উদ্দেশ্য, পাটনায় গিয়ে তার জানাশোনা একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এম. এল. এ-কে ধরে মন্ত্রীদের কাছে যাবে। এমনকি স্বয়ং শুকদেও ঝা'র কাছেও। তাঁদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়ে আসবে, নমকপুরায় মাইনোবিটি আর অচ্ছুৎদের ভোট মিলিয়ে শতকরা তিরিশ ভাগের বেশি হবে না। বাকি সেভেনটি পারসেন্ট ভোট আপার কাস্টের লোকেদের। পরের নির্বাচনের খুব দেরি নেই। বড় জোর বছরদেড়েক। মন্ত্রীরা, বিশেষ করে শুকদেও ঝা যদি মনে করে থাকেন ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে অচ্ছুতের মেয়ের বিয়ে দিয়ে থার্টি পারসেন্টের জোরে চুনাওতে তরে যাবেন, তা হলে মূর্খের রাজত্বে বাস করছেন। সেভেনটি পাবসেন্টের কাছে হাঁটু গেড়ে তাঁদের হাত পাততেই হবে। অর্জুনকে যদি নমকপুরা থেকে তাড়ানো না হয়, বাধ্য হয়ে মান্ধাতারা শুকদেওদের অপোজিশন পার্টিকে ভোট দেওয়ার জন্য আপার কাস্টের দরজায় দরজায় ঘুরবে। ব্রাহ্মণত্বের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো রফা নেই। আর কোনো অস্ত্রে না হলেও ভোট এমনই এক ব্রহ্মাস্ত্র যাতে সব পার্টির সব ক্যান্ডিডেটই কাবু হয়ে যায়। এম. এল. এ, এম. পি বা মন্ত্রী না হতে পারলে রাজনৈতিক কেরিয়ার তাদের শেষ। কাজেই ব্রুট মেজরিটিব ভয় দেখালে সুড় সুড় করে তাঁরা অর্জুনকে নমকপুরা থেকে অন্য কোথাও ট্রান্সফার করিয়ে দেবেন।

এই সব মারাত্মক খবর অর্জুনকে ভীষণ চঞ্চল করে তোলে। চঞ্চল এবং সন্ত্রস্ত। বিজয় বা সুরেশ কিন্তু একেবারেই ভয় পায় নি। এ ক'দিন তারা চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকে নি। বিজয় রাঁচী আর মজঃফরপুরে তাদের 'প্রগতিবাদী হিন্দু সমস্কার সংস্থান'-এর অফিসে চিঠি লিখে জানিয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু মেম্বারকে যেন নমকপুরায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নমকপুবায় তাদের সংস্থান খুব জোরাল নয়। মাত্র ক'মাস হল বিজয় এখানে এসেছে, এখনও সেভাবে সংগঠন গড়ে তুলতে পারে নি। তার ইচ্ছা রাঁচী মজঃফরপুর থেকে সংস্থানের ছেলেরা এসে গেলে তারা ব্রাহ্মণদের পালটা মিছিল বার করে তাদের অফিসে তো যাবেই, সারা নমকপুরায় ঘুরে ঘুরে স্লোগান দেবে। নমকপুরা শহরকে বুঝিয়ে দেবে অর্জুনদেব ওপর যে নির্যাতন চলছে সেটা বরদাস্ত করা হবে না, তাদের পাশে দাঁড়াবার মতো মানুষও আছে।

শুধু রাঁচী মজঃফরপুরের ওপর নির্ভর কবে বসে থাকে নি বিজয়রা। সে জানে স্থানীয় মানুষজনের সমর্থনও একান্ত জরুরি। 'সনস অফ দা সয়েল'-এর সহযোগিতা না পাওয়া গেলে বাইরের মদতে বেশি

দূর যাওয়া যাবে না। তাই সুরেশ এবং সে এখানকার কলেজে আর ছেলেদের ক্লাবে ক্লাবে ঘুরে ক'দিন ধরে সমানে বোঝাচ্ছে, ব্রাহ্মণ মৌলবাদীরা কিভাবে অর্জুনদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। বার বার এসে বোঝানোয় নমকপুরার যুবকদের কাছ থেকে ভালই সাড়া পাওয়া গেছে।

বিজয় এবং সুরেশ অচ্ছুৎটোলিতেও গেছে। সেখানে ধাঙড় দোসাদ গঞ্জু হিন্দু খ্রিস্টান— সবাইকে জড়ো করে বুঝিয়েছে অর্জুনদের পেছনে গিয়ে তাদের দাঁড়ানো দরকার। ভারতের সংবিধান দেশের সব মানুষকে সমানাধিকার দিয়েছে। এখানে কেউ কারুর ওপরে বা নিচে নয়।

অচ্ছুৎদের কাছে এটা একটা অত্যন্ত বিস্ময়কর খবর। তারা জিজ্ঞেস করেছে, 'সব বরাবর (সমান)?'

বিজয়রা বলেছে, 'হাঁ।'

'বামহন কায়াথের সঙ্গে ধাঙড় দোসাদের কোনো ফারাক নেই?'

'বিলকুল না। দেখ নি, ভোটে মান্ধাতা মিশ্রর ভোটের দামও যা, তোমাদের টৌলির লোকেদের ভোটের দামও তাই।'

এরপর কেউ আর কোনো প্রশ্ন করে নি।

বিজয় বলেছে, 'উঁচা জাতের সঙ্গে তোমাদের বরাবর করার জন্যে অর্জুন কত কষ্ট করছে। তোমরা যদি তার পাশে গিয়ে না দাঁড়াও মান্ধাতা শর্মারা তাকে আর কমলাকে শেষ করে ফেলবে। কমলাকে বিয়ে করে সে তোমাদের সম্মান দিতে চাইছে আর তার বিপদের সময় তোমরা তাকে দেখবে না?' একটু থেমে বলেছে, 'অর্জুনকে যদি মদত না দাও সারা জীওন উঁচা জাতের জুতোর তলায় তোমাদের পড়ে থাকতে হবে।'

বিজয়দের কথাগুলো শেষ পর্যন্ত খানিকটা মাথায় ঢুকেছে অচ্ছুৎটোলার বাসিন্দাদের। তারা বুঝেছে কমলা অর্জুনের জন্য কিছু করা খুবই জরুরি।

এখানে কমলার মা এবং বাপ নাথুনি আর জগলাল, বিজয়দের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছে। অর্জুনের সঙ্গে কমলার বিয়ের ব্যাপারটা চাউর হওয়ার পর থেকেই ভয়ে তারা সিঁটিয়ে আছে। এ বিয়েতে তাদের একেবারেই মত ছিল না। তার কারণ সংস্কার। ব্রাহ্মণের মতো সর্বোচ্চ স্তরের মানুষের সঙ্গে তাদের মতো অচ্ছুৎদের বিয়ে হওয়া সম্ভব, এটা তারা চিন্তাই করতে পারে না। তবু যখন বিয়েটা হয়েই গেল, তারা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। বিয়েতে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়ে তাদের আলাদা করে নিমন্ত্রণও করেছিলেন চন্দ্রকান্ত কিন্তু ভয়ে তারা যায় নি। তবে কমলা অর্জুনের বিয়ের পর গোটা নমকপুরা জুড়ে যে তুলকালাম কাণ্ড চলছে তাতে নাথুনি এবং জগলাল ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। উৎকণ্ঠায় দুর্ভাবনায় আর মারাত্মক ভয়ে তারা রাতে ঘুমোতে পারছে না। লোকে উলটো পালটা নানারকম ভীতিকর খবর নিয়ে আসছে। এতে উদ্বেগ ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। অথচ নিজেরা বাইরে গিয়ে যে কমলাদের সঠিক খবর নিয়ে আসবে সেই সাহসটুকু পর্যন্ত নেই।

বিজয়দের অভাবিতভাবে কাছে পেয়ে হাতজোড় করে জগলাল বলেছে, 'বাবুজি, কমলা আর অর্জুনজি কেমন আছে?'

বিজয় বলেছে, 'ভাল আছে।'

'সচ বাবুজি?'

'হাঁ হাঁ, সচ।'

'লেকেন শুনেছি ওদের নাকি খুব মারধর করেছে?'

'ঝুট, বিলকুল ঝুট।'

'ভগোয়ান রামজির কসম নিয়ে বলছেন তো?'

'হাঁ হাঁ, জরুর। ওরা পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় আছে। আপনারা গিয়ে দেখে আসুন না।'

নাথুনি পাশ থেকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'আমাদের কেউ মারবে না তো?'

বিজয় বলেছে, 'না না, কে মারবে?'

'ঠিক আছে, আপনা আঁখে একবার ওদের দেখে না এলে মনমে শান্তি পাচ্ছি না বাবুজি।'

এবার সুরেশ বলেছে, 'আমরা মিছিল করে এস. ডি. ও সাহেবের বাংলো আর অর্জুনের অফিসে এখন থেকে রোজ যাব। আপনারাও আসবেন।'

ভীরু গলায় জগলাল জিজ্ঞেস করেছে, 'মিছিল নিয়ে যাবেন কেন বাবুজি?'

কারণটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় সুরেশ। এ ছাড়া সমস্ত অধিকার আদায় করে সসম্মানে মাথা উঁচু করে নমকপুরায় থাকা অর্জুনদের পক্ষে সম্ভব হবে নয়।

সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে জগলাল জানতে চায়, 'কমলা আর অর্জুনজিকো কোঈ খতরা তো নেহী হোগা?'

'না না, আমরা সবাই ওদের সঙ্গে থাকলে কে ওদের ক্ষতি করবে? আসবেন কিন্তু মিছিলে।'

এদিকে বিজয়দের সঙ্গে এই যে অচ্ছুৎটোলায়, কলেজে বা ছেলেদের ক্লাবে ঘুরে ঘুরে সুরেশ সবাইকে বোঝাচ্ছে, এর মধ্যে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে সুরেশের। বিজয় অর্জুনদের ব্যাপারে অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু একটা বিশেষ সীমার বাইরে এই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া সুরেশের পক্ষে সম্ভাব নয়। কেননা একজন পত্রকারকে হতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। কারুর দিকে ঝোঁকা তার পক্ষে অনুচিত। সেটা তার প্রফেশনের পক্ষে ক্ষতিকর। তবু এত বড় একটা ঝুঁকি যে বিজয় নিয়েছে তার পেছনে রয়েছে তার সামাজিক দায়িত্ববোধ। পত্রকার হলেও সে সোসাইটিরই একজন সচেতন মানুষ। উদাসীন দর্শক হয়ে সে তাই দূরে সরে থাকতে পারেনি।

সতের

আজ সকালে রাঁচী এবং মজঃফরপুর থেকে প্রগতিবাদী হিন্দু সমাজ সম্‌স্কার সংস্থানের জন কুড়ি জঙ্গী মেম্বার এসে হাজির হয়েছে। তারা উঠেছে নমকপুরার সবচেয়ে বড় শিবমন্দিরের পাশের ধর্মশালায়।

দুপুরে বিজয় কলেজের কয়েকটি ছেলেকে যোগাড় করে ফেলে। তারপর ধর্মশালা থেকে তার সম্‌স্কার সংস্থানের মেম্বারদের নিয়ে অফিসের দিকে মিছিল করে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যায়।

'উঁচা জাতকা জুলুম—'

'নেহী চলেগা, নেহী চলেগা।'

'অর্জুন চৌবেকো ট্রান্সফার—'

'নেহী মানেগা, নেহী মানেগা।'

'অর্জুন-কমলাকা শাদি—'

'স্বীকার কর, স্বীকার কর।'

সুরেশ দশটার ভেতর খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে অচ্ছুৎটোলায় চলে গিয়েছিল। সে বেশ কিছু দোসাদ ধাঙড় এবং খ্রিস্টান যুবক জুটিয়ে মিছিল বার করে। তবে নিজে সঙ্গে থাকে না। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে থাকে। পত্রকার হিসেবে তাকে এই জটিল ব্যাপারে খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে।

সুরেশ এই মিছিলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে যে খ্রিস্টান ছেলেটির হাতে, তার নাম যোশেফ। দু পুরুষ আগে তারা ছিল ধাঙড়। যোশেফ ম্যাট্রিক পাস, চার্চে যে প্রাইমারি স্কুল রয়েছে সেখানে পড়ায়। খুবই তেজী যুবক। নেতৃত্ব পেয়ে সে দারুণ খুশি। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে যেন। হাতের মুঠো আকাশের দিকে ছুঁড়ে গলায় সবটুকু জোর ঢেলে স্লোগান দেয়।

'উঁচা জাতকা জুলুম—'

অন্য সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'নেহী চলেগা, নেহী চলেগা।'

নমকপুরায় চুনাও-এর সময় মিছিল বেরোয়। সেই মিছিলে বামহন কায়াথ রাজপুত ক্ষত্রিয়দেরই ভিড়। নির্বাচন হচ্ছে না, অথচ পুরোপুরি সামাজিক কারণে অচ্ছুৎটোলা থেকে এরকম একটা মিছিল বেরুতে পারে, নমকপুরায় এমন ঘটনা অভাবনীয়। উৎসাহ এবং উত্তেজনা সেই কারণে।

ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসের সামনে বিজয় আর যোশেফদের দুটো মিছিল একাকার

হয়ে মিশে যায়। এবার স্লোগান তুমুল হয়ে ওঠে।

এই দুপুরবেলায় উলটোপালটা গরম হাওয়া বয়ে যাচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, কখন আড়াআড়ি পুব থেকে পশ্চিমে। দুই মিছিলের প্রচণ্ড চিৎকার উত্তপ্ত বাতাসে ভর করে নমকপুরার চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কোনো মিছিলের সঙ্গেই অর্জুন নেই। সে তার সেকশনে পরিত্যক্ত একঘরের মতো চুপচাপ এককোণে নিজের চেয়ারটিতে বসে আছে।

ভানপ্রতাপদের মিছিলটা এখনও এসে পৌঁছয় নি।

হঠাৎ অন্যরকম স্লোগান শুনে অফিসার-ইন-চার্জ সুধাকর দুবে তাঁর কামরায় চমকে ওঠেন। সেকশন অফিসার বিন্ধ্যাচলী মিশ্রও তার সেকশনে আয়েস করে হাতের চেটোতে তামাক এবং চুন ডলে খৈনি বানাতে বানাতে হকচকিয়ে যায়। অর্জুন দ্রুত জানালার দিকে তাকায়। তার চোখে পড়ে, বাইরে ঠিক তার জানালার নিচে সত্তর আশিটি যুবক জড়ো হয়েছে। তাদের অনেকেই অচেনা। তবে কয়েকজনকে আগেই দেখেছে অর্জুন। ওরা অচ্ছুৎটোলার ছেলে, আলাপ-টালাপ না থাকলেও মুখচেনা। তবে কলেজের ছেলেগুলোকে সে চেনে। তারা নমকপুরায় বামহন এবং কায়াথটোলার বাসিন্দা। এদের মধ্যে বিজয়কেও দেখা যাচ্ছে। সুরেশ অবশ্য ভিড়ের ভেতর নেই, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

বিজয়রা এমন একটা কাণ্ড এত বিরাট আকারে করে বসবে, ভাবতে পারে নি অর্জুন। নমকপুরায় ব্রাহ্মণ কায়াথদের সঙ্গে অচ্ছুৎ আর খ্রিস্টানরা একসঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করে স্লোগান দিচ্ছে, এ জাতীয় দৃশ্য আগে কেউ কখনও দেখে নি। অবাক বিস্ময়ে সে তাকিয়ে থাকে।

ওদিকে সুধাকর দুবে তাঁর বেয়ারাকে ডেকে বলেন, 'দেখে এস তো কারা বাইরে হুজ্জুৎ করছে। মনে হচ্ছে এরা ভানপ্রতাপের দলবল নয়।'

বেয়ারা তক্ষুনি খবর নিয়ে আসে, জানিয়ে দেয় কারা স্লোগান দিচ্ছে।

খানিকক্ষণ বিভ্রান্তের মতো বসে থাকেন সুধাকর। তারপর বলেন, 'যাও, বিজয়কে ডেকে নিয়ে এস।' বেয়ারাটা চলে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'ওখানে পত্রকার সুরেশ সহায়কে দেখলে?' তাঁর ধারণা, এই পালটা আন্দোলনের মধ্যে সুরেশ নিশ্চয়ই আছে। এবং এই মুহূর্তে নিচে তার থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা।'

বেয়ারাটি খুবই তুখোড়। সে সুরেশকে চেনে। বলে, 'আছে স্যার।'

'বিজয়ের সঙ্গে তাকেও ডেকে এনো। অর্জুন চৌবেকেও খবর দাও, সে যেন এখানে চলে আসে।'

কিছুক্ষণ পর বিজয় এবং সুরেশ সুধাকরের কামরায় এসে ঢোকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আসে অর্জুন।

সুধাকর তাদের বসতে বলে জিজ্ঞেস করেন, 'এটা কিরকম হল বিজয়জি, সুরেশজি?'

বিজয় বলে, 'কোনটা?'

'আপনাদের অনুরোধ করেছিলাম, কোনোরকম মিছিল নিয়ে অফিসে আসবেন না। সেই নিয়ে এলেন!' সুধাকর দুবেকে বেশ ক্ষুব্ধই দেখায়।

'অর্জুনকে বাঁচাতে হলে এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না দুবেজি।' বিজয় বেশ জোর দিয়ে বলে।

সুধাকর উত্তর দেন না।

বিজয় এবার বলে, 'আপনি কি জানেন, অর্জুনকে এখান থেকে ট্রান্সফার করবার জন্যে মান্ধাতা শর্মারা পাটনা গেছে। শুনলাম মন্ত্রীটন্ত্রীদের তারা ভয় দেখাবে, যদি তাদের কথামতো কাজ না হয় নেক্সট চুনাওতে এখানকার আপার কাস্টরা অপোজিশন পার্টিকে ভোট দেবে। ওরা দু'দিক থেকে প্রেসার দিতে চাইছে। এক, পাটনায় গিয়ে থ্রেটেন করে আর এই অফিসে ভানপ্রতাপদের পাঠিয়ে গণ্ডগোল বাধিয়ে। কাজেই অর্জুনদের রক্ষা করতে হলে এ ছাড়া আমরা আর কী করতে পারি বলুন।'

খানিকক্ষণ বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থাকেন সুধাকর। তারপর বলেন, 'মান্ধাতা শর্মারা পাটনায় গেছে!' মুখচোখ দেখে মনে হয় এই খবরটা তিনি সত্যিই জানতেন না।

'হাঁ স্যার।' আস্তে মাথা নাড়ে বিজয়। বলে, 'আপনাকে আরেকটা জরুরি খবর দেব।'

'কী?'

'আমরা যে মিছিল নিয়ে এসেছি তাতে প্রগতিবাদী হিন্দু সমাজ সংস্থানের মেম্বাররাই শুধু নেই, আমাদের সঙ্গে অচ্ছুৎ, খ্রিস্টান, এমন কি আপার কাস্টের কিছু ছেলেও এসেছে।' একটু থেমে ফের বলে, 'পিপলস সাপোর্ট আমরাও পেতে শুরু করছি স্যার।'

সুধাকর ঠিক এমন একটা খবরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বিমূঢ়ের মতো বলেন, 'আপার কাস্টের ছেলেরা আপনাদের সঙ্গে মিছিল করে এসেছে!'

বিজয় হাসে। বলে, 'বিশ্বাস না হলে নিচে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসতে পারেন। চলুন না, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।'

সুধাকর বলেন, 'না না, নিচে যাওয়ার দরকার নেই। আপনি যখন বলছেন, বিশ্বাস করছি।'

'তা হলে স্যার, আমরা এখন যাই।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় বিজয়। তার দেখাদেখি অর্জুন এবং সুরেশও।

চিন্তাগ্রস্তের মতো সুধাকর বলেন, 'আচ্ছা।'

বিজয়রা সুধাকরের ঘর থেকে বেরিয়ে যখন একতলার সিঁড়ির দিকে নামছে সেই সময় দূর থেকে স্লোগান ভেসে আসে।

'ভ্রষ্টাচার—'

'নেহী চলেগা, নেহী চলেগা।'

'ব্রাহ্মণকো—'

'রক্‌ষা কর, রক্‌ষা কর।'

'সমাজকো পবিত্রতা—'

'রক্‌ষা কর, রক্‌ষা কর।'

'ব্রাহ্মণ-অচ্ছুৎ শাদি—'

'নেহী মানেগা, নেহী মানেগা।'

বিজয়রা এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায়। অর্জুন এবং সুরেশের উদ্দেশে বলে, 'ভানপ্রতাপরা আসছে।'

'হাঁ।' সুরেশ অর্জুন, দু'জনেই মাথা নাড়ে।

'তাড়াতাড়ি নিচে চলুন।'

অর্জুন যখন সুধাকরের ঘরে আলোচনা করছিল, মিছিলের লোকেরা স্লোগান দেয় নি। হই চই না বাধিয়ে তারা এলোমেলো দাঁড়িয়ে বা বসে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিল। দূরে স্লোগান শুনে তাদের স্নায়ু টান টান হয়ে যায়। যারা বসে ছিল, দ্রুত উঠে দাঁড়ায়।

ঠিক এই সময় উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিচে নেমে আসতে আসতে চিৎকার করে ওঠে বিজয়, 'উঁচা জাতকা জুলুম—

বাকি সবাই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচায়, 'নেহী চলেগা, নেহী চলেগা।'

'অর্জুন-কমলাকা শাদি—'

'স্বীকার কর, স্বীকর কর।'

এদিকে ভানপ্রতাপদের মিছিল স্লোগান দিতে দিতে অফিসের কাছে চলে এসেছিল। প্রথম দিকে নমকপুরার আপার কাস্টের যত উৎসাহ ছিল, এখন তাতে ভাটার টান লেগেছে। দুপুরে যখন উত্তপ্ত লু-বাতাসে চারদিক ঝলসে যায়, তখন শুধুমাত্র ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য রোজ রোজ বেরুতে কার আর ভাল লাগে? নিজের জাতের শুদ্ধতার ব্যাপারে তাদেব সতর্কতার শেষ নেই। তাই বলে অসহ্য রোদে বেরিয়ে গায়ের চামড়া পোড়াবার কোনো মানে হয় না। কাজেই প্রথম দিন ভানপ্রতাপরা ব্রাহ্মণ আর কায়াথটোলা থেকে যত লোক জুটিয়ে আনতে পেরেছিল, আজ তার সিকি ভাগও আসেনি। আর কয়েক দিন আন্দোলন চালালে দশ বারটি কট্টর ফান্ডামেন্টালিস্ট ছাড়া ভানপ্রতাপরা মিছিল করার লোক পাবে

না।

বিজয়দের স্লোগান শুনে কাছাকাছি এসে ভানপ্রতাপদের মিছিল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দু পক্ষের মাঝখানে তখন মাত্র কয়েক গজের দূরত্ব।

ভানপ্রতাপদের মুখচোখ দেখে মনে হয়, তারা ভীষণ হকচকিয়ে গেছে। পালটা একটা মিছিল আগে থেকে এসে এখানে স্লোগান দিতে থাকবে, এটা ছিল তাদের পক্ষে অভাবনীয়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমূঢ়তা কেটে যায় ভানপ্রতাপদের। মাথার ওপর গনগনে আকাশ। হু হু বাতাস আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে। এই সময় ভানপ্রতাপদের মাথায় সেই আগুন খানিকটা ঢুকে যায় যেন। রক্তের ভেতর ব্রাহ্মণত্বের তেজ দর্প এবং সংস্কার দশ গুণ জোরাল হয়ে আবার ফিরে আসে।

বিপুল চেহারার ভানপ্রতাপ আকাশের দিকে ঘুষি ছুঁড়ে চেঁচায়, 'ব্রাহ্মণকা বিনাশ—'

অন্য সবাই গলা মিলিয়ে গর্জে ওঠে, 'নেহী চলেগা, নেহী চলেগা।'

বিজয়বাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে না। তারাও গলার শির ছিঁড়ে পালটা স্লোগান দিতে থাকে।

দুই প্রতিপক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে স্লোগান দেবে, এমন ঘটনা আগে আর কখনও ঘটে নি নমকপুরায়। অর্জুনদের অফিস থেকে সবাই বাইরে বেরিয়ে আসে। এই দুপুরবেলা রাস্তাঘাট এমনিতেই ফাঁকা। যা দু-চারটে লোক এধারে ওধারে ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁটছিল তারা দাঁড়িয়ে যায়। বয়েল আর ভৈসা গাড়ি, টাঙ্গা কি সাইকেল রিক্‌শা, সব কাছে এসে ভিড় জমাতে থাকে। আপার কাস্টের বিরুদ্ধে এভাবে এত লোক জড়ো হয়ে স্লোগান দিচ্ছে, এ এক অকল্পনীয় দৃশ্য। নমকপুরার মানুষ সকলেই সকলকে চেনে। ধাঙড় গাঙ্গোতা দোসাদ এবং খ্রিস্টানের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণ কায়াথদের ছেলেরা উঁচা জাতের বিপক্ষে মুঠি পাকিয়ে চিৎকার করছে — এতে সবাই চমকে গেছে। এমন ঘটনা এ শহরে আগে আর কখনও ঘটে নি।

উত্তেজনা যেভাবে বাড়ছিল, তাতে যে কোনো মুহূর্তে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যেতে পারত। ঘটল না, তার কারণ দু পক্ষের মিছিলের খবর পেয়ে আচমকা দুটো বড় ভ্যান বোঝাই হয়ে পনের যোল জন আর্মড পুলিশ এসে পড়ে। এবং রাইফেল উঁচিয়ে দু পক্ষকে দু'দিকে হটিয়ে দেয়।

একদিকে বিজয়রা, আরেক দিকে ভানপ্রতাপের দলটা। মাঝখানে শ খানেক গজের দূরত্ব। দু পক্ষই দু'ধারে দাঁড়িয়ে সমানে গলার শির ছিঁড়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। আর আর্মড কনস্টেবলরা দু পক্ষের উদ্দেশেই চেঁচাতে থাকে, 'হট যাও, হট যাও—'

প্রায় ঘণ্টাখানেক চিৎকার এবং পালটা চিৎকারের পর দুই দল শেষ পর্যন্ত দু দিকে চলে যায়।

আঠার

আরো দু'দিন কেটে গেল।

এই দু'দিনই বিজয় এবং প্রগতিবাদী হিন্দু সম্‌স্কার সংস্থানের ছেলেরা অর্জুনদের জন্য ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসের এবং এস. ডি. ও বাংলোর সামনে মিছিল নিয়ে কয়েক ঘণ্টা করে স্লোগান দিয়েছে। এই দু'দিনে তাদের মিছিলে নমকপুরা টাউনের আরো বহু মানুষ এসে ভিড় করেছে। অচ্ছুৎ, খ্রিস্টান, থেকে ব্রাহ্মণ-কায়াথ পর্যন্ত কেউ আর বাকি নেই। অবশ্য এদের বেশির ভাগই যুবক যুবতী। এদের সঙ্গে সুরেশ তো আছেই। অর্জুন আর কমলাকে ঘিরে নমকপুরায় দারুণ উন্মাদনা শুরু হয়ে গেছে।

সুরেশ বলেছে, 'মানুষ যেভাবে অর্জুনজিকে সাপোর্ট করতে আসছে সেটা খুবই ভাল লক্ষণ। এই পিপলস সাপোর্ট আমাদের ধরে রাখতে হবে।'

এ ব্যাপারে সুরেশের মতো বিজয় এবং তার সংস্থানের ছেলেরাও খুব আশাবাদী। তাদের ধারণা, জনমতের চাপে ভানপ্রতাপদের পিছু হটতেই হবে।

এদিকে ভানপ্রতাপদের দলে এখন ভাটার টান। এমন কি পাটনা থেকে ফিরে এসে মান্ধাতা শর্মাও

লোকজন যোগাড় করতে পারছে না। ব্রাহ্মণত্ব এবং সমাজিক স্থিতিকে যে রক্ষা করা যাবে না, এমন ইঙ্গিত সে বুঝিবা পেয়ে যাচ্ছে। মানুষের ভ্রষ্টাচারে সে যত না বিস্মিত, তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখিত এবং বিষণ্ণ। তার ধারণার মডেল হিন্দু সমাজকে বোধহয় আর বাঁচিয়ে রাখা গেল না। প্রথম দিকে যত লোক তাদের মিছিলে আসত, শেষ দু'দিনে তার সিকিরও সিকি আসে নি। সব মিলিয়ে বড় জোর বিশ পঁচিশ জন। তাদের মধ্যে আগের সেই জেদ এবং জঙ্গি ব্যাপারটা বিশেষ অবশিষ্ট নেই। তারা ধরেই নিয়েছে এই যুদ্ধে তাদের হার ঠেকানো যাবে না।

তবু যতক্ষণ প্রাণটা আছে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়।

এদিকে কাল রাতে পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় অর্জুনদের থাকার মেয়াদ শেষ হয়েছে।

আজ সকালে চা-টা খাওয়া শেষ হতে না হতেই কেয়ার-টেকার জগন্নাথ সিং অর্জুনদের কামরায় এসে হাজির হয়। কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'আপনাদের সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে অর্জুনজি।'

ভাল করে রোদ উঠতে না উঠতেই জগন্নাথ কী কারণে হানা দিয়েছে সেটা মোটামুটি ধরে ফেলেছে অর্জুন। তবু কিছুটা উদ্বিগ্ন মুখেই সে জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

'আপনাদের এখানে সাত দিন থাকার পারমিসান ছিল। কাল রাতেই তা শেষ হয়েছে। আজ কম্পার্টমেন্ট খালি করে দিতে হবে।'

'আর দু-একটা দিন কি থাকতে দিতে পারেন না?'

'আমি ছোটামোটা নৌকরি করি অর্জুনজি। ওপর থেকে হুকুম এসেছে আজই যেন আপনারা কামরা খালি করে দ্যান।'

সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'ওপর থেকে কে হুকুম দিল—এস ডি. ও সাহেব?'

এবার রীতিমতো ঘাবড়ে যায় জগন্নাথ। হাতজোড় করে সে বলে, 'আমাকে তা জিজ্ঞেস করবেন না অর্জুনজি। আমি বহোত ছোটামোটা সরকারি নৌকর।'

এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করে না অর্জুন। শুধু বলে, 'এখনই চলে যেতে বলছেন?'

'ওপর থেকে সেই রকম ইনস্ট্রাকশান এসেছে।' জগন্নাথ বলতে থাকে, 'আমাকে দয়া করে ভুল বুঝবেন না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আপনাদের ওপর আমার কত সিমপ্যাথি। লেকেন আমার হাত-পা একেবারে বাঁধা, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'না না, ক্ষমার কথা বলবেন না। আপনি আমাদের জন্যে যথেষ্ট করেছেন। শুধু ছোট একটা অনুরোধ করব। যদি আপনার অসুবিধা না হয়—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে যায় অর্জুন।

জগন্নাথ ভয়ে ভয়ে, চিন্তিতভাবে অর্জুনকে লক্ষ করতে করতে বলে, 'কী অনুরোধ অর্জুনজি?'

'দশটা পর্যন্ত যদি থাকতে দ্যান, খুব উপকার হবে। আমার বন্ধুরা খানিকটা পর আসবেন। স্নান খাওয়া সেরে তাঁদের সঙ্গে চলে যাব।'

জগন্নাথ লক্ষ করেছে, রোজই ন'টা সাড়ে ন'টায় বিজয় বা সুরেশ, কেউ না কেউ এখানে আসে। তাদের সঙ্গে অর্জুন বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সে। তারপর দ্বিধান্বিতভাবে বলে, 'ঠিক আছে, তাই হবে।' বলতে বলতে উঠে পড়ে।

কমলা কাছেই বসে ছিল, জগন্নাথ চলে যাওয়ার পর অর্জুন তাকে বলে, 'জামা কাপড় টাপড় গুছিয়ে নাও।'

কমলা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। জগন্নাথ এবং অর্জুনের কথা শুনতে শুনতে তার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে। সে বলে, 'এখান থেকে বেরিয়ে আমরা কোথায় গিয়ে উঠব? আমাদের জন্যে নমকপুরায় আর তো কোনো জায়গা নেই।'

অর্জুন বলে, 'বিজয়রা নিশ্চয়ই কোনো একটা ব্যবস্থা করবে।'

স্যুটকেস এবং কাপড়ের ব্যাগে নিজেদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে প্রথমে স্নান সেরে নেয় কমলা। তারপর বাথরুমে ঢোকে অর্জুন। সে বেরিয়ে এসে ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়নায় কমলাকে দেখতে পায়। দূরের সোফায় সে চুপচাপ বসে আছে। স্নান করার পরও তার মুখচোখ থেকে দুর্ভাবনা এবং উদ্বেগের চিহ্ন মুছে যায় নি।

কমলার দিকে না ফিরে অর্জুন বলে, 'অত ভেবো না। আমাদের সঙ্গে এখন অনেক মানুষ। আমরা শেষ হয়ে যাব না।'

কমলা উত্তর দেয় না।

অর্জুন ফের বলে, 'যখন আমরা ঠিক করেছিলাম বিয়ে করব, আমাদের পাশে কেউ ছিল না। চোখ বুজে একরকম দরিয়াতেই ঝাঁপ দিয়েছিলাম। এখন আমাদের সাহায্য করার জন্যে কত মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। কেউ না কেউ থাকার একটা জায়গা করে দেবেই।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে কমলা। অর্জুনের কথাগুলো সাহস যুগিয়ে তাকে আশান্বিত করে তুলতে থাকে।

আরো কিছুক্ষণ পর বিজয় এসে পড়ে। একধারে রাখা স্যুটকেস এবং ব্যাগটা লক্ষ করতে করতে সে বলে, 'একেবারে রেডি হয়ে আছ দেখছি। ডেভিনিটলি বাংলো ছাড়ার নোটিশ পেয়ে গেছ—তাই না?'

আস্তে আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় অর্জুন।

বিজয়কে খুব একটা বিচলিত বা চিন্তাগ্রস্ত মনে হয় না। ধীরেসুস্থে একটা সোফায় বসে কয়েক পলক দ্রুত কিছু ভেবে নেয় সে। তারপর বলে, 'একরকম ভালই হয়েছে। এই স্যুটকেস ব্যাগসুদ্ধ কমলাকে নিয়ে আজ আমরা মিছিল করে এস. ডি. ও'র বাংলোর সামনে যাব।'

কমলা ভয় পেয়ে যায়। বলে, 'গোলমাল হবে না তো?'

বিজয় হাসে, 'গোলমাল একটু আধটু তো হবেই। তা ফেসও করতে হবে। তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে?'

'না।'

'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।'

খাওয়া শেষ হলে পি. ডব্লু. ডি বাংলোর বিল মিটিয়ে অর্জুনরা বেরিয়ে পড়ে।

রাস্তায় এসে দুটো রিক্‌শা থামিয়ে তারা উঠে পড়ে। একটা রিক্‌শায় উঠেছে অর্জুন এবং বিজয়, অন্যটায় স্যুটকেস ব্যাগ নিয়ে কমলা।

একসময় রিক্‌শা দুটো সোজা এস. ডি. ও বাংলোর সামনে চলে আসে। আগেই ঠিক করা আছে, সব মিছিল আজ এখানে এসে জড়ো হবে। এখানে পিকেটিং এবং মিটিং করার পর তারা যাবে ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসে।

ভাড়া মিটিয়ে রিক্‌শা দুটোকে ছেড়ে দেয় বিজয়রা। এস. ডি. ও বাংলোর সামনের ফাঁকা জায়গায় মিটিংয়ের জন্য দু'দিন আগেই কাঠ দিয়ে একটা উঁচু মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। বিজয়রা সোজা সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। মিনিট দশেকের ভেতর স্লোগান দিতে দিতে বিরাট একটা মিছিল নমকপুরার দক্ষিণ দিক থেকে এসে পড়ে। মিছিলটার সামনের দিকে রয়েছে সুরেশ। পেছনে নমকপুরার কলেজের ছেলেমেয়েরা। তা ছাড়া আরো অজস্র যুবক এবং কিছু বয়স্ক মানুষ। এ ক'দিন মিছিলে শুধু পুরুষদেরই দেখা গেছে, আজই প্রথম দেখা গেল কয়েকটি ছাত্রীকে; সংস্কারের দেওয়াল ভেঙে তারা বেরিয়ে এসেছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিক থেকে আরো একটা বড় মিছিল এসে পড়ে। এতে রয়েছে দোসাদ, ধাঙড়, তাতমা, কোয়েরি এবং খ্রিস্টান আর মুসলমানেরা। অর্থাৎ হিন্দু সোসাইটির নিচের তলার মানুষ এবং মাইনোরিটিরা। তাদের ভেতর জগলাল এবং নাথুনিকেও দেখা যায়। এই মিছিলটা নিয়ে এসেছে যোশেফ।

দুই মিছিল একাকার হয়ে মিশে যাওয়ার পর প্রবল উৎসাহে ফের কিছুক্ষণ স্লোগান চলে। সবার মুষ্টিবদ্ধ হাত এখন আকাশের দিকে।

এরই মধ্যে দু'টি লোক এসে মঞ্চে মাইক লাগিয়ে দিয়ে যায়।

রাস্তার ওধারে এস. ডি. ও বাংলোর ভেতর দুটো কালো রংয়ের ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল। তার ভেতর রয়েছে পঁচিশ তিরিশ জন আর্মড কনস্টেবল। এখানে মিছিল মিটিং এবং ধরনা শুরু হওয়ার পর থেকে পুলিশ ভান দুটো সারাক্ষণ এস. ডি. ও বাংলোয় হাজির থাকছে।

মিছিল আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যান থেকে বেরিয়ে কনস্টেবলরা বাংলোর গেটের বাইরে এসে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মুখচোখ দেখে মনে হয়, তাদের মধ্যেও এক ধরনের টেনশন চলছে।

স্লোগান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার বিজয় অর্জুন কমলা যোশেফ এবং আনন্দকে নিয়ে মঞ্চে ওঠে। আনন্দ নমকপুরা কো-এড়ুকেশন কলেজের ছাত্র-নেতা। কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সেক্রেটারি। এদের মঞ্চে তুললেও বিজয় সুরেশকে ডাকে না। পত্রকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে সে নিচেই দাঁড়িয়ে থাকে।

এইসময় দেখা যায় ভানপ্রতাপ এবং মান্ধাতা শর্মারাও তাদের মিছিল নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। প্রথম দিকে মান্ধাতার মিছিলে যত মানুষ হত এখন তার আট ভাগের এক ভাগও নেই। সব মিলিয়ে পনের যোল জন। তাদের চিৎকার বায়ুমণ্ডলে সামান্য একটু ঢেউ তুলেই বিলীন হয়ে যায়।

মান্ধাতাদের দেখামাত্র এস. ডি. ও বাংলোর সামনের জনতা গলা কয়েক পর্দা চড়িয়ে দেয়। অসংখ্য মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর সমুদ্র গর্জনের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এগিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মান্ধাতারা। এত মানুষ দেখে তারা ভীষণ দমে যায়। বুঝতে পারে, এই যুদ্ধে তাদের আর কিছু করার নেই।

ধীরে ধীরে মান্ধাতা এবং ভানপ্রতাপেরা হতাশ ভঙ্গিতে স্লোগান দিতে দিতে যেদিকে থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে যায়।

বিজয় মাইকের সামনে এসে শুরু করে, 'ভাইয়ো আউর বহেনো, আমরা ক'দিন ধরে কী উদ্দেশ্যে এস. ডি. ও সাহেবের বাংলোর সামনে আর অর্জুনের অফিসে মিছিল করে আসছি, আপনারা জানেন। আমরা লড়াই চালাচ্ছি সুবিচারের জন্যে। সমাজে কট্টর মৌলাবাদীরা যে পুরানা দুর্গন্ধওলা সম্‌স্কার কায়েম রাখতে চাইছে, আমাদের লড়াই তার বিরুদ্ধে। সরকার অর্জুন আর কমলার শাদিতে মদত দিয়েছিল। এটা খুব বড় কথা। আমরা ভেবেছিলাম সরকার সোসাইটিকে সামনের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে নিয়ে যাবে। লেকেন এখন দেখা যাচ্ছে সর্ষের মধ্যেই ভূত থেকে গেছে। সরকারের একটা অংশ যেমন সোসাইটির উন্নতি চায়, প্রোগ্রেস চায়, আরেকটা অংশ তেমনি সোসাইটিকে পেছনে টেনে রাখতে চাইছে। আমাদের লড়াই তারও বিরুদ্ধে। আপনারা বুঝতেই পারছেন, আমাদের কাজটা কত শক্ত। লেকেন ভিক্টরি আমাদের চাই-ই চাই। জিততে আমাদের হবেই। আমাদের সামনে অনেক উঁচা উঁচা দীবার খাড়া হয়ে আছে। সে সব ভাঙতে হবে। আমরা যদি হেরে যাই, আর কোনো ভরসা নেই। সোসাইটি হাজার সাল আগের পুরানা জমানায় পড়ে থাকবে।

'এখন একটাই আশা, আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন। হর রোজ নয়া নয়া সাথী আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। নিজের চোখেই দেখলেন ফান্ডামেন্টালিস্টদের দলে মানুষ কত কমে গেছে। আজ তো তারা সামনে আসতেই সাহস পেল না। দূর থেকে আমাদের হিম্মৎ দেখে পালিয়ে গেল। কিন্তু পালিয়ে গেল বলে ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছে, এমন ভাববেন না। যে কোনো সময় আবার হানা দিতে পারে।

'যাই হোক, আপনাদের একটা নয়া সমস্যার কথা বলব। কমলা আর অর্জুনকে এই শহরে কেউ থাকার জায়গা দেয় নি। ওরা আমার কাছে কিছু দিন লুকিয়ে থেকেছে। অর্জুনের থাকার ব্যাপারে কারুর আপত্তি ছিল না, লেকেন বাড়িওলা যেদিন কমলাকে ধরে ফেলল সেদিন এক মিনিটও আর থাকতে দেয় নি। শেষে এস. ডি. ও'র কাছে ধরনা দিয়ে পি. ডব্লু. ডি বাংলোয় ওদের থাকার ব্যবস্থা করি। সরকারি কানুনে সাত দিনের বেশি ওখানে থাকার উপায় নেই। অর্জুনদের আজ বাংলো ছেড়ে দিতে

হয়েছে। সিধা সেখান থেকে স্যুটকেস ব্যাগ নিয়ে ওরা আমার সঙ্গে চলে এসেছে।

অর্জুনদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিজয় বলতে থাকে, 'ওই যে ওদের দেখুন। ওরা কোনো অন্যায় করে নি, বেকানুনি কোনো কাজ করে নি, স্রেফ দু'জনের জাত 'আলাগ' বলে আজ ওদের এই হাল। আপনারা বলুন এমন বে-সাহারা হয়ে রাস্তার কুত্তা-বিল্লির মতো এখন থেকে কি ওদের আসমানের নিচে রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটাতে হবে?'

জনতা চিৎকার করে ওঠে, 'নেহী নেহী, কভি নেহী।'

বিজয় আবার শুরু করতে যাচ্ছিল, সেই সময় এস. ডি. ও বাংলোর দিক থেকে দু'জন আর্মড গার্ড দৌড়ুতে দৌড়ুতে মঞ্চের কাছে এসে দাঁড়ায়। বিজয়ের দিকে হাত তুলে নাড়তে থাকে। বোঝা যায় তারা কিছু বলতে চাইছে।

বিজয় মঞ্চের ধারে চলে আসে। একজন গার্ড বলে, 'এস. ডি. ও সাহেব আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চান। তুরন্ত আ যাইয়ে।' বলেই তার সঙ্গীকে নিয়ে গার্ড ফিরে যায়।

বিজয় মাইকের কাছে এসে জনতার উদ্দেশে এবার বলে, 'ভাইয়ো আউর বহেনো, এস. ডি. ও সাহেব আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ডেকেছেন। অর্জুন আর কমলাকে নিয়ে তাঁর কাছে যাচ্ছি। আপনারা কৃপা করে এখানে অপেক্ষা করুন। এস. ডি. ও'র সঙ্গে কী কথাবার্তা হল, ফিরে এসে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি।'

একটু পর অর্জুনদের সঙ্গে করে বিজয় সুরেশ যোশেফ এবং আনন্দ এস. ডি. ও'র বাংলোয় চলে আসে। আজ যে ছাত্ররা এখানে এসে জমায়েত হয়েছে সেটা আনন্দর কারণে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে হয়েও দারুণ টগবগে আর লড়াকু ধরনের যুবক। সেই সঙ্গে উদার এবং সংস্কারমুক্তও।

এস. ডি. ও মহেশ্বরপ্রসাদ নিচের তলায় ড্রইং রুমে অপেক্ষা করছিলেন। একজন আর্মড গার্ড বিজয়দের সোজা সেখানে নিয়ে চলে আসে।

মহেশ্বরের মুখ থমথম করছে। অর্জুনদের সঙ্গে কমলাকে দেখে তাঁর চোখ সামান্য কুঁচকে যায়। কপালে ভাঁজ পড়ে। গম্ভীর গলায় সামনের সোফাগুলো দেখিয়ে তিনি বলেন, 'বসুন।'

বিজয় হাতে ঝুলিয়ে অর্জুনদের স্যুটকেস এবং ব্যাগ নিয়ে এসেছিল। সেগুলো একধারে নামিয়ে রেখে অন্য সবার সঙ্গে মহেশ্বরের মুখোমুখি বসে পড়ে।

চোখের কোণ দিয়ে স্যুটকেস এবং ব্যাগটা একবার দেখে নেন মহেশ্বর। তবে এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেন না। ব্যাগ-ট্যাগ থেকে তাঁর চোখ একবার ঘুরে যায় যোশেফ আর আনন্দর দিকে। অপরিচিত দুই যুবককে দেখে তিনি খুশি হন না। অসন্তোষ নিয়েই ফের বিজয়ের দিকে তাকান। বলেন, 'আপনাদের সেদিন বলে দিয়েছিলাম, আমার যেটুকু করা সম্ভব, সবই করেছি। তবু আজ আবার লোকজন এনে আমার বাংলোর সামনে হল্লা করছেন কেন?'

বিজয় খেপে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টের পায়, এখন রাগারাগি বা উত্তেজনা অর্জুনদের কোনো উপকারই করবে না, বরং তা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। নিজেকে সামলে নিয়ে যতটা সম্ভব বিনীত ভঙ্গিতে সে বলে, 'স্যার, যদি মনে কিছু না করেন, একটা কথা বলব।'

মহেশ্বরের কপালের ভাঁজ আরো একটু গভীর হয়। তীক্ষ্ণ গলায় বলেন, 'কী কথা?'

'আপনার যা ক্ষমতা তার সবটা আপনি অ্যাপ্লাই করেন নি। যদি করতেন, সব সমস্যার সলিউশান হয়ে যেত।'

মহেশ্বরের শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায়। বলেন, 'তার মানে?' তাঁর কণ্ঠস্বরে রাগের চেয়ে এবার অনেক বেশি তীক্ষ্ণতা।

'সেই পুরনো কথাটা তা হলে আবার বলি। অর্জুনদের অফিসে তাকে এখনও নানাভাবে ঝঞ্ঝাটে ফেলা হচ্ছে। কাজকর্ম দেওয়া হচ্ছে না, অচ্ছুতের মতো একধারে বসিয়ে রাখা হচ্ছে। আপনি ফার্ম হলে অবস্থাটা বদলে যেত। অর্জুন সম্মানের সঙ্গে কাজ করতে পারত।'

আনন্দ এইসময় বলে ওঠে, 'অফিসে আমরা ওর ফুল প্রোটেকশন চাই।'

কড়া চোখে আনন্দর দিকে তাকিয়ে মহেশ্বর বলেন, 'হু আর ইউ?'

বিজয় দ্রুত বলে ওঠে, 'ওর নাম আনন্দ ঝা। এখানকার কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি।'

মহেশ্বর বলেন, 'সেক্রেটারি না হয় হলেন, এঁর সঙ্গে অর্জুনদের কী সম্পর্ক ? কলেজ ছেড়ে এখানে কেন ?'

প্রশ্নটা যদিও বিজয়কেই করা হয়েছে, উত্তরটা কিন্তু আনন্দই দিল। সে বলে, 'অর্জুনদের ব্যাপারটা একটা বড় সোশাল আর হিউম্যান প্রবলেম। তাই একজন কনসাস মানুষ হিসেবে আমাকে আসতে হয়েছে।'

মহেশ্বর কিছুটা চমকে ওঠেন। বলেন, 'কলেজের ছেলেরাও আপনাদের সঙ্গে এসেছি নাকি ?'

'নিশ্চয়ই। শুধু ছেলেরাই না, কয়েকজন ছাত্রীও এসেছে। অর্জুন আর কমলার বিয়েটা আমরা সমর্থন করি।'

এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল সুরেশ। এবার সে বলে ওঠে, 'ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আজ এ শহরের প্রচুর ইয়াংম্যানও এসেছে। এমন কি মাইনোরিটি কমিউনিটির, যেমন খ্রিস্টান আর মুসলমানেরা। আর এসেছে আপার কাস্টের যারা লিবারেল তাদের একটা অংশ। স্যার, প্রতিদিন অর্জুনদের ফেভারে জনসমর্থন বেড়েই যাচ্ছে। দয়া করে একটু বাইরে যদি তাকান, দেখতে পাবেন, কত মানুষ অর্জুনদের জন্যে এখানে এসেছে।' একটু থেমে যোশেফকে দেখিয়ে বলে, 'এঁর নাম যোশেফ। মাইনোরিটি কমিউনিটির একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ।'

মহেশ্বর যোশেফকে এক পলক দেখেন, তবে উত্তর দেন না।

ওধার থেকে বিজয় বলে, 'যত দিন যাবে, পিপলের এই সাপোর্ট বাড়তেই থাকবে।'

মহেশ্বর এবার মুখ খোলেন, 'তার মানে ব্রুট ফোর্স দেখিয়ে আপনারা আমার ওপর প্রেসার দিতে চাইছেন ?'

মহেশ্বর রাস্তার মাঝখান দিয়ে অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলাব মানুষ। নেতা, মন্ত্রী, এম. পি, ডি. এম ইত্যাদি ওপরওলার মন যুগিয়ে সবার সঙ্গে আপস করে কোনোরকমে চাকরিটা বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই তিনি খুশি। সারভিস কেরিয়ারে এতটুকু দাগ লাগুক, এই দুর্ভাবনায় সারাক্ষণ কুঁকড়ে থাকেন মহেশ্বর। কিন্তু সেই মানুষটাকেই আজ অন্য সুরে অন্য ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। এ ক'দিন তাঁকে এত কড়া হতে দেখা যায়নি।

বিজয় স্থির চোখে কিছুক্ষণ মহেশ্বরকে লক্ষ করে। তারপর চতুর ডিপ্লোম্যাটের মতো বলে, 'স্যার, আপনাকে প্রেসার দেওয়ার সাহস আমাদের হওয়া কি সম্ভব? আমরা শুধু বলতে চাইছি অর্জুনরা কোনো অন্যায় করে নি, নমকপুরায় অনেক মানুষের সমর্থন আর আশীর্বাদ ওরা পেয়েছে।'

মহেশ্বর বলেন, 'ঠিক আছে, আপনার কথা না হয় মেনেই নেওয়া গেল। কিন্তু এভাবে বার বার এখানে লোকজন এনে ঝামেলা করাটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়।'

বিজয় বলে, 'আমরা অন্যায় কোনো দাবি নিয়ে আপনার কাছে আসছি না। অর্জুনদের থাকার একটা পার্মানেন্ট ব্যাওস্থা আর অফিসে তার প্রোটেকশান, এর বেশি কিছু চাই নি।'

'দুই ব্যাপারেই বহুবার জানিয়ে দিয়েছি, আমার যা করার করেছি। এর বেশি আর কিছু আশা করবেন না।'

'এটাই কি আপনার শেষ কথা?'

খুবই বিনীত ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করেছে বিজয়, তবু তার মধ্যে কোথাও একটা দৃঢ়তা ছিল। মহেশ্বর প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করেন। তারপর বলেন, 'হঠাৎ একথা বলছেন?'

বিজয় বলে, 'আপনি যদি ভরসা না দিতে পারেন, আমাদের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

এরকম উত্তর আশা করেন নি মহেশ্বর। তিনি প্রথমটা হকচকিয়ে যান, পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন, 'কী করতে চান আপনারা?'

মহেশ্বরের কাছ থেকে ভরসা না পাওয়া গেলে কী করা দরকার, সেটা ঠিক করে রাখেনি বিজয়রা। দ্রুত ভেবে নিয়ে সে বলে, 'আমরা আপনার কাছে আর আসব না।'

বিমূঢ়ের মতো মহেশ্বর বলেন, 'তা হলে?'

'সোজা ডিস্ট্রিক্ট টাউনে গিয়ে ডি. এম-এর কাছে ধরনা দিয়ে বসে থাকব এক উইক। তাতেও কাজ না হলে পাটনায় সেক্রেটারিয়েট 'যার চিফ মিনিস্টারের বাড়ির সামনে গিয়ে পিকেট করব। যতদিন প্রবলেমটার সলিউশান না হচ্ছে আমরা ছাড়ছি না।'

মহেশ্বর চমকে ওঠেন। বিজয়রা যদি ডি. এম-এর বাংলো কিংবা পাটনার সচিবালয়ে বা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে হামলা চালায় সেটা হবে তাঁর পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর আর বিপজ্জনকও। তিনি যে অত্যন্ত অযোগ্য, সামান্য একটা সমস্যাও ঠিকঠাক সামাল দিতে পারেন না—এসব প্রমাণ হয়ে যাবে। প্রবল বেগে হাত নেড়ে তিনি বলেন, 'না না, ডি. এম কি চিফ মিনিস্টারের কাছে আপনাদের যেতে হবে না। দেখি অর্জুনের অফিসের ব্যাপারটা কিভাবে মেটানো যায়।' বলে পাশের ছোট নিচু টেবল থেকে ফোন তুলে তিনি ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসে সুধাকর দুবেকে ধরেন। বলেন, 'একটু কষ্ট করে যদি আমার বাংলায় একবার আসেন, ভাল হয়। সঙ্গে করে আপনার সেকশন ইন-চার্জ বিন্ধ্যাচলীজিকেও নিয়ে আসবেন। খুব জরুরি কাজ আছে।'

লাইনের ওধার থেকে সুধাকর কী উত্তর দেন, শোনা যায় না। মহেশ্বর শুধু 'হাঁ হাঁ, নমস্তে—' বলে ফোন নামিয়ে রাখেন।

মিনিট পনের বাদে শশব্যস্ত সুধাকর এবং বিন্ধ্যাচলী প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে মহেশ্বরের ড্রইং রুমে এসে ঢোকেন। অর্জুনদের এখানে দেখে দু'জনেই ভীষণ হকচকিয়ে যান।

মহেশ্বর বলেন, 'বসুন।'

সুধাকররা ডান পাশের দুটো সোফায় বসে পড়েন। তবে তাঁদের চোখেমুখে উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা ফুটে বেরিয়েছে। অর্জুনদের নিজের কাছে বসিয়ে মহেশ্বর কেন তাদের এখানে ডেকে এনেছেন, তা বুঝতে পারছেন না সুধাকররা। উৎকণ্ঠা সেই কারণে।

মহেশ্বর এবার সোজাসুজি কাজের কথায় চলে আসেন। বলেন, 'অর্জুন আপনার অফিসে কতদিন আগে জয়েন করেছে?'

একটু ভেবে সুধাকর বলেন, 'মাসখানেকের ওপর।'

'অর্জুনের অভিযোগ, তাকে এখন পর্যন্ত কোনো কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। অফিস আওয়ার্সে সারাক্ষণ তাকে চুপচাপ বসিয়ে রাখা হয়। অভিযোগটা কি সত্যি? আপনার সেকশন ইন-চার্জ এ ব্যাপারে কী বলেন?'

বিন্ধ্যাচলী এবং সুধাকর অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

মহেশ্বর আবার বলেন, 'ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম আমার দেখার কথা নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনাদের ডাকিয়ে আনার কারণটা হল, আমার কাছে অভিযোগ করার পরও যদি কোনো কাজ না হয়, ওঁরা পাটনায় হায়ার অথরিটির কাছে চলে যাবেন।'

বিন্ধ্যাচলী এবং সুধাকর দু'জনেই ভীষণ ঘাবড়ে যান। ভয়ে ভয়ে বিন্ধ্যাচলী বলে, 'স্যার, অর্জুন সবে জয়েন করেছে। সারা জীবন তো খাটতে হবে। তাই ক'দিন থোড়া কুছ রিলিফ দিচ্ছি। আপনি যখন বলছেন, কাল থেকে কাজ দেব। ও কাজ করলে আমারই তো সুবিধা। আমার অনেক প্রেসার কমে যাবে।'

মহেশ্বর বলেন, 'ঠিক আছে, কালই ওকে কাজ দেবেন। অর্জুন আবার অভিযোগ করুক, এটা আমি চাই না।'

দু হাত এবং মাথা জোরে জোরে নেড়ে বিন্ধ্যাচলী বলে, 'না না স্যার, আপনি হুকুম দিয়েছেন, এর নড়চড় হবে না।

মহেশ্বর ভেতরে ভেতরে খুশি হন, তবে বাইরে তার প্রকাশ নেই। গম্ভীর মুখে এবারও বলেন, 'আরেকটা কথা—'

'বলুন স্যার।'

'শুনলাম, আপনার সেকশনে অর্জুনের সঙ্গে সবাই ভীষণ খারাপ ব্যবহার করছে। কথাটা কি ঠিক?'

বিন্ধ্যাচলী হকচকিয়ে যায়। কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'না স্যার, খারাপ ব্যবহাব করবে কেন? সবাই কলিগ তো। এই একটু ঠাট্টা টাট্টা হয়ত করে থাকবে।'

মহেশ্বর বলেন, 'অন্য স্টাফের সম্পর্কে তো অর্জুন বলেছেই। তবে ওর সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আপনার বিরুদ্ধে। অফিসে গেলেই আপনি নাকি ওকে উত্ত্যক্ত করে তোলেন।'

দুই হাত এবং মাথা একসঙ্গে প্রচণ্ডভাবে নাড়তে নাড়তে বিন্ধ্যাচলী বলেন, 'না না, এটা ঠিক নয়। এসব বললে আমার ওপর খুব অবিচার করা হবে স্যার।'

উত্তেজিতভাবে প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছিল অর্জুন। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয় বিজয়। আসলে যে মহেশ্বর এতদিন অর্জুনের ব্যাপারে প্রায় কোনো কথাই শুনছিলেন না, তিনিই যখন বিন্ধ্যাচলীদের ডেকে এনে কড়া গলায় ধমকাতে শুরু করেছেন তখন বোঝাই যাচ্ছে আবহাওয়া বদলে গেছে। যা করার এবং বলার এখন মহেশ্বরই করুন আর বলুন। তাতে কাজ বেশি হবে।

মহেশ্বর এবার বলেন, 'আপনি সেকশন অফিসার হিসেবে দেখবেন, অর্জুনের ওপর কোনো দুর্ব্যবহার যেন না করা হয়। নতুন করে আবার যদি অভিযোগ আসে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চুপচাপ বসে থাকবে না, তাকে ফার্ম স্টেপ নেওয়ার কথা ভাবতে হবে। আমাব কথাটা আশা করি, আপনারা বুঝতে পারছেন।' হুঁশিয়ারিটা একই সঙ্গে সুধাকর এবং বিন্ধ্যাচলীব উদ্দেশে। কথা শেস করে পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে দু'জনকে লক্ষ করতে থাকেন মহেশ্বর।

সুধাকররা শশব্যস্তে বলে ওঠেন, 'অর্জুনের সঙ্গে কেউ যাতে ভবিষ্যতে আর মিসবিহেভ না করতে পারে, সেটা আমরা এখন থেকে দেখব।'

'ধন্যবাদ।'

'স্যার, আমাদের আর কি থাকার দরকার আছে?'

'না। আপনারা এখন আসুন।'

নমস্কার জানিয়ে সুধাকর এবং বিন্ধ্যাচলী চলে যায়।

মহেশ্বর বিজয়দের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'অফিসের সমস্যাটার সলিউশন হয়ে গেল। আশা করি, এ নিয়ে আর কিছু বলার নেই আপনাদের।'

এতক্ষণ চুপচাপ সাংবাদিকের নিরপেক্ষতা নিয়ে বসে ছিল সুরেশ। এবার ফস করে সে বলে ফেলে, 'না। তবে—' কথা শেষ না করে হঠাৎ থেমে যায়।

'তবে কী?'

'আপনি স্যার আগেই বিন্ধ্যাচলী মিশ্রদের ডেকে ওয়ার্নিং দিলে ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না।'

মহেশ্বর ভীষণ গম্ভীর হয়ে যান। সুরেশের কথার উত্তর না দিয়ে থমথমে মুখ বলেন, 'আমাকে এবার উঠতে হবে। আমার অন্য এনগেজমেন্ট আছে।' বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ান।

বিজয় বলে, 'স্যার, দয়া করে আব কয়েক মিনিট বসে যান। একটা সমস্যা আপনি মিটিয়েছেন কিন্তু আরো একটা ভাইটাল ব্যাপার রয়েছে।'

মহেশ্বরের কপাল কুঁচকে যায়। প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছেন তিনি। বলেন, 'অর্জুনদের থাকার ব্যাপার তো?'

মহেশ্বর বসেন নি, অগত্যা বিজয়দেরও উঠে দাঁড়াতে হয। বিজয় বলে, 'হ্যাঁ।' ঘরের কোণে স্যুটকেস ব্যাগ দেখায় সে, 'ওই যে মালপত্র নিয়ে ওদের পি. ডব্লু. ডি গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। থাকার ব্যবস্থা না করে দিলে অর্জুনদেব রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।'

'আমার পক্ষে বাড়িটাড়ি যোগাড় করে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি যতদূর পেরেছি, করেছি। এর বেশি আমার কাছে এক্সপেক্ট করবেন না।' মহেশ্বর বলতে থাকেন, 'আপনারা ইচ্ছা করলে ডি. এম কি চিফ মিনিস্টাবের বাংলোর সামনে গিয়ে ধরনা দিতে পারেন।'

বিজয়রা বুঝতে পারছিল, আইনের দিক থেকে যেটুকু করা সম্ভব ঠিক ততটুকুই করেছেন মহেশ্বর। এর বাইরে আর কিছুই করানো যাবে না তাঁকে দিয়ে। বিজয় বলে, 'ঠিক আছে স্যার, আমরা তাহলে চলি।'

উনিশ

এস. ডি. ও বাংলোর লন-এ নেমে গেটের দিকে যেতে যেতে অনিশ্চিতভাবে সুরেশ বলে, 'এস. ডি. ও তো সাফ জানিয়ে দিলেন, অর্জুনদের থাকার ব্যাপারে কিছুই করতে পারবেন না। কানুনের বাইরে এক কদমও তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। এখন তা হলে কী করা যায়?'

একই কথা ভাবছিল বাকি সবাই। বিজয় বলে, 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'

সকলেই উৎসুক চোখে তার দিকে তাকায়। বলে, 'কী?'

'বাইরে গিয়ে বলছি।'

অর্জুন এই সময় ভয়ে ভয়ে বলে, 'কোথাও জায়গা না পাওয়া গেলে রেভারেন্ড টিরকের কাছেই না হয় চলে যাব। উনি নিশ্চয়ই এবার ফিরিয়ে দেবেন না।'

বিজয় বলে, 'রেভারেন্ড টিরকে তো রইলেনই। কিন্তু এই শহরে এত মানুষ থাকতে বার বার ওঁকেই বা শেলটার দেওয়ার কথা বলতে হবে কেন? আর কি একজনও নেই যে অর্জুনদের আশ্রয় দিতে পারে?'

কেউ উত্তর দেয় না। চুপচাপ সবাই গেটের বাইরে গিয়ে রাস্তা পেরিয়ে ওপারে চলে যায়।

এখনও ওধারে বিশাল জনতা বসে আছে। অর্জুনরা এস. ডি. ও-র কাছ থেকে কী প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে সে জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। তাদের দেখে সকলে উঠে দাঁড়ায়। একসঙ্গে তারা প্রশ্ন করতে থাকে, 'কী হল অর্জুনদের? কী বললেন এস. ডি. ও সাহেব?'

অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জননেতার মতো হাত তুলে জনতাকে থামিয়ে দেয় বিজয়। তারপর অর্জুনদের নিয়ে উঁচু মঞ্চে এসে সোজা মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ভাইয়ো আউর বহেনজিলোগ, আপনারা নিশ্চয়ই এস. ডি. ও সাহেবের সঙ্গে আমাদের কী কথাবার্তা হল শুনতে চাইছেন। প্রথমে একটা সুখবর দিই। অর্জুনের অফিসের সমস্যা মিটে গেছে। এস. ডি. ও সাহেব অর্জুনের দুই অফিসারকে ডেকে কড়া ধমক দিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, তাকে যেন কোনোভাবে বিরক্ত করা না হয়, কেউ যেন অর্জুনের ওপর উৎপাত না করে। করলে তা বরদাস্ত করা হবে না। অফিসাররা কথা দিয়েছেন এখন থেকে কোনো গোলমাল হবে না।'

জনতা আকাশের দিকে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করে ওঠে, 'বহুৎ আচ্ছা খবর, বহুৎ আচ্ছা—'

দু হাত তুলে বিজয় বলে, 'থামুন। এবার আপনাদের একটা খারাপ খবর দেওয়ার আছে। ভেরি ভেরি ব্যাড নিউজ।'

জনতা চুপ করে যায়।

বিজয় এভাবে শুরু করে, 'আপনারা জানেন, আজ পি. ডব্লু. ডি গেস্ট হাউস থেকে অর্জুনদের চলে আসতে হয়েছে। কানুন আছে এক সপ্তাহের বেশি ওখানে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না। আমরা এস. ডি. ও সাহেবের কাছে আর্জি জানিয়েছিলাম, অর্জুন আর কমলাকে ওখানে আরো কিছুদিন থাকতে দেওয়া হোক। উনি রাজি হন নি, সাফ জানিয়ে দিয়েছেন কানুন ভাঙতে পারবেন না। এতে যদি আমরা খোদ মুখ্যমন্ত্রী কি ডি. এম-এর কাছে গিয়ে নালিশ করি, ওঁর আপত্তি নেই। কানুনের দিক থেকে এস. ডি. ও সাহেব ঠিকই বলেছেন, কিন্তু অর্জুনরা এখন কোথায় থাকবে? কেউ যদি তাদের সাহারা না দেয়, আসমানের নিচে স্রেফ রাস্তায় তাদের পড়ে থাকতে হবে। তাই আপনাদের কাছে আমি একটা আর্জি রাখতে চাই।'

কথা শেষ করে সামনের কয়েক শ মানুষের দিকে তাকায় বিজয়। কেউ কিছু বলে না, শুধু অসীম ঔৎসুক্যে তাকে লক্ষ করতে থাকে। বিজয়ের আর্জিটা কী ধরনের হতে পারে তা যেন খানিকটা আঁচ করতে চাইছে তারা।

বিজয় এবার বলে, 'আমি চাইছি, যতদিন না অর্জুনদের পার্মানেন্ট কোনো থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে, আপনারা পালা করে দু-চারদিন করে তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে রাখুন। আপার কাস্টের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আপনারা যুদ্ধ শুরু করেছেন। যুদ্ধটা যে শুধু মুখে মুখে নয়, সেটা আমাদের সবাইকে প্রমাণ

করতে হবে। বলুন, কারা অর্জুনদের আশ্রয় দেবেন?'

চারদিক ঘিরে অদ্ভুত এক স্তব্ধতা নেমে আসে। তাব মধ্যেই বিজয় আবার বলে, 'যাঁরা আশ্রয় দেবেন তাঁরা সোজা মঞ্চে আমাদের কাছে চলে আসুন।'

কোনো দিক থেকেই সাড়া পাওয়া যায় না। সব এত চুপচাপ যে গাছের পাতা নড়লেও যেন তার আওয়াজ শোনা যাবে।

বিজয় বলতে থাকে, 'আমরা যে অর্জুনদের ভালবাসি, আমরা যে হিন্দু সোসাইটির পুরানো খতরনাক সমস্কার ভাঙতে যাচ্ছি, সেটা প্রমাণ করতে হবে। নইলে আমাদের এই লড়াই, এই অন্দোলন একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনারা ভাল করে ভেবে দেখুন, বার বার ভাবুন—'

এবারও সবাই চুপচাপ। প্রচণ্ড উন্মাদনায় এবং নতুন কিছু কবার উৎসাহে সামনের এই সব লোকজন ছুটে এসেছিল। কিছুক্ষণ হইচই করে, স্লোগানে স্লোগানে নমকপুরার বাতাস গরম করে নিজেদের দায়িত্ব চুকিয়ে দিতে চেয়েছিল তারা। এখন দেখা যাচ্ছে, আঁচটা সোজাসুজি তাদের গায়ে এসে লাগছে। নিরাপদ দূরত্বে দাড়িয়ে গা বাঁচানো আর যাবে না, সরাসবি অর্জুনদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে। এর জন্য কেউ আগে থেকে তৈরি ছিল না। এমন একটা জটিল সমস্যার মধ্যে এসে পড়তে হবে, আগে জানা থাকলে অনেকেই হয়ত আসত না।

নৈঃশব্দের মধ্যেই দেখা গেল ভিড়ের ভেতর থেকে পা টিপে টিপে অনেকে চলে যাচ্ছে। সেটা লক্ষ করেছিল বিজয়। সে বলে, 'দয়া করে আপনারা যাবেন না। জবরদস্তি কারুর ওপর অর্জুনদের চাপিয়ে দেওয়া হবে না। খুশি মনে, সহানুভূতির সঙ্গে যাঁরা দায়িত্ব নেবেন, ওরা শুধু তাঁদের কাছেই যাবে। আমি জানি, জবরদস্তির ফল ভাল হয় না।'

যারা চলে যাচ্ছিল, তারা থমকে দাঁড়ায়।

বিজয় কিছুক্ষণ জনতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে। তারপর গাঢ় আবেগের গলায় বলে, 'তবে কি আমরা ধরে নেব হরিজনের মেয়ে বিয়ে করার অপরাধে অর্জুন নমকপুরার কোনো বাড়িতেই জায়গা পাবে না? এখানে এমন কেউ নেই যার কাছে সামান্য মহত্ত্ব বা উদারতা আশা করা যায় না? মনে রাখবেন, আপার কাস্টের গোঁড়ামি আর কুসমস্কারের জন্যে হিন্দু সোসাইটির অনেকেই অন্য ধর্ম নিয়েছে। আমরা যদি অর্জুনদের কাছে টেনে নিতে না পারি, তারা হয়ত হিন্দু ধর্ম ছেড়ে দেবে।'

বিজয়ের কথা শেষ হতে না হতেই জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। চারদিকে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়। ক্রমশ সেটা উত্তেজনার চেহারা নিতে থাকে।

এরই ভেতর ভিড় ঠেলে ঠেলে কমলার মা-বাবা জগলাল এবং নাথুনি মঞ্চের নিচে এসে দাঁড়ায়। তাদের দেখে বিজয় এক কিনারে এসে ওপর থেকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা কিছু বলবেন?'

জগলালরা সমস্বরে বলে, 'হাঁ।'

'ওপরে চলে আসুন।'

মঞ্চের গা ঘেঁষে আলগা ইট বসিয়ে বসিয়ে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসে জগলালরা। তাদের চেয়ারে বসিয়ে বিজয় বলে, 'এবার বলুন।'

জগলাল এবং নাথুনি হাতজোড় করেই আছে। তারা যা জানাল তা এইরকম। অনেক আগেই তাদের ইচ্ছা ছিল কমলা এবং অর্জুনকে তাদের কাছে নিয়ে যায় কিন্তু মান্ধাতাদের ভয়ে নিতে সাহস হয় নি। তা ছাড়া অর্জুন তাদের দামাদ হলেও, সমাজের সবচেয়ে উঁচু স্তরের মানুষ। বিলকুল দেওতা-বরাবর। তাদের মতো অচ্ছুৎ কী করে নিজেদের ঘরে তাকে নিয়ে যায়, এটা ভাবতেও ভরসা পায় নি তারা। কিন্তু এখন বে-সাহারা মেয়ে-জামাই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, তা কী করে হতে পারে? তাই ভয়, সংকোচ এবং সমস্কার ভেঙে তারা এগিয়ে এসেছে। মেয়ে-জামাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে নিজেদের কাছে।

বিজয় বলে, 'খুব ভাল কথা। আপনাবা তো রইলেনই, কিন্তু আমরা আরো অনেককে চাই।'

আসলে বিজয়ের পরিকল্পনার মধ্যে সূক্ষ্ম একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। সে যে বহু লোকের বাড়িতে পালা করে অর্জুনদের রাখতে চাইছে তার কারণ একটাই। সামাজিক দিক থেকে নমকপুবার যত বেশি

লোক তাদের মেনে নেবে, এই আন্দোলন ততই সার্থক হয়ে উঠবে। অচ্ছুৎ এবং বামহন-কায়াথদের মাঝখানে যে বিশাল দেওয়ালটি আবহমান কাল মাথা খাড়া করে রয়েছে তা ভেঙে মাটিতে মিশে যাক, অর্জুনের কাছে সেটাই একমাত্র কাম্য।

নমকপুরা কলেজের স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সেক্রেটারি আনন্দ এতক্ষণ মঞ্চে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে বলে, 'বিজয়জি, আমি ভাবছি, অর্জুনজি আর কমলাজিকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব।'

বিজয়ের চোখ হঠাৎ চকচক করে ওঠে, তার হৃৎপিণ্ডের ওপর দিয়ে হাজারটা ঘোড়া যেন ছুটতে থাকে। সে যা চাইছিল তা যেন করতলে পেয়ে গেছে। দৌড়ে মাইকের সামনে চলে যায়, বলে, 'আপনারা শুনে খুশি হবেন, কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি আনন্দজি আর অর্জুনের শ্বশুর-শাশুড়ি অর্জুন আর কমলাকে সাহারা দিতে রাজি হয়েছেন। আপনারা আর কেউ ওদের আশ্রয় দিতে চান, কৃপা করে জানান।'

আনন্দর নামটা শোনার পর জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য হঠাৎ অনেকটাই বেড়ে যায়। এবার এক একজন করে বার চোদ্দজন মঞ্চে উঠে আসে। তাদেব বেশির ভাগই ব্রাহ্মণ বা কায়াথ। দু-একজন খ্রিস্টানও রয়েছে। এরা সকলেই অর্জুনদের নিজেদের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য মনস্থির করে ফেলেছে।

এতগুলি আশ্রয়দাতা যে এভাবে এগিয়ে আসবে, ভাবতে পারে নি বিজয়। উত্তেজনায়, খুশিতে এবং এক ধরনের প্রবল আবেগে তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। সবাইকে বসিয়ে সুরেশকে মঞ্চের একধারে ডেকে নিয়ে যায় সে। কেননা সুরেশই আগাগোড়া এই আন্দোলনে তাদের পাশে রয়েছে। উৎসাহ এবং পরামর্শ দিয়ে এই বিরাট যুদ্ধে জয় ছিনিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। তাকে ছাড়া এতদূর এগিয়ে আসা সম্ভব হত না।

বিজয় নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'এত লোক অর্জুনদের শেলটার দিতে চাইছে। প্রথমে কাদের বাড়ি পাঠাব?'

সুরেশ ঠোঁট টিপে হাসছিল। সে বলে, 'আপনার প্ল্যানটা আমি বোধহয় ধরতে পেরেছি।'

বিজয় চমকে ওঠে, 'কি রকম?'

'আপনি হয়ত নমকপুরার বহু লোককে দিয়ে সামাজিকভাবে অর্জুনদের অ্যাকসেপ্ট করিয়ে নিতে চান, তাই না?'

বিজয় হেসে ফেলে। বলে, 'হাঁ। আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

সুরেশ বলে, 'তা হলে আমি বলব, জগলালদের দাবি সবার আগে থাকলেও আনন্দদের বাড়ি অর্জুনদের প্রথমে যাওয়া উচিত। কারণ ওরা ব্রাহ্মণ। ওদের বাড়িতে অর্জুনদের মেনে নিলে অন্য ব্রাহ্মণদের রেজিস্টান্স কমে যাবে। ধীরে ধীরে টেনশন কেটে ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।'

'আমিও এই কথাই ভেবেছি।' বলে আবার মাইকের সামনে এসে দাঁড়ায় বিজয়, 'ভাইয়ো আর বহেনজিরা, আমাদের আশা পূর্ণ হয়েছে। আপনারা নিজের চোখেই দেখলেন, অনেকে অর্জুন আর কমলাকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা মঞ্চে এসে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। নমকপুরায় যে সমস্কারমুক্ত, মানুষের মতো মানুষ অনেকেই আছেন, সেটা জেনে আমি গৌরব বোধ করছি। আমি জানি এরপর আরো অনেকে অর্জুনদের আশ্রয় দেওয়ার জন্যে এগিয়ে আসবেন। যাই হোক, এখন পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি আনন্দজির বাড়িতে সবার আগে যাবে অর্জুনরা। তারপর পালা করে অন্য সকলের বাড়িতে। যতদিন না ওদের স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে, নমকপুরার সব বাড়িই হোক ওদের বাড়ি।'

বিজয়ের কথা শেষ হতে না হতেই চারদিকে হাততালি শুরু হয়ে যায়। আওয়াজ একটু থিতিয়ে এলে বিজয় ফের শুরু করে, 'এখনই আমরা আনন্দজির বাড়ি যাব। আমার অনুরোধ আপনারা আমাদের সঙ্গে অর্জুনদের আনন্দজির বাড়ি পৌঁছে দিতে যাবেন।'

জনতা গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'জরুর, জরুর।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, বিপুল জনতা অর্জুন এবং কমলাকে সামনে রেখে নমকপুরার বড় সড়ক ধরে ব্রাহ্মণটোলিতে আনন্দদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে।

শান্তিপর্ব

পশ্চিম থেকে পুবে যে হাইওয়েটা আড়াআড়ি ফরবেশগঞ্জের দিকে গেছে তার দু'ধারে উত্তর বিহারেব অফুবন্ত ফসলেব মাঠ। আকাশ যেখানে অনেকটা ঝুঁকে দিগন্তে নেমেছে, এই সব শস্যক্ষেত্র ততদূর ছড়ানো। মাঠের পব দিগন্তের গা ঘেঁষে ছোটখাট ক'টা পাহাড় আকাশে উঁচুনিচু ঢেউ এঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

সময়টা ফাল্গুনের মাঝামাঝি। মাসদেড়েক আগে, মাঘ পড়তে না পড়তেই 'ধানকাটাই'রা মাঠ ফাঁকা করে ফসল তুলে নিয়ে গিয়েছিল। এখন যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক — সব ধু ধু, শূন্য, নিঃস্ব।

সবে সকাল হয়েছে। এইমাত্র দিগন্তের তলা থেকে সূর্যটা উঠে এল। ষষ্ঠ ঋতুর মায়াবী আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক।

ফাল্গুনেব আধাআধি কেটে গেলেও সকালের দিকে রোদে তেমন ধাব নেই। মিহি সিল্কের মতো কুয়াশার পটি আকাশের কানাতে কি গাছপালার মাথায় কিংবা ফসলেব মাঠে আবছাভাবে ছড়িয়ে থাকে। এখনও বাতাসে হিমের আমেজ মাখানো। গায়ে লাগলে শিবশিব করে। ইতি'র পর পুনশ্চ'ব মতো উত্তব বিহারের এই অঞ্চলে শীতের খানিকটা জের থেকেই গেছে।

ফাল্গুনের এই সকালে পুবনো মডেলের বিরাট বিরাট চাকাওলা, হুডখোলা একটা মোটব হাইওয়েতে ঝড় তুলে পুব দিকে ছুটে যাচ্ছিল। ওটা যাবে ধরমপুরা টাউনে। গাড়িটার রুগ্ণ ঝরঝরে ইঞ্জিনে হাজারটা গলদ। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হলে যেমন হয়, অনববত সেইরকম সাঁই সাঁই আওয়াজ বেরুচ্ছে ওটার ফুসফুস থেকে।

গাড়িটার পেছনের সিটে বসে আছে কিরণ। তার পাশে তাদের পারিবাবিক ভকিল বা উকিল খুবলাল সহায়। গাড়িটা চালাচ্ছে কিরণদের বহুদিনেব পুরনো ড্রাইভার চৌধাবী সিং।

কিরণের বয়স একুশ বাইশ। ভারতীয় মেয়েদের তুলনায় তাকে বেশ লম্বাই বলা যায়। টান টান, সতেজ, মেদশূন্য চেহারা। মুখ ডিম্বাকৃতি। তার মসৃণ সজীব ত্বকে ডিমেব ভেতরকার কুসুমের মতো হলদে আভা। পাতলা নাক সটান কপাল থেকে নেমে এসেছে। উজ্জ্বল চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। রেশমের সূক্ষ্ম সুতোর মতো তার বাদামি চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা, ভুরু দুটো প্লাক-কবা।

কিরণের গালে এবং ঠোঁটে হালকা রং, নখ ম্যানিকিওর-করা। তার শরীর থেকে পারফিউমেব ফিকে গন্ধ উঠে আসছিল। বোঝা যায় —এই সব রং এবং গন্ধ কোনোটাই টাটকা নয়, দু'তিন দিনের বাসি।

কিরণের পবনে স্লিভলেস ব্লাউজ আর মেরুন রঙের শিফন শাড়ি। গয়না-টয়না সে পছন্দ কবে না। বাঁ হাতেব চৌকো সুদৃশ্য ঘড়ি এবং তার মেটাল ব্যান্ডটি ছাড়া আব কোথাও ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই। কোলের ওপর অবশ্য একটা গগলস্ আলতোভাবে পড়ে আছে।

একটু লক্ষ কবলে টের পাওয়া যায়, এই মেয়েটিব মধ্যে একটা শক্ত মেরুদণ্ড আছে। আছে এক ধরনের অনমনীযতা, যেটাকে ব্যক্তিত্বই বলা যেতে পাবে। সব মিলিযে সে আধুনিক, ঝকঝকে, নিজেব মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন, তেজী একটি তরুণী। অন্তত বাইরে থেকে সেবকম ধারণা কবা যায়।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা নয়। কিরণবা শাক্যদ্বীপী ব্রাহ্মণ। গোঁড়ামি, হাজাব বছরেব সংস্কাব, ব্রাহ্মণত্বের দম্ভ এবং ছুঁয়াছুতের চুলচেরা বিচার ইত্যাদি একাকার হয়ে তাদেব যে পারিবাবিক ট্রাডিশন, তাব সঙ্গে কিরণের সাজপোশাক, দামি বিদেশি পারফিউম, চুলের ছাঁট, কিছুই খাপ খায় না। তবু কিরণ যে আচমকা তাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আর বংশগত গোঁড়ামির আবহাওয়া থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া আলাদা রকমের হয়ে গেছে, এর পেছনে রয়েছে তাব বাবা মুকুটনাথ মিশ্র এবং ত্রিকূটনারায়ণ দুবের চতুর এবং সুদূরপ্রসাবী এক পবিকল্পনা। ত্রিকূটনারায়ণ পনের বছর ধবে একনাগাড়ে স্বপ্ন দেখছেন কিরণকে পুতহু বা পুত্রবধূ করে ঘরে তুলবেন। কিন্তু এসব কথা পরে।

কিরণের সঙ্গী ভকিল খুবলাল সহাযেব চেহারাখানা দেখার মতো। শবীরে মাংস-টাংস বা শাঁস বলে

কিছু নেই, সবটাই হাড় আর ছিবড়ে। লোকটা বেজায় ঢ্যাঙা, তাই কিছুটা কুঁজো দেখায়। তার সব কিছুই অস্বাভাবিক লম্বা—হাত, পা, আঙুল, মুখ। ঢিবির মতো নাকের তলায় চৌকো গোঁফ। চোখে ধূর্ত এবং সতর্ক চাউনি।

খুবলালের বয়স ষাটের কাছাকাছি। তার চুল পাকলেও সাদা হয়নি, কেমন যেন পাঁশুটে রং ধরে আছে।

লোকটার পরনে ঢলঢলে ফুল প্যান্ট আর বেঢপ কালো কোট। মামলার ব্যাপারে এজলাসেই যাক, আর মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজতেই বেরোক, এই কালো কোটটা তার গায়ে সর্বক্ষণ ঝুলতে থাকে।

চৌত্রিশ বছর আগে পাটনা থেকে ল'য়ের ডিগ্রি নিয়ে আসার পরদিনই কিরণের বাবা মুকুটনাথ খুবলালকে তাঁদের নিজস্ব উকিল করে নেন। মিশ্র বংশের আইনঘটিত যাবতীয় দায়দায়িত্ব তখন থেকেই তার কাঁধে চেপে আছে। জমিজমা, বিষয়-আশয় সম্পর্কে মিশ্রদের সবরকম স্বার্থই তার হাতে সুরক্ষিত। কেস-টেস ছাড়াও মুকুটনাথদের পারিবারিক প্রচুর কাজও করে দেয় খুবলাল। লোকটা যেমন অনুগত তেমনি বিশ্বাসী। তার আনুগত্য প্রায় পোষা কুকুরের মতো।

পাশে বসে খুবলাল চোখের কোণ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে, খানিকটা ভয়ে ভয়েই যেন, কিরণকে লক্ষ করছে। কিছু বলতে চায় সে, কিন্তু ঠিক সাহস পাচ্ছে না। অথচ এখন না বললেই নয়। কেননা, কয়েক মিনিটের ভেতর তারা ধরমপুরা পৌঁছে যাবে। তখন আর সময় পাওয়া যাবে না। নিজের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা অস্থিরতা এবং স্নায়বিক চাপ টের পেতে থাকে সে।

কিরণ কিন্তু একবারও খুবলালের দিকে তাকাচ্ছে না। তার মুখ জানালার বাইরে ফেরানো।

এই সকালবেলায় হাইওয়েতে লোকজন বা গাড়িটাড়ি তেমন চোখে পড়ে না। মাঝে মধ্যে দু-একটা দূরপাল্লার বাস বা ট্রাক সাঁ-সাঁ করে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তবে গৈয়া এবং ভৈসা গাড়ি বেশ কয়েকটাই দেখা গেল। চাকায় ক্যাঁচোর-কোঁচর আওয়াজ তুলে অলস ঢিমে চালে সেগুলো নবীগঞ্জের দিকে চলেছে।

অদৃশ্য চোরা স্রোতের মতো ফাল্গুনের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে প্রান্তরের ওপর দিয়ে। রাস্তার দু'ধারে পরাস আর সিমার গাছগুলোতে শীত কাটতে না কাটতেই ফুল ফুটতে শুরু করেছে। নির্জন ফসলের খেতে ক্বচিৎ দু-একটা মাঠকুড়ানি চোখে পড়ে। ধান কেটে নিয়ে যাবার পর যে দু'চার দানা শস্য এখানে ওখানে, আলের ধারে বা ইঁদুরের গর্তে পড়ে আছে, তারা সেগুলো খুঁটে খুঁটে জড়ো করছে। আলের ওপর দিয়ে বুক টেনে টেনে মন্থর ভঙ্গিতে চলেছে অগুনতি গোসাপ। দেখে মনে হয়, পৃথিবীর কোনো কিছুতে তাদের আদৌ গরজ নেই।

মাথার ওপর এখন অজস্র পাখি—ঝাঁকে ঝাঁকে বক সিল্লি আর পরদেশি শুগা। ডানায় হাওয়া মাপতে মাপতে তারা দিগন্ত পেরিয়ে কোথায় চলেছে, কে জানে।

কিরণ জানে, হাইওয়ের ডাইনে গোলগোলি মৌজা আর বাঁ ধারের মৌজাটার নাম বইহারি। দুই মৌজায় এবং দূরে ছোট ছোট পাহাড়ের যে রেঞ্জটা রয়েছে সেগুলোর গায়ে যত জমিজমা, সবই তাদের। সে শুনেছে কয়েক বছর আগে বিনোবা ভাবে ভূদান মুভমেন্টের কাজে এদিকে পদযাত্রা করেছিলেন। গরিব ভুখা ভূমিহীন মানুষদের জন্য বড় বড় জমিমালিকদের কাছে তিনি হাত পেতেছিলেন, যদি তারা কৃপা করে নিজেদের শত শত একর জমি থেকে দু'এক টুকরো খেত দান করে।

বিনোবার পদযাত্রা এ অঞ্চলে বেশ সাড়া তুলেছিল। বড় জমিমালিকদের হৃদয়ের নাকি এতটাই পরিবর্তন ঘটে যায় যে বিনোবার সামনে সরকারি অফিসারদের ডেকে এনে স্ট্যাম্পড কাগজে তারা নির্ভূম কিষাণদের নামে দানপত্র লিখে দিয়েছিল। সেবার তার বাবা মুকুটনাথও কয়েক ঘর অচ্ছুৎকে সুদূর পাহাড়ের গায়ের সবটুকু জমি লিখে দিয়ে বিনোবাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ভূদান যজ্ঞে মহানুভবতার এমন দৃষ্টান্ত ভূ-ভারতে আগে আর কখনও দেখা যায় নি, এমন কি পরেও না। অভিভূত আপ্লুত বিনোবা নাকি এমন কথাও বলেছেন, গোটা ভারতবর্ষে যদি মুকুটনাথের মতো মহান আত্মা হাজার খানেকও পাওয়া যায় এ দেশ সত্যিকারের রামরাজ্য হয়ে যাবে। অবশ্য তিনি জানতেন না মুকুটনাথ যে জমি দান করেছেন তা পাথুরে কর্কশ এবং বাঁজা। এই পড়তি নিষ্ফলা মাটিতে এক দানা

ধান গেঁহু তো দূরের কথা, অকেজো আগাছাও জন্মায় না।

তবে বইহারি এবং গোলগোলি মৌজার উৎকৃষ্ট দো-ফসলা জমিগুলোর কথা একেবারেই আলাদা। দু'বার লাঙল দিয়ে বীজ রুইলেই ফি বিঘেতে তিরিশ মণ করে ভাল জাতের তুলসীমঞ্জরী, পূর্বী কেলাসর বা গজমুক্তা ধান ফলে। চৈত্র মাসে পাওয়া যায় অঢেল রবি ফসল—তিল তিসি রাই সর্ষে মুগ কলাই ইত্যাদি।

মিশ্রদের কয়েক জেনারেশন ধরে একটা পারিবারিক অহংকার বা গর্ববোধ রয়েছে। তাঁরা এ অঞ্চলের অন্য জমিমালিকদের মতো নন। অন্যেরা লাঠি বন্দুক এবং পোষা পহেলবানদের জোরে বা হাজারটা কূট কৌশলে অচ্ছুৎ, আনপড়, গরিবের চাইতেও গরিব মানুষদের জমিজমা খেত কেড়েকুড়ে নেয়। মিশ্রদেরও প্রচুর গুলি-বন্দুক আছে, পোষা পহেলবান আছে, কিন্তু জোরজুলুম করে কারুর এক ধুর মাটিও তারা কোনোদিন ছিনিয়ে নেননি। এটা তাঁরা ভাবতেই পারেন না, উলটে এ জাতীয় বর্বর নিষ্ঠুর পদ্ধতিকে প্রচণ্ড ঘৃণা করেন।

মিশ্রদের বিষয়-আশয় বাড়াবার প্রক্রিয়া একেবারেই অন্যরকম। তাঁদের যাবতীয় জমিজমা এসেছে বিয়ের যৌতুক হিসেবে। মিশ্রদের এমনই কপাল যে গত পাঁচ জেনারেশন ধরে তাঁদের বংশে একটি মেয়েও জন্মায়নি, সবই ছেলে। মুকুটনাথ, তাঁর বাবা মথুরনাথ, তাঁর বাবা জগন্নাথ, তাঁর বাবা রাজনাথ এবং তস্য পিতা চতুরনাথ। চতুরনাথের আগে মিশ্রদের বংশতালিকার আদি ইতিহাস এখন আর জানা যায় না। সে সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

মিশ্ররা বেছে বেছে এমন সব ঘর থেকে পুতহু বা পুত্রবধূ এনেছেন যাদের জমি ঠিক তাঁদেরই জমিজমার পাশে। প্রতিটি ছেলের বিয়েতে তাঁরা দেড়শ থেকে দু'শ বিঘে করে জমি আদায় করেছেন। ছেলের শ্বশুরের কাছে যৌতুক হিসেবে মিশ্ররা সোনা চাঁদি হীরে জেবর এবং টাকাপয়সা কিছুই চাননি। এসব উত্তেজক ধ্বংসপ্রবণ বস্তুগুলির ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ কম, কিন্তু জমির মার নেই। চোর ডাকাত তা কেড়ে নিতে পারবে না।

যৌতুক নিয়েই জমিগুলোকে আইনের মারপ্যাচে এমনভাবে মিশ্ররা বেঁধে দিয়ে গেছেন যাতে পরের জেনারেশনের কেউ বেচে 'সত্যনাশ' করে দিতে না পারে। এইভাবে সম্পত্তি বাড়াতে বাড়াতে গোলগোলি এবং বইহারি মৌজা দুটো তাঁদের মুঠোর ভেতর চলে এসেছে।

আসলে বংশ পরম্পরায় মিশ্ররা বিয়েটাকে বিষয় সম্পত্তি বাড়ার কাজে একটা সূক্ষ্ম চারুকলার স্তরে তুলে এনেছেন। তাঁদের কাছে বিয়ে মানেই জমি, পুতহুর অর্থ হল ল্যান্ড প্রোপার্টি। পুরুষানুক্রমে এটাই হল মিশ্র বংশের বীজমন্ত্র।

কিন্তু পাঁচ জেনারেশন নির্বিঘ্নে কাটবার পর হঠাৎ পারিবারিক পরম্পরা ভেঙে মুকুটনাথের দু'টি মেয়ে হয়েছে—কিরণ এবং সুষমা। বরাবর মিশ্ররা যৌতুক পেয়েই এসেছেন, এবার তাঁদের দেওয়ার পালা। দুই মেয়ের বিয়েকে মুকুটনাথ কতটা নিপুণভাবে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারেন, এখন সেটাই দেখার।

কিরণ অন্যমনস্কর মতো তাকিয়েই আছে। দু'ধারের ফাঁকা মাঠ, আবছা ফিনফিনে কুয়াশা, মাথার ওপর পাখির ঝাঁক বা দিগন্তের গা ঘেঁষে পাহাড়ের অস্পষ্ট রেঞ্জ, কিছুই সে দেখতে পাচ্ছিল না। গাড়িটা ধরমপুরার দিকে যত এগোচ্ছে ততই এক ধরনের ভয় উৎকণ্ঠা এবং দুশ্চিন্তা তার চোখেমুখে ফুটে উঠছে।

পরশু দুপুরে দিল্লিতে তাদের হস্টেলে এসে খুবলাল জানিয়েছিল, মুকুটনাথ হঠাৎ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক, আজই কিরণকে খুবলালের সঙ্গে ধরমপুরায় ফিরে যেতে হবে। প্রচুর ঘুষ দিয়ে দু'খানা টিকিট কেটে সেই দিনই রাত্তিরের ট্রেন ধরেছিল তারা। কাল সন্ধেয় এসেছে পাটনা। সেখান থেকে আরেকটা ট্রেনে আজ ভোরে এসে নেমেছে পানপোরিয়াতে। স্টেশনে চৌধারী সিং তাদের জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

এদিকে প্রায় মরিয়া হয়েই শেষ পর্যন্ত খুবলাল পাশ থেকে ডাকে, 'কিরণ—'

কিরণ আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

খুবলাল ভীরু গলায় বলে, 'বেটা, আমার একটা অন্যায় হয়ে গেছে।'

ভুরু দুটো সামান্য কুঁচকে যায় কিরণের, এবারও সে কিছু বলে না।

খুবলাল গলা খাঁকরে খানিকটা সময় নিয়ে সাহস সঞ্চয় করে। তারপর বলে, 'আমি তোমাকে ঝুট বলেছি।'

'ঝুট!' কিরণের গলায় শব্দটা প্রতিধ্বনির মতো শোনায়। বেশ অবাকই হয়ে গেছে সে।

'হাঁ। মুকুটনাথজির কিছু হয়নি, তাঁর তবিয়ত ভালই আছে।' নিশ্বাস না ফেলে এক দমে বলে যায় খুবলাল।

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে কিরণ। কী বলবে, এই মুহূর্তে ভেবে পায় না। অনেকক্ষণ পর বলে, 'মিথ্যে বলার কী দরকার ছিল? বাবুজির জন্যে দুশ্চিন্তায় দু'রাত আমাকে ঘুমোতে দেননি।'

'জানি বেটা, চিন্তা হওয়ারই কথা। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না।' খুবলাল যেন অনুতপ্ত সুরেই জানায়, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকের অজুহাত খাড়া না করলে কিছুতেই কিরণকে দিল্লি থেকে আনা যেত না।

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা সূক্ষ্ম চক্রান্ত রয়েছে। হঠাৎ শরীরের সমস্ত রক্ত কিরণের মাথায় উঠে আসে। অসহ্য রাগে তার নাক মুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। তীব্র গলায় সে বলে, 'এর মানে কী? কী মতলব আপনাদের?'

খুবলাল নিজেকে গুটিয়ে নিতে নিতে কাঁপা গলায় বলে, 'এর বেশি কিছু বলতে পারব না বেটা। মুকুটনাথজি যেমন বলেছেন আমি তাই করেছি। আমি তাঁর নিমক খাওয়া নৌকর।'

লোকটার ওপর হঠাৎ করুণাই হয় কিরণের। গলার ঝাঁজ কমিয়ে সে বলে, 'ঠিক আছে, ধরমপুরায় গিয়ে এখনই আমি বাবুজিকে জিজ্ঞেস করব।'

কিছু একটা মনে পড়ে যায় খুবলালের। সে বলে, 'মুকুটনাথজি তো এখানে নেই।'

কিরণ এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় তবে!'

'দো রোজ আগে বনারস গেছেন। একই সাথ আমরা ধরমপুরা থেকে বেরিয়েছিলাম। আমি দিল্লি গেলাম, মুকুটনাথজি কাশী।'

কিরণের বিস্ময় কয়েক গুণ বেড়ে যায়, 'কাশী গেছেন কেন?'

'তোমার দাদীজির জন্যে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

খুবলাল সহায় এবার যা বলে, সংক্ষেপে এইরকম।

মাসখানের আগে কিরণের চুরাশি বছরের ঠাকুমার শরীরের হাল আচমকা এমনই খারাপ হয়ে যায় যে মনে হয়েছিল তাঁর মৃত্যু একেবারে অবধারিত। তক্ষুনি তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করতে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কাশীতে 'দেহান্ত' ঘটলে স্বর্গবাস অনিবার্য—পুরুষানুক্রমে মিশ্রদের এ বিশ্বাস অটল। কিন্তু বেনারসে গোটা একটি মাস কাটিয়েও যখন বুড়ির মরার কোনোরকম ইচ্ছাই দেখা গেল না, বরং হাওয়া এবং জায়গা বদলের কারণে রীতিমত সুস্থই হয়ে উঠলেন তখন অত দূরে তাঁকে রাখার মানে হয় না। মুকুটনাথজি তাই তাঁকে আনতে কাশী ছুটেছেন। আজকালের মধ্যে ওঁরাও ধরমপুরায় ফিরে আসবেন।

কিরণ বলে, 'দাদীকে বেনারস পাঠানো হয়েছে, আমাকে কেউ জানায়নি তো!' তাকে বেশ ক্ষুব্ধই দেখায়।

খুবলাল বলে, 'আচমকা এরকম একটা খবর পেলে দিল্লিতে তুমি খুব চিন্তা করতে, তাই জানানো হয়নি। তবে তেমন কিছু হলে মুকুটনাথজি টেলিগ্রাম করতেন কি লোক পাঠাতেন।'

কিরণ আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। বাবার জন্য পরশু থেকে যে দুশ্চিন্তা প্রবল চাপে তার স্নায়ুগুলোকে সারাক্ষণ ছিঁড়ে ফেলছিল, যে অসহ্য কষ্টে বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল, এখন সে সব কেটে যায়। হালকা বোধ করতে গিয়েও পরক্ষণে আর এক ধরনের মারাত্মক ভয়ে

কিরণের মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে বরফের স্রোত নামতে থাকে। কেননা, তিনদিন পর এখন হঠাৎ মনে পড়ে যায়—তার পেটে রয়েছে একটি অবৈধ ভ্রূণ, আর এই ভ্রূণটি তৈরি হয়েছে খ্রিস্টানের বীজ থেকে। শুধু খ্রিস্টানই নয়, সে অচ্ছুৎও। অচ্ছুৎ থেকে সে খ্রিস্টান হয়েছে।

ধরমপুরার মিশ্রদের চোখে কুঁয়ারীর, বিশেষ করে গোঁড়া শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের ঘরের অবিবাহিত মেয়ের গর্ভে বাচ্চা আসার মতো জঘন্য পাপ ভূ-ভারতে দ্বিতীয়টি নেই। তার ওপর সেই বাচ্চা যদি অচ্ছুৎ ও খ্রিস্টানের হয় তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, ভাবতেও সাহস হয় না কিরণের।

মিশ্রদের ধারণা, সত্যযুগের পর তাঁদের মতো শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। কাজেই মৃত্যুর পর তাঁদের আত্মাগুলি যে স্পেশাল শকটে চেপে সোজাসুজি স্বর্গে চলে যায়, এ ব্যাপারে কারুর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না। স্বর্গের ব্রাহ্মণ কলোনিতে পুরুষানুক্রমে মিশ্র বংশের যে সব আত্মা অপার শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে, ঘুণাক্ষরে যদি তারা কিরণের পেটের ভ্রূণটার কথা টের পায়, একেবারে শিউরে উঠবে।

আপাতত স্বর্গবাসী পূর্বপুরুষদের অদৃশ্য আত্মাগুলির কথা আদৌ ভাবছে না কিরণ। এই পৃথিবীতে যারা চারপাশের গাছপালা প্রান্তর বা আকাশের মতোই প্রত্যক্ষ, তাঁদের মুখগুলি চোখের সামনে সারি সারি ফুটে উঠতে থাকে। মা, বাবা, ঠাকুমা, বশিষ্ঠনারায়ণ ইত্যাদি। নিশ্চয়ই মুকুটনাথ প্রভাকরের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং পরিণতি হিসেবে তার গর্ভবতী হবার খবর পেয়ে গেছেন। তাই চতুর একটি চাল চেলে খুবলালকে দিল্লি পাঠিয়ে তাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছেন।

কিরণ একবার ভাবে, চৌধারী সিংকে গাড়ি থামাতে বলে নেমে যাবে। তারপর বাস-টাস ধরে সোজা স্টেশনে গিয়ে দিল্লির ট্রেন ধরবে। পরমুহূর্তেই অদম্য জেদ তাকে পেয়ে বসে। কিরণের ধারণা সে যা করেছে তা সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায়, কেউ তার ওপর জোরজুলুম করেনি। এই সন্তান ধারণের জন্য তার কোনোরকম পাপবোধ বা অনুতাপ হচ্ছে না।

কিরণ ভাবে, বাড়ির কাছাকাছি যখন এসেই পড়েছে তখন ভীরুর মতো পালিয়ে যাওয়ার কারণ নেই। সে জানে, ব্রাহ্মণত্বের দম্ভ, বিখ্যাত মিশ্র বংশের অহংকার, গোঁড়ামি, হাজার বছরের পুরনো সংস্কার, মা, মুকুটনাথ, ঠাকুমা, তাদের কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ চৌবে—সব একাকার হয়ে প্রচণ্ড শক্তিমান, অনমনীয় এবং একরোখা এক প্রতিপক্ষ তাকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করছে। এদের মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে।

মিশ্র বংশের কাছে একটা বিরাট ব্যাপার হল—শান্তি এবং স্থিতাবস্থা। স্থিতাবস্থা ব্যাপারটাকে মূল্যবান পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে জেনারেশনের পর জেনারেশন আগলে রাখা হয়েছে। পুরুষানুক্রমে ধর্মপালনের মতো সবাই এটা অটুট রাখছেন। কখনও কোনো পরিস্থিতিতেই শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটেনি।

কিরণের বাবা মুকুটনাথ বহুকাল আগে কয়েক বছর ধরমপুরার সরকারি হাই স্কুলে যাতায়াত করেছিলেন। তারই স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তাঁর কথায় হামেশাই দু'চারটে ইংরেজি শব্দ ঢুকে পড়ে। তিনি মাঝে মাঝেই বলেন, 'যা চালু আছে তা চলতে দাও। কিসী প্রকার ডিসটার্ব মাত্ করনা। তাতে অশান্তি ছাড়া কোনো গেইন নেই। শান্তিভঙ্গ আমার বিলকুল না-পসন্দ।'

কিরণের কারণে কয়েক শ বছর পর এই প্রথম মিশ্র বংশে সম্ভবত শান্তি ধ্বংস হতে চলেছে।

নানা চিন্তার মধ্যেও একটা কথা ভেবে মজাই পায় কিরণ। ঠাকুমা গঙ্গাযাত্রা শেষ না করে বেনারস থেকে ফিরে আসছেন, আর পেটে একটি অবৈধ ভ্রূণ নিয়ে সে আসছে দিল্লি থেকে। তার এবং ঠাকুমার মধ্যে মাত্র একটা জেনারেশনের গ্যাপ। কিন্তু মনে হয়, তারা যেন সৌরলোকের আলাদা আলাদা দু'টি গ্রহের মানুষ—পরস্পরের সম্পূর্ণ অচেনা।

তার পেটের ভ্রূণটার কথা জানামাত্র ঠাকুমার মনের অবস্থা কী হবে, ভাবতে গিয়ে চমকে ওঠে কিরণ। আর চমকে উঠতে গিয়ে মনে মনে হেসেই ফেলে। বুড়ির তখনই, সেই মুহূর্তে দেহান্ত হয়ে যাবে। নতুন করে কাশীতে গঙ্গাযাত্রার সময় আর পাওয়া যাবে না।

দুই

হাইওয়ের গা ঘেঁষে ধরমপুরা টাউন। বড় সড়ক অর্থাৎ হাইওয়ে থেকে নেমে এক ফার্লং যেতে না যেতেই ধরমপুরার প্রথম যে বাড়িটা চোখে পড়ে সেটা মিশ্রদের।

বিহারের এই সব অঞ্চলের বিরাট বিরাট জমিমালিকদের বাড়ি যেমন হয়, মিশ্রদের বাড়িটা তার থেকে আলাদা কিছু নয়। প্রায় সাত-আট বিঘে জায়গা জুড়ে বিশাল কমপাউন্ড। দশ ফুট খাড়াই আর আড়াই ফুট চওড়া দেওয়াল দিয়ে সেটা ঘেরা। বাউন্ডারি ওয়ালের মাথায় নানা রঙের ভাঙা কাচের টুকরো আর উলটো করে গজাল বসানো। এটা হল চোর এবং ডাকাতদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

বাড়িটার সামনে প্রকাণ্ড দরজা। তারপর অতিরিক্ত সতর্কতার কারণে জবরদস্ত কোলাপসিবল গেট। দিনরাত দুটো বিপুল চেহারার ভোজপুরী দারোয়ান কাঁধে বন্দুক এবং বুকে টোটার মালা ঝুলিয়ে সেখানে পাহারা দেয়। গেটের ডান পাশে কমপাউন্ড ওয়ালের গায়ে শ্বেত পাথরের ফলকে বাড়িটার নাম লেখা আছে : 'মিশ্র নিকেত'।

সাত আট বিঘের পুরোটা জুড়েই বাড়ি নয়। মাঝখানে প্রকাণ্ড তেতলা। কম করে খান ষাটেক ঘর আছে এ বাড়িতে। সামনে এবং পেছনে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা। ছাদে কুলদেবী মহালছমীর ঘর বা মন্দির।

আগে সামনের দিকের খোলা জায়গায় শেড বানিয়ে প্রচুর ঘোড়া, মোষ এবং কয়েকটা ফিটন এবং বড় বড় চাকাওলা, ক্যানভাসের হুড-বসানো, পুরনো মডেলের একটা মোটর রাখা হত। বাড়িটার পেছনে রয়েছে দিশি ফুল, ফল এবং সবজির বাগান। দিনকয়েক আগে সামনের শেড খুলে পেছনের বাগানের পাশে নিয়ে বসানো হয়েছে এবং গরু মোষ ফিটন মোটর সব ওখানে চলে গেছে।

সামনের দিকটা একেবারে তকতকে পরিষ্কার। শুধু এক কোণে দিনরাত মজুর খাটিয়ে একটা পুবমুখি নতুন মন্দির বানানো হয়েছে। এতে কুলদেবী মহালছমীর মূর্তি নেই, আছে নীল পাথরে খোদাই নীলকণ্ঠ শিবের মূরত। রাতারাতি এই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা নেহাত অকারণে নয়। কিন্তু সে কথা পরে।

মন্দিরের বাঁ পাশে ছোটখাট পুকুরের মতো চৌবাচ্চা করা হয়েছে। চৌবাচ্চাটা গঙ্গাজলে ভর্তি। সেটার গা ঘেঁষে বাঁধানো চবুতর।

মিশ্ররা যে মারাত্মক ধরনের গোঁড়া সেটা বাড়ির চেহারা দেখলেই টের পাওয়া যায়। এত বড় বাড়ির জানালা এবং দরজাগুলো ভীষণ চাপা এবং ছোট ছোট। দরজায় ভারি পর্দা আর জানালায় লোহার মজবুত জাল। বাইরের লোকের চোখ এবং মুক্ত বাতাস যাতে বাড়ির ভেতর না পৌঁছুতে পারে তার সব ব্যবস্থাই পাকাপাকিভাবে করা হয়েছে। হাজার বছরের গোঁড়ামি এবং সংস্কারের শিকড় এ বাড়ির ভিতের তলায় বহুদূর ছড়িয়ে আছে।

'মিশ্র নিকেত'-এর ভেতরটা সব সময় আবছা আবছা। এমন কি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে রোদে যখন প্রচণ্ড তেজ তখনও এ বাড়ি কেমন যেন ছায়াচ্ছন্ন, অন্ধকার।

চার জেনারেশন আগে এই বাড়িটা ঠিক এই মডেলে তৈরি করেছিলেন চতুরনাথ মিশ্র। গোঁড়ামির ছাঁচে ঢেলে তিনি যে জীবনযাত্রার প্যাটার্ন তৈরি করে দিয়ে গেছেন, পরের জেনারেশনের বংশধরেরা একান্ত নিষ্ঠায় তা চালু রেখেছে, এতটুকু হেরফের হতে দেয়নি।

মিশ্রদের এখন যিনি প্রধান পুরুষ সেই মুকুটনাথ মিশ্রকে হয়ত কিছুটা লিবারেল বলা যায়। তিনি অচ্ছুৎদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কথা বলেন, দৈবাৎ তাদের ছায়া মাড়িয়ে ফেললে আগের আগের জেনারেশনের মতো দশ বার নাহানা করে নিজের দেহ শুধ্ (শুদ্ধ) করার কথা ভাবেন না। এই সামান্য পরিবর্তনটা হয়ত দিনকাল বদলে যাওয়ার কারণে। যতই পূর্বপুরুষেরা স্টিলের ফ্রেমে জীবনযাত্রার মডেল বাঁধিয়ে দিয়ে যান না, সময় তলায় তলায় সবার অজান্তে নিজের কাজ করে যায়। তবুও লিবারেল মুকুটনাথ দরজা-জানালা ভেঙে সেগুলো বড় করে বাইরের আলো-হাওয়া বইয়ে দেবার কথা ভাবতে পারেন না। আবহমান ট্রাডিশন ভাঙার শক্তি সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই তাঁর নেই। সুদীর্ঘ কালের প্রাচীন সংস্কার লক্ষ কোটি জীবাণু হয়ে তাঁর রক্তে ছড়িয়ে আছে। কাজেই দরজায় পুরু পর্দা,

জানালায় লোহার জাল নির্বিঘ্নেই বজায় আছে।

একসময় কিরণদের গাড়িটা 'মিশ্র নিকেত'-এর গেট পেরিয়ে ভেতরে এসে থামে। গাড়িতে বসেই বাড়ির সামনের দিকের পরিবর্তনটা দেখতে পায় কিরণ। বছরখানেক বাদে সে ধরমপুরায় এল। এর মধ্যে অনেক কিছু বদলে গেছে। গরু-মোষের 'শেড'গুলো নেই। ওধারে শিব মন্দির উঠেছে, পুকুর বানানো হয়েছে। সে বেশ অবাকই হয়।

খুবলাল সহায় গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল। ঘুরে এসে কিরণের দিকের দরজা খুলে দিয়ে নরম গলায় বলে, 'নামো বেটা—' তারপর গলা চড়িয়ে নৌকরদের ডাকাডাকি শুরু করে, 'এ ভলুয়া, এ ঘনিরাম, সামান লে যা।' এ বাড়ির কাজের লোকেদের সবাইকেই চেনে সে।

কিরণ নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নামে। তখনই দেখতে পায়, খানিকটা দূরে শিব মন্দিরের সামনের উঁচু চাতালে বসে আছেন তাদের কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ এবং তার মা রেবতী। কাছাকাছি একটা বড় পেতলের পরাতে প্রচুর ফুল নিয়ে বসেছে মায়ের খাস নৌকরনী কোয়েরি। এধারে ওধারে দু'চারটে নৌকর ভীষণ ব্যস্তভাবে বাড়িঘর ধোয়ামোছা করছে।

কিরণকে দেখে যে যার কাজ থামিয়ে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে।

ওধার থেকে বশিষ্ঠনারায়ণ ডাকেন, 'এখানে এস বেটা।'

চুপচাপ মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায় কিরণ, তার পাশে খুবলাল।

বশিষ্ঠনারায়ণের বয়স সম্ভব বাহাত্তর। গোলগাল মাঝারি চেহারা, গায়ের রং টকটকে। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, পেছনে এক গোছা ধবধবে মোটা টিকি। নিয়মিত তিনটি বেলা বিপুল পরিমাণে দুধ এবং ঘি তিনি খেয়ে থাকেন। ফলে তাঁর মসৃণ নিভাঁজ চামড়া থেকে সর্বক্ষণ যেন মাখন গড়িয়ে পড়ছে। দু'চোখ স্নেহে ভেজা। মুখে অপার প্রশান্তির একটি হাসি লেগেই আছে।

বশিষ্ঠনারায়ণের পরনে ফিনফিনে সাদা থান এবং উড়নি। উড়নিটা এত মিহি যে ভেতরে পৈতের গোছা দেখা যাচ্ছে।

আগে আগে কিরণের মনে হত, পবিত্র ব্রাহ্মণের চেহারার মডেলটি এরকমই হওয়া উচিত।

রেবতীর বয়স পঞ্চাশের মতো। নরম ধাঁচের ছোটখাট চেহারা তাঁর। এই বয়সেও শরীরে মেদ টেদ তেমন জমেনি। গায়ের রং কালোই বলা যায়, তবে মুখটি ভারি সুন্দর। পানপাতার মতো গড়ন, সরু চিবুক, ভাসা ভাসা বড় চোখ, পাতলা ঠোঁট। ছোট্ট কপালের ওপর থেকে কোঁচকানো কোঁচকানো ঘন চুলের ঘের। সিঁথির দু'পাশে কিছু কিছু চুল সাদা হতে শুরু করেছে।

এ অঞ্চলের বিশেষ একটি স্টাইলে একটা রঙচঙে শাড়ি ফেরতা দিয়ে পরেছেন রেবতী। রঙিন জমকালো কাপড় চোপড় তাঁর খুব পছন্দ। দু'হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি এবং মোটা কাংনা, নাকে হীরের নাকফুল, গলায় মটরদানা হার, কোমরে চাঁদির চওড়া বিছে। বিছের সঙ্গে বাঁধা চাবির থোকা।

কিরণ জানে, এই কোমল ধাঁচের মহিলাটির মধ্যে কোথায় যেন অলৌকিক দৃঢ়তা আছে।

রেবতী স্থির চোখে কিরণকে লক্ষ করছিলেন। তাঁর ঠোঁট দৃঢ়বদ্ধ, তাকানোর ভঙ্গিতে অদ্ভুত কাঠিন্য। অন্যান্য বার দিল্লি থেকে বাড়ি এলেই মা ছুটে এসে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতেন, স্নিগ্ধ মুখে কত কথা যে বলতেন! কিরণের শরীর কেমন আছে, দিল্লিতে সময়মতো খাওয়া দাওয়া করত কিনা, বন্ধুদের খবর কী—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাঁচ মিনিটে সব কিছু জেনে নিতেন। এবার উচ্ছ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই, রেবতীর মুখ চোখ একেবারে অন্যরকম—রুক্ষ, কর্কশ, আবেগশূন্য।

কিরণ বুঝতে পারে, মা তার ব্যাপারটা জেনে গেছেন। কিন্তু এই জানাটা কতদূর পর্যন্ত, সেটাই ধরা যাচ্ছে না। ফলে অচেনা সংশয় তার বুকের ভেতর প্রবল চাপ তৈরি করতে থাকে।

এদিকে বশিষ্ঠনারায়ণ মধুর হেসে বলেন, 'বেটা, আগে শিউশংকরজির নয়া মন্দিরে প্রণাম করে নাও। পরে অন্য কথা হবে।'

আরেকটু হলে উটকো ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে ফেলত কিরণ। সে যা বলতে যাচ্ছিল তা এইরকম। বাড়ির ছাদে কুলদেবী মহালছমীর ঘর থাকা সত্ত্বেও নতুন করে এক্সট্রা একটা শিবমন্দির তোলার উদ্দেশ্য কী? পাঁচ জেনারেশন ধরে পুজো চড়াবার পরও কি মহালছমী মিশ্র বংশের মনস্কামনা পূর্ণ করতে পারেন

নি? আরো ল্যান্ড আরো পুণ্য আরো দৌলতের জন্যই কি শিবকে বাড়িতে এনে বসানো হয়েছে? বলতে গিয়েও এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, ভাবতেই সামলে নিয়েছে কিরণ। কিন্তু একটা খটকা থেকেই যায়। শিবের পুজোয় সারপ্লাস পুণ্য হয়ত হতে পারে কিন্তু তার যতদূর জানা আছে টাকা পয়সা প্রোপার্টি, জমিজমা, এসব শিবের এক্তিয়ারের বাইরে।

বশিষ্ঠনারায়ণ স্নিগ্ধ গলায় আবার বলেন, 'পরণামটা সেরে নাও বেটা।'

কিরণের খেয়াল হয়, সে দাঁড়িয়েই আছে। গুরু, ঈশ্বর, দেবদেবী, পুজো পার্বণ, এ সব ব্যাপারে তার তেমন আগ্রহ নেই। তবে সে পুরনো ধর্মবিশ্বাস বা ট্রাডিশনকে ধ্বংস করার মতো প্রচণ্ড বিপ্লবীও না। কিরণ একজন নন-প্রাকটিসিং হিন্দু এবং সহাবস্থানে বিশ্বাসী। কৃষ্ণ বিষ্ণু ব্রহ্মা কালী দুর্গা তৌহার-পরব, এসবও থাক এবং আমিও থাকি, এরকমই তার মনোভাব। দেবদেবীর মূরতের সামনে মাথা নোয়ানোটাকে সে খুব একটা লজ্জাকর কাজ বলে মনে করে না। আবার নোয়ালেই বাড়তি কিছু পুণ্য তার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে, তা-ও ভাবে না। আসলে পাপপুণ্য নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো অঢেল সময় নেই তার।

সিঁড়ি ভেঙে চবুতরে উঠতে গিয়ে শরীরের অভ্যন্তরে সেই ভ্রূণটার কথা হঠাৎ আবার মনে পড়ে যায় কিরণের, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। হাজার বছরের অদৃশ্য সংস্কার তাকে ওপরে উঠতে দেয় না, ক্রমাগত পেছনে টানতে থাকে। এ অবস্থায় শিবের মূরতের সামনে যেতে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করে সে।

সিঁড়ি দিয়ে ফের নামতে নামতে কিরণ বলে, 'গুরুজি, দু'রাত ট্রেনে এসেছি। জামাকাপড় নোংরা, বাসি। স্নান করে শিউশংকর আর আপনাকে প্রণাম করে যাব।'

একটু চিন্তা করে বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'ঠিক হ্যায় বেটা।' বলে মূল মন্দিরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন, 'এই যে শিউশংকরজির মূরত দেখছ, ইনি বহুত মহত্ত্বপূর্ণ নীলকণ্ঠ শিব। অন্দর-বাহার শুধ্ হয়ে এঁকে পরণাম করাই ভাল।'

মাথাটা একদিকে সামান্য হেলিয়ে সায় দেয় কিরণ।

বশিষ্ঠনারায়ণ আচমকা গভীর গলায় বলেন, 'ভগোয়ান শিউশংকরজি তোমাকে সৎ মতি দিন, সৎ পথ দেখান। সৎ কুলে তোমার জনম, এই কুল শিউশংকরজির কৃপায় সদা পবিত্র থাক। ওঁ শিবায় নমঃ।'

এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে একটা গ্রামে থাকেন বশিষ্ঠনারায়ণ। হয়ত শিব প্রতিষ্ঠার কারণে তাঁকে এখানে আনা হয়েছে। তাঁর কথায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে প্রচুর স্থানীয় দেহাতি 'বুলি'ও মিশে থাকে। বলার ভঙ্গিতে এবং কণ্ঠস্বরেও দেহাতি টান।

কিরণ চমকে ওঠে। বশিষ্ঠনারায়ণ এই যে সৎ পথ, সুমতি এবং মিশ্র বংশকে পবিত্র রাখার কথা বললেন, সেটা নিশ্চয়ই অকারণে নয়। তার ব্যাপারটা কি বশিষ্ঠনারায়ণকে জানানো হয়েছে? ভেতরে ভেতরে নিজের অজান্তেই কুঁকড়ে যেতে থাকে কিরণ।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলতে থাকেন, 'অব্ যাও বেটা। দো রাত ট্রেনে এসে বহুত 'থকে' গেছ। ঘরে গিয়ে আরাম কর।'

উত্তর না দিয়ে এবার রেবতীর দিকে তাকায় কিরণ। মা তার সঙ্গে এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেননি। খারাপ লাগছে তার। আস্তে ডাকে, 'মা—'

রেবতী তাকিয়েই ছিলেন। এক পলকের জন্যও মেয়ের দিক থেকে চোখ সরাননি। কিন্তু তিনি সাড়া দিলেন না।

ভীরু গলায় কিরণ ফের বলে, 'মা, তোমার—'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই রেবতী নীরস গম্ভীর স্বরে প্রায় হুকুমের ভঙ্গিতেই বলেন, 'ওপরে নিজের ঘরে যাও।'

বশিষ্ঠনারায়ণের মতো রেবতীর কথাতেও বিহারের গ্রাম্য টান। আসলে ধরমপুরাকে টাউন বলা হলেও দিল্লি বোম্বাই বা কলকাতার কাছে এটা কিছুই না। যদিও ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে, অনেকগুলো

রাস্তা পিচ বাঁধানো, গণ্ডা গণ্ডা কংক্রিটের বিল্ডিং উঠেছে, তবু ওই সব শহরের তুলনায় ধরমপুরা একটা বড় মাপের গ্রামই। এখানে আজীবন থেকে শুধু রেবতীর কেন, পুরুষানুক্রমে 'মিশ্র নিকেত'-এর মানুষজনের চালচলন, কথাবার্তা, রাহান সাহান, সব কিছুতেই পাকা দেহাতি ছাপ পড়ে গেছে।

মায়ের কথায় দেহাতি ঢং নিয়ে কিরণের আদৌ দুশ্চিন্তা নেই। এটা তো সে আজন্মই শুনে আসছে। কিরণ অবাক হচ্ছিল অন্য কিছু ভেবে। রেবতী আগে আর কখন এমন রূঢভাবে, হুকুমের সুরে কথা বলেছেন কি না, সে মনে করতে পারে না।

কিরণ আর দাঁড়ায় না, আস্তে আস্তে নিচে নেমে ঘাসের ফাঁকা জমিটা পেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে।

চবুতরের সামনে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল খুবলাল। এবার সে রেবতীকে বলে, 'লেড়কীকে পৌঁছে দিলাম, এবার বাড়ি যাই ভাবীজি, পরে আসব।'

রেবতী তাকে এখানেই স্নানটান করে খেয়ে যেতে বলেন।

খুবলাল বিনীতভাবে জানায়, তার বাড়িতে 'থোড়া কুছ' জরুরি কাজ আছে, স্নান-খাওয়ার জন্য এখানে থেকে গেলে অসুবিধা হবে।

রেবতী বলেন, 'তা হলে আর কী বলি, আপনা মকানেই যান। লেকেন সামকো জরুর আইয়েগা। সাসকে নিয়ে আপনাদের মিশ্রজি এর মধ্যে কাশী থেকে এসে যাবেন। দিল্লিতে গিয়ে কী করলেন, কিভাবে মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে এলেন, কিছুই শোনা হল না।'

'সন্ধেবেলা এসে বলব।'

খুবলাল সহায় বাঁকানো শিরদাঁড়া নিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে গেটের দিকে চলে যায়। এদিকে ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে বিশাল তেতলা বাড়িটার পাথরে বাঁধানো বারান্দায় উঠে আসে কিরণ। ওখান থেকেই দেখতে পায় ঘনিরাম আর ভলুয়া মোটরের ক্যারিয়ার থেকে তার সুটকেশ হোল্ডঅল এবং টুকিটাকি অন্য সব মালপত্র নামাচ্ছে।

আগে লক্ষ করেনি, এবার কিরণ দেখতে পায়, গোটা বাড়িটায় নতুন রং করা হয়েছে। দরজা জানালা এবং দেওয়াল থেকে টাটকা রঙের গন্ধ উঠে আসছে।

বারান্দার ডান পাশে ওপরে যাবার সিঁড়ি। একশ বছর আগের সরু সরু ইট দিয়ে তৈরি ধাপগুলো আড়াই ফুট করে চওড়া।

দোতলায় উঠতে উঠতে কিরণের চোখে পড়ে, নৌকর নৌকরনীরা প্রতিটি ঘর বারান্দা সিঁড়ি ধুয়ে মুছে ঘষে মেজে তকতকে করে তুলছে। এ বাড়িতে ঘর তো কম নয়, প্রায় ষাটটা। তা ছাড়া ডজন দুয়েক বারান্দা, অগুনতি সিঁড়ি, এক তলার ঢালাও চাতাল—সব মিলিয়ে বিশাল ব্যাপার। কাজের লোকগুলো ঘেমে নেয়ে একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

ষাটটা ঘর দরকার হয় না কিরণদের। তারা মানুষ তো মোটে পাঁচ জন। বাবা মা সুষমা ঠাকুমা এবং সে নিজে। অবশ্য দশ বারটা নৌকর নৌকরানীও আছে।

একতলায় ছ'সাতটা ঘরে কাজের লোকেরা থাকে, দোতলায় এবং তেতলায় খান পাঁচেক ঘর নিয়ে কিরণরা। সে আর ঠাকুমা ক'দিনই বা এখানে থাকতে পারে! দশ বার বছর ধরে বেশির ভাগ সময়টাই তার দিল্লিতে কাটছে, ছুটিছাটায় শুধু বাড়ি আসতে পারে। আর ঠাকুমা ক'বছর ধরে প্রায়ই গঙ্গাযাত্রা করতে যাচ্ছেন কাশী। তাদের দু'জনকে বাদ দিলে বাড়িতে সারাক্ষণ থাকে মোট তিন জন। তিনটি লোকের জন্য পাঁচটি ঘর আর নৌকরদের জন্য সাতটা, মোট বারখানা ঘর প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। বাকি ঘরগুলো সারা বছর তালা বন্ধ থাকে। শুধু দশেরার আগের দিন একবার তালা খুলে সাফসুতরো করা হয়।

কিন্তু এই ফাল্গুন মাসে তো দশেরা হয় না। তা হলে আবহমান কালের নিয়ম ভেঙে এই অসময়ে বাড়ি সাফাই করা হচ্ছে কেন? ব্যাপারটা রহস্যময় থেকে যায়।

দোতলায় উঠে আসে কিরণ। তারপর তেতলায় নিজের ঘরে।

ঘরটা প্রকাণ্ড। একধারে দেওয়াল ঘেঁষে পুরনো আমলের মকরমুখি খাট। আর এক দেওয়ালে

আয়না-বসানো আলমারি, ড্রেসিং টেবল, বুককেস, পড়াশোনার জন্য টেবল-চেয়ার, ডিভান ইত্যাদি। এ ঘরের সব আসবাব দুষ্প্রাপ্য দামি বর্মা-টিকে তৈরি। সেগুলো ভারি ভারি, প্রাচীন। কাচের ওপর, আলমারি কিংবা খাটের পায়ায় এবং ছত্রিতে পুরনো নক্‌শা, পুরনো গন্ধ। এ বাড়ির আবহাওয়ায় এরকম আসবাব ছাড়া যেন মানায় না।

তবু এরই মধ্যে ছোটখাট তিনটি বিপ্লব ঘটিয়েছে কিরণ। প্রায় প্রতিবারই দিল্লি থেকে ফেরার সময় সে একটা করে মডার্ন পেইন্টিং-এর কপি বাঁধিয়ে এনে দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছে। চার দেওয়ালে এখন মডার্ন আর্টের মোট সাতটি নমুনা। এইসব বিদ্‌ঘুটে ছবির দিকে যাতে বেশি মন না যায়, তাই মুকুটনাথ এবং রেবতী পলকা কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো লছমী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু এবং গণপতির ধ্যাবড়া ক'টা ছবি ওগুলোর ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিয়েছেন।

ছবি ছাড়া অন্য দু'টি বিপ্লব এইরকম। কার্পেট এনে মেঝেতে বিছিয়েছে কিরণ আর জোর করে ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম করিয়ে নিয়েছে।

কার্পেটটা নিয়ে বিশেষ আপত্তি হয়নি কারুর। কিন্তু অ্যাটাচড বাথ এবং কমোড নিয়ে মিশ্র বংশ একেবারে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। যে বাড়ির মাথায় কুলদেবী মহালছমীর মন্দির, তারই আঠার ফুট তলায় কমোডের মতো 'গন্ধা' নোংরা বস্তু বসানো হলে সে মন্দিরের পবিত্রতা যে একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে এ বিষয়ে ঠাকুমা থেকে সুষমা পর্যন্ত সবাই ছিল একমত।

'মিশ্র নিকেত'-এ কি তাই বলে বাথরুম বা পায়খানা-টায়খানার মতো অশুদ্ধ নারকীয় ব্যাপার নেই? নিশ্চয়ই আছে। সেগুলো রয়েছে মূল তেতলা বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে পেছন দিকের ফুল ফল সবজি বাগানের ওপাশে। পাঁচ জেনারেশন ধরে তাতেই দিব্যি কাজ চলে যাচ্ছে।

কুলদেবীর ঘরের পবিত্রতা নিয়ে অনেক বোঝানো হয়েছিল কিরণকে কিন্তু টলানো যায়নি। সে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে একাই চার জনের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত মুকুটনাথকে মেয়ের জেদের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে। তবে তার মধ্যেও রয়েছে সেই সূক্ষ্ম সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। অর্থাৎ যে ছক অনুযায়ী কিরণকে দিল্লিতে চৌকস সোসিয়েলাইট করতে পাঠানো হয়েছে তার সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ, কমোড বা কার্পেটের কিছু সম্পর্ক আছে।

ঘরের সব কিছুই ঝকঝকে, পরিচ্ছন্ন। এমন কি বিছানাটা পর্যন্ত নিখুঁত পেতে রাখা হয়েছে। নক্‌শা-করা রাজস্থানী বেডশিটে সামান্য ভাঁজ পর্যন্ত নেই। কিরণের জন্যই যে ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে ফিটফাট করে রাখা হয়েছে, সেটা এখানে পা দিলেই টের পাওয়া যায়। অন্য সময় হলে ঘরের পরিপাটি চেহারা দেখে খুশিই হত কিরণ। মেঝেতে ধুলো ময়লা, দেওয়ালে ঝুল, নোংরা কোঁচকানো বিছানা, এসব দেখলে তার মাথা গরম হয়ে যায়।

কোনো দিকে না তাকিয়ে কিরণ সোজা বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয়। মাথার দিকের জানালায় যে লোহার জাল রয়েছে তার ভেতর দিয়ে জালি-কাটা আকাশ চোখে পড়ে। সূর্যটা এতক্ষণে আরো একটু ওপরে উঠে এসেছে, রোদের তাপ হয়ত সামান্য বেড়েছে কিন্তু তিন ফুট পুরু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা এই ছায়াচ্ছন্ন ঘরে তা একেবারেই বোঝা যায় না। অন্যমনস্কর মতো সেদিকে তাকিয়ে কিরণ হঠাৎ খুব বিপন্ন বোধ করে। অদম্য সাহস এবং জেদ নিয়েই সে এবার 'মিশ্র নিকেত'-এ ফিরেছে। কিন্তু মায়ের চেহারা দেখে মনে হয়েছে, এ বাড়ির একটি মানুষও তার পক্ষে আঙুল তুলবে না। বাবা এবং ঠাকুমা ফিরে আসার পর কী ধরনের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, তখন নিজের জেদ কতটা বজায় রাখতে পারবে এ সব সম্পর্কে কোনো পরিষ্কার ধারণাই সে করতে পারছে না।

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিরণ আবছাভাবে টের পায় ভলুয়া এবং ঘনিরাম তার সুটকেশ-টুটকেশ দিয়ে গেল।

আরো কিছুক্ষণ বাদে কার ডাকে সামান্য চমকে মুখ ফেরায় কিরণ। দরজার কাছে সাগিয়া দাঁড়িয়ে আছে।

সাগিয়ার বয়স আঠার উনিশ। সতেজ আগাছার মতো পুষ্ট চেহারা তার। গোটা শরীরে অঢেল স্বাস্থ্য। গোল মুখ, পুরু ঠোঁট, চাপা চোখ, মাথাভর্তি রুক্ষ তেলহীন জট-পাকানো চুল। হাত পায়ের হাড়

মোটা মোটা। দেখেই টের পাওয়া যায় এই মজবুত গড়নের মেয়েটার দেহে প্রচুর শক্তি জমা রয়েছে। তবে চোখে এবং ঠোঁটে সর্বক্ষণ সরল নিষ্পাপ হাসি লেগেই আছে।

সাগিয়ার গায়ে লাল জামা। শাড়িটা দেহাতি ঢং-এ পায়ের গোছ পর্যন্ত তুলে পরেছে। নাকে ঝুটো পাথর-বসানো চাঁদির নাকফুল, দু'হাতে গোছা গোছা কাচের চুড়ি।

সাগিয়া কিরণের খাস নৌকরনী। দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরলেই সারাক্ষণ সে তার সঙ্গে ছায়ার মতো আটকে থাকে। কিরণের মুখ থেকে কিছু একটা হুকুম বেরুনো মাত্র সে ছুটে যায়। কিরণকে খুশি করতে এটা করছে, সেটা করছে। সর্বক্ষণ তার জন্য মেয়েটা তটস্থ।

ভয়ে ভয়ে সাগিয়া জানতে চায়, ভেতরে ঢুকবে কিনা। কেননা তার জামা কাপড় নোংরা, শাড়ির নিচের দিকটা ময়লা জলে ভেজা, গালে কপালে চুলে সাবানের ফেনা। সে জানে, অপরিচ্ছন্নতা একেবারেই পছন্দ করে না কিরণ। ভয়টা সেই কারণেই।

সাগিয়ার ভীরুতার মধ্যে এক ধরনের ছেলেমানুষি রয়েছে। এই কারণে মেয়েটাকে ভাল লাগে কিরণের। আস্তে হাত নেড়ে বলে, 'আয়।'

আলতো করে পা ফেলে ফেলে, যেন চারপাশের ছোঁয়া বাঁচাতেই ঘরে ঢুকে জড়সড় হয়ে এক ধারে দাঁড়ায় সাগিয়া। বলে, 'কাপড়া সাফ করছিলাম। ওহী লিয়ে—' বলেই থেমে যায়। অর্থাৎ কাপড়-চোপড় কাচছিল বলে নোংরা সাবান জল তার গায়ে লেগেছে, এটাই বোঝাতে চায় সাগিয়া। এজন্য কিরণের যেন 'গুস্সা' না হয়। আসলে কিরণ যখন ধরমপুরায় থাকে না তখন সাগিয়াকে অন্য নৌকর নৌকরনীদের সঙ্গে বাড়ির নানা ধরনের প্রচুর কাজ করতে হয়। তখন কিরণের পছন্দমতো তার পক্ষে ফিটফাট থাকা সম্ভব না। কিরণ এসে গেছে, এখন অন্য সব 'গন্ধা কাম' থেকে তার পুরোপুরি ছুটি। ক্ষারে কাচা পরিষ্কার শাড়ি জামা পরে, পিঠে বিনুনি ঝুলিয়ে এবার সে কিরণের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে পারবে।

কিরণ বলে, 'ঠিক আছে।' বলেই লক্ষ করে, সাগিয়া পলকহীন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ঠিক এইভাবেই রেবতীও কিছুক্ষণ আগে তাকে দেখছিলেন। তবে কি নৌকর নৌকরনীদের মধ্যেও তার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে? ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যায় কিরণ। একবার ভাবে, এ নিয়ে সাগিয়াকে কিছু জিজ্ঞেস করবে কি না। কিন্তু পেটের ভেতরকার ভ্রূণটা সম্পর্কে একটি নৌকরনীর সঙ্গে কথা বলতে তার রুচিতে আটকায়।

কিরণের কখন কী দরকার সব জানে সাগিয়া। চোখ না সরিয়েই সে বলে, 'তুমি আসবে বলে ঘর সাফ করে বিস্তারা পেতে রেখেছি।'

এতক্ষণে ঘরটার দিকে ভাল করে তাকায় কিরণ এবং মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও খুশিই হয়।

সাগিয়া ফের বলে, 'নাহানা-ঘরে খুশবুও ছড়িয়ে দিয়েছি।'

খুশবু অর্থাৎ আতর। স্নানের ঘরে আতরের সুগন্ধ কিরণের খুব পছন্দ। ভেতরকার অস্বাচ্ছন্দ্য এবং চাপটা কাটাবার জন্য সে মজার গলায় বলে, 'ফাইন, ফাইন। তোর তুলনা নেই সাগিয়া।'

সাগিয়া ইংরেজি জানে না, নেহাতই আনপড়। তবে কিরণ যে তারিফ করছে, এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না। সে হাসে, খুশিতে তার চোখ চিকচিক করতে থাকে।

ভয়টা কেটে গিয়েছিল। সাগিয়া এবার বলে, 'টিরেনে রাত জেগে এসেছ। নাহানা করবে তো?'

কিরণ মাথা হেলিয়ে দেয়—করবে।

সাগিয়া বলে, 'গরম পানি নিয়ে আসি?'

'এখন না, পরে। আগে তুই নিজে নাহানা সেরে ভাল শাড়ি টাড়ি পরে আমার জন্যে কফি করে আন।' ঘনিরামরা যে মালপত্র নামিয়ে রেখে গিয়েছিল সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে একটা বাস্কেট দেখিয়ে দেয়, 'ওটার ভেতর কফির প্যাকেট আছে। নাহানা সেরে নিয়ে যাবি।'

এ বাড়িতে কিরণ ছাড়া আর কেউ কফি খায় না। এই অভ্যাসটা তার হয়েছে দিল্লিতে গিয়ে। চিনি-দুধ ছাড়া কড়া ব্ল্যাক কফি তার পছন্দ। বাড়িতে চালু নেই বলে তার জন্য কফি এনে রাখার কথা কারুর মনে থাকে না। তাই দিল্লি থেকে প্রতিবারই দু-তিনটে কফির প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে আসে কিরণ।

সাগিয়া চলে গেল। কিছুক্ষণ পর স্নান-টান সেরে ফিটফাট হয়ে আবার এসে কফির প্যাকেট নিয়ে যায়। দশ মিনিট বাদে তৃতীয় বার যখন আসে তার হাতে জাগের মতো লম্বাটে কাপে ভর্তি ব্ল্যাক কফি।

কাপটা কিরণের হাতে দিয়ে সাগিয়া জানতে চায়, এবার সে কী করবে।

কফিতে চুমুক দিয়ে কিরণ বলে, 'কিছু করতে হবে না। এখন আমি একটু ঘুমুব। তুই বাইরে থাকবি। দু'ঘণ্টা পর ডেকে দিবি।'

সাগিয়া ঘড়ি দেখতে জানে, কিরণই তাকে এটা শিখিয়েছে। সে বাইরে বেরিয়ে যায়, কিন্তু কিরণের ঘুমনো আর হয় না। কফিটা অর্ধেকও শেষ হয়নি, সুষ্‌মা হঠাৎ এ ঘরে ঢুকে সোজা কিরণের সামনে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায়।

সুষ্‌মার বয়স উনিশ কুড়ি। চোঙার মতো বেটপ মাথায় লালচে পাতলা চুল। সেই চুল দু'ভাগে বিনুনি করে কাঁধের দু'পাশ থেকে সামনের দিকে এনে বুকের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছে। ছোট ছোট গোল চোখ দুটোতে ধূর্ত হিংসুটে চাউনি। পুরু ঠোঁট সুষ্‌মার, হনু বেশ খাড়া। সারা গায়ে লাবণ্য বা লালিত্য বলতে কিছু নেই। হাত-পা কাঠ কাঠ, গাঁট-পাকানো।

স্থানীয় ঢংয়ে ফেরতা দিয়ে জমকালো দামি শাড়ি পরেছে সুষ্‌মা। কপালে সবুজ রংয়ের বড় টিপ। হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি, আঙুলে কম করে চার পাঁচটা আংটি, নাকের পাটায় হীরের নাকফুল, কানে করণফুল, গলায় চওড়া সোনার হার, পায়ের আঙুলে রুপোর চুটকি। এভাবে সারাক্ষণ প্রচুর সোনা চাঁদি গায়ে চড়িয়ে জবড়জং হয়ে থাকতে ভালবাসে সুষ্‌মা। পোশাক সাজগোজ বা চেহারা, এ সব দেখে কে বলবে কিরণের আপন বোন' কে বলবে, একই পুরুষের বীজে উৎপন্ন হয়ে একই নারীর গর্ভ থেকে তারা পৃথিবীতে নেমে এসেছে।

নিজের এই বোনটিকে আজন্ম দেখে আসছে কিরণ, সুষ্‌মার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত তার চেনা। এমন সন্দিগ্ধ, ঈর্ষাকাতর, কুচুটে ধরনের মেয়ে আর একটিও চোখে পড়েনি কিরণের। সর্বক্ষণ অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট, দিনরাত অন্যের খুঁত ধরে বেড়াচ্ছে। যা কিছু ভাল, সুন্দর বা মহৎ, সে সব আদৌ পছন্দ করে না। উদারতা, মাধুর্য, কোমলতা—এই সব বস্তু তার হাজার মাইলের মধ্যেও নেই।

এই পৃথিবীতে কিরণকে সব চাইতে বেশি ঘৃণা করে সুষ্‌মা। বড় বোনকে নিজের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীও ভাবে। তার প্রতি সুষ্‌মার যে চরম বিদ্বেষ—কিরণের কাছে এটা অজানা নয়।

সুষ্‌মার ঈর্ষা বা বিদ্বেষের পেছনে সলিড কিছু কারণ আছে। সেগুলো এতই স্পষ্ট যে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয় না। প্রথমত, রূপের কথাই ধরা যাক। তারা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়ালে, অনিবার্য নিয়মেই কিরণের টানটান চেহারা, ডিমের কুসুমের মতো ত্বক, সোনার ফুলদানির মতো গ্রীবা, তার ব্যক্তিত্ব বা পোশাকরুচি চুম্বকের মতো অন্যের চোখ টানতে থাকে। কিন্তু সুষ্‌মার শরীরে এতই খুঁত, নারীসুলভ কমনীয়তার এমনই ঘাটতি যে তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

তা ছাড়া যে কারণটা সব চাইতে মারাত্মক তা এইরকম। কিরণের সাত বছর বয়সেই এ অঞ্চলের এম. এল. এ এবং জবরদস্ত পলিটিক্যাল লিডার ত্রিকূটনারায়ণ দুবে তাকে পুতহু হিসেবে নির্বাচিত করেছেন এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে নিখুঁত একটি ছক কেটে সোসিয়েলাইট বানাবার জন্য তাকে দিল্লি পাঠিয়েছেন। অথচ উনিশটা বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত সুষ্‌মাকে কেউ পুতহু করার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবে না। অবশ্য মুকুটনাথ যে ধরনের জাঁদরেল জমিমালিক তাতে সুষ্‌মাকে কুঁয়ারী হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে হবে না। নিশ্চয়ই তিনি ছোট মেয়ের জন্য দামাদ যোগাড় করে ফেলবেন। তবে স্বাভাবিকভাবে মিশ্র বংশের সমান লেভেলের ঠাটবাটওলা কুলীন ঘরে মেয়ে দিতে হলে কম করে দু'আড়াই শ বিঘে জমি দহেজ দিতে হবে। খিঁচটা এখানেই। মিশ্র বংশ কয়েক জেনারেশন ধরে প্রোপার্টি বাড়িয়ে যে একটা বিশাল রাজত্ব গড়ে তুলেছে তার থেকে এতটা জমি চলে যাওয়া কাজের কথা নয়, এবং এ ব্যাপারে মুকুটনাথের প্রচণ্ড আপত্তি। তাই একটি গরিব ঘরের লেখাপড়া জানা অনুগত নম্র স্বভাবের ছেলের খোঁজে চারদিকে লোক লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা, ছোট দামাদকে তিনি ঘরজামাই হিসেবে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করবেন। তাতে অনেকটা জমি অন্তত রক্ষা পাবে।

যে মেয়ে বংশের মর্যাদা বাড়াতে পারবে না, উলটে যার কারণে সম্পত্তি হানির প্রবল সম্ভাবনা,

তাকে মুকুটনাথের মতো জমিমালিক খুব একটা ভাল চোখে যে দেখবেন না, সেটা বোঝাই যায়। তবে জন্মদাতা হিসেবে নিজের দায়িত্ব তিনি আদৌ উপেক্ষা করেননি। বংশের প্রথা অনুযায়ী থুথুড়ে বুড়ো মাস্টারজি রেখে বাড়িতেই কাজ চালানোর মতো লেখাপড়া শিখিয়েছেন সুষমাকে।

সুষমার জন্য প্রোপার্টি হাতছাড়া হবে আর বিনা যৌতুকেই কি কিরণের বিয়েটা হয়ে যাবে? না, ঠিক তা নয়। তবে একটি সুন্দরী নিখুঁত সোসিয়েলাইটকে পুত্রবধূ করতে পারলে ত্রিকূটনারায়ণ যে দহেজ নিয়ে খুব একটা দড়ি টানাটানি করবেন না, এ ব্যাপারে মুকুটনাথ পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। তিনি যা দেবেন তাতেই খুশি থাকবেন ত্রিকূটনারায়ণ।

মা-বাপের চোখে সব ছেলেমেয়েই নাকি সমান। কিন্তু কিরণ সম্পর্কে মুকুটনাথের যে পক্ষপাতিত্ব আছে সেটা পরিষ্কার টের পাওয়া যায়।

সাত বছর বয়সেই, অযাচিতভাবে অঢেল সুখ, কনভেন্টে পড়ার সুযোগ, পর্যাপ্ত স্বাধীনতা, বিখ্যাত শ্বশুরবাড়ির পুতহু হবার সৌভাগ্য, সব কিরণের হাতের ভেতর চলে এসেছে। সুষমার ধারণা এবং বিশ্বাস, প্রতি মুহূর্তে কিরণ তাকে ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। যা কিছু তার প্রাপ্য, পৃথিবীর যাবতীয় সুখ আনন্দ এবং কাম্য ভবিষ্যৎ-- -প্রবল শক্তিতে সে ছিনিয়ে নিচ্ছে। এই সব কারণে সুষমার বুকের ভেতরটা ঘৃণায় ঈর্ষায় হিংসায় বিষাক্ত হয়ে থাকে।

সুষমাকে দেখলেই অস্বস্তি হয় কিরণের। ছোট বোনকে রীতিমত ভয়ই করে সে। তবু হেসে হেসে বলে. 'কেমন আছিস মুনিয়া—' সুষমার ডাকনাম মুনিয়া।

সুষমার কণ্ঠস্বর খুবই কর্কশ। খ্যাসখেসে গলায় সে বলে, 'বহুত বুরা। তোর জন্যে আমাদের ভাল থাকার উপায় আছে ?'

কিরণ চমকে ওঠে। এ বাড়ির সবাই যেন তার জন্য অস্ত্র শানিয়ে বসে আছে। সে জিজ্ঞেস করে, 'তোদের খারাপ থাকার মতো আমি কী এমন করেছি।' বলে ভয়ে ভয়ে চোখের কোণ দিয়ে সুষমাকে লক্ষ করতে থাকে।

'জানিস না কী করেছিস! বেশরম শাঁখরেল।'

বুকের ধুকপুকুনি পলকের জন্য থমকে যায় কিরণের। তবে কি বাড়ির সবাই ভ্রূণটার খবর পেয়ে গেছে? শ্বাসরুদ্ধের মতো সুষমার দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

সুষমা বলে, 'মিশ্র বংশের মুখে তুই কালি দিয়েছিস। ধরমপুরার লোক তোর গায়ে থুক দেবে।'

কিরণ জানে, সুষমার কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির আশা নেই। তার সম্পর্কে মায়ের মনোভাবও সে জেনে গেছে। এ বাড়ির সর্বশক্তিমান ডিকটেটর মুকুটনাথের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, সে ব্যাপারেও তার স্পষ্ট ধারণা আছে। তবে খুবলালকে পাঠিয়ে এভাবে তাকে ধরমপুরায় নিয়ে আসার পেছনে মুকুটনাথের কী কূট উদ্দেশ্য রয়েছে কিংবা তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নতুন করে তিনি কী ভেবেছেন, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। অথচ তা জানা দরকার।

স্নায়ুগুলোকে টান টান রেখে, খুব সতর্কভাবে কিরণ বলে, 'আমি কোনো অন্যায় করিনি।'

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, হাত দুটো প্রবল বেগে নাড়তে নাড়তে ভেংচে ওঠে সুষমা, 'ও হো হো হো— অন্যায় করিনি! একেবারে শুধ্ গঙ্গাপানি! লাখ লাখ রুপাইয়া খরচ করে কেন তোকে দিল্লি পাঠিয়েছে। কিস লিয়ে—অ্যাঁ, কিস লিয়ে?'

সুষমার আক্রমণটা ঠিক কোন দিক থেকে আসছে, বুঝতে পারে না কিরণ। হঠাৎ বুকের ভেতর কাঁপুনির চোরা স্রোত টের পায়। কিছুটা শিথিল গলায় বলে, 'কিসের জন্যে আবার, লেখাপড়া শিখতে!'

আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে সুষমা, 'ঝুট।' চেঁচালে তার গলার শিরাগুলো দড়ির মতো জট পাকিয়ে ফুটে বেরোয়।

হাতের কাছে উপযুক্ত উত্তর খুঁজে পায় না কিরণ। বিমূঢ়ের মতো সে তাকিয়ে থাকে।

সুষমা বিষাক্ত গলায় বলে যায়, 'তুই দিল্লি গেছিস ভাঁদো মাসের কুত্তীর মতো ছোকরাদের পেছন পেছন চক্কর মারতে।'

গলার স্বর সামান্য তুলে কিরণ বলে, 'কে বলেছে এ সব? কে? কে ?'

'কে আবার বলবে! তোদের বড়ী মাস্টারনী বাপুজিকে চিট্‌ঠি লিখে সব জানিয়েছে।'

বড়ী মাস্টারনী অর্থাৎ তাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তিনি যে মুকুটনাথকে চিঠি লিখেছেন, কিরণের জানা ছিল না। তার হৃৎপিণ্ডের ওঠা-নামা পলকের জন্য থমকে গিয়েই আবার চলতে শুরু করে। ভীরু গলায় সে জিজ্ঞেস করে, 'কী লিখেছেন আমাদের প্রিন্সিপ্যাল?'

দু'হাত নাচিয়ে নাচিয়ে কোমরটা বাঁকিয়ে চুরিয়ে নানারকম জঘন্য ভঙ্গি করতে করতে সুষ্‌মা বলে, 'তোর পাংখ্ গজিয়েছে, দিল্লিতে বহোত উড়ছিলি।'

সুষ্‌মা ঠিক কী বলতে চায়, বোঝা যাচ্ছে না। তবে প্রিন্সিপ্যালের চিঠিতে যে মারাত্মক কিছু অভিযোগ আছে এবং সেই কারণেই যে মুকুটনাথ তাকে ধরমপুরায় নিয়ে এসেছেন, সেটা আন্দাজ করা যায়। উত্তর না দিয়ে সে সুষ্‌মাকে দেখতে থাকে।

সুষ্‌মা শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝোঁকে, কিরণের মুখের কাছে বাঁ হাতটা এনে আঙুলে অদ্ভুত মুদ্রা ফুটিয়ে বলে, 'সমঝি নেহী?'

কিরণ এবারও চুপ।

সুষ্‌মা বলতে থাকে, 'প্যার মোহব্বত—সমঝি ? চুটিয়ে প্যার করছিলি। বেশরম চুহিয়া।'

এ বাড়ির আবহাওয়ায় পুরুষানুক্রমে গোঁড়ামি এবং সংস্কারের যত অদৃশ্য ভাইরাস থিক থিক করছে তার প্রায় সবগুলোই সুষ্‌মার রক্তে এবং মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে। মিশ্র বংশের অন্য সবার মতোই তার কাছে কুঁয়ারী মেয়ের প্রেম-ভালবাসা একেবারেই নিষিদ্ধ বস্তু, নিচু স্তরের পাপাচরণের মতো অত্যন্ত গর্হিত কাজ। উনিশ বছরের এই মেয়েটার মধ্যে একশ বছরের জীর্ণ অসহিষ্ণু প্রাচীন একটি স্পিরিট শেকড় গেড়ে বসেছে।

সুষ্‌মার দিকে তাকিয়েই থাকে কিরণ, কিছু বলে না।

সুষ্‌মা থামেনি, সে একটানা বলে যায়, 'বাবুজি বনারস যাবার আগে কী বলে গেছে জানিস?'

'কী?' এতক্ষণে গলার স্বর ফোটে কিরণের।

'ফিরে এসে তোর পাংখ্ দুটো আগে ছেঁটে দেবে। তারপর পাক্কীর ধারে যে নহরটা আছে তাতে তোকে পুঁতে ফেলবে। বাবুজি বলেছে মিশ্‌র বংশে তোর মতো লেড়কীর জরুরত নেই—সমঝি ?'

জোরে শ্বাস টানে কিরণ। যতটা বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় প্রিন্সিপ্যাল ছেলেদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ব্যাপারে মুকুটনাথকে কিছু লিখে থাকতে পারেন। তবে ভ্রূণটার বিষয়ে অবশ্যই কিছু জানাননি। কেননা এটা এখন পর্যন্ত এতই গোপন যে প্রভাকর এবং সে ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ঘুণাক্ষরেও প্রিন্সিপ্যাল টের পেলে, এতদিনে সারা দিল্লি তোলপাড় করে ফেলতেন। আর মুকুটনাথ জানতে পারলে নিশ্চয়ই মাকে আনতে কাশী যেতেন না, খুবলালকে না পাঠিয়ে তিনিই স্বয়ং দিল্লি ছুটতেন। মাকে বিফল গঙ্গাযাত্রা থেকে ফিরিয়ে আনার চাইতে মেয়ের বংশধারা-বিরোধী কেলেঙ্কারি ঠেকানোটা অনেক বেশি জরুরি।

ভ্রূণটা সম্পর্কে বাড়িতে যে জানাজানি হয়নি, এ নিয়ে আর সংশয় নেই। তা হলে এতক্ষণে সুষ্‌মা চেঁচিয়ে মেচিয়ে বাড়ির ভিত নাড়িয়ে দিত। ওর পেটে কোনো কথা দশ সেকেন্ডের বেশি থাকে না।

সুষ্‌মা বলে, 'আমি যাচ্ছি। বাবুজি ফিরে আসুক, তখন মজা দেখতে আবার আসব।'

ডানা ছেঁটে নহরের পাঁকে কিরণকে পুঁতে ফেলার অত্যন্ত দরকারি খবরটি দিয়ে সুষ্‌মা চলে যায়।

তিন

কিরণকে ঘিরে মুকুটনাথ এবং ত্রিকূটনারায়ণ পনের বছর আগে যে সুদূরপ্রসারী চতুর পরিকল্পনাটি করেছিলেন—তা এইরকম।

ত্রিকূটনারায়ণ দুবে বা দ্বিবেদীরাও মুকুটনাথদের মতোই পুরুষানুক্রমে বিরাট জমিমালিক। গোলগোলি ভালুকের বর্ডারে যে বেঁটেখাট পাহাড়ের রেঞ্জটা রয়েছে তার ওধারের যাবতীয় জমিজমা

দ্বিবেদীদের। মিশ্রদের মতো দ্বিবেদীবাও পুরনো ল্যান্ডেড অ্যারিস্টোক্র্যাট। তবে জমি দখল এবং জেনারেশনের পর জেনারেশন সে সব বাড়িয়ে চলার পদ্ধতি দুই বংশের দু রকম। অবশ্য বিপুল ল্যান্ড প্রোপার্টি রক্ষণাবেক্ষণের কৌশল বা প্রক্রিয়া কিন্তু একই ধরনের। ত্রিকূটনারায়ণরা থাকেনও পাহাড়ের ওপারের ছোট টাউন কামতিগঞ্জে।

মিশ্রদের সমস্ত জমিজমা বিয়ের দৌলতে। এই বংশে এক একটি পুত্রবধূ এসেছে, তাদের সঙ্গে যৌতুক হিসেবে এসেছে দেড় দু'শ বিঘে করে জমি। কিন্তু দ্বিবেদীদের জমি বেড়েছে লাঠি আর বন্দুকের দাপটে এবং হাজারটা কূটকৌশলে। কখনও গায়ের জোরে গরিব আনপড় অচ্ছুতদের জমি তারা কেড়ে নিয়েছে, কখনও মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে কিংবা চড়া সুদের দায়ে তাদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে দিয়েছে।

কিন্তু প্রোপার্টি বাড়ানো যেমন বিরাট ব্যাপার, তেমনি সে সব দখলে রাখা তার চাইতেও অনেক বড় সমস্যা। এতদিন ভালই চলছিল, কিন্তু 'জমিন্দারি অ্যাবোলিশান বিল' পাশ হয়ে যাওয়ার পর প্রবলেমটা প্রথম দিকে বেশ ঘোরালই মনে হয়েছিল। বড় জমিমালিকদের চোখ থেকে রীতিমত ঘুম ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক দিনের জন্য।

দিল্লির লোকসভায় জমিজমা নিয়ে কবে কখন কী আইন পাশ হল সে খবর ধরমপুরা এবং কামতিগঞ্জের চারপাশের গরিবের চাইতেও গরিব, হাভাতে, আনপড়েরা রাখে না এবং সে সব নিয়ে মাথাও ঘামায় না। কিন্তু যাদের অঢেল জমি, অজস্র সোনা চাঁদি, টাকাপয়সা এবং জমিজমার কারণে মর্যাদা, আভিজাত্য এবং প্রচণ্ড ক্ষমতা, তাদের সমস্ত খবরই রাখতে হয়। বিশেষ করে তারা দেখে জমি সংক্রান্ত কী আইন চালু হল এবং তার মধ্যে কোথায় কতটা ফাঁক আছে। এ সব কূট চাল তাদের না জানলেই নয়। মিশ্ররা এবং দুবেরা তাই জমিদারি বিলোপ প্রথা পাশ হওয়ার পর ঝানু ল-ইয়ারদের দিয়ে এর ফোকরগুলো খুঁজে বার করে। তারপর স্বনামে এবং বেনামে কয়েক শ একর জমির ব্যবস্থা এমনভাবে করে ফেলে যাতে আইনের সাধ্য কি তাদের একটি চুলের ডগাও ছুঁতে পারে!

কিন্তু দিনকাল পালটাতে শুরু করেছে। আনপড় ভুখা অচ্ছুৎগুলোর চোখও ইদানীং অল্প অল্প ফুটছে। ভোজপুর মোতিহারি পালামৌর দিক থেকে অনেক রকম গোলমেলে খবর আসে। বান্ধুয়া কিষাণ, ভূমিহীন অচ্ছুৎ এবং আদিবাসী ওরাওঁরা নাকি খুব ঝঞ্ঝাট বাধাচ্ছে। তাদের দাবি—বাপ, দাদা, দাদার বাপ কিংবা তাদের বাপের কাছ থেকে নানা অছিলায় এবং কৌশলে বা বন্দুকের জোরে যে সব জমি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, ফেরত দিতে হবে। শহর থেকে পলিটিক্যাল পার্টির লোকেরা এসে এইসব ভূমিহার, অচ্ছুৎ এবং আদিবাসীদের নাকি ক্রমাগত খেপিয়ে তুলছে। ভোজপুর পালামৌতে যে আগুনের ফুলকি দেখা দিয়েছে, ধরমপুরা কামতিগঞ্জ বইহারি এবং গোলগোলিতে তা ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ! পলিটিক্যাল পার্টির ওয়ার্কাররা কি এ অঞ্চলের স্থিতাবস্থা বজায় থাকতে দেবে? 'ল্যান্ড রিফর্ম, ল্যান্ড রিফর্ম' বলে গোটা দেশ জুড়ে যেভাবে হই চই শুরু হয়েছে, যেভাবে নেতারা অনবরত হল্লা 'মচাচ্ছে', তাতে এখানকার শান্তি যে অটুট থাকবে, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই।

এসব নিয়ে আগে আদৌ মাথা ঘামাতেন না মুকুটনাথ। কড়া ধাঁচের পুরনো ফিউডাল পদ্ধতিতেই তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তিনি মনে করেন প্রোপার্টি দখলে রাখার জন্য লাঠি বন্দুক এবং পোষা পহেলবানরাই যথেষ্ট। অবশ্য জমিদারি বিলোপ আইন চালু হওয়ার পর তাঁর কিছুটা দুর্ভাবনা যে হয়নি তা নয়। পরে বিশাল জমিজমা বেনামা করে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

মুকুটনাথের তুলনায় ত্রিকূটনারায়ণ ঢের বেশি দূরদর্শী। তাঁর ভাবনা-চিন্তা নিশ্চিতভাবেই একালের। অনেক আগেই তিনি বুঝেছিলেন, আজকের ভারতবর্ষে ফিউডাল সিস্টেম জিইয়ে রাখতে হলে শুধু মাত্র লাঠি বন্দুকের ওপর ভরসা করলে চলে না, তার জন্য যেটা সব চাইতে জরুরি, তা হল পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা—পলিটিক্যাল পাওয়ার। সে কারণে গত তিনটি অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে তিনি কনটেস্ট করে আসছেন। প্রথম দু'বার হেরে যান। তৃতীয় বার অর্থাৎ সাড়ে চার বছর আগে যে চুনাওটা হয়ে গেল তাতে কোনোক্রমে জিতেছেন। ছ'মাস পর আবার সাধারণ নির্বাচন আসছে। এবার তাঁকে ভাল মার্জিনে জিততেই হবে।

পনের বছর হল রাজনীতিতে এসেছেন ত্রিকূটনারায়ণ। খুবই করিৎকর্মা মানুষ। বড় বড় জমিমালিকরা যেমন হয়, প্রচুর ঘিউ-মাখ্খন, পেস্তাবাদাম এবং হুইস্কি খেয়ে শরীরে চর্বির পাহাড় জমিয়ে কাজের বার হয়ে যায়—তিনি তার উলটো। ঘিউ-শক্কর বা মদটা তিনি নিশ্চয়ই খান তবে মাত্রা ছাড়া নয়, খুবই মাপা। ষাটের কাছাকাছি বয়স কিন্তু শরীরে বাড়তি বাজে মেদ এক গ্রামও জমতে দেননি। পেটানো চেহারা তাঁর, অটুট স্বাস্থ্য। কখনও ক্লান্ত হন না, আলস্য বলতে কিছু নেই। তাঁর পায়ে অদৃশ্য চাকা বাঁধা আছে। সর্বক্ষণ ম্যারাথন দৌড়ের মধ্যেই যেন রয়েছেন। দিনরাত ছুটছেন, প্রচণ্ড এনার্জিতে টগবগ করে ফুটছেন।

জমিজমা তো আছেই, সেসব দেখাশোনার জন্য লোকজন রেখেছেন। পুরুষানুক্রমে চাষবাসের কাজ যান্ত্রিক নিয়মেই চলছে। ওসব নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই, এদিকে সময় না দিলেও চলে। কিন্তু রাজনীতিতে আসার পর এ ব্যপারটাকে ত্রিকূটনারায়ণ হোল টাইম প্রফেশন হিসেবেই নিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস আধাখ্যাঁচড়া মন নিয়ে কারুর পলিটিকসে নামা ঠিক নয়। এতে শরীর নিঙড়ে সমস্ত এনার্জি এবং কর্মক্ষমতা ঢেলে দেওয়া দরকার। এটা শুধু কথার কথা নয়, নিজেও পনের বছর ধরে তা ঢেলে দিয়েছেন। তার ডিভিডেন্ডও পেতে চলেছেন এতদিনে।

এই পনের বছরে পনেরটা দিনও একটানা তিনি কামতিগঞ্জে কাটাননি। পাঁচ সাতদিন পর পরই ছুটেছেন পাটনায় বা দিল্লিতে। নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং সঠিক জায়গায় পুজো চড়াবার ফলে পলিটিক্যাল সার্কেলে তাঁর ছায়া ক্রমশ বড় হয়ে পড়তে শুরু করেছে, শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহুদূর পর্যন্ত। ত্রিকূটনারায়ণকে মোটামুটি কথা দেওয়া হয়েছে, এবারের চুনাওতে জিতে এলে স্টেট ক্যাবিনেটে তাঁর মন্ত্রিত্ব কেউ ঠেকাতে পারবে না। পাঁচ বছর এখানে কাটাবার পর পার্লামেন্টারি ইলেকশনে জিতিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে দিল্লি। সেখানে আরো বিরাট কিছু তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। রাতারাতি তিনি অল ইন্ডিয়া ফিগার হয়ে যাবেন।

রাজনীতিতে আসার পর থেকে ত্রিকূটনারায়ণ লক্ষ করছেন, পুতহু বা পুত্রবধূরা ইন্ডিয়ান পলিটিকসের অনেকটাই কনট্রোল করছে। দিল্লি বা পাটনায় গেলে চোখে পড়ে, জবরদস্ত নেতা বা মন্ত্রীদের সঙ্গে অনিবার্য অলিখিত কোনো নিয়মেই যেন সুন্দরী শিক্ষিতা ঝকঝকে স্মার্ট পুত্রবধূরা সর্বক্ষণ পরছাই হয়ে ঘুরছে। এরা বিখ্যাত ক্ষমতাবান শ্বশুরদেব বন্ধু সচিব এবং পরামর্শদাতা এবং পাবলিক রিলেশনস ম্যানেজার। এরা নিখুঁত উচ্চারণে জলের মতো ইংরেজি বলে, পার্টিতে যায়, জনসভায় বা প্রেস কনফারেন্সে শ্বশুরদের পাশে পাশে থাকে, বক্তৃতা ড্রাফট করে দেয়, দর্শনার্থীদের সামলায়, রাত্তিরে শোওয়ার সময় বলবর্ধক টনিক এবং ঘুমের ওষুধ হাতের কাছে এগিয়ে দেয়।

মেয়েদের দিয়েও এ সব কাজ হতে পারে কিন্তু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই তো তারা অন্যের প্রোপার্টি, বিয়ে হলেই পরের ঘরে চলে যায়। কিন্তু পুতহু কোথাও যাবে না। ইদানীং ইন্ডিয়ান পলিটিকসে চোস্ত ইংরেজি বলিয়ে স্মার্ট সোসিয়েলেট পুত্রবধূ একটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং স্থায়ী অ্যাসেট।

এই সব দেখে শুনে আইডিয়াটা মাথার ভেতর বসে যায় ত্রিকূটনারায়ণের। তাঁকেও একটি ঝকঝকে উৎকৃষ্ট পুত্রবধূ যোগাড় করতে হবে। কিন্তু তখন তাঁর ছেলে হরীশের বয়স সবে এগার, ক্লাস ফাইভে পড়ছে। ছেলে বড় হবে, দু একটা পাশ করবে, তবে তো বিয়ে, তবে তো পুতহু। ততদিন তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে।

ঠিক এই সময় বা কিছু পরে এক আত্মীয়ের বাড়ি 'শুভ্ বিবাহ'-র নিমন্ত্রণে গিয়ে হঠাৎ কিরণকে দেখে তাক লেগে যায় ত্রিকূটনারায়ণের। তৎক্ষণাৎ খোঁজ খবর নিয়ে মুকুটনাথকে বার করে ফেলেন। মুকুটনাথকে আগে থেকেই চিনতেন। সেই বিয়ের আসরেই তিনি সরাসরি প্রস্তাব দেন, কিরণকে পুতহু করতে চান। কিরণ হবে তাঁর মকানের শ্রেষ্ঠ অলংকার, ঘরের শোভা।

মুকুটনাথও ত্রিকূটনারায়ণকে চিনতেন। এমন একটা বিরাট মানুষ, যাঁর অগাধ টাকা, বিশাল ল্যান্ড প্রোপার্টি, রাজনীতিতে আসার কারণে বিপুল প্রতিপত্তি এবং দীর্ঘকালের আভিজাত্য—মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। মেয়ের বাপকেই চিরকাল জোড়হাতে ছেলের বাড়িতে প্রার্থী হয়ে যেতে হয়, এটাই এ অঞ্চলের প্রথা। কিন্তু ত্রিকূটনারায়ণ যা করেছিলেন তা একেবারে

অভাবনীয়। চমকটা থিতিয়ে এলে গভীর আবেগে তাঁর একটা হাত ধরে মুকুটনাথ বলেছেন, 'এ তো আমার বড় সৌভাগ।'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেছিলেন, 'সৌভাগ আমারও। দু'একদিনের ভেতর আমি আপনার হাভেলিতে বাত পাক্কা করতে যাচ্ছি।'

দিন তিনেক বাদে পুরনো মডেলের ঢাউস ফোর্ড গাড়িতে চড়ে সত্যিই এসেছিলেন ত্রিকূটনারায়ণ, সঙ্গে স্ত্রী রোহিণী এবং জনপাঁচেক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

যথেষ্ট খাতিরদারি করে তাঁদের দোতলায় নিয়ে বসানো হয়েছিল। মুকুটনাথের মা মহেশ্বরীর শরীর স্বাস্থ্য তখনও মোটামুটি ভালই ছিল অর্থাৎ কাশীতে গঙ্গাযাত্রা করার মতো অবস্থা হয়নি। তিনি কাছে বসে নতুন রিস্তেদারদের আদরযত্নে যাতে কোনোরকম ত্রুটি না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন আর অনর্গল কথা বলছিলেন। মিশ্ররা এবং দুবেরা পাহাড়ের এপারে এবং ওপারে পঁচিশ তিরিশ মাইলের মধ্যে যদিও পুরুষানুক্রমে বাস করে আসছে, তবু তাদের মধ্যে আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক নেই। এতকাল পর ত্রিকূটনারায়ণের আগ্রহে এবং মহত্ত্বে দুই বংশের যে গাঁট-বন্ধন হতে যাচ্ছে সে জন্য মহেশ্বরী খুব খুশি। 'মনমে বহুত সন্তোষ হুয়া, আউর পরমাত্মাকা বহুত শান্তি। শিউশংকরজি আউর মা লছমীকা কিরপাসে এ নাতেদারি আচ্ছাই হোগা।'

খাঁটি ভৈসা ঘিয়ে তৈরি মুগের লাড্ডু, গুলাবজামুন, কলাকন্দ, পেঁড়া, রাবড়ি ইত্যাদি দিয়ে উৎকৃষ্ট ভোজন করতে করতে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আমি তো 'শাদিকা বাত' পাক্কা করতে এসেছি। আপনাদের মেয়ে আমার দেখা, লেকেন আমার ছেলেকে আপনারা দেখেননি। তার সম্বন্ধে আপনাদের সব কিছু জানা দরকার। তাকে আপনাদের দেখা উচিত।'

মুকুটনাথ রেবতী এবং মহেশ্বরী একসঙ্গে প্রবলবেগে মাথা এবং হাত নেড়েছেন। এমন তাজ্জব কথা আগে আর কখনও শোনেননি তাঁরা। বিয়ের কথা হবে দুই পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে। মেয়ে দেখাটা অবশ্যই চলতে পারে কিন্তু ছেলে দেখার প্রশ্নই ওঠে না। এমন রেওয়াজ এদিকে চালু নেই।

মুকুটনাথ বলেছেন, 'ছেলেকে দেখার জরুরত নেই, আপনাকেই তো দেখছি।'

'নেহী নেহী'—আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে দোলাতে ত্রিকূটনারায়ণ বলেছেন, 'ইয়ে ঠিক নেহী। আমি আপনি চিরকাল থাকব না। কানা খোঁড়া আন্ধা—কার হাতে আপনি ফুল বরাবর লেড়কীকে দিয়ে গেলেন, একবারও দেখবেন না? ভারতীয় সংবিধানে পুরুষ আউর আওরতের সমান রাইট দিয়েছে। লেড়কী পসন্দ হলেই হবে না, লেড়কাকেও মনের মতো হতে হবে। নইলে এই শাদিতে বরাবর খিঁচ লেগে থাকবে।'

এই সব লিবারেল কথাবার্তা যে একেবারেই অনাবশ্যক, ত্রিকূটনারায়ণ খুব ভাল করেই জানতেন। তাঁকে ফিরিয়ে দেবার সাধ্য মুকুটনাথের নেই। তবু এগুলো বলার উদ্দেশ্য একটাই, মুকুটনাথদের কাছে নিজের প্রগতিশীল ইমেজ বা ভাবমূর্তি চমকদার করে তোলা।

মুকুটনাথরা আরো একবার তাজ্জব বনে যান। পরে ভাবী দামাদ এগার বছরের বালককে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে বলেন, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন শ্রীমানজিকে একবার দেখে আসব।'

ত্রিকূটনারায়ণের মুখচোখ দেখে বোঝা যায়, এতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। বলেছেন, 'এবার তা হলে আরেকটা জরুরি কথা সেরে নেওয়া যাক।'

একটু অবাকই হয়েছেন মুকুটনাথ। পাকা কথা হয়ে যাবার পরও জরুরি কথা কী থাকতে পারে? পরক্ষণেই একটা সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে পড়েছে। বলেছেন, 'দহেজের ব্যাপারে কিছু বলবেন?'

'নেহী, নেহী। আমরা চামারিয়া নই, ও ব্যাপারে আপনি যা ভাল বুঝবেন তা-ই হবে।'

'তব্?'

'আপনার লেড়কীকে লেখাপড়া শেখাতে হবে।'

'তা তো শেখাচ্ছিই। একজন মাস্টারজি রেখে দিয়েছি—'

'ওতে হবে না, হাইলি এডুকেটেড হতে হবে।'

মুকুটনাথ আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন, 'চিন্তা মাত্ করনা দুবেজি। এক মাস্টারের জায়গায় দশ মাস্টার

লাগিয়ে দেব।'

মহেশ্বরী বেশ মজার গলায় বলেছেন, 'নাতনীকে পণ্ডিতাইন করেই তোমাদের ঘরে পাঠাব।'

ত্রিকূটনারায়ণ হেসে হেসে জানিয়েছেন, তিনি পুতহু হিসেবে একটি স্মার্ট মডার্ন লেডি চান। এখানকার ধুসো কোট পরা, নাকের ডগায় নিকেলের গোল চশমা লাগানো, চামড়া ঘেঁষে চুল ছাঁটা, মোটা টিকিওলা, কাঁচা চামড়ার চপ্পল পরা, টিপিক্যাল আধা শহুরে আধা গাঁইয়া মাস্টারদের সাধ্য নেই কিরণকে একটি ঝকঝকে সফিস্টিকেটেড আধুনিকা বানিয়ে তুলতে পারে। বড় জোর প্রাচীন ভারতের মৈত্রেয়ী এবং অরুন্ধতীদের মডেলে ফেলে কিরণকে তাদের একটি ডুপ্লিকেট বানানো এই মাস্টারজিদের পক্ষে সম্ভব। তার বেশি কিছু নয়।

বিমূঢ়ের মতো মুকুটনাথরা জিজ্ঞেস করেছেন, 'তব্?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেছেন, 'লেড়কীকে দিল্লির কনভেন্টে পাঠিয়ে দিন। আংরেজি ভাষা, বিলাইতি চাল, রাহান সাহান, এটিকেট, এ সবে দুরস্ত হয়ে আসুক।' তিনি আরো বলেছেন, আজকের ফ্রি ইন্ডিয়ায় সোসাইটি, পলিটিকস বা জীবনের যে কোনো জায়গায় উঁচু লেভেলে চড়তে গেলে 'ইংলিশ'টা খুবই জরুরি, ওটা ছাড়া একটি কদমও ফেলা যাবে না।

তিন তিন বার ইন্টারমিডিয়েট ফেল ত্রিকূটনারায়ণের ইংরেজি ভাষা এবং 'বিলাইতি' চালের ওপর অসীম দুর্বলতা। নিজে ভাল ইংরেজি বলতে পারেন না। অজস্র ভুলভাল তো বলেনই, তাঁর উচ্চারণে ধরমপুরা কামতিগঞ্জ গোলগোলি এবং বইহারির দেহাতি গন্ধ আর ঢং মিশে আছে। তাঁর আংরেজি যে অত্যন্ত বিদঘুটে এবং কিম্ভূতকিমাকার, সেটা নিজেও কিছু কিছু টের পান।

যে ত্রিকূটনারায়ণ ইংরেজি ছাড়া কিছু ভাবতে পারেন না, যাঁর ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন জুড়ে শুধুই ইংরেজি, তিনিই কিনা এক সময় 'আংরেজি হটাও' আন্দোলনে নেমে গোটা আর্যাবর্ত চষে বেড়িয়েছেন। পলিটিকসে এলে এরকম উলটোপালটা কাজ করতেই হয়। ভারতবর্ষের মানুষের স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল, এসব ঘটনা তারা মনে করে রাখে না।

ত্রিকূটনারায়ণের কথাগুলো সবটা না পারলেও খানিকটা খানিকটা ধরতে পেরেছিলেন মহেশ্বরী। তিনি বলেছেন, 'পুতহুকে মেমসাহেব বানাতে চাও বেটা?'

'তা বলতে পারেন।'—ত্রিকূটনারায়ণ হেসেছেন।

'লেকেন বেটা, একটা কথা বলব। বুরা না সমঝো—'

'না না, আমি কিছুই ভাবব না, আপনি বলুন মা'জি।'

মহেশ্বরী যা বলেছেন তা এইরকম। দুবে এবং মিশ্রদের পারিবারিক আবহাওয়া চালচলন এবং রাহান সাহান অবিকল এক ধাঁচের। মেয়েরা বাড়ি থেকে কদাচিৎ বাইরে বেরোয়। বংশানুক্রমে জীবনযাত্রার যে প্যাটার্ন তৈরি হয়ে আছে তা ভাঙার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাড়িতেই যখন গোঁড়ামি সংস্কার পূজা তৌহার কুলদেওতা ইত্যাদির মধ্যে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে হবে, তখন মেমসাহেব পুত্রবধূর প্রয়োজনটা কোথায়?

এবার ত্রিকূটনারায়ণ তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তখনও তিনি এম. এল. এ হননি, তবে খুব শীগ্‌গিরই যে হয়ে যাবেন এবং তারপর মন্ত্রী হওয়া যে অবধারিত, এ নিয়ে আদৌ সংশয় নেই। তখন সঙ্গী সেক্রেটারি এবং গাইড হিসেবে একজন সোসিয়েলাইট পুত্রবধূ ছাড়া এক সেকেন্ডও চলবে না। মজা করে বলেছেন, 'ইন্ডিয়ান পলিটিকসের ফর্টি পারসেন্ট এখন কনট্রোল করছে পুতহুরা।'

মহেশ্বরী খুঁতখুঁত করছিলেন। নাতনীকে সোসিয়েলাইট বানাবার প্রস্তাবে তাঁর আত্‌মা এতটুকু সায় দেয়নি। রক্তে ভাসমান বহুকালের সংস্কার কাটিয়ে ওঠা কি এতই সহজ! তিনি বলেছেন, 'আমাদের বাড়ির মেয়েরা কেউ লেখাপড়া শেখার জন্য বাইরে গিয়ে থাকেনি।'

'মা'জি, জমানা বিলকুল বদল গিয়া। আজকাল মেয়েরা চাকরি করছে, বড় বড় কোম্পানি চালাচ্ছে, আকাশে হাওয়াই জাহাজ ওড়াচ্ছে, এম. এল. এ বনছে, মন্ত্রী হচ্ছে। ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পুরুষ আউর আওরতকে বরাবর করে দিয়েছে। দু'জনের ইকোয়েল রাইটস—সমান অধিকার।'

তবু কিরণকে 'আংরেজি' স্কুলে পাঠিয়ে বিলাইতি চাল শেখানোর ব্যাপারে একেবারেই রাজি হচ্ছিলেন না মহেশ্বরী। কিন্তু এই সময় কিঞ্চিৎ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন মুকুটনাথ। ত্রিকূটনারায়ণকে সমধী হিসেবে পেলে নানাদিক থেকে লাভ। কিছুদিন ধরেই তাঁর ইচ্ছা একটা লোহার কারখানা বসাবেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় জমিমালিক, ল্যান্ডেড অ্যারিস্টোক্র্যাট। এরা কেউ কেউ ধানবাদে আর আদিত্যপুরে ফ্যাক্টরি বসিয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হওয়ায় তাদের চালচলন, পোশাক, লাইফ স্টাইল রাতারাতি বদলে গেছে। কেউ আর এখন দেহাতি ঢংয়ে ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি বা নাগরা পরে না, কলকাতা বা পাটনার নাম-করা টেলরদের দিয়ে স্যুট বানিয়ে আনে। চুলের ছাঁটও অন্যরকম হয়ে গেছে। এদের অফিসের চেহারা দেখে তাক লেগে গেছে মুকুটনাথের। আজন্ম তিল তিসি ধান গেঁহু কিষান সার চাষবাস কুলগুরু কুলদেওতা জমিজমা, এসব নিয়েই আছেন। শেষ বয়সে কারখানা-টারখানা বসিয়ে একটু আলাদা স্টাইলে জীবনটা যদি কাটানো যায়, মন্দ কি!

অর্থাৎ জমিমালিক থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে চান মুকুটনাথ। উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন, তাঁর যা-ই থাক, হুট করে কারখানা বসানো খুব সোজা ব্যাপার নয়। পেছনে যদি ত্রিকূটনারায়ণের মতো জবরদস্ত পলিটিক্যাল লিডারকে সমধী হিসেবে পাওয়া যায়, সব কিছু জলের মতো সহজ হয়ে যাবে। তা ছাড়া পালামৌ ভোজপুরের দিকে ভূমিহীন বান্ধুয়া কিষানরা যে ধরনের ঝঞ্ঝাট পাকাচ্ছে তার আগুন যদি এধারে কোনোভাবে ঠিকরে আসে, ত্রিকূটনারায়ণের সাহায্য তখন অত্যন্ত দরকার।

সাত বছরের কিরণকে নিয়ে তার বাবা এবং ভাবী শ্বশুর, দু'জনেই দু'দিক থেকে অতি চতুর এবং চিকন পরিকল্পনা করেছিলেন। তার ওপর ভর করেই তাঁরা কয়েক স্তর ওপরে উঠতে চান।

মুকুটনাথ ঝানু ডিপ্লোম্যাটদের মতো হেসে হেসে মহেশ্বরীকে বলেছেন, 'মা, কিরণ এখন ওদের জিনিস। আমরা পরায়া ধন পালপোষ করছি। ত্রিকূটনারায়ণজি যদি চান তাঁদের পুতহু আংরেজি শিখবে ত শিখবে, বিলাইতি চাল রপ্ত করবে ত করবে। আমরা কেন বাধা দেব? সত্যিই তো, দিনকাল বদলে গেছে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন মহেশ্বরী।

আরো খানিকটা সময় এ নিয়ে কথাবার্তার পর ত্রিকূটনারায়ণ বলেছেন, 'অনেকক্ষণ এসেছি, এবার আমাদের উঠতে হবে। যাওয়ার আগে একবার আমার 'ঘরকা রোশনি'কে দেখে যাই।'

'ঘরকা রোশনি' অর্থাৎ কিরণ। তাকে তখনই ডেকে আনা হয়। ত্রিকূটনারায়ণ তাঁর কাঁধে একটা হাত রেখে কোমল স্বরে বলেন, 'ছোটি মা, তোমার সব ব্যাওস্থা পাক্কা হয়ে গেল। দু-এক মাসের মধ্যে তোমাকে কনভেন্টে পাঠানো হবে। গঙ্গা নদীতে বর্ষায় যেমন কারেন্ট খেলে ওইরকম স্পিডে আংরেজি বলতে শিখবে।' বলেই তাঁর মনে হয়েছে গঙ্গা নদীর কারেন্টের উপমাটা খুব জুতসই হয়নি। তিনি এবার বলেছেন, 'আংরেজিটা এমনভাবে বলতে শিখবে যাতে মনে হবে, মেমসাহেবের গলার নলিয়া থেকে বেরিয়ে আসছে। স্বাধীন ভারতে ইংলিশটা ইমপর্টান্ট চীজ।'

তখন অনেক কিছুই বোঝার বয়স নয় কিরণের। চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে থেকেছে। ত্রিকূটনারায়ণ নিজের স্ত্রীর দিকে ফিরে এবার বলেছেন, 'ঘরের লছমীকে আশীর্বাদ কর।'

ত্রিকূটনারায়ণের স্ত্রী রোহিণী বিপুল চেহারার থলথলে মহিলা। সর্বাঙ্গে পর্যাপ্ত মেদ। কপালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁর ঘোমটা টানা। সিঁথি থেকে পা পর্যন্ত হীরে মোতি সোনা চাঁদিতে মোড়া। এতক্ষণ রোহিণী চুপচাপ বসে ছিলেন, হঠাৎ শশব্যস্তে আঁচলের তলা থেকে একটা চাঁদির বাক্স বার করে খুলে ফেলেন। সেটার ভেতরে রয়েছে প্রচুর জড়োয়া গয়না। কিরণকে কোলে বসিয়ে নিজের হাতে সেগুলো একটা একটা করে তাকে পরিয়ে দেন, তারপর আদর করে তার মাথায় কপালে চুমু খান।

ত্রিকূটনারায়ণরা চলে যাবার আধ ঘণ্টা বাদে আচমকা কিছু মনে পড়ে যায় মহেশ্বরীর। তিনি প্রায় শিউরেই ওঠেন, 'মেয়েটার সর্বনাশ করে ফেললাম রে মুকুট—' তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল একেবারে ভেঙে পড়েছেন, তাঁর সর্বস্ব খোয়া গেছে।

মিশ্র বাড়ির সবাই ভয়ানক চমকে উঠেছিল। মুকুটনাথ বলেছেন, 'কী হয়েছে মা?'

'দুবেদের ঘরে মেয়ে পাঠানো ঠিক হবে না। ইয়ে শাদি নেহী হোনা চাহিয়ে। দুবেরা যে জেবর দিয়ে গেছে, কালই সেগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিবি।'

বিমূঢ়ের মতো মায়ের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন মুকুটনাথ। বলেছেন, 'এ তুমি কী বলছ মা! অত বড় একটা আদমী নিজের থেকে এসে কিরণকে আশীর্বাদ করে গেলেন, তখন তো কিছু বললে না! এখন কিভাবে বিয়ে ভাঙব? তা ছাড়া—' জোরে শ্বাস টেনে ফের বলতে থাকেন, 'ত্রিকূটনারায়ণজির কাছে তখন নিজেই বললে দুবেদের ঘরে কন্যাদান করাটা আমাদের পক্ষে বহুত সৌভাগ!'

মহেশ্বরী বলেছেন, 'তখন মনে পড়েনি যে। তারপর আচানক সব খেয়াল হল। ওদের বংশটা কেমন জানিস তো—'

মা কী ইঙ্গিত দিয়েছেন, সঠিক ধরতে না পেরে তাকিয়ে থেকেছেন মুকুটনাথ।

মহেশ্বরী সমস্ত ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ অঞ্চলের কারুর জানতে বাকি নেই যে, দুবেদের বংশটা খুবই দাগী। পুতহু পোড়াবার জন্য তারা বিখ্যাত। তিন তিনটে 'বহু'কে তারা পুড়িয়ে মেরেছে। এমন খুনীদের ঘরে কিরণকে পাঠানো কোনোভাবেই সমীচীন নয়। এ হল সব জেনেশুনে, হাত পা বেঁধে একটা মেয়েকে সোজা আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া।

এতক্ষণে মুকুটনাথেরও মনে পড়ে গেছে। তিনি বলেছেন, 'সে সব পন্দ্র বিশ সাল আগের কথা। তারপরে তো আর কিছু শুনিনি। তাছাড়া—'

'কী?'

মুকুটনাথ জানান, ত্রিকূটনারায়ণজি উদার, মহানুভব এবং শ্রদ্ধেয় মানুষ। বড় 'মহত্ত্বপূর্ণ আদমী'। তার ওপর পলিটিকসে নেমেছেন। তিনি এখন পাবলিক ফিগার। ইচ্ছা থাকলেও এমন কিছুই বলতে বা করতে পারেন না যাতে তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার ধ্বংস হয়ে যায়। পলিটিকস বহুত আজীব চীজ। এম. এল. এ, এম. পি বা মন্ত্রী বনতে হলে কিছু কিছু দামও দিতে হয়। মহেশ্বরী নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কিরণের গায়ে একটা আঁচড়ও পড়বে না।

মুকুটনাথ বলেছেন, 'চিন্তা না করনা মা।'

'মিশ্র নিকেত'-এ রেবতীর ভূমিকা পরছাইঁ বা ছায়ার মতো। সারাদিনে দু-চারটের বেশি শব্দ তাঁর মুখ থেকে বেরোয় না। সর্বক্ষণ চুপচাপ, নিঃশব্দে চলেন ফেরেন, নৌকর-নৌকরনীদের কাজকর্ম তদারক করেন। কিন্তু মহেশ্বরী উত্তর দেবার আগে হঠাৎ বলে ফেলেছেন, 'খরবুজাসে খরবুজা রং পাকড়তা হ্যায়। ওদের গায়ে হত্যারার খুন। আমার ডর লাগছে।'

মুকুটনাথের চোখে মুখে এবার অসহিষ্ণুতা ফুটে বেরিয়েছিল। স্ত্রীর দিকে ফিরে বলেছেন, 'পরছাইসে ডরনা মাত্। ওরা কি ভিখমাঙোয়ার ঘর থেকে পুতহু নিচ্ছে? দুবেরা না চাইলেও দহেজ আমি ঠিকই দেব। কমসে কম শ'ও বিঘা জমিন, হীরা মোতির জেবর, নগদ এক লাখ রুপাইয়া। দুবেরা কিরণকে মাথায় চড়িয়ে রাখবে।' একটু থেমে বলেন, 'তাছাড়া আমাদের সঙ্গে রিস্তেদারি করলে আখেরে ত্রিকূটনারায়ণজির ফায়দাই হবে। এতে তাঁর স্বার্থ রয়েছে।'

'কিসের স্বার্থ?'

'শুনেছি, এবার যে চুনাও আসছে, তাতে কামতিগঞ্জের চুনাও কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের গোলগোলি মৌজার অনেকটা জায়গা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। লগভগ গোলগোলিতে দশ হাজার ভোটার রয়েছে। আমি যাকে দিতে বলব, এই দশ হাজার ভোটে তার নামেই মোহর পড়বে। চুনাওতে জিততে হলে আমার পায়ে ত্রিকূটনারায়ণ দুবেকে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকতে হবে। সমঝি?'

রেবতী কিছু বলার সুযোগ পাননি, তার আগেই মুকুটনাথ আবার শুরু করেছেন, 'আমার মেয়ের গায়ে আগুন ধরিয়ে ভবিষ্যের সত্যনাশ করবেন, ত্রিকূটজি এতটা বেওকুফ নিশ্চয়ই হবেন না।'

তবু দ্বিধাটা পুরোপুরি কাটেনি রেবতীর। বলেছেন, 'সবই বুঝলাম। কিন্তু ওরা যে তিন তিনটে পুতহু পুড়িয়েছে, এটা তো মিথ্যে নয়।'

মহেশ্বরীও মাথা নেড়ে সায় দিয়েছেন, 'ঠিক, ঠিক বাত।'

এবার বেশ রেগেই গেছেন মুকুটনাথ, 'কেন, কেন ওরা পুতহু পুড়িয়েছে, তোমাদের মনে নেই? যা

দহেজ দেবার কথা ছিল তা ওই তিন পুতহুর বাপেরা দেয়নি। তাতেই তো দুবেদের মাথায় খুন চড়ে যায়। এই যে আমি শাদি করেছি, আমার শ্বশুর যদি কথা দিয়ে দো শ বিঘে জমিন না দিত, তোমরা কী করতে মা?' রেবতীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেছেন, 'একে কি টিকতে দিতে?'

সামনে পেছনে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছেন মহেশ্বরী। পুত্রবধূ পোড়াবাব এমন নিশ্ছিদ্র সলিড যুক্তির বিরুদ্ধে তাঁর কিছু বলার নেই। রেবতীও আর কিছু বলেননি। যারা ছেলেদেব শ্বশুরবাড়ি থেকে পর্যাপ্ত দহেজ পায় না, নিশ্চিতভাবেই তাদের পুতহু পোড়াবার অধিকার আছে।

কণ্ঠস্বর নমনীয় করে মুকুটনাথ বলেছেন, 'তোমাদের তো বলেছিই, দুবেবা ভিখমাঙোয়ার ঘব থেকে মেয়ে নিচ্ছে না। কিরণের কিছু হলে আমি ছেড়ে দেব ভেবেছ?'

'শাদিকা বাত' পাকা হয়ে যাওয়ার মাস দুই বাদে কিরণকে দিল্লির কনভেন্টে পাঠানো হয়েছিল। ওখানে থেকেই তাকে পড়তে হবে।

কনভেন্টের ব্যবস্থা করেছিলেন স্বয়ং ত্রিকূটনারায়ণ। তিনি এবং মুকুটনাথ প্রথম বাব কিবণকে দিল্লি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন। কিরণ কিছুতেই ওই অজানা অনাত্মীয় পরিবেশে থাকবে না, খুব কান্নাকাটি করেছিল সে। মুকুটনাথ অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে শান্ত করেছেন। কথা দিতে হয়েছে, বছরে তিন বার—এক্স-মাসের ছুটিতে, দেওয়ালীর সময় এবং সামার ভ্যাকেশনে মুকুটনাথ নিজে এসে তাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন।

কনভেন্টটা প্রায় চার একর জায়গা জুড়ে। কমপাউন্ডের ভেতর দু দু'টো খেলার মাঠ, টেনিস ব্যাডমিন্টন আর বাস্কেটবলের কোর্ট। তাছাড়া এখানে ওখানে চমৎকার বাগান, প্রচুর গাছপালা, ফুল, অজস্র পাখি। একটা ভাল সুইমিং পুলও আছে। সামনের দিকে তকতকে স্কুল বিল্ডিং, একেবারে পেছনে ছাত্রী এবং টিচারদের জন্য কটেজ টাইপের হস্টেল।

ইন্ডিয়ার প্রায় সব প্রভিন্স থেকেই মেয়েরা এখানে পড়তে এসেছে। এদেব বেশিব ভাগই পার্শি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, কুর্গি, বাঙালি আর সাউথ ইন্ডিয়ান। প্রতিটি মেয়েই দারুণ স্মার্ট এবং প্রাণবন্ত, সারাক্ষণ টগবগ করে যেন ফুটছে। সব ক'টি মেয়েকেই 'চুন চুনকে' অর্থাৎ কিনা চুলচেরা বিচারের পব বেছে নেওয়া হয়েছে। কিরণই শুধু বাদ। তার মতো প্রায় গাঁইয়া একটি মেয়ের অ্যাডমিশন সম্ভব হয়েছে ত্রিকূটনারায়ণের রাজনৈতিক কনট্যাক্টের জোরে।

'মিশ্র নিকেত'-এর পর্দা-ঢাকা, হাজার বছবের প্রাচীন গোঁড়ামি এবং সংস্কারে ঠাসা অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অচেনা এক সৌরলোকে যেন চলে এসেছে কিরণ। সে একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল। গোড়ায় গোড়ায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, কুঁকড়ে থাকত। তাবপর স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন এই পরিবেশের সঙ্গে মিশে গেছে। দু বছরের মধ্যে সে কনভেন্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল।

প্রথম দিকে বছরে তিন বার এসে কিরণকে বাড়ি নিয়ে যেতেন মুকুটনাথ। পরে অবশ্য খুবলালকে পাঠাতেন। প্রতিবারই ধরমপুরায় এসে কিরণের মনে হয়েছে, 'মিশ্র নিকেত' ক্রমশ তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এ বাড়িতে সে জন্মেছে, তার রক্তে এবং ফুসফুসে জীবনের প্রথম সাতটা বছর মিশ্র বংশের গোঁড়ামির সমস্ত ভাইরাস ঢুকে গেছে, তবু মনে হত, সে এখানকার কেউ না। ভাবনা চিন্তা, লাইফ স্টাইল—সব দিক থেকেই ধরমপুরার সঙ্গে তার যোগাযোগ ধীরে ধীরে আলগা হয়ে আসছিল।

ছুটিতে বাড়ি এলেই ত্রিকূটনারায়ণ তাঁর ঢাউস ফোর্ড গাড়িতে চেপে চলে আসতেন। দু একবার ছেলেকেও নিয়ে এসেছেন। ছেলের পুরো নাম হরীশনারায়ণ, সংক্ষেপে হরীশ—কিরণেব ভাবী স্বামী।

হরীশ আদৌ তার বাবার মতো নয়। ঘিউ-ননী খাওয়া গোলগাল শান্তশিষ্ট ভালমানুষ চেহারা। তাকেও বিলাইতি এটিকেট, চোস্ত ইংরেজি এবং রাহানসাহান শেখাবার জন্য পাটনার এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কিরণ শুনেছে হরীশের মাথাটি একেবারেই নিরেট, আগাগোড়া নিশ্ছিদ্র পাথরের স্ল্যাব, কিছুই ঢোকে না, বেরোয়ও না। একেকটা ক্লাসে প্রোমোশন পেতে তাব কম করে দু-তিন বছর লেগে যায়।

অকর্মার ধাড়ি, অপদার্থ এই ছেলেটা কিরণদের বাড়ি এলে ত্রিকূটনারায়ণের গা ঘেঁষে, মুখ নামিয়ে এমনভাবে বসে থাকত যাতে থুতনিটা সোজা বুকে গিয়ে ঠেকত। একটি কথাও বলত না সে, কারুর দিকে তাকাত না পর্যন্ত।

ত্রিকূটনারায়ণ কিরণকে জিজ্ঞেস করতেন, 'পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?'

কিরণ বলত, 'ভাল।'

এরপর কনভেন্ট সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু প্রশ্ন করতেন ত্রিকূটনারায়ণ। টিচাররা কেমন পড়ায়, অন্য মেয়েরা তাকে বিরক্ত করে কিনা, বিলাইতি চাল কেমন শেখানো হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর অনিবার্য নিয়মে এই কথাটা বলতেন, 'ইংলিশটা কিরকম শিখলে, থোড়া কুছ শোনাও তো মা।' ইংরেজির প্রতি তাঁর আজন্মের দুর্বলতা এবং নৌকরসুলভ আনুগত্য।

প্রথম প্রথম লজ্জা পেত কিরণ। পরে অবশ্য বুঝেছে, সে বাড়ি এলেই ত্রিকূটনারায়ণ যে ছুটে আসেন তার কারণ একটাই। সে কতটা বিলিতি এটিকেটে চৌকস হয়েছে, জলের মতো ইংরেজি বলতে পারে কিনা, এ সব জানাই তাঁর উদ্দেশ্য।

পরে কিরণের বেশ মজাই লেগেছে, সে গড়গড়িয়ে যা হোক কিছু বলে যেত। শুনতে শুনতে ত্রিকূটনারায়ণের চোখে মুখে একটা আঠাল গ্যাদগেদে তৃপ্তির জেল্লা ফুটে বেরুত। ভবিষতে তিনি যখন মন্ত্রী হবেন, অল ইন্ডিয়া ফিগার হয়ে যখন তাঁর 'ভাবমূরত' শানদার হয়ে উঠবে, সেই অনাগত ঝকমকানো ভবিষ্যতের জন্য এইরকম একটি সর্বক্ষণের সঙ্গিনী এবং সেক্রেটারি একান্ত জরুরি। কিরণ অবিকল তাঁর মনের মতো হয়ে উঠছে। তাঁর পুতহু নির্বাচন যে আগাগোড়া অভ্রান্ত, এতে তিনি খুবই খুশি।

সে ধরমপুরায় এলে বাড়ির লোকেরা—মা বাবা থেকে শুরু করে নৌকর নৌকরনীরা পর্যন্ত—অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকত। কয়েক মাস পর পর সে যখন বাড়ি আসে, এর মধ্যে আগের বারের থেকে কতটা বদলে যায়, সেটা হয়ত তারা বুঝতে চেষ্টা করত।

মহেশ্বরী কিরণকে কাছে বসিয়ে প্রগাঢ় স্নেহে বলতেন, 'হাঁ রে মুন্নুয়া, তুই কি সচমুচ মেমসাহেব বনে যাবি!'

কিরণের আদরের নাম মুন্নুয়া। সে মাথা হেলিয়ে দিয়ে মজা করে হাসত, 'বনে যাব কী, বনে গেছিই তো।'

'তোদের ইস্কুলে যারা রসুই করে তাদের কী জাত? ব্রাহ্মণ না অন্য কিছু?'

কেমন করে কিরণ ঠাকুমাকে জানায়, খ্রিস্টান মিশনারিদের কনভেন্টে যারা খানা পাকিয়ে টেবলে সার্ভ করে তারা বেশির ভাগই গোয়াঞ্চি পিদ্রু আর লখনৌ-এর মুসলমান। এসব শোনার সঙ্গে সঙ্গে দমবন্ধ হয়ে তাঁর দেহান্ত ঘটে যাবে। মুসলমান আর খ্রিস্টানের হাতে খাওয়া শুদ্ধ ব্রাহ্মণের পক্ষে ঘোর অধর্ম। কিরণ বলত, 'আমাদের কুকরা, মতলব রসুইকরেরা সবাই শাক্যদ্বীপী ব্রাহ্মণ।'

'সচ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সচ।'

কিরণ জোর দিয়ে বলা সত্ত্বেও দুশ্চিন্তা কাটত না মহেশ্বরীর। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, 'ওরা তোকে অখাদ্য খেতে দেয় না তো?'

মহেশ্বরীর নিষিদ্ধ খাদ্য তালিকায় রয়েছে মাংস ডিম এবং মছলি। এই বস্তুগুলো 'মিশ্র নিকেত'-এর বাউন্ডারি ওয়াল পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে পায় না। মহেশ্বরীর চোখে এসব ভোজন পবিত্র ব্রাহ্মণের পক্ষে অতীব গর্হিত কাজ। ঠাকুমাকে জানানো অসম্ভব যে দিল্লিতে গিয়ে কিরণ মাছ মাংস খেতে শিখেছে। যদিও ওখানে বিশুদ্ধ ভেজিটারিয়ানদের জন্যও ব্যবস্থা আছে তবু হ্যাম পর্ক মাটন তার অত্যন্ত প্রিয়। শাক্যদ্বীপী মিশ্র বংশের মেয়ে কুখাদ্য খেয়ে পাকস্থলী অপবিত্র করেছে, এ খবরটা কানে গেলে মহেশ্বরীর হাল কী হবে, কিরণ তা জানত। হেসে হেসে সে বলত, 'কী যে বল দাদী, তোমার নাতনি হয়ে ওসব খেতে পারি! স্ট্রেট নরকে চলে যাব না! আমি সেন্ট পারসেন্ট ভেজিটারিয়ানই আছি।'

'সেটা কী?'

'পবিত্র শাকাহারী।'

পরে উঁচু ক্লাসে কিরণ যখন পড়ছে, তখন বাড়ি এলে মহেশ্বরী জিজ্ঞেস করতেন, 'কী রে মুন্নুয়া, যে রকম চমকদার জোয়ানী হয়ে উঠেছিস তাতে দিল্লির ছোকরাদের মুণ্ডুতে চক্কর লেগে যাচ্ছে না?'

চোখ কুঁচকে, ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কিরণ বলত, 'যাচ্ছে আবার না।'

'কারুর পাল্লায় পড়িসনি তো?'

যদিও তামাসার ঢংয়ে, হালকা চালে প্রশ্নগুলো করতেন, তবু এর পেছনে যে মহেশ্বরীর গভীর দুর্ভাবনা রয়েছে, তা টের পেতে অসুবিধা হত না। ঠাকুমাকে খেপিয়ে দেবার জন্য কিরণ ঘাড় হেলিয়ে বলত, 'যদি পড়ে থাকি?' বলে ঠোঁট টিপে হাসত।

মহেশ্বরী আঁতকে উঠতেন, 'মাত্ কহো, মাত্ কহো। এমন বুরা কথা মুখ থেকে আর কখনও বার করবে না। কভী নেহী। অ্যায়সা বুরা জবানমে লাগাম হোনা চাহিয়ে।'

মহেশ্বরীর গলার ভেতব একটা দম দেওয়া স্বয়ংক্রিয় রেকর্ড আছে। এরপর সেটা অনেকক্ষণ একটানা বেজে যেত। ব্রাহ্মণ কুঁয়ারীকে বিয়ের আগে দেহমনে গঙ্গাজলের মতো শুদ্ধ থাকতে হয়। বিশেষ করে কিরণের মতো মেয়েকে। যার সাগাই হয়ে গেছে তার পক্ষে ভাবী স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের কথা চিন্তা করাও জঘন্য পাপ, ভ্রষ্টাচার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ কুঁয়ারীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের তালিকা শুনতে শুনতে কানের পর্দা ছিঁড়ে যেত কিরণের। দু'হাতে কান চাপা দিয়ে সে বলত, 'প্লিজ দাদী, আর না। অন্য ছেলের দিকে তাকাব না, হরীশনারায়ণ দুবে ছাড়া আর কারুর কথা ভাবব না, গঙ্গাপানি বরাবর শুধ্ থাকব—বিলকুল পিওর। ঠিক হ্যায়?'

'হাঁ।'

'মনমে শান্তি হুয়া তো?'

'হাঁ, পরমাত্মাকা শান্তি। পিছলা জন্মে বহুত 'পুণ' করেছিলি, তাই এবার মিশ্র বংশে জন্মেছিস। এমন কিছু ভাববি না, এমন কিছু করবি না যাতে এই বংশে কলংক লাগে, এর পবিত্রতা নাশ হয়ে যায়। হোঁশিয়ার।' বলে একটু থেমে আবার শুরু করতেন মহেশ্বরী, 'মনে করিস না দিল্লিতে গিয়ে আমার চোখের বাইরে যা খুশি করে বেড়াবি। আমি এখানে বসেও তুই কী করছিস না করছিস—সব টের পাই।'

কিরণ বুঝতে পারত, হাজার মাইল দূরে 'মিশ্র নিকেত'-এর চৌহদ্দি থেকে সোজা দিল্লি পর্যন্ত চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন মহেশ্বরী। নাতনির দেহের শুদ্ধতা এবং মনের শুচিতা বজায় থাকাটা তাঁর কাছে অত্যন্ত জরুরি।

কিরণ বাড়ি এলে মায়ের মুখ আলো হয়ে যেত। তাঁর চলায় ফেরায় আনন্দের আভা যেন ছড়িয়ে পড়ত। কথা তো তিনি কম বলেন, তবু সময় পেলেই তাকে কাছে নিয়ে বসতেন। পিঠে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করতেন, সে দিল্লিতে ঠিকমতো খায় কিনা, সময়মতো ঘুমোয় কিনা, কোনোরকম অনিয়ম করে কিনা, এই সব।

যে ক'টা দিন সে বাড়িতে থাকত, রেবতী কখনও ঠাণ্ডাই বানিয়ে মেয়ের মুখের সামনে ধরতেন, কখনও নিয়ে আসতেন নিজের হাতে তৈরি নিমকিন, গুলাবজামুন, মুগের লাড্ডু, দেওঘরের পেঁড়া বা মোতিচুর কিংবা কলাকন্দ। মায়ের স্নেহ যে কত গভীর, কত দূরপ্রসারী, অন্য সবার থেকে সেটা কত আলাদা তা কয়েক দিনেই টের পাওয়া যেত।

মুকুটনাথ বেশি কিছু বলতেন না। শুধু পরিতৃপ্ত চোখে মিশ্র বংশের একটি মেয়ের আশ্চর্য ইভোলিউশন দেখে যেতেন। কিরণ একশ বিঘে জমি, প্রচুর জেবর এবং অজস্র টাকার দহেজ নিয়ে দুবেদের বাড়ি চলে যাবে ঠিকই কিন্তু এইসব জমিটমি একেবারে জলে যাবে না, বরং কুলদেবী মহালছমীর কৃপা হলে এর একশ গুণ উঠে আসবে। এই মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ভবিষ্যতে তাঁর জন্য অনেক কিছু করতে পারবে। সচমুচ ত্রিকূটনারায়ণজি যদি মন্ত্রী হন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিরাট পলিটিক্যাল সার্কেলে মিশবার সুযোগ পাবে কিরণ। তার এই সব যোগাযোগ থেকে ত্রিকূটনারায়ণজিই শুধু ফয়দা

ওঠাবেন না, ছিটেফোঁটা তাঁর ভাগেও পড়বে। কিরণকে ঘিরে মুকুটনাথের মনেও উচ্চাশার 'মূরত'টা ক্রমশ লম্বা হতে শুরু করেছে।

এদিকে কিরণ যখন প্রথম দিল্লির কনভেন্টে যায় সুষ্মা তখন খুবই ছোট। সে যত বড় হচ্ছিল ততই কুচুটে এবং হিংসুক হয়ে উঠছিল। সুষ্মার ধারণা হয়েছিল এবং এখনও সে ধারণা অটুট—জগতে তার যা কিছু প্রাপ্য, যা কিছু কাম্য, সব কিছু কিরণ জোর করে কেড়ে নিয়েছে।

ছুটিতে কিরণ বাড়ি এলে সবাই ছুটে আসত, শুধু সুষ্মা বাদ। দুর থেকে কোঁচকানো হিংস্র চোখে সে শুধু ওকে লক্ষ করত। অগত্যা কিরণকেই ছোট বোনের কাছে এগিয়ে যেতে হত। তার হাত ধরে কোমল গলায় বলত, 'কেমন আছিস বুন্নুয়া?'

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সুষ্মা হঠাৎ গলার শির ছিঁড়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিত, 'তোর জন্যে আমি কি সারা জীওন ভাল থাকতে পারব? চুহি কাঁহিকা!'

মুখটা কালো হয়ে যেত কিরণের। সে বলত, 'গুস্‌সা হচ্ছিস কেন? এই দ্যাখ তোর জন্যে কী এনেছি।'

ফি বারই সুষ্মার জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আসত কিরণ। কোনো বার কাড়ির হার, কোনো বার দামি সেন্ট বা পেন কিংবা চামড়ার ফ্যাশনেবল ব্যাগ। সে সব ওর হাতে দিলেই ছুঁড়ে ফেলে দিত। চিৎকার করে বলত, 'নেহী চাহিয়ে, নেহী চাহিয়ে—'

সুষ্মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করতে চাইত কিরণ। কিন্তু সে অত্যন্ত অবুঝ, তার মধ্যে নানা ধরনের কমপ্লেক্স। নিতান্ত অকারণেই সে চেঁচাতে থাকত, এলোপাথাড়ি বলে যেত, 'বান্দরী কাঁহিকা, দিল্লিতে মেমসাহেব বনে সাপের পাঁচ পা দেখেছিস!'

তার দিল্লি যাওয়াটা যে সুষ্মার কষ্ট এবং কমপ্লেক্সের একটা বড় কারণ, সেটুকু বুঝতে আদৌ অসুবিধা হয়নি কিরণের। মুকুটনাথকে সে বহুবার বলেছে, সুষ্মাকেও যেন কোনো একটা কনভেন্টে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু বাবা তা কানেও তোলেননি। যে মেয়েকে পুতহু করার জন্য ত্রিকূটনারায়ণের মতো বিখ্যাত 'বড়ে আদমী' দৌড়ে আসবেন না, তাকে কনভেন্টে পাঠিয়ে বিলাইতি চাল শেখাবার সঙ্গত কোনো কারণ নেই। বংশধারা অনুযায়ী মান্ধাতার বাপের বয়সী পিঠ-বাঁকা কোমর-ভাঙা বুড়ো মাস্টারজিদের কাছে দু'চার পাতা যা পারে, শিখে নিক সুষ্মা। তা হলেই তার জীবন কেটে যাবে।

বাড়ির চেহারা তো এইরকম। কনভেন্টের ক'টা বছর কিন্তু চমৎকার কেটেছে কিরণের। খ্রিস্টান মিশনারিদের ম্যানেজমেন্ট, তাই হোলি বাইবেলটা পড়তেই হত। তাতে তার আপত্তি ছিল না, বরং একটা নতুন জিনিস শেখার আনন্দ ছিল।

কনভেন্ট কিরণের সামনে হাজারটা দরজা খুলে দিয়েছিল যেন। নিয়মিত ক্লাস করার ফাঁকে ফাঁকে ডিবেট, স্পোর্টস, এক্স-মাসে হস্টেল সাজানো, পিকনিক, সেমিনার, মাঝে মাঝে নাম-করা অধ্যাপক বা বিজ্ঞানীদের নিয়ে এসে তাঁদের কথা শোনা, নাটক করা, ভাল এডুকেশনাল ফিল্ম দেখা, এক্সকারসন, প্রায় ফি মাসেই এরকম কিছু না কিছু প্রোগ্রাম থাকতই। সারা ইন্ডিয়া থেকে মেয়েরা পড়তে এসেছিল। তাদের কালচার, ভাষা বা ফুড-হ্যাবিট সবই আলাদা আলাদা। একটা সত্যিকারের কসমোপলিটান আবহাওয়ায় বছরের পর বছর থাকার জন্য কিরণের পৃথিবী দ্রুত বড় হয়ে যাচ্ছিল। শাকদ্বীপী মিশ্র বংশ তার ধ্যানধারণা ভাবনাচিন্তার ওপর গোঁড়ামি এবং সংস্কারের যে শক্ত স্থায়ী কোটিং চাপিয়ে দিয়েছিল সেটা ভেঙে পড়ছিল। একটা খাপের ভেতর থেকে নিজের অস্তিত্বকে টেনে বার করে আনতে শুরু করছিল সে।

কিরণ যখন হায়ার ক্লাসে পড়ছে, সেই সময় হঠাৎ আবছাভাবে মনে হয়েছিল, একজন ভাবী মন্ত্রীর সেক্রেটারি এবং একটা অত্যন্ত অপদার্থ ঘি-মাখন খাওয়া ছোকরার স্ত্রী হওয়ার চেয়ে আরো অনেক কিছু করার আছে। অনেক মিনিংফুল এবং দরকারি। হয়ত সেদিন থেকেই নিজেব অজান্তে নিজস্ব একটা আইডেন্টিটির কথা ভাবতে শুরু করেছিল সে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে দিল্লিরই এক বিখ্যাত উইমেনস কলেজে ভর্তি হয়েছিল কিরণ। এই কলেজে মেয়ে পাঠাবার জন্য সারা দেশের নিও-অ্যারিস্টোক্র্যাটরা স্বাধীনতার পব থেকে স্বপ্ন দেখে আসছে। প্রতি বছরই এখানে দিল্লি ছাড়াও বাকি স্টেটগুলো থেকে অ্যাপ্লিকেশন আসে পঁচিশ ত্রিশ হাজার। তার ভেতর থেকে সেই একই পদ্ধতিতে অর্থাৎ 'চুন চুনকে' অর্থাৎ ঝাড়াই বাছাই করে মাত্র চার শ মেয়ে নেওয়া হয়।

ভাল রেজাল্ট করলেই এখানে অ্যাডমিশান পাওয়া যায় না। পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড, সামাজিক এবং আর্থিক স্টেটাস, ভর্তি হওয়ার পেছনে এগুলো অনেক বেশি জরুরি। অলিখিত একটা শর্তই আছে, কলেজ ফাণ্ডে মোটা অঙ্কের ডোনেশনও দিতে হবে।

আসলে দিল্লির এই কলেজটা হল ভবিষ্যতের এম. পি, পলিটিক্যাল লিডার, ডিপ্লোম্যাট, আই. এ. এস, আই. এফ. এস, আই. পি. এস, বিগ বিজনেস হাউসের টপ একজিকিউটিভ বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদেব উপযুক্ত 'ধর্মপত্নী' অথবা জীবনসঙ্গিনী বানাবার ওয়ার্কশপ। এখানে ভর্তি হওয়ার জন্য তাই গোটা ইন্ডিয়া জুড়ে প্রবল প্রতিযোগিতা।

এই কলেজেও কিরণের অ্যাডমিশানের ব্যবস্থা করেছিলেন ত্রিকূটনারাযাণ। কনভেন্টেব মতো এখানেও তাঁকে প্রচণ্ড রাজনৈতিক ইনফ্লুয়েন্স খাটাতে হয়েছে। অবশ্য ততদিনে তিনি একটি নির্বাচনে জিতে এম. এল. এ হয়ে গেছেন। এবং রাজনীতিতে তাঁর সত্যিকারের এই জাতে ওঠার পেছনে মুকুটনাথের যথেষ্ট হাত আছে।

এখানে মেয়েদের পাঠানো হয়, ভবিষ্যতের দামি অফিসার টফিসারদের স্ত্রী করে তোলার কারণে। কিন্তু কিরণকে ভর্তি করা হয়েছিল একজন উচ্চাকাঙক্ষী রাজনৈতিক নেতার পুত্রবধূ এবং যোগ্য সহকারিণী বানাবার উদ্দেশ্যে।

যে কনভেন্টে কিরণ অনেকগুলো বছব কাটিয়ে এসেছে তার তুলনায় কলেজ কমপাউন্ডটা অনেক বড়, প্রায় চার গুণ। সায়েন্স, আর্টস এবং কমার্স স্ট্রিমের জন্য আলাদা আলাদা বিশাল বিল্ডিং। এ ছাড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক, অডিটোরিয়াম, অনেকগুলো বাগান, খেলার মাঠ, তিনটে সুইমিং পুল —এসব আছেই। একধারে মেয়েদের হস্টেল, টিচারদের জন্য কটেজ। হস্টেলে দামি হোটেলে থাকার সুখ এবং আরাম।

কিরণদের কনভেন্ট থেকে আরো চারটি মেয়ে, এই কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তারা পাঁচ জন ছাড়া ফার্স্ট ইয়ারের তিন শ পঁচানব্বইটি নতুন মেয়ে একেবারেই অচেনা। এদের অনেকেই দিল্লির নানা কনভেন্ট এবং স্কুল থেকে এসেছে। বাদ বাকিরা এসেছে কলকাতা বম্বে মাদ্রাজ ব্যাঙ্গালোর আমেদাবাদ-টামেদাবাদ থেকে। অবশ্য যারা সিনিয়র, সেকেন্ড থার্ড বা ফোর্থ ইয়ারে তখন পড়ছে—তাদের কাউকে চিনত না কিরণ।

সে আগেই শুনেছিল, দিল্লির এই কলেজটায় মারাত্মক র‍্যাগিং চলে। ভয়ে ভয়েই সে প্রথম দিন বাবা এবং ত্রিকূটনারায়ণের সঙ্গে এখানে এসেছিল। অফিসে খবর নিয়ে জানা গিয়েছিল, আর্টসের ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট হস্টেলের চাবতলার বাইশ নম্বর রুমে তাব থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

মুকুটনাথরা কিরণকে পৌঁছে দিয়ে বেশিক্ষণ বসেননি, ছোটখাট কিছু সদুপদেশ দিয়ে চলে গেছেন। আব সে আস্তে আস্তে দুটো খেলার মাঠ এবং অনেকগুলো ফুলের বাগান পেরিয়ে চলে এসেছিল আর্টসের ছাত্রীদের হস্টেলে।

পাঁচতলা হস্টেল বিল্ডিংটায় দুটো অটোমেটিক লিফ্ট। ওপরে উঠে নিজের ঘরে এসে দারুণ খুশি হয়ে গিয়েছিল কিরণ। কার্পেটে মোড়া বিশাল ঘরের দু'ধারে দুটো সিঙ্গল বেড খাটে দুধের মতো ধবধবে বিছানা পাতা। একটা বেডে বসে আছে ললিতা—ললিতা নায়ার।

ললিতা কেরালার মেয়ে, তবে দিল্লিতেই জন্ম, ওর বাবা মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্সে বিরাট অফিসার। ললিতা কনভেন্টে কিরণের সঙ্গে পড়ত। সে ওর সব চাইতে প্রিয় বন্ধু।

কিরণকে দেখে লাফিয়ে উঠেছিল ললিতা, 'হাই কিরণ. তোর জন্য কতক্ষণ বসে আছি ! অফিসে খোঁজ করে জানলাম, তোকে আর আমাকে একটা ঘর দেওযা হয়েছে। হাউ নাইস!'

কিরণের প্রায় নাচতে ইচ্ছা করছিল। একই ঘরে ললিতার সঙ্গে ক'টা বছর থাকতে পারবে, এটা একটা দুর্দান্ত ব্যাপার। চোখ বড় বড করে, সে ছুটে এসে ললিতাকে জড়িয়ে ধরেছিল, 'রিয়েলি নাইস। কবে এসেছিস এখানে?'

'আজই। দু'ঘণ্টা আগে।'

'প্রীতি, সুমন, সুলভাকে দেখেছিস? শুনেছি ওরাও এখানে ভর্তি হয়েছে—'

এই মেয়ে তিনটিও কিরণদের কনভেন্ট থেকেই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করেছে। ললিতা বলেছিল, 'সুমনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওর ঘর ফার্স্ট ফ্লোরে। তবে প্রীতি আর সুলভাকে দেখিনি।'

কিরণ বলেছে, 'চল, ওদের খুঁজে বার করি। হস্টেলটাও ঘুরে ঘুরে দেখা যাক।'

পাখির মতো উড়তে উড়তে দু'জনে বেরিয়ে পড়েছিল। লিফ্‌টে করে না, সিঁড়ি ভেঙে তর তর করে প্রথমে নেমে এসেছে দোতলায়। সুমনকে তার ঘর থেকে টেনে এনেছিল একতলায়। তারপর আবার উঠে এসেছিল ওপরে। তিনজনে প্রতিটি রুমে হানা দিয়ে যাচ্ছিল এবং ফোর্থ ফ্লোরে এসে প্রীতি এবং সুলভাকে পেয়ে গিয়েছিল।

নতুন জায়গায় পুরনো বন্ধুদের পেয়ে পাঁচ জনেরই ভীষণ ভাল লাগছিল। এক মিনিটও কেউ ঘরে থাকেনি, গোটা হস্টেল জুড়ে তারা অনেকক্ষণ ছোটাছুটি করেছে। শুধু তারাই নয়, যে সব নতুন মেয়ে ইন্ডিয়ার নানা শহর থেকে এসেছে তারাও ঝাঁকে ঝাঁকে রঙিন প্রজাপতি হয়ে উড়ছিল। করিডরে ঘুরতে ঘুরতে তাদের অনেকের সঙ্গেই আলাপ করে নিয়েছে কিরণরা, তারাও এগিয়ে এসে আলাপ করছিল।

পাঁচটা ফ্লোরে অনবরত ছোটাছুটি করতে করতে কিরণরা জেনে গিয়েছিল, আধখানা বৃত্তের মতো এই হস্টেল বিল্ডিংটায় সবসুদ্ধ দু'শ ঘর। বড় ঘরগুলোয় তিনজন করে থাকার ব্যবস্থা, তুলনায় ছোট ঘরগুলো দু'জনের জন্য। একতলায় রয়েছে কিচেন, বিশাল ডাইনিং রুম। তেতলায় আছে বড় হল। সেখানে ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা ছাড়াও একটা মাঝারি স্টেজ এবং রঙিন টি. ভি রয়েছে। আর ছাদে সুপারিনটেনডেন্ট প্রফেসর মিস হরজিৎ কাউরের কোয়ার্টার্স। এক ঘণ্টার মধ্যেই কিরণরা জেনে গেল, প্রফেসর মিস হরজিৎ কাউর দু'বারের ডিভোর্সি। একবার তাঁর পদবি হয়েছিল সিং, একবার সোন্ধি। দুই স্বামীকে একটি করে ছেলে উপহার দেওয়ার পর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এবং তিনি তাঁর কুমারী জীবনের পুরনো পৈতৃক পদবিটি আবার নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে দেন।

কিরণ নতুন কলেজে এসেছিল বেলা দশটায়। ঘণ্টা দেড়-দুই ঘোরাঘুরির পর অ্যাটাচড্ বাথে স্নান টান সেরে নিচের ডাইনিং হল-এ গিয়ে লাঞ্চ সেরে আসে। তারপর সুলভার ঘরে শুরু হয়েছিল আড্ডা, হই চই, ফোয়ারার মতো হঠাৎ হঠাৎ হাসি।

সেদিন কোনো ব্যাপারেই তাড়াহুড়ো ছিল না, সমস্ত দিনটাই হালকা, ফুরফুরে। কেননা ক্লাস শুরু হবে পরের দিন থেকে। হস্টেলে প্রথম দিনটা 'কেয়ার-ফ্রি মুডে' যা খুশি করে নাও, এইরকম একটা ভাব আর কি।

হুল্লোড় যখন জমে উঠেছে, সেই সময় একটা বেয়ারা এসে খবর দিয়েছিল, সুপারিনটেনডেন্ট হরজিৎ কাউর নতুন মেয়েদের নিচের বড় হল-এ যেতে বলেছেন।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেছে, ফার্স্ট ইয়ার আর্টস-এ যে এক শ পঁচিশটি মেয়ে ভর্তি হয়েছিল, সব একতলার হল-এ স্টেজের সামনের চেয়ারগুলোতে এসে বসেছে। তারা আসার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিলেন হরজিৎ। তিনি ঢুকতেই মেয়েরা উঠে দাঁড়িয়েছিল। 'সিট ডাউন গার্লস' বলতে বলতে হরজিৎ উঁচু মঞ্চে গিয়ে একটা বড় গদি-মোড়া চেয়ারে বসে পড়েছিলেন।

ভদ্রমহিলার শরীরে পর্যাপ্ত মেদ। কোমর বা গলা বলে কোনো বিভাজিকা রেখা নেই, সর্বাঙ্গ জুড়ে তাল তাল চর্বি এবং মাংস, ওয়েট হয়ত এক কুইন্টালের বেশি। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। পরনে শাড়ি ব্লাউজ, পায়ে পুরু সোলের স্লিপার, ডান হাতের কবজিতে চওড়া স্টিল ব্যান্ডে বাঁধা বড় চৌকো ঘড়ি।

হরজিৎ কাউরের গলার স্বর তাঁর বিপুল শরীরের তুলনায় বেজায় সরু। মনে হয়, অগুনতি চর্বির থাক ঠেলে সেটাকে রাস্তা করে বেরুতে হয়। তিনি প্রথমে একশ পঁচিশটি মেয়ের নাম জিজ্ঞেস

করেছিলেন। কে কোন প্রভিন্স থেকে এসেছে, তাদের বাবারা কে কী করেন, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড কী ধরনের, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এ সব জেনে নেওয়ার পব বলেছেন, 'আমি তোমাদের দেশের সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস বিদ্যামন্দিরে 'স্বাগত' জানাচ্ছি। তবে এক সপ্তাহ পরে কলেজের তরফ থেকে প্রিন্সিপাল তোমাদের ফর্মাল 'স্বাগত' জানাবেন।'

'তোমরা হয়ত শুনেছ, আমি এই হস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট। ক'টা বছর আমরা একসঙ্গে থাকব। আশা করি, এই কলেজের দেশজোড়া সুনাম এবং মর্যাদার কথা মনে রেখে তোমরা এমন কিছু করবে না যাতে এখানকার শান্তি নষ্ট হয়। তোমরা সবাই রেসপেক্টবল ফ্যামিলি থেকে এসেছ। এই কলেজ তোমাদের কাছ থেকে সংযত ভদ্র মধুর আচরণ প্রত্যাশা করে। বাইরের জগতে তোমরা এই মহান ঐতিহ্যসম্পন্ন কলেজের এক একজন প্রতিনিধি। অ্যামবেসেডরস অফ দিস গ্রেট ইনস্টিটিউশন। আমার বিশ্বাস এই কথাটা তোমরা সর্বক্ষণ মনে রাখবে। এখানে তোমাদের আরো একবার 'স্বাগত' জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। থ্যাংক ইউ গার্লস।'

বক্তৃতার স্টাইলে হরজিৎ কাউরের উপদেশমূলক কথাগুলো শুনতে শুনতে হঠাৎ মুকুটনাথের কথা মনে পড়ে গেছে কিরণের। পরিবারের প্রতিটি মানুষের প্রতি তাঁর কড়া নির্দেশ, কেউ এমন কিছু করবে না যাতে শান্তি বিপন্ন হয়, পারিবারিক স্থিতাবস্থা ভেঙে পড়ে। তবে কনভেন্টে ভর্তি হওয়ার সময় সেখানকার মাদার সুপিরিয়র এবং হেডমিস্ট্রেস এ জাতীয় কিছু বলেছিলেন কিনা, কিরণের মনে নেই, কেননা তখন সে খুবই ছোট।

হরজিৎ কাউরের আনুষ্ঠানিক 'স্বাগত' ভাষণের ঠিক পাঁচ ঘণ্টা বাদে এই কলেজের শান্তি এবং স্থিতিবস্থায় মারাত্মক ধাক্কা লাগে। পরে কিরণ শুনেছে এমন ঘটনা কলেজের তিরিশ বছরের ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি।

সাড়ে আটটার ডিনার খেয়ে কিরণরা যে যার ঘরে চলে গিয়েছিল। সারাদিন দারুণ উত্তেজনায় কেটেছে। রাতের খাওয়া শেষ হতে না হতেই ঘুম পাচ্ছিল।

ললিতা আর কিরণ আলো নিভিয়ে জিরো পাওয়ারের হালকা নাইট ল্যাম্প জ্বেলে শুতে যাবে, সেই সময় একটি মেয়ে—পরনে টাইট জিন্স আর শার্ট, চুলে বয়েজ কাট—দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করেছে, 'ফ্রেশার?'

কিরণরা বলেছে, 'ইয়া। য়ু?'

'তিন বছর আগে ফ্রেশার ছিলাম। নাউ কাম অন—'

অর্থাৎ মেয়েটা ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী। কিরণরা জানতে চেয়েছে, 'কোথায় যেতে হবে?'

মেয়েটা বলেছে, 'সেকেন্ড ফ্লোরে।'

'কেন?'

'সুপারিনটেনডেন্ট তোমাদের 'স্বাগত' জানিয়েছেন। আমরা সিনিয়ররা এখন তোমাদের 'ওয়েলকাম' জানাব। হারি আপ।'

'এত রাত্রে!'

'নো মোর কোশ্চেন। কাম, কুইক'—মেয়েটা গলার স্বর চড়িয়ে হুকুমেব ভঙ্গিতে এবার বলেছে।

আবছাভাবে কিছু একটা টের পেতে শুরু করেছিল কিরণ, হয়ত ললিতাও। একবার ভেবেছিল যাবে না। কিন্তু বুঝতে পারছিল, না গিয়ে উপায় নেই।

ভয়ে ভয়েই তারা ওই মেয়েটির সঙ্গে সেকেণ্ড ফ্লোরের একটা বিশাল ঘরে এসেছে। এখানে তাদের চেয়ে বড় চোদ্দ পনেরটা মেয়ে চেয়ারে সোফায় বা বিছানায় বসে ছিল। বোঝাই যাচ্ছিল তারাও সিনিয়র—সেকেন্ড থার্ড বা ফোর্থ ইয়ারের। এরা ছাড়া আরো সাত আটটি মেয়ে, কিরণদের বয়সী অর্থাৎ 'ফ্রেশার', একধারে আড়ষ্টের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ মুখ দেখে মনে হয়েছে, ওরা খুবই নার্ভাস। সম্ভবত কিরণদের মতোই ওদেরও ঘর থেকে ডেকে আনা হয়েছে।

এই ঘরে সব চেয়ে বেশি করে যাকে চোখে পড়েছে তার পরনে চাপা হট প্যান্ট আর স্লিভলেস

টাইট শার্ট। প্যান্ট এবং শার্ট ফাটিয়ে তার প্রকাণ্ড মাংসল উরু এবং বুক যেন বেরিয়ে আসতে চাইছিল। ডাই-করা লালচে চুল কাঁধের দু'ধারে ঝুলছে, কিছু কিছু এসে পড়েছে মুখের ওপর। চোখে বিরাট এবং গোলাকার ধোঁয়াটে চশমা। হাতে লম্বা সিগারেট।

মেয়েটা কিরণদের চেয়ে অনেক বড়। পায়ের ওপর পা তুলে সে বসে ছিল একটা মস্ত সোফায়। চশমার আবছা কাচের ভেতর দিয়েও দেখা যাচ্ছিল তার চোখ আরক্ত এবং ঢুলুঢুলু। তার চোখমুখ জানিয়ে দিচ্ছিল সে ড্রাগের শিকার। তার সিগারেট থেকে যে ধোঁয়া বেরুচ্ছে তাতে টোবাকোর গন্ধ ছিল না। অন্য ধরনের অচেনা উগ্র ঝাঁঝাল একটা গন্ধ কিরণের নাকের ভেতর ঢুকে তার স্নায়ুগুলোকে বিকল করে দিচ্ছিল। পরে সে জেনেছে ওটা গাঁজার গন্ধ। সিগারেটের ভেতরকার তামাক বার করে গাঁজা পুরে নেওয়াটা নাকি ড্রাগ-অ্যাডিক্টদের ভীষণ পছন্দ।

কিরণ এবার লক্ষ করেছে, শুধু ওই মেয়েটাই নয়, আরো কয়েকটি মেয়ের হাতেও সিগারেট জ্বলছে। ধরমপুরার অচ্ছুৎ বয়স্ক আওরতেরা যারা খেতে খামারে কাজ করে, রাস্তা বানায় বা মাটি কাটে তাদেব আকছার বিড়ি-টিড়ি খেতে দেখা যায়। কিন্তু কোনো ভদ্র শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে, বিশেষ করে ছাত্রীদের এর আগে সিগারেট খেতে দেখেনি কিরণ। মেয়েদের সিগারেট খাওয়া সে খুব গর্হিত কাজ বলে মনে করে না। তবু এমন দৃশ্য তার অনভ্যস্ত চোখ এবং আজন্মের সংস্কারকে ঝাঁকুনি দিয়ে গিয়েছিল।

মেয়েটার বসার উদ্ধত ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টিতে বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভাব—এ সব দেখে মনে হচ্ছিল সে সিনিয়র মেয়েদের লিডার।

লিডার মেয়েটা সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঈষৎ জড়ানো গলায় বলেছিল, 'ওয়েলকাম ডার্লিংস। তোমাদের সঙ্গে আলাপটালাপ করার জন্যে ডেকে এনেছি। কিছু মনে করো না। একসঙ্গে তো সবার সঙ্গে আলাপ করা যাবে না। রোজ দশ জন দশ জন করে ডাকব। আমার নাম শারণ—শারণ বেদি, ফোর্থ ইয়ার।'

তারপরেই একটি নতুন মেয়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে, 'য়ু, য়ু—ইওর নেম?' তার কণ্ঠস্বর খসখসে, হাস্কি ধরনের।

যার দিকে কম্পাসের কাঁটার মতো আঙুলটি স্থির হয়ে ছিল সে ভয়ে ভয়ে বলেছে, 'শমিতা বাসু।'

'বাসু? আই মিন বেঙ্গলি?'

'হ্যাঁ।'

'ফ্রম ক্যালকাটা?'

'হ্যাঁ।'

'ববীন্দ্রনাথ টেগোর? য়ু—' বলতে বলতে শারণের গলা বুজে এসেছিল, চোখ আরো ঢুলুঢুলু হয়েছিল। সে হয়ত বলতে চাইছিল, রবীন্দ্রনাথের শহর থেকে এসেছ? বা ওই জাতীয় একটা কিছু।

শমিতা উত্তর দেয়নি।

একটু পরে রক্তিম চোখ ভাল করে মেলে, যেন এক ঝটকায় গলার স্বর অনেকটা উঁচুতে তুলে শারণ বলেছে, 'স্টার্ট ড্যান্সিং—ওয়ালজ—'

শমিতা এবং নতুন মেয়েরা সবাই চমকে উঠেছিল। শমিতা ঢোক গিলে বলেছে, 'আমি নাচতে জানি না—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই শারণ চেঁচিয়ে উঠেছে, 'স্টার্ট—'

অগত্যা শমিতা নিজের অজান্তে প্রচণ্ড ভয়ে এবং যান্ত্রিক কোনো তাড়নায় এলোপাথাড়ি বেতালা পা ছুঁড়তে শুরু করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সিনিয়র মেয়েরা হাতে হাতে তালি বাজাচ্ছিল।

শারণ কখনও শমিতাকে কোমর বাঁকাতে, কখনও হাঁটু ভেঙে, পিঠ হেলিয়ে শরীর ঝাঁকাতে, কখনও হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করছিল। শুধু তা-ই নয়, আরো তিনটে মেয়ের দিকে ফিরে বলেছিল, 'জয়েন হার—'

চারটি মেয়েকে নিয়ে যা খুশি করছিল শারণরা। হঠাৎ একটা লম্বা মতো মেয়ে তালি বাজানো থামিয়ে জিনসের পকেট থেকে ছোট কাঁচি বার করে যাদের নাচানো হচ্ছিল তাদের একজনের একগোছা চুল কচাকচ কেটে দিয়েছে। আরেকটি বড় মেয়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে অন্য একটি নতুন মেয়ের জামা পুড়িয়ে ফুটো ফুটো দাগ করে দিচ্ছিল। সিগারেটটা দু-একবার তার কপালে এবং হাতে চেপেও ধরেছে। মেয়েটা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সিনিয়রদের তালি বাজানো, হুল্লোড়বাজি এবং চিৎকার মাত্রাছাড়া উদ্দাম হয়ে উঠছিল। তারা প্রবল হিস্টিরিয়ার ঘোরে ছিল যেন।

র‍্যাগিং সম্পর্কে আগে কিছু কিছু শুনেছে কিরণ, কিন্তু সেসব পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। এখন চোখের সামনে এই নিষ্ঠুরতা দেখে আতঙ্কে তার হাত পায়ের জোড় আলগা হয়ে আসছিল, শিরদাঁড়া বেয়ে গল গল করে ঘাম ছুটছিল। কেননা এটা খুবই স্পষ্ট, শারণরা তাদের ছেড়ে দেবে না। ওই চারটে মেয়ের পর তাদের ওপরও র‍্যাগিং চালনো হবে এবং সেই নিষ্ঠুরতা কী ধরনের হতে পারে বুঝতে না পেরে তার শ্বাস আটকে আসছিল। মেয়েরা যে এই ধরনের স্যাডিস্ট হতে পারে, তার ধারণা ছিল না। অবশ্য এই টরচারের মধ্যে জঘন্য কুৎসিত সেক্সের ব্যাপার ছিল না।

কিরণ এবং অন্য নতুন মেয়েরা যখন কুঁকড়ে যাচ্ছে সেই সময় তাদের ভেতর থেকেই কেউ তালির শব্দ এবং হুল্লোড়ের আওয়াজের ওপর গলা চড়িয়ে চিৎকার করেছিল, 'স্টপ, স্টপ দিস ক্রুয়েলটি।'

মুহূর্তে হিস্টিরিয়ার ঘোর থেমে গিয়েছিল। চমকে সবাই যে মেয়েটির দিকে ঘুরে তাকিয়েছে তার টান টান, সতেজ চেহারা স্পোর্টস গার্লদের মতো। নাক মুখ কাটা কাটা, ধারাল। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো হাইট। অসহ্য রাগে এবং উত্তেজনায় তার নীলচে চোখের তারা জ্বলছিল। শারণদের দিকে সটান হাত বাড়িয়ে, আঙুল নাচাতে নাচাতে সে বলেছে, 'য়ু আর নো হিউম্যান বিয়িংস, সিম্পলি বিস্টস্।'

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর কিছুক্ষণের জন্য বিশাল হস্টেল বাড়িটায় যেন অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। তারপর শারণ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছে। সোজা সেই মেয়েটির চোখের ভেতর তাকিয়ে বলেছে, 'হু আর য়ু? ইওর নেম?' তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল, গাঁজার নেশা খানিকটা ছুটে গিয়ে চোখ থেকে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছিল যেন। একটি ফ্রেশার এখানে প্রথম দিন এসেই যে এমন বেপরোয়া ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে, গালাগাল করে সিনিয়রদের বেইজ্জত এবং নাজেহাল করার মতো স্পর্ধা বা দুঃসাহস দেখাতে পারে, কলেজের তিরিশ চল্লিশ বছরের ইতিহাসে এ জাতীয় আর কোনো রেকর্ড নেই।

মেয়েটি জানিয়েছে তার নাম সুনীতা কুলকার্নি, আসছে বম্বে থেকে।

শারণ বলেছিল, 'মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটা দিল্লি।'

'থ্যাংক য়ু ফর দ্য ইনফরমেশন। আমি ভারতের বাইরে থেকে আসছি না। আই অ্যাম অ্যান ইন্ডিয়ান সিটিজেন। আই হ্যাভ গট এভরি রাইট টু কাম হিয়ার। দিস কলেজ ইজ নট ইওর পেটার্নাল প্রোপার্টি।'

শারণ দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছে, 'কার প্রোপার্টি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আই উড থ্রো ইউ আউট অফ দিস কলেজ।'

সুনীতা বলেছিল, 'য়ু মে ট্রাই।'

শারণ এবং তার সঙ্গিনীদের চোখেমুখে জান্তব রাগ ফুটে বেরিয়েছিল। প্রথমত, র‍্যাগিংয়ে বাধা পড়ায় খেপে গেছে। নতুন মেয়েগুলোকে নিয়ে সারারাত দারুণ একটা প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে রেখেছিল তারা, সেটা তো হলই না, তার ওপর বম্বের এই মেয়েটা একেবারে চূড়ান্ত নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে।

হিংস্র ভঙ্গিতে শারণরা সুনীতার দিকে এগিয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, তারা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সুনীতা আদৌ ভয় পায়নি, তার চোখে মুখে নার্ভাসনেসের এতটুকু ছাপ নেই। শরীরটাকে শক্ত করে সে যেন আক্রমণ ঠেকাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। এমন কি তেমন কিছু হলে সে হয়ত পালটা আঘাতও করবে।

একপাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল কিরণ। তার হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি থমকে গেছে। তবু তারই মধ্যে অসীম বিস্ময়ে সে সুনীতার দিকে তাকিয়ে ছিল। এই মেয়েটার অনমনীয়তা, সাহস এবং ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে এক ধরনের অচেনা প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দিচ্ছিল। নিজের অজান্তে অস্পষ্টভাবে একটা বোধ তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। পরে জেনেছে সেটার নাম শ্রদ্ধা।

মারাত্মক কিছু ঘটার আগেই কী এক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আচমকা সুলভার গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা জোরাল সংক্রামক রোগের মতো নতুন মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। এতগুলো মেয়ের মিলিত চেঁচামেচিতে হস্টেলের ভিত নড়ে গিয়েছিল যেন।

শারণরা ভাবতে পারেনি এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাবে। তারা হকচকিয়ে যায়, কিন্তু চিৎকার থামে না। ফলে এক সময় হরজিৎ কাউরের ঘুম ভেঙে যায় এবং একশ কিলোগ্রাম ওজনের বিপুল শরীর টানতে টানতে নিচে নেমে আসেন তিনি।

পনের বছর তিনি এই হস্টেলে সুপারিনটেনডেন্ট। কিন্তু রাত ন'টার পর কোনোদিন তাঁকে নিচে নামতে হয়নি। অত্যন্ত বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট মুখে হরজিৎ কাউর জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী হয়েছে, কী ব্যাপার? এত গোলমাল কিসের?'

গোলমালের কারণটা জানিয়ে দিয়েছিল সুনীতা।

হরজিৎ কাউরের বিরক্তি তিন চারটে লেভেল পেরিয়ে রাগের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি খুবই উত্তেজিত এবং চড়া গলায় জানিয়েছেন, এই সামান্য 'ইনসিগনিফিকান্ট' ব্যাপার নিয়ে কলেজের 'ডিগনিটি' নষ্ট করা ঠিক নয়। এটা স্লাম নয়। তাছাড়া সিনিয়ররা হয়ত একটু মজা করতে চেয়েছে। তাদের রেসপেক্ট দেওয়া নতুনদের কর্তব্য।

'যাও, নিজের নিজের ঘরে চলে যাও। আর যেন কোনোরকম হই চই না হয়।' বলে ফের ওপরে উঠে গেছেন হরজিৎ।

সুনীতা কিন্তু নিজের ঘরে যায়নি। কিরণরা ক'জন তো সঙ্গে ছিলই, প্রতিটি ফ্লোর থেকে নতুন মেয়েদের ডেকে নিচের হল-এ চলে গিয়েছিল। সে বলেছে, 'শারণদের নামে কমপ্লেন করে কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না। সুপারিনটেনডেন্ট ওই বিস্টগুলোকে রেসপেক্ট দেখাতে বললেন। কিন্তু আমি ছাড়ছি না। একটা প্রোটেস্ট করতেই হবে। তোমরা আমার সঙ্গে থাকছ তো?'

কয়েকটি মেয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিন্তু কলেজ অথরিটি যে চটে যাবে।'

'যায় যাবে। কিন্তু এরকম একটা ডার্টি গেম চুপচাপ মেনে নেওয়া যায় না।'

সবাই চুপ। অনেকক্ষণ বাদে একটি মেয়ে হঠাৎ বলেছিল, 'যা হবার হবে। আমি তোমার সঙ্গে থাকব।'

'থ্যাংক য়ু।'

'কিন্তু কী করতে চাও তুমি?'

সুনীতা এবার তার পরিকল্পনাব কথা জানিয়েছে। পরের দিন তাদের নতুন সেসান শুরু হবে। কিন্তু কেউ ক্লাসে না গিয়ে র‍্যাগিয়ের বিরুদ্ধে ক'টা পোস্টার লিখে তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকের সামনে 'সিট-ইন' স্ট্রাইক করবে।

আরো ক'টি মেয়ে এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। তারাও 'অবস্থান ধর্মঘটে'র সময় সুনীতার পাশে থাকতে রাজি। ক্রমে আরো অনেকের সাহস বাড়ছিল। তা ছাড়া একসঙ্গে নতুন কিছু একটা করার উত্তেজনাও আছে। সবসুদ্ধ সত্তর আশিটি মেয়ে পেয়েছিল সুনীতা। বাকিরা তখনও দ্বিধান্বিত এবং বেশ ভীতও। স্ট্রাইকের ফলাফল কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, তারা ভেবে উঠতে পারছিল না।

প্রথম থেকেই সুনীতা চোরা স্রোতের মতো প্রবল আকর্ষণে কিরণকে তার দিকে টানছিল। এই জেদী অদম্য একগুঁয়ে মেয়েটাকে যত দেখছিল ততই আকর্ষণটা তীব্র হচ্ছিল। সে-ও জানিয়ে দিয়েছে, 'সিট-ইন' স্ট্রাইকে থাকবে।

সেই রাতে পনের কুড়িটা পোস্টার লিখে ফেলা হয়েছিল। তাতে ইংরেজিতে লেখা : র‍্যাগিং বন্ধ করতে হবে, র‍্যাগিং এক ধবনের অমানুষিক বর্বরতা, ইত্যাদি।

পরের দিন দশটা বাজতে না বাজতেই দেখা গিয়েছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের গেটের উলটোদিকে সবুজ ঘাসের জমিতে একশ পঁচিশটি মেয়েই পোস্টার নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। আগের দিন রাতেও যে ক'টি মেয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল, পরের দিন সকালে তাদের দ্বিধা কেটে গেছে। 'সবার যা হবে, আমারও তা-ই হবে'—এরকম একটা মনোভাব তাদের।

সুনীতার মধ্যে কোথাও একটা ম্যাজিক ছিল। নইলে দেশের নানা প্রভিন্স থেকে যে সব মেয়ে সবে এখানে এসেছে, কেউ কাউকে আগে দেখেনি পর্যন্ত, তারা ওর ডাকে 'সিট-ইন স্ট্রাইক' করতে আসবে কেন? খুব সম্ভব এটাই স্বাভাবিক এবং সহজাত নেতৃত্বের ক্ষমতা।

সামনের রাস্তা দিয়ে অফিসের লোকজন, অধ্যাপিকা এবং পুরনো ছাত্রীরা নানা কাজে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। তাদের কারুর কপাল বিরক্তিতে কুঁচকে গেছে, কারুর চোখে ছিল অপার বিস্ময়। কেননা, এই কলেজের একটানা চল্লিশ বছরের ইতিহাসে এমন দৃশ্য কখনও দেখা যায়নি।

ঘণ্টাখানেক বাদে ধবধবে ইউনিফর্ম পরা একটি বেয়ারা শশব্যস্তে এসে বলেছিল, 'প্রিন্সিপ্যাল আপনাদের ডাকছেন।'

তখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লকের দোতলায় তাঁর নিজস্ব স্পেশাল চেম্বারেই ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল। বেয়ারা একশ পঁচিশটি আনকোরা মেয়েকে সোজা সেখানে পৌঁছে দিয়েছে, 'ভেতের যান।'

কার্পেটে-মোড়া চেম্বারটি বিশাল, দুই দেওয়ালে এয়ার-কুলার বসানো। মাঝখানে আধখানা বৃত্তের আকারে প্রকাণ্ড গ্লাস-টপ টেবল। টেবলের ওপর একধারে চার পাঁচটা রঙিন টেলিফোন, আরেক ধারে স্তূপাকার ফাইল। পেছনে গোটা দেওয়াল কেটে বইয়ের লম্বা র‍্যাক বসানো, সামনে কাচ। এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে শুরু করে হিস্ট্রি সোসিওলজি পলিটিকস ফিলজফি, এমন নানা বিষয়ের দামি দামি অসংখ্য বই সেখানে সাজানো।

টেবলের ওপাশে একটা রিভলভিং চোয়ারে বসে ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল, এপাশে অনেকগুলো সুদৃশ্য চোয়ার।

প্রিন্সিপ্যালের বয়স ধাটের কাছাকাছি। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে জবরদস্ত পুরষালী চেহারা। কাঁচাপাকা চুলের ছাঁটও পুরুষদের মতোই। চওড়া কাঁধ, ভারি মাংসল মুখ, জোড়া ভুরু। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা।

তাঁর নাম মধুর খান্না। পরনে যদিও ধবধবে শাড়ি-ব্লাউজ, তবু মহিলাসুলভ মাধুর্যের ছিটেফোঁটাও নেই তাঁর স্বভাব বা আকৃতিতে। তিনি যে প্রচণ্ড বক্তিত্বসম্পন্ন, তাকানো মাত্র স্নায়ুগুলো তা টের পেয়ে যায়।

মেয়েরা অনুমতি নিয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। সবাই না, তিরিশ চল্লিশ জন। বাকিরা দরজার বাইরে করিডরে শ্বাসরুদ্ধের মতো অপেক্ষা করছিল। কেননা, চেম্বারটা বড় হলেও একশ পঁচিশ জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

প্রিন্সিপ্যাল মধুর খান্না থমথমে মুখে, মোটা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেছেন, 'হু ইজ সুনীতা কুলকার্নি?'

সবার সামনে, প্রিন্সিপ্যালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল সুনীতা। সে বিনীত ভঙ্গিতে বলেছে, 'আমি ম্যাডাম!'

বোঝাই যাচ্ছিল, র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে নতুন মেয়েদের উসকে দিয়ে এবং তাদের জড়ো করে সুনীতাই যে মুভমেন্ট শুরু করেছে, এ খবর প্রিন্সিপ্যালের কাছে পৌঁছে গেছে।

প্রিন্সিপ্যাল এবার বলেছেন, 'দিস ইজ দা বেস্ট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন ইন দা কান্ট্রি—সেরা বিদ্যামন্দির। এটা ট্রেড ইউনিয়ন শেখার ট্রেনিং সেন্টার নয়। আমি ভাবতে পারি না, এখানকার স্টুডেন্টরা কারখানাব ওয়ার্কারদের মতো পোস্টার নিয়ে 'সিট-ইন' স্ট্রাইক করছে!' একটু থেমে রুমালে চশমার কাচ মুছে ফের চোখে লাগাতে লাগাতে বলেছেন, 'তোমরা এবারেব নিউ কামাররা ট্রাবল-মেকার হবে বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি কিছুতেই এ সব সহ্য করব না।' মধুর খান্নার গলার স্বর

সারা চেম্বারে গম গম করছিল।

সুনীতাদের সঙ্গে কিরণও ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। মধুর খান্নার মতো এমন প্রবল ব্যক্তিত্ব অন্য কোনো মহিলার মধ্যে তো নয়ই, কোনো পুরুষের মধ্যেও আগে দ্যাখেনি সে। ভয়ে বুকের ভেতরটা জমাট বেঁধে যাচ্ছিল। মনে হয়েছে ঝোঁকের মাথায় সুনীতার সঙ্গে মুভমেন্টে নেমে পড়া ঠিক হয়নি। কিন্তু তখন আর ফেরা যায় না। সুনীতা বলেছিল, 'আমরা যা করেছি তার সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্ক নেই। শুধু র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট জানাতে চেয়েছি।'

কিরণ এবার সুনীতার দিকে তাকিয়েছে। মনেই হয়নি, দেশের সব চেয়ে বিখ্যাত সবচেয়ে প্রেস্টিজিয়াস কলেজের দুর্ধর্ষ প্রিন্সিপ্যালের সামনে দাঁড়িয়ে সে আদৌ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। তার কণ্ঠস্বর স্বচ্ছন্দ, আচরণ স্বাভাবিক। যথেষ্ট বিনীত হলেও তার মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যা নোয়ানো প্রায় অসম্ভব। সুনীতাকে দেখতে দেখতে কিরণ আবার হারানো সাহস ফিরে পাচ্ছিল।

স্থির চোখে অনেকক্ষণ সুনীতাকে লক্ষ করছিলেন প্রিন্সিপ্যাল। তারপর হঠাৎ অবিশ্বাস্য একটি প্রশ্ন করেছেন, 'তোমার বাবা কী করেন?'

একটি বিখ্যাত পলিটিক্যাল উইকলি'র নাম করে সুনীতা জানিয়েছে, তার বাবা সুরেশ কুলকার্নি তার সম্পাদক এবং প্রকাশক।

গোটা দেশ জুড়ে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির বিপুল জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব। এর প্রতিটি সংখ্যায় এমন সব চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ঘটনার খবর, অন্তর্তদন্ত এবং বিশ্লেষণ থাকে যা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়। বারুদে বোঝাই এই সব তথ্য এক একদিন লোকসভা রাজ্যসভা বা কোনো কোনো প্রদেশের বিধানসভার আবহাওয়া সরগরম করে তোলে। তার উত্তাপ ছড়িয়ে যায় গোটা দেশে।

সুরেশ কুলকার্নি খ্যাতিমান এবং শ্রদ্ধেয় মানুষ। পলিটিক্যাল সার্কেলে যথেষ্ট প্রভাবশালীও।

সাপ্তাহিকটি এবং তার সম্পাদকের নাম শুনে প্রিন্সিপ্যালের মুখের কাঠিন্য অনেকটাই শিথিল হয়ে এসেছে। শক্ত পেশীগুলোতে দেখা দিয়েছে নমনীয়তা। ঈষৎ নরম গলায় এবার তিনি বলেছেন, 'তোমাদের হয়ত বুঝতে ভুল হয়েছে। আমার ধারণা, থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের মেয়েরা তোমাদের সঙ্গে একটু মজা করেছে। প্রতি বছরই নতুন মেয়েদের সঙ্গে ওরা আনন্দটানন্দ করে থাকে। এটাকে 'জোক' বলে ধরে নাও।'

'জোক না, এটা টরচার। আপনাকে একটা ব্যাপার দেখাই।' সেই মেয়েটিকে—যার নাম চিত্রা রত্নম, যার জামায় এবং গায়ে আগের রাত্তিরে অগুনতি সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে—প্রিন্সিপ্যালের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল সুনীতা। বলেছিল, 'এগুলো নিশ্চয়ই আনন্দের চিহ্ন নয়।'

সুনীতাকে যত দেখছিল, বিস্ময় এবং বিমূঢ়তা ততই বেড়ে যাচ্ছিল কিরণের। বেশির ভাগ মানুষেরই শিরদাঁড়া বলতে কিছু থাকে না। কেঁচো বা কেন্নোর মতো আজন্ম মাটিতে মিশেই আছে, কিন্তু এই মেয়েটা একেবারেই আলাদা। শক্ত ধাতুতে তৈরি তার মেরুদণ্ডটি খুবই জোরাল।

সুনীতা আবার বলেছে, 'এই কলেজের সিনিয়র মেয়েরা এক একটি জন্তু। বয়সে যারা ছোট তাদের সম্বন্ধে এক ফোঁটা সিমপ্যাথি নেই। ম্যাডাম, আপনি হয়ত জানেন না এদের বেশির ভাগই ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, কাল রাত্তিরে সিগারেটের ভেতর গাঁজা পুরে খাচ্ছিল।'

প্রিন্সিপ্যালের মুখে আগের সেই কঠোরতা ফিরে আসছিল। গমগমে গলায় তিনি বলেছেন, 'আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু মনে রেখ, তোমাদের কোনোরকম ইনডিসিপ্লিন বরদাস্ত করব না। এরপর এরকম কিছু করলে কলেজ থেকে বার করে দেওয়া হবে।'

কিরণ লক্ষ করেছে, র‍্যাগিং বন্ধ করার কথা একবারও বলেন নি প্রিন্সিপ্যাল। পরে সে জেনেছে, তাঁর পক্ষে এটা একেবারেই সম্ভব না। হয়ত নিজের চাকরির নিরাপত্তার জন্যও র‍্যাগিংয়ের ব্যাপারে তাঁকে চোখ বুজে থাকতে হয়েছে।

কিরণ পরে জেনেছে, সেই মেয়েটি অর্থাৎ শারণ বেদি, পাঞ্জাবের এক মন্ত্রীর শালী। র‍্যাগিংয়ের অন্য নাটের গুরুরা কেউ বিরাট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের নাতনি, কেউ এম. পি'র মেয়ে, কেউ টপ পুলিশ অফিসার বা লেফটেনান্ট কর্নেলের কিংবা কোনো গভর্নরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এদের গায়ে টোকা দিলে

নিজের চামড়া বাঁচানো যাবে না।

প্রিন্সিপ্যাল এবার বলেছেন, 'তোমরা এখন যেতে পার। একটা কথা সব সময় মনে রাখবে, এই ইনস্টিটিউশনের শান্তি কখনও কোনো কারণেই নষ্ট হয়নি, ভবিষ্যতেও যেন না হয়।'

ক'দিন বাদে নবাগত ছাত্রীদের কলেজের তরফ থেকে যে আনুষ্ঠানিক 'ওয়েলকাম' জানানো হয়েছিল, তার স্বাগত ভাষণে প্রিন্সিপ্যাল এই 'শান্তি' ব্যাপারটার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কোনো কারণেই যাতে শান্তিভঙ্গ না ঘটে, সে বিষয়ে প্রতিটি নতুন মেয়েকে সতর্ক থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। শুনতে শুনতে বাবার কথা মনে পড়ে গেছে কিরণের। প্রিন্সিপ্যালের গলার ভেতর থেকে মুকুটনাথের কণ্ঠস্বর যেন বেরিয়ে আসছিল। শান্তি যাতে অটুট থাকে সে জন্য এঁদের সতর্কতা এবং উৎকণ্ঠার শেষ নেই।

পরে কিরণ জেনেছে এবং বুঝতে শিখেছে বিশেষ কোনো কোনো ক্লাসের স্বার্থে এবং দীর্ঘকালের সযত্ন এবং সুচারু অভ্যাসে যা কিছু এস্টাব্লিশড বা প্রতিষ্ঠিত, যেমন সংস্কার, নিয়ম, পলিসি, কালচার অথবা বানানো মূল্যবোধ—এসবের গায়ে হাত পড়ুক সুবিধাভোগীরা তা একেবারেই চায় না। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ক্ষেত্রেও একই কথা। অর্থাৎ যা চলছে চলুক, স্থিতাবস্থা বজায় থাক, এস্টাব্লিশমেন্টের বিশাল চিরস্থায়ী সৌধে যেন আঁচড় না লাগে। অশান্তি উত্তেজনা আন্দোলন, এ সব বাঞ্ছনীয় নয়। চিরকাল অপার প্রশান্তি বিরাজমান থাকুক।

একটা ব্যাপার কিরণের এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, সিনিয়র মেয়েরা তাদের আর মধ্যরাতে টানাটানি করেনি। সে বছর নিউ কামাররা র‍্যাগিংয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়ে গিয়েছিল। হয়ত প্রিন্সিপ্যাল শারণদের ডেকে কিছু বলেছিলেন।

তবে র‍্যাগিং বন্ধ করলেও দেখা হলেই সিনিয়র মেয়েরা দাঁতে দাঁত চেপে ইয়াংকি উচ্চারণে নোংরা খিস্তি করে যেত। কিরণরা অবশ্য উত্তর দিত না।

সেদিনের 'সিট-ইন স্ট্রাইক'য়ের পর সুনীতার মুগ্ধ ফ্যান হয়ে উঠেছিল কিরণ। সময় পেলেই সে সুনীতার ঘরে চলে যেত। ওর সঙ্গ কী ভাল যে লাগত! ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবাক বিস্ময়ে আচ্ছন্নের মতো তার কথা শুনে যেত। সুনীতার প্রতি তার আনুগত্য ছিল পুরোপুরি শর্তহীন।

সুনীতা প্রায়ই তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলত। ইকনমিকসে ডিগ্রি নিয়ে সে আমেরিকায় যাবে। সেখানে রিসার্চ করার ইচ্ছা। তারপর দেশে ফিরে বাবার পলিটিক্যাল উইকলিতে জয়েন করবে। যথেষ্ট বয়স হয়েছে বাবার। তাঁকে সাহায্য করা, তাঁর পাশে দাঁড়ানো খুবই জরুরি, কেননা সুনীতাই তাঁর একমাত্র সন্তান। সে কাগজের দায়িত্ব না নিলে ওটা অবশ্যই উঠে যাবে। শুধু দায়িত্ব নেওয়াই না, উইকলিটা আরো বড় করতে হবে, এজন্য ব্যাপক প্ল্যানিংয়ের প্রয়োজন। স্বাধীনতার পরও অর্থনৈতিক শোষণ চলছে দেশ জুড়ে, সামাজিক স্তরে চলছে বিরাট বৈষম্য। তাদের সাপ্তাহিক ব্যাপকভাবে এসব তুলে ধরবে। তা ছাড়া রাজনৈতিক খবর তো থাকবেই। জোরটা বেশি দেওয়া হবে রুরাল ইন্ডিয়া বা গ্রামীণ ভারতের ওপর, যেখানে শতকরা সত্তর ভাগ মানুষ রয়েছে দারিদ্রসীমার নিচে। গ্রামীণ অর্থনীতি, সেখানকার ভূমি সমস্যা, বণ্ডেড লেবারার, স্ত্রী-স্বাধীনতা, অনিশ্চিত জীবিকার লোকজন, এমনি নানা বিষয়ের ওপর প্রচুর কাজ করতে হবে। সত্যিকারের দেশ এবং তার রুট সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা একান্ত প্রয়োজন।

শুনতে শুনতে কিরণ একেবারে হাঁ। সুনীতার কথাগুলো তার মাথার কয়েক মাইল ওপর দিয়ে বেরিয়ে যেত। এসব যেন কোনো সুদূর অচেনা গ্রহের সাংকেতিক ভাষা—দুর্জ্ঞেয় এবং বিভ্রান্তিকর।

এই মেয়েটা তারই সমবয়সী, অথচ দেশকাল এবং মানুষ সম্পর্কে কত কিছু জানে, কত কিছু ভাবে। আর কিরণ যেন এক চিরকালীন গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে।

একদিন সুনীতা হেসে হেসে বলেছে, 'সারাক্ষণ আমি একাই তো বকে যাই। তোমার কথা কিছু বল। এম. এ করার পর রিসার্চ করবে নিশ্চয়ই?'

হঠাৎ গভীর বিষাদে মন ভরে যেত কিরণের। কী করে সে বলে, একটি ঘি-মাখন খাওয়া নধর

অপদার্থ ছোকরার স্ত্রী এবং একজন ভাবী মন্ত্রীর উপযুক্ত পুত্রবধূ বানাবাব জন্য তাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। বলা যায়নি, নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণাই তার নেই। আবছা গলায় সে শুধু বলেছে, 'দেখা যাক।' বলতে বলতে হঠাৎ মনে হয়েছে, মুকুটনাথ এবং ত্রিকূটনারায়ণ তাকে মাঝখানে রেখে যে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিটা করেছেন তার মতো অসম্মানজনক ব্যাপার কিছু হতে পারে না। যেন তার নিজস্ব কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা ব্যক্তিত্ব নেই, তার সমস্ত কিছুই দু'টি স্বার্থপর মানুষ এবং দু'টি পরিবারের খেয়ালখুশিতে নিয়ন্ত্রিত। তার স্নায়ু ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছিল। আর সেই মুহূর্তে নিজের অজান্তে তার অস্তিত্বের গভীরে কিসের যেন একটা বীজ বোনা হয়ে গিয়েছিল।

এই কলেজে নিয়মিত ক্লাস করা ছাড়াও এলিট সোসাইটিতে মেলামেশা এবং কথা বলার কৌশল শেখানো হত। যাদের ইংরেজি উচ্চারণে কিঞ্চিৎ গোলমাল আছে তা শুধরে দেওয়া হত। মাঝে মাঝে পপ সং, পপ মিউজিকের আসর বসানো হত। বাইরে থেকে ফ্যাশন এক্সপার্টদের এনে কোন ঋতুতে, কোন পার্টিতে বা পরিবেশে কী জাতীয় পোশাক পরা বাঞ্ছনীয়, বুঝিয়ে দেওয়া হত। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সবেব সঙ্গে সিলেবাসেব সম্পর্ক নেই। ভবিষ্যতে স্বামীদের সঙ্গে যাদের বিরাট বিরাট পার্টিতে যেতে হবে, থাকতে হবে বিদেশের দূতাবাসে, ক্যান্টনমেন্টে, কিংবা মিশতে হবে দেশবিদেশের সুউচ্চ সোসাইটিতে, তাদের নিখুঁত সোসিয়েলাইট বানাবার জন্য সব দিক থেকে নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।

সব কিছুই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চলছিল। তার পাশাপাশি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের মেয়েরা রাত ন'টার পর হস্টেলে গাঁজা, হেরোইন, স্ম্যাক এসব খেয়ে যাচ্ছিল এবং বেশ কিছু নতুন মেয়ে তাদের পাল্লায় পড়ে ড্রাগ-অ্যাডিক্টদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছিল।

কিরণ একদিন বলেছে, 'জানো, ওবা ফার্স্ট ইয়ারের মেয়েদেব ব্রাউন সুগার খেতে শেখাচ্ছে। কিছু করা দরকার।' তাকে ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

সুনীতা কিন্তু এতটুকু বিচলিত হয়নি। সে বলেছে, 'যারা ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হচ্ছে তারা জেনেশুনেই হচ্ছে। কেউ বাচ্চা নয়, তুমি আমি কী করতে পারি?'

কিবণের কেমন একটা বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, সুনীতা পৃথিবীব সমস্ত অন্যায় এবং নোংরামিব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে। কিন্তু ওর উত্তরটা তাকে কিছুটা হতাশই করেছে।

কিরণের মনোভাব চট কবে বুঝে নিয়ে সুনীতা এবার বলেছে, 'সেদিন শুনলে তো, প্রিন্সিপ্যালকে সিনিয়রদের গাঁজা খাওয়ার কথা বলেছিলাম। উনি সে সম্পর্কে একটি কথাও না বলে উলটে আমাদেরই ধমকালেন। এখন ড্রাগের ব্যাপার নিয়ে যদি হই চই করি, উনি বলবেন, ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টের মতো ঝামেলা পাকাচ্ছি। কোনো লাভ নেই—বুঝলে?'

সুনীতাকে দেখার পর থেকে কিরণের মধ্যে সারাক্ষণ একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে টের পাচ্ছিল, ভেতরে ভেতরে তাব অনেক ভাঙচুর এবং পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিছুদিন আগেও সে সব কিছুকে ভয় পেত। তার ভয় ঠাকুমাকে, পাবিবারিক ডিকটেটর মুকুটনাথকে, বংশানুক্রমিক সংস্কারকে, শাক্যদ্বীপী ব্রাহ্মণত্বেব অনড় গোঁড়ামিকে। এই ভয়টা তার কাছে, শুধু তাব কাছেই না, মিশ্র বংশের মেয়েদেব চোখে একটা ধর্মবিশ্বাসের মতো ব্যাপার। বলা যায়, ভয়ের 'কাল্ট'-এর মধ্যেই তার জন্ম এবং সেই আবহাওয়াতেই সে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সুনীতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে তার চারপাশ থেকে ভয়ের শক্ত খোলাটা ভেঙে যাচ্ছিল।

কিরণ বলেছে, 'কিন্তু কিছু তো করা দরকার।'

সুনীতা কিছুক্ষণ ভেবে বলেছে, 'যাবা ড্রাগ অ্যাডিকশনেব বিরুদ্ধে, তাদের সিগনেচার নিয়ে প্রিন্সিপ্যালের কাছে পাঠাতে পারি।'

'গুড আইডিয়া।'

সেদিনই 'সিগনেচাব ক্যামেপেন' শুরু হয়েছিল এবং প্রচুর সই টই যোগাড় করে প্রিন্সিপ্যালেব কাছে পাঠানো হয়েছে। পরেব দিন প্রিন্সিপ্যাল তাদের ডাকিয়ে বলে দিয়েছেন, নিজেদের পড়াশোনা

ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারেই তারা যেন মাথা না ঘামায়। কলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যা ভাবার ভাববে, যা করার করবে। ছাত্রীদের একমাত্র করণীয়, নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলা। সিনিয়র মেয়েরা কিরণদের যাতে উত্যক্ত না করে সেটা তিনি দেখবেন।

কিন্তু স্থিতাবস্থা এবং শান্তিতে বিশ্বাসী কলেজ প্রশাসন আর প্রিন্সিপ্যাল ড্রাগ অ্যাডিকশনের বিরুদ্ধে একটি আঙুলও তোলেন নি। সুতরাং রাত ন'টার পর হস্টেল বিল্ডিংগুলো স্ম্যাক হেরোইন এবং গাঁজার দখলেই থেকে যাচ্ছিল।

সুনীতা বলেছিল, 'দেখলে তো, প্রিন্সিপ্যাল কোনো স্টেপই নিলেন না। আমি একটা কথা ভাবছিলাম, তাতে অবশ্য রিস্ক আছে।'

কিরণ জিজ্ঞেস করেছে, 'কী ভাবছ?'

সুনীতা বলেছে, 'কলেজের অবস্থা ডিটেলে জানিয়ে বাবাকে চিঠি লিখব কিনা। এখানকার খবর তাঁর কাগজে বেরুলে কিছু একটা হতে পারে। তবে প্রিন্সিপ্যাল আমাকে নিশ্চয়ই কলেজ থেকে বার করে দেবেন।' একটু থেমে বলেছে, 'আর কিছুদিন দেখাই যাক, কী বল?'

সুনীতা কলেজ ছেড়ে চলে যাবে, এটা ভাবতে পারছিল না কিরণ। সে তক্ষুনি বলেছে, 'সেই ভাল।'

কিরণরা সেই যে 'সিট-ইন স্ট্রাইক' করেছিল তার কয়েক মাস বাদে আবার শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটল। ওদের কলেজের পাঁচশ গজের মধ্যে ছেলেদের একটা কলেজ আছে। দেশ জুড়ে সেটারও খুব নাম, প্রচুর গ্ল্যামার। সারা ইন্ডিয়ার বিরাট বিরাট ফ্যামিলির ছেলেদের ওখানে পাঠানো হয়।

স্বাধীনতার আগে কঠোর ডিসিপ্লিন, শিষ্টাচার এবং ভাল রেজাল্টের জন্য এই কলেজ ছিল দেশের সেরা ইনস্টিটিউশনগুলোর একটা। স্বাধীনতার পরও বেশ কয়েক বছর এই ট্রাডিশন বজায় ছিল। কিন্তু ততদিনে পোস্ট-ইন্ডিপেনডেন্স দেশপ্রেমিকদের একটা জেনারেশন তৈরি হয়ে গেছে, যাদের ত্যাগ বা স্যাক্রিফাইস বলতে কিছুই নেই। রাজনীতি স্বাধীন ভারতের সব চেয়ে লাভজনক 'ইন্ডাস্ট্রি' বলে এরা এদিকে ঝুঁকছে। এই ইন্ডাস্ট্রি উৎপাদন করেছে দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, কালো টাকার প্যারালাল ইকনমি। এই সব নতুন দেশসেবী এবং তাদের সঙ্গীরা, রাতারাতি এক জেনারেশনেই টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছে। আজকাল এদের ফ্যামিলি থেকে ছেলেরা আসছে ওই কলেজে। ফলে আগেকার পুরনো আবহাওয়া পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। গ্ল্যামার অনেক গুণ বেড়েছে ঠিকই, রেজাল্টও হয়ত ভালই হয়, কিন্তু ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই। ড্রাগ-অ্যাডিক্ট নয়, এমন একটি যুবককে খুব সম্ভব ওখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওখানকারই ক'টা ছেলেকে পুলিশ ব্রথেলে মারামারি করার জন্য একবার ধরে নিয়ে যায়। এক বার কলগার্ল নিয়ে কী একটা কেলেঙ্কারিতে ওদের কয়েকজন জড়িয়ে পড়ে। এক বার ওই কলেজের চারটি ছেলে রাস্তা থেকে জোর করে দুটো মেয়েকে গাড়িতে তুলতে গিয়ে লোকজনের হাতে প্রচণ্ড মার খায়। একটি ছেলে নাকি রেপ এবং মার্ডার কেসেও ফেঁসে গিয়েছিল। এই নিয়ে কাগজে প্রচুর লেখালিখি, হইচই হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরাছোঁয়ার বাইরে অদৃশ্য কোনো আঙুলের ইঙ্গিতে সব চাপা পড়ে যায়।

হঠাৎ একদিন রাতে এই কলেজের ছেলেরা বেদম ড্রিংক করে, পুরোপুরি উলঙ্গ হয়ে ড্রাম বাজাতে বাজাতে কিরণদের কলেজের গেট টপকে ঢুকে পড়েছিল। এই ছেলেদের ক'জন এমনই বজ্জাত, এমনই নটোরিয়াস যে সারা দিল্লি তাদের চেনে। শুধু মাতাল ড্রাগ-অ্যাডিক্টই না, ছুরি এবং রিভলবার চালাতেও তারা ওস্তাদ।

ওদের দেখামাত্র দারোয়ান-টারোয়ানরা পালিয়ে গিয়েছিল। বেয়ারাগুলো ঝাঁক বেঁধে কলেজ কমপাউণ্ড থেকে কোথায় উধাও হয়েছিল, কে জানে।

ছেলেগুলোর টার্গেট মেয়েদের হস্টেল। অন্য বিল্ডিং-এ কী হয়েছিল কিরণ জানে না। তবে তাদের ব্লকের মেয়েরা চিৎকার এবং ড্রামের কান ফাটানো আওয়াজে উঠে পড়েছিল এবং মাঝরাতে এতগুলো মাতাল উলঙ্গ হিংস্র নেকড়েকে দেখে মারাত্মক ভয়ে প্রথমটা একেবারে সিঁটিয়ে যায়, তারপরই বেশির ভাগ মেয়ে কাঁদতে শুরু করে। শুধু দু-চারটে সিনিয়র মেয়ে স্ম্যাকের নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখে তাকিয়ে

অদ্ভুত হেসে বলেছে, 'ডরনেকা কিয়া হ্যায়? আনে দো শালে লোগকো। 'ফান' বহুত জমেগা।' ইংরেজির পাশাপাশি এখানে হিন্দিটাও চলে।

সেক্সি মেয়েগুলোক সুনীতা প্রচণ্ড ধমকে দেয়, 'শাট আপ য়ু বিচেস। বিলকুল মুহ্ বন্ধ।'

তারপরেই কিরণ এবং আরো ক'টি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি ফ্লোরে সিঁড়ির মুখে ভারি ভারি তালা ঝুলিয়ে চলে যায় ছাদে। কিন্তু একটানা মিনিট তিনেক কলিং বেলের সুইচ টিপে এবং গলা ফাটিয়ে ডাকাডাকি করেও সুপারিনটেনডেন্ট হরজিৎ কাউরের ঘুম ভাঙাতে পারে না।

অগত্যা সুনীতা থানায় ফোন করার জন্য কিরণকে নিচে পাঠিয়ে দেয়। পাঁচ মিনিট পর ফের ছাদে এসে কিরণ দেখতে পায়, সুনীতারা কার্নিসের ওপর দিয়ে ঝুঁকে আছে। সেখানে আসতেই রাস্তার জোরাল ফ্লুয়োরেসেন্ট আলোয় যে দৃশ্যটি চোখে পড়ে তাতে তার শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ষাট ফুট নিচে বার চোদ্দটি ছেলে সিটি দিয়ে এবং ড্রাম বাজিয়ে, অশ্লীল কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করতে করতে নেচে চলেছে। অন্য হস্টেল বিল্ডিংগুলোর সামনেও সেই একই দৃশ্য।

একেবারে থ হয়ে যায় কিরণ। এই টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির শেষ দিকে একটি স্বাধীন দেশের (যে দেশের পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সিভিলাইজেশনের একটা পশ্চাৎপট আছে) ক'টি ছাত্র মেয়েদের হস্টেলের সামনে এভাবে নাচতে পারে, এ যেন ভাবাই যায় না। মনে হচ্ছিল, সেই বাতে দিল্লি শহর কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে আদিম বর্বর যুগে ফিরে গেছে।

কদর্য হুল্লোড় করতে করতে হঠাৎ ছোকরাগুলো কিরণদের দেখতে পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। দু'হাত তুলে তারা জড়ানো মাতাল গলায় চেঁচাতে থাকে, 'জাম্প ডারলিং, জাম্প।'

বলতে বলতেই একটা ছোকরা টলতে টলতে রেন-ওয়াটার পাইপের কাছে ছুটে আসে। উদ্দেশ্য, পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে আসবে।

কিরণরা ভীষণ ঘাবড়ে যায়। সুনীতাকে বলে, 'কী হবে এবার?'

সুনীতার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। চোখের তারা স্থির। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলেছে, 'নিচ থেকে চেয়ার টেবল যা পাও নিয়ে এস।'

তক্ষুনি অনেকগুলো চেয়ার টেবল সোফা ইত্যাদি ছাদে চলে আসে। সেই ছোকরাটা পাইপ বেয়ে কয়েক ফুট উঠে এসেছে। সুনীতা একটা চেয়ার তুলে তার দিকে ছোঁড়ে কিন্তু তাকটা ফসকে যায়। না লাগাতে পারলেও এতে ম্যাজিকের কাজ হয়। ছোকরার মাতলামি তৎক্ষণাৎ অনেকখানি ছুটে যায় এবং এরপর তার মাথাটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য আরো কিছু পড়তে পারে এই অনুমানশক্তি কাজে লাগিয়ে পলকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে। আর তখনই একটা পুলিশ ভ্যান গাঁক গাঁক আওয়াজ তুলে কলেজ কমপাউন্ডে ঢোকে। কারা ভ্যানটার জন্য গেট খুলে দিয়েছিল, কে জানে।

পুলিশ দেখামাত্র মাতাল উলঙ্গ ছোকরাগুলো নর্দমার ভীতু ইঁদুরের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড লাগিয়েছে এবং যে যেদিক দিয়ে পারে বাউন্ডারি ওয়াল টপকে উধাও হয়ে গেছে।

পুলিশের গন্ধ পেয়ে এবাব প্রিন্সিপ্যাল আর তিনটে হস্টেলেব সুপারিনটেনডেন্টদের দেখা গিয়েছিল। ছাত্রীরাও হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। কলেজ জুড়ে তখন প্রচণ্ড উত্তেজনা, চাঞ্চল্য। একজন মধ্যবয়সী পুলিশ অফিসার ভ্যান থেকে নেমে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যে পনের ষোল জন আর্মড পুলিশ এসেছে তারা আগেই মাতাল ছোকরাগুলোকে তাড়া করে গিয়েছিল কিন্তু একটাকেও ধরতে না পেরে ফিরে এসেছে।

অফিসার জানিয়েছিলেন, মাঝরাতে ফোন পেয়ে তাঁরা ছুটে এসেছেন। তারপর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনারা কি ওই বদমাস ড্রাংকার্ডগুলোকে চিনতে পেরেছেন? তা হলে অ্যারেস্ট করতে সুবিধা হবে।'

প্রিন্সিপ্যাল বলেছেন, 'আমার বাংলোয় চলুন, সব বলছি।'

এই সময় সুনীতা কিরণ এবং আরো অনেক মেয়ে একসঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকার শুরু করেছিল। তারা জানিয়েছে, ওই নেকেড মাতালগুলো কোন কলেজের ছাত্র এবং মাঝরাতে কী মহান উদ্দেশ্যে তারা

মেয়েদের হস্টেলে হানা দিয়েছে।

অফিসার চমকে উঠেছিলেন। ঢোক গিলে বলেছেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই ওদের নামে ডায়েরি করবেন। কোথাও বসতে পারলে আপনাদের অভিযোগ লিখে—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই প্রিন্সিপ্যাল অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলেছিলেন, 'যা বলার আমিই বলব, আপনি লিখে নেবেন। আসুন আমার সঙ্গে।' একরকম জোর করেই মেয়েদের হস্টেলে পাঠিয়ে পুলিশ অফিসারকে নিয়ে নিজের বাংলোয় চলে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ মেয়েরা ওই অবাঞ্ছিত জঘন্য ঘটনা সম্পর্কে মুখ খুলুক, এটা তিনি চাননি।

পরের দিন সকালেই বেয়ারা পাঠিয়ে সুনীতাদের নিজের বাংলোয় ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রিন্সিপ্যাল। সেদিন তাঁকে আদৌ কড়া বা ভীতিকর মনে হয়নি। তাঁর মুখে চিরস্থায়ী কঠোরতার চিহ্নমাত্রও ছিল না। বরং তাঁকে খুবই কোমল এবং স্নেহপ্রবণ দেখাচ্ছিল—অনেকটা মায়ের মতো।

প্রিন্সিপ্যাল তাদের বসিয়ে বেয়ারাকে সবার জন্য কোকো আর বিস্কুট আনতে বলেছিলেন।

কোকোর কাপে আলতো একটি চুমুক দিয়ে নরম গলায় প্রিন্সিপ্যাল বলেছেন, 'পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে দিইনি বলে নিশ্চয়ই তোমরা রাগ করেছ। কিন্তু এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।'

কেন পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে মেয়েদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এর পর তিনি বুঝিয়ে বলেছেন। পুলিশের কাছে ডায়েরি করলে পরে তা নিয়ে ক্রিমিনাল কেস উঠবে। সাক্ষি, জেরা ইত্যাদি কারণে অনবরত মেয়েদের কোর্টে উঠতে হবে। তা ছাড়া বিরুদ্ধ পক্ষের ল'ইয়াররা জেরার মুখে এমন কিছু প্রশ্ন করতে পারেন যা মেয়েদের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর।

কোর্টে কেস উঠলেই খবরের কাগজের আইন আদালত কলমে ছাপা হবে। তাতে এই কলেজের আর এখানকার ছাত্রীদের সুনাম এবং মর্যাদা নষ্ট হবে। কেননা, সাধারণ মানুষ তো কাল রাতের এই কদর্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নয়। আদালতের মুখরোচক রিপোর্টটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে তারা ভাবতে পারে এক হাতে কখনও তালি বাজে না, ইত্যাদি। আর যাদের মাছির মতো ব্রণ খোঁটার অভ্যাস তারা ভাববে, মেয়েদের দিক থেকেও পর্যাপ্ত উসকানি ছিল, নইলে মাঝরাতে ওভাবে কেউ হানা দিতে পারে!

প্রিন্সিপ্যাল জানিয়েছিলেন, সারা দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গভীর বিশ্বাসে তাঁর হাতে নিজের নিজের মেয়েদের মর্যাদা এবং সুরক্ষার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। কোর্ট তাদের টানাটানি করুক, তারা স্ক্যান্ডালের শিকার হোক—এ তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না।

সুনীতা হঠাৎ বলে ফেলেছে, 'তা হলে যা-ই ঘটুক না, আমাদের মুখ বুজে থাকতে হবে? কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করব না?'

প্রিন্সিপ্যাল রেগে যাননি। পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে স্থির চোখে সুনীতাকে দেখতে দেখতে বলেছেন, 'তোমাদের বয়েস এখনও কম, এক্সপিরিয়েন্সও কিছুই হয়নি। আমাদের নারী-পুরুষের ইকোয়েল রাইটসের কথা বলা হয়ে থাকে ঠিকই কিন্তু এখনও এ দেশ মেল-ডমিনেটেড। এখানে মেয়েদের অনেক কিছু অ্যাডজাস্ট করে চলতে হয়।'

সুনীতার পাশে বসে কিরণ সেই প্রথম মেল-ডমিনেটেড বা পুরুষ-শাসিত ইন্ডিয়ার কথা শুনেছিল।

শান্তিভঙ্গের যে তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে তাতেও প্রিন্সিপ্যালকে কয়েক পা পিছু হটতে হয়েছিল।

প্রতি বছরেই শীতে কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় তুমুল হইচই করে। মিডিয়া অর্থাৎ খবরের কাগজ, টিভি এবং রেডিওকে এ ব্যাপারে কাজে লাগানো হয়ে থাকে। এমন সব জমকালো অনুষ্ঠান করা হয় যাতে মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

এই উপলক্ষে গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের কোনো নাম-করা স্টারকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। শুধু প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানেই না, কলেজের যে কোনো ফাংশনে 'গ্ল্যামার' থাকা চাই-ই, বিশেষ করে চিত্রতারকা আনার দিকে ঝোঁকটা প্রচণ্ড। এটাই এই কলেজের রেওয়াজ।

এখানকার প্রথম কথা গ্ল্যামার, শেষ কথাও তা-ই।

সেবার শ'খানেক টেলিগ্রাম করে এবং বম্বেতে চার বার লোক পাঠিয়ে হিন্দি ফিল্মের একজন দামি

সুপারস্টারকে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রিন্সিপ্যাল। এটা যেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অ্যাচিভমেন্ট বা অতুলনীয় কীর্তি, প্রিন্সিপ্যালের মুখচোখ দেখে তা-ই মনে হচ্ছিল।

কিন্তু যে তারকাটি শুধুমাত্র সেলুলয়েডে বিপুল বিক্রমে পিস্তলবাজি করে, দাঁত খিঁচিয়ে এবং 'ডামি'র সাহায্যে অবিরত 'ক্যারাটে কি খেল' বা মারদাঙ্গা চালিয়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে, দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে এমন একটা অসার ফাঁপা মেকি ব্যক্তির নির্বাচন সুনীতারা মেনে নিতে পারেনি। তারা সোজা প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট জানিয়েছে।

প্রিন্সিপ্যাল অবাক হয়ে বলেছেন, 'এত বছর আমি এই কলেজে আছি। পপ ড্যান্সার, মিউজিসিয়ান, নাম-করা টি.ভি আর্টিস্ট —কেউ না কেউ প্রতি বছরই আসেন। এর আগে কোনো ছাত্রী তো প্রতিবাদ করেনি। এই সুপাবস্টারটি এলে কাগজে বড় করে নিউজ বেরুবে, গ্ল্যামার কত বেড়ে যাবে, ভাবতে পার!' গ্ল্যামার এবং পাবলিসিটির দিকে তাঁর অসীম দুর্বলতা।

সুনীতা জানিয়েছে, মারদাঙ্গা আর নোংবা সেক্সের ছবিতে পঁচিশ বছর অভিনয় করে করে যে দেশের কালচার ধ্বংস করে দিচ্ছে, নষ্ট করে দিচ্ছে নতুন জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের, তাকে এই ইনস্টিটিউশনে খাতির করে আনার মানে হয় না। তাদের মতামত অগ্রাহ্য করে যদি আনাই হয়, মেয়েরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করবে।

শেষ পর্যন্ত টেলিগ্রাম করে 'অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়েছে'—জানিয়ে সুপারস্টারেব আসা বন্ধ করা হয়েছিল। তার বদলে আনা হয়েছে বিখ্যাত এক বিজ্ঞানীকে।

এই ব্যাপারটা নিয়ে আর জল ঘোলা করেননি প্রিন্সিপ্যাল। তাঁর কাছে শান্তিই একমাত্র কাম্য বস্তু।

শান্তিভঙ্গের শেষ যে ঘটনাটি ঘটে তাতেই জীবন সম্পর্কে কিরণের ধারণা আগাগোড়া বদলে যায়। শাক্যদ্বীপী মিশ্ররা বাড়ির মেয়েদের জন্য জীবনযাত্রার যে মডেল এবং ফরমুলা তৈরি করে দিয়েছে, তার কাছে সেটা পুরোপুরি অনাবশ্যক এবং অর্থহীন মনে হয়।

ঘটনাটি এইরকম। কিরণরা যেবার থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে উঠল সে বছব সারা দেশ জুড়ে আচমকা বিপুল উদ্যমে পুত্রবধূ পোড়াবার ধুম পড়ে যায়। খুনের প্রতিযোগিতাটা দিল্লিতেই সবচেয়ে বেশি। রোজই কাগজে দু'চারটে করে বউ পোড়ানোর খবর বেরুচ্ছিল। সেই সঙ্গে থাকত অসহায় মেয়েগুলোর ঝলসানো মৃতদেহের ছবি এবং ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। যথেষ্ট পরিমাণে দহেজ বা পণ আদায় করতে না পারায় এই শহরের শ্বশুর-শাশুড়িদের মাথায় উন্মাদ আততায়ী যেন ভব করেছিল। হত্যার নেশা এবং হিস্টিরিয়া আক্রান্ত দিল্লি তখন কোনো আদিম বর্বর যুগে ফিরে গেছে।

এই সময় একদিন দুপুরে অধ্যাপিকারা ক্লাসে ক্লাসে গম্ভীর মুখে যখন লেকচার দিচ্ছেন, মেয়েবা ঘাড় গুঁজে নোট নিচ্ছে, হঠাৎ বাইরে থেকে সামুদ্রিক ঝড়ের আওয়াজ ভেসে এসেছিল।

গেটের কাছাকাছি আর্টস ডিপার্টমেন্টের বড় বিল্ডিংয়ে কিরণদের ক্লাস চলছিল। চমকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখা গেছে, অগুনতি পুরুষ এবং মহিলার বিরাট মিছিল গেট পেরিয়ে স্লোগান দিতে দিতে জলোচ্ছ্বাসের ঢলের মতো কলেজ কমপাউন্ডের ভেতর ঢুকে পড়েছে। তাদের অনেকেব হাতেই হিন্দি এবং ইংরেজিতে লেখা পোস্টার।

কাছাকাছি আসতে স্লোগানগুলো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল।

'দহেজ প্রথা—

'বন্ধ্ কর।'

'হত্যাকারীদের—'

'শাস্তি চাই—'

'নারী মুক্তি আন্দোলনে—'

'যোগ দিন।'

প্রিন্সিপ্যালেব কড়া নির্দেশ, কোনো মিছিল বা অবাঞ্ছিত লোককে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

কিন্তু বিশাল জনতা দেখে দারোয়ানরা এতই ঘাবড়ে যায় যে গলা দিয়ে তাদের আওয়াজ বেরোয়নি, কাঠের পুতুল হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

ততক্ষণে প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপিকা এবং ছাত্রীরা বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। স্বাধীনতার পর দিল্লিতে অসংখ্য কারণে হাজার মিছিল বেরিয়েছে কিন্তু এই কলেজের কথা তাদের মনে পড়েনি, এখানকার শান্তি ছিল অবাধ এবং নির্বিঘ্ন।

প্রিন্সিপ্যালকে দেখে মনে হয়েছিল খুবই বিচলিত। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী ব্যাপার? আপনারা কী চান এখানে?'

জনতার একেবারে সামনের দিকে যে ঝকঝকে যুবকটি দাঁড়িয়ে ছিল সে বলেছে, 'আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।' বলেই, পাশের বাগানের উঁচু রেলিংয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার গলায় একটা ছোট মাইক ঝুলছিল। সেটা তুলে নিয়ে সে এভাবে শুরু করেছিল :

দেশ জুড়ে, বিশেষ করে দিল্লিতে বধূহত্যার যে মারাত্মক ঘটনাগুলি ক্রমাগত ঘটে চলেছে তাতে সন্দেহ হয় ভারতবর্ষ একটি সভ্য দেশ কিনা এবং এর পেছনে কয়েক হাজার বছরের গৌরবময় পুরনো কালচার আছে কিনা। নারী পুরুষের সমান অধিকার এবং সম মর্যাদার কথা এখানে অনবরত ঢাক পিটিয়ে বলা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষও ধুমধাম করে কাড়ানাকড়া বাজিয়ে পালন করা হয়। তার পাশাপাশি ঘরের বউও পোড়ানো হচ্ছে, পণপ্রথাও রয়েছে, বহুবিবাহও চলছে। মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে ক্রীতদাসীর মতো। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে।

যুবকটি জানিয়েছিল, 'মুক্তি' নামে তাদের একটি সংস্থা রয়েছে। তারা মেয়েদের নানা সমস্যা নিয়ে কাজ করছে। তাদের ইচ্ছা, দেশের যেখানে যেখানে মেয়েদের ওপর—তাদের ধর্মমত জাত বা ভাষা যাই হোক না—জুলুম শোষণ অত্যাচার চলছে, সেখানেই ছুটে যাওয়া এবং নিগৃহীত মেয়েদের সংগঠিত করা। কিন্তু সত্তর কোটি মানুষের দেশে সমস্যাটা এমনই ব্যাপক এবং জটিল যে অসংখ্য কর্মী দরকার, বিশেষত শিক্ষিত সচেতন সহানুভূতিসম্পন্ন মহিলা কর্মী। কেননা মেয়েদের সমস্যা মেয়েরাই ভাল বুঝতে পারে। এ কাজে কিরণদের কলেজের মেয়েদের এগিয়ে আসা দরকার। কিন্তু সেসব পরের কথা। আপাতত তাদের সংগঠন 'মুক্তি' বধূহত্যা এবং দহেজপ্রথার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা অফিসকর্মী এবং গৃহবধূদের নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে চলেছে লোকসভা ভবনের দিকে। যুবকটির আবেদন, কিরণদের কলেজের ছাত্রী আর অধ্যাপিকারাও যেন মিছিলে যোগ দেন।

যুবকটির কণ্ঠস্বর আশ্চর্যরকম ভরাট গম্ভীর এবং আবেগময়। তার বলার ভঙ্গিতে এমন একটা জাদুকরী ব্যাপার আছে যে সারা কলেজে উন্মাদনা ছড়িয়ে গিয়েছিল।

এই সব মিছিল, আন্দোলন প্রিন্সিপ্যালের ঘোর অপছন্দ। কিন্তু তিনি বাধা দেবার আগেই সুনীতা কিরণ এবং আরো বেশ কিছু মেয়ে মিছিলে মিশে গিয়েছিল। এমনকি দু'তিন জন অধ্যাপিকাও তাদের সঙ্গে গেছেন।

সেদিন পার্লামেন্ট ভবনের সামনে থেকে কিরণরা ফিরে আসার পর প্রিন্সিপ্যাল ভীষণ রাগারাগি করেছিলেন। প্রচুর তর্জন গর্জন করে বলেছেন, 'আমার অনুমতি ছাড়া কেন তোমরা প্রসেসানে গেলে? এতটা সাহস কী করে হল?'

যে অধ্যাপিকারা কিরণদের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁরা কাচুমাচু মুখে, মিনমিনে গলায় বলেছেন, 'এমন সব সাংঘাতিক ঘটনা ঘটছে, কিছু একটা প্রতিবাদ করা তো দরকার। তাই—'

এক ধমকে তাঁদের থামিয়ে দিয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল, 'চুপ করুন। এই কলেজের টিচার আর স্টুডেন্টরা পলিটিক্যাল ধাপ্পাবাজদের পাল্লায় পড়ুক, এ আমি চাই না—'

সুনীতা এই সময় বলে উঠেছে, 'ম্যাডাম, ওরা কেউ পলিটিকস করে না। ওদের সোশাল অরগানাইজেশন 'মুক্তি'র—'

তার কথা শেষ হয়নি, কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে প্রিন্সিপ্যাল রূঢ়ভাবে বলেছিলেন, 'তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। প্রথম দিন থেকেই দেখছি, তুমি অত্যন্ত ইমপার্টিনেন্ট। আমার ইচ্ছে নয়, এ জাতীয় কোনো ব্যাপারের সঙ্গে এই কলেজের কেউ সম্পর্ক রাখে।'

সুনীতা অসীম দুঃসাহসে এবার বলেছে, 'মেয়েদের ওভাবে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, আর আমরা মুখ বুজে থাকব!'

'হ্যাঁ, থাকবে।' প্রিন্সিপ্যাল এবার খেপে উঠেছেন, 'দেশে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে। পার্লামেন্ট, কোর্ট, পুলিশ, মিলিটারি, পলিটিক্যাল পার্টি, সমাজসেবী—কোনো কিছুর অভাব নেই। যা করার তারা করবে। এ নিয়ে তোমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। যাও, যে যার হস্টেলে চলে যাও।'

প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ তর্কাতর্কি করতে পারত সুনীতা। বলতে পারত, এই কলেজের মেয়েরা যখন এই দেশেরই মানুষ তখন তাদের কিছু সামাজিক দায়িত্ব আছে। কিন্তু এ নিয়ে আর একটি কথাও বলতে ইচ্ছা হয়নি তার। হস্টেলের দিকে ফিরতে ফিরতে সে শুধু কিরণকে বলেছে, 'কাল একবার 'মুক্তি'-র অফিসে যেতে হবে। ভদ্রলোক তখন যা বলে গেলেন, তার অর্ধেকও যদি ঠিক হয়, তা হলে বলতে হবে ওঁরা বিরাট কাজ করছেন।'

কিরণ বলেছিল, 'আমাকে নেবে তোমার সঙ্গে?'

'সাহস থাকলে আসতে পার।'

আরো ক'টি মেয়েও তাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল।

পরের দিন কলেজ ছুটির পর খুঁজে খুঁজে আনসারি রোডে 'মুক্তি'-র অফিসটা বার করেছিল কিরণরা। কলেজের নিয়ম, মেয়েরা বাইরে বেরুতে পারে, তবে সন্ধে সাতটার মধ্যে ফিরে আসতেই হবে।

তিনটে মাঝারি ঘর নিয়ে 'মুক্তি'-র অফিস। বেশ কিছু পুরুষ এবং মহিলাকে সেখানে দেখা গিয়েছিল। সবাই দারুণ ব্যস্ত। কেউ টাইপ করছিল, দু'তিন জন একটা বড় খাতায় খবরের কাগজের কাটিং পেস্ট করে রাখছিল। একটি মধ্যবয়সী মজুর শ্রেণীর মেয়েমানুষ কেঁদে কেঁদে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে কী সব বলে যাচ্ছিল, একটি তরুণী তা টুকে নিচ্ছিল। এদের মধ্যে আগের দিনের সেই ঝকঝকে যুবকটিকে দেখা গিয়েছিল। প্রথমটা কিরণদের চিনতে পারেনি। আগের দিন অত মানুষের ভিড়ে এবং ওই রকম উত্তেজনার মধ্যে একটি কলেজের ক'জন মেয়েকে আলাদা করে মনে রাখা সম্ভব নয়। যুবকটি জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনারা?'

সুনীতা জানিয়েছিল তারা কোত্থেকে আসছে এবং এখানে আসার উদ্দেশ্যই বা কী।

যুবকটি খুব খুশি। সে কিরণদের বসিয়ে তাদের নাম-টাম, কার কোন ইয়ার জিজ্ঞেস করেছে, নিজেরও পরিচয় দিয়েছে। তার নাম প্রভাকর আম্বেদকর, দিল্লিরই একটা কলেজে ইংরেজির লেকচারার এবং 'মুক্তি'-র সেক্রেটারি। অন্য যে মহিলা এবং পুরুষ সহকর্মীরা তখন ওখানে ছিল তাদের সঙ্গেও কিরণদের আলাপ করিয়ে দিয়েছে প্রভাকর। এদের কেউ সরকারি অফিস বা প্রাইভেট ফার্মের বড় অফিসার কিংবা খুব সাধারণ এমপ্লয়ী, কেউ স্কুলে পড়ায়, কেউ নিছকই গৃহবধূ। নিজস্ব কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সময় বার করে 'মুক্তি'-র জন্য সবাই প্রচুর খাটে।

প্রভাকর একজন মারাঠি হরিজন। শুধু হরিজনই না, খ্রিস্টানও। শুনে চমকে উঠেছে কিরণ, তার আজন্মের সংস্কারে কোথায় যেন ধাক্কা লেগেছিল। পরক্ষণেই মনে পড়েছে, দেশটা একমাত্র আপার কাস্ট হিন্দুদের নয়। উঁচু জাতের হিন্দু মেয়েদেরই শুধু পুড়িয়ে মারা হচ্ছে না বা তারাই নানা অমানুষিক প্রথার শিকার নয়। কাগজে মাঝে মাঝে যে সব খবর বেরোয় তা থেকে কিরণ জেনেছে, অন্য জাতের বেশির ভাগ মেয়ের অবস্থা ক্রীতদাসীর মতো, তাদের ওপর নির্যাতন চলে আসছে আবহমান কাল। তবে কিরণের এই জানাটা অনেক দূর থেকে এবং খুবই ভাসা ভাসা।

এদিকে নানা প্রসঙ্গে টুকরো টুকরো কথা বলতে বলতে ভারতীয় নারীদের বিভিন্ন সমস্যা, স্ত্রী-স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে 'মুক্তি' তখন পর্যন্ত যা যা করেছে এবং করে যাচ্ছে, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী—সব বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল প্রভাকর। নির্যাতিত অসহায় মেয়েদের জন্য আর্থিক এবং আইনঘটিত সাহায্যের কিছু কিছু ব্যবস্থা তারা করেছে। প্রয়োজনের তুলনায় সে সব যৎসামান্য। সব চেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে দেশের মানুষকে মেয়েদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা, তাদের কাছে বিপজ্জনক ভয়াবহ অবস্থার আসল ছবি তুলে ধরা। 'মুক্তি'-র বিপুল কর্মসূচির মধ্যে এসবও রয়েছে।

কথায় কথায় ছ'টা বেজে গিয়েছিল। সুনীতা বলেছে, 'এবার আমাদের ফিরতে হবে।'

কিরণ এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সে বলেছে, 'আমরা যদি মাঝে মাঝে আসি—'

প্রভাকর বলেছে, 'মোস্ট ওয়েলকাম। এখানকার দরজা সবার জন্যে খোলা।'

প্রথম প্রথম কিরণরা সপ্তাহে এক-আধদিন এসে ছোটখাট কিছু কাজ করে দিয়ে যেত। পরে নিয়মিত আসতে শুরু করে। বিকেল হলেই আনসারি রোড বিপুল আকর্ষণে তাদের যেন টেনে নিয়ে যেতে থাকে, বিশেষ করে কিরণকে। 'মুক্তি'র কাজ তো আছেই, তার আসল আকর্ষণটা ছিল প্রভাকরকে ঘিরে।

প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা এবং একসঙ্গে কাজ করতে করতে প্রভাকরকে নানা দিক থেকে আবিষ্কার করতে শুরু করেছিল কিরণ। এমন সংস্কারমুক্ত উদার হৃদয়বান মানুষ আগে আর কখনও দেখেনি সে। প্রভাকরকে দেখে ক্রমে সে বুঝতে পারছিল, সারা জীবনের জন্য তার নিজস্ব কাম্য পুরুষটি কী ধরনের হওয়া উচিত।

প্রভাকরের মূল কাজটা গ্রামের গোঁড়া হিন্দু মুসলিম মেয়েদের নিয়ে। দীর্ঘকালের সংস্কার এবং গোঁড়ামি থেকে তাদের বার করে আনতে হবে। তাদের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে আধুনিক শিক্ষা, তাদের বোঝাতে হবে স্ত্রী-স্বাধীনতার মর্মার্থ। এই নিয়েই প্রভাকর মেতে ছিল। তার আরো একটা বড় কাজ, বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ। এতে বিরাট ঝুঁকি ছিল। কেননা গোঁড়া কট্টরপন্থীরা তার বিরুদ্ধে খেপে গিয়েছিল। কিন্তু প্রভাকর এসব গ্রাহ্য করত না। সে প্রচণ্ড সাহসী জেদী এবং একরোখা।

কিরণ টের পাচ্ছিল, প্রভাকর তাকে পছন্দ করে। কোনো কারণে দু'একদিন না এলে জানতে চাইত, কেন আসেনি।

প্রথম প্রথম আনসারি রোডে 'মুক্তি'-র অফিসে এসে টুকটাক কিছু করে যেত কিরণরা। পরে তাদের বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দু-তিন জনের এক একটা গ্রুপ বানিয়ে ওদের নানা জায়গায় পাঠানো হত। কোনো দল যেত শ্রমিক বস্তিতে, কোনোটা নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে, কোনোটা বিবাহ-বিচ্ছিন্ন মহিলাদের খোঁজে। উদ্দেশ্য, এইসব মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের অর্থনৈতিক পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যাগুলি লিখে এনে রিপোর্ট তৈরি করা। এই গ্রুপগুলোর কোনো একটার সঙ্গে প্রভাকরও বেরিয়ে পড়ত। তবে কিরণ যে গ্রুপে থাকত, বেশির ভাগ দিন তাদের সঙ্গেই যেত প্রভাকর।

সুনীতা কিরণের ভেতর থেকে ঘুমন্ত আগুন খুঁড়ে বার করেছিল আর প্রভাকর চারপাশের সব মজবুত দেওয়াল ভেঙে তাকে উন্মুক্ত আকাশের নিচে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল যেন।

মাস কয়েক এভাবে চলার পর ঠিক হয়েছিল, এক ছুটির দিনের সকালে একটা গ্রুপ হরিয়ানার এক কৃষাণ গ্রামে যাবে। সেখানে নির্যাতিত মেয়েদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য যোগাড় করাই ছিল যাওয়ার উদ্দেশ্য।

এই গ্রুপটায় ছিল তিনজন। কিরণ সুলভা এবং প্রভাকর। কিন্তু যাওয়ার দিন সুলভা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় কিরণ আর প্রভাকরকেই যেতে হয়। ভাবা গিয়েছিল, বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে, কিন্তু হরিয়ানায় কাজ সারতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। দিল্লিতে যখন ওরা পৌঁছয় তখন অনেক রাত এবং সে সময় কিরণের পক্ষে হস্টেলে ফেরা অসম্ভব।

প্রভাকর বেশ বিপন্ন বোধ করেছিল। সে বলেছে, 'আজ রাতে তোমাকে কোনো ভাল হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সকালে কলেজে চলে যেও।'

কোনোদিন একা হোটেলে থাকেনি কিরণ। সে ভয় পেয়ে বলেছে, 'না, না—'

'তা হলে?'

একটু ভেবে কিরণ এবার বলেছে, 'আপনার ফ্ল্যাটে থাকলে অসুবিধা আছে?'

চমকে উঠেছিল প্রভাকর, 'কিন্তু আমি তো একা থাকি।'

'তাতে কী?'

কিরণের নিষ্পাপ মুখে কোনোরকম অবিশ্বাস বা সংশয় ছিল না। ছিল প্রভাকরের প্রতি গভীর বিশ্বাস এবং নির্ভরতা।

প্রভাকর কিরণকে নিজের ফ্ল্যাটেই শেষ পর্যন্ত নিয়ে গেছে। সেই প্রথম তাকে একা কাছে পায় কিরণ। আর তখনই অনুভব করে, এই মানুষটিকে ছাড়া তার জীবন অসম্পূর্ণ, একে বাদ দিয়ে তার একটা দিনও চলবে না। হয়ত তার সম্পর্কেও এই রকম কিছু ভেবে থাকবে প্রভাকর।

সেদিন মধ্যরাতে সাউথ দিল্লির একটি ফ্ল্যাটে গোঁড়া শাক্যদ্বীপী মিশ্র বংশের পরম্পরা থেকে কিরণ যেন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ধরমপুরার 'মিশ্র নিকেত'-এ তার অস্তিত্বের যে শিকড়গুলি আজন্ম ছড়িয়ে ছিল, সব যেন কোনো অলৌকিক প্রবল টানে উপড়ে আসে। ত্রিকূটনারায়ণ হরীশ, এমনকি মুকুটনাথ মহেশ্বরী সুষ্মা রেবতী, এদের মুখগুলি পর্যন্ত সুদূর এবং অস্পষ্ট হয়ে যায়।

পরের দিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙে কিরণ লক্ষ করে, প্রভাকরের বুকের কাছে শুয়ে আছে। সে চোখ নামিয়ে আরক্ত লাজুক মুখে হেসেছিল।

প্রভাকরের চোখেমুখে গ্লানির চিহ্ন ফুটে বেরিয়েছে। সে বলেছে, 'তোমার খুব ক্ষতি করে ফেললাম কিরণ। কাল জোর করে হোটেলে রেখে এলেই ভাল হত।'

মুখ না তুলে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে কিরণ। বোঝাতে চেয়েছে ক্ষতি হয়নি।

প্রভাকর বলেছে, 'কিন্তু তোমার সাগাই ঠিক হয়ে আছে। এখন কী হবে?'

নিজেদের পারিবারিক কাঠামো, গোঁড়ামি ইত্যাদি থেকে শুরু করে, তার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে থাকা পর্যন্ত যাবতীয় খবর আগেই প্রভাকরকে জানিয়ে দিয়েছিল কিরণ। সে আধফোটা গলায় বলেছে, 'আমি জানি না।' অর্থাৎ যা ভাবার প্রভাকর ভাববে, নিজেকে প্রভাকরের কাছে সঁপে দিয়েই তার সব কাজ যেন শেষ।

প্রভাকর বলেছে, 'আচ্ছা, এখন তুমি হস্টেলে ফিরে যাও। পরে এ নিয়ে ভেবে দেখব।'

হস্টেলে সুনীতা তার জন্য শ্বাসরুদ্ধের মতো অপেক্ষা করছিল, তার মুখে গভীর উৎকণ্ঠা। সে জানিয়েছিল, রাত্তিরে সুপারিনটেনডেন্ট কিরণের খোঁজ নিয়েছিলেন। ন'টায় ঘুমোতে যাবার আগে ফ্লোরে ঘুরে প্রতিদিন তিনি একবার মেয়েদের দেখে যান। যাই হোক, কোনোরকমে ব্যাপারটা সামলে নিয়েছে সুনীতা। সে জিজ্ঞেস করেছে, 'কী হয়েছিল কাল? কোথায় ছিলে?'

কিরণ শুধু জানিয়েছিল, হরিয়ানা থেকে ফিরতে দেরি হওয়ায় রাতে তাকে কোথায় থাকতে হয়েছে।

সুনীতার ঘ্যানঘেনে মেয়েলি কৌতূহল নেই। সে এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করেনি।

এর দিনকয়েক বাদে প্রভাকর কিরণকে বলেছিল, সেই রাতে যা ঘটে গেছে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার। কিরণের আপত্তি না থাকলে তাদের বিয়ে হতে পারে। তার সংস্কার নেই, গোঁড়ামির কথা সে ভাবতে পারে না। তবে কোনোদিনই কিরণের জন্মগত ধর্মবিশ্বাসকে অসম্মান করবে না। ইচ্ছা করলে বিয়ের পরও সে তার পারিবারিক আচারগুলি পালন করতে পারে।

ঠিক হয়েছিল, সুবিধামতো একটা দিন দেখে তারা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে চলে যাবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

আরো দু'তিন মাস বাদে সুনীতা কিরণ এবং আর দু'একজন ছাড়া 'মুক্তি' সম্পর্কে অন্য মেয়েদের উৎসাহ একেবারেই কমে যায়। সাময়িক উন্মাদনা কেটে গেছে। তারা আনসারি রোডে যাওয়া বন্ধ করে দেয়।

এদিকে কিরণ হঠাৎ একদিন টের পায় তার শরীরের অভ্যন্তরে বিপুল তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। বুঝতে পারে সে প্রেগনান্ট।

ঠিক এই সময় প্রিন্সিপ্যাল মধুর খান্না খবর পান, তাঁর কলেজের ক'টি মেয়ে ছুটির পর 'মুক্তি'-র জন্য কাজ করছে। তিনি শুনেছেন, এদের মধ্যে কেউ বা কয়েকজন মাঝে মাঝেই বাইরে রাত কাটিয়ে আসছে। ভবিষ্যতে যারা এলিট সোসাইটির শোভা হয়ে উঠবে তাদের পক্ষে এসব খারাপ দৃষ্টান্ত। দাগী

আমগুলিকে তিনি আর ঝুড়িতে রাখতে চাননি। অভিভাবকদের তৎক্ষণাৎ লম্বা চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মেয়েরা যেভাবে চলছে তাতে এদের ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, কোনো স্ক্যান্ডালে এরা জড়িয়ে পড়বে কিনা, তিনি জানেন না। অভিভাবকরা যেন দ্রুত এর ব্যবস্থা নেন।

এই চিঠি পেয়েই মুকুটনাথ ভকিল খুবলাল সহায়কে দিল্লি পাঠিয়েছিলেন।

আর গোঁড়া শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বংশের মেয়ে কিরণ পেটে অচ্ছুৎ ও খ্রিস্টানের বীজ থেকে জাত একটি ভ্রূণ নিয়ে ফিরে এসেছে 'মিশ্র নিকেত'-এ, যেখানে আবহমান কাল ধরে স্থিতাবস্থা এবং চিরশান্তি বিরাজমান।

চার

দুপুরে পুরনো রসুইকর বুড়ো নন্দলাল ঝা কিরণের ঘরেই ভাত এবং পুরি-টুরি দিয়ে গিয়েছিল। খেয়েই শুয়ে পড়েছে সে। তখনও মুকুটনাথরা কাশী থেকে ফেরেননি। তাঁরা এলে বাড়ির আবহাওয়া তার পক্ষে কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে, যদিও এ নিয়ে প্রচুর দুশ্চিন্তা ছিল কিরণের তবু শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে, অগাধ ঘুমে ডুবে যায় কিরণ। আগের দু'রাত মুকুটনাথের স্ট্রোকের কথা শুনে অসহ্য উৎকণ্ঠায় একটুও ঘুমোতে পারেনি। একটানা কয়েক ঘণ্টা ঘুম তার পক্ষে ছিল খুবই জরুরি। ভয়ে টেনসনে এবং উত্তেজনায় মাথার ভেতরটা দপ দপ করছিল, মনে হচ্ছিল তার নিজেরই কিছু একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে।

ঘুম ভাঙে সাগিয়ার ডাকাডাকিতে। সে ব্ল্যাক কফি নিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বাথরুমে মুখ টুখ ধুয়ে এসে কফির কাপটা নিতে নিতে কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'দাদীরা এসেছে?'

সাগিয়া মাথা নাড়ে, 'না।'

কিরণ আর কোনো প্রশ্ন করে না।

বাইরে ফাল্গুনের বিকেল গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে। রোদের রং টাটকা হলুদের মতো। গাছপালার ছায়া দ্রুত দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম দিক থেকে রোদের লম্বা লম্বা ক'টা লাইন ঘরের ভেতর কার্পেটের ওপর এসে পড়েছে।

কফির কাপটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে বাইরের বারান্দায় চলে আসে কিরণ, সাগিয়াও আসে তার সঙ্গে সঙ্গে।

এখনও সারা বাড়ি ঘষা-মাজা ধোয়াধুয়ি চলছে। কিরণ নৌকর নৌকরানীদের লক্ষ করে না, সোজা রেলিংয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্যমনস্কর মতো কফিতে আলতো চুমুক দিতে দিতে দূরে হাইওয়ের দিকে তাকায়।

হাইওয়েটা ধরমপুরার কাছে এসে এমনভাবে কোমর বাঁকিয়ে ঘুরে গেছে যাতে কিরণদের বাড়ির সামনে এবং পেছনে, দু'দিক থেকেই ওটা চোখে পড়ে। পাকা সড়কে এখন প্রচুর মানুষ, ট্রাক, বাস, সাইকেল রিক্‌শা, গৈয়া আর ভৈসা গাড়ি।

মাথার ওপর দিয়ে মরসুমী পাখির ঝাঁক উড়ে চলেছে দিগন্তের দিকে। অনেক দূরে আকাশের গা ঘেঁষে সকালের মতোই পাতলা তুলোর মতো আবছা কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। গোটা ফাল্গুন মাস জুড়ে সকাল বিকেল এই কুয়াশাটা পড়তে থাকবে।

হাইওয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মায়ের কথাই ঘুরে ঘুরে মনে হচ্ছে। অন্য বার বাড়ি এলে মা এতক্ষণে পঁচিশ বার তার ঘরে চলে আসতেন। আজ একবারও আসেননি, এমন কি তার খাওয়ার সময়ও নয়। বুকের ভেতর শ্বাসকষ্টের মতো একটা যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে কিরণ।

হঠাৎ পেছন থেকে সাগিয়া চেঁচিয়ে ওঠে, 'আ গিয়া, আ গিয়া—'

কিরণ চমকে ওঠে এবং তখনই দেখতে পায়, বিরাট বিরাট চাকাওলা একটা চেনা মোটর হাইওয়ে থেকে এধারের রাস্তায় নেমে বাড়ির দিকে আসছে। গাড়িটার ফ্রন্ট সিটে বসে আছেন মুকুটনাথ, কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণের ছেলে হেমগিরিনারায়ণ এবং ড্রাইভার ঠাণ্ডি সিং। পেছনের সিটে মহেশ্বরী,

তাঁর খাস নৌকরনী মধ্যবয়সী হট্টাকট্টা চেহারার কুঁদরী এবং একজন বৈদ (কবিরাজ) চন্দ্রকান্ত ঝা।

কিরণদের একই মডেলের একজোড়া গাড়ি আর দু'জন ড্রাইভার। একটা গাড়ি নিয়ে চৌধারী সিং তাকে আর খুবলালকে আনতে স্টেশনে গিয়েছিল। এই গাড়িটা গিয়েছিল মহেশ্বরীদের আনতে।

একটু পর মোটরটা সামান্য ঘুরে বাড়ির সামনের দিকে চলে গেল। এখান থেকে সেটাকে আর দেখা যায় না।

সাগিয়া বলে, 'দিদি, দাদীজিকে দেখতে যাব?'

মুকুটনাথকে দেখামাত্র প্রবল ভয়ের চাপে ফুসফুস যেন ফেটে যেতে থাকে কিরণের। হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি হঠাৎ এত বেড়ে যায় যে তার আওয়াজ পর্যন্ত সে শুনতে পায়। ঝাপসা গলায় বলে, 'যা।'

সাগিয়া সিঁড়ির দিকে দৌড়য়।

কিছুক্ষণ পর নিচে হই চই চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। পেছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিরণ টের পায়, নৌকর নৌকরনীরা শশব্যস্তে ছোটাছুটি করছে।

দ্বিধান্বিতের মতো আরো খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে থাকে কিরণ। সে ছাড়া দোতলায় বা তেতলায় আর কেউ নেই, সবাই নিচে নেমে গেছে। কখন যেন, নিজের অজান্তে সিঁড়ি ভেঙে একতলায় নামতে থাকে কিরণ।

উলটো দিক থেকে সাগিয়া উঠে আসছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলে, 'দাদীজি তোমাকে ডাকছে—'

উত্তর না দিয়ে আস্তে আস্তে শিথিল পায়ে কিরণ নেমে আসে। আর তখনই দেখতে পায় একটা ফিতের খাটিয়ায় নরম বিছানা পেতে, মহেশ্বরীকে তার ওপর শুইয়ে চারজন নৌকর নতুন শিব মন্দিরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পাশে পাশে চলেছেন মুকুটনাথ, রেবতী, সুষমা, বৈদ চন্দ্রকান্ত ঝা, কুলগুরুর ছেলে যুবক হেমগিরি আর খুবলাল। তা ছাড়া খাটিয়াবাহক বাদে আরো ক'টি নৌকর এবং নৌকরনীরা।

খুবলাল কখন যে আবার 'মিশ্র নিকেত'-এ ফিরে এসেছে, টের পায়নি কিরণ। এই মুহূর্তে তার কী করণীয়, বুঝতে পারে না। অনেকটা স্রোতের টানে ভেসে যাওয়ার মতো, মহেশ্বরীকে নিয়ে যে শোভাযাত্রা চলেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে সে।

চলতে চলতে শীতল কঠিন চোখে একবার কিরণকে দেখে নেন মুকুটনাথ, কিন্তু একটি কথাও বলেন না।

বাবার দিকে তাকিয়ে কিরণ বুঝে ফেলে, পরে একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। মুখ ফিরিয়ে এবার মাকে লক্ষ করে সে। রেবতীর মুখের কঠোরতা সেই সকালের মতোই, নমনীয়তার কোনো লক্ষণ নেই।

এদিকে খাটিয়ায় শুয়ে মহেশ্বরী মাথা ঘুরিয়ে কিরণকে খুঁজছিলেন, দেখতে পেয়ে হাত তুলে ডাকলেন, 'ইহাঁ আ—'

মহেশ্বরীর বয়স চুরাশি পঁচাশি। গায়ে মাংস বলতে কিছুই নেই, সরু সরু পলকা হাড়ের ওপর শুধুই জালি জালি, কোঁচকানো, কালচে চামড়া জড়ানো। শরীর শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ঘোলাটে চোখ দু-ইঞ্চি গর্তের ভেতর। তোবড়ানো গাল এবং মুখে অজস্র ভাঙচুর। মাথায় চুল নেই বললেই হয়, পাটের ফেঁসোর মতো এখানে ওখানে কিছু কিছু ঝুলছে। লিকলিকে সরু গলা। হঠাৎ দেখলে বুড়ো গিধের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যদিও নিজের ঠাকুমা সম্পর্কে এ সব ভাবতে নেই।

কিরণ মহেশ্বরীর কাছে এগিয়ে আসে। একটু ইতস্তত করে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

মহেশ্বরী রোগা শীর্ণ দুটো হাত বাড়িয়ে কিরণের মুখটা নামিয়ে একটি চুমু খান। বলেন, 'ভাল আছিস দিদি?'

কিরণ আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়।

মহেশ্বরী আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বলেন, 'ভগোয়ান শিউশঙ্করজি তোকে সুমতি দিন।'

সকালে অবিকল এইরকম কিছু বলেই আশীর্বাদ করেছিলেন কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ। নিশ্চয়ই মহেশ্বরীকেও তার সম্পর্কে কিছু বলে থাকবেন মুকুটনাথ। এঁরা কি ধরেই নিয়েছেন তার 'মতি' খারাপ

পথে চলেছে?

একসময় শোভাযাত্রা শিবমন্দিরের কাছে চলে আসে। সামনের চবুতরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বশিষ্ঠনারায়ণ। স্বর্গীয় হেসে তিনি বলেন, 'দেখ মহেশ্বরী, আমার কথায় তোমার জন্যে মুকুট নতুন শিবমন্দির বানিয়ে দিয়েছে। তোমাকে বার বার কাশী যেতে হবে না। বাড়ির ভেতরেই বিশ্বনাথ ধাম পেয়ে যাবে।' পাশের বিশাল চৌবাচ্চাটা দেখিয়ে বলেন, 'ওটা শুধ্ (বিশুদ্ধ) গঙ্গাপানিতে বোঝাই। মনে মনে একে গঙ্গাজি ভাববে।' মহেশ্বরী তাঁর চেয়ে কুড়ি বছরের বড়, কিন্তু যেহেতু তিনি সম্মানিত গুরু, 'তুমি' করে বলার জন্মগত অধিকার তাঁর। অন্যের বয়স, সামাজিক প্রতিষ্ঠা যা-ই হোক, তাকে সম্মান দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। গুরু সকলের ওপরে।

সব ব্যাপারেরই কোনো না কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে। বাড়িতে কুলদেবী মহালছমী থাকা সত্ত্বেও হুট করে নতুন শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে যায় কিরণের কাছে।

ক'বছর ধরেই বাত শ্বাসকষ্ট এবং আরো হাজার রকমের রোগে ভয়ানক কাবু হয়ে পড়েছেন মহেশ্বরী, বিছানা থেকে উঠতেই পারেন না। অ্যালোপ্যাথ ওষুধে গোমাংসের রস বা গোরক্ত থাকতে পারে, এই আশঙ্কায় অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারদের 'মিশ্র নিকেত'-এর চৌকাঠ মাড়াতে দেওয়া হয় না। হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে অতটা জোরাল আপত্তি না থাকলেও মহেশ্বরী রীতিমত শুচিবায়ুগ্রস্ত, এই ওষুধও তিনি ছোঁন না। কাজেই একমাত্র ভরসা কবিরাজি।

ধরমপুরার বৈদ্যরা যখন মহেশ্বরীর শরীরে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মতো এনার্জি যোগাতে পারল না, তখন কলকাতা এবং পাটনা থেকে বিস্তর খরচ করে দু'জন নামকরা কবিরাজ আনিয়েছিলেন মুকুটনাথ। তাঁরা পরিষ্কার জানিয়ে গেছেন, কিছুই করার নেই তাঁদের। স্বয়ং চরক এসে নিজের হাতে ওষুধ খাইয়ে গেলেও মহেশ্বরীর শরীরে সার আর তৈরি হবে না। ভেতরের সমস্ত কিছু ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

বৈদরা দু'বছর আগে জবাব দিয়ে গেলে কী হবে, মহেশ্বরীর পরমাত্মা তাঁর রুগ্‌ণ পঙ্গু শরীর ছেড়ে যেতে একেবারেই অনিচ্ছুক। তবু মৃত্যু এসে মাঝেমাঝেই দরজায় টোকা দেয়। ফলে গত দু'বছরে চার-চার বার কাশীতে গঙ্গাযাত্রা করতে পাঠানো হয়েছে মহেশ্বরীকে।

মিশ্রদের পরিবারে কয়েক জেনারেশন ধরে এই গঙ্গাযাত্রার প্রথাটা চলে আসছে। গঙ্গার পাশে কারুর মৃত্যু ঘটলে মোক্ষলাভ নাকি অবধারিত। বিশেষ করে কাশীতে মারা গেলে তো কথাই নেই। ওখানকার আকাশে 'পুণ' (পুণ্য), বাতাসে 'পুণ', প্রতিটি ধুলোর দানায় 'পুণ'। স্বয়ং গঙ্গাজিও পাশ দিয়ে নিরবধি বয়ে চলেছেন। আর আছেন স্বয়ং বিশ্বনাথ। ওখানে স্বর্গের অগুনতি স্পেশাল গাইড থিক থিক করছে। আবহমান কাল ধরে তারা দিবারাত্রি শিরদাঁড়া টান টান করে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেহ থেকে আত্মাটি খসবার সঙ্গে সঙ্গে খপ করে সেটিকে ধরে তারা সোনার কৌটোয় পুরে সোজা বিষ্ণুলোকে বা শৈবলোকে নিয়ে যায়। এরপর আর পুনর্জন্ম নেই, অনন্ত মোক্ষ।

মুকুটনাথের ঠাকুরদার বাবা চতুরনাথ ছিলেন খুবই দূরদর্শী এবং বিবেচক। নিজের এবং স্ত্রীর জন্য তো বটেই, তাঁর পরবর্তী জেনারেশনের বংশধরদের পুণ্যসঞ্চয় ও মোক্ষলাভের জন্য স্থায়ী বন্দোবস্ত করে গেছেন। আশি বছর আগে এই সেঞ্চুরির একেবারে গোড়ায় কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের পাশে শ্মশানের কাছাকাছি একটা দোতলা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে পুরুষানুক্রমে কাশীরই একটি ব্রাহ্মণ পরিবার কেয়ারটেকার হিসেবে বাড়িটা দেখাশোনা করে আসছে। ধরমপুরা থেকে মিশ্ররা প্রতি মাসে নিয়মিত মাইনে পাঠিয়ে যান। পরকাল এবং মোক্ষের জন্য এই খরচটুকু কিছুই না।

চতুরনাথের পর মিশ্র বংশের কারুর মৃত্যু ঘনিয়ে এলেই তাকে কুলগুরু বা তাঁর কোনো প্রতিনিধি, ভজন গাইয়ের একটি দল এবং নৌকর নৌকরনী সঙ্গে দিয়ে কাশীতে গঙ্গাযাত্রা করতে পাঠানো হচ্ছে।

আগে গঙ্গাযাত্রার জন্য সারা ভারত থেকে প্রচুর লোক কাশী যেত। কিন্তু ইদানীং ব্রাহ্মণের ছেলে গোমাংস খেয়ে, উচ্চবর্ণের কায়াথের মেয়ে মুচির গলায় মালা দিয়ে যখন পবিত্র হিন্দুধর্মের ভিত আলগা করে দিচ্ছে, তখনও মৃত্যুর ওপারের পরকালের জন্য ভিড় খুব কম হয় না। এদের জন্য বড় বিজনেসম্যান আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা ক'টা 'গঙ্গালাভ' ভবন বানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু গঙ্গাযাত্রার ব্যাপারে মিশ্রদের মতো প্রায় এক সেঞ্চুরি ধরে এমন নিষ্ঠা এবং গোঁ গোটা দেশের আর কোনো পরিবারে আছে কিনা, বলা মুশকিল।

গত দু'বছরে চার বার মহেশ্বরীকে কাশীতে রেখে আসা হয়েছে কিন্তু ওখানকার আবহাওয়ায় এমন কিছু আছে যাতে মহেশ্বরীর নির্জীব শরীর এবং ঘুণে-খাওয়া হৃৎপিণ্ড চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। তাঁর দেহান্ত কোনোভাবেই আর ঘটে ওঠেনি। শৈবলোক আর বিষ্ণুলোকেব দূতেরা বৃথাই তাঁর আত্মাটির জন্য সোনার কৌটো হাতে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত চার-চার বার হতাশ হয়ে অন্য কারুর আত্মার খোঁজে চলে গেছে। আর মহেশ্বরীকে ধরমপুরায় ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। তাঁর কপালে কাশীতে মৃত্যু নেই। তাই ধরমপুরায় 'মিশ্র নিকেত'-এই একটি কাশী বানানো হয়েছে।

বশিষ্ঠনারায়ণের নির্দেশে নৌকররা খাটিয়াসুদ্ধ মহেশ্বরীকে শিবমন্দিরের সামনে নামায়। মৃত্যু না ঘটলেও নড়াচড়ার শক্তি নেই মহেশ্বরীর। খাটিয়ায় শুয়ে শুয়েই তিনি কুলগুরুকে বলেন, 'কিরপা করে আপনি একটু কাছে আসুন গুরুদেও—'

বশিষ্ঠনারায়ণ নিচে নেমে আসার ফাঁকে হাতজোড় করে শিবের মূরতকে প্রণাম করেন মহেশ্বরী। তারপর বশিষ্ঠনারায়ণকে বলেন, 'বয়েস আর বুখার আমাকে মেরে রেখেছে। উঠতে পারি না। আপনার চরণকা ধূল কী করে যে নিই?'

বশিষ্ঠনারায়ণ উত্তর দেবার আগেই রেবতী এত বড় সমস্যাটার সন্তোষজনক সমাধান করে দেন। নিজের হাতে কুলগুরুর পা থেকে কয়েক দানা ধুলো তুলে নিয়ে মহেশ্বরীর মাথায় ঠেকান। চোখ বুজে হাতজোড় করে পরম ভক্তিভরে বিড় বিড় করে মহেশ্বরী বলেন, 'জয় গুরুদেও, জয় গুরুদেও—'

বশিষ্ঠনারায়ণের চোখেমুখে তৃপ্তি এবং সুখের স্বর্গীয় একটি হাসি ফুটে ওঠে। এই বিষাক্ত কলিযুগে অবিশ্বাসী এবং নাস্তিকে যখন দেশ ভরে গেছে তখন এরকম একনিষ্ঠ ভক্তিমতী শিষ্য পাওয়া কম কথা নয়।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'বনারস ধাম থেকে অনেক কষ্ট করে এসেছে মহেশ্বরী। শবীরের ওপর বহুত ধকল গেছে। ওকে আর এখানে রেখ না। খাটিয়া উঠিয়ে ঘরে নিয়ে যাও।'

নৌকরেরা আবার খাটিয়া কাঁধে তোলে। তারপর বাঁ দিকে ঘুরে শ্বেত পাথরের চওড়া সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠে। শোভাযাত্রাটি খাটিয়ার পেছন পেছন চলতেই থাকে। কিরণও তাদেব সঙ্গে অসীম দুশ্চিন্তা নিয়ে এগিয়ে যায়।

মহেশ্বরী যখন সুস্থ এবং সবল ছিলেন, চলাফেরার শক্তি যখন তাঁর অটুট ছিল সেই সময় তিনি থাকতেন দোতলায়। কিন্তু এবার তাঁর থাকাব ব্যবস্থা হয়েছে একতলায়। এমন একটি আলো-হাওয়াওলা প্রকাণ্ড ঘর তাঁর জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে, যেখানে শুয়ে শুয়েই শিয়রের দিকের জানালা দিয়ে শিবমন্দিব এবং বিবাট বাঁধানো চৌবাচ্চায় নকল গঙ্গা দেখা যায়। অর্থাৎ মিনিয়েচার বেনারসটি তাঁর চোখের সামনেই থাকবে।

ঘরের একধাবে জানালার ধার ঘেঁষে পুরনো আমলের মডেলে মেহগনি কাঠের বিশাল খাট। তা ছাড়া আলমাবি, চেয়ার টেয়ার এবং ছোট টেবিলও রয়েছে। সিলিং থেকে দুই ব্লেড-ওলা পাখা ঝুলছে।

নৌকরেরা খাটিয়াটিকে বড় খাটের পাশে এনে নামায়। মুকুটনাথের নির্দেশে এবং তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সন্তর্পণে আর যত্নে মহেশ্বরীকে খাটে শুইয়ে দেওয়া হয়।

মুকুটনাথ নৌকরদের চলে যেতে বলেন। তারা চলে গেলে ঘরে থাকেন রেবতী, মুকুটনাথ, হেমগিরি, সুষমা, কিরণ, বৈদ চন্দ্রকান্ত ঝা এবং খুবলাল। আর থাকে মহেশ্বরীর খাস নৌকরনী কুঁদরী।

মুকুটনাথ মহেশ্বরীর উদ্দেশে বলেন, 'শরীব কেমন লাগছে মা? কুছ তখলিফ?'

মহেশ্বরী বলেন, 'না, আমি ঠিক আছি।'

তবু মুকুটনাথ চন্দ্রকান্তকে বলেন, 'মাকে একবার পরীক্‌ষা (পরীক্ষা) করে দেখুন----'

চন্দ্রকান্ত মহেশ্বরীব লিকলিকে একটি হাত তুলে নিয়ে নাড়িটি দেখেন, তারপর বলেন, 'না, ঠিক আছে। চিন্তাকা কুছ নেহী।'

মুকুটনাথ বলেন, 'তা হলে এখন আপনি বাড়ি চলে যান। ট্রেনে রাত জেগে এসেছেন। এখন বিশ্রাম দরকার। রোজ সকালে একবার করে মাকে দেখে যাবেন।'

'হাঁ।'

'মাকে নিয়ে আপাতত দুর্ভাবনা নেই তো?'

'নেহী। বিশ্বনাথজির কৃপায় এখনও তিন চার সাল উনি আমাদের মধ্যে থাকবেন।'

চন্দ্রকান্ত চলে যান। খুবলালের সঙ্গে দু-একটি কথা বলে তাকেও বিদায় করেন মুকুটনাথ। বলেন, 'কাল সুবে একবার এস। জরুরি কথা আছে।'

এরপর হেমগিরিকে বিশ্রামের জন্য সুষমার সঙ্গে একতলারই অন্য একটি ঘরে পাঠিয়ে দেন মুকুটনাথ। কুলগুরু এবং তাঁর বংশের লোকজনদের জন্য একতলায় থাকার চমৎকার বন্দোবস্ত করা আছে। এটা মুকুটনাথ করেননি, তিন পুরুষ আগে চতুরনাথই করে গেছেন।

এখন এ ঘরে মুকুটনাথ, রেবতী, কিরণ, মহেশ্বরী এবং কুঁদরী ছাড়া আর কেউ নেই। কুঁদরী ত্রিশ পঁয়ত্রিশ সাল ধরে মহেশ্বরীর সেবা করে আসছে। সে খুবই বিশ্বাসী। তিন কুলে তার কেউ নেই। সে 'মিশ্র নিকেত'-এর একজন হয়ে গেছে। এ কোঠির গৌরব তার নিজের গৌরব, এই বংশের লজ্জা তার লজ্জা।

কিরণকে কাছে ডেকে খাটের একধারে নিজের পাশে বসতে বলেন মহেশ্বরী। নিজের ইচ্ছায় না, যন্ত্রচালিতের মতোই যেন কিরণ বসে পড়ে। সে টের পায়, তার হৃৎপিণ্ডে যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো কিছু একটা ঘটে চলেছে। মনে হয়, বিস্ফোরণটা এখনই ঘটে যাবে।

কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো মাংসহীন গাঁটপাকানো হাতটা কিরণের কাঁধে রেখে সস্নেহে বলেন, 'তুই বিলকুল মেমসাহেব বনে গেছিস। দিল্লিতে ভাল ছিলি তো?'

কিরণ আস্তে করে বলে, 'হাঁ দাদী---'

'শুনলাম আজই তোকে খুবলাল নিয়ে এসেছে।'

'হাঁ।'

'কখন এসেছিস?'

কিরণ জানিয়ে দেয়।

একটু চুপচাপ।

তারপর মহেশ্বরী বলেন, 'তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

মুকুটনাথ কি মহেশ্বরীকে কিছু বলেছেন? কী বলতে পারেন তিনি? সেটা ঠিক আন্দাজ করা যাচ্ছে না। কিরণের হৃৎপিণ্ডের উত্থান পতন পলকের জন্য থমকে যায়, পরক্ষণে প্রবল বেগে সেটা লাফাতে থাকে। দ্রুত একবার মা এবং বাবার মুখের দিকে তাকায় কিরণ। মুকুটনাথ এবং রেবতীর কাঠিন্য অটুট রয়েছে। সেখানে কোমলতার এতটুকু আভাস নেই। চোখ ফিরিয়ে আবার সে মহেশ্বরীর দিকে তাকায়। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

'পরে শুনিস। এই সবে এলাম, তুইও আজই দিল্লি থেকে এসেছিস। তাড়ার কী?' বলে হাসেন মহেশ্বরী।

কিরণ আর কোনো প্রশ্ন করে না। তবে তার মনে হয়, পেটের ভ্রূণটার কথা এখনও বাড়ির কেউ জানে না। জানলে তার প্রতিক্রিয়া অন্যরকম হত।

কিন্তু কী কারণে হঠাৎ তাকে দিল্লি থেকে আনা হল, সেটাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। অসীম উদ্বেগে কিরণের মস্তিষ্কের ভেতরটা যেন ফেটে যেতে থাকে। যতক্ষণ না মা বাবা বা মহেশ্বরী কিছু বলছেন, উৎকণ্ঠা কাটবে না।

পাঁচ

কিরণকে দিল্লি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে দু'দিন আগে। সে আসার পর আটচল্লিশটি ঘণ্টা একরকম নির্বিঘ্নেই কেটে গেছে বলা যায়। বিস্ফোরণ এখন পর্যন্ত কিছুই ঘটেনি, যদিও কিরণের ধারণা যে কোনো মুহূর্তেই মারাত্মক কিছু ঘটে যাবে। এক একটি মিনিট কাটছে আর কিরণের স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি হচ্ছে। ভাল করে সে খেতে পারছে না, ঘুমোতে পারছে না। সর্বক্ষণ প্রচণ্ড অস্বস্তি এবং টেনসনে তার হৃৎপিণ্ড ফেটে যেন চৌচির হয়ে যাবে। এর চেয়ে মুকুটনাথ মহেশ্বরী বা রেবতী যদি কিছু বলতেন, সে তার স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে ফেলতে পারত। প্রবল মানসিক চাপ নিয়ে সময় কাটানো যে কতটা কষ্টকর, প্রতি মুহূর্তে কিরণ টের পাচ্ছে।

এই দু'দিন বেশির ভাগ সময়টাই নিজের ঘরে কাটিয়ে দিয়েছে কিরণ। জানালার পাশে বা সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ, পাখি, দূরের হাইওয়ে, ধরমপুরা টাউনের নানা দৃশ্য অথবা আরো দূরের ফাঁকা শস্যক্ষেত্র দেখতে দেখতে বার বার প্রভাকরের মুখ যেন কোনো অদৃশ্য টিভি'র পর্দায় ফুটে উঠেছে। দিল্লিতে থাকতে শেষের দিকে রোজই প্রভাকরের সঙ্গে দেখা হত। এটা একটা নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই দু'দিনেই মনে হচ্ছে, যেন কত বছর কি কত যুগ সে তাকে দেখেনি।

এই আটচল্লিশ ঘণ্টায় রেবতী বা মুকুটনাথ একবারও তার ঘরে আসেনি। তবে সুষ্মা বারকয়েক দরজার সামনে এসে মুখ বাঁকিয়ে এমনভাবে তাকিয়েছে যাতে তার চোখ থেকে অসীম ঘৃণা ঈর্ষা এবং রাগ ফেটে বেরিয়ে এসেছে। জ্ঞান হবার পর থেকেই এই মেয়েটা তাকে ঈর্ষা করে আসছে। তার সঙ্গে সুষ্মার আজন্মের শত্রুতা। কিরণ যেন তাকে তার সমস্ত ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে অনবরত বঞ্চিত করে চলেছে।

সুষ্মা কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়েই চলে গেছে, একটি কথাও বলেনি। একমাত্র মহেশ্বরী একবার করে তাকে নিচে ডাকিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত সদয়। কিরণকে কাছে বসিয়ে তার গালে মাথায় এবং পিঠে সস্নেহে শাঁসহীন কঙ্কালসার আঙুল বুলোতে বুলোতে দিল্লির কথা, হস্টেলের বন্ধুবান্ধব বা অধ্যাপিকাদের কথা জিজ্ঞেস করেছেন। কিন্তু যা শোনার জন্য আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে সে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে তার ধারকাছ দিয়েও যাননি। অনাবশ্যক মধুর কথাবার্তাতেই সময় কাটিয়ে দিয়েছেন।

ঠাকুমার ঘরেই অবশ্য রেবতী বশিষ্ঠনারায়ণ বা মুকুটনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কুলগুরু ছাড়া বাবা-মা ক্বচিৎ দু-একটি কথা বলেছেন। যা বলেছেন তা থেকে আদৌ আঁচ পাওয়া যায়নি, আচমকা কেন, কোন উদ্দেশ্যে কিরণকে তাঁরা ধরমপুরায় নিয়ে এসেছেন।

দুটো দিন মারাত্মক অনিশ্চয়তা এবং টেনসনে কাটাবার পর কিরণ মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, আর অপেক্ষা করবে না। সরাসরি মুকুটনাথকে জিজ্ঞেস করবে, কেন তোমরা কৌশলে, চতুর চাল চেলে এখানে ধরে এনেছ?

কিরণ জানে, এই প্রশ্নটা কবার সঙ্গে সঙ্গে মুকুটনাথ রাগে এবং উত্তেজনায় ফেটে পড়বেন। 'মিশ্র নিকেত'-এর তিনি একমাত্র ডিকটেটর। তাঁর মুখের ওপর এ পর্যন্ত কেউ কখনও কথা বলেনি, তাঁর কাজের প্রতিবাদ কেউ করেনি। এ বাড়িতে একটা অলিখিত নিয়ম আবহমান কাল চালু রয়েছে। সেটা এইরকম—'মিশ্র নিকেত'-এর প্রধান পুরুষটি যা বলবে যা করবে তাতে নিঃশর্ত সায় দিতে হবে মেয়েদের। পুরুষানুক্রমে মেয়েরা এখানে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে।

কিন্তু কিরণ কিছুতেই তা করবে না। এর ফলাফল যা-ই হোক না, কনফ্রনটেশন বা মুখোমুখি সংঘাতের জন্য এই আটচল্লিশ ঘণ্টায় নিজেকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে নিয়েছে সে।

তা ছাড়া এখানে থাকার আর উপায় নেই। দিল্লিতে তার প্রচুর কাজ। পরীক্ষাও এসে যাচ্ছে। কিন্তু এখান থেকে ফিরে যাওয়ার যে কারণটা সবচেয়ে প্রবল তা হল পেটের সেই ভ্রূণটি। প্রতিদিন সেটা একটু একটু করে বড় হচ্ছে। এক-আধ মাসের ভেতর কিরণের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যাবে, সে ...তী।

তাড়াহুড়ো করে চলে আসার জন্য প্রভাকরের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে আসতে পারেনি কিরণ। তাকে একটা চিঠি লেখা খুবই দরকার। তার থেকেও যেটা বেশি জরুরি তা হল দিল্লিতে ফিরে যাওয়া।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আজ প্রভাকরকে চিঠি লিখতে বসেছে কিরণ। জানালা দিয়ে আকাশের একটা চৌকো টুকরো চোখে পড়ে। সেখানে ফাল্গুনের ঝলমলে রোদ আর ঝাঁকে ঝাঁকে পরদেশি 'শুগা'। এই বুনো টিয়ারা অঘ্রাণ পৌষে ধান পাকতে না পাকতেই দিগন্ত পেরিয়ে কোত্থেকে যেন ধরমপুরার চারপাশের শস্যক্ষেত্রগুলোতে চলে আসে। মাঠ থেকে ধান উঠে যাবার পরও কিছুদিন তারা এখানে থেকে যায়। তারপর শীতের দাপট কমে এলে ফাল্গুনের শেষাশেষি থেকে আবার ফিরে যেতে থাকে।

আকাশ, ফাল্গুনের অঢেল রোদ বা বুনো টিয়ার ঝাঁক, কোনো দিকেই লক্ষ্য ছিল না কিরণের। সে বিছানায় বসেই প্যাডের কাগজে চিঠি লিখে চলেছে, কিন্তু দু-তিনটে লাইন লিখতে না লিখতেই দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় সুষমা। ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ কুটিল চোখে কিছুক্ষণ কিরণকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তারপর ডাকে, 'এই যে মেমসাব—'

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় কিরণ। সুষমাকে এই মুহূর্তে সে এখানে আশা করেনি। মনে মনে নিজের এই ছোট বোনটিকে ভয় করে কিরণ, তাকে দেখলেই এক ধরনের অস্বস্তিতে তার ভেতরটা ভরে যায়।

কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবি?'

সুষমা বলে, 'নিচে দাদীর কামরায় তোকে ডাকছে—'

এ বাড়িতে আট দশটা নৌকর নৌকরনী থাকতে সুষমা নিজে কেন এই খবরটা দিতে এসেছে তা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। নিশ্চয়ই মহেশ্বরীর ঘরে আজ এমন কিছু ঘটবে যার ফলাফল কিরণের পক্ষে একেবারেই ভাল নয়। কিরণের লাঞ্ছনায় যে সব চেয়ে সুখী হয় সে সুষমা। সেই কারণেই সে এখানে ছুটে এসেছে।

কিরণ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'দাদীর ঘরে আমাকে কে যেতে বলেছে?'

সুষমা বলে, 'গেলেই দেখতে পাবি।'

একটু চিন্তা করে কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'কেন ডেকেছে জানিস?'

'জানি।' সংক্ষিপ্ত জবাবটুকু দিয়েই চুপ করে যায় সুষমা।

'কেন?'

'বলব না। দের নেহী করনা মেমসাব। পাঁচ মিনিটের বেশি দেরি করলে বাবুজি এসে চুলের ঝুঁটি ধরে তোকে নিয়ে যাবে।' বলে আর একটি মুহূর্তও দাঁড়ায় না সুষমা, দরজার কাছ থেকে একতলার সিঁড়ির দিকে চলে যায়।

এটুকু জানা গেল, মহেশ্বরীর ঘরে মুকুটনাথ আছেন। আর কে কে আছে, অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। যে-ই থাক, মনে হচ্ছে কনফ্রনটেশনটা আজই হয়ে যাবে।

সুষমা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওঠে না কিরণ। মনে মনে রণকৌশলটা স্থির করে নেয়। তারপর আস্তে আস্তে প্যাড এবং কলমটা বিছানাতেই নামিয়ে রেখে সে ঘরের বাইরে চলে আসে। সিঁড়ি দিয়ে একতলায় এসে মহেশ্বরীর ঘরের দিকে যেতে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি সময়ই নেয়। মহেশ্বরী মুকুটনাথ রেবতী এবং কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে। খানিকটা দূরে বারান্দার এক ধারে সুষমা দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই তাকে মহেশ্বরীর ঘরে যেতে বারণ করা হয়েছে। চোখাচোখি হতেই হিংস্র ভঙ্গিতে সে কিরণের দিকে তাকায়, তবে কিছু বলে না।

সুষমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কিরণ মহেশ্বরীর ঘরের ভেতর চলে আসে। বশিষ্ঠনারায়ণকে বাদ দিলে বাকি তিনজনের মুখ থমথমে, গম্ভীর। সে টের পায়, বিস্ফোরণটা আজ ঘটতে চলেছে।

কিরণ ঢুকতেই বশিষ্ঠনারায়ণ সস্নেহে, কোমল স্বরে বলেন, 'আও বেটি, ইঁহা বৈঠো—' মহেশ্বরীর সুবিশাল খাটের একটি কোণ দেখিয়ে দেন তিনি।

খাটের আরেক ধারে রেবতী বসে আছেন। একটু দূরে দু'টি চেয়ারে বসেছেন বশিষ্ঠনারায়ণ এবং মুকুটনাথ। কিরণ খাটের ধারে বসতেই মুকুটনাথ উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসেন। কিরণ

বুঝতে পারে, এই ঘরে যে উদ্দেশ্যে তাকে ডেকে আনা হয়েছে সেটা বাইরে জানাজানি হোক, তা কেউ চান না।

স্নায়ুগুলো টান টান করে এক পলক সবাইকে লক্ষ করে কিরণ, তারপর অপেক্ষা করতে থাকে।

বশিষ্ঠনারায়ণকে খুব ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে কিরণ। কোনো কারণেই তিনি উত্তেজিত হন না। পার্থিব সব ব্যাপারেই তাঁর অসীম ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা। সর্বক্ষণ তাঁর মুখে স্বর্গীয় মধুর হাসির কোটিং লাগানো। হাত-পা বা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই হাসিটি তাঁর জন্মসূত্রেই যেন পাওয়া।

প্রথম দু'তিন মিনিট কেউ একটি কথাও বলেন না। 'মিশ্র নিকেত'-এর এই বিশাল ঘরটিতে অপার নৈঃশব্দ নেমে আসে যেন। সমস্ত আবহাওয়াটাই অত্যন্ত অস্বস্তিকর।

একসময় মুকুটনাথ এভাবে শুরু করেন, 'তোর কলেজ থেকে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে।'

পলকের জন্য কিরণের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড জমাট বেঁধে যায়। তারপর প্রচণ্ড জোরে ধক ধক করতে থাকে। মনে হয়, কয়েক শ তেজী ঘোড়া সেখানে ছুটে চলেছে।

কিরণ উত্তর দেয় না। সে বুঝতে পারে চিঠিটা লিখেছেন তার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কী লিখেছেন তিনি? নিশ্চয়ই এমন কিছু মারাত্মক ইঙ্গিত দিয়েছেন যাতে মুকুটনাথ খুবলালকে দিল্লি পাঠিয়ে তাকে ধরমপুরায় নিয়ে এসেছেন। যতই বেপরোয়া হওয়ার চেষ্টা করুক কিরণ কিংবা মনে মনে রণকৌশল ঠিক করে রাখুক, সে টের পায়, শ্বাস আটকে আসছে।

মুকুটনাথ ফের বলেন, 'চিঠিতে কী লিখেছে তুই জানিস?'

কিরণ নিচু গলায় বলে, 'না।'

হঠাৎ ডান হাতটা কিরণের দিকে তুলে তর্জনী নাচাতে নাচাতে মুকুটনাথ কর্কশ গলায় বলে ওঠেন, 'মিশ্র বংশকে তুই নরকে নামিয়ে এনেছিস।'

তবে কি পেটের সেই ভ্রূণটার কথা জানিয়ে দিয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল? কিন্তু প্রভাকর এবং সে ছাড়া এই পৃথিবীর আর কারুর পক্ষেই সেটা জানা সম্ভব নয়। তা হলে?

ক্ষীণ গলায় কিরণ বলে, 'তুমি কী বলছ, বুঝতে পারছি না।'

স্বয়ংক্রিয় অদৃশ্য কোনো স্প্রিংয়ের ধাক্কায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান মুকুটনাথ। প্রচণ্ড রক্তচাপে তাঁর দুই চোখ যেন ফেটে যাবে। আরক্ত দৃষ্টিতে কিরণকে দেখতে দেখতে তিনি চিৎকার করে ওঠেন, 'বুঝতে পারছিস না?'

যে সাহসটুকু একটু আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা এবার ফিরে আসে কিরণের মধ্যে। এমনিতে মুকুটনাথের মস্তিষ্ক খুবই ঠাণ্ডা, তার ধাতে অসহিষ্ণুতা বলতে কিছু নেই। কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের চিঠিতে বিস্ফোরণের এমন কিছু উপকরণ রয়েছে যাতে তাঁর সংযম বা ধৈর্য পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

রেবতী পারতপক্ষে সংসারের কোনো ব্যাপারে থাকেন না। 'মিশ্র নিকেত'-এ তাঁর ভূমিকা অনেকটা দর্শকের মতো। তিনি শুধু দেখেই যান, কখনও মন্তব্য করেন না। কিন্তু এবার বাড়ি আসার পর থেকেই কিরণ লক্ষ করেছে, মায়ের মুখ সারাক্ষণ পাথরের মতো শক্ত। কিরণের কাছ থেকে নিজেকে তিনি গুটিয়ে নিয়েছেন। তবে এ দু'দিন তাকে কিছুই বলেননি।

এই মুহূর্তে তাঁর চিরকালের শান্ত নির্লিপ্ত স্বভাবটির কথা বুঝিবা ভুলেই গেলেন রেবতী। তীব্র, চড়া গলায় বলে উঠলেন, 'তুই আমাদের সবার মুখে চুনকালি লাগিয়ে দিয়েছিস। এই বংশে যা কোনোদিন ঘটেনি, তুই তাই করে বসলি!'

মায়ের এরকম উগ্র ভয়ঙ্কর চেহারা আগে কখনও দেখেনি কিরণ। উত্তেজিত হতে গিয়েও নিজেকে দ্রুত সামলে নেয় সে। শান্ত মুখে বলে, 'তোমরা এভাবে বলছ কেন? আমি অন্যায় কিছু করিনি।'

আরক্ত চোখে তাকিয়ে ছিলেন মুকুটনাথ। কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে তিনি চেঁচাতে থাকেন, 'বশরম লেড়কী, বংশের নাম ডুবিয়ে আবার সাফাই গাইছে। কিছু করিনি! তোকে আমি মাটিতে পুঁতে ফেলে দেব। এমন লেড়কীর দরকার নেই আমার।'

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে কী হবে, মুকুটনাথ যেভাবে চিৎকার করছেন তাতে আধ মাইল দূরের লোকও প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাবে।

এবার হাত তুলে বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'শান্ত হো যাও মুকুটনাথ। এত উত্তেজনা তোমার শরীরের পক্ষে ভাল না—বহোত বুরা। যা বলার আস্তে আস্তে বল। বিপদের সময় মাথা ঠিক রাখতে হয়।'

কুলগুরুর কথায় কিছুটা কাজ হয়। গজ গজ করতে করতে আবার বসে পড়েন মুকুটনাথ।

বিছানার সঙ্গে প্রায় লেপটে মহেশ্বরীর কঙ্কালসার শরীর পড়ে আছে। এতক্ষণ চুপচাপ শুয়েই ছিলেন তিনি। এবার ছেলের দিকে তাকিয়ে তীব্র শ্লেষের গলায় বলে উঠলেন, 'বানা, মেয়েকে মেমসাব বানা। যখনই মেয়েকে দিল্লি পাঠালি তখনই জানি এরকম কিছু একটা ঘটবে। পাঠাতে বারণ করেছিলাম, কিন্তু তোরা আমার কথা কানে তুললি না।'

সেই সাত আট বছর বয়সে দিল্লির কনভেন্টে নিয়ে গিয়ে যখন তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয় সেই সময় আদৌ এ জাতীয় কথা মহেশ্বরী বলেছিলেন কিনা, কিরণ মনে করতে পারে না। সে চোখের কোণ দিয়ে একবার ঠাকুমাকে দেখে নেয়।

আগের তুলনায় গলা অনেকটা নামিয়ে মুকুটনাথ বলেন, 'হাঁ, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর নয়।' বলেই সোজাসুজি কিরণের চোখের দিকে তাকান, 'প্রভাকর কে?'

সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু একটা খেলে যায় কিরণের। সে বুঝতে পারে, এতক্ষণ যা চলছিল সেটা ভূমিকা মাত্র। এবার আসল যুদ্ধটা শুরু হবে।

এত আকস্মিকভাবে মুকুটনাথ প্রশ্নটা করেছেন যে এর জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না কিরণ। কী উত্তর দেবে যখন সে ভাবছে সেই সময় রুক্ষ ভঙ্গিতে আবার মুকুটনাথ বলেন, 'চুপ করে রইলি কেন? বল—'

কিরণ বুঝতে পারে, প্রিন্সিপ্যাল নিশ্চয়ই প্রভাকরের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। উত্তেজনাশূন্য মুখে বলে, 'একজন প্রফেসর।'

'তোদের কলেজের?'

'না। আমাদের কলেজের সবাই মহিলা প্রফেসর।'

'তবে?'

'অন্য কলেজের।'

'তার সঙ্গে তুই দিল্লির বস্তিতে আর চারপাশের গাঁওগুলোতে ঘুরে বেড়াস?'

'হাঁ।'

'কেন?'

'আমরা সোশাল ওয়ার্ক করি।'

'সেটা কী?'

কী ধরনের কাজ তাদের অর্গানাইজেশন করে থাকে সেটা সংক্ষেপে জানিয়ে দেয় কিরণ।

দাঁতে দাঁত চেপে মুকুটনাথ বলেন, 'আমি কি তোকে সোশাল ওয়ার্কার হওয়ার জন্যে দিল্লি পাঠিয়েছিলাম?'

কিরণ উত্তর দেয় না।

মুকুটনাথ কিন্তু কিরণকে ছাড়েন না। তীক্ষ্ণ গলায় বলেন, 'মুখ বুজে আছিস কেন? বাতা, বাতা। আভী, রাইট নাউ।'

কিরণ বলে, 'না। তুমি আমাকে মেমসাহেব বানাবার জন্যে পাঠিয়েছিলে। কিন্তু—'

'কী?'

'প্রভাকরের সঙ্গে মেশার পর আমার মনে হয়েছে সোসাইটির ব্যাপারে আমার কিছু দায়িত্ব আছে।'

কিরণের কাছ থেকে এ জাতীয় উত্তর কেউ আশা করেননি। মহেশ্বরীর এই একতলার ঘরটায় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধতা নেমে আসে। তারপরেই বিস্ফোরণ ঘটে যায়। প্রবল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ান মুকুটনাথ। চিৎকার করে বলেন, 'বহুৎ বড়ী রেসপনসিবিলিটিবালী আয়ী হ্যায়! সোসাইটির দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে তোকে দিল্লি পাঠানো হয়েছিল? এর জন্যে পলিটিসিয়ানরা আছে, সোশাল ওয়ার্কাররা আছে।'

মুকুটনাথের এই প্রতিক্রিয়ার জন্য কিরণ মনে মনে প্রস্তুতই ছিল। সে সাহস হারায় না। এতকাল 'মিশ্র নিকেত'-এর মেয়েদের আলাদা কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাদের আচার আচরণ, চলাফেরা, রাহান সাহান, সব কিছুই এই বংশের পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু দিল্লিতে কয়েক বছর কাটানোর পর, বিশেষ করে প্রভাকরের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে কিরণ আগাগোড়া পালটে গেছে। 'মিশ্র নিকেত'-এর বৈশিষ্ট্যহীন, অতি সাদামাঠা, ভীরু একটি মেয়েকে আর তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে এখন এক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তরুণী, দিল্লি এ ক'বছরে একটু একটু করে তাকে শাণিত করে তুলেছে।

খুব শান্ত গলায় কিরণ বলে, 'সোসাইটির কাজ করার দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের। এর জন্যে পলিটিসিয়ান বা সোশাল ওয়ার্কার হওয়ার দরকার নেই।'

শরীরের সব রক্ত লাফিয়ে মাথায় উঠে আসে মুকুটনাথের। গলার কাছের শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে যায়। প্রবল রক্তচাপে চোখ দুটো ফেটে যাবে যেন। মুকুটনাথ গলার স্বর আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে ফের আগের সেই প্রশ্নটা করেন, 'সোসাইটির দেখভাল করার জন্যে তোকে দিল্লি পাঠানো হয়েছিল?'

নিরুত্তেজ ভঙ্গিতে এবারও কিরণ বলে, 'না।'

কণ্ঠস্বর আগের পর্দায় রেখেই মুকুটনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'তবে কিসের জন্যে? হোয়াই?'

মুকুটনাথের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিরণ বলে, 'ভবিষ্যতে মন্ত্রী হতে পারে এমন একজন পলিটিসিয়ানের পুতহু হওয়ার জন্যে মেমসাহেব বানাতে। কিন্তু—'

রক্তাভ চোখে তাকিয়ে মুকুটনাথ প্রশ্ন করেন, 'কী?'

'দিল্লিতে গেলে সোসিয়েলাইটও হওয়া যায়, আবার মানুষের মতো মানুষ হতেও অসুবিধা নেই। ওখানে অনেক রাস্তা খোলা আছে। যার যেমন রুচি সে তেমন রাস্তা বেছে নেয়।'

'লেকচার দিতে হবে না। তোমাকে একটা রাস্তাই দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুসরা রাস্তা ঢুঁড়তে কেউ বলেনি।'

কিরণ কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ বলে ওঠেন, 'শান্ত্ হো যাও মুকুটনাথ, শান্ত্ হো কর বৈঠো। এত উত্তেজনা তোমার তবিয়তের পক্ষে আচ্ছা নেহী।'

খাটে শুয়ে এতক্ষণ বেশ ভয়ে ভয়েই সব শুনছিলেন মহেশ্বরী। এবার বলেন, 'হাঁ হাঁ, বৈঠ্ মুকুট, বৈঠ্।'

কুলগুরু এবং মায়ের সম্মান রাখতেই আস্তে আস্তে বসে পড়েন মুকুটনাথ। গলা নামিয়ে বলতে থাকেন, 'কত বড় সাহস, বাপের মুখের ওপর কথা বলছে! এমন লেড়কী মিশ্র বংশে আগে আর জন্মায়নি। বেশরম কাঁহীকা!'

বশিষ্ঠনারায়ণ মৃদু ধমকের গলায় বলেন, 'আ মুকুটনাথ, শির ঠাণ্ডা রাখ। ক্রোধ বহুৎ বুরা চীজ।'

মুকুটনাথ আর কিছু বলেন না, বিরক্ত চোখে কিরণকে একবার লক্ষ করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

বশিষ্ঠনারায়ণ এবার কিরণের দিকে ফিরে বলেন, 'বেটা, প্রভাকরের ঘর কোথায়?'

কিরণের স্নায়ুগলো সতর্ক হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে, বিরুদ্ধ পক্ষের উকিলদের মতো উলটোপালটা জেরা করে প্রভাকর সম্পর্কে অনেক খবর বার করে নিতে চেষ্টা করবেন বশিষ্ঠনারায়ণ। কিরণ বলে, 'মহারাষ্ট্রে।'

'দিল্লিতে কী করে সে?'

'বললাম তো, কলেজের প্রফেসর।'

'পণ্ডিত আদমী?'

'হাঁ।'

'উমর কত?'

'তিরিশের মতো।'

নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে যায় বশিষ্ঠনারায়ণের। বলেন, 'লেড়কা জোয়ান?'

তাঁর বলার ভঙ্গিতে গভীর একটা ইঙ্গিত ছিল, কিরণ উত্তর দেয় না।
বশিষ্ঠনারায়ণ একটু চিন্তা করে আবার বলেন, 'তুমি তো বললে প্রভাকরের সঙ্গে সমাজের সেবা করতে —'
'হাঁ।' মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয় কিরণ।
'কী ধরনের সেবা?'
দিল্লিতে তারা কী কী করত, আবেক বার জানিয়ে দেয় কিরণ।
বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'কাজটা ভালই। লেকেন পড়াশোনা বন্ধ করে এ সব করা ঠিক না।'
কিরণ বলে, 'পড়াশোনা বন্ধ করে আমি কিছুই করিনি। কলেজ ছুটির পর সোশাল ওয়ার্ক করতাম।'
কিছুক্ষণ চুপচাপ।
তারপর বশিষ্ঠনারায়ণ ফের এভাবে শুরু করেন, 'বেটা, তোমাদের প্রিন্সিপ্যাল লিখেছেন, তুমি নাকি সমাজের কাজ সেরে রোজই অনেক রাতে কলেজে ফিরতে।'
কিরণ চমকে ওঠে। প্রিন্সিপ্যাল রাত করে হস্টেলে ফেরা ছাড়া আর কিছু জানিয়েছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য তার এখনও ধারণা, পেটের ভ্রূণটার কথা সে এবং প্রভাকর ছাড়া আর কেউ জানে না। বাড়ির সবাই কতটা কী জানতে পেরেছে, এখনই বোঝা যাবে। এই মুহূর্তে অস্থির বা উত্তেজিত হলে সব গোলমাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। স্নায়ুগুলো টান টান করে কিরণ শান্ত, সংযত গলায় বলে, 'রোজ দেরি করে আসতাম না। দু-একদিন ফিরতে দেরি হয়েছে।'
'আচ্ছা বেটা—'
'বলুন—'
'প্রভাকরের কী জাত?'
বশিষ্ঠনারায়ণ দুম করে এরকম একটা প্রশ্ন করে বসবেন, কিরণের কাছে এটা ছিল অভাবনীয়। ভেতরে ভেতরে সে হকচকিয়ে যায়, তবে নিজের অস্থিরতা বাইরে ফুটে উঠতে দেয় না। জিজ্ঞেস করে, 'জাত দিয়ে কী হবে?'
বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'কিছুই হয়ত হবে না। জানার ইচ্ছা হল, তাই—'
প্রভাকরের জাতপাত সম্পর্কে প্রশ্ন করার পেছনে বশিষ্ঠনারাণের নিশ্চয়ই কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কিরণ মনস্থির করে ফেলে, সব কথার সোজাসুজি উত্তর দেবে। ক'দিন ধরে প্রবল স্নায়বিক চাপে তার মস্তিষ্ক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা আর কিছুদিন চললে সে পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়বে। সে চায়, ভালমন্দ যা ঘটার আজই ঘটে যাক। বেপরোয়া ভঙ্গিতে কিরণ এবার বলে, 'প্রভাকররা খ্রিস্টান। অচ্ছুৎ হিন্দু থেকে তিন পুরুষ আগে ওরা খ্রিস্টান হয়েছে।'
কিরণ ছাড়া বাকি চারটি মানুষের হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন একেবারে থেমে যায়। সারা ঘরটা মুহূর্তে বায়ুশূন্য হয়ে গেছে বুঝিবা। একই সঙ্গে যে যুবক খ্রিস্টান এবং অচ্ছুৎ, তার সঙ্গে পবিত্র মিশ্র বংশের একটি মেয়ে সোশাল ওয়ার্ক করতে বেরিয়ে অনেক রাতে হস্টেলে ফিরেছে—এমন মারাত্মক ঘটনাব কথা আগে এ বাড়ির কেউ কখনও কল্পনা করতে পারেনি।
স্তব্ধতা চুরমার করে গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে ওঠেন মুকুটনাথ, 'খ্রিস্টান, অচ্ছুৎ! তুই তার সঙ্গে সমাজ সেবা করতে যাস দিল্লিতে!'
এদিকে তীক্ষ্ণ সরু গলায় মড়াকান্না জুড়ে দেন মহেশ্বরী, 'হো ভগোয়ান শিউশঙ্কর, হো বিষুণজি, কিরণ এ কী বলছে!'
কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ, কোনো কারণেই যিনি বিচলিত হন না, হাত তুলে চতুর ডিপ্লোম্যাটদের মতো মহেশ্বরী এবং মুকুটনাথকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'এত হই চই করলে চলে! চারদিকে নৌকর নৌকরনীরা রয়েছে। তাদের কানে এসব গেলে পুরা ধরমপুরা টৌনে রটিয়ে বেড়াবে। তাতে মিশ্র বংশের সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে। আস্তে কথা বল মুকুটনাথ। মহেশ্বরী, রোনা উনা (কান্নাকাটি) বিলকুল বন্ধ।'
মহেশ্বরীর কান্নার আওয়াজ স্তিমিত হয়ে আসে। মুকুটনাথ গলা নামিয়ে গজ গজ করতে থাকেন,

'আপনিই বলুন গুরুজি, এ সব শোনার পর মাথা ঠিক রাখা যায়?'

'সমঝা মুকুটনাথ। লেকেন বিপদের সময় মাথা তো ঠিক রাখতেই হবে। ধৈর্য ধর, মন থেকে উত্তেজনা বার করে দাও। শিউশঙ্করজি সব সমস্যা মিটিয়ে দেবেন।'

মুকুটনাথ উত্তর দেন না, মুখ নামিয়ে চাপা গলায় গজরাতে থাকেন।

বশিষ্ঠনারায়ণ এবার কিরণকে বলেন, 'প্রভাকরের সঙ্গে তোমার এত মেলামেশা করা ঠিক হয়নি বেটা —'

কিরণ বলে, 'কেন, প্রভাকর অচ্ছুৎ আর ক্রিশ্চান বলে?'

'তা বলতে পার। তোমাদের এত বড়, মহান ব্রাহ্মণ বংশ! যার তার সঙ্গে মেলামেশা ঠিক না।'

'একটা কথা সবার মনে রাখা দরকার গুরুজি।'

'কী?'

'স্বাধীন ভারতে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ব্রাহ্মণ কায়াথ অচ্ছুৎ, সব সমান। কেউ উঁচাও না, নিচাও না।'

বশিষ্ঠনারায়ণ মধুর হেসে বলেন, 'তাই কখনও হতে পারে? ভগোয়ান করমফল অনুযায়ী কাউকে উঁচা, কাউকে নিচা করে পাঠিয়েছেন। জবরদস্তি করে সবাইকে বরাবর করা যাবে না। ভগোয়ানের কানুনের বাইরে যারা যেতে চায় তাদের মতলব হল সনাতন ধরমকে বিনাশ করা। লেকেন তা হতে দেওয়া যায় না।'

কিরণ বুঝতে পারে, হাজার হাজার বছরের প্রাচীন গোঁড়ামি আর সংস্কার বশিষ্ঠনারায়ণদের মতো কুলগুরু টাইপের শ্রেণীটির রক্তে ভাইরাসের মতো মিশে আছে। খুব সহজে সেগুলো থেকে তাদের মুক্ত করা যাবে না। মানুষের চেয়ে তাদের কাছে অনেক বড় হল জাতপাত এবং ছুঁৎমার্গের সওয়াল। আবহমান যা চলে আসছে, এদের ইচ্ছা তা-ই চলতে থাক। হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ব্রাহ্মণ কিংবা অচ্ছুৎ, সবাই উঁচু উঁচু বাউণ্ডারিওয়াল তুলে আলাদা আলাদা খোপের মধ্যে নিজেদের পুরে রাখুক। কোনোভাবেই যেন দেওয়াল ভেঙে একে অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেতে না পারে। স্থিতাবস্থায় চিড় ধরুক, এটা তাদের কাম্য নয়। পুরনো ভারতবর্ষের ধর্মান্ধতা আর সংস্কার থেকে এক পা-ও এরা সামনের দিকে এগুবে না। প্রাচীন ধ্যানধারণা নিয়ে এরা এ দেশকে মধ্যযুগের জীর্ণ কিংখাবে আটকে রাখতে চায়।

কিরণ কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বশিষ্ঠনারায়ণ ফের বলে ওঠেন, 'তোমার ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে বেটা—'

কিরণ হকচকিয়ে যায়, 'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না গুরুজি—'

'আমাদের ধারণা তুমি এমন কিছু করনি যাতে এত বড় মিশ্র বংশের সম্মান নষ্ট হয়।'

বশিষ্ঠনারায়ণের কথায় সূক্ষ্ম এবং চোরা কোনো ইঙ্গিত রয়েছে কী? কিছুক্ষণ সতর্ক চোখে তাকিয়ে তাঁকে লক্ষ করে কিরণ। তারপর বলে, 'আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী মনে হয় না এখন পর্যন্ত কোনোরকম অন্যায় করেছি।'

বশিষ্ঠনারায়ণ উদার হেসে বলেন, 'ঠিক বাত। এত বড় বংশের মেয়ে হয়ে বুরা গান্ধা কাম তোমার পক্ষে সম্ভব না।'

কিরণ চুপ করে থাকে।

বশিষ্ঠনারায়ণ আবার বলেন, 'তোমাকে একটা দরকারি কথা বলার জন্যে ডেকে আনা হয়েছে বেটা—'

কিরণ মুখ তুলে তাকায়, তবে এবারও কিছু বলে না। শুধু সতর্ক ভঙ্গিতে অপেক্ষা করতে থাকে।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'ত্রিকূটজি খুব অস্থির হয়ে উঠেছেন কিরণ বেটা—'

কথাটা এত আচমকা বশিষ্ঠনারায়ণ বলে ফেলেছেন যাতে কিরণের স্নায়ুতে রীতিমত ধাক্কা লাগে। তিনি ঠিক কী জানাতে চান, বুঝতে না পেরে সে জিজ্ঞেস করে, 'কোন ত্রিকূটজি?'

বশিষ্ঠনারায়ণ হাসেন। তাঁর হাসিটি একই সঙ্গে প্রাণখোলা এবং স্নিগ্ধ। তাঁর স্বভাব এবং মুখমণ্ডলের

এটি একটি বড় রকমের শোভা। কুলগুরুদের এ জাতীয় অ্যাসেট থাকা বোধহয়.অত্যন্ত জরুরি। মজার ভঙ্গিতে তিনি বলেন, 'কী আশ্চর্য, নিজের শ্বশুরের নাম ভুলে গেছ !'

ত্রিকূটজি অর্থাৎ ত্রিকূটনারায়ণ দুবে। বশিষ্ঠ পুরো নাম না বলায় প্রথমটা ধরতে পারেনি কিরণ। সে কিছু বলে না, চুপ করে থাকে।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'ত্রিকূটজির ইচ্ছা, এই মাসেই তোমাদের শাদিটা চুকিয়ে ফেলেন।'

হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন আবার কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় কিরণের। শিরদাঁড়ার ভেতর বরফের স্রোত নামতে থাকে। কাঁপা, আড়ষ্ট গলায় সে বলে, 'লেকেন—'

'কী বেটা?'

'দু'মাস পর আমার পরীক্ষা—'

'ঠিক হ্যায়। পরীক্ষা যখন হওয়ার তখন ঠিক হবে। দু'মাস অনেক সময়। তার মধ্যে শাদিটা হয়ে যাক।'

কিরণ ভয় পেয়ে যায়। একটি চতুর চালে তাকে বোকা বানিয়ে কী উদ্দেশ্যে ধরমপুরায় টেনে আনা হয়েছে, আগে ঘুণাক্ষরেও টের পেলে সে এখানে আসত না। তার মনে হয়, বাবা মা কুলগুরু ঠাকুমা এবং ত্রিকূটনারায়ণ—সবাই মিলে তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য এই ষড়যন্ত্রটি করেছেন। এখান থেকে যেভাবেই হোক, মাথা ঠাণ্ডা রেখে তাকে দিল্লি ফিরে যেতেই হবে। সে জন্য যেটা প্রয়োজন তা হল ধৈর্য এবং কৌশল। মা বাবা বা কুলগুরুর মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে তাঁরা তার বিয়ের ব্যবস্থা করবেনই। একমাত্র পরীক্ষার ওপর জোর দিলে হয়ত তাকে দিল্লিতে ফিরতে দিতে পাবেন।

কিরণ বলে, 'বিয়ের পর কতরকম বাধা আসে। নতুন জায়গায় গিয়ে পড়াশোনায় মন বসানো মুশকিল।'

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'বাধা যাতে না আসে আমরা ত্রিকূটজিকে তাব ব্যবস্থা করতে বলব। চিন্তা নেহী করনা বেটা।'

'আপনি যতই বলুন, বাধা পড়বেই। এত বছর পড়াশোনা করলাম, টেস্টও হয়ে গেছে। আর দু'মাস পব ফাইনাল পরীক্ষাটা দিতে পারলেই আমি গ্র্যাজুয়েট হয়ে যাব। আপনারা এক কাজ করুন গুরুজি—'

'কী?'

'পরীক্ষার পর বিয়ের তাবিখ ঠিক করুন।'

'তা হয় না।'

'কেন?'

'ফাল্গুন মাসে বিয়ে না হলে সেই শাওনের আগে সম্ভাবনা নেই। বৈশাখে তোমার মা আর পিতাজির শাদি হয়েছে। ওই মাহিনায় সন্তানের শাদি হওয়া ঠিক না। জেঠ মাহিনায় জ্যেষ্ঠ সন্তানের শাদি না হওয়াই ভাল। আগের সাল আষাঢ়ে শাদির তারিখ নেই। তা হলে বুঝতেই পারছ, শাদিটা ফাল্গুনে হওয়া কতটা জরুরি।'

ফাল্গুনে বিয়ের পক্ষে সবরকম অজুহাতই সাজিয়ে রেখেছেন বশিষ্ঠনারায়ণরা। সেগুলোর বিরুদ্ধে আরো জোরাল যুক্তি খাড়া করে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলে সে দিল্লি চলে যেতে পারবে। আর দিল্লি গিয়ে দেরি করবে না, প্রভাকরকে নিয়ে সোজা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে চলে যাবে।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'তা ছাড়া—'

কুলগুরুর চোখের দিকে তাকিয়ে কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'তা ছাড়া কী?'

বশিষ্ঠনারায়ণ মিথ্যে করেই বলেন, 'শাদির ব্যাপারে ত্রিকূটজিরা আর দেরি করতে চাইছেন না। ওঁর মায়ের উমর হয়েছে। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে নাতির শাদি দেখে যেতে চান।'

মহেশ্বরী এতক্ষণ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। এবার বলেন, 'আমার বয়েস নব্বই হতে চলল। আমারও ইচ্ছা, মরার আগে কিরণের শাদিটা দেখে যাই। এই জন্যেই হয়ত শিউশঙ্করজি আমাকে কাশীধাম থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

দুবে এবং শর্মা বংশের দুই বৃদ্ধা নব্বই বছরের কাছাকাছি পৌঁছেও যে মরতে পারছেন না, তা শুধু

কিরণের বিয়ের জন্য। এই বিয়েটাই তাঁদের মৃত্যুর পক্ষে একমাত্র বাধা। শুভ কাজটা হয়ে গেলেই তাঁরা অপার শান্তিতে চোখ বুজতে পারেন। ব্যাপারটার মধ্যে সেন্টিমেন্ট এবং আবেগ জড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে কিরণ বলে, 'আমার দাদী কি দুবেজির মা এতদিন যখন বেঁচে আছেন, আব ক'টা মাস শিউশঙ্করজি নিশ্চয়ই তাঁদের বাঁচিয়ে রাখবেন। ভগোয়ানের পূজা চড়িয়ে বলব, আমার শাদির আগে তাঁদের যেন কিছু না হয়।'

মুকুটনাথ ভারি গমগমে গলায় বলে ওঠেন, 'আমি তোমার কোনো বাহানা শুনব না। এই মাসেই তোমার শাদি হবে। ত্রিকূটজিকে সেইরকম কথা দিয়েছি।'

বাবার মারমুখী চেহারা কিরণকে অনেকখানি দমিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে আরেক বার আগের কথাটাই সে বলে, 'এতদূর এগিয়ে শুধু ক'টা মাসের জন্যে গ্র্যাজুয়েটটা হতে পারব না?'

মুকুটনাথ বলেন, 'কী জন্যে তোমাকে দিল্লি পাঠানো হয়েছিল, নিশ্চয়ই মনে আছে? ত্রিকূটজি আর আমি চেয়েছিলাম, তুমি ভাল করে ইংলিশ বলতে পারবে, মেমসাহেবদের রাহান সাহান রপ্ত করে নেবে। সে দুটো হয়ে গেছে, ব্যস। গ্র্যাজুয়েট হলে নতুন করে তিনটে ল্যাজ আর চারটে হাত গজাবে না।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'বি. এ পাশ করাটা আমার খুব দরকার।'

'কিসের দরকাব? তুমি কি নৌকরি উকরি করবে যে ইউনিভার্সিটির একটা স্ট্যাম্প নিতে হবে!'

কিরণ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ে। বিরক্ত মুখে সেদিকে তাকিয়ে কর্কশ গলায় মুকুটনাথ চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কৌন?'

একটি ভীরু কণ্ঠস্বর বাইরে থেকে ভেসে আসে, 'আমি ঘাসিয়া—'

ঘাসিয়া এ বাড়ির ডজনখানেক নৌকবদের একজন। আগের গলাতেই মুকুটনাথ বলেন, 'কী চাই?'

'দুবেজি আয়া হুজৌর—'

দুবেজি অর্থাৎ ত্রিকূটনারায়ণ দুবে। শশব্যস্ত মুকুটনাথ বলেন, 'দুবেজিকে খাতিরদারি করে বাইরের ঘবে বসা। আমি আসছি।'

ঘাসিয়া বলে, 'বসিয়েছি সরকার।'

'ঠিক হ্যায়।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান মুকুটনাথ।

এদিকে ত্রিকূটনারায়ণের আসার খবরে এলোপাথাড়ি হাতুড়ি পেটানোর শব্দের মতো কিরণেব বুকের ভেতর কিছু একটা ঘটতে থাকে।

পাশের ঘরে ত্রিকূটনারায়ণকে যথেষ্ট যত্ন করে সসম্ভ্রমে বসানো হয়েছে। তিন চারটে নৌকর তটস্থ হয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। মুকুটনাথের ভাবী 'সমধী' বা বেয়াই ত্রিকূটনারায়ণের 'মিশ্র নিকেত'-এ কতটা মর্যাদা, সে সম্বন্ধে এ বাড়ির কাকপক্ষি থেকে কুকুর বেড়াল পর্যন্ত সবাই সচেতন।

ত্রিকূটনারায়ণ একাই আসেননি, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রোহিণীও এসেছেন। রোহিণীর সর্বাঙ্গে—সিঁথি থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত—সোনা চাঁদি হীরে মুক্তোর ঝকমকানি। মহিলার সারা গায়ে যে গয়না রয়েছে তার ওজন কম করে কিলো দেড়েক। যাঁরা রোহিণীকে দু'দিনও দেখেছে তারা জানে সর্বক্ষণ এই গয়না পরেই থাকেন তিনি। এমন কি রাতে শোওয়ার সময়ও করণফুল বা পায়জোড়টি পর্যন্ত খোলেন না। এতটা ওজন দিবারাত্রি কেমন করে যে তিনি বয়ে বেড়ান কে জানে।

ভারি ভারি গয়নার সঙ্গে জমকালো একটি বেনারসী পরে এসেছেন রোহিণী। পায়ে কাচ এবং পুঁতি বসানো ভেলভেটের স্লিপার।

মুকুটনাথ ঘরে এসে ঢুকতেই দু'জনে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ান, 'নমস্তে—'

মুকুটনাথও দুই হাত জোড় করে বুকের কাছে এনে মাথাটা সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়ে সসম্ভ্রমে বলেন, 'নমস্তে, নমস্তে। কৃপা করে বসুন—'

'আপ বৈঠিয়ে—'

'আপলোগ পহেলে।'

সবাই বসার পর একটা নৌকবকে ডেকে নিচু গলায় মুকুটনাথ বলেন, 'মাঈজিকে গিয়ে বল, মিঠাই আর ঠাণ্ডাই এ কামরায় পাঠাবার বন্দোবস্ত করে এখনই যেন চলে আসেন।'

মাঈজি অর্থাৎ রেবতী। নৌকরটা ঘাড় হেলিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ত্রিকূটনারায়ণ এবার বলেন, 'শুনলাম মাতাজিকে বনারস ধাম থেকে ফিরিয়ে এনেছেন?'

ত্রিকূটনারায়ণ যে মাতাজির কথা বললেন তিনি মহেশ্বরী। মুকুটনাথ বলেন, 'জি, হাঁ। বৈদ বলল মায়ের শরীর সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাই ওখানে আর ফেলে রাখলাম না।'

'ভালই করেছেন।' অনুমোদনের ভঙ্গিতে বললেন ত্রিকূটনারায়ণ।

মুকুটনাথ জানান, 'ঠিক করেছি, মাকে অত দূরে আর পাঠাব না। বড়িতেই শিউশঙ্করজির মন্দির বানিয়ে দিয়েছি। ভালমন্দ যা হওয়ার আমাদের চোখের সামনেই হোক।'

মুকুটনাথের এই পরিকল্পনায় পুরোপুরি সায় রয়েছে ত্রিকূটনারায়ণের। তিনি মাথা নেড়ে বলেন, 'ঠিক বাত। আমিও শুনেছি, বাড়িতেই আপনি স্বয়ং বিশ্বনাথজিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।' একটু থেমে মহেশ্বরীর প্রসঙ্গ থেকে একেবারে অন্য বিষয়ে চলে যান, 'আরো একটা খবর আমার কানে এল মুকুটনাথজি—'

এবার সতর্ক ভঙ্গিতে ত্রিকূটনারায়ণকে লক্ষ করেন মুকুটনাথ। খুব আস্তে জিজ্ঞেস করেন, 'কী খবর?'

'মাতাজিকে যেমন বনারস থেকে নিয়ে এসেছেন তেমনি দিল্লি থেকে কিরণকেও লোক পাঠিয়ে অনিয়েছেন।'

এই ত্রিকূটনারায়ণ দুবে সারা বছরই দিল্লি বম্বে কলকাতা আর পাটনায় ঘুরে বেড়ান। উঁচু সোসাইটিতে তাঁর মেলামেশা। তাঁর পক্ষে নানারকম খবর যোগাড় করা খুবই সহজ ব্যাপার। কিরণ সম্পর্কে গোলমেলে কিছু শুনেই তিনি আজ ছুটে এসেছেন কিনা, এই মুহূর্তে তাঁর মুখচোখ দেখে বলা যাচ্ছে না। মুকুটনাথ সন্দিগ্ধভাবে বলেন, 'হাঁ। ভাবলাম মা আর ক'দিনই বা আছেন। আচানক দেহান্ত ঘটে গেলে আপসোস থেকে যাবে, বড় নাতনির সঙ্গে তাঁর দেখা হল না বলে। সেই জন্যেই—'

'আচ্ছাই কিয়া—'

একটু চুপচাপ।

সেই ফাঁকে রেবতী এ ঘরে চলে আসেন। তাঁর পেছন পেছন ঢাউস চাঁদির ট্রেতে ঠাণ্ডাইয়ের গেলাস এবং মিষ্টির প্লেট নিয়ে একটা নৌকর ঢোকে।

রেবতী সবিনয়ে রোহিণী এবং ত্রিকূটনারায়ণকে 'নমস্তে' জানিয়ে নিজেব হাতে তাঁদের সামনে শরবত এবং মিঠাই সাজিয়ে দেন। মৃদু গলায় বলেন, 'একটু মুহ্‌মিঠা করুন।'

'হাঁ হাঁ, জরুর। আপনি বসুন—'

একটা বড় সোফায় কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বসে পড়েন রেবতী।

ত্রিকূটনারাযণ শরবতের গেলাস তুলে নিয়ে আলতো চুমুক দিযে বলেন, 'যে কথা ভাবছিলাম, কিরণকে দিল্লি থেকে আনিয়ে ভালই করেছেন মুকুটনাথজি। নইলে দু-একদিনের ভেতর কাউকে পাঠাতে হত।'

মুকুটনাথের সেই সন্দেহটা আচমকা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। প্রভাকরের সঙ্গে কিরণের ঘোরাফেবার খবর কি ত্রিকূটনারায়ণের কানে পৌঁছে গেছে? মুকুটনাথের স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে যায়। কোনো প্রশ্ন না করে তিনি ত্রিকূটনারায়ণকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করতে থাকেন।

ত্রিকূটনারায়ণ ফের বলেন, 'কেন দিল্লিতে লোক পাঠাতে হত জানেন?'

মুকুটনাথের টেনসন কাটে না। আধফোটা গলায় তিনি বলেন, 'কেন?'

'হরীশের দাদী আর মায়ের ইচ্ছা, এই ফাগুয়ার মাসেই ওর শাদিটা চুকিয়ে ফেলে। অনেকদিন তো হয়ে গেল। শুভকাজটা আর ফেলে রাখা ঠিক না।' ত্রিকূটনারায়ণ বলে যান, 'যে কাবণে কিবণকে দিল্লি

পাঠানো হয়েছিল তা তো হয়েই গেছে। বিলাইতি চাল, রাহানসাহান, সবই শিখে নিয়েছে সে। জলের মতো ইংরেজিটাও বলতে পারে। এর বেশি জরুরত নেই।'

মুকুটনাথের টান টান স্নায়ুগুলো আবার আলগা এবং স্বাভাবিক হয়ে আসে। অনেকটা আরাম বোধ করেন তিনি। ত্রিকূটনারায়ণ যা বলছেন সেটা তাঁরও কাম্য। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে এক কথায় রাজি হয়ে গেলে দুবেজি পেয়ে বসবেন। একটু খেলিয়ে মত দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মুকুটনাথ বলেন, 'মুন্নুয়া বলছিল পরীক্ষার আর মোটে দু মাস বাকি। ওটা হয়ে গেলে বরং—'

দুই হাত প্রবল বেগে নেড়ে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রিউগ্রি পেলে একস্ট্রা বাহার কী আর হবে? ডিগ্রির জরুরত তো নৌকরির জন্যে। আপনার কি আমার এমন হাল হয়নি যাতে মেয়েদের নৌকরি করতে পাঠাব।'

ত্রিকূটনারায়ণের আগ্রহটা চাগিয়ে দেবার জন্য মুকুটনাথ বলেন, 'ঠিক বাত। লেকেন নামের শেষে একটা ডিগ্রি থাকলে ওজন বাড়ে।'

ত্রিকূটনারাযণ হাসেন, 'আপনার কথা মানছি শর্মাজি। লেকেন মুশকিলটা হয়েছে দু দিক থেকে—'

'কিরকম?'

এতক্ষণ রোহিণী চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার ত্রিকূটনারায়ণ মুখ খোলার আগেই বলে ওঠেন, 'হরীশ মুখে কিছু বলছে না, লেকেন বুঝিয়ে দিচ্ছে শাদিটা এবার না দিলেই নয়। হরীশের এক দোস্ত বলছিল, কিরণ এসেছে শুনে স্রিফ এক নজর দেখার জন্যে দো রোজ ও আপনাদের কোঠির চারপাশ দিয়ে ঘুরে গেছে। বেচারার হাল বঝে দু'জনের 'জোড়ি' মিলিয়ে দিন।'

মুকুটনাথ এবং রেবতী একসঙ্গে হকচকিয়ে যান। রেবতী মৃদু গলায় বলেন, 'কী আশ্চর্য, ও বাড়ির ভেতর এল না কেন?'

'ভাবী দামাদকে ইনভাইট না করলে কি আসতে পারে? শরমকি বাত।' বলে হাসতে লাগলেন রোহিণী।

ত্রিকূটনারায়ণ বললেন, 'ছেলে শাদির জন্যে একেবারে খেপে উঠেছে। খেপবার কথাই। উমর তো কম হল না। চব্বিশ পঁচিশ সাল কমসে কম। এই বয়েসে আমার তো দো বচ্চে হয়ে গেছে।'

ত্রিকূটনারায়ণ ঝানু পলিটিসিযান হলেও কোথায় যেন তাঁব মধ্যে এক ধরনের সারল্য রয়েছে। নইলে ছেলে সম্বন্ধে এ জাতীয় মন্তব্য আদৌ করতেন না।

মুকুটনাথ এবং রেবতীও প্রচুর হাসছিলেন। মুকুটনাথ হাসতে হাসতেই বলেন, 'এ তো একটা কারণ। দুসরা কারণটা কী?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আপনি তো চিরকাল ল্যান্ড নিয়েই পড়ে রইলেন। পলিটিকসের ধারও ধারেন না, তার খবরও রাখেন না। এদিকে ইলেকশন এসে যাচ্ছে।'

'কবে ইলেকশন?'

'চার পাঁচ মাস পর।'

বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন মুকুটনাথ। তারপর বলেন, 'ইলেকশনের সঙ্গে শাদির কী সম্পর্ক?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আমাব চুনাও কেন্দ্রের ফিফটি পারসেন্ট ভোটার আপনার গোলগোলি বইহারি ভূমনগঞ্জ ঝাঝরিয়া মৌজার লোক। তাদের ভোটগুলো তো চাই। চুনাও-এর ক্যামপেনের সময় আপনাকে আমরা সঙ্গে থাকতে হবে।'

'তা তো থাকবই। শাদির জন্যে এটা আটকে থাকবে নাকি?'

'শাদিটা হলে বেশি জোর খাটানো যায়। তখন লিগ্যালি আপনি আমার আপনা আদমী। এখন আপনি আমার জন্যে যা করবেন, একবার লিগ্যাল সমধী হয়ে গেলে তার দশ বিশ গুণ করবেন।' বলে হাসতে থাকেন ত্রিকূটনারায়ণ।

ছেলের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ত্রিকূটনারায়ণের যে অকপট সারল্য দেখা গিয়েছিল এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। এই মুহূর্তে তাঁর মধ্যে থেকে একজন তুখোড় পলিটিসিয়ান বেরিয়ে এসেছে। অত্যন্ত

সূক্ষ্মভাবে দুটো ব্যাপার ত্রিকূটনারায়ণ বুঝিয়ে দিয়েছেন। তেমন প্রয়োজন হলে চুনাওতে তিনি মুকুটনাথের ওপর জবরদস্তিই করবেন। বিয়েটা হয়ে গেলে কিরণকে নিজের হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন ত্রিকূটনারায়ণ। তখন সে তাঁদেরই সম্পত্তি। আর কন্যাদান করার পর সব বাপই কমজোর হয়ে যায়। মেয়ের ভালমন্দব এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার শ্বশুরবাড়ির অনেক অন্যায় আবদার তাকে মেনে নিতে হয়। বিশেষ করে এই অঞ্চলে যেখানে সামান্য কারণে পুত্রবধূ পোড়ানো একটা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে। তা ছাড়া বউ পোড়াবার একটা ব্যাকগ্রাউন্ডও রয়েছে দুবেদের।

মুকুটনাথ বলেন, 'কবে শাদির ব্যওস্থা করতে চাইছেন?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'ঠিক হ্যায়। গুরুদেওয়ের সঙ্গে কথা বলে তারিখ ঠিক করে আপনাকে জানাব।'

'আচ্ছা—'

একটু ভেবে মুকুটনাথ বলেন, 'এবার তা হলে আরেকটা দরকারি বাত সেরে নেওয়া যাক।'

ত্রিকূটনারায়ণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বলেন, 'দরকারি বাত তো হয়েই গেল।'

'নেহী দুবেজি। দহেজের কথাটা পাক্কা করে নেওয়া যাক।' শান্ত, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বলেন মুকুটনাথ।

দহেজ অর্থাৎ যৌতুকের কথায় রীতিমত ক্ষুব্ধই হন ত্রিকূটনারায়ণ। বলেন, 'দহেজের জন্যে আমি ছেলের শাদি দিচ্ছি না মিশ্রজি। ভগোয়ান শিউশঙ্করজির কৃপায় আমার সমসারে অভাব নেই। মিশ্র বংশ আর দ্বিবেদী বংশ দো চারশ বরষ পাশাপাশি বাস করে আসছে, লেকেন তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক হয় নি। আমার মনোকামনা দুই বংশের ভেতর একটা পাকাপাকি মধুর রিস্তেদারি হোক। আপনার মেয়েটি ছাড়া আমার কোনো দাবি নেই। দহেজ বহুত গন্ধা চীজ মিশ্রজি।'

পলিটিক্যাল লিডারদের মতো বক্তৃতার ঢং-এ কণ্ঠস্বরে প্রচুর আবেগ ঢেলে কথাগুলো বলেন ত্রিকূটনারায়ণ। কিন্তু মুকুটনাথ বহুদর্শী, পোড় খাওয়া মানুষ। বক্তৃতাবাজি করে তাঁকে টলানো এত সহজ নয়। তা ছাড়া দুবে বা দ্বিবেদী বংশ যে বধূহত্যার কারণে এ তল্লাটে যথেষ্টই বিখ্যাত সেটা তিনি এক পলকের জন্যও ভুলে যাননি। হেসে হেসে বলেন, 'আপনারা কি আর দহেজ চাইছেন দুবেজি? ভগোয়ান শিউশঙ্কর আর রামচন্দ্রজির কৃপায় আমারও কোনো অভাব নেই। মেয়েকে খালি হাতে সসুরালে পাঠালে লোকে আমার গায়ে থুক দেবে। বলবে বেটা মক্ষিচুষ, বিলকুল মাইজার। তা ছাড়া লাস্ট টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ারসের মধ্যে আমাদের কোঠিতে কোনো শাদি উদির মতো শুভকাজ হয়নি। আমাদের পরের জেনারেশনে এটাই হবে পয়লা ম্যারেজ। ধুমধাম না করে মেয়েকে কি সসুরালে পাঠাতে পারি?'

যৌতুক নিয়ে আগেও দু চারবার ত্রিকূটনারায়ণের সঙ্গে কথা হয়েছে মুকুটনাথের কিন্তু সে সব ভাসা ভাসা। বিয়ে যখন এবার দিতে হবে, আনুষ্ঠানিকভাবে যৌতুকের ব্যাপারটা পাকা করে নেওয়া দরকার।

দহেজ নেবেন না, মনে মনে এমন ধনুর্ভাঙা পণ আদৌ করে বসেননি ত্রিকূটনারায়ণ। তবে যৌতুকের ব্যাপারে প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশ করে একটু আগে পরম উদারতায় যে লম্বা-চওড়া বক্তৃতাটি তিনি করেছেন, সেটা শুধু কথার কথা। ঝানু রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁকে লোক চরিয়ে খেতে হয়। মনুষ্যচরিত্র তাঁর নখের ডগায়। মেয়ের বাপেদের মনস্তত্ত্ব তাঁর একেবারে অজানা নয়। তিনি যদি মুখ ফুটে বলেন, এটা চাই, সেটা চাই, তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি। কেননা যা চাইবেন তার বেশি কিছুই মিলবে না। বরং কিছু না চাইলে প্রত্যাশার বেশিই পাওয়া যাবে। উলটে কিঞ্চিৎ মহত্ত্বও দেখানো হবে। লোকে বলবে, আহা, কী গ্রেট ম্যান! যাই হোক, মুকুটনাথের কথায় খুবই সন্তুষ্ট হন ত্রিকূটনারায়ণ, তবে মুখে কিছু বলেন না।

মুকুটনাথ এবার বলেন, 'আমি কী ঠিক করে রেখেছি জানেন?'

উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করেন ত্রিকূটনারায়ণ, 'কী?'

'সোনাচাঁদি হীরামোতি ফার্নিচার—এসব তো মামুলি চীজ। সব বাপই তার মেয়েকে দিয়ে থাকে।

আমিও দেব। সেই সঙ্গে এমন কিছু দেব যা দুবেরা জেনারেশনের পর জেনারেশন মনে রাখবে।'

এবার রীতিমত হকচকিয়ে যান ত্রিকূটনারায়ণ। কোনাকুনি সোফাটায় বসে আছেন রোহিণী, তিনিও মুখ তুলে অবাক চোখে মুকুটনাথের দিকে তাকান।

ত্রিকূটনারায়ণ অপার বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কী দিতে চান মিশ্রজি?'

'আন্দাজ করুন।' বলে অল্প অল্প হাসেন মুকুটনাথ। যাঁর মুখোমুখি তিনি বসে আছেন সেই তুখোড় রাজনৈতিক নেতাটিকে নিয়ে কিঞ্চিৎ মজা করতে তাঁর ভালই লাগছে।

কপাল কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করেন ত্রিকূটনারায়ণ। তারপর ডাইনে বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে আস্তে আস্তে বলেন, 'না, বুঝতে পারছি না মিশ্রজি।'

অনেকটা ঝুঁকে মুকুটনাথ বলেন, 'জমিন, জমিন। গোলগোলি মৌজার পাশে যে পাহাড় তার গায়ে আমার এক শ বিঘা ভাল জমিন রয়েছে। পুরোটাই আমার মেয়ের নামে লেখাপড়া করে দেব।'

ত্রিকূটনারায়ণের চোখেমুখে বিজুরি খেলে যায়। ভেতরকার প্রচণ্ড লোভ এবং খুশি প্রাণপণে ভেতরেই আটকে রাখেন, বাইরে বেরিয়ে আসতে দেন না। অত্যন্ত সংযত ভঙ্গিতে বলেন, 'লেড়কীকে কী দেবেন সেটা পুরা আপনার ইচ্ছা। তার ওপর কারুর কথা চলে না। তবে এসব না দিলেও কিছু যায় আসে না। আপনাদের সঙ্গে নাতেদারিটাই আসল, বহুৎ বড়ে প্রাইজ বলে মনে করি।'

যে চোখা বুদ্ধি এবং চতুরালির খেলাটা চলছে তাতে রীতিমত আমোদই লাগে মুকুটনাথের। তিনি যে ত্রিকূটনারায়ণের সূক্ষ্ম চালটা ধরতে পেরেছেন তা একেবারেই বুঝতে দেন না। অত্যন্ত নিস্পৃহ মুখে এবং খুব স্বাভাবিক গলায় বলেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন দুবেজি, মেয়েদের সাইকোলজিটা তাজ্জবের জিনিস। শ্বশুরের যত প্রোপার্টি সেনাদানা থাক না, বাপের কাছ থেকে কিছু না পেলে সে মনে মনে কমজোর হয়ে যায়, লোকের চোখে তার সম্মান থাকে না।'

ত্রিকূটনারায়ণ হাতজোড় করে হাসতে হাসতে বলেন, 'আমি পলিটিকস করি, বক্তৃতার চক্করে লোকের মাথা ঘুরিয়ে দিই। লেকিন আপনার কাছে বিলকুল হার মানলাম। জীওনে এত সুন্দর করে কথা বলতে আমিও পারব না।'

মুকুটনাথও হাসতে থাকেন।

রেবতী এবং রোহিণীও হাসছিলেন। রোহিণী রেবতীকে বলেন, 'দুই সমধীর শতরঞ্জ খেলাটা দেখছেন বহীনজি?'

রেবতী নিচু গলায় জাবাব দেন, 'যা বলেছেন।'

ওদিকে মুকুটনাথ ত্রিকূটনারায়ণের উদ্দেশে বলেন, 'জমিটা কবে দেখতে যাবেন বলুন?'

জিভ কেটে, একসঙ্গে মাথা এবং দুই হাত জোরে জোরে নেড়ে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'ছি ছি, এ আপনি কী বলছেন ভাইয়া! নিজের লেড়কীকে কী দেবেন তা দেখতে যাব আমি!'

'তা কী কখনও হয় দুবেজি? আমি পাথুরে পড়তি জমিন গছিয়ে দিলাম কিনা সেটা নিজের চোখে দেখে নেওয়া ভাল। পরে এই নিয়ে হয়ত মনে আপনার খিঁচ থেকে যাবে। চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতে পারবেন না।'

হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো ভঙ্গিতে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না। এমন বিপদে কেউ কাউকে ফেলে!'

মুকুটনাথ বলেন, 'এটা আমার দোষও বলতে পারেন, গুণও বলতে পারেন। আগেই সব সাফ সাফ বলে নেওয়া ভাল। পরে এই নিয়ে ঝঞ্ঝাট আমার না-পসন্দ। তা হলে কবে জমিন দেখার দিন ঠিক করব?'

'তার আগে শাদির তারিখ ঠিক হোক।'

'সেটা দু-চার রোজের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'তারপর না হয় জমিন দেখতে যাব। আপনি যেদিন বলবেন সেদিনই যাব।'

'ঠিক হ্যায়।'

কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে চা-মিঠাই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'অনেকক্ষণ

এসেছি, এবার তবে ওঠা যাক। যাবার আগে মাতাজি, গুরুদেও আর শিউশঙ্করজিকে দর্শন করে যাব।'

মুকুটনাথ ব্যস্তভাবে বলেন, 'হাঁ হাঁ, জরুর। মা আর গুরুদেও পাশের কামরাতেই আছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর শিউশঙ্করজির মন্দিরে নিয়ে যাব।'

সবাই সোফা থেকে উঠে পড়েছিলেন। ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'এতদূর যখন এসে পড়েছি, কিরণকেও দেখে যাই।'

'মুন্নুয়াও পাশের ঘরেই আছে। আসুন, আসুন—'

চার জন মহেশ্বরীর ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

ছয়

মুকুটনাথ আর রেবতী ত্রিকূটনারায়ণ এবং রোহিণীকে মহেশ্বরীর ঘরে নিয়ে এলেন।

কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ মহেশ্বরীর সঙ্গে তাঁর মাস দেড়েকের কাশীবাস সম্পর্কে কথা বলছিলেন। কিরণ অন্যমনস্কর মতো চুপচাপ ঠাকুমার খাটের এক কোণে বসে আছে। বশিষ্ঠনারায়ণদেব একটি কথাও যেন সে শুনতে পাচ্ছিল না। খুবই চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

ঘরের মেঝেতে বসে মহেশ্বরীর খাস নৌকরনী কুঁদরী একটা পাথরের খলে মহেশ্বরীর জন্য মধু দিয়ে কবিরাজি বড়ি মাড়ছিল। এখন তাঁর ওষুধ খাওয়ার সময়।

ত্রিকূটনারায়ণরা এতক্ষণ পাশের ঘরে কী বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, কিরণ সবই আন্দাজ করতে পারে। তার দুশ্চিন্তার কারণ সেটাই। যাই হোক, ত্রিকূটনারায়ণদের এ ঘরে দেখে সে চমকে ওঠে। যদিও সে জানত মহেশ্বরীর সঙ্গে দেখা করতে ওঁরা এ ঘরে আসবেন। নিজেকে শক্ত রাখবে এবং কোনো অবস্থাতেই ভেঙে পড়বে না, এরকম একটা সংকল্প মাথায় রেখেও সে টের পায় অদ্ভুত এক ভীতি তার মনোবল আর ব্যক্তিত্বকে যেন চুরমার করে দিতে চাইছে।

বশিষ্ঠনারায়ণ স্নিগ্ধ হেসে বলেন, 'আও ত্রিকূট, আও বহুরানী—' বহুরানী অর্থাৎ রোহিণী।

অতিথিদের দেখে মহেশ্বরীর কঙ্কালসার শরীরে আনন্দ এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে যায়। হাতে ভর দিয়ে তিনি উঠে বসতে যাবেন, প্রায় ছুটেই তাঁর কাছে চলে আসেন ত্রিকূটনারায়ণ। ব্যস্তভাবে বলেন, 'উঠবেন না মাতাজি, উঠবেন না।'

মহেশ্বরী আর ওঠার চেষ্টা করেন না। যথেষ্ট সমাদর করে বলেন, 'আও বেটা, বৈঠো--'

ত্রিকূটনারায়ণ সস্ত্রীক বশিষ্ঠনারায়ণ এবং মহেশ্বরীকে প্রণাম করে দুটো চেয়ারে বসেন। তাঁরা বসার পর মুকুটনাথ আর রেবতীও বসে পড়েন।

মহেশ্বরী কিরণকে বলেন, 'কি রে মুন্নুয়া, ত্রিকূটদের প্রণাম করলি না।'

কিরণ এতই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছিল যে এ ব্যাপারটা তার মাথায় আসেনি। দিল্লিতে কয়েক বছর কাটিয়ে এলেও শিষ্টাচার ভুলে যায়নি সে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান দিতে জানে কিরণ। দ্রুত উঠে গিয়ে রোহিণী এবং ত্রিকূটনারায়ণকে প্রণাম করে সে। শুধু তা-ই না, মা বাবা ঠাকুমা এবং কুলগুরুকেও প্রণাম করতে হয়। উপস্থিত যে গুরুজনেরা থাকবেন তাঁদের সবাইকেই এভাবে সম্মান জানানো এ বাড়িব বহুকালের রেওয়াজ।

প্রণাম চুকলে রোহিণী কিরণকে নিজের কাছে বসান। বলেন, 'কেমন আছ বেটা?'

কিরণ সংক্ষেপে উত্তর দেয়, 'ভাল।'

ত্রিকূটনারায়ণ সস্নেহে কিরণের সঙ্গে কথা বলে মহেশ্বরীর দিকে তাকান। বলেন, 'মাতাজি, আজ আমরা আপনার অনুমতি নিতে এসেছি।'

মহেশ্বরীর কোঁচকানো মুখে মধুর হাসি ছড়িয়ে যায়। তিনি বলেন, 'কিসের অনুমতি—কিরণের সঙ্গে তোমার ছেলের শাদির?'

'হাঁ মাতাজি। একটু আগে মুকুটনাথজিব সঙ্গে সেই কথাই হচ্ছিল। তিনিও রাজি হয়েছেন। লেকেন ছোটা আদালতের রায় পেলেই তো হবে না, হাইকোর্টের হুকুম চাই।'

মহেশ্বরী হাসলেন।

ত্রিকূটনারায়ণ ফের বলেন, 'আমাদের ইচ্ছা, এই মাসেই শাদিটা হয়ে যাক।'

মহেশ্বরী অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন, 'বেশ তো। শুভ কাজ বেশিদিন ফেলে রাখতে নেই।'

ত্রিকূটনারায়ণ খুবই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। বলেন, 'ঠিক মাতাজি। এই কথাই তখন মুকুটনাথজিকে বলছিলাম।' বলতে বলতে বশিষ্ঠনারায়ণের দিকে তাকান, 'গুরুদেও, কৃপা করে পঞ্জিকা দেখে শাদির তারিখ ঠিক করে দিতে হবে।'

'হাঁ হাঁ, জরুর।' বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'আজ রাত্তিরেই তারিখটা দেখে মুকুটনাথকে বলে দেব।'

শুনতে শুনতে হৃৎপিণ্ডের উত্থান পতন থমকে গিয়েছিল কিরণের। গল গল করে ঘামতে শুরু করেছে সে। মাথার ভেতর ঝিঁঝির ডাকের মতো একনাগাড়ে দুর্বোধ্য কী সব শব্দ হচ্ছে যেন। মনে হচ্ছে, সে একটা জটিল ফাঁসের মধ্যে ক্রমশ জড়িয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার শক্তি বোধহয় একেবারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠতে চাইল কিরণ, 'এ শাদি হবে না, হবে না, হবে না। আমার পেটে অন্যের বাচ্চা রয়েছে।' কিন্তু স্বর ফুটল না। তবে এটুকু বুঝতে পারল, যা করার দু-এক দিনের মধ্যেই তাকে করে ফেলতে হবে। নইলে সব কিছুই হাতের বাইরে চলে যাবে।

বিচলিত এবং সন্ত্রস্ত কিরণ বিপর্যয়ের শেষ মাথায় পৌঁছে স্থির করে ফেলল, আজই প্রভাকরকে চিঠিটা লিখে সব জানিয়ে দেবে। এই ফাঁদে-পড়া বিপন্ন অবস্থায় তার পরামর্শ এবং সাহায্য একান্ত জরুরি।

ত্রিকূটনারায়ণ এবার মুকুটনাথকে বলেন, 'শাদির তারিখটা নিয়ে কৃপা করে ভাবীজি আর আপনি যদি গরিবখানায় পায়ের ধুলো দেন—'

মুকুটনাথ শশব্যস্তে হাঁ হাঁ করে ওঠেন, 'পায়ের ধুলো কী বলছেন দুবেজি! আপনার কোঠিতে যাব, এ তো আমাদের বহুত বড়ে সৌভাগ।'

'কবে আসছেন? আপনার সঙ্গে শাদি ছাড়াও আরো অনেক পরামর্শ আছে।'

'গুরুদেওজি তারিখটা আজ জানিয়ে দিলে কাল পরশু চলে যেতে পারি।'

'পরশু আর করবেন না। কালই কষ্ট করে চলে আসুন।'

একটু ভেবে মুকুটনাথ বলেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। আপনার সঙ্গে আমারও কিছু জরুরি কথা আছে।'

'নিশ্চয়ই শুনব।' ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'কাল কখন আসছেন?'

'বিকেলের দিকে যাব। ধরুন চারটে পাঁচটা নাগাদ।'

'আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। এবার তা হলে আপনারা সবাই হুকুম দিন, আমরা আজ যাই।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান ত্রিকূটনারায়ণ। আরেক প্রস্থ প্রণামের পর বলেন, 'যাবার আগে নতুন মন্দির দর্শন করব।'

'অবশ্যই।' মুকুটনাথ রেবতী এবং বশিষ্ঠনারায়ণ ত্রিকূটনারায়ণদের সঙ্গে করে নতুন শিবমন্দিরে নিয়ে আসেন। সস্ত্রীক ত্রিকূট ভক্তিভরে এবং সাষ্টাঙ্গে শিবের 'মূরত'কে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলেন, 'বহুত পুণের কাজ করেছেন মুকুটনাথজি। আপনার কোঠি পবিত্র বনারস-ধাম হয়ে গেল।'

মুকুটনাথের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। তিনি অবশ্য কোনো উত্তর দেন না।

ত্রিকূটনারায়ণেরাও উত্তরের জন্য অপেক্ষা করেন না। মন্দিরের মুখোমুখি ফাঁকা জায়গায় তাঁদের যে পুরনো মডেলের ঢাউস মোটরটা দাঁড়িয়ে ছিল, সোজা সেখানে চলে যান। মুকুটনাথ এবং রেবতী তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আসেন।

মুকুটনাথ নিজের হাতে গাড়ির দরজা খুলে দিতে দিতে সবিনয়ে বলেন, 'উঠুন ভাবীজি, উঠুন ত্রিকূটজি। কাল আবার দেখা হবে।'

ত্রিকূটনারায়ণদের মোটর গেটের বাইরে বেরিয়ে যাবার পর মুকুটনাথ একটা নৌকরকে ডেকে বলেন, 'তুরন্ত ভকিলজির কোঠিতে চলে যা। তাকে বলবি আজই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।'

ভকিলজি অর্থাৎ খুবলাল। নৌকর ঘাড় হেলিয়ে তৎক্ষণাৎ খুবলালের বাড়ির দিকে ছোটে।

এদিকে মুকুটনাথেরা বেরিয়ে যাওয়ার পর মহেশ্বরীর কামরায় মহেশ্বরী, তাঁর নৌকরনী কুঁদরী এবং কিরণ ছাড়া আর কেউ ছিল না।

কিরণ বিভ্রান্তের মতো চুপচাপ বসে আছে। একটি চতুর চালে মুকুটনাথেরা তাকে যে একটা দুর্ভেদ্য ব্যূহের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসার রণকৌশল তার জানা নেই।

কুঁদরীর ওষুধ মাড়া হয়ে গিয়েছিল। খলসুদ্ধ ওষুধটা এনে মহেশ্বরীর মুখের কাছে ধরে সে। চেটে চেটে খেয়ে নেন মহেশ্বরী। তারপর তাঁকে জল খাইয়ে ঘরের বাইরে চলে যায় কুঁদরী।

বলবর্ধক কবিরাজি বড়ি মহেশ্বরীর স্নায়ুগুলোকে মুহূর্তে চাঙ্গা করে তোলে। হাসিমুখে তিনি বিয়ের ব্যাপারে কিরণকে ঠাট্টা টাট্টা করেন, চোখেমুখে মজাদার ভঙ্গি ফুটিয়ে রঙ্গ রসিকতা জুড়ে দেন।

একটা ছড়াও কাটেন মহেশ্বরী।

'সুহাগিন লাড়ো (আদরের মেয়ে) খোজাইছে হে যোগ জাড়িয়া—'

কিরণের এসব একেবারেই ভাল লাগছিল না। সে অন্যমনস্কর মতো হুঁ হাঁ করে যায়। তারপর আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি এখন যাই—'

মহেশ্বরী অবাক হয়ে বলেন, 'যাবি কী রে, বস বস। দু'দিন পর সসুরাল যাবি। মরদ বশ করার কিছু কায়দা তোকে শিখিয়ে দিই। নইলে পরে মুশকিলে পড়তে হবে।'

'আমার শরীরটা ভাল না। মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।' বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে যায় কিরণ। একটু পর দোতলায় এসে নিজের ঘরে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকে।

জানালার চৌকো ফ্রেমে আকাশের যে টুকরোটা ধরা পড়েছে সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে। দূরে ফাঁকা শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে দু-একটা ঝাঁকড়া মাথা পিপর কি অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা চেহারার তাল গাছ। তার ভেতর দিয়ে চলে গেছে হাইওয়ে। সেখানে লাইন দিয়ে চলেছে ট্রাক, দূর পাল্লার বাস, ভ্যান। এছাড়া ঝাঁকে ঝাঁকে বয়েল গাড়ি, ভৈসা গাড়ি আর সাইকেল রিক্‌শা তো যাচ্ছেই।

কিন্তু কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিল না কিরণ। তার কাছে পৃথিবীর যাবতীয় দৃশ্যাবলী শব্দ এবং গন্ধ—সমস্তই বুঝিবা লুপ্ত হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পর নিজেকে প্রায় টেনেই তুলল কিরণ। বিছানার এক ধারে প্যাড, কলম পড়ে আছে। প্যাডের প্রথম পাতায় কয়েকটা লাইন লেখা। ঘণ্টা তিনেক আগে প্রভাকরকে যখন সে চিঠি লিখছিল সেই সময় সুষমা এসে তাকে মহেশ্বরীর ঘরে ডেকে নিয়ে যায়।

কিরণ কয়েক পলক লাইন ক'টার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর মনস্থির করে ফেলে। চিঠিটা শেষ করে আজই পোস্ট করতে হবে।

কলম আর প্যাড তুলে নিয়ে দ্রুত লিখতে শুরু করে কিরণ। চিঠির বিষয়বস্তু এইরকম। বাবা মা ঠাকুমা কুলগুরু, সবাই মিলে একরকম জোর করেই তার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। এখান থেকে পালিয়ে যে সে দিল্লিতে প্রভাকরের কাছে চলে যাবে তারও উপায় নেই। মনে হয়, সবাই তার ওপর কড়া নজর রাখছে। চিঠি পাওয়া মাত্র প্রভাকর যেন বন্দিদশা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়, ইত্যাদি।

চিঠিটা শেষ করে একটা খামের ভেতর পুরে যখন সে ঠিকানা লিখছে সেই সময় সাগিয়া কফির কাপ নিয়ে ঘরে ঢোকে। কিরণের কখন কী দরকার, মেয়েটা যেন আগে থেকেই টের পায়। তাড়াতাড়ি ঠিকানা লেখা শেষ করে হাত বাড়িয়ে কফির কাপটা নেয় কিরণ। চিঠিটা লিখতে পেরে খানিক আরাম বোধ করে সে। তার বিশ্বাস, প্রভাকর নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করবে।

পরক্ষণেই কিরণের মনে হয়, চিঠি তো লেখা হল কিন্তু সেটা ডাকে দেবে কে ? ডাক বাক্স এ বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে। সে বেরুতে গেলেই হাজারটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে। অন্য কাউকে দিয়ে যে চিঠিটা পোস্ট করাবে, তাতেও যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা। মুকুটনাথের হাতে যদি কোনোভাবে চিঠিটা পড়ে যায় প্রভাকরের নাম দেখেই খেপে যাবেন। এর ফলাফল হবে মারাত্মক। তা ছাড়া মুকুটনাথ নৌকরদের তার সম্বন্ধে কী বলে রেখেছেন কিরণের জানা নেই। কারুর হাতে চিঠিটা দেওয়া মাত্র সে হয়ত মুকুটনাথের কাছে পৌঁছে দেবে।

অন্য কাউকে দিয়ে চিঠিটা পোস্ট করার ঝুঁকি নিতে পারবে না কিরণ। হঠাৎ তার খেয়াল হয়, একমাত্র সাগিয়াকেই এই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। মেয়েটা চালাক চতুর এবং যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যও। খুব ছোটবেলা থেকে সে তার কাছেই আছে। কিরণ যা বলবে, মুখ বুজে তা-ই করবে সে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, 'মিশ্র নিকেত'-এর মেয়েদের হুটহাট বাড়ির বাইরে বেরুবার নিয়ম নেই। নৌকরনী হলেও না।

কিন্তু সাগিয়ার সাহায্য ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও তো নেই। একটা ঝুঁকি নিতেই হবে কিরণকে। দ্বিধাগ্রস্তের মতো সে বলে, 'আমার একটা কাজ করে দিবি?'

তক্ষুনি মাথা হেলিয়ে দেয় সাগিয়া, 'হাঁ, জরুর।'

'না শুনেই জরুর বলছিস যে?'

'তুমি এমন কাজ দেবে না যেটা করা যায় না। এখন বলে ফেল দিদিজি—'

চিঠিটা দেখিয়ে কিরণ বলে, 'এটা ডাক বাক্সে ফেলে আসতে হবে। তবে—'

তার কথা শেষ হবার আগেই সাগিয়া চাপা গলায় বলে, 'কেউ যেন জানতে না পারে, তাই তো?'

সাগিয়ার গালে আলতো টোকা মেরে কিরণ হাসে। বলে, 'তুই একটা শাঁখরেল।' পরক্ষণে কিছু একটা মনে পড়তেই চিন্তাগ্রস্তের মতো বলে, 'কিন্তু—'

'কা?'

'তুই চিঠি ফেলতে যাবি কী করে? কোঠির বাইরে তোকে যেতে দিলে তো।'

'একটা বাহানা করে ঠিক বেরিয়ে যাব। চিন্তা নায় করনা দিদিজি।'

সাগিয়ার সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং ফন্দিবাজির ওপর কিরণের অগাধ আস্থা। তবু পুরোপুরি নিঃসংশয় হতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, 'কী বাহানা?'

সেটা তখনও ভেবে দেখেনি সাগিয়া। সে বলে, 'ওটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও দিদিজি। একটা ফিকির ঠিক মাথায় এসে যাবে।'

'দেখিস, কেউ যেন এই চিঠির ব্যাপারে জানতে না পারে।'

'আমার মৌত না হওয়া পর্যন্ত কেউ জানতে পারবে না।'

মনের ভেতর খুঁতখুঁতুনি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কিরণকে বলতেই হয়, 'ঠিক আছে।' সাগিয়ার ওপর নির্ভর করা ছাড়া তার আর উপায় নেই। সে ফের বলে, 'চিঠিটা কিন্তু আজই ডাকে দিতে হবে।'

'জরুর।' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সাগিয়া। ধীরে ধীরে তার টেপা ঠোঁটে অদ্ভুত নিঃশব্দ একটি হাসি ফুটে ওঠে। খুব নিচু গলায় ষড়যন্ত্রকারীর মতো এবার সে বলে, 'কাকে চিঠি লিখেছ দিদিজি? কিছু গড়বড় আছে?'

চমকে ওঠে কিরণ। সে সাগিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। চোখ নামিয়ে বলে, 'পরে শুনিস।'

সাত

মিশ্রদের গোলগোলি তালুকের বর্ডারে যে বেঁটে পাহাড়ের রেঞ্জটা রয়েছে তার ওধারে দু'কিলোমিটার জুড়ে চায়ের জমি। তারপর ছোট মাপের শহর কামতিগঞ্জ। চেহারায় বা চরিত্রে মিশ্রদের ধরমপুরা টাউনের সঙ্গে কামতিগঞ্জের তফাত প্রায় নেই বললেই চলে। খোয়ার রাস্তার ওপর ছ'ইঞ্চি পুরু ধুলোর স্তর। কাঁচা নর্দমা দিয়ে কালো থকথকে স্রোত বয়ে চলেছে। তার ওপর দিনরাত উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা। এই খোলা নোংরা ড্রেনগুলো মশাদের পার্মানেন্ট মেটার্নিটি হোম।

এখানে বেশির ভাগই টিনের বা টালির চালের ঘর। ফাঁকে ফাঁকে বেঢপ চেহারার দু-চারটে একতলা দোতলা কি তিনতলা পাকা দালান।

সারাদিন ধুলো উড়িয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সাইকেল রিক্‌শা, বয়েল আর ভৈসা গাড়ি কামতিগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় চক্কর দেয়। সন্ধের পর মিউনিসিপ্যালিটির টিমটিমে বাতিগুলো থেকে যে অলোটুকু পাওয়া

যায় তাতে দশ ফুট দূরের মানুষও চোখে পড়ে না।

কামতিগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় আকছার যা চোখে পড়ে তা হল নতুন আর পুরনো মন্দির। বজরঙ্গবলী থেকে শিব দুর্গা লছমী, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর এমন কেউ নেই যার মন্দির এ শহরে দেখা যাবে না। প্রতিটি রাস্তায় কম করে দশ বারটা করে দেবদেবীর মূরত বা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মন্দির ছাড়া এখানে আর যা চোখে পড়বে তা হল পাল পাল ধর্মের ষাঁড় এবং বেওয়ারিশ কুকুর।

এ শহরের এক ধারে প্রায় পাঁচ একর জায়গা জুড়ে দ্বিবেদী বা দুবেদের বাড়ি 'ইন্দ্রধনুস'। বিহারের এই সব অঞ্চলের বড় জমিমালিকদের হাভেলি যেরকম হয়, এ বাড়িটা হুবহু তাই। উঁচু কমপাউণ্ড ওয়াল দিয়ে সীমানা ঘিরে রাখা হয়েছে। মাঝখানে দুর্গের মতো প্রকাণ্ড তেতলা। সেটার মাথায় রামসীতা মন্দির। মন্দিরটা এক মাইল দূর থেকে দেখা যায়।

বাড়িটার সামনের দিকে ফুলের বাগান। ত্রিকূটনারায়ণের ফুলের খুব শখ। রাজনীতির কারণে বছরের বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে দিল্লি আর পাটনা করে বেড়াতে হয়। যেটুকু সময় বাড়িতে থাকেন, তার অনেকটাই ফুলের পেছনে কেটে যায়।

বাগানের একধারে টিনের শেডের তলায় তিন চারটে নতুন এবং পুরনো মডেলের মোটর। চারপাশের অন্য জমিমালিকদের মতো ঘোড়ায় টানা ফিটন পছন্দ করেন না ত্রিকূটনারায়ণ। ঢিমে তালের জীবনে তাঁর একেবারেই রুচি নেই। তিনি চান স্পিড। বিহারের এই সব অঞ্চলের জীবনযাত্রা যেখানে গৈয়া ভৈসা আর ঘোড়ায় টানা টাঙ্গার যুগে পড়ে আছে, সেখানে তিনি দুরন্ত গতি আনতে চান।

বাড়িটার সামনের দিকে যেমন অজস্র দেশি বিদেশি ফুলের, পেছন দিকে তেমনি নানা ধরনের ফলের বাগান। সবেদা লিচু আম জাম জামরুল বাতাবি লেবু ইত্যাদি। সেখানে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি বানিয়ে নৌকর নৌকরনীদের থাকার ব্যবস্থা।

এখন সকাল। একতলার বিশাল বারান্দার এক ধারে যে সাবেক কালের বিশাল গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকটা দাঁড়িয়ে আছে সেটার কাঁটায় সাড়ে আটটা।

এর মধ্যেই রোদ বেশ চড়ে গেছে। গরম কাল যে আসছে বাতাসের উত্তাপে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে পরদেশি শুগা এবং বকের ঝাঁক চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। ওদিকে ফাঁকা শস্যক্ষেত্রগুলি অসীম নিঃস্বতা নিয়ে গা এলিয়ে পড়ে আছে একটানা দিগন্ত পর্যন্ত।

শীত গ্রীষ্ম বার মাস ভোরে সূর্যোদয়ের আগে উঠে পড়া ত্রিকূটনারায়ণের দীর্ঘকালের অভ্যাস। কামতিগঞ্জে থাকলে উঠেই তিনি ছাদে চলে যান। রামসীতার মূরতের সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে প্রথমে প্রণামটি সেরে নেন। তারপর ছাদেই একদমে আড়াই শ বুক ডন এবং বৈঠক দেওয়ার পর কিছুক্ষণ মুগুর ভাঁজেন। শারীরিক এই কসরতের পর ঠাণ্ডা জলে স্নানটি সেরে পোশাক পালটে নিচের বারান্দায় এসে বসেন।

শ্বেত পাথরের ঢালা বারান্দাটার আধাআধি জায়গা কার্পেটে মোড়া। তার ওপর পুরু গদিওলা পনের কুড়িটা সোফা আর সেন্টার টেবল চমৎকার করে সাজানো। কামতিগঞ্জে থাকলে বেশির ভাগ দিনই দুপুর পর্যন্ত এখানে কাটিয়ে দেন ত্রিকূটনারায়ণ। বেলা আটটার পর থেকে দর্শন মাঙনেওলারা ভিড় জমাতে থাকে। তা ছাড়া কামতিগঞ্জের বিশিষ্ট কিছু মানুষও আসেন। এঁরা তাঁর ইনার সার্কেলের লোক — বন্ধু, পরামর্শদাতা এবং হিতাকাঙক্ষী।

এই মুহূর্তে ত্রিকূটনারায়ণ বারান্দায় তাঁর আম দরবারে একটি সোফায় বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে বসেছেন কামতিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রাজভূষণ তেওয়ারি, ডাক্তার যুগলপ্রসাদ, স্থানীয় ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল প্রতাপরাম লাল এবং এখানকার বড় বিজনেসম্যান লালতাপ্রসাদ চৌবে।

বারান্দার তলায় নুড়ির রাস্তা। তারপর থেকে ফুলের বাগান। বাগানের পর প্রকাণ্ড লোহার গেট। সেখানে দুটো ভোজপুরী দারোয়ান গলায় টোটার মালা ঝুলিয়ে এবং কাঁধে দোনলা বন্দুক ফেলে টহল দিচ্ছে। ত্রিকূটনারায়ণ সকালে বারান্দায় নেমেই তাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আজ অন্য কোনো দর্শনমাঙোয়াকে যেন ভেতরে আসতে না দেওয়া হয়।

ত্রিকূটনারায়ণের পরনে এই মুহূর্তে ধবধবে চুস্ত আর ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের সামনে পেস্তা-বাদাম দেওয়া উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই-এর গেলাস সাজানো রয়েছে। আর রয়েছে প্রচুর পরিমাণে লাড্ডু, গুলাবজামুন, কাজু বাদামের বরফি এবং কলাকন্দ। তা ছাড়া প্লেটে প্লেটে নানা ধরনের ফল।

ধরমপুরা টাউনের মুকুটনাথ মিশ্রের মেয়ে কিরণের সঙ্গে ত্রিকূটনারায়ণের ছেলে হরীশের শাদির বিষয়েই তাঁদের মধ্যে গভীর এবং গূঢ় আলোচনা চলছে। এই কারণেই ত্রিকূটনারায়ণ আজ তাঁর বন্ধু ও পরামর্শদাতাদের বিশেষ করে ডাকিয়ে আনিয়েছেন।

ঠাণ্ডাই-এর গেলাসে লম্বা চুমুক দিয়ে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পবিত্র চেহারার প্রতাপরাম বলেন, 'এটা একটা পলিটিক্যাল ম্যারেজ। ডিপ্লোম্যাটিকও। এতে সব দিক থেকে আপনার লাভ ত্রিকূটজি।'

ত্রিকূটনারায়ণ ভারিক্কি চালে হাসেন, তবে কোনো উত্তর দেন না।

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বিপুল আকারের রাজভূষণ তেওয়ারি বলেন, 'পন্দ্র (পনের) সাল আগে ধরমপুরার মিশ্রদের সঙ্গে রিস্তেদারি করার জন্যে যে প্ল্যানিংটা করেছিলেন এবার তার রেজাল্ট পাওয়া যাবে। ত্রিকূটজির জবাব নেই।'

বড় সাইজের একটা গুলাবজামুন মুখে পুরে বিজনেসম্যান লালতাপ্রসাদ বলেন, 'এই না হলে পলিটিসিয়ান! পন্দ্র সাল পরের ঘটনা তিনি সিনেমার মতো দেখতে পেয়েছিলেন।'

দুই ঠোঁটে আধফোটা হাসি নিয়ে এই সব চাটুকারিতা উপভোগ করতে থাকেন ত্রিকূটনারায়ণ। বোঝা যায়, এ জাতীয় তোষামোদে তিনি চিরদিন অভ্যস্ত।

ডাক্তার যুগলপ্রসাদ কামতিগঞ্জের একমাত্র এম. বি. বি. এস। তিনি বলেন, 'গোলগোলি তালুকটা ছিল আমাদের সবচেয়ে উইক পয়েন্ট। আগেকার দুটো চুনাওতে ত্রিকূটজি ওখান থেকে টেন পারসেন্টের বেশি ভোট পাননি। শাদির কথা ঠিক হওয়ার পর জিততে শুরু করেছেন। তবে গোলগোলি তালুকের পুরা ভোট এখনও পান না। মনে হয় মুকুটজি কিছু হাতে রাখছেন। এ ব্যাপারে পুরা 'ধ্যান' দিচ্ছেন না। শাদিটা একবার হয়ে গেলে আশা করি হানড্রেড পারসেন্ট ভোট পাবেন।'

রাজভূষণ সামনের সেন্টার টেবলে প্রচণ্ড চাপড় মেরে বলেন, 'জরুর, জরুর—'

বিজনেসম্যান লালতাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করেন, 'এবার চুনাওটা হচ্ছে কবে?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'জুন মাসে, বারীষ নামবার আগে।'

'তা হলে তো আর বেশি দেরি নেই। এখন থেকে ক্যামপেনের কাজ চালু করে দেওয়া দরকার।'

'তার আগে যেটা বেশি দরকার তা হল হরীশের সঙ্গে মুকুটনাথজির বেটির শাদিটা চুকিয়ে ফেলা।'

প্রথমে বিমূঢ়ের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন লালতাপ্রসাদ। যে নির্বাচন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে তার আগে কেন ছেলের বিয়েটা সেরে ফেলা জরুরি, সেটা তাঁর মাথায় ঢোকে না। পরমুহূর্তে অবশ্য বিজলি চমকের মতো লালতাপ্রসাদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি প্রবল উৎসাহে মাথা এবং দুই হাত নেড়ে বলেন, 'সমঝ গিয়া, সমঝ গিয়া। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, এ শাদি পলিটিক্যাল শাদি। যত জলদি এ শাদি হয় আমাদের ততই ফায়দা। শাদির তারিখ কি ঠিক করে ফেলেছেন ত্রিকূটজি?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'মুকুটনাথজি তারিখটা জলদি জলদি জানিয়ে দেবেন বলেছেন। আমিও ভাবছি ফাগোয়ার মাসেই শাদিটা চুকিয়ে ফেলব।'

যুগলপ্রসাদ বলেন, 'এ মাসে তো শাদির অনেক ডেট আছে।'

ত্রিকূটনারায়ণ তাঁর দিকে ফিরে বলেন, 'পঞ্জিকা দেখেছি, মিনিমাম আট দশটা ডেট রয়েছে।'

'ভেরি গুড।'

একটু চুপচাপ।

তারপর এক চুমুকে বাকি ঠাণ্ডাইটুকু শেষ করে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আপনারা আমার দোস্ত, রিয়েল ওয়েল-উইশার। আপনাদের এবার একটা খুশ খবর দিই। শুনলে ভাল লাগবে।'

সবাই বিপুল আগ্রহে ত্রিকূটনারাণের দিকে তাকান। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ‘সুখবরটা কী?’

ত্রিকূটনারায়ণ রহস্যময় হেসে পালটা প্রশ্ন করেন, ‘আন্দাজ করুন।’

সবাইকে কিঞ্চিৎ চিন্তিত দেখায়। এবারও তাঁরা সমস্বরে বলে ওঠেন, ‘বুঝতে পারছি না।’

ত্রিকূটনারায়ণের হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে যায়। তিনি বলেন, ‘ছেলের শাদি দিতে যাচ্ছি। শাদিতে দহেজ পাব কি না?’

‘হাঁ হাঁ, জরুর।’

‘কী দহেজ পেতে পারি বলুন তো।’

লালতাপ্রসাদ বলেন, ‘হীরামোতি সোনাচাঁদি ফার্নিচার আর নগদ টাকা যা সবাই দিয়ে থাকে।’

‘নেহী লালতাপ্রসাদজি—’ মৃদু হেসে ত্রিকূটনারায়ণ বলতে থাকেন, ‘হরীশের শাদিতে যা পেতে যাচ্ছি আমাদের দুবে বংশ কোনোদিন তা পায়নি। আমি অবশ্য নিতে চাইনি। লেকেন মুকুটনাথজি জোর করেই আমাকে রাজি করিয়েছেন। সমধীর সঙ্গে এ নিয়ে ঝামেলা করা যায় না।’

‘কী দহেজ দিতে চেয়েছেন মুকুটনাথজি?’

‘ল্যাণ্ড—ল্যাণ্ড প্রোপার্টি।’

সবার চোখ চকচক করতে থাকে। রাজভূষণ অনেকখানি ঝুঁকে বলেন, ‘কতটা ল্যাণ্ড?’

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, ‘একশ বিঘা। গোলগোলি তালুকের লগভগ আধাআধি দিতে চেয়েছেন।’

কিছুক্ষণের জন্য দুবেদের এই বিশাল বাড়ি ‘ইন্দ্রধনুস’-এ স্তব্ধতা নেমে আসে। তারপর রাজভূষণই ফের শুরু করেন, ‘মিশ্ররা তো চিরকালই ছেলেদের শাদি দিয়ে ল্যাণ্ড নিয়েছে। এইভাবেই ওদের যত প্রোপার্টি। এক ধুর জমি ছাড়তে ওদের জান চলে যায়। মুকুটনাথজি এত ল্যাণ্ড দিতে রাজি হলেন যে?’

‘তা আমি বলতে পারব না।’ বলতে বলতে একটু কী ভাবেন ত্রিকূটনারায়ণ। তারপর যা বলেন তা এইরকম, ‘মুকুটনাথজির ছেলে নেই যে তার শাদি দিয়ে নতুন করে জমিন দহেজ পাবেন। অবশ্য জমিনের বদলে অন্য কিছুও তিনি দিতে পারতেন। আমার কোনো ডিমাণ্ড ছিল না।’

চাটুকারদের একজন হলেন লালতাপ্রসাদ। তিনি বলে ওঠেন, ‘তা তো আমরা জানিই। আপনার মতো মহান আদমী পরায়া প্রোপার্টি ডিমাণ্ড করবেন, এ আমরা ভাবতেই পারি না।’

প্রিন্সিপ্যাল প্রতাপরাম বলেন, ‘দুবেদের মতো কালচার্ড, নির্লোভ ফ্যামিলি বিহারে আর আছে কিনা সন্দেহ। ছেলের শাদি দিয়ে অন্যের কাছে তাঁরা হাত পাতবেন, এ আমাদের কল্পনার বাইরে।’

তোযামোদের কমপিটিশন শুরু হয়ে যায় যেন। ডাক্তার যুগলপ্রসাদ বলেন, ‘রামসীতাজির কৃপায় দুবেদের ল্যাণ্ড প্রোপার্টি, সোনচাঁদি, হীরামোতি কি কিছু কম আছে যে অন্যের কাছে হাত পাতবেন! এর কোনো জরুরতই নেই।’

রাজভূষণ চাটুকারিতার মাত্রাটা সূক্ষ্ম চারুকলার স্তরে তুলে নিয়ে যান। বলেন, ‘সব চেয়ে বড় ব্যাপার হল, কারুর কাছ থেকে কিছু নেবার মতো হীন মনোবৃত্তিই দুবে বংশের মানুষের নেই। তাঁরা হলেন মহান দাতা, বংশ পরম্পরায় অন্যাদের দিয়েই এসেছেন।’

যুগলপ্রসাদ বলেন, ‘তবে হাঁ, কেউ যদি নিজের থেকে কিছু দিতে চান সেখানে তো আর ‘না’ বলা যায় না। সেটা হবে অভদ্রতা।’

রাজভূষণ বলেন, ‘আমারও তাই মত। ত্রিকূটজি জোর করে আদায় করছেন না, মুকুটনাথজিরা খুশি মনেই তাঁর মেয়ের শাদিতে প্রোপার্টি দিচ্ছেন।’

এই সব ইনার সার্কেলের পরামর্শদাতা এবং বন্ধুরা যখনই ত্রিকূটনারায়ণকে ঘিরে বসেন তখনই বেশ খানিকটা সময় এ জাতীয় মধুর চাটুবাক্য তাঁকে শুনতে হয়। বলা যায়, এটা একটা নিয়মেই দাঁড়িয়ে গেছে। সবাই এত ভাল ভাল কথা বলছেন কিন্তু কারুর মুখ দিয়েই আসল কথাটি বেরুচ্ছে না। শুধু দহেজের কারণে এই দুবে বংশের তিন তিনটি বউ পোড়ানোর রেকর্ডও রয়েছে।

ত্রিকূটনারায়ণের মুখে হাসিটি লেগেই ছিল। পরিতৃপ্তিতে সেটা চকচক করতে থাকে। ধীরে ধীরে অত্যন্ত নরম গলায় তিনি এবার বলেন, ‘আপনারা ঠিকই বলেছেন, পরায়া ধন নেওয়ার মনোবৃত্তি

আমার নেই। তবু গোলগোলি তালুকের জমিনটা নিতে যে রাজি হয়েছি তার কারণ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন।'

রাজভূষণদের বুঝতে ভুল হয় না। তাঁরা প্রায় কোরাসেই বলে ওঠেন, 'হাঁ হাঁ, কারণটা সেন্ট পারসেন্ট পলিটিক্যাল।'

'গোলগোলি তালুকটা আমাদের হাতে এসে গেলে শুধু আমিই না, আমার পর হরীশ যদি পলিটিকসে নামে, ওখানকাব ভোটগুলো সে-ও পেয়ে যাবে।'

প্রিন্সিপ্যাল প্রতাপরাম কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলেন, 'মোস্ট সার্টেনলি। গোলগোলির ভোটগুলো পেয়ে গেলে জেনারেশনের পর জেনারেশন আপনারা এম. এল. এ কি এম. পি হতে পারবেন। হরীশের শাদিতে দুবে বংশের এটাই সব থেকে বড় লাভ।'

ত্রিকূটনারায়ণ হাসেন।

এরপর হরীশের বিয়ে এবং তার পরবর্তী নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা করতে করতে সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে আসে। স্থির হয়, আপাতত বিয়েটাই আসল ব্যাপার। সমস্ত মনোযোগ এবং এনার্জি সেখানেই প্রয়োগ করা হবে। তারপর প্রবল উদ্যমে নির্বাচনের কাজে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

একসময় আজকের মতো ইনার সার্কেলের সভা ভেঙে যায়। রাজভূষণরা বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর একতলার আম দরবার থেকে দোতলায় চলে আসেন ত্রিকূটনারায়ণ।

দোতলায় উঠলেই লম্বা টানা বারান্দা চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। বারান্দা প্রায় দশ ফুটের মতো চওড়া। সেটার একটা দিক গ্রিল দিয়ে ঘেরা। আরেক দিকে সারি সারি পনেরটা বিরাট বিরাট ঘর। বেশির ভাগ ঘরই তালাবন্ধ। কেননা এ বাড়িতে লোকজন বিশেষ নেই। ত্রিকূটনারায়ণ, তাঁর স্ত্রী রেবতী, হরীশ, দুই বিধবা পিসি, আর ডজন দেড়েক নৌকর এবং নৌকরনী। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের একজন থাকে দ্বারভাঙ্গায়, আরেক জন গিবিডিতে। দুই শুচিবাইগ্রস্ত বিধবা পিসি তাঁদের যাবতীয় সংস্কার, ছুঁয়াছুতের বিচার ইত্যাদি নিয়ে একতলায় পড়ে থাকেন। পৃথিবীর কোনো কিছুর সঙ্গেই তাঁদের বিশেষ যোগাযোগ নেই।

ত্রিকূটের বড় পিসির বিয়ে হয়েছিল সাত বছর বয়সে। স্বামীর বয়স তখন তেতাল্লিশ। দু বছরের মধ্যেই তিনি বিধবা হন। ছোট পিসির বিয়ে হয়েছিল এগার বছর বয়সে, পঞ্চাশ বছরের এক বিরাট জমিমালিকের সঙ্গে। বিয়ের তিন বছরের মাথায় এই জমিমালিকটিরও দেহান্ত ঘটে। বিধবা হওয়ার পর থেকেই দুই বোন বাপের বাড়ি 'ইন্দ্রধনুস'-এ এসে আছেন। জপতপ, ধর্মকর্ম, পূজাপার্বণ ইত্যাদি নিয়ে নিমগ্ন একাহারী মানুষ দু'টির অস্তিত্ব একেবারেই টের পাওয়া যায় না। নিজেদের আলাদা একটি জগৎ তৈরি করে তাঁরা তার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন।

হরীশও বেশির ভাগ সময় কাটায় পাটনার হস্টেলে। আর রাজনীতির কারণে সারা বছরই হিল্লি দিল্লি করে বেড়াতে হয় ত্রিকূটনারায়ণকে। কাজেই 'ইন্দ্রধনুস'-এ বেশির ভাগ সময়টা প্রায় একাই থাকতে হয় রোহিণীকে। একা বলাটা ঠিক হল না। কেননা তাঁর বাপের বাড়ির বিপুল জনবল। সাত সাতটি ভাই এবং তাঁদের বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রায় পঁচিশ তিরিশ জন। এই ভাই এবং তাদের বউদের কেউ না কেউ দু-এক মাস পর পরই এখানে হানা দিচ্ছে। যেমন এই মুহূর্তে ত্রিকূটনারায়ণের শালা রাজেশ এবং তার স্ত্রী উত্তরা তাদের দুটো বাচ্চাকে নিয়ে এ বাড়িতেই আছে। পরশু এসেছে তারা. থাকবে দিন দশেকের মতো।

বারান্দার একধারে বিশাল অ্যাকুয়েরিয়ামে অজস্র রঙিন মাছ। সিলিং থেকে সাত আট ফুট দূরে দূরে তারের জাল দিয়ে তৈরি চৌকো চৌকো পাখির খাঁচা ঝুলছে। সেগুলোর কোনোটায় তোতা. কোনোটায় ডজন ডজন মুনিয়া, কোনোটায় ম্যাকাও, কোনোটায় বা জোড়া জোড়া কাকাতুয়া।

কাকাতুয়াগুলো সবাই কিছু না কিছু বুলি শিখেছে। কেউ সুর করে বলছে 'রাধাকিষুণ', কেউ 'সীয়ারাম', কেউ বা 'জয় জয় শিউশঙ্কর'। অন্য পাখিরা দুর্বোধ্য ভাষায় কিচির মিচির করছে।

পাখিগুলো ত্রিকূটনারায়ণকে দেখে প্রচুর হই চই বাধিয়ে দেয় এবং খাঁচার ভেতর সমানে ডানা ঝাপটাতে থাকে। তাঁকে ওরা খুব ভাল করেই চেনে।

প্রতিটি খাঁচার কাছে মিনিটখানেক করে দাঁড়িয়ে খুব কোমল গলায়, গাঢ় স্নেহে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'ঠিক হ্যায় রে চুন্নুয়া মুন্নুয়া বুন্নুয়া—'

সবাইকে আদর করতে করতে তিনি এগিয়ে যান। এত বড় টানা বারান্দায় ত্রিকূটনারায়ণ ছাড়া এখন আর কেউ নেই। নিচের তলায় নৌকর নৌকরনীরা যে যার কাজ করছে।

এই অংশটা থেকে বাড়ির পেছন দিকটা পুরোপুরি দেখা যায়। সেখানে ফলের বাগানে তিন চারটে দেহাতী কেউ গাছের গোড়ায় জল দিচ্ছে, কেউ আগাছা সাফ করছে, কেউ বা বড় কাঁচি দিয়ে গাছের বুড়ো পাতা ছাঁটছে।

হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটায় চলে এলেন ত্রিকূটনারায়ণ। এটাই তাঁর শোওয়ার ঘর।

তিরিশ ফুট লম্বা বিশ ফুট চওড়া এই প্রকাণ্ড ঘরটা আগাগোড়া ছ ইঞ্চি পুরু দামি কার্পেটে মোড়া। নতুন এবং পুরনো আসবাবে চারদিক ঠাসা। প্রথম কেউ এসে ঢুকলে মনে হবে কোনো ফার্নিচারের দোকানে এসে পড়েছে।

এখানেই রোহিণী রাজেশ এবং উত্তরাকে পাওয়া গেল। রাজেশের বাচ্চাদুটোকে দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই নৌকর নৌকরনীদের কেউ তাদের বাগানে টাগানে নিয়ে গেছে।

রোহিণী যথারীতি প্রচুর হীরেমোতি আর সোনার ভারি ভারি গয়না সারা গায়ে চড়িয়ে, দামি চোখ-ধাঁধানো শাড়ি পরে একটি সোফায় বসে আছেন। এইভাবে সারাদিন সেজেগুজে পটের রানী হয়ে থাকতে তাঁর ভাল লাগে।

রোহিণীর হাতের কাছে একটা লম্বা সরু টেবলে চাঁদির প্রকাণ্ড পানের ডিবে আর তিন চারটে বাহারে জর্দার কৌটো। দিনে কম করে তিরিশ চল্লিশ খিলি পান তিনি খেয়ে থাকেন।

রোহিণীর মুখোমুখি বসে আছে হরীশ রাজেশ এবং উত্তরা।

রোহিণী মজার গলায় বলেন, 'কি, তোমাদের মিটিং ভাঙল লিডারজি?' স্বামীকে ঠাট্টা টাট্টা করে মাঝে মাঝেই 'লিডারজি' বলে থাকেন তিনি।

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'তা ভেঙেছে, লেকেন তোমাদের মিটিং তো পুরাদমে চলছে দেখছি।'

'তা চলছে। তোমাদের মিটিং-এ কী কথা হল? স্রিফ পলিটিকস, তাই না?' এম. এল. এ, এম. পি, মিনিস্টার, দিল্লি, পাটনা—এ সব ছাড়া দুনিয়ার আর কিছুই তোমরা জানো না।'

রাজনীতি ত্রিকূটনারায়ণের ধ্যানজ্ঞান এবং সর্বক্ষণের চিন্তা হলেও প্রাণের ভেতরটা তাঁর কর্কশ হয়ে যায়নি। মজা বা তামাশা করতে তিনিও যথেষ্টই পটু। একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন, 'নেহী বিবিজি, আজ পলিটিকস নিয়ে বাতচিত হয়েছে টোয়েন্টি পারসেন্ট, বাকিটা হয়েছে তোমার ছেলের শাদির ব্যাপারে। মনে হচ্ছে, তোমরাও একই টপিক নিয়ে শির থেকে পসিনা বইয়ে দিচ্ছ।'

'ঠিকই ধরেছ।'

রাজেশ একজন মাঝারি ধরনের ঠিকাদার। 'ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট' ওয়ার্ল্ডের মানুষ। সে বলে, 'আমরা শুধু গপ সপ করে আসর গরমই করছি না দুবেজি। কাজের কাজও কিছু করেছি।'

ত্রিকূটনারায়ণ তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেন, 'কাজের কাজটা কী শালে-সাহেব?'

'হরীশ আর নয়া বহুর জন্যে পুব দিকে বড় কামরাটা সাজিয়ে ফেলেছি।'

এটা একটা নতুন খবর বটে। এবং অভাবিতও। রীতিমত অবাক হয়েই ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'শাদির ডেট এখনও ঠিক হয়নি। এর মধ্যে ছেলে আর বহুর কামরা সাজিয়ে ফেলেছ!'

রাজেশ বলে, 'শাদি তো হবেই। একটা একটা করে কাম গুছিয়ে রাখছি। কিরকম সাজিয়েছি, দেখবেন চলুন।'

'এখন থাক। বহুত ভুখ লেগেছে। আগে ভোজন চুকিয়ে নিই, তারপর দেখা যাবে।'

'সেই ভাল।'

রোহিণী সোফা থেকে উঠতে উঠতে বলেন, 'এবার একটা দরকারি কথা বলি।'

ত্রিকূটনারায়ণ জিজ্ঞেস করেন, 'কী?'

'রাজু তো কিরণকে দ্যাখেনি। ওর ইচ্ছা আজ একবার হরীশকে নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে আসে। তুমি মুকুটনাথজিকে খবর পাঠিয়ে দাও, বিকেলে রাজুরা যাবে।'

কিরণকে দেখার ইচ্ছাটা কার যে বেশি তা বুঝতে এক মুহূর্ত সময়ও লাগে না ত্রিকূটনারায়ণের। চোখের কোণ দিয়ে হরীশকে দেখতে দেখতে বলেন, 'ঠিক হ্যায়, এখনই তৌহরকে 'মিশ্র নিকেত'-এ পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আট

সাগিয়াকে দিয়ে গোপনে কিরণ প্রভাকরকে সেদিন যে চিঠিটা পাঠিয়েছিল তারপর কয়েকটা দিন কেটে গেছে। এখনও প্রভাকরের কাছ থেকে কোনো উত্তর আসেনি। ফলে কিরণ রীতিমত সংশয় এবং উৎকণ্ঠার মধ্যেই রয়েছে।

সাগিয়া যথেষ্ট চালাক চতুর মেয়ে। তবু শেষ পর্যন্ত চিঠিটা ডাকে দিতে পেরেছে কিনা কে জানে। যদিও সেদিন জোর দিয়েই সাগিয়া বলেছিল, পোস্ট অফিসে গিয়ে চিঠিটা সে লেটার বক্সে ফেলে এসেছে।

এমনও হতে পারে, প্রভাকর হয়ত এই মুহূর্তে দিল্লিতে নেই। এই কারণে চিঠি তার ঠিকানায় পৌঁছলেও উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু দু-চারদিনের ভেতর প্রভাকর যদি কোনো ব্যবস্থা না করে ফেলতে পারে কিরণকে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়তে হবে। সে শুনেছে খুব তাড়াতাড়িই বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলবেন বশিষ্ঠনারায়ণ।

প্রায়ই কিরণের মনে হয়, মরিয়া হয়ে এবার সে পেটের ভ্রূণটার কথা জানিয়ে দেবে, কিন্তু জানাতে গিয়েও পারে না। লজ্জায় বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, অতটা বেপরোয়া হওয়া এখনও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু কিছু একটা তাকে করতেই হবে।

এবার 'মিশ্র নিকেত'-এ ফেরার পর থেকে বাড়িতে একরকম বন্দি জীবনই কাটাতে হচ্ছে কিরণকে। নিজের ঘরটি থেকে সে প্রায় বেরোয় না বললেই চলে। দিনে একবার অবশ্য মহেশ্বরী তাকে ডেকে পাঠান। সেখানে অনিবার্য নিয়মে কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ থাকবেনই। দু'জনে মিলে তাঁরা তাকে সুনীতি, সংযম, 'মিশ্র নিকেত'-এর কৌলীন্য এবং মর্যাদা, সদ্বংশের মেয়েদের আচার আচরণ, রাহান সাহান ইত্যাদি সম্পর্কে বিপুল গাম্ভীর্যে পুরো এক দেড় ঘণ্টা উপদেশ দিয়ে যান। উপদেশের ফাঁকে ফাঁকে শাস্ত্রে পবিত্র ব্রাহ্মণ কুমারীদের বিষয়ে যে সব খটর মটর সংস্কৃত শ্লোক রয়েছে সেগুলো আওড়াতে থাকেন বশিষ্ঠনারায়ণ। এ সবের একটা বর্ণও কিরণের মাথায় ঢোকে না, শুধু কানের পর্দায় সেগুলো একটানা বিপর্যয় ঘটিয়ে যায়। এইসব সংস্কৃত শ্লোকের উদ্দেশ্য কী, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না কিরণের। প্রভাকর সম্বন্ধে এঁদের সন্দেহ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। তাঁদের ধারণায় যদি সামান্য দুর্বলতা এখনও থেকে থাকে, ওইভাবে তা শোধন করে নিতে চান।

দিল্লিতে প্রায় স্বাধীনভাবেই এতগুলো বছর কাটিয়ে এসেছে কিরণ। কলেজ হস্টেলে নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতেই হয়। সেটুকু বাদ দিলে তার চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল অবাধ। সেখানকার মুক্ত কসমোপলিটান আবহাওয়া থেকে এবার ধরমপুরায় আসার পর প্রতি মুহূর্তে কিরণের মনে হচ্ছে, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাড়ি থেকে যে বেরুবে তারও উপায় নেই। সে বুঝতে পারে তার ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

ছেলেবেলার এক বন্ধু আছে কিরণের। তার নাম ললিতা। সে ধরমপুরারই মেয়ে এবং তের বছর বয়সে এই শহরেরই একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। ধরমপুরার পুব দিকের শেষ মাথায় জানকীটোলিতে তার শ্বশুরবাড়ি।

ছেলেবেলার বন্ধুদের মধ্যে ললিতার সঙ্গে কিরণের যোগাযোগটুকু এখনও থেকে গেছে, যদিও জীবন সম্পর্কে ধ্যানধারণা এবং স্বভাবের দিক থেকে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ। এই বয়সেই তিনটি ছেলেমেয়ের মা হয়ে গেছে ললিতা। বাচ্চা মানুষ করা, শ্বশুর শাশুড়ির সেবাযত্ন, হাজারটা

গেঁয়ো সংস্কার নিয়ে তার মা-ঠাকুমাদের তৈরি পরম্পরা মেনে নিয়ে দিন কাটিয়ে-দিচ্ছে ললিতা। প্রাচীন সাংসারিক ট্রাডিশন ভাঙার কথা সে ভাবতেও পারে না। দিল্লিতে না গেলে এই জীবনই হাসিমুখে, বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হত কিরণকে। কেননা, এর বাইরেও মেয়েরা যে মাথা উঁচু করে নিজেদের মর্যাদা নিয়ে অন্যভাবে বাঁচতে পারে তা সে জানতেও পারত না। ভাবতেও পারত না মেয়েদের আলাদা কোনো আইডেনটিটি থাকতে পারে।

জীবনযাত্রার দিক থেকে ললিতা যেন একশ বছর পিছিয়ে আছে। তবু সাদাসিধে হাসিখুশি ঘোরপ্যাঁচহীন ছেলেবেলার এই বন্ধুটিকে খুবই পছন্দ করে কিরণ। দিল্লি থেকে ছুটিছাটায় ধরমপুরায় এলে প্রায় রোজই সে ললিতার শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি সাইকেল রিক্‌শা ধরে সে, তারপর সোজা জানকীটোলি। কিন্তু এবারেই যাওয়া হয়নি। প্রায় সাত আট দিন হল খুবলাল তাকে ধরমপুরায় নিয়ে এসেছে। তারপর থেকে এমন সব কাণ্ড ঘটে চলেছে যে ললিতার কাছে যাওয়ার কথা প্রথম দিকে তার মনেও পড়েনি। পরশু দুপুরে হঠাৎ যখন মনে পড়ল তখনই যেতে চেয়েছিল কিরণ। 'মিশ্র নিকেত'-এর দম বন্ধ-করা আবহাওয়া থেকে বেরুতে পারলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও সে উৎকণ্ঠা অশান্তি এবং উত্তেজনা ভুলে থাকতে পারত।

কিন্তু দোতলা থেকে নেমে গেটের কাছে আসতেই বিপুল চেহারার ভোজপুরী দারোয়ান কাঁচুমাচু মুখে অত্যন্ত সসম্ভ্রমে জানিয়েছিল, কিরণের একা একা বাইরে যাওয়ার হুকুম নেই।

প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিল কিরণ। পরক্ষণে অসহ্য রাগে মাথার ভেতর রক্ত যেন ফুটতে শুরু করেছে। ইচ্ছা হচ্ছিল, লোকটার গালে চড় কষিয়ে দেয়। তীব্র গলায় সে প্রায় চিৎকারই করে উঠেছে, 'কার হুকুম?'

দারোয়ান ভয়ে ভয়ে বলেছে, 'বড়ে সরকারকা, দিদিজি—'

বড়ে সরকার, অর্থাৎ মুকুটনাথ মিশ্র। বাবুজি যে এভাবে তার ওপর মধ্যযুগীয় ডিকটেটরশিপ চালাবেন, এতটা ভাবতে পারেনি কিরণ। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল, সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করেছিল।

দারোয়ান এবার বলেছে, 'মেরা কোঈ কসুর নেহী দিদিজি—'

সত্যিই তো, এই লোকটার ওপর রাগারাগি করে লাভ নেই। সে সামান্য নৌকর মাত্র। যার নুন খায় তার হুকুম তামিল করতে সে বাধ্য।

কিরণ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় রেবতী গেটের কাছে চলে আসেন। খুব সম্ভব শিউশঙ্করজির নতুন মন্দির বা মহেশ্বরীর কামরা কিংবা অন্য কোথাও থেকে তিনি তাকে দেখে থাকবেন। রেবতী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এখানে কী করছ?'

কী কারণে সে গেটের কাছে এসেছে, কিরণ জানিয়ে দিয়েছে।

রেবতী বলেছেন, 'ললিতার সসুরালে যেতে হবে না। নিজের ঘরে যাও।' তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত কিন্তু দৃঢ়।

কিরণ বলেছে, 'প্রতি বারই তো দিল্লি থেকে এসে ওর কাছে যাই।'

'অন্য সব বার গেছ বলে এবারও যেতে হবে, এমন কোনো কথা আছে?'

'যাব না-ই বা কেন?'

'আমরা কেউ চাই না, সেই জন্যে যাবে না।'

মাথার ভেতর রক্ত টগবগ করছিলই। কিরণের মনে হচ্ছিল যে কোনো মুহূর্তে সেটা ফেটে যেতে পারে। প্রবল উত্তেজনা এবং স্নায়বিক চাপের মধ্যেও দ্রুত চারপাশ একবার দেখে নিয়েছে কিরণ। গেটে দারোয়নরা তো রয়েছেই, এধারে ওধারে নৌকর নৌকরনীরা ঘাড় গুঁজে কাজ করছিল। কিরণ প্রাণপণ চেষ্টায় বিপজ্জনক কিছু ঘটতে দেয়নি। কাজেব লোকেদের সামনে অপ্রিয় একটি নাটক করার মতো রুচি তার নেই। ইচ্ছা করলে জোর করেই সে ললিতাদের বাড়ি যেতে পারত। তাকে আটকাতে হলে দারোয়ানকে গায়ে হাত দিতে হবে। তেমন দুঃসাহস বা ক্ষমতা কোনোটাই তার নেই।

কিরণ চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করেছে, 'কেন তোমরা চাইছ না? কী এমন কারণ ঘটেছে?'

যে রেবতী চিরদিনই শান্ত, নির্বিরোধ, যাঁর অস্তিত্ব এই 'মিশ্র নিকেত'-এ প্রায় টেরই পাওয়া যায় না—সেই মুহূর্তে তিনি প্রায় মারমুখী হয়ে উঠেছেন। উগ্র গলায় বলেছেন, 'তর্ক না করে নিজের ঘরে চলে যাও।'

কিরণ আর কিছু বলেনি, স্থির চোখে মায়ের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে সামনের ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে বাড়ির দিকে চলে গিয়েছিল।

এখন নিজের ঘরে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে অন্যমনস্কের মতো জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে কিরণ।

বিকেল হয়ে গেছে।

ঘণ্টাখানেক আগেও রোদ থেকে হলকা ছুটছিল যেন। ধরমপুরার ওপর দিয়ে গনগনে লু-বাতাস অদৃশ্য ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে দূরে শস্যহীন মাঠগুলোর দিকে ধাওয়া করে যাচ্ছিল। রোদের তাপ দ্রুত জুড়িয়ে আসছে, তার রংও বদলে গেছে। এখন রোদেব রং হলুদ। সন্ধের আগেই সমস্ত চরাচব জুড়ে আরামদায়ক স্নিগ্ধতা নেমে আসবে।

সাগিয়া ঘরে এসে ঢোকে। তার হাতে পোর্সেলিনের দামি কাপে ব্ল্যাক কফি। রোজ এই সময়টা কফি করে নিয়ে আসে সে।

সাগিয়ার পায়ের আওয়াজে মুখ ফিরিয়ে তাকায় কিরণ। কফির কাপটা নিতে নিতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যেতে বলে, 'আচ্ছা সাগিয়া—'

সাগিয়া কিরণের মুখের দিকে তাকায়, 'কী দিদিজি?'

কিরণ অনেকটা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'সেদিন চিঠিটা ঠিকমতো ডাকে দিয়েছিলি তো?' এই প্রশ্নটা সে আগে আরো কয়েক বার করেছে।

সাগিয়া বলে, 'হাঁ দিদিজি। আমি নিজের হাতে ডাকে দিয়েছি। চিন্তা করো না। যাকে লিখেছ সে ঠিক পেয়ে যাবে।'

কিরণ আর কিছু বলে না, ফের জানালা দিয়ে অনেক দূরে বাইরের রাস্তার দিকে তাকায়।

সাগিযা কিছুক্ষণ তাকে লক্ষ করে, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবনাটা আবার তার মাথায় ফিরে আসে। এবার 'মিশ্র নিকেত'-এ এসে যেভাবে সে ফাঁদে আটকে গেছে তাতে প্রভাকরই একমাত্র তাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যেতে পারে। প্রভাকরের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া তার কাছে অন্য কোনো পথই খোলা নেই।

হঠাৎ কিরণের চোখে পড়ে, একটা মোটর দূরের হাইওয়ে থেকে পাশের রাস্তায় ঢুকে তাদের বাড়ির দিকেই আসছে। একটু পর গাড়িটা তাদের বিশাল গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

কিরণ প্রথমটা ভাল করে লক্ষ করেনি। এবার দেখতে পায়, মোটর থেকে চর্বির ছোটখাট একটি পাহাড় নেমে আসছে। বছর দুই পর দেখলেও চিনতে অসুবিধা হয় না কিরণের। ত্রিকূটনারায়ণেব ছেলে হরীশ। দু বছর আগে কিরণ তার যে চেহারা দেখেছিল এখন সে তার প্রায় দেড় গুণ। যেভাবে সারা শরীরে হরীশ চর্বি জমাচ্ছে তাতে পাঁচ বছর বাদে তার আকার কী দাঁড়াবে ভাবতেও ভয় হয়।

সাত আট বছর বয়সেই এই ছেলেটার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। মহেশ্বরীর কথায় হরীশ নাকি তার জন্ম-জন্মান্তরের স্বামী। একটা অর্ধশিক্ষিত আন-কালচারড বেঢপ চেহারার ছোকরাকে চক্রান্ত করে মিশ্র এবং দুবে ফ্যামিলি তার কাঁধে চাপিয়ে দিতে চলেছে। বিয়ে সম্পর্কে তার নিজস্ব যে একটা মতামত থাকতে পারে, এ নিয়ে আদৌ কারুর মাথাব্যথা নেই। মুকুটনাথ এবং ত্রিকূটনারায়ণেব সিদ্ধান্তটাই হচ্ছে একেবারে চূড়ান্ত। এর বিরুদ্ধে কারুর কিছু যে বলার থাকতে পারে, তাঁদের কথাই যে শেষ কথা নয়, এ সব ভেবে দেখার প্রয়োজনই বোধ করেন না মুকুটনাথেরা। দিল্লিতে না গেলে সে জানতেই পারত না তাদের সোসাইটিতে মেয়েদের আসল জায়গাটা ঠিক কোথায়। হরীশের সঙ্গে তাব বিয়েটাকে অদৃষ্ট, নিয়তি, বিধিলিপি ইত্যাদি বলেই সে ধরে নিত।

হরীশের পেছন পেছন রাজেশও নেমে এসেছিল। হরীশের চাইতে সাত আট বছরের বড় সে। ধারাল চেহারা, শরীরে এক গ্রাম অনাবশ্যক মেদ নেই।

রাজেশকে আগে কখনও দেখেনি কিরণ। যাই হোক, দু'জনকে দেখতে দেখতে কপাল কুঁচকে যায় তার। অসহ্য বিরক্তি এবং রাগে শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে আসে। কপালের দু'পাশের শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে যাবে।

এদিকে রাজেশরা মোটর থেকে নামতেই নৌকররা দৌড়ে যায়। তারপর দেখা গেল শশব্যস্তে মুকুটনাথ প্রায় ছুটতে ছুটতে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং বিগলিত ভঙ্গিতে কিছু বলছেন। কথাগুলো শোনা না গেলেও বোঝাই যাচ্ছে, যথেষ্ট খাতির করে হরীশদের বাড়ির ভেতর যেতে অনুরোধ করছেন।

কিছুক্ষণ পর হরীশদের সঙ্গে নিয়ে মুকুটনাথ প্রথমে নতুন শিব মন্দিরের দিকে গেলেন। সেখানে হরীশরা শিউশঙ্করজির মূরতকে প্রণাম করে মুকুটনাথের সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে শ্বেতপাথরে বাঁধানো একতলার উঁচু বারান্দায় উঠতে লাগল। একটু পর তারা চোখের আড়ালে চলে যায়।

কয়েক মিনিট বাদে কী ঘটতে চলেছে, দোতলায় নিজের ঘরে বসে পরিষ্কার যেন দেখতে পায় কিরণ। তার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে।

যা ভাবা গিয়েছিল, তা-ই ঘটে যায়। কিছুক্ষণ পর রেবতী দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

কিরণের মনে হয়েছিল, সাগিয়া বা অন্য কোনো নৌকরনীকে তার কাছে পাঠানো হবে। কেননা এবার দিল্লি থেকে তাকে নিয়ে আসার পর রেবতী বা মুকুটনাথ কেউ তার ঘরে একদিনও আসেননি। মাকে দেখে কিরণ চমকে ওঠে।

রেবতী বলেন, 'হরীশ এসেছে।'

কিরণ উত্তর দেয় না।

রেবতী ফের বলেন, 'ভাল শাড়ি-জামা পরে নে। সুষমা এসে তোকে নিয়ে যাবে।' চিরকালের শান্ত চুপচাপ মায়ের গলায় কর্তৃত্ব এবং আদেশের সুর।

অর্থাৎ সাজগোজ করে হরীশদের কাছে তাকে যেতে বলছেন রেবতী। কিরণের মাথার ভেতরটা জ্বালা করতে থাকে। ভাবল—বলে ফেলে, সে সং টং সেজে যেতে পারবে না। কিন্তু বলার আগেই মা দরজার সামনে থেকে চলে গেছেন।

বেশ খানিকক্ষণ অনড় হয়ে বসে থাকে কিরণ। খাট থেকে নেমে পোশাক বদলাবার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। একসময় নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে কী ভেবে শাড়ি টাড়ি পালটে নেয়, এমনকি মুখে গালে গলায় পাউডারও বুলোয়, শাড়িতে দামি একটু সেন্টও ছড়িয়ে দেয়।

একটু সাজসজ্জা করে না গেলে এখনই হই চই শুরু হয়ে যাবে। মুকুটনাথ এবং রেবতী দৌড়ে আসবেন। এই মুহূর্তে যখন সে কোনোরকম কনফ্রনটেশনে যাচ্ছে না তখন উত্তেজনা বাড়িয়ে কী লাভ ? প্রভাকরের চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত তার অধৈর্য হলে চলবে না।

সুষমা এসে ঘরের ভেতর দাঁড়ায়। কোমরে দুই হাত রেখে মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে হেলিয়ে কিরণকে মিনিট খানেক দেখে নেয় সে। তারপর কর্কশ গলায় বলে, 'বিলকুল সিনেমার হিরোইন সেজেছিস দেখছি। বর এসেছে, মনে খুশির লহর খেলে যাচ্ছে!'

বিতৃষ্ণা এবং বিরক্তিতে সারা মন ভরে আছে, তবু সুষমার সঙ্গে একটা মজা করতে ইচ্ছা হল। বলল, 'এক কাজ করবি সুষমা?'

ভুরু কুঁচকে সন্দিগ্ধ চোখে কিরণকে লক্ষ করে সুষমা। বলে, 'কী?'

'হরীশকে তুই বিয়ে করবি? যদি করিস তো বাবুজিকে বলে ব্যবস্থা করে দিই।' বলে নিপাট ভালমানুষের মতো মুখ করে তাকায় কিরণ।

সুষমা একেবারে খেপে যায়। হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হিংস্র মুখে বলে, 'ওই হাথীকে আমার দরকার নেই। তোর হাথী তোরই গলায় ঝুলুক। এখন চল, নিচে বাবুজি ডাকছে।'

একটু পর সুষমার সঙ্গে একতলায় বসার ঘরে চলে আসে কিরণ। এখানেই সেদিন রোহিণী এবং

ত্রিকূটনারায়ণকে বসানো হয়েছিল।

এই মুহূর্তে পাশাপাশি দুটো সোফায় বসে আছে হরীশ আর রাজেশ। তাদের মুখোমুখি অন্য একটা সোফায় মুকুটনাথ। হরীশের সামনে নিচু সেন্টার টেবলে প্রচুর মিঠাই আর নোনতা খাবার। আর ট্রেতে রয়েছে চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম এবং কয়েকটা দামি কাপ-প্লেট।

মুকুটনাথ দিল্লি থেকে আসার পর কিরণের সঙ্গে দু-একটার বেশি কথা বলেননি। তাঁর চোখমুখ দেখে টের পাওয়া গেছে, সারাক্ষণ তার ওপর বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। কিন্তু হরীশের সামনে হাসিমুখে, অত্যন্ত নরম গলায় ডাকলেন, 'আ বেটা, এখানে আয়।' কিরণকে নিজের পাশের সোফায় বসিয়ে বললেন, 'হরীশ আর রাজেশ এসেছে। রাজেশকে তো তুই আগে দেখিসনি। ও হরীশের ছোট মামা।'

রাজেশের মতো অল্পবয়সী যুবককে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে কিনা প্রথমটা কিরণ ভেবে উঠতে পারল না। তারপর মনস্থির করে ফেলল। হাতজোড় করে বলল, 'নমস্তে—'

চোখ কুঁচকে কিরণকে একবার দেখে নিলেন মুকুটনাথ। বয়স কম হলেও সম্পর্কে রাজেশ তার গুরুজন। তার পায়ে মাথা ঠেকানো খুবই উচিত ছিল। কিন্তু যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। রাহান সাহান এবং সহবত নিয়ে এখন চেঁচামেচি বা বকাবকি করলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। মুকুটনাথ প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখলেন।

রাজেশ খারাপভাবে ব্যাপারটা নেয়নি। সে-ও হাতজোড় করে বলে, 'নমস্তে—'

এরপর কিছুক্ষণ এলোমেলো কথাবার্তার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়ান মুকুটনাথ। বলেন, 'আচ্ছা, তোমরা গল্পটল্প কর। আমি যাই। জরুরি কাজ আছে।'

সুষমা খানিকটা দূরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে সঙ্গে করে বাইরে চলে গেলেন মুকুটনাথ। রাজেশ যদিও থেকে গেল তবু খানিকটা খোলামেলা কথা বলার এবং মেলামেশার সুযোগ কিরণরা পাবে। অল্পবয়সী মামারা অনেকটা বন্ধুর মতো। মুকুটনাথ থাকলে ওদের অস্বস্তি হবে।

কিরণ ঘরে ঢোকামাত্র হরীশের ছোট ছোট গোল চোখ দুটো তার গায়ে যেন আটকে গিয়েছিল। তখন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও তার দিক থেকে চোখ সরায়নি হরীশ।

এবারই শুধু নয়, আগেও যখন দু-একবার হরীশের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কিরণের দিকে পলকহীন তাকিয়ে থেকেছে সে। তার তাকানোটা এমন যে গা ঘিন ঘিন করে। মনে হয়, চামড়ার ওপর দিয়ে একটা নোংরা পোকা হেঁটে যাচ্ছে। কিরণ ভাবল, মুকুটনাথেরা জোরজার করে এই লোকটার সঙ্গে যদি তার জীবন কাটাবার ব্যবস্থা করেন, দু দিনেই নির্ঘাত মরে যাবে সে।

হরীশ বলল, 'রাজু মামা তোমাকে তো আগে দেখেনি—তাই ধরে নিয়ে এলাম।'

কিরণ বলে, 'উনি যে দয়া করে এসেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ।' বলতে বলতে হঠাৎ তার চোখে পড়ে সেন্টার টেবলে যে দামি দামি মিঠাই পড়ে আছে, সেগুলো এখনও ছোঁয়নি হরীশরা। কিরণ এবার অনুরোধের সুরে বলে, 'একি, আপনারা তো কিছুই খাচ্ছেন না। প্লিজ, আরম্ভ করুন।'

'আপনি' না 'তুমি' কিরণকে কী বলবে, এই নিয়ে রাজেশকে কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত দেখায়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে কুণ্ঠাটা কাটিয়ে ওঠে। কয়েক দিনের মধ্যে যে মেয়েটি তার ভাঞ্জা বা ভাগনের স্ত্রী হতে চলেছে তাকে 'আপনি' করে বলার মানে হয় না। রাজেশ বলে, 'তুমিও শুরু কর।'

কিরণ সবিনয়ে জানায়, আজ দুপুরের খাওয়া সারতে সারতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন খেলে ভীষণ কষ্ট হবে।

রাজেশ আর কিছু না বলে প্লেট থেকে একটা কলাকন্দ তুলে নেয়। হরীশও বিরাট আকারের গুলাবজামুন তুলে খেতে শুরু করে।

কিরণ রাজেশকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা কোথায় থাকেন?'

কোথায় থাকে, রাজেশ জানিয়ে দেয়। তারপর বলে, 'জায়গাটা খুব ভাল। তোমাদের বিয়ের পর আমাদের ওখানে নিয়ে যাব। দূরে পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, একটা নদীও রয়েছে। বেড়াবার পক্ষে চমৎকার। অবশ্য—'

কিরণ বলে, 'কী?'

'তুমি তো শুনেছি একরকম দিল্লিরই মেয়ে। অত বড় শহরে থাকার পর পাহাড় জঙ্গল কি ভাল লাগবে?' বলে হাসে রাজেশ।

এই মানুষটিকে মোটামুটি ভালই লাগে কিরণের। তার চোখেমুখে সারল্য মাখানো, কথাবার্তায় রয়েছে আন্তরিকতা।

হরীশের সঙ্গে বিয়ে হলে, তবেই রাজেশদের কাছে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু মরে গেলেও সে যে ওই চর্বির পাহাড়কে বিয়ে করবে না, এই কথাটা এখন জানালে সারা বাড়ি তোলপাড় হয়ে যাবে। প্রভাকরের চিঠি না আসা পর্যন্ত যখন সে কোনোরকম সংঘাতে যাচ্ছে না তখন উত্তেজনা সৃষ্টি করলে শুধু ক্ষতিরই সম্ভাবনা। নিজের মনোভাব বুঝতে না দিয়ে স্বাভাবিকভাবে সে বলে, 'শহর যেমন আমার ভাল লাগে, নেচারও তেমনি পছন্দ করি।'

রাজেশ খুশি হয়ে বলে, 'ফাইন। আচ্ছা কিরণ—'

মুখ তুলে রাজেশের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় কিরণ।

রাজেশ জিজ্ঞেস করে, 'কত দিন যেন দিল্লিতে কাটিয়ে এলে?'

কিরণ বলে, 'চোদ্দ পনের বছর।'

'জানো, আমি কখনও দিল্লি যাইনি। ভাবছি, একবার যাব।'

'নিশ্চয়ই যাবেন। সবারই দেশের ক্যাপিটাল দেখে আসা উচিত।'

এরপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিল্লি সম্বন্ধে নানা খবর জেনে নেয় রাজেশ। তারপর বলে, 'অত বড় শহরে এতদিন থাকার পর হরীশদের কামতিগঞ্জ টাউনে গিয়ে থাকতে কি তোমার ভাল লাগবে?'

হরীশ একের পর এক লাড্ডু পেঁড়া এবং গুলাবজামুন খেয়ে যাচ্ছিল। একটা লাড্ডু চিবুতে চিবুতে জড়ানো গলায় সে বলে, 'নেহী নেহী—'

রাজেশ এবং কিরণ চমকে উঠে হরীশের দিকে তাকায়। রাজেশ বলে, 'কী হল?'

'কিরণকে কামতিগঞ্জে বেশিদিন থাকতে হবে না। অ্যাভারেজে, মান্থলি ম্যাক্সিমাম দশ বার দিন।'

'বাকি আঠার কুড়ি দিন কোথায় থাকবে?'

'বাবুজি যখন এম. এল. এ তখন পাটনায়। পরের ইলেকশনে এম. পি হলে দিল্লিতে। এম. পি হতে পারলে সার্টেনলি বাবুজি সেন্ট্রাল মিনিস্টার হবেন। তখন বছরে পাঁচ দিনও কিরণ কামতিগঞ্জে থাকতে পারবে কিনা, আই ডাউট। কিরণ হবে বাবুজির প্রাইভেট সেক্রেটারি।' কথার ফাঁকে ফাঁকে দু চারটে ইংরেজি শব্দ গুঁজে দেয় হরীশ। সে যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে, খুব সম্ভব তা প্রমাণ করার জন্য।

রাজেশের হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে পড়ে যায়। সে ব্যস্তভাবে বলে, 'আরে তাই তো, দুবেজি একজন পলিটিশিয়ান। এম.পি কি মিনিস্টার বনলে তাঁকে দিল্লিতে থাকতেই হবে। কিরণ তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হলে তাকেও তো সেখানেই থাকতে হয়।'

কিরণ কোনো প্রতিবাদ করে না। সে শুধু হাসে।

এলোমেলো আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর হঠাৎ রাজেশ বলে, 'দুবেজি বলছিলেন, তোমাদের নতুন মন্দির আর তোমার ঠাকুমাকে যেন দর্শন করে যাই।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়।

কিরণও উঠে পড়ে, 'চলুন, আপনার সঙ্গে যাই। আগে মন্দির দেখিয়ে তারপর ঠাকুমার কাছে নিয়ে যাব।'

রাজেশ বলে, 'না না, সঙ্গে আসতে হবে না। আমি নিজেই চলে যাব।'

'আপনি এ বাড়িতে নতুন এসেছেন। অসুবিধা হবে।'

'কোনো অসুবিধা হবে না। তোমরা গল্প কর।' বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে যায় রাজেশ।

প্রথমটা অবাক হয়ে যায় কিরণ। পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারে। আগে থেকে ওরা দু'জনে পরিকল্পনা ছকে এখানে এসেছে। আলাপ পরিচয়ের পর রাজেশ মন্দির এবং মহেশ্বরীকে দর্শন করার অছিলায় উঠে যাবে। উদ্দেশ্য, হরীশকে তার সঙ্গে আলাদা করে নিরিবিলিতে কথা বলার সুযোগ

করে দেওয়া।

কিন্তু রাজেশকে এভাবে একা ছেড়ে দেওয়া অভদ্রতা। কিরণ একটা নৌকরকে ডেকে রাজেশের সঙ্গে যেতে বলে ফের সোফায় এসে বসে।

কিরণকে একা পেয়ে খুশিতে হরীশের মুখে আঠাল গ্যাদগেদে হাসি ফুটে ওঠে। বোঝা যায়, তার ভেতর উত্তেজনার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। কিরণকে দেখার পর থেকে তার চোখে আর পাতা পড়েনি। পলকহীন সে তাকিয়েই আছে।

হরীশ বলে, 'এবার দু'বছর বাদে তোমাকে দেখলাম। মনে হচ্ছে টু সেঞ্চুরিস। অবশ্য—' এই পর্যন্ত বলে হাসিটাকে বিশাল মুখে আরো অনেকটা ছড়িয়ে দেয়।

কিরণ উত্তর দেয় না, ঠোঁট টিপে স্থির চোখে হরীশকে দেখতে থাকে।

হরীশ আবার বলে, 'এখন থেকে এক বছর দু'বছর পর আর তোমাকে দেখতে হবে না। সব সময় তোমাকে কাছে কাছে পাব। এতদিনে আমার ড্রিমটা সত্যি হতে চলেছে।'

হঠাৎ মাথার ভেতর একটা শিরা যেন ছিঁড়ে যায় কিরণের। সে বলে, 'ড্রিম তো সত্যি হতে চলেছে কিন্তু তার আগে তোমরা ক'টা খবর জানা দরকার।'

প্রচণ্ড উৎসাহে টেবলের ওপর দিয়ে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে হরীশ। বলে, 'কী খবর?'

'তুমি কি জানো দিল্লিতে থাকার সময় অনেক ছেলের সঙ্গে আমি ফ্রিলি মেলামেশা করেছি?'

হরীশ বলে, 'ও, এই ব্যাপার। বেশ করেছ, মিশেছ। আজকাল বড় বড় সিটিতে ছেলেমেয়েদের ফ্রি মিক্সিং চলছে। পাটনাতেও আমি এ সব দেখেছি। এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। দিল্লি বম্বে কলকাতা পাটনা তো আর ধরমপুরা কি কামতিগঞ্জ নয়। তা ছাড়া—'

'কী?'

'বাবুজি এম.পি কি মিনিস্টার হলে তোমাকে কত লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। আই ডোন্ট মাইন্ড।'

'দ্যাটস রাইট। কিন্তু যে সব ছেলের সঙ্গে মিশেছি তাদের কারুর সঙ্গে যদি আমার ইন্টিম্যাসি হয়ে থাকে?'

হরীশের হাসির জেল্লা নিভে যেতে থাকে। সে মরিয়া হয়ে বলে, 'ধুস, তুমি আমার সঙ্গে মজা করছ—স্রেফ জোক।'

কিরণ চাপা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'ধর যদি ব্যাপারটা মজা না হয়?'

হরীশের মুখে যে নিভু নিভু হাসিটুকু এখনও আটকে আছে, সেটা একেবারেই মুছে যায়। ভারি গলায় সে বলে, 'এসব কথা শোনার জন্যে কি এতগুলো বছর আমি ওয়েট করেছি কিরণ?'

এই সাদাসিধে, ঘি-মাখন খাওয়া, বাপ-মায়ের আদুরে ছেলেটার জন্য হঠাৎ করুণাই হয় কিরণের। কিন্তু সে ধীরে ধীরে যে মারাত্মক প্রসঙ্গটার দিকে এগিয়ে গেছে সেখান থেকে ফেরার আর উপায় নেই। কিরণ লক্ষ করল, এর মধ্যেই গল গল করে ঘামতে শুরু করেছে হরীশ। সবটা শোনার পর নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়বে। যা হবার হোক, কাউকে না কাউকে ব্যাপারটা বলতেই হবে। হরীশকেই না হয় বলা যাক। তাকে বললে মুহূর্তে সবাই জেনে যাবে।

কিরণ বলে, 'তুমি বোধহয় শোননি, একটি ছেলের সঙ্গে আমার ইন্টিম্যাসি এত বেড়ে গিয়েছিল যে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বাবুজিকে সব জানিয়ে চিঠি লেখেন। বাবুজি সঙ্গে সঙ্গে খুবলাল ভকিলকে পাঠিয়ে আমাকে ধরমপুরায় নিয়ে আসেন।'

অনেকক্ষণ শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে থাকে হরীশ। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, 'তোমার সঙ্গে ছেলেটির যা-ই হয়ে থাক, ও সব আমি গ্রাহ্য করি না। পাস্ট নিয়ে আমার হেড-এক নেই।'

কিরণ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রেবতী ঘরে এসে ঢোকেন। বলেন, 'দাদীজি তোমাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন হরীশ। এস আমার সঙ্গে—'

'হাঁ, মাতাজি—' অতি কষ্টে নিজেকে সোফা থেকে টেনে হেঁচড়ে দাঁড় করায় হরীশ। তারপর রেবতীকে প্রণাম করে তাঁর সঙ্গে মহেশ্বরীর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। কোনো ছেলের সঙ্গে কিরণের কতটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তা নিয়ে তার আর আগ্রহ নেই। কিরণকে যেভাবে হোক পেলেই সে খুশি, তার

স্বপ্ন সার্থক।

এত বড় একটা সুযোগ পেয়েও হরীশকে সবটা বলা গেল না। কিরণকে রীতিমত হতাশ দেখায়।

রেবতীরা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে রেবতী বলেন, 'তুইও আয়। এখানে একা একা বসে থেকে কী করবি?'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায় কিরণ।

নয়

'মিশ্র নিকেত'-এর জীবনযাত্রা খুবই ঢিলেঢালা। এখানে সময় ঢিমে চালে বয়ে যায়। কিন্তু আজকের দিনটা বছরের অন্য সব দিন থেকে আলাদা।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে নিজের ঘরে বসেই ব্রেকফাস্ট করতে করতে কিরণের চোখে পড়ে, নতুন শিবমন্দিরের সামনের খোলা মাঠে ভকিল খুবলাল সহায় চার পাঁচটা নৌকর দিয়ে দুটো ফিটন ধুইয়ে মুছিয়ে ঝকঝকে করে তুলছে। আরো দুই নৌকর গোটা চারেক দামি স্বাস্থ্যবান ঘোড়ার গা পরিষ্কার করে সাজিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মুকুটনাথ এসে হাঁকডাক করে গাড়ি এবং ঘোড়া সাফাইয়ের তদারক করে যাচ্ছেন। তা ছাড়া নৌকরনীরা রসুইকরেরা যে যার কাজ তটস্থ ভঙ্গিতে করে চলেছে।

এই ব্যস্ততার কারণ খুব ভাল করেই জানে কিরণ। একটু বেলা হলে ত্রিকূটনারায়ণরা আসবেন। দিন দুই আগে স্বয়ং মুকুটনাথ কামতিগঞ্জে গিয়ে তাঁদের আজ এখানে আসার জন্য অনুরোধ করে এসেছেন। ওঁরা এলেই ফিটনে করে বেরিয়ে পড়বেন। এই বিরাট কর্মসূচির পেছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। পুব দিকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গোলগোলি মৌজার গায়ে যে এক শ বিঘে জমি মুকুটনাথ কিরণের বিয়েতে যৌতুক দিতে চান, সেটা ত্রিকূটনারায়ণদের দেখিয়ে দেবেন। পরে ওঁরা যেন বলতে না পারেন এক জমি দেখিয়ে অন্য জমি দেওয়া হয়েছে।

প্রথম থেকেই জমি নেওয়ার ব্যাপারে মৌখিক আপত্তি জানিয়ে এসেছেন ত্রিকূটনারায়ণ। পরে অবশ্য নিতে রাজি হয়েছেন। তবে সেদিনও আরেক বার মৃদু গলায় বলেছিলেন, জমিটা না দিলেই তিনি খুশি হবেন। কিন্তু মুকুটনাথ তাঁর সিদ্ধান্তে আগাগোড়া অটল। তিনি জানেন, ওটা ত্রিকূটনারায়ণের মুখের কথা। জমির লালচ তাঁর যথেষ্টই রয়েছে।

মুকুটনাথ হাতজোড় করে সেদিন বলে এসেছিলেন, জমি দেখাবার পর 'মিশ্র নিকেত'-এ কিঞ্চিৎ শাকাহার করে গেলে তিনি কৃতার্থ হন। ত্রিকূটনারায়ণ প্রথমে রাজি হননি। বলেছেন, এ সব ঝঞ্ঝাট করার মানে হয় না। কিন্তু মুকুটনাথ নাছোড়বান্দা। অগত্যা নিরুপায় হয়েই খাওয়ার ব্যাপারটা তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে। সেই জন্যই গোটা 'মিশ্র নিকেত' আজ এত সরগরম।

শিবমন্দিরের সামনের ফাঁকা জায়গায় গাড়ি সাফাই এবং ঘোড়া সাজানো দেখতে দেখতে ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল কিরণের। ভেতরে ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল তার। হরীশের সঙ্গে তার বিয়ের যে ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যৌতুকের জমি দেখতে যাওয়া তার একটা অত্যন্ত জরুরি অংশ। এটা ভাবতে গিয়ে অসহ্য রাগে কিরণের মাথা থেকে গরম ভাপ বেরুতে থাকে।

কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে রাগ অস্থিরতা বা বিরক্তি, কিছুই আর অনুভব করল না কিরণ। যে বিয়ে কোনোদিনই হওয়ার নয় তা নিয়ে নিজের স্নায়ুকে উত্তেজিত করার মানে হয় না। প্রভাকর এলেই 'মিশ্র নিকেত' এবং 'ইন্দ্রধনুস'-এর প্রতিটি মানুষকে কিরণ জানিয়ে দেবে তার শরীরে একটি ভ্রূণ রয়েছে, আর প্রভাকরের বীজ থেকেই তার জন্ম। এরপর নিশ্চয়ই মুকুটনাথ মিশ্র তাঁকে বাড়িতে এক মুহূর্তও থাকতে দেবেন না, সোজা গেটের বাইরে বার করে দিয়ে গোটা 'মিশ্র নিকেত'কে গঙ্গাজলে বাইশ বার ধুইয়ে, অষ্টপ্রহর যজ্ঞ-টজ্ঞ করে পাপমুক্ত করাবেন।

মুকুটনাথ তাকে তাড়িয়ে দিন, এটাই কিরণ চায়। কিন্তু পেটের ভ্রূণটার কথা না জানালে সে সম্ভাবনা আদৌ নেই। প্রভাকর না আসা পর্যন্ত এটা জানানো যাচ্ছে না। তার মধ্যে মুকুটনাথরা যত বার

ইচ্ছা যৌতুকের জমি দেখান, যেভাবে খুশি বিয়ের প্রস্তুতি চালান, শেষ অস্ত্রটা তো তার হাতেই থেকে যাচ্ছে।

'এখনও বসে আছিস?'

গলার আওয়াজে চমকে ঘুরে বসে কিরণ। দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন রেবতী।

রেবতীর প্রশ্নটা ঠিকমত বুঝতে না পেরে কিরণ বলে, 'কী করব তা হলে?'

'কাল রাত্তিরে তোর বাবুজি তোকে কী বলেছিল?' রেবতী সোজাসুজি কিরণের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

এবার কিরণের মনে পড়ে যায়। মুকুটনাথ কাল বলেছিলেন, সকালে ন'টা নাগাদ সে যেন ভাল শাড়ি-টাড়ি পরে রেডি থাকে। সবাই মিলে যৌতুকের জন্য যে জমি দেখতে যাওয়া হচ্ছে সেই দলে কিরণকেও থাকতে হবে। কিরণ আপত্তি করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার কথায় কান দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেননি মুকুটনাথ।

কিরণ রেবতীকে বলে, 'আমি যাব না।'

রেবতী ভাবলেন, সংকোচের জন্যই হয়ত যেতে চাইছে না কিরণ। কোনো মেয়ে কি নিজের বিয়ের যৌতুক স্বচক্ষে দেখে যাচাই করে নেয়? ব্যাপারটা খুবই অস্বস্তিকর।

অল্প হেসে রেবতী ঘরের ভেতর চলে এলেন। কোমল স্বরে বলেন, 'তোর যাওয়া দরকার—'

'কেন?'

'জমিটা তোর নামে লিখে দেওয়া হবে। কী দেওয়া হল, সেটা দেখে নিবি না?'

কিরণ উত্তর দেয় না।

রেবতী এবার যা বলেন তা এইরকম। দহেজ অর্থাৎ পণ এবং যৌতুক হল মেয়েদের সবচেয়ে বড় জোরের জায়গা। বাপের বাড়ি থেকে যে যত দহেজ নিয়ে যেতে পারবে শ্বশুরবাড়িতে তার তত খাতির, তত মর্যাদা। বিদ্যাবুদ্ধি রূপগুণ যতই থাক, দহেজ আনতে না পারলে ও সবের দাম কানাকড়িও নয়।

সব শুনেও কিরণ চুপ করে থাকে।

রেবতীর মনে হয়, তাঁর কথাগুলো কিরণের মাথায় সুকৌশলে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন। সে যে কোনোরকম আপত্তি না করে চুপচাপ তাঁর কথা শুনে গেল, এতে তিনি যথেষ্ট স্বস্তিবোধ করেন।

দিল্লি থেকে কিরণের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কিছুদিন আগে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন রেবতী। কয়েক রাত তিনি ঘুমোতে পারেন নি। বার বার শিউশঙ্করজি এবং বিষুণজির কাছে প্রার্থনা করেছেন, পবিত্র মিশ্র বংশে যেন কলঙ্ক না লাগে। ভ্রষ্টাচার এবং মতিচ্ছন্নতার পথ থেকে ফিরে এসে কিরণ যেন পারিবারিক সম্মান অটুট রাখে।

রেবতী লক্ষ করেছেন, দিল্লি থেকে এবার ফেরার পর কিরণের মধ্যে কোথায় যেন সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেটা ঠিক স্পষ্ট করে ধরা যাচ্ছিল না, তবে অনুভব করতে পারছিলেন। ফলে তাঁর উৎকণ্ঠা এবং রক্তচাপ বেড়েই যাচ্ছিল। আজই কিরণের সঙ্গে কথা বলে মনে হল, মাঝখানে সামান্য ঝাঁকুনি লাগলেও পরম্পরা নষ্ট হয়নি। মিশ্র বংশের আগের আগের প্রজন্মের মেয়েদের থেকে সে আলাদা কিছু নয়।

রেবতী আবার বলেন, 'এতে লজ্জার কিছু নেই। নিজের জিনিস নিজের চোখে দেখে নেওয়া ভাল।' একটু ভেবে ফের বলেন, 'আরেকটা কথা—'

খুব একটা আগ্রহ দেখায় না কিরণ। নিরুৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

রেবতী জানান, ত্রিকূটনারায়ণদের বংশে পুতহু বা পুত্রবধূ পোড়াবার দুর্নাম রয়েছে। কিন্তু সে সব অনেক কালের পুরনো ঘটনা। দুবেরা এখন পুরোপুরি বদলে গেছে। তাদের হাত দিয়ে আজকাল আর কোনো নোংরা কাজ হওয়া সম্ভব নয়। তবু কিরণের সতর্ক থাকা দরকার। মুকুটনাথ যে জমিটা যৌতুক হিসেবে তাকে দিতে যাচ্ছেন সেটা যেন কোনোক্রমেই সে ত্রিকূটনারায়ণদের নামে লিখে না দেয়।

অত্যন্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কিরণ বলে, 'ও, আচ্ছা—'

রেবতী বলেন, 'আমার আর দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। ওদিকে অনেক কাজ পড়ে আছে। তুই তুরন্ত জামাকাপড় বদল করে নে। ভাল সিল্কের শাড়ি পরবি।' বলেই ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

কিরণ সেই পুরনো কথাটা ভাবল, প্রভাকর না আসা পর্যন্ত সংঘর্ষে নামার মানে হয় না। ব্রেকফাস্ট শেষ করে বাধ্য মেয়ের মতো সে দামি শাড়ি এবং জামা টামা পরে। এমন কি ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে ঠোঁটে এবং গালে একটু রংও বুলিয়ে নেয়। তারপর চোখে আই-ব্রো পেন্সিল টেনে যখন সারা গায়ে সেন্ট ছড়াতে শুরু করেছে সেই সময় নিচে হই চই শোনা যায়। জানালা দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে ত্রিকূটনারায়ণ, হরীশ এবং রাজেশ পুরনো মডেলের একটা বিরাট ফোর্ড গাড়ি থেকে নামছে, আর মুকুটনাথ এবং খুবলাল যথেষ্ট বশংবদ ভঙ্গিতে তাঁদের খাতিরদারি করছে।

ওঁরা কী বলছেন, প্রায় চল্লিশ ফুট উচ্চতা থেকে শোনা যাচ্ছে না, তবে এটা বোঝা যায় মুকুটনাথরা ত্রিকূটনারায়ণদের ভেতরে এসে একটু চা খেয়ে যাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন। কিন্তু এখন চা খেতে গেলে অনেক বেলা হয়ে যাবে। তাঁদের মতে আগে আসল কাজটা সেরে আসা দরকার।

ত্রিকূটনারায়ণদের দেখে বিশেষ চাঞ্চল্য বোধ করল না কিরণ, ড্রেসিং টেবলের সামনের কুশন থেকে উঠলও না।

কিন্তু বেশিক্ষণ বসে থাকা গেল না। রেবতী ছুটতে ছুটতে ফের চলে এলেন। বললেন, 'কি রে, তোর হয়েছে?'

উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ায় কিরণ।

রেবতী এক পলক মেয়ের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান। তাঁর চোখে আলো ছলকাতে থাকে। মেয়ের সাজ দেখে তিনি খুশি হয়েছেন। গভীর স্নেহে কিরণকে বলেন, 'চল চল, ওঁরা তোর জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

নিচে এসে ত্রিকূটনারায়ণকে প্রণাম করে কিরণ। ত্রিকূটনারায়ণ আশীর্বাদের ভঙ্গিতে একটি হাত তুলে বলেন, 'জিতা রহো বেটা—'

বয়স্কদের কাউকে প্রণাম করলে, উপস্থিত অন্য সবাইকে ওইভাবে সম্মান জানানো মিশ্র বংশের একটি চালু নিয়ম। কাজেই মুকুটনাথ, রেবতী থেকে শুরু করে দূরে শিউশঙ্করের নতুন মন্দিরের বারান্দায় গিয়ে কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ পর্যন্ত সকলেরই পায়ের কাছে মাথা নোয়াতে হয় কিরণকে। এই পর্বটি চুকে যাওয়ার পর একটি ফিটনে ওঠেন মুকুটনাথ ত্রিকূটনারায়ণ কিরণ এবং হরীশ। অন্যটিতে রাজেশ আর খুবলাল। কোচোয়ানরা আগে থেকেই ওপরে উঠে বসে ছিল। কিরণরা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারা ফিটন হাঁকিয়ে দেয়।

পাহাড়ের নিচে গোলগোলি এবং বইহারি তালুকের গায়ে একটানা ফসলের জমিগুলোর কাছে এসে গাড়ি থামাতে বলেন মুকুটনাথ।

এদিকে পাক্কী বা পাকা সড়ক নেই। কাঁচা রাস্তা যেটা আছে সেটা বেশ সমতল। ফিটন চলতে অসুবিধা হয় না।

এখনও ন'টা বাজেনি, কিন্তু এর মধ্যেই রোদ বেশ গনগনে হয়ে উঠেছে। চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। সামনের টানা পাহাড় এবং বাকি তিন দিকের ফাঁকা শস্যক্ষেত্র যেন ঝলসে যাচ্ছে। মাথার ওপর কচিৎ দু-একটা পাখি চোখে পড়ে।

ডান ধারে খেতগুলোর গায়ে ক'টা হতচ্ছাড়া চেহারার গাঁ। টালি বা ফুটোফাটা টিনের চাল এবং বাঁশ কিংবা মাটির দেওয়ালের অগুনতি ভাঙাচোরা ঘর চারদিকে এলোমেলো দাঁড়িয়ে আছে। এই সব গাঁয়ে পুরুষানুক্রমে যারা বাস করে আসছে তারা হল দোসাদ গঞ্জু গাঙ্গোতা চামার আর ধাঙড় অর্থাৎ জল-অচল অচ্ছুতেরা।

অচ্ছুৎদের গাঁ-গুলোর পাশ দিয়ে লম্বা একটা খাল বহু দূর চলে গেছে। খালটার ওপর পর পর অনেকগুলো বাঁশের সাঁকো। সাঁকোর মাথায় মাছরাঙা বসে আছে।

ফিটন থেকে প্রথমেই নেমে পড়েছিলেন মুকুটনাথ। দরজা খুলে দিয়ে ত্রিকূটনারায়ণদের নামতে বললেন। তারপর চারপাশে ফসলের জমিগুলো দেখে চমকে ওঠেন।

অনেক দিন বাদে আজই প্রথম এদিকে এসেছেন মুকুটনাথ। আজ যে শস্যক্ষেত্রগুলি তিনি দেখছেন কয়েক বছর আগে সেগুলো ছিল কর্কশ পাথুরে ডাঙা। এখানে আগাছা আর কিছু মরকুটে কাঁটাগাছ ছাড়া অন্য কিছু জন্মাত না। কিন্তু এখন জমির চেহারা দেখেই বোঝা যায়, এগুলো উৎকৃষ্ট ফসলের খেত। এবছর যে প্রচুর ফলন হয়েছে তা ধান কেটে নেওয়ার পর গাছের গোড়াগুলোর দিকে তাকিয়েই টের পাওয়া যাচ্ছে।

কুড়ি বাইশ বছর আগে উত্তর বিহারের এ অঞ্চলে ভূদান যজ্ঞের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। স্বয়ং বিনোবা ভাবে এখানে আসায় বড় বড় জমিমালিকদের হৃদয়ের এমনই পরিবর্তন ঘটে যায় যে তারা ভূমিহীন অচ্ছুৎদের নামে জমি দানপত্র করে লিখে দেয়। সেই ফেরে পড়ে মুকুটনাথও গোলগোলি আর বইহারি তালুকের পাথুরে পড়তি ডাঙাগুলো অচ্ছুতদের বিলিয়ে দেন। যে জমিতে কোনোদিন দশ গ্রাম ধান গেঁহু জন্মাবে না তা দিতে অসুবিধা কোথায়? কী জমি দেওয়া হল তা তো আর বিনোবার পক্ষে মাঠে মাঠে ঘুরে পরখ করা সম্ভব ছিল না।

অকেজো বাজে জমিও দেওয়া হল, সেই বাবদে দানবীর বলে যথেষ্ট সুনামও জুটে গেল। এই চালটি দিতে পেরে এতকাল বেশ একটা আত্মগরিমাই অনুভব করে এসেছেন মুকুটনাথ। কিন্তু এই মুহূর্তে ফসলের মাঠগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁর হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে। এমন বেকুব জীবনে আর কখনও তাঁকে বনতে হয়নি। কে জানত, মাঝখানের ক'টা বছরে পাথুরে জমিগুলোকে অচ্ছুতেরা এমন চমৎকার শস্যক্ষেত্র বানিয়ে ফেলবে! আগে থেকে জানা থাকলে কে এতটা জমি দানপত্র করে লিখে দিত! অবশ্য গায়ের জোরে তিনি জমিগুলো কেড়েকুড়ে নিতে পারেন। সে জন্য কয়েকটি বিশেষ জায়গায় মোটা টাকার ঘুষ চড়াতে হবে।

পরক্ষণেই মুকুটনাথ ভাবেন, অকারণে এ সব দুশ্চিন্তার মানে হয় না। তাঁর মনে পড়ে যায়, বিনোবাজির সামনে হিজিবিজি সই করে জমিগুলো অচ্ছুৎদের নামে দানপত্র করে দিয়েছিলেন তিনি। তবে বড় উকিল দিয়ে উপযুক্ত জায়গায় ঘুষ চড়িয়ে যে কোনোদিন তিনি ফসলের এই মাঠগুলোর দখল নিতে পারেন। কিন্তু মেয়েকে যখন যৌতুকই দেবেন ঠিক করেছেন, ওই সব হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। শুধু নামকাওয়াস্তে দানপত্রের কথাটা ত্রিকূটনারায়ণকে একবার জানিয়ে দিলেই হবে। দুবেরা জানে, কিভাবে জমি নিজেদের দখলে রাখতে হয়।

দুই ফিটন থেকে বাকি সবাই নেমে পড়েছিল। মুকুটনাথ তাদের, বিশেষ করে ত্রিকূটনারায়ণকে বলেন, 'চলুন ত্রিকূটজি, একটু কষ্ট করে হেঁটে নিজের চোখে জমি দেখে নিন।'

ভকিল খুবলাল সহায় বুদ্ধি করে গোটা কয়েক ছাতা নিয়ে এসেছিল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধরিয়ে দেয় সে। রোদের তেজ থেকে মাথা বাঁচানো যাবে। এতে সবাই খুশিই হয় এবং খুবলালের দূরদৃষ্টির তারিফ করে।

তীব্র রোদে হেঁটে হেঁটে জমি দেখতে আপত্তি করেন না ত্রিকূটনারায়ণ। কেননা আগে যৌতুকেব কথায় যতই নিরাসক্ত থাকতে চেষ্টা করুন, এই মুহূর্তে উৎকৃষ্ট ফসলের খেতগুলো দেখতে দেখতে লোভে তাঁর চোখ চক চক করতে থাকে।

ফিটন দুটো পেছনে ফেলে সবাই কাঁচা রাস্তা দিয়ে সোজা এগিয়ে যায়। একেবারে সামনে রয়েছেন ত্রিকূটনারায়ণ এবং মুকুটনাথ। তাঁদের ঠিক পেছনে কিরণ। তারপর হরীশ আর রাজেশ। সবার শেষে খুবলাল। কোচোয়ানরা আসেনি, তারা ঘোড়া এবং গাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে কাঁচা সড়কের দু ধারের খেতগুলো দেখিয়ে মুকুটনাথ বলেন, 'এখানে লগভগ এক শ বিঘা জমিন রয়েছে ত্রিকূটজি। বহুত ফাইন ল্যাণ্ড।'

ত্রিকূটনারায়ণ আস্তে মাথা হেলিয়ে দেন, 'হাঁ।'

'এই জমিনের পুরাটাই কিরণের শাদিতে যৌতুক দেব। পাহাড়ের ওধারের সব ল্যাণ্ড আপনাদের, এধারে শও বিঘা জমিন পেলে একটানা অনেকটা জমিন হয়ে যাবে।'

ত্রিকূটনারায়ণ সামান্য হাসেন, উত্তর দেন না।

মুকুটনাথ এবার বলেন, 'ধান গেঁহু ইখ—এ জমিতে যা লাগাবেন তাই ফলবে।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়তে ত্রিকূটনারায়ণ বলে ওঠেন, 'লেকেন—'

'কী?'

'আমি অনেকদিন আগে একটা কথা শুনেছিলাম।'

'কী কথা?'

কুণ্ঠিত মুখে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'ভূদান যজ্ঞের সময় আপনি নাকি বিনোবাজিকে সাক্ষী রেখে এই জমিগুলো অচ্ছুৎদের দানপত্র করে দিয়েছেন। আমার ভুল হলে ক্ষমা করবেন।'

মুকুটনাথ বলেন, 'না না, ভুল কিসের। আমিও এই ব্যাপারটা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম।' এরপর ভূদান যজ্ঞের হুজুগে কিভাবে জমিগুলো অচ্ছুৎদের দান করেছিলেন, পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন।

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'ও, এই ব্যাপার। ঠিক আছে, জমিগুলো কিরণের নামে লিখে দেওয়ার পর অচ্ছুৎরা যদি কিছু ঝামেলা করে, আমি সামলাব। চিন্তা মাত কিজিয়ে মুকুটনাথজি।'

ঠিক এটাই আন্দাজ করেছিলেন মুকুটনাথ। বিবেকের দিক থেকে তিনি এখন একেবারে মুক্ত। সব স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিয়েছেন এবং ত্রিকূটনারায়ণ তাঁর পুত্রবধূর জমি দখলে রাখার ব্যবস্থা করবেন বলেও জানালেন।

একটু চুপচাপ।

তারপর মুকুটনাথ অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বলেন, 'আমার একটা আর্জি ছিল ত্রিকূটজি—'

ব্যস্তভাবে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আর্জি আবার কী, হুকুম করুন্—'

একটু চিন্তা করে মুকুটনাথ এভাবে শুরু করেন, 'এই জমিন যেখানে শেষ হয়েছে, তারপর আমার ছোটখাট একটা তালুক রয়েছে। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা, ওখানে একটা লোহার কারখানা বসাব। আপনি পরের চুনাওতে ভাল মার্জিনে জরুর জিতবেন। তখন আমাকে লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

পেছনে আসতে আসতে মজাও লাগে কিরণের। তার বিয়েটাকে ঘিরে মুকুটনাথ এবং ত্রিকূটনারায়ণ নিজের নিজের সাধ মিটিয়ে নিতে চাইছেন। মুকুটনাথের অনেক দিনের ইচ্ছা, শুধু ল্যাণ্ডেড অ্যারিস্টোক্র্যাট হয়ে থাকবেন না, তাঁকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টও হতে হবে। কিন্তু এতকাল পাশে দাঁড়িয়ে মদত দেবার মতো কেউ ছিল না। দুবেদের ঘরে মেয়েকে পুতহু করে পাঠাতে পারলে এবার ইচ্ছাটা পূরণ হয়ে যাবে বলেই তাঁর ধারণা। দু পক্ষই এই বিয়ে থেকে কতটা লাভ তুলে নিতে পারে, তারই এক সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতা চলছে যেন। মনে মনে হেসে ফেলে কিরণ।

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'জরুর। আমি চুনাওতে জিততে পারলে একটা কেন, আপনি দশটা কারখানা বসাবেন।'

আশায় এবং খুশিতে চোখমুখ ঝকমক করতে থাকে মুকুটনাথের। বিগলিত ভঙ্গিতে বলেন, 'বহুত ধন্যবাদ ত্রিকূটজি—'

এধারে তৃতীয় লাইন থেকে কখন যে হরীশ তার পাশে চলে এসেছে, কিরণ টের পায়নি। আচমকা চাপা গলার ডাক শুনে সে চমকে মুখ ফিরিয়ে বাঁ দিকে তাকায়।

হরীশ হেসে হেসে গাঢ় গলায় ফিস ফিস করে, 'জানো তো, ক'দিনের মধ্যে আমাদের শাদি?'

তারিখটা এখনও ঠিক না হলেও খুব তাড়াতাড়িই যে শুভকাজ চুকিয়ে ফেলতে চান মুকুটনাথেরা, কিরণ তা জানে। হঠাৎ অসহ্য রাগে মারাত্মক কিছু একটা ঘটিয়ে ফেলতে চায় সে। হরীশের গালে একটা চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। পরক্ষণেই কিন্তু মাথা থেকে রাগটা নেমে যায়। হরীশ কেমন করে জানবে দিল্লিতে গিয়ে সে কী করে বসে আছে।

ত্রিকূটনারায়ণ দুবের এই ছেলেটা বোকাসোকা গোছের ভালমানুষ। সেই কবে থেকে সরল বিশ্বাসে সে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। হরীশের জন্য নতুন করে আরেক বার করুণাই হয় তার। ছোকরার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে শুধু।

হরীশ আরো একটু ঘন হয়ে আসে। বলে, 'তোমাকে ছাড়া আমার সময় আর কাটতে চাইছে না।'
মজার গলায় কিরণ বলে, 'আমারও—'
কথায় কথায় তারা কখন যে পশ্চিম দিকের দেহাতী গ্রামগুলোর কাছে চলে এসেছে, খেয়াল ছিল না। হঠাৎ কিরণদের চোখে পড়ে কয়েক শ মানুষ চারপাশের গাঁগুলো থেকে ছুটতে ছুটতে তাদের দিকে আসছে।

দশ

মুকুটনাথ মানুষগুলোকে ছুটে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দেখাদেখি অন্য সবাইও থেমে যায়।
ত্রিকূটনারায়ণ পাশ থেকে জিজ্ঞেস করেন, 'ওরা কারা?'
মুকুটনাথ জানান, ওরা জল-অচল অচ্ছুৎ। পুরুষানুক্রমে মিশ্রদের অর্থাৎ তাঁদেব প্রজা। আবহমান কাল ধরে এই লোকগুলো তাঁদের জমি চষে আসছে। কিরণের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে এই অঞ্চলের এক শ বিঘে খেত লিখে দেবার পর এই সব দোসাদ গঞ্জু এবং গাঙ্গোতারা ত্রিকূটনারায়ণদের প্রজা বনে যাবে। যেভাবে মিশ্র বংশের জমি এতকাল তারা চষে এসেছে, অবিকল সেইভাবেই দুবেদের জমিতেও তারা লাঙল চালাবে, ধান কি গেঁহু বুনবে, ফসল কাটবে, ওপর দিকের জমি হস্তান্তরের ব্যাপারটা নিয়ে তাদের কোনো প্রতিক্রিয়াই হবে না। সব কিছু যেমন চলছে তেমনই চলতে থাকবে।
মুকুটনাথ বলেন, 'জমিগুলোর চেহারা বিলকুল বদলে দিয়েছে অচ্ছুতেরা।'
'হাঁ। আমারও মনে আছে, আগে যখন এদিকে এসেছি, জমিগুলো পড়তিই ছিল। অচ্ছুৎগুলোকে তারিফ করতে হয়, খেটেখুটে খুন আর পসিনা ঝরিয়ে মা লছমীর কৃপা আদায় করে ছেড়েছে।'
'ঠিক বলেছেন।'
হঠাৎ কিছু মনে পড়তে মুকুটনাথ এবার বলেন, 'একটা কথা আপনার জেনে রাখা দরকার ত্রিকূটজি।'
'কী?' উৎসুক চোখে তাকান ত্রিকূটনারায়ণ।
'অচ্ছুৎদের নামে দানপত্র বিনোবাজির সামনে লিখে দিয়েছি। তেমনি পরে অচ্ছুৎদের দিয়ে করজপত্রও লিখে রেখেছি। সেগুলো এমনভাবে খুবলাল ভকিল বানিয়ে দিয়েছে, যাতে দেনার দায়ে যে কোনো সময় ওদের জমি কেড়ে নিতে পারি।'
ত্রিকূটনারায়ণ বেজায় খুশি হয়ে যান। হাত তুলে নাড়তে নাড়তে বলেন, 'ব্যস ব্যস, আপনার মেয়েকে করজপত্রগুলো শুধু দিয়ে দেবেন। তারপর বাকিটা আমি দেখব। আমার মনে হয়, আর কোনো ঝামেলা হবে না।'
'জরুর জরুর। তবে একটা কথা ত্রিকূটজি—'
'বলুন—'
'চুনাওয়ের আগে অচ্ছুৎরা যেন জমির ব্যাপারটা জানতে না পারে। তা হলে ঝঞ্ঝাট হবে।'
'আমি কি অতই ব্লাডি ইডিয়ট মিশ্রজি! নিজের ইন্টারেস্ট বরবাদ করে কিছুই করব না।'
এদিকে অচ্ছুৎরা মাঠের ওপর দিয়ে কাছাকাছি এসে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রায় শ তিনেক মানুষের একটা জনতা। সবার সামনে রয়েছে ভৈরো দোসাদ। ভৈরোর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। চুল যদিও সবটাই সাদা হয়ে গেছে, তবু এই বয়সেও তার পেটানো মজবুত স্বাস্থ্য। গালে খাপচা খাপচা দাড়ি। পোড়া ঝামার মতো গায়ের রং। চারকোনা চোয়াল, থ্যাবড়া নাক, মোটা মোটা আঙুলের মাথায় ভাঙা নখ। ছোট চোখ দুটোতে শিশুর সারল্য। পরনে খাটো লালচে ধুতির ওপর সবুজ জামা। পা দুটো খালি।
মাঝারি মাপের এই লোকটার মধ্যে যে অসীম শক্তি জমা হয়ে আছে, দেখা মাত্রই টের পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের অচ্ছুৎটোলিগুলোতে যে 'পঞ্চ' রয়েছে, ভৈরো তার মাথা। সে একটি আঙুল তুললে

এখানকার কয়েক হাজার দোসাদ গঞ্জু এবং গাঙ্গোতা আগুনে ঝাঁপ পর্যন্ত দিতে পারে।

ভৈরো মাথা ঝুঁকিয়ে মুকুটনাথকে বলে, 'দেওতা আপ!' অর্থাৎ যে মুকুটনাথকে গত পাঁচ সাত বছরে একবারও এদিকে দেখা যায়নি, হঠাৎ কেন তিনি আজ এলেন, এতে খুবই অবাক হয়ে গেছে সে এবং তার সঙ্গী অন্যান্য অচ্ছুতেরাও।

মুকুটনাথ হেসে হেসে বলেন, 'কেন রে, আসতে নেই?'

সসংকোচে জিভ কেটে ব্যস্তভাবে ভৈরো বলে, 'এ আপনি কী বলছেন দেওতা!'

'তোদের অনেক দিন দেখিনি তো, তাই চলে এলাম।'

'হুজৌর, কষ্ট করে এই ধুপের ভেতর এতদূর এলেন। হুকুম করলে আমরাই চলে যেতাম।'

মুকুটনাথ সস্নেহে হাসেন, 'তোদের যাওয়াও যা, আমাদের আসাও তাই। বল কেমন আছিস?'

'আপনার কিরপাসে ভালই আছি হুজৌর।' কথা বলছে ঠিকই ভৈরো, কিন্তু বার বার তার চোখ চলে যাচ্ছে ত্রিকূটনারায়ণ কিরণ হরীশ এবং রাজেশের দিকে। হঠাৎ এতগুলো বিশিষ্ট বড়ে আদমী এমন চড়া রোদ মাথায় নিয়ে কেন এখানে হানা দিয়েছেন, বোঝা যাচ্ছে না।

'শুনলাম তোদের জমিতে এবার প্রথম ধান হয়েছে।'

'হাঁ হুজৌর?'

'কেমন ধান ফলল?'

'আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। আপহিকা কিরপা।'

মুকুটনাথের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন ত্রিকূটনারায়ণ। একটু দূরে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে চারদিকের ফাঁকা শস্যক্ষেত্র, অচ্ছুৎটোলার লোকজন, মাঠের পেছনে পাহাড়, ঝকঝকে আকাশ দেখছিল কিরণ। মুকুটনাথের সঙ্গে ত্রিকূটনারায়ণ বা ভৈরোর কথাবার্তা আবছাভাবে তার কানে আসছিল। কিন্তু সে ব্যাপারে ঔৎসুক্য না থাকায় তার কোনো প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে না।

কিরণের শরীর থেকে বিশ সেন্টিমিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে ঘ্যানঘেনে মাছির মতো চাপা গলায় এক নাগাড়ে কিছু বলে যাচ্ছে হরীশ। ঘি-মাখন খাওয়া চর্বির এই ঢিবিটা কী জানতে চাইছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না কিরণের। কিন্তু সে ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া আদৌ প্রয়োজন বোধ করে না কিরণ।

দলছুট হয়ে বেশ খানিকটা দূরে ফাঁকা মাঠে একা একা ঘোরাঘুরি করছে রাজেশ। ত্রিকূটনারায়ণ আর মুকুটনাথ বা কিরণ আর হরীশ, কোনো দলেই সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না।

হঠাৎ ত্রিকূটনারায়ণের কথা মনে পড়ে যায় মুকুটনাথের। ভৈরোকে বলেন, 'তোদের সঙ্গে আমার জরুরি কিছু কথা আছে।'

তাদের মতো গরিবের চাইতেও গরিব, দুনিয়ার সব চেয়ে ওঁচা মানুষদের সঙ্গে ঈশ্বরের মতো মহিমময় মুকুটনাথ মিশ্রর কী প্রয়োজন থাকতে পারে, ভৈরো ভেবে পায় না। আর কিনা স্বয়ং তিনি সেই কথাটি বলার জন্য এতদূর ছুটে এসেছেন! ভৈরো এবং তার সঙ্গীরা একেবারে হকচকিয়ে যায়। ভৈরো বিভ্রান্তের মতো বলে, 'জি—'

ত্রিকূটনারায়ণকে দেখিয়ে মুকুটনাথ এবার জিজ্ঞেস করেন, 'এঁকে চিনিস?'

ভৈরো মাথাটি প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুঁকিয়ে বলে, 'চিনব না! উনি কামতিগঞ্জের বড়ে সরকার।'

'চিনিস তা হলে।' মুকুটনাথ হাসেন, 'জরুরি কথাটা ওঁর ব্যাপারে।'

ভৈরো বলে, 'হুজৌর, এতদূর এসেছেন। আউর থোড়া কিরপা করে যদি আমাদের গাঁও-এ আসেন--মতলব, এই ধুপে এত তকলিফ হচ্ছে আপনাদের—'

মুকুটনাথ বলেন, 'দুফার হয়ে এল। আজ গেলে আরো দেরি হয়ে যাবে। আরেক দিন সুবেহ্ এসে তোদের গাঁওয়ে চলে যাব।' একটু থেমে আবার বলেন, 'এখানেই ত্রিকূটজি সম্পর্কে কথাটা বলে যাই।'

মুকুটনাথ যখন বলেছেন আজ তাদের গ্রামে যাবেন না, তখন আর দ্বিতীয় বার তাঁকে অনুরোধ করতে সাহস হয় না ভৈরোর। সে বিনীত ভঙ্গিতে শুধু বলে, 'জি দেওতা—'

মুকুটনাথ এবার বলেন, 'তোরা তো জানিস, পাঁচ সাল পর পর ত্রিকূটজি চুনাওতে দাঁড়ান।'

'জি—'

'লেকেন আগে তোরা ওঁকে সেভাবে ভোট দিসনি, তাই ত্রিকূটজি জিততে পারেননি।' বলে মুকুটনাথ অল্প হাসেন।

ভৈরো জানায়, তারা আগের আগের চুনাওতে ভোট দেয়নি ঠিকই, তবে সাড়ে চার বছর আগে যে চুনাওটা হয়ে গেছে তাতে কিন্তু ভোটটা ত্রিকূটনারায়ণকে দিয়েছে। এবং তার জোরে জিতেও গেছেন তিনি।

মুকুটনাথ হেসে হেসে বলেন, 'সবাই দিসনি। দিলে ত্রিকূটজি ভাল করে জিততেন।'

আসলে মুকুটনাথ তেমনভাবে গত নির্বাচনে ত্রিকূটনারায়ণের হয়ে প্রচারে নামেননি। ভাসা ভাসা ভাবে ভৈরোদের ভোট দিতে বলেছিলেন শুধু। কিরণের সঙ্গে হরীশের বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত তিনি হাতে কিছু সুতো রেখে দিয়েছিলেন, পুরোটা ছেড়ে দেননি।

মুকুটনাথ এবার বলেন, 'তোরা কি শুনেছিস, ত্রিকূটজির ছেলের সঙ্গে অনেক দিন আগেই আমার মেয়ের শাদি ঠিক হয়ে আছে?'

'জি, নায়—' আস্তে মাথা নাড়ে ভৈরো।

মুকুটনাথ বলেন, 'তা জানবি কী করে, আমি তো আর আগে তোদের জানাই নি। খুব শীগ্‌গিরই শাদিটা হয়ে যাবে। এই শাদিতে তোদেরও নেমন্তন্ন হবে।' বলে আঙুল বাড়িয়ে খানিকটা দূরে কিরণ এবং হরীশকে দেখিয়ে দেন, 'ওই যে আমার মেয়ে আর ত্রিকূটজির ছেলে—'

শুধু ভৈরোই না, চারপাশের বিশাল অচ্ছুৎ জনতা অসীম কৌতূহলে কিরণদের দেখতে থাকে। তাদের ঝলমলে মুখচোখ দেখে মনে হয় বিয়ের খবরে খুবই খুশি হয়েছে, যদিও মুকুটনাথরা বংশ পরম্পরায় তাদের রক্ত শোষণ করে আসছে। ভৈরো উচ্ছ্বসিতভাবে বলে, 'বহোত বড়িয়া খবর।'

মুকুটনাথ বলেন, 'তা হলে বুঝতেই পারছিস, ত্রিকূটজি আমার রিস্তেদার হতে যাচ্ছেন।'

'হাঁ হাঁ, সমধী।'

'আমার রিস্তেদার তোদেরও তো আপনা আদমী—তাই না?'

'জরুর হুজৌর—'

একটু ভেবে কিছুক্ষণ পর মুকুটনাথ এবার বলেন, 'জানিস তো আবার চুনাও আসছে?'

চোখ ছোট করে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে ভৈরো, 'শুনা হ্যায়, লগভগ তিন চার মাহিনা পর চুনাও হবে।'

'ঠিকই শুনেছিস। এবারও ত্রিকূটজি চুনাওতে নামছেন।'

ভৈরো উত্তর দেয় না। নির্বাচন এবং ত্রিকূটনারায়ণের ব্যাপারে মুকুটনাথ আরো কী বলতে চান, শোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

মুকুটনাথ বলেন, 'এখানে যত গাঁও আর গাঁওবালা আছে তাদের বলে রাখবি আমার সমধীকে যেন সবাই ভোট দেয়।'

'জি—' বশংবদ ভঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে দেয় ভৈরো।

'একটা ভোটও যেন এদিক ওদিক না হয়।'

'জি—'

'কথাটা মনে থাকবে?'

'থাকবে হুজৌর।'

'আজ আমরা যাই। পরে ত্রিকূটজিকে সঙ্গে নিয়ে তোদের গাঁওয়ে যাব। তুই নিজে ত্রিকূটজির সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দিবি।'

ফেরার জন্য মুকুটনাথরা যখন পা বাড়াতে যাবেন সেই সময় দূর থেকে মেয়েমানুষের গলা ভেসে আসে, 'কঁহা হ্যায় মেরে দেওতা, কঁহা হ্যায়?'

মুকুটনাথের আর যাওয়া হয় না। ভিড় ঠেলে ছুটতে ছুটতে একটি মেয়েমানুষ একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। তার বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ। আঁটোসাটো গড়ন, উদ্দাম স্বাস্থ্য।

মেয়েমানুষটির গায়ের রং মোটামুটি ফর্সাই। ভাসা ভাসা বড় চোখ তার, লম্বাটে মুখ, সাদা সুগঠিত দাঁত। পিঠময় ছড়ানো কোঁচকানো চুলের প্রায় সবটাই কুচকুচে কালো, ফাঁকে ফাঁকে ক্বচিৎ দু-চারটে রুপোর তার। গায়ের চামড়া এখনও টান টান। সরু কোমর তার, নিচের দিকটা বিশাল।

পরনে খাটো রঙিন শাড়ি আর লাল টকটকে জামা। দুই ভুরুর মাঝখানে সাপ-আঁকা উলকি। হাতে মোটা মোটা চাঁদির কাংনা, নাকে ঝুটো সবুজ পাথব বসানো নাকফুল, কানে বড় বড় চাকার মতো দুল, গলায় চাঁদিরই হার।

যৌবন অনেক আগেই চলে যাবার কথা কিন্তু এখনও তার গনগনে আঁচ অনেকটাই থেকে গেছে। তার শরীর জুড়ে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো এই বয়সেও প্রচুর চটক।

মেয়েমানুষটা মুকুটনাথের পায়ের কাছে প্রায় লম্বা হয়ে শুয়ে প্রণাম করে। তবে পা ছোঁয় না, কেননা জল-অচল অচ্ছুতের স্পর্শে পবিত্র ব্রাহ্মণের দেহমন অশুদ্ধ হয়ে যাবে। সজ্ঞানে তা হতে দিতে পারে না মেয়েমানুষটা। প্রণামের পর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় সে।

মুকুটনাথ মেয়েমানুষটাকে দেখে ভেতরে ভেতরে অনেকখানি কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। কেননা যৌবনে সে ছিল তাঁর রাখনি বা রক্ষিতা। রাতের অন্ধকারে ধরমপুরায় মিশ্রদের এক পুরনো বাড়িতে রোজই লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসত মেয়েমানুষটা। তার জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করতেন মুকুটনাথ। ঘণ্টা তিন চারেক একসঙ্গে কাটিয়ে 'মিশ্র নিকেত'-এ চলে যেতেন মুকুটনাথ, আর মেয়েমানুষটি চলে যেত অচ্ছুৎটোলিতে।

অচ্ছুৎদের ছুঁলে শুধ্ ব্রাহ্মণের চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হতে পারে, কিন্তু তাদের ঘরের সুন্দরী যুবতী মেয়েরা এ অঞ্চলে চিরকালই মিশ্র বংশের ভোগের বস্তু। সেখানে ছুঁয়াছুতের দোষ অর্সায় না।

মুকুটনাথের ধারণা, তাঁদের পুরনো বাড়ির এক অতি প্রাচীন নৌকর ছাড়া আর কেউ এই গূঢ় খবর জানে না। নৌকরটা অতীব বিশ্বাসী, গলা কেটে ফেললেও তার মুখ দিয়ে এ ব্যাপারে টুঁ শব্দটি বেরুবে না।

মুকুটনাথের ধারণা যাই হোক, ধরমপুরার চল্লিশ হাজার মানুষের আশি হাজার চোখ রয়েছে। মিশ্রদের পুরনো বাড়িতে মুকুটনাথ এবং ওই মেয়েমানুষটা রাত্তিরে বেশ খানিকটা সময় যে কাটিয়ে যেত তা তাদের অনেকেরই চোখে পড়েছে। প্রবল প্রতাপান্বিত মিশ্র বংশের কেচ্ছা একসময় সবাই জানত, আবার কেউ জানত না। ঘটনাটি ধরমপুরার মানুষজনের কাছে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ব্যাপার।

এই মেয়েমানুষটি সম্পর্কে মুকুটনাথের মোহভঙ্গ হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। পাঁচ ছ' বছর তার সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ নেই বললেই চলে। আজকাল ক্বচিৎ কখনও দু'জনের দেখা হয়।

মুকুটনাথ জানেন, ইদানীং মেয়েমানুষটি এ অঞ্চলে দাই-এর কাজ করে। ছেলেপুলে জন্মাবার সময় তার ডাক পড়ে। তা ছাড়া মুকুটনাথ খবর পেয়েছেন, মেয়েমানুষটির একটা গোপন ব্যবসাও রয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে অবাঞ্ছিত অবৈধ ভ্রূণ নষ্ট করে থাকে সে। এই ব্যবসাতে তার প্রচণ্ড রমরমা।

মুকুটনাথ নিচু গলায় বলেন, 'কেমন আছিস ভামরী?' বলে চোখের কোণ দিয়ে চারপাশের লোকজনকে লক্ষ করতে থাকেন।

'আপনার কিরপায় দিন কেটে যাচ্ছে।' মেয়েমানুষটা অর্থাৎ ভামরী এভাবে উত্তর দেয়।

খানিকটা দূরে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল কিরণ। ভামরীর নাম কানে আসতেই চমকে তার দিকে তাকায়। যদিও 'মিশ্র নিকেত' একটি ছোটখাট দুর্গবিশেষ, তবু তার দেওয়াল ভেদ করে মুকুটনাথ এবং ভামরীকে জড়িয়ে কিছু কেচ্ছা সেখানেও ঢুকে পড়েছিল। ভামরীকে আগে কখনও দেখেনি সে। বেশ আগ্রহ নিয়েই এখন কিরণ তাকে লক্ষ করতে থাকে।

ভামরী হাতজোড় করে বলে, 'হুজৌর, আমার ঘরে চলুন। আপনার পায়ের ধুলো পড়লে ঘরটা স্বরগ বনে যাবে।'

ভৈরো মুকুটনাথকে তাদের গাঁয়ে যেতে বলেছিল। কিন্তু ঘরে যেতে বলার সাহস নেই। ভামরীর এ কথা বলার জোরটা যে কোথায়, ভৈরো কেন, অচ্ছুৎটোলার বয়স্ক পুরুষ এবং মেয়েরা সবাই জানে। তবে মুখ ফুটে এ বিষয়ে কিছু বলার দুঃসাহস বা স্পর্ধা কোনোটাই তাদের নেই।

মুকুটনাথ অনিশ্চিতভাবে বলেন, 'আসব একদিন তোদের গাঁওয়ে। তখন তোর ওখানেও যাব।' বলে ব্যস্তভাবে ঘুরে দাঁড়ান। বলেন, 'চলুন ত্রিকূটজি, চল হরীশ, রাজেশ। ইস, অনেক বেলা হয়ে গেল।'

সবাই দূরে ফিটনগুলোর দিকে এগিয়ে যায়।

এগার

গোলগোলি এবং বইহারি মৌজা দেখার পর ফেরার সময় ত্রিকূটনারায়ণ হাতজোড় করে বলেন, 'যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা বলি—'

পালটা হাতজোড় কর মুকুটনাথ শশব্যস্তে বলেন, 'অপরাধ নেব আমি! যা ইচ্ছা হয় বলুন।'

'হঠাৎ মনে পড়ল, বাড়িতে জরুরি একটা কাজ আছে। দুপুরে আপনার কোঠিতে খেতে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। ভাবীজিকে বললেন, আমি আরেক দিন গিয়ে খেয়ে আসব। উনি যেন আমাদের ক্ষমা করে দেন।'

মুকুটনাথকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখায়। তিনি বলেন, 'আমরা বস্তুত আশা করেছিলাম, একসাথ বসে আনন্দ করে খাব। ভাগ্যটাই খারাপ দেখছি।'

মুকুটনাথের দু হাত ধরে কাঁচুমাচু মুখে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'আপনার না, ভাগ্যটা আমারই খারাপ। দুটো দিন, ওনলি টু ডেজ। তারপর আমি হরীশ আর রাজেশকে সঙ্গে করে এসে ভাবীজির রান্না খেয়ে যাব।'

মুকুটনাথ হতাশ ভঙ্গিতে বলেন, 'ঠিক আছে। কৃপা করে আসবেন কিন্তু। এবার মেহমানদারির চান্সটা যেন পাই।'

ত্রিকূটনারায়ণ হেসে ফেলেন। হালকা গলায় বলেন, 'পাবেন পাবেন। চিন্তা মাত্ কীজিয়ে—' একটু থেমে ফের বলেন, 'আরেকটা মেহেরবানি যে করতে হবে মুকুটনাথজি—'

মুকুটনাথ বলেন, 'মেহেরবানি বলে লজ্জা দেবেন না, হুকুম করুন।'

ত্রিকূটনারায়ণ জানান, তাঁরা মুকুটনাথের ফিটন নিয়ে আপাতত কামতিগঞ্জে ফিরে যেতে চান। বাড়ি পৌঁছেই ফিটনটা ফেরত পাঠানো হবে। মুকুটনাথ ধরমপুরায় নিজের বাড়ি গিয়ে যেন ত্রিকূটনারায়ণের ড্রাইভারকে মোটর নিয়ে কামতিগঞ্জে চলে যেতে বলেন।

এরপর দুটো ফিটন দু দিকে চলে যায়। এক ফিটনে ত্রিকূটনারায়ণ হরীশ এবং রাজেশ, অন্য ফিটনটায় মুকুটনাথ কিরণ আর খুবলাল।

'মিশ্র নিকেত'-এর কাছে যখন কিরণদের ফিটন এসে পৌঁছয়, সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। রোদে এখন ছুরির ধার। গরম হাওয়া গনগনে ভাপ ছড়াতে ছড়াতে ধরমপুরা টাউনের ওপর দিয়ে উলটোপালটা ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

ফিটনটা দেখে দারোয়ান ধাতব শব্দ করে লোহার গেট খুলে দেয়।

কোচোয়ান ভেতরে ফাঁকা জায়গায় ফিটনটা এনে থামাতেই মুকুটনাথ এবং কিরণ নেমে পড়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা মাঝবয়সী নৌকর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসে। কিন্তু কিছু বলার আগেই নতুন শিবমন্দিরের বারান্দা থেকে কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ তাকে থামিয়ে দেয়; 'তোকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমি বলছি।'

মুকুটনাথ শিবমন্দিরের দিকে তাকান। বারান্দায় শুধু বশিষ্ঠনারায়ণই নেই, রেবতীও রয়েছেন। তাঁরা দু'জনেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।

মুকুটনাথের স্নায়ু খুবই সজাগ। মুহূর্তে তিনি টের পান, গোটা 'মিশ্র নিকেত'-এর আবহাওয়া কেমন যেন থমথমে। ঘণ্টা তিনেক আগে তিনি যখন পাহাড়ের নিচের মৌজায় জমি দেখাতে গিয়েছিলেন, এ বাড়ির কোথাও অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ কী ঘটে যেতে পারে? কিছুটা

উদ্বেগই বোধ করতে থাকেন তিনি।

আগে লক্ষ করেননি মুকুটনাথ, এবার তাঁর চোখে পড়ে নৌকর নৌকরনীরা দূরে দূরে থোকায় থোকায় দাঁড়িয়ে চাপা নিচু গলায় কী যেন বলাবলি করছে। নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে যেতে থাকে মুকুটনাথের।

বশিষ্ঠনারায়ণ এবং রেবতী কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

মুকুটনাথ খানিকটা উদ্বেগের সুরে বলেন, 'কী?'

চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'এখানে না, ভেতরে চল।' রেবতীকে বলেন, 'তুমি কিরণকে ওপরে ওর ঘরে পৌঁছে দাও। ডান দিকের সিঁড়ি দিয়ে যাবে।'

ওপরে যাবার দুটো সিঁড়ি আছে এ বাড়িতে। রেবতী মাথা নেড়ে বলেন, 'জি।' কিরণের দিকে ফিরে বলেন, 'আয়।'

কিরণ খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিমূঢ়ের মতো সে রেবতীর সঙ্গে ডান ধারের সিঁড়ির দিকে যায়।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'এস মুকুট—'

পা বাড়াতে গিয়ে ত্রিকূটনারায়ণের অনুরোধ মনে পড়ে যায় মুকুটনাথের। যে মোটরে করে সকালে তিনি এসেছিলেন সেটা ফেরত পাঠাতে বলেছেন।

ত্রিকূটনারায়ণের ফোর্ড গাড়িটা এক কোণে পার্ক করা রয়েছে। মাঝবয়সী যে নৌকরটা তাকে কিছু বলার জন্য দৌড়ে এসেছিল সে এখনও দাঁড়িয়েই আছে। তাকে দিয়ে ত্রিকূটনারায়ণের ড্রাইভারকে ডাকিয়ে কামতিগঞ্জে ফিরে যেতে বলেন। তারপর বশিষ্ঠনারায়ণের সঙ্গে বাড়ির দিকে এগিয়ে যান।

যেতে যেতে বশিষ্ঠনারায়ণ চাপা গলায় বলেন, 'বহুত মুসিবত মুকুট—'

'কী হয়েছে? মায়ের কি কিছু হল?' একটু আগের সেই উদ্বেগটা বেড়ে যায় মুকুটনাথের।

'না না, মহেশ্বরী ঠিক আছে।'

'তা হলে?'

'ভেতরে গিয়ে সব বলব।'

মুকুটনাথ বুঝতে পারছিলেন, বশিষ্ঠনারায়ণ এই খোলা জায়গায় যেখানে নৌকর নৌকরনীরা থিক থিক করছে, কিছুই বলবেন না। যা জানাবার গোপনেই জানাবেন।

মুকুটনাথ ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। কোনো কারণেই তিনি অধীর হয়ে পড়েন না। তাঁর ধৈর্য অফুরন্ত। আর কোনো প্রশ্ন করেন না তিনি।

দু'জনে একটু পর একতলার বাঁ দিকে একটা ফাঁকা ঘরে গিয়ে সোফায় মুখোমুখি বসেন।

মুকুটনাথ স্থির চোখে বশিষ্ঠনারায়ণের দিকে তাকান, 'এবার বলুন গুরুজি—'

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'ওই ছোকরা এসেছে।'

'কার কথা বলছেন?'

'ওই যে দিল্লিবালা, যার কথা কিরণের কলেজের বড়ী মাস্টারনী তোমাকে চিঠিতে জানিয়েছিল।'

পলকে মুখচোখের চেহারা একেবারে পালটে যায় মুকুটনাথের। চোয়াল পাথরের মতো শক্ত হতে থাকে, শরীরের সব রক্ত গিয়ে জমা হয় দু চোখে। কণ্ঠার কাছের রক্তবাহী শিরাগুলো দড়ির মতো পাকিয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত ঘষে মুকুটনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি প্রভাকরের কথা বলেছেন কী?'

'হাঁ—' আস্তে মাথা হেলিয়ে দেন বশিষ্ঠনারায়ণ।

মুকুটনাথ বলেন, 'কখন এসেছে কুত্তাটা?'

'তোমরা ফিটন নিয়ে বেরিয়ে যাবার এক দেড় ঘণ্টা পর।'

'কোঠির ভেতর ঢুকতে দিল কে? দারবানেরা?'

'নেহী, আমিই দিয়েছি।'

মুকুটনাথ যত ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিতই হন না, কুলগুরুর সিদ্ধান্তের ওপর কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব

নয়। তিনি যা করেছেন তা মেনে নিতেই হবে। কোনো প্রশ্ন না করে মুকুটনাথ তাকিয়ে থাকেন।

বশিষ্ঠনারায়ণ এবার বলেন, 'ছোকরাকে দারবানেরা ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছিল না। ও তখন কিরণের নাম করে এমন চেল্লাচেল্লি শুরু করে দেয় যে লোক জমে যাচ্ছিল। ঘরের কেচ্ছা বাইরে রটুক, সেটা তো ঠিক না মুকুটনাথ। তাই ওকে ভেতের এনে বসিয়েছি।'

মুকুটনাথ সায় দিয়ে বলেন, 'ঠিক করেছেন। ছোকরা হঠাৎ এখানে এল কেন? আপনাকে কিছু বলেছে?'

'নেহী। আমি জিজ্ঞেস করিনি। ভাবলাম, গোলগোলি মৌজা থেকে ফিরে এলে যা বলার তুমিই বলবে। আমি আবশ্য তোমার সঙ্গে থাকব।'

কোনো কারণেই যে মুকুটনাথ মাথা গরম করেন না, এই মুহূর্তে অসহ্য ক্রোধে এবং উত্তেজনায় তাঁর রক্তচাপ ভয়ানক বেড়ে যায়। কণ্ঠার দু পাশের শিরা দপ দপ করতে থাকে। চোখ দুটো এত লাল হয়ে উঠেছে যেন ফেটে গিয়ে এখনই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলেন, 'ওর এত সাহস যে দিল্লি থেকে ধরমপুরা পর্যন্ত চলে এসেছে! শুয়ারকা বাচ্চার সঙ্গে একটা কথাও আমি বলব না, স্রিফ লাথ মারতে মারতে কোঠি থেকে বার করে দেব। নৌকরদের বলব, গর্দানা পাকড়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসতে।' বলতে বলতে উঠে পড়েন।

বশিষ্ঠনারায়ণ মুকুটনাথের হাত ধরে ফের বসিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখ মুকুটনাথ। ছোকরা দিল্লির প্রফেসার, ধরমপুরার আনপড় ডরপোক আদমী না। যে অত দূর থেকে আসতে পারে তার পেছনে জরুর বড়ে বড়ে আদমী আছে।'

বশিষ্ঠনারায়ণ বোঝাতে চাইছেন, ধরমপুরার গরিব শিক্ষাদীক্ষাহীন ভীরু লোকজনের ওপর অবশ্যই দাপট খাটানো যায়, চোখ রাঙিয়ে তাদের দাবিয়ে রাখাও যেতে পারে। তাদের গলা দিয়ে টুঁ শব্দটি বেরুবে না। কিন্তু দিল্লির একজন উচ্চশিক্ষিত প্রফেসারের ওপর ঠিক ওই পদ্ধতি চালানো যায় না। তা ছাড়া তার পেছনে প্রভাবশালী মুরুব্বির জোর থাকা অসম্ভব নয়। জবরদস্তি কিছু করতে গেলে তার ফলাফল হবে মারাত্মক। কোনোরকম হইচই না করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রভাকরকে ফেরত পাঠানোই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। মনে রাখা দরকার, সব জায়গায় জোরজুলুম খাটে না, কূটকৌশলও কাজে লাগাতে হয়।

বশিষ্ঠনারায়ণের কথাগুলো আদৌ অসার নয়, তার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। মুকুটনাথের উত্তপ্ত মস্তিস্ক কিছুটা জুড়িয়ে আসে। তিনি বলেন, 'আপনি যা বলছেন তা-ই হবে।'

'এখন প্রভাকরের কাছে চল।'

একতলায় মহেশ্বরীর কামরা বাদ দিলে তিন তিনটে বসবার ঘর রয়েছে। দক্ষিণ দিকের শেষ ঘরটিতে প্রভাকরকে বসানো হয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে বশিষ্ঠনারায়ণ এবং মুকুটনাথ সেখানে চলে আসেন।

ঝকঝকে চেহারার প্রভাকর একটা সোফায় চুপচাপ বসে ছিল। মাথার ওপর আস্তে আস্তে পুরনো মডেলের দুই ব্লেডওলা পাখা ঘুরে যাচ্ছে। মুকুটনাথদের দেখে সে উঠে দাঁড়ায়। মাথা ঝুঁকিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'নমস্তে। আমি প্রভাকর।'

প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতটা সামান্য তুলে মুকুটনাথ বলেন, 'আমার নাম মুকুটনাথ মিশ্র।' বশিষ্ঠনারায়ণের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'ইনি আমাদের কুলগুরু।'

'ওঁকে আগেই দেখেছি। পরিচয়টা জানতাম না।' প্রভাকর বলতে থাকে, 'আমি দিল্লি থেকে আসছি।'

'শুনেছি, বসুন। অত দূর থেকে যখন এসেছেন, নিশ্চয়ই জরুরি কোনো ব্যাপার আছে?'

সবাই বসে পড়েছিল। সেন্টার টেবলের একধারে মুকুটনাথ এবং বশিষ্ঠনারায়ণ, তাঁদের মুখোমুখি প্রভাকর।

প্রভাকর বলে, 'হাঁ। আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। আমার বিশেষ কিছু কথা আছে।'

'বলুন—' মুকুটনাথ তার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকান।

প্রভাকর হাতজোড় করে বলে, 'আমার একটা অনুরোধ আছে। বয়েসে আপনাদের চেয়ে আমি অনেক ছোট। 'আপনি' করে বলছেন, আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।'

'ঠিক আছে। যা বলতে এসেছ, বলে ফেল—'

'কিন্তু—' বলে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে বশিষ্ঠনারায়ণের দিকে তাকায় প্রভাকর।

তার মনোভাবটা বুঝতে পারেন মুকুটনাথ। বলেন, 'তুমি আমাকে যা বলবে, ওঁর কাছে তার একটা শব্দও গোপন থাকবে না। কোনো চিন্তা নেই। গুরুজির সামনে বললে তোমার ক্ষতি হবে না।'

প্রভাকর বলে, 'ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন—'

প্রভাকরকে থামিয়ে দিয়ে হঠাৎ বশিষ্ঠনারায়ণ বলে ওঠেন, 'কথাবার্তা পরে হবে। তুমি অতদূর থেকে এসেছ। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। আগে চা খাও, তারপর কথা—'

কুলগুরুর সূক্ষ্ম চালটা ধরতে পারেন মুকুটনাথ। অর্থাৎ খাতিরদারি করে মধুর ব্যবহারে, মিষ্টি কথায় প্রভাকরকে বিদায় করতে হবে। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে তিনি বলে ওঠেন, 'নৌকরগুলোকে ঘাড় ধরে আমার কোঠি থেকে বার করে দেব। একটা লোক দিল্লি থেকে এসে টায়ার্ড হয়ে বসে আছে, তাকে চা-পানি দেবার কথা কারুর খেয়াল নেই? যত ভূচ্চরের দল—' বলেই চিৎকার করে একটা নৌকরকে ডাকেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘোলের উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডাই গুলাবজামুন পেঁড়া কলাকন্দ নিমকিন এবং সমোসা এসে হাজির হয়। মুকুটনাথ পরম সমাদরের ভঙ্গিতে বলেন, 'খাও—'

প্রভাকর আপত্তি না করে ঠাণ্ডাই এবং দু-একটা মিঠাই খেয়ে বলে, 'এবার শুরু করতে পারি?'

'সার্টেনলি।'

কোনো ভণিতা না করে সোজাসুজি কাজের কথায় চলে আসে প্রভাকর, 'কিরণের কাছে আমার কথা হয়ত আপনি শুনে থাকবেন।'

মুকুটনাথ চোখের কোণ দিয়ে বশিষ্ঠনারায়ণকে এক পলক দেখে নেন। তারপর বলেন, 'কিরণ আমাকে বলেনি। তবে তোমার নাম অন্য জায়গা থেকে শুনেছি।'

'কোত্থেকে?'

'সেটা না জানলেই কি নয়?'

প্রভাকর বলে, 'জানতে পারলে ভাল হত।'

মুকুটনাথ বলেন, 'বেশ, শুনে নাও। কিরণের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আমাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন।'

প্রভাকর হকচকিয়ে যায়। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে খুব সংযত ভঙ্গিতে বলে, 'প্রিন্সিপ্যাল আমার সম্বন্ধে কী লিখেছেন, জানতে চাই না। তবে আমার ধারণা—'

চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন মুকুটনাথ, কোনো প্রশ্ন করেন না।

প্রভাকর থামেনি। সে বলে যায়, 'ওই চিঠিটা পাওয়ার পরই বোধ হয় কিরণকে আপনি লোক পাঠিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন।'

মুকুটনাথ বলেন, 'তোমার এ কথার আমি জবাব দেব না। অন্য কথা থাকলে বল—'

প্রভাকর তক্ষুনি কিছু বলে না। কিছুক্ষণ ভেবে শুরু করে, 'কয়েকদিন আগে আমি কিরণের একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে সে কী লিখেছে আপনি কি জানেন?'

সমস্ত ঘরটায় নিরেট স্তব্ধতা নেমে আসে। কিরণকে দিনরাত একরকম কয়েদিদের মতো কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে। আজ গোলগোলি মৌজায় যাওয়া ছাড়া এক পলকের জন্যও তাকে 'মিশ্র নিকেত'-এর বাইরে বেরুতে দেওয়া হয়নি। একদিন একা একা সে তার ছেলেবেলার বন্ধুর বাড়ি যেতে চেয়েছিল, দারোয়ানেরা তাকে রুখে দেয়। এই নিশ্ছিদ্র নজরদারির ভেতরে থেকেও সে কী করে প্রভাকরকে চিঠি পাঠাতে পারল?

মুকুটনাথের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছিল। কর্কশ স্বরে তিনি বলেন, 'কী লিখেছে?'

প্রভাকর মুকুটনাথের চোখের দিকে পলকহীন তাকিয়ে বলে, 'আপনি তাকে এ বাড়িতে আটকে

রেখেছেন।'

বশিষ্ঠনারায়ণের পরামর্শ অনুযায়ী প্রাণপণে এতক্ষণ নিজেকে সংযত রেখেছিলেন মুকুটনাথ। কিন্তু শরীরের সব রক্ত আবার তাঁর মাথায় উঠে আসতে থাকে।

প্রভাকর এবার বলে, 'এটা আপনি কিছুতেই পাবেন না। দিস ইজ টোটালি আন-ল'ফুল, পুরোপুরি বে-আইনি।'

মুকুটনাথকে এই মুহূর্তে বারুদের স্তূপের মতো দেখাচ্ছে। প্রভাকরের কথা শুনতে শুনতে তার দিকে লক্ষ রাখছিলেন বশিষ্ঠনারায়ণ। বিস্ফোরণটা ঘটবার আগেই মুকুটনাথকে থামিয়ে দিয়ে তিনি প্রভাকরকে বলেন, 'মুকুট কিরণের বাবা। মেয়েকে আটকে রাখা না-রাখা, সবটাই তার ইচ্ছা।'

প্রভাকর আগাগোড়াই ধীর স্থির এবং শান্ত। নিরুত্তেজ ভঙ্গিতে সে বলে, 'কিরণ সাবালিকা। তাকে কারুর ইচ্ছামতো আটকে রাখা যায় না, বাবা হলেও না। আপনারা যে কোনো ভকিলকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারেন।'

বশিষ্ঠনারায়ণ অদ্ভুত হাসেন, 'তুমি কলেজে পড়াও, জ্ঞানী আদমী। আইন না জেনেই কি আর বলছ! তবে আইনের ওপরও অনেক কিছু থাকে।'

'যেমন?' কিঞ্চিৎ উৎসুক দেখায় প্রভাকরকে।

'তুমি সেই শ্লোকটা জরুর জানো। 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ—'

'জানি।'

'তাছাড়া কিরণদের বংশের একটা পরম্পরা আছে।'

'কিরকম?'

'এই বংশে বাপই সব। তার ইচ্ছা বা হুকুমের বাইরে কোনো কিছু হওয়ার উপায় নেই।'

'ছেলেমেয়ে যদি বাবার ইচ্ছায় না চলে?'

'তার ফল তাদের ভুগতে হবে।' বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'ওসব কথা থাক। তুমি তো বললে কিরণের চিঠি পেয়ে চলে এসেছ—'

'হাঁ—' আস্তে মাথা নাড়ে প্রভাকর।

'কী জন্যে এসেছ, সেটা কিন্তু এখনও আমরা জানতে পারিনি।'

'আমি কিরণকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

বশিষ্ঠনারায়ণ চমকান না। প্রভাকর যে এই উদ্দেশ্যেই এখানে হানা দিয়েছে, সেটা যেন জানাই ছিল তাঁর। তিনি বিচলিতও হন না। অত্যন্ত স্বাভাবিক সুরে বলেন, 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

প্রভাকর বলে, 'নিশ্চয়ই।'

'তোমার সঙ্গে মুকুটনাথের রিস্তেদারি আছে বলে কখনও শুনিনি। তুমি ওর ভাই না, চাচা না, মামা না। তোমার সঙ্গে একটা যুবতী লেড়কীকে আমরা যেতে দেব কেন?'

প্রভাকর বলে, 'কিরণ আমার স্ত্রী। তাই ওকে আমার সঙ্গে যেতে দেবেন।' তার কণ্ঠস্বর শান্ত, অথচ দৃঢ়।

সমস্ত ধরমপুরা টাউন তোলপাড় করে 'মিশ্র নিকেত'-এর মাথায় আচমকা প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ পড়ে যেন। তারপর কিছুক্ষণের জন্য সারা ঘর একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়।

বার

কিরণকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে রেবতী রূঢ় গলায় বলে গিয়েছিলেন, 'কামরা থেকে বেরুবে না।' বাইরে বেরিয়ে কাকে যেন হুকুম দিয়েছিলেন, এই ঘরের ওপর নজর রাখতে। যদি কিরণ বেরুবার চেষ্টা করে, তক্ষুনি যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়।

রেবতীর মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয়নি কিরণের। চিরদিনের শান্ত এবং নরম মানুষটি

পারিবারিক মর্যাদা রক্ষা করার জন্য একেবারে খেপে উঠেছেন। বংশের সম্মান তিনি কোনোভাবেই নষ্ট হতে দেবেন না। এ ব্যাপারে মুকুটনাথ বা মহেশ্বরীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর ধ্যান-ধারণার বিন্দুমাত্র তফাত নেই।

রেবতী চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ খাটে বসে থাকে কিরণ। তারপব উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরময় ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। একবার ভাবে, এখনই নিচে নেমে যাবে। প্রভাকব এখানে আসাব পর আর মুখ বুজে থাকার মানে হয় না। এবার বিস্ফোরণ ঘটাতেই হবে। পরক্ষণে চিন্তা করে, আরেকটু অপেক্ষা করে দেখা যাক।

তীব্র অস্থিরতার মধ্যে অনেকটা সময় কেটে যায়। তারপর হঠাৎ বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে ঘরে ঢোকে সাগিয়া। চাপা গলায় ডাকে, 'দিদিজি—' তার স্বরে উত্তেজনা।

মুখ ফিরিয়ে তাকায় কিরণ।

সাগিয়া কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'নিচে গোলমাল হচ্ছে। জরুর শুনেছ, দিল্লি থেকে একগো আদমী এসেছে। বহোত খুবসুবত। বড়ে সরকাবের সঙ্গে তার ঝগড়া হচ্ছে।'

কিরণ কিছু উত্তর দেবার আগে সাগিয়া ফের বলে, 'আচ্ছা দিদিজি, আমাকে তুমি যে চিঠিটা ডাকে দিতে বলেছিলে সেটা কি এই আদমীটাকেই লিখেছিলে?'

মেয়েটা দারুণ চালাক চতুর, কেউ হাঁ করলে তার বুকের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পায়। অন্য সময় হলে কিরণ অবাক হত, এখন প্রভাকরের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। চিঠির ব্যাপারে কিছু না বলে সে জিজ্ঞেস করে, 'বাবুজি কী বলছে?'

'বহোত গুস্‌সা হয়ে ওই আদমীটাকে গালি দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, দারবানদের ডেকে তাকে কোঠির বাইরে বার করে দেবে। আমার ডর লাগছে দিদিজি—'

'প্রভাকর কী বলছে?'

'দিল্লি থেকে যে এসেছে তার নাম প্রভারকরজি?'

'হাঁ।'

'সব কথা শুনতে পাইনি। মা'জি ওখানে কাউকে যেতে দিচ্ছে না। তবে দূর থেকে কানে এল, প্রভাকরজি তোমাকে দিল্লি নিয়ে যেতে চাইছে।'

রুদ্ধশ্বাসে কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'বাবুজি কী বলল?'

সাগিয়া জানায়, আর কিছু সে শুনতে পায়নি। কেননা হঠাৎ রেবতী তাকে দেখতে পেয়ে রেগে যান এবং দোতলায় চলে আসতে বলেন।

একটু চুপচাপ।

তারপর সাগিয়া চাপা গলায় এবার বলে, 'দিদিজি, আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'বড়ে সরকার যেরকম গুস্‌সা হয়ে আছেন তাতে প্রভাকরজির বিপদ হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে—'

উৎকণ্ঠিত ভঙ্গিতে তাকায় কিরণ। বলে, 'কী?'

'প্রভাকরজি যদি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে জেদ ধরে, দারবানদের দিয়ে মার দেওযাবেন। কী হবে দিদিজি?'

সাগিয়ার কথা শেষ হতে না হতেই মনস্থির করে ফেলে কিরণ। সে শুধু জিজ্ঞেস করে, 'মা এখন কোথায় রে?'

সাগিয়া বলে, 'যে কামরায় বড়ে সরকার, গুরুজি আর প্রভাকরজি কথা বলছে তার বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে—'

আর কিছু বলে না কিরণ। তার ওপর দুর্জয় এক সাহস যেন ভর করে। সাগিয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে তার পাশ দিয়ে দ্রুত বাইবে বেরিয়ে একতলার সিঁড়ির দিকে ছুটে যায়।

পেছন থেকে ভীরু গলায় সাগিয়া বলে ওঠে, 'মাত্ যাও দিদিজি, মাত্ যাও—'

কিন্তু তার কথা যেন শুনতেই পায় না কিরণ। একসঙ্গে দু-তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে সে নির্দিষ্ট

ঘরটির সামনে চলে আসে।

খবরটা ঠিকই দিয়েছিল সাগিয়া। রেবতী ঘরের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সতর্ক চোখে চারদিকে লক্ষ রাখছেন। আশেপাশে নৌকর নৌকরনী কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। খুব সম্ভব তাঁর হুকুমে সবাই বাড়ির অন্য দিকে চলে গেছে।

কিরণকে দেখে মুখ কঠোর হয়ে ওঠে রেবতীর, কপাল কুঁচকে যায়। রুক্ষ গলায় বলেন, 'এখানে কে আসতে বলেছে তোমাকে? ওপরে যাও।'

কিরণ উত্তর দেয় না, দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ঘরের ভেতর থেকে মুকুটনাথের প্রচণ্ড চিৎকার ভেসে আসছে, 'দিস ইজ নট ইওর দিল্লি। এখানে আমি যা বলব তা-ই করতে হবে। আমার কথাই এখানকার কানুন। উঠে পড়, আমার লোকেরা তোমাকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসবে।'

প্রভাকরের গলা শোনা যায়। শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে সে বলে, 'আপনাকে তো অনেক বার বলেছি, কিরণকে না নিয়ে আমি এখান থেকে যাব না।'

মুকুটনাথের গলা এবার আরো কয়েক পর্দা চড়ে যায়।

ভেতরে তর্জন গর্জন চলছে। রেবতী কিরণকে বলেন, 'আমার কথা কী কানে গেল না? ওপরে যেতে বললাম যে?'

কিরণ মা'র প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে, 'দরজা ছাড়, আমি ভেতরে যাব।'

মেয়ের স্পর্ধায় কিছুক্ষণ রেবতীর গলায় স্বর ফোটে না। অসহ্য রাগে শরীরের সব রক্ত মাথায় চড়ে যায় যেন, গলার কাছের মাংসপেশী পাথরের মতো শক্ত হতে থাকে। একসময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চেঁচিয়ে ওঠেন, 'বেশরম লেড়কী, এত সাহস তোমার! বংশের মুখে আর কত কালি মাখাবে! যাও—' বলে সটান হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে দোতলার সিঁড়ি দেখিয়ে দেন।

যে প্রবল জেদটা কিরণকে নিচে নামিয়ে এনেছিল তার শক্তি আচমকা কয়েক গুণ বেড়ে যায় যেন। সে ধীরে ধীরে মাকে একপাশে সরিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ে। বশিষ্ঠনারায়ণ এখন এ ঘরে নেই। হয়ত কোনো দরকারে বাইরে গেছেন।

মুকুটনাথ প্রচণ্ড উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে প্রভাকরকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আচমকা কিরণকে দেখে থমকে যান। এ ঘরে আসাব মতো এতটা সাহস কিরণের কিভাবে হল, এরকম একটা ভাবনা তাঁকে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত করে রাখে। তারপর আরক্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি এখানে!'

চোখের সামনে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না কিরণ। অন্ধের মতো সে বলে, 'প্রভাকরের সঙ্গে আমি দিল্লি যাব।'

কিরণের কথা শেষ হতে না হতেই মুকুটনাথ প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। একটা হাত ধরে টানতে টানতে সোজা ওপরে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে তার ঘরে ছুঁড়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দেন।

কিরণ ঘরের মেঝেতে আছড়ে পড়েছিল। দ্রুত উঠে দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে গলা চড়িয়ে ডাকতে থাকে, 'বাবুজি, বাবুজি. দরজা খুলে দিন—'

মুকুটনাথের উত্তর মেলে না। তাঁর পায়ের আওয়াজ একতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

কিরণ উন্মাদের মতো দরজায় ঘা মারতেই থাকে, 'বাবুজি, বাবুজি—'

একসময় ক্লান্ত, হতাশ কিরণ বিছানায় গিয়ে বসে। এখন কী করা উচিত, একেবারেই ভেবে উঠতে পারছে না। অথচ যা করার, কয়েক মিনিটের ভেতর করে ফেলতে হবে। কেননা, প্রভাকরকে জোর করে এ বাড়ি থেকে বার করে দিলে, যে দুর্লভ সুযোগটা পাওয়া গেছে, চিরকালের মতো তা হাতছাড়া হয়ে যাবে। 'মিশ্র নিকেত'-এর দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে কোনোদিনই আর বেরুনো যাবে না। বেরুলেও তাকে যেতে হবে কামতিগঞ্জে ত্রিকূটনারায়ণদের বাড়িতে।

দিল্লিতে কয়েক বছর কাটিয়ে পর্যাপ্ত আলো হাওয়ায় ভরা গোঁড়ামি-মুক্ত স্বাধীন যে পৃথিবীর স্বপ্ন সে দেখেছে, কোনোদিনই তার নাগাল পাওয়া যাবে না। হাজার কুসংস্কারে বোঝাই, পচা, গলা, আবহমান কালের প্রাচীন আবহাওয়ায় তাকে আমৃত্যু আটকে থাকতে হবে।

হঠাৎ কিরণ উঠে দাঁড়ায়। তার মনে হয়, ক্ষীণ একটু আশা এখনও আছে। মুকুটনাথ যখন তাকে টানতে টানতে ওপরে নিয়ে এসেছিলেন, কিরণ বাধা দেয়নি। বলা যায়, দিতে পারেনি। বাবাকে সেই ছেলেবেলা থেকে সে ভীষণ ভয় পায়। কিন্তু সেই ভয়টা এই মুহূর্তে তার কাটিয়ে ওঠা অত্যন্ত জরুরি। কোনোরকমে এই বাড়িটা থেকে বেরুতে পারলে জোব করেই প্রভাকরের সঙ্গে চলে যাবে। বেরুবার একটা উপায় তাকে বার করতেই হবে।

কিরণ সোজা দরজার কাছে চলে আসে। ডাকে, 'সাগিয়া, সাগিয়া—' কিরণের ধাবণা, মুকুটনাথ চলে যাবার পর সাগিয়া দরজার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।

কিরণ যা ভেবেছিল তা-ই। বাইরের বারান্দা থেকে সাগিয়ার চাপা গলা ভেসে আসে, 'হাঁ দিদিজি—'

'শেকলটা খুলে দে।'

'নেহী দিদিজি।'

বিশ্বস্ত অনুগত সাগিয়ার কাছ থেকে এমন জবাব আশা করেনি কিরণ। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সে। তারপর বিমূঢ়ের মতো বলে, 'খুলবি না কেন?'

সাগিয়া বলে, 'হুকুম নেহী।'

'কার হুকুম?'

'বড়ে সরকারের। দরবাজা খুলে দিলে আমার জান চলে যাবে।'

অর্থাৎ চতুর মুকুটনাথ আগেই আন্দাজ করেছিলেন, ঘর থেকে বেরুবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে যাবে কিরণ, অন্তত প্রভাকর যতক্ষণ এ বাড়িতে আছে। তাই সাগিয়াকে, শুধু সাগিযাকেই না, এ বাড়ির নৌকর নৌকরনী থেকে শুরু করে সবাইকে হয়ত শাসিয়ে দিয়েছেন, দরজা খুলে দিলে খুন করে ফেলবেন। তাঁর হুঁশিয়ারি অমান্য করার সাহস 'মিশ্র নিকেত'-এর একটি মানুষেরও নেই।

কিরণ বলে, 'তোর ভয় নেই সাগিয়া। বাবুজিকে বলব, দরজা খুলে দেওয়ার জন্যে আমিই তোকে জোর করেছি।'

বিপন্নভাবে সাগিয়া বলে, 'আমাকে দরবাজা খুলতে বলো না দিদিজি। আমি পারব না।'

এরপর কাকুতি মিনতি করতে থাকে কিরণ, 'খুলে দে সাগিয়া, খুলে দে। কথা দিচ্ছি, তোর কোনো বিপদ হবে না।'

সাগিয়ার একটাই জবাব, তার পক্ষে বড়ে সবকারের হুকুম অগ্রাহ্য করে দরজা খোলা সম্ভব নয়।

এবার উদ্‌ভ্রান্তের মতো দরজায় এক নাগাড়ে ধাক্কা মাবতে থাকে কিবণ, 'খোল বলছি, খোল—'

সাগিয়া উত্তর দেয় না।

হঠাৎ নিচে তুমুল হই চই শুনে চমকে ওঠে কিরণ। দবজায় ঘা দিতে দিতে তার হাত থেমে যায়। চোখ কুঁচকে হইচই-এর কারণটা বুঝতে চেষ্টা করে। বিদ্যুৎ চমকেব মতো তার মনে হয়, প্রভাকরকে নিয়ে বড় রকমের একটা গোলমাল চলছে। নিজের অজান্তেই প্রায় দৌড়ে উলটো দিকের জানালার কাছে চলে আসে কিরণ। এখান থেকে নিচেব ফাঁকা জায়গা, বাঁ দিকের নতুন শিবমন্দিব, ডান পাশের বিশাল লোহার গেট—সব দেখা যায়।

গরাদের ফাঁক দিয়ে নিচে তাকাতেই পলকের জন্য কিবণের হৃৎপিণ্ডে দুরন্ত গতিতে ঝড় বয়ে যায়। যা ভয় করেছিল তা-ই। গেটের দুই দারোয়ান এবং হট্টাকট্টা চেহারার চার পাঁচটা নৌকর প্রভাকরকে টেনে হেঁচড়ে তাদের পুরনো মডেলের মোটরটার দিকে নিয়ে চলেছে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সমস্ত ব্যাপারটা তদারক করতে করতে মুকুটনাথ নৌকরদের বলছেন, 'ভূচ্চরের ছৌয়াটাকে গাড়িতে তুলে সিধা স্টেশনে নিয়ে যাবি। যে ট্রেন পয়লা আসবে সেটায তুলে দিয়ে তবে ফিরবি। সমঝা?'

নৌকর এবং দারোয়ানরা সমস্বরে জানায়, 'সমঝ গিয়া হুজৌর।'

এদিকে প্রভাকর সমানে হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছিল আর চিৎকার করছিল, 'ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও—'

মুকুটনাথ হিংস্র গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'চুপ, বিলকুল চুপ—'

প্রভাকর বলে, 'আমি আপনাকে ছাড়ব না। জেনে রাখুন মিস্টার মিশ্র, কিরণকে আমি এখান থেকে নিয়ে যাবই।'

'ফের ওকথা বললে তোমার জিভ ছিঁড়ে ফেলব কুত্তা।'

'একবার না, হাজার বার বলব। আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন।'

অসীম ক্রোধে প্রায় অন্ধ হয়ে যান মুকুটনাথ। চোখ দুটো যেন ফেটে পড়বে, কণ্ঠার কাছের মোটা শিরাগুলো দপ দপ করে লাফাতে থাকে। একটা মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে যাচ্ছিল, তার আগেই শিবমন্দিরের ভেতর থেকে কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ দ্রুত বেরিয়ে এলেন। 'শান্ত হো যাও মুকুটনাথ, শান্ত হো যাও—' বলতে বলতে নিচে নেমে সোজা মুকুটনাথের কাছে চলে আসেন, 'চারদিকে লোকজন রয়েছে। এখন এত উত্তেজনা ভাল না।'

বশিষ্ঠনারায়ণ আরো একবার বুঝিয়ে দেন, নৌকর দারোয়ানদের সামনে নিজের মেয়ের ব্যাপারে চিৎকার চেঁচামেচি করা অনুচিত। তাতে ঘরের কেলেঙ্কারি বাইরে ছড়িয়ে যাবে। ঢি ঢি পড়ে যাবে ধরমপুরা টাউনে। ঠাণ্ডা মাথায়, অসীম ধৈর্যে এখন সমস্যাটা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার।

আগেও অনেক বার বশিষ্ঠনারায়ণ সতর্ক করে দিয়েছিলেন। মুকুটনাথ দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করেন। বলেন, 'ঠিক আছে—' তারপর নৌকরদের উদ্দেশে চাপা গলায় বলতে থাকেন, 'তুরন্ত জানবরটাকে গাড়িতে তুলে ফ্যাল। ভৈসের মতো চেহারা এক একটার। ওই রোগা দুব্‌লা ছোকরাকে টেনে তুলতে এত সময় লাগে! লাথ মেরে আমি সবাইকে বাড়ি থেকে বার করে দেব।'

কাজেই নতুন উদ্যমে টানাহ্যাঁচড়া শুরু হয়ে যায়। অসীম শক্তিতে নৌকরদের বাধা দিতে দিতে প্রভাকর সমানে বলতে থাকে, 'কিরণকে না নিয়ে আমি যাব না।'

চোয়াল শক্ত করে মুকুটনাথ নৌকরদের শুধু বলেন, 'তুরন্ত—'

দোতলায় গরাদের ওপর নিজের মুখটা চেপে ধরে পলকহীন নিচের দৃশ্য দেখছিল কিরণ। টের পাচ্ছিল, তার বুকের ভেতরটা বেঁকেচুরে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ শরীরের সবটুকু শক্তি জড়ো করে সে চিৎকার করে, 'আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমি ওর সঙ্গে যাব।'

চমকে মুখ তুলে কিরণকে দেখেন মুকুটনাথ। সেই সঙ্গে বাকি সবাই।

পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নৌকরদের উদ্দেশে মুকুটনাথ বলে ওঠেন, 'জলদি—'

এক হ্যাঁচকায় প্রভাকরকে গাড়িতে তুলে পেছনের সিটে বসিয়ে দেয় নৌকরেরা এবং নিজেরা উঠে তাকে ঘিরে থাকে। প্রভাকর যে এতগুলো পাহারাদারকে ফাঁকি দিয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে পড়বে তার উপায় নেই।

এ বাড়ির পুরনো ড্রাইভার আগে থেকেই স্টিয়ারিং ধরে বসে ছিল এবং এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা বাইরের রাস্তায় নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে লোহার গেট ধাতব শব্দ করে বন্ধ হয়ে যায়।

ক্রমশ গাড়িটা দূরে, আরো দূরে, হাইওয়ের দিকে চলে যেতে থাকে। গরাদে মুখ চেপে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কিরণের চোখের সামনে চারপাশের পৃথিবী একেবারে ঝাপসা হয়ে যায়।

তের

প্রভাকরকে নিয়ে নৌকরেরা অনেকক্ষণ আগেই স্টেশনে চলে গিয়েছিল। তাকে পাটনার গাড়িতে চড়িয়ে তবে ওরা ফিরবে।

মুকুটনাথ প্রভাকরকে টানাটানি করে গাড়িতে তোলার ব্যাপারটা আগাগোড়া তদারক করে গেছেন। সুচারুভাবে কাজটি সম্পন্ন করে তিনি আপাতত বাড়ির ভেতর চলে এসেছেন। হয়ত কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ রেবতী বা মহেশ্বরীর সঙ্গে এই নিয়ে পরবর্তী রণকৌশল স্থির করছেন অথবা স্নানটান সেরে দুপুরের ভোজন চুকিয়ে বিশ্রাম করছেন।

হই চই শুনে সেই যে কিরণ জানালার কাছে গিয়ে গরাদে মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এখনও হুবহু সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

নিচের ফাঁকা জায়গাটায় এই মুহূর্তে কেউ নেই। দু-একটা নৌকর এধারে ওধারে কী যেন করছে। নতুন শিউশঙ্করজির মন্দিরেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কারুর সাড়াশব্দও কানে আসছে না। 'মিশ্র নিকেত' প্রচণ্ড দুর্যোগের পর হঠাৎ একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে।

দূরে হাইওয়ের ওপর দিয়ে প্রভাকরকে তুলে নিয়ে তাদের পুরনো আমলের ফোর্ড গাড়িটা চলে গেছে। যতক্ষণ সেটা দেখা গেছে, উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে ছিল কিরণ। হাজার রকমের প্রাচীন সংস্কার দিয়ে ঘেরা 'মিশ্র নিকেত' থেকে বেরুবার শেষ আশাটুকুও বিলীন হয়ে গেছে তার।

হাইওয়েতে এখন প্রতিদিনের সেই দৃশ্যাবলী। সেই বয়েল আর ভৈসা গাড়ির ঝাঁক, অগুনতি সাইকেল রিক্‌শা, ট্রাক, বাস এবং মানুষ। কিরণের জীবনে এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল কিন্তু তার এতটুকু ছাপ পড়েনি কোথাও। সমস্ত কিছুই আগের নিয়মে চলছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই কিরণের। হঠাৎ ঝনাৎ করে শেকলের আওয়াজ হওয়ায় চমকে ঘুরে দাঁড়ায়। ওধারের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকছেন রেবতী।

তিন ঘণ্টা আগে মায়ের চোখেমুখে যে দুশ্চিন্তা আর টেনশন ফুটে বেরিয়েছিল এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। এই মুহূর্তে ভাবনামুক্ত হয়ে রেবতীকে অনেকটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। বড় রকমের অঘটন না ঘটিয়ে প্রভাকরকে যে ধরমপুরা থেকে বিদায় করা গেছে, এতেই তাঁর স্নায়বিক চাপটা আর নেই।

খুব সহজ গলায় রেবতী বলেন, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। এবার স্নান করে খেয়ে নে।'

কিরণ লক্ষ করল, প্রভাকরের নাম বা তাকে নিয়ে 'মিশ্র নিকেত'-এ এমন একটা উত্তেজক ব্যাপার যে ঘটে গেল তার উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না রেবতী। যেন এ বাড়িতে পলকের জন্যও কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি, আজকের দিনটা অন্য সব দিনের মতো চিরকালেব রুটিন অনুযায়ী কেটে যাচ্ছে। কোথাও কোনো ব্যতিক্রম নেই।

কিরণ মাকে দেখতে দেখতে মনস্থির করে ফেলে। আপাতত সে চুপচাপ থাকবে। খাওয়া দাওয়া সেরে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর যা করার করবে। শরীবের অভ্যন্তরে প্রভাকরের যে ভ্রূণটি প্রতিদিন একটু একটু করে পুষ্ট হচ্ছে, এবার সেটার কথা বলার সময় হয়েছে। তার পক্ষে আর দেরি করা সম্ভব নয়।

পেটের এই ভ্রূণটার কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে মোটামুটি আন্দাজ করে নেয় কিরণ। হয়ত শেষ পর্যন্ত 'মিশ্র নিকেত' থেকে বাব করে দেবেন মুকুটনাথেরা। সেটাই চায় সে। যেভাবেই হোক এখান থেকে তাকে বেরুতেই হবে। প্রভাকর এ বাড়িতে থাকতে থাকতে পেটের বাচ্চাটাকে অস্ত্রের মতো কেন যে প্রয়োগ করল না, ভেবে এখন আপসোস হচ্ছে। তা হলে হয়ত প্রভাকরের সঙ্গেই তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে চিরকালের মতো বিদায় করতেন মুকুটনাথেরা। আসলে প্রভাকরকে এ বাড়িতে দেখে সে এতই হকচকিয়ে গিয়েছিল যে গুছিয়ে ভাবতেই পারছিল না তার কী করা উচিত। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার শক্তিটা কিছুক্ষণেব জন্য হারিয়ে গিয়েছিল।

রেবতী এবার তাড়া দিলেন, 'কিরে, দাঁড়িয়ে রইলি যে? স্নান করতে যা।'

কিরণ বলে, 'হাঁ, যাচ্ছি।'

মেয়েকে সহজভাবে কথা বলতে দেখে রেবতী ভাবলেন, প্রভাকরকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলটা ভালই হয়েছে। কিরণ নিশ্চয়ই মিশ্র বংশের ছক-কাটা পথেই ফিরে এসেছে। তাঁদের এই অনমনীয়তা এবং নিষ্ঠুরতার খুবই প্রয়োজন ছিল। এবার থেকে কিরণ নিশ্চয়ই এমন বেয়াড়া কিছু করবে না বা ভাববে না যাতে মিশ্রদের পারিবারিক সুনাম এবং মর্যাদা নষ্ট হয়।

ফিরে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে পা বাড়িয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন রেবতী। বললেন, 'যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এবার ওসব ভুলে যাও। সব সময় নিজের বংশের সম্মানের কথা মনে রাখবে।' একটু থেমে আবার বলেন, 'ছেলেদের দুর্নাম রটলে দু'দিন পরে সবাই ভুলে যায়, কিন্তু মেয়েদের বদনাম হলে তার দাগ চিরকাল থেকে যায়। কথাটা ভুলো না।'

উত্তর না দিয়ে স্থির চোখে মাকে লক্ষ করতে থাকে কিরণ।

মেয়ের মুখ বুজে থাকাটা ভালই লাগে রেবতীর। তাঁর ধারণা প্রভাকরকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে কিরণের সৃষ্টিছাড়া মতিগতি শুধরে যাবে। অন্তত এখন তাকে দেখে রেবতীর তা-ই মনে হচ্ছে। তিনি মোটামুটি খুশি হয়েই ঘরের বাইরে পা বাড়ালেন।

আর তখনই পেছন থেকে কিরণ ডাকল, 'মা—'

রেবতী ঘুরে দাঁড়ালেন, 'কী বলছিস?'

'বিকেলে দাদীর ঘরে তুমি, গুরুজি থাকবে। বাবুজিকেও থাকতে বলবে। আমি ওখানে যাব। তোমাদের সঙ্গে দরকারি কথা আছে।'

সন্দিগ্ধ চোখে কিরণকে দেখতে দেখতে রেবতী জিজ্ঞেস করেন, 'কী কথা?'

কিরণ বলল, 'তখনই বলব।'

রেবতী চলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল সুষ্‌মা। তার কুটিল মুখে হিংস্র হাসি ফুটে আছে। চোখ এবং ভুরু কুঁচকে সে বলে, 'চুহী কাঁহিকা! গলায় রশি দিতে পারিসনি?'

জঘন্য স্বভাবের এই হিংসুটে ইতর মেয়েটাকে পারতপক্ষে ঘাঁটায় না কিরণ। যতটা সম্ভব এড়িয়েই চলতে চায়। দু-একটা কথা কিরণ যা বলে তাতে থাকে খোশামুদি। কিরণ জানে, কারুর, বিশেষ করে তার ভাল আদৌ চায় না সুষ্‌মা। উলটে তার ক্ষতি হলে, তার বদনাম হলে, লোকের চোখে তার মর্যাদা নষ্ট হলে, সুষ্‌মার মতো খুশি কেউ হবে না।

অন্য সময় কী করত, কিরণ জানে না, কিন্তু এই মুহূর্তে মাথার ঠিক থাকে না তার। অসহ্য রাগে মাথার ভেতরটা দপ দপ করতে থাকে। নিজের অজান্তে সে চিৎকার করে ওঠে, 'গলায় রশি দেব কেন? তোর কথায়?'

কিরণের এরকম মারমুখী চেহারা আগে আর কখনও দেখেনি সুষ্‌মা। প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। পরক্ষণে সামলে নিয়ে বলে, 'শরম নেই তোর? বাড়িতে দিল্লিবালা এক জানবর এসে বলে কিনা তুই তার আওরত। আমাদের মুখে কালি দিয়ে এখন আবার আঁখ গরম করছিস! কুত্তী কাঁহিকা!'

ক্রোধে, উত্তেজনায় মাথা ফেটে যেন চৌচির হয়ে যাচ্ছে কিরণের। গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে সে বলে, 'কাকে জানবর বলছিস রে শয়তান মেয়ে! জানিস উনি একজন প্রফেসর, কত পণ্ডিত—'

মুখটা এবার বেঁকেচুরে বীভৎস দেখায় সুষ্‌মার। সে টেনে টেনে তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'ছোড় তেরি প্রফসর! নালিয়ার পোকার মতো যার স্বভাব সে আবার পণ্ডিত! থুঃ থুঃ থুঃ—' অসীম ঘৃণায় শব্দ করে তিনবার থুতু ফেলে সে।

শরীরের সব রক্ত টগবগ করে ফুটছে। মারাত্মক কিছু একটা ঘটিয়েই ফেলত কিরণ। তার আগেই কণ্ঠনালী থেকে আরো খানিকটা বিষ ঢালে সুষ্‌মা, 'মর তুই, মর, মর।' বলে আর দাঁড়ায় না, কোমরে ক্ষিপ্র একটা মোচড় দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

সুষ্‌মা যাবার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে কিরণ। মাথাটা জুড়িয়ে এলে কোনোরকমে স্নান খাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়ে। আজ সকাল থেকে যে সব সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে তাতে স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে আছে। তা ছাড়া আসল বিস্ফোরণটা ঘটবে বিকেলে। এই সব কারণে ঘুম আসে না, চোখ বুজে থাকলেও ভেতরটা জ্বালা জ্বালা করতে থাকে।

শুয়ে থাকতে থাকতে চোখের পাতা কখন ভারি হয়ে এসেছিল, কিরণের খেয়াল নেই। হঠাৎ সাগিয়ার ডাক ভেসে আসে, 'দিদিজি—দিদিজি—'

চমকে চোখ মেলতেই কিরণ দেখতে পায়, কফির কাপ হাতে নিয়ে তার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সাগিয়া। বলে, 'কি রে, আজ এত তাড়াতাড়ি কফি নিয়ে এলি!'

'তাড়াতাড়ি কোথায়?' সাগিয়া বলে, 'ওই দেখ সূরয ডুবে যাচ্ছে। একটু পরেই আন্ধেরা নেমে যাবে।'

দ্রুত জানালার বাইরে তাকায় কিরণ। অনেক দূরে আকাশ যেখানে ঝুঁকে পশ্চিম দিগন্তে নেমেছে, সূর্যটা সেখানে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই ওটাকে আর দেখা যাবে না। এই শেষ বেলায় রোদের

রং মরে গেছে। মাঠ ঘাস শস্যক্ষেত্র এবং দূরের গাছপালা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে কিরণ বলে, 'তুই একটু দাঁড়া, আমি মুখটা ধুয়ে আসি।'

ফিরে এসে সাগিয়ার হাত থেকে কফির কাপটা নিয়ে হালকা চুমুক দেয় কিরণ।

সাগিয়া বলে, 'তুরন্ত কফি খেয়ে নিচে যাও। দাদীজির ঘরে সবাই তোমার জন্যে বসে আছে।'

কিরণ অবাক চোখে তাকায়, 'কারা বসে আছে?'

'গুরুজি, মা'জি, বড়ে সরকার আর দাদীজি।' সাগিয়া বলতে থাকে, 'মা'জি তিনবার তোমাকে নিচে যাবার জন্যে খবর পাঠিয়েছে। তুমি ঘুমোচ্ছিলে বলে ডাকিনি।'

এবার সব মনে পড়ে যায় কিরণের। দুপুরে সে নিজেই এই পারিবারিক সভার আয়োজন করতে বলেছিল রেবতীকে। আজই পেটের ভ্রূণটার ব্যাপারে আজই চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে নিতে চায় সে। তার মুখ একটু শক্ত ওঠে। দ্রুত কফিটা শেষ করতে থাকে সে।

সাগিয়া জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি এখন নিচে যাবে?'

কিরণ অন্যমনস্কর মতো বলে, 'হাঁ।'

'আমি কি মা'জিকে বলে আসব?'

'দরকার নেই। আমি এখনই যাচ্ছি।'

কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সাগিয়ার হাতে খালি কাপটা দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে চলে আসে কিরণ। সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামতে নামতে টের পায়, তার স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত শরীরে এক ধরনের কাঠিন্য অনুভব করে সে। যে কথা কিরণ আজ মা বাবা ঠাকুমা এবং কুলগুরুর সামনে বলতে যাচ্ছে, মিশ্র বংশের কোনো মেয়ে কোনোদিন তা উচ্চারণ করার সাহস পায়নি। কিন্তু সে নিরুপায়। ঘা খেতে খেতে একেবারে খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে কিরণ, এবার তাকে রুখে দাঁড়াতেই হবে। অদম্য এক জেদ তার ওপর যেন ভর করতে থাকে।

মহেশ্বরীর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। যে গতিতে সিঁড়ি ভেঙে কিরণ নেমে এসেছে, দরজার মুখে হঠাৎ সেটা থমকে যায়। সে বুঝতে পারে হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন আচমকা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে এবং গালে গলায় কপালে দানা দানা ঘাম জমতে শুরু করেছে। কয়েক পলক মাত্র। তারপরেই প্রবল শক্তিতে যাবতীয় স্নায়বিক দুর্বলতা এবং ভয় কাটিয়ে সে একরোখা ভঙ্গিতে ভেতরে চলে আসে। সেই প্রবল জেদটা আবার তার মধ্যে ফিরে এসেছে।

ঘরের ভেতর নিজের বিশাল খাটে যথারীতি শুয়ে আছেন মহেশ্বরী। তাঁর পায়ের দিকে ছত্রিতে হেলান দিয়ে রেবতীকে বসে থাকতে দেখা গেল। একটু দূরে দুটো গদি-মোড়া বিশাল সোফায় বসে আছেন বশিষ্ঠনারায়ণ এবং মুকুটনাথ।

কিরণ লক্ষ করল, সবার মধ্যেই একটা ঢিলেঢালা স্বস্তির ভাব। কারুর চোখেমুখে কোনোরকম উত্তেজনা দুশ্চিন্তা বা টেনশন নেই। প্রভাকরকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর এখন তাঁরা আরামই বোধ করছেন।

কিরণকে দেখে সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠেন, 'আয়, আয়—'

কিরণ সোজা মহেশ্বরীর কাছে গিয়ে বসে।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'আমাদের এখানে আসতে বলেছ কেন? কিছু দরকার আছে?'

কিরণ আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়, 'হাঁ।'

'কী?'

'বলছি। তার আগে আমার কয়েকটা কথা জানতে হবে।'

'কী কথা?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না কিরণ। কিছুক্ষণ ভাবার পর বলে, 'নৌকরেরা কি প্রভাকরকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছে?'

প্রভাকরের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া পলকে বদলে যায়। সবার চোখেমুখে অস্বস্তি

এবং বিরক্তি ফুটে ওঠে। মেরুদণ্ড খাড়া করে মুকুটনাথ বলেন, 'হাঁ। আর কোনোদিন এখানে আসার চেষ্টা করলে ভুচ্চরের ছৌয়াটাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলব। এত বড় সাহস ওর—'

হাত তুলে মুকুটনাথকে থামাতে থামাতে বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'শান্ত হো যাও, শান্ত হো যাও। ছোকরাকে যখন ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়েছে তখন আর রাগারাগি কেন?'

মহেশ্বরীও বিছানায় কাত হয়ে সরু দুর্বল গলায় বলেন, 'ও সব কথা এখন থাক। যা হয়ে গেছে তা টেনে আনার জরুরত নেই। যত ওসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবি ততই ঝঞ্ঝাট বাড়বে।'

মুকুটনাথ আর কিছু বলেন না, থমথমে মুখ করে বসে থাকেন।

বশিষ্ঠনারায়ণ সস্নেহে এবার কিরণের দিকে তাকান। বলেন, 'বেটা, তোমার জরুরি কথাটা এবার বল।'

কিরণ বলে, 'আমি জানতে চাইছি, লেখাপড়া বন্ধ করে আমাকে জোর জবরদস্তি বাড়িতে আটকে রাখা হচ্ছে। এখন আমার ভবিষ্যৎ কী? কী ইচ্ছে আপনাদের? এই কয়েদখানাতেই আমাকে পচিয়ে মারতে চান?'

বশিষ্ঠনারায়ণ সস্নেহে হেসে হেসে শান্ত মুখে বলেন, 'এ কী কথা বেটা! তোমার ওপর জোর জবরদস্তির প্রশ্নই ওঠে না। ভবিষ্যতের কথা বলছ? সেটা তো কবেই ঠিক হয়ে আছে।'

'আপনি ত্রিকূটনারায়ণজির ছেলের সঙ্গে আমার শাদির কথা বলছেন নিশ্চয়ই?'

'হাঁ বেটা। শুভদিনও মোটামুটি স্থির হয়ে গেছে।'

'কিন্তু —'

'কী?'

'এত লেখাপড়া শেখার পর ওইরকম একটা অপদার্থ গাধাকে আমায় বিয়ে করতে হবে?'

কিরণের কথা শেষ হতে না হতেই রেবতী চিৎকার করে ওঠেন, 'চুপ রহো বেশরম লেড়কী—' এতটা গলা চড়িয়ে তাঁকে কেউ কোনোদিন কথা বলতে শোনেনি।

মহেশ্বরী কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে কিরণের মাথায় রাখতে রাখতে বলেন, 'বেটা, এমন কথা বলতে নেই। হাজার হোক, সে তোমার স্বামী—'

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো কিরণ বলে, 'কে আমার স্বামী! আমি ওই ইডিয়টটাকে বিয়ে করলে তো—'

মুকুটনাথের মাথার ভেতর বারুদের একটা স্তূপে যেন আগুন ধরে গিয়েছিল। প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেন, 'ইডিয়ট হোক আর গাধাই হোক, হরীশকে তোমার বিয়ে করতেই হবে। এ বিয়ে সেই ছেলেবেলা থেকে ঠিক করা আছে।'

বশিষ্ঠনারায়ণ স্বর্গীয় হাসি হেসে বলেন, 'শুধু ছেলেবেলা থেকেই না, এ তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন।' এরপর একনাগাড়ে তিনি যা বলে যান তা এইরকম। হরীশ এবং কিরণের সম্পর্ক আবহমান কালের, তা এমনই দৃঢ় আর অটুট যে কোনোদিনই ছিন্ন হওয়ার নয়। প্রজাপতি ব্রহ্মার ইচ্ছায় এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, মানুষের এতে হাত নেই। এ বিয়ে অনিবার্য, কারুর পক্ষেই তা আটকানো সম্ভব নয়।

গুরুজাতীয় এই জীবটিকে টেনে একটা চড় কষাতে ইচ্ছা করছিল কিরণের। বক বক করে কতকগুলো অসার কথা গলার ভেতর থেকে সে উগরে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই করল না কিরণ, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আপনাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, এ বিয়ে হবে না।'

বিমূঢ়ের মতো বশিষ্ঠনারায়ণ উচ্চারণ করেন, 'হবে না!'

'না।'

'তা হলে?'

'আপনারা প্রভাকরকে ফিরিয়ে আনুন, নইলে আমাকে দিল্লি যেতে দিন। ওকে ছাড়া আর কাউকে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।'

মহেশ্বরী কাঁপা গলায় বলেন, 'কী বলছিস মুন্নুয়া! ত্রিকূটনারায়ণদের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়ে

গেছে। এখন বিয়ে ভাঙতে গেলে আমাদের সম্মান থাকবে? এ বংশে এমন ঘটনা আব কখনও ঘটেনি।'

'আমাব উপায় নেই দাদী। হরীশদেব জানিয়ে দাও এ বিয়ে হবে না।'

মহেশ্বরী শুধোন, 'বিয়ে ভাঙার জন্যে এত জেদ ধরেছিস কেন?'

ঘোরেব ভেতব থেকে কিরণ বলে ওঠে, 'আমি—আমি মা হতে চলেছি দাদী।'

কিরণের কথা শেষ হতে না-হতেই মহেশ্বরীর ঘরে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে আসে।

চোদ্দ

মিশ্র বংশের কোনো মেয়ে আগে আর কখনও এমন মারাত্মক কথা উচ্চারণ করে নি। মুকুটনাথ মহেশ্বরী রেবতী এবং বশিষ্ঠনারায়ণের শ্বাসক্রিয়া কিছুক্ষণের জন্য একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। নিজেদের কানে শোনার পরও কথাগুলো তাঁদেব কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হতে থাকে। আসলে 'মিশ্র নিকেত'-এর যা ট্রাডিশন তাতে এ জাতীয় কথা কোনো মেয়েব মুখ থেকে বেরুতে পাবে, এটা এখানে বসে চিন্তাও করা যায় না। যে বাড়ির অন্তঃপুরে এখনও মধ্যযুগের আবহাওয়া, যেখানে মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছুই থাকার কথা নয়, সেখানে এ রকম একটা ঘটনা সমস্ত পরিবারের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার মতো।

প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর যেমন ঘটে, অদ্ভুত এক স্তব্ধতা চারপাশ যেন গ্রাস করে ফেলেছে। বাইরে কোথাও বুঝি কোনো শব্দ নেই, হাওয়াও থেমে গেছে, পাখিদের ডাকও শোনা যাচ্ছে না। এ বাড়িতে যে ডজনখানেক নৌকর নৌকরনী আছে, তাদের চলাফেরা কথাবার্তা ব্যস্ততা, কোনো কিছুর আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ হিক্কার মতো একটা শব্দ করে ওঠেন মহেশ্বরী। তারপরেই তাঁর গলার ভেতর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে করুণ গোঙানি বেরিয়ে আসতে থাকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধতা ভেঙেচুরে উন্মাদের মতো চিৎকার করে ওঠেন মুকুটনাথ, 'কী বললি বেশবম মেয়ে! কী বললি!'

চমকে একবার মুকুটনাথের দিকে তাকিয়েই পরক্ষণে মুখ নামিয়ে নেয় কিরণ, কোনো উত্তর দেয় না।

গলার পর্দা আরো চড়িয়ে দেন মুকুটনাথ, 'চুপ করে আছিস কেন? বল, আরেক বার বল—'

নিচু, অথচ দৃঢ় গলায় কিরণ বলে, 'যা বলেছি তা তো শুনেছেনই।'

চাপা দুর্বল স্বরে একটানা গোঙানির মতো আওয়াজ করে চলেছেন মহেশ্বরী। তার মধ্যেই আচমকা দু হাতে কপালে চাপড়াতে চাপড়াতে গলার শির ছিঁড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো কাঁদতে থাকেন রেবতী। 'এ কী পাপ পেটে ধরেছিলাম! আমাকে মেরে ফেল তুই, মেরে ফেল।' একটানা তিনি যা বলে যান তা এইরকম। এখনও আকাশে চন্দ্রসূর্য ওঠে, এখনও পৃথিবী রসাতলে তলিয়ে যায়নি, তবু পবিত্র মিশ্র বংশের মুখে কালি লাগল কেন? এমন ভয়াবহ পাপের কথা এ বাড়িতে কে কবে শুনেছে! হে বিষ্ণুজি, হে শিউশঙ্কর, তোমরা আমাকে মৃত্যু দাও।

বশিষ্ঠনারায়ণ উঠে এসে রেবতীর পাশে দাঁড়ান। কোনো কারণেই তিনি বিচলিত বা উত্তেজিত হন না। রেবতীর মাথায় একটা হাত রেখে প্রশান্ত ভঙ্গিতে বলেন, 'শান্ত হো যাও কিরণকি মা, শান্ত হো যাও। বিপদের সময় এত ভেঙে পড়লে চলে!'

রেবতী কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিলেন না। এতক্ষণ কপাল চাপড়াচ্ছিলেন, এবাব মহেশ্বরীর খাটের বাজুতে উন্মত্তের মতো মাথা ঠুকতে লাগলেন। কিরণ যে এভাবে মিশ্র বংশকে নরকে ডুবিয়ে দেবে, এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

এদিকে প্রচণ্ড ক্রোধ এবং উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাঁপছিল মুকুটনাথের। চোয়াল পাথরের মতো

শক্ত, চোখ টকটকে লাল। মনে হয়, প্রবল রক্তচাপে এখনই একটা স্ট্রোক হয়ে যাবে।

মুকুটনাথ গলার স্বর শেষ পর্দায় তুলে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মহেশ্বরীর জীর্ণ শরীর হঠাৎ ধনুকের মতো বেঁকে দুমড়ে যায়, একটা হাত কাত হয়ে ঝুলে পড়ে। পরক্ষণেই গলার ভেতর একটানা শ্লেষ্মাজড়ানো ঘড়ঘড়ে আওয়াজ হতে থাকে। সেই সঙ্গে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে। বোঝা যায়, মারাত্মক কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

বশিষ্ঠনারায়ণ মহেশ্বরীকে লক্ষ করেছিলেন। তিনি ত্রস্ত ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'মুকুটনাথ, এক্ষুনি বৈদকে খবর দাও। মহেশ্বরীর খুব কষ্ট হচ্ছে।'

ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে পালটে যায়। মাথা কুটতে কুটতে চমকে মুখ তোলেন রেবতী। মুকুটনাথ শশব্যস্তে একটা নৌকরকে তখনই কবিরজের বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

কিরণকে ঘিরে পারিবারিক সমস্যাটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, আকস্মিকভাবে সেটা অন্য দিকে ঘুরে যায়। মহেশ্বরী যে হঠাৎ এভাবে এতটা অসুস্থ হয়ে পড়বেন, খানিক আগেও ভাবা যায়নি। অবিবাহিত কিরণের গর্ভবতী হওয়ার খবরটা তাঁর প্রাচীন দেহে এবং মনে এমনই ধাক্কা দিয়েছে যে তা সামলে ওঠা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে।

দ্রুত হাত বাড়িয়ে মহেশ্বরীর দুমড়ানো শরীর যখন কিরণ সোজা করে শুইয়ে দিতে যাবে, সেই সময় রেবতী হিংস্র গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ছুঁবি না, ছুঁবি না। তোর ছোঁয়া লাগলে ওঁর পুণ নষ্ট হয়ে যাবে। ভ্রষ্টা. পাপী কাঁহিকা।'

মা'র ভয়ঙ্কর চোহারা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে যায় কিরণ। মহেশ্বরীর গায়ে হাত দিতে সাহস হয় না তার। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে চুপচাপ মাথা নিচু করে বসে থাকে সে।

মুকুটনাথ মহেশ্বরীকে সযত্নে সোজা করে শুইয়ে দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। মহেশ্বরীর শাঁসহীন রুগ্‌ণ শরীর বেঁকেই থাকে। গলার ভেতব থেকে এতক্ষণ ঘড়ঘড়ে আওয়াজ হচ্ছিল, এবার সাঁই সাঁই শব্দ হতে থাকে।

স্থিতধী এবং বহুদর্শী বশিষ্ঠনারায়ণ মহেশ্বরীকে লক্ষ করতে করতে অনিবার্য কিছুর আভাস পেয়ে যান। অনুচ্চ চাপা গলায় তিনি সমানে আওড়াতে থাকেন, 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।'

রেবতী মাথা ঠোকা থামিয়ে মহেশ্বরীর পরিচর্যা শুরু করেন। কখনও হাতের চেটো ঘষে ঘষে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া পায়ের তলায় উত্তাপ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেন, কখনও ব্যাকুলভাবে বুকে এবং কপালে হাত বুলোতে থাকেন। মুকুটনাথ বিভ্রান্তের মতো একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। কী করলে মহেশ্বরীর কষ্ট কমবে, তিনি একটু আরাম পাবেন, কিছুই ভেবে উঠতে পারছেন না।

জরুরি তলব পেয়ে কবিরাজ কিছুক্ষণের মধ্যে 'মিশ্র নিকেত'-এ দৌড়ে আসে। কিন্তু সে যখন পৌঁছয় মহেশ্বরীর শরীর আরো দুমড়ে গেছে, গলার ভেতরকার সেই সাঁই সাঁই শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না।

মহেশ্বরী যে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এ খবর সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোথাও এখন এতটুকু আওয়াজ নেই। চারদিক স্তব্ধ। ডজনখানেক নৌকর নৌকরনী পা টিপে টিপে এধারে ওধারে কাজ করে যাচ্ছে, চাপা গলায় ফিস ফিস করে কথা বলছে।

কবিরাজকে সোজা মহেশ্বরীর কামরায় নিয়ে আসা হয়। মহেশ্বরীর কঙ্কালসার হাতটা তুলে নাড়িতে আঙুল ঠেকিয়েই চমকে ওঠে সে, চোখেমুখে হতাশা এবং বিষাদ ফুটে ওঠে। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে হাতটা বিছানায় নামিয়ে রেখে মাথা নিচু করে কবিরাজ। ঘরের কারুর দিকেই সে তাকাতে পারছে না।

শ্বাসরুদ্ধের মতো কবিরাজের দিকে তাকিয়ে ছিলেন মুকুটনাথ। শুধু মুকুটনাথই না, রেবতী বশিষ্ঠনারায়ণ এবং কিরণও। মুকুটনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলেন?'

কবিরাজ উত্তর দেয় না, আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে থাকে।

মুকুটনাথের গলার ভেতর থেকে আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে, 'মা নেই?'

'নেহী।' কবিরাজ বিমর্ষ সুরে বলে যায়, 'আজ সকালেও দেখে গেছি, ভালই ছিলেন মা'জি। আরো কয়েক বছর ওঁর বেঁচে থাকার কথা। হঠাৎ এমন কী হল যে দেহান্ত ঘটে গেল!'

কবিরাজের শেষ কথাগুলো কারুর কানে ঢুকছিল না। দু হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন মুকুটনাথ। মহেশ্বরীর পলকা শরীর জড়িয়ে রেবতী প্রায় মূর্ছিতের মতো পড়ে রইলেন। বশিষ্ঠনারায়ণের কণ্ঠস্বর এবার স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল, 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।'

মহেশ্বরীর দেহান্তের খবর পেয়ে নৌকর নৌকরনীরা দৌড়ে এসে দরজার সামনে ভিড় জমাতে থাকে। তাদের ভেতর কান্নাকাটির প্রবল প্রতিযোগিতা চলছে যেন। কাজের লোকেদের এই তুমুল শোকের মধ্যে আন্তরিকতা হয়ত কিছু আছে, তবে লোকদেখানো ব্যাপারটাই বেশি। বিশেষ করে তারা মুকুটনাথের নজরে পড়তে চায়। কেঁদে কেটে বড়ে সরকারকে খুশি করতে পারলে তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকবে।

ভিড় ঠেলে, খোলা চুল উড়িয়ে আলুথালু ভঙ্গিতে এ ঘরে চলে আসে সুষমা। মেঝেতে গড়িয়ে গড়িয়ে, গলা ফাটিয়ে কাঁদতে থাকে। শোক আনন্দ বা রাগ—সব কিছুরই প্রকাশ তার মারাত্মক রকমের তীব্র।

মহেশ্বরীর খাটের একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কিরণ। তার চোখ থেকে অবিরল জল ঝরে যাচ্ছে। সুষমার মতো সে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে না। তার সুখ-দুঃখের প্রকাশ শান্ত মৃদু ও সংযত।

পনের

মহেশ্বরীর মৃত্যুর খবর 'মিশ্র নিকেত'-এর সীমানা ছাড়িয়ে কিভাবে যেন দ্রুত ধরমপুরার নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই নগণ্য শহরের প্রায় প্রতিটি বাসিন্দা কোনো না কোনো দায়ে মিশ্রদের কাছে আটকে আছে। মুকুটনাথ গোপনে তেজারতির কারবার করে থাকেন। চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে জমিজমা সোনাদানা বাঁধা রাখেন। তা ছাড়া ধরমপুরার আধাআধি মানুষ তাঁর জমিতে সারা বছর কাজ করে। কাজেই নিজেদের মা-বাবা মরলে চোখের জল না ফেললেও তাদের মহাভারত অশুদ্ধ হয় না, কিন্তু মহেশ্বরীর মৃত্যুতে 'মিশ্র নিকেত'-এ দৌড়ে এসে বুক চাপড়ে কাঁদাটা তাদের কাছে অত্যন্ত জরুরি। বলা যায়, এক পবিত্র কর্তব্য।

নিজেদের কাজকর্ম ফেলে লোকজন 'মিশ্র নিকেত'-এর দিকে ছুটে আসতে শুরু করেছে। গেটের সামনে ক্রমশ ভিড় জমে যাচ্ছে। দারোয়ানরা অবশ্য তাদের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। বাইরে দাঁড়িয়ে গলার স্বর যতটা সম্ভব চড়া পর্দায় তুলে তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সমানে কাঁদছে, 'মা'জিকা দেহান্ত হো গিয়া। পুরা ধরমপুরা বিলকুল আন্ধেরা হো চুকা।' এখানেও নৌকর নৌকরনীদের মতো একই প্রতিযোগিতা। মহেশ্বরীই শুধু না, মিশ্র বংশের যে কেউ মরুক না, তাদের কাছে ধরমপুরা পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে। আসল কথা যেভাবেই হোক মুকুটনাথদের খুশি করা।

এদিকে রেবতী অনেকক্ষণ মহেশ্বরীকে ধরে মূর্ছিতের মতো পড়ে ছিলেন। হঠাৎ একসময় মুখ তুলে কিরণের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ক্ষিপ্তের মতো বলে উঠলেন, 'এই পাপী শাঁখরেলটা মা'জিকে শেষ করে দিল। নরকেও ওর জায়গা হবে না।' রাগে উত্তেজনায় এবং আকস্মিক এই শোকে একেবারে পাগল হয়ে গেছেন তিনি।

যে রেবতী ধীর স্থির সংযত, কোনোদিন যাঁর কণ্ঠস্বর একটা বিশেষ পর্দার ওপর ওঠে না, 'মিশ্র নিকেত'-এ যাঁর অস্তিত্ব প্রায় টেরই পাওয়া যায় না, তাঁর এভাবে খেপে ওঠার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না কিরণের। সে উত্তর দেয় না। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের অজান্তেই একটা অপরাধবোধ তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে।

রেবতীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে মুকুটনাথও চিৎকার করতে লাগলেন, 'এই শয়তান ছোকরিকে আমি মাটিতে পুঁতে ফেলব। ও আমার মাকে শেষ করে দিল। আমার ঘরে যে এমন সাপ জন্মাবে, কে জানত!'

এই শোকের পরিবেশেও বশিষ্ঠনারায়ণ অবিচলিত রয়েছেন। তিনি ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, 'তোমরা কী করছ মুকুটনাথ! নৌকর নৌকরনীরা কাছাকাছি রয়েছে। বাইরের লোকজন আসতে শুরু

করেছে। ঘবের কেলেঙ্কারি বটিয়ে কী লাভ ! শান্ত হো যাও। এখন মাথা গরম করে নিজেদের ক্ষতি করো না।'

এর আগেও বেশ কয়েক বার কিরণের প্রসঙ্গে রেবতী এবং মুকুটনাথকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন বশিষ্ঠনারায়ণ। ঘরের কলঙ্ক বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ করে দিলে বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে না। মুকুটনাথেরা সেটা যে বোঝেন না তা নয়। কিন্তু কিরণের কারণে পারিবারিক মর্যাদা যে নষ্ট হয়েছে এবং মহেশ্বরীর শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে, এসব কিছুতেই ভুলতে পারছেন না তাঁরা। তাই মাঝে মাঝেই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেলছেন।

বশিষ্ঠনারায়ণের কথা শেষ হতে না হতেই রেবতী এবং মুকুটনাথ দ্রুত দরজার দিকে তাকান। সত্যিই সেখানে 'মিশ্র নিকেত'-এর তাবত কাজের লোক জড়ো হয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। তাদেব মাথার ওপর দিয়ে দূরে লোহার গেটটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানেও প্রচুর লোকজন। অগত্যা আর কিছু বলেন না মুকুটনাথেরা, শুধু ক্রুদ্ধ চোখে একবার কিরণের দিকে তাকান।

সব দিকে নজর রয়েছে বশিষ্ঠনারায়ণের। শোকার্ত হয়ে বসে থাকলে চলবে না। এখন অনেক কাজ। শাস্ত্রীয় রীতিতে মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা করতে হবে। মিশ্র বংশের সবচেয়ে বর্ষীয়সী মানুষটিকে তো ঐরু গৈরুর মতো যেমন তেমন ভাবে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যায় না, তার জন্য প্রচুর আয়োজন করতে হবে। ধরমপুরা টাউন ঘিরে বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যে যত গাঁ-গঞ্জ রয়েছে সে সব জায়গার সব মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে মুকুটনাথ মিশ্রের মা অন্তিম যাত্রায় চললেন। ঘটা বা সমারোহ মিশ্র বংশের মর্যাদা অনুযায়ী করতে হবে।

মহেশ্বরীর দেহান্তের সম্ভাবনাটা মাথায় রেখে কাশীতে এবং ধরমপুরার এই 'মিশ্র নিকেত'-এ মেহগনি কাঠের দু দু'খানা নতুন খাট বানিয়ে রাখা হয়েছিল। যেখানেই তিনি মারা যান, ওই খাটে চড়িয়েই শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। এ খবরটা বশিষ্ঠনারায়ণের জানা আছে।

কিন্তু একটা খাট দিয়েই তো মিশ্র বংশের সম্মানিত মানুষটির শেষ 'সংস্কার' হয় না। এর জন্য আরো অনেক কিছু দরকার।

বশিষ্ঠনারায়ণ মুকুটনাথের মাথায় গভীর স্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'কেঁদো না মুকুট, কেঁদো না। মা-বাবা কারুব চিরকাল থাকে না। তুমি জ্ঞানী মানুষ। জানোই তো, আমাদের এই পচনশীল দেহের বিনাশ ঠেকানো যায় না। একদিন তা শেষ হবেই। কিন্তু আত্মা অবিনাশী। দেহান্ত ঘটলেও মহেশ্বরী সবসময় আমাদের কাছেই থাকবে।'

পুরাকালের বশিষ্ঠ ঋষির মতোই একালের বশিষ্ঠনারায়ণ তাঁর শিষ্যকে শুনিয়ে নিরাসক্ত গম্ভীর স্বরে একটানা প্রাচীন সব সান্ত্বনাবাক্য আউড়ে যান। তিনি আরো যা বলেন তা এইরকম। প্রাকৃতিক নিয়মে একদিন না একদিন মহেশ্বরী মারা যেতেনই। কাশীতে কাম্য মৃত্যুটি তাঁর ঘটেনি ঠিকই, কিন্তু ধরমপুরায় শিউশঙ্করজির নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দ্বিতীয় বেনারস-ধাম তৈরি করেছেন মুকুটনাথ। এর মাহাত্ম্যও কম নয়। পুণ্যবতী মহেশ্বরীর শৈবলোক প্রাপ্তি কেউ ঠেকাতে পারবে না। ছেলে হিসেবে মায়ের জন্য এত বড় একটা কাজ করেছেন মুকুটনাথ। মহেশ্বরী কি কম ভাগ্যশালিনী! কাজেই অতি সাধারণ মানুষের মতো অধীর হওয়া মুকুটনাথের মানায় না, ইত্যাদি।

সান্ত্বনা দেবার পর বশিষ্ঠনারায়ণ রূঢ় বাস্তবে ফিরে আসেন, 'এখন ওঠ, নিজেকে শক্ত কর। খুবলাল আর তোমার সমধী ত্রিকূটনারায়ণকে খবর পাঠাও। তারা এসে অন্তিম সংস্কারের ব্যবস্থা করুক।'

মহেশ্বরীর খাট থেকে নামতে গিয়ে ফের মুকুটনাথের নজর চলে আসে কিরণের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, তার আগেই বশিষ্ঠনারায়ণ তাঁর কাঁধে একটা হাত রাখেন। চাপা গলায় বলেন, 'আর রাগারাগি করো না। কিরণের ব্যাপারটা আমি দেখছি।'

বশিষ্ঠনারায়ণ বুঝতে পারছিলেন, কিরণ এ ঘরে থাকলে রেবতী বা মুকুটনাথ কেউ নিজেদের শান্ত রাখতে পারবেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে এ শহরের মান্যগণ্য লোকেরা এবং ত্রিকূটনারায়ণ রোহিণী হরীশ ইত্যাদি অনেকেই এসে পড়বে। তাদের সামনে উত্তেজনার বশে মুকুটনাথ এমন কিছু করে বসতে

পারেন যা কোনোমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

বশিষ্ঠনারায়ণ দ্রুত কিরণের কাছে চলে আসেন। তার একটা হাত ধরে স্নিগ্ধ সুরে বলেন, 'এস আমার সঙ্গে—'

বিহ্বলের মতো বশিষ্ঠনারায়ণের দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয় কিরণ। নিচু গলায় ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাব?'

'তোমার কামরায়।'

নিজের ইচ্ছায় নয়, যন্ত্রচালিতের মতো বশিষ্ঠনারায়ণের সঙ্গে কিরণ দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বাড়ির কাজের লোকেরা শশব্যস্তে তাদের জন্য পথ করে দেয়।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'এত বড় বংশের মেয়ে হয়ে তুমি এমন ভুলটা করলে কী করে? মা বাপ বংশের সম্মান—এ সবের কথা একবারও তোমার মনে পড়ল না?'

মহেশ্বরীর সঙ্গে কিরণের সম্পর্কটা অত্যন্ত নিবিড়। সে ছিল তার দাদীর খুবই প্রিয়। সে তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। ইদানীং দু-তিন বছর গঙ্গাযাত্রার জন্য বেরিয়ে বেশির ভাগ সময় মহেশ্বরী বেনারসে থাকতেন। ছুটিছাটায় দিল্লি থেকে এলে প্রায়ই ঠাকুমার সঙ্গে দেখা হত না। কিন্তু তার আগে সামারে বা উইন্টারে বাড়ি এলে প্রায় সারাক্ষণই মহেশ্বরীর কাছে কাটাত কিরণ। সেই প্রিয় মানুষটি আজ মারা গেলেন। এই শোকের মুহূর্তে নিজের পেটের ভ্রূণ নিয়ে কোনো কথা বলতে কিরণের ইচ্ছা হয় না। যদিও মা-বাবা থেকে শুরু করে বশিষ্ঠনারায়ণ পর্যন্ত সবার বিশ্বাস সে ঘোর অন্যায় করেছে, কিন্তু পেটের বাচ্চাটি নিয়ে তার কোনোরকম গ্লানি বা অনুশোচনা নেই। সজ্ঞানে, শুদ্ধ মনে প্রভাকরের সঙ্গে নিজের দৈহিক সম্পর্ক সে মেনে নিয়েছে।

কিরণ বলে, 'এখন ওসব থাক গুরুজি। পরে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব। দাদী চলে গেলেন, বড় কষ্ট হচ্ছে।' সে জানে পরে হাজার বছর চেষ্টা করলেও প্রাচীন ধ্যানধারণা থেকে বশিষ্ঠনারায়ণকে টলানো যাবে না। তাঁদের সংস্কার বংশ পরম্পরায় রক্তের গভীর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, সেখান থেকে সেটা উপড়ে ফেলা অসম্ভব। ওঁরা বিশ্বাস করেন, কুমারী মেয়ের গর্ভে সন্তান আসাটা পাপ। কোনো যুক্তিতেই তা খণ্ডানো যাবে না।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'ঠিক আছে। পরেই তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

দোতলায় উঠে ওরা যখন কিরণের ঘরের সামনে চলে এসেছে তখন পেছনে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। ঘুরে দাঁড়াতেই কিরণরা দেখতে পায়, লম্বা লম্বা পায়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছেন মুকুটনাথ। দু'জনেই অবাক হয়ে যায়।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'তুমি!'

মুকুটনাথ বলেন, 'গুরুজি, আমাকে আসতে হল।'

কাছাকাছি এলে দেখা গেল, মুকুটনাথের হাতে একটা ঢাউস তালা এবং চাবির গোছা। বশিষ্ঠনারায়ণ বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করেন, 'ওগুলো দিয়ে কী হবে?'

কিরণকে দেখিয়ে নির্মম গলায় মুকুটনাথ বলেন, 'এই বজ্জাত মেয়েটাকে আটকে রাখতে হবে।'

বশিষ্ঠনারায়ণ এবং কিরণ মুকুটনাথের মনোভাব বুঝতে পারছিল। কিন্তু কেউ কিছু বলে না।

মুকুটনাথ এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেন, 'আমরা সবাই শ্মশানে চলে যাব। সেই ফাঁকে এ যে পালিয়ে যাবে না, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। গুরুজি, ও আমার বিশ্বাস বিলকুল নষ্ট করে দিয়েছে।' কর্কশ গলায় কিরণকে বলেন, 'যা, অন্দর যা—'

কিরণ তৎক্ষণাৎ ভেতরে ঢোকে না। ভীরু গলায় বলে, 'আমিও শ্মশানে যাব।'

'শ্মশানে হাজারো আদমী আসবে। তাদের ওই কালা মুখ আর দেখাতে হবে না। যা—' একরকম জোর করেই ঘরের ভেতর কিরণকে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেন মুকুটনাথ।

মুকুটনাথেরা চলে যাবার পর ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ নিজের বিছানায় শুয়ে ছিল কিরণ। একটা দুঃখ তার থেকেই গেল। মহেশ্বরীর আয়ু ফুরিয়ে এসেছিল। চার ছ'মাস, বড় জোর

বছরখানেক কি বছর দুয়েকের মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটতই, কিন্তু তার গর্ভবতী হওয়ার খবরটা প্রবল আঘাতে মহেশ্বরীর হৃৎপিণ্ড দ্রুত অকেজো করে দিল। নিজে মহেশ্বরীর মৃত্যুর কারণ হয়ে যাওয়ায় খুবই কষ্ট পাচ্ছে কিরণ।

নিচে বোধহয় বিপুল সমারোহে শ্মশানযাত্রার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। লোকজনের হই চই এবং শোকোচ্ছ্বাসের আওয়াজ ছাপিয়ে কীর্তনের শব্দ কানে আসছে। 'রাম নাম সত্ হ্যায়, রাম নাম সত্ হ্যায়।' ফাঁকে ফাঁকে ভরাট সুরেলা গলায় বশিষ্ঠনারায়ণের গীতাপাঠ শোনা যাচ্ছে।

একসময় নিজের অজান্তেই উঠে পড়ে কিরণ। পায়ে পায়ে পুব দিকের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। নিচের ফাঁকা জায়গাটা মানুষে বোঝাই। কখন যে দারোয়ানেরা ধরমপুরার বাসিন্দাদের জন্য গেট খুলে দিয়েছে, কে জানে।

শিউশঙ্করজির নতুন মন্দিরের চাতালে কীর্তনের দলটা বসে নিচু গলায় গেয়ে চলেছে। মন্দিরের উঁচু বারান্দায় গীতাপাঠ করছেন বশিষ্ঠনারায়ণ। এক ধারে মহেশ্বরীর শেষ যাত্রার জন্য নির্দিষ্ট মেহগনির খাটটা ফুলে ফুলে সাজানো হচ্ছে। এদের মধ্যে খুবলালকে ভীষণ ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে। মুকুটনাথ বা রেবতী মন্দিরে বা ফাঁকা জায়গায় কোথাও নেই। হয়ত ওঁরা মহেশ্বরীর নিষ্প্রাণ দেহটি ঘিরে বসে আছেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অগুনতি শোকার্ত মানুষ দেখতে দেখতে খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়ে কিরণ। সে ওদের কেউ না। ছোঁয়াচে রোগীর মতো তাকে সবার কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে।

হঠাৎ হর্নের আওয়াজে গেটের দিকে তাকায় কিরণ। অত্যন্ত চেনা, পুরনো মডেলের একটা মোটর গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকছে। সেটার ভেতর বসে আছেন ত্রিকূটনারায়ণ রোহিণী এবং হরীশ।

ষোল

শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী শ্মশানযাত্রার ব্যবস্থা করছিলেন বশিষ্ঠনারায়ণ। কোথাও সামান্য ত্রুটি না থেকে যায়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে তাঁর। কুলগুরুর সামনেই দেহান্ত ঘটেছে মহেশ্বরীর। মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা যাতে সরাসরি স্বর্গে যেতে পারে সেদিকটা তো বশিষ্ঠকেই দেখতে হবে।

পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন মুকুটনাথ। তাঁর চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে। চুরাশি বছর বয়সে দেহান্ত ঘটল মহেশ্বরীর। একে কেউ অকালমৃত্যু বলবে না। তবু বাষট্টি বছরের প্রবীণ সন্তান মুকুটনাথ যে বিরামহীন চোখের জল ফেলছেন, এটা মহেশ্বরীর পক্ষে সৌভাগ্যের বলতে হবে। মায়ের মৃত্যুতে এই বয়সেও সত্যিই মুকুটনাথ অভিভূত। এটা লোকদেখানো নকল শোকোচ্ছ্বাস নয়।

শ্মশানযাত্রার তদারক করতে করতে মাঝে মাঝে মুকুটনাথকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন বশিষ্ঠনারায়ণ। পরিপূর্ণ সুখের সংসার পেছনে ফেলে মহেশ্বরী এই যে স্বর্গযাত্রা করলেন, এটা কোনোভাবেই শোকাবহ ঘটনা নয়। মুকুটনাথ যেন দেহের নশ্বরতার কথা মনে রাখেন। শরীর একদিন না একদিন বিনষ্ট হবেই, কিন্তু পরমাত্মার বিনাশ নেই। মহেশ্বরীর আত্মা স্বর্গ থেকে চিরকাল তাঁর ধর্মনিষ্ঠ সন্তান মুকুটনাথের কল্যাণ করে যাবে।

বশিষ্ঠনারায়ণের সান্ত্বনার কথাগুলো আবছাভাবে মুকুটনাথের কানে ঢুকছিল। তিনি যেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, ত্রিকূটনারায়ণ রোহিণী এবং হরীশকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে আসছেন। ওঁদের দেখামাত্র মায়ের মৃত্যুশোক পলকের জন্য ভুলে গেলেন তিনি, মনে পড়ে গেল কিরণের গর্ভবতী হওয়ার কথা। এক ধরনের ভয় ঠাণ্ডা স্রোতের মতো তাঁর শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল। কিরণের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে এঁদের প্রতিক্রিয়া কী হবে, ভাবতেও সাহস হয় না মুকুটনাথের। টাকার জোরে খুনখারাপি পর্যন্ত চাপা দেওয়া যায় কিন্তু কিরণ যে মারাত্মক কাণ্ডটা ঘটিয়ে বসেছে তা ঢেকে রাখা অসম্ভব। পারার ঘায়ের মতো তা ফুটে বেরুবেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে লোকলজ্জা মান-সম্মানের ভয়। খবরটা জানামাত্র চারদিকে ঢি ঢি পড়ে যাবে। যে মিশ্র বংশ প্রবল দাপটে ধরমপুরায় কয়েক পুরুষ ধরে প্রায় রাজত্ব করছে তার মর্যাদা মুহূর্তে চুরমার হয়ে

যাবে। কোনোদিন তাঁরা আর এ শহরে মাথা তুলে হাঁটতে পারবেন না।

এলোমেলোভাবে মুকুটনাথ ভাবেন, হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়েটা ভেঙে দেবেন কিনা। পরক্ষণেই মনে হয়, সেটা আদৌ সম্ভব নয়। পনের বছর আগে যে বিয়ে স্থির হয়ে আছে, যার জন্য কিরণকে দিল্লি পাঠিয়ে একটু একটু করে তৈরি করা হয়েছে, এমন কি রোহিণী কিরণকে আশীর্বাদ পর্যন্ত করে গেছেন —আচমকা সেটা খারিজ করে দেবেন কোন অজুহাতে? তা ছাড়া ধরমপুরা কামতিগঞ্জ এবং এই দুই শহরের চারপাশের তাবত মানুষজন জেনে গেছে, কিরণ এবং হরীশের বিয়েটা হচ্ছেই। হঠাৎ তা ভেঙে দিতে চাইলে ত্রিকূটনারায়ণ রাজি হবেন কেন? চৌবেদের পারিবারিক গরিমাও এই বিয়ের সঙ্গে জড়িত।

মুকুটনাথ ভাবেন, এ অঞ্চলে ত্রিকূটনারায়ণদের প্রভাব প্রতিপত্তি বা টাকার জোর তাঁদের চেয়ে এতটুকু কম নয়। চৌবেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাও যথেষ্ট। তাঁদের যে বিপুল জমি বেনামা করা আছে, ত্রিকূটনারায়ণের তা অজানা নয়। ওঁরা ইচ্ছা করলে তাঁকে ঘোর বিপদে ফেলতে পারেন। ঘরের কাছে এমন প্রবল শত্রু তৈরি করার মানে হয় না।

তা হলে কিরণ যে ভয়ঙ্কর জটটা পাকিয়ে ফেলেছে তা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে কিভাবে? মস্তিষ্কে সব কিছু একেবারে তালগোল পাকিয়ে যায় মুকুটনাথের।

এতক্ষণে ত্রিকূটনারায়ণরা কাছে চলে এসেছেন। শোকের পরিবেশে যেমনটি মানায় তাঁদের চোখেমুখে অবিকল সেই ধরনের বিষাদ মাখানো। ত্রিকূটনারায়ণ দু হাতে মুকুটনাথের একটা হাত জড়িয়ে ধরেন। ভারি গলায় বলেন, 'মা'জি যে এভাবে চলে যাবেন, আমরা ভাবতেই পারিনি। খবরটা যখন পেলাম বিশ্বাস হচ্ছিল না।'

ভয়ে এবং আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা ভয়ানক কাঁপছে। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন মুকুটনাথ। তিনি কিছু বলতে চেষ্টা করেন কিন্তু গলায় স্বর ফোটে না।

ত্রিকূটনারায়ণের মনে হয়, মায়ের মৃত্যুতে মুকুটনাথ এমনই বিহ্বল যে কথা বলার শক্তিটাও হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি বলেন, 'এত ভেঙে পড়বেন না মুকুটজি, মা-বাপ কারুর চিরকাল থাকে না।'

মুকুটনাথ উত্তর দেন না।

ত্রিকূটনারায়ণ এবার বলেন, 'পরশু দিনও মা'জিকে দেখে গেছি। কত হাসি খুশি দেখাচ্ছিল। বললেন, কিরণ আর হরীশের শাদিতে খুব আনন্দ করবেন। আচানক কী এমন হল যে উনি চলে গেলেন!'

মুকুটনাথ কিছু বলার আগে পাশ থেকে বশিষ্ঠনারায়ণ বলে ওঠেন, 'সবই শিউশঙ্করজির মর্জি। কখন কার ডাক আসবে, আগে কি কেউ বলতে পারে? এই যে আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, কে জানে পাঁচ মিনিটের ভেতর আমার দেহান্ত হবে কিনা। জনম আর মৌত, দুটোই ওঁর হাতে।' বলে আঙুল দিয়ে আকাশ দেখিয়ে দেন।

এ বিষয়ে ত্রিকূটনারায়ণেরও সম্পূর্ণ সায় রয়েছে। তিনি বলেন, 'ও তো সহী বাত। ভগোয়ানের লীলা কে বুঝবে?'

এইসব উচ্চাঙ্গের কথাবার্তার মধ্যে রোহিণী বলেন, 'মাকে কোথায় রাখা হয়েছে?'

এতক্ষণে যেন গলার স্বর ফোটে মুকুটনাথের। তিনি জানান, মহেশ্বরীর নশ্বর দেহ এখনও তাঁর ঘরেই আছে। রেবতী মৃতদেহের কাছে বসে আছেন। এ খবরটা দিয়ে তিনি বলেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

ত্রিকূটনারায়ণদের সঙ্গে নিয়ে মহেশ্বরীর ঘরে চলে আসেন মুকুটনাথ।

মহেশ্বরীর নিষ্প্রাণ দেহ ঘিরে শুধু রেবতীই নন, আরো কয়েকজন পুরুষ এবং মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। এঁরা সবাই মিশ্রদের আত্মীয়স্বজন এবং ধরমপুরা শহরের বড় বড় বংশের লোকজন। মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ওঁরা ছুটে এসেছেন।

রেবতী সমানে কাঁদছেন, তাঁর পাশে বসে সুষমাও। আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ কাঁদছেন, অন্যরা বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে।

রোহিণী রেবতীর পাশে গিয়ে বসেন। তাঁকে দু হাতে জড়িয়ে ভারি কাঁপা গলায় সান্ত্বনা দিতে থাকেন।

হরীশ চুরাশি বছরের বুড়ি ভাবী দিদিশাশুড়ির মৃত্যুতে যে ভয়ানক দুঃখ পেয়েছে, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই, যদিও গোলাকার মাংসল মুখে সে একটা নকল শোক ফুটিয়ে রেখেছে। খাটে শায়িত মহেশ্বরীর শরীর, চারপাশের শোককাতর মানুষজন, তাদের কারুর দিকেই নজর নেই হরীশের। তার দুই চোখ অস্থিরভাবে প্রকাণ্ড ঘরটার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় একজনকেই শুধু খুঁজে চলেছে। সে কিরণ।

শুধু রোহিণীই না, ত্রিকূটনারায়ণও কোমল স্বরে রেবতীকে সহানুভূতি জানান। বলেন, এই দুঃখের সময় এত অভিভূত হয়ে পড়লে চলবে না। মাঁজি অর্থাৎ মহেশ্বরী নেই, এখন থেকে মিশ্র বংশের সব দায় রেবতীকে নিতে হবে। তিনি যদি এত কাতর হয়ে পড়েন, সংসার কে দেখবে? ইত্যাদি।

সান্ত্বনায় কিছু কাজ হয়। শোকোচ্ছ্বাস কমে এলে রেবতী ভাঙা ভাঙা জড়ানো গলায় বলেন, 'পাঁচ বছর বয়েসে নিজের মাকে হারিয়েছি। দশ বছর বয়েসে বিয়ের পর 'মিশ্র নিকেত'-এ এসেছিলাম। তখন থেকে শাশুড়িই ছিলেন আমার মা। তিনি আজ চলে গেলেন। মা'র মমতা এ জীবনে আর কখনও পাব না।'

বহুকালের প্রাচীন সেই বাক্যটি আরেক বার নতুন করে শুনিয়ে দেন রোহিণী, 'মা-বাপ কি চিরদিন সবার থাকে? একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে সকলকে চলে যেতে হয়।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন রেবতী, 'তা তো ঠিকই বহেনজি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে যায় রোহিণীর। দ্রুত চারপাশ একবার দেখে নিয়ে তিনি বলেন, 'কিরণকে তো দেখছি না।'

স্বাভাবিক কারণেই যে কিরণের প্রসঙ্গ এসে পড়বে, এটা আগে মনে পড়েনি রেবতীর। প্রথমটা চমকে ওঠেন তিনি, তারপর কোনো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাঁর মুখ মুকুটনাথের দিকে ঘুরে যায়। কী উত্তর দেবেন, বুঝতে না পেরে তিনি স্বামীর দিকে তাকান।

আবহাওয়াটা মুকুটনাথের কাছে ভীষণ অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। বিব্রত মুখে তিনি বলেন, 'ও ওপরে আছে।'

শোকাচ্ছন্ন এই বাড়িতে মহেশ্বরীর মৃতদেহ ঘিরে যেখানে তাঁর প্রিয়জনেরা বসে বা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে কিরণের না থাকাটা বিশেষ করে নজরে পড়ে। যে সম্ভাবনাটা সবার আগে মনে আসার কথা সেটা প্রশ্নের আকারে বেরিয়ে এল ত্রিকূটনারায়ণের মুখ থেকে, 'কিরণের শরীর কি ভাল নেই?'

শোকের আসরে কিরণের উপস্থিত না-থাকার একটা উপযুক্ত কারণ খুঁজছিলেন মুকুটনাথ। নিজের অজান্তেই সেটা হাতের কাছে যুগিয়ে দিয়েছেন ত্রিকূটনারায়ণ। মুকুটনাথ বলে ওঠেন, 'হাঁ। তার ওপর ঠাকুমার মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছে।'

গলার ভেতর সহানুভূতিসূচক একটু শব্দ করেন ত্রিকূটনারায়ণ। রোহিণীও আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। তবে হরীশের ইচ্ছা হচ্ছিল, এই মুহূর্তে দোতলায় কিরণের কাছে চলে যায়। কিন্তু সেটা বেজায় দৃষ্টিকটু হয়ে উঠবে বলে ইচ্ছাটাকে প্রাণপণে দমিয়ে রাখতে হয়।

এরপর কিরণের বিষয়ে কেউ আর কিছু বলেন না। মহেশ্বরীকে ঘিরে যাবতীয় আলোচনা চলতে থাকে। সাত বছর বয়সে কুলবধূ হয়ে 'মিশ্র নিকেত'-এ এসেছিলেন তিনি। তারপর সাতাত্তর বছর এখানেই কাটিয়ে দিলেন। তাঁর মতো পুণ্যবতী ধার্মিক মহিলা এই ঘোর কলিযুগে ক্বচিৎ চোখে পড়ে। তিনি শ্বশুরকুলকে তো বটেই, এই ধরমপুরা টাউনকেও পবিত্র করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এই শহর এক কথায় মাতৃহারা হল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাদে নতুন দামি খাটে মহেশ্বরীকে শুইয়ে সোজা শিউশঙ্করজির মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। রেবতী নিজের হাতে শাশুড়িকে নতুন তসরের থান পরিয়ে দেন। ফুলে এবং মালায় তাঁর সমস্ত শরীর ঢাকা। মুখখানাই যা শুধু বেরিয়ে আছে।

পবিত্র শাকদ্বীপী মিশ্র বংশের মৃতদেহ বা তার খাট ছোঁয়ার অধিকার কোনো অব্রাহ্মণের নেই। স্থির হয়েছে মহেশ্বরীকে শ্মশানে বয়ে নিয়ে যাবেন স্বয়ং মুকুটনাথ, ত্রিকূটনারায়ণ এবং ধরমপুরা টাউনের দুবে চৌবে এবং পাণ্ডে পদবিধারী কয়েকজন শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ আগে আগে মন্ত্রপাঠ করতে করতে যাবেন। সবার সামনে থাকবে পেশাদার কীর্তনের দল। 'রাম নাম সত হ্যায়'—গাইতে গাইতে তারা মহেশ্বরীর স্বর্গযাত্রার রাস্তাটি একেবারে নিষ্কণ্টক করে দেবে।

মহেশ্বরীর শববাহকদের পেছনে থাকবে বর্ণ অনুসারে ধরমপুরার বাসিন্দারা। প্রথমে ব্রাহ্মণ, তারপর কায়াথ, ক্ষত্রিয়, এবং সবার শেষে দোসাদ গঞ্জু ধাঙড় গাঙ্গোতা, ইত্যাদি।

শ্মশানঘাট 'মিশ্র নিকেত' থেকে মাইল আড়াই দূরে, একটা মজা নদীর পাড়ে। এতটা দূরে একটা মৃতদেহ কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া ভয়ানক কষ্টের ব্যাপার। খুবলাল একবার বলেছিল, ট্রাকে করে মহেশ্বরীকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হোক। কিন্তু এক কথায় এই পরিকল্পনা খারিজ করে দিয়েছেন মুকুটনাথ। 'মিশ্র নিকেত'-এর সবচেয়ে বর্ষীয়সী এবং সবচেয়ে পুণ্যবতী মহিলা, বিশেষ করে স্বয়ং মুকুটনাথের মাকে ট্রাকে চাপিয়ে হুস করে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। চিরকাল এ বাড়ির লোকজনকে ফুলে ফুলে সাজিয়ে, দামি পালঙ্কে শুইয়ে, গোটা শহরকে জানিয়ে তবেই না শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। কেউ ভাল করে বুঝবে না, জানবে না, তার আগেই মহেশ্বরী শ্মশানে পৌঁছে যাবেন, তা কি কখনও হতে পারে! মিশ্র বংশের সঙ্গে সমারোহ শব্দটা ব্যাপকভাবে জড়িয়ে আছে। তা সে জন্মই হোক, শিশুর প্রথম অন্ন গ্রহণই হোক, বিয়ে বা মৃত্যুই ঘটুক। মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে রাজকীয় মর্যাদায় মহেশ্বরীকে শ্মশানে না নিয়ে গেলে এই বংশের মর্যাদা পুরোপুরি রক্ষা করা যাবে না।

একসময় রেবতী সুষমা আত্মীয়স্বজন রোহিণী বাড়ির নৌকর নৌকরনী এবং ধরমপুরাবাসীদের অবিরাম বিলাপের মধ্যে শ্মশানযাত্রা শুরু হয়। প্রথম দিকে আত্মীয়দের সঙ্গে মায়ের খাটে কাঁধ দেন মুকুটনাথ। ত্রিকূটনারায়ণও খাটের অন্য প্রান্ত কাঁধে তুলে নেন।

'মিশ্র নিকেত' থেকে বেরুবার আগে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই সুশৃঙ্খল জনতা শবের পেছন পেছন চলতে থাকে। একেবারে সামনে টাঙ্গায় মাইক লাগিয়ে কীর্তনের দল এক নাগাড়ে গাইতে থাকে :

'রামনাম—'

'সত্ হ্যায়।

'রামনাম—'

'সত্ হ্যায়।'

ধরমপুরা শহরের মাঝখান দিয়ে শিরদাঁড়ার মতো সোজা একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে। সেই পথ ধরেই শবযাত্রা এগিয়ে যেতে থাকে। দু ধারের প্রতিটি বাড়িঘর থেকে লোকজন বেরিয়ে এসেছে। খবর পেয়ে কাতারে কাতারে মানুষ চারদিকের অলিগলি থেকে ছুটে আসতে থাকে। তাদের অনেকেই বুক চাপড়ে কাঁদছে। মহেশ্বরীর সঙ্গে এদের কোনো আত্মীয়তা নেই, নেই কোনোরকম রক্তের সম্পর্ক। এই শোক হল আবহমান কাল ধরে মিশ্র বংশের প্রতি ধরমপুরাবাসীদের আনুগত্যের প্রকাশ।

কিছুক্ষণ মহেশ্বরীর খাট বয়ে নিয়ে যাওয়ার পর শববাহকের ভূমিকা থেকে মুকুটনাথ এবং ত্রিকূটনারায়ণকে মুক্তি দেওয়া হয়। এবার মুকুটনাথের আত্মীয় এবং ধরমপুরার সৎ ব্রাহ্মণেরা মহেশ্বরীকে শ্মশানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নেয়।

খাটের পেছন পেছন নিঃশব্দে খানিকটা হাঁটার পর চোখের কোণ দিয়ে একবার ত্রিকূটনারায়ণের দিকে তাকান মুকুটনাথ। তাঁর জীবনে এত বড় একটা শোকাবহ ঘটনা যে ঘটে গেল, মহেশ্বরীকে এই যে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, চারপাশে এত যে মানুষজন, একটানা কীর্তনের সুর—কিছুই যেন মুকুটনাথের মাথায় সেভাবে এখন দাগ কাটছে না। ত্রিকূটনারায়ণদের দেখার পর থেকে যে দুশ্চিন্তা এবং ভয়টা শুরু হয়েছিল, সেটা তাকে পেয়ে বসে। গর্ভবতী কিরণকে নিয়ে তিনি কী করবেন? তার পেটের ভ্রূণটার কথা ত্রিকূটনারায়ণরা জেনে ফেললে তার কী নিদারুণ প্রতিক্রিয়া হবে, ভাবতেও সাহস

হয় না। অথচ ব্যাপারটা এতই মারাত্মক যে কোনোভাবেই তা গোপন রাখা সম্ভব নয়।

মুকুটনাথের ধাতটাই এমন যে মাথায় দুর্ভাবনা নিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না। মনে হয়, পাগল হয়ে যাবেন কিংবা প্রবল চাপে মস্তিষ্ক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। যেভাবে হোক কিরণের বিষয়ে একটা চূড়ান্ত হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। যা লুকিয়ে রাখা যাবে না, কাল হোক পরশু হোক ফুটে বেরুবেই, সে ব্যাপারে ত্রিকূটনারায়ণের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলে নেওয়াই ভাল। হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়ে না হলে সেটা ভবিতব্য বলেই মেনে নেবেন। মুকুটনাথ পরজন্মের মতো অদৃষ্টে ঘোর বিশ্বাসী। তাঁর কাছে ভাগ্য অপরিবর্তনীয়, কোনো মানুষের সাধ্য নেই তা বদলাতে পারে।

মুকুটনাথ মনস্থির করে ফেলেন। 'যা হবার হবে—'এমন এক ভঙ্গিতে তিনি হঠাৎ ডাকেন, 'ত্রিকটজি—'

অন্যমনস্কর মতো হাঁটছিলেন ত্রিকূটনারায়ণ। হয়ত ভাবছিলেন, এই মহাগুরু নিপাতের ফলে মিশ্রদের যে কালাশৌচ চলবে তাতে আগামী মাসখানেক হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না। দুই বংশই আচার-নিয়ম নিষ্ঠাভরে মেনে চলে। কাজেই বিয়েব জন্য আরেকটা দিন ঠিক করতে হবে।

মুকুটনাথের ডাকে চমকে ওঠেন ত্রিকূটনারায়ণ। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'কিছু বলবেন?'

'হাঁ।' বলে চুপ করে যান মুকুটনাথ।

উৎসুক মুখে তাকিয়ে থাকেন ত্রিকূটনারায়ণ।

মুকুটনাথ এবার বলেন, 'কিরণের সঙ্গে হরীশের শাদির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

'কী কথা?'

'মা'র কাজটা চুকে যাবার পর বলব।'

'ঠিক আছে।'

এরপর আর কোনো কথা হয় না। 'রাম নাম সত্ হ্যায়' করতে করতে শবযাত্রীরা এগিয়ে চলে।

এরপব বিপুল সমারোহে শ্রাদ্ধের কাজকর্ম চুকিয়ে ফেলেন মুকুটনাথ। মিশ্র বংশের মহিমা যাতে বিন্দুমাত্র খাটো না হয় সেদিকে সতর্ক নজর ছিল তাঁর। আড়ম্বর বা জাঁকজমকে বিন্দুমাত্র খুঁত থাকতে দেননি। মাতৃশ্রাদ্ধে পাঁচশ একজন সৎ ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে প্রত্যেককে স্বর্ণ, রজত, মূল্যবান বস্ত্র, নতুন বাসন, ঘৃত, মধু, এগার রকমের ফল, ছাতি, খাট, খড়ম ইত্যাদির সঙ্গে একটি করে সবৎসা গাভীও দান করেছেন। তা ছাড়া ধরমপুরার উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ থেকে জল-অচল অচ্ছুৎ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে কাছে দাঁড়িয়ে উৎকৃষ্ট ভোজন করিয়েছেন। এ শহরে ভিখারিরাও বঞ্চিত হয়নি। তাদেরও পরম সমাদরে ডেকে এনে আকণ্ঠ খাওয়ানো হয়েছে এবং মাথা পিছু পাঁচ টাকা করে দক্ষিণা দেওয়া হয়েছে।

দান ধ্যান এবং সমারোহে এমন বিরাট আকারের পারলৌকিক ক্রিয়া ধরমপুরাবাসীরা আগে আর কখনও চোখে দেখেনি। সবাই বলাবলি করেছে, মুকুটনাথ হচ্ছেন 'রাজা য্যায়সা আদমী'। রাজা না হলে এমন ব্যাপকভাবে মাতৃশ্রাদ্ধ কেউ করতে পারে!

সতের

শ্মশানঘাটে মহেশ্বরীর অন্তিম সংস্কার করে আসার পরের দিন থেকে রোজই ভোরবেলা ত্রিকূটনারায়ণ এবং রোহিণী 'মিশ্র নিকেত'-এ চলে এসেছেন, কোনো কোনো দিন এসেছে হরীশ। সারাদিন এবং সন্ধের পরও কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরে যেতেন।

মহেশ্বরীর পারলৌকিক কাজের সময়ও কিরণকে একবারও দেখা যায়নি। সে গুরুতর অসুস্থ, এই অজুহাতে তাকে তার ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। রোহিণী এবং ত্রিকূটনারায়ণ কিছুটা উতলা হয়ে

শয্যাশায়ী কিরণকে দেখতে চেয়েছেন। কিরণের জন্য হরীশ কী পরিমাণে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, সেটা তার মুখচোখের চেহারা দেখেই আন্দাজ করা গেছে। কিন্তু ভাবী পত্নীকে দেখার কথাটা লজ্জায় সে মুখ ফুটে বলতে পারেনি। মুকুটনাথ কাউকেই দেখা করতে দেননি। সবিনয়ে জানিয়েছেন, ডাক্তার কিরণকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন, সুস্থ হলেই কিরণ নিজে ত্রিকূটনারায়ণ সঙ্গে দেখা করবে।

ত্রিকূটনারায়ণের মন ঘোর সংশয়ে ভরে যাচ্ছিল। ক'দিন আগেও কিরণকে পুরোপুরি সুস্থ দেখেছেন। হঠাৎ কী এমন হল যে তার সঙ্গে দেখা করাও বারণ! গোটা ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় যেন একটা চাতুরি রয়েছে। মুকুটনাথরা কি হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়ে দিত চান না? তাঁরা কি এই সম্পর্ক ভেঙে দেবেন?

এই বিয়েটা চুকিয়ে ফেলেতে পারলে সব দিক থেকেই ত্রিকূটনারায়ণ লাভবান হবেন। যৌতুকের এক শ বিঘে জমি তো পাওয়া যাবেই। তা ছাড়া মুকুটনাথের 'সাপোর্ট' পেলে পরের চুনাও-তে নির্ঘাত ভাল মার্জিনে জিতে যাবেন। সবার ওপর রয়েছে বংশের মর্যাদা। পনের বছর ধরে এ অঞ্চলের তাবত মানুষ জানে হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়েটা হচ্ছেই। হঠাৎ সেটা ভেঙে গেলে কারুর কাছেই মুখ দেখানো যাবে না। সব দিক থেকে লাভজনক এই বিয়ে যেভাবে হোক ঘটাতেই হবে।

কাজেই শ্রাদ্ধশান্তির পরদিন আবার এলেন ত্রিকূটনারায়ণ। এ ক'দিন মুকুটনাথরা এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বিয়ের ব্যাপারে আলোচনার পরিবেশই ছিল না। কিন্তু আজ কিরণকে অসুস্থ করে রাখার রহস্য তাঁকে জানতেই হবে। ত্রিকূটনারায়ণের ধারণা, কিরণের কিছুই হয়নি, সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। তিনি ভেবেই পাচ্ছেন না, কিরণকে এভাবে সবার চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখার কারণ কী থাকতে পারে!

আজ একাই এসেছেন ত্রিকূটনারায়ণ। রোহিণী এবং হরীশ সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, তাদের আনেননি।

অনেকক্ষণ আগেই বিকেল হয়েছে। বেলা আর বেশি নেই। রোদের তাপ দ্রুত কমে যাচ্ছে। বহুদূরে পাতলা মলমলের মতো কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে।

নতুন শিউশঙ্করজির মন্দিরের চবুতরে মুকুটনাথ এবং কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ বসে ছিলেন। ত্রিকূটনারায়ণকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে মকুটনাথ বলেন, 'আসুন ত্রিকূটজি, আসুন—'

ত্রিকূটনারায়ণ কাছে এগিয়ে এসে বলেন, 'মুকুটনাথজি, আপনার সঙ্গে আলাদাভাবে একটু কথা বলতে চাই।' বশিষ্ঠনারায়ণের উদ্দেশে হাতজোড় করে বলেন, 'গুরুজি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। দশ মিনিটের ভেতর মুকুটজিকে ছেড়ে দেব।'

বশিষ্ঠনারায়ণ হেসে বলেন, 'ঠিক হ্যায়।'

মুকুটনাথ উঠে পড়েন। ত্রিকূটনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে একতলার বৈঠকখানার দিকে যেতে যেতে বলেন, 'কথাটা বোধহয় কিরণ আর হরীশের ব্যাপারে?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'হাঁ।'

মুকুটনাথ অবাক হন না। তিনি যেন এর জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন। বলেন, 'আমারও অনেক কথা আছে। আসুন।'

আঠার

ত্রিকূটনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে একতলার বসার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে মুকুটনাথ বলেন, 'বসুন ত্রিকূটজি।'

মুকুটনাথের আচরণে রীতিমত অবাকই হয়ে যান ত্রিকূটনারায়ণ। একটা সোফায় বসে তিনি চুপচাপ ভাবী বেয়াই-এর দিকে তাকান।

মুখোমুখি বসতে বসতে মুকুটনাথ বলেন, 'আপনার সঙ্গে আমার গোপন কিছু আলোচনা আছে। আমি চাই না, আমাদেব কথাবার্তা কেউ শুনে ফেলুক। তাই দরজা বন্ধ করলাম।'

ত্রিকূটনারায়ণ লক্ষ করেন, মুকুটনাথ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর অস্থিরতার কারণ আন্দাজ করতে না পেরে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের চাপা টেনশন অনুভব করতে থাকেন। বলেন, 'ঠিক আছে। কথাটা কী?'

সরাসরি উত্তর না দিয়ে মুকুটনাথ বলেন, 'ত্রিকূটজি, যদি অপরাধ না নেন, আমি একটা অনুরোধ করব?'

'অপরাধ নেওয়ার প্রশ্নই নেই। আপনি বলুন।'

বলতে গিয়েও থেমে যান মুকুটনাথ। দু'হাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ পর কাঁপা গলায় শুরু করেন, 'আপনি হরীশের সঙ্গে অন্য মেয়ের বিয়ে দিন। যদি বলেন তো সদ্বংশের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে আমি যোগাড় করে দেব।'

আচমকা এই ঘরে বাজ পড়লেও এতটা চমকে উঠতেন না ত্রিকূটনারায়ণ। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর বলেন, 'কী বলছেন মুকুটনাথজি! পনের বছর ধরে এ বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, পঞ্চাশ মাইলের ভেতর এ খবর কারুর জানতে বাকি নেই। এখন এই বিয়ে ভেঙে অন্য জায়গায় হরীশের বিয়ে দিতে গেলে লোকের কাছে কী কৈফিয়ত দেব? আমার এক গালে চুনা, আরেক গালে কালি লেপে দেবে সবাই। আমাকে এভাবে বেইজ্জৎ করবেন না মুকুটনাথজি—'

মুকুটনাথ উত্তর দিলেন না। মুখ ঢেকে ধ্বংসস্তূপের মতো বসে রইলেন।

ত্রিকূটনারায়ণ এবার বলেন, 'আরেকটা কথা ভেবে দেখেছেন?'

'কী?'

'হরীশ পুরুষমানুষ। এ বিয়ে যদি কোনো কারণে না হয় তার একটা গতি হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে কিরণের কী হাল হবে, সেটা বোধহয় চিন্তা করেননি।'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে ঝাপসা গলায় মুকুটনাথ বলেন, 'সব দিক খুব ভাল করে ভেবে দেখেছি। এক আধ দিন না, পুরা চোদ্দ দিন। তারপর আপনাকে এসব বলছি। দুশ্চিন্তায় চোদ্দটা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি ত্রিকূটনাথজি।'

বিয়ে স্থির হয়ে আছে। মহেশ্বরীর মৃত্যুর কারণে যে কালাশৌচ চলছে, সে জন্য যজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে যাবতীয় দোষ খণ্ডন করা হবে। তারপর শুভ কাজ চুকিয়ে ফেলা দরকার। আজ এরকম একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন ত্রিকূটনারায়ণ কিন্তু মুকুটনাথের দিক থেকে এমন ভয়াবহ অনুরোধ আসবে, এ তিনি ভাবতেই পারেননি। এই বিয়ের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক সম্মান তো বটেই, রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ জড়িত। তা ছাড়া পুরো এক শ একর উৎকৃষ্ট জমি যৌতুক হিসেবে যে পাওয়ার কথা, সেটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে। মাথার ভেতর হঠাৎ যেন বিপর্যয় ঘটে যায় ত্রিকূটনারাণের। কিন্তু তিনি রাজনীতি-করা মানুষ। কখন নিজেকে ধীর এবং সংযত রাখা প্রয়োজন তা তিনি ভাল করেই জানেন। খেপে উঠতে গিয়েও ধৈর্য হারান না। শাস্ত গলায় বলেন, 'এই বিয়ে ভেঙে দিতে চান কেন? কৃপা করে কারণটা বলবেন?'

দ্বিধান্বিতভাবে মাথা নাড়েন মুকুটনাথ। বলেন, 'হাঁ, বলব। কারণটা আপনাকে জানানো দরকার। নইলে আমাকে ভুল বুঝবেন।'

ত্রিকূটনারায়ণ উদগ্রীব তাকিয়ে থাকেন।

মুকুটনাথ বলেন, 'সে খুব লজ্জার কথা ত্রিকূটজি। যা ঘটেছে তা শোনাব আগে কেন আমার মৃত্যু হল না!' বলতে বলতে মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেন তিনি।

ত্রিকূটনারায়ণ দেখতে পান, গ্লানিতে দুঃখে অসীম যন্ত্রণায় একেবারে ভেঙেচুরে যাচ্ছেন মুকুটনাথ। কিছু না বলে তিনি তাকিয়ে থাকেন। বুঝতে পারেন, এঁকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই, নিজের থেকেই এবার সব খুলে বলবেন মুকুটনাথ। তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন।

মুকুটনাথ বলেন, 'লজ্জাটা আমার মেয়ে কিরণকে নিয়ে।'

বিয়ে ভেঙে দেওয়ার কারণ যে কিরণ হতে পারে, এটা মাথায় আসেনি ত্রিকূটনারায়ণের। তিনি হকচকিয়ে যান, 'কী করেছে কিরণ?'

'সর্বনাশ করেছে ত্রিকূটজি—' বলেই আবার দু'হাতে মুখ ঢাকেন মুকুটনাথ এবং ভাঙা আবছা গলায় কিরণের গর্ভবতী হওয়ার খবরটা দিয়ে বলেন, 'এই জন্যে আমার মা হার্টফেল করে মারা গেছেন। সব জেনেশুনে কলঙ্কিনী মেয়েকে আপনাদের পবিত্র বংশে পুত্রবধূ করে পাঠাতে চাই না। আমাদের বংশকে ও তো নরকে পাঠিয়েছেই, আপনাদেরও ক্ষতি হোক, এটা আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগের মতো প্রচণ্ড কিছু ত্রিকূটনারায়ণের সমস্ত অস্তিত্বে ভাঙচুর ঘটিয়ে দেয়। চিন্তা করার শক্তি একেবারে অসাড় হয়ে যায় তাঁর। স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন তিনি।

মুকুটনাথ বলেন, 'আশা করি সব শোনার পর আমাকে ক্ষমা করবেন। পৃথিবীতে দুশ্চরিত্র মেয়ের বাপ হওয়ার মতো মহাপাপ আর নেই।'

কিছুক্ষণের জন্য 'মিশ্র নিকেত'-এর এই ঘরটা সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দু'টি মানুষ শ্বাসরুদ্ধের মতো পরস্পরের মুখোমুখি বসে থাকে।

এক সময় গভীর শ্বাস টানার মতো শব্দ করে মুকুটনাথ ফের বলেন, 'আপনার কাছে একটা মিনতি আছে ত্রিকূটজি—' বলতে বলতে হাতজোড় করে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেন।

বিভ্রান্তের মতো মুকুটনাথের হাত দু'টি ধরে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'না না ওভাবে বলে আমাকে অপরাধী করবেন না। আমাকে কী করতে হবে বলুন—'

'আপনি আমার বন্ধু—'

'নিশ্চয়ই।'

'তা ছাড়া আমাদের দুই বংশের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক হতে যাচ্ছিল। কত আশা ছিল আমার। দুই বংশ এক হয়ে গেলে আমরা কী না করতে পারতাম! কিন্তু মেয়েটা একেবারে সত্যনাশ করে দিল।'

ত্রিকূটনারায়ণ পলকহীন মুকুটনাথের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি উত্তর দিলেন না।

মুকটনাথ থামেননি, 'আমার মতো আপনিও সন্তানের বাপ। আমার কষ্টটা নিশ্চয়ই বুঝবেন। কিরণ যা করেছে সেটা জানাজানি হলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। আপনার ওপর আমার ভরসা আছে: দয়া করে এই কলঙ্কের কথা গোপন রাখবেন। আমরা মৌত পর্যন্ত আপনার গোলাম হয়ে থাকব।'

ত্রিকূটনারায়ণ দূরদর্শী মানুষ। কোনো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বহু দূরের একটি ছবি তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সেই ছবিটির দিকে তাকিয়ে খুব আন্তরিক স্বরে তিনি বলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মুকুটনাথজি। কিরণ যেমন আপনার বেটি, তেমনি আমারও। আপনার ক্ষতি মানে আমারও ক্ষতি।'

আশ্বস্ত মুকুটনাথের চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে। গাঢ় গলায় তিনি বলেন, 'আমাকে বাঁচালেন।'

একটু চুপচাপ। তারপর ত্রিকূটনারায়ণ জিজ্ঞেস করেন, 'কিরণের এই খবরটা আর কে কে জানে?'

'আমার স্ত্রী, আমি, আমাদের গুরুজি আর আমার মা। মা তো চলেই গেলেন।'

'গুরুজি কারুর সঙ্গে এ নিয়ে চর্চা করবেন না তো?'

'না না, ওঁর মতো হিতাকাঙ্ক্ষী আমাদের খুব কমই আছে।'

'খুব ভাল। এ সব পাঁচ কান না হওয়াই মঙ্গল। তবু ওঁকে কথাটা গোপন রাখতে বলবেন। সাবধানের মার নেই।'

'গুরুজিকে হুঁশিয়ার করার দরকার হবে না। কিন্তু আপনি যখন বলছেন তখন জানিয়ে রাখব।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন।'

'আমাদের সঙ্গে যে রিস্তেদারি হতে যাচ্ছিল সেটা এক্ষুনি ভেঙে দেবেন না। এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই।'

অবাক বিস্ময়ে ত্রিকূটনারায়ণকে লক্ষ করতে থাকেন মুকুটনাথ। ভেতরে ভেতরে তাঁর তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। বলেন, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না ত্রিকূটজি।'

কী করেই বা বুঝবেন মুকুটনাথ? এই মুহূর্তে তিনি মানসিক দিক থেকে এমনই বিপর্যস্ত যে

ত্রিকূটনারায়ণের মস্তিষ্কে দুরন্ত গতিতে যে সব সূক্ষ্ম ক্রিয়া চলছে তা টের পাওয়ার মতো অবস্থাই তাঁর নেই।

এদিকে একশ একর উৎকৃষ্ট জমি, এম. এল. এ এবং মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন মিলিয়ে সুদূরপ্রসারী লোভনীয় অদৃশ্য যে চিত্রটি ত্রিকূটনারায়ণের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে সেদিকে তাকিয়ে থেকে স্নিগ্ধ গলায় তিনি বলেন, 'ছেলেমেয়েরা একটা ভুল করে বসলে তাদের তো ফেলে দেওয়া যায় না। ভুলটা শুধরে তাদের জীবনে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। এটা মা-বাপের কর্তব্য।' একটু থেমে নতুন উদ্যমে আবার শুরু করেন, 'জমানা বদলে গেছে মুকুটনাথজি। আমাদের কাল আর নেই। এখন মেয়েদের আর পর্দার আড়ালে রাখা যাচ্ছে না। বেঙ্গলে যান, মহারাষ্ট্রে যান, কেরালায় যান, গুজরাত, দিল্লি যেখানে যাবেন মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে কো-এড কলেজে পড়ছে, অফিসে পাশাপাশি বসে কামকাজ করছে। এত ফ্রি-মিক্সিং হলে থোড়া কুছ এদিক সেদিক তো হবেই। সেটা মাথায় রেখে এখন আমাদের চলতে হবে। রাগের মাথায় কিছু করা যেমন ঠিক হবে না, তেমনি ভেঙে পড়লেও চলবে না।'

যত শোনেন ততই বিস্ময় বাড়তে থাকে মুকুটনাথের। তাঁদের মিশ্র বংশের মতোই ত্রিকূটনারায়ণরাও মারাত্মক গোঁড়া, মান্ধাতার বাপের আমলের যাবতীয় সংস্কার তাঁদের রক্তের মধ্যেও বয়ে চলেছে অব্যাহত ধারায়। হঠাৎ এই মানুষটির মুখে এমন প্রবল প্রগতিশীলতার কথা মুকুটনাথকে প্রায় বিপর্যস্ত করে ফেলে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তা হলে আপনি এখন আমাকে কী করতে বলেন?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'এক, এক্ষুনি হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়ে ভেঙে দেবার কথা ভাববেন না। দুই, কিরণকে বেশি শাসন করার দরকার নেই। তবে তার ওপর নজর রাখবেন, যেন বাড়ি থেকে বেরুতে না পারে, আত্মহত্যা না করে বসে।'

আত্মহত্যার যে একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে, এটা আগে মাথায় আসেনি মুকুটনাথের। হঠাৎ তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। একে তো কুমারী মেয়ের গর্ভবতী হওয়াটা মারাত্মক দুর্ভাবনার কারণ। তার ওপর কিরণ যদি আত্মহত্যা করে বসে তার ফলাফল কী দাঁড়াবে, ভাবা যায় না। এ সব কেসে পুলিশ টানা-হ্যাঁচড়া করেই থাকে। তাদের মুখ বন্ধ করার কৌশল অবশ্য তাঁর জানা আছে। তবু অকারণ হুজ্জুতের মধ্যে গিয়ে কী লাভ ? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। নতুন ঝঞ্ঝাট যাতে না বাধে সেদিকে নজর রাখা দরকার। মুকুটনাথ বলেন, 'আপনি যা বললেন তাই হবে। কিরণকে আপাতত বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছি না। এখন থেকে সব সময় ওর কাছে একজন নৌকরনীকে রাখার ব্যবস্থা করব। এমন কি রাত্তিরেও সে কিরণের ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকবে। আর কিছু?'

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'নৌকরনীটা বিশ্বাসী নিশ্চয়ই?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে মুকুটনাথ বলেন, 'কিরণের একটা খাস নৌকরানী আছে। ওর জন্যে ছোকরি জান দিতে পারে। ভাবছি ওকে বদলে অন্য নৌকরনী দেব। ভাল হবে না?'

'হাঁ।'

'আর কী কবতে হবে?'

'এখন আর কিছু করতে হবে না। আমাকে একটু ভাবতে দিন, একটা না একটা উপায় বেরিয়ে যাবেই।'

মায়ের মৃত্যু এবং মেয়ের কেলেঙ্কারিতে মুকুটনাথ এতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন যে স্বাধীনভাবে কোনোরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। ত্রিকূটনারায়ণ যেভাবে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাতে তিনি অভিভূত। তাঁর ধারণা ছিল কিরণের গর্ভবতী হওয়ার কথা শুনেই তাঁর মুখে থুতু ছিটিয়ে অপরিসীম ঘৃণায় এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহারই পাওয়া গেল। ত্রিকূটনারায়ণের সহানুভূতি এবং উদারতায় তিনি মুগ্ধ। এই মানুষটির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

ত্রিকূটনারায়ণ আস্তে আস্তে উঠে পড়েন। বলেন, 'আজ চলি। কাল আর পরশু বাদ দিয়ে একেবারে

তরশু আবার আসছি। এর ভেতর যদি কোনো গোলমাল হয়, আমাকে খবর-দেবেন।'

'আচ্ছা—' আস্তে মাথা হেলিয়ে দেন মুকুটনাথ।

কথা বলতে বলতে ওঁরা বাইরে বেরিয়ে আসেন। নিজের পুরনো মডেলের ফোর্ড গাড়িটায় ওঠার আগে মুকুটনাথের কাঁধে একটা হাত রেখে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'দুশ্চিন্তা করে শরীর খারাপ করবেন না। আগেই যদি কিরণের ব্যাপারটা আমাকে জানাতেন, মা'জিকে এভাবে হারাতে হত না। সবই ভাগ্য। যাই হোক, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন থেকে আপনার ভাবনা আমার। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।'

গভীর আবেগে ত্রিকূটনারায়ণের দুই হাত জড়িয়ে ধরেন মুকুটনাথ। তাঁর চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

ত্রিকূটনারায়ণকে বিদায় দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে আসেন মুকুটনাথ। রেবতীকে এখন তাঁর খুব প্রয়োজন। এ ক'দিন কিরণের সমস্যাটা তাঁকে যেন একটা বায়ুশূন্য অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, কোনোদিন আর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না। ত্রিকূটনারায়ণের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলার পর আলো দেখতে পেয়েছেন মুকুটনাথ। ত্রিকূটনারায়ণ যখন ভরসা দিয়েছেন, সুরাহা কিছু একটা হয়ে যাবেই। এই বিষয়েই রেবতীর সঙ্গে জরুরি আলোচনা করতে হবে।

দোতলার টানা বারান্দার শেষ মাথায় অনেকগুলো পাখির খাঁচা ঝোলে। রোজ এই সময়টা রেবতী পাখিদের দানা খাওয়ান। শীতগ্রীষ্ম বার মাস, এই নিয়মের হেরফের হওয়ার উপায় নেই।

আজও যথারীতি রেবতীকে পাখির খাঁচাগুলোর সামনে দেখা গেল। কাছাকাছি এসে মুকুটনাথ বলেন, 'আমার সঙ্গে এস।'

মুকুটনাথ যে ত্রিকূটনারায়ণকে নিয়ে নিচের বসার ঘরে ঘণ্টাদেড়েক কাটিয়েছেন, রেবতী তা জানেন। দু'জনের ভেতর এতটা সময় কী নিয়ে কথা হয়েছে সেটাও তাঁর অজানা নয়। নিশ্চয়ই সে ব্যাপারে কিছু বলতে এসেছেন মুকুটনাথ।

উদ্বিগ্ন মুখে স্বামীর দিকে তাকান রেবতী। কিন্তু মুকুটনাথকে দেখে মনে হয় না তাঁর মধ্যে কোনোরকম ভয় দুর্ভাবনা বা টেনশন রয়েছে। এই ক'দিন তাঁকে কেউ ভেঙে গুঁড়িয়ে একেবারে চুরমার করে দিয়েছিল যেন। আজ তাঁকে বেশ সতেজ এবং ভারমুক্ত দেখায়। রেবতীর উৎকণ্ঠা অনেকটা কেটে যায়।

একটু পর মুকুটনাথের পেছন পেছন নিজেদের শোওয়ার ঘরে চলে আসেন রেবতী। বিশাল ঘরখানার একধারে পুরনো আমলের ক'টি সোফা আর ডিভান রয়েছে। দু'জনে সোফায় মুখোমুখি বসলেন।

রেবতী জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার সঙ্গে ত্রিকূটনারায়ণজির কী কথা হল?'

মুকুটনাথ তাঁদের আলোয়নার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে গেলেন, একটি শব্দও বাদ দিলেন না।

সব শুনে কৃতজ্ঞ রেবতী হাতজোড় করে কপালে ঠেকান। গভীর গলায় বলেন, 'সবই শিউশঙ্করজির কৃপা।' একটু থেমে বলেন, 'ত্রিকূটজির মতো মানুষ হয় না। শিউশঙ্করজি তাঁর কল্যাণ করবেন। তোমরা কী মনে হয়, সব জানার পর ত্রিকূটজি হরীশের সঙ্গে কিরণের বিয়েতে রাজি হবেন?'

মুকুটনাথ বলেন, 'আমার তো তা-ই মনে হয়। অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। আপত্তি থাকলে বিয়েটা নিশ্চয়ই ভেঙে দিতেন।'

'ওঁদের সঙ্গে রিস্তেদারিটা যদি শেষ পর্যন্ত হয়ে যায়, সেটা আমাদের সৌভাগ্য।'

'দেখা যাক।'

'এখন তা হলে আমাদের কী করতে হবে?'

ত্রিকূটনারায়ণ কিরণের ব্যাপারে যে কর্মসূচি ঠিক করে দিয়েছেন সেটা জানিয়ে দেন মুকুটনাথ।

একটু চিন্তা করে রেবতী বলেন, 'সরসতীয়াকে কিরণের ঘরে পাঠিয়ে দিই। সে ওর ওপর নজর রাখবে।'

সরসতীয়া মাঝবয়সী জবরদস্ত নৌকরনী। যেমন কর্মঠ তেমনি বিশ্বাসী। অনেক দিন 'মিশ্র নিকেত'-এ আছে। তিন কুলে কেউ নেই তার, মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই কাটিয়ে যাবে। মুকুটনাথ এবং রেবতী বললে সে চোখ বুজে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে। এ জন্য একবারও ভাববে না, একটা প্রশ্নও করবে না।

মুকুটনাথ বলেন, 'সেই ভাল। কিন্তু কিরণের নৌকরনী সাগিয়ার কী হবে?'

'ওকে গম পেষাইয়ের কাজে লাগিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে। সরসতীয়াকে ডাকো।'

রেবতী ঘর থেকে বেরিয়ে সরসতীয়াকে ডেকে আনেন। কিভাবে সারাক্ষণ কিরণের গতিবিধির ওপর নজরদারি করবে, সব বুঝিয়ে দেন দু'জনে। এমন কি রাত্তিরেও তাকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কিরণ যাতে না পালায়, বাইরের কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে বা চরম হতাশায় আত্মহত্যা না করে বসে—এ সব দিকে তাকে লক্ষ রাখতে হবে।

সরসতীয়া ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'সমঝ গিয়া।' বলে রেবতীর কাছ থেকে কিরণের ঘরের চাবি নিয়ে চলে যায়। এ ক'দিন তাকে বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে।

সরসতীয়ার হাতে কিরণের দায়িত্ব দেওয়ার পর অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে যান রেবতী। বলেন, 'এবার কী করব?'

'এখন আমাদের আর কিছু করার নেই। বুধবার ত্রিকূটজি আসবেন। ততদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

উনিশ

কথামতো বুধবারই বিকেলের দিকে চলে এলেন ত্রিকূটনারায়ণ। বলেন, 'প্রবলেমটার বিলকুল সমাধান বার করে ফেলেছি। আর চিন্তা নেই।'

গভীর আগ্রহে মুকুটনাথ বলেন, 'কী সমাধান?'

'সব বলব। তার আগে গুরুজি আর ভাবীজির সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'ঠিক আছে। এখনই ওদের ডাকছি।'

কিছুক্ষণ পর দোতলায় মুকুটনাথের শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে পরামর্শ সভা বসে। ত্রিকূটনারায়ণকে সামনে রেখে তাঁর মুখোমুখি বসেন রেবতী বশিষ্ঠনারায়ণ এবং মুকুটনাথ।

বশিষ্ঠনারায়ণ মুকুটনাথের কুলগুরু হওয়ার সুবাদে তাঁর ভাবী বেয়াইকে তুমি করে বলেন। তিনি বললেন, 'কী বলবে বল। কিরণের ব্যাপারে আমরা তো কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি না।'

যড়যন্ত্রকারীর মতো চাপা গলায় এবার নিজের সমাধান-সূত্রটি জানিয়ে ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, 'এ ছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখছি না। আপনারা কী বলেন?'

অনেকক্ষণ শ্বাসরুদ্ধের মতো চুপচাপ বসে থাকে বাকি তিনজন। তারপর বশিষ্ঠনারায়ণ আস্তে আস্তে বলেন, 'আমার মনে হয়, এর চেয়ে ভাল সুরাহা আর হয় না। তোমাদের কী মত?' বলে রেবতী এবং মুকুটনাথের দিকে তাকান।

রেবতী মুখ নিচু করে বসে আছেন, তিনি উত্তর দেন না। বশিষ্ঠনারায়ণের মতো গোঁড়া প্রাচীন মানুষ যে এতটা সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠতে পারেন, এটা ভাবতে পারেননি মুকুটনাথ। দ্বিধান্বিতভাবে তিনি বলেন, 'কিন্তু গুরুজি, আমাদের বংশে এমন কাজ কেউ কখনও করেনি। মহাপাপ হবে না তো?'

বশিষ্ঠনারায়ণ প্রগতিবাদী সোশাল রিফর্মারদের মতো উদারভাবে জানান, জমানা বদলে গেছে।

পুরনো সংস্কার ধরে বসে থাকলে চলে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অদলবদল মেনে নিতে হয়। জগতে কোনো কিছুই অনড় বা অপরিবর্তনীয় নয়।

কুলগুরুর কাছ থেকে জোরাল সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও খুঁত খুঁত করতে থাকেন মুকুটনাথ। তিনি বলেন, 'মা বেঁচে থাকলে কিছুতেই এতে রাজি হতেন না।'

'আমি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাতাম। বংশের সুনাম সম্মান রক্ষা করতে হলে ত্রিকূট যা বলছে সেটাই একমাত্র পথ। চিন্তা করো না। পাপ যাতে না ঘটে, সে জন্যে যাগযজ্ঞ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। আমি তার ব্যবস্থা করব। ওটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

নিরুপায় মুকুটনাথকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হয়।

ক'টা দিন প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায়। এর মধ্যে সকাল বিকেল দু'বেলা রোজ 'মিশ্র নিকেত'-এ এসে মুকুটনাথদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন ত্রিকূটনারায়ণ। তাঁদের আলোচনার বিষয়টা এত গোপন রাখা হয়েছে যে কাকপক্ষি টের পায়নি। একদিন মুকুটনাথ তাঁকে নিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফিরেছেন অনেকটা রাত করে। মিশ্র বংশ ঘিরে যে মারাত্মক সমস্যা ঘনিয়ে এসেছে, এই গোপনতা এবং ছোটাছুটি যে সেই কারণে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আজ সন্ধের পর রেবতী সোজা কিরণের ঘরে চলে আসেন। ত্রিকূটনারায়ণের কথামতো ক'দিন ধরে তার সঙ্গে চমৎকার ব্যবহার করছেন রেবতীরা। মিশ্র বংশকে নরকে ডোবানোর জন্য যে গর্হিত কাজটি সে করেছে সে সম্পর্কে কেউ একটি কথাও বলেনি তাকে। অবশ্য সরসতীয়া শিকারি কুকুরের মতো সর্বক্ষণ তাকে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে।

রেবতী বলেন, 'আমার সঙ্গে তোকে এক জায়গায় যেতে হবে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে।'

জীবনে কখনও মা তাকে কোথাও নিয়ে গেছেন কিনা, কিরণ মনে করতে পারে না। প্রথমটা সে অবাক হয়ে যায়। তারপর বলে, 'কোথায় যাব আমরা?'

'গেলেই বুঝতে পারবি।'

যদিও মা-বাবা ইদানীং সদয় ব্যবহার করছেন, তবু সাগিয়াকে সরিয়ে সরসতীয়াকে তার দেখাশোনা করার জন্য পাঠানোয় কিরণ খুব সন্দিগ্ধ। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো চতুর পরিকল্পনা আছে, কিন্তু সেটা যে কী, ধরা যাচ্ছে না। সংশয়ের গলায় কিরণ জিজ্ঞেস করে, 'আর কে যাচ্ছে?'

রেবতী বলেন, 'আর কেউ না।'

এবার কোনো প্রশ্ন করে না কিরণ। দ্বিধার সঙ্গে খানিকটা কৌতূহলও সে বোধ করতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর পোশাক বদলে মায়ের সঙ্গে নিচে নেমে আসে কিরণ। সেখানে একটা ফিটন দাঁড়িয়ে আছে। ফিটনটা তাদের নয়, আগে কখনও দেখেনি।

খানিক দূরে শিউশঙ্করজির নতুন মন্দিরের চাতালে একা বসে আছেন বশিষ্ঠনারায়ণ। মুকুটনাথকে ধারে কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তবে ক'টা নৌকর নৌকরনী এধারে ওধারে ছোটাছুটি করে কাজকর্ম করছে।

রেবতী বলেন, 'উঠে পড়।'

কোচোয়ান ফিটনের মাথায় বসে ছিল, রেবতী এবং কিরণ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকায়। একটু পরে গাড়িটা গেট পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে যায়।

গোটা ব্যাপারটা কিরণের কাছে অদ্ভুত রহস্যময় মনে হয়। 'মিশ্র নিকেত'-এর মেয়েরা নৌকর নৌকরনী বা বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে ছাড়া এক পা-ও বেরোয় না। বিশেষ করে রেবতী একা একা বাইরে যাবার কথা ভাবতেও পারেন না। কী এমন ঘটল যাতে কিরণকে নিয়ে তাঁকে এভাবে বেরুতে হচ্ছে! হঠাৎ ভয়ে এবং উদ্বেগে কিরণের শ্বাস আটকে আসে। সে ভীত চোখে রেবতীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'মা, আমাদের সঙ্গে আর তো কেউ এল না!'

'কে আসবে?' রেবতী জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। মুখ না ফিরিয়েই কথাটা বললেন।

'বাবুজি খুবলালজি কি কোনো নৌকর।'
'ওদের কারুর আসার দরকার নেই।'
'কিন্তু চিরকাল রাস্তায় বেরুলে কেউ না কেউ সঙ্গে তো থাকেই।'
'চিরকাল থাকে বলে আজও থাকবে, এমন কোনো কথা নেই।'
কিরণ নিরুৎসুক সুরে বলে, 'কী ব্যাপার? আমরা এভাবে কোথায় যাচ্ছি? আর কেনই বা যাচ্ছি?'
'তখনই তো বললাম, গেলেই বুঝতে পারবি।'
কিরণ আবার কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেন রেবতী। বলেন, 'এ নিয়ে কোনো কথা নয়। চুপ করে বসে থাক।' তাঁর গলার সুর নীরস এবং রুক্ষ।
কিরণ রেবতীর দিকে তাকিয়েই ছিল। তিনি জানালার বাইরে থেকে এখনও মুখ ফেরাননি। কিরণ লক্ষ করল, মা'র মুখ পাথরের মতো শক্ত। যে রেবতী কোনো দিন কাউকে কড়া কথা বলেননি, বাড়িতে যাঁর অস্তিত্ব প্রায় বোঝাই যায় না, তাঁকে এই মুহূর্তে ভয়ানক নির্মম মনে হচ্ছে। কিরণ আর কিছু বলে না, নিঃশব্দে দুর্জ্ঞেয় ভবিতব্যের জন্য ফিটনের এক কোণে বসে থাকে।
'মিশ্র নিকেত' থেকে বেরিয়ে গাড়িটা নানা রাস্তা ঘুরে ঘুরে কোথায় চলেছে কে জানে। ধরমপুরা এমনিতে খুবই নগণ্য শহর। এখানকার জীবনযাত্রা ঢিমে তালে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। দিনের বেলাটা মোটামুটি সরগরম থাকে কিন্তু সন্ধের পর শহর একেবারে ঝিমিয়ে পড়ে। রাস্তায় লোকজন কমে যায়। ক্বচিৎ দু'চারটে গৈয়া গাড়ি কি টাঙ্গা বা সাইকেল রিক্‌শা এমন অলস ভঙ্গিতে চলতে থাকে, মনে হয়, জগতের কোনো ব্যাপারেই তাদের আদৌ তাড়া নেই।
শহরের জমজমাট পাড়াগুলো ছাড়িয়ে ফিটনটা কখন যে দক্ষিণ দিকের নির্জন এলাকায় চলে এসেছিল, কিরণের খেয়াল নেই। এখানে নতুন মহল্লা গড়ে উঠেছে। দু-চারটে আনকোরা বাড়ি এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চারপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা, ঝোপঝাড়, গাছপালা। একটা বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়ির দূরত্ব অনেকখানি। এই অঞ্চলের রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো নেই। রাত্তিরে জায়গাটা কেমন ভুতুড়ে হয়ে যায়। মনুষ্যজগতের সঙ্গে এই জায়গাটার যেন কোনো সম্পর্ক নেই।
এখানে তাকে কী কারণে নিয়ে আসা হয়েছে, কিরণ বুঝতে পারে না। তার ভয়টা হঠাৎ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। উদ্বেগের চাপে বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে বলে মনে হয়।
একটা বাড়ির সামনে এসে ফিটন দাঁড়িয়ে পড়ে। কোচোয়ান নিচে নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে বলে, 'আ গিয়া মা'জি। উতারিয়ে—'
গাড়ির ভেতর ছোট কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। তার টিমটিমে আলোয় হঠাৎ কিরণ দেখতে পায়, মা'র দুই চোখ থেকে জলের ধারা গালের ওপর বয়ে যাচ্ছে। সে চমকে ওঠে। কিছুক্ষণ আগে মা'র রূঢ় ব্যবহারের সঙ্গে এই নীরব অশ্রুপাত কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। অজানা আশঙ্কায় শ্বাস আটকে আসে কিরণের।
কোচোয়ানের গলা শুনে শশব্যস্তে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে ভারি গলায় রেবতী মেয়েকে বলেন, 'নেমে আয়।'
কিরণ একবার ভাবে, কিছুতেই নামবে না। 'এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসার অর্থ কী?' জিজ্ঞেস করতে গিয়েও সে থমকে যায়। কোনো অলৌকিক শক্তি এক হাতে তার কণ্ঠনালী টিপে রেখে একটি শব্দও বেরুতে দেয় না, আরেক হাতে প্রবল ধাক্কায় ফিটন থেকে তাকে নামিয়ে দেয়।
বাড়িটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে। মাঝখানে ঝকঝকে নতুন দোতলা, চারপাশে ফুল আর ফলের বাগান।
রাস্তায় আলো না থাকায় এখানে অন্ধকার অনেক বেশি গাঢ়। চারদিকে অগুনতি জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে। মাটির অতল থেকে উঠে আসছে ঝিঁঝিদের একটানা বিলাপ। দূর থেকে শিয়াল এবং কাছাকাছি কোনো গাছের কোটর থেকে প্যাঁচাদের কর্কশ ডাক ভেসে আসছে।
ফিটনটা এসে দাঁড়িয়েছিল পোর্টিকোর তলায়। সেখানে অবশ্য আলো জ্বলছে। কিন্তু ধরমপুরায়

বিজলির ভোল্টেজ এত কম যে, যত পাওয়ারের বাল্বই জ্বালানো হোক, আলোর তেজই হয় না।

পোর্টিকো থেকে আট দশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে তবে মূল বাড়িটা। মা'র সঙ্গে নিচে নামতেই হতবাক কিরণ দেখতে পায়, ওপরের শেষ সিঁড়িটার মাথায় উকিল খুবলাল এবং দুটো শক্ত চেহারার মাঝবয়সী অচেনা মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এই অন্ধকার রাতে তিনটে মানুষ এমন একটা বাড়িতে তাদের জন্যই যে অপেক্ষা করছিল, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ঢ্যাঙা কুঁজো চেহারার খুবলাল সিঁড়ি বেয়ে বেড়ালের মতো তর তর করে নেমে আসে। মেয়েমানুষ দুটোও নামতে থাকে, তবে খুবলালের মতো দ্রুত নয়, তাদের গতি অনেক কম।

খুবলাল ঘাড় ঝুঁকিয়ে রেবতী এবং কিরণকে বলে, 'আইয়ে ভাবীজি, আও আও বেটা—'

মেয়েমানুষ দুটো কাছে আসতে একজনকে চেনা চেনা মনে হয়। কিন্তু কোথায় তাকে দেখেছে, চট করে মনে করতে পারে না কিরণ।

মায়ের পাশাপাশি খুবলালদের সঙ্গে ওপরে উঠতে থাকে সে।

খুবলাল রেবতীকে বলে, 'রাস্তায় আসতে কোনো তখলিফ হয়নি তো ভাবীজি?'

রেবতী বলেন, 'না।'

'আগে কি পুরা কোঠিটা দেখে নেবেন?'

'আপনি যদি বলেন তাই দেখব।'

এবার খুবলাল কিরণের দিকে ফিরে বলে, 'বেটা কিরণ, এ কোঠিটা মুকুটনাথজি কিনবেন বলে ঠিক করেছেন। তাঁর ইচ্ছা, কেনার আগে নতুন কোঠিটা তোমাকে আর ভাবীজিকে দেখিয়ে দিই।তোমাদের পসন্দ হলে তবেই কেনা হবে।'

কিরণ শুনেছে, খুবলাল লোকটা নাকি একজন অত্যন্ত ঘাগী উকিল। তার মতো বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মেয়েকে এখানে টেনে আনার যে অজুহাতটি সে দিল তা এতই ছেঁদো এবং অবিশ্বাস্য, ভাবা যায় না। লোকটা তাকে ভেবেছে কী? দুগ্ধপোষ্য নাবালিকা? শুধু বাড়ি দেখানোই যদি উদ্দেশ্য হত, মা সোজাসুজি বলে দিতে পারতেন। চক্রান্তকারীর মতো কৌশলে তাকে টেনে আনার প্রয়োজন ছিল না।

কিরণ এক সময় খুবলালকে বেশ পছন্দই করত। কিন্তু মুকুটনাথের অসুস্থতার খবর দিয়ে দিল্লি থেকে নিয়ে আসার পর থেকেই তার ওপর বিরূপ হয়ে আছে। কিরণের ধারণা আজ যে এখানে তাকে আনা হয়েছে তার ভেতরেও গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে এবং এর পেছনে নিশ্চয়ই আছেন মুকুটনাথ। এবং তাঁর হাতের পুতুল এই মানুষগুলো—খুবলাল, রেবতী, এমন কি ওই মাঝবয়সী মেয়েমানুষ দুটোও। কিন্তু মুকুটনাথের অভিসন্ধিটা যে কী, তার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ অপার্থিব কিছু যেন ভর করে কিরণের ওপর। 'যা হবার হবে'—এমন একটা বেপরোয়া একরোখা চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। বুকের ভেতর থেকে উৎকণ্ঠা এবং ভয়টা বার করে দিতে দিতে মা'র সঙ্গে সিঁড়ির মাথায় উঠে আসে।

এ বাড়িটার একতলায় দোতলায় সব মিলিয়ে আঠারখানা ঘর। খুবলাল উকিল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত ঘর, বাথরুম, ঝুলবারান্দা, কিচেন ইত্যাদি দেখিয়ে রেবতী এবং কিরণকে শেষ পর্যন্ত দোতলার বসার ঘরে নিয়ে এল। বাড়ি দেখাবার সময় সেই মেয়েমানুষ দুটো অবশ্য সঙ্গে ছিল না।

কিরণ লক্ষ করেছিল, প্রতিটি ঘরই দামি আসবাবে সাজানো। বাথরুমে নক্‌শা-করা টাইলস এবং শাওয়ার। এত বড় বাড়িটা কিন্তু একেবারে ফাঁকা। খুবলাল আর সেই মেয়েমানুষ দু'টি ছাড়া অন্য কাউকে চোখে পড়েনি।

ড্রইংরুমে এসে বসতেই খুবলাল অসীম উৎসাহে রেবতীকে জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িটা চমৎকার, তাই না?'

'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে উত্তর দেন রেবতী।

এবার কিরণের দিকে তাকিয়ে খুবলাল জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কেমন লাগল?'

এ বাড়িটার মালিক যেন খুবলাল নিজেই। এটা দেখিয়ে সে যেন চাপা গর্বই বোধ করছে। কিরণ

বলে, 'ভাল বাড়ি।'

'তোমাদের যখন পসন্দ হয়েছে, মুকুটনাথজিকে কিনে ফেলতেই বলি।'

কিরণ উত্তর দিল না।

খুবলাল এবার জানায়, বাড়িটা জলের দরে পাওয়া যাচ্ছে। কে এক বিজনেসম্যান নাকি শখ করে এটা বানিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ ব্যবসায় ভরাডুবি হওয়ায় বেচে দিচ্ছে। এ সুযোগ হাতছাড়া করা একেবারেই উচিত হবে না, ইত্যাদি।

আসল ষড়যন্ত্রকারী অর্থাৎ মুকুটনাথকে না দেখে কিরণ আবছাভাবে ভাবে হয়ত বাড়িটা দেখাবার জন্যই তাকে এবং রেবতীকে এখানে আনা হয়েছে। পরক্ষণে রেবতীর আগের আচরণ, চোখের জলের ধারা এবং তাঁর কথাবার্তা মনে পড়তেই পুরনো সন্দেহটা ফিরে আসে।

একনাগাড়ে কথা বলতে বলতে দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে খুবলাল, 'আরে ভামরী, চায়-পানি তো দিয়ে যা।' হঠাৎ অতিথি আপ্যায়নের জন্য ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে।

ভামরী নামটা শুনে চমকে ওঠে কিরণ। এবার মনে পড়ে, এ বাড়িতে ঢুকে দুটো মেয়েমানুষের মধ্যে যাকে চেনা চেনা মনে হয়েছিল তাকে গোলগোলি মৌজায় দেখেছে সে। সেখানে ত্রিকূটনারায়ণদের সঙ্গে সেদিন তাকেও যৌতুকের জন্য জমি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন মুকুটনাথ। ভামরী ছুটতে ছুটতে তাদের কাছে চলে এসেছিল, তার ঘরে সবাইকে নিয়ে যাবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল।

একটা চাপা গুঞ্জন একসময় ধরমপুরায় শোনা যেত, ভামরী নাকি মুকুটনাথের রাখনী বা রক্ষিতা। যৌবনের চটক নষ্ট হওয়ার পর মুকুটনাথ তাকে আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। এ সব কথা আগেই কানে এসেছে কিরণের কিন্তু সে ভেবেই পাচ্ছে না, যে মেয়েমানুষটিকে মুকুটনাথ অনেক কাল আগেই ত্যাগ করেছেন সে এখানে এল কী করে? এই যোগাযোগের ব্যাপারটা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছে না। সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ভেতর থেকে ভামরীর গলা ভেসে আসে, 'আতী হ্যায় ভকিলজি—'

একটু পর প্রচুর মিঠাই এবং ঠাণ্ডাই শরবত নিয়ে এ ঘরে চলে আসে সে। তবে দ্বিতীয় মেয়েমানুষটিকে এখন আর দেখা যায় না।

কিরণ বলে, 'এখন আমি কিছু খাব না।'

খুবলাল হাত কচলাতে কচলাতে বলে, 'তাই কখনও হয়! একটু না খেলে আমার আত্মার শান্তি হবে না। লেও বেটা—'

খুবলাল অনেক অনুনয় টনুনয় করায় শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই শরবতের গেলাস তুলে নেয় কিরণ। রেবতী খাবার দাবার কিছুই ছোঁন না। বাইরে খাওয়ার অভ্যাস নেই তাঁর। সৎ ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারুর ছোঁয়া তিনি খান না।

ঠাণ্ডাই আধাআধি খাওয়া হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎ কিরণের মনে হয়, মাথার ভেতর চাকার মতো কিছু ঘুরে যাচ্ছে। পেটের ভেতরটা গুলিয়ে ওঠে, সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড অস্বস্তি, নাক-কান দিয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে যেন হলকা বেরুচ্ছে। চোখ দুটো গভীর ঘুমে জড়িয়ে আসতে থাকে। প্রাণপণ চেষ্টাতেও চোখ খুলে রাখতে পারে না কিরণ। সে টের পায় বিপর্যয়ের মতো কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে। সেটা যে ঠিক কী, বুঝবার আগেই চোখের সামনের সমস্ত কিছু গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যায়।

জ্ঞান ফেরার পর প্রথমটা কিরণ আবছাভাবে দেখতে পায় কে যেন তার মুখের ওপর ঝুঁকে বসে আছে। মানুষটা কে, সে বুঝতে পারে না। তবে এটা টের পায় তার তলপেটে কেউ করাত চালাচ্ছে। মনে হচ্ছে, তীব্র যন্ত্রণায় শরীরের নিচের দিকটা ছিঁড়ে যাবে। কিরণের গলা থেকে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসতে থাকে।

'খুব কষ্ট হচ্ছে?' একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পায় কিরণ। কিন্তু তার স্নায়ু এখন এতই দুর্বল যে

গলাটা কার, একেবারেই বুঝতে পারে না। ঘোরের মধ্যে টের পায়, তার মুখে থকথকে আরকের মতো কিছু ঢেলে দেওয়া হচ্ছে।

আরকটা গিলে ফেলার বেশ কিছুক্ষণ পর তলপেটের কষ্টটা অনেক কমে আসে। এবার তার চোখের ঘোলাটে ভাবও খানিকটা কেটে যায়। মাথার ভেতরটা এতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, ফলে আশেপাশের কোনো কিছুই ভাল করে বুঝতে বা ধরতে পারছিল না। এখন সে দেখতে পায় 'মিশ্র নিকেত'-এ নিজের ঘরের খাটটিতে শুয়ে আছে, আর রেবতী উদ্বিগ্ন মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। মা ছাড়া এ ঘরে অন্য কেউ নেই।

কিরণের মস্তিষ্কে হঠাৎ স্বয়ংক্রিয় কোনো পদ্ধতিতে কাজ শুরু হয়ে যায়। মনে পড়ে, মা'র সঙ্গে নির্জন নতুন বাড়িতে গিয়েছিল সে। সেখানে খুবলাল, ভামরী এবং আরেকটি মেয়েমানুষ তাদের আপ্যায়নের জন্য অপেক্ষা করছিল। ভামরী তাকে ঠাণ্ডাই খাওয়ায়, তারপর কয়েক ঘণ্টা, নাকি কয়েক দিন কী ঘটেছে তার মনে নেই। এখন দেখা যাচ্ছে নিজের ঘরে শুয়ে আছে।

রেবতী আরো একটু ঝুঁকে বলেন, 'এখন ব্যথাটা কম লাগছে?'

আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় কিরণ। সে কিছুটা অবাকই হয়। ফিটনে করে সে যখন নতুন বাড়িটায় যায় মাকে অত্যন্ত কঠোর এবং রুক্ষ দেখাচ্ছিল। কিন্তু সেই রেবতী একেবারে বদলে গেছেন। এখন চিরকালের চেনা কোমল, স্নেহময়ী, সন্তানের দুঃখে কাতর মাকেই তার পাশে দেখতে পাচ্ছে।

রেবতী আর্দ্র স্বরে বলেন, 'দু'চারদিন একটু কষ্ট হবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। কোনো ভয় নেই।'

কিরণ উত্তর দেয় না। আচমকা মনে হয়, তার শরীরের অভ্যন্তরে যে নতুন প্রাণটি লালিত হচ্ছিল, সেটি আর নেই। ভ্রূণটাকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এই জন্যই কি কৌশলে তাকে সেই বাড়িটায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? কে যেন তাকে বলেছিল, আজকাল গর্ভপাত করে পয়সা কামায় ভামরী।

কিরণ শিউরে ওঠে, দু হাতে মুখ ঢেকে অবুঝ বালিকার মতো কাঁদতে থাকে।

গভীর মমতায় তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে রেবতী বলেন, 'কাঁদিস না মা, কাঁদিস না।'

কিরণের কান্না ক্রমশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, 'কেন তোমরা আমার সর্বনাশ করলে? কেন?'

'তোর কোনো ক্ষতি করা হয়নি মা। পাপটাকে শুধু নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।'

কয়েকদিন পর শিউশঙ্করজির নতুন মন্দিরের সামনের ফাঁকা জায়গাটায় প্যান্ডেল খাটিয়ে কিরণের গর্ভশুদ্ধির জন্য হোমযজ্ঞের আসর বসান বশিষ্ঠনারায়ণ। গর্ভশুদ্ধির কথাটা অবশ্য গোপন রাখা হয়। যেটা জানানো হয় তা হল, অসুস্থ কিরণের আরোগ্যের জন্য এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে

ধরমপুরার তাবত মানুষজনকে এখানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তাদের জন্য ঢালাও প্রসাদের ব্যবস্থা করেছেন মুকুটনাথ। তা ছাড়া একশ একজন নাম-করা সৎ ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট ভোজন করিয়ে প্রত্যেককে নতুন বস্ত্র, স্বর্ণ, ফল, ফুল, মিষ্টি, রুপোর থালা, উপবীত, নিখুঁত গরু এবং দু'শ এক টাকা করে দক্ষিণা দেওয়া হবে।

যজ্ঞকুণ্ডের আগুনে ধুনো, ঘি ইত্যাদি নিবেদন করতে করতে উদাত্ত স্বরে মন্ত্রপাঠ করছেন বশিষ্ঠনারায়ণ।

'দ্যো শান্তিঃ, অন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ,
ওষধয় শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ, বনস্পতয় শান্তিঃ
বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ, ব্রহ্ম শান্তিঃ, সর্বং শান্তিঃ

বিশাল শামিয়ানার নিচে প্রচুর লোকজন। এক কোণে পাশাপাশি বসে মুকুটনাথ এবং ত্রিকূটনারায়ণ পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে আলোচনা করছিলেন।

ত্রিকূটনারায়ণ বলেন, ‘গর্ভশুদ্ধি হয়ে গেল। আর কোনো অশান্তি নেই। এবার কিরণের পেটে যে সন্তান আসবে তার জন্য মাতৃকুল পিতৃকুল কারুর কোনো ক্ষতি হবে না। ঈশ্বর তাকে পাপমুক্ত করেছেন।’

মুকুটনাথ সাগ্রহে বলেন, ‘কিরণ সুস্থ হয়ে উঠলে গুরুজিকে তা হলে বিয়ের একটা দিন ঠিক করে দিতে বলি?’

‘নিশ্চয়ই।’

ওদিকে বশিষ্ঠনারায়ণের গভীর কণ্ঠস্বর আকাশে বাতাসে মন্ত্রের পবিত্র বাণী ছড়িয়ে দিচ্ছে।

‘ওঁ সর্ব্বরোগ শান্তিঃ, ও সর্বপচ্ছান্তি। ওঁ যৎ এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তিঃ।’

ছোট গল্প

মানুষ

ঠিক দুপুরবেলা শেরমুণ্ডি পাহাড়ের কাছাকাছি আসতেই হুড়মুড় করে বৃষ্টিটা নেমে গেল।

সেই ভোরে—আকাশ তখনও ঝাপসা, রোদ ওঠেনি, বাঁশের লাঠির ডগায় রংবেরংয়ের তালি-মারা ঝুলিটা বেঁধে এবং ঝুলিসুদ্ধ লাঠিটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়েছিল ভরোসালাল। সে আসছে রাজপুত ঠাকুর রঘুনাথ সিং-এর তালুক হেকমপুর থেকে, আপাতত যাবে শেরমুণ্ডি পাহাড়ের ওপারে টাউন ভকিলগঞ্জে।

ভোরে ভরোসালাল যখন হেকমপুর থেকে বেরোয় তখন আকাশের চেহারা দেখে টের পাওয়া যায়নি দুপুরের মধ্যেই চারদিক ভেঙেচুরে এভাবে বৃষ্টি নেমে যাবে। খুব নিরীহ চেহারার দু-চার টুকরো ভবঘুরে মেঘ মাথার ওপর বাতাসের ধাক্কায় ধাক্কায় এদিক সেদিক ভেসে বেড়াচ্ছিল। তারপর বেলা একটু বাড়লে চাঁদির থালার মতো সূর্যটা আকাশের গড়ানে গা বেয়ে উঠে এসেছিল। গলানো রুপোর মতো ঝকঝকে রোদে মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গল ভেসে যাচ্ছিল তখন, কিন্তু এই রোদ আর কতক্ষণ! বেলা আরেকটু চড়বার সঙ্গে সঙ্গে এক ফুঁয়ে বাতি নিভে যাবার মতো আচমকা চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছিল। মকাইয়ের খেত, যবের খেত, আখের খেত, নানারকম ঝোপঝাড় আর হতচ্ছাড়া চেহারায় দু-একটা গ্রাম পেরিয়ে আসতে আসতে ভরোসালালের অজান্তে কখন যে ভারি ভারি চাংড়া চাংড়া জলবাহী মেঘে আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল, টের পাওয়া যায়নি। ভরোসালাল চমকে উঠেছিল মেঘের ডাকে, সেই সঙ্গে তার চোখে পড়েছিল আকাশটা আড়াআড়ি চিরে বিদ্যুৎ ছুটে যাচ্ছে।

মাথার ওপর মেঘ আর বিদ্যুৎচমক নিয়ে জোরে জোরে পা চালিয়ে দিয়েছিল ভরোসালাল। আজ যেমন করেই হোক, তাকে শেরমুণ্ডি পাহাড়ের ওপারে ভকিলগঞ্জে পৌঁছুতেই হবে।

হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফিরিয়ে বার বার পেছন দিকটা দেখে নিচ্ছিল ভরোসালাল। হঠাৎ একসময় অনেক, অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে সেখানটায় বৃষ্টি নেমে গিয়েছিল। জল নামতে দেখে দৌড়ুতেই শুরু করেছিল ভরোসালাল কিন্তু বৃষ্টিটা নাছোড়বান্দা হয়ে তার পিছু নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত শেরমুণ্ডি পাহাড়ের তলায় এসে তাকে ধরেই ফেলেছে।

বেশ কোমর বেঁধেই নেমেছে বৃষ্টিটা। তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে উলটোপালটা ঝড়ো হাওয়া। এই ঝড়বৃষ্টি ঘাড়ে নিয়ে সামনের খাড়া পাহাড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভরোসালাল এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। এই মুহূর্তে মাথা বাঁচাবার জন্য কোথাও একটু দাঁড়ানো দরকার। হঠাৎ সে দেখতে পেল খানিকটা দূরে একটা ঝাঁকড়া-মাথা পিপুল গাছের তলায় দশ-বারটা দেহাতী লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে একটা মেয়েও রয়েছে।

বোঝা যাচ্ছে, বৃষ্টির জন্যই ওরা ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গাছতলায় মাথা গুঁজে জলের ছাট থেকে নিজেদের যতটা বাঁচানো যায়। ভরোসালাল দৌড়ে সেখানে চলে গেল।

ভরোসালালের বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। শরীরের কাঠামো দারুণ মজবুত। চওড়া ছড়ানো কাঁধ তার, এবড়ো খেবড়ো পাথরের মতো প্রকাণ্ড বুক, হাতদুটো জানু ছাড়িয়ে কয়েক আঙুল নেমে গেছে। গায়ের চামড়া পোড়া ঝামার মতো, সাত জন্মে সেখানে তেল পড়ে না। ফলে বার মাস খসখসে কর্কশ গা থেকে খই উড়তে থাকে। চৌকো মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি তার, থ্যাবড়া থুতনি। চেহারা যেমনই হোক, চোখদুটো কিন্তু আশ্চর্য মায়াবী—যেমনি সরল তেমনি নিষ্পাপ।

ভরোসালালের পরনে হাঁটু পর্যন্ত খাটো টেনি আর ফতুয়ার মতো লাল কামিজ। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি মাংস শুকিয়ে ডেলা পাকিয়ে প্রায় ঝুলে আছে। বাঘের থাবা খেয়ে ঘাড়টার অবস্থা এই রকম।

ভরোসালাল একজন 'বিটার'। এ অঞ্চলে যাকে জঙ্গল-হাঁকোয়া বলে সে তা-ই। তার কাজ হল বনে-জঙ্গলে টিন পিটিয়ে আর চেঁচিয়ে তাড়া করে করে বাঘ ভাল্লুক কিংবা অন্য জন্তু-জানোয়ারকে

শিকারিদের বন্দুকের মুখে নিয়ে যাওয়া। বছব তিনেক আগে রক্সৌলে এক শিকারির জন্য টিন পেটাতে গিয়ে বাঘের থাবায় ঘাড়ের মাংস ওইভাবে ঝুলে গেছে। 'বিটারে'র কাজ ছাড়া আরো একটা কাজ করে থাকে ভরোসালাল। চারদিকে যত ছোটখাট শহব আছে, সেসব জায়গার মিউনিসিপ্যালিটিগুলো মাঝে মাঝে রাস্তার বেওয়াবিশ খ্যাপা কুকুর ধবে মেবে ফেলে। এই কুকুর ধরা আমার মারার কাজটিও কবে থাকে সে।

'বিটারে'র কাজ কিংবা কুকুর মারার দায়িত্ব কেউ তাকে ডেকে দেয় না। ভরোসালাল নিজে থেকেই খোঁজখবর নিয়ে শিকারিদেব বাড়ি বাড়ি কিংবা মিউনিসিপ্যালিটিগুলোর দরজায় দরজায় হানা দেয়। এটাই তার জীবিকা। খুবই নিষ্ঠুর হয়ত, কিন্তু স্রেফ পেটের জন্য এসব করতে হয় তাকে।

এদিকে বৃষ্টির জোর আরো বেড়েছে। আকাশের যা অবস্থা তাতে জল কখন ধরবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ঝাঁকড়া-মাথা পিপুল গাছের তলায় দেহাতী মানুষগুলোর সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েও কি রেহাই আছে? ডালপালা আর পাতার ফাঁক দিয়ে ঝবঝর জল পড়ে গা-মাথা ভিজিয়ে দিচ্ছে। তবে খোলা জায়গায় দাঁড়ালে চোখেব পলকে চান হয়ে যাবে। সেই তুলনায় এখানে ভেজাটা কম হচ্ছে, এই আর কি।

অন্যমনস্কেব মতো তাকিয়ে তাকিয়ে বৃষ্টিব ভাবগতিক লক্ষ কবছিল ভরোসালাল। হঠাৎ পাশের লোকটা বলে উঠল, 'বহোত ভারি বারিষ (বৃষ্টি)।'

ভরোসালাল ঘাড় ফেরাল। দেখল, লোকটা মধ্যবয়সী, মাথায় পাগড়ি, ভাঙাচোরা চেহারা। সে বলল, 'হাঁ—'

লোকটা এবার বলল, 'মালুম হচ্ছে এ বারিষ জলদি রুখবে না।' তার ভাষা হিন্দি এবং বাংলায় মেশানো। খুব সম্ভব বিহার-বাংলার সীমান্তে কোনো অঞ্চলে তার বাড়ি।

ভরোসালাল বলল, 'হাঁ—'

মধ্যবয়সী এবার তার সঙ্গীদের দেখিয়ে বলল, 'দুফারে হামলোগকো টেউন ভকিলগঞ্জে যাওযার কথা ছিল। লেকিন কী করে যাই?'

বোঝা যাচ্ছে, এরাও শেরমুণ্ডি পাহাড় পেরিয়ে ওপারে যাবে। ভরোসালাল কৌতূহলহীন চোখে লোকটাব সঙ্গীগুলোকে একবার দেখে নিল। তারা অবশ্য এই লোকটার মতো মাঝবয়সী না, দামড়া মোষের মতো তারা এককেটা তাগড়া জোয়ান। তাদের দেখতে দেখতে সেই মেয়েটার দিকে নজব পড়ে গেল ভবোসালালের। দলটার মধ্যে সে একা—একমাত্র মেয়ে।

জীবন বা মানুষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা খুবই কম ভরোসালালের। জোয়ান বয়সের শুরু থেকে বনেব হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আর খ্যাপা কুকুরেব পেছনে ছুটে ছুটে এতগুলো বছর কেটে গেছে তার, তবু সে বুঝতে পারল মেয়েটা গর্ভিণী। দু-চার দিনের মধ্যে তার বাচ্চা-টাচ্চা হবে।

পাশের লোকটা প্রচণ্ড বক বক করতে পাবে। এবার সে যা বলল সংক্ষেপে এইরকম। বৃষ্টিতে ভিজে পাহাড়ী বাস্তার হাল খুবই বুরা (খারাপ) হয়ে গেছে। এখন সেখানে উঠতে যাওয়া বোকামি, পা পিছলে পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না—নির্ঘাত খতম হয়ে যেতে হবে।

মেয়েটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ভরোসালাল বলল, 'হাঁ—'

লোকটা এবার বলল, 'লেকিন দুফারেব ভেতব ভকিলগঞ্জে হাজিব হতে না পারলে কামটা ছুটে যেতে পারে।' তাকে খুবই চিন্তিত দেখাল।

'কিসের কাম?'

'ভকিলগঞ্জে নদীর কিনারে বাঁধ বানানো হবে। আমরা মাটি কাটার কামে যাচ্ছি। দেরি হয়ে গেলে গরমিন অফসর (গভর্নমেণ্ট অফিসার) যদি ভাগিয়ে দ্যায়—'

'রামজি কিরপা করলে ভাগাবে না।' বলতে বলতে আবার মেয়েটির দিকে তাকাল ভরোসালাল। পৃথিবীর কোনো কিছু সম্বন্ধেই বিশেষ কৌতূহল নেই তার। নিজের পেটের জন্য বনে-জঙ্গলে বা লোকালয়ে সর্বক্ষণ তাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে অন্য দিকে চোখ তুলে তাকাবার সময় পর্যন্ত পায় না। যদিও বা পায়, খুবই আগ্রহশূন্যভাবে এই পৃথিবী আর পৃথিবীর মানুষকে দেখে থাকে। তবু আবছাভাবে ভরোসালাল ভাবল, ওই মেয়েটির পেটে অন্তত ন'দশ মাসের বাচ্চা রয়েছে। এ অবস্থায়

সে-ও কি মাটি কাটতে চলেছে? জেনানাদের এ সময়টা কোনো ভারি কাজ করা ঠিক নয়। ভাবল বটে, তবে কিছু বলল না।

সেই মাঝবয়সী লোকটা ঘাড়ের পাশ থেকে বলে উঠল, 'রামজি কি কিরপা করবে?'

ভরোসালাল এবার উত্তর দিল না। অন্যমনস্কর মতো মুখ ফিরিয়ে মেঘের ভারে নেমে আসা ঝাপসা আকাশ দেখতে লাগল।

কিন্তু উত্তর না দিলে কী হবে, পাশের লোকটা ঘ্যানঘেনে বৃষ্টির মতো সমানে বকে যাচ্ছে।

কতক্ষণ পিপুল গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই ভরোসালালের। হঠাৎ একসময় বৃষ্টির তোড় কমে এল, সেই সঙ্গে ঝাড়ের দাপটও। তবে আকাশ ভারি হয়ে আছে। যে কোনো মুহূর্তে প্রবল বেগে আবার শুরু হয়ে যেতে পারে।

সেই লোকটা কানের পাশ থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বারিষ ধরে এসেছে। এই মওকায় পাহাড় পেরুতে হবে।' বলেই সঙ্গীদের উদ্দেশে জোরে জোরে হাঁকল, 'অ্যাই ছোকরারা—চল চল, জোরসে পা চালা—'সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে সে পাহাড়ের দিকে চলল।

দলটা আগে আগে চলেছে। তাদের পেছনে রয়েছে সেই মেয়েটা। ভরোসালাল এই সুযোগটা ছাড়ল না। মেয়েটার পেছন পেছন সে-ও হাঁটতে লাগল। বৃষ্টির জোর নতুন করে বাড়বার আগেই সে-ও শেরমুণ্ডি পাহাড় পেরিয়ে যেতে চায়।

দিনকয়েক আগে ঠাকুর রঘুনাথ সিং শিকারে যাবেন, এই খবরটা পেয়ে হেকমপুর তালুকে ছুটে গিয়েছিল ভরোসালাল। পুরো চারটে দিন রঘুনাথ সিংয়ের সঙ্গে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে টিন পিটিয়ে মোট দশটা টাকা আর তিন কিলো মাইলো মজুরি হিসেবে পেয়েছে। সেই টাকাটা তার কোমরে গোঁজা রয়েছে, আর মাইলোগুলো তার চিত্রবিচিত্র ঝুলিটায়।

হেকমপুরে থাকতে থাকতেই সে খবর পেয়েছিল, পূর্ণিয়া টাউনে দু-চার দিনের মধ্যে খ্যাপা কুকুর মারা হবে। তাই রঘুনাথ সিংয়ের শিকার শেষ হতে না হতেই সে বেরিয়ে পড়েছে। শেরমুণ্ডি পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে টাউন ভকিলগঞ্জে আজকের রাতটা কাটাবে ভরোসালাল। তারপর কাল সকালে উঠে চলে যাবে সগরিগলি ঘাটে, সেখানে নদী পেরিয়ে পূর্ণিয়া টাউনের দিকে হাঁটা শুরু করবে।

যাই হোক, এই শেরমুণ্ডি পাহাড়টা ভয়ানক রকমের খাড়া, তার সারা গায়ে ঘন অরণ্য। শাল আর মহুয়ার গাছই এখানে বেশি করে চোখে পড়ে। অবশ্য আমলকী, দেবদারু, কেঁদ আর ট্যারাবাঁকা চেহারার অগুনতি সিসম গাছও চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া আছে নানা ধরনের ঝোপঝাড়, সাবুই ঘাস এবং আগাছার জঙ্গল।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পায়ে চলার রাস্তা উঠে গেছে। সেই রাস্তা এই মুহূর্তে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কেননা যদিও এটা একটা পাহাড়, তবু হাজার হাজার বছরের ঝড়বৃষ্টিতে পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে এর গায়ের ওপর চামড়ার মতো মাটির একটা স্তর জমেছে। বৃষ্টিতে সেই মাটি গলা মাংসের মতো থকথকে হয়ে আছে।

খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে ওরা পাহাড় বাইছিল। বৃষ্টির জোর কমে এলেও অল্প অল্প পড়েই যাচ্ছে। হাওয়ার দাপটও আগের মতো নেই। দু ধারের ঝোপঝাড় থেকে ঝিঁঝিঁদের একটানা চিৎকার উঠে আসছিল। গাছের মাথায় সরুমোটা, নানা বিচিত্র সুরে পাখিরা একটানা ডেকে যাচ্ছে। কোথায় যেন সাপেদের পেট টেনে টেনে চলার শব্দ হচ্ছে।

সেই মধ্যবয়সী লোকটা মাঝে মাঝেই তার সঙ্গীদের উদ্দেশে হেঁকে উঠছিল, 'জলদি পা চালা। হো রামজি, দুফার পার হয়ে গেল!'

চারদিকের নানারকম শব্দ বা মধ্যবয়সী লোকটার হাঁকাহাঁকি শুনেও যেন শুনতে পাচ্ছিল না ভরোসালাল। দূরমনস্কর মতো খাড়াই পাহাড় ভাঙছিল সে। নেহাত বৃষ্টিটা হঠাৎ এসে গেছে। নইলে তাড়াহুড়ো করে ওপারে যাওয়ার খুব একটা দরকার তার নেই। কারণ আজকের দিনটা তার বিশ্রাম। টাউন ভকিলগঞ্জে একবার পৌঁছুতে পারলে ধীরেসুস্থে হাত-পা ছড়িয়ে দিনের বাকি অংশটা সে কাটিয়ে দেবে। তারপর কাল থেকে আবার নতুন কাজের ধান্দা শুরু হবে। কিন্তু কালকের কথা কাল।

খানিকক্ষণ পাহাড় বাওয়ার পর হঠাৎ কাতর গোঙানির মতো একটা আওয়াজ কানে আসায় চমকে

উঠল ভরোসালাল। সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সেই গর্ভিণী মেয়েটা পাহাড়ে ওঠার ক্লান্তিতে ভয়ানক হাঁপাচ্ছে। তার মুখটা খুলে অনেকখানি হাঁ হয়ে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে থেকে থেকে গোঙানিটা বেরিয়ে আসছিল। হাঁপানির দাপটে মেয়েটার বুক তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। চোখের তারা দুটো মরা মাছের চোখের মতো, মনে হচ্ছিল সে দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

প্রায় টলছিল মেয়েটা। তার মধ্যেই হাঁটুভর গভীর থকথকে কাদার ভেতর এলোপাথাড়ি পা ফেলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারছিল না। সে হয়ত ঘাড়-মুখ গুঁজে হুড়মুড় করে পড়েই যেত, তার আগেই পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল ভরোসালাল। বলল, 'কেয়া, তুমহারা তবিয়ত আচ্ছা নেহী?'

খুব নির্জীব গলায় মেয়েটা উত্তর দিল, 'নেহী—'

ভরোসালাল কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখে পড়ল সেই মাঝবয়সী লোকটা দামড়া মোষের মতো জোয়ান ছোকরাগুলোকে নিয়ে ঝোপঝাড় ঠেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সে এবার অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আবে, তোমার সাথবালারা (সঙ্গীরা) বহোৎ দূর চলে গেল যে!'

মেয়েটা বলল, 'আমি ওদের সাথ আসি নি।'

ভয়ানক চমকে ওঠে ভরোসালাল, 'মতলব (মানে)?'

'আমি অকেলিই এসেছি।'

'হো রামজি, শরীরের এই হাল নিয়ে তুমি অকেলিই বেরিয়ে পড়েছ!'

'কী করব?'

'কেন, তোমার মরদ কোথায়?'

মেয়েটা ভরোসালালের প্রকাণ্ড চওড়া বুকের ওপর শরীরের ভার রেখে খানিকটা সামলে নিয়েছিল। এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'সে আসতে পারল না।'

ভরোসালাল জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'মহাজনের খেতিবাড়িতে সে বেগার দিতে গেছে।'

'বেগার?'

'হাঁ—'মেয়েটা এবার যা বলে, সংক্ষেপে এইরকম। চার সাল আগে তাদের দেহাতের মহাজন বিষুণ আহীরের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল তার মরদ। টাকাটা আর শোধ করা যায়নি। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লোকটার, তার সিন্দুকে সোনাচাঁদি আর জহরতের পাহাড়। আর জমিজমা খেতিবাড়ির তো লেখাজোখা নেই। তাদের দেহাতে যেখানে যে জমিতে পা দেওয়া যাক না, সেটাই বিষুণ আহীরের। এত জমি, এত টাকা পয়সা থাকলে কী হবে, লোকটা আস্ত কসাই। এই মেয়েটার মরদের সামান্য ক'টা টাকা উশুল করার জন্য বিষুণ তাকে বছরের পর বছর বেগার খাটিয়ে চলেছে। বছরে দু মাস মেয়েটার মরদকে বিষুণ আহীরের খেতিবাড়িতে বেগার দিতে হয়। সুদে আসলে বিষুণের টাকাটা ফুলেফেঁপে এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে দশ বছর বেগার দিলেও নাকি ওটা শোধ হবে না। এইরকম যখন অবস্থা তখন মেয়েটার মরদ তার সঙ্গে আসে কী করে?

সব শুনে ভরোসালাল এবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ঘরে মরদ ছাড়া আর কোঈ নেহী?'

'নেহী।'

'হো রামজি—বলে একটু চুপ করে ভরোসালাল। পরক্ষণে আবার শুরু করে, 'এবার তুমি চলতে পারবে?'

মেয়েটা বলল, 'পারব।'

'বহোত হোঁশিয়ার হয়ে পা ফেলে চল—'

খুব সাবধানে চটচটে আঠাল কাদার ভেতর পা টেনে টেনে দু'জনে এগুতে থাকে।

সেই মধ্যবয়সী লোকটা তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে শাল এবং সিসম গাছটাছের ভেতর উধাও হয়ে গেছে। এখন আর তাদের দেখা যাচ্ছে না। ইচ্ছা করলে লম্বা লম্বা পা ফেলে ভরোসালাল পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যেতে পারে। কিন্তু মেয়েটাকে এ অবস্থায় ফেলে তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার, খ্যাপা কুকুর আর নিজের পেট ছাড়া পৃথিবীর কোনো ব্যাপারেই ভরোসালালের আগ্রহ নেই। তবু মেয়েটার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তার অল্পস্বল্প কৌতূহল হতে লাগল। সে বলল, 'তোমার গাঁও কোথায়?'

মেয়েটি বলল, 'পাঁচ মিল (মাইল) পশ্চিমে, নাম ঝুমারিয়া—'

'গাঁও থেকেই এখন আসছ?'

'হাঁ—'

'পাহাড়ের ওপারে কোথায় যাবে?'

'টেউন ভকিলগঞ্জে—'

'কোনো রিস্তেদারের বাড়ি?'

'নেহী।'

'তব্?'

একটু চুপ করে থেকে মেয়েটা বলল, 'আমি অসপাতাল (হাসপাতাল) যাচ্ছি।'

'অসপাতাল কেন?' বলেই ভরোসালালের মনে পড়ল মেয়েটা গর্ভিণী। নিশ্চয়ই বাচ্চাটাচ্চা হওয়ার ব্যাপারে হাসপাতালে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার বলে উঠল, 'সমঝ গিয়া, রামজিকা কিরপা—'

মেয়েটা মুখ নিচু করে হাঁটতে লাগল।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

এই শেরমুণ্ডি পাহাড়ের গায়ে নির্দিষ্ট কোনো রাস্তা নেই। ঝোপঝাড় এবং জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ফাঁকা জায়গা দেখে দেখে চড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে হচ্ছে।

একসময় মেয়েটি জড়ানো গলায় হঠাৎ ডেকে ওঠে, 'এ আদমী—'

ভরোসালাল ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়, 'কিছু বলবে?'

'হাঁ, একঠো বাত—'

'বল—'

তক্ষুনি কিছু বলল না মেয়েটা। খানিকক্ষণ বাদে প্রায় মরিয়া হয়েই সে শুরু করল, 'আমি অকেলি আওরত, তবিয়তের হালও খুব খারাপ। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড় বাইতে ডর লাগছে। তুমি আমাকে ফেলে রেখে চলে যেও না।'

ভরোসালাল ভাল করে মেয়েটাকে লক্ষ করল। তার দুর্বল রক্তহীন শরীর, গর্তে বসে-যাওয়া চোখের কোলের গাঢ় কালি, পেরেকের মাথার মতো ঠেলে-ওঠা কণ্ঠার হাড, মাংস ঝরে-যাওয়া লম্বাটে রোগা মুখ, শির-বার-করা সিকড়ে সিকড়ে হাত, ন'দশ মাসের বাচ্চাওলা স্ফীত পেট, বোতামহীন জামার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা টসঠসে স্তন, স্তনের বোঁটার চারপাশে ভুসো কালির ছোপ, ইত্যাদি দেখতে দেখতে কেমন যেন মমতা বোধ করতে লাগল সে। বলল, 'আরে না না, তোমাকে একলা ফেলে আমি যাচ্ছি না। টেউন ভকিলগঞ্জে আমিও যাচ্ছি। আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমি ওখান পর্যন্ত যেতে পারবে।'

মেয়েটির মুখচোখ দেখে মনে হল, একটা শক্তসমর্থ সবল পুরুষের ভরসা পেয়ে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

পাঁক ঠেলে ঠেলে দু'জনে চলেছে তো চলেছেই। আরো খানিকক্ষণ যাওয়ার পর হঠাৎ ভরোসালাল লক্ষ করল, মেয়েটার পা ঠিকমতো পড়ছে না, আবার সে টলতে শুরু করেছে। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে তার। এবারও তাকে ধরে ফেলল ভরোসালাল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

মেয়েটা কাঁপা দুর্বল গলায় বলল, 'মাথা ঘুরছে।'

'হাঁটতে তখলিফ হচ্ছে?'

'হাঁ।'

'থোড়েসে জিরিয়ে নাও—'

ওখানেই একটা পাথর দেখে বসে পড়ে মেয়েটা। কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে উঠতে উঠতে বলে, 'চল—' কিন্তু পা ফেলতে গিয়ে আবার টলতে শুরু করে।

ভরোসালাল চিন্তিতভাবে বলল, 'মালুম হচ্ছে তুমি হেঁটে যেতে পারবে না। পা ফেলতে গেলেই টলছ, মাথায় চক্কর লাগছে। এক কাম করা যাক—'

মেয়েটি নির্জীব গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'তোমাকে আমি ধরে ধরে নিয়ে যাই। তোমার যা হাল, অকেলি চলতে গেলে পড়ে গিয়ে বিপদ হয়ে যাবে।'

মেয়েটি আস্তে মাথা হেলায়। অর্থাৎ ভরোসালাল ধরে নিয়ে গেলে তার আপত্তি নেই। তা হলে সে বেঁচেই যায়।

ভরোসালাল মেয়েটিকে ধরে ফেলল। এক হাতে তার কাঁধ বেড় দিয়ে আস্তে আস্তে আবার ওপরে উঠতে লাগল। খানিকটা যাওয়ার পর সে টের পেল মেয়েটার হাঁটার শক্তি ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। আর যত ফুরিয়ে আসছে ততই তার শরীরের সব ভার ভরোসালালের হাতের ওপর এসে পড়ছে। কাদাভর্তি পিছল পথে বাচ্চাসমেত একটি গর্ভিণী মেয়ের গোটা দেহের ওজন একটা হাতের ওপর নিয়ে এগুনো সম্ভব নয়। ভরোসালাল মেয়েটাকে প্রায় সাপটে বুকের ভিতর নিয়ে এল। সেই অবস্থাতেই তাকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে পাহাড় ভাঙতে লাগল। আর সমানে বিড় বিড় করতে লাগল, 'হো বামজি—তেরে কিরপা, তেরে কিরপা—'

এতক্ষণ বৃষ্টির জোর ছিল না, তবে মিহি চিনির দানার মতো সেটা ঝরেই যাচ্ছিল। হঠাৎ আবার তোড়ে নেমে এল বৃষ্টিটা। হাওয়া পড়ে গিয়েছিল। সেটাও বৃষ্টির মতোই আচমকা উন্মাদ হয়ে পাহাড়ী জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাঁই সাঁই ঘোড়া ছোটাতে শুরু করে দিল।

এদিকে মেয়েটির দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি শেষ হয়ে গেছে। তার কোমরের তলার দিকটা শরীর থেকে আলগা হয়ে যেন ঝুলে পড়ছে। ভরোসালাল দিশেহারা হয়ে পড়ল। গর্ভিণী মেয়েটাকে সে কথা দিয়েছে, শেরমুণ্ডি পাহাড় পার করে দেবে। কিন্তু এখন, এই অবস্থায় কিভাবে যে তার এবং তার পেটের বাচ্চাটাকে রক্ষা করবে—ভেবে পাচ্ছে না।

কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই মনে মনে ভরোসালাল সব স্থির করে ফেলল।

মেয়েটার শরীরের যা হাল তাতে তাকে আর হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তা ছাড়া সেই পিপুল গাছটার মতো ঝাঁকড়া-মাথা এমন কোনো গাছ কাছাকাছি নেই যার তলায় গিয়ে কিছুক্ষণ মাথা গোঁজা যেতে পারে। আর বৃষ্টিটা এবার যেভাবে শুরু হয়েছে তাতে আদৌ থামবে কিনা, কিংবা থামলে কখন থামবে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনিশ্চিতভাবে ভেজার চাইতে এগুবার চেষ্টা করাই ভাল।

ভরোসালাল করল কি, যেখানে কাদা কম এমন একটা জায়গা দেখে মেয়েটাকে শুইয়ে দিল। তারপর বাঁ কাঁধে লাঠির ডগায়-বাঁধা সেই চিত্রবিচিত্র ঝুলিটা নামিয়ে তার ভেতর থেকে দুটো ধুতি বার করে দ্রুত একটা বড় ঝোলা বানিয়ে ফেলল। মেয়েটাকে সেই ঝোলার ভেতর বসিয়ে, তার পাশে মাইলোগুলো রেখে নিজের পিঠে ঝুলিয়ে নিল। তারপর কাদার ভেতর সাবধানে পা ফেলে ফেলে খুব সাবধানে পাহাড়ের গা বাইতে লাগল। দায়িত্ব যখন নিয়েছে তখন মেয়েটাকে নিরাপদে পাহাড় পার করে দিতেই হবে।

আকাশ থেকে লক্ষকোটি বৃষ্টির রেখা বল্লমের ফলার মতো ছুটে আসছিল। ঝড়ে চারপাশের অর্জুন-শাল-আমলকী আর সিসম গাছগুলে একেক বার মাটিতে নুয়ে পড়ছে, পরক্ষণেই সটান খাড়া হয়ে যায়। ঝোপঝাড় উলটোপালটা খ্যাপা বাতাসে ছিঁড়ে খুঁড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছিল। আকাশের গায়ে বড় বড় ফাটল ধরিয়ে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে। ঝড়বৃষ্টির সর্বনাশা চেহারা দেখতে দেখতে ভরোসালাল একটানা বলে যেতে লাগল, 'হো রামজি তেরে কিরপা, হো রামজি তেরে কিরপা—' বলতে বলতে থকথকে পিছল কাদায় পায়ের আঙুলগুলোকে গজালের মতো গেঁথে গেঁথে সে ওপরে উঠতে লাগল।

পিঠে একটা ভরা গর্ভিণী মেয়ের বাচ্চাসুদ্ধু দেহের সমস্ত ভার চাপানো। যদিও ভরোসালাল হট্টাকাট্টা দুর্দান্ত শক্তিশালী মরদ, তবু তার শিরদাঁড়া যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, শ্বাস আটকে আসছে। তুমুল বৃষ্টি অনবরত চোখমুখে এমন ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে যাতে সামনের কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে। তাছাড়া দারুণ ঝড়ো হাওয়া তাকে ঠেলে দশ হাত একদিকে নিয়ে যাচ্ছে, পর মুহূর্তেই ধাক্কা মারতে

মারতে পনের হাত অন্য দিকে সরিয়ে দিচ্ছে। জলে আর হাওয়ায় তার চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তারই মধ্যে এই প্রচণ্ড দুর্যোগের বিরুদ্ধে শরীরটাকে ঢালের মতো খাড়া রেখে ভরোসালাল নিশানা ঠিক করে এগিয়ে যেতে লাগল আর কাতর সুরে একটানা বলে যেতে লাগল, 'হো রামজি তেরে কিরপা, তেরে কিরপা—'

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, শেরমুণ্ডি পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে যখন সে ওপারে গিয়ে নামল তখন বৃষ্টির দাপট থেমে এসেছে। ঝড়টাও আর নেই। আকাশের গায়ে মেঘ ক্রমশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে। পিঠ থেকে মেয়েটাকে নামিয়ে ভরোসালাল দু হাঁটুতে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ হাঁপাল, তার শরীরের সব শক্তি তখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ভরোসালালের মনে হচ্ছিল শরীরের একটা হাড়ও আর আস্ত নেই, সমস্ত ভেঙেচুরে গেছে. শিরাটিরাগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে। ঘাড়ের তলা থেকে অসহ্য একটা যন্ত্রণা শিরদাঁড়া বেয়ে কোমরে, কোমর থেকে পা পর্যন্ত চমক দিয়ে দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল।

অনেকক্ষণ বাদে খানিকটা ধাতস্থ হওয়ার পর হঠাৎ সেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল ভরোসালালের। ধড়মড় করে মুখ তুলতেই দেখতে পেল তার সারা গা, শাড়ি-জামা—সব ভিজে সপসপে হয়ে আছে। শরীরের চামড়া আর আঙুলের ডগাগুলো সিঁটিয়ে সাদা হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল ভরোসালাল। মেয়েটার মুখ অসহ্য কষ্টে কুঁচকে যাচ্ছে, ঠোঁটদুটো নীলবর্ণ। দাঁতে দাঁত চেপে কষ্টটা চাপতে চেষ্টা করছে সে। ভরোসালাল ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মেয়েটার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

নিজের পেটের কাছটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গোঙানির মতো শব্দ করল মেয়েটা, 'এখানে বহোৎ দর্দ। জলদি আমাকে অসপাতাল নিয়ে চল—'

পাহাড়ের তলা থেকে টাউন ভকিলগঞ্জ ঝাড়া পাঁচটি মাইল তফাতে। সেখানে পৌঁছুতে না পারলে হাসপাতালে যাওয়া যাবে না। ভরোসালাল শুধলো, 'তুমি কি হেঁটে যেতে পারবে?'

'নেহী। আমার কোমর পেট ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

ভরোসালাল সেটাই আন্দাজ করেছিল। এ অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে একটা পা ফেলাও মেয়েটার পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে ভরোসালালের শরীরে এমন শক্তি আর অবশিষ্ট নেই যাতে তাকে পিঠে ঝুলিয়ে আরো পাঁচ মাইল যেতে পারে। মেয়েটাকে পাহাড় পার করাতেই তার জিভ বেরিয়ে গেছে।

অবশ্য এই শেরমুণ্ডি পাহাড়ের তলায় ছোটখাট একটা বাজার আছে। নামেই বাজার। একটা চাল-ডাল-নিমক-মরিচের দোকান, একটা পান-বিড়ি-খৈনিপাতার, তৃতীয় দোকানটা হল চায়ের। ব্যস, এই হল বাজারের নমুনা। তার গা ঘেঁষে একটা আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা, জনাবের খেত, গেঁহুর খেত, যবের খেত আর এলোমেলোভাবে ছড়ানো নানা দেহাতের মধ্য দিয়ে টাউন ভকিলগঞ্জের দিকে চলে গেছে। ওই বাজারটার কাছে গেলে শহরে যাওয়ার বয়েল গাড়ি পাওয়া যায়। তক্ষুনি তার খেয়াল হল, গাড়ি ভাড়া করলে কম করে পাঁচটি টাকা লাগবে। ঠাকুর রঘুনাথ সিংয়ের দেওয়া দশটা টাকা তার ট্যাকে গোঁজা আছে। এ-ই তার শেষ সঞ্চয়। ওই টাকা থেকে খরচ করা ঠিক হবে কিনা, ভাবতে লাগল ভরোসালাল। আর তখনই তার কানে অস্পষ্ট গোঙানির মতো আওয়াজটা এসে ধাক্কা দিল। ঘাড় ফেরাতেই সে দেখল, পেটের মাংস এক হাতে খামচে ধরে থেকে থেকে কাতর শব্দ করে উঠছে মেয়েটা।

আর কিছু ভাবার সময় পেল না ভরোসালাল। কেউ যেন আচমকা টান মেরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল। এক দৌড়ে বাজারের কাছ থেকে একটা বয়েল গাড়ি নিয়ে এল সে। তারপর পাঁজাকোলা করে মেয়েটাকে ছইয়ের তলায় নিয়ে শুইয়ে দিল। গাড়িওলাকে বলল, 'জলদি টেউন চল ভেইয়া, বহোৎ জলদি—'

গাড়িওলা 'উর-র্—' বলে একটা শব্দ করে দুটো গোরুরই ল্যাজ মুচড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গোরু দুটো কাঁচা রাস্তা ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাল।

এদিকে আকাশটা দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। মেঘের গায়ে অল্প অল্প ফাটল ধরিয়ে মরা মরা নির্জীব রোদ বেরিয়ে আসতে চাইছিল। রোদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল, বেলা ফুরিয়ে এসেছে, একটু পরেই সন্ধে নেমে যাবে।

গাড়িতে উঠবার পর থেকে ভরোসালাল কোনো দিকে আর তাকায়নি, মেয়েটাকেই শুধু লক্ষ করে যাচ্ছে। মেয়েটা কাত হয়ে বুকের কাছে হাত-পা গুটিয়ে অনবরত গুঙিয়ে যাচ্ছিল আর চোয়াল শক্ত করে শ্বাস আটকে যন্ত্রণা চাপবার চেষ্টা করছিল। ভরোসালাল ঝুঁকে খুব নরম গলায় শুধলো, 'এ জেনানা, খুব কষ্ট হচ্ছে?'

মেয়েটা শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে মাথা নাড়ল শুধু, কিছু বলল না।

ভরোসালাল যে কী করবে, কী করলে মেয়েটার কষ্ট একটু কমতে পারে—ভেবে পেল না। সে শুধু শ্বাসরুদ্ধের মতো বিড়বিড় করতে লাগল, 'হো রামজি তেরে কিরপা, হো পবনসুত তেরে কিরপা—'

মেয়েটা এবার বলল, 'আমার বহোৎ ডর লাগছে।'

পরম মমতায় তার একটা হাত ধরে ভরোসালাল বলল, 'কিসের ডর?'

মেয়েটার যন্ত্রণা যেন পাঁচ গুণ বেড়ে গেল হঠাৎ। শরীরটা ধনুকের মতো বেঁকে যেতে লাগল তার, কপাল-গলা-গাল সব ঘামে ভিজে যাচ্ছে। গায়ের লোমগুলো শীত লাগার মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। চোখের তারা আস্তে আস্তে স্থির হয়ে যাচ্ছে।

ভরোসালাল অস্থির হয়ে উঠল। এই মেয়েটা পনের মাইল রাস্তা পেরিয়ে, বিশাল পাহাড় ডিঙিয়ে মানুষের জন্ম দিতে চলেছে। মানুষ সম্বন্ধে প্রায় অনভিজ্ঞ ভরোসালাল জানে না কিভাবে তার শুশ্রূষা করবে। ভীতভাবে সে বলল 'এ জেনানা, তোমাদের এ সময় কী করতে হয়?'

কোমরের কাছটা ধরে মেয়েটা অত্যন্ত দুর্বল স্বরে বলল, 'এখানে একটু সেঁক দিয়ে দাও—'

এই বয়েল গাড়ির ভেতর কোথায় আগুন, কোথায় বা কী? কিন্তু যেভাবেই হোক সেঁকটা দিতেই হবে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে ভরোসালালের চোখে পড়ল গাড়ির ছইয়ের নিচে এক ধারে একটা হেরিকেন ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘাড় ফিরিয়ে গাড়িওলাকে বলল, 'ভেইয়া, তোমার হেরিকেনে তেল আছে?'

গাড়িওলা বলল, 'আছে, কেন?'

'ওটা একটু জ্বালব। এই জেনানাকে সেঁক দিতে হবে।'

'জ্বালতে পার, তবে তেলের জন্যে চার আনা দিতে হবে।'

'দেব।'

'তব্ ঠিক আছে।'

'তোমার কাছে আগ আছে?'

'আছে।' গাড়িওলা কোমরের খাঁজ থেকে একটা দেশলাই বার করে ছুঁড়ে দিল।

ভরোসালাল হেরিকেন ধরিয়ে নিল। তারপর নিজের একটা কাপড়ের খানিকটা অংশ চার ভাঁজ করে হেরিকেনটার মাথায় বসিয়ে গরম করতে থাকে। সেটা বেশ তেতে উঠলে, আস্তে আস্তে মেয়েটার কোমরে সেঁক দিতে লাগল। অনেকক্ষণ সেঁক দেওয়ার পর গোঙাতে গোঙাতে এক সময় মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ল।

বয়েল গাড়িটা যখন টাউন ভকিলগঞ্জের সরকারি হাসপাতালে পৌঁছুল, বেশ রাত হয়ে গেছে।

কিন্তু এত রাতে ডাক্তার সাহেবকে পাওয়া গেল না। তিনি তাঁর কোয়ার্টারে চলে গেছেন।

যারা ছিল তারা বলল, 'আজ তো হবে না, কাল নিয়ে এস।'

ভরোসালালের মাথায় তখন পাহাড় ভেঙে পড়ার অবস্থা। মেয়েটাকে নিয়ে এই রাত্তিরে কোথায় রাখবে সে? সবার কাছে সে কাকুতি মিনতি করতে লাগল, 'কিরপা করে জেনানাকে ভর্তি করে নিন।'

হাসপাতালের লোকেরা জানাল, ডাক্তারসাব অর্ডার না দিলে কাউকে ভর্তি করা যাবে না। তখন মরিয়া হয়ে ডাক্তারসাবের কোয়ার্টারের ঠিকানা নিয়ে খুঁজে তাঁকে বার করল ভরোসালাল। তারপর তাঁর হাতে পায়ে ধরে, কিভাবে কত কষ্ট করে গর্ভিণী মেয়েটাকে পাহাড় পার করিয়ে এত দূরে নিয়ে এসেছে তার যাবতীয় বিবরণ দিয়ে বলল, অব আপকা কিরপা ডাগদরসাব।'

সব শুনে ডাক্তারসাহেব হাসপাতালে এসে মেয়েটাকে ভর্তি করে নিলেন।

এবার ভরোসালালের দায়িত্ব শেষ। গাড়িওলাকে ভাড়া ববাদ পাঁচ টাকা আর তেলের দরুন চার

আনা দিয়ে, আজ রাতের মতো একটা আস্তানার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ভরোসালাল।

পৃথিবীতে কেউ নেই তার। কাজেই পিছুটানও নেই। সে একেবারে ঝাড়া হাত-পা মানুষ। যখন যেখানে যায় সেখানে নিজের হাতে খানকতক রুটি সেঁকে নেয়। তারপর কারুর বাড়ির দাওয়ায় কিংবা মাঠে ঘাটে গাছতলায় শুয়ে পড়ে।

আজ আর কিছুই ভাল লাগছিল না ভরোসালালের। আটা কিনে এনে ছানো, উনুন বানাও, কাঠ কুটো যোগাড় কর—এত সব ঝঞ্ঝাট একটা দিনের জন্যে সে বাদ দিতে চায়। ভরোসালাল করল কি, একটা দোকানে গিয়ে তেঁতুলের আচার আর নুন-লঙ্কা দিয়ে একদলা ছোলার ছাতু খেয়ে এসে এক বাড়ির খোলা বারান্দায় শুয়ে রইল। কাল সকালে সে সগরিগলি ঘাটে যাবে। সেখান থেকে পূর্ণিয়া।

পরদিন সকালে উঠে সগরিগলি ঘাটে যাওয়ার সময় হঠাৎ ভরোসালালের মনে হল, মেয়েটার একটা খবর নিয়ে গেলে হয়। অন্যমনস্কর মতো হাঁটাতে হাঁটতে এক সময় সে হাসপাতালে এসে পড়ল এবং খবর নিয়ে জানল, এখনও মেয়েটার ছেলেপুলে কিছু হয়নি; তবে যে-কোনো মুহূর্তে হয়ে যেতে পারে, আর জানল মেয়েটা ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে।

শেষ খবরটা পেয়ে মন খারাপ হয়ে যায় ভরোসালালের। পৃথিবীর সব ব্যাপারেই সে উদাসীন। তবু কাল পিঠে চাপিয়ে যাকে পাহাড় পার করিয়েছে, যার জন্য নিজের সঞ্চয় থেকে নগদ সোয়া পাঁচ টাকা খরচও করে ফেলেছে, গরম সেঁক দিয়ে যার সেবা করেছে, তার খুব কষ্ট হচ্ছে জেনে আর সগরিগলি যেতে মন সরছে না। সে ঠিক করে ফেলল, ভালয় ভালয় মেয়েটার বাচ্চা-টাচ্চা হয়ে গেলে সে পূর্ণিয়া টাউনে যাবে। গিয়ে হয়ত দেখবে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা খ্যাপা কুকুর মারার জন্য অন্য লোক লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কী আর করা যাবে? হো রামজি, হো পবনসুত—

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এধারে ওধারে খানিক ঘুরে বেড়াল ভরোসালাল। তারপর রুটি বানিয়ে খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল। ঘুম থেকে উঠে বিকেলে আবার সে এল হাসপাতালে। কিন্তু কোনো খবর নেই। রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকালে আর বিকেলে দু বার এল ভরোসালাল। খবর নেই।

দু দিন কাটবার পর উদ্বেগে তার দম যখন বন্ধ হয়ে আসছে সেই সময় ডাক্তারসাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'বহুত আচ্ছা খবর—'

ভরোসালাল বলল, 'হো গিয়া ডাগদরসাব?'

'হো গিয়া।'

'রামজিকা কিরপা, পবনসুতকা কিরপা—' ভরোসালালের চোখে আলো ঝিলিক দিয়ে গেল।

'তোমার জেনানার লেড়কা হয়েছে। খুবসুরৎ গোরা লেড়কা—'

চমক লাগল ভরোসালালের। ডাগদরসাব নিশ্চয়ই মেয়েটাকে তার আওরত ধরে নিয়েছে। ভুল শুধরে দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'ও আমার আওরত না ডাগদরসাব।'

'তব্?' ডাক্তারসাহেব ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

ভরোসালাল বলল, 'রাস্তায় আসতে আসতে জান-পয়চান (আলাপ পরিচয়) হয়েছিল। আচ্ছা চলি ডাগদরসাব, রাম রাম।' এবার পরম নিশ্চিন্তে সগরিগলি ঘাট পেরিয়ে সে পূর্ণিয়া যেতে পারবে।

সাতঘরিয়া

মনপথল গাঁয়ের সামনের দিকে সরকারি পাকা সড়ক, এখানে যাকে বলে পাক্কী। পেছনে দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাত। কোয়েল এখন নামেই নদী। এই জেঠ মাহিনা অর্থাৎ জষ্ঠি মাসে বাদামি বালির পাহাড়ের তলায় যে জলটুকু রয়েছে তাতে হাঁটুও ডোবে না।

মনপথল জল-অচল অচ্ছুৎদের গাঁ। এর উত্তর দিকে থাকে ধাঙড়েরা, দক্ষিণে গুঞ্জুরা, পশ্চিমে দোসাদরা।

ভোরবেলা দোসাদটোলার চাঁপিয়া কোয়েলের হাঁটুভর পানিতে নাহানা (স্নান) সেরে নিজের ধসে-

পড়া কোমর-বাঁকা ঘরটার দাওয়ায় বসে আছে। আর থেকে থেকেই থুতনি তুলে চনমন করে দূরে পাক্কীর দিকে তাকাচ্ছে। ওই সড়কটা ধরে পুব দিক থেকে নাটোয়ারের আসার কথা।

এত ভোরে গঞ্জুটোলা ধাঙড়টোলা বা দোসাদটোলায় কারুর ঘুম ভাঙেনি। তবে ধাঙড়পাড়ার পাল পাল শুয়োর এর মধ্যেই খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। জানবরগুলোর পেটে সারাক্ষণ রাহুর খিদে। শুয়োর ছাড়া আর যারা জেগেছে তারা হল পাখি। ঝাঁক ঝাঁক পরদেশি শুগা আর চোটা পাখি ডানায় বাতাস চিরে চিরে পাক্কীর ওধারে ধু ধু মাঠের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

মনপথলের যে ধারেই তাকানো যাক, পরাস আর সিমার গাছের ছড়াছড়ি। তিন মাস আগে সেই যে গাছগুলো থোকায় থোকায় লাল ডগডগে ফুল ফোটাতে শুরু করেছিল, এখনও ফুটিয়েই যাচ্ছে। আর আছে সফেদিয়া গোলগোলি এবং মনরঙ্গোলি গাছের অজস্র ঝোপ। প্রতিটি ঝোপের মাথায় শুধু ফুল আর ফুল।

মনুষ্যজাতির সব চাইতে নিচের স্তরের যে অংশটি সারা পৃথিবী থেকে ভয়ে ভয়ে দূরে সরে এসে এই মনপথলে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে তাদের কেউ এই মুহূর্তে জেগে থাকলে চাঁপিয়াকে দেখে একেবারে হাঁ হয়ে যেত।

দুসাদিন চাঁপিয়ার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গায়ের রং পোড়া ঝামার মতো। চুল উঠে উঠে কপালটা প্রকাণ্ড মাঠ হয়ে গেছে। নাকটা খাটো এবং চাপা থুতনিতে কাটা দাগের মতো খাঁজ। মোটা ভুরু, খসখসে চামড়া। তবু লক্ষ করলে টের পাওয়া যায়, চাঁপিয়ার লম্বাটে মুখে এককালে খানিকটা ছিরিছাঁদ ছিল। এই বয়সেও তার চোখদুটো বড় সরল, বড় নিষ্পাপ এবং টানা টানা। বিশ-পঁচিশ সাল আগে চাঁপিয়া যখন সবে নঈ যুবতী হয়ে উঠছে সেই সময় গঞ্জুটোলার ফেকুমল প্রায়ই বলত, তার চোখ নাকি বনহরণা অর্থাৎ বনহরিণীর মতো। ছোকরা ছিল বেজায় ফুর্তিবাজ, আমুদে। নৌটঙ্কীর দলে গান গাইত আর আজীব আজীব কথা বলে লোককে তাক লাগিয়ে দিত।

বনহরণার মতো চাঁপিয়ার চোখ হোক বা না-হোক, তার গায়ে ছিল বনভৈঁসীর তাকত। অসীম শক্তি আর অফুরন্ত স্বাস্থ্যই তাকে জীবনের লম্বা অনেকগুলো বছর এই পৃথিবীতে টিকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তিন বছর আগে খারাপ জাতের চেচকে (বসন্তে) চাঁপিয়ার অটুট শরীর ভেঙে গেছে। কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। মুখে, ঘাড়ে, গলায় বসন্তের কালো কালো দাগ। হাতের শিরগুলো দড়ি হয়ে চামড়ার তলা থেকে ফুটে উঠেছে। আজকাল দুব্‌লা শরীরে অল্পতেই হাঁফ ধরে যায় তার।

একটা রোগা ভাঙাচোরা চেহারার আধবুড়ি দুসাদিনের দিকে তাকিয়ে গঞ্জুরা, ধাঙড়রা বা দোসাদরা নিশ্চয়ই হাঁ হয়ে যাবে না। তাদের অবাক হওয়ার কারণ হল চাঁপিয়ার সাজগোজ। এই মুহূর্তে তার পরনে বাদরার ছাই (এক ধরনের ক্ষার) দিয়ে কাচা পরিষ্কার রঙিন একটা শাড়ি আর খাটো জামা। চোখে কাজলের লম্বা টান। চুলগুলো কাঠের কাঁকই দিয়ে চুড়ো করে বেঁধে চারপাশে মনরঙ্গোলি ফুল বসিয়ে দিয়েছে। কপালের মাঝখানে মেটে সিঁদুরের ফোঁটা। গলায় চাঁদির হার, কানে চাঁদির করণফুল, হাতে চাঁদির কাঙনা। গত তিন সাল বড় কষ্ট গেছে চাঁপিয়ার, বহোত তখলিফ। কতদিন পেটে দানা পড়েনি, বিলকুল ভুখা থাকতে হয়েছে। তবু প্রাণ ধরে চাঁদির এই গয়না ক'টা সে যে বেচতে পারেনি তার কারণ একটাই। হাজার দুঃখেও চাঁপিয়ার আশা বা স্বপ্ন ছিল জীবনে আরো একবার সে সাজতে পারবে। আজ তার সেই সাজার দিন।

সেই পনের বছর বয়স থেকে এখন পর্যন্ত মোট ছ'বার এভাবে সেজেছে চাঁপিয়া। মনপথলের অচ্ছুতেরা তাকে শেষ বার সাজতে দেখেছে পাঁচ সাল আগে। সেবার চাঁপিয়া তার ছ'নম্বর মরদের ঘর করতে যায়।

মনপথলকে ঘিরে দশ বিশটা গাঁয়ে চাঁপিয়ার আরেক নাম ছেঘরিয়া অর্থাৎ চল্লিশ বছরের জীবনে মোট ছ'টি পুরুষের ঘর করেছে সে আজ পর্যন্ত।

ঘরের দাওয়ায় বসে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠতে থাকে চাঁপিয়া। চারপাশের দোসাদটোলা, গঞ্জুটোলা, ধাঙড়টোলা, ঝাঁক ঝাঁক পরদেশি পাখি, পাল পাল শুয়োর, সিমার বা পরাস গাছের মাথায় থোকা থোকা আগুন, অনেক দূরে ধু ধু ফাঁকা মাঠ— কোনোদিকেই লক্ষ্য নেই তার। পাকা সড়কের ওপর চাঁপিয়ার দুই চোখ স্থির হয়ে আছে।

কথা আছে, দু'মিল (দু'মাইল) পুবের ছোট টৌন ভকিলগঞ্জ থেকে সূরয উঠবার ঢের আগেই নাটোয়ার এসে তাকে নিয়ে সোজা চলে যাবে আড়াই 'কোশ' পশ্চিমে সুরথপুরার হাটে। নাটোয়াব তারই স্বজাত, অর্থাৎ কিনা দোসাদ। বয়স কমসে কম পঞ্চাশ হবেই। ভকিলগঞ্জে এক ঠিকাদারের কাছে দিনমজুরিতে সে মাটি কাটে। ওদিকটায় এখন সড়ক তৈরির কাজ চলছে, তার জন্যই মাটি কাটা।

দেখতে দেখতে চারদিক দ্রুত ফর্সা হতে থাকে। অনেক, অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে ঠিক সেইখানে লাল টকটকে সূর্যটা একটু একটু করে মাথা তোলে। ধাঙড়, গঞ্জু আব দোসাদটোলা থেকে মানুষজনের গলা ভেসে আসে। টের পাওয়া যায় মনপত্থল গাঁ জাগতে শুরু করেছে।

সূরয উঠে গেল, অথচ এখনও নাটোয়ারের দেখা নেই। তবে কি সে আসবে না? ভাবতেই বুকের ভেতর চল্লিশ বছরের দুর্বল হৃৎপিণ্ড থমকে যায় চাঁপিয়ার, চোখ জলে ভরে যেতে থাকে। নাটোয়াব দোসাদ না এলে তার এত সাজ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আরো খানিকক্ষণ পর সূর্য যখন দিগন্তের তলা থেকে লাফ দিয়ে ওপরে উঠে আসে, সেই সময় দেখা যায় পাক্কী ধরে নাটোয়াব এদিকেই আসছে। বুকের ভেতব থমকানো হৃৎপিণ্ড বিপুল বেগে ছোটাছুটি শুরু করে। খুশিতে চোখমুখ চকচকিয়ে ওঠে চাঁপিয়াব।

একটু পর ডাইনে এবং বাঁয়ে ধাঙড় আব গঞ্জুটোলা রেখে দোসাদটোলায় ঢুকে পড়ে নাটোয়ার। তারপর সামনের সিমার আর পবাস গাছগুলোব তলা দিয়ে সোজা চাঁপিযার কাছে এসে দাঁড়ায়। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাজের বাহার দেখতে দেখতে শুধোয়, 'কা রে চাঁপিযা, রিডি?' চাঁপিয়া প্রস্তুত হয়ে আছে কি না তা জানতে চাইছে নাটোয়ার। ঠিকাদারদেব কাছে কাজ করে করে দু-চারটে আংরেজি বুলি শিখে ফেলেছে সে। কথায় কথায় হরদম সেগুলো বেরিয়ে আসে।

'হাঁ—' আস্তে ঘাড় হেলিয়ে দেয় চাঁপিযা। নাটোয়ারের দিকে ভাল করে তাকাতে পারে না সে। পনের ষোল বছরের নঈ যুবতী সে আর নেই। তবু তার বুক সুখে এবং লজ্জায় থির থির করে কাঁপতে থাকে।

'আমার আসতে থোড়া দেব হয়ে গেল।'

চাঁপিয়া কী উত্তর দেবে, ভেবে পেল না।

নাটোয়ার ফের বলে, 'আব দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে। সূরয চড়ে যাচ্ছে। জলদি চল। সুরথপুরাব হাটিয়ায় পৌঁছুতে দুফার হয়ে যাবে।'

আবছা গলায চাঁপিয়া বলে, 'থোড়া ঠহর যাও।' বলেই তাব ভাঙচোবা ফুটোফাটা ঘরেব ভেতব ঢুকে একটা পুঁটুলি নিয়ে বেরিয়ে আসে। পুঁটলিটা কাল রাতেই বেঁধে ছেঁদে রেখেছিল সে। ওটার ভেতর রয়েছে তার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি। মোটা খানদুই সেলাই-কবা খাটো বহরের শাড়ি, তিনটে ছেঁড়া জামা, একটা কাঁথা, একটা কম্বল আর সিলভারের তোবড়ানো দু-তিনটে থালা-গেলাস।

নাটোয়ার পুঁটলিটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে শুধোয়, 'এটা নিয়ে যাবি?'

'হাঁ—' চাঁপিয়া মাথা নাড়ে।

'ঠিক হ্যায়। চল—'

কয়েক পা এগিয়ে একবার পেছন ফেরে চাঁপিযা। হেলে-পড়া টুটাফুটা ঘবটা দেখে নেয়। এটা তাব বাপের ঘর। অবশ্য বাপ আর বেঁচে নেই, কবে মরে ফৌত হয়ে গেছে। শুধু কি বাপ, মা-বোন কেউ নেই তার। এক ভাই ছিল, শাদির পর অনেক দূরের ভারি টৌন ঝরিয়ায় চলে গেছে। সেখানে কয়লা খাদানে কাজ করত। দশ-বিশ সাল তাব কোনো খবব পায় না চাঁপিয়া। মরে গেছে কি বেঁচে আছে, কে জানে।

বাপের এই ঘর থেকে প্রথম যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি কাঁখে নিয়ে একজন মরদের পিছু পিছু চলে যাচ্ছে না চাঁপিয়া। আগেও ছ ছ'বার ছ'টি পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। যাওয়াব সময় প্রতিবারই মনে মনে বলেছে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি, আর যেন আমাকে বাপেব ঘরে ফিরতে না হয়।' কিন্তু দো সাল, চার সাল পরপরই ও ঘরিয়া চাঁপিয়াকে ফিরে আসতে হয়েছে।

এবার হল সপ্তম বার। ঘরটা দেখতে দেখতে মনে মনে হাত জোড করে রামচন্দ্রজি এবং কিষুণজির

উদ্দেশে চাঁপিয়া প্রার্থনা জানায়, এই যেন তার শেষ যাওয়া হয়।

নাটোয়ার তাড়া লাগায়, 'কি রে, দাঁড়িয়ে গেলি যে? দের নায় করনা—'

'নায়—' মুখ ফিরিয়ে নাটোয়ারের পিছু পিছু আবার হাঁটতে শুরু করে চাঁপিয়া। যেতে যেতে লক্ষ করে, হট্টাকট্টা চেহারার আধবুড়ো নাটোয়ারের সাজের বহরও আজ কম নয়। এমনিতে তার যা কাজ তাতে একরকম সারা দিনই মাটি মেখে পিরেত সেজে থাকে। কিন্তু আজ এর মধ্যেই সারা গায়ে প্রচুর তেল মেখে 'নাহানা' সেরে নিয়েছে নাটোয়ার। মাথায় এত কড়ুয়া তেল ঢেলেছে যে এখনও কপাল বেয়ে বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে। তার পরনে ক্ষারে-কাচা সফেদ ধুতি আর লাল জামা। পায়ে কাঁচা চামড়ার ভারি জুতো, কানে পেতলের মাকড়ি। কাঁধের ওপর নতুন কোরা গামছা।

দোসাদটোলা পেছনে ফেলে গঞ্জু আর ধাঙড়টোলার ভেতর দিয়ে দু'জনে এগিয়ে যেতে থাকে। এর মধ্যে মনপথল গাঁয়ের যাদেরই ঘুম ভেঙেছে দুলহনের সাজে চাঁপিয়াকে দেখে তারা তাজ্জব বনে যায়। জিজ্ঞেস করে, 'কা রে চাঁপিয়া, নয়া মরদ মিলা হো?'

মুখে কিছু বলে না চাঁপিয়া। চোখ নামিয়ে আস্তে মাথা নাড়ে শুধু।

'এবার তা হলে সাতঘরিয়া হবি!'

চাঁপিয়া চুপ।

মনপথলের বয়স্ক মানুষজনেরা তার হিতাকাঙ্ক্ষী। তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পরামর্শ দেয়, 'দেখিস, এই শাদিটা যেন টুটে না যায়।'

এর আগে ছ ছ'বার শাদি হয়েছে চাঁপিয়ার। ছ'বারই ভেঙে গেছে। মনে মনে তার ইচ্ছা, শ্মশানে না চড়া পর্যন্ত এই শাদি যেন অটুটই থাকে। হো রামজি, হো কিষুণজি, তেরে কিরপা।

একসময় দু'জনে মনপথল গাঁ থেকে বেরিয়ে সোজা পাক্কীতে এসে ওঠে, তারপর সুরথপুরা হাটের দিকে যেতে থাকে। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যখন আসছিল তখন দু'জনে আগে পিছে হাঁটছিল। যে মরদের সঙ্গে এখনও শাদি হয়নি, গাঁয়ের মানুষের চোখের সামনে তার গা ঘেঁষে চলা যায় নাকি? শরম লাগে না? এই শরমটা নাটোয়ারের মধ্যেও কাজ করছিল খুব সম্ভব। গাঁয়ের ভেতরে বরাবর চাঁপিয়ার কাছ থেকে খানিকটা ফারাক রেখে চলেছে সে। কিন্তু পাকা সড়কে জান-পয়চান কেউ নেই। এখানে চাঁপিয়ার পাশাপাশি হাঁটতে অসুবিধা কোথায়?

চলতে চলতে বার বার সঙ্গিনীর দিকে তাকায় নাটোয়ার। চাঁপিয়াও তার সঙ্গীকে আড়ে আড়ে দেখতে থাকে। এভাবে মাঝে মাঝে দু'জনের চোখাচোখি হয়ে যায়।

হাজার হোক, চাঁপিয়া একটা রক্তমাংসের জীবন্ত আওরত। মনুষ্যজাতি সম্পর্কে তার বিপুল অভিজ্ঞতা। নাটোয়ারের তাকানো দেখে এক লহমায় বুঝে নেয়, তাকে 'পুরুখ' বা পুরুষটার মনে ধরেছে।

চাঁপিয়ার মনে পড়ে, প্রথম বার ছাড়া বাকি পাঁচ বারই এইভাবে একটা করে পুরুষের সঙ্গে সুরথপুরার হাটে গেছে সে। প্রথম বার যেতে হয়নি, তার কারণ তখন বাপ বেঁচে ছিল। সে-ই চারপাশের দশ-বিশটা তালুক চষে মনপসন্দ একটা ছেলে খুঁজে এনে তার শাদি দেয়। বিয়ের পর মনপথল থেকে আট 'মিল' উত্তরে হাথিয়াগঞ্জে মরদের ঘর করতে চলে যায় চাঁপিয়া।

জীবনের প্রথম 'পুরুখ' মুঙ্গীলাল ছিল বড়ই সাদাসিধে ভালমানুষ গোছের আদমী। সংসারে সে আর তার একটা বুড়ি পিসি ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। এক রাজপুত ক্ষত্রিয়ের জমিতে মুঙ্গীলাল ছিল কামিয়া অর্থাৎ খরিদী কিষাণ। তার দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদা জমিমালিকের কাছ থেকে কোরা কাগজে অঙ্গুঠার ছাপ মেরে টাকা করজ নিয়েছিল। সে টাকা নিজে আর শোধ করে যেতে পারেনি। ফলে বাকি জীবন দাদাকে মালিকের জমিতে স্রেফ পেটভাতায় ঘাড় গুঁজে খেটে যেতে হয়েছে। দাদার পর বাপ মৃত্যু পর্যন্ত ওই মালিকেরই জমি চষে গেছে। তারপর মুঙ্গীলালের পালা। কিন্তু সুদে-আসলে করজের টাকা ফুলে ফেঁপে এতই বিরাট হয়ে উঠেছে যে তিনপুরুষ ধরে অবিরত খেটেও শোধ করা যাচ্ছে না।

শাদির পর চাঁপিয়াকেও মালিকের খেতির কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল মুঙ্গীলাল। দু'জনে খেটে যত তাড়াতাড়ি কামিয়াগিরি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, এই ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু দুটো সাল ঘুরতে না ঘুরতেই দশ দিনের 'বোখারে' হঠাৎ মরে গেল মুঙ্গীলাল। মরদের মৃত্যুশোক সামাল দিয়ে উঠতে না

উঠতে মালিকের মুনশি আধবুড়ো পিঠবাঁকা চিমসে চেহারার টেড়ারাম সহায় একদিন রাতে তার কাছে এসে ফিসফিসিয়ে একটা প্রস্তাব দেয়। সে তাকে 'রাখনি' (রক্ষিতা) করতে চায়। এমনি এমনি মুফতে নয়। রীতিমতো সপরনার (সাজসজ্জা) জিনিস দেবে। নয়া শাড়ি দেবে, চাঁদির গয়না দেবে, এ ছাড়া পাইসা-রুপাইয়া তো আছেই।

অচ্ছুৎ ভূমিদাসদের ঘরের যুবতী মেয়েদের মালিক এবং তাদের লোকেরা চিরদিন ভোগদখল করে এসেছে। আবহমানকাল ধরে এ অঞ্চলে এ একটা চালু প্রথা। এর বিরুদ্ধে কেউ কখনও মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। কিন্তু চাঁপিয়া অন্য ধাতের তেজী মেয়ে। তা ছাড়া মুঙ্গীলালের শোকটা তখনও তার মনে বড়ই টাটকা। আচমকা তার মাথায় কী যেন হয়ে যায়। 'বুড়হা গিধ, তুহারকা মুহ্‌মে থুক থুক থুক—' গালাগাল দিয়ে এবং টেড়ারামের মুখে গুনে গুনে তিন বার থুতু ছিটিয়েই চাঁপিয়ার হুঁশ হয়, হাথিয়াগঞ্জে আর থাকা ঠিক হবে না। টেড়ারাম তাকে নির্ঘাত খুন করে ফেলবে।

এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে চাঁপিয়া রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করে এবং রাতারাতি খেতির পর খেতি পেরিয়ে সোজা মনপথলে বাপের ঘরে ফিরে আসে।

বাপ গণপত দোসাদ কমজোর মানুষ। সে ছিল মরশুমী কিষাণ। ধান কি গেঁহু চাষের সময় আর ফসল কাটার মরশুমে দেড় আর দেড় মোট তিনটে মাস সে কাজ পেত। বাকি ন'মাস দক্ষিণ কোয়েলের পাড়ে যে মাইলের পর মাইল জুড়ে জঙ্গল পড়ে আছে সেখান থেকে সুথনি (এক জাতীয় কন্দ), রামদানা, মেটে আলু বা মহুয়ার গোটা তুলে এনে খেয়ে জীবন বাঁচাত! মুঙ্গীলালের সঙ্গে শাদির আগে বাপের পিছু পিছু খাদ্যের খোঁজে কতবার সে ওই জঙ্গলটায় গেছে। হাথিয়াগঞ্জ থেকে ফেরার পর রোজই সেখানে যেতে লাগল চাঁপিয়া।

দিন কাটে যাচ্ছিল। কিন্তু চাঁপিয়ার বরাত এমনই, মুঙ্গীলালের মৃত্যুর পর ছ'মাস ঘুরল না, বাপটা মরে ফৌত হয়ে গেল।

দুবলা হোক, বুড়হা হোক, হাভামজা হোক, তবু মাথার ওপর একটা বাপ ছিল। সে চোখ বোজার পর রাতের অন্ধকারে কারা যেন ঘরের বেড়া আঁচড়াত আর চাপা গলায় বলত, 'দরবাজা খোল চাঁপিয়া। তোর জন্যে লাড্ডুয়া এনেছি, বুন্দিয়া এনেছি, চাঁদির কবণফুল এনেছি—'

বাপ মরার পর থেকেই শিয়রের কাছে একটা বাঁকানো দা নিয়ে শুত চাঁপিয়া। দা'টা বাগিয়ে বিছানায় উঠে বসে সে গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাত, 'ভাগ যা চুহাকা ছৌয়ারা। নইলে জানে খতম হয়ে যাবি।'

কিন্তু উৎপাতটা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। অতিষ্ঠ চাঁপিয়া শেষ পর্যন্ত মনপথলের 'পঞ্চ'-এর কাছে গিয়ে নালিশ জানায়। 'পঞ্চ'-এর যে মাথা সে হল গঞ্জুটোলার বুড়ো ধানপত। সব শুনে সে বলেছিল, যুবতী ছোকরির অরক্ষিত থাকা ঠিক নয়। চাঁপিয়ার উচিত তুরন্ত আরেক বার শাদি করে ফেলা। বেশির ভাগ 'পুরুখে'র (পুরুষের) মধ্যেই রয়েছে একটা করে জানবর। চাঁপিয়ার শরীরে এবং মনে তাকত কতটুকু? জানবরেরা তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

ধানপত ভাল লোক, বহোত সাচ্চা আদমী। তার কথাগুলো ফেলে দেওয়ার মতো নয়। চাঁপিয়া বলেছিল, 'লেকেন আমি একঘরিয়া রাণ্ডী, আমাকে কে শাদি করবে?'

ধানপত বলেছিল, 'কা তাজ্জবকা বাত! আমাদের অচ্ছুতিয়াদের ঘরে একঘরিয়াদের নতুন শাদি হয় না! কেত্তে দোঘরিয়া চারঘরিয়া দশঘরিয়া চুমৌনা (সাঙ্গা) করে সমসার করছে।'

কথাটা চাঁপিয়ার অজানা নয়। দোসাদ সমাজের যাবতীয় প্রথাই সে জানে। নিজের দ্বিতীয় বার শাদির প্রসঙ্গে ঠিক ওভাবে সে বলতেও চায়নি। দ্রুত শুধরে নিয়ে সে এবার বলেছে, 'জানি চাচা। লেকেন আমি একটা লেড়কী, মাথার ওপর বাপ নেই। কোঈ ভি নায়। লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে কি বলতে পারি আমাকে শাদি কর! শরমকা বাত।'

'তুই রাজি থাকলে বল। আমি ব্যবস্থা করব।'

'তোমার যা আচ্ছা মনে হয়, কর।'

কয়েক দিনের মধ্যেই পাশের তালুক দুধলিগঞ্জ থেকে আধবুড়ো এক দোসাদকে এনে হাজির করেছিল ধানপত। লোকটার নাম চৌপটলাল। দু'জনের আলাপ-টালাপ করিয়ে দিয়ে ধানপত

জানিয়েছিল, চৌপট পাক্কীতে সাইকেল রিক্‌শা চালায়। আগে দু'বার বিয়ে করেছে। এক বউ মারা গেছে বোখারে, আরেক বিয়ে 'ছুট' হয়ে গেছে। ছেলেপুলে নেই, ঝাড়া হাত-পা লোক। চাঁপিয়াও তা-ই। এই চুমৌনা হলে দু'জনের পক্ষেই ভাল।

চাঁপিয়া মুখ নামিয়ে ধানপতকে শুধিয়েছে, 'চাচা, রিক্‌শা গাড়িয়াটা কি ওর নিজের?'

চৌপটলাল প্রশ্নের উত্তরটা ধানপতকেই দিয়েছে, 'ওকে বলে দাও চাচা, ওটা মালিকের। রোজ চার রুপাইয়া তাকে কেরায়া দিতে হয়। তারপর যা থাকে সেটা আমার কামাই।' একটু থেমে ফের বলেছে, 'আউর একগো বাত ধানপত চাচা।'

ধনাপত জানতে চেয়েছে, 'কা বাত ?'

'তোমাদের লেড়কীকে জানিয়ে দাও, আমার কামাইয়ের দিকে যেন নজর না দেয়। চুমৌনা হলে নিজের পেটের দানা নিজেকেই ওর জুটিয়ে নিতে হবে। আমার পেটের সওয়াল আমার, ওর পেটের সওয়াল ওর। রাজি হলে এ চুমৌনা হবে।'

'লেকেন তোর ঘবে গিয়ে নয়া জায়গায় চাঁপিয়া নিজের ব্যওস্থা কী করে করবে?'

'সেটা আমি দেখব। রাজি কিনা তুমি পুছে নাও—'

ধানপত উত্তর দেওয়ার আগেই চাঁপিয়া বলে উঠেছে, 'আমি রাজি।' আসলে একা একা থাকতে তার সাহস হচ্ছিল না, একটি পুরুষের আশ্রয় তার প্রয়োজন ছিল।

এবার সোজাসুজি তার দিকে তাকিয়ে চৌপটলাল বলেছে, 'তা হলে কাল সুবে সাফা কাপড় টাপড়া পরে থেক। আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

ধানপত শুধোয়, 'কোথায় নিয়ে যাবি?'

চৌপটলাল বলে, 'সুরথপুরার হাটিয়ায়।'

'সেখানে কী?'

চৌপটলাল যা উত্তর দেয় তা এইরকম। তখন চাষের মরশুম। চারপাশের দশ বিশটা গাঁয়ের যত জমির মালিক আছে, তাদের সবার খেতমজুর দরকার। সুরথপুরার হাটিয়ায় এ অঞ্চলের তাবৎ ভূমিহীন মেয়েপুরুষ এই সময়টা গিয়ে জড়ো হয়। জমির মালিকেরা তাদের ভেতর থেকে শক্তসমর্থ দেখে মজুর বেছে নিয়ে যায়। তেমন তেমন খাটিয়ে হলে মালিকেব কাছে সালভর কাজ পাওয়া যায়। কাজের বদলে মেলে চাল, গেঁহু বা বজরা আর নগদ কিছু পাইসা। চাঁপিয়াকে যদি পসন্দ করে কোনো জমির মালিক কাজ দেয়, চৌপটলাল তাকে নিজের ঘরে নিয়ে তুলবে।

ধানপতের সন্দেহ হয়েছিল। সে শুধিয়েছে, 'তোর মতলব কী রে? চাঁপিয়াকে রাখনি বানিয়ে ঘবে বসাতে চাস?'

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে চৌপটলাল বলেছে, 'নায় নায় চাচা। ওরকম পাপকা চিন্তা মনে এনো না। তোমাদের লেড়কী খেতমালিকের কাম পেলেই চুমৌনার ব্যওস্থা করে ফেলব। তারপর ওকে ঘরে নিয়ে যাব। তবে একটা কথা—'

'কা?'

'কাম না পেলে কিন্তু চুমৌনা হবে না। তোমাদের লেড়কীকে সুরথপুরার হাটিয়া থেকে ফিরে আসতে হবে।'

ধানপতকে বিষণ্ণ দেখিয়েছিল। চাঁপিয়ার দিকে ফিরে সে শুধিয়েছে, 'কা রে, রাজি? ভাল কবে ভেবে দ্যাখ।'

চাঁপিয়া বলেছে, 'ভাবনার কিছু নেই। আমি রাজি।'

কথামতো পরের দিন ভোরে কোয়েলের হাঁটুভর জলে 'নাহানা' চুকিয়ে সেজেগুজে গয়না পরে নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে থেকেছে চাঁপিয়া। মুঙ্গীলালের সঙ্গে পয়লা শাদির সময় বাপ অনেক চাঁদির গয়না দিয়েছিল। সে সব নিয়ে আসতে পারেনি সে। এক কাপড়ে তাকে মুঙ্গীলালদের গাঁ থেকে পালিয়ে আসতে হয়। পরে অবশ্য বুড়ি পিসিশাশুড়ি তার কাপডজামা গয়নাগাটি, সব কিছু নিজে এসে দিয়ে গেছে।

যাই হোক, সূরয উঠবার আগেই চৌপটলাল এসে চাঁপিয়াকে সঙ্গে করে সুরথপুরার হাটে নিয়ে

গিয়েছিল। সেখানে এক খেতমালিক তাকে দেখামাত্র পছন্দ করে ফেলে এবং সালভর কাজের ব্যবস্থা পাকা হয়ে যায়।

চৌপটলাল মরদকা ছৌয়া। তার বাত হাতীকা দাঁত। ওই হাটিয়াতেই অচ্ছুতিযাদের বামহন ডেকে চুমৌনা সেরে নয়া ঘরবালীকে নিয়ে দুধলিগঞ্জে চলে যায়।

চৌপটলালের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনের আয়ু মোট চার সাল। এই ক'টা বছর মোটামুটি ভালই কেটেছে। শর্তানুযায়ী চৌপটলাল আর চাঁপিয়া নিজের নিজের পেটের দানা যোগাড় করত। তাদের জীবনে কোনোরকম ওঠানামা ছিল না। রোজ ভোরে উঠে বাসি রোটি কি পানিভাত্তা (পান্তাভাত) খেয়ে চুলা ধরিয়ে কালোয়া (দুপুরের খাবার) বানিয়ে নিত চাঁপিয়া। দুটো তোবড়ানো সিলভারের কটোরায় কালোয়া ভরে একটা দিত চৌপটলালকে, একটা নিত নিজে। তারপর দু'জনে চলে যেত দু'দিকে। চাঁপিয়া মালিকের খামারে কিংবা জমিতে। চৌপটলাল যেত সাইকেল রিক্‌শা নিয়ে পাক্কীতে। সারাদিন পর রাত্রিবেলা দু'জনের দেখা হত। গরম গরম মাড়ভাত্তা বা লিট্টি বানিয়ে খাওযা দাওয়া চুকিয়ে ঘন হয়ে পাশাপাশি শুয়ে ঘরের ফুটো ছাউনির ফাঁক দিয়ে আকাশ আর তারার মেলা দেখতে দেখতে কত যে গল্প করত চৌপটলাল!

চাঁপিয়ার এই চার বছরের বিবাহিত জীবনের একটা বড় ঘটনা হল এক মরা বাচ্চার জন্মদান। এটুকু বাদ দিলে মনে হচ্ছিল, দিন এভাবেই কেটে যাবে।

কিন্তু চার সাল বাদে এদিকে এমন মারাত্মক খরা হল যে মাইলের পর মাইল সব চাষের জমি টুটেফুটে গেল। না এক ফোঁটা মেঘ, না এক বুঁদ বারিষ। আকাশের চেহারা দেখে এদিকে আদৌ কোনোদিন যে বৃষ্টি নামবে, এমন ভরসা পাওয়া গেল না। জল না হলে চাষও নেই। জমিমালিক জানিয়ে দিল, সে আর চাঁপিয়াকে রাখতে পারবে না।

কাজটা চলে যাওয়ার পর চৌপটলাল নিরানন্দ মুখে বলেছিল, 'মননে বহোৎ দুখ হচ্ছে। তবু কথাটা তোকে বলতেই হয়।'

'কা?' ভয়ে ভয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছে চাঁপিয়া।

'তুই মনপথলে ফিরে যা।'

'ফিরে যাব!'

'হাঁ।' বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়েছে চৌপটলাল, 'তোর কাম নেই, কামাই বন্ধ। এই খরার সময় মানুষের পয়সা নেই, কেউ রিক্‌শ গাড়িয়ায় চড়তে চায় না। দিনভর আমার যা কামাই তাতে আমারই চলে না। তুই থাকলে দু'জনেই ভুখা মরে যাব।'

অগত্যা কাটান-ছাড়ান হয়ে গেল। নিজস্ব জামাকাপড় আর চাঁদির গয়নাগুলো নিয়ে চোখের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে আবার মনপথলে ফিরে এল চাঁপিয়া।

বাপের ঘরটা অনেকদিন ফাঁকা পড়ে ছিল। মানুষজন না থাকায় হাঁটুভর ধুলোবালি আর জঞ্জাল জমে উঠেছিল সেখানে। সাওয়ান কাঠের খুঁটিতে ঘুণ ধরে এমন ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল যে ঘরটা হুড়মুড় করে যে কোনো সময় পড়ে যেতে পারত। জঞ্জাল সাফসুতরো করে, জঙ্গল থেকে কাঠ জুটিয়ে এনে খুঁটিগুলো বদলে নিয়েছিল চাঁপিয়া।

এরপর একটা বছর বড়ই কষ্টে কেটেছে তার। চৌপটলালদের ওখানেই শুধু খরা হয়নি, মনপথলের চারপাশে চল্লিশ পঞ্চাশটা তালুকের তাবৎ জমি রোদে জ্বলে গিয়েছিল। বারিষের অভাবে চাষবাস যখন বন্ধ তখন চাঁপিয়ার মতো মানুষদের কাজও বন্ধ। কাজেই দক্ষিণ কোয়েলের মরা খাতের দু'ধারের জঙ্গলটাই ওদের একমাত্র ভরসা। সেখান থেকে রোজ মহুয়ার গোটা, রামদানা আর সুথনি যোগাড় করে এনে সে সব সেদ্ধ করে খেয়ে কিভাবে যে পুরা একটা সাল কাটিয়ে দিয়েছে তা একমাত্র চাঁপিয়াই জানে। তার জীবনীশক্তি যে প্রবল, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। নইলে এই সব কচুঘেঁচু আগাছা খেয়ে কেউ বেঁচে থাকত পারে!

এক বছর বাদে আকাশের দেওতা মুখ তুলে চাইল। জেঠ মাহিনা শেষ হতে না হতেই চারপাশ ঘন কালো-মেঘে ছেয়ে গেল। চাঁপিয়া আকাশের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে মাথায় ঠেকিয়েছে আর বলেছে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি, তেরে কিরপা। কাম মিললে ভাত খেতে পাব। এক সাল ভাতের

মুখ দেখি না।'

চাঁপিয়া ঠিক করে ফেলেছিল, দু-এক রোজের ভেতর সুরথপুরার হাটে গিয়ে সেই কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় বসবে। ওখান থেকেই চারপাশের জমিমালিকেরা মরশুমি কিষান জুটিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু যেদিন সে হাটে যাবে তার আগের দিন পাশের গাঁ হাতিয়াড়া থেকে জগন দোসাদ এসে হাজির। সুরথপুরার হাটে ধানচালের আড়তে সে মাল বয়। জগন বলেছিল, 'হামনি শুনা হ্যায়, তুহারকা ঘরমে মরদ নেহী। চৌপটলালের সাথ তোর শাদি টুটে গেছে।'

জগন দোসাদকে ছোটবেলা থেকেই চিনত চাঁপিয়া। বাপ বেঁচে থাকতে প্রায়ই মনপথলে আসত সে। চাঁপিয়া ঘাড় কাত করে জানিয়েছিল, 'হাঁ।'

'আমার ঘরেও জেনানা নেই। তোর মন হলে আমার ঘরে আসতে পারিস। মগর—'

জগন দোসাদের প্রস্তাবটা বুঝতে অসুবিধা হয় না চাঁপিয়ার। একটা তাগড়া তাকতওলা জোয়ান মরদ যেচে এসে তাকে বিয়ের কথা বলছে শুনেও বুকের ভেতরটা উথলপাথল হয়ে ওঠে না। শান্ত চোখে জগনের দিকে তাকিয়ে নিরুত্তাপ গলায় সে শুধিয়েছে, 'মগর কা?'

জগন এবার যা বলেছে তা এইরকম। চাঁপিয়াকে সে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে পারে একটিমাত্র শর্তে। কামাই করে নিজে পেটের দানা তাকে জোটাতে হবে।

এমন শর্ত চাঁপিয়ার অজানা নয়। এই কড়ারেই আগের বিয়েটা হয়েছে তার।

সে বলেছে, 'ঠিক হ্যায়।' এ দেশের নিয়ম এবং সংস্কার অনুযায়ী চাঁপিয়া বুঝে নিয়েছে, সব ঔরতের জন্যই একটা করে পুরুষের প্রয়োজন। সে খেতে পরতে না দিক, অন্য নিরাপত্তার জন্যও তাকে একান্ত দরকার। মেয়েদের পক্ষে একা বেওয়ারিশ পড়ে থাকা খুবই বিপজ্জনক।

জগন এবার খুশি হয়ে বলেছে, 'এহী সাল আসমানে ঘটা দেখে খেতিমালিকেরা সুরথপুরার হাটিয়ায় কিষান নিতে আসছে। ওখানে গেলেই কাম জুটে যাবে।'

'জানি। আমি কাল সুরথপুরা যাব।'

জগনের উৎসাহ এবার দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সে বলেছে, 'কাল সুবে তোর এখানে চলে আসব। হামনিলোগন একসাথ সুরথপুরায় চলে যাব।'

'ঠিক হ্যায়।'

'তোর কাম জুটলে তোকে আমার ঘরে নিয়ে যাব।'

পরের দিন ভোরে সূরয উঠবার আগে মনপথলের তাবৎ মানুষ দেখল চাঁপিয়া আরো একবার সেজেগুজে হাতিয়াড়া গাঁয়ের জগন দোসাদের পিছু পিছু সুরথপুরার হাটে চলেছে।

কড়াইয়া গাছের তলায় গিয়ে বসতে না বসতেই কাজ জুটে গিয়েছিল চাঁপিয়ার। ফলে চৌপটলাল যা যা করেছে এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। জগন কোত্থেকে এক টিকিওলা পণ্ডিত ধরে এনে নগদ পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়ে বিয়েটা চুকিয়ে ফেলে। তারপর চাঁপিয়াকে নিয়ে সিধা নিজের ঘরে চলে যায়।

চাঁপিয়ার এই তিন নম্বর বিয়ের আয়ু পুরো দু'সালও নয়। পয়লা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পেটে ছৌয়া এসে গেল। কিন্তু সে জন্য কাজ বন্ধ করা যায় না। নায় কাম তো নায় খোরাকি। কাজেই ন'মাস পর্যন্ত বাচ্চা পেটে নিয়ে মালিকের খেতিতে কাজ করে গিয়েছিল চাঁপিয়া। তাতে যা হওয়ার তাই হয়েছে। একদিন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। রক্তাক্ত বেহুঁশ চাঁপিয়াকে একটা গৈয়া গাড়িতে তুলে বিশ মাইল তফাতের এক টৌনে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তিন মাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যখন সে বেরুল, শরীর বেজায় কমজোর হয়ে গেছে। পেটের ছৌয়াটা তো আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালের ডাগদরসাব জানিয়ে দিয়েছে, তার আর ছৌয়া হবে না। সেজন্য খুব একটা দুর্ভাবনা ছিল না। চাঁপিয়ার ভয় তার শরীরটাকে নিয়ে। এই শরীর যদি একবার ভেঙে পড়ে, কাজকর্মের অযোগ্য হয়ে যায়, ভুখা মরে যেতে হবে।

হাসপাতাল থেকে বেরুবার পর সত্যি সত্যি বড় দুব্‌লা হয়ে গিয়েছিল চাঁপিয়া। খেতির কাজ তো দূরের কথা, একসঙ্গে দশ পা চলতে তার হাঁফ ধরে যেত। ফলে জমির কাজটা তার গেল। আর যে আওরত নিজের পেটের দানা জুটিয়ে নিতে পারে না, তাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবার মতো সৌখিন লোক জগন নয়। কাজেই চাঁপিয়ার তিন নম্বর বিয়েটাও টিকল না। নিজস্ব কাপড়জামা এবং অন্যান্য

জিনিসপত্র গুছিয়ে আবার মনপথলে ফিরে এল সে।

এরপর আরো তিন বার সেজেগুজে তিনজনের পিছু পিছু সুরথপুরার হাটিয়ায় গেছে চাঁপিয়া—সেই একই শর্তে। অর্থাৎ খেতিব কাজ করে পেটের দানা জোটাতে পারলে তবেই শাদি হবে। কিন্তু তার চার পাঁচ এবং ছ' নম্বর বিয়েও বেশিদিন টেকেনি। কোনোটা চার সাল, কোনোটা বা এক সাল। চার নম্বর বিয়েটা ভাঙল দক্ষিণ কোয়েলের বাড়ের জন্য। বন্যায় চাষের জমি ডুবে যাওয়ায় জমিমালিক কাজ থেকে তাকে ছাড়িয়ে দেয়। সুতরাং বিয়েও বরবাদ। পাঁচ নম্বর বিয়েটা চৌপট হল মরদ মরে যেতে। ছ নম্বর বিয়ে ভাঙল অজম্মার জন্য।

তারপর এই পড়তি বয়সে চেচকে-ভোগা অশক্ত দুর্বল ভাঙা শরীরে জীবনের সাত নম্বর মরদ নাটোয়ারের সঙ্গে সুরথপুরায় চলেছে চাঁপিয়া।

আচমকা পাশ থেকে নাটোয়ারের গলা কানে আসে, 'এ ঔরত--'

এতক্ষণ দূরমনস্কর মতো হেঁটে যাচ্ছিল চাঁপিয়া। চমকে সে ঘাড় ফেরায়। বলে, 'কা?'

'সাফ সাফ দো-চারগো বাত তুহারকা সাথ হয়ে যাক।'

চাঁপিয়া উত্তর দেয় না। তবে কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে থাকে।

এদিকে ঝাঁ ঝাঁ করে জেঠ মাহিনার বেলা চড়ে যাচ্ছে। রোদের ঝাঁঝ দ্রুত চড়তে থাকে। বাস-ট্রাক, সাইকেল রিক্‌শা, গৈয়া এবং ভৈসা গাড়ির চলাচলও অনেক বেড়ে গেছে। হাইওয়েতে লাল ধুলো উড়িয়ে চাঁপিয়াদের পাশ দিয়ে সেগুলো একের পর এক বেরিয়ে যেতে থাকে। এখন রাস্তায় মানুষজনও প্রচুর।

নাটোয়ার বলে, 'আমার পেটে একেবারে দশগো জানবরের খিদে।'

চাঁপিয়া অবাক হয় না। নাটোয়ারের আগে যে ক'জনের সঙ্গে সে সুরথপুরার হাটিয়ায় গেছে তারা প্রায় সবাই এ কথা বলেছে। পেটে জানোয়ারের খিদে নিয়ে সবাই তাকে শাদি করতে আসে। যাই হোক, চাঁপিয়া কিছু বলে না।

তীক্ষ্ণ চোখে নাটোয়ার এবার চাঁপিয়ার দিকে তাকায়। তার কথা আওরতটার কানে ঠিক ঢুকেছে কিনা, সে সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ হয়। সে শুধোয়, 'শুনা হামনিকা বাত?'

নিচু গলায় চাঁপিয়া বলে, 'শুনা হ্যায়।'

'আমার যা কামাই তাতে আমার পেটটাই শুধু চলে। সুরথপুরায় গিয়ে কাম তোকে জোটাতেই হবে।' নাটোয়ার শেষ কথাগুলোর ওপর যথেষ্ট জোর দেয়।

এ জাতীয় কথাও চাঁপিয়ার কাছে নতুন কিছু নয়। শান্ত মুখে সে বলে, 'জানি।'

এবার ডান হাতের আঙুল নেড়ে উথলে-ওঠা স্বরে নাটোয়ার বলে, 'তব্ হাঁ—'

ঈষৎ কৌতূহল নিয়ে চাঁপিয়া সঙ্গীর দিকে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, 'কা?'

'তোর কামটা হয়ে গেলে একটা শাদির মতো শাদি করব। সবাই একেবারে তাজ্জব বনে যাবে।'

এই বয়েসে জীবনের সাত নম্বর শাদিতে কতটা ঘটা হওয়া সম্ভব, চাঁপিয়া ভেবে পায় না। তবু নাটোয়ারের এই উচ্ছ্বাস একেবারে মন্দ লাগে না। বুকের ভেতর ঠাণ্ডা ঝিমানো রক্ত একটু যেন ছলকেই ওঠে তার।

হাঁটতে হাঁটতে চাঁপিয়ার কাপড়চোপড় লক্ষও করে নাটোয়ার। শাড়ি আর জামা যদিও পরিষ্কার, তবে বহুকালের পুরনো। নানা জায়গা পিঁজে পিঁজে গেছে, দু-চারটে তালিও চোখে পড়ে। নাটোয়ার জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'নায় নায়, এইী কপড়াউপড়া চলবে না। সুরথপুরায় গিয়ে দুকান থেকে অ্যায়সা জগমগ জগমগ কাপড়া আউর জামা কিনে দেব যে লোকের আঁখ ধাঁধিয়ে যাবে—হাঁ।'

আগে আর এ জাতীয় কথা কেউ কখনও বলেনি। আশায় সুখে এবং উত্তেজনায় চাঁপিয়ার বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে। নাটোয়ার তার উত্তেজনাটা আরেকটু উসকে দেয়। সে ফের বলে, 'বিলাইতি পাউডেল (পাউডার), সিনুর (সিঁদুর), খশবুদার তেল ভি কিনে দেব। আর কী কী দেব জানিস?'

'কী?'

'চাঁদির বিছুয়া, করণফুল, পৈড়ী, কজ্বৌটি—'

বাধা দিয়ে মৃদু গলায় চাঁপিয়া বলে, 'আমার তো এসব আছে। আবার নতুন করে—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিতে দিতে নাটোয়ার বলে, 'তুই আমার ঘরে নয়া যাচ্ছিস। তোকে কিছু দিতে আমার ইচ্ছা করে না? হাঁ কি নায়—বাতা, বাতা—'

চোখ নামিয়ে চাঁপিয়া বলে, হাঁ।'

'তোকে নাজুক সুনহলা দুলহানিয়া বানিয়ে ঘরে নিয়ে তুলব। বিলকুল পরী য্যায়সা—'

চড়া রঙে চাঁপিয়ার চোখের সামনে ঝকমকানো স্বপ্নের একটি ছবি আঁকতে আঁকতে নাটোয়ার তাকে নিয়ে একসময় সুরথপুরায় পৌঁছে যায়।

সুরথপুরা হাটের দক্ষিণ দিক ঘেঁষে যে বার চোদ্দটা কড়াইয়া গাছ গা-জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে তার তলায় বরাবর যেমন হয়, এবারও তেমনি মরশুমি ভূমিহীন খেতমজুররা জমা হয়েছে। তা পুরুষ এবং আওরত মিলিয়ে দু-আড়াই শ লোক তো হবেই। মেয়েমানুষগুলোর বেশির ভাগেরই কোলে দু-একটা করে বাচ্চা ঝুলছে।

নাটোয়ার আর চাঁপিয়া সিধা সেখানে চলে আসে। খেতমজুরদের জটলাটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে নাটোয়ার বলে, 'তুই ওখানে গিয়ে বোস।'

চাঁপিয়া শুধোয়, 'তুমি?'

নাটোয়ার বলে, 'আমি আর বসব না। দুকান থেকে চায়-পানি খেয়ে আসি।' তারপর আশ্বাস দিয়ে বলে, 'ডর নেই, একাই খাব না। তোর জন্যেও নিয়ে আসব।'

নাটোয়ার দাঁড়ায় না, হাটের যে দিকটা দোকানপাট দিয়ে সাজানো এবং মানুষের ভিড়ে জমজমাট, সিধা সেখানে চলে যায়। আর আস্তে আস্তে চাঁপিয়া খেতমজুরদের পাশে গিয়ে বসে।

তার চারপাশে যারা আছে তাদের প্রায় সবাইকেই চেনে চাঁপিয়া। এদের কেউ দোসাদ, কেউ গঞ্জু, কেউ ধোবি, কেউ মুসহর। মোট কথা জাতপাতের দিক থেকে পুরাপুরি অচ্ছুৎ। এই জল-অচলরা ছাড়াও আর যারা আছে তারা হল আদিবাসী মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাটের এই অংশটা ফাঁকা ফাঁকা, লোকজনের ভিড় কম। আসল হাট হল খানিকটা তফাতে— উত্তর দিকটায়। সেখান থেকে ভনভনে মাছির মতো একটানা আওয়াজ আসছে।

আবছাভাবে নিজের চারপাশের খেতমজুরদের দিকে একবার তাকায় চাঁপিয়া। পরক্ষণেই তার নজর দিয়ে পড়ে সামনের চালাঘরগুলোর তলায়। হাটের চালা হলেও ওখানে আজকাল দোকান-টোকান বসে না, ওগুলো বাতিল করে হাটটা দূরে সরে গেছে।

পরিত্যক্ত চালাগুলোর তলায় এই মুহূর্তে এ অঞ্চলের খেতমালিক এবং তাদের লোকজনেরা বসে আছে। বোঝা যায়, এখনও মজুর বাছাবাছি শুরু হয়নি।

দুব্‌লা শরীরে মনপত্থল থেকে এতটা হেঁটে আসার জন্য হাত-পা যেন ভেঙে আসছিল চাঁপিয়ার। তার ওপর এখন পর্যন্ত পেটে কিছুই পড়েনি। খ্যাপা জন্তুর মতো খিদেটা ধারাল দাঁতে পাকস্থলী যেন ক্রমাগত ফেঁড়ে ফেঁড়ে দিচ্ছে। নাটোয়ার অবশ্য ভরসা দিয়েছে, তার জন্য চায়-পানি নিয়ে আসবে। দেখাই যাক।

খেতমজুররা এধারে ওধারে কথা বলে যাচ্ছে। বাচ্চাকাচ্চাগুলো কেউ চিল্লাছে, কেউ লাল ধুলো মেখে হুটোপাটি করছে। চাঁপিয়া কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না। এখন তার একটাই চিন্তা। যেভাবেই হোক, খেতির কাজ তাকে পেতেই হবে। মনে মনে বিড়বিড়িয়ে সে অনবরত বলতে থাকে, 'হো রামজি, হো কিষুণজি, অব তেরে কিরপা।'

আচমকা পেছন থেকে কে যেন ডেকে উঠে, 'কৌন—চাঁপিয়া?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় চাঁপিয়া। হাত দশেক ফারাকে বসে আছে আধবুড়ো গৈবীনাথ। তাকে দেখামাত্র চমকে ওঠে চাঁপিয়া। চেহারার এ কী হাল করেছে লোকটা!

এখন থেকে অনেক সাল আগে প্রথম যেবার কাজের আশায় এই কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় এসে চাঁপিয়া বসেছিল সেই তখন থেকেই গৈবীনাথকে চেনে সে। তারপর যত বার এখানে এসেছে তত বারই লোকটাকে দেখেছে। পাথর কি লোহা দিয়ে তৈরি ছিল তার শরীর। গায়ে ছিল দশটা বনভৈসের

তাকত। ওকে দেখামাত্র জমিমালিকদের পছন্দ হয়ে যেত।

গৈবীনাথ জাতে ধোবি। অনেক সাল ধরে দেখাশোনার ফলে তার সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতাই হয়েছে চাঁপিয়ার। অন্য খেতমজুররা যখন নিজের নিজের ধান্দা ছাড়া আর কিছু বোঝে না তখন গৈবীনাথের সঙ্গে দেখা হলেই সে তার খোঁজখবর করেছে; নতুন নতুন মরদদের কথা জানতে চেয়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একের পর এক বিয়ে ভাঙার কারণগুলো জেনে আন্তরিক দুঃখ এবং সহানুভূতি জানিয়েছে। লোকটা এক কথায় খুবই বড়মাপের দিলওলা আদমী।

মাঝখানে তিন সাল সুরথপুরায় আসতে পারেনি চাঁপিয়া। এর ভেতর লোহা বা পাথরে বানানো গৈবীনাথের চেহারাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে যেন। গাল তুবড়ে চোয়ালের হাড় ফুটে বেরিয়েছে। গায়ে মাংস বলতে কিছুই নেই। পাঁজরাগুলো গুনে নেওয়া যায়। দেহের ওই বিশাল কাঠামোটায় এখন শুধু হাড্ডি আর হাড্ডি। চোখদুটো এক আঙুল করে গর্তে ঢুকে গেছে। চামড়া ঢিলে হয়ে কুঁচকে গেছে। থেমে থেমে হাঁ করে একেক বার শ্বাস নেয় সে আর হাঁপায়। দেখেই বোঝা যায়, ফুসফুসের সঙ্গে বাইরের বাতাসের যোগাযোগ রাখতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে গৈবীনাথের। অথচ কী এমন বয়স! বড় জোর পঁচাশ কি তার চাইতে দু এক সাল বেশি। কিন্তু এখন গৈবীনাথকে দেখে মনে হয় বয়সটা সত্তর কি আশি পেরিয়ে গেছে।

চাঁপিয়া বলে, 'তুম!'

'হাঁ রে—' গৈবীনাথ এগিয়ে এসে তার পাশে বসে।

'এ কী চেহারা করেছ!'

'কা করে! তিন চার সাল ধরে বুকের দোষ হয়েছে। তার সাথ সাথ হাঁপ আউর খাঁসি (কাশি)। তাতেই শরীরটা চৌপট হয়ে গেল।'

'ডাগদর দেখিয়ে দাওয়া খেয়েছ?'

'পেটের দানা জোটে না তো ডাগদর, দাওয়া! আমাকে কী পেয়েছিস—রাজা-মহারাজাকা ছৌয়া?'

চাঁপিয়া আর কিছু বলে না।

গৈবীনাথ এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ করেনি। এবার জেল্লাহীন ঘোলাটে চোখে একদৃষ্টে চাঁপিয়াকে দেখতে দেখতে বলে, 'তুইও চেহারার কী হাল করেছিস!'

চাঁপিয়া বড় করে শ্বাস ফেলে। বলে, 'চেচক (বসন্ত) হল যে। তারপরই হাল বুরা হয়ে গেল।'

'তুই আমি, দু'জনেই বুখারে কমজোর হয়ে গেছি। খেতির কাম মিলবে কি না কে জানে।'

'ভগোয়ান কিষুণজিকা কিরপা—'

এই সময় মাটির খোরায় চা, গরম গরম সমোসা এবং পাউরুটি নিয়ে ফিরে আসে নাটোয়ার। রুটি-টুটি চাঁপিয়ার হাতে দিতে দিতে বলে, 'গরমাগরম খা লে। আমি আবার হাটিয়ায় যাচ্ছি।'

'কায়?' নিজের অজান্তেই চাঁপিয়ার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে আসে যেন।

'পাক্কী ধরে আসতে আসতে বললাম না, নয়া জগমগ-জগমগ কাপড়া-উপড়া কিনে দেব। আমার মরদকা জবান—হাঁ।' বলে আর দাঁড়ায় না নাটোয়ার, ফের হাটের ভিড়ে মিশে যায়।

চায়ের ভাঁড়ে মুখ ঠেকাতে গিয়ে হঠাৎ চাঁপিয়ার চোখে পড়ে লুব্ধ দৃষ্টিতে খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে গৈবীনাথ আর সমানে ঢোক গিলছে। বোঝা যায়, লোকটার পেটে এই মুহূর্তে মারাত্মক ভুখ। চাঁপিয়া শুধোয়, 'চায়-পানি খাবে?'

গৈবীনাথ উত্তর দেয় না, তবে তার মুখচোখ দেখে মনে হয়, খাওয়ার ষোল আনা ইচ্ছে।

ভাঁড়সুদ্ধ পুরো চা'টা দেওয়ার মতো অতখানি মহানুভবতা চাঁপিয়ার অন্তত নেই। আলগোছে অর্ধেকটা চা খেয়ে বাকি ভাঁড়টা গৈবীনাথকে দেয় সে। সেই সঙ্গে সমোসা, পাউরুটির ভাগও।

চায়ে ভিজিয়ে গোগ্রাসে পাউরুটি খেতে খেতে গৈবীনাথ শুধোয়, 'ওই আদমীটা কে?'

'কার কথা বলছ?' চাঁপিয়া জানতে চায়।

'যে চায়-পানি আউর রোটি-উটি দিয়ে গেল।'

'ওর নাম নাটোয়ার দুসাদ।'

কৌতূহলী চোখে চাঁপিয়ার দিকে তাকিয়ে গৈবীনাথ এবার জিজ্ঞেস করে, 'নাটোয়ার তোকে চায়-

রোটি খিলাচ্ছে কেন?'

চাঁপিয়া চুপ করে থাকে।

গৈবীনাথ এবার বলে, 'সমঝ গিয়া। কাম মিললে নাটোয়ার তোকে শাদি করে নিয়ে যাবে—নায়?'

চাঁপিয়া মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

গৈবীনাথ ফের বলে, 'আগে তো তোব ছে ছে'গো (ছ ছ'টা) শাদি হয়ে গেছে?'

চাঁপিয়া সম্পর্কে সব খবরই রাখে গৈবীনাথ। চাঁপিয়া বলে, 'হাঁ।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই নাটোয়ার আবার ফিরে আসে। তার হাতে জগমগ-জগমগ নতুন শাড়ি। চাঁপিযাকে সেটা দিতে দিতে বলে, 'কাছে রাখ। আমি তোর সপরনার (সাজগোজের) জিনিসগুলো নিয়ে আসি।' বলেই সে চলে যায়।

একসময় সামনের চালাগুলোর তলা থেকে খেতিমালিক এবং তাদের লোকজন উঠে এসে কিষাণ বাছতে শুরু করে। গৈয়াহাটা, ছাগরিহাটা কি মুরগিহাটায় যেভাবে গরুবাছুর ছাগল বা মুরগির গা টিপে টিপে পরখ করে নেওয়া হয় অবিকল সেই ভাবেই কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ঘুরে ঘুরে তারা ভূমিহীন ওরাওঁ-মুণ্ডা এবং অচ্ছুৎদের যাচিয়ে বাজিয়ে নিচ্ছে। খেতি চষার মতো মারাত্মক খাটুনির কাজের তাকত যাদের আছে জমিমালিকেরা শুধু তাদেরই বেছে নিচ্ছে। দুর্বল অশক্ত লোক নিয়ে কী লাভ?

হট্টাকট্টা চেহারার পুরুষ আর আওরতেরা প্রথমেই কাজ পেয়ে যায়। ওদেব নিয়ে কিছু কিছু জমিমালিক চলে যেতে থাকে। কড়াইয়া গাছগুলোর তলা ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসে।

ঝড়তি পড়তি পঞ্চাশ ষাটটা আদিবাসী আর অচ্ছুৎ ধোবি দোসাদেব ভেতর চাঁপিয়া এখনও বসে আছে। তার পাশে গৈবীনাথ। লোকটা সমানে হাঁপিয়ে যাচ্ছে। জলহীন ফাঁকা হুঁকো টানার মতো অদ্ভুত একটা শব্দ একটানা কানে ঢুকতে থাকে চাঁপিয়ার।

অন্য সব বছর দেখামাত্রই জমিমালিকরা চাঁপিয়াকে পছন্দ করে ফেলত। কিন্তু এবার বরাত খারাপ. কিষাণ বাছাবাছি শুরু হওয়ার পর কত খেতিমালিক তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এক পলক তাকে দেখেই চলে গেছে। গৈবীনাথেরও সেই একই হাল।

তবু আশা একেবারে ছেড়ে দেয়নি চাঁপিয়া। এখনও জনকয়েক খেতিমালিক রয়েছে। এই চাষের মরশুমে প্রচুর কিষাণ দরকাব। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তাকে কাজ দেবে। মনে মনে অনবরত চাঁপিয়া বিড়বিড় করতে থাকে, 'হো কিষুণজি, হো রামজি, তেরে কিরপা।'

জেঠ মাহিনার সূর্য এখন খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। চারদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ।

যে ক'জন জমিমালিক এখনও রয়েছে তারা কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ঘুবে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে যেই কেউ কাছে এসে দাঁড়ায়, বুকের ভেতর শ্বাস আটকে আসে চাঁপিয়ার। বেশির ভাগই কিছু না বলে সরে যায়। তবে এক আধজন জিজ্ঞেস করে, 'কা রে, খেতির কাজ পারবি?'

রুদ্ধশ্বাসে চাঁপিয়া উত্তর দেয়, 'পারব হুজৌর।'

তীক্ষ্ণ চোখে জমিমালিক লক্ষ করতে থাকে। চাঁপিয়া সারা গায়ে শাড়ি জড়িয়ে জড়সড় হয়ে আছে। জমিমালিক বলে, 'কাপড়া হটা—'

শাড়ি সরালে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে। এমনিতে যেটুকু আশা আছে, শরীরের হাল দেখলে কেউ তাকে পছন্দ করবে না। সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'নায় নায় হুজৌর—'

জমিমালিক ভাবে, লজ্জায় ও সংকোচে চাঁপিয়া গা থেকে কাপড় সরাতে চাইছে না। কুৎসিত একটা খিস্তি ঝেড়ে সে বলে, 'রাজা মহারাজের বিটিয়া সব—' বলেই একটানে শাড়ির খানিকটা খুলে ফেলতে চাঁপিয়ার দুর্বল রোগা শরীরের অনেকটা দেখতে পায়। বলে, 'ইসি লিয়ে কপড়া জড়িয়ে আছিস!' তারপর আঙুল দিয়ে চাঁপিয়ার হাত টিপতে টিপতে বলে, 'তোর গায়ে তো কিছু নেই রে। তোকে দিয়ে চলবে না।'

জমিমালিকের দু'পা জড়িয়ে ধরে চাঁপিয়া, 'চলবে হুজৌর। আমাকে কাম দিয়ে দেখুন—'

'হট্‌ হট্‌—' অকারণে বেশি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করে না জমিমালিক। এক ঝটকায় পা ছাড়িয়ে নিয়ে সে এগিয়ে যায়।

এবার গৈবীনাথ পাশ থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হামনিকো লে যা হুজৌর।'

জমিমালিক থমকে দাঁড়িয়ে যায়। বলে, 'তোর সিনা (বুক) তো চুহার মতো। মুর্দাকে (মড়া) দিয়ে কি চাষের কাম হয়? ভাগ শালে ভূচ্চর—'

গৈবীনাথ এবং চাঁপিয়া হাতেপায়ে ধরে হাজার কাকুতি মিনতি করেও একজন জমিমালিককেও টলাতে পারে না। বিশ পঁচিশ সাল ধরে সুরথপুরার হাটিয়ায় এই কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় এসে বসছে দু'জনে। যত বার এসেছে তত বারই তাদের খেতির কাজে নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। শুধু এবারই বাদ।

সূর্য যখন পছিমা আকাশে হেলে পড়তে থাকে সেই সময় ঝড়তি পড়তিদের ভেতর থেকে আরো কিছু আওরত এবং পুরুষ কিষাণ বেছে নিয়ে বাকি জমিমালিকেরা চলে যায়। যে বিশ-পঁচিশটা আদিবাসী এবং অচ্ছুৎ চাঁপিয়াদের সঙ্গে বাতিল হয়ে গেছে তারাও একজন দু'জন করে চলে যায়। কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় শুধু পড়ে থাকে দু'জন—চাঁপিয়া আর গৈবীনাথ।

দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে এখন চুপচাপ বসে আছে চাঁপিয়া। তার পাশে শ্বাসটানা অদ্ভুত শব্দ করে কেঁদে চলেছে গৈবীনাথ, 'কাম নায় মিলা। মর যায়েগা, ভুখ্‌সে মর যায়েগা—'একদিন যার শরীর ছিল লোহা বা পাথর কেটে তৈরি, সে যে এভাবে কাঁদতে পারে, তা যেন ভাবা যায় না। তার কান্নায় আওয়াজ জ্যৈষ্ঠের তাতানো বাতাসে ঘন বিষাদ ছড়াতে থাকে।

ঠিক এই সময় সপবনার জিনিসপত্র কিনে ফিরে আসে নাটোয়ার। কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় ফাঁকা জায়গাটায় ঘাড় গুঁজে চুপচাপ চাঁপিয়াকে বসে থাকতে দেখে চোখের পলকে কিছু একটা আঁচ করে নেয়। গৈবীনাথ সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। আস্তে করে নাটোয়ার ডাকে, 'চাঁপিয়া—'

চাঁপিয়াও কাঁদছিল, তবে শব্দ করে নয়। নাটোয়ারের গলা কানে আসতেই তার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। মুখ তুলে আরক্ত চোখে ভয়ে ভয়ে নাটোয়ারের দিকে তাকায়।

নাটোয়ার সরাসরি কাজের কথায় আসে, 'খেতিকা কাম মিলা?'

'নায়—' বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে চাঁপিয়া।

'এতগুলো খেতিমালিক এসেছিল, কেউ তোকে পসন্দ্ করল না?'

'নায়—'

নাটোয়ারকে দেখে কান্না থামিয়ে দিয়েছিল গৈবীনাথ। কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় এই নির্জন দুপুরে গভীর স্তব্ধতা নেমে আসে কিছুক্ষণের জন্য।

একসময় ঠাণ্ডা গলায় নাটোয়ার শুরু করে, 'কাম মিলল না। তা হলে শাদিটা হয় কী করে?'

চাঁপিয়া চুপ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নাটোয়ার। তারপর ফের বলে, 'শাড়িটা দে—'

নিঃশব্দে, কাঁপা হাতে নতুন কাপড়টা পাশ থেকে তুলে নাটোয়ারের দিকে বাড়িয়ে দেয় চাঁপিয়া। একরকম ছোঁ মেরেই সেটা নিয়ে হাটের দিকে চলে যায় নাটোয়ার।

এতক্ষণ বুকের ভেতর দম বন্ধ করে বসে ছিল গৈবীনাথ। এবার বড় করে শ্বাস টানে সে, খানিক হাঁপিয়ে গাঢ় দুঃখের গলায় বলে, 'তোর এই শাদিটা বরবাদ হয়ে গেল।'

চাঁপিয়া কিছু বলে না। বলার কী-ই বা থাকতে পারে এই অবস্থায়।

গৈবীনাথ বলতেই থাকে, 'এখন কী করবি? কাম তো জুটল না। রওদ আগ য্যায়সা (আগুনের মতো), গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।'

শাদি না হওয়া এবং কাজ না পাওয়ার ধাক্কা কিছুটা কাটিয়ে ওঠে চাঁপিয়া। তার মনে হয়, এটাই তো একান্ত স্বাভাবিক। এবার সে মুখ খোলে, 'এখানে বসে থেকে কা ফায়দা? ঘরে লৌটব।'

'মনপথল?'

'হাঁ।'

'সুরথপুরায় এসে এই পয়লা শাদি না করে তুই বাপের ঘরে লৌটছিস—নায়?'

কথাটা বলার জন্যই বলেছে গৈবীনাথ। উত্তর না দিয়ে চাঁপিয়া জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এখন কী করবে?'

'ভাবছি।' সাঁই সাঁই শব্দ করে শ্বাস টানতে থাকে গৈবীনাথ, 'আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই।'

'কেন, তোমার গাঁওকা ঘর?'

'দো সাল আগে ওটা মহাজনের পেটে ঢুকে গেছে।'

'ক্যায়সে?'

'ভারি বুখার (রোগ) হল। কাম বন্ধ, মগর পেটটা তো চালু রাখতে হবে। তাই করজ নিয়েছিলাম। রুপাইয়া ওয়াপস করতে পারলাম না, বাপ-দাদার ঘরটা চলে গেল।'

'তা হলে তুমি থাক কোথায়?'

'হঁহা-উঁহা। হাটিয়ার চালির তলায়, পেঁড়কা নিচামে, সড়ককা বগলমে। বুকের দোষ হয়েছে, গলা দিয়ে খুন নিকলেছিল, কোনো মানুষ আমাকে কাছে ভিড়তে দেয় না।'

হঠাৎ বাতিল বিমারি রুগ্‌ণ দুর্বল মানুষটা সম্বন্ধে অপাব সহানুভূতি বোধ করতে থাকে চাঁপিয়া। গৈবীনাথের মতো সে-ও তো পৃথিবী থেকে খারিজ হয়ে গেছে। চাঁপিয়া বলে, 'তোমার তা হলে কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই?'

'নায়—' ঘাড় হেলায় গৈবীনাথ।'

'হামনিকা সাথ মনপথল চল।'

গৈবীনাথ চমকে ওঠে, 'কী বলছিস! তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেল!'

চাঁপিয়া বলে, 'ঠিকই বলছি। মাথা আমার ঠিকই আছে।'

'তুই একা থাকিস। আমাকে নিয়ে তুললে গাঁওবালারা কী বলবে হুঁশ আছে?'

এ দিকটা খেয়াল করেনি চাঁপিয়া। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে সে। মনে মনে ভাবে, এতকাল নিজের নিরাপত্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই তার মাথায় ঢুকত না। এ জন্য একের পর এক পুরুষের পিছু পিছু সুরথপুরার হাটে এসেছে। কিন্তু তার চাইতেও দুর্বল, তার চাইতেও কমজোর অসহায় বিমারি আদমীও রয়েছে। লক্ষকোটি মানুষের পৃথিবীতে গৈবীনাথকেই একমাত্র তার বড় আপন মনে হয়। চাঁপিয়া মনঃস্থির করে ফেলে। বলে, 'মনপথলে যাওয়ার আগে বামহনের কাছে গিয়ে শাদিটা চুকিয়ে ফেলব। চাঁদির পৈড়ি বেচে বামহনের পাইসা দেব।'

ফুসফুস ফাটিয়ে চিৎকার করে ওঠে গৈবীনাথ, 'নায় নায়, এ নেহী হোগা—'

চাঁপিয়া বলে, 'তুমনি চুপ হো যাও। রামজি কসম—'

সন্ধের পর মনপথলের দোসাদরা, গঞ্জুরা, ধোবিরা চমকে উঠে দেখতে পায় চাঁপিয়া দুসাদিন ভোরে সেজেগুজে একজনের সঙ্গে চলে গিয়েছিল, কিন্তু ফিরে এল আরেক জনের সঙ্গে।

এতদিন ছ ছ'টা পুরুষ চাঁপিয়াকে শাদি করে নিয়ে গেছে। কিন্তু জীবনে এই প্রথম সে স্বয়ম্বরা হল।

একসময় সবার অবাক চোখের সামনে দিয়ে দু'টি বাতিল মানুষ মনপথলের শেষ মাথায় বহুকালের প্রাচীন একটা কোমর-বাঁকা ধসে-পড়া ঘরে গিয়ে ওঠে।

বাজি

কেহরগঞ্জ টাউনের দুই নাম-করা জুয়াড়ী হল মোটেরাম এবং চুহালাল। তাদের আসল নাম কী ছিল কেউ জানে না, তারা নিজেরাও বেমালুম কবেই তা ভুলে গেছে। দু'জনের বাপ-মায়ের দেওয়া আদি নাম নিয়ে কেহরগঞ্জের লোকজন কোনোদিন মাথা ঘামায় না। এ ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

মোটেরাম ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা বিশাল চেহারার একটা মানুষ। এই কারণে তার নামের গোড়ায় 'মোটে' শব্দটা জুড়ে গেছে। অর চুহালাল হল রোগা, কমজোর, বিলকুল ইঁদুরের মতো ছোটখাট আদমী। তাই তাকে ডাকা হয়—চুহালাল। প্রথম প্রথম মজা করেই এভাবে তাদের ডাকা হত। পরে এই দুই নামেই তারা বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

মোটেরাম এবং চুহালালের কথা পরে। তার আগে কেহরগঞ্জ টাউন সম্পর্কে কিছু জানানো

দরকার।

কেহরগঞ্জ উত্তর বিহারের নগণ্য এক শহর। ইন্ডিয়া—ইন্ডিয়া কেন, বিহারের মানচিত্রেও এই শহরটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। হাজার কুড়ি মানুষ, তিরিশ চল্লিশটা বেঢপ চেহারার পাকা কোঠি, এলোমেলো গজিয়ে ওঠা টিন এবং টালির চালের বিদঘুটে বাড়িঘর, কাঁচা খোলা নর্দমা, গোটা পঁচিশেক টাঙ্গা, শ খানেক সাইকেল রিক্‌শা, বড় বড় চাকা-ওলা হুডখোলা পুরনো আমলের ক'টা মোটর, অগুনতি বয়েল আর ভৈসা গাড়ি—এই নিয়ে কেহরগঞ্জ। আর আছে প্রচুর মশা, কয়েক কোটি মাছি, গন্ডা গন্ডা ধর্মের ষাঁড়, বেওয়ারিশ কুকুর, ইত্যাদি। এখানকার রাস্তাগুলো বেশির ভাগই কাচ্চী বা কাঁচা সড়ক, পা ফেললেই ধুলোয় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। দু চারটে রাস্তায় অবশ্য কিছু কিছু খোয়া আর ইঞ্চি দেড়েক পিচের একটা স্তর চোখে পড়ে। এবং কী আশ্চর্য, এখানে একটা মিউনিসিপ্যালিটিও আছে আর বছর তিনেক হল বিজলিও এসেছে।

মিউনিসিপ্যালিটির অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় এভাবে। মাঝে মাঝে ওখানকার হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে লোকজন এসে কাঁচা নর্দমায় মশা মারা তেল ছিটিয়ে যায় আর ট্যাক্স কালেক্টররা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ট্যাক্স আদায় করে। বছরে মোটে একবার বার্ষিক শ্রাদ্ধের মতো কয়েকটা রাস্তায় কিছু খোয়া ফেলে পিচ ঢালা হয়।

এখানে যে বিজলি এসেছে তার রকমসকম বেজায় গোলমেলে। ভোল্টেজ এতই কম যে বিজলি বাতির চেয়ে কেরোসিন-লণ্ঠনের তেজ বেশি। তা ছাড়া আরো একটা মুশকিল রয়েছে। যখন তখন বিজলি চলে যায়, আর একবার গেলে কবে ফিরবে কেউ জানে না।

এখানে হই চই কম। পৃথিবীর যাবতীয় হট্টগোল থেকে অনেক, অনেক দূরে উত্তর বিহারের এই কেহরগঞ্জ টাউন।

ফি শনিবার শহরের পুব দিকের শেষ মাথায় জাঁকিয়ে হাট বসে। পুরো ছ'টি দিন ঝিমিয়ে থাকার পর হাটের দিন কেহরগঞ্জে কিছুটা চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা দেখা দেয়। কিন্তু তা শুধু এই একটি দিনেব জন্যই।

আজ শনিবার। বহুকালের নিয়ম অনুযায়ী আজও কেহরগঞ্জে হাট বসেছে।

হাটের ধারে ঘেঁষে সিগরা নদী। নদীর কিনার থেকে উঠে আসা পুরনো ভাঙাচোরা পাথরের বাঁধের ওপর অত্যন্ত বেজার মুখে বসে আছে মোটেরাম এবং চুহালাল। তাদের এই বিমর্ষতার কারণ পরে বলা যাবে।

মোটেরাম এবং চুহালাল দু'জনেই টাঙ্গা চালায়। একসময় দু'জনেরই নিজস্ব গাড়ি এবং ঘোড়া ছিল, কিন্তু জুয়া খেলে খেলে এমনই হাল যে গাড়ি ঘোড়া সবই বেচে দিতে হল। এখন নিজের গাড়িই ভাড়া নিয়ে তাদের পেট চালাতে হয়। নতুন মালিক দিনের শেষে নগদ সাতটি টাকা ভাড়া গুনে নেয়। তার ওপর দু'জনেরই যা কামাই তা দিয়ে নিজের নিজের সংসারের এবং ঘোড়ার দানাপানি জোটাতে হয়। তা ছাড়া জুয়ার খরচ তো রয়েছেই।

অঘুন বা অঘ্রাণ মাস শেষ হয়ে এল। এখন সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর অনড় দাঁড়িয়ে আছে। এই দুপুর বেলাতেও হাওয়া বেশ কনকনে। হিমালয় বেশি দূরে নয়। অঘ্রাণ পড়তে না পড়তেই এখানে বাতাসে হিমের গুঁড়ো মিশতে শুরু করে। দুপুরের রোদও তাকে তাতিয়ে তুলতে পারে না।

বাঁধের তলায় সিগরা নদী এখন বড় শান্ত। তার জলে না আছে ঢেউ, না স্রোত। দু-একটা নৌকো খুবই আলসে ভঙ্গিতে এধারে ওধারে ভেসে বেড়াচ্ছে। পরদেশি শুগার ঝাঁক বাতাস চিরে চিরে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে উড়ে যাচ্ছে।

এবার মোটেরাম এবং চুহালালকে লক্ষ করা যেতে পারে। দু'জনেরই বয়স চল্লিশের নিচে। মোটেরামের পরনে এই মুহূর্তে ময়লা ঢলঢলে পাজামা আর ডোরাকাটা সবুজ শার্ট, তার ওপর ধুসো কম্বল জড়ানো, পায়ে কাঁচা চামড়ার তালিমারা চম্পল। মাথায় শীত ঠেকাবার জন্য পোকায়-কাটা কম্ফোর্টার পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে। চুহালালের পরনে নোংরা ধুতি আর কুর্তা। ধুতির কাছা এবং কোঁচা পাকিয়ে পেছনে গোঁজা। কুর্তার ওপর একটা ছেঁড়া সুতোর সুজনি জড়ানো রয়েছে। পায়ে টায়ার-কাটা

রবারের চটি। শীতের কারণে তার মাথায় একটা চিটচিটে গামছা পাগড়ির মতো আটকানো।

ওরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে সামনে কয়েক হাত দূরে অনেকগুলো ঝাঁকড়া-মাথা পিপর গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেগুলোর তলায় একদিকে সারি সারি টাঙ্গা, আরেক দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে সাইকেল রিক্‌শা। তার পর থেকেই হাটের শুরু। প্রায় সিকি মাইল জায়গা জুড়ে বিশাল হাটটা মানুষের ভিড়ে এবং তাদের হাঁকাহাঁকিতে গমগম করছে।

মোটেরাম জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আজকের দিনটা একেবারে চৌপট হয়ে গেল চুহা—'

চুহালাল বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে, 'হাঁ। সূরয মাথার ওপর চড়তে না চড়তেই পাকিটের (পকেটের) পুরা পাইসা খতম। এখনও আধা রোজ পড়ে রয়েছে। দিনটাই বিলকুল বরবাদ।' সে-ও হুস করে জোরে শ্বাস ছাড়ে।

অর্থাৎ হাটে এসে অভ্যাসমতো প্রথমেই আজ দু'জনে চলে গিয়েছিল জুয়ার আড্ডায়। প্রতি হাটেই এখানে জমজমাট জুয়ার আসর বসে। জুয়া খেলাটা মোটেরামদের কাছে একেবারে ধর্ম পালনের মতো। আজ যে ক'টা বাজি তারা ধরেছে, সবগুলোতেই হেরে পকেট ফাঁক করে ফেলেছে। নতুন বাজি ধরার মতো ফুটো কড়িও তাদের কাছে নেই। সেই কারণেই মোটেরাম এবং চুহালাল ভয়ানক বিমর্ষ।

হাটে এসে জুয়ার আড্ডায় ঢোকার আগে কালালি থেকে দু'জনে খানিকটা নেশা করে এসেছিল। যতই তারা দারু বা তাড়ি টাড়ি খাক, পুরোপুরি বেহুঁশ হয়ে পড়ে না। চোখ সামান্য লাল হয়ে ওঠে আর মাথা অল্প অল্প কাঁপে। এর বেশি আর কিছু নয়।

মোটেরাম একটু চিন্তা করে বলে, 'ধারে খেলবি?'

দু'জনের জুয়াড়ী হিসাবে এতই সুনাম এবং মর্যাদা যে আশেপাশে বিশ তিরিশ মাইলের ভেতর যত জুয়ার আড্ডা বসে সব জায়গায় তাদের ধারে খেলতে দেওয়া হয়। হেরে গেলে এবং পকেটে সেই মুহূর্তে পয়সা না থাকলে পরে এসে তারা বাজির টাকা দিয়ে যায়। পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠুক, দুনিয়া রসাতলে যাক, হেরে যাওয়া বাজির ঋণ তারা শোধ করবেই। এই একটা দিকে তাদের অসীম সততা। এ অঞ্চলের প্রতিটি জুয়াড়ী এবং জুয়ার অড্ডার মালিক এই কারণে তাদের যথেষ্ট খাতির করে থাকে।

আসলে মোটেরাম এবং চুহালালের কাছে জুয়া আর ভগোয়ান রামজির পুজো প্রায় একই ব্যাপার। সেখানে কোনোরকম ফাঁকি বা ধোঁকাবাজি নেই।

চুহালাল বলে, 'নেহী মোটরু, ধারে খেলব না। তিন রোজ মালিকের গাড়ির কিরায়া দিতে পারিনি। লালার দুকান থেকে আটা ডাল মরিচ নিমক নিয়েছিলাম বাকিতে। লালা সুবাহ্ সাম, দু'বার করে তাগাদা দিচ্ছে। তার ওপর বরাতটা আজ খুবই খারাপ, একটা বাজিও লাগাতে পারলাম না।' একটু থেমে বলে, 'ধার করে আজ আর খেলছি না।'

মোটেরাম তাকে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করে, 'ঠিক আছে, ধারে তোকে খেলতে হবে না। হাটিয়ায় টাঙ্গার কিরায়া আজ অনেক পাবি। কিছু পাইসা পেলে দো-চার বাজি লাগিয়ে দেব, কি বলিস?'

চুহালালের খানিক আগের সিদ্ধান্ত এবার টলে যায়। মিনমিনে গলায় বলে, 'লেকেন ঘরবালী বলছিল, ঘরে ডাল আটা আনাজ কিচ্ছু নেই। এ সব না নিয়ে গেলে চুলহা জ্বলবে না—'

মোটেরাম বলে, 'আমারও তো সেই হাল। তাই বলে হাটিয়ায় এসে পাইসা নেই বলে বাজি ধরব না! আদত খারাপ হয়ে যাবে বিলকুল। সওয়ারি পাকড়া, দো-চার রুপাইয়া কামা, তারপর ফির জুয়াকা তাম্বু—'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দূর থেকে মাইকের আওয়াজ ভেসে আসে।

কেহরগঞ্জের রাস্তা ঘাটে আকছার মাইকে হিন্দি সিনেমার গান বাজানো হয়। সেটা নতুন কোনো ব্যাপার নয়। প্রথমটা মোটেরামরা খেয়াল করে নি কিন্তু আওয়াজটা কাছে এগিয়ে আসতেই টের পাওয়া গেল, ওটা গান নয়। কেউ ভারি মোটা গলায় একটানা কিছু বলে যাচ্ছে।

মোটরাম বলে, 'কা বোলতা রে?'

চুহালাল মাইকের কথাগুলো শুনতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না। সে ডান হাতটা হাওয়ায় ঘুরিয়ে বলল, 'কৌন জানে!'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, কয়েকটা সাইকেল রিক্‌শা মিছিল করে এগিয়ে আসছে। সেগুলোর পেছনে

একটা খোলা জিপ, জিপের পেছনে আবার ডজনখানেক সাইকেল রিক্‌শা।

একেবারে প্রথম রিক্‌শাটায় বসে আছে একটা মাঝবয়সী হট্টাকট্টা চেহারার লোক। সে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'ভোলেচাঁদজিকো—'

সামনে পিছনে সবগুলো সাইকেল রিকশা অল্পবয়সী ছেলেছোকরাতে বোঝাই। তারা গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করছে, 'ভোট দো।'

মাঝখানের খোলা জিপটায় হাতজোড় করে বিগলিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে একটি চর্বির পাহাড় অর্থাৎ ভোলেচাঁদ দাস। লোকটা লালদাসিয়া কায়াথ।

ভোলেচাঁদের বয়েস ষাটের কাছাকাছি। গলা টলা বলতে তার কিছুই নেই। বিশাল শরীরের ওপর সরাসরি মাথাটা ঠেসে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। চুল চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা, পেছন দিকে একগোছা মোটা টিকি। প্রকাণ্ড গোল মুখে ছোট ছোট চোখ। ভুরু বলতে প্রায় কিছুই নেই। থুতনির তলায় চর্বির চার পাঁচটা পুরু থাক।

এই মুহূর্তে ভোলেচাঁদের পরনে ফিনফিনে মিলের ধুতি আর ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি। তার ওপর তুষের শাল। ধুতিটা দেহাতী ধরনে পরা। তার গলায় একটা মোটা গাঁদা ফুলের মালা ঝুলছে. কপাল জুড়ে লাল চন্দনের লম্বা তিলক।

ভোলেচাঁদকে চেনে না এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না কেহরগঞ্জে। শহরের ঠিক মাঝখানে যে চক বাজারটা রয়েছে সেখানে তার বিরাট ভেজিটেবল অয়েলের দোকান। তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে সে এখানে বনস্পতি তেল বেচে আসছে। মোটামুটি ভালই পয়সা করেছে সে। দোতলা কোঠি বনিয়েছে ভোলেচাঁদ। গোটা দুই টাঙ্গা আছে, আর আছে দশ বারটা বয়েল গাড়ি। টাঙ্গা এবং বয়েল গাড়িগুলো সে ভাড়ায় খাটায়। বনস্পতি তেলওলা নির্বাচনে নেমে গেছে, এটা কেহরগঞ্জে একটা বিস্ময়কর ঘটনা। হাটের সব লোক হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কেউ জিপ এবং সাইকেল রিক্‌শাগুলোর পেছন পেছন হাঁটতেও শুরু করেছে।

স্লোগান সমানে চলছেই।

'আগেলা চুনাওমে কৌন জিতগা?'

'ভোলেচাঁদ দাস, ভোলেচাঁদ দাস।'

'ভোলেচাঁদজি—'

'এম্লে বনেগা।'

'ভোলেচাঁদজি—'

'মনিস্টার বনেগা।'

এই সব স্লোগানের মধ্যে সামনের রিক্‌শার ভলান্টিয়ার একটা পোস্টার তুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'দেখিয়ে এহী হ্যায় ভোলেচাঁদজিকা চিহ্ন্‌—' পোস্টারটায় একটা বড় হরিণ আঁকা রয়েছে। সেটা দেখিয়ে সে আবার বলে, 'আগেলা চুনাওমে হিরণ পর মোহব মার—' অর্থাৎ আগামী নির্বাচনে হরিণ ছাপ মেরে ভোলেচাঁদকে নির্বাচনে তরিয়ে দিতে হবে।

অন্য ভলান্টিয়াররা ধুয়ো ধরে, 'মোহর মার, মোহর মার—'

'দেশপ্রেমী ভোলেচাঁদজি—'

'অমর রহে, অমর রহে।'

ভোলেচাঁদ দাসের নির্বাচনী মিছিল ধীরে ধীরে হাটের অন্য দিকে চলে যায়।

চুহালাল আর মোটেরাম একেবারে থ। অনেকক্ষণ পর চুহালাল বলে, 'কা রে মোটরু, চুনাও আ গিয়া—কা?'

মোটেরাম বলে, 'হাঁ। তাই তো দেখছি।'

'ভোলেচাঁদ তেলবালাও চুনাওতে নেমে গেল!'

'দেশপ্রেমী ভি বন গিয়া।'

'হাঁ। আজীব দুনিয়া।'

একটু চুপচাপ। তারপর কী ভেবে চুহালাল বলে, 'এর আগে কবে যেন চুনাও হয়েছিল?'

মোটেরাম মনে মনে সময়ের হিসেব কষে বলে, 'পাঁচ সাল আগে।'
'দেখতে দেখতে পাঁচ পাঁচগো সাল কেটে গেল।'
আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে কী বলতে যাচ্ছিল মোটেরাম, তার আগেই আবার উত্তুরে হাওয়ায় মাইকের শব্দ ভেসে আসে।
যেদিক থেকে ভোলেচাঁদের মিছিল এসেছিল সেদিক থেকেই আওয়াজটা আসছে।
বাঁধের ওপর থেকে মোটেরামেরা চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। চুহালাল অবাক হয়ে বলে, 'ফির মাইক!'
ততক্ষণে আরেকটা মিছিল কাছাকাছি এসে পড়েছে। এবার আর সাইকেল রিক্শা এবং জিপ নয়, পঁচিশ তিরিশটা টাঙ্গা আস্তে আস্তে লাইন করে আসছে। একেবারে প্রথম টাঙ্গাটায় মাইক হাতে রোগা চিমড়ে চেহারার একটা লোক অনবরত চেঁচিয়ে যাচ্ছে।
'বজরঙ্গীলালজিকো—'
পেছনের টাঙ্গাগুলোতে পঞ্চাশ ষাটটা ছোকরা দাঁড়িয়ে বা বসে আছে। তারা গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ভোট দিজিয়ে, ভোট দিজিয়ে—'
এই শোভাযাত্রার সব চেয়ে দর্শনীয় বস্তু হল সামনের দিক থেকে দু নম্বর টাঙ্গাটা। সেটাতে কোচোয়ানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং বজরঙ্গীলাল। লোকটা রোগা এবং বেজায় ঢ্যাঙা। ঘোড়ার মতো মুখ তার। অস্বাভাবিক লম্বা বলে রীতিমত কুঁজো দেখায়। গলাটা ধড় থেকে হাতখানেক উঁচুতে। টেরাবেঁকা মুখ। হুঁকোর খোলের মতো মাথার চাঁদিতে অল্প চুল রয়েছে। এ ছাড়া দু'পাশে একেবারে কান পর্যন্ত ক্ষুর দিয়ে চেঁছে সাফ করে ফেলা হয়েছে। সিঁথিটা মাথার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। লোকটার পরনে ধুতি, ডবল-কাফ দেওয়া ফুল শার্টের ওপর আলপাকার গলাবন্ধ কোট। দুই কানের লতিতে সোনার মাকড়ি। গাঁটপাকানো অঙুলে হীরে পান্না চুনি ইত্যাদি মিলিয়ে চার পাঁচটা আংটি। বাইরে থেকে যা দেখা যায় না তা হল কোমরে এবং হাতের বাজুতে চার পাঁচটা তাবিজও রয়েছে।
বজরঙ্গীলাল কেহ্রগঞ্জের মোটামুটি পয়সাওলা লোক এবং বিখ্যাত কৃপণ। এই টাউনে তিন চারটে পাকা কোঠি আছে তার। সেগুলো থেকে ভাল ভাড়া পায়। তা ছাড়া সুদে টাকা খাটিয়েও প্রচুর পয়সা কড়ি করেছে। কিন্তু পল্‌টিকস অর্থাৎ রজনীতিতে এখন অঢেল পয়সা, তাই ভোলেচাঁদের মতো সে-ও চুনাওতে নেমেছে।
উটের মতো বিদঘুটে চেহারায় দুর্ধর্ষ কৃপণ এই লোকটা নির্বাচনে নেমেছে, এরকম চমকপ্রদ ঘটনা কেহ্রগঞ্জের ইতিহাসে খুব বেশি একটা ঘটে নি।
সেই চিমড়ে লোকটা আবার চেঁচায়, 'সমাজসেবী বজরঙ্গীলালকো—'
'মদত কর, মদত কর।'
চিমড়ে লোকটা ভেলোচাঁদের নির্বাচনী এজেন্টের মতো একটা পোস্টার তুলে ধরে। সেটাতে বজরঙ্গীলালের প্রতীক একটা বেড়ালের ছবি আঁকা রয়েছে। লোকটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'বজরঙ্গীলালজিকা চিহ্ন্ কা হ্যায়?'
বজরঙ্গীর চুনাও কর্মীরা গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বিল্লী বিল্লী বিল্লী—'
'বিল্লী পর—'
'মোহর মার।'
'সমাজসেবী বজরঙ্গীলাল—'
'অমর রহে, অমর রহে।'
বাঁধের ওপর বসে কেহ্রগঞ্জের দুই তুখোড় জুয়াড়ী তাজ্জব হয়ে বজরঙ্গীর মিছিল দেখতে থাকে। একসময় মোটেরাম বলে, 'ভোটকা তৌহার (পার্বণ) আ গিয়া—'
অন্যমনস্কর মতো চুহালাল জাবাব দেয়, 'হাঁ—'
'শালে কলিযুগ বিলকুল পুরা হো গিয়া—'
'কী করে বুঝলি?'
'তেলবালা ভোলেচাঁদ দেশপ্রেমী বনে গেল! আর মক্ষিচুষ সুদখোর বজরঙ্গী বনলো সমাজসেবক!

হোয় হোয়, কা আজীব দুনিয়া। দো শালে চুনাওতে নেমে আবার ভোট চাইতে বেরিয়েছে!'

আশেপাশে যারা ছিল তাদের মধ্যেও চাঞ্চল্য এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু এখানেই নয়, বিকিকিনি কিছুক্ষণের জন্য স্থগিত রেখে ভোলেচাঁদ এবং বজরঙ্গীলালের চুনাওতে নামার ঘটনাটা নিয়ে গোটা কেহরগঞ্জের হাটিয়া জুড়ে আপাতত তুমুল হইচই চলছে।

বজরঙ্গীর টাঙ্গার মিছিল সামনের রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে ডাইনে ঘুরতেই আচমকা চুহালালের মাথায় বিজলি চমকে যায়। সে বলে, 'এ মটরু—'

'কা?' মোটেরাম ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়।

'চুনাওতে কে জিতবে তোর মনে হয়—বজরঙ্গীলাল না ভোলেচাঁদ?'

'কেউ না। তেলবালা আর মক্ষিচুষ হেরে চৌপট হয়ে যাবে।'

'নেহী নেহী।'

'কা নেহী?'

চুহালাল বলে, 'আমার মনে হচ্ছে তেলবালা ভোলেচাঁদ আগেলা চুনাওতে জিতে যাবে। ওর অনেক পাইসা। জানিস না যার পাইসা আছে সে-ই চুনাওতে জেতে। না হলে আগের বার ফটেগিলাল শর্মা জিততে পারত? সিরেফ রুপাইয়ার জোরে ভোট কিনে নিল।'

কথাগুলো মোটেরামের মস্তিষ্কে ছোটখাট ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। সে বলে, 'ঠিক বাত।' তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে এভাবে শুরু করে, 'হামনিকা মালুম হোতা ভোলেচাঁদ নেহী জিতেগা।'

চুহালাল চোখ কুঁচকে বলে, 'তা হলে কি জিতবে?'

'বজরঙ্গীলাল—'

'ওহী মক্ষিচুষ!'

আস্তে ঘাড় হেলিয়ে মোটেরাম বলে, 'হাঁ।'

কেউ, বিশেষ করে মোটেরাম তার কথায় সায় না দিলে ভীষণ খেপে যায় চুহালাল। চড়া গলায় সে বলে, 'কী করে বুঝলি?'

'বজরঙ্গীর বহোত পাইসা।' বলে পকেট থেকে কাঁচা তামাক এবং চুন বার করে বাঁ হাতের তেলোতে ডলে ডলে খৈনি বানিয়ে ফেলে। খানিকটা নিজে রেখে বাকিটা চুহালালের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

চুহালাল তার খৈনিটা নিচের পাটির দাঁত এবং ঠোঁটের মাঝখানে পুরে বলে, 'কভী নেহী। জিতবে তেলবালা। ওর এত্তে পাইসা যে কেহরগঞ্জের পুরা ভোট কিনে নিতে পারে।'

'নেহী—' কোনোভাবেই চুহালালের সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব হয় না মোটেরামের। তার ধারণা মক্ষিচুষ সুদখোর বজরঙ্গীলালের টাকা ভোলেচাঁদের চেয়ে অনেক, অনেক গুণ বেশি।

দুব্‌লা পাতলা কমজোর চুহালালের চেহারা যেমনই হোক, তেজটা মারাত্মক। কারণে অকারণে তার মেজাজ চড়ে যায়। বাঁধ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে চোখ লাল করে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সে চেঁচায়, 'শালে কুত্তা, আমি বলছি তেলবালার পাইসা বেশি। ভোলেচাঁদ জরুর জিতেগা।'

মোটেরামও কম যায় না। সে-ও হ্যাঁচকা টানে বিপুল শরীরটাকে নিচে নামিয়ে, গলার শিরা ছিঁড়ে চিৎকার করতে থাকে, 'শালে ভুচ্চর কাঁহিকা, আমি বলছি মক্ষিচুষের জ্যাদা পাইসা। চুনাওতে সে-ই জিতবে।' বলে বাঁধের ওপর প্রচন্ড জোরে থাপ্পড় মারে।

সেই ছেলেবেলা থেকে দু'জনের গভীর বন্ধুত্ব। একটা দিনও একজনকে ছাড়া আরেক জনের চলে না। আবার প্রতি মুহূর্তে তাদের আকচাআকচি, ঝগড়াঝাঁটি এবং হল্লাবাজি। একেক দিন মারপিটও হয়ে যায়, তখন কথাবার্তা বন্ধ থাকে। কিন্তু দু'জনের বন্ধুত্বের ভিত এতই মজবুত যে দু'দিন যেতে না যেতেই আবার গলায় গলায় ভাব।

চুহালালও ছাড়ার পাত্র নয়। গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে সেও বাঁধের ওপর চাপড় মেরে বলে, 'ঠিক হ্যায়, বাজি হয়ে যাক। আমি বলছি তেলবালা জিতবে।'

মোটেরামও চুহালালের মতোই গলা চড়ায়, 'হোক বাজি। আমি বলছি মক্ষিচুষ জিতবে, জিতবে—'

তাস, কৌড়ি এবং বালা থেকে শুরু করে এমন কোনো জুয়া নেই যা চুহালাল · মোটেরাম

খেলে না। শুধু তাই নয়, দুনিয়ার সব কিছুর ওপর ওরা বাজি ধরে। আকাশের উড়ন্ত পাখি পুব দিকে যেতে যেতে উত্তরে ঘুরে যাবে কিনা, ফির্তুপ্রসাদ মারোয়াড়ির সাদা ঘোড়ার ক'টা দাঁত আছে, জেঠ মাহিনার কোন তারিখে বারিষ নামবে, জঙ্গিলাল গাড়োয়ানের পুতহুর ছেলে হবে না মেয়ে হবে, ইত্যাদি নানা ব্যাপারেই বাজি ধরে বসে।

চুহালাল বলে, 'কেত্তে বাজি? বাতা বাতা—'

মোটেরামের চেহারাটা হাতির মতো বিশাল হলেও ভেতরে ভেতরে সে একটি মিটমিটে হারামজাদা। তার মাথায় সারাক্ষণ খুব সূক্ষ্ম ধরনের শয়তানি চলছে। মোটেরাম বলে, 'জরু বাজি—'

প্রথমটা বুঝতে পারে না চুহালাল। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বলে, 'মতলব?'

'মতলব আমি হারলে আমার জরু তোর হয়ে যাবে। তুই হারলে তোর ঘরবালী আমার ঘরে চলে আসবে। কা রে, রাজি?'

বাজির ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যেতেই রাগে চিড়বিড়িয়ে ওঠে চুহালাল, 'গিদ্ধড়, ভূচ্চরকা ছৌয়া; তোর হাতির মতো ঘরবালী আমার ঘাড়ে গছাতে চাস! পাঁচগো বাচ্চা পয়দা করে ওহী আওরতটার আছে কী? আর আমার ঘরবালী পরী য্যায়সা। একগো বাচ্চাও এখন পয়দা করেনি। শালে হারামজাদ কাঁহিকা—' শেষ গালাগালটা আবার মোটেরামের উদ্দেশে।

কথাটা মোটামুটি ঠিকই বলেছে চুহালাল। মোটেরামের জেনানা অর্থাৎ স্ত্রী তার সঙ্গে জুড়ি মিলিয়ে আরেকটি চর্বির পাহাড়। তার চেহারায় না আছে ছিরিছাঁদ, না তার স্বভাবে এতটুকু মাধুর্য। সাত আট বছরে পাঁচ পাঁচটা বাচ্চার জন্ম দিয়ে একেবারে বেঢপ হয়ে গেছে সে। তা ছাড়া মেজাজটা মারাত্মক। সর্বক্ষণ তেরিয়া হয়েই আছে। দিনরাত তার মুখ চলে, কর্কশ গলায় এমনই চেঁচায় যে বাড়ির আধ মাইলের মধ্যে কাক চিল ঘেঁষতে পারে না। সেদিক থেকে চুহালালের জেনানা ডানাকাটা পরী না হলেও তাকে সুন্দরই বলা যায়। পাতলা কোমর, নাকমুখ কাটা কাটা, বড় বড় টানা চোখ, মাথায় প্রচুর চুল। জোড়া বেলের মতো দৃঢ় সুগোল স্তন, কোমরের তলার দিকটা সুঠাম এবং বিশাল। ভারি উরু, রংটি মাজা কাঁসার মতো। শরীরে এক ছটাক বাজে চর্বি নেই। সে যখন কোমর নাচিয়ে হাঁটে আর চোখ ঘুরিয়ে তেরছা নজরে তাকায় তখন চারপাশের মানুষের বুকে যেন বিজলি খেলে যায়। বাজিতে হেরে এইরকম খুবসুরত চটকদার ঘরবালীকে কিছুতেই খোয়াতে চায় না চুহালাল। আর জিতলে সে পাবে কি না একটা 'হাথী য্যায়সা' চর্বির ঢিবি! তার ঘাড়ে সারা জীবনের জন্য একটি পাহাড় চেপে যাবে। হার জিত দু'দিক থেকেই তার বিরাট ক্ষতি।

মেটারাম মিটিমিটি হেসে বলে, 'তা হলে বাজিটা কী হবে?

'তিন শ রুপাইয়া।' চুহালালের মুখ ফসকে এই বিরাট টাকার অঙ্কটা বেরিয়ে আসে।

তারা এমনিতে দু পাঁচ টাকার বেশি বাজি ধরে না। তিন শ টাকা শুনে খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে থাকে মোটেরাম। ব্যাপারটা তার কানে এতই অবিশ্বাস্য ঠেকে যে আবার জিজ্ঞেস করে, 'কী বললি!'

চুহালাল খেঁকিয়ে ওঠে, 'কানে শুনতে পাস না? বহির (কালা) বন গিয়া, কা?'

মোটেরাম একটু চিন্তা করে বলে, 'হেরে গেলে তিন শ রুপাইয়া দিবি তো?'

বাঁধের ওপর আরেক বার প্রচণ্ড চাপড় কষিয়ে চুহালাল বলে, 'জরুর। মরদকা বাত হাঁথীকা দাঁত। গলার নলিয়া দিয়ে যা বেরিয়েছে তা আর পেটের ভেতর ঢুকিয়ে নেব না।'

মোটেরাম পলকহীন তাকিয়ে থাকে।

চুহালাল ফের বলে, 'কা রে, অব্ গুংগা বন গিয়া? বাজিতে হারলে রুপাইয়া দিবি না?'

বাঁধানো ইটের বাঁধে মোটেরামও জোরে ঘুষি হাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'জরুর। আমারও মরদকা বাত, হাঁথীকা দাঁত। চুনাও কবে?'

মোটেরাম পিছু না হটে সোজাসুজি যে বাজির লড়াইতে নেমে পড়েছে তাতে খুশিই হয় চুহালাল। বলে, 'হোগা এক দো মাহিনাকা বাদ—'

একসময় তিনটে চেনা লোক এসে মোটেরামকে বলে, তুরন্ত তাদের নয়া মহল্লায় পৌঁছে দিতে হবে। সওয়ারী নিয়ে মোটেরাম চলে যায়। চুহালালকেও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয় না। কিছুক্ষণ পর তারও ভাড়া জুটে যায়।

দুই

দিন দশেক কেটে গেছে। এর মধ্যে কেহরগঞ্জে ভোটের বাজার সরগরম হয়ে উঠেছে। অঘ্রাণের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ক্রমশ উত্তেজনা এবং উত্তাপ ছড়িয়ে যেতে শুরু করেছে।

এবার এখানে চুনাও মাঘের গোড়ার দিকে। মাঝখানে পুরো দেড় মাস সময়ও নেই। আর ভোলেচাঁদ এবং বজরঙ্গীলাল শুধু এই দু'জন প্রার্থীই আগামী নির্বাচনে নামে নি. বড় বড় রাজনৈতিক দলের আরো পাঁচজন ক্যান্ডিডেট কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। তাদের দু-তিনজনের অঢেল পয়সা, চুনাওতে খাটার জন্য লোকজনও প্রচুর। এই নির্বাচনী যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কে জিতে বেরিয়ে আসবে, আগেভাগে বলা খুবই মুশকিল।

সারাদিন কেহরগঞ্জের কাঁচা সড়কে ধুলো উড়িয়ে সাত সাতজন ক্যান্ডিডেটের সাইকেল রিক্‌শা বা টাঙ্গার মিছিল চলেছে। সেই সঙ্গে চলছে পদযাত্রা। ফলে এত ধুলো উড়ছে যে কেহরগঞ্জের আকাশে সারাক্ষণ সেগুলো হাতখানেক পুরু স্তরের মতো জমে থাকে। মিছিল, পদযাত্রা ছাড়া চলছে মিটিং। বিরাট বিরাট জনসভায় মাইক ফাটিয়ে গাঁক গাঁক করে প্রার্থীরা এবং তাদের মরুব্বিরা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

পাঁচ বছর পর চুনাও আসে, চুনাও যায়। কেহরগঞ্জে এখন পঞ্চবার্ষিকী উত্তেজনা বা তৌহার। দিবারাত্রি চারদিকে গানের ধুয়োর মতো শোনা যাচ্ছে, 'ভোট দো, ভোট দো—'

অন্য ক্যান্ডিডেটদের নিয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই মোটেরাম এবং চুহালালের। মোটেরামের নজর মক্ষিচুষ সুদখোর বিদঘুটে চেহারার বজরঙ্গীলালের ওপর। আর চুহালাল চোখ রেখেছে ভেজিটেবিল তেলবালা ভোলেচাঁদের দিকে।

নির্বাচনের তারিখ যত এগিয়ে আসছে ততই তাদের বুকের 'তড়পনা' বেড়েই চলেছে। আরো একটা ব্যাপারে দু'জনের রাতের ঘুম বিলকুল ছুটে গেছে। কেননা চুহালাল এবং মোটেরাম অতীব সৎ আর নিষ্ঠাবান জুয়াড়ী। বাজির যে টাকাটা তারা একবার কবুল করে বসেছে সেটা প্রাণ গেলেও দিতেই হবে। অথচ তাদের ঘরে জমানো ফুটো পয়সাও নেই। জুয়ায় সর্বস্ব খুইয়ে টাঙ্গার গাড়ি ঘোড়া দুইই বেচে দিতে হয়েছে। কিন্তু দু'জনেই তাল ঠুকে গলাবাজি করে জানিয়ে দিয়েছিল, মরদকা বাত হাঁথীকা দাঁত। তাই বাজি ধরার দিন থেকে তারা প্রাণপণে দিনরাত টাঙ্গা ছুটিয়ে, সওয়ারী বয়ে অনেক বেশি খেটে চলেছে। বাড়তি কামাইয়ের টাকাটা তারা জমিয়ে রাখছে। চুনাওয়ের ফলাফল না বেরুনো পর্যন্ত দু'জনে প্রতিজ্ঞা করেছে এক দান জুয়া তো খেলবেই না, জুয়ার আড্ডার এক মাইলের মধ্যেও যাবে না। ক'দিনে যেটুকু জমিয়েছে জুয়ায় হেরে গেলে মরদের বাত আর হাতির দাঁত থাকবে না। মোট কথা, আর পঁয়ত্রিশ চল্লিশ দিনের ভেতর নগদ তিন শ'টি টাকা জমিয়ে ফেলতেই হবে।

হাটের দিন সিগরা নদীর পারে পিপর গাছগুলোর তলায় টাঙ্গার আড্ডায় দু'জনের দেখা হয়। অন্য দিন শহরের মাঝমধ্যিখানে চক বাজারে যে টাঙ্গার স্ট্যান্ডটা আছে সেখানে ভোর হতে না হতে সওয়ারীর আশায় এসে তারা বসে থাকে।

চোখাচোখি হলেই চুনাওয়ের কথা। মোটেরাম বলে, 'বজরঙ্গীলাল জরুর জিতেগা। যা পাইসা খরচা করছে, ভাবতে পারবি না। ভলিন্টারদের সুবেহ্ খাওয়াচ্ছে পুরি হালোয়া আউর গুলাবজামুন, দুফারে বঢ়িয়া ভাতকা ভোজন, রাতমে পরেঠা ভাজি বুন্দিয়া বালুসাই। ভলিন্টাররা চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে বজরঙ্গীজির জন্যে গলা দিয়ে খুন নিকলে দিচ্ছে।'

চুহালাল হাওয়ায় হাত নাচাতে নাচাতে বলে, 'তোর মক্ষিচুষ কেত্তে পাইসা আর খরচা করবে! জেতার জন্যে টাকা ওড়াচ্ছে তেলবালা ভোলেচাঁদজি। যা খিলাচ্ছে পিলাচ্ছে, সে সব নাম তোর চোদ্দ পুরুষেও কানে শোনে নি। চোখে দ্যাখে নি। পুলাও, মালাই, কলাকন্দ, কলকাত্তাকা রাজভোগ, বাদাম বরফি, পিস্তা—'

মোটেরাম নাকের ভেতর ঘুঁত ঘুঁত আওয়াজ করে। তাচ্ছিলের ভঙ্গিতে বলে, 'যা যা শালে, তেলবালা খিলাবে এসব!'

খেপে আগুন হয়ে যায় চুহালাল, 'তেলবালা খিলাবে না তো কি তোর বাপ খিলাবে!'

এরপর তুমুল বচসা শুরু হয়ে যার দু'জনের। বচসাটা কোনো কোনো দিন হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। অবশ্য তা আর কতক্ষণ? দু-চার ঘন্টা পর আবার গলায় গলায় ভাব হয়ে যায়।

তিন

আরো কয়েকটা দিন কেটে যায়। চুনাও-এর তারিখ দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। কেহরগঞ্জের আবহাওয়ায় এখন প্রবল উত্তেজনা আর উত্তাপ। মিটিং মিছিল এবং পদযাত্রা আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। স্লোগানে স্লোগানে এখানকার আকাশ চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

চুনাও যত এগিয়ে আসছে, মোটেরাম এবং চুহালালের উত্তেজনাও ততই চড়ছে। স্নায়ুগুলো সারাক্ষণ তাদের টান টান হয়ে থাকে। নির্বাচন আর তিন শ টাকার বাজি দু'জনের মাথায় চেপে বসে গেছে যেন। তাদের জেদ, যেভাবেই হোক, বাজিটা জিততেই হবে।

আজকাল আর কারুর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। যতক্ষণ সওয়ারী পাওয়া যায়, দু'জনে পাগলের মতো কেহরগঞ্জের এ মাথা থেকে ও মাথায় টাঙ্গা ছোটায়। তার ফাঁকে ফাঁকে মোটেরাম ছোটে বজরঙ্গীলালের মিছিলে বা মিটিংয়ে। ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে সে-ও 'ভোট দো ভোট দো' করে গলা ফাটাতে থাকে। আসলে বজরঙ্গীর চুনাও-কর্মীদের ওপর সে পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারছে না। উত্তেজনাটা তার এত প্রচন্ড যে বজরঙ্গীকে জেতাবার জন্য ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যতটা পারে কাজ করে দেয়। কখনও পোস্টার সাঁটে, কখনও বা স্লোগান দিতে দিতে গলা চিরে ফেলে। এ ব্যাপারটা সে করে যাচ্ছে অত্যন্ত গোপনে। কোনোভাবেই যাতে চুহালাল টের না পায় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট হুঁশিয়ার থাকে।

মোটেরাম জানে না, চুহালালও তার মতোই লুকিয়ে চুরিয়ে ভোলেচাঁদের জন্য খেটে যাচ্ছে। তারও একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, তেলবালাকে নির্বাচনে জেতাতে হবে।

কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত জানাজানি হয়ে যায়। একদিন ভোরে টাঙ্গা নিয়ে মোটেরাম চক বাজারে আসতেই চুহালাল তার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। দাঁত খিঁচিয়ে, হাত নেড়ে, চোখমুখের উগ্র ভঙ্গি করে প্রথমে তোড়ে খানিকক্ষণ খিস্তি করে নেয় সে। তারপর বলে, 'শালে গিদ্ধড়কে ছৌয়া, চুপকে চুপকে মক্খিচুষের ভলিন্টার বনেছিস! তুই চেল্লালেই সুদখোরটা জিতে যাবে?'

মোটেরামের কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। সে পকেট থেকে জং-ধরা চৌকো কৌটো বার করে। ওটার ভেতর তামাক পাতা আর চুন রয়েছে। বাঁ হাতের চেটোয় পরিমাণমতো চুন তামাক নিয়ে খৈনি ডলতে ডলতে পিট পিট করে চুহালালের দিকে তাকায়। তারপর ধীরে সুস্থে খৈনির পুরোটাই জিভের তলায় ঢুকিয়ে চোখ বুজে থাকে। একসময় চোখ মেলে পিচিক করে খানিকটা খয়েরি রংয়ের থুতু ফেলে, আস্তে আস্তে খুব মজাদার ভঙ্গিতে বলে, 'আমি মক্খিচুষের ভলিন্টার হলে কসুর হয়ে যায়, আর তুই ভুচ্চরের ছৌয়া তেলবালার ভলিন্টার হলে কিছু হয় না—কা রে?'

চুহালাল হকিচকিয়ে যায়। মোটেরাম যে তার খবরটা পেয়ে গেছে, এটা সে ভাবতে পারে নি। আরেক দফা খিস্তি গলা দিয়ে বার করতে গিয়ে সেগুলো তক্ষুনি গিলে ফেলে। স্থির চোখে মোটেরামকে দেখতে দেখতে হঠাৎ শব্দ করে হেসে ওঠে, 'শালে কুত্তা কাঁহিকা! ঠিক হ্যায়, শোধবোধ।' একটু থেমে ফের বলে, 'তুই মক্খিচুষের হয়ে খেটে যা, আমি খাটি তেলবালার জন্যে। দেখি কে জেতে।'

দু'জনের মধ্যে এভাবে রফা হয়ে যায়।

এরপর স্লোগান দিয়ে দিয়ে চুহালালদের গলা ফেঁসে যায়। চোখ এত লাল হয়ে ওঠে, মনে হয়, শরীরের সব রক্ত সেখানে গিয়ে জমা হয়েছে। রাত জেগে চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে।

ব্যাপারটা ধরা পড়ার পর দু'জনেই আজকাল পরস্পরকে জানায়, তাদের ক্যান্ডিডেটের কে কোথায় পদযাত্রায় বেরিয়েছিল, কোন মহল্লায় গিয়ে মিটিং করেছে, কোন কোন রাস্তায় মিছিল করে এসেছে, ইত্যাদি।

আরো কয়েক দিন পর ভয়াবহ একটা খবর নিয়ে আসে মোটেরাম, 'সত্যনাশ হয়ে গেছে রে চুহা—'

চুহালাল ভুরু কুঁচকে তাকায়, 'কা?'

'মালুম হচ্ছে, মক্ষিচুষের পাইসা খতম হয়ে গেছে।' মোটেরামকে ভীষণ বিমর্ষ দেখায়।

চুহালাল সামনের দিকে ঝুঁকে গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'কী করে বুঝলি?'

মোটেরাম জানায়, চুনাও-এর খরচ চালাবার জন্য বজরঙ্গীলাল দু-তিনটে বাড়ি নাকি বেচে দিয়েছে। সে বলেছে, 'এল্লে' হতে পারলে ও রকম পঞ্চাশটা বাড়ি করে ফেলতে পারবে। আর কোনোভাবে 'মনিস্টার' হতে পারলে পুরা কেহরগঞ্জটাই কিনে নেবে।

মোটেরাম যা জানে না তা হল এইরকম। এবার কোনো পলিটিক্যাল পার্টিরই এককভাবে সরকার বানানো খুবই কষ্টকর। তখন নির্দল এম এল এ'দের নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। তাই চুনাওতে জেতার জন্য বজরঙ্গীলালের মতো ক্যান্ডিডেটরা দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যাচ্ছে। সর্বস্ব খরচ করে, এমন কি বাড়িঘর বেচে ধারধোর করেও যদি কোনোরকমে এম এল এ'টা হওয়া যায় তা হলে খরচের বিশ গুণ তুলে নিতে পারবে।

চুহালাল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। তবে কিছু বলে না।

দিন তিনেক পর চুহালালও প্রায় একই রকম খবর নিয়ে আসে। তেলবালা ভোলেচাঁদও নির্বাচনের খরচ মেটাতে তার সবগুলো টাঙ্গা এবং বয়েল গাড়ি বেচে দিয়েছে। তারও মরণপণ জেদ, যেভাবে হোক এম এল এ হতেই হবে। ভোলেচাঁদের বিরাট আশা, মিনিস্টার সে হবেই।

চার

চুনাও-এর আর চার দিন বাকি। এর মধ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মোটেরাম এবং চুহালালের গলা একেবারে বসে গেছে। প্রাণপণে চেঁচালে ফ্যাঁসফেসে একটু আওয়াজ বেরোয় মাত্র। চোখ যেন রক্তের ডেলা। চোখের তলার কালি আরো গাঢ় হয়েছে। মোটেরামের কোমরে ক'বছর ধরে বাতের ব্যথা চলছে, সেটা এখন ভীষণ চাগিয়ে উঠেছে। এদিকে ঠাণ্ডা টাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধিয়ে বসেছে চুহালাল। বাত এবং জ্বরে কাবু হলেও তারা কি আর ঘরে বসে আছে, না এটা ঘরে বসে থাকার সময়? দিনরাত তারা যেন পায়ে চাকা বেঁধে ঘুরছে। বাজিটা জিততেই হবে।

একটি মাস 'গতর চূরণ' খেটে দু'জনেই বাজির তিন শ'টি টাকা জমিয়ে ফেলেছে। সেদিক থেকে একটা দুশ্চিন্তা অন্তত কেটেছে। এখন যে-ই হারুক, নাকের ওপর টাকাটা ছুঁড়ে দিতে পারবে। তবু হারতে কে আর চায়?

এদিকে বজরঙ্গীলালকে চুনাও-এর খরচ যোগাতে আরো ক'টা বাড়ি বেচে দিতে হয়েছে। ভোলাচাঁদ তার বনস্পতি তেলের দোকান এক মারোয়াড়ির কাছে বাঁধা দিয়েছে। এই চুনাওতে হারলে তারা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কোমর সিধে করে জীবনে আর দাঁড়াতে হবে না। কাজেই দুই প্রার্থী এবং দুই জুয়াড়ীর মধ্যে এখন মারাত্মক যুদ্ধ চলছে।

শেষ পর্যন্ত চুনাও হয়ে গেল। পরের দিন রেজাল্ট বেরুবে কেহরগঞ্জ কালেক্টরেট অফিস থেকে।

নির্বাচনের দিন প্রতিটি 'বুথে' উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে দুই জুয়াড়ী। আঁচ করতে চেষ্টা করেছে তাদের ক্যান্ডিডেটদের পক্ষে কিরকম ভোট টোট পড়ছে। পরের দিন ভোর হতে না হতেই ক্যালেক্টরেট অফিসে গিয়ে তারা হাজির। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোট গোনা শুরু হয়। মানুষের ভিড়ে এবং উত্তেজনায় জায়গাটা সরগরম হয়ে উঠতে থাকে। চুহালাল এবং মোটেরামের হৃৎপিণ্ডের উত্থান পতন কখনও দারুণ বেড়ে যায়, কখনও থেমে আসে।

বিকেল চারটেয় মাইকে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ভোলেচাঁদ এবং বজরঙ্গীলাল দু'জনেই হেরে ভূত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এত কম ভোট পেয়েছে যে তাদের জামানতও পুরোপুরি জব্দ।

রেজাল্ট শোনার পর কিছুক্ষণ থ হয়ে বসে থাকে দুই জুয়াড়ী। তারপর আচমকা জোরে শ্বাস ফেলে প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে, 'যাক, আমরা বাজি হারিনি। তিন শ রুপাইয়া বিলকুল বচ্ গিয়া। মরুক শালে তেলবালা অউর মক্ষিচুষ।'

এই নির্বাচনে কে জিতল তা নিয়ে তাদের আর আদৌ মাথাব্যথা নেই। দুই জুয়াড়ী হাত ধরাধরি করে নিজের নিজের টাঙ্গার দিকে চলে যায়।

জাহান্নামের গাড়ি

পার্ক সার্কাসের একধারে পুরনো আমলের এই ছিরিছাঁদহীন একতলা বাড়িটার বয়স যে কত, ক্যালকাটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনও হয়ত তার হদিশ দিতে পারবে না। সত্তরও হতে পারে, আশি নব্বই হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। লম্বা ধাঁচের পর পর চারটে বেঢপ ঘর, যার কোনোটাই আস্ত নেই—সব ভাঙাচোরা, নোনা-লাগা, শ্যাওলা-ধরা। চারপাশের দেওয়াল থেকে আস্তর খসে খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। প্রতিটি ঘরের মেঝেতে ছোট-বড় অজস্র চিড়।

বাড়িটার একদিকের দু'খানা ঘর নিয়ে পঞ্চাশ বছর ধরে আছে মাসুদ জান গাড়িওলা আর তারই কাছাকাছি বয়সের একটা মোটর, যার চাকাগুলো বিরাট বিরাট, সামনে বড় বড় গোল হেডলাইট, মাথায় ক্যানভাসের হুড, ডান ধারে ড্রাইভারের সিটের লাগোয়া জানালাটার পাশে আড়াই প্যাঁচওলা বিউগলের ধরনে হর্ন—পুরনো ভিনটেজ কার যাকে বলে তা-ই। গাড়িটার আদি চেহারা মোটামুটি একই রকম রয়েছে। তবে তার ইঞ্জিন, মাড গার্ড, স্টিয়ারিং, সিটের গদি বহু বার পালটাতে হয়েছে। মাসুদ জান বাড়ির যেধারে থাকে তার সামনের ফাঁকা জায়গায় টুটোফুটো টিনের চালা বানিয়ে তার তলায় গাড়িটাকে রাখা হয়। হাত-পা বা শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো এটা তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, অচ্ছেদ্য কোনো বন্ধনে। মাসুদ জান নিজেও বলে, এই গাড়ি তার কলিজার টুকরা।

অনেক বছর আগে, তার যৌবনে, একটা শাদিও হয়েছিল মাসুদ জানের। গোটা দুই ছেলেমেয়েও জন্মেছিল। তারা কেউ টেকে নি, কবেই মরে ফৌত হয়ে গেছে। কিন্তু মাসুদ জান আছে, আর আছে তার এই গাড়িটা। এছাড়া এত বড় দুনিয়ার আর কেউ নেই তার। বিবি, বেটা বা বিটিয়ার মুখ আজকাল ভাল করে মনেও পড়ে না। তাদের স্মৃতি একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে।

বাড়িটার বাকি দু'খানা ঘর নিয়ে থাকে ফজলু মিঞা, তার বিধি রেহানা এবং তাদের দুটো বাচ্চা। বাজারে ফজলুর ছোটখাট ফলের কারবার।

মাসুদ জান এ বাড়ির চিরস্থায়ী বাসিন্দা হলেও অন্য ঘর দুটোয় মাঝে মাঝেই ভাড়াটে বদলে যায়। পঞ্চাশ বছরে কত জন যে এল তার লেখাজোখা নেই। তিন সাল আগে এসেছিল ফজলুরা। ওরা মানুষ ভাল—বিনয়ী, ছা-পোষা, নির্ঝঞ্ঝাট। মাসুদ জানকে খুবই খাতির করে।

বাড়িটার সামনে দিয়ে পনের ফুট চওড়া একটা গলি জিলিপির প্যাঁচের মতো পাক খেতে খেতে চলে গেছে। ওটার এক মাথায় ট্রাম রাস্তা, আরেক মাথায় রেল লাইন। দু'ধারে ইটের দেওয়াল আর টিনের চালের সারবন্দি ঘরবাড়ি। সে সবের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ হঠাৎ সাবেক কালের কিছু একতলা, দোতলা বা তেতলা, যেগুলোর খড়খড়ি লাগানো জানালার মাথায় বাহার খোলার জন্য আধখানা চাঁদের আকারে লাল-নীল-সবুজ রঙের কাচ বসানো। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনের দিকে নানা ধরনের দোকানপাট—কোনোটা সস্তা রুটি-মাংসের, কোনোটা পান-বিড়ির, কোনোটা ইলেকট্রিক সাজ-সরঞ্জামের, কোনোটা বা মুদিখানা। এছাড়া রয়েছে চায়ের দোকান, দাওয়াখানা, মোটর মেরামতি আর লেদ মেশিনের ছোটখাট কারখানা।

এলাকাটা পনের বিশ বছর আগেও বেশ নিরিবিলি ছিল। এখন লোকজন প্রচুর বেড়ে গেছে। রাস্তায় সারাক্ষণ গিজগিজে ভিড়। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত হই-হল্লা, কারণে অকারণে ঝগড়াঝাঁটি, খিস্তিখেউড়। যেদিকে তাকানো যাক, পচা আবর্জনা ডাঁই হয়ে আছে। তীব্র দুর্গন্ধে এখানকার বায়ুমণ্ডল দিবারাত্রি বিষাক্ত হয়ে থাকে।

রোজ অনেকটা বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় মাসুদ জান। কিন্তু আজ অন্ধকার থাকতে থাকতেই উঠে পড়েছে। তারপর স্নান চুকিয়ে সামনের দিকের টিনের চালার তলায় যেখানে তার গাড়িটা থাকে তার

পাশে একটা চৌপায়ায় বসে আছে। কাল রাতে ফজলুদের ঘর থেকে তিনখানা হাতল-ভাঙা চেয়ার চেয়ে এনে চৌপায়াটার সামনে সাজিয়ে রেখেছিল। তা ছাড়া চার-পাঁচটা কোল্ড ড্রিংকের বোতলও কিনে এনেছিল ; সেগুলো ঘরের ভেতর রয়েছে। আজ সকালে যে কোনো সময় রঘুবন্ত সিং এই গরিবখানায় পা রাখবেন। রঘুবন্ত রাজপুত ক্ষত্রিয়, অঢেল পয়সাওলা, রইস লোক। প্রচুর জমিজমার মালিক তিনি ; তা ছাড়া নানা রকমের কল-কারখানা আর 'বিজনেস'ও আছে। মাসুদ জানের পুরনো গাড়িটার খবর পেয়ে কাল পাটনা থেকে কলকাতার একটা নাম-করা হোটেলে এসে উঠেছেন। তাঁর পাঠানো একটা লোক কাল রাতেই এসে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আজ সকালে তিনি সবান্ধবে এসে হাজির হবেন। তাঁর খাতিরদারির জন্য চেয়ার আর কোল্ড ড্রিংকের ব্যবস্থা করে রেখেছে মাসুদ জান।

হিন্দুদের বড় পুজোর ধুমধাম ক'দিন আগে শেষ হয়েছে। তারপর থেকেই এ বছর হিম পড়তে শুরু করেছে। উত্তুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে এলোমেলো। সেই হাওয়ায় ঠাণ্ডা আমেজ জড়ানো, গায়ে লাগলে শিরশির করে। এই শিরশিরানিটুকু ভারি সুখদায়ক। খানিক আগে রোদ উঠে গিয়েছিল। তবু একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, অনেক দূরে আকাশের গায়ে চিকন সাদা ওড়নার মতো এখনও সামান্য কুয়াশা লেগে রয়েছে।

চারপায়ায় বসে মাঝে মাঝেই রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল মাসুদ জান, পরক্ষণেই তার দুই চোখ ফিরে আসছিল পুরনো গাড়িটার দিকে। এখন তাকে দেখলে টের পাওয়া যাবে, ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন চাপা উত্তেজনা চলছে। নাকি অস্থিরতা, কিংবা অন্য কিছু?

তার বয়স কবেই সত্তর পেরিয়ে গেছে। প্রায় চার হাতের মতো লম্বা। বয়সের কারণে শরীরের মাংস ঝরে ঝরে মাসুদ জানকে খুব রোগা আর ঢ্যাঙা দেখায়। দুই হাতের মোটা মোটা শিরা, কণ্ঠা এবং গালের হাড় ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে যেন। একসময় রং ছিল টকটকে। চামড়া কুঁচকে, ঢিলে হয়ে মাকড়সার জালের মতো সরু সরু, সূক্ষ্ম কালচে দাগে ভরে গেছে সারা গা। এই বয়সেও লম্বা, ঘন, ঢেউখেলানো দাড়িতে মেহেদি মাখানো। চোখে সরু করে সুর্মার টান। স্নানের পর সুর্মা আর মেহেদি লাগানো তার বহুকালের অভ্যাস। ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ বছর আগে মোতি বাঈ, গর্দানি বাঈ বা জহুরা বাঈ এবং তাদের বাবুদের সামনের ওই গাড়িতে তুলে যখন গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেত তখন থেকেই এই অভ্যাসের শুরু। যে গাড়ির সওয়ার পরমাশ্চর্য সব বাঈজিরা, যাদের জমকাল সাজের বাহার আর রূপের ঝলক চোখ ধাঁধিয়ে দিত, তার চালকের গায়ে থাকবে সাদামাঠা, ম্যাড়মেড়ে জামা-প্যান্ট, তা তো আর হয় না। আরোহিণীরাই তাদের সঙ্গে মানিয়ে যায়, এমন পোশাকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

এই মুহূর্তে মাসুদ জানের পরনে সাদা ঢোলা পাজামা যার তলার দিকটা চাপা, আর লম্বা ঝুলের শেরওয়ানি। মাথায় জর্জেটের পাগড়ি, যেটার এক দিক কুঁচিয়ে জাপানি পাখার মতো উঁচু করে রাখা হয়েছে। ওইভাবে সেজেই বছরের পর বছর বাঈজিদের গাড়ি চালিয়ে এসেছে সে।

এরকম সাজসজ্জা করে কেউ নিজের বাড়িতে বসে থাকে না। মাসুদ জান যে সেটা করেছে তার কারণ একটাই। প্রথম নজরেই যেন রঘুবন্ত সিং টের পেয়ে যান মামুলি এক ড্রাইভারের কাছে তিনি আসেননি।

ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, মাসুদ জানের পাগড়ি বা শেরওয়ানির নানা জায়গায় পিঁজে পিঁজে সুতো বেরিয়ে পড়েছে। বার বার রিপু করিয়েও সেগুলোর দুর্দশা ঠেকানো যায়নি। বেশ বোঝা যায় সে খুব কষ্টে আছে। আজকাল তার গাড়িটার কদর নেই। পঞ্চাশ বছর আগের সেই বাবু, বিবি আর বাঈজিরা কি আছে যে এর মর্যাদা দেবে? এখন নতুন নতুন মডেলের গাড়ি বেরিয়েছে ; সে সব নিয়ে লোকে মাতোয়ারা। অন্য সব পুরনো জিনিসের মতো তার এই মোটর আর সে স্রেফ বাতিলের দলে। ইদানীং কেউ তার খোঁজও নেয় না। গাড়ি না চালাতে পারলে যা হয়, রোজগার প্রায় বন্ধ। বছরে দু'বার পুরনো গাড়ি অর্থাৎ ভিনটেজ কারের যে র‍্যালি হয় তাতে নাম দেয় মাসুদ জান। ফার্স্ট প্রাইজটা তার বাঁধা। দু'বার প্রাইজ হিসেবে কাপ আর কিছু নগদ টাকা পাওয়া যায়। তাছাড়া ব্যাঙ্কে কিছু

টাকা জমানো রয়েছে, তার সুদও যৎকিঞ্চিৎ মেলে। এইভাবে কোনোরকমে দিন কেটে যাচ্ছে। তবে সব মিলিয়ে তার যেটুকু আয় তার বেশ খানিকটা গাড়ির পেছন খরচ হয়ে যায়।

চালু রাখার জন্য মাঝে মাঝেই গাড়িটাকে রাস্তায় বার করে মাসুদ জান। আর তখনই পুরনো ক্ষয়কাশের রোগীর মতো হাজারটা উপসর্গ ধরা পড়ে। গ্যারাজে নিয়ে গেলে ওরা বলে এটা পালটাও, ওটা পালটাও। গাড়িটা তার জেরবার করে ছাড়ছে। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বহুবার পরামর্শ দিয়েছে এই জঞ্জালটা বিদায় কর। ভিনটেজ কারের শখ যাদের, তারা কেউ কেউ গাড়িটা কিনতেও এসেছিল কিন্তু মাসুদ জানের একটাই শর্ত, গাড়ির সঙ্গে তাকেও ড্রাইভার হিসেবে নিতে হবে। যত দিন সে বেঁচে আছে সেটা অন্য কেউ চালাক, একেবারেই পছন্দ নয় তার। কিন্তু গাড়ি পছন্দ হলেও সেই সঙ্গে তার চালকটিকে নিতে কেউ রাজি হয়নি।

রঘুবন্ত সিং ঠিক কী চান, মাসুদ জানের জানা নেই। সে জন্য কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। নিজের শর্ত তাকে জানিয়ে দেবে সে। রঘুবন্তজি যদি রাজি হন, সমস্যা নেই। তবে গাড়িটা কেনাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাঁকে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে।

রঘুবন্ত সিংরা এলেন বেশ খানিকটা বেলা করেই। ততক্ষণে সকালের গা থেকে কুয়াশার ওড়না মুছে গেছে ; রোদের তাত আর জেল্লা আরো কিছুটা বেড়েছে।

এই আমলের ঝকঝকে মডেলের একটা গাড়ি বাড়ির সামনে এসে থামতেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিল মাসুদ জান। মোটর থেকে তিনজন নামলে সে কয়েক পা এগিয়ে যায়। দু'জনের পরনে বিহারি ধরনে পরা ধুতির ওপর গরম পাঞ্জাবি, পায়ে মোটা চামড়ার পাম্প-শু। তাদের মজবুত চেহারা, চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। একজনের মুখ চৌকো, আরেক জনের লম্বাটে। দু'জনেরই চোখেমুখে হিংস্রতা যেন লুকনো রয়েছে। তৃতীয় লোকটির ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা বিশাল শরীর ; গোলাকার মুখ, লালচে চোখ, কাঁধ পর্যন্ত লতানো চুল। পরনে দামি সিল্কের চুস্ত আর কারুকাজ-করা পাঞ্জাবি যার বোতামে হীরের ঝলক। দু'হাতের আটটা আঙুলের তিনটে আংটিতেও হীরে বসানো ; বাকিগুলোতে চুনি, পান্না, গোমেদ ইত্যাদি। গলায় সোনার সরু হার, বাঁ হাতের কবজিতে সোনার ব্যাণ্ডে বিদেশি দামি ঘড়ি। তার সারা শরীর থেকে ভুর ভুর করে দুর্লভ সেন্টের গন্ধ উঠে আসছে। ইনিই যে রঘুবন্ত সিং সেটা মাসুদ জানের সত্তর বছরের অভিজ্ঞ চোখ মুহূর্তে শনাক্ত করে ফেলে। হঠাৎ পয়সা হওয়া লোকেদের গায়ের গন্ধ, তাকানো, হাঁটার চালে এমন কিছু থাকে যে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। অন্য দু'জন যে তার অঙ্গরক্ষক বা বডিগার্ড এবং মোসাহেব, একালের ভাষায় চামচা, সেটাও টের পাওয়া যায়।

রঘুবন্তদের সঙ্গে আরো একজন রয়েছে—ওঁদের ড্রাইভার। গাড়ি থেকে সে নামেনি। কাল রাতে এই লোকটাই তাকে খবর দিয়ে গিয়েছিল। মাসুদ জান বিনীতভাবে বলে, 'আদাব। আইয়ে আইয়ে—'

রঘুবন্ত মাসুদ জানের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলে, 'আপ মাসুদ জান?'

লোকটার গা থেকে টাকার গরম বাষ্প বেরিয়ে এলেও দেখা যাচ্ছে কিঞ্চিৎ সহবত জানে। তার মতো বয়স্ক মানুষকে তুমি করে যে বলেনি, তাই যথেষ্ট। মাসুদ জান মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, 'জি—' তারপর খাতির করে তিনজনকে এনে চেয়ারে বসায়। দৌড়ে ঘর থেকে ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতলগুলো নিয়ে এসে চাবি দিয়ে খুলে সবার হাতে একটা করে দেয়।

রঘুবন্ত সিং বোতল নেন বটে, তবে পানীয় স্পর্শ করেন না। বোতলটা নিচে নামিয়ে রেখে ঘাড় ফিরিয়ে টিনের চালার তলায় গাড়িটা দেখতে থাকেন। বলেন, 'আপনার এই পুরনো মোটরটার খবর আমার এক বন্ধুর কাছে পেয়েছি।'

মাসুদ জান বলে, 'জি—'

'শুনেছি হর সাল গাড়িটা পুরানা কার রেসে ফার্স্ট হয়।'

'জি—'

'আখবরে এর ছবিও বেরিয়েছিল। বন্ধু সেটাও আমাকে দেখিয়েছে।'

'জি—'

হঠাৎ উঠে গিয়ে চারপাশ ঘুরে গাড়িটার হর্ন, সিট, হেডলাইট খুঁটিয়ে দেখে এসে ফের চেয়ারে বসতে বসতে রঘুবন্ত বলেন, 'মোটরটা তোয়াজে রেখেছেন দেখছি।'

মাসুদ জান খুশি হয়ে পুরনো, বহুবার-বলা সেই কথাগুলো আউড়ে যায়, 'জি বাবুসাব, গাড়িটা আমার কলিজার টুকরা—'

রঘুবন্ত বলেন, 'এটা আমার পসন্দ্ হয়েছে।'

'বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া বাবুসাব।'

কেউ তার গাড়ির তারিফ করলে দিল তর হয়ে যায় মাসুদ জানের। উচ্ছ্বাসের গলায় লাগাতার সে যা বলে যায় তা এইরকম। তার গাড়ির খানদান, চাল, ঐতিহ্য, এসব বোঝার মতো মানুষ আজকাল নেই বললেই চলে। রুচি-টুচি সব পালটে গেছে। এখন ঠুনকো, পলকা, কারুকার্যহীন জিনিসের দিকে লোকের ঝোঁক। আভিজাত্য বা বনেদিআনা ব্যাপারগুলোর দাম কানাকড়িও নয়। বাবুসাব রঘুবন্ত সিংয়ের মতো সত্যিকারের সমঝদার অনেক সাল বাদে সে দেখতে পেল। অজস্র বার ধন্যবাদ জানিয়ে মাসুদ জান জিজ্ঞেস করে, 'বাবুসাব, এবার বলুন গাড়িটার ব্যাপারে আপনি কী ভেবেছেন?'

রঘুবন্ত বলেন, 'ওটা আমি কিনতে চাই।'

একটু চুপ করে থাকে মাসুদ জান। তারপর বলে, 'ঠিক হ্যায় বাবুসাব। আমার বহুৎ উমর হয়ে গেছে। মৌত তো একদিন আসবেই। মরার আগে গাড়িটা একজন সমঝদার আদমির হাতে পড়লে ভাল লাগবে। লেকেন—'

'কী?'

'আমার একটা শর্ত আছে।'

তার কথা ভাল করে না শুনেই হাত তুলে রঘুবন্ত সিং বলেন, 'দামের জন্যে ভাববেন না। যা কিম্মত চাইবেন তাই পাবেন—'

মাসুদ জান বলে, 'টাকার কথা ভাবছি না বাবুসাব—'

থমকে যান রঘুবন্ত। কী ভেবে জিজ্ঞেস করেন, 'তা হলে?'

'গাড়ির সঙ্গে আমাকে নিতে হবে।'

'মতলব?'

মাসুদ জান তার শর্তটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়। অন্য ড্রাইভার এ গাড়ি চালাক, সেটা একেবারেই চায় না সে। যতদিন বেঁচে আছে, নিজেই চালিয়ে যাবে।

তীক্ষ্ণ চোখে ধীরে ধীরে মাসুদ জানকে আরেক বার লক্ষ করেন রঘুবন্ত। বলেন, 'আপনি গাড়ি চালাতে পারবেন?'

মাসুদ জান জানায়, তার শরীরে যে তাকত এখনও অবশিষ্ট রয়েছে তাতে আরো দশটা সাল অক্লেশে ড্রাইভ করতে পারবে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে রঘুবন্ত বলেন, 'মঞ্জুর।'

'বহুৎ সুক্রিয়া। বাবুসাব, এই গাড়িতে চড়লে বুঝবেন আরাম কাকে বলে। নিজের জিনিস বলে মনে করবেন না বাড়িয়ে বলছি। এমন উমদা, খানদানি চিজ নসিবে না থাকলে মেলে না।'

আচমকা বিপুল শরীরে তুফান তুলে হেসে ওঠেন রঘুবন্ত। মাসুদ জান যা বলেছে তেমন মজাদার কথা বুঝিবা আগে আর কখনও শোনেন নি।

'কী হল বাবুসাব?' রীতিমত হকচকিয়ে যায় মাসুদ জান।

রঘুবন্ত হাসতেই থাকেন। দেখাদেখি তাঁর দুই মোসাহেবও পাল্লা দিয়ে হাসে।

ভীষণ জড়সড় হয়ে মাসুদ জান জিজ্ঞেস করে, 'আমার কি কিছু কসুর হল বাবুসাব?'

দুই হাত এবং মাথা প্রবল বেগে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে রঘুবন্ত বলেন, 'মিঞা, আপনার কি ধারণা আমি

ওই লক্কড় টিনের খাঁচাটায় চড়ব?'

যে মানুষ খানিক আগে গাড়িটার এত তারিফ করেছেন তাঁর মুখে এমন একটা মন্তব্য শুনে মন ভীষণ খারাপ হয়ে যায় মাসুদ জানের। বলেন কিনা লক্কড় টিনের খাঁচা! বিষণ্ণ সুরে সে বলে, 'গোস্তাকি মাপ করবেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'হাঁ হাঁ, করুন।'

'যদি না-ই চড়েন, গাড়িটা কিনতে চাইছেন কেন?'

'চম্পার জন্যে। সে চড়বে।'

ব্যাপারটা মাসুদ জানের মাথার ভেতর গুলিয়ে যায়। সে অবাক হয়ে বলে, 'চম্পা!'

রঘুবন্ত একটু জোর দিয়ে বলেন, 'হাঁ, চম্পা—'

'সে কে?'

এবার ডান পাশে যে চৌকো মুখওলা লোকটা বসে ছিল, রঘুবন্ত সিং তার দিকে ফিরে বলেন, 'গণপত, মিঞাকে সমঝিয়ে দাও তো চম্পা কে।'

গণপত পরিষ্কার করে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দেয়। চম্পা হল রঘুবন্ত সিংয়ের রাখনি অর্থাৎ রক্ষিতা। পাটনা থেকে পঞ্চাশ মাইল পুবে যে পুরনো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাউনটা রয়েছে, যার নাম কামতাপুর, সেখানে রঘুবন্তজির তিনটে রাইস মিল, একটা সুগার ফ্যাক্টরি আর একটা প্ল্যাস্টিকের কারখানা রয়েছে। ওখানে নয়া দোতলা বাড়ি বানিয়ে চম্পার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। পুরনো গাড়ির ভারি শখ চম্পার। তার আবদার মেটাতে ভূ-ভারত ঢুঁড়ে ঢঁড়ে শেষ পর্যন্ত মাসুদ জানের এই গাড়িটার খোঁজ পেয়েছেন তিনি।

গণপতের কথা শেষ হতে না হতেই রঘুবন্ত সিং আরেকটু জুড়ে দেন। চম্পা হল খানদানী ঘরানার মেয়ে। তার মা হীরাবাঈ, দাদী পান্নাবাঈ, তার মা পিয়ারীবাঈ— সাতপুরুষ ধরে লখনৌয়ের বাঈমহল্লা এরা আলো করে ছিল। যা কিছু পুরনো, প্রাচীন, জমকাল এবং অভিজাত, সে সব তাদের পছন্দ। তা হীরের গয়নাই বল, কি কাশ্মীরের পশমিনা, কি জরির ফুল-বসানো বেনারসি শাড়ি বা সাবেক কালের চাঁদির ফরসি অথবা জাফরি আর জানালায় রঙিন কাচ-বসানো বাড়ি, ঝাড়লণ্ঠন, রুপোর কারুকার্যময় বাসন কিংবা গাড়ি। এমন বনেদি যার বংশলতিকা তার দু-একটা শখ না মেটাতে পারলে নিজের কাছেই ছোট হয়ে যেতে হয়।

রঘুবন্ত থামেননি, একনাগাড়ে বলে যান, 'মিঞা, আপনাকে গাড়ি নিয়ে কামতাপুরে চম্পার কোঠিতে গিয়ে থাকতে হবে। রোজ বিকেলে সে হাওয়া খেতে বেরোয়। যেখানে যেতে চায়, ঘুরিয়ে আনবেন।'

এতক্ষণ গাড়ির আলোচনায় এতটাই ডুবে ছিল মাসুদ জান যে খুব ভাল করে রঘুবন্তকে লক্ষ করেনি। মার্কামারা শরাবী আর লম্পটদের চেহারায় আলাদা রকমের একটা ছাপ থাকে। পঞ্চাশ বছর ধরে এই জাতীয় লোক ছাড়া সৎ, সাচ্চা, চরিত্রবান মানুষ খুব একটা দেখেনি সে। রঘুবন্ত যে পয়লা নম্বরের একটি লুচ্চা সেটা তার কথায় টের তো পাওয়া গিয়েছিলই, তার চোখেমুখেও লাম্পট্যের স্থায়ী মোহর দাগানো রয়েছে।

মনে মনে একটু হাসে মাসুদ জান। তার গাড়িতে চিরকাল বেশ্যা আর বাঈজিরাই চড়েছে। এই শেষ বয়সে রঘুবন্ত সিংয়ের 'রাখনি'ও চড়বে। নাঃ, পরম্পরা ঠিকই থাকছে।

মাসুদ জান বলে, 'জানি বেয়াদপি হয়ে যাচ্ছে। তবু জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি কি কামতাপুরে থাকেন না?'

রঘুবন্ত বলেন, ' না, আমি পাটনায় বেশির ভাগ সময় থাকি। মাঝে মাঝে কামতাপুরে যাই।'

পয়সাওলা বড়লোকেরা নানা জায়গায় মেয়েমানুষ রাখে। রঘুবন্ত পাটনায় আরেকটি 'রাখনি' পোষেন কিনা সেটা জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না মাসুদ জানের।

রঘুবন্ত এবার বলেন, 'তা হলে বাত পাক্কা হয়ে গেল, আপনি কামতাপুরে আসছেন।'

মাসুদ জান ভাবে, গাড়িটা এখানে পড়ে পড়ে তো নষ্টই হয়ে যাচ্ছে। যতদিন সে বেঁচে আছে, প্রাণ ধরে এটা কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। হঠাৎ ওপরওলার মেহেরবানিতে রঘুবন্ত সিংয়ের মতো রইস আদমি যেচে বাড়িতে চলে এসেছেন এবং তার শর্তে রাজি হয়ে গেছেন। শেষ বয়সে তার আর তার গাড়িটার মোটামুটি গতি হতে চলেছে। একটাই শুধু অক্ষেপ, পঞ্চাশ বছর যে শহরে কাটলো সেটা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

হঠাৎ মাসুদ জানের মনে হল, সে আমলের গর্দানী বাঈ, জহুরাবাঈ কি হীরাবাঈরা মানুষ হিসেবে ছিল চমৎকার। দরাজ দিলের অধিকারিণী এই সব আওরতেরা তার সঙ্গে আপনজনের মতো ব্যবহার করত। কেউ ডাকত ভাইসাব, কেউ বলত চাচা। আর দু'হাতে কত টাকা যে তাকে বকশিস দিয়েছে তার হিসেব নেই। কিন্তু একালের চম্পার রুচি কেমন, চালচাল কী ধরনের, সহবত জানে কিনা, বয়স্ক লোকেদের কতটা সম্মান দেয়—এসব কিছুই জানা নেই মাসুদ জানের। তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যদি সম্ভব না হয়? সেটা হবে খুবই মুশকিলের ব্যাপার।

মাসুদ জান স্থির করে ফেলে, কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে দিয়ে সে কামতাপুরে চিরকালের মতো চলে যাবে না। কিছুদিন সেখানে গিয়ে থেকে দেখবে। তারপর যদি মন বসে যায় তখন দেখা যাবে।

রঘুবন্ত সিং বলেন, 'কী হল, চুপ করে আছেন যে? আপনার শর্ত তো আমি মেনেই নিয়েছি।'

মাসুদ জান বলে, 'ঠিক আছে বাবুসাব, আমি কামতাপুর যাব। কবে যেতে বলেন?'

'যত তাড়াতাড়ি হয়। আজ পারলে আজই চলে যান।'

'আজ হবে না। সাত রোজ পরে যাব।'

একটু চিন্তা করে রঘুবন্ত বলেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। এবার বলুন গাড়ির দাম কী দিতে হবে?'

মাসুদ জান বলে, 'এখন আমি কিছুই নিচ্ছি না। আগে কামতাপুর যাই, তারপর এ নিয়ে কথা হবে।'

রঘুবন্ত চতুর লোক। সে বলে, 'সমঝ গিয়া। কামতাপুর গিয়ে শহর, সওয়ারনী পসন্দ্ হলে দাম ঠিক করবেন, তাই তো?'

মাসুদ জান হাসে, উত্তর দেয় না।

রঘুবন্ত বলেন, 'মঞ্জুর। যা চাইছেন, তাই হবে। এতদূর যাবেন, রাস্তার খরচ আছে। কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে যাই?'

মাসুদ জান বলে, 'আপকা মেহেরবানি।'

রঘুবন্ত পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে গুনে গুনে দু'হাজার টাকা বাড়িয়ে দেন।

মাসুদ জান মাত্র তিনখানা একশ টাকার নোট নিয়ে বাকিটা সবিনয়ে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলে, 'অত দরকার হবে না।'

রঘুবন্ত এ নিয়ে আর একটি কথাও বলেন না। কামতাপুরে কিভাবে যেতে হবে, চম্পার বাড়িটা শহরের কোন মহল্লায়, সব জানিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমি চম্পাকে খবর পাঠিয়ে দেব। আপনার কোনোরকম অসুবিধা হবে না।' বলতে বলতে উঠে পড়েন।

রঘুবন্ত এবং তাঁর মোসাহেবদের সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত চলে আসে মাসুদ জান। ওঁরা যতক্ষণ না গাড়িতে ওঠেন সে দাঁড়িয়ে থাকে।

দুই

ঠিক সাত দিন বাদে ধবধবে পাজামা-শেরওয়ানি পরে মাথায় নিখুঁত করে পাক দিয়ে দিয়ে পাগড়ি বেঁধে, একটা চামড়ার স্যুটকেসে কয়েকটা জামাটামা পুরে নিজের গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মাসুদ জান। তার আগে ফজলুর হাতে ঘরের চাবি দিয়ে বলেছিল, সপ্তাহখানেকের জন্য সে বাইরে যাচ্ছে। ফজলু আর তার বিবি যেন তার ঘরের দিকে নজর রাখে।

খুব ভোরে, তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি, কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা, রাস্তায় কচিৎ দু-একটা গাড়ি বা মানুষ, দু'ধারের হিমে-ভেজা বাড়িঘর অস্পষ্ট ছবির মতো দাঁড়িয়ে—রওনা দিয়েছিল মাসুদ জান। যতই তোয়াজে রাখুক, এটা তো ঠিক, তার মোটরটার বয়স হয়েছে। ফলে স্পিড তোলার সঙ্গে সঙ্গে সেটার ইঞ্জিন থেকে জোরে শ্বাস টানার মতো সাঁই সাঁই আওয়াজ উঠে আসছিল। মাঝেমাঝেই গাড়ির পুরো বডিটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। নিশ্চয়ই কোথাও কোথাও পার্টস আলগা হয়ে গেছে। সেগুলো পালটানো দরকার।

গাড়িটার এতটুকু গোলমাল দেখা দিলে তটস্থ হয়ে ওঠে মাসুদ জান। সর্বক্ষণ তার একমাত্র চিন্তা, কী করে ওটাকে সতেজ, নিখুঁত আর টগবগে রাখা যায়। সে চায় গাড়িটার চাল হবে মসৃণ, রাস্তা দিয়ে রাজকীয় মহিমায় অন্য সব যানকে ম্লান করে ছুটে যাবে।

আজ কিন্তু গাড়িতে ওঠার পর থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে আছে মাসুদ জান। শ্বাসকষ্টের মতো ইঞ্জিনের আওয়াজ বা ঢিলে হয়ে যাওয়া পার্টসের ঝকর ঝকর শব্দ তার কানে ঢুকছিল না। তার চোখের সামনে পঞ্চাশ বছর আগের টুকরো টুকরো দৃশ্য এবং কিছু মানুষজনের মুখ ফুটে উঠছিল।

তাদের বাড়ি ছিল ইলাহাবাদ থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরে একটা গাঁওয়ে যার নাম আজমপুরা। ছেলেবেলায় আব্বাকে হারিয়েছিল সে। আম্মার যখন এন্তেকাল হল তখন তার বয়স বিশ। এক দূর সম্পর্কের চাচা কলকাতায় এক খাঁটি সাদা চামড়ার সাহেবের গাড়ি চালাত। সে-ই গাঁ থেকে মাসুদ জানকে পার্ক সার্কাসের ওই বাড়িটায় নিয়ে আসে। নিজের হাতে ছ'মাস তালিম দিয়ে তাকে ড্রাইভিংটা ভাল করে রপ্ত করিয়ে দেয়। সেটা ইংরেজি উনিশ শ চল্লিশ সাল। কলকাতা তখন খাস ব্রিটিশদের খাসতালুক। বিলেতে সেই সময় জোরদার লড়াই চলছে। তার আঁচ অল্প অল্প লাগতে শুরু করেছে এই শহরে।

তালিম দেওয়ার পর মাসুদ জানের চাচা তাকে এক জাঁদরেল সাহেবের কাছে লাগিয়ে দিয়েছিল। তাঁর নাম মিস্টার ব্রাউন। যে গাড়িটা চালিয়ে সে আজ কামতাপুর চলেছে, ব্রাউন সাহেব সেই চল্লিশ সালে ওটা কিনেছিলেন। এই গাড়িটা চালানোর জন্যই তাকে বহাল করা হয়েছিল। তারপর পঞ্চাশ বছর ধরে এটাই চালিয়ে আসছে সে। সেদিক থেকে মাসুদ জানকে একনিষ্ঠ বলা যায়। সারা জীবনে দ্বিতীয় কোনো গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে তাকে হাত দিতে হয়নি।

ব্রাউন সাহেবের মতো দু'কান-কাটা বদমাস তামাম দুনিয়ায় খুব বেশি জন্মায়নি। তাঁর মেমসাহেব অর্থাৎ মিসেস ব্রাউন তখন বিলেতে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী একটা গোলমাল চলছিল। ফলে মিসেস ব্রাউন দেশে চলে যান। সাহেবপাড়ার গুজব তিনি আর ইণ্ডিয়ায় ফিরে আসবেন না।

ব্রাউন সাহেব এমনিতে লোক খারাপ ছিলেন না। মাইনে ছাড়াও দেদার বকশিস দিতেন। দিনের বেলাটা একরকম কেটে যেত কিন্তু সন্ধের পর তাঁর মাথায় লুচ্চামি ভর করত। প্রচুর মদ টেনে মাসুদ জানকে নিয়ে এই গাড়িটায় বেরিয়ে পড়তেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের রেন্ডিখানা থেকে ডবকা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছুকরি বা সোনাগাছি কি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের বেশ্যাখানা ঢুঁড়ে উচক্কা বয়সের মেয়েমানুষ তুলে নিয়ে চলে যেতেন ময়দানে কি গঙ্গার ধারে। তখন কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের বাতি জ্বলত। তার স্নিগ্ধ নরম আলোয় রাতের শহরটাকে খোয়াবের হুরীর মতো মনে হত। তারই মধ্যে চলন্ত গাড়ির ব্যাকসিটে মাঝরাত পর্যন্ত নিজের জামাকাপড় খুলে এবং মেয়েমানুষগুলোকে উদোম করে, তাদের ধামসে, চটকে ব্রাউন সাহেব যে হুল্লোড় চালাত, এই সত্তর বছর বয়সেও সেসব ভাবলে কানের লতি গরম হয়ে ওঠে মাসুদ জানের। মনে আছে, পারতপক্ষে সে পেছন ফিরে তাকাত না ; ঘাড় টান টান করে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ করে স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বসে থাকত।

সেই আমলে কেল্লায় প্রতি ঘন্টায় ভোঁ দিয়ে সময় ঘোষণা করা হত। বারটা বাজলে ফেরার পালা। প্রথমে ব্রাউন সাহেবের লিটল রাসেল স্ট্রিটের বাড়িতে চলে আসত মাসুদ জান। রাত আটটা বাজলেই দুটো বেয়ারা গেটের সামনে হামেহাল মজুদ থাকত। তারা ক্লান্ত, টলটলায়মান ব্রাউন সাহেবকে প্রায় চ্যাংদোলা করে বাড়ির ভেতর নিয়ে যেত। এরপর যেদিন যে মেয়েকে যেখান থেকে তোলা হত

সেখানে তাকে পৌঁছে দিত মাসুদ জান। সন্ধেয় যে মেয়েগুলো থাকত তাজা, টগবগে, মধ্যরাতে তাদের দিকে তাকানো যেত না। আঁচড়ানো, কামড়ানো, ক্ষতবিক্ষত মাংসের এক একটা পিণ্ড হতে উঠত তারা।

সবাইকে নামিয়ে পার্ক সার্কাসে ফিরতে ফিরতে রোজই একটা বেজে যেত। চাচা রমজান আলি স্নেহপ্রবণ, চমৎকার মানুষ। মাসুদ জান যতক্ষণ না ফিরত, সে অপেক্ষা করত। তারপর খেয়েদেয়ে পাশাপাশি দুই চারপায়ায় দু'জন শুয়ে পড়ত।

প্রথম প্রথম লজ্জায় ব্রাউন সাহেবের বেলেল্লা কাণ্ডকারখানার কথা রমজান আলিকে বলেনি মাসুদ জান। পরে অবশ্য যতটা সম্ভব রেখে ঢেকে জানিয়েছে।

সব শুনে রমজান আলি বলেছে, 'বেটা, পেটের জন্যে আমরা গাড়ি চালাই। ড্রাইভারদের মনিবের ব্যাপারে বহিরা (কালা) আর আন্ধা হতে হয়। গাড়ি চালানো ছাড়া অন্য কোনোদিকে তাকাবে না, পেছনের সিট থেকে যদি কোনো আওয়াজ আসে কানে তুলবে না।'

রমজান আলির প্রতি মাসুদ জানের আনুগত্যের তুলনা নেই। চোখ নামিয়ে সে বলেছে, 'জি—'

'কাজ করে মাসের শেষে তলব নেব—ব্যস। এছাড়া মনিবের সঙ্গে কিসের রিস্তেদারি? সে কী করল, না করল, সেদিকে আমাদের নজর দেওয়ার দরকার নেই।'

'জি।'

যে দুটো বছর মাসুদ জান ব্রাউন সাহেবের গাড়ি চালিয়েছে, সেই সময়টা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তার কাজ থাকত না। শুয়ে, বসে, ঘোর আলস্যে দিন কেটে যেত।

দু'বছর বাদে হঠাৎ ব্রাউন সাহেবকে বিলেতে চলে যেতে হল। যাওয়ার আগে গাড়িটা বেচে দিয়ে গেলেন বউবাজারের বিখ্যাত বাঈজি মোতিবাঈকে। ব্রাউন সাহেব পয়লা নম্বরের লুচ্চা হলেও গান বাজনার সমঝদার ছিলেন ; বিশেষ করে গজলের। মাঝে মধ্যে মোতিবাঈয়ের এক বাবুর সঙ্গে তার জমকাল কোঠিতে গিয়ে গান শুনে আসতেন।

জীবনের প্রথম গাড়ি বলেই হয়ত ওটার ওপর ভীষণ মায়া পড়ে গিয়েছিল মাসুদ জানের। সে ব্রাউন সাহেবের কাছে আর্জি জানিয়েছিল, মোতিবাঈকে বলে তাকে ড্রাইভারের কাজটা যেন দেওয়া হয়। আর্জি মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল। তার দু'নম্বর মনিব মোতিবাঈয়ের মতো সুন্দরী জীবনে আগে আর কখনও দেখেনি মাসুদ জান। যেন বেহেস্তের হুরী। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ ; তার চেয়ে কম করে তের চোদ্দ বছরের বড়।

মোতিবাঈয়ের সমস্ত শরীরটা যেন গোলাপের নির্যাস দিয়ে তৈরি। পদ্মের পাপড়ির মতো চোখের পাতাদুটো স্বপ্নের ঘোরে বুঝিবা সারাক্ষণ আধ-বোজা হয়ে আছে। নিখুঁত, ভরাট মুখ। দুই ভুরুর মাঝখান থেকে পাতলা ফুরফুরে নাক নেমে এসেছে। রক্তাভ ঠোঁট। ডান গালে ছোট একটি তিল মুখটাকে যেন অলৌকিক করে তুলেছে। নিভাঁজ, মসৃণ গলা। দাঁত যেন মোতির সারি। কোঁচকানো চুল কোমর ছাপিয়ে নেমে গেছে।

মোতিবাঈয়ের পরনে সবসময় থাকত রংবেরংয়ের রেশমি সালোয়ার কামিজ বা চুড়িদার। তার নাকছাবিতে, গলার চওড়া হারে বা ব্রেসলেট কি আংটিতে শুধু পান্না আর হীরের দ্যুতি। পোশাকেও থাকত দামি দামি পাথরের ঝলক। সারা গা থেকে ভুর ভুর করে উঠে আসত আতরের খুশবু।

ব্রাউন সাহেবের মতোই মোতিবাঈয়ের কাছে তার ডিউটি ছিল সন্ধের পর। সারাদিন পার্ক সার্কাসের বাড়িতে কাটিয়ে মোতিবাঈয়ের কোঠিতে চলে যেত সে। ব্রাউন সাহেবের আমলে যে ব্যবস্থা ছিল এবারও তার হেরফের হয়নি। ডিউটি শেষ হলে গাড়িটা নিয়ে মাসুদ জান পার্ক সার্কাসে চলে আসত। পরদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওটা তার কাছেই থাকত।

ব্রাউন সাহেবের কাছে যখন মাসুদ জান ছিল, মোটামুটি পরিষ্কার পাজামা আর কুর্তা পরেই গাড়ি চালাত। কিন্তু মোতিবাঈয়ের নজর ছিল অনেক উঁচু। তার গাড়ি যেমন ঝকঝকে তকতকে থাকবে, তেমনি তার চালকের পোশাকও দামি এবং ফিটফাট হওয়া চাই। মাসুদ জানকে চার সেট ধবধবে শেরওয়ানি, কুঁচি-দেওয়া পাজামা আর পাগড়ি কিনে দিয়েছিল সে। প্রথম দিনই জানিয়ে দিয়েছে, রোজ

পাটভাঙা পোশাক পরে আসতে হবে। আজকের পাজামা-টাজামা কাল পরলে চলবে না। এর জন্য ধোবিখানার সব খরচ মাইনে ছাড়াও আলাদা করে দেওয়া হবে। তাছাড়া দাড়ি-টাড়ি পরিষ্কার রাখা চাই। পাগড়ির ডান ধারে জাপানি পাখার মতো যে অংশটা উঁচু হয়ে থাকে তার কুঁচিতে যেন এতটুকু খুঁত চোখে না পড়ে। পায়ের জুতো দুটো রোজ পালিশ করে চকচকে রাখতে হবে।

মোতিবাঈয়ের গলার আওয়াজটা ছিল সেতারের বোলের মতো মিষ্টি, সতেজ আর সুরেলা। প্রথম দিন সে আরো বলেছিল, 'ভাইয়া মাসুদ জান, তোমাকে আরো দু-একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে।'

মোতিবাঈয়ের রূপ ছিল আগুনের হলকার মতো, তার দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ঝলসে যেত। মুখ নামিয়ে মাসুদ জান শুধু বলেছে, 'জি—'

মোতিবাঈ এবার বলেছে, 'রাত্রিবেলা, দশটার পর আমি আর আরেকজন তোমার গাড়ি চড়ে বেড়াতে বেরুব।'

'জি—'

'তুমি স্রেফ সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।'

'জি—'

'পিছনের সিট থেকে যদি কোনো আওয়াজ কানে যায় বিলকুল শুনবে না।'

অর্থাৎ চাচা রমজান আলি যে সব নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সেগুলোই ফের শুনতে হয়েছিল। রমজান আলির মতো মোতিবাঈও বুঝিয়ে দিয়েছে, গাড়ির ব্যাক সিটের আরোহীদের সম্পর্কে তাকে কালা এবং অন্ধ হয়ে থাকতে হবে। মুখ আরো নিচু হয়ে গিয়েছিল মাসুদ জানের। আবছা গলায় এবারও সে বলেছে, 'জি—'

মনে আছে, মোতিবাঈয়ের একটি রইস বাবু ছিল। লোকটা বাঙালি, অঢেল টাকা তার। জোড়াবাগান না শোভাবাজার কোথায় যেন তাদের রাজমহলের মতো বিশাল বাড়ি। লোকটিকে দেখতেও রাজা-বাদশার মতো। নাম দর্পনারায়ণ মল্লিক। মোতিবাঈয়ের পাশে তাঁকে চমৎকার মানাত। এই দুনিয়ার ওপরওলা যেন একজনের জন্যে আরেকজনকে সৃষ্টি করেছেন।

মল্লিকবাবু আসতেন জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে, ঠিক সূর্যাস্তের পর। তাঁর সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধাক্কাপাড় কোঁচানো ধুতির ভাঁজ থেকে দামি বিলিতি সেন্টের যে গন্ধটা উঠে আসত আধ মাইল জুড়ে সেটা বাতাসকে মাতিয়ে রাখত। ব্রাউন সাহেবের মতো তিনিও প্রচুর মদ খেতেন, চোখদুটো সারাক্ষণ লালচে আর ঢুলুঢুলু, পা দুটো টলটলায়মান। ঠোঁটের কোণে শরাবীর হাসি। তবে এটা মানতেই হবে, মদ খেলেও ব্রাউন সাহেবের মতো তিনি উদ্দাম বেলেল্লাপনা কখনও করতেন না।

মোতিবাঈ থাকত দোতলায়। মল্লিকবাবু এসে জুড়িগাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে চোখের কোণ দিয়ে একবার মাসুদ জানের দিকে তাকাতেন। ততক্ষণে সে পার্ক সার্কাস থেকে বউবাজারে এসে শিরদাঁড়া টানটান করে বসে আছে। মাসুদ জান এর মধ্যে জেনে গেছে, মোতিবাঈয়ের হাত ঘুরে যে টাকাটা মাইনে হিসেবে সে পায় সেটা মল্লিকবাবুই দিয়ে থাকেন। এমনকি মোতিবাঈ যে গাড়িটা ব্রাউন সাহেবের কাছ থেকে কিনেছে তাও ওঁরই পয়সায়। কাজেই তাঁকে দেখলেই খাড়া উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম ঠুকত মাসুদ জান।

মনে আছে, মল্লিকবাবু আসার অনেক আগেই সালমা-চুমকি বসানো ঘাঘরা কি চুড়িদার পরে জড়োয়া গয়নায় গা মুড়ে, একেক দিন একেক ছাঁদের চুল বেঁধে তার পাশে সোনার কাঁটা আর টাটকা বেলফুলের মালা জড়িয়ে অপেক্ষা করত মোতিবাঈ।

মল্লিকবাবু এলে বেয়ারা বাবুর্চি বা ড্রাইভারদের পক্ষে দোতলায় যাওয়া ছিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। জাফরিওলা বারান্দা আর লাল-নীল কাচের বন্ধ জানালার ওধারে থেকে দু-এক টুকরো গজল বা ঠুমরির কলি চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসত। মোতিবাঈয়ের যে কণ্ঠস্বরে সারাক্ষণ সেতারের বোল শোনা যেত, গান গাওয়ার সময় সেটা আশ্চর্য মোহময় হয়ে উঠত।

সাড়ে আটটা, ন'টা পর্যন্ত গান বাজনার পর মোতিবাঈ মল্লিকবাবুকে নিয়ে মাসুদ জানের গাড়িতে

উঠে বেড়াতে বেরুত। কোনোদিন তারা যেত কার্জন পার্কের দিকে, কোনোদিন ইডেন গার্ডেনে, কোনোদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশের রাস্তাগুলোতে।

ব্রাউন সাহেবের মতো বেহেড লুচ্চা ছিলেন না মল্লিকবাবু। কোনোদিন তাঁকে মাত্রাছাড়া হুল্লোড়বাজি করতে দেখেনি মাসুদ জান। ব্যাক সিটে পাশাপাশি ঘন হয়ে বসে ফিসফিস করে গল্প করতেন তাঁরা। মাঝেমাঝে হাসির দু-চারটে ঝলক, বা আস্তে আস্তে কোমল খাদে গলা নামিয়ে রেওয়াজি গলায় মাতিয়ে দেওয়া মোতিবাঈয়ের একটু-আধটু গান।

মোতিবাঈয়ের এক নৌকরের কাছে মাসুদ জান শুনেছিল, মল্লিকবাবুর বাড়িতে সুন্দরী স্ত্রী আছে। তবু বাঈজি না পুষলে নাকি বড়লোকি চাল বজায় থাকে না। সেকালের পয়সাওলা মানুষগুলোর এটাই ছিল রেওয়াজ।

তবে গাড়ি চালাতে চালাতে একটা ব্যাপার মাসুদ জানের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ; মোতিবাঈ আর মল্লিকবাবু পরস্পরকে ভালবাসেন। এই ভালবাসাটা পয়সা দিয়ে কেনাবেচার জিনিস নয়, একজনের প্রতি আরেক জনের টানটা যথেষ্ট আন্তরিক।

মোতিবাঈয়ের কাছে বছর চারেক ছিল মাসুদ জান। এই দিনগুলো তার জীবনে সবচেয়ে সুখের সময়। মোতিবাঈ আর মল্লিকবাবুর কাছ থেকে মাইনে ছাড়াও কত জিনিস যে পেয়েছে—দামি দামি পোশাক, গরম কোট, কাশ্মিরি শাল, আংটি, ঘড়ি—তার হিসেব নেই। এই চার বছরের মধ্যে শাদিও হয়েছিল তার। বিয়ের সময় তার বিবিকে হার-চুড়ি- আংটি, এমনি নানা জেবর দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল মোতিবাঈ। তাছাড়া গণ্ডা গণ্ডা রেশমি সালোয়ার-কামিজ, সাজের নানা জিনিস থেকে শুরু করে ঘরকন্নার জন্য থালা-বাসন, চুলা-চাক্কি, সবই গাড়ি বোঝাই করে পাঠিয়ে দিয়েছে। শাদি করা মানে খরচ বেড়ে যাওয়া। সেদিকেও নজর ছিল মোতিবাঈয়ের ; মাসুদ জানের মাইনে দেড় গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল সে।

কিন্তু চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে চারটে বছর যেন হুস করে মিলিয়ে গেছে। তারপরই অঘটনটা ঘটে গেল। প্রচুর মদ খাওয়ার কারণে লিভারটা পচতে শুরু করেছিল মল্লিকবাবুর। ডাক্তাররা বহুবার তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন ; মদ্যপান বন্ধ না করলে তিনি বাঁচবেন না। এই সব সতর্কবাণী তাঁর এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ফলে যা হওয়ার তাই হল ; হুইস্কিই তাঁকে শেষ করে ফেলল। ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মল্লিকবাবুকে বাঁচানো যায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর একেবারে ভেঙে পড়েছিল মোতিবাঈ। তিনদিন বিছানা থেকে ওঠেনি সে, একটানা কেঁদেই গিয়েছিল।

বাঈজি হয়ে কেউ যে তার মৃত বাবুর জন্য শোকে এমন বিধ্বস্ত হতে পারে, দুনিয়ায় আগে কখনও শোনা যায়নি। বউবাজারের অন্য বাঈজিরা থ হয়ে গেছে। গালে হাত দিয়ে ভেবেছে, দেখালে বটে মোতিবাঈ, এ যে শাদি-করা বিবিকেও হার মানিয়ে দিলে!

যাই হোক, মোতিবাঈ শেষ পর্যন্ত শোকটা সামলে উঠেছিল। এদিকে তার জীবনের শূন্য স্থানটা পূরণ করার জন্য কলকাতার বাবুদের লাইন লেগে গিয়েছিল। কেননা মোতিবাঈয়ের মতো বেহেস্তের হুরী আর তার মতো চমকদার গানের গলা বাঈজিপাড়ায় আর একটাও ছিল না। কিন্তু মল্লিকবাবুর এই শহরে মন টিকছিল না তার। এখনকার পাট চুকিয়ে দিয়ে একদিন লখনৌ চলে গিয়েছিল সে। যাওয়ার আগে নানা আসবাবের সঙ্গে গাড়িটাও বেচে দিয়েছিল।

এবার ওটার মালকিন হয়েছিল বাঈজি মহল্লার আরেক বাসিন্দা জহুরাবাঈ। গাড়িটা যে মাসুদ জানের এক টুকরো কলিজা সেটা মোতিবাঈ জানত। তাই জহুরাকে হাত ধরে অনুরোধ করেছিল, তাকে যেন ড্রাইভার হিসেবে রেখে দেয়।

বউবাজারে মোতিবাঈ যেখানে থাকত তার দু'খানা বাড়ির পর ছিল জহুরার বাড়ি। সে মাসুদ জানকে আগে থেকেই চিনত এবং তাকে শান্ত, ভদ্র, ভালমানুষ বলে জানত। মোতিবাঈয়ের অনুরোধ রেখেছিল জহুরা।

জহুরার বয়স তখন চল্লিশের ওপরে। একসময় যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। কিন্তু পরে সারা শরীরে প্রচুর চর্বি জমিয়ে চেহারাটা বেঢপ করে তুলেছে। বিপুল পরিমাণে মদ্যপানের কারণে গলার স্বরটা হয়ে গিয়েছিল খসখসে। সে দারুণ বদমেজাজি ধরনের মেয়েমানুষ। পান থেকে চুন খসলে সবাইকে ধমকে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলত। চাকর-বাকর, বাবুর্চি থেকে শুরু করে যে তবলচি বা সারেঙ্গিওলা তাব গানের সঙ্গে সঙ্গত করত, সবাই সর্বক্ষণ তার ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত।

তবে এটা মানতেই হবে, মোতিবাঈয়ের চেয়ে এতটুকু খারাপ গাইত না জহুরা। বরং তার খসখসে গলায়, বিশেষ করে গজলটা যেন আরো বেশি করে খুলত। শুনলে মনে হত, বুকের ভেতরটা আনচান করে উঠছে।

ব্রাউন সাহেব আর মোতিবাঈয়ের আমলে মাসুদ জানকে গাড়ি চালাতে হত রাত্তিরে। জহুরার কাছে এসে তার ডিউটির সময়টা বদলে গিয়েছিল। তখন দুনিয়া জুড়ে তুমুল লড়াই চলছে। পুরোদমে তার ধাক্কা এসে লেগেছে কলকাতাতেও। আমেরিকান টমিতে সারা শহর বোঝাই। রাস্তায় রাস্তায় সারাক্ষণ মিলিটারি ট্রাক গাঁক গাঁক করে ছুটছে। প্রতিটি পার্কে আত্মরক্ষার জন্য ট্রেঞ্চ আর বড় বড় বাড়ির সামনে উঁচু উঁচু ব্যাফল ওয়াল। শহরটাকে ঘিরে কত যে আর্মি ব্যারাক তার লেখাজোখা নেই। সন্ধের পব রাস্তায় বেরুনো অসম্ভব ব্যাপাব। তখন ব্ল্যাক-আউট চালু হয়েছে, কর্পোরেশন থেকে রাস্তার আলোগুলিতে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছে। সেই তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ সালে কলকাতা যেন এক ভুতুড়ে শহর। তাছাড়া টমিরা সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আকণ্ঠ মদ গিলে সারা কলকাতা তোলপাড় করে ফেলত। রাস্তায় মেয়েটেয়ে দেখলে, তা সে যে বয়সেরই হোক না, ট্রাক বা জিপে জোর করে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যেত। ফলে ভয়ে কোনো মেয়ে সন্ধের পর পারতপক্ষে বাইরে বেরুত না।

তাই হাওয়া খাওয়ার সময়টা পালটে নিয়েছিল জহুরাবাঈ। চেহারাটা যতই চর্বির ঢিবি হয়ে যাক না, তারও একজন বাবু ছিল। সব ডেকচিরই তো ঢাকনা থাকে। এই বাবুটি মারোয়াড়ি, যুদ্ধের বাজারে মিলিটারিতে নানারকম মাল সাপ্লাই দিয়ে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছে। তার নাম লচ্ছিন্দর ঝুনঝুনওলা। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন। জহুরা যদি চর্বির ঢিবি হয়, লচ্ছিন্দর হল মেদের আস্ত একটি পাহাড়।

অঢেল পয়সা হলে যা হয়, একটি নামজাদা রক্ষিতা বা খানদানী বাঈজি না পুষলে জাতে ওঠা যায় না। তাই দালাল লাগিয়ে বউবাজারের গলিতে জহুরাকে খুঁজে বার করেছিল সে। ব্রাউন সাহেব ছিলেন পয়লা নম্বরের লম্পট কিন্তু লুচ্চামিতে লচ্ছিন্দর তাঁর নাক এবং কান কেটে নিতে পারত। লোকটা মদ মাংস ডিম বা মাছ কিছুই খেত না। একেবারে ঘোর নিরামিষাশী। তাছাড়া পান বিড়ি সিগারেটও ছিল তার কাছে অস্পৃশ্য। যার মধ্যে আমিষ বা নেশার জিনিস এক রত্তিও ঢোকেনি, তেমন একটি পবিত্র শরীর নিয়ে যখন সে বাঈজিপাড়ায় আসত তখন লচ্ছিন্দর একেবারে আলাদা মানুষ। ভরদুপুবে জহুরাকে গাড়িতে তুলে বেরিয়ে পড়ত। যে যে দিকে মিলিটারিদের চলাচল কম, মাসুদ জানকে হুকুম দিয়ে সেই সেই সব জায়গায় নিয়ে যেত। সামনের দিকে চোখ রেখেও টের পেত ব্যাক সিটে দু'হাতে মাঝবয়সী জহুরার শরীরটা সমানে খোবলাচ্ছে লচ্ছিন্দর। তাছাড়া জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আরো যেসব আওয়াজ ভেসে আসত তাতে মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকত মাসুদ জানের।

ব্রাউন সাহেব মেয়েমানুষ নিয়ে যা করত সবই রাতের অন্ধকারে। কিন্তু লচ্ছিন্দর প্রকাশ্য দিবালোকে লুচ্চামির চূড়ান্ত করে ছাড়ত। লোকটা কথা বলত খুব কম। তার দুই হাত আর শরীরই যা করার করত। সারা দুপুর ফুর্তি লোটার পর বিকেলে তাকে গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দিতে হত। সেখানে জামাকাপড়-সুদ্ধু গোটাকতক ডুব দিয়ে, গা থেকে সব পাপ মুছে, নিজেকে আগাগোড়া শুদ্ধ করে ফিরে যেত তার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। পরের দিন, তার পরের দিন, তারও পরের দিন, নিয়মিত রোজই এক ঘটনা ঘটে যেত।

বছর ছয় সাতেক জহুরাবাঈদের কাছে ছিল মাসুদ জান। তারপর বাঈজি সম্পর্কে অরুচি ধরে গেল লচ্ছিন্দরের। এতকাল আমোদ-ফুর্তি করে ইহকালের সেবা করেছে, এবার পরকালের দিকে নজর দিল সে। ব্যবসা ট্যবসার ফাঁকে সময় পেলেই হরিদ্বার, দ্বারকা, পুরী কি রামেশ্বরে নিজের বিয়ে-করা স্ত্রীকে

নিয়ে ছুটত। উত্তরকাশীতে এক বড় যোগীর কাছে মন্ত্র নিয়েছিল। বছরে বার চারেক তার কাছে না গেলেই নয়।

এদিকে দেশে আজাদি এসে গেছে। জহুরাবাঈয়ের বয়সও হয়ে গিয়েছিল যথেষ্ট। লচ্ছিন্দর ধর্মকর্মে মন দেওয়ার পর রোজগার বন্ধ হল তার। পঞ্চাশ বছরের বাঈজি, যার চুল আধাআধি পেকে গেছে, শরীরে যৌবনের ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট নেই, এই বয়সে তাকে কে পুষবে? ফলে খরচ কমানো দরকার। জমানো যে টাকা ক'টা আছে তাই দিয়ে বাকি জীবনটা তো কাটাতে হবে।

জহুরা তার গাড়িটা একটা যুবতী বাঈজির কাছে বেচে দিল এই শর্তে, মাসুদ জানকে ড্রাইভার হিসেবে রাখতে হবে। শর্তটা অবশ্য আগের দু'বারের মতো তার আর্জিতেই করা হয়েছিল।

মাসুদ জানের তিন নম্বর মালকিন হল চামেলি বাঈ। তার পয়সার লালচ ছিল মারাত্মক। একটা নয়, দু দু'টো বাবু ছিল তার। এটা কোনো ঢাক ঢাক গুড় গুড় ব্যাপার নয়। দুই বাবুকেই সে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, একজনের টাকায় তার পোষাবে না। যদি এতে কারুর আপত্তি থাকে অন্য বাঈজির কাছে যেতে পারে। চামেলি বাঈয়ের একনিষ্ঠতা নিয়ে ওদের শুচিবাই ছিল না। দু'জনেই তার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল।

চামেলি বাঈয়ের এক বাবু আসত দুপুরের দিকে। খানিকটা সময় বাড়ির ভেতর কাটিয়ে তাকে নিয়ে মাসুদ জানের গাড়িতে বেরিয়ে পড়ত সে। বিকেল পর্যন্ত বেড়িয়ে সূর্যাস্তের আগে আগে ফিরে আসত। সন্ধের পর আসত তার দু'নম্বর বাবু। দু-চারটে গান শুনে সে-ও মাসুদ জানের গাড়িতে তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত। ফিরতে ফিরতে মাঝরাত। দুপুর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত প্রায় একটানা গাড়ি চালিয়ে একেক দিন প্রাণ একেবারে লবেজান হয়ে যেত তার।

তবে একটা কথা মানতেই হবে, যে সব বাঈজির কাছে সে কাজ করেছে তাদের দিল ছিল দরাজ, হাত ছিল মুক্ত। জহুরা বাঈয়ের কাছে যে তলব সে পেত তা দ্বিগুণ করে দিয়েছিল চামেলি।

চামেলি বাঈয়ের কাছে নৌকরি করার সময় তার বিবি আর বাচ্চারা মারা যায়। পর পর এতগুলো শোকে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল মাসুদ জান। যতদিন সে চাকরি করেছে সেই একবারই আপনজনদের মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে মাস দেড়েকের ছুটি নিয়েছিল। তারপর সামলে উঠে ফের গাড়ি চালানো শুরু করে।

চামেলি বাঈদের কাছেও বেশিদিন থাকা হয়নি। বড় জোর বছর তিনেক। তার দুই বাবুর কারুরই বড় বড় ঢাউস হেডলাইটওলা, বিউগল শেপের হর্ন-লাগানো আদ্যিকালের মোটর আদৌ পছন্দ নয়। ততদিনে নতুন নতুন মডেলের ঝকঝকে সব গাড়ি বাজারে এসে গেছে। তেমন গাড়িতে চড়ার শখ চামেলি বাঈয়েরও। সে ঠিক করে ফেলেছিল, পুরনো মোটরটা বেচে দেবে। দু-চারজন খদ্দেরের আনাগোনাও শুরু হয়েছিল। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল গাড়িটাই শুধু কিনবে, ড্রাইভারের দরকার নেই। চালাবার লোক ওদের আছে। মাসুদ জান ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শুরু থেকেই গাড়িটা চালিয়ে আসছে সে। ওটার ওপর মায়া পড়ে যাওয়া ছাড়াও হঠাৎ অন্যের হাতে ওটা চলে গেলে চাকরির জন্য এই বয়সে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? ব্রাউন সাহেবকে বাদ দিলে পার্ক সার্কাসের ওই বাড়ি আর বউবাজারের বাঈজিপাড়ার বাইরে আর কাউকেই সে চিনত না।

ঘোর উৎকণ্ঠায় যখন দিন কাটছে সেইসময় চামেলি বাঈয়ের কাছে গিয়ে সেলাম করে খুবই বিনীতভাবে মাসুদ জান বলেছে, 'মালকিন, আমার একটা কথা আছে।'

চামেলি জিজ্ঞেস করেছে, 'কী কথা?'

'গাড়িটা তো আপনি বেচে দিচ্ছেন। আমাকে যদি দেন—'

'তুমি কিনবে?'

'জি—'

রীতিমত অবাকই হয়ে গিয়েছিল চামেলি বাঈ। জানতে চেয়েছে, 'কিনবে যে, দাম দেবে কী করে?'

মাসুদ জান জানিয়েছিল, এতদিন নানা জনের কাছে নৌকরি করে যে তলব পেয়েছে তার থেকে

কিছু কিছু করে বাঁচিয়ে আট হাজার টাকা জমিয়েছে। কিছু ঘড়ি আংটি বকশিসও পেয়েছিল। তাছাড়া মৃত বিবির জেবরও আছে। সেসব বেচে দিলে আরো দু-আড়াই হাজার পাওয়া যাবে।

সমস্ত শুনে চামেলি বাঈ বলেছে, 'মতলব, তুমি দশ সাড়ে দশহাজার দিতে পার।'

'জি—'

'পুরা টাকাটা দিলে তোমার হাতে তো কিছুই থাকবে না।'

এ কথার কী আর উত্তর দেবে মাসুদ জান? সে চুপ করে থেকেছে।

একটু চিন্তা করে চামেলি বাঈ এবার বলেছে, 'একজন গাড়িটার দাম দিতে চেয়েছে সাত হাজার, একজন সাড়ে সাত হাজার। আমি জানি ওটার ওপর তোমার মায়া পড়ে গেছে। তুমি আমাকে তিন হাজারই দিও। বাকি টাকাটা হাতে রাখবে।'

কৃতজ্ঞতায়, খুশিতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল মাসুদ জান। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি সে। যে আওরত গলার স্বর আর শরীর বেচে পয়সা কামায় তার ভেতর এত বড় একটা দিল যে থাকতে পারে তা কোনোদিন ভাবতে পারেনি। একসময় মাসুদ জান টের পায় তার দু চোখ জলে ভরে গেছে। কপালে আদাবের ভঙ্গিতে হাত ঠেকিয়ে বলেছে, 'মালকিন, আপনার মেহেরবানি সারা জিন্দগীতে ভুলব না। লেকেন—'

'লেকেন কী?'

'তিন হাজার দিলে আপনার বহুত নুকসান হয়ে যাবে। আমি আপনাকে চার হাজার দেব। জেবরগুলো আমার বিবির ইয়াদগার। আপনার মেহেরবানিতে ওগুলো আমার কাছে থেকে যাবে। তা ছাড়া আট হাজারের চার হাজার গেলে আরো চার হাজার থাকবে।'

চামেলি বাঈ হেসে বলেছে, 'ঠিক হ্যায়।'

'আপনার যদি কখনও এই গাড়িটা চড়তে ইচ্ছে হয়, হুকুম করবেন। আমি গাড়ি নিয়ে হাজির হযে যাব।'

'শুনে খুব খুশি হলাম। তেমন মর্জি যদি সত্যিই হয়, তোমাকে খবর দেব।'

'আদাব—'

'আদাব।'

চামেলিবাঈয়ের করুণায় গাড়িটার মালিকানা শেষ পর্যন্ত তারই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই পুরনো মোটর চড়ার লোক তেমন পাওয়া যাচ্ছিল না। বউবাজারের আধবুড়ো বাঈজিরা মাঝে মাঝে তার গাড়িটা ভাড়া করে তাদের বাবুদের নিয়ে চড়েছে। মাঝেমধ্যে শখ হলে ছুকরি বাঈজিরাও তাকে ডেকে পাঠাত। সব মিলিয়ে মাসে দশ পনের দিনের মতো ভাড়া খাটত গাড়িটা। একা মানুষের পক্ষে তাতেই ভালভাবে চলে যেত। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল ওটার চাহিদা ক্রমশ কমে আসছিল।

গাড়িটা মাসুদ জানের দিলের বা জানের টুকরা হতে পারে, কিন্তু শুরু থেকে দুশ্চরিত্র শরাবী লুচ্চা আর বেশ্যা-বাঈজি ছাড়া ওটায় একবার উঠেছিল তিন ডাকু। ডাকাতি করে পালানোর সময় পুলিশের তাড়া খেয়ে তার গাড়িতে জোর করে উঠে পড়েছিল তারা এবং গলায় ছোরা ঠেকিযে বরানগরের ওধারে একটা গলির মুখে ওদের ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছিল। এই নিয়ে মাসুদ জানেব ওপর দিয়ে পুলিশের হুজ্জুৎ কম যায়নি। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে তার জান বেরিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছিল।

যে সব বাঈজি তার গাড়ি চড়েছে তাদের মধ্যে মোতিবাঈ আর জহুরাবাঈ ছিল সত্যিকারের কলাকার। পয়সার জন্য শরীর বেচলেও গান ছিল তাদের পয়লা পেয়ার। রোজ ভোরে উঠে তবলচি আর সারেঙ্গিওলাদের নিয়ে ঘন্টা তিন চারেক রেওয়াজ করত। তাদের যারা বাবু ছিল তারা গানবাজনার সমঝদার। কিন্তু পরে যে বাঈজিরা তার গাড়ির সাওয়ার হয়েছে তারা স্রেফ ভাদ্রমাসের কুত্তী। তারা বাঈজি হওয়ার মতো কাবিল নয়। শরীর ছাড়া ওরা আর কিছু বুঝত না। ওদের চাই টাকা, অঢেল অপর্যাপ্ত টাকা। আর সেটা স্রেফ শরীর ভাঙিয়ে। গানের চর্চা যে তারা করত না তা নয়। সেসব সস্তা চটকদার সিনেমার গান। কালোয়াতি বা ওস্তাদি গানের ধারে কাছে তারা ঘেঁষত না।

মাসুদ জানের চাপা একটা আফসোস আছে। গাড়িটা তার জানের টুকরা হলেও ওটায় কোনো ভাল, সৎ, পবিত্র মানুষ কখনও চড়েনি।

এই যে জীবনের সত্তরটা বছর কাটিয়ে, চুলদাড়ি যখন ধবধবে সাদা আর ঢিলে চামড়ায় লক্ষকোটি ভাঁজ, কলকাতা ছেড়ে সে কামতাপুরে চলেছে, সেখানেও তার গাড়িতে চড়বে রঘুবন্ত সিংয়ের রক্ষিতা চম্পা। তার নসিবই এই, সৎ ভালমানুষকে এ জীবনে সওয়ার হিসেবে আর পাওয়া গেল না।

সময়ের উজান টানে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের সেই দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিল মাসুদ জান। হঠাৎ তার খেয়াল হল, কলকাতা থেকে অনেক দূরে ন্যাশনাল হাইওয়েতে চলে এসেছে।

পার্ক সার্কাস থেকে যখন সে বেরিয়েছিল গোটা শহর সারা গায়ে হেমন্তের ঘন কুয়াশা জড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। এখন কুয়াশার চিহ্নমাত্র নেই। সূর্য সোজা মাথার ওপর উঠে এসেছে।

হাইওয়ের দু'ধারে অবারিত ফসলের খেত। যতদূর চোখ যায়, সেই দিগন্ত পর্যন্ত পাকা ধানের সোনালি লাবণ্যে ছেয়ে আছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই ফসল কাটা শুরু হয়ে যাবে।

ধানবনে ঢেউ তুলে উলটো পালটা বয়ে যাচ্ছে উত্তুরে হাওয়া। সমস্ত চরাচর জুড়ে নুয়ে পড়া পাকা ধানের আওয়াজ উঠছে—ঝুন ঝুন। মাথার ওপর উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে ভিনদেশি টিয়া। ধান পাকার খবর পেয়ে তারা আকাশ পাড়ি দিয়ে এখানে চলে এসেছে।

এই ভরদুপুরেও রোদের তাত তেমন তীব্র নয়। উত্তুরে বাতাসে যে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজটুকু এখনও রয়েছে তা বড়ই আরামের।

স্মৃতির ভেতর থেকে উঠে এসে একবার চারপাশে তাকায় মাসুদ জান। লম্বা হাইওয়েটা মোটামুটি ফাঁকাই। মাঝে মাঝে উলটো দিক থেকে গাঁক গাঁক করে লরির কনভয় পাশ দিয়ে কলকাতার দিকে চলে যাচ্ছে।

এতক্ষণে তার খেয়াল হল, ভীষণ খিদে পেয়েছে। ভোরে নিজের হাতে চা বানিয়ে খেয়েছিল ; সেই সঙ্গে দু'খানা বাসি রুটি। তাছাড়া এতটা বেলা পর্যন্ত পেটে আর কিছু পড়েনি।

হাইওয়ের ধারে ধারে পাঞ্জাবিদের যে অনেক ধাবা আছে, মাসুদ জান তা জানে। আরো ঘন্টাখানেক পর একটা ধাবা পাওয়া গেল। সেখানে গাড়ি থামিয়ে, হাত-মুখ ভাল করে ধুয়ে, পেট ভরে রুটি-তড়কা আর বড় এক গেলাস লস্যি খেয়ে আবার চলা শুরু।

বিকেলের কিছু আগে আগেই পশ্চিম বাংলার বর্ডার পেরিয়ে বিহারে পৌঁছে গেল গাড়িটা। কিভাবে, কোন রাস্তা ধরে বর্ডার থেকে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কামতাপুরে যাওয়া যাবে তার পরিষ্কার একটা ছক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন রঘুবন্ত সিং। সেইমতো হাইওয়ে থেকে বাঁ দিকের পথটা ধরল মাসুদ জান।

মাইল তিরিশেক চলার পর সূর্য যখন পশ্চিম আকাশের অনেকটা পাড়ি দিয়ে দিগন্ত ছুঁতে চলেছে, রোদের রং যখন বাসি হলুদের মতো ম্যাড়মেড়ে সেই সময় দেখা গেল ডান দিকের মাঠ ভেঙে দুটো লোক মাথার ওপর হাত তুলে নাড়তে নাড়তে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। তারা সমানে চিৎকার করছিল, 'মোটর রুখিয়ে, মোটর রুখিয়ে---'

প্রথমটা ভীষণ চমকে উঠেছিল মাসুদ জান। এখানে চারদিক সুনসান। হাইওয়ের ফ্যাকড়া এই রাস্তাটার দু'ধারে পশ্চিম বাংলার মতোই পাকা ধানের খেত। অনেক দূরে দূরে আবছা দু-একটা গাঁ। মানুষজন কেউ কোথাও নেই। তবে প্রচুর পাখি উড়ছে আকাশ জুড়ে। এর মধ্যে ওই লোকদুটো মাটি ফুঁড়ে কোত্থেকে যে বেরিয়ে এল, কে জানে। ওদের কোনোরকম বদ মতলব আছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না।

একটু দুশ্চিন্তা যেমন হচ্ছিল, তেমনি তার পাশাপাশি কিছুটা কৌতূহলও বোধ করছিল মাসুদ জান। শেষ পর্যন্ত ভাবল, দেখাই যাক না, লোকদুটো তার কাছে কী চায়। গাড়ির গতি খানিকটা কমিয়ে দিল সে। তেমন বুঝলে ফের স্পিড বাড়িয়ে দেবে।

চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যে লোকদুটো ধানখেত পেরিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে গাড়িটার পাশে চলে আসে। কাছাকাছি আসতে দেখা যায় দু'জনেই দেহাতী মানুষ, বয়স ষাটের ওপরে। একজনের পরনে খাটো ধুতি আর হাফ-হাতা জামা। আরেক জনের ধুতির ওপর মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি। তাদের জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই, সারা গা রক্তে মাখামাখি। একজনের মাথা ফেটে অনেকটা জায়গা হাঁ হয়ে আছে। আরেক জনের কপাল ঢিবির মতো ফুলে রয়েছে আর থুতনির মাংস ডেলা পাকিয়ে ঝুলে পড়েছে। সেখান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে। শুধু মুখ এবং মাথাই নয়, ভাল করে লক্ষ করতে মাসুদ জানের চোখে পড়ল, তাদের হাতে, পায়ের গোছে এবং কাঁধে অগুনতি চোটের দাগ। দু'জনেরই চোখেমুখে আতঙ্কের চিহ্ন। বোঝা যায়, লাঠি বা অন্য কোনো ভারি ভোঁতা হাতিয়ার দিয়ে লোকদুটোকে এলোপাথাড়ি পেটানো হয়েছে।

এই বয়সের দুটো মানুষকে এমন মারাত্মকভাবে কেউ মারতে পারে তা যেন ভাবা যায় না। অসীম উৎকণ্ঠায় মাসুদ জান জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে তোমাদের? এভাবে জখম হলে কী করে?'

দুটো লোকের মধ্যে একজন বেশ ঢ্যাঙা আর রোগা। আবেক জনের গোলগাল, ভারি চেহারা। ঢ্যাঙা লোকটা হাতজোড় করে বলে, 'মিঞা সাব, আমাদের জন্যে চিন্তা করবেন না। চারগো বদনসিব লেড়কীকো কিরপা করকে বঁচাইয়ে।'

এবার গাড়িটা পুরোপুরি থামিয়ে দেয় মাসুদ জান। রক্তাক্ত, ভয়ঙ্করভাবে জখম লোকদুটো নিজেদের কথা বলছে না ; চারটি মেয়েকে বাঁচানোর জন্য ব্যাকুলভাবে শুধু আর্জি জানাচ্ছে। জীবনে ওদের এই প্রথম দেখল সে। ওরা কোথায় থাকে, কী করে, পরিচয়ই বা কী, কিছুই জানা নেই। তার ওপর যে চারটে মেয়েকে বাঁচানোর জন্য ছুটে এসেছে তাদের তো চোখেই দেখেনি।

মাসুদ জান বিমূঢ়ের মতো একের পর এক প্রশ্ন করে যায়, 'যে লেড়কীদের কথা বলছ তারা কারা? ওদের বাঁচাতে হবে কেন? কোনো বিপদে পড়েছে কী?'

'হাঁ, বহুৎ ভারি খতরা। আমাদের সঙ্গে এখনই চলুন। নইলে ভূচ্চরের ছৌয়া জগনলাল ওদের তুলে নিয়ে যাবে।' তুলনায় খাটো চেহারার লোকটা মাসুদ জানের একটা হাত চেপে ধরে।

প্রথমে অচেনা দুটো লোক, তারপর অদেখা চারটে মেয়ে, এখন তার ওপর কে এক ভূচ্চরের বাচ্চা জগনলাল এসে গেল। মাথার ভেতর সব গুলিয়ে যায় মাসুদ জানের। সে বলে, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

লোকদুটো শ্বাসরুদ্ধ মতো একসঙ্গে বলে ওঠে, 'আমাদের গাঁওয়ে চলুন। নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন। চলিয়ে, তুরন্ত চলিয়ে—'

লোকদুটোর তীব্র আকুলতা মাসুদ জানকে ভেতরে ভেতরে এবার নাড়া দিয়ে যায়। তার ওপর কৌতূহলটা তো ছিলই। ওদের কথা থেকে যেটুকু আঁচ পাওয়া গেছে তাতে মনে হচ্ছে ওদের সঙ্গে গেলে বিপদের ঝুঁকি আছে। তবু অদৃশ্য কেউ যেন জানিয়ে দিল, এই বয়স্ক গাঁওবালা দুটোর সঙ্গে যাওয়াটা খুবই জরুরি। মাসুদ জান জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের গাঁও কোথায়?'

ঢ্যাঙা লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে ধানখেত যেখানে শেষ হয়েছে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'উঁহা—'

অবাক হয়ে মাসুদ জান বলে, 'এই ধান জমিনের ওপর দিয়ে ওখানে যাব কী করে?'

ঢ্যাঙা লোকটা জানায় পাকা রাস্তা ধরে সামনের দিকে খানিকটা গেলে ডান ধারে একটা কাঁচা মেঠো পথ অর্থাৎ 'কাচ্চী' পাওয়া যাবে। ওটা দিয়ে মোটরে করে তাদের গাঁয়ে পৌঁছুতে দশ মিনিটও লাগবে না।

'লেকেন—'

'কী?'

'তোমাদের যা হাল, যেভাবে খুন ঝরছে তাতে এখনই হাসপাতালে যাওয়া দরকার।'

'আমাদের কথা পরে ভাবব, আগে লেড়কী চারটে তো বাঁচুক।'

এত করে বলা সত্ত্বেও মাসুদ জানের সংশয়টা যে পুরোপুরি কেটেছে তা বলা যায় না। তবু একটু

দ্বিধান্বিতভাবে সে বলে, 'ঠিক হ্যায়, আমাব গাড়িতে উঠে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।' বলে পেছন দিকের দরজাটা খুলে দেয়।

লোকদুটো খানিক ইতস্তত করে বলে, 'আমাদের খুন লেগে যাবে আপনার গাড়িতে—'

'তোমরাই তো বললে লেড়কীগুলোকে বাঁচাতে হবে। লাগুক খুন, উঠে পড।'

লোকদুটো বুঝিবা আগে কখনও মোটরে চড়েনি। তারা উঠে ব্যাক সিটে জড়সড হয়ে বসে থাকে। মাসুদ জান গাড়িতে ফের স্টার্ট দেয়। অজানা এক গ্রামের দিকে যেতে যেতে প্রশ্ন করে করে ওদের কাছ থেকে যা জানা যায় তা এইবকম। যে মাথায় বেশি লম্বা তার নাম ধনপত, অন্যজন হল গণেরি। তাদের গাঁয়ের নাম মনচনিয়া। পাশাপাশি ওদের বাড়ি। দু'জনেরই কয়েক বিঘা করে জমিজমা আছে। সেখান থেকে বছরে দু'বার যে ফসল ওঠে তাতে মোটামুটি চলে যায়। বংশ পরম্পরায় ধনপত আর গণেরি চাযবাস নিয়েই আছে। তারা লেখাপড়া জানে না, বিলকুল আনপড়।

ধনপতের দুই মেয়ে, দু'টিরই বিয়ে হয়ে গেছে। এক মেয়ে থাকে ঝরিয়ায়, অন্যটি হাজাবিবাগে। গণেরির একটাই ছেলে। শখ করে তাকে তিন মাইল দূরের স্কুলে পাঠিয়েছিল। ম্যাট্রিক পাস করার পর সে স্রেফ জানিয়ে দিয়েছে, জমি চযার মতো ছোট কাজ কববে না। আজকাল পিছড়ে বর্গের অর্থাৎ পিছিয়ে-থাকা মানুষদের জন্য অনেক চাকরি-বাকরিব ব্যবস্থা আছে। সরকারি বিজলি কোম্পানিতে একটা কাজ জুটিয়ে সে বৈশালী চলে গেছে। সেখানে নিজেব পছন্দমতো বিয়ে করেছে, বাপের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই চলে। গণেরির ঘরবালী মারা গেছে বছর সাতেক আগে। দুনিয়ায় সে একেবারে একা। ধনপতের ঘরবালী অবশ্য এখনও জীবিত ; তবে বাত এবং অন্য সব রোগে একেবারে অথর্ব হয়ে পড়েছে।

আজন্ম তারা পড়শিই শুধু নয়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। সারাদিন দু'জনে নিজেদের জমিতে বা বাড়িতে কাজ করে। সন্ধের পর গাঁয়ের পণ্ডিত এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণ ঝমনলাল ঝা'র বাড়িতে তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠের যে জমায়েত হয় সেখানে গিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত পাঠ শোনে। মোটামুটি এই হল তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের তালিকা। এর মধ্যে বড় রকমের কোনো চমক ও চোখধাঁধানো ঘটনার সুযোগ নেই। বছরের পর বছর এইভাবে, খুবই ঢিমে তালে সময় কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু আজ সকালে যা ঘটল, তাদের যাট-বাযট্টি বছরেব জীবনে কোনোদিন ওবা তা চিন্তাও করতে পারেনি। ব্যাপারটা যতটা চমকদার, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

তাদের গাঁ থেকে তিন-চার মাইল দূরে বড় একটা গঞ্জ রয়েছে ; নাম ভোগবানি। তার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বরখা নদী। গঞ্জটাকে ঘিরে মাঝারি মাপেব জমজমাট একটা টাউন গড়ে উঠেছে। ভোগবানির একধারে প্রচুর বাড়িঘর নিয়ে শহব ; আরেক দিকে নদীর পাড় ঘেঁষে ধান চাল গেঁহুর সারি সারি আড়ত। এখানেই অনেকটা ফাঁকা জায়গা জুড়ে সপ্তাহে একদিন বিরাট হাট বসে। চলে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একটানা।

ফি হাটবারেই ধনপত আর গণেরি ভোগবানিতে কেনাকাটা করতে যায়। আজও ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে পড়েছিল। ওরা যখন হাটের কাছাকাছি চলে এসেছে সেই সময় রোদ উঠে গেছে। তবে তখনও তেমন লোকজন আসেনি, সেভাবে বিকিকিনিও শুরু হয়নি।

হাটের মূল জায়গা থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা বহুকালের পুরনো গুদাম টুটোফাটা টিনের চাল মাথায় নিয়ে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। এক কালে ওটা ছিল এক মারোয়াড়ীর। সে মারা গেলে বহুকাল ফাঁকা পড়ে থাকার পর কিছুদিন হল জগনলাল ওটার দখল নেয়।

জগনলাল এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বন্দুকবাজ। তার অনেক সাকরেদ। এরা মোটা টাকা নিয়ে মানুষ খুন করে। চুনাওয়ের সময় নেতাদের হয়ে ভোটের কাজও করে থাকে। ওদের দাপটে তিরিশ চল্লিশ মাইলের ভেতর যত লোকজন রয়েছে সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। পুলিশের সঙ্গে, বড় বড় নেতাদের সঙ্গে জগনলালের ওঠাবসা।

মনচনিয়া গাঁ থেকে হাটে ঢুকতে হলে ওই ফাঁকা গুদামটার পাশ দিয়ে যেতে হয়। ধনপতরা যখন

ওটার সামনে এসে পড়েছে সেই সময় হঠাৎ ভেতর থেকে অনেকগুলো মেয়ের কান্না আর চিৎকার ভেসে আসতে থাকে, 'বাঁচাও—বাঁচাও—'

পড়ো গুদামটার পাশ দিয়ে আগে বহুবার হাটে গেছে ধনপতরা ; জগনলাল আর তার সাকরেদদের বারকয়েক ওখানে দেখেছেও কিন্তু আগে কখনও কোনো মেয়ে চোখে পড়েনি বা তাদের গলাও শোনা যায়নি। দু'জনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

মেয়েগুলো একনাগাড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল, 'কে আছ, আমাদের এখান থেকে বার করে নিয়ে যাও। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

তারা যে বাঙালি সেটা কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছিল। বাংলা ভাষাটা বলতে না পারলেও মোটামুটি বুঝতে পারে ধনপতরা। এই ফাঁকা গুদাম ঘরে কোত্থেকে বাঙালি মেয়েরা এসে জুটল ভেবে পাচ্ছিল না তারা। ওদের করুণ, আর্ত চিৎকার ধনপতদের বুকের ভেতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। একবার ধনপতরা ভেবেছে, এ সব ঝঞ্ঝাটে, বিশেষ করে যার মধ্যে জগনলাল জড়িয়ে আছে, মাথা না গলানোই বুদ্ধিমানের কাজ কিন্তু নিজেদের অজান্তেই তারা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

চিন্তিতভাবে গণেরি জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী করা যায় বল তো?'

ধনপত বলেছে, 'বুঝতে পারছি না।'

'আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'মেয়েগুলোকে বাঁচানো দরকার।'

'লেকেন জগনলাল কিরকম খতরনাক আদমি তা তো জানো।'

কিছুক্ষণ ভেবে গণেরি বলেছে, 'দুনিয়ার সবাই তা জানে। তাই বলে মেয়েগুলোর সর্বনাশ হয়ে যাবে?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে ধনপত কিন্তু কোনো উত্তর দেয়নি। গণেরি এবার গুদামটার খুব কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে ফিরে এসেছিল কিন্তু কাউকেই দেখতে পায়নি। সে বলেছে, 'মনে হচ্ছে, জগনলালের সঙ্গে যে ভূচ্চরের ছৌয়াগুলো ঘোরে তারা এখন কেউ নেই।'

ধনপত বলেছে, 'হাঁ। থাকলে লেড়কীগুলো অমন করে চিল্লাতে পারত না।'

গণেরি বলেছে, 'চল। ভেতরে গিয়ে একবার দেখি।'

ধনপতের সাহস হচ্ছিল না। ভয়ে ভয়ে সে বলেছে, 'লেকেন—'

'কী?'

'জগনলাল টের পেলে—'

ধনপতকে থামিয়ে দিয়ে গণেরি এবার বলেছে, 'এস তো—' আসলে মেয়েগুলোর কাতর লাগাতার চিৎকার তাদের খুবই বিচলিত করে তুলেছিল। তা ছাড়া ধনপতের তুলনায় সে অনেক বেশি সাহসী।

গুদামটার সামনের দিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। বহুকাল লোকজনের যাতায়াত ছিল না বলে প্রচুর আগাছা গজিয়ে উঠেছে। অবশ্য কিছু গাছপালা ঝোপঝাড় ছেঁটে পায়ে চলার সরু পথ তৈরি করা হয়েছে। ওটা যে জগনলালদের কাজ সেটা বোঝা যায়।

আগাছার ঝোপ পেরুলে টিনের চালের বিশাল গুদামটার সামনের দিকে লোহার গুল-বসানো প্রকাণ্ড দরজা। পুরনো হলেও এখনও বেশ মজবুত। দরজাটার বাইরে মোটা শেকল তুলে রাখা ছিল। ধনপতদের মনে হয়েছিল, কেউ বেরিয়ে গিয়ে ওভাবে গুদামটা বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে ভেতরকার মেয়েগুলো বেরুতে না পারে। যে-ই শেকল তুলে দিক সে যে কাছেই কোথাও গেছে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। কেননা বেশি দূর গেলে নিশ্চয়ই তালা দিয়ে যেত।

শেকল খুলতেই ভেতরকার কান্নাকাটি এবং চিৎকার মুহূর্তে থেমে যায়।

বাইরে থেকে গণেরি বলে, 'চুপ করে গেলে কেন? কে আছ, বেরিয়ে এস—'

তবু সাড়াশব্দ নেই।

এবার দু'জনে ভেতরে ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চারটে মেয়ে—ষোল থেকে কুড়ির ভেতর বয়স—হুড়মুড় করে তাদের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে। ওদের চোখেমুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছাপ। মনে হয়, বেশ কয়েক দিন তারা খায়নি, ঘুমোয়নি। গণেরি বলে, 'এতক্ষণ ধরে তোমাদের ডাকাডাকি করছি, জবাব দিচ্ছিলে না কেন?'

মেয়েগুলোর মধ্যে যে বয়সে সবার বড় সে রুদ্ধস্বরে বলে, 'আমরা ভেবেছিলাম ওই লোকটা ফিরে এসেছে।'

'কোন লোকটা?'

'ওই বড় বড় মোচওলা—আমাদের যে পাহারা দিচ্ছিল—'

'সে কোথায় গেছে?'

'হাটে কেনাকাটা করতে—'

'তোমরা এখানে এলে কী করে?'

মেয়েটা বলেছে, 'আমাদের আগে বার করে দূরে কোথাও নিয়ে চলুন। লোকটা এসে পড়লে কেউ বাঁচব না। আপনাদেরও ভীষণ বিপদ হবে।'

তখন ভাল করে সব দিক ভাবার মতো সময় ছিল না। গণেরি এবং ধনপত একসঙ্গে বলেছে, 'ঠিক হ্যায়, চল আমাদের সঙ্গে—'

কিন্তু বেশি দূর যাওয়া সম্ভব হয়নি, গুদামের সামনের আগাছা-ভরা জায়গাটা পেরুবার আগেই পাকানো গোঁফওলা লোকটা ফিরে এসেছিল। তার হাতে প্রকাণ্ড একটা কাপড়ের ব্যাগ-বোঝাই জিনিসপত্র। হয়ত খাবার দাবার হবে।

তার চেহারা পাক্কা দুশমনের মতো। বয়স ত্রিশ-একত্রিশ। জোড়া ভুরু, ঘন কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। হিংস্র চোখদুটো দেখলে টের পাওয়া যায় খুনখারাপি করাটা এর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। পরনে চাপা ফুলপ্যান্টের ওপর হাফ-হাতা, মোটা গেঞ্জি।

গণেরি আর ধনপত লোকটাকে দেখেই মেয়েগুলোকে বলেছিল, 'দৌড় লাগাও—'

চারটে মেয়ে আর ধনপতরা দু'জন, ছ'জনে ঊর্ধ্বশ্বাসে আগাছার জঙ্গল ভেঙে ছুটতে শুরু করেছিল। লোকটা ততক্ষণে তাদের উদ্দেশ্য বুঝে নিয়েছে। চোখের পলকে হাতের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে, একটা লাঠি জুটিয়ে নিয়ে অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে তাড়া করে এসেছিল।

গণেরি আর ধনপতের মতো ষাট-বাষট্টি বছরের দুই বুড়ো এবং যুবতী চারটে মেয়ের পক্ষে কত জোরে দৌড়নো সম্ভব? গুদামের চৌহদ্দি ছাড়ালে রাস্তা, পরপর অনেকটা জায়গা জুড়ে ন্যাড়া মাঠ। মাঠটা পেরুলে ধানখেত। ধানখেতে পড়ার আগেই তাদের ধরে ফেলেছিল লোকটা। সে বুঝতে পেরেছিল, ধনপত আর গণেরি মেয়েগুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে। তার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল ওদের ওপর। এলোপাথাড়ি লাঠি চালিয়ে যাচ্ছিল সে। ধনপতরা খুনই হয়ে যেত কিন্তু গণেরি পায়ের কাছে একটা ভারি পাথরের টুকরো পেয়ে যায়। সেটা তুলে নিয়ে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে অন্ধের মতো ছুঁড়ে মারে। সেটা সোজা গিয়ে লাগে লোকটার মুখে। তীব্র গোঙানির মতো আওয়াজ করে ঘাড় গুঁজে সে মাঠের ওপর পড়ে যায়। তার পক্ষে উঠে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি। বেঁচে আছে কি মরে গেছে, কে জানে।

এরপর মেয়ে চারটেকে নিজেদের গাঁয়ে নিয়ে আসে ধনপতেরা। পথেই জেনে নিয়েছিল, ওদের বাড়ি বাংলা মুল্লুকে। একজনের মুর্শিদাবাদে, একজনের হুগলিতে, তৃতীয় আর চতুর্থ জনের বর্ধমান এবং মেদিনীপুরে। আগে কেউ কাউকে চিনত না। খুব গরিব ঘরের মেয়ে তারা। নৌকরি দেওয়ার নাম করে বদ লোকেরা তাদের কলকাতায় নিয়ে আসে। সেখানে জগনলালের কাছে ওদের বেচে দেওয়া হয়। জগনলাল একটা মোটরে করে পরশু মেয়েগুলোকে ভোগবানিতে এনে ওই গুদামটায় তুলেছে! দুশমনের মতো চোহারার লোকটার পাহারায় ওদের রেখে সে গেছে পাটনায়। মেয়েরা শুনেছে, তাদের নাকি বোম্বাইতে কার কাছে বেচে দেওয়া হবে। সেই খদ্দেরকে সঙ্গে করে দু-

একদিনের মধ্যে জগনলাল পাটনা থেকে ফিরে আসবে।

গণেরি আর ধনপত শুনতে শুনতে শিউরে উঠেছিল। জগনলাল এতকাল বন্দুকবাজি করে বেড়িয়েছে। সে যে আওরতের ব্যবসায় নেমেছে, কে ভাবতে পেরেছিল!

মেয়েগুলোকে মনচনিয়ায় এনে ধনপতের বাড়ির একটা ঘরে রেখে ওরা বড় সড়কে চলে এসেছিল। এই রাস্তাটা দিয়ে বাংলা মুল্লুকের দিকে রোজ শ'য়ে শ'য়ে গাড়ি যায়। ওদের ইচ্ছা, এমন একটা গাড়ি ধরে মেয়েগুলোকে যার যার মা-বাপের কাছে পাঠিয়ে দেয়। বেশির ভাগ গাড়িকেই থামানো যায়নি। দু-একটা যা থেমেছে, হাজার কাকুতি মিনতিতেও তাদের রাজি করাতে পারেনি। ভগোয়ান রামচন্দ্রজির করুণায় শেষ পর্যন্ত তারা মাসুদ জানকে পেয়েছে।.........

কথা শেষ করে ধনপত বলে, 'এখন জরুর বুঝতে পারছেন, কেন আপনাকে জবরদস্তি আমাদের গাঁওয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কিরপা করে লেড়কীগুলোকে ওদের ঘরে পৌঁছে দিন। আমাদের গাঁয়ে থাকলে ওদের বাঁচাতে পারব না।'

কী করবে, মনে মনে স্থির করে ফেলেছিল মাসুদ জান। একটু হেসে বলে, 'তোমরা তো আমাকে চেন না। কোন ভরসায় চারটে লেড়কীকে আমার হাতে তুলে দিতে চাইছ? আমি আচ্ছা আদমী না-ও হতে পারি।'

গণেরি বলে, 'আপনাকে দেখেই বুঝেছি---সাচ্চা আদমি। যদি খারাপ হন, বুঝব সেটা ওদের নসিব।'

যে সারাটা জীবন নষ্ট লোকদের গাড়িতে তুলে ঘুরে বেড়িয়েছে তাকে কিনা ওরা ভালমানুষ ধরে নিয়েছে! এক ধরনের অপরাধবোধ কিছুক্ষণের জন্য মাসুদ জানকে বিষণ্ণ করে রাখে। পরক্ষণে ভাবে, পেটের জন্য কত কী-ই তো মানুষকে করতে হয়। কিন্তু সে সজ্ঞানে জীবনে কোনো অন্যায় করেনি।

মাসুদ জান টের পায়, 'সাচ্চা আদমী' শব্দ দুটো তার মধ্যে তুমুল আলোড়ন ঘটিয়ে চলেছে। একসময় সে বলে, 'মেয়েগুলোকে তো আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে চাইছ। জগনলাল জানতে পারলে তোমাদের মুশকিল হয়ে যাবে যে—'

গণেরি বলে, 'তা হবে। আমাদের উমর ষাট পেরিয়ে গেছে মিঞাসাব। আর ক'দিনই বা বাঁচব! দু-এক সাল আগেই না হয় একটা ভাল কাজের জন্যে মরলাম।'

গাঁয়ে এসে মোটরটা থামার সঙ্গে সঙ্গে ধনপতের বাড়ির কোণের দিকের ঘর থেকে চারটে মেয়েকে বার করে এনে ওরা ব্যাক সিটে তুলে দেয়। বলে, 'ভাইসাব, এক্ষুনি গাড়ি চালিয়ে দিন।'

ধনপতদের তাড়ার কারণটা বুঝতে পারছিল মাসুদ জান। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে লক্ষ করে, হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে গণেরি আর ধনপত। তারা বিড় বিড় করে বলে, 'ভাগোয়ান আপনার ভাল করবেন।'

আপন মনে মাসুদ জান বলে, 'খোদা মেহেরবান। তাঁর দোয়ায় তোমাদেরও ভাল হবে।'

হাইওয়ের দিকে যেতে যেতে সে ভাবে, এখন তার প্রথম কাজ হল চারটে মেয়েকে তাদের মা-বাপের কাছে পৌঁছে দেওয়া। একদিনে চার জায়গায় যাওয়া সম্ভব হবে না, কম করে দু-তিনদিন লেগে যাবে। তারপর কলকাতায় ফিরে রঘুবন্ত সিং যে টাকাটা রাহা খরচ হিসেবে দিয়ে গিয়েছিলেন সেটা তাঁর পাটনার ঠিকানায় ফেরত পাঠিয়ে দেবে। তার গাড়িতে ধনপত আর গণেরির মত সাচ্চা, সৎ মানুষেরা এই প্রথম উঠেছে। এরপর লুচ্চা, বেশ্যা আর বাঈজিদের কোনোদিনই সেটায় তোলা যাবে না।

কার্তিকের ঝড়, বন্যা এবং চুনাও

ধারাউনি টাউনের গিরধরলাল দুবের বিশাল বাড়িটা ক'দিন ধরেই সারাক্ষণ সরগরম। কেননা, ঠিক দু'মাস এগার দিন পর বিধান মণ্ডলের চুনাও বা নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনে দুবেজি একজন প্রার্থী।

গত পনের বছর ধরে গিরধবলাল এ অঞ্চলের পুবনো এম. এল. এ। বাড়িতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই তিনি তিন তিনটে চুনাওতে জিতে এসেছেন। কারণ ছোট্ট ধারাউনি টাউনের পঞ্চাশ ষাট মাইলেব মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বড় জমিমালিক। স্বনামে এবং বেনামে কম করে হাজারএকর জমি তাঁর দখলে। আর আছে ডজনখানেক বন্দুক এবং পঞ্চাশটি পোষা পহেলবান।

ধারাউনি টাউনের মাইল দেড়েক চৌহদ্দির পর থেকে শুব হয়েছে আদিগন্ত ফসলের মাঠ এবং কাঁকুরে পড়তি জমি। তার ফাঁকে ফাঁকে হতচ্ছাড়া চেহারার দেহাত বা অজ গাঁ। এইসব গ্রামগুলো মান্ধাতার বাপের আমলে যেন ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। এখানে না আছে বিজলি, না স্কুল, না শিক্ষাদীক্ষা। এইসব গাঁয়ের বেশির ভাগ মানুষই অচ্ছুৎ, আনপড় এবং ভীরুর চাইতেও ভীরু। এব আগে চুনাও এলেই গিরধরলাল বন্দুক হাতে দিয়ে পহেলবানদের গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারা বার বার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে এসেছে, সবাই যেন দুবেজির নির্বাচনী প্রতীকে মোহর মারে, নইলে গাঁকে গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। এতেই কাজ হয়েছে। হাজার হাজাব মানুষ ভেড়ার পালেব মতো লম্বা লাইন দিয়ে দুবেজির প্রতীকের পাশে ছাপ মেরে এসেছে। আর গিবধবলাল গুলাবের পাপড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সোজা পাটনার বিধানসভায় চলে গেছেন।

কিন্তু এবার ব্যাপারটা অত সহজ নয়। দু'মাস এগার দিন পব যে চুনাও আসছে তাতে দুবেজির প্রতিদ্বন্দ্বী রামধনী। তার বয়েস বেশি নয়, বড় জোব পঁচিশ ছাব্বিশ। হট্টাকট্টা চেহারার এই ছোকবা জাতে কোয়েরি অর্থাৎ জল-অচল অচ্ছুৎ।

কোয়েবি রামধনী দুবেজির বাতের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে। আগের তিন বারেব মতো বাড়ি বসে থেকে, শুধুমাত্র বন্দুক এবং পহেলবান পাঠিয়ে এবাব আব চুনাওতে জেতা যাবে না বলেই মনে হচ্ছে।

বিহারের ওই সৃষ্টিছাড়া গাঁগুলোতে ভীরু পশুব মতো যে অচ্ছুতেরা আবহমান মুখ বুজে পড়ে আছে তাদের সঙ্গে বামধনীব কিছুই মেলে না--না কথাবার্তায, না চালচলনে। সে প্রচণ্ড তেজী, একগুঁয়ে এবং বেপরোয়া, মারাত্মক গোঁ তার।

ছেলেবেলায় কিভাবে যেন মিশনারিদের পাল্লায় পড়ে রাঁচী চলে গিয়েছেল বামধনী। সেখান থেকে মাথার ভেতর কিছু জেদ আর পেটে কিছু কালিব অক্ষব পুবে বছরখানেক আগে ফিরে এসেছে। এই দেহাতীগুলোর মধ্যে সে-ই একমাত্র মান্যগণ্য 'লিখিপড়ী আদমী'। ভগোয়ানের 'মূরত'কে উঁচু বেদীতে রেখে লোকে যেমন পুজো চড়ায় তেমন একটি জায়গায় মনে মনে তাকে বসিয়ে রেখেছে অচ্ছুতেরা। এবারকার চুনাওতে ওদের ভোটগুলো যে রামধনীই পেতে চলেছে, এরকম একটা গুজব হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

গিরধর খবর পেয়েছেন, রামধনী রাঁচী থেকে ফিরে আসাব পর থেকেই অচ্ছুৎদের চোখ ফুটতে শুরু করেছে। ভয়ে আগের মতো অতটা জুজু হয়ে থাকছে না তারা।

আজকাল অনেক জায়গা থেকে হাওয়ার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নানারকম বিপজ্জনক খবর আসে। ভোজপুর, মোতিহারি আর পালামৌর দিকে নাকি অচ্ছুৎ আর আদিবাসীরা জমিমালিকদেব সঙ্গে লড়াই করেছে। কোথায় নাকি বামুনদের গাঁয়ে চামাররা চড়াও হয়েছিল।

এসব সত্ত্বেও লাঠি বন্দুক এবং পহেলবানদের ওপর এখনও অগাধ আস্থা দুবেজির। তবে তাঁর ঠাণ্ডা মাথার দুরদর্শী শুভাকাঙ্ক্ষীরা একটু বুঝে সুঝে চলতে পরামর্শ দিয়েছেন। কথায় কথায় বন্দুকবাজি কোনো কাজের কথা নয়।

গত তিনটে নির্বাচনে যা করেননি, এবার তা-ই করতে হয়েছে গিরধরকে। এর মধ্যেই বার চারেক অচ্ছুৎদের গাঁগুলোতে ভিখমাঙোয়াদের মতো ভোট চেয়ে এসেছেন। এতে কাজ যে কিছুটা হয়নি তা নয়। গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁর নাগরার ধুলো পড়ায় বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছিল। মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে বুড়োবুড়ি থেকে পাঁচ বছরের বাচ্চাটা পর্যন্ত তাঁকে সম্মান জানিয়েছে, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না গিবধব। ভূচ্চরের ছোঁয়াগুলো পেটের ভেতর কী মতলব নিয়ে বসে আছে, কে জানে।

আজ বিকেলে দুবেজির বাড়িতে আসন্ন নির্বাচনের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা হচ্ছিল।

একতলার বসবার ঘরে দেড় ফুট উঁচু কাঠের পাটাতনের ওপর ধবধবে ফরাস পাতা। ফরাসের চারধারে পুরনো আমলের বিশাল বিশাল সোফা।

কিন্তু সোফা টোফা খুব একটা পছন্দ করেন না গিরধর। এই মুহূর্তে তিনি এবং তাঁর চারজন বিশেষ পরামর্শদাতা ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন। এই চারজনের একজন হলেন দুঁদে ভকিল, একজন বড় কন্ট্রাক্টর, একজন রিটায়ার্ড হেডমাস্টার এবং চতুর্থ ব্যক্তিটি ধারাউনির সবচেয়ে বড় বিজনেসম্যান। এঁদের নিয়েই গিরধরের নিজস্ব গোপন ক্যাবিনেট বা পলিটিক্যাল 'সেল'। ঠিক কী ধরনেব পরিকল্পনা কবলে তাঁব রাজনৈতিক 'ভাবমূরত' বা ইমেজ ক্রমশ আরো উজ্জ্বল হবে এবং তিনি আমৃত্যু এম. এল. এ থাকতে পারবেন--সেসব এঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেই স্থির করা হয়।

ক'দিন আগে দেওয়ালি গেছে। অন্যান্য বছর এই সময়টায় আবহাওয়া থাকে চমৎকার। শুষ্ক হাল্‌কা জলকণাহীন বাতাস বয়ে যায় ধারাউনির ওপর দিয়ে। ঝকঝকে নীলাকাশে মেঘের একটি টুকরোও খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও সকালে এবং সন্ধেয় সামান্য হিম পড়ে কিন্তু তা খুবই আরামদায়ক।

কিন্তু এবছর সবই উলটা। ক'দিন জোরাল বাতাসের তাড়া খেয়ে এলোমেলো কালচে মেঘ ভেসে আসছিল। আজ পাথরের চাংড়ার মতো সেগুলো জমাট বেঁধে আকাশটাকে যেন ধারাউনির মাথার ওপর অনেকখানি নামিয়ে এনেছে। উলটাপালটা ঝড়ো বাতাস সাঁই সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে আকাশটাকে আড়াআড়ি চিরে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে।

মেঘের গর্জন, বাতাসের অনবরত শাসানি এবং বিজলি চমক--এসব দেখে মনে হচ্ছে, পৃথিবীর আদিম ভয়ঙ্কর দুর্যোগ যেন ধারাউনিতে ফিরে আসছে।

বাইরের ঘরের জানালা দিয়ে আকাশের চেহারা একবার দেখে নিয়ে গিরধর বলেন, 'আজকেব দিনটা বিলকুল বরবাদ হয়ে গেল। এই ঘটা (মেঘ) আর বিজবি মাথায় নিয়ে বাইরে বেরুনো যাবে না।' তাঁকে ভীষণ হতাশ এবং চিন্তাগ্রস্ত দেখায়।

উকিল সীয়াশরণজি বলেন, 'আকাশের যা হাল তাতে ক'দিন হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে, কে জানে!'

আসলে আজ তিন তিনটে গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার কথা ছিল। দুর্যোগের কারণে বেরুনো যাচ্ছে না, হতাশাটা সেই কারণে।

হেডমাস্টার রামনরেশজি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বাইরে জিপের আওয়াজ শোনা যায়। একটু পরেই ধারাউনি থানার দারোগা হংসনাথ তেওয়ারি ঘরে এসে ঢোকে। লোকটার বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। বিপুল গোলাকার চেহারা। দেড়শ কেজির মতো ওজন। শরীরের বেশিটাই চর্বি।

ঘাড় ঝুঁকিয়ে হাতজোড় করে অত্যন্ত বশংবদ ভঙ্গিতে হংসনাথ বলে, 'নমস্তে দুবেজি--' গিবধরের স্পেশাল সেলের অন্য মেম্বারদেরও সে নমস্কার জানায়।

গিরধরলালের প্রতি তার আনুগত্যে এতটুকু ভেজাল বা ফাঁকি নেই। কারণ গিরধরই তাকে পুলিশের চাকরিটা করে দিয়েছেন, এবং নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রেমোশনেরও ব্যবস্থা করেছেন। তাই যখন তখন সে এ বাড়িতে আসে। ধারাউনিতে কে কী করছে, কে কী ভাবছে, সব খবরই সে গিরধরকে জানিয়ে যায়। এসব খবর সে আবার যোগাড় করে ইনফরমারদের কাছ থেকে।

গিরধর বলেন, 'বসো হংসনাথ।' দারোগা কুণ্ঠিতভাবে ফরাসের এক কোণে বসলে জিজ্ঞেস করেন, 'ক্যা সমাচার? তোমার কাজকর্ম ভাল চলছে?'

'জি, আপনার আশীর্বাদে।'

'তারপর এই ঝড়তুফান মাথায় নিয়ে এলে যে?'

'একটা জরুরি খবর আছে দুবেজি।'

হংসনাথ যখন কোনো খবর আনে তখন সেটা জরুরিই হয়ে থাকে। শিরদাঁড়া টান টান করে উঠে বসেন দুবেজি। বলেন, 'কী খবর?'

হংসনাথ যা জানায় তা এইরকম। বঙ্গোপসাগরের ওধারে কোথায় যেন আচমকা ডিপ্রেসান হয়েছে, তার ফলে অসময়ে আকাশে এত মেঘ। তাছাড়া হিমালয়ে হঠাৎ নাকি বেশি করে বরফও গলতে শুরু করেছে, তার ফলে ধারাউনি থেকে দু মাইল দূরে বরখা নদীতে প্রচণ্ড বান আসছে, নদীর দু'ধারের সব গাঁ এবং ফসল এতে একেবারে ভেসে যাবে। ওপর থেকে হংসনাথের কাছে নির্দেশ এসেছে আজই, বরখা নদীর পাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে বন্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি করে দিয়ে আসতে হবে। ফসল হয়ত বাঁচানো যাবে না, তবে প্রাণহানিটা যাতে না ঘটে, সে জন্য গ্রামের মানুষজন যেন নিরাপদ জায়গায় চলে যায়।

ঠিকাদার বিষ্ণুকান্ত সিং এই সময় বলে ওঠেন, 'হাঁ হাঁ, ঝড় তুফানের কথা রেডিওতে বলছে বটে।'

প্রাক্তন হেডমাস্টার রামনরেশজি এবং উকিল সীয়াশরণজিও জানান, তাঁরাও রেডিওতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্কতামূলক ঘোষণা শুনেছেন।

গিরধরলাল রেডিও টেডিও শোনার সময় পান না। শুনলে এ খবরটা তিন দিন আগেই পেয়ে যেতেন। যাই হোক, তুফান এবং বরখা নদীতে প্রচণ্ড বন্যার সম্ভাবনা আছে--এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় দ্রুত বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটতে থাকে। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যায়।

গিরধরলাল জিজ্ঞেস করেন, 'দশ সাল আগে বরখা নদীতে আর একবার খতরনাক বাড় হয়েছিল না?'

সেবারের বন্যার কথা ভুলেই গেছেন রামনরেশজিরা। দশ ফুট উঁচু প্রবল জলস্রোতে অচ্ছুৎদের ক'টা গাঁ ভেসে গিয়েছিল। প্রচুর মানুষ এবং গরু-মোষ-বকরি মরে ফৌত--এসব অপ্রয়োজনীয় বাজে খবর কে আর মনে করে রাখে! গিরধরলালের প্রশ্নে তাঁদের দুর্বল স্মৃতির ওপর থেকে কয়েকটা পর্দা সরে যায়; দশ বছর আগের এক ভয়াবহ বন্যার ছবি নতুন করে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। প্রায় একই সঙ্গে সবাই বলে ওঠেন, 'হাঁ হাঁ, হয়েছিল।'

'কত লোক মরেছিল, মনে আছে?'

রামনরেশ বা সীয়াশরণ মৃতের সঠিক সংখ্যাটি দিতে পারেন না। শুধু বিষ্ণুকান্ত বলেন, 'হোগা লগভগ দশ পন্দ্র।'

গিরধর শুধরে দিয়ে বলেন, 'নেহী, তিশ আদমী। আর গাই ভৈস-বকরি?' অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে কত পশু মরেছিল সেটাও তিনি জানতে চান।

এ ঘরের কারুর স্মৃতিশক্তি এতটা সতেজ নয় যাতে দশ বছর আগের বন্যায় অচ্ছুৎদের ক'টা গরু, ক'টা মোষ, ক'টা ছাগল মরেছিল--এসব মনে করে রাখতে পারে। তাঁরা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে কাঁচুমাচু মুখে নিজেদের অক্ষমতা জানান এবং মনে মনে কমজোর স্মৃতিশক্তির জন্য নিজেদের হয়ত ধিক্কারই দেন। তবে একটা ব্যাপারে তাঁরা খুবই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। দশ বছর আগের বন্যায় মৃত ক'টা অচ্ছুৎ আর তাদের গাই-বকরি নিয়ে হঠাৎ এত খেপে উঠলেন কেন গিরধরলাল--এটাই বুঝে উঠতে পারছেন না।

গিরধর বলেন, 'মনে নেই তো? ঠিক আছে, আমিই বলে দিচ্ছি। দো শ গাই, একশ বিশ ভৈস আর দো শ চাল্লিশ বকরি।' বলে দারোগার দিকে তাকান, 'এস. ডি ও'র অফিসে এর রেকর্ড আছে, ইচ্ছে হলে দেখে নেবেন।'

একটু চুপচাপ। তারপর গিরধর বলতে থাকেন, 'আপনারা হয়ত ভাবছেন, দশ বছর আগের কথা মনে করে রেখেছি কেন?'

সবাই গিরধরের দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকেন। কেননা এই প্রশ্নটা তাঁদেরও।

গিরধর বলেন, 'পলিটিসিয়ানকে অনেক কিছু মনে করে রাখতে হয়। কবে কী ঘটেছে, কে কী

করেছে বা বলেছে--এ সব সময়মতো কাজে লাগাতে না পারলে সে গেল। স্মৃতিশক্তি জোরদার না হলে পলিটিকসে এক কদম এগুনো যায় না।'

সবাই যদিও মাথা নেড়ে সায় দেন কিন্তু দশ বছর আগে কয়েকটা অচ্ছুৎ এবং কয়েক শ পশুর মৃত্যুর সঙ্গে রাজনৈতির সম্পর্ক কতটা, তা বুঝে উঠতে ঘাম ছুটে যায় তাঁদের।

গিরধর এবার দারোগা হংসনাথের দিকে ফিরে বলেন, 'সেবার বাড়ের পর সরকারি রিলিফ এসেছিল না?'

হংসনাথ বলে, 'হাঁ হাঁ, লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল বরখা নদীর পাড়ের গাঁগুলোতে। অচ্ছুতিয়াদের তাম্বু, টাকাপয়সা, কিছু গাই-বকরিও দেওয়া হয়েছিল।'

'বহুত আচ্ছা।' জ্বলজ্বলে চোখে দারোগাকে দেখতে দেখতে গিরধর বলেন, 'এবারও যদি শেষ পর্যন্ত ভগোয়ান শিউশঙ্করের কৃপায় বাড়টা হয়েই যায়, সরকারি রিলিফ আসবে নিশ্চয়ই। গরিব বেসাহারা মানুযের দুখ তো ঘোচাতেই হবে।'

'হাঁ হাঁ, জরুর।' হংসনাথ জানাতে থাকে, দুর্যোগে ফসল বাড়িঘর ধ্বংস হলে এবং মানুষ মরলে সরকারি ত্রাণ আসবেই। এটা একটা চালু নিয়ম।

তাকে থামিয়ে দিয়ে গিরধর বলেন, 'আমি জানি।' বলে পিঠের পেশি নরম করে আবার তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসেন। একটু চিন্তা করে ফের বলেন, 'এবার বাড় হলে গভর্ণমেন্টের রিলিফটা আমরাই বিলি করব। সরকারি কর্মচারিদের খেটে খেটে মুখে খুন তোলার জরুরত নেই।'

গিরধরের কথায় সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁর নিজস্ব গোপন 'ক্যাবিনেট'-এর মেম্বাররা তা ধরে ফেলেন। বরখা নদীর এপারের অচ্ছুৎ গ্রামগুলো গিরধরের কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যেই পড়ে। সেখানে বন্যার পর গিরধর যদি রিলিফের জিনিস বিলি করতে পারেন, তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। সরকার টাকা দেবে, গিরধর ক্ষীর খাবেন। সবাইকে এতক্ষণে বেশ চনমনে দেখায়।

এদিকে ঢোক গিলে হংসনাথ বলে, 'লেকেন--'

গিরধর জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু বলবে?'

'জি, হাঁ।'

'বলে ফেল।'

'রিলিফ এলে তো ডি. এম আর এস. ডি. ও'র সামনে বিলি করা হয়। এটা সরকারি কানুন--'

গিরধর রেগে ওঠেন না। অপার সাহিষ্ণুতা তাঁর। এই গুণটি ছাড়া সফল পলিটিসিয়ান হওয়া অসম্ভব। তিনি বলেন, 'তোমার বয়েস কত হল?'

'জি, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।' হংসনাথ বলে।

'এখনও বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই হল না। আমি হলাম এম. এল. এ। জনতাকো প্রতিনিধি। মানুষ আমার হাত থেকেই রিলিফ নিতে বেশি পছন্দ করবে। সমঝা?'

উত্তর না দিয়ে ঘাড় চুলকোতে থাকে দারোগা। তার মনে একটা খটকা থেকেই যাচ্ছে।

গিরধর বলেন, 'চিন্তা না করনা। আমি ডি. এম আর এস. ডি. ও'র সঙ্গে কথা বলে নেব।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর দারোগা উঠে পড়ে। বলে, 'আকাশের হাল আরো খারাপ হয়ে গেছে। বরখা নদীর পারের দেহাতগুলোতে হোঁশিয়ারি দিয়ে তুরন্ত থানায় ফিরে আসতে হবে।'

গিরধর প্রায় চমকেই ওঠেন। শশব্যস্তে বলেন, 'না না, তোমাকে আর কষ্ট করে ওখানে যেতে হবে না। যা করার আমিই করব।'

'ঠিক হ্যায়। নমস্তে দুবেজি।' বিনীত, অনুগত ভঙ্গিতে নমস্কার জনিয়ে হংসনাথ বেরিয়ে যায়। একটু পর বাইরে থেকে জিপের আওয়াজ ভেসে আসে।

এবার ঘরের ভেতর গিরধররা ঘন হয়ে বসেন। শিউশঙ্করজির কৃপায় দুর্যোগটা যখন আসছেই, সেটাকে কাজে লাগানো যে বদ্ধিমানের কাজ--সে বিষয়ে সবাই একমত হয়ে যান।

এক ঘণ্টার মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঠিক করে ফেলা হয়। তারপর গম্ভীর চালে হেসে গিরধর বলেন, 'পলিটিসিয়ানের সবসময় চোখ-কান খুলে রাখা বহুৎ জরুরি। ঝড়তুফান, খরা, যা-ই হোক না, তা থেকে

ফায়দা উঠিয়ে নিতে হয়।'

গিরধরলালের বাঞ্ছিত বিপর্যয়টি শেষ পর্যন্ত ঘটেই যায়। তিন দিন একটানা প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং ঝড় চলতে থাকে। বরখা নদীর জল বার ফুট উঁচু হয়ে দু'ধারের ঘরবাড়ি, প্রচুর মানুষ আর গরু মোষ ভাসিয়ে নেয়। মাইলের পর মাইল খেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

কেউ এসে আগেভাগে ওখানে হুঁশিয়ারি দিয়ে যায়নি, দিলে মানুষ এবং পশুগুলো অন্তত বেঁচে যেত। সেদিন দারোগাকে বরখার পারের গাঁগুলোতে যেতে দেননি গিরধর, নিজে গিয়েও কাউকে সতর্ক করে আসেননি। এর পেছনে তাঁর সুদূরপ্রসারী একটি পরিকল্পনা ছিল।

যাই হোক, এর মধ্যে ফোনে এস. ডি. ও এবং ডি. এমের সঙ্গে বানভাসি দেহাতগুলোতে রিলিফের ব্যাপারে গিরধরের কিছু কথা হয়ে গেছে।

তিনদিন পর তুফান এবং বন্যার দাপট কমে এলে বরখা নদীর পাড়ের গ্রামগুলোতে রিলিফ ক্যাম্প বা ত্রাণ শিবির খোলা হয়। ডি. এম যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে শিবিরের উদ্বোধন করেন, ছোটাছুটি করে আসল তদারকটা করতে থাকেন গিরধর এবং তাঁর লোকজনেরা।

এখনও গ্রামগুলো দু আড়াই হাত জলের তলায়। জল ঠেলে কাদা মাড়িয়ে খালি পায়ে গ্রামের পর গ্রাম চষে বেড়ান গিরধর। যারা এখনও বেঁচে আছে তাদের ত্রাণ শিবিরে নিয়ে আসা হয়।

সবগুলো গ্রামেই এখন শুধু কান্না, বিলাপ আর আর্তনাদ। কারুর ভাই মরেছে, কারুর বাপ, কারুর স্বামী, কারুর ছেলে। বুক চাপড়ে তারা চিৎকার করে চলেছে।

গিরধর প্রতিটি শোকার্ত অচ্ছুতের পিঠে এবং মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকেন।

এদিকে প্রথম দিন ত্রাণশিবির খুলে দিয়ে ডি. এম, এস. ডি. ও এবং অন্য সব অফিসাররা সেই যে চলে গেছেন আর তাঁদের বরখার পাড়ে দেখা যায়নি। রিলিফের যাবতীয় কাজ এখন করছেন গিরধর এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা।

হাওয়ায় হাওয়ায় কিভাবে যেন রটে যায়, গিরধরই বানে-ডোবা গ্রামগুলোকে খাবার-দাবার, আশ্রয় এবং ওষুধ দিয়ে আবার বাঁচিয়ে তুলছেন। শোনা যায়, বড়ে সরকার দুবেজি স্বয়ং ভগোয়ান। তাঁর 'কিরপা'য় এবার তারা রক্ষা পেল, রামজি কি কিষুণজির মতো তিনি দয়ালু, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রামধনীরা এই রিলিফের ব্যাপারে প্রচুর হইচই করল। তাদের অভিযোগ, সরকারি রিলিফ নিজেব বলে চালাচ্ছেন দুবেজি। কিন্তু সে কথা কেউ কানেও তুলল না।

আরো দু'মাস পর বিধানসভার যে নির্বাচনটা হল তাতে বরখা পাড়ের গ্রামগুলো থেকে অচ্ছুৎরা লাইন দিয়ে ভোটের কাগজে গিরধরের প্রতীকে মোহর মেরে আসে। অসময়ের তুফান এবং বন্যা আরো পাঁচ বছরের জন্য দুবেজিকে এম. এল. এ বানিয়ে দেয়।

ভোজ

ফাগুন মাস ফুরিয়ে এল। ক'দিন আগে এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তৌহার হোলিব মাতামাতি শেষ হয়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী উত্তর বিহারের বাতাসে এখনও ঠাণ্ডা শিরশির একটু আমেজ লেগে থাকার কথা। কিন্তু এ বছর এরই মধ্যে চারপাশের চেহারা বদলে যেতে শুরু করেছে। বেলা একটু চড়লে সূর্যের তেজ মারাত্মক বেড়ে যায়। রোদের অসহ্য তাপে মাঠঘাট ফসলের মাঠ ঝলসে যেতে থাকে। উলটো পালটা হাওয়া আগুনের হলকা ছড়াতে ছড়াতে পুব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমাগত ঘোড়া ছুটিয়ে যায়।

মাথার ওপর বিশাল আকাশ, নিচে আদিগন্ত শস্যক্ষেত্র। তবে এখন যতদূর চোখ যায়, মাঠ একেবারে ফাঁকা। কোথাও একদানা ফসল নেই। মাস দুই আগেই গৈয়া আর ভৈসা গাড়ি বোঝাই করে ধানকাটানিরা সব ধান তুলে নিয়ে গেছে। রবিফসলের মরশুমও শেষ হয়ে এসেছে। অনেক দূরে

দূরে ক্বচিৎ দু-এক টুকরো খেতিতে তিসি কি কলাই চোখে পড়ে।

ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে যে কাঁচা সড়ক বা কাচ্চী এঁকেবেঁকে আড়াআড়ি চলে গেছে তার ওপর হাঁটুভর ধুলো মাড়িয়ে হেঁটে আসছিল ধনিয়া। তার বয়স ষাট না সত্তর, সে জানে না। কেননা অঙ্ক বা ধারাপাত সম্পর্কে তার আদৌ কোনো ধারণাই নেই। তিরিশ পর্যন্ত মোটামুটি সে গুনতে পারে; তার ওপরের কোনো সংখ্যা হলেই হিসেবে গোলমাল হয়ে যায়।

শরীরে মাংস বলতে বিশেষ কিছুই নেই ধনিয়ার। ঢিলে কোঁচকানো খই-ওড়া চামড়া খোলসের মতো তার হাড়ের ওপর কোনোরকমে জড়িয়ে আছে। পায়ের পেছন দিকে শিরাগুলো জট পাকানো, তোবড়ানো গাল, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ফুঁড়ে বেরিয়েছে। মাথার চুল রুক্ষ পাটের ফেঁসো। এই চুলের সঙ্গে ধনিয়ার জন্মের পর থেকে যে তেলের কোনো যোগাযোগ ঘটেনি, দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়। মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি। ঘোলাটে চোখ এক আঙুল গর্তে ঢোকানো।

ধনিয়ার পরনে চিটচিটে ধুদ্ধুড়ি টেনা, সেটা এতই খাটো যে কোমর থেকে উরু পর্যন্ত কোনোরকমে ঢাকা পড়েছে। ওপর দিকে ছেঁড়া একটা জামা; সেটায় নানা রঙের অগুনতি তালি। তার পিঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা চটের থলে। থলেটার ভেতর রয়েছে ধনিয়ার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি। দুটো বাড়তি টেনা, দুটো হাতা-ছেঁড়া জামা, একটা ধুসো কম্বল, তোবড়ানো সিলভারের থালা, খানকয়েক রুটি, আধখানা খরমুজা, আখের একটা টুকরো, কিছু ঘাটো, খানিকটা গেঁহু, একটা ভোঁতা ছুরি। এগুলো হচ্ছে দুঃসময়ের জন্য তার সঞ্চয়।

ধনিয়া আসছে খাড়া দক্ষিণ থেকে। যাবে উত্তরের এক ভারি টৌন বা বড় শহর মেকলিপুরায়। সেখানে শাক্যদ্বীপী ব্রাহ্মণ চন্দ্রেশ্বর মিশিরের মায়ের শরাধ বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আজ বিরাট ভোজ। সেই ভোজ খেতেই চলেছে ধনিয়া।

ধনিয়ার মতো মানুষকে কেউ খাতিরদারি করে বাড়িতে ডেকে খাওয়ায় না। সে-ই নিজের গরজে খবরটবর যোগাড় করে ভোজের আসরে হানা দেয়।

ধনিয়া উত্তর বিহারের একজন বিখ্যাত ভিখমাঙোয়া। ভোজসভায় সরগনা আদমী অর্থাৎ মান্যগণ্য অতিথিদের খাওয়া হয়ে গেলে পাতের যে উচ্ছিষ্ট খাবারদাবার নালিয়ায় (নর্দমায়) ফেলে দেওয়া হয়, কাক কুকুর চিল এবং অন্য ভিখমাঙোয়াদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি মারামারি করে তাতে তাকে ভাগ বসাতে হয়।

কাল বিকেলে ধনিয়া ঘুরতে ঘুরতে ধরমগঞ্জের হাটিয়ায় এসে হাজির হয়েছিল। সেখানেই চন্দ্রেশ্বরের খবরটা পায়। এক শুধ্ ব্রাহ্মণ আরেক শুধ্ ব্রাহ্মণকে চন্দ্রেশ্বর মিশিরের মায়ের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্র পড়ে শোনাচ্ছিল। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে তা শুনেছে ধনিয়া।

এমনিতে তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। সে আনপড় মূরখ। তিরিশের বেশি গুনতে পারে না, কিন্তু খাওয়ার কোনো ব্যাপার থাকলে প্রতিটি শব্দ তার মাথার ভেতর স্থায়ীভাবে বসে যায়।

শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্রের বয়ানটা ছিল এইরকম :

'মান্যবর,

ফাল্গুনী শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশীকো মেরে মাতাজিকো গঙ্গালাভ হুযা। পচিস ফাগ্লুন উনকী শ্রাধ্ হ্যায়। কৃপয়া উপস্থিত হো কর দেবঙ্গত আত্মাকে লিয়ে শান্তি প্রার্থনা করে।

শোকসন্তপ্ত
চন্দ্রেশ্বর মিশ্র
মেকলিপুরা।'

শ্রাদ্ধ যখন হবে তখন উৎকৃষ্ট রকমের একটা ভোজন কি আর হবে না? বয়ানটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ধনিয়া ঠিক করে ফেলে রাতটা হাটিয়ার ফাঁকা চালার তলায় কাটিয়ে আজ ভোরে মেকলিপুরা রওনা হবে। কেননা, লোকজনের কাছে জেনে নিয়েছে পরের দিনই পঁচিশে ফাগ্লুন।

তখনও ভোর হয়নি, অন্ধকার এবং হালকা কুয়াশায় আকাশ ঝাপসা হয়ে ছিল। সেইসময় ধরমগঞ্জের হাট থেকে বেরিয়ে পড়েছিল ধনিয়া।

মেকলিপুরার নাম সে বহুবার শুনেছে কিন্তু আগে কখনও সেখানে যাওয়া হয়নি। মেকলিপুরা টৌন কোন দিকে, কিভাবে সেখানে যেতে হয়, এসব সম্পর্কে ধনিয়ার ভাসা ভাসা ধারণা আছে। কাল সে ভেবেই রেখেছিল, রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে মেকলিপুরার সঠিক হদিশ জেনে নেবে।

কাঁচা সড়কে ধুলো উড়িয়ে অগুনতি বয়েল এবং ভৈসা গাড়ি আর সাইকেল রিক্‌শা পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এক একটা গাড়ি যায়, দশ হাত উঁচু পর্যন্ত বায়ুস্তর ধূলোর মেঘে ছেয়ে যেতে থাকে। তবে এই রাস্তায় ট্রাক বা বাস-টাস কিছু চলে না।

শুধু বয়েল গাড়িটাড়িই নয়, কত যে দেহাতি মানুষ যাচ্ছে তার গোনাগুনতি নেই। এখনও ঠিক দুপুর হয়নি। তবে সূর্যটা আকাশের খাড়া দেওয়াল বেয়ে বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। রোদ গনগনে হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কোথাও এক ছিটে মেঘ নেই। মাথার ওপর দিয়ে বাতাসের স্তর কেটে কেটে শীতের পাখির শেষ ঝাঁক উড়ে চলেছে সুদূর দিগন্তের দিকে।

ঝলসানো আকাশ, পাখি, বয়েল আর ভৈসা গাড়ির সারি কিংবা ধুলোর পুরু মেঘ--কোনো দিকেই লক্ষ্য ছিল না ধনিয়ার। বেলা যত চড়ছে ততই তার উদ্বেগ বাড়ছে। সে জানে শ্রাদ্ধের খাওয়া দাওয়া দুপুর--বড় জোর বিকেলের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তার আগেই ভোজসভায় পৌঁছনো দরকার। নইলে এতটা ছোটাছুটিই সার হবে।

কম করে জন তিবিশেক রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করেছে ধনিয়া, 'ভেইয়া, আউর কিতনা দূর হোগা মেকলিপুরা?'

সবার উত্তরই প্রায় এরকম, 'এহী নজদিগ। লগভগ দো-চার মিল।'

সেই সকালে রোদ ওঠার পর থেকে যাকেই প্রশ্ন করছে, একই উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু 'লগভগ দো-চার মিল' আর শেষ হচ্ছে না। ধনিয়ার দুশ্চিন্তায় কারণ আছে বৈকি।

হাঁটতে হাঁটতে সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে আসে। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে হা হা করে লু-বাতাস ছুটতে থাকে। কিন্তু রোদের মারাত্মক তাতও যেন ধনিয়ার গায়ে লাগে না, আসলে সে ব্যাপারে তার হুঁশই নেই। তবে একমাত্র লক্ষ্য কিভাবে মেকলিপুরার পৌঁছুবে। তার চোখের সামনে ভোজের আসরের লোভনীয় সুখাদ্যগুলি জীবনের দুর্লভ স্বপ্নের মতো দুলতে থাকে।

এমনিতে ধনিয়া খুবই দুব্‌লা, কমজোর। তার ওপর শ্রাদ্ধের ভোজ খাবে বলে সকাল থেকে কিছুই খায়নি। ইচ্ছা করলে চটের ঝোলা খুলে দু'মুঠো ঘাটো বা একখানা শুখা রুটি চিবিয়ে নিতে পারে, কিন্তু যেখানে নিশ্চিত একটা ভোজের আশা আছে সেখানে দুর্দিনের সঞ্চয়ে হাত দেওয়ার মানে হয় না।

কতকাল তার পেটে দামি সুখাদ্য পড়েনি সে নিজেই জানে না। এক মাস, দু মাস না তিন মাস—কে বলবে। লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে, চেয়েচিন্তে, হাত পেতে সে যা পায় তা হল বাসি চাপাটি, পোড়া লিট্টি, ঘাটো বা সেদ্ধ রামদানা। এসব খেয়ে খেয়ে তার জিভের ডগা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত হেজে গেছে।

বহু বছর বাদে একটা লোভনীয় ভোজের সুযোগ পাওয়া গেছে। কে বলতে পারে এটাই তার জীবনের শেষ সেরা ভোজন হবে কিনা। অদম্য এক উৎসাহ বিপুল শক্তিতে ধনিয়াকে ধাক্কা দিতে দিতে মেকলিপুরার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

উৎসাহ এবং লোভ যত তীব্রই হোক, শরীরটা তো বেজায় দুর্বল। ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাথায় নিয়ে হাঁটতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। এলোমেলো পায়ে প্রায় টলতে টলতে এগুতে থাকে ধনিয়া।

আরো খানিকটা পর একটা আধবুড়ো দেহাতি লোককে সে ডাকে, 'ভেইয়া--'

লোকটা তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ডাক শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। ধনিয়ার জামাকাপড়ের হাল, পা থেকে মাথা ধুলোয় ঢাকা তার মূরত, এসব দেখামাত্র টের পেয়ে যায় সে কোন শ্রেণীর জীব। লোকটার চোখমুখ বিরক্তিতে কুঁচকে যায়। কর্কশ গলায় বলে, 'কা রে?'

'মেকলিপুরা টৌন আউর কেত্তে দূর?'

'হোগা দেড় দো মিল'। উত্তরে, দিগন্তের কাছাকাছি যেখানে আগুনের মতো রোদের শিষ নির্মম ভঙ্গিতে কাঁপছে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে লোকটা বলে, 'ওখানে একটা ভাগাড় আছে। সেই ভাগাড় পেরিয়ে এক মিল সোয়া মিল গেলে মেকলিপুরা টৌন।'

মেকলিপুরা শহরটা ঠিক কোথায়, এতক্ষণে সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করা গেল। প্রথমে মরা জন্তুজানোয়ারের ভাগাড়, তারপর টৌন। লোকটার কাছ থেকে চন্দ্রেশ্বর মিশিরের কোঠি সম্পর্কে আরো কিছু জরুরি খবর জেনে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তার আগেই লম্বা লম্বা পা ফেলে লোকটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সমান তালে হেঁটে ধনিয়া তাকে ধর্‌বার চেষ্টা করল। কিন্তু অশক্ত শরীরে অত জোরে চলা তার পক্ষে সম্ভব না। দু-চার পা ফেলেই সে ভয়ানক হাঁপিয়ে যায়। কোমরের এবং হাঁটুর নড়বড়ে হাড়গুলোতে কেমন যেন খিঁচ ধরে। অগত্যা হাঁটার গতি কমিয়ে আবার সে টলতে টলতে এগোয়। ধনিয়া টের পেতে থাকে তার জামাকাপড় ভিজিয়ে ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আর ঘামের সঙ্গে যত নিমক বেরিয়ে যাচ্ছে ততই শরীরে শক্তি শেষ হয়ে আসছে।

হাঁটতে হাঁটতে এধারে ওধারে তাকায় ধনিয়া। রাস্তার গায়ে একটা ঝাঁকড়া মাথা পিপর গাছ চোখে পড়ে। একবার ভাবে গাছটার ছায়ায় বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেবে কিনা। পরক্ষণেই মনে হয়, একবার বসলে সে আর হাঁটতে পারবে না; তার যা বয়স এবং শরীরের যা হাল তাতে জীবনের এই শেষ ভোজটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। এমন সুযোগ তো বার বার আসে না। আর আসবে কিনা, সে বিষয়ে ধনিয়ার ঘোর সন্দেহ আছে।

একসময় চাকার ক্যাঁচর কোঁচর আওয়াজ কানে আসতেই সে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। একটা ফাঁকা বয়েল গাড়ি পাশ দিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখেই বোঝা যায়, গাড়িটার কোথাও যাওয়ার তেমন তাড়া নেই।

হঠাৎ ধনিয়ার মনে বিদ্যুৎচমকের মতো একটা দুরাশা ঝিলিক মারে। গাড়িটার গা ঘেঁষে পাশাপাশি দ্বিধান্বিতের মতো হাঁটতে হাঁটতে ভীরু গলায় গাড়োয়ানকে সে ডাকে, 'এ ভেইয়া--'

গামছা নেড়ে নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে গাড়োয়ান গুন গুন করে একটা দেহাতি সুর ভাঁজছিল। গান থামিয়ে সে বলে, 'কা?'

'তোমার গাড়ি কোথায় যাচ্ছে?'

'মেকলিপুরায়। কায়?'

বুকের ভেতর সেই দুরাশাটা আচমকা দশ গুণ বেড়ে যায়। সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'একগো বাত ভেইয়া--'

গাড়োয়ান বলে, 'বল্ না কী বলবি--'

ঢোক গিলে ধনিয়া যা বলে তা এইরকম। বয়েল গাড়িটা তো বিলকুল ফাঁকাই যাচ্ছে, আর যাচ্ছে মেকলিপুরাতেই। ধনিয়াও সেখানেই যাবে। সে দুব্‌লা কমজোর বুড়া আদমী। গাড়োয়ান ভেইয়া যদি কিরপা করে গাড়িতে তুলে তাকে মেকলিপুরায় পৌঁছে দেয় ভাগোয়ান রামজি ভাগোয়ান কিষুণজি তার ভালাই করবেন, তার খেতিতে ফলন বাড়বে, বালবাচ্চা ঘিউ-শক্কর খেয়ে সুখে থাকবে, বয়েলগাড়ির বয়েল দুটো নীরোগ এবং তাজা থাকবে--এমনি হাজারটা কথা একটানা বলে যায় ধনিয়া।

গাড়োয়ান ভুরু নাচাতে নাচাতে চোখের কোণ দিয়ে ধনিয়াকে দেখতে থাকে। তারপর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হুমকে ওঠে, 'শালে মনিস্টার আয়া! ভূচ্চরের বাচ্চা ভিখমাঙোয়া—ভাগ, হট্ যা।' বলেই দু'হাতে বলদ দুটোর ল্যাজ মুচড়ে আলটাকরায় জিভ ঠেকিয়ে টক টক টক্কাস করে আওয়াজ তোলে। পরিচিত সংকেত কানে যেতেই বয়েল দুটো বহুদূর পর্যন্ত ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ধনিয়াকে পেছনে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে থাকে। আর ধনিয়ার মনে যে আশাটুকু ধুকপুক করছিল মুহূর্তে তা নিভে যায়।

ক্লান্ত নির্জীব শরীর টানতে টানতে আবার এগুতে থাকে ধনিয়া। এই যে কুকুর চিল কাক এবং ভুখা মানুষের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করে লোকের পাতকুড়নো খেতে চলেছে, চিরকাল সে কিন্তু এমন

হতচ্ছাড়া ভিখমাঙোয়া ছিল না। গাঁ-গঞ্জ শহর-বাজারের লোকের কাছে ইদানীং অনবরত হাত পেতে তাকে এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে হচ্ছে। অথচ চিরদিন অন্যের করুণার ওপর ধনিয়াকে নির্ভর করতে হয়নি। ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে জীবনের শুরুটা কেমন হয়েছিল, তার মনেও পড়ে না। ধনিয়ার স্মৃতিতে আবছাভাবে যে স্মৃতিটা ধরা আছে তা এইরকম। কোশি নদীর ওধারে নৈবহার তালুকে ছেলেবেলার অনেকগুলো বছর শুধু পেটভাতায় এক রাজপুত ক্ষত্রিয়ের খেতি এবং খামারে সূর্যোদয় থেকে মাঝরাত পর্যন্ত তাকে খাটতে হত। বছর দশেক এভাবে চলার পর হঠাৎ একদিন সে লক্ষ করল, শুধু পেটেই খেয়েছে। নেহাত নাঙ্গা থাকলে খারাপ দেখায়, তাই রাজপুত জমিমালিক জামাকাপড়টা দিয়েছে। কিন্তু হাতে একটা ফুটো কড়িও পায়নি।

এই সময়টা তাজা টগবগে মরদ সে। পৃথিবীর আর সব জোয়ানের মতোই অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই ধনিয়ার মনে একটি শাদির ইচ্ছা জাগে। কিন্তু মুখে বললেই তো আর শাদি হয় না। তার জন্য কমসে কম দেড়-দুশ টাকা দরকার। মেয়ের বাপকে পণ না দিলে নিজস্ব একটি আওরত কে তার হাতে তুলে দেবে?

কাজেই নৈবহার তালুক থেকে রাতারাতি সে পালামৌতে যায় জঙ্গল কাটতে। হাতে নগদ টাকা চাই। সেখানেও বছর কয়েক জঙ্গল কাটার পর দেখা গেল সামান্যই জমাতে পেরেছে। ততদিনে শাদির বাজারে অন্য দশটা জিনিসের মতো যুবতী কুঁয়ারী মেয়েদের দরও বেজায় চড়ে গেছে। ওই জমানো টাকায় ঘরবালী পাওয়া অসম্ভব।

তখনও শাদির আশাটা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, মনের ভেতর স্বপ্নের রেশের মতো সেটা আটকে আছে।

অগত্যা টাকার খোঁজে এক আড়কাঠির পাল্লায় পড়ে সে ছুটল সুদূর আসামে বেত কাটার কাজে। সেখানে ছিল টানা পনের সাল। আসামে থাকতে থাকতেই শেষ দিকে ভারি চেচকে (বসন্ত) পড়েছিল ধনিয়া। চেচক সারতে না সারতেই ধরল রক্ত আমাশা আর শ্বাসকষ্ট। তাতেই স্বাস্থ্য ভেঙে যেতে লাগল। অশক্ত শরীরে বেতকাটার মতো প্রচণ্ড দম এবং খাটুনির কাজ সম্ভব নয়। ঠিকাদার তাকে ছাড়িয়ে দিল। চিরস্থায়ী একটি বুকের দোষ নিয়ে উত্তর বিহারে ফিরে এল ধনিয়া।

তাগড়া মোষের মতো যে যুবক ধনিয়া আসাম গিয়েছিল আর পনের বছর বাদে যে ধনিয়া ফিরে এল তাদের দু'জনের মধ্যে অনেক তফাত। সবটুকু শাঁস শুষে নিয়ে আসাম তার খোলসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সে তখন দুনিয়ার সব কাজের অযোগ্য, জগতের সমস্ত কিছু থেকে পুরোপুরি বাতিল। তখন পা ফেলতে তার কষ্ট, শ্বাস টানতে কষ্ট, একটুতেই হাঁফ ধরে যায়।

ততদিনে শাদির স্বপ্নটা মাথার ভেতর থেকে ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে গেছে। আসাম থেকে যে ক'টা টাকা নিয়ে এসেছিল বসে বসে খেয়ে ফুরিয়ে গেল। তারপর একদিন অসহায় ধনিয়া সেই আদিম জীবিকার রাস্তায় পা দিল। ক্রমশ উত্তর বিহারের বিখ্যাত ভিখমাঙ্গোয়া হয়ে উঠল সে।

তার থাকার নির্দিষ্ট জায়গা নেই। উত্তর বিহারের প্রায় পঞ্চাশ মাইল জায়গা জুড়ে বছরের পর বছর খাদ্যের খোঁজে অনবরত ছুটে বেড়াচ্ছে ধনিয়া। কোথায় গেলে ঘাটো মিলবে, কোথায় দু'মুঠো ভাত বা দু'টুকরো রুটি--সে জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। খিদে ছাড়া তার শরীরে আর কোনো অনুভূতি নেই। ভিক্ষে তো সে চায়ই, সেই সঙ্গে চোখ কানও খুলে রাখে। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে বিয়ে শ্রাদ্ধ উপনয়ন বা অন্নপ্রাশনের যাবতীয় খবর সে আগাম যোগাড় করে। এত খবর বোধ হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা বা সাংবাদিকেরাও সংগ্রহ করতে পারবে না। খাদ্যের জন্য দিকে দিকে শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস তার অভিযান।

এক মাস দু'মাস না, এবার পুরো সালই বুঝিবা ভালমন্দ সে কিছু খায়নি। শরীর যেভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে তাতে চন্দ্রেশ্বর মিশিরের বাড়ির শ্রাদ্ধের খাওয়াটাই হয়ত জীবনের শেষ ভোজ। যেভাবেই হোক, মৃত্যুর আগে উৎকৃষ্ট একটা ভোজন তাকে করতেই হবে। নইলে ঘাটো আর রামদানা খেয়ে মরার মধ্যে বিরাট আপসোস থেকে যাবে। এমন মৃত্যু তার কাম্য নয়।

সূর্যটা সেই যে সোজা মাথার ওপর চলে এসেছিল, সেইখানেই অনড় দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমের ঢাল বেয়ে নিচে নামবে, এমন কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

চলতে চলতে আরেকটি লোকের সঙ্গে ধনিয়ার আলাপ হয়ে যায়। সে থাকে মেকলিপুরা টৌনের পাশের একটা গাঁয়ে। কথায় কথায় জানা গেল, দূরের এক দেহাতে এক রিস্তেদারেব বাড়ি কাল সে গিয়েছিল; আজ ঘরে ফিরছে।

লোকটার কথাবার্তার ধরন এবং ব্যবহার বেশ ভাল। ভিখমাঙোয়া বলে আর সবার মতো ধনিয়াকে সে ঘেন্না করছে না। কিংবা তার কথার দায়সারা জবাব দিয়ে এড়িয়েও যাচ্ছে না। এমন সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ খুব বেশি দেখেনি ধনিয়া।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ধনিয়া শুধোয়, 'ভেইয়া, আপনি তো মেকলিপুরা টৌনের পাশের গাঁও-এ থাকেন।'

'হাঁ--' লোকটা ঘাড় কাত করে।

'টৌনের চন্দ্রেশ্বর মিশিরজিকে চেনেন?'

লোকটা জানায় চন্দ্রেশ্বরকে সে চেনে, অনেক বার দূর থেকে দেখেছে। বহুৎ বড়ে আদমি ; কমসে কম হাজার দো হাজার বিঘা জমির মালিক। এসব জানিয়ে একটু অবাক হয়েই শুধোয়, 'মিশিরজির খবর নিচ্ছ যে?'

'শুনা হ্যায় মিশিরজিকো মাতাজির আজ শরাধ্।'

'হাঁ, আমিও শুনেছি।'

'আচ্ছা ভেইয়া, মায়ের শরাধে মিশিরজি ভোজনটা জরুর ভালই করাবে। আপনি কী বলেন?' বলে উৎসুক চোখে সঙ্গীর দিকে তাকায় ধনিয়া।

'তা আর খাওয়াবে না!' লোকটা বলতে থাকে, 'এত্তে বড়ে আদমি! একটাই তো মা, আর তার শরাধ্ একবারের বেশি হবে না। এমন ভোজন করাবে যে তিন রোজ আর কাউকে খেতে হবে না। শুনেছি একেবারে গলা পর্যন্ত ঠেসে না খাওয়া পর্যন্ত মিশিরজির হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায় না।'

শ্রাদ্ধের ভোজে কী কী খাওয়াতে পাবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে যায় ধনিয়া। একটু লজ্জাই করে। তবে মনে মনে তাব জানা লোভনীয় সুখাদ্যের একটা লম্বা তালিকা তৈবি করে ফেলে।

লোকটা আবার বলে, 'তিন সাল আগে মিশিরজির লেড়কীর শাদি হল। পাটনাসে বাজনদার আব পটাকরি(আতশবাজি) এনেছিল। কলকাত্তাসে আনিয়েছিল রসগুল্লা আউর মিঠা দহি আউর দশ কিসিম কা সন্দেশ, মিহিজামসে কলাকন্দ, মুঙ্গেরসে মুংগকা লাড্ডু, আউর ভাগলপুরসে গুলাবজামুন। আউর--'

লোকটা একনাগাড়ে কত যে ভাল সুস্বাদু খাদ্যের নাম করে যায় তার ঠিকঠিকানা নেই। এত সব নাম জন্মেও শোনেনি ধনিয়া। কিছু শুনেছে, বাদবাকি সবই অচেনা। মেয়ের শাদিতে যদি এরকম বিরাট কাণ্ড ঘটিয়ে থাকেন মিশিরজি, মায়ের শরাধে কী তার আধাআধি আয়োজনও করবেন না?

ধনিয়া শুধোয়, 'আপনি কি মিশিবজিব লেডকীর শাদিতে গিয়েছিলেন?'

'আরে নেহী নেহী।' লোকটা জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়ে, 'আমার মতো ছোটামোটা গরিব আদমীর কি মিশিরজির মতো বড়ে আদমীর লেড়কীর শাদিতে ভোজন করার সৌভাগ হয়?'

'তব্?'

ধনিয়া কী জানতে চায়, মুহূর্তে বুঝে ফেলে লোকটা। মিশিরজির মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রিত না হয়েও সেই ভোজের বিষয়ে এত খুঁটিনাটি সে জানল কী করে? লোকটা জানায়, এত বড়ে আদমির বাড়ির ভোজ। তা কী আর জানতে বাকি থাকে? লোকের মুখে মুখে এই ভোজের ব্যাপারটা অনেক দূর পর্যন্ত রটে গিয়েছিল।

নতুন উৎসাহে ধনিয়ার শিরায় শিরায় ঝিমিয়ে পড়া স্তিমিত রক্ত দুরন্ত গতিতে ছুটতে থাকে। গুলাবজামুন. কলাকন্দ, সন্দেশ--এই নামগুলি তার হৃৎপিণ্ডে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটিয়ে দেয়।

এদিকে রোদের তেজ আরো বেড়ে গেছে। অসহ্য তাপে আকাশটা গলে গলে উত্তর বিহারেব সীমাহীন খোলা মাঠে ক্রমশ নেমে আসছে। মাথার ওপর এখন আর একটা পাখিও নেই. বোদ চড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা দিগন্তের ওপারে উধাও হয়ে গেছে। আগুন মুখে নিয়ে খ্যাপা লু বাতাস হা হা করে ছুটতে থাকে দিগ্বিদিকে।

মনে যত উদ্দীপনাই থাক, লোভনীয় খাদ্যের তালিকা ধনিযাব মস্তিষ্কে যে প্রতিক্রিয়াই ঘটাক, ভোব থেকে ভুখা পেটে হাঁটতে হাঁটতে শরীব ক্রমশ এলিয়ে আসছে। দিগন্তজোড়া আগুনের ভেতব পা ফেলতে এখন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার।

সঙ্গের লোকটা ধনিয়ার পাশাপাশি এতক্ষণ আস্তে আস্তেই হেঁটে আসছিল। এবাব সে জানায়, ঘরে তার জরুরি কাজ আছে। এখন ঢিমে তালে হাঁটলে চলবে না। বলেই জোরে জোরে পা চালাতে থাকে।

লোকটা এতক্ষণ যে ধনিয়াব সঙ্গে কথা বলেছে, ধীর চালে হেঁটে তাকে সঙ্গ দিয়েছে, এমন কি ভাল ভাল সুখাদ্যের নাম করে তার আশা এবং স্বপ্নকে যে উস্‌কে দিয়েছে--সেটুকুই যথেষ্ট। সে ধনিযাকে মেকলিপুবায চন্দ্রেশ্বর মিশিরের কোঠি পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, এতটা ভাবা খুবই অন্যায়, অন্তত তাব মতো এক ভিখমাঙোয়াব পক্ষে।

লোকটা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। পেছনে থেকে ধনিয়া ডাকে, 'সিরিফ একগো বাত। মেকলিপুরা আউর কেত্তে দূর?'

চলতে চলতেই মুখ ফিরিয়ে লোকটা জানায় আর সিকি মাইল গেলেই ভাগাড় পড়বে ; তারপর মেকলিপুরা বড় জোর ঘণ্টাখানেকের পথ।

লোকটা লম্বা লম্বা পাযে হাঁটছে। ধনিযাব সঙ্গে তার দূবত্ব ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে।

এখন কাচ্চীতে মানুষজনও বেশি দেখা যাচ্ছে না। রোদের তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক চলাচলও কমে এসেছে। ক্বচিৎ দু-একটা বয়েল আব ভৈসা গাড়ি পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি টানা জন্তুগুলোর দিকে এখন আর তাকানো যায় না; সেগুলোর জিভ আধ হাত করে বেরিয়ে পড়েছে।

এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে হাঁটছিল ধনিয়া। এখন সে টেব পায়, মুখের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জিভের ডগা থেকে আলটাকবা পর্যন্ত কর্কশ বালিব মতো খরখরে মনে হচ্ছে। ঢোক গিলতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। হাত-পায়ের জোড় যেন ক্রমশ আলগা হয়ে আসছে। সে আর বোধ হয় এগুতে পারবে না। এখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

কোনোবকমে এলোমেলো পা ফেলে, ধুঁকতে ধুঁকতে আরো খানিকটা যাওযার পর আচমকা খানিকটা দূরে উঁচু ডাঙামতো একটা জাযগায় ভাগাড় চোখে পড়ে ধনিযার। ওখানে ঝাঁকড়া-মাথা ক'টা পরাস সিমার এবং পিপব গাছেব মাথায় অগুনতি শকুন উড়ছে। আব গরম লু-বাতাসে ভেসে আসছে মরা পশুদের পচে যাওয়া দেহের দুর্গন্ধ।

ভাগাড যখন দেখা গেছে তখন মেকলিপুরা টৌন আর বেশি দূরে নেই। শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু জড়ো করে ধনিয়া প্রায় দৌড়ুতেই থাকে।

কিন্তু ততক্ষণ আব। একটু পর সে টেব পায়, গালেব কষ বেয়ে ফেনা গড়িয়ে আসছে তাব। মাথা ভয়ানক টলছে। চোখেব সামনে দিগন্ত পর্যন্ত ঝলসানো শস্যক্ষেত্র দ্রুত ঝাপসা হয়ে যেতে থাকে।

ভাগাড়ের কাছাকাছি আসতেই আচমকা হাঁটু ভেঙে ঘাড় গুঁজে হুড়মুড় করে পড়ে যায় ধনিয়া। সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ। গালের কষ বেয়ে এতক্ষণ ফেনা গড়াচ্ছিল; এবার ভলকে ভলকে কালচে রক্ত বেরুতে থাকে। পিঠের থলেটার মুখ খুলে গিয়ে লিট্টি, ঘাটো, আমের টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সেই সে ধনিয়া ঘাড ভেঙে পড়ে গিয়েছিল, তারপব ওঠেনি। ভাগাড়ের শকুনেরা পরাস সিমার এবং পিপর গাছগুলোর মাথা থেকে সারা দুপুর সারা বিকেল ঘাড় বাঁকিয়ে, তীক্ষ্ণ চোখে তাকে লক্ষ করে। তারপর নির্ভুলভাবে কিছু একটা টের পেয়ে যায়। ধীরে ধীরে ডানা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা নেমে আসতে থাকে।

সন্ধের ঠিক আগে ধনিয়ার দেহটা নিয়ে কয়েক শ শকুন ভোজের আসর বসিয়ে দেয়।

অনুপ্রবেশ

এখনও ভাল করে ভোর হয়নি, রোদ উঠতে অনেক দেরি, এই সময় দলটা নর্থ বিহারের উঁচু হাইওয়ে থেকে নিঃশব্দে, পোকার মতো চুপিসারে কাচ্চী অর্থাৎ কাঁচা সড়কে নেমে আসে।

দুই পরিবারের নানা বয়সের মেয়েপুরুষ মিলিয়ে মোট আটটি মানুষ। এক পরিবারে ফরিদ এবং তার দাদী হাবিবা। অন্যটায় রাশেদারা। রাশেদা, তার আব্বা, আম্মা, দুই ছোট ভাই আর এক বয়স্ক রুগ্‌ণ ফুফু অর্থাৎ পিসি।

পুরুষদের পরনে লুঙ্গি বা পাজামা, শার্ট, তার ওপর চাদর কিংবা মোটা রোঁয়াওলা পুলওভার। মেয়েরা পরেছে ঢোলা সালোয়ার কামিজ আর চাদর। সবার মাথায় বা হাতে নানা লটবহর—টিনের ঢাউস বাক্স, বেতের টুকরি, বাঁশের ঝুড়ি, কাপড়ের ব্যাগ, পোঁটলা পুঁটলি ইত্যাদি।

এরা ছাড়া সকলের আগে আগে রয়েছে মধ্যবয়সী শওকত। সে ফরিদের দূর সম্পর্কের চাচা এবং আট জনের মনুষ্যবাহিনীটির গাইড।

ফাল্গুনের আধাআধি কেটে গেল। তবু বিহারের এই অঞ্চলে শীতের মেজাজ খানিকটা থেকেই গেছে। বিশেষ করে সন্ধের পর থেকে রোদ ওঠার আগে পর্যন্ত সময়টায়।

কিছুক্ষণ আগে চাঁদ ডুবে গেছে। মাথার ওপর বিশাল আকাশ জুড়ে রুপোর বুটির মতো অগুনতি তারা। একফোঁটা মেঘ নেই কোথাও। তবে অন্ধকারের সঙ্গে সাদা কুয়াশা মিশে চারদিক ঝাপসা হয়ে আছে। অদৃশ্য, টান টান স্রোতের মতো ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে হু হু করে। গায়ে লাগলে কাঁটা দেয়।

কাঁচা সড়কের দু'ধারে ঝোপঝাড়, উঁচু উঁচু ঝাঁকড়া পিপর গাছ। তারপর দু'পাশেই ফাঁকা মাঠ। দূরে বা কাছাকাছি গাঁ আছে কিনা বোঝা যায় না। যেদিকে যতদূর চোখ যায় সব অসাড়, নিঝুম। ঘুমের আরকে সমস্ত চরাচর ডুবে আছে।

চারপাশে অন্ধকারে আলোর ছুঁচের মতো ফোঁড় দিয়ে দিয়ে হাজার জোনাকি উড়ছে। পিপর গাছের ফোকর থেকে মাঝে মাঝে কামার পাখিদের কর্কশ চিৎকার ভোররাতের অগাধ শান্তিকে চুরমার করে দিচ্ছে। এ ছাড়া এই স্তব্ধতার মধ্যে একটানা সাঁই সাঁই একটা শব্দ অনবরত শোনা যাচ্ছে। সেটা হল রাশেদার ফুফু আনোয়ারার বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা হাঁপানির টানের আওয়াজ। বোঝা যায়, তার চিরস্থায়ী শ্বাসকষ্টটা মারাত্মক বেড়ে গেছে।

চাপা, ক্ষীণ গলায় টেনে টেনে আনোয়ারা জিজ্ঞেস করে, 'আউর কিতনি দূর শওকতভাই?' কথা শেষ করে জোরে জোরে হাঁপাতে থাকে সে। এখানে, এই আকাশের নিচে এত বিশুদ্ধ বাতাস, তবু তার অকেজো ফুসফুসকে চাঙ্গা করে তোলার পক্ষে যেন পর্যাপ্ত নয়।

শওকত চলার গতি কমায় না। চলতে চলতেই দ্রুত পেছন ফিরে একবার তাকায় শুধু। বলে, 'এই নজদিগ। জোরে পা চালিয়ে এস।'

'আর যে পারছি না। বহোৎ কমজোর লাগছে। চোখের সামনে বিলকুল সব আন্ধেরা, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। জরুর মাটিতে পড়ে যাব।' আনোয়ারার গলার ভেতর থেকে কথাগুলো গোঙানির মতো বেরিয়ে আসতে থাকে।

'উপায় নেই বহেন। সূরয ওঠার আগে আমাদের পৌঁছুতেই হবে। এখনও লগভগ তিন মিল (মাইল) রাস্তা।' বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে নেয় শওকত, 'দুনিয়ার কারুর নজরে পড়ার আগেই এই সড়ক পেরিয়ে যেতে হবে। কেউ দেখে ফেললে বহোৎ মুসিবত।'

এরপর আনোয়ারার আর কিছু বলার থাকে না। তার মাথা টলছিল। তবু তারই মধ্যে প্রাণপণে, দুর্বল জীর্ণ শরীরের শেষ শক্তিটুকু জড়ো করে অন্ধের মতো এলোপাথাড়ি পা চালাতে থাকে।

আনোয়ারার ঠিক পেছনেই ছিল ফরিদ। তার মাথায় প্রকাণ্ড টিনের ট্রাঙ্ক, ডান হাত দিয়ে সেটা ধরে রেখেছে। বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা বড় চটের ব্যাগ। সে আনোয়ারাকে লক্ষ করছিল। টলতে টলতে আনোয়ারা যখন প্রায় হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে, সেই সময় বাঁ হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে ফরিদ। বলে, 'আমাকে ধরে ধরে চলুন ফুফু।'

আনোয়ারা বলে, 'তোমার মাথায় এত ভারি সামান। আমি হাত ধরলে সামলাতে পারবে না।'

'পারব।'

ফরিদের বাঁ হাত এবং কাঁধের ওপর শরীরের খানিকটা ভার রেখে হাঁটতে থাকে আনোয়ারা। বলে, 'বেটা ফরিদ, আমার কী মনে হচ্ছে জানো?'

ফরিদ বলে, 'কী?'

'শেষ পর্যন্ত আর পৌঁছুতে পারব না। তার আগেই এই সড়কের ধারে আমাকে তোমাদের গোর দিতে হবে।'

'এ সব বলতে নেই। আমরা সবাই জিন্দা পৌঁছুব। হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলুন।'

আনোয়ারা আর কিছু বলে না। তার ফুসফুসের ভেতর থেকে সাঁই সাঁই আওয়াজটা বেরুতেই থাকে।

মালপত্র এবং একটি মানুষের ভার নিয়ে চলতে চলতে ফরিদের মনে হয়, পরিচিত দুনিয়ার বাইরে কোনো তুখোড় বাজিকরের ম্যাজিকে তারা বহুদূরের অচেনা, ঘুমন্ত এক গ্রহে এসে পড়েছে।

তিনদিন আগে টাউটেরা মাথাপিছু দু শ টাকা আদায় করে তাদের আট জনকে পশ্চিম বাংলার বর্ডার পার করিয়ে দেয়। এপারেও সেই একই ব্যবস্থা। প্রতিটি মানুষের জন্য দু শ টাকাই গুনে দিতে হয়, এক পয়সা কমবেশি না।

বর্ডার থেকে সোজা কলকাতায়। সেখান থেকে ট্রেনে কাটিহার। কাটিহার থেকে ব্রাঞ্চ লাইনের অন্য একটা ট্রেনে সন্ধেবেলা ফরিদরা কামতাপুরে এসে নেমেছিল। সেখানে অপেক্ষা করছিল শওকত। সে-ই তাদের খানিকটা রাস্তা বয়েল গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসে। তারপর মাঝরাত থেকে শুরু হয়েছে অনবরত হাঁটা। শওকতের কথা যদি ঠিক হয়, আরো মাইল তিনেক তাদের হাঁটতে হবে।

ফরিদের বয়স তেইশ। তার জন্ম সাবেক ইস্ট পাকিস্তানে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ছ'বছর আগে।

সে শুনেছে, সাতচল্লিশে ইণ্ডিয়া দু ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদা মুদাস্‌সর আলি বিবি এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে বিহার থেকে ঢাকায় চলে যায়। ছেচল্লিশে বিহারে যে মারাত্মক দাঙ্গা হয়েছিল, সেই সময় তাদের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফরিদদের কেউ মারা না গেলেও, চেনাজানা অনেকেই খুন হয়েছিল। তখন চারদিকে শুধু হত্যা, আগুন, রক্তস্রোত, লাশের পাহাড়, অবিশ্বাস, ঘৃণা আর উন্মত্ততা। এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় আতঙ্কে মুদাস্‌সরদের শ্বাস আটকে আসছিল। একটা মুহূর্তও আর নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। পুরুষানুক্রমে দু শ বছর ধরে যেটা তাদের স্বদেশ, তা ফেলে এক শীতের রাতে তারা পালিয়ে যায়। পেছনে পড়ে থাকে জমিজমা এবং পোড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপ।

ঢাকায় গিয়ে বেশিদিন বাঁচেনি মুদাস্‌সর আলি। এক বছরের ভেতরেই তার এন্তেকাল হল। তখন তার একমাত্র ছেলে রহমত পূর্ণ যুবক। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। প্রথম দিকে এটা সেটা করে নানারকম উঞ্ছবৃত্তিতে দিন কেটেছে। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সংসারটাকে বাঁচাবার জন্য জিনের মতো খেটে গেছে সে। হাতে কিছু টাকা জমলে এবং আরো কিছু 'করজ' নিয়ে একটা রেডিমেড পোশাকের দোকান দেয়। দু-তিন বছরের মধ্যে ব্যবসা জমে ওঠে। এরপর একমাত্র বোন মালেকার বিয়ে দিয়ে নিজেও শাদি করে রহমত। সাদির সাত বছরের মাথায় ফরিদের জন্ম।

নানা দুর্যোগ এবং টালমাটালের পর জীবনটাকে রহমত যখন মোটামুটি গুছিয়ে এনেছে, সেই সময় পর পর দু'টি মৃত্যু তাকে অনেকটা টলিয়ে দিয়ে যায়। প্রথমে মারা যায় মালেকা, তারপর ফরিদের আম্মা আমিনা। এই শোকও একসময় থিতিয়ে আসে। তবে মন এতই ভেঙে গিয়েছিল যে ঘর-সংসার

বা রোজগারের দিকে তেমন নজর ছিল না। নেহাত যেটুকু না করলে নয় সেটুকুই করে গেছে। বাড়িতে ফরিদকে আগলে রাখত তার দাদী হাবিবা।

এইভাবে কোনোরকমে চলে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। একই ধর্ম, তবু বাঙালি আর অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তখন চরম অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং বিদ্বেষ, ঠিক যেমনটি দেখা গিয়েছিল দেশভাগের ঠিক আগে আগে সেই ভয়াবহ দাঙ্গার দিনগুলোতে। তখন প্রতিপক্ষ ছিল অন্য ধর্মের মানুষ। পাকিস্তানের খুনী সাঁজোয়া বাহিনী ব্যারাক থেকে ট্যাঙ্ক, মেশিনগান আর অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। গাঁয়েগঞ্জে এবং শহরে শহরে গড়ে উঠেছিল প্রবল প্রতিরোধ। তখন সারাদিনই চতুর্দিকে গুলির শব্দ, ট্যাঙ্কের কর্কশ আওয়াজ, বারুদের গন্ধ, লাশের পাহাড়, রক্তের নদী, ধর্ষণ, হত্যা, আগুন আর বিপন্ন বিধ্বস্ত মানুষের আর্ত চিৎকার।

রহমত আলি নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ। রাজনৈতিক কূটকচাল তার মাথায় ঢুকত না। নিজের দোকান আর ভাঙাচোরা সংসারের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে অন্য কোনো দিকে তার নজর যেত না। কিন্তু চারপাশে যখন আগুন জ্বলছে, তার আঁচ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব। একদিন তার দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হল, প্রচণ্ড মারও দেওয়া হয় তাকে, নেহাত আয়ুর জোরে সে বেঁচে যায়।

একদিন নিরাপত্তার কারণে হিন্দুস্থান থেকে ঢাকায় চলে এসেছিল সে। পূর্ব পাকিস্তানকেই গভীর আবেগে নতুন স্বদেশ ভেবে নিয়েছিল। মনে হয়েছিল, সব আতঙ্ক ভয় অনিশ্চয়তা আর দুর্ভাবনা কেটে গেল। কিন্তু এবার তারা কোথায় যাবে?

একদিন মুক্তিযুদ্ধ থামে। জন্ম নেয় নতুন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাতাস থেকে বারুদের গন্ধ, মাটি থেকে রক্তের দাগ মুছে যায়। কিন্তু উর্দুভাষী অবাঙালি মুসলমানদের সম্পর্কে বিদ্বেষ সন্দেহ আর ঘৃণাটা থেকেই যায়।

তবু বেঁচে তো থাকতে হবে। রহমত জোড়াতাড়া দিয়ে আবার দোকান খোলে কিন্তু আগের মতো বেচাকেনা নেই। কামাই ভীষণ কমে যায়।

এদিকে স্থির হয়েছিল, পাকিস্তান উর্দুভাষী বিহারী মুসলমানদের ঢাকা থেকে নিয়ে যাবে। দু-চারজনকে নিয়েও যায় কিন্তু কয়েক লাখ মানুষ বাংলাদেশে পড়ে থাকে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে।

দিনের পর দিন কেটে যায়। বছরের পর বছর। পাকিস্তান থেকে রহমতদের নেওয়ার জন্য প্লেন বা জাহাজ কিছুই আসে না।

এদিকে ফরিদ বড় হচ্ছিল। ক্রমশ স্কুল পেরিয়ে সে কলেজে যায়। কিন্তু বি. এ পরীক্ষায় বসার আগেই রহমত আলি দশ দিনের জ্বরে মারা গেল। এরপর পড়ার খরচ যোগাবে কে? ফরিদ কলেজ ছেড়ে দেয়। শুধু পয়সার অভাবের জন্য না, তীব্র হতাশায় তখন সে ভুগছে। কষ্ট করে বি. এ'র ডিগ্রিটা যোগাড় করতে পারলেও তার চাকরি হবে না। বাংলাদেশে তার ভবিষ্যৎ কী?

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখতে দেখতে সতের বছর কেটে যায়। ইণ্ডিয়ার পার্টিশনের সময় যে বিহারী মুসলমানেরা তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে চলে এসেছিল তাদের বেশির ভাগই এখনও স্বপ্ন দেখে, লাহোর করাচি বা ইসলামাবাদ থেকে যে কোনোদিন প্লেন এসে তাদের তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে, তাদের বিশ্বাসে রীতিমত চিড় ধরে গেছে। আর তারা করাচি লাহোরের প্লেনের ভরসা করে না। রাত্তিরে মীরপুরের উর্দুভাষীদের এলাকায় বসে গোপনে পরামর্শ করে, ইণ্ডিয়াতে, পূর্বপুরুষের ভিটেয় ফিরে গেলে কেমন হয়? তারা খবর পেয়েছে পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাতচল্লিশে যে উর্দুভাষীরা করাচিতে চলে গিয়েছিল সেখানকার আদি বাসিন্দারা তাদের আদৌ পছন্দ করে না। উড়ে এসে জুড়ে বসা মোহাজিরদের সম্পর্কে তাদের প্রচণ্ড বিরূপতা। দাঙ্গা এবং খুন সেখানে লেগেই আছে। রুটির ভাগ কে আর অন্যকে দিতে চায়?

বেশ কিছুদিন পরামর্শের পর তারা মনস্থির করে ফেলে। সুদূর লাহোর বা করাচি থেকে বিহারের সেই গ্রামগুলি—যেখানে পুরুষ পরম্পরায় তাদের বাপ-দাদারা বাস করেছে---অনেক বেশি পরিচিত

এবং কাছের। কিন্তু মুখের কথা খসালেই তো সেখানে যাওয়া যায় না। এক স্বাধীন দেশ থেকে আরেক স্বাধীন দেশে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু আইন-কানুন যা-ই থাক, দুনিয়ায় টাউটেবাও থাকে। রাতের অন্ধকারে তারা মীরপুরে হানা দিতে শুরু করে। তারাই জানিয়ে দিয়েছিল প্রথমে কোথায় গিয়ে উঠতে হবে। এমন একটা ফাঁকা জায়গার খোঁজ টাউটেরা দিয়েছিল যার আশেপাশে বসতি নেই। তা ছাড়া একসঙ্গে অনেকের যাওয়া বিপজ্জনক। লোকের চোখে পড়ে গেলে হই চই হবে। তাদের পরামর্শ হল, ছোট ছোট দলে আট-দশজন করে যাওয়া অনেক নিরাপদ। কিছুদিন পর যাওয়া বিলকুল বন্ধ। তারপর প্রতিক্রিয়া দেখে ফের অন্যদের যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ছক মাফিক প্রথম দলটা আসে পনের দিন আগে। তাদের সঙ্গে এসেছিল শওকত। সে চটপটে, চৌখস, ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তারপর থেকে প্রায় রোজই দু-তিনটে করে ফ্যামিলি আসছে। আজ এসেছে ফরিদরা।

রাশেদাদের আজ আসার কথা ছিল না। তার ফুফু আনোয়ারার খুবই শ্বাসকষ্ট চলছিল। ঠিক হয়েছিল, সে কিছুটা সুস্থ হলে পরের কোনো একটা দলের সঙ্গে ওরা আসবে। তবু যে আসতে হল, তার কারণ রাশেদা।

রাশেদার সঙ্গে ফরিদের শাদির কথাবার্তা এবং দেনমোহর অনেক আগে থেকেই পাকা হয়ে আছে। শাদিটা যে হয়নি তার কারণ ফরিদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। স্থায়ী রোজগারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কথা ভাবতে পারে না ফরিদ।

রাশেদা চায়নি তাদের ঢাকায় ফেলে আগেই ফরিদরা চলে যায়। কেঁদেকেটে এবং জেদ ধরে এমন এক কাণ্ড সে করে বসে যে শেষ পর্যন্ত তার আব্বা এবং আম্মাকেও বাক্স বিছানা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়।

আগে থেকেই ঠিক করা আছে, কামতাপুর স্টেশনে রোজ অপেক্ষা করবে শওকত। সীমান্তের ওপার থেকে যারা আসবে তাদের জায়গামতো নিয়ে যাবে। আজও সে ফরিদদের নিয়ে চলেছে।

মুখ বুজে চুপচাপ সবাই হাঁটছিল। হঠাৎ রাশেদার আব্বা রমজান ডেকে ওঠে, 'শওকতভাই—'

মুখ না ফিরিয়েই সাড়া দেয় শওকত, 'হাঁ—'

'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানকার হালচাল কেমন?'

'এখনও গোলমাল হয়নি। তবে—'

'কী?'

'আমরা যে এসেছি, সেটা মনে হয় ওদিকের লোকেরা জেনে গেছে।'

খানিকটা পেছনে, মাথায় বাক্স আর কাঁধের ব্যাগ সামলে, আনোয়ারাকে ধরে ধরে নিয়ে আসছিল ফরিদ। এখন শরীরের সব ভার তার ওপর ছেড়ে দিয়েছে আনোয়ারা।

শওকতের কথাগুলো কানে আসতে চমকে ওঠে ফরিদ। রমজান জবাব দেওয়ার আগেই সে বলে, 'শুনেছিলাম জায়গাটা ফাঁকা মাঠ, ওখানে লোকজন থাকে না।'

শওকত বলে, 'বিলকুল ঠিক।'

'তা হলে?'

ফরিদের প্রশ্নটার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না শওকতের। সে বলে, 'আরে বেটা, মানুষের আঁখ আর কানের মতো খতারনাক চীজ দুনিয়ায় আর একটাও পাবে না। জঙ্গলেই যাও কি দরিয়াতে গিয়েই লুকোও, কারুর না কারুর নজরে পড়ে যাবেই। একজন দেখে ফেললে দশ আদমীর কানে উঠতে কতক্ষণ!' লম্বা লম্বা পায়ে রাস্তার দৈর্ঘ্য খানিকটা কমিয়ে দিয়ে আবার সে বলে, 'পরশু খালেদ চার 'মিল' দূরে বারহৌলির বাজারে আটা ডাল নিমক মরিচ কিনতে গিয়েছিল। সেখানে শুনে এসেছে, লোকেরা আমাদের ব্যাপারে বলাবলি করছিল। আমরা কোত্থেকে এসেছি, আচানক মাঠের দখল নিলাম কী করে—এই সব। বুঝতেই পারছ, জরুর কেউ না কেউ আমাদের দেখে গেছে।'

পুরো তিনটে দিন ভাল করে খাওয়া হয়নি, ঘুম হয়নি। ট্রেনে, বাসে, সাইকেল রিক্‌শায়, বয়েল

গাড়িতে এবং পায়ে হেঁটে অনবরত তারা চলেছেই, চলেছেই। অসীম ক্লান্তিতে হাত-পা এবং কোমরের জোড় যেন আলগা হয়ে গেছে। ধুঁকে ধুঁকে এবড়োখেবড়ো কাঁচা সড়কে টক্কর খেতে খেতে কোনোরকমে শরীরটা খাড়া রেখে তারা হাঁটছিল। শওকতের কথাগুলো তাদের শিরদাঁড়ার ভেতর অনেকখানি আতঙ্ক ঢুকিয়ে দেয়। সবার প্রতিনিধি হিসেবেই যেন রমজান বলে, 'এখানে থাকতে পারব তো শওকত ভাই?'

শওকত গলায় জোর দিয়ে বলে, 'কোসিস তো করনা পড়েগা। ডরো মাত্ রমজান ভাই। একটা কিছু ব্যাওস্থা জরুর হয়ে যাবে।'

বিশ ফুট পেছনে আসতে আসতে শওকতের দিকে সসম্ভ্রমে তাকায় ফরিদ। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এই মানুষটাকে দেখে আসছে। সে শুনেছে, সাতচল্লিশে বিহারের দেহাত থেকে আরো হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সে-ও ইস্ট পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। অতি সাধারণ গরিব বিহারীরা গোড়ার দিকে যে ঢাকায় গুছিয়ে বসতে পেরেছিল সে জন্য শওকতের ভূমিকা কম নয়। সবার জন্য সুযোগ সুবিধা আদায় করতে একে ধরা, ওর কাছে আর্জি জানানো, তাকে সেলাম ঠোকা—কী না করেছে সে! আবার চল্লিশ বছর বাদে এই যে প্রায় রোজ ছোট ছোট দলে মানুষ বর্ডার পেরিয়ে তাদের পূর্বপুরুষের দেশে চলেছে, তাতেও তার প্রবল উৎসাহ। কখনও ভেঙে পড়ে না শওকত, হতাশায় তার শিরদাঁড়া দুমড়ে যায় না, কোনো অবস্থাতেই হার মানতে শেখেনি। জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত আশাবাদী এই মানুষটাকে শ্রদ্ধা করে ফরিদ।

এদিকে রমজান আর কিছু বলে না। গভীর উৎকণ্ঠা তার ভেতরকার শেষ জীবনীশক্তিটুকুকে যেন চুরমার করে দিতে থাকে।

তারা চলেছে তো চলেছেই।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় অন্যমনস্ক হয়ে যায় ফরিদ। স্কুলে এবং কলেজে খানিকটা ইতিহাস পড়েছে সে। হিন্দু বা বৌদ্ধ আমলের কথা সে বলতে পারবে না। সেই সব সময়ে তাদের বংশের আদি পুরুষেরা কোথায় ছিল, কী-ই তখন তাদের পরিচয়, সে সম্পর্কে আদৌ কোনো ধারণা নেই ফরিদের। গত দু শ বছরের কথাই সে শুধু বলতে পারে। কয়েক জেনারেশন ধরে তখন তারা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার প্রজা—ভারতীয় মুসলমান। দেশভাগের পর ঢাকায় গিয়ে তারা হয়ে যায় পাকিস্তানী। তারপর নিশ্চিতভাবে না হলেও বাংলাদেশে থাকার কারণে হয়ত বা বাংলাদেশী। আর এই মুহূর্তে ভোরের ঝাপসা আকাশের তলায় ইণ্ডিয়ার মাটির ওপর যখন পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছে তখন তাদের কী আইডেনটিটি, সে জানে না।

ইতিহাসের সেই আদিযুগের দেশহীন পরিচয়হীন অভিযানকারীদের মতো তারা চলেছে একটি স্বদেশের জন্য, একটি সুনিশ্চিত আইডেনটিটির সন্ধানে। আদৌ তা পাওয়া যাবে কিনা, কে বলবে!

সূর্য ওঠার ঠিক আগে আগে কাঞ্চী অনেকটা তফাতে রেখে বিশাল এক পড়তি জমির মাঝখানে পৌঁছে যায় ফরিদরা।

এখানে বাঁশ টালি চট আর বাতিল পুরনো টিন দিয়ে তিরিশ চল্লিশটা ঘর তোলা হয়েছে। ঢাকা থেকে আগে যারা চলে এসেছিল, এই ঘরগুলো তাদের।

নির্জন নিঝুম মাঠের মাঝখানে রাতারাতি গজিয়ে ওঠা এই ছন্নছাড়া উপনিবেশে এখনও কারুর ঘুম ভাঙেনি।

শওকত বলে, 'পোঁহুছ গিয়া। তিন রোজ বহোৎ তখলিফ গেছে তোমাদের। এবার আরাম কর।'

ঘাড় এবং মাথা থেকে লটবহর নামিয়ে সবাই মাটিতে শরীর এলিয়ে বসে পড়ে। তাড়াতাড়ি ময়লা চাদর পেতে আনোয়ারাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। এতটা আসার ধকলে তার বুকে এখন একসঙ্গে দশটা হাপর ওঠানামা করছে।

ফরিদ একধারে বসে অসীম আগ্রহে চারদিক লক্ষ করছিল। শওকত সঠিক খবরই দিয়েছে। এখান

থেকে যেদিকে যতদূর চোখ যায়, কোথাও মানুষজন বা দেহাতের চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে একদিকের কাঁকুরে ভাঙা ততদূর ছড়ানো। আরেক দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে মজা বিল। শ্যাওলা আর লম্বা লম্বা ডাঁটিওলা জলজ ঘাসে সেটা বোঝাই। বিলের ধাব ঘেঁষে প্রচুর ঝোপঝাড় আর বিরাট বিরাট সিমাব এবং কড়াইয়া গাছ। গাছগুলোর মাথায় অগুনতি বক ডানা মুড়ে চুপচাপ বসে আছে।

এদিকে গলা তুলে শওকত ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে, 'আরে ওসমান ভাইয়া, রুস্তম, নবাবজান, রহিমা চাচী—আর কত ঘুমোবে! ওঠ ওঠ, উঠে পড়। ওরা এসে গেছে।'

প্রথমে দু-একজন, তারপব একে একে শ'খানেক মানুষ ঘবগুলো থেকে বেরিয়ে আসে। ফরিদদের দেখে বলে, 'আ গিয়া তুমলোগ?'

রমজান নির্জীব স্বরে বলে, 'হাঁ। লেকেন বিলকুল মর গিয়া।'

ওসমান বলে, 'হাঁ, পযদল অনেকটা বাস্তা আসতে হয। পা আর কোমরের হাড্ডি বেঁকে যায়। পথে কোনো গোলমাল হয়েছে?'

'নেহী।'

'ইণ্ডিয়ার লোকজন সন্দেহ করেনি?'

'নেহী।'

'না করারই কথা। ইতনা বড়ে দেশ। কড়োর কড়োর (কোটি কোটি) আদমী। এখানে কে কার খবর রাখে!'

এরপর ঠিক হয়, আগে এসে যারা ঘর তুলেছে, তাদের কাছে ভাগাভাগি করে ফরিদরা দু-চারদিন থাকবে। তারপর বারহৌলির বাজার থেকে টালি বা পুরনো টিন কিনে এনে নিজেদের ঘর তুলে নেবে।

ফরিদ দূরমনস্কর মতো সবার কথা শুনছিল। আসলে বর্ডার পেরিয়ে এপারে আসতে আসতে নিজের মধ্যে তিনদিন আগে এক ধরনের উত্তেজনা টেব পেয়েছিল সে। এখন, এই বিশাল মাঠের মাঝখানে এসে আচমকা সেটা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। সে শুনেছে, এখান থেকে মনপত্থল গাঁ খুব দূরে নয়। মনপত্থল থেকেই চল্লিশ বছর আগে তার দাদা বিবি-ছেলেমেয়ে নিয়ে ইস্ট পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। পূর্বপুরুষের সেই গ্রামটা দেখার জন্য প্রচণ্ড অস্থিরতা এই মুহূর্তে একগুঁয়ে জিনের মতো তার কাঁধে যেন চেপে বসে।

হঠাৎ ফরিদ জিজ্ঞেস করে, 'শওকতচাচা, মনপত্থল গাঁও কোথায়?'

অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে ফরিদের দিকে তাকায় শওকত। বলে, 'এখান থেকে চার 'মিল' তফাতে বারহৌলি বাজার। সেখান থেকে আরো দু 'মিল' গেলে মনপত্থল। কেন জানতে চাইছ?'

'আমি আমাদের গাঁও দেখতে যাব।'

শওকত বলে, 'এখন না বেটা। আরো কিছুদিন দেখি, হালচাল ভাল করে বুঝি। গাঁও তো নজদিগ রইলই। সময় হলে যখন ইচ্ছা যেতে পারবে। আমারও তো ওই একই গাঁও, আমিও এখন পর্যন্ত যাইনি।'

এখানে যারা এসেছে তাদের সবাই মনপত্থল এবং তার চারপাশের গ্রামগুলো থেকে একদিন ঢাকায় চলে গিয়েছিল। তারাও শওকতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জানায়, এখন পর্যন্ত কেউ পিতৃভূমি দেখতে যায়নি। শুধু নিজেদের পুরনো গাঁওতেই নয়, অন্য কোনোদিকেও তারা পা বাড়ায়নি। ভয়ে ভয়ে, চাপা আতঙ্ক নিয়ে এই কাঁকুরে জমিতেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে। তবে দু-একজন খুব সতর্ক ভঙ্গিতে বারহৌলি বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিল।

এদের মনোভাব বুঝতে পারছিল ফরিদ। কেউ কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চায় না। চল্লিশ বছর আগে এটা তাদের দেশ ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন তারা এ দেশের কেউ নয়। পিতৃভূমি বা জন্মভূমি দেখতে গিয়ে যদি বিপন্ন হতে হয়, তাই সেদিকে কেউ পা বাড়ায়নি।

ফরিদ আর কিছু বলে না।

শওকত এবার তাদের ব্যবস্থা করে দেয়। হাবিবা আর ফরিদ তাদের ঘর না তোলা পর্যন্ত থাকবে ওসমানদের সঙ্গে। রাশেদা আর আনোয়ারা থাকবে নবাবজানদের কাছে। বাশেদার দুই ভাই এবং আব্বা-আম্মার দায়িত্ব নেবে রুস্তম আর গহর শেখ।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরগুলোর সামনে ফরিদরা শওকতকে ঘিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। আজ আর ঢাকা থেকে কেউ আসবে না, তাই শওকতের কামতাপুরে যাওয়ার তাড়া নেই।

মাথার ওপর ঝকঝকে নীলাকাশ। সূর্য তার ঢালু গা বেয়ে পশ্চিমে নামতে শুরু করেছে। রোদে তাত থাকলেও গা পুড়িয়ে দেবার মতো নয়। প্রচুর উলটোপালটা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে। ফাল্গুনের রোদের সঙ্গে হাওয়া থাকায় মোটামুটি ভালই লাগছে সবার।

ইণ্ডিযায় তাদের ভবিষ্যৎ কী, এই নিযে কথা হচ্ছিল।

ফরিদ বলে, 'শওকতচাচা, কতদিন আমরা এখানে লুকিয়ে থাকতে পারব? তুমি আসতে আসতে বলেছিলে, আমাদের খবর অনেকে জেনে গেছে। তারাই আমাদের টেনে বার করবে। কে জানে ভাগিয়ে দেবে কিনা। তা ছাড়া আরো একটা কথা ভাবার আছে।'

শওকত জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'ঢাকা থেকে আমরা কে আর ক'টা পয়সা আনতে পেরেছি! কামাই না করলে না খেয়ে মরতে হবে। সে জন্যেও এখান থেকে বেরুনোটা জরুরি।'

ফরিদের কথাগুলো অনেককে নাড়া দিয়ে যায়। তারা সায় দিয়ে বলে, 'ঠিক ঠিক।'

শওকত গভীর আগ্রহে ফরিদের কথা শুনছিল এবং অন্যদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিল। সে আস্তে আস্তে বলে, 'বেটা তুমি যা বললে, সব আমার মাথায় আছে। লেকেন সবুর। আমি এখানকার একটা লোকের খোঁজ পেয়েছি। মনে হচ্ছে, তাকে দিয়ে আমাদেব অনেক মুশকিল আসান হবে। দো-চার রোজের ভেতর তার সঙ্গে দেখা করব।'

অন্য সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফরিদ জিজ্ঞেস করে, 'লোকটা কে?'

শওকত জানায়, তার নাম এখন বলা যাবে না। সে পলিটিক্যাল পার্টির জবরদস্ত লিডার। তার নামে এ অঞ্চলে বাঘ আর বকরি একঘাটে জল খায়। সে-ই একমাত্র তাদের বাঁচাতে পারে। তবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

ফরিদ এবং আরো অনেকে শ্বাসরুদ্ধের মতো জিজ্ঞেস করে, 'এর খবর তোমাকে কে দিল?'

শওকত বলে, 'বর্ডারের এপারে ওপারে কত ধান্দায় কত দালাল ঘুরে বেড়াচ্ছে, জানো? ধরে নাও তাদের কারুব কাছ থেকে খবরটা পেয়েছি।'

ফরিদের সংশয় কাটে না। সে বলে, 'যদি লিডারের সঙ্গে দেখা করতে না পার?'

'করতেই হবে। এটা আমাদের বাঁচা-মরার সওয়াল।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ফরিদ বলে, 'আরেকটা কথা বলব শওকত চাচা?'

শওকত বলে, 'একটা কেন, দশটা বিশটা, যে ক'টা ইচ্ছা—বল।'

'এই মাঠে পড়ে না থেকে আমাদের গাঁওগুলোতে চলে যাওয়াই তো ভাল। যারা আমাদের জমিনের ওপর বসে আছে তাদের হাতে-পায়ে ধরলে একটু থাকার জায়গা দেবে না?'

ফরিদের সারল্যে হেসে ফেলে শওকত। ছেলেটা প্রচুর লেখাপড়া করলেও অনেক ব্যাপারে একেবারেই ছেলেমানুষ, যেন বহুকাল আগের 'বচপনেই' থেকে গেছে। তার হয়ত ধারণা, দুনিয়াটা পীর-দরবেশে থিক থিক করছে। এদের কাছে হাত পাতলেই যা ইচ্ছা পাওয়া যাবে। শওকতদের মতো মানুষ যারা না ইণ্ডিয়ান, না বাংলাদেশি, না পাকিস্তানী, যারা একটু আশ্রয়ের জন্য লুকিয়ে চুরিয়ে পুরনো স্বদেশে ঢুকে পড়েছে, এখন যদি ফেলে-যাওয়া জমির অংশ চাইতে যায় তার ফলাফল কী হতে পারে,

চোখের সামনে ছবির মতো তা দেখতে পায় শওকত। সে ফরিদের কাঁধে একটা হাত রেখে আস্তে আস্তে বলে, 'ফরিদ বেটা, কেউ এক 'ধুর' জমিনও দেবে না। যা খোয়া গেছে তা কোনোদিনই ফেরত পাওয়া যাবে না। সমঝা?'

ফরিদরা আসার পর তিন দিন কেটে যায়। এর মধ্যে আরো কিছু মানুষ বর্ডারের ওপার থেকে চলে এসেছে।

আজ চতুর্থ দিন। সকালে উঠে বাসি রুটি আর আখের গুড় দিয়ে নাস্তা করে লোক আনতে কামতাপুরে চলে গেছে শওকত।

বেলা আরেকটু চড়লে ফরিদ ঠিক করে ফেলে, মনপথলে আজ যাবেই। পূর্বপুরুষের জন্মভূমি তাকে যেন প্রবল আকর্ষণে সেদিকে টানতে থাকে।

এখন যে যার ঘরের সামনের তকতকে ফাঁকা জায়গাটায় ঢিলেঢালা হয়ে বসে কথা বলছে। পুরুষদের রোজগার-ধান্দার ব্যাপার নেই। মেয়েদের অবশ্য কাঠকুটো জ্বেলে ভাজি চাপাটি বানাতে হয়। তবু তাদেরও তেমন তাড়া থাকে না। ভূগোলের হট্টগোল থেকে বহুদূরে এই মাঠের মাঝখানে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনরাত শুধু মুখ গুঁজে পড়ে থাকা ছাড়া আপাতত কারুর বিশেষ কিছু করার নেই।

ফরিদরা পায়ে পায়ে বিলের দিকে চলে যায়। ওসমানের কাছ থেকে আগেই সে জেনে নিয়েছিল কিভাবে বারহৌলি যেতে হবে। আর বারহৌলিতে একবার পৌঁছুতে পারলে লোকের কাছে জিজ্ঞেস করে ঠিক মনপথলে চলে যেতে পারবে।

বিলের কাছাকাছি ফরিদ যখন এসে পড়েছে, সেই সময় শুনতে পায়, 'এই শুনো—'

ঘুরে তাকাতেই ফরিদ দেখতে পায় রাশেদা। বেতের মতো পাতলা, ধারাল চেহারা তার। নাকমুখ কাটা কাটা। গায়ের রং পাকা গমের মতো। বড় বড় চোখ দু'টিতে আশ্চর্য যাদু মাখানো। বয়স উনিশ কুড়ি। ঢাকায় থাকতে মেয়েটা সেই কবে থেকে তাকে নজরে নজরে রেখেছে। তার চোখ এড়িয়ে কিছু করার বা কোথাও একটা পা ফেলার উপায় নেই।

রাশেদা কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

ফরিদ ভেবেছিল মনপথলে যাওয়ার ব্যাপারটা কাউকে জানাবে না। বলে, 'কই, কোথাও না। এই এখানে একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম।'

'ঝুট।'

'মতলব?'

'তুমি মনপথল যাচ্ছ।'

ফরিদ হকচকিয়ে যায়। বলে, 'নেহী নেহী। কে বললে?'

পলকহীন তাকিয়ে ছিল রাশেদা। সে বলে, 'আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

ধরা যখন পড়েই গেছে, তখন কী আর করা। ফরিদ বলে, 'সে অনেক দূর। যেতে ছ'মাইল। ফিরতে আবার ছ'মাইল। তোমার কষ্ট হবে।'

'হোক কষ্ট, আমি তো আর তোমার পায়ে হাঁটব না।'

'না না, ভাল করে ভেবে দেখ।'

'তোমার কোনো বাহানা শুনছি না। আমি যাবই। জানো তো রাশেদা কেমন জিদ্দি।'

অগত্যা হাল ছেড়ে দিতে হয় ফরিদকে।

বিলের পাশ দিয়ে ঝোপঝাড় চিরে একটা সরু কাঁচা রাস্তা চলে গেছে। সেটা ধরে আধ মাইলের মতো হাঁটলে পাকা সড়ক বা পাক্কী। এই পাক্কীটা সোজা গিয়ে ঠেকেছে বারহৌলিতে।

কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে পাক্কীতে ওঠে দু'জনে। দু'পাশে ফসলকাটা ফাঁকা মাঠ এবং আকাশে অজস্র

পাখি দেখতে দেখতে আর কথা বলতে বলতে যখন তারা বারহৌলি পৌঁছয়, দুপুর হতে তখনও বেশ দেরি।

জায়গাটা রীতিমত গমগমে। ছোটখাট টাউনই বলা যায় বারহৌলিকে। প্রচুর লোকজন। বিজলি বাতি এসে গেছে। সাইকেল রিক্‌শা আর বয়েল গাড়িতে চারদিক ছয়লাপ। ফাঁকে ফাঁকে অটো আর স্কুটারও চোখে পড়ে। রাস্তার বেশির ভাগই পাকা। দু'ধারে একতলা দোতলা অগুনতি বাড়ি। অবশ্য টিনের এবং টালির ঘরও অজস্র। এরই একধারে জমজমাট বাজার।

মনপখলে গিয়ে খাবার টাবার কিছু পাওয়া যাবে কিনা, কে জানে। ফরিদরা বাজারে এসে মিঠাইয়ের দোকান থেকে বালুসাই, লাড্ডু আর পুরি কিনে, দোকানদারের কাছ থেকে মনপখলে যাওয়ার রাস্তার হদিশ জেনে নিয়ে যখন বেরিয়ে আসে সেই সময় দূর থেকে বহু মানুষের চিৎকার ভেসে আসতে থাকে। ফরিদরা দাঁড়িয়ে যায়।

প্রথম দিকে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর দেখা যায় রাস্তার মোড় ঘুরে স্লোগান দিতে দিতে বিরাট একটা মিছিল আসছে। এবার কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যায়।

'আগলা চুনাওমে আজীবলাল সিংকো—'

'ভোট দেঁ, ভোট দেঁ।'

'সমাজসেবক আজীবলাল—'

'অমর রহে, অমর রহে।'

'দেশপ্রেমী আজীবলাল—'

'যুগ যুগ জীয়ে।'

'আজীবলালকা চিহ্ন—'

'হাঁথী ছাপ হাঁথী ছাপ।'

'হাঁথী পর—'

'মোহর মার, মোহর মার।'

রাশেদার কানের কাছে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় ফরিদ বলে,'এখানে চুনাও (নির্বাচন) আসছে।'

নির্বাচন, মিছিল, মিটিং ইত্যাদি ঢাকাতেও তারা দেখেছে। এসব তাদের কাছে অজানা কিছু নয়। রাশেদা আস্তে মাথা নাড়ে, নিচু গলায় বলে, 'হাঁ।'

একসময় স্লোগান দিতে দিতে মিছিলটা ফরিদদের সামনে দিয়ে চলে যায়। তারপর ওরা আর দাঁড়িয়ে থাকে না। বাঁ দিকের একটা সরু রাস্তায় ঢুকে এগিয়ে যায়।

বাজার এবং বারহৌলি টাউনের শেষ সীমা পেছনে ফেলে কিছুক্ষণের মধ্যে ফরিদরা একটা চওড়া পিচের সড়কে এসে ওঠে। মিঠাইওলা বলে দিয়েছিল, এই সড়কটা মনপখলের পাশ দিয়ে চলে গেছে।

এখানেও রাস্তার দু'ধারে ফাঁকা ফসলের খেত। দূরে দূরে ঘন গাছপালার ভেতর কিষানদের গাঁ।

এ রাস্তায় প্রচুর গাড়িঘোড়া। দূরপাল্লার বাস, বয়েল কি ভৈসা গাড়ি, সাইকেল রিক্‌শা, ট্রাক আর রোগা হাড্ডিসার ঘোড়ায়-টানা এক-আধটা টাঙ্গা। এক কিনার দিয়ে, গাড়িটাড়ির পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে দু'জনে সোজা হাঁটতে থাকে। মনপখলের দিকে যত এগোয়, আবেগে এবং উত্তেজনায় ফরিদের বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যায়। রাশেদা কী ভাবছে, বোঝা যায় না। ফরিদের পাশে পাশে সে যেন চঞ্চল পাখির মতো উড়ে চলে।

মাইল দুই হাঁটার পর ওরা মনপখলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। রাস্তার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে তারা জানায়, এবার পাকা সড়ক থেকে নেমে ফরিদদের ডান দিকে যেতে হবে। মাঠের ভেতর দিয়ে খানিকটা গেলেই মনপখল গাঁও।

মাঠে মেনে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে হাঁটতে থাকে ফরিদ। তার পাশে একইভাবে উড়ে উড়ে চলেছে রাশেদা। কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা মনপখল পৌঁছে যায়।

হালুইকর বলে দিয়েছিল, মনপখল গোয়ার বা গোয়ালাদের গাঁ। চারদিকে অজস্র গরু-মোষ চরতে

দেখে তা-ই মনে হয়।

এখন দুপুর। সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। রোদের ঝাঁঝ বেড়ে গেছে অনেকটা। তবে আগের মতোই জোরাল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

মনপথলে পৌঁছে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢোকে না ফরিদ। গাঁয়ের সীমানার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অগত্যা রাশেদাকেও থমকে যেতে হয়।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফরিদের আবেগ এবং উত্তেজনা রাশেদার মধ্যেও যেন চারিয়ে যেতে থাকে।

অনেকক্ষণ পর রাশেদা বলে, 'কী হল, গাঁওয়ে ঢুকবে না?'

চমকে উঠে ফরিদ বলে, 'হাঁ, চল।' যেতে যেতে গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে দেয় সে, 'হোঁশিয়ার, আমরা যে ঢাকা থেকে এসেছি কাউকে বলবে না। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

গ্রামে ঢুকে খানিকটা গেলেই বিরাট পুকুর। ফরিদ বলে, 'এই তালাও-এর ধারে বসে আগে খেয়ে নিই। তারপর কোথায় আমাদের পুরনো ঘরবাড়ি জমিন ছিল, খোঁজ করব।'

পুরি, মিঠাই এবং পুকুরের জল খেয়ে তারা পিতৃভূমির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

ফরিদের জন্ম পূর্ব পাকিস্তানে। আগে আর কখনও সে এখানে আসেনি। ঢাকায় থাকতে আব্বা বা দাদীর কাছে মনপথলের কথা অনেক বার শুনেছে কিন্তু তখন কোনোরকম টান অনুভব করেনি। বহুদূরে উত্তর বিহারের গ্রামাঞ্চলের নগণ্য অজানা এক ভূখণ্ডের জন্য তার প্রাণ উথলে ওঠেনি। পিতৃভূমি তার কাছে তখন নিতান্তই কথার কথা, ঝাপসা একটা আইডিয়া মাত্র। কিন্তু এখানকার মাটিতে পা দিয়ে ফরিদ টের পায়, না জন্মালেও বা আগে না দেখলেও তার অস্তিত্বের শিকড়টি মনপথলেই থেকে গেছে।

একটা ব্যাপার ভেবে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল, সাতচল্লিশে পার্টিশনের পর তার দাদা এবং রাশেদার দাদা এই গ্রামে থেকে সর্বস্ব খুইয়ে ঢাকায় চলে যায়। ঠিক চল্লিশ বছর বাদে তাদের দুই নাতি-নাতনী আশ্রয়ের খোঁজে, হয়ত বা আইডেনটিটির সন্ধানে এখানে চলে এসেছে।

একগুঁয়ে অভিযানকারীর মতো ফরিদ এবং রাশেদা মনপথলের ঘরে ঘরে হানা দিতে থাকে। কিন্তু এখানকার বাসিন্দা যাদের বয়স কম তারা কেউ বলতেই পারল না, ফরিদের দাদা মুদাস্‌সর আলি এবং রাশেদার দাদা সামসুদ্দিন হোসেন নামে আদৌ কেউ মনপথলে ছিল কিনা। তবে তারা শুনেছে, অনেক কাল আগে এই গাঁওয়ে কিছু মুসলমান থাকত, আজাদীর পর তারা কোথায় চলে গেছে, কে জানে। এখন আর কোনো মুসলিম ফ্যামিলি এখানে নেই।

কিছুটা হতাশ হলেও অদম্য উৎসাহে খোঁজ চালিয়েই যায় ফরিদরা। শেষ পর্যন্ত মনপথলের সবচেয়ে প্রাচীন লোকটি তাদের জানায় মুদাস্‌সর আলি এবং সামসুদ্দিন হোসেন এই গাঁওতেই থাকত। সে তাদের চিনতও।

ফরিদের রক্তের ভেতর দিয়ে বিজলি চমকের মতো কিছু ঘটে যায়। সে বলে, 'মেহেরবানি করে বলুন তাদের ঘর কোথায় ছিল—' উত্তেজনায় আবেগে আগ্রহে তার গলা কাঁপতে থাকে।

বুড়ো লোকটা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'কিছু নেই বেটা।' তারপর আঙুল বাড়িয়ে দূরে যে জায়গাটা দেখিয়ে দেয় সেটা ফাঁকা শস্যক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, ঘরবাড়ির কোনো চিহ্ন নেই কোথাও।

সেখানে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ফরিদ আর রাশেদা। তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মতো ফিরে যায়।

বিকেলের ঢের আগেই তারা বারহৌলি বাজারে চলে আসে। এবারও দেখা যায় আরেকটা লম্বা মিছিল স্লোগানে স্লোগানে আকাশ চৌচির করে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে।

'দশভকত রামবনবাস চৌবে—'
'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।'
'এম্লে বনেগা কৌন?'
'রামবনবাস চৌবে।'
'মন্ত্রী বনেগা কৌন?'
'রামবনবাস চৌবে।'
'রামরাজ লায়েগা কৌন?'
'রামবনবাস চৌবে।'
'চৌবেজিকা চিহ্ন্ পেঁড় পর—'
'আগলে চুনাওমে মোহর মার, মোহর মার।'
'তুমহারা হামারা উম্মীদবার কৌন?'
'রামবনবাস চৌবে।'
'যবতক চান্দ্ সূরয হোগা—'
'তবতক চৌবেজিকা নারা হোগা।'
'চৌবেজি—'
'অমর রহে, অমর রহে।'

রামবনবাসের নির্বাচনী মিছিল আজীবলালের মিছিলের চেয়ে কিছুটা বড় এবং বেশি জমকাল। কিন্তু সেদিকে ফরিদের লক্ষ্য ছিল না। সে শুনেছে মনপথলে তাদের বেশ বড় বাড়ি ছিল। পাকা মেঝে, ইটের দেওয়াল, চাল অবশ্য টিনের। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে কী দেখে এল তারা? গভীর হতাশা চারদিক থেকে যেন তাকে ঘিরে ধরতে থাকে।

সন্ধের আগে আগে, আকাশে দিনের আলো থাকতে থাকতেই ফাঁকা কাঁকুরে ডাঙার মাঝখানে তাদের সেই ছন্নছাড়া আস্তানায় পৌঁছে যায় ফরিদরা।

দিন সাতেক কেটে গেল।

এর মধ্যে ওপার থেকে আরো শ'খানেক মানুষ এসে পড়েছে। বাঁশ চট টালি ইত্যাদি জোড়াতাড়া দিয়ে আট দশটা নতুন ঘরও খাড়া করা হয়েছে। আরো ক'টা বানাবার তোড়জোড় চলছে।

সব মিলিয়ে এখন এখানে আড়াই শ'র মতো মানুষ। ঠিক হয়েছে, আপাতত বেশ কিছুদিন সীমান্তের ওধার থেকে লোক আসা বন্ধ থাকবে।

আজ সকালে নাস্তা সেরে শওকত ফরিদকে বলে, 'আমার সঙ্গে তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে বেটা।'

কোনো প্রশ্ন না করে ফরিদ বলে, 'যাব।'

কিছুক্ষণ পর তারা বেরিয়ে পড়ে। বিল এবং কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে পাক্কীতে উঠে শওকত বলে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, জানো?'

এ দিকটা ফরিদের চেনা। এই রাস্তা দিয়েই ক'দিন আগে বারহৌলি হয়ে সে আর রাশেদা মনপথল গিয়েছিল। কিন্তু নিশ্চিতভাবে এখনও ফরিদ জানে না শওকত তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে—বারহৌলিতে, না মনপথলে? জবাব না দিয়ে উৎসুক চোখে শওকতকে লক্ষ করতে থাকে সে।

শওকত নিজেই তার প্রশ্নের উত্তর দেয়, 'আমরা যাচ্ছি বারহৌলি টৌনে। সেই পলটিকাল লিডারের সঙ্গে দেখা করতে। বড়ে আদমী, আংরেজি উংরেজি বলতে পারে। সঙ্গে একজন 'লিখিপড়ি' লোক থাকা দরকার। তাই তোমাকে নিয়ে এলাম।' শওকত একনাগাড়ে বলে যায়, 'ভেবে দেখলাম, আর দেরি করা ঠিক না। কখন কী হাঙ্গামা বেধে যাবে, হয়ত এখান থেকে আবার ভাগিয়ে দেবে। তার

আগে লিডারকে ধরতে হবে। সিধা ওঁর পায়ে পড়ে যাব।'

শওকত খুবই দূরদর্শী, অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান। ষাট বছরের জীবনে ভারত পাকিস্তান আর বাংলাদেশে অজস্র দাঙ্গা গণহত্যা দেশভাগ অস্থিরতা আর উন্মাদনার সাক্ষী সে। জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শিখিয়েছে।

শওকতের কথাগুলো ফরিদকে বুঝিয়ে দেয়, ইণ্ডিয়ায় থাকতে হলে পলিটিক্যাল প্রোটেকশনটা একান্ত জরুরি। আর সেই উদ্দেশ্যেই আজ সে তাকে নিয়ে চলেছে।

ফরিদ আচমকা বলে ওঠে, 'আমরা কার কাছে যাচ্ছি চাচা? আজীবলাল সিং, না রামবনবাস চৌবে?' বলেই টের পায় গোলমাল করে ফেলেছে। সে যে বারহৌলির দিকে গিয়েছিল, আর বারেহৌলিতে গেলে নিশ্চয়ই মনপখলে হানা দিয়েছে, এটা এবার ধরা পড়ে যাবে।

শওকত অবাক হয়ে ফরিদের দিকে তাকায়। বলে, 'ওঁদের নাম তুমি জানলে কী করে? বারহৌলিতে এসেছিলে?'

ফরিদ মুখ নিচু করে মাথা হেলিয়ে দেয়।

চোখের তারা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে শওকতের। সে বলে, 'মনপখলেও গিয়েছিলে, তাই না?'

ফরিদ আধফোটা গলায় বলে, 'হাঁ।'

শওকত অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'ঠিক আছে, পরে মনপখলের কথা শোনা যাবে। এখন বল, আজীবলাল সিং আর রামবনবাস চৌবের কথা কার কাছে শুনেছ?'

ফরিদ সেদিনের দুটো মিছিলের কথা জানায়।

শওকত বলে, 'ও, আচ্ছা। আমরা এখন রামবনবাস চৌবের কাছেই যাচ্ছি।'

বারহৌলি টাউনের এক মাথায় বাজার, আরেক মাথায় 'চতুর্বেদী ধাম'। বিশাল কমপাউণ্ডের মাঝখানে পুরনো আমলের দুর্গের মতো প্রকাণ্ড তেতলা বাড়িটার মাথায় রামসীতা মন্দির। কামপাউণ্ড ঘিরে দশ ফুট উঁচু এবং তিন ফুট চওড়া দেওয়াল। সামনের দিকে লোহার পাল্লা দেওয়া বিরাট গেট। সেখানে পাকানো গোঁফওলা বিপুল চেহারার ভোজপুরী দারোয়ান হাতে বন্দুক এবং গলায় টোটার মালা ঝুলিয়ে দিনরাত পাহারা দেয়।

শওকতরা 'চতুর্বেদী ধাম'-এ পৌঁছে দারোয়ানকে জানায় রামবনবাস চৌবের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

দারোয়ান ভুরু কুঁচকে দু'জনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছাড়ে, 'ভাগ শালে—'

শওকতেরা চলে যায় না, সমানে কাকুতিমিনতি করতে থাকে। দারোয়ান ভেতরে ঢুকতে দেবে না, তারাও নাছোড়বান্দা। দারোয়ানের মেজাজ ক্রমশ চড়তে থাকে, সেই সঙ্গে তার গলাও। চিৎকার করে সে বার বার হুঁশিয়ারি দেয়, না গেলে গুলি করে শওকতদের মাথা বিলকুল ছাতু করে দেবে।

এই সময় ভেতর থেকে গম্ভীর মোটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'দারবান, উ লোগোকো অন্দর আনে দো।'

গেটের পর অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা হুড-খোলা প্রাচীন আমলের মোটর, দুটো জিপ আর ঘোড়ার-টানা ফিটন দাঁড়িয়ে আছে। দুটো নৌকর মোটর আর ফিটন ধোয়ামোছা করছে।

দূরে মূল বাড়িটার একতলায় শ্বেতপাথরে বাঁধানো ঢালা বারান্দায় ইজি চেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে ডাক এডিশনের কাগজ পড়ছিলেন রামবনবাস। পাশে একটা নিচু টেবলে আরো অনেকগুলো খবরের কাগজ পর পর সাজানো। আর আছে দু-চারটে জরুরি ফাইল, কলম, দামি কাগজের রাইটিং প্যাড। নিচে একটা মোরাদাবাদী ফরসি, কলকের মাথা থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উড়ছে।

রামবনবাসের বয়স পঁয়ষট্টি ছেষট্টি। মজবুত স্বাস্থ্য। এই বয়সেও চুলটুল বেশি পাকেনি, দাঁতগুলো অটুট। খাড়া নাক, ধারাল মুখ। শরীরে অতিরিক্ত মেদ নেই। চোখে অবশ্য চশমা রয়েছে।

বারান্দাটা মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচুতে। শওকতেরা ভয়ে ভয়ে, প্রায় দমবন্ধ করে রামবনবাসের কাছাকাছি নিচের জমিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘাড় ঝুঁকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'সেলাম হুজৌর—'

রামবনবাস সোনার ফ্রেমের ওপর দিয়ে তীব্র চোখে তাদের দেখতে দেখতে বলেন, 'কী হয়েছে? শোর মচাচ্ছিলে কেন?'

'হুজৌর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দারবান আসতে দিচ্ছিল না।'

'কারা তোমরা? তোমাদের তো আগে কখনও দেখিনি।'

শওকত জানায়, তারা এখানে নতুন এসেছে। তবে চল্লিশ বছর আগে এ অঞ্চলেরই বাসিন্দা ছিল।

কপালে ভাঁজ পড়ে রামবনবাসের। তিনি বলেন, 'মতলব?'

কিভাবে দেশভাগের পর তারা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়, তারপর বাংলাদেশ হওয়ার পর ঢাকায় তাদের কী হাল হয়েছে এবং এখানে ফিরে না এসে তাদের উপায় ছিল না, ইত্যাদি বিস্তারিত জানিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে থাকে শওকত।

রামবনবাসের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়া ঘটে যায় যেন। খাড়া উঠে বসেন তিনি। বলেন, 'তোমরা লুকিয়ে চুরিয়ে ইণ্ডিয়ায় ঢুকেছ! ঘুসপৈঠিয়া—ইনফিলট্রেটরস। জানো এটা কত বড় বেআইনি কাজ?'

শওকত এবং ফরিদ হাতজোড় করে একেবারে নুয়ে পড়ে। শওকত রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'হুজৌর মা-বাপ, আমাদের বাঁচান। ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। এখানে যদি থাকতে না পারি, বালবাচ্চা নিয়ে শেষ হয়ে যাব। এখন আপনার মেহেরবানি।'

অনেকক্ষণ কী ভাবেন রামবনবাস। তার্পর বলেন, 'তোমরা কত লোক এসেছ?'

'লগভগ আড়াই শ হুজৌর।'

'আর আসবে?'

'হাঁ।'

'কত আসতে পারে?'

'বহোত আদমী। তবে এদিকে আর সাত আটশ'র বেশি আসবে না।'

একটু চুপ করে থাকার পর রামবনবাস আবার জিজ্ঞেস করেন, 'আমার খবর তোমাদের কে দিলে?'

টাউটদের নাম করে না শওকত। সসম্ভ্রমে শুধু বলে, 'দুনিয়ায় আপনার নাম কে না জানে! এখানে পা দিয়েই আপনার কথা শুনেছি মালিক।'

চাটুবাক্যে মোটামুটি খুশিই হন রামবনবাস। তবে বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় নেই। বলেন, 'আচ্ছা, এখন যাও।'

শওকত ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের কী হবে মালিক?'

'আমাকে ক'দিন ভাবতে দাও।'

রামবনবাস চলে যেতে বলেছেন, তবু দাঁড়িয়ে থাকে শওকতেরা।

রামবনবাস বিরক্ত হয়েই এবার বলেন, 'কী হল, গেলে না?'

শওকত মাথা আরো নুইয়ে দিয়ে বলে, 'হুজৌর, আমরা যে এসেছি, অনেকে জেনে গেছে। তারা যদি ঝঞ্ঝাট বাধায়?'

'চার রোজ বাদ তোমরা আমার সঙ্গে দেখা করো।'

শওকতের আর প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। 'জি—' বলে এবং বারকয়েক সেলাম ঠুকে তারা বিদায় নেয়।

রামবনবাস চৌবে স্পষ্ট করে তাদের কোনো ভরসা দেননি। অবশ্য চারদিন পর আসতে বলেছেন। তখন তিনি কী বলবেন, কী করবেন, বোঝা যাচ্ছে না। শওকতের গা ঘেঁষে চলতে চলতে উৎকণ্ঠায় দম আটকে আসতে থাকে ফরিদের। আংরেজি বলার জন্য শওকত তাকে নিয়ে এসেছিল কিন্তু তার দরকার হয়নি। এতক্ষণ রামবনবাসের হাভেলিতে সে ছিল নির্বাক দর্শক। এবার হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে,

'চৌবেজিকে আমাদের কথা বলে কি ভাল হল চাচা?'

চিন্তাগ্রস্তের মতো শওকতও হাঁটছিল। ফরিদের প্রশ্নের ধাঁচটা ধরতে না পেরে বলে, 'মতলব?'

'ওরা পলিটিক্যাল লোক। যদি বিপদে ফেলে দেয়?'

অর্থাৎ রাজনীতি-করা লোকেরা কতটা বিশ্বাসযোগ্য, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে ফরিদের। শওকত বলে, 'কাউকে না কাউকে সাহারার জন্যে তো বলতেই হবে। পলটিক্যাল লিডার ছাড়া আর কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। এখন দেখা যাক।'

ফরিদ আর কিছু বলে না।

চারদিন নয়, ঠিক দু'দিন পর সকালবেলায় দুটো ঘাড়ে-গর্দানে-ঠাসা, হট্টাকট্টা চেহারার লোক এসে লাঠি ঠুকে চেঁচায়, 'কৌন হো শওকত মিঞা আউর ফরিদ আলি?'

মাঠের মাঝখানে সৃষ্টিছাড়া এই বসতিতে মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শওকত এবং ফরিদ ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমরা। কেন?'

'চৌবেজি তোমাদের নিয়ে যেতে বলেছেন।'

চারদিনের বদলে দু'দিনের ভেতর কেন এই তলব, বুঝে উঠতে পারে না শওকত। ভীরু গলায় সে জানতে চায়, 'মালিক কেন যেতে বলেছেন, আপনারা জানেন?'

'নেহী।'

আর কোনো প্রশ্ন করে না শওকত। চারপাশের ত্রস্ত মানুষগুলোকে খানিকটা ভরসা দিয়ে ফরিদকে নিয়ে লোক দুটোর সঙ্গে বারহৌলি চলে যায়।

দু'দিন আগে 'চতুর্বেদী ধাম'-এর একতলায় শ্বেতপাথরে বাঁধানো বারান্দায় একাই ছিলেন রামবনবাস। আজ তাঁকে ঘিরে গদি-মোড়া আরামদায়ক চেয়ারে চারপাঁচ জন বসে আছেন। চেহারা এবং পোশাকআশাক দেখে আন্দাজ করা যায় তাঁরা মান্যগণ্য বিশিষ্ট সব মানুষ। উঁচু গলায়, উত্তেজিত ভঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করছিলেন। শওকতদের দেখে তাঁরা থেমে যান।

রামবনবাস বলেন, 'এদের কথাই আপনাদের বলেছিলাম।'

তাঁব সঙ্গীরা স্থির চোখে শওকতদের লক্ষ করতে থাকেন। একজন বলেন, 'এরাই তা হলে ঘুসপৈঠিয়া (অনুপ্রবেশকারী)? এদের কথা আমার কানে আগেই এসেছে। বিলের পাশে পড়তি জমি দখল করে ঘর তুলে বসেছে এরা।'

আরো ক'জন সায় দিয়ে বলেন, 'আমরাও খবরটা পেয়েছি।'

শুনতে শুনতে ভয়ানক ঘাবড়ে যায় শওকত আর ফরিদ। গলগল করে ঘামতে থাকে।

রামবনবাস শওকতকে বলেন, 'আজ তোমাদের একটা জরুরি কাজে ডাকিয়ে এনেছি। সেদিন তোমরা বলেছিলে, লগভগ আড়াইশ আদমী ওপার থেকে এসেছ।'

কাঁপা গলায় উত্তর দেয় শওকত, 'জি।'

এবার রামবানবাস তাঁর সঙ্গীদের দিকে ফিবে জিজ্ঞেস করেন. 'আপনারা মনে করছেন, আগলা চুনাওতে আজীবলাল ভাল ভোট পাবে।'

সবাই সমস্বরে জানান, 'হাঁ।'

'কতগুলো সিওর ভোট হাতে থাকলে আমি জিততে পারি?'

'কমসে কম ছ'সাত শ।'

'ঠিক বলছেন?'

'হাঁ, জরুর।'

রামবনবাস আবার শওকতদের দিকে মুখ ফেরান। বলেন, 'সেদিন বলছিলে ওপার থেকে আরো ছ'সাত শ আদমী এখানে আসবে। এসে গেছে?'

'নেহী মালিক। শুনেছি কিছুদিন পর থেকে আসতে থাকবে।' শওকত শ্বাসরুদ্ধের মতো বলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর রামবনবাস বলেন, 'এখানে আট মাস পর যে চুনাও হচ্ছে, তা জানো?'

শওকত ফরিদকে দেখিয়ে বলে, 'জানি না। তবে বারহৌলি বাজারে ও দুটো চুনাওর মিছিল দেখেছে। একটা আপনার, আরেকটা আজীবলাল সিংয়ের।'

'হাঁ।' রামবনবাস নড়েচড়ে বসেন। বলেন, 'এত আগে কেউ চুনাও নিয়ে মাথা ঘামায় না। লেকেন আজীবলাল ময়দানে নেমে গেছে। আমার পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব না। ভূচ্চরটা জেতার জন্য দু হাতে টাকা ওড়াচ্ছে।' বলেই গলার ভেতর থেকে মোটা গমগমে আওয়াজ বার করেন, 'হোঁশিয়ার, ওদের পাল্লায় পড়বে না।'

ভীত মুখে শওকত বলে, 'নেহী মালিক, নেহী।'

'আর শোন, আগলা চুনাওতে আমাকে তোমরা ভোট দেবে। আমার চিহ্ন্‌ পেঁড়। পরে যারা ওপার থেকে আসবে তাদেরও আমাকে ভোট দিতে হবে।'

এই সময় নিজের মধ্যে খানিকটা সাহস জড়ো করে ফরিদ বলে, 'লেকেন মালিক আমরা ঘুসপৈঠিয়া, এদেশে ভোট দেব কী করে?'

তার মনোভাব বুঝতে পারছিলেন রামবনবাস। বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটাধিকার নেই। তিনি বলেন, 'সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। লেকেন হোঁশিয়ার, আমাকে ভোট না দিলে তোমরা জিন্দা গোরে চলে যাবে।'

পাশ থেকে শশব্যস্তে শওকত বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ মালিক, আপনাকেই আমরা ভোট দেব, এই জবানের এদিক ওদিক হবে না। লেকেন আমাদের কী হবে? ফরিদ ক'দিন আগে মনপথল গিয়েছিল। সেখানে আমাদের বাপ-দাদার ঘর 'বরাবর' করে এখন চাষ হচ্ছে। আমরা কোথায় থাকব? কী করব?'

'ওখানে কিছু করা যাবে না। ভোটটা আগে দাও, ইণ্ডিয়ান বনো। তারপর ব্যওস্থা হয়ে যাবে।'

শওকত আর ফরিদ চুপ করে থাকে।

রামবনবাস আবার বলেন, 'আজ যে সব কথা হল, কাউকে বলবে না। মুহ্‌ বিলকুল বন্ধ্‌।'

'হাঁ মালিক।'

আরো কিছুদিন কেটে যায়। এর মধ্যে সীমান্তের ওপার থেকে নতুন কয়েক শ লোক এসে পড়ে।

এদিকে নির্বাচনের কারণে এ অঞ্চলের আবহাওয়া ক্রমশ তেতে উঠতে থাকে। তারই ভেতর এক ঝিম-ধরা দুপুরে দুটো লোক এসে ভোটার্স লিস্টে তাদের নাম তুলে নিয়ে যায়। আর কয়েক দিন বাদে রামবনবাসের সুপারিশে তাদের রেশন কার্ডও হয়ে গেল।

দিন মোটামুটি কেটে যাচ্ছিল। উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা ভয় আতঙ্ক—সবই ছিল কিন্তু কেউ এসে এতকাল ঝঞ্ঝাট বাধায়নি। কিন্তু ভোটার লিস্টে নাম ওঠা এবং রেশন কার্ড হয়ে যাওয়ার পর একদিন বিকেলে আজীবলালের শ'তিনেক লোক চিৎকার করতে করতে এসে হানা দেয়।

'ঘুসপৈঠিয়া হিন্দুস্থানসে—'

'দফা হো, দফা হো।'

'বিদেশি—'

'ভারত ছোড়ো, ভারত ছোড়ো।'

ঘন্টাখানেক হল্লা করে লোকগুলো চলে যায়।

তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে শওকত আর ফরিদ বারহৌলিতে 'চতুর্বেদী ধাম'-এ চলে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়ার্ত মুখে সব ঘটনা রামবনবাসকে জানায়।

রামবনবাস এতটুকু উত্তেজিত হন না। নিস্পৃহ সুরে বলেন, 'শোর মচানে দো শালে লোগকো। ভোটার লিস্টে তোমাদের নাম উঠেছে, রেশন কার্ডও হয়ে গেছে। এখন তোমরা ইণ্ডিয়ান। কোনো ভূচ্চরের ছোঁয়ার ক্ষমতা নেই তোমাদের চামড়ায় হাত ঠেকায়। চিন্তা মাত্‌ করনা। শুধু আমার ভোটের

কথাটা মনে রেখ।'

'জি। জান গেলেও ভুলব না।'

ঘন্টাখানেক বাদে শওকতের সঙ্গে কাঁকুরে ডাঙার মাঝখানে তাদেব সৃষ্টিছাড়া বসতিতে ফিরে যেতে যেতে ফরিদের মাথায় সেই ভাবনাটাই বার বার ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। ব্রিটিশ আমলে তারা ছিল ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানী, তারও পর বাংলাদেশি। চুনাও-এর কারণে চল্লিশ বছর বাদে তারা নতুন আইডেনটিটি পেয়ে যায়। এখন তারা আবার ভারতীয়।

দুরমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে মনে মনে চুনাওকে হাজার বার সেলাম জানায় ফরিদ।

কিছুক্ষণ

উত্তর বিহারের উঁচু হাইওয়ের ধারে পড়তি কাঁকুরে মাঠটায় 'মাধোপুরা রিলিফ ক্যাম্প' অর্থাৎ ত্রাণশিবির। অনেকটা জায়গা জুড়ে নতুন তেরপলের অগুনতি তাঁবু লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গোটা শিবির ঘিরে তারকাঁটার মজবুত বেড়া। সামনের দিকে কাঠের পাল্লা দেওয়া গেট।

রিলিফ ক্যাম্পটায় এই মুহূর্তে বাচ্চাকাচ্চা মিলিয়ে হাজারখানেক মানুষ রয়েছে।

দিন পনেব আগে এ অঞ্চলে বড় রকমের দাঙ্গা হয়ে গেছে। পাঁচ ছ'টা গাঁ ভেঙেচুরে জ্বালিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মারা গেছে দু পক্ষের কম করে সাত আটজন। জখম হয়েছে বিস্তর, তাদের অনেকেই এখন ডিস্ট্রিক্ট টাউনের হাসপাতালে। জ্বালিয়ে দেওয়া গাঁয়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে হাজারেব মতো সন্ত্রস্ত, দিশেহারা, অসহায় মানুষকে তুলে এনে ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

ত্রাণশিবির থেকে বিশ গজ দূরত্বে সি আর পি অর্থাৎ সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের সাত আটটা তাঁবু। তাঁবুগুলোর সামনে ক'টা চারপায়া। সেগুলোর ওপর ঢোলা হাফপ্যান্ট বা লুঙ্গি পরা জনচারেক আর্মড পুলিশ আধশোয়ার মতো করে কাত হয়ে আছে। তাদের পাশে বেয়োনেট লাগানো রাইফেল। দুটো জিপ আর একটা কালো রংয়ের জবরদস্ত ভ্যানও সি আর পি তাঁবুগুলোর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

দাঙ্গার পনের দিন বাদেও এখানকার আবহাওয়া বেশ উত্তপ্ত। বাতাসে নানা গুজব উড়ছে। উত্তেজনা কমে এলেও সব কিছু স্বাভাবিক হতে এখনও সময় লাগবে। তাই দিবারাত্রি রিলিফ ক্যাম্প পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট আঠার জনের পুলিশবাহিনীটি হাজার মানুষের জান-প্রাণের জিম্মাদার। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে একটা মাছিরও রিলিফ ক্যাম্পে ঢোকার উপায় নেই।

কার্তিক মাস শেষ হয়ে এল। এই সময়টা সন্ধের পর থেকে ভোর পর্যন্ত এখানে হালকা ধরনের শীত পড়ে। দিনের বেলাটা কিন্তু চমৎকার—ভারি আরামদায়ক। তখন না ঠাণ্ডা, না গরম।

এখন ভরদুপুর।

পরিষ্কার ঝকঝকে নীলাকাশের কোথাও একফোঁটা মেঘ নেই। ফুরফুরে ভারহীন শুকনো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে চরাচরের ওপর দিয়ে। আকাশ চিরে চিরে বুনো টিয়ার ঝাঁক উড়ে চলেছে উত্তর থেকে খাড়া দক্ষিণে।

রিলিফ ক্যাম্পের তারকাঁটার বেড়ার ধার ঘেঁষে অন্যমনস্কর মতো বসে আছে রফিক। তার পাশে তার বিবি ফরিদা। ফরিদার কোলে তাদের মাস চারেকের বাচ্চা।

ওরা যেখানে বসেছে সেখান থেকে পঁচিশ তিরিশ গজ তফাতে অনেকগুলো ঝাঁকড়া-মাথা কড়াইয়া গাছ গা জড়াজড়ি করে রয়েছে। তারপর নয়ানজুলি। নয়ানজুলির ওধারে উঁচু হাইওয়ে। রাস্তাটা একদিকে পাটনা, আরেক দিকে পূর্ণিয়ায় গিয়ে ঠেকেছে।

এই দুপুরবেলায় হাইওয়েতে গাঁক গাঁক করতে করতে লরির ঝাঁক ছুটে চলেছে। আর যাচ্ছে মানুষে-মালপত্রে আগাপাশতলা ঠাসা দূরপাল্লার বাস, সাইকেল রিক্শা, অটো, টেম্পো, বয়েল আর ভৈসা গাড়ি। এছাড়া রয়েছে মানুষের স্রোত।

রফিক হাইওয়ের দিকে তাকিয়ে মানুষ এবং লরি টরি দেখছিল। তার বয়স সাতাশ আটাশ, পরনে

লুঙ্গি আর আধময়লা হাফ-হাতা গেঞ্জি। পেটানো স্বাস্থ্য রফিকের। বোঝা যায়, গায়ে খেটে তাকে পেটের দানা জোটাতে হয়। মুখচোখের দিকে ভাল করে তাকালে আরো টের পাওয়া যাবে, রফিক খুবই সাদাসিধে আর ভালমানুষ গোছের যুবক। তার ভেতর আদৌ কোনো মারপ্যাঁচ নেই।

রফিকের বিবি ফরিদাও প্রায় তারই মতো। শ্যামলা মেয়েটির মুখে পৃথিবীর সবটুকু সারল্য মাখানো। তার পরনে ডোরাকাটা সবুজ শাড়ি। পাতলা নাকের পাটায় সবুজ পাথর বসানো নাকফুল, কানের লতিতে চাঁদির করণফুল আর হাতে চাঁদির কাংনা। তার চোখও স্বামীর মতোই হাইওয়ের দিকে ফেরানো।

ক্যাম্পের ভেতর রফিকদের পেছন দিকে আরো অনেক মেয়েপুরুষ দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে পর্দা নিয়ে তেমন কড়াকড়ি নেই।

ফরিদা একসময় জিজ্ঞেস করে, 'আর কত দিন আমাদের এখানে আটকে থাকতে হবে?' এই প্রশ্নটা রোজই কয়েক বার করে থাকে সে। আসলে তারকাঁটার ঘেরের ভেতর তাঁবুর নিচে কয়েদির মতো দিন কাটাতে আর ভাল লাগছিল না তার।

রফিকও এই ব্যাপারটাই ভাবছিল। প্রশ্নটার উত্তর তারও জানা নেই। ক্যাম্পে থাকতে থাকতে তার দম বন্ধ হয়ে এসেছে। গোড়ার দিকে তারকাঁটার গণ্ডির বাইরে এক পা-ও বেরুবার হুকুম ছিল না। ইদানীং দিনকয়েক হাইওয়ে পর্যন্ত যেতে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু হাইওয়ে পেরিয়ে ওধারে পা বাড়ালেই সি আর পি তাঁবু থেকে গম্ভীর ভারি গলায় হুঁশিয়ারি ভেসে আসে, 'মাত্ যাও।'

রফিক হতাশ ভঙ্গিতে দু'হাত উলটে দেয়। বিবিকে বলে, 'কৌন জানে!'

ফরিদা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হঠাৎ দেখা যায়, হাইওয়ে থেকে বিশ তিরিশটি মানুষের একটা দল নয়ানজুলির কালভার্ট পেরিয়ে এসে ক্যাম্পের সামনের কড়াইয়া গাছগুলোর তলায় বোঁচকা-বুঁচকিসুদ্ধ হুড়মুড় করে বসে পড়ে। না খেতে পাওয়া হাভাতে চেহারা তাদের। বোঝা যায়, অনেক দূর থেকে বেশ কিছুদিন ধরে পায়ে হেঁটে তারা আসছে। তাদের চোখেমুখে অসীম ক্লান্তি আর কষ্টের ছাপ।

দলটার ভেতর একটা রোগা মরকুটে বাচ্চা তার স্বাস্থ্যহীন ক্ষয়াটে চেহারার মায়ের কোলে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া বাকি সবাই একেবারে চুপ। কথা বলার মতো শক্তিটুকুও বুঝিবা তাদের শরীরে আর অবশিষ্ট নেই।

ওদিকে সি আর পি তাঁবুগুলোতে একেবারে হুলস্থূল বেধে যায়। দাঙ্গার উত্তেজনা কমে আসার পর আজকাল আর্মড গার্ডরা নিয়মিত নজরদারি করে গেলেও একটু ঢিলেও দিয়েছে। দুপুরে পাহারা দিতে দিতে খানিকটা ঘুমিয়েও নেয় তারা। আর সেই ফাঁকে অঘটনটা ঘটে গেছে। হতচ্ছাড়া চেহারার মানুষগুলো আচমকা ক্যাম্পের সমানে এসে বসে পড়েছে। অথচ ওপর থেকে ত্রাণশিবিরের ধারে কাছে বাইরের লোকজনকে ঘেঁষতে দেওয়ার 'অর্ডার' নেই।

আলস্য এবং দুপুরের উৎকৃষ্ট 'ভোজনে'র পর পরিপাটি নিদ্রাটি পলকে মাটি হয়ে যায় আর্মড গার্ডদের। সটান উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেল হাতে হাঁই হাঁই করতে করতে তারা হাভাতেদের কাছে দৌড়ে আসে। হাতের রাইফেলগুলো আকাশের দিকে তুলে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চিৎকার করতে থাকে, 'ভূচ্চরের ছৌয়া, ভাগ হিঁয়াসে, ভাগ আভ্‌ভি।'

হাভাতে মানুষের গোটা দলটা মুহূর্তে ভয়ে কুঁকড়ে যায়। মায়ের কোলে যে রুগ্‌ণ বাচ্চাটা হাড়-পাঁজরা ফাটিয়ে একটানা কেঁদে যাচ্ছিল, সে-ও একেবারে থেমে গেছে।

দলের ভেতর থেকে বছর তিরিশের একটি যুবক, তার নাম গণুয়া, কোমর ঝুঁকিয়ে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'হুজৌর, আমরা সাত রোজ হাঁটতে হাঁটতে আসছি। গায়ে আর তাকত নাই। সিরিফ দুফারটা এখানে থাকব, সূরয ডোবার আগেই চলে যাব। কিরপা করে দো চার ঘণ্টা থাকতে দিন।'

গণুয়ার কাকুতি মিনতিতে কিছুটা কাজ হয়। আর্মড গার্ডরা গোটা দলটাকে ধীরে ধীরে একবার দেখে নেয়। বাচ্চা-টাচ্চা সমেত সবগুলো মেয়েপুরুষ তটস্থ হয়ে আছে।

সি আর পি'দের একটা বড় ধরনের দুশ্চিন্তা হল, আবহাওয়া এখনও যেরকম গরম হয়ে আছে তাতে বাইরের দাঙ্গাবাজরা রিলিফ ক্যাম্পে হামলা চালাতে পারে। কিন্তু এই সব কমজোর, ভুখা, অতি

নিরীহ লোকগুলোর পক্ষে কারুর চামড়ায় সামান্য একটা আঁচড় কাটারও যে ক্ষমতা নেই, তা বলে না দিলেও চলে।

একটা আর্মড গার্ড গলার স্বর খানিকটা নরম করে বলে, 'কোনো ঝামেলা করবি না তো?'

'নেহী হুজৌর।' গণুয়া কোমর আরো কিছুটা ঝুঁকিয়ে দেয়।

রিলিফ ক্যাম্পের দিকে আঙুল বাড়িয়ে আর্মড গার্ডটা এবার বলে, 'ওদের দিকে এক কদম বাড়ালে গুলি চালিয়ে বিলকুল মাথা উড়িয়ে দেব—হাঁ। মনে থাকবে?'

গাছতলা থেকে এখনই উঠে যেতে হবে না, সেটুকুই যথেষ্ট। পুলিশের করুণায় গোটা দলটা একেবারে কৃতার্থ হয়ে যায়। গণুয়া এবার মাথা প্রায় মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে বলে, 'মনে থাকবে হজৌর, জরুর মনে থাকবে।'

আর্মড গার্ডরা আরো বারকয়েক হুঁশিয়ারি দিয়ে ফিরে যায়। গিয়েই তৎক্ষণাৎ চৌপায়াগুলোতে ফের গা এলিয়ে দেয়। দিবানিদ্রায় যে ব্যাঘাতটুকু ঘটেছিল তা পুষিয়ে নিতে হবে।

যে বাচ্চাটা কিছুক্ষণ আগে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিচ্ছিল সে বুঝিবা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জেনে ফেলেছে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে পুলিশকে ভয় পেতেই হয়। আর্মড গার্ডরা চলে যাওয়ার পর সে নতুন উদ্যমে কান্না জুড়ে দেয়।

গণুয়া এতক্ষণ আর্মড গার্ডদের সঙ্গে কথা বলছিল। এবার সে বাচ্চাটার মায়ের পাশে গিয়ে বসে। বিরক্ত মুখে বলে, 'গিধের ছৌয়াটা চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে মাথা ধরিয়ে দিলে। থামা ওটাকে লছিমা।'

বাচ্চাটার মা অর্থাৎ লছিমা গণুয়ার ঘরবালী। তার শরীরে মাংস বলতে প্রায় কিছুই নেই। সমতল বুক, মাথায় জট পাকানো রুক্ষ চুল, হলদেটে চোখ। সে বলে, 'চিল্লানি থামাব কী করে? ভুখে কাঁদছে। জানো না, তিন রোজ আটা গুলে খাইয়ে রেখেছি। আজ আটাও নেই।' বলে একটি শুকনো স্তন বাচ্চাটার মুখে গুঁজে দেয়। কিন্তু দু-একটা টান দিয়েই আবার চেঁচাতে শুরু করে বাচ্চাটা। নাঃ, মায়ের বুকে একফোঁটা রসও নেই।

দুই কান হাত দিয়ে চেপে গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে গণুয়া, 'কৌয়ার ছৌয়াটাকে গলা টিপে খতম করে দে। চিল্লানি আর ভাল লাগে না।'

লছিমা বলে, 'গলা আর টিপতে হবে না। ওর জন্যে যদি কিছু যোগাড় করতে না পার, আজই ওর মৌত (মৃত্যু) হয়ে যাবে।'

অপবিসীম বিদ্বেষে বাচ্চা আর লছিমাকে একবার দেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় গণুয়া।

আরো খানিকক্ষণ কাঁদার পর নিস্তেজ হয়ে চুপ করে যায় বাচ্চাটা।

এদিকে দলের অন্য লোকজনেরা পোঁটলা পুঁটলি খুলে যৎসামান্য যে খাদ্যটুকু এখনও বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে—যেমন রামদানা সেদ্ধ, লিট্টি বা ঘাটো—বার করে খেতে শুরু করে।

লছিমাদের খাবার দাবার কাল রাতেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। আজ সকাল থেকে তাদের উপোস শুরু হয়েছে। যতক্ষণ না নতুন করে খাদ্যবস্তু যোগাড় করতে পারছে, জলই তাদের একমাত্র ভরসা।

লছিমা এবং গণুয়া যেখানে বসেছে সেখান থেকে মাত্র দশ গজের মতো দূরে তারকাঁটার বেড়ার ওধারে এখনও রফিকরা বসে আছে। উত্তর থেকে আসা মানুষের দলটাকে আগাগোড়া লক্ষ করে যাচ্ছিল তারা।

রফিক খুবই মিশুকে এবং আলাপী ধরনের। সে হঠাৎ ডেকে ওঠে, 'এ ভেইয়া—'

গণুয়া চমকে মুখ ফেরায়। তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে একটু হাসে রফিক। জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কোত্থেকে আসছ?'

অনির্দিষ্টভাবে উত্তর দিকে আঙুল বাড়িয়ে নাড়তে নাড়তে গণুয়া বলে, 'উধর জানকীপুরা গাঁও হ্যায়—শুনা হ্যায় ওহী নাম?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে রফিক বলে, 'নেহী। বহোত দূর?'

'হাঁ।'

'কেত্তে দূর?'

খানিক চিন্তা করে গণুয়া বলে, 'হোগা লগভগ ষাট-পঁয়ষট 'মিল' (মাইল)।'

রফিক কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, 'এত্তে আদমী গাঁও ছেড়ে কোথায় চলেছ?'

'টৌনে (টাউনে)।'

'কেন?'

গণুয়া এবার যা উত্তর দেয় তা এইরকম। তাদের জানকীপুরা অঞ্চলে এবছর প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে। সমস্ত মাঠঘাট পুরো দেড় মাস চার হাত জলের তলায় ডুবে ছিল। ফলে চাষবাস কিছুই হয়নি। গণুয়ারা ভূমিহীন খেতমজুর। চাষ নেই তো তাদের কামাইও নেই। কামাই না থাকলে পেটের দানা জুটবে কোথেকে? তাদের মতো মানুষের ঘরে সোনাদানা ধান গেঁহু এমন কিছুই জমানো থাকে না যা দিয়ে খরা বা বন্যার মতো দুঃসময় কাটিয়ে উঠতে পারে।

গ্রামে চাষ ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। কতদিন আর উপোস দিয়ে থাকা যায়! তাই স্রেফ প্রাণে বাঁচার জন্য জানকীপুরা ছেড়ে কাজকর্মের খোঁজে গণুয়ারা পূর্ণিয়া কি কাটিহার চলেছে। তাদের বিশ্বাস শহরে গেলে কামাইয়ের কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

জানকীপুরার হাভাতে দুঃখী মানুষগুলোর জন্য এক ধরনের কষ্টবোধ হতে থাকে রফিকের। সংশয়ের গলায় বলে, 'সচমুচ কামাইয়ের ব্যওস্থা হবে তো?'

গণুয়া বলে, 'হো যায়গা মালুম হোতা। অব্ ভগোয়ানকা মর্জি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর গণুয়া জিজ্ঞেস করে, 'একগো বাত পুছেগা ভেইয়া?'

রফিক বলে, 'হাঁ হাঁ, জরুর।'

'তুমলোগোন কৌন গাঁওকা রহেনেবালা?'

'নওশেরগঞ্জকা।'

'বহোত দূর?'

'নেহী, নজদিগ হ্যায় হামনিকো গাঁও। জ্যাদাসে জ্যাদা এক দেড় মিল হোগা।'

গণুয়া এবার অসীম বিস্ময়ে 'মাধোপুরা রিলিফ ক্যাম্প'টাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখে। তারপর বলে, 'এত কাছে তোমাদের গাঁও। তা হলে নিজেদের ঘর ছেড়ে তাম্বুতে এসে আছ কেন?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় না রফিক। তার কপাল কুঁচকে যায়, মুখে কঠোরতা ফুটে ওঠে। সে বলে, 'তোমরা কিছু জানো না?'

'নেহী ভেইয়া।'

'কিছু শোননি?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে গণুয়া বলে, 'শুনা হ্যায় হিঁয়া থোড়াকুছ ঝামেলা হুয়া। বহোত আদমী মর গিয়া, ঘর জ্বল গিয়া—'

রফিক উত্তর দেওয়ার আগে আচমকা কয়েকজন সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মর গিয়া নেহী, জানসে মার দিয়া। আট দশগো গাঁও জ্বলা কর মিট্টিমে বরাবর কর দিয়া। হামলোগনকা গাঁও, হামলোগনকা আদমী—'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় রফিক আর গণুয়া। কখন যে রফিকের পেছনে ক্যাম্পের ক'টা লোক এসে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ করেনি তারা। লোকগুলোকে ভয়ানক হিংস্র দেখাচ্ছে। তাদের চোখমুখ তীব্র ঘৃণায়, বিদ্বেষে আর রাগে গনগন করছে।

লোকগুলো এবার রফিকের দিকে তাকিয়ে হাত-পা ঝাঁকিয়ে হুমকে ওঠে, 'ওহী আদমীটার সঙ্গে কী বকর বকর করছিস! বন্ধ কর বকোয়াস। উঠে আয়—'

রফিক তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করে, 'আরে ভেইয়া, এর কী কসুর? গরিব দুখি আদমী, অনেক দূরের গাঁও থেকে ষাট-পঁয়ষট 'মিল' হাঁটতে হাঁটতে আসছে। বহোত রোজ—'

রফিককে থামিয়ে দিয়ে একটা কম বয়সের যুবক চিৎকার করে ওঠে, 'ওর কসুর নেই। লেকেন

ওর জাতভাইরা তো আমাদের গাঁ জ্বালিয়েছে, মানুষ মেরেছে।'

'কারা কসুর করল আর কার ওপর তোমরা গুস্‌সা করছ! এ ঠিক নেহী।'

যুবকটি তার গলা আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে দেয়, 'চুপ হো যা শালে।'

চেঁচামেচি হইচই যখন চলছে, সেই সময় রিলিফ ক্যাম্পের ভেতর থেকে আরো অনেকে দৌড়ে চলে আসে। একটি বৃদ্ধ মানুষ, তাব চুলদাড়ি ধবধবে, পিঠ বয়সের ভারে খানিকটা বেঁকে গেছে, উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে, আঁ?'

সেই যুবকটি উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগে রফিক উঠে এসে বয়স্ক লোকটির সামনে দাঁড়ায়। বলে, 'আনোয়ার চাচা, আগে আমার কথাটা শুনুন।'

বোঝা যায়, বৃদ্ধটি ত্রাণ শিবিরের লোকজনের মুরুব্বি। সবাই তাকে মেনে চলে। সে বলে, 'ঠিক আছে, বল—'

যুবকটি উদ্ধতভাবে এগিয়ে এসে হাওয়ায় হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলে, 'না, আমি আগে বলি—'

বৃদ্ধটি ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। একবার রফিক, একবার যুবকটির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে রফিককে বলে, 'তুই বল বেটা—'

সমস্ত ঘটনাটি আগাগোড়া উত্তেজনাশূন্য, শান্ত ভঙ্গিতে বলে যায় রফিক।

সব শুনে বৃদ্ধ বলে, 'ঠিক বাত।' গণুয়াদের দেখিয়ে সেই যুবকের উদ্দেশে বলে, 'ওদের কোনো দোষ নেই। এক আদমী কসুর করেছে বলে আরেক আদমীর গলা কেটে ফেলতে হবে—এ কী রকম কথা! যা তোরা এখান থেকে। ঝামেলা উমেলা মাত্ কর।'

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর একটি বিশেষ পর্দার ওপর ওঠে না। বলার ধরনে উগ্রতা বা অসহিষ্ণুতা নেই। তবু তারই মধ্যে এমন এক কর্তৃত্ব আর দৃঢ়তা রয়েছে যা অমান্য করার সাহস বা ক্ষমতা এই 'মাধোপুরা রিলিফ ক্যাম্প'-এর একজন বাসিন্দারও নেই। যুবক এবং অন্য যারা মারমুখী হয়ে তেড়ে এসেছিল তারা অবোধ্য চাপা গলায় গজ গজ করতে করতে দূরে চলে যায়।

ওধারে চেঁচামেচি শুনে চারপায়ায় শুয়ে যে আর্মড গার্ডরা দ্বিতীয় দফা দিবানিদ্রা দিচ্ছিল, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে। গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'কা হুয়া রে, এত চিল্লাচেল্লি কেন—আঁ? নিদটা দিলে চৌপট করে!'

বৃদ্ধ হাত তুলে আর্মড গার্ডদের আশ্বস্ত করে, 'কিছু হয়নি সিপাহীজিরা। আপনারা ঘুমোন।'

'বহোৎ আচ্ছা। চাচাজি, আপনি দেখবেন কোনোরকম ঝঞ্ঝাট উঞ্ঝাট যেন না হয়।'

'দেখব।' বৃদ্ধের দাড়িগোঁফের জঙ্গলের ভেতর মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

আর্মড গার্ডরা জানে, বৃদ্ধটি খুবই শ্রদ্ধেয় এবং প্রভাবশালী। তার ওপর রিলিফ ক্যাম্পের সাময়িক দায়িত্ব চাপিয়ে তারা ফের চারপায়ায় শরীর এলিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সাধা ঘুমটি চোখের পাতায় নেমে আসে।

বৃদ্ধ এবার গণুয়াদের দিকে এগিয়ে এসে সেই উত্তেজিত যুবকদের দুর্ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট আক্ষেপ করে বলে, 'মনে দুখ আর রাগ পুযে রেখ না বেটা। দাঙ্গায় মানুষ মরেছে, গাঁও জ্বলছে, সব ফেলে তাম্বুতে এসে সিপাহীদের পাহাবায় থাকতে হচ্ছে। তাই কারুর মাথার ঠিক নেই।'

বৃদ্ধ একেবারে বাপ-চাচার মতো। তার সহৃদয় সস্নেহ ব্যবহারে দিশেহারা হয়ে পড়ে গণুয়া। বলে, 'নেহী নেহী, আমরা বহোৎ ছোটামোটা আদমী। রাগ দুখ, কিছুই পুযে রাখব না।' সে আরো জানায়, রোদের তেজ পড়লে তারা চলে যাবে। তখন এখানকার কথা মনেও থাকবে না।

'ঠিক হ্যায়। তোমরা আরাম কর। আমি চলি।' বলে আস্তে আস্তে ক্যাম্পের ভেতর দিকে চলে যায় বৃদ্ধ।

এইমাত্র যা ঘটে গেল তাতে আবহাওয়াটা ভারি হয়ে উঠেছে। যদিও বৃদ্ধের জন্য উত্তেজনা আর নেই, তবু কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে যায়।

বৃদ্ধ চলে যাওয়ার পর ফের রফিক তারকাঁটার ওধারে তার সেই জায়গাটিতে বসে পড়েছে। ফরিদা তার বাচ্চাটাকে নিয়ে আগের মতোই বসে আছে।

খানিকক্ষণ অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়ে একসময় দ্বিধান্বিতভাবে রফিক ডাকে, 'এ ভেইয়া—'

গণুয়া বুঝিবা এই ডাকটার জন্যই কান খাড়া করে ছিল। দ্রুত মুখ তুলে বলে, 'হাঁ, বোলো—'

'দেখ তো কী হুজ্জুৎ হয়ে গেল! সচমুচ তুমি গুস্‌সা করনি তো?'

'আরে নেহী নেহী, বুড়া চাচাকে তো বললাম।' বলে কিছুক্ষণ কী ভাবে গণুয়া। তারপর বলে, 'এক বাত পুছেগা ভেইয়া?'

রফিক বলে, 'হাঁ, পুছো না—'

'এখানে দাঙ্গা বাধাল কারা?'

ভীষণ হকচকিয়ে যায় রফিক। তারপর হাত দুটো উলটে দিয়ে বিমর্ষ মুখে বলে, 'কৌন জানে! ছোড়ো ও বাত। যো হুয়া সো হুয়া। ওসব ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে গণুয়া। সে কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই হঠাৎ লছিমার কোলে তাদের সেই বাচ্চাটা আবার গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়ে দেয়। এতক্ষণ ঝিমিয়ে ছিল সে। নতুন করে কাঁদার মতো খানিকটা শক্তি হয়ত এর ভেতর যোগাড় করে ফেলেছে।

বিরক্ত চোখে নিজের রোগা কঙ্কালসার আওরতটির দিকে তাকিয়ে গণুয়া চেঁচায়, 'ভূচ্চরের ছৌয়া ফের চিল্লাচিল্লি শুরু করলে! থামা এটাকে, থামা—' বলে রফিকের দিকে তাকায়, 'কে কে আছে তোমার?'

ফরিদা এবং তাদের ছেলেকে দেখিয়ে রফিক বলে, 'ওহী বিবি আউর লেড়কা।'

'একগোই লেড়কা তুমহারা?'

'হাঁ।'

এদিকে লছিমা বাচ্চাটাকে নিয়ে একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছিল। গায়ে কিছু নেই তার, শুধু সরু পলকা হাড়ের ওপর পাতলা ময়লা চামড়া জড়ানো। ওই শরীরেই যেন তেজী ঘোড়ার শক্তি নেমে আসে। লছিমাকে লাথি মেরে, খিমচে বিধ্বস্ত করতে থাকে। সেই সঙ্গে ধারাল সরু গলায় চিলের মতো একটানা চিৎকার।

ফের হিংস্র ভঙ্গিতে লছিমার দিকে ঘুরে বসে গণুয়া। বলে, 'দে, আমার হাতে দে জানবরের বাচ্চাটাকে। গলা টিপে বিলকুল খতম করে দিই।'

বাচ্চাটাকে তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য গণুয়া উঠতে যাচ্ছিল, রফিক উদ্বিগ্ন মুখে বলে ওঠে, 'আরে ভেইয়া, বৈঠ বৈঠ। কী হয়েছে তোমার বাচ্চাটার, এত গুস্‌সা করছ কেন?'

হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ভেঙে পড়ে গণুয়া। ভারি গলায় বলে, 'ভুখ ভেইয়া, ভুখ। ক'রোজ আটা গুলে খাইয়ে রেখেছিলাম। এখন আর তা-ও নেই। আর ওর মায়ের চেহারার হাল তো দেখছ। বুকে এক বুঁদ দুধ নেহী। কা করে? আমার বাচ্চাটা না খেয়েই মরে যাবে।' বলে অসহায়ভাবে কাঁদতে থাকে।

ফরিদা এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। চুপচাপ সব দেখে যাচ্ছিল। এবার রফিকের কাছে এগিয়ে এসে নিচু গলায় তাকে কিছু বলে।

অবাক বিস্ময়ে স্ত্রীর দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে রফিক। তার চোখমুখ আলো হয়ে ওঠে। তারপর দ্রুত তারকাঁটার বেড়ার কাছে গিয়ে সে বলে, 'ভেইয়া, তোমার লেড়কাকে একবার দাও তো।'

ব্যাপারটা এমনই অভাবনীয় এবং আকস্মিক যে অনেকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকে গণুয়া।

রফিক তাড়া লাগায়, 'কী হল, দাও। ঘাবড়াও মাত্‌, তোমার লেড়কাকে আমরা ছিনিয়ে নেব না। দাও, দাও। বহোত্‌ রোতা হ্যায় লেড়কা। এমন কাঁদলে সিনা ফেটে যাবে।'

অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে গণুয়া লছিমার কাছ থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে তারকাঁটার বেড়ার ওপর দিয়ে রফিককে দেয়। আর ফরিদা নিজের ছেলেকে রফিকের কাছে রেখে গণুয়ার ছেলেকে নিয়ে দূরে ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর যখন ফিরিয়ে আনে, বাচ্চাটার কান্নাকাটি আর নেই। এখন তার পেটটি ভরা, হাত-পা নেড়ে নেড়ে সে খেলছে।

আগের মতোই হস্তান্তরিত হতে হতে বাচ্চাটা ফের লছিমার কাছে ফিরে যায়।

কৃতজ্ঞ গণুয়া আর লছিমা হাতজোড় করে ভারি গলায় বলে, 'বহেনজি, তুমি আমাদের লেড়কার

জান বাঁচালে। তোমাদের ভালাই হবে, বহোৎ ভালাই।'

ফরিদা উত্তর দেয় না। তবে রফিক বলে, 'ও কিছু না। বাচ্চাটা চোখের সামনে মরে যাবে, তাই কখনও হয়! কভী নেহী।'

বিকেলে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশের গা বেয়ে খানিকটা নেমে গেছে, সেই সময় গণুযারা পোঁটলা-পুঁটলি গুছিয়ে উঠে পড়ে। তারকাঁটাব বেড়ার কাছে গিয়ে রফিকদের উদ্দেশে বলে, 'ভেইয়া, বহেনজি, যেত্তে রোজ বেঁচে আছি তোমাদের কথা মনে থাকবে। তোমাদের কিরপা (কৃপা) ভুলব না।'

গণুয়ারা একটু পরে হাইওয়েতে গিয়ে ওঠে। হাঁটতে হাঁটতে পেছন ফিরে বার বার তাকায়। রফিক আর ফরিদা রিলিফ ক্যাম্পের তারকাঁটার বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে পলকহীন তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

শহিদের স্ত্রী

দু সপ্তাহ আগে কাশ্মীরের সেনাশিবির থেকে রাজেশের শেষ চিঠি এসেছিল। সে লিখেছে, তিন-চার দিনের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবে। রাজেশ সেনাবাহিনীর একজন ল্যান্স নায়েক। আট বছর আগে সে ভারতীয় ফৌজে নাম লিখিয়েছিল। এখন তার বয়স একত্রিশ। মধ্যপ্রদেশের এক সেন্টারে বছরখানেক হাড়ভাঙা কঠোর ট্রেনিংয়ের পর তাকে পাঠানো হয় আসামে। সেখান থেকে রাজস্থান গুজরাট হয়ে দেড় বছর হল কাশ্মীরে আসে।

ভারতবর্ষের যে প্রান্তেই থাক, ফি বছরই সতের জুলাইয়ের ঠিক আগে আগে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে নানকিপুরা টাউনে তাদের বাড়িতে চলে আসে রাজেশ। ছ'বছর আগে ওই তারিখে তার বিয়ে হয়েছিল। সতের জুলাই তার জীবনের একটা বিশেষ দিন। বাড়ি এসে ওই দিনটা বিমলার সঙ্গে কাটানো চাই-ই। বিয়ের পর থেকে এভাবেই চলে আসছে।

নানকিপুরা বিহারের অতি তুচ্ছ একটা শহর। দেশের মানচিত্রে কোথাও তার হদিস পাওয়া যাবে না। সেখানে আছে রাজেশের বুড়ো বাবা-মা—রামধারী এবং লছমী যাদব। আর আছে তার তিন বছরের ছেলে বাবুয়া এবং স্ত্রী বিমলা।

জুলাই মাস পড়লেই সারা বাড়ি জুড়ে তুমুল ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। রাজেশ আসবে তাই ঘরদুয়ার, সামনের চবুতর, সব ধুয়ে মুছে তকতকে করে তোলে বিমলা। যত ময়লা কাপড়চোপড়, বালিশের ওয়াড়, চাদর, জানালার পর্দা কেচে ইস্তিরি করে রাখে। ফৌজে ঢোকার পর নোংরা ময়লা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না রাজেশ। সে চায়, সেনা শিবিরের মতো বাড়িতেও সমস্ত কিছু ফিটফাট থাকুক।

বিমলাদের একটা টিভি আছে। এক রূপসী মহিলা প্রতি সপ্তাহে তাতে নানারকম লোভনীয় খাবার তৈরির কৌশল দর্শকদের শিখিয়ে দেন। মাট্রিক পাস বিমলা সেগুলো একটা খাতায় টুকে নেয়। রাজেশ ছুটি নিয়ে নানকিপুরায় এলে তার ভেতর থেকে বাছা বাছা কয়েকটি পদ রান্না করে খাওয়ায়।

এবছরও বাড়িঘর সাজিয়ে গুছিয়ে বিমলারা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে। সময় যেন আর কাটতে চাইছে না।

সেই যে রাজেশ লিখেছিল, তিন চারদিনের মধ্যে আসছে, তারপর আরো ছ'সাতদিন কেটে গেল কিন্তু সে তো আসেইনি, তার কোনো খবরও নেই। কেন আসতে দেরি হচ্ছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। দু'দিন থানায় এবং একদিন এ অঞ্চলের জবরদস্ত পলিটিক্যাল লিডার রাজপুত ক্ষত্রিয় অযোধ্যানাথ সিংয়ের বাড়িতেও গিয়েছিল বিমলা। ওঁরা বলেছেন, ফৌজি দপ্তরে খোঁজ করে তাকে রাজেশ সম্পর্কে জানাবেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি।

রাজেশ কাশ্মীরে বদলি হয়ে যাওয়ার পর থেকেই বিমলারা সর্বক্ষণ প্রচণ্ড রকমের উৎকণ্ঠায় আছে। জায়গাটা যেন ভয়াবহ বারুদের স্তূপ। সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের সঙ্গে দিবারাত্রি বন্দুকের লড়াই

চলছেই। যখন তখন বিস্ফোরণ আর খুন। গত বছর রাজেশ যখন ছুটিতে বাড়ি এসেছিল, বিমলা বলেছে, সে ফৌজ ছেড়ে দিক। রাজেশ বলেছিল, মুখের কথা খসালেই সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। তা ছাড়া বেরুবেই বা কেন? লোকটা অসীম সাহসী। সে আরো বলেছে, ফৌজে হাজার হাজার যুবক আছে। বিমলার মতো ওদের স্ত্রী বা মায়েরা যদি তাদের বেরিয়ে আসতে বলে, দেশটাকে বাঁচাবে কারা?

বিমলার উদ্বেগ আরো বেড়ে গিয়েছিল মাসখানেক আগে, যখন সীমান্তের ওপার থেকে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীরা ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিতে শুরু করে। ওদের বেশির ভাগই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ফৌজি। কোনো পক্ষই যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, তবে ওখানে যা চলছে সেটা যুদ্ধই।

প্রতিদিনই যতবার টিভিতে খবর পড়া হয়, শ্বাসরুদ্ধের মতো বিমলারা সেটার সামনে বসে থাকে। সংবাদপাঠক লড়াইয়ের বিবরণ দিয়ে কত জন হানাদার খতম করা হয়েছে, কতখানি হারানো জমি আমরা পুনরুদ্ধার করেছি, এই সব জানাবার পর ভারি বিমর্ষ সুরে কোনোদিন বলেন, 'আজকের যুদ্ধে পাঁচজন ভারতীয় জওয়ান প্রাণ দিয়েছেন, সাতজন আহত হয়েছেন।' কোনোদিন মৃত্যুর সংখ্যা একটু কমে, কোনোদিন বা বাড়ে। সংবাদপাঠক হতাহতের নাম জানিয়ে তাঁদের ছবি দেখিয়ে আরো বলেন, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী নিহত সেনাদের জন্য গভীরভাবে শোকাহত, তাঁরা এই শহিদদের পরিবারগুলিকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছেন।

রোজ মৃত জওয়ানদের তালিকাটা পড়া হয়ে গেলে, বুকের ভেতর থেকে আবদ্ধ বাতাস ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে বিমলার। না, রাজেশের নাম তালিকায় নেই।

এইভাবে খবর শুনে শুনে সময় কেটে যাচ্ছিল। তার মধ্যে রাজেশের চিঠিটা এল। কী খুশি যে হয়েছিল বিমলা! কিন্তু তারপরেও তো কতগুলো দিন কেটে গেল! ভীত, আতঙ্কগ্রস্ত, দিশেহারা বিমলা কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না।

অন্য দিনের মতো আজও সন্ধেবেলায় খবর শুনতে বসেছিল বিমলা, রামধারী আর লছমি। তিন বছরের বাবুয়া ঘরময় ঘুরে একটা খেলনা মোটর অক্লান্তভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

খবরের সময় হলে অদম্য আকর্ষণে বিমলারা টিভিটার সামনে যে চলে আসে তার কারণ একটাই। এই চতুষ্কোণ যাদু-বাক্সটা ছাড়া কাশ্মীর সম্পর্কে কিছু জানার উপায় নেই।

নির্দিষ্ট সময়ে খবর শুর হল। প্রথমেই লড়াইয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে সুদর্শনা সংবাদপাঠিকা জানালেন, 'আজকের যুদ্ধে যে তিন বীর জওয়ান দেশ রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা হলেন গোর্খা রাইফেলসের রাইফেলম্যান গণেশ প্রধান, কুমায়ুন রেজিমেন্টের সিপাহী কেবলরাম ত্রিবেদী এবং ইনফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়নের ল্যান্স নায়েক রাজেশ যাদব। রাষ্ট্রপতি—'

বাকিটা আর শোনা হল না। রাজেশের মা, রুগ্‌ণ চেহারার লছমি বুকফাটা চিৎকার করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। তার চোখ থেকে পুরু লেন্সের চশমাটা দূরে ছিটকে গেল। রামধারী দু' হাতে উন্মাদের মতো বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ডুকরে ওঠে, 'ইয়ে কিয়া শুনায়া! ও মেরা বেটা রে--'

দাদা আর দাদীকে হঠাৎ ওভাবে কেঁদে উঠতে দেখে বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল বাবুয়া। গাড়ি চালানো বন্ধ রেখে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

রাজেশের খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড ফেটে যেন চৌচির হয়ে গেল বিমলার। মনে হল সমস্ত শরীর, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, দ্রুত অসাড় হয়ে যাচ্ছে। একটা প্রবল কান্না বুকের ভেতরটা ভেঙে চুরমার করে গলার আছে এসে ডেলা পাকিয়ে গেল, কিছুতেই সেটা বার করে আনতে পারছে না সে।

সংবাদপাঠিকা একটানা খবর পড়ে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে টুকরো টুকরো ক্লিপিং দেখানো হচ্ছে। মহিলা কী যে পড়ছেন, টিভির পর্দায় কিসের ছবি ফুটে উঠছে কিছুই বিমলা দেখতে বা শুনতে পাচ্ছিল না। মহিলাটির কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট গুঞ্জনের মতো কানে আসছে। সে টের পায়, গল গল করে ঘাম বেরিয়ে তার জামাকাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছে। টিভির শব্দ এবং চারপাশের দৃশ্যাবলী ক্রমশ ঝাপসা হতে হতে একসময় বিলীন হয়ে যায়। বিমলার ঘাড় ভেঙে মাথাটা একপাশে ঝুলে পড়ে।

কতক্ষণ বেঁহুশ হয়ে ছিল, বিমলা জানে না। যখন জ্ঞান ফেরে দেখতে পেল খাটে শুয়ে আছে সে।

তার মাথা মুখ এবং বালিশ জলে ভেজা।

এখন বাড়িভর্তি প্রচুর লোকজন। তারাই তার মাথায় জল ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়েছে।

লছমি অঝোরে কেঁদে চলেছে। রামধারী যাদব আগের মতোই বুক চাপড়াতে চাপড়াতে একটানা আর্ত চিৎকার করে যাচ্ছে।

বিমলাদের টোলার কয়েকজন বয়স্ক মহিলা লছমিকে জড়িয়ে ধরে ভারি, বিষণ্ণ গলায় বলছে, 'রো মাত্‌ রাজুয়াকা মাঈ--রো মাত্‌---'

ক'জন আধাবয়সী পুরুষ রামধারীকে ঘিরে ধরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে। পাশের বাড়ির হরসুখের বিধবা বোন রাধিয়া বাবুয়াকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেছে সেটা বুঝতে না পারলেও দাদা-দাদীকে কাঁদতে দেখে বাবুয়াও এখন কাঁদছে।

বিমলাকে চোখ মেলতে দেখে নানা বয়সের ক'টি মেয়ে বৌ তার পাশে গিয়ে বসল।

সারা বাড়ির পরিবেশ শোকাচ্ছন্ন, নিজের জীবনের চূড়ান্ত ক্ষতিটা হয়ে গেছে, তবু কাঁদতে পারছে না বিমলা। জ্ঞান ফেরার পরও বিহ্বলের মতো সে এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ভিড়ের ভেতর কারা যেন চাপা গলায় ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'বিলকুল পত্থর বন গয়ী।'

পড়শী এক বুড়ি, যাকে সবাই নাথুনির মা বলে ডাকে--কী ভেবে বাবুয়াকে রাধিয়ার কোল থেকে নিয়ে বিমলার কাছে বসিয়ে দেয়। ছেলেটা কাঁদছিলই, মায়ের ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিমলার মধ্যে কী একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। দ্রুত উঠে বসে বাবুয়াকে বুকের ভেতর আঁকড়ে ধরে উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে ওঠে, 'হো ভগোয়ান, এ কী হল আমার!' এতক্ষণে অবরুদ্ধ কান্নাটা হৃৎপিণ্ডের ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে আসতে পারল।

নাথুনির মা হয়ত এটাই চাইছিল। বিমলা কাঁদুক--কেঁদে কেঁদে একটু হালকা হোক।

অনেকক্ষণ কান্নার পর রামধারী, লছমী এবং বিমলার ফুসফুসের দম যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় চারপাশের লোকজনের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। পরক্ষণে ভিড় ঠেলে থানার একজন অফিসার ঘরে এসে ঢুকলেন। এখানকার শোকাবহ পরিবেশ তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল যেন।

অফিসারটির নাম মহেশ্বর সহায়। খানিকক্ষণ বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। তারপর ভিড়টার দিকে ফিরে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এ বাড়িতে ল্যান্স নায়কে রাজেশ যাদবের কে কে আছে?'

পড়শীদের একজন রামধারীদেব দেখিয়ে বলল, 'ওর বাবুজি, মা, স্ত্রী আর বেটা--' বিমলাদের নামগুলোও লোকটা জানিয়ে দেয়।

শোকাতুর মানুষগুলোকে দেখে সেরকমই আন্দাজ করেছিলেন মহেশ্বর। ওরা যে রাজেশের মৃত্যু সংবাদ জেনে গেছে সেটাও বোঝা যাচ্ছিল। একে একে রামধারী, লছমি এবং বিমলার কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'আপনাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। ভগোয়ান বিষুণজি দুঃখ কাটিয়ে ওঠার মতো মনের জোর আপনাদের দিন।'

রামধারীরা কেউ কিছু বলে না। শুধু অবিরল তাদের গাল বেয়ে চোখের জল ঝরতে থাকে।

মহেশ্বর এবার জানান, পরশু ভোরে রাজেশের মৃতদেহ প্লেনে কাশ্মীর থেকে পাটনায় নিয়ে আসা হবে, সেখান থেকে ভারতীয় ফৌজের গাড়িতে 'অন্তিম সংস্কার'-এর জন্য আনা হবে নানকিপুরায় তাদের বাড়িতে। মৃতদেহের সঙ্গে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আসবেন বড় বড় ফৌজি অফিসার এবং জওয়ানেরা। তা ছাড়া স্থানীয় পুলিশের বিশাল একটা বাহিনী তো থাকবেই। জেলার সদর থেকে আসবেন ডি. এম, এ. ডি. এম অর্থাৎ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা।

খবরটা দিয়ে মহেশ্বর চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদে পর পর এলেন এ অঞ্চলের বিখ্যাত জননেতা রাজপুত অযোধ্যানাথ সিং এবং তাঁর বিরোধী দুই পলিটিক্যাল পার্টির লিডার কমলাপতি দুবে আর রাজদেও সিং।

প্রথমে এসেছিলেন অযোধ্যানাথ। মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে লোকটার বিশাল চেহারা দেখার মতো। একসময় কুস্তিগীর ছিলেন। একজোড়া কাঁচাপাকা জমকাল গোঁফ তাঁর প্রকাণ্ড চৌকো মুখটাকে ভীতিকর করে তুলেছে। ভারাক্রান্ত সুরে তিনি রামধারীদের, বিশেষ করে বিমলাকে একটানা বহুক্ষণ

সান্ত্বনা এবং অপার সহানুভূতির কথা শুনিয়ে বললেন, 'বেটি, এই দুঃখের দিনে আমি আর আমার পার্টি সবসময় তোমাদের পাশে থাকব।' তিনি আরো জানালেন, 'পরশু রাজেশ বেটার অন্তিম সংস্কারের সময় মন্ত্রী ত্রিলোকশরণজি খোদ উপস্থিত থাকবেন।' ত্রিলোকশরণ অযোধ্যানাথদের রাজনৈতিক দলের একজন বরিষ্ঠ নেতা এবং মন্ত্রী।

সামান্য এক ল্যান্স নায়েকের মৃত্যুকে মহিমান্বিত করে তোলার জন্য ত্রিলোকশরণের মতো বিপুল ক্ষমতার অধিকারী একজন মন্ত্রী ধুলোয়-ভরা, দুর্গন্ধওলা, অতি তুচ্ছ এই নানকিপুরা শহরে ছুটে আসবেন, এমন একটা চমকপ্রদ খবরও বিমলাকে নাড়া দিতে পারে না। আসলে তার স্নায়ুমণ্ডলী কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে। বিমূঢ়ের মতো বিমলা বসে থাকে।

অযোধ্যানাথ চলে যাওয়ার পর এলেন কমলাপতি দুবে। ষাটের কাছাকাছি বয়স। প্রচুর পরিমাণে ঘি-মাখন খাওয়া, মাঝারি হাইটের গোলগাল চেহারা। গায়ের চামড়া থেকে এই বয়সেও জেল্লা ঠিকরে বেরুচ্ছে, মাথায় কদমছাঁট চুল কিন্তু মোটা জাঁকাল একটা টিকি রয়েছে, যার ডগায় একটি পরিপাটি গিঁট। চোখে গোল চশমা।

অযোধ্যানাথের মতোই রামধারী এবং লছমিকে প্রথমে সমবেদনা জানিয়ে বিমলার দুটো হাত ধরে কমলাপতি বললেন, 'বেটি, তোমার কষ্টে আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তুমি যা হারিয়েছ তা কোনোদিনই ফিরে পাবে না। লেকিন এত ভেঙে পড়লে চলবে না। মনে সাহস আনো। সামনে তোমার বিরাট দায়িত্ব। ছোট একটা বেটা আছে। তাকে মানুষ করতে হবে। বুড়া শ্বশুর আর সাস আছে, তাদের দেখভাল করতে হবে। মনে রাখবে, তুমি একলা নও। তোমার কষ্টের হিস্যাদার আমি আর আমার পার্টি। বেটি চিন্তা করো না। তুমি আমাদের বাড়ি চেনো। যখন যা দরকার হবে খবর দিও। আমি চলে আসব। মনে রেখ, আমি তোমার পিতা-সমান।'

লোকটার গলার স্বর মিহি, মেয়েলি ধরনের। কথা বলতে বলতে চোখের জল ঝরতে লাগল তাঁর। নানকিপুরা টাউন এবং আশেপাশের বিশ তিরিশটা গাঁয়ের মানুষজন জানে রাজনৈতিক বক্তৃতার সময় মঞ্চে উঠে মুহূর্তে চোখের জল টেনে বার করতে পারেন কমলাপতি। অলৌকিক অভিনয়ের ক্ষমতা তাঁর। নৌটঙ্কীর দলে নাম লেখালে অনেক নাম-করা অভিনেতার নাক তিনি কেটে দিতে পারতেন।

এত চোখের জল ফেলেও বিমলার সাড়া পাওয়া গেল না। স্বামীর মৃত্যুশোক কি এত সহজে কাটিয়ে ওঠা যায়?

কমলাপতির পর এলেন আরেকটি রাজনৈতিক দলের নেতা রাসবিহারী দাস। তিনি লালদাসিয়া কায়াথ। বয়স চল্লিশের নিচে। মেদহীন, ধারাল চেহারা। গালে তিন-চার দিনেব না কামানো দাড়ি। পরনে আধময়লা পাজামা, পায়ে মোটা চামড়ার চপ্পল।

রাসবিহারীদের পার্টি এ অঞ্চলে নতুন। সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও সেভাবে সাড়া জাগাতে না পারলেও সবাই মনে করে ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত সৎ এবং তেজী। অন্যায়ের সঙ্গে কখনও আপস করেন না। মানুষের বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সারাক্ষণ উন্মুখ হয়ে থাকেন। লোকের ধারণা, রাসবিহারীর জন্য তাঁদের পার্টির প্রভাব এ অঞ্চলে দু' চার বছরের ভেতরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

অযোধ্যানাথ এবং কমলাপতি যা করেছেন, রাসবিহারীও তাই করলেন। রামধারী আর লছমিকে সহানুভূতি জানিয়ে বিমলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'বহেনজি, আমি রোজ এসে আপনাদের খোঁজ নিয়ে যাব। আমাকে আপনার বড় ভাই মনে করবেন।' তাঁর কণ্ঠস্বরে গভীর আন্তরিকতা এবং অপার সমবেদনা।

রাজনৈতিক নেতারা চলে গেলেও প্রতিবেশীদের বেশির ভাগই রাতটা বিমলাদের ঘিরে বসে কাটিয়ে দিল। এই দুঃসময়ে তিনটি শোকাভিভূত মানুষকে ফেলে কি যাওয়া যায়?

মাঝখানের একটা দিন অদ্ভুত আচ্ছন্নতার মধ্যে পেরিয়ে গেল। টিভিতে রাজেশের মৃত্যুর খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন সমানে বুক চাপড়ে কেঁদেছিল রামধারী, মাটিতে আছড়ে পড়ে লছমিও আছাড়ি পিছাড়ি খেতে খেতে কেঁদেছে। কাল রামধারী সর্বক্ষণ ঘরের কোণে দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে স্তব্ধ হয়ে বসে থেকেছে। লছমি মাঝে মাঝে ডুকরে উঠেছে। আর বিমলার চোখ বেয়ে অবিরত

জল ঝরেছে।

রামধারীরা কিছুই খাবে না, পড়শীরা ভাত ফুটিয়ে জোর করে ওদের সামান্য দু-চার দানা খাইয়েছে।

বিমলার সিঁথিতে এখনও সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে। পুরোহিত জানিয়েছে, রাজেশের নশ্বর দেহ চিতাভস্মে বিলীন হয়ে যাওয়ার পর মর্মান্তিক ব্যাপারটা অর্থাৎ সিঁদুর মোছা এবং হাতের চুড়ি ভাঙার কাজটা করতে হবে।

সেদিন নানকিপুরা থানার অফিসার মহেশ্বরজি যা বলে গিয়েছিলেন তাই হল। সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে খানিকটা হেলেছে সেই সময় গোটা শহরটাকে তোলপাড় করে রাজেশের মৃতদেহ এসে গেল।

প্রথমে আটজন শববাহক জওয়ানের কাঁধে একটা ঢাকনি-খোলা কফিনে রয়েছে রাজেশের নিষ্প্রাণ শরীর। শবাধারটা ফুলে ফুলে ঢাকা, শুধু তার মুখটাই দেখা যাচ্ছে।

এদের ঠিক পেছনে সেনাবাহিনীর ব্যান্ড। বাজনদারেরা নানকিপুরার বাতাসে বিষাদের সুর ছড়িয়ে ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে। তারপর তিরিশ জন জওয়ানের সুশৃঙ্খল দুটো লাইন, নিঃশব্দে একতালে তারা পা ফেলছে। তাদের হাতে রাইফেল। জওয়ানদের পর একদল পুলিশ। তাদের পেছনে নানা ধরনের গাড়ির বিরাট কনভয়--মিলিটারি ট্রাক, পুলিশের জিপ ছাড়াও একটা সাদা, ধবধবে দামি গাড়িতে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিলোলোকশরণজি, তাঁর পাশে অযোধ্যানাথ। অযোধ্যানাথ কথা রেখেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিলোকশরণকে নানকিপুরায় এনে ছেড়েছেন। তাঁর বিরোধী দলের কমলাপতি দুবেও কম যান না। তাঁদের দলের প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় সরকারে নেই কিন্তু রাজ্য সরকারে আছে। তিনি পাটনা থেকে তাঁদের মন্ত্রী বাঁকেলাল পাসোয়ানকে ফোন করে আনিয়েছেন। একটা মেরুন রঙের ঝকঝকে অ্যাম্বাসাডরের ব্যাক-সিটে তাঁরা বসে আছেন।

তবে এখানকার তিন নম্বর রাজনৈতিক দলের রাসবিহারী দাস অযোধ্যানাথ বা কমলাপতির তুলনায় আজ কিছুটা ম্রিয়মাণ। কেননা কেন্দ্রে বা রাজ্যে তাঁদের কোনো মন্ত্রী নেই। পার্টিও ছোট। কিন্তু এমন শোকাবহ ঘটনায় অন্য রাজনৈতিক দলগুলো নানকিপুরার রাস্তা গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ করে সাড়ম্বরে হাজির হবে আর তাঁরা পিছিয়ে থাকবেন, তা তো হতে পারে না। তাই একটা রংচটা, পুরনো গাড়ি ভাড়া করে রাসবিহারী কয়েকজন দলীয় কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। এছাড়া আছেন ডি. এম, এ. ডি. এম, এস. পি এবং অন্য বড় বড় অফিসারেরা।

নানকিপুরা টাউনের ইতিহাসে কেন্দ্র এবং রাজ্যের দু দু'জন মন্ত্রী, এত সব ওজনদার রাজনৈতিক নেতা, এত জওয়ান, আর্মির বিরাট অফিসার, পুলিশ বাহিনী, প্রশাসনের জবরদস্ত কর্তারা একসঙ্গে এখানে আসবেন, কে ভাবতে পেরেছিল! নানকিপুরার ঢিলেঢালা, ঢিমে তালের জীবনযাত্রায় এমন ঘটনা আগে আর কখনও ঘটেনি। গোটা শহর তো বটেই, চারপাশের বিশ পঁচিশটা গাঁয়ের তাবৎ মানুষ একেবারে ভেঙে পড়েছে। মন্ত্রীদের গাড়ি, শ্রেণীবদ্ধ জওয়ান এবং পুলিশবাহিনী ইত্যাদি থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তারা সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

একসময় শবাধারে শায়িত রাজেশ শেষ বারের মতো তাদের বাড়িতে পৌঁছে গেল।

রামধারী, লছমি এবং বিমলা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল। পড়শীরা তাদের ঘিরে রেখেছে।

শবাধার বাড়ির চত্বরে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে লছমি রাজেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন উন্মত্তের মতো কেঁদে উঠল যেন তার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে বেরিয়ে আসবে। টিভিতে ছেলের মৃত্যু-সংবাদ শোনার পর যা করেছিল হুবহু সেইভাবেই বুক চাপড়াতে লাগল। আর বিমলা মুখে আঁচল গুঁজে নিঃশব্দে কেঁদে চলল।

কর্নেল গ্রেওয়াল অন্তিম সংস্কারের জন্য মৃতদেহ নিয়ে এসেছিলেন। সাড়ে ছ ফিটের ওপর হাইট, বিশাল এই ফৌজি অফিসারের চোখ বিমলাদের দেখতে দেখতে ভিজে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। ওদের সঙ্গে রাজেশের সম্পর্কটা কী, প্রতিবেশীদের কাছে জেনে নিয়ে তিনজনকে সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'শান্ত হো যাইয়ে, শান্ত হো যাইয়ে--' আরো জানালেন, মৃত ল্যান্স নায়েকের যাবতীয় প্রাপ্য এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কর্নেল সমবেদনা জানিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ানোর পর এগিয়ে এলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিলোকশরণজি। সত্তরের ওপর বয়স, চুল ধবধবে। পরনে দুধ-সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। তিনি লছমির দু হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কাঁদবেন না বহেনজি, কাঁদবেন না।' রামধারীকেও একই কথা বলে বিমলার কাছে এলেন। তাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আর্দ্র গলায় জানালেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার রাজেশ আর তোমাদের ফ্যামিলি সম্পর্কে অনেক কিছু ভেবে রেখেছে। কয়েকদিন পর নানকিপুরায় এসে বেটি তোমাকে সব জানাব। তোমার অনেক দায়িত্ব। পুরা সমসার তোমাকে দেখতে হবে। ঈশ্বর তোমাদের শক্তি দিন।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পর স্টেট ক্যাবিনেটের সদস্য বাঁকেলাল পাসোয়ানও বিমলাকে জানিয়ে দিলেন, রাজ্য সরকারও তাদের জন্য অনেক কিছু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে তিনি এসে বলবেন।

রাসবিহারী দাস অবশ্য কোনো প্রতিশ্রুতি দিলেন না। প্রথম দিনের মতো শুধু বললেন, বিপদে-আপদে সবসময় তিনি বিমলাদের সঙ্গে থাকবেন।

ঘণ্টাখানেক পর আবার শবাধার জওয়ানদের কাঁধে উঠল। এবার গন্তব্য শ্মশান।

মৃত সন্তানকে কিছুতেই যেতে দেবে না লছমি। প্রতিবেশীরা অনেক কষ্টে তাকে ধরে রাখল। বাবুয়াকেও যেতে দেওয়া হল না। রাজেশের শেষযাত্রায় এ বাড়ি থেকে সঙ্গী হবে শুধু রামধারী আর বিমলা।

ত্রিলোকশরণজি এবং বাঁকেলালজি, দুই মন্ত্রীই বিমলা এবং রামধারীকে বললেন, 'আমাদের গাড়িতে উঠে শ্মশানে চলুন।'

রামধারী যেন শুনতেই পেল না। ছেলের মৃত্যুতে সে এতটাই বিমর্ষ যে কে কী বলল সেদিকে তার লক্ষ্য নেই। আচ্ছন্নের মতো শববাহক জওয়ানদের পিছু পিছু হেঁটে চলল।

সীমাহীন শোকের মধ্যেও বিমলার কিন্তু একটু চমক লাগল। রাজ্য এবং কেন্দ্রের দুই বিপুল ক্ষমতাশালী মন্ত্রী তার মতো এক সাধারণ ল্যান্স নায়েকের স্ত্রীকে গাড়িতে করে শ্মশানে নিয়ে যেতে চাইছেন, এর চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু এত বড় সৌভাগ্যও বিমলাকে নাড়া দিতে পারল না। স্বামীর অন্তিম যাত্রায় মন্ত্রীর গাড়ির পুরু গদিওলা আরামদায়ক সিটে বসে তার সঙ্গী হবে, তার কাছে এটা সম্পূর্ণ অভাবনীয়। তা ছাড়া, দুই মন্ত্রীই নিয়ে যেতে চাইছেন। একটা মানুষের পক্ষে দুটো গাড়িতে চড়ে যাওয়া যায় না।

বিমলার দু চোখ বেয়ে সমানে জল ঝরছিল। হাতজোড় করে সে বলল, 'ক্ষমা করবেন। আমি হেঁটেই যাব।'

এর মধ্যে মন্ত্রীরা জেনে নিয়েছেন, শ্মশান অন্তত দু মাইল দূরে। বললেন, 'এতটা রাস্তা হেঁটে যেতে কষ্ট হবে।'

বিমলা বলল, 'হোক।'

বাঁকেলালজি বললেন, 'গাড়িতে উঠতে বলে আমারই ভুল হয়েছিল। স্বামীর এই শেষ সময়ে পত্নী আরাম করে যাবে, তা হয় না। চল, আমিও তোমার সঙ্গে হেঁটে শ্মশানে যাব।' বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন।

এদিকে মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন ত্রিলোকশরণজি। তিন দফায় বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। যৌবনে সাধারণ পলিটিক্যাল ওয়ার্কার হিসেবে মোটা চামড়ার চপ্পল পায়ে দিয়ে উত্তর ভারতের গাঁয়ে গাঁয়ে উদয়াস্ত ঘুরে বেড়াতেন, কিষানদের নিয়ে সংগঠন করতেন। সে সব দিনের ইতিহাস স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেছে। নির্বাচনে জিতে প্রথম দু'বার এম. পি হয়ে দশ বছর কাটিয়েছেন, তারপর তিন বার হয়েছেন মন্ত্রী। এম. পি হওয়ার পর থেকেই হাঁটাহাঁটির অভ্যাসটা নষ্ট হয়ে গেছে। মন্ত্রী হওয়ার পর তো কথাই নেই। মাটির সঙ্গে তাঁর পায়ের যোগাযোগ আজকাল কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু বাঁকেলাল পাসোয়ান নামে রাজ্যের মন্ত্রীটি যদি বিমলা আর রামধারীর সঙ্গে হাঁটতে থাকেন আর তিনি গাড়িতে যান, সেটা ভীষণ খারাপ দেখাবে। এই অঞ্চলের মানুষজনের ওপর তার প্রতিক্রিয়াটা খুব

সুখকর হবে না। ল্যান্স নায়েক রাজেশ যাদবের কারগিল রণাঙ্গনে মৃত্যু এবং তার পরিবার, বিশেষ করে বিমলাকে দেখার পর থেকে তাঁর মাথায় সুদূরপ্রসারী একটা পরিকল্পনা এসে গেছে। কেননা কয়েক মাসের মধ্যে নতুন আরেকটা নির্বাচন আসছে। বিমলাকে সামনে রেখে তিনি এই এলাকায় কাজ গুছিয়ে নিতে চান। বাঁকেলাল খুব সম্ভব কোনো একটা অভিসন্ধি নিয়ে বিমলার সঙ্গে হাঁটতে চাইছেন কিন্তু সেটা তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। সুতরাং ত্রিলোকশরণকে গাড়ি থেকে নামতেই হল।

দুই মন্ত্রী নানকিপুরার ভাঙাচোরা রাস্তায় ছ ইঞ্চি ধুলোয় পা ডুবিয়ে হেঁটে হেঁটে রাজেশকে পৌঁছে দেবেন, আর অন্যেরা গাড়িতে চড়ে যাবে, তা কখনও হয়? অযোধ্যাপ্রসাদ, রাসবিহারী, কর্নেল গ্রেওয়াল থেকে শুরু করে ডি. এম, এ. ডি. এম--সবাই টপাটপ গাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নামেন। তাঁদের পেছন পেছন চলতে থাকে বিপুল জনতা। এমন অন্তিম যাত্রা নানকিপুরার মানুষ কেউ কখনও দেখেনি।

শ্মশানটা একটা মজা নদীর পাড়ে। সেটার একধারে বিশাল ঝুরিওলা বটগাছের তলায় ডোমের ঘর। আরেক পাশে খোলা আকাশের নিচে অনেকটা জায়গা জুড়ে মড়া পোড়ানোর নানা চিহ্ন ছড়িয়ে আছে—কাঠকয়লা, আধপোড়া কাঠের টুকরো, কিছু হাড়, ভাঙা মাটির কলসি। বটগাছের ডালে অগুনতি শকুন বসে আছে।

পুরনো চিতাগুলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে পরিষ্কার জায়গায় রাজেশের শবাধার নামানো হল। শ্মশানের ডোমকে আগেই খবর দেওয়া হয়েছিল। সে নতুন চিতা তৈরি করে সেখানে অপেক্ষা করছে। রাজেশের মুখাগ্নি এবং তার দেহ সৎকারের পর শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্মের জন্য তাদের টোলার প্রতিবেশীরা একজন পুরোহিতকে সঙ্গে করে এনেছিল।

প্রথমে জওয়ানরা, পরে পুলিশবাহিনী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে রাইফেল ছুঁড়ে রাজেশকে শেষ অভিনন্দন জানায়। তারপর পুরোহিত রামধারী এবং বিমলার কাছে এসে বলে, এবার মুখাগ্নি করতে হবে।

রামধারী দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে, 'হাম নেহী সাকেগা। আমি পারব না--পারব না।'

মুখাগ্নির প্রথম অধিকার পুত্রের কিন্তু তিন বছরের বাচ্চা বাবুয়াকে শ্মশানে আনা হয়নি। বিমলা নিজের মনকে শক্ত করে বলে, 'চলুন, আমিই করব।'

পুরোহিতের গম্ভীর মন্ত্রপাঠের মধ্যে মুখাগ্নি হল। তারপর চিতায় আগুন দেওয়া হয়।

ঘণ্টা তিনেক পর দাহ যখন শেষ হল বিকেল আর নেই। রাত নেমে গেছে।

রাজেশের দেহ চিতাভস্মে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর পুরোহিত নদী থেকে রামধারী আর বিমলাকে স্নান করিয়ে আনল।

শ্মশানে আর কোনো কাজ নেই। এবার বাড়ি ফেরার পালা। দুই মন্ত্রী এবং কর্নেল গ্রেওয়াল, কেউ রামধারী আর বিমলাকে দু'মাইল হেঁটে যেতে দিলেন না। মন্ত্রীদের ইচ্ছা ছিল তাঁরাই গাড়িতে করে পৌঁছে দেবেন কিন্তু কর্নেল গ্রেওয়াল বিনীতভাবে জানালেন, যেহেতু রাজেশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন, তাঁদেরই উচিত ফৌজের গাড়িতেই বিমলাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। মন্ত্রীরা আপত্তি করলেন না।

ক'টা দিন কেটে গেল।

এর মধ্যে সরকার রাজেশের যাবতীয় প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া বিমলাদের জন্য মোটা টাকা পেনসনের ব্যবস্থা করেছে।

এদিকে একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে একেবারে জবুথবু হয়ে গেছে রামধারী আর লছমি। দু'জনেরই যথেষ্ট বয়স হয়েছে। অনেকদিন ধরেই শরীর ভাল যাচ্ছিল না। ছেলের মৃত্যুশোক তাদের ভেঙেচুরে ফেলেছে যেন । রামধারী ঘর থেকে বেরোয় না, কারুর সঙ্গে সহজে কথা বলতে চায় না, শূন্য চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে। লছমি দিনরাত বিছানায় পড়ে আছে। মাঝে মাঝে গোঙানির মতো আওয়াজ করে কেঁদে ওঠে।

ফলে নিজের দিকে তাকানোর সময় নেই বিমলার। মৃত স্বামীর জন্য নির্জনে বসে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবে তেমন ফুরসতটুকুও সে পায় না। বাবুয়া, বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ি এবং সংসারের পেছনে

হরদম ছুটতে ছুটতে তার দিন কেটে যায়।
পাড়াপড়শীরা খুবই সহৃদয়। সারাক্ষণ তারা বিমলাদের আগলে আগলে রাখে। তা ছাড়া অযোধ্যানাথ, রাসবিহারী এবং বাঁকেলালের পার্টির স্থানীয় নেতা কমলাপতি রোজ একবার করে তাঁদের খোঁজখবর নিয়ে যান।
রাজেশের শ্রাদ্ধশান্তি মিটে যাওয়ার পর একদিন বিকেলে অযোধ্যানাথ এসে হাজির। বিমলাকে বললেন, 'বেটি তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে।'
বিমলা উৎসুক চোখে তাকায়, 'বলুন--'
অযোধ্যানাথ বলেন, 'আসছে এতোয়ারে নানকিপুরা কলেজের মাঠে আমাদের পার্টি একটা মিটিং ডেকেছে। ত্রিলোকশরণজি সভাপতি হবেন। স্রিফ তোমার জন্যে তিনি দিল্লি থেকে আসছেন। তোমাকে সভায় যেতে হবে। আমি এসে নিয়ে যাব।'
কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকে বিমলা। তার মতো সামান্য একটি মেয়ের জন্য ত্রিলোকশরণ হাজারটা জরুরি কাজ ফেলে ছুটে আসবেন, শুনে বিশ্বাস হতে চায় না। সে বলে, 'স্রিফ আমার জন্যে একদূব আসবেন কেন?'
একটু শুধরে নিয়ে অযোধ্যানাথ বলেন, 'তোমার—মতলব রাজেশের জন্যে।'
ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হয় ন। বিমলা তাকিয়েই থাকে।
অযোধ্যানাথ বলেন, 'বুঝতে পারলে না? রাজেশকে ত্রিলোকশরণজি সেদিন সম্মান জানাবেন। ধরমপত্নী হিসেবে তোমার তাই সভায় থাকাটা খুবই জুররি।'
'আপনি যখন বলছেন, থাকব।'
আজ হল সোমবার। শনিবার পর্যন্ত অযোধ্যানাথদের পার্টির ছেলেরা জিপে করে মুখে মাইক লাগিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তারস্বরে ঘোষণা করে যায়, 'শহিদ রাজেশ যাদব দেশের জন্যে জীবনদান করেছেন। তাঁর আত্মাকে সম্মান জানাতে রবিবার নানকিপুরা কলেজের মাঠে বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ত্রিলোকশরণজি স্বয়ং উপস্থিত থেকে এই সম্মান জানাবেন।'
মাইকের অবিরাম আওয়াজ বিমলার কানেও ভেসে আসে। ত্রিলোকশরণ এবং অযোধ্যানাথের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে যায়।
পড়শীদের মধ্যেও তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তেজিত মুখে তারা এসে বিমলাকে মাইকের ঘোষকদের কথা জানিয়ে যায়। বলে, রাজেশের জন্য তাদেরও মর্যাদা বেড়ে গেছে। সে নানকিপুরা শহরের গৌরব।
রবিবারের জনসভায় কাতারে কাতারে মানুষ চারপাশ থেকে এসে জড়ো হয়। সবার চোখমুখে প্রবল উদ্দীপনা। তাদের শহরের একটি ছেলের জন্য একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বার বার এখানে আসবেন, কেউ কি ভাবতে পেরেছিল!
মন্ত্রী ত্রিলোকশরণজি গভীর আবেগের সুরে প্রায় এক ঘণ্টা ভাষণ দিলেন। বিষয়বস্তু কারগিলের যুদ্ধ এবং শহিদ রাজেশ যাদব। বললেন, রাজেশ সারা দেশের গর্ব। নিজের প্রাণ দিয়ে সে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে মাতৃভূমিকে রক্ষা করেছে। তার মৃত্যু দেশের মানুষকে, বিশেষ করে যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করবে। এমন মহান মৃত্যু যে কোনো দেশপ্রেমিকের কাম্য।
বক্তৃতার শেষ পর্বে ত্রিলোকশরণজি বললেন, 'ল্যান্স নায়েক রাজেশ যাদবের মৃত্যুতে আমরা একই সঙ্গে গর্বিত এবং ব্যথিত। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পরিবার--তার মা, বাবা, তিন বছরের একমাত্র ছেলে এবং স্ত্রী। যে ক্ষতি তাদের হয়েছে তা পূরণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ঈশ্বর নিশ্চয়ই এই শোক সহ্য করার শক্তি ওঁদের দেবেন।' একটু থেমে ফের শুরু করলেন, 'এ ব্যাপারে সবশেষে এটুকুই বলতে চাই, আমার বেটি-সমান বিমলার পাশে আমি আর আমার পার্টি চিরকাল থাকব। আর আমাদের তরফ থেকে বিমলাকে দু'লাখ টাকা দিতে চাই।'
সঙ্গে সঙ্গে সভার চারদিক থেকে একটানা কয়েক মিনিট হাততালি চলতে থাকে। জনতা এই অর্থদানের ঘোষণাটিকে গভীর উল্লাসে স্বাগত জানায়।

দু হাত তুলে বিশাল জনসভাকে শান্ত করতে করতে ত্রিলোকশরণ বিনীতভাবে বলেন, 'কেউ যেন মনে না করেন, রাজেশ যাদবের অমূল্য প্রাণের দাম মাত্র দু'লাখ টাকা। ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থ আর সম্পদ দিলেও রাজেশের প্রতি আমাদের ঋণ শোধ হবে না। এই প্রাণের কোনো দাম হয় না। আমরা সামান্য কিছু দিয়ে নিজেরাই কৃতার্থ বোধ করছি।'

ত্রিলোকশরণের পেছনে পাথরের মতো ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর দেহরক্ষী সশস্ত্র কমান্ডোরা। মঞ্চে অন্য যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন অযোধ্যানাথ এবং ত্রিলোকশরণের পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্ট ভুবনেশ্বর পাণ্ডে এবং বিমলা।

ত্রিলোকশরণ ভুবনেশ্বরকে কিছু ইঙ্গিত করতে তিনি পোর্ট ফোলিও ব্যাগ থেকে একটা লম্বাটে, সুদৃশ্য কারুকাজ-করা জয়পুরী কাঠের বাক্স—এক ফুট লম্বা, আট ইঞ্চি চওড়া—বার করে তাঁর হাতে দিলেন।

ত্রিলোকশরণ এবার বিমলার দিকে ফিরে বললেন, 'বেটি, আমার কাছে এসে দাঁড়াও।'

ঘোরের মধ্যে উঠে এল বিমলা। তার দিকে কাঠের বাক্সটা বাড়িয়ে দিয়ে ত্রিলোকশরণ বললেন, 'নাও। এর ভেতর চেক রয়েছে।'

খবরের কাগজের রিপোর্টার, ফোটোগ্রাফার এবং টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যানরা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। সাংবাদিকরা সভার খুঁটিনাটি বিবরণ টুকে নিচ্ছে আর ক্যামেরাম্যানরা অনবরত ছবি তুলে চলেছে।

ত্রিলোকশরণের হাত থেকে বাক্সটা নিতে নিতে বিমলা টের পাচ্ছিল, প্রচণ্ড আবেগে তার সমস্ত শরীর থরথর কাঁপছে।

ত্রিলোকশরণ, অযোধ্যানাথ, তাঁদের পার্টি এবং রাজেশ যাদবের নামে জয়ধ্বনিতে জনসভা গমগম করতে থাকে।

'ত্রিলোকশরণজি—'

'জিন্দাবাদ।'

'রাজেশ যাদব—'

'জিন্দাবাদ।'

ফের হাত তুলে জনতাকে শান্ত করেন ত্রিলোকশরণ। তারপর সস্নেহে, কোমল স্বরে বিমলাকে বলেন, 'বেটি মাইকের সামনে এসে জনতাকে কিছু বল।'

বিহ্বলের মতো বিমলা বলে, 'আমি বলব!'

'হ্যাঁ। সবাই তোমার কথা শুনতে চায়।'

মাইকের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকায় ত্রিলোকশরণের কথা শ্রোতারা শুনতে পাচ্ছিল। তারা চেঁচিয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা বিমলা বহীনের কথা শুনতে চাই।'

আশ্বাসের ভঙ্গিতে ডান হাতটা তুলে সভার উদ্দেশে নাড়তে থাকেন ত্রিলোকশরণ। অর্থাৎ তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। বিমলাকে বলেন, 'ওরা কী চাইছে, শুনলে তো?'

বিমলার গলা শুকিয়ে এসেছিল। সে বলে, 'না না, আমি পারব না।'

'খুব পারবে।'

'লেকেন এরকম মিটিংয়ে কখনও কিছু বলিনি। কী বলব আমি!'

বিমলার কাঁধে একটা হাত রেখে ত্রিলোকশরণ তাকে সাহস দেওয়ার সুরে বলেন, 'কোনো ভয় নেই। রাজেশের কথা বল—' মাইকের মুখোমুখি তিনি বিমলাকে দাঁড় করিয়ে দেন।

সামনে অসংখ্য মানুষ উদ্‌গ্রীব তাকিয়ে আছে। প্রথমটা সমস্ত কিছু ঝাপসা হয়ে যায়। তারপর প্রায় মরিয়া হয়েই শুরু করে বিমলা। তার নিজের তো বটেই, বুড়ো মা বাবা এবং একমাত্র ছেলের জীবন জুড়ে ছিল রাজেশ। ফি বছর জুলাই মাসে বিবাহ বার্ষিকীর আগে আগে সেনাশিবির থেকে চলে আসত সে। দিন পনেরর বেশি ছুটি পেত না। কিন্তু এই ক'টা দিন সবাইকে মাতিয়ে রাখত। এবারও তার আসার কথা ছিল, সেজন্য অন্য সব বছরের মতো বিমলারা অপেক্ষা করছিল কিন্তু জীবন্ত মানুষটা এল না।

বলতে বলতে গলা বুজে এল বিমলার। বুকের অতল স্তর থেকে উত্তাল কান্না স্রোতের মতো উঠে আসছে। কিছুতেই সেটা ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। দু হাতে মুখ ঢাকল সে।

ত্রিলোকশরণ বিমলাকে মাইকের সামনে এগিয়ে দিয়ে মঞ্চের একটা চেয়ারে বসে পড়েছিলেন। শশব্যস্তে উঠে এসে তার কাঁধটা বেড় দিয়ে ধরে বলেন, 'রো মাত্ বেটি--কেঁদো না। এত মানুষ তোমার কথা শোনার জন্য বসে আছে। নাও, ফির শুরু কর।'

নিজেকে ধীরে ধীরে সামলে নেয় বিমলা। মুখ থেকে হাত সরিয়ে আবার বলতে থাকে। রাজেশ নেই, লেকিন সে সবসময় তাদের মধ্যেই আছে। তার জন্যই হাজার হাজার মানুষকে আমাদের কাছে পেয়েছি। পেয়েছি অযোধ্যানাথজি আর ত্রিলোকশরণজির মতো মহান নেতাকে। আমার জন্য এত মানুষের এত মমতা ছিল আগে জানতাম না। আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সকলকে আমার প্রণাম।

বিমলার কথাগুলো বিশাল জনতাকে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে তারা। তারপর শোকাতুরা একটি বিধবার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে ধীরে ধীরে হাততালি দিতে থাকে।

মাইকের কাছ থেকে সরে নিজের চেয়ারটিতে গিয়ে বসে বিমলা। অযোধ্যানাথ উঠে এসে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তাড়াহুড়ো নেই। মানুষজন আস্তে আস্তে মাঠ ছেড়ে চলে যায়।

বিমলা ত্রিলোকশরণকে বলেল, 'আপনি অনুমতি করলে আমি বাড়ি যাব। বুড়ো শ্বশুর, সাস আর বাচ্চাকে পড়শীদের কাছে রেখে এসেছি।'

ত্রিলোকশরণ বললেন, 'হাঁ, নিশ্চয়ই যাবে। এখানকার কাজ শেষ হয়েছে। অযোধ্যানাথজি তোমাকে পৌঁছে দেবেন।'

কিছুক্ষণ পর একটা অ্যাম্বাসাডরের পেছনের সিটে অযোধ্যানাথের পাশাপাশি বসে বাড়ি ফিরছিল বিমলা।

পশ্চিম দিকের উঁচু উঁচু গাছপালার ওধারে সূর্য খানিক আগে ডুবে গেছে। নানকিপুরা টাউনের ওপর ঝাপসা সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। রাস্তায় রাস্তায় আলকাতরা মাখানো কাঠের গুঁড়ির পোস্টগুলোতে মিউনিসিপ্যালিটির টিমটিমে আলো জ্বলে উঠেছে।

জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে বিমলা। রাজেশকে জড়িয়ে তার জীবনের টুকরো টুকরো নানা ঘটনা, নানা দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠছিল।

মনে পড়ে, বিয়ের আগে রামধারী এবং এক বন্ধুর সঙ্গে তাকে দেখতে গিয়েছিল রাজেশ। এবং দেখামাত্র পরস্পরকে তাদের ভাল লেগে যায়। কিন্তু সে ফৌজি জওয়ান, জীবনটা পদ্মপাতায় জলের মতো, এই আছে এই নেই। লড়াই বাধলে চলে যেতে হবে রণাঙ্গনে। সেখান থেকে বেঁচে ফিরবে কিনা সে সম্পর্কে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। জীবন যার এত অনিশ্চিত তার হাতে মেয়েকে তুলে দিতে ইচ্ছা ছিল না বিমলার বাবুজি ফেকুনাথ যাদবের। অনিচ্ছার কারণটা জানতে পেরে পরে একা গিয়ে রাজেশ তাকে বুঝিয়েছে, সেই একাত্তর সালের পর যুদ্ধ হয়নি। বড় রকমের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ভারতবর্ষের নেই। তা ছাড়া যুদ্ধ ছাড়া কি লোক মরে না? এই যে কত যুবক গাড়ি চাপা পড়ে কিংবা ট্রেনে কাটা পড়ে বা অসুখ বিসুখে মারা যায়। জন্মালে মানুষকে কোনো কোনোভাবে দু'দিন আগে হোক বা পরে হোক মরতেই হবে। তাই বলে তাদের বিয়ে হয় না?

শেষ পর্যন্ত, ফেকুনাথ যাদব বিয়েতে রাজি হয়েছিল। রাজেশ ছিল খুবই আমুদে, হাসিখুশি মানুষ। বিয়ের পর ক'টা বছর, যদিও তাকে সবসময় কাছে পেত না বিমলা, স্বপ্নের মতো যেন কেটে গিয়েছিল।

হঠাৎ পাশ থেকে অযোধ্যানাথের ডাক কানে এল, 'বেটি—'

স্মৃতির ভেতর থেকে উঠে আসে বিমলা। চমকে মুখ ফিরিয়ে অযোধ্যানাথের দিকে তাকায়, 'কিছু বলবেন?'

অযোধ্যানাথ আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন, 'হাঁ। তোমার ওপর মানুষের কত সিমপ্যাথি দেখলে?'

'হাঁ।'

'সিমপ্যাথির লহরটা ধরে রাখতে হবে।'

অযোধ্যানাথের এই কথাটা বুঝে উঠতে পারল না বিমলা। সহানুভূতির যে ঢেউ উঠেছে, সেটা ধরে রাখার মানে কি? বিমলা বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

অযোধ্যানাথ এ সম্পর্কে আর কিছু না বলে জিজ্ঞেস করেন, 'শুনেছি, তুমি লেখাপড়া জানো। স্কুলে পড়েছ?'

বিমলা বলল, 'আমি একটা মিশনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেছি, কলেজেও ভর্তি হয়েছিলাম। বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পড়া বন্ধ হয়ে গেল।'

দু চোখে অপার বিস্ময় ফুটে ওঠে অযোধ্যানাথের। বলেন, 'তুমি মাট্রিক পাস!'

'হাঁ।'

'মিশনারিদের স্কুলে যখন পড়েছ, আংরেজি বলতে নিশ্চয়ই পার।' সাধারণ হিন্দি স্কুলে ক্লাস এইচ পর্যন্ত পড়া অযোধ্যানাথের ইংরেজি সম্বন্ধে অসীম দুর্বলতা।

বিমলা সামান্য হেসে বলল, 'পারি। আমাদের ইংলিশ মিডিয়ামেই তো পড়াশোনা করতে হয়েছে।'

অযোধ্যানাথের মনে হল, হঠাৎ একটা অমূল্য রত্ন তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। বিমলার প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর মন ভরে যায়। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর বলেন, 'তোমাকে নিয়ে ত্রিলোকশরণজি আর আমার একটা খুব বড় পরিকল্পনা আছে।'

'কিসের পরিকল্পনা?'

'আজ জানতে চেও না। আগে সব ব্যাপারটা পাকা হোক। তারপর তোমাকে বলব।'

একসময় বিমলা বাড়ি পৌঁছে যায়।

সেই যে অযোধ্যানাথরা নানকিপুরা কলেজের মাঠে মিটিং করেছিলেন তার দু'দিন পর সন্ধেবেলায় রাজ্যের মন্ত্রী বাঁকেলালজিদের পার্টির স্থানীয় নেতা কমলাপতিজি এসে হাজির। বিমলাকে তিনি বললেন, 'বেটি, আমি ক'দিন নানকিপুরায় ছিলাম না। জরুরি কাজে পাটনা গিয়েছিলাম। ফিরে এসে শুনলাম লাস্ট এতোয়ারে তোমাকে নিয়ে অযোধ্যানাথজিরা বড় মিটিং করেছেন।'

বিমলা আস্তে মাথা নাড়ে, 'হাঁ।'

'দো লাখ রুপাইয়াও দিয়েছে।'

'হাঁ।'

'বেটি সামনের এতোয়ারে আমরা তোমাকে নিয়ে তার চাইতেও ভারি মিটিং করব। তোমাকে সেখানে যেতে হবে। তোমার পতিকে ওদের চেয়েও আমরা অনেক বেশি সম্মান দেব।'

ক'টা দিন কমলাপতিদের পার্টির যুবকেরা দশ-বারটা জিপ নিয়ে নানকিপুরা টাউন তো বটেই, চারপাশের তিরিশ চল্লিশটা গ্রাম চষে ফেলে মাইকে মাইকে জানিয়ে দিল, আগামী রবিবার শহরের বিশাল গান্ধী ময়দানে মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে। ল্যান্স নায়েক রাজেশ যাদবকে সেখানে বিরাট সম্মান জানানো হবে। রাজেশের পত্নী শ্রীমতী বিমলা যাদব সভায় উপস্থিত থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন রাজ্যের প্রভাবশালী মন্ত্রী বাঁকেলালজি। আপনারা দলে দলে যোগ দিন।

গান্ধী ময়দানটা আকারে নানকিপুরা কলেজের মাঠের প্রায় দ্বিগুণ। অযোধ্যানাথদের মিটিংয়ের মতো এখানকার জনসভাতেও মানুষ উপচে পড়ল। কমলাপতি, এবং বাঁকেলাল ভাষণ দিলেন। বিমলাকেও আগের রবিবারের সভার মতো রাজেশ সম্পর্কে কিছু বলতে হল। হাততালিও কম হল না।

বাঁকেলালজি তাঁর দেড় ঘণ্টার বক্তৃতায় দেশের জন্য রাজেশের আত্মত্যাগের বিবরণ দিয়ে বললেন, তার নাম জাতির ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ভাষণের পর তাঁদের পার্টির তরফ থেকে বিমলাকে আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হল। অর্থাৎ ত্রিলোকশরণরা যা দিয়েছিলেন তার চেয়ে পঞ্চাশ হাজার বেশি।

অর্থদানের পর বাঁকেলালজি জানালেন, তাঁর পার্টি ল্যান্স নায়েক রাজেশ যাতে মরণোত্তর 'পরমবীর চক্র'-এর সম্মানটি পায় যে জন্য মস্ত রকম চেষ্টা করবে। সব মিলিয়ে তাঁরা ত্রিলোকশরণজির ওপর

অনেকটা টেক্কা দিয়ে গেলেন।

সেদিন বিমলাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন অযোধ্যানাথ। আজ সভার পর সে দায়িত্বটা নিয়েছেন কমলাপতি। গাড়িতে পাশাপাশি বসে যেতে যেতে তিনিও জানালেন, বিমলাকে নিয়ে তাঁদেরও একটা বড় আকারের পরিকল্পনা আছে।

দু দুটো রাজনৈতিক দলের দুই জবরদস্ত নেতা তাকে নিয়ে একই রকম পরিকল্পনার কথা বলেছেন। কী উদ্দেশ্য ওঁদের? বিমলার মনে সংশয় দেখা দেয়। সে জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে নিয়ে কী করতে চান আপনারা?

মৃদু হেসে কমলাপতি বলেন, 'দু'চারটে দিন সবুর কর। তারপর নিজে এসে সব জানিয়ে যাব।'

বিমলা উত্তর দেয় না।

বাঁকেলালজিদের সভার দিন কয়েক পর হঠাৎ বিমলার কানে এল এ অঞ্চলের তিন নম্বর রাজনৈতিক দল, রাসবিহারী দাস যার নেতা, কুপন ছাপিয়ে রাজেশের নামে টাকা তুলছে। সে ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এই রাজনৈতিক দলগুলোর কী যে মতলব সঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

অযোধ্যানাথ আর কমলাপতির মতো এক রবিবার রাসবিহারীও বিমলাকে নিয়ে সভা করলেন। বললেন, তাঁদের দল ছোট, বড় পলিটিকাল পার্টিগুলোর মতো তাঁদের টাকার জোর নেই। সাধারণ মানুষের কাছে রাজেশকে সম্মান জানানোর জন্য হাত পেতেছিলেন। জনগণ তাঁদের ফেরায়নি। অকুণ্ঠভাবে নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী সাহায্য করেছে। দেশবাসীর এই দান, মোট তেত্রিশ হাজার টাকা, বিমলাকে দিয়ে রাসবিহারীরা ধন্য হচ্ছেন।

এই সভার পর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার সময় বিমলাকে সেই একই কথা বললেন রাসবিহারী। ওকে নিয়ে তাঁদেরও বিশাল পরিকল্পনা আছে এবং খুব শীগ্‌গিরই তা জানানো হবে।

দিন পনের পর অযোধ্যানাথ এসে বললেন, 'বেটি, তোমাকে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলেছিলাম। আজ তোমাকে সেটা শোনাতে এসেছি।'

উদ্বিগ্ন মুখে বিমলা বলে, 'কী পরিকল্পনা?'

'আসছে চুনাওতে আমাদের পার্টি তোমাকে টিকিট দিচ্ছে। তোমাকে ভোটে লড়তে হবে।'

বিমলা চমকে ওঠে, 'আমি! পলিটিকস সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই তো নেই। লোকে আমাকে ভোট দেবে কেন?'

অযোধ্যানাথ বললেন, 'দেবে দেবে। রাজেশের জন্যে তোমার পক্ষে সিমপ্যাথির লহর উঠেছে। সেটা কাজে লাগাতে হবে।'

বিমলার মুখটা হঠাৎ শক্ত হয়ে ওঠে, 'ও, এই জন্যেই মিটিং করে আমাকে টাকা দিয়েছিলেন?'

বিব্রতভাবে অযোধ্যানাথ বললেন, 'ওভাবে বলো না। রাজেশের আত্মাকে আমরা সম্মান জানিয়েছি। আমাদের পার্টি তোমার কাছে কিছু আশা তো করতেই পারে।'

'ক্ষমা করবেন। আমি রাজি নাই।'

অনেক অনুরোধ এবং অনুনয় করলেন অযোধ্যানাথ। কিন্তু বিমলাকে টলানো গেল না। মুখ কালো করে তিনি চলে গেলেন।

তারপর একে একে একই প্রস্তাব নিয়ে এলেন কমলাপতি এবং রাসবিহারী। তাঁদেরও ফিরিয়ে দিল বিমলা। তার স্বামীর জীবনদানের সুযোগটা সে কিছুতেই রাজনৈতিক দলগুলিকে নিতে দেবে না।

গ্রন্থ-পরিচিতি